উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ঃ একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

লেনিন আজাদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে পি,এইচ,ডি ডিগ্রী
অর্জনের শর্তপূরণের জন্য উপস্থাপিত

Ph.D.

তারিখ ঃ ৮ই আগষ্ট ১৯৯৩।

তত্ত্বাবধায়ক
ডঃ রংগলাল সেন
মধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানঃ একটি সমাজ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

লেনিন আজাদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে পি.এইচ.ডি ডিগ্রী অর্জনের শর্তপূরণের [illegible]
উপস্থাপিত।

তারিখঃ ৮ই আগষ্ট ১৯৯৩।

Dhaka University Library
384943
384943

তত্ত্বাবধায়ক
ডঃ রংগলাল সেন
অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	তিন
	সারণি সূচী	পাঁচ
	শব্দ সংক্ষেপ	নয়
১	ভূমিকা	১
২	উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানঃ একটি তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত	৯
৩	রাষ্ট্রঃ একটি সমাজতাত্ত্বিক প্রত্যয়	৩৭
৪	পশ্চিম পাকিস্তানের উৎপাদন পদ্ধতি ও সামাজিক শ্রেণী-বিভাজনের প্রকৃতি	৬৭
৫	পূর্ব পাকিস্তানের উৎপাদন পদ্ধতি ও সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস	৮৮
৬	পাকিস্তান রাষ্ট্রের চরিত্রঃ ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮	১১৬
৭	পাকিস্তান রাষ্ট্রের চরিত্রঃ আইয়ুব আমল	১৪৩
৮	উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানঃ রাজনৈতিক আন্দোলনের বিকাশ ধারা পর্যালোচনা	২০০
৯	সারসংক্ষেপ ও উপসংহার	৩৩৬
সংযোজনী-১	দৈনিক আজাদ পত্রিকার নির্বাচিত সংবাদ শিরোনাম	৩৪৮
সংযোজনী-২	সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের নাম পরিচয়	৩৮৩
সংযোজনী-৩	প্রশ্নমালা	৩৯০
গ্রন্থপঞ্জী		৩৯৪

384943

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ইতিহাসের কোন কোন ঘটনা সমগ্র জনতা কিংবা গোটা জাতিকে নাড়া দিয়ে যায়; সমাজে, অর্থনীতিতে, সংস্কৃতিতে কিংবা মননে এমন ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে যা' সবকিছুকে অতিক্রম করে যায়। এ ধরনের একটি ঘটনাই হচ্ছে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এমন সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে সংঘটিত হয়েছিল যাতে একদিকে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সমগ্র পাকিস্তানের জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধভাবে অংশগ্রহণ করেছিল, অন্যদিকে, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপক সাধারণ মানুষ আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল, যার মধ্যেই তারা খুঁজেছিল জীবন-জীবিকার এক সুন্দর ভবিষ্যৎ। স্বল্প সময়ের জন্য হলেও তৎকালীন পাকিস্তানে বসবাসকারী প্রায় সমগ্র বাঙালী এমন প্রতিবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে যে, শত অত্যাচার-নির্যাতন ও দুঃশাসনকে উপেক্ষা করে তারা পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে আঘাত হানতে মরিয়া হয়ে ওঠে। সমগ্র পাকিস্তানের জনসাধারনের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের আন্দোলন এবং পাকিস্তানের উভয় অংশের শ্রমজীবী মানুষের শোষণ মুক্তির সংগ্রাম কিভাবে সমন্বিত হয়েছিল এবং কিভাবে পূর্ব পাকিস্তানে তা বিপ্লবী গণঅভ্যুত্থানের দিকে মোড় নিতে শুরু করেছিল তার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষনের জন্যই এ গবেষণার সূত্রপাত ।

গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি অনেকেরই সহযোগিতা পেয়েছি এবং তাঁদের কারো কারো কাছ থেকে এমন মূল্যবান সহযোগিতা পেয়েছি যা'ছাড়া এ গবেষণা কর্মটি সমাপ্ত করা সম্ভব হত না। এ ধরনের সাহায্য সহযোগিতা যারা করেছেন তাঁদের মধ্যে আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক রংগলাল সেনের ভূমিকা ছিল প্রধান। তিনি এ গবেষণার প্রস্তাবনা প্রস্তুত থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত গবেষণার প্রতিটি স্তরে আমার জন্য এত বিপুল সময় ব্যয় করেছেন যে, যে কোন গবেষকের জন্য এটি ঈর্ষার ব্যাপার হয়ে উঠতে পারে। কেননা এমন সহযোগিতাসুলভ মনের অধিকারী একজন তত্ত্বাবধায়কের অধীনে গবেষণার সুযোগ পাওয়া সত্যিই গৌরবের বিষয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক সৈয়দ আহমদ খানের বিভিন্ন সময়ের উৎসাহ উদ্দীপনা ও গবেষণার পদ্ধতি সম্পর্কিত বস্তুনিষ্ঠ পরামর্শ আমার গবেষণাকর্মকে এগিয়ে নিতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছে। আমি তাঁর প্রতি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। বিভাগের অন্য দু'জন অধ্যাপক যথাক্রমে জনাব কে,এ,এম,সা'দ উদ্দিন ও ডঃ নজরুল ইসলামের নাম আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। তাঁরা দু'জন গবেষণার তত্ত্বগত কাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন এবং বিভিন্ন সময় গবেষণার কোন সমস্যা নিয়ে গেলে তাঁরা অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে শুনেছেন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেছেন। এছাড়া, গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে বিভাগীয় সেমিনারে কিংবা ব্যক্তিগতভাবে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের যে সকল শিক্ষক সাহায্য -সহযোগিতা করেছেন তাদের মধ্যে ডঃ হেলাল উদ্দীন খান সামসুল আরেফিন, জনাব সরদার আমিনুল ইসলাম, ডঃ মাহাবুব আহমেদ, ডঃ হাবিবুর রহমান, ডঃ মনিরুল ইসলাম খান ও ডঃ নূরুন-নবী অন্যতম। এ সকল প্রাজ্ঞ শিক্ষকের প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমি এখানে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বি.আই.ডি.এস)-এর তিন জন কৃতি গবেষকের নাম। এঁরা হচ্ছেন জনাব আবু আহম্মেদ আব্দুল্লাহ, ডঃ হোসেন জিল্লুর রহমান ও ডঃ বিনায়ক সেন। এ তিনজনের মূল্যবান পরামর্শ আমার গবেষণার কাজকে অগ্রসর করে নিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। আমি তাঁদের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। বি.আই.ডি.এস-এর আর যাঁরা আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন তাঁরা হচ্ছেন বি.আই.ডি.এস-এর প্রাক্তন প্রফোসারিয়াল ফেলো অধ্যাপক রেহমান সোবহান, গবেষণা পরিচালক ডঃ আবদুল গফুর এবং উর্ধতন গবেষণা ফেলো ডঃ সুলতান হাফিজ রহমান। এঁরা তাঁদের মূল্যবান অভিজ্ঞতা বিশ্লেষনের মাধ্যমে আমার বেশ কিছু বিষয় সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারনা লাভে সহায়তা করেছেন। এছাড়া, বি.আই.ডি.এস-এর উর্ধতন গবেষণা ফেলো ডঃ আতিউর রহমানের কাছেও আমি বিশেষভাবে ঋণী, কেননা তাঁর ঐকান্তিক সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া আমার গবেষণার জন্য যে বিপুল সময় ও অর্থ ব্যায় করতে হয়েছে তার কোন কিছুই করা সম্ভব হতনা। বি.আই.ডি.এস-এর আর যারা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের মধ্যে ডঃ মাহমুদুল আলম অন্যতম। আমি এঁদের সকলের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

এ গবেষণার কাজে ধৈর্য ধরে যে সকল রাজনীতিবিদ নিজস্ব জীবনের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন তাদের মধ্যে শরদিন্দু দস্তিদার, আব্দুল মতিন, নূরুল হুদা মির্যা, অজয় রায়, ডঃ শাহ আলম মোল্লা, হায়দার আকবর খান রনো, তোফায়েল আহমদ, নূরুর রহমান ও শামসুজ্জোহা মানিকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমি ঢাকা শহরের তিনটি গ্রন্থাগারের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করছিঃ এগুলি হচ্ছে বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং বি.আই.ডি.এস গ্রন্থাগার। উক্ত তিনটি গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সহযোগিতার ওপর নির্ভর করেই মূলত গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্যের সিংহভাগ সংগৃহীত হয়েছে। এছাড়া, গবেষণার কাজে কিছু তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন বন্ধুবর মেসবাহ কামাল। তথ্য সংগ্রহের কাজে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন ওলিউল ইসলাম ও মশিয়ার রহমান। গবেষণা কর্মটি প্রস্তুতের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ দিয়ে সহায়তা করেছেন আমার বড়বোন রেবেকা সুলতানা। দীর্ঘ অভিসন্দর্ভটি যত্নের সাথে কম্পিউটার কম্পোজ করেছেন বি.আই.ডি.এস-এর মোবারক হোসেন। শত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেও এঁদের কারো ঋণ শোধ হবার নয়।

পরিশেষে, আমার বাবা-মার ব্যাপক উৎসাহ ও সমর্থন এ গবেষণা কর্মকে সমাপ্ত করতে আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। আমার স্ত্রী ফিরোজা বেগমের সর্বোচ্চ নৈতিক সমর্থন ও ভালবাসা আমার গবেষণাকে দ্রুত শেষ করতে সাহায্য করেছে। এঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর কোন ভাষা আমার নেই।

লেনিন আজাদ
৮ই আগষ্ট, ১৯৯৩ ।

384943

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সারণি সূচী

সারণির শিরোনাম		পৃষ্ঠা
সারণি ৪.১ঃ	১৯৪৯ সালে পাঞ্জাবে ভূমি মালিকানার ধরণ	৬৮
সারণি ৪.২ঃ	পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশে মোট চাষযোগ্য জমি ও তার মালিকানার ধরণ	৭২
সারণি ৪.৩ঃ	ষাটের দশকে কলের লাঙ্গলের মালিকদের খামার আয়তন ভিত্তিক শ্রেণী বিভাগ	৭৩
সারণি ৪.৪ঃ	১৯৭১/৭২ সালে পাকিস্তানের গ্রামীন পরিবার-সমূহের খামার আয়তন ও শ্রেণী ভিত্তিক বিভাজন	৭৪
সারণি ৪.৫ঃ	১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তানের শিল্প প্রতিষ্ঠানের তুলনামূলক চিত্র	৭৭
সারণি ৪.৬ঃ	পাকিস্তানী শিল্পপতিদের প্রাক্তন পেশার তুলনামূলক চিত্র	৭৮
সারণি ৪.৭ঃ	পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন শিল্পে স্থায়ী সম্পদের অগ্রগতির ধারা (কোটি টাকার হিসাবে)	৭৮
সারণি ৪.৮ঃ	মূল্যমানের ভিত্তিতে পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পপন্য উৎপাদনে উন্নয়ন ধারা (কোটি টাকার হিসাব)	৭৯-ক
সারণি ৪.৯ঃ	পশ্চিম পাকিস্তানে শিক্ষিতের হারে পরিবর্তন	৮০
সারণি ৪.১০ঃ	পশ্চিম পাকিস্তানে শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতির ধারা	৮১
সারণি ৪.১১ঃ	১৯৬১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের সামাজিক শ্রমশক্তির (১০ বছরের উর্ধে) পেশাগত বিন্যাস (শতকরা হার)	৮২
সারণি ৪.১২ঃ	পশ্চিম পাকিস্তানে অকৃষি শ্রমশক্তির শ্রেণী বিন্যাস	৮৩
সারণি ৪.১৩ঃ	১৯৪৭-৭০ কাল পর্বে পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পোন্নয়নের লক্ষ্যে আগত বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণের ক্ষতিয়ান	৮৪
সারণি ৪.১৪ঃ	পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন ভারী শিল্পে কর্মরত সদস্য সংখ্যা অগ্রগতির ধারা (হাজার লোকের হিসাব)	৮৫
সারণি ৪.১৫ঃ	পশ্চিম পাকিস্তানে ১৯৫৯-৭০ কাল পর্বে বৃহৎ শিল্প-কারখানার স্থায়ী সম্পদের মূল্য, উৎপাদিত পন্যের মূল্য এবং শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিক কর্মচারী সংখ্যার অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র	৮৫
সারণি ৫.১ঃ	১৯৫১-৬১ কালপর্বে আবাদী জমির সাথে কৃষকদের সম্পর্কের প্রকৃতি	৮৯
সারণি ৫.২ঃ	১৯৫১-৬১ কালপর্বে কৃষিতে নিয়োজিত শ্রম শক্তির বিন্যাস	৯০
সারণি ৫.৩ঃ	১৯৬০ সালে ভূমি মালিকানা ও মহাজনী ঋণের ধরণ	৯১
সারণি ৫.৪ঃ	১৯৬০ ও ১৯৬৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানের খামার সংখ্যা ও খামার আয়তনের তুলনামূলক চিত্র	৯২
সারণি ৫.৫ঃ	১৯৬৭-৬৮ সালে জমি ব্যবহারের প্রকৃতির ভিত্তিতে খামারের শ্রেণী বিন্যাস	৯৩
সারণি ৫.৬ঃ	পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামীন এলাকায় আয়ের বন্টনের স্বরুপ	৯৫
সারণি ৫.৭ঃ	খামারে উৎপাদিত ফসলের সাথে সংসারের প্রয়োজনের সম্পর্কের মাত্রা	৯৬
সারণি ৫.৮ঃ	পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫২-১৯৬২ কালপর্বে PIDC বিনিয়োগের ক্ষতিয়ান	১০৪
সারণি ৫.৯ঃ	সরকারী অনুমোদন প্রাপ্ত পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান প্রধান শিল্প কারখানার সংখ্যা	১০৫
সারণি ৫.১০ঃ	পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত ভারি শিল্প সমূহে ষাট দশকের উৎপাদনের পরিমান	১০৫
সারণি ৫.১১ঃ	১৯৪৯-৫০ থেকে ১৯৬৮/৬৯ কালপর্বে পূর্ব বাংলার শিল্প পন্য উৎপাদনের খতিয়ান	১০৫
সারণি ৫.১২ঃ	১৯৬৯-৭০ সালে প্রধান প্রধান শিল্পে স্থায়ী ও চলতি মূলধনের পরিমান, উৎপাদনের পরিমান ও মুনাফার হার	১০৭
সারণি ৫.১৩ঃ	১৯৫৯/৬০-১৯৬৮/৬৯ কালপর্বে পূর্ব পাকিস্তানের ব্যক্তিগত খাতে বিনিয়োজিত পুঁজির পরিমান ও তার উৎস্য	১০৮
সারণি ৫.১৪ঃ	১৯৪৯/৫০-১৯৬৮/৬৯ কালপর্বে পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরীন উৎপাদনের খাত ওয়ারী খতিয়ান	১১০
সারণি ৫.১৫ঃ	বিভিন্ন পেশায় কর্মরত সক্রিয় শ্রমশক্তির বিন্যাস	১১১
সারণি ৫.১৬ঃ	শহরে শ্রমশক্তির বিন্যাস	১১১
সারণি ৬.১ঃ	১৯৪৮/৪৯-১৯৫১/৫২ (এপ্রিল-মার্চ) কালপর্বে পাকিস্তানের পুজি সঞ্চালনের (Capital Movement) স্বরুপ	১৩০

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ৬.২ঃ	১৯৪৮/৪৯-১৯৫১/৫২ (এপ্রিল-মার্চ) কাল পর্বে পাকিস্তানের আমদানী রফতানী ভারসাম্যের স্বরূপ	১৩১
সারণি ৬.৩ঃ	১৯৪৮/৪৯-১৯৫১/৫২ (এপ্রিল-মার্চ) কাল পর্বে পাকিস্তানের দু'অংশে অর্থনৈতিক ভারসাম্যের স্বরূপ	১৩২
সারণি ৬.৪ঃ	১৯৪৭/৪৮-১৯৫৫/৫৬ (এপ্রিল-মার্চ) কাল পর্বে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন বাজেটের (প্রকৃত ব্যয়) স্বরূপ	১৩৩
সারণি ৬.৫ঃ	১৯৫৫ সালে কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে কর্মকর্তাদের মধ্যে পাকিস্তানের দুই অংশের প্রতিনিধিত্বের স্বরূপ	১৩৫
সারণি ৬.৬ঃ	১৯৫৫ সালে সামরিক আমলাদের অঞ্চলগত বিন্যাস (সংখ্যা)	১৩৫
সারণি ৬.৭ঃ	পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে নিয়োজিত প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের স্থায়ী বাসস্থান ভিত্তিক বিন্যাস	১৩৬
সারণি ৬.৮ঃ	১৯৬৩ সালে পাকিস্তানে কর্মরত কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রিত কর্মকর্তাদের স্থায়ী ঠিকানা ও বেতন অনুযায়ী বিন্যাস	১৩৭
সারণি ৬.৯ঃ	১৯৬৩ সালে পূর্ব পাকিস্তানের কর্মরত ইপিসিএস কর্মকর্তাদের স্থায়ী ঠিকানা ও বেতন অনুযায়ী বিন্যাস	১৩৮
সারণি ৬.১০ঃ	পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যাগত অবস্থান	১৩৮
সারণি ৬.১১ঃ	১৯৫৯-৬৭ কাল পর্বে সি.এস.পি পদে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের নিয়োগের তুলনামূলক চিত্র	১৩৯
সারণি ৭.১ঃ	যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচীতে শ্রেণীগত দাবিসমূহের স্বরূপ	১৫৯
সারণি ৭.২ঃ	১৯৫৮-৬২ কাল পর্বে পাকিস্তানের দু'অংশে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের চিত্র	১৬১
সারণি ৭.৩ঃ	১৯৫৯/৬০-১৯৬৮/৬৯ কাল পর্বে পূর্ব পাকিস্তানের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের চিত্র	১৬১
সারণি ৭.৪ঃ	১৯৫৪/৫৫-১৯৬৯/৭০ কাল পর্বে পাকিস্তান ও অন্যান্য দেশ থেকে বিভিন্ন ধরনের পন্য আমদানির খতিয়ান	১৬২
সারণি ৭.৫ঃ	১৯৫৪/৫৫-১৯৬৯/৭০ কাল পর্বে পাকিস্তান ও অন্যান্য দেশে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন ধরনের পন্য রপ্তানির খতিয়ান	১৬৩
সারণি ৭.৬ঃ	১৯৫৯/৬০-১৯৬৮/৬৯ কাল পর্বে পূর্ব পাকিস্তানের পশ্চিম পাকিস্তানে ও অন্যান্য দেশে বিভিন্ন ধরনের পন্য রপ্তানির খতিয়ান	১৬৪
সারণি ৭.৭ঃ	১৯৫৯/৬০-১৯৬৮/৬৯ কাল পর্বে পূর্ব পাকিস্তানের রাজস্ব আয়	১৬৪
সারণি ৭.৮ঃ	১৯৫৫/৫৬-১৯৬৮/৬৯ কাল পর্বে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের খাতওয়ারী বিবরণ	১৬৬
সারণি ৭.৯ঃ	১৯৫৯-৬৪ কাল পর্বে পাকিস্তানের দু'অংশে শিল্প উন্নয়নের জন্য সরকারী-বেসরকারী বিনিয়োগের তুলনামূলক চিত্র	১৬৬
সারণি ৭.১০ঃ	তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৬৫-৭০)তে শিল্প উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবিত ব্যয়	১৬৭
সারণি ৭.১১ঃ	পাকিস্তানে কৃষি পন্য উৎপাদনের প্রদেশওয়ারী পরিসংখ্যান	১৬৮
সারণি ৭.১২ঃ	১৯৪৭/৪৮-১৯৬৬/৬৭ কাল পর্বে পাকিস্তানের দুই অংশে অর্থকরী ফসল উৎপাদনের খতিয়ান	১৬৮
সারণি ৭.১৩ঃ	১৯৫৯/৬০ থেকে ১৯৬৯/৭০ কাল পর্বে পূর্ব বাংলার মোট জাতীয় সঞ্চয় (পরোক্ষ হিসাবে)	১৬৯
সারণি ৭.১৪ঃ	১৯৫৯/৬০-১৯৬৯/৭০ কাল পর্বে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক সঞ্চয় ও বৈদেশিক পুঁজির নিট আন্তঃপ্রবাহের মধ্যে তারসাম্য	১৭০
সারণি ৭.১৫ঃ	১৯৪৯/৫০ থেকে ১৯৬৯/৭০ কাল পর্বে পূর্ব বাংলার জাতীয় উৎপাদন	১৭০
সারণি ৭.১৬ঃ	১৯৪৯/৫০ থেকে ১৯৬৯/৭০ কাল পর্বে বিভিন্ন সময়ে পূর্ব বাংলার জনসংখ্যার খতিয়ান	১৭১
সারণি ৭.১৭ঃ	পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন সময় প্রাথমিক শিক্ষকদের গড় সংখ্যা	১৭৩
সারণি ৭.১৮ঃ	পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন সময় মাধ্যমিক শিক্ষকদের গড় সংখ্যা	১৭৪
সারণি ৮.১ঃ	আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা	২৭৭
সারণি ৮.২ঃ	দৈনিক আজাদে প্রকাশিত সংবাদ শিরোনামের স্বরূপ	২৮৫
সারণি ৮.৩ঃ	পাক-ভারত সম্পর্ক বিষয়ক সংবাদের মাসিক গড় সংখ্যা	২৮৭
সারণি ৮.৪ঃ	পাকিস্তান রাষ্ট্রের ক্ষমতাবান এলিটবর্গের নমূনা	২৮৭
সারণি ৮.৫ঃ	গণনির্যাতন ও নিপিড়নমূলক খবরের মাসিক গড় সংখ্যা	২৮৯
সারণি ৮.৬ঃ	গণনিপীড়ন ও হয়রানি	২৮৯
সারণি ৮.৭ঃ	দাবি-দাওয়া বিষয়ক সংবাদের মাসিক গড় সংখ্যা	২৯০
সারণি ৮.৮ঃ	সরকারের সমালোচনামূলক সংবাদের মাসিক গড় সংখ্যা	২৯০

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ৮.৯ঃ আন্দোলনের কর্মসূচী সংক্রান্ত সংবাদের মাসিক গড় সংখ্যা ২৯১
সারণি ৮.১০ঃ ধর্মঘট বিষয়ক সংবাদের মাসিক গড় সংখ্যা ২৯২
সারণি ৮.১১ঃ বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের সরকার বিরোধী ভূমিকা ২৯৩
সারণি ৮.১২ঃ রাজনৈতিক দল ও জোট বিষয়ক সংবাদের মাসিক গড় ২৯৪
সারণি ৮.১৩ঃ আওয়ামী লীগ বিষয়ক সংবাদ ২৯৫
সারণি ৮.১৪ঃ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী) বিষয়ক সংবাদ ২৯৫
সারণি ৮.১৫ঃ পাকিস্তানের চারজন প্রধান সরকার বিরোধী জাতীয় নেতা সম্পর্কিত সংবাদের মাসিক গড় সংখ্যা ২৯৬
সারণি ৮.১৬ঃ উত্তরদাতাদের বাসস্থান ও পিতার কর্মক্ষেত্রের পরিচয় ৩২৪
সারণি ৮.১৭ঃ উত্তরদাতাদের জেলাওয়ারী বিভাজন ৩২৫
সারণি ৮.১৭কঃ উত্তরদাতাদের ভূমি মালিকানা ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস ৩২৫
সারণি ৮.১৮ঃ উত্তরদাতাদের আয় কাঠামো ৩২৬
সারণি ৮.১৯ঃ উত্তরদাতাদের রাজনৈতিক আদর্শগত অবস্থান ৩২৭
সারণি ৮.২০ঃ উত্তরদাতাদের রাজনৈতিক আদর্শগত বিশ্বাস সৃষ্টির ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা ৩২৮
সারণি ৮.২১ঃ কি কি কারনে উত্তরদাতারা আইয়ুব সরকার বিরোধী হয়ে উঠেছিলেন ৩২৮
সারণি ৮.২২ঃ যে সকল জনগোষ্ঠী আইয়ুব সরকার বিরোধী আন্দোলনকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন জানিয়েছিল সেরকম পাঁচটি শ্রেণী ৩২৯
সারণি ৮.২৩ঃ আইয়ুব সরকার বিরোধী আন্দোলনে যারা অংশগ্রহণ করেনি কিংবা বিরোধীতা করেছিল ৩৩০
সারণি ৮.২৪ঃ আইয়ুব সরকার বিরোধী আন্দোলনে শ্রমজীবী জনসাধারনের অংশগ্রহনের কারণ ৩৩০
সারণি ৮.২৫ঃ উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময় বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সংগ্রাম সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ের নেতাদের ভাবনা ৩৩১
সারণি ৮.২৬ঃ উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে মাঠ পর্যায়ের নেতাদের আকাংখা ৩৩২

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ

আই.এল.ও	ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন
আই.পি.এস	ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল সার্ভিস
আই.সি.এস	ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস
ইপসিক	ইস্ট পাকিস্তান স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন
ই.পি.আই.ডি.সি	ইস্ট পাকিস্তান ইন্ডাসট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন
ই.পি.আর	ইষ্ট পাকিস্তান রাইরফেলস
ই.পি.সি.এস	ইষ্ট পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস
ইপিসিপি (এম-এল)	ইষ্ট পাকিস্তানস্ কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী)
এডিসি	এসিষ্ট্যান্ট ডেপুটি কমিশনার
এনডিএফ	ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট
এনএসএফ	ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফেডারেশন
এবডো	ইলেকসন বোডিজ ডিসকোয়ালীফিকেশনস অর্ডার
এমএনএ	মেমবার অব দা ন্যাশনাল এসেমব্লি
এস.ডি.পি.ও	সাব ডিভিসনাল পুলিশ অফিসার
এম পি এ	মেমবার অব দা প্রভিন্সিয়াল এসেমব্লি
এসডিও	সাব ডিভিসনাল অফিসার
ওয়াপদা	ওয়াটার এন্ড পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট অথোরিটি
ওয়াসা	ওয়াটার এন্ড সোয়েরেজ অথোরিটি
কপ	সম্মিলিত বিরোধী দল
সি আই এ	সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সি (আমেরিকা)
ডাক	ডেমোক্রেটিক একশোন কমিটি
ডাকসু	ঢাকা ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ণ
ডিসি	ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনার
ন্যাপ	ন্যাপনাল আওয়ামী পার্টি
ন্যাপ (ভাসানী)	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বাধীন অংশ, সংক্ষেপে, পিকিংপন্থী ন্যাপ
ন্যাপ (ওয়ালী)	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, খান আব্দুল ওয়ালী খানের নেতৃত্বাধীন অংশ, সংক্ষেপে মস্কোপন্থী ন্যাপ
পিডিএম	পাকিস্তান ডেমোক্রাটিক মুভমেন্ট
পিডিপি	পাকিস্তানে ডেমোক্রাটিক পার্টি
পিডিবি	পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড
পিপিআর	পলিটিক্যাল পার্টিজ রেগুলেশনস
পিপিএসসি	পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশন
পিএসসি	পাবলিক সার্ভিস কমিশন
পোডো	পাবলিক অফিস ডিসকয়্যালিফিকেশনস অর্ডার
বিআইডিএস	বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট ষ্টাডিজ
সিপিইপি	কমিউনিষ্ট পার্টি অব ইষ্ট পাকিস্তান
সিয়াটো	সাউথ ইষ্ট এশিয়ান ট্রিটি অর্গানাইজেশন
সিএসপি	সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তান
সিএসএস	সেন্ট্রাল সুপিরিয়ার সারভিস
সেন্টো	সেন্ট্রাল ট্রিটি অর্গানাইজেশন

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাস নিয়ে কথা উঠলেই যে সকল রাজনৈতিক ঘটনার কথা উঠে পড়ে তার মধ্যে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান অন্যতম। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পর উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের কথা না বলে একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের আলোচনা কেউ করেন না। তাহলে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের এমন কি তাৎপর্য যে, এ ঘটনার উল্লেখ না করে জাতীয় স্বাধীনতার আলোচনাতেও যাওয়া যায় না? বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালীর মাতৃভাষার দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালীর স্বতন্ত্র ও স্বাধীন দেশ গঠিত হয়েছিল কিন্তু উনসত্তরে এমনকি ঘটেছিল যে, উপরোক্ত দুটি ঘটনার উল্লেখ করতে গেলেই এ ঘটনার উল্লেখ করতে হয়? এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই বেশ লেখালেখি হয়েছে, এ ঘটনার ওপর কয়েকখানি গ্রন্থও রচিত হয়েছে। প্রথমে উক্ত গ্রন্থগুলিকে পর্যালোচনা করে দেখা যাক কি কারণে বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ওপর প্রথম যে প্রামাণ্য গ্রন্থখানি রচিত হয় তার লেখক মাহ্‌ফুজ উল্লাহ (১৯৮৩)। মাহফুজউল্লাহ তার উক্ত গ্রন্থে ১৯৬৮ সালের নভেম্বর থেকে শুরু করে ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ঘটে যাওয়া প্রায় সকল রাজনৈতিক ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে। এ সকল ঘটনার সমর্থনে তিনি বেশ কিছু দলিল ও প্রামাণ্য চিত্রও উক্ত গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। এ গ্রন্থের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক ধারার ভূমিকা ও টানাপোড়েনের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে মাহ্‌ফুজ উল্লাহ দেখিয়েছেন, একটি অসংগঠিত রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে থেকেও উনসত্তরে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সকল স্তরের জনসাধারণ এমন এক ব্যাপক অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করে যে, তাদের সে অভ্যুত্থানের মুখে আইয়ুব খানের মত একজন শক্তিশালী শাসকেরও পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল।[১] ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে আন্দোলন শুরু হয়ে ক্রমাগত তা এমন শক্তি অর্জন করে যে, লাগাতার সান্ধ্য আইন জারি করেও জনতার আন্দোলনকে স্তব্ধ করা যায়নি। ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্তসহ সকল স্তরের জনসাধারণ একে একে রাজপথে নেমে আসে এবং সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্তব্ধ করে দেয়। সেনাবাহিনী তলব করেও কোন লাভ হয় না, প্রতিটি নির্যাতনমূলক ঘটনায় প্রতিবাদে জনসাধারণ আরো জঙ্গী আন্দোলন গড়ে তোলেন। শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের দাবির কাছে সরকার আত্মসমর্থন করে এবং তার পরই কেবলমাত্র জনসাধারণ ঘরে ফিরে যায়।

মাহ্‌ফুজ উল্লাহ একের পর এক ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন কিন্তু কি ধরনের দ্বন্দ্বের কারণে এ সকল মারাত্মক সব ঘটনা ঘটতে পারলো তা ব্যাখ্যা করেননি। অবশ্য, এ গ্রন্থ লেখার পিছনে সে উদ্দেশ্যও তার ছিল না। কি কারণে জনসাধারণ এ ধরনের জঙ্গী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল তা জানা না গেলেও ঘটনার তাৎপর্য সম্পর্কে মাহ্‌ফুজ উল্লাহর গ্রন্থ থেকে অবহিত হওয়া যায়।

'উনসত্তরের গণআন্দোলন' শিরোনামে সেলিনা হোসেন যে গ্রন্থখানি রচনা করেছেন সেটাও একটি বিবরণমূলক গ্রন্থ[২] এ গ্রন্থে একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণের চেষ্টা থাকলেও ঘটনাসমূহের কার্যকারণ বিশ্লেষণের দিকে লেখিকা তেমন একটি যাননি। এ গ্রন্থে ১৯৬২ সাল থেকে শুরু করে পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তবে এ বিবরণের মূল উদ্দেশ্য হল কিভাবে বাঙ্গালীর জাতীয় প্রশ্নটি সামনে চলে আসে তা পরিষ্কার করা। আর এ আলোচনার মধ্য দিয়ে কিভাবে শেখ মুজিব একক ব্যক্তিত্ব হিসাবে বের হয়ে আসেন তারও বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আন্দোলনে মওলানা ভাসানীর ভূমিকাকে খাটো করে দেখা না হলেও কোন্ ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে মওলানা ভাসানী নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম হল তার কোন বিবরণ এ গ্রন্থে দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে, কোন্ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পাকিস্তানী কেন্দ্রীয় সরকারের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তারও কোন বিবরণ সেলিনা হোসেন তার গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেননি। ফলে সেলিনা হোসেনের এ গ্রন্থের মধ্য দিয়ে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ব্যাপকতা সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায় বটে কিন্তু কি কারণে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ সেই তীব্র গণআন্দোলনে শরিক হয়েছিল সে সম্পর্কে কোন ধারণা পাওয়া যায় না। এমনকি, শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগ ছাড়া যে অন্য কোন রাজনৈতিক শক্তির অস্তিত্ব এখানে ছিল তাও সেলিনা হোসেনের গ্রন্থ থেকে বোঝা যায় না। সেলিনা হোসেন পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তানের উপনিবেশ হিসাবে দেখে যে সরলভাবে জাতীয় স্বাধীনতার প্রশ্নকে সামনে এনেছেন তাতে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারীদের ভাবাবেগ সম্পর্কে একটি আঁচ পাওয়া যায় বটে কিন্তু সম্ভাব্য অন্যান্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ সম্পর্কে মোটেই ধারণা পাওয়া যায় না।

মেসবাহ কামাল প্রণীত 'আসাদ ও উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান' (১৯৮৬) আন্দোলনের আরো বড় প্রেক্ষাপট নিয়ে রচিত। মেসবাহ কামাল দেখান পাকিস্তান সৃষ্টির মধ্যেই এ ধরনের আন্দোলনের সম্ভাবনা লুকিয়েছিল। কেননা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কতকগুলি অযৌক্তিক ভিত্তির ওপর নির্ভর করে।[৩] মেসবাহ কামাল দেখিয়েছেন ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় তৎকালীন নেতৃত্ব তাদের শ্রেণীস্বার্থের কথা ভেবেই বিভিন্ন প্রদেশের সমস্যাগুলিকে এড়িয়ে যান এবং একমাত্র ধর্মকে জাতীয়তার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন। বিভিন্ন জাতির জাতিগত সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হয় সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীল সামন্তবাদের সংরক্ষক একটি সরকার। পাঞ্জাব ও সিন্ধু অঞ্চলের বড় পুঁজিপতি গোষ্ঠীর আশীর্বাদপুষ্ট এ সরকার পরবর্তীকালে নিজেদের জনগোষ্ঠীকে শোষণ করেই ক্ষান্ত হয়নি, তা প্রসারিত হয় পূর্ব বাংলা, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ওপরও।[৪] এরই প্রতিফলন হিসাবে পরবর্তী সময়ে সংবিধান, আইন পরিষদ ইত্যাদি নীতিনির্ধারক ক্ষেত্রে এসব প্রদেশসমূহ বিশেষতঃ পূর্ব বাংলার স্বার্থকে বিঘ্নিত করা হয়। আর এর বিরুদ্ধে গড়ে উঠতে তাকে আন্দোলন। এ আন্দোলনগুলিকে নস্যাৎ করার জন্য নানা ধরনের কালাকানুন জারি করা হয়। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও পূর্ব বাংলার ওপর নির্যাতন নেমে আসে। সব মিলিয়ে পূর্ব বাংলায় জনজীবন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, যার প্রথম বিস্ফোরণ ঘটে ১৯৫২ সালে। মেসবাহ কামাল দেখিয়েছেন, এভাবেই পূর্ব বাংলার জনগণ তাদের জাতীয় চেতনায় শাণিত হতে থাকেন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে তারা কেন্দ্রীয় শাসক দল মুসলিম লীগকে পূর্ব বাংলা থেকে একেবারে উৎখাত করে দেয়। তারপর শুরু হয় নতুন ধরনের চক্রান্ত। সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীল ধনি পুঁজিপতি ও বৃহৎ সামন্তশ্রেণীর প্রতিভূ সরকার বিভিন্ন অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড করেও যখন তাদের স্বার্থকে নিশ্চিত করতে পারছিল না তখন শাসক শ্রেণীসমূহের স্বার্থরক্ষার জন্য খোদ সামরিকবাহিনী এগিয়ে আসে।

---

[১] মাহ্‌ফুজ উল্লাহ (১৯৮৩): *অভ্যুত্থানের উনসত্তর* ঢাকা: ডানা প্রকাশনী, পৃঃ ৯।
[২] হোসেন, সেলিনা (১৯৮৬): *উনসত্তরের গণআন্দোলন* ঢাকা: বাংলা একাডেমী।
[৩] কামাল, মেসবাহ (১৯৮৬): *আসাদ ও উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান* ঢাকা: বিবর্তন, পৃ. ১৩।
[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

সামরিক শাসক আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসে সমস্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করে দেন এবং পূর্ব বাংলার ওপর আগের থেকে চলা শোষণ প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখেন।এভাবেই পাকিস্তানের দুইঅংশের মধ্যে ব্যাপকরকম অর্থনৈতিক বৈষম্য গড়ে ওঠে। ফলে একদিকে যেমন প্রদেশের সাধারণ মানুষের জন্যে জীবিকা নির্বাহ প্রতিদিন কঠিনতর হয়ে উঠছিল, অন্যদিকে বিকাশের আকাঙ্খায় উন্মুখ এ অঞ্চলের উঠতি পুঁজিপতি শ্রেণীর সামনে এ ব্যবস্থা অন্তরায় হিসাবে বিরাজ করছিল। মেসবাহ্ কামালের মতে এভাবেই উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট গড়ে ওঠে।

মেসবাহ্ কামাল অবশ্য এ প্রেক্ষাপট আলোচনার শেষে এসে উনসত্তরের আন্দোলনের শ্রেণী–বিন্যাসের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন। বিভিন্ন রাজনেতিক দলের মতামত ব্যক্ত করে তিনি সিদ্ধান্তে পৌছান গোটা পাকিস্তানের জনগণের ওপর তিন ধরনের শোষণ চেপে বসে। এগুলি হল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নয়া ঔপনিবেশিক শোষণ, দেশীয় পুঁজির শোষণ এবং সামন্ত অবশেষের শোষণ।[৫] এই তিন শোষণের যাতাকলে পড়ে পাকিস্তানের উভয় অংশের সাধারণ মানুষ অতীষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এর ওপর মূলতঃ পাঞ্জাব কেন্দ্রিক বুর্জোয়াদের স্বার্থকে নিরংকুশভাবে প্রতিষ্ঠিত করার স্বার্থে পাকিস্তানের পশ্চিমাংশে প্রবর্তন করা হয়েছিল এক ইউনিট ব্যবস্থা, যার বিরুদ্ধে পশ্চিমাংশের অপরাপর জাতিসত্তাসমূহের বিকাশে আগ্রহী মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। আর তারা, বর্ণ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মৌলিক প্রভেদ এবং সেই সাথে ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন পূর্ব বাংলার প্রতি পশ্চিমাংশের বৃহৎ পুঁজির ধারক সরকারের বিশেষ রকম নেতিবাচক ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে পূর্ব বাংলার বিকাশ–আকাঙ্খী মধ্যবিত্তের স্বাধিকারের আকাংখা ক্রমাগত সুতীব্র হয়ে উঠেছিল। মেসবাহ্ কামালের মতে এভাবেই গোটা পাকিস্তানব্যাপী উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের শ্রেণী বিন্যাসটি গড়ে ওঠে।

মেসবাহ্ কামাল ১৯৬৮ সালের ৭ই নবেম্বর থেকে শুরু করে ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ পর্যন্ত ঘটনাবলীকে চারটি ভাগ করে খুবই তথ্যভিত্তিক আলোচনা করেছেন, একে একে তথ্য পরিবেশন করে সত্য ঘটনাটি স্পষ্ট করে তুলেছেন। অবশ্য এ সময়ের যে বিবরণ কামাল দিয়েছেন তা উপরোক্ত দুইটি গ্রন্থ অপেক্ষা তেমন আলাদা নয়, তবে তার আলোচনা আরো হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে তার সংগৃহীত প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণগুলি থেকে। ঢাকা শহরের চাকরিজীবী, রিক্সাওয়ালা, দোকান কর্মচারী, শ্রমিকসহ বিভিন্ন স্তরের মানুষ যে কি উৎকট ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল সেদিন, তার বর্ণনা কামালের গ্রন্থের প্রতি ছত্রে ছত্রে ফুঠে উঠেছে। তবে কামাল উনসত্তর সম্পর্কে নতুন যে প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন তা হচ্ছে এ আন্দোলনে শ্রেণীসংগ্রামের উপাদান। এটা কামালের নতুন সংযোজন। কামাল মত প্রকাশ করেছেন–– "সরকারী নির্যাতন–বিরোধী একটি সাধারণ শহুরে লড়াই হিসাবে শুরু হলেও উনসত্তরের গণআন্দোলন প্রাথমিক চরিত্রে দীর্ঘদিন সীমাবদ্ধ থাকেনি। তা শহরের গন্ডি ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে গ্রামাঞ্চলে। পরবর্তীতে তা শহর ও গ্রামের সমন্বিত আন্দোলন আকারে শোষণের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করেছে।[৬]

কামাল উনসত্তরের গণআন্দোলনের শ্রেণীসংগ্রামের দিকটি আলোচনা করতে গিয়ে মোট ৫৮টি উদাহরণ দিয়েছেন। এ সমস্ত উদাহরণের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে তৎকালীন বাম রাজনৈতিক দলগুলির শ্রেণীসংগ্রাম গড়ে তোলার সক্রিয় তৎপরতার চিত্র। ফুটে উঠেছে গ্রামের খেটে–খাওয়া সাধারণ কৃষক সমাজ কিভাবে গ্রামের জোতদার ও চেয়ারম্যান–মেম্বরদের একাংশের মদতপুষ্ট ডাকাত ও গরুচোরের বিরুদ্ধে রক্তাক্ত সংগ্রাম গড়ে তুলেছিলেন তার চিত্র। বিভিন্ন শিল্প কারখানা, অফিস–আদালত, যানবাহন ইত্যাদির শ্রমিক কর্মচারিগণ আপোসহীন সংগ্রাম করে তাদের শ্রেণী ও পেশার দাবি আদায় করে নিয়েছিল, তারও অসংখ্য চিত্র কামাল তুলে ধরেছেন। এ সমস্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে কামাল যথেষ্ট যোগ্যতার সাথে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন যে, উনসত্তরের গণআন্দোলন ক্রমান্বয়ে সশস্ত্র শ্রেণী যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু বাম রাজনৈতিক দলগুলির অনৈক্য, নেতৃত্ব প্রদানে অযোগ্যতা এবং জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক ধারাসমূহের আপোসরফা, এই ত্রিবিধ কারণে তা স্বতঃস্ফূর্ত নৈরাজ্যের স্তরকে অতিক্রম করে গঠনমূলক দিকে অগ্রসর হতে পারেনি।

নিঃসন্দেহে কামালের কাজটি গবেষণাধর্মী এবং অত্যন্ত শ্রমসাধ্য। কিন্তু তিনি প্রেক্ষাপটের আলোচনায় যা বলেছেন, শেষ পর্যায়ে এসে তিনি তার বিপরীত সিদ্ধান্তে চলে গেছেন। প্রেক্ষাপটের প্রধান অংশ জুড়ে তিনি বিবরণ দিয়েছেন পূর্ব বাংলার ওপর কিভাবে অন্যায় রকমের শোষণ ও জুলুম করা হয়েছিল। আবার প্রেক্ষাপটের শেষে এর কোন তথ্য পরিবেশন না করেই তিনি গোটা পাকিস্তানের সাধারণ জনগণের পাঞ্জাব–কেন্দ্রিক ধনী বুর্জোয়া ও সামন্ত শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষক সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবার কথা বলেছেন। এক ইউনিট এর মাধ্যমে পাঞ্জাব–কেন্দ্রিক শাসকগোষ্ঠী কিভাবে অপরাপর জাতিসত্তার স্বার্থকে বিঘ্নিত করেছিল তারও কোন বিবরণ এখানে তিনি দেননি।

কামাল তার গ্রন্থের গোড়া থেকেই আলোচনা করেছেন পূর্ব বাংলার জনগণের ওপর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কি নিদারুণ শোষণ–নিপীড়ন চালিয়েছিল পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু এই ২২ বছরের জাতিগত নিপীড়নের পর তা কি কারণে উনসত্তরের গণআন্দোলন সংগঠিত হল গণতান্ত্রিক ও শ্রেণী দাবি নিয়ে, তারও কোন ব্যাখ্যা কামাল দেননি। আর এ ব্যাখ্যা না দিয়েই তিনি কি কারণে শ্রেণী রাজনীতির উপাদানকে এ গণঅভ্যুত্থানের মৌলিক দিক ছিল বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তাও বোধগম্য করে তোলেন নি।

কামাল উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে শ্রমিক কৃষকের ব্যাপক অংশগ্রহণের কথা বলেছেন এবং দেখিয়েছেন শ্রমিকদের আন্দোলনে অংশগ্রহণের মূল দিক ছিল শ্রেণী দাবি। অথচ কি কি শ্রেণী দাবি তাদেরকে এত জঙ্গী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেছিল তার কোন বিস্তারিত বিবরণ দেননি। অন্যদিকে, কৃষকদের আন্দোলন গ্রামের জোতদার, চোর–ডাকাতের মদদদার গ্রামীণ ধনী এবং ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যদের বিরুদ্ধে কি কারণে মারমুখী আকার ধারণ করল তারও কোন ব্যাখ্যা তিনি দেননি; তিনি বিশ্লেষণ করেননি এ মোড় পরিবর্তনের আর্থ–সামাজিক প্রেক্ষাপটকেও। সরকারী বা রাষ্ট্রীয় নীতির মাঝে এ ধরনের আন্দোলনের কোন কারণ নিহিত ছিল কিনা তারও কোন বিশ্লেষণ কামাল দাঁড় করাননি। ফলে কামালের সীমাহীন শ্রমসাধ্য এ কাজটি বিপুল তথ্যের সমাহার হিসাবেই থেকে গেছে। এসব তথ্যের উপর আরোপ করা তার সিদ্ধান্তসমূহ যৌক্তিক হয়ে ওঠেনি। বরং তার নিজের সংগৃহীত তথ্যসমূহ তার তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটকে সংশয়াপন্ন করে তুলেছে। সিদ্ধান্তগুলির মাঝেও ফুটে উঠেছে অসংখ্য আত্মবিরোধ।

কমিউনিস্ট নেতা মোহাম্মদ ফরহাদের 'উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, (১৯৮৯) নামে সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থখানি একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। '৬৯–এর পর এ আন্দোলনকে তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির (মনিসিংহ) পক্ষে সামগ্রিকভাবে মূল্যায়ণের দায়িত্ব পেয়ে মোহাম্মদ

---

[৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

[৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

Dhaka University Institutional Repository

ফরহাদ যে রিপোর্ট তৈরি করেছিলেন সেটাই এ গ্রন্থের মূল অংশ। সে সময় মোহাম্মদ ফরহাদ ছিলেন গোপন কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে ছাত্র সংগঠন পরিচালনার দায়িত্বে। আর সে সময় এ আন্দোলনে ছাত্রদের ছিল অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা। ফলে আন্দোলনকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে দেখা এবং পরিচালনার সৌভাগ্য তার হয়েছিল। আর এ কারণেই এ আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়, প্রতিটি খুঁটিনাটি ঘটনাকেও তিনি দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সাথে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এ আন্দোলনের প্রতিটি ঘটনা, তাতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভূমিকা, বিশেষতঃ ন্যাপ (মোজাফফর), ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) এবং কমিউনিস্ট পার্টির (মনি সিংহ) ভূমিকা, জনসাধারণের মনোভাব ও অংশগ্রহণ ইত্যাদিকে নিপুণভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি এ আন্দোলনের মূল্যায়ন করতে গিয়ে প্রথমে তার পটভূমি ব্যাখ্যা করেন। এর পর তিনি দেখান কিভাবে সর্বপ্রথম একটি আন্দোলন গোটা পাকিস্তানব্যাপী বিস্তৃত হয়ে পড়ল এবং উভয় অংশে গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হল। যখন পূর্ববঙ্গে এ অভ্যুত্থান সর্বব্যাপী রূপ ধারণ করল তখন স্বৈরাচারী রাষ্ট্রযন্ত্রের গণনির্যাতনের সমস্ত বৈধ উপাদানগুলি কিভাবে একে একে ভেঙ্গে পড়ল তার নিখুঁত চিত্র এঁকেছেন ফরহাদ।

মোহাম্মাদ ফরহাদ তার পটভূমির আলোচনায় বলেন, "প্রকৃতপক্ষে কেবল আইয়ুব শাহীর ১০ বছরের স্বৈরাচারী শাসনই নয়, বরং পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভবের পর থেকেই দীর্ঘ ২২ বছরব্যাপী মূলতঃ একই শাসক শ্রেণীর শোষণ, শাসন, নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়ে জনগণের জীবনের সংকটসমূহ আইয়ুব শাসনামলে যে তীব্রতা লাভ করে, গণঅভ্যুত্থানের সেটাই ছিল পটভূমি। রাজনৈতিকভাবে গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের অধিকার অস্বীকার এবং অর্থনৈতিকভাবে নিরংকুশ ধনবাদী পথ অনুসরণ ও সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীলতা সামন্তবাদী শোষণের জের টিকিয়ে রাখা, একচেটিয়া পুঁজির উদ্ভব, শ্রমিক–কৃষক শহরের গরীব, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী, প্রভৃতি সর্বশ্রেণীর জনগণের দৈনন্দিন জীবনে সংকট বৃদ্ধি প্রভৃতি মানুষের অন্তরে যে বারুদ পুঞ্জীভূত করেছিল, তা–ই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ফেটে পড়ে"।[৭]

ফরহাদের মতে এ আন্দোলন গোটা পাকিস্তানব্যাপী বিস্তৃতি পেলেও দেশের দুইঅংশে এর প্রকৃতি ছিল ভিন্ন। পশ্চিম পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রকৃতি তুলনামূলকভাবে দুর্বল ছিল। আর সে কারণে সেখানে জনজীবনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাসমূহ সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর আকারে সামনে আসতে পারেনি। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র সমাজের ১১ দফা কর্মসূচীর মাধ্যমে যে অভিব্যক্তি ঘটে, তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির মালিকদের স্বার্থরক্ষাকারী শাসকগোষ্ঠীর অনুসৃত নীতিসমূহের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবেই বিকাশ লাভ করে গণঅভ্যুত্থান।[৮]

ফরহাদ মত প্রকাশ করেন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পাকিস্তানের শাসক–শোষকদের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রাম অব্যাহত ছিল। অনেক গৌরবোজ্জ্বল আন্দোলন তারা করেছে। কিন্তু মহান ভাষা আন্দোলন ছাড়া আর কোন আন্দোলনের বিজয়কেই তারা ধরে রাখতে পারেনি। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগকে ব্যাপকভাবে পরাজিত করেও তারা শাসক গোষ্ঠীকে শাসন ক্ষমতা থেকে সরাতে পারেনি। বরং বিপরীতে, শাসকগোষ্ঠী আরও নিরংকুশ শোষণ, জাতিগত নিপীড়ন, একচেটিয়া ধনবাদী পথ অনুসরণ ও স্বৈরাচারী শাসনের পথকেই পাকাপোক্ত করে। কিন্তু উনসত্তরে এসে জনগণের অভ্যুত্থান 'লৌহমানব' ডিক্টেটর আইয়ুবকে উৎখাত করে। উনসত্তরে স্বৈরাচারকে উৎখাত করতে পারার পেছনে সুনির্দিষ্ট কতকগুলি কারণ ছিল বলে ফরহাদ মত প্রকাশ করেন। ফরহাদের মতে, এর আগে আর কখনও গোটা পাকিস্তানের জনসাধারণ একযোগে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জেগে ওঠেনি। দ্বিতীয়তঃ এর আগে আর কখনও শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিরোধ এতো তীব্রতর হয়নি; তৃতীয়তঃ শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, ছাত্র, বুদ্ধিজীবীসহ বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশাজীবীর কাছ থেকে এত তীব্রভাবে আর কখনই পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বিচ্ছিন্ন হয়নি; এবং চতুর্থতঃ এর আগে আর কখনও জনসাধারণের ক্ষিপ্ত মনোভাব দেখে শাসকগোষ্ঠীর বিভিন্ন অংশ তাদের শ্রেণীগত নিরাপত্তার প্রশ্নে আতংকিত হয়ে ওঠেনি।[৯]

ফরহাদ মত প্রকাশ করেন এত চমৎকার বিপ্লবী পরিস্থিতি থাকা সত্ত্বেও উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান যৌক্তিক পরিণতির দিকে যেতে পারেনি। এর কারণ হিসাবে কতকগুলি প্রশ্ন এক সাথে কাজ করেছিল বলে ফরহাদ মত প্রকাশ করেন। তার মধ্যে অন্যতম কয়েকটি হচ্ছেঃ (১) আওয়ামী লীগের মধ্যে প্রচন্ড ভীতি কাজ করছিল; বিশেষতঃ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তির প্রশ্নটি জনসাধারণের কাছে সাংঘাতিক জনপ্রিয় দাবি হওয়া সত্ত্বেও প্রশ্নটি রাজনৈতিক দাবি হিসাবে উথাপন করতে তারা অস্বীকার করছিল। অন্যদিকে, কোনভাবেই যাতে দক্ষিণপন্থী দলগুলি থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে সেই নীতি গ্রহণ করে। আন্দোলনের সমস্ত পর্যায়েই আওয়ামী লীগ আন্দোলনকে দর কষাকষির হাতিয়ার হিসাবে দেখেছে। (২) কমিউনিস্ট পার্টি (মনিসিংহ) যথাসময়ে বিপ্লবী পরিস্থিতিকে উপলব্ধি করতে পারেনি, তাই গণঅভ্যুত্থানের পর্যায়ে কর্মী ও জনগণকে কোন দিক দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে তার কোনই দিক – নির্দেশনা দিতে পারেনি। আর এ একই কারণে কারফিউ বা আরও কঠিন কোন সময়ে সংগ্রাম কি পদ্ধতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে তার কোনই পূর্ব প্রস্তুতি ছিল না। (৩) মওলানা ভাসানীর অপ্রয়োজনীয় হটকারিতা এবং আন্দোলনের পরিস্থিতি, নেতৃত্বের চরিত্র ইত্যাদি না বুঝে জ্বালাও পোড়াও নীতি ও ঐক্যবিরোধী অবস্থান। প্রধানতঃ এই তিনটি কারণে এ আন্দোলনকে যৌক্তিক পরিণতিতে নিয়ে যাওয়া যায়নি।। ফরহাদ মত প্রকাশ করেন এ আন্দোলন শ্রমিক, কৃষক ও বিভিন্ন শ্রমজীবী মানুষের ভিতর আন্দোলনের তীব্রতা এমন এক পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত প্রবণতাই তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছিল। বিভিন্ন বুর্জোয়া প্রচার মাধ্যমগুলি আসন্ন সশস্ত্র সংগ্রামের আশঙ্কায় ভীতি প্রকাশ করছিল, বার বার আহবান জানানো হচ্ছিল আন্দোলন যেনো এমন কোন পথে না আগায়। এমন একটা অবস্থা বিরাজ করছিল যে, জনগণকে কারফিউ ভাঙ্গার আহবান জানালে নিশ্চিতই জনগণ কারফিউ ভাঙ্গাতে এগিয়ে আসতো। কিন্তু নেতৃত্বের প্রকৃতি, জনগণের মনোভাব, সংগঠনের সাংগঠনিক প্রস্তুতি ইত্যাদির বিবেচনায় সে ধরনের ডাক দেওয়া হত আত্মঘাতী।[১০]

এভাবে বিস্তারিত বিশ্লেষণের পর ফরহাদ মন্তব্য করেন "এই অভ্যুত্থান গ্রামাঞ্চলে, বিশেষতঃ পূর্ব বাংলার কৃষক সমাজকে আন্দোলনে টেনে আনে, টেনে এনেছে মহিলা সমাজকে, সাড়া দিয়েছে শহরের গরীব মেহনতী মানুষ, যা এর আগে আর কোন গণআন্দোলনেই এত ব্যাপকভাবে ঘটেনি।[১১]

[৭] ফরহাদ, মোহাম্মদ (১৯৮৯)ঃ উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, ঢাকাঃ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, পৃ.৮।
[৮] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮।
[৯] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯–১০।
[১০] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭–৫৫।
[১১] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৭।

Dhaka University Institutional Repository

ফরহাদ মত প্রকাশ করেছেন ছাত্রদের ১১ দফা ছিল একটি বামপন্থী কর্মসূচী এবং এবারই প্রথম পূর্ব বাংলার সমগ্র মানুষ এই বামপন্থী কর্মসূচীকে আদায় করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে।[১২]

কিন্তু ফরহাদ বলেননি কি ধরনের শোষণ-নিপীড়নের কারণে এই বামপন্থী কর্মসূচীর প্রতি সমগ্র জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়। বরং তিনি বলেছেন ১১ দফার প্রধান দিকই ছিল আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও গণতান্ত্রিক দাবি।[১৩] এখানে তার বক্তব্যে একটি আত্মবিরোধ জন্ম নিয়েছে।

ফরহাদ বলেছেন, ঊনসত্তরের জানুয়ারির পর থেকে শ্রমিক কর্মচারীদের আন্দোলন ব্যাপকতম ঘেরাও আন্দোলনে রূপ লাভ করে এবং রাজনৈতিক দাবিগুলিকে তুলে গিয়ে শুধু অর্থনীতিবাদী আন্দোলনে পর্যবসিত হয়।[১৪] আবার তিনি বলেছেন ১১ দফার ভিতর শ্রমিকশ্রেণী তাদের মুক্তির পথ খুঁজে পায়। শ্রমিকদের মধ্যে গণজাগরণের জোয়ার শুরু হয়। তিনি আরোও অভিমত প্রকাশ করেন ২৪শে জানুয়ারি গণঅভ্যুত্থানের দিনে যে লক্ষ মানুষ স্বতস্ফুর্তভাবে মিছিলে বের হয় তাদের মধ্যে শহরের গরীব বস্তিবাসী, ছোট-খাট সর্বপ্রকার কারখানার মানুষেরাই ছিল বেশী। আর আদমজী, পোস্তাখোলা, তেজগাঁও, ডেমরাসহ বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকগণ এসে সেদিন সমস্ত পল্টন ময়দানকে ভাসিয়ে দিয়েছিল,[১৫] কোন অনুপ্রেরণা থেকে তারা এসেছিল? কোন্ ধরনের আশা আকাঙ্খা তাদেরকে এই বৈপ্লবিক আন্দোলনে শামিল করেছিল? এছাড়াও ফরহাদের গ্রন্থে তার উত্থাপিত অনেক বিষয়ই বেশ অস্পষ্ট রয়ে গেছে। তার সমগ্র গ্রন্থে যেখানে শ্রেণী দাবি ও গণতান্ত্রিক দাবিতে সারা পাকিস্তানব্যাপী আন্দোলনের জোয়ার আসলো, সেখানে কিভাবে জাতীয়তাবাদী ধারণাটিই প্রধান ধারা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হল এবং যে আওয়ামী লীগের মধ্যে আগাগোড়াই ছিল আপোসকামী একটি প্রবণতা সেই আওয়ামী লীগ এবং তার নেতা শেখ মুজিব যথাক্রমে সর্বজনমান্য সংগঠন ও নেতায় পরিণত হল কি কারণে, তার কোন ব্যাখ্যা ফরহাদ দেননি। সর্বোপরি, এ গ্রন্থ কোন গবেষণার ফসল নয় যা তিনি নিজেও দাবি করেননি। ফলে তার প্রতিটি মূল্যায়নই প্রমাণ সাপেক্ষ।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায়, আলোচিত লেখকদের প্রত্যেকেই মত প্রকাশ করেছেন ঊনসত্তরের আন্দোলন ছিল গোটা পাকিস্তানব্যাপী একটি ব্যাপক গণআন্দোলন। তবে পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণ এ আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল স্বৈরাচারী আইয়ুবের একনায়কত্বের অবসান, গণতন্ত্র ও এক ইউনিট প্রথা বাতিলের দাবিতে। কিন্তু পূর্ব বাংলার মানুষ অভ্যুত্থান করেছিল উপরোক্ত দাবি ছাড়াও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে। একমাত্র সেলিনা হোসেন ছাড়া বাকী তিনজন লেখক মত প্রকাশ করেছেন পূর্ব বাংলার গণমানুষের কাছে এ আন্দোলন শুধু গণতন্ত্র ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা, বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিবাদ ও সামন্ত অবশেষের অবসান ঘটানোর তীব্র আকাঙ্খাও এ আন্দোলনকে এত ব্যাপক রূপ দিতে বিশেষভাবে ভূমিকা পালন করেছিল। মেজবাহ কামাল তা এ উপাদানগুলিকেই ঊনসত্তরের আন্দোলনের মৌলিক দিক হিসাবে মত প্রকাশ করেছেন। ফরহাদ, কামাল এবং মাহফুজ উল্লাহ এ তিনজন লেখকই মত প্রকাশ করেছেন শহরের খেটে-খাওয়া গরিব মানুষ আর বিভিন্ন কারখানার হাজার হাজার শ্রমিক এ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার ফলেই তো অভ্যুত্থানে পরিণত হয়। এরা সবাই বলেছেন পূর্ব বাংলার জনগণের কাছে প্রাণপ্রিয় দাবি হয়ে উঠেছিল ছাত্র সমাজের ১১ দফা। আর এ ১১ দফা ছিল একটি অত্যন্ত উন্নত ধরনের জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মর্মবস্তু সম্পন্ন একটি প্রগতিশীল কর্মসূচী। এ কর্মসূচীতে যেমন স্থান পেয়েছিল একচেটিয়া পুঁজিবাদের শোষণের হাত থেকে পূর্ব বাংলাকে রক্ষা তথা পূর্ব বাংলার জনগণের পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি, তেমনই শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্তসহ সমস্ত নিপীড়িত-নির্যাতিত শ্রেণীসমূহের অস্তিত্ব রক্ষার দাবি। আর এ কারণেই ১১ দফা এত ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল বলে তাঁরা মত প্রকাশ করেন।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কতকগুলি অনিবার্য প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। এ প্রশ্নগুলি নিম্নরূপঃ

১) পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার গোড়া থেকেই আঞ্চলিক বৈষম্য নীতি অনুসরণ করা হচ্ছিল। কিন্তু কোন্ সামাজিক শক্তির কারণে পাকিস্তানের তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী তা অব্যাহত রাখতে পারছিল, এ সমস্ত লেখাতে তা ফুটে ওঠেনি। এ বিষয়টি পরিষ্কার না থাকার কারণেই স্পষ্ট হয়নি, কেন সদ্য স্বাধীন একটি রাষ্ট্রের জনগণের ওপর শুরু থেকেই স্বেচ্ছাচারী শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল? কি কারণেই বা কোন সাংবিধানিক সংকট দেখা না দেওয়া সত্ত্বেও বগুড়ার মোহাম্মদ আলী, গোলাম মোহাম্মদ, চৌধুরী গোলাম মোহাম্মদ এবং ইস্কান্দার মীর্জার মত সামরিক-বেসামরিক আমলা ব্যক্তিগণ হঠাৎ হঠাৎ একেকটি শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক পদ দখল করতে সক্ষম হয়েছিল? এ সকল আমলা ব্যক্তির রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস ছিল কোথায়? কোন্ শক্তির বলে এরা সমস্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে ক্ষমতার শীর্ষ বিন্দু থেকে অপসারণ করতে সক্ষম হল?

২) পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার গোড়া থেকে যেমন বৈষম্যনীতি অনুসরণ করা হয়েছিল, তেমনই পাকিস্তান জন্মের শুরু থেকেই পূর্ব বাংলার জনসাধারণের আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। আর যেখানে 'সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীল ধনি পুঁজিপতি শ্রেণী ও বৃহৎ সামন্তশ্রেণীর প্রতিভূ' একটি সরকার পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং কৃষক, শ্রমিক ও অপরাপর মেহনতী মানুষের ওপর উক্ত নির্ভরশীল পুঁজিপতি শ্রেণী ও সামন্তশ্রেণী নির্বিঘ্নে শাসন-শোষণ চালিয়ে আসছিল সেখানে কি এমন প্রয়োজন পড়লো দেশে সামরিক শাসন জারি করার? এমন কোন রাজনৈতিক শক্তিরও তখন উত্থান ঘটেনি যার ফলে সাধারণ নির্বাচনে জয়যুক্ত হয়ে তারা নির্ভরশীল পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে একই সাথে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। আর উক্ত শাসক-শোষক শ্রেণীসমূহের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষাই যদি সামরিক শাসন আসার মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে তাহলে ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের আগে এমনকি কি ঘটেছিল কিংবা পরবর্তীকালে এমনকি ঘটার সম্ভাবনা ছিল যা' সাংবিধানিক সরকার টিকিয়ে রেখে উক্ত শ্রেণীসমূহের স্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব ছিল না? অন্যদিকে, তদানীন্তন সরকার যদি একই সাথে নির্ভরশীল পুঁজিপতি ও সামন্তশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে চলে তাহলে কি এমন ঘটনা ঘটেছিল যার ফলে অতো ঘন ঘন সরকারের তথা মন্ত্রী পরিষদের পরিবর্তন ঘটাতে হয়েছিল? কি কারণেই বা জাতীয় পরিষদকে পাশ কাটিয়ে তৎকালীন পাকিস্তানের গর্বণর জেনারেল বা প্রেসিডেন্ট ঘন ঘন অধ্যাদেশ জারি করে চলেছিল? কি এমন বিরোধ ছিল সেদিনের গর্বণর জেনারেল বা প্রেসিডেন্টের সাথে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত জাতীয় পরিষদের?

---

[১২] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৭।
[১৩] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৯।
[১৪] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৫।
[১৫] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫-৪৬

Dhaka University Institutional Repository

৩) জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালে সামরিক শক্তির বলে পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নিয়ে টানা দশ বছরের অধিক কাল ক্ষমতাসীন ছিলেন। তাঁর শাসনের প্রথম সাড়ে তিন বছর পাকিস্তানের জনসাধারণের ওপর এমন কঠিন এক সামরিক শাসন চাপিয়ে দেওয়া হয় যে, ন্যূনতম কোন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচলনা করাও সম্ভব হয় না। যে সরকারের আমলে এধরনের একটি কঠিন শাসন বলবত ছিল সে সরকারের আবার শ্রেণীভিত্তি ছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ-নির্ভর পুঁজিপতি গোষ্ঠী ও বৃহৎ সামন্তশ্রেণী বলে মেসবাহ কামাল উল্লেখ করেছেন। আবার এ শ্রেণী ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে যে সরকার সমগ্র জনতার ওপর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিল, সেই সরকার 'পাঞ্জাব-কেন্দ্রিক বুর্জোয়াদের স্বার্থকে নিরংকুশভাবে প্রতিষ্ঠিত করার স্বার্থে পাকিস্তানের পশ্চিমাংশে এক ইউনিট ব্যবস্থা' কিভাবে প্রবর্তন করা সম্ভব হয়েছিল তা একটি অত্যন্ত জরুরী প্রশ্ন। কেননা এক ইউনিট প্রথা প্রবর্তনের অর্থই হচ্ছে বৃহৎ সামন্তদের আঞ্চলিক আধিপত্যকে খর্ব করা। অন্যদিকে, পশ্চিম পাকিস্তানের সকল প্রদেশ ও অঞ্চলসমূহকে নিয়ে এক ইউনিট প্রবর্তন করার লক্ষ্য যদি হয় একটি শক্তিশালী কেন্দ্র গঠন করে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর আঞ্চলিক আধিপত্য ও শোষণ-নিপীড়নকে অব্যাহত রাখা, তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহৎ সামন্তশ্রেণীর তাতে কি ধরনের লাভের সম্ভাবনা ছিল যার ফলে সরকারের এ এক ইউনিট প্রবর্তনের ব্যবস্থাকে তারা সমর্থন করেছিল? আর আইয়ুব সরকারের অন্যতম শ্রেণীভিত্তি যদি বৃহৎ সমান্তশ্রেণীই হয় তাহলে সেই সামন্তশ্রেণীর প্রতিনিধি রাজনৈতিক দলগুলি কিভাবে আইয়ুববিরোধী ঐক্য মোর্চাতে প্রথম থেকেই অংশগ্রহণ করতে থাকে?

৪) পূর্ব বাংলার জনসাধারণ যখন গণঅভ্যুত্থানে শামিল হয় তখন আর্থিক দিক দিয়ে পূর্ব বাংলার অবস্থা বেশ বিকাশশীল হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে, আওয়ামী লীগ তখন নানা কারণে আতঙ্কিত ও অসংগঠিত। বামপন্থী দলগুলির মস্কোপন্থী অংশ ঐক্যবদ্ধ থাকলেও পিকিংপন্থী অংশটি বিভিন্ন ধরনের তাত্ত্বিক বিতর্কে নিমজ্জিত এবং বহুধা-বিভক্ত। এদের বড় একটা অংশ শহরের সংগ্রামকে বাদ রেখে গ্রামাঞ্চলের কাজকে প্রধান ক্ষেত্র হিসাবে গ্রহণ করে এবং প্রকাশ্য সংগঠনগুলি ছেড়ে দিয়ে গোপন ধারায় কাজ করতে শুরু করে। অথচ ঠিক এ পর্যায়েই কি করে এতবড় একটি অভ্যুত্থান ঘটে যেতে পারলো? তাহলে জনসাধারণের অভ্যুত্থান কি রাজনৈতিক দলসমূহের ঐক্য বা অনৈক্যের ওপর নির্ভর করে না? কিসের ওপর তাহলে তা নির্ভর করে?

৫) উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের নেতা ছিল ছাত্রসমাজ আর সে অভ্যুত্থানের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে ছাত্রসমাজের ১১ দফা। কিন্তু এ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান একক ব্যক্তিত্ব হিসাবে বের হয়ে আসেন আর পূর্ব পাকিস্তানের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের দাবি আর সমস্ত দাবিকে পিছে ফেলে সামনে চলে আসে। অন্যদিকে, গ্রামের কৃষক-জনতা মৌলিক গণতন্ত্রী, থানা-পুলিস, তহসিল অফিস ও গ্রামাঞ্চলের সামাজিক অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রচন্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। শহরের শ্রমিজীবী মানুষও তাদের শ্রেণী ও পেশাগত দাবিতে এ সময় লাগাতার বিক্ষোভ প্রকাশ করে চলেছিল। এ সকল বিষয়ের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক কি ছিল তা নির্ধারণ না করে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের তাৎপর্য উপলব্ধি করার যে চেষ্টা ওপরে আলোচিত গ্রন্থসমূহে করা হয়েছে তাকে কি বাস্তব সমত বলে গ্রহণ করা যেতে পারে? তাহলে কি উপায়ে অভ্যুত্থানের এ চর্তুমুখী দিকগুলিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে?

৬) পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের আঞ্চলিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা আর আইয়ুব সরকারে স্বৈরশাসন--এ দু'টি উপাদানই পূর্ব পাকিস্তানে গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টির জন্য মূল ভূমিকা পালন করেছিল বলে উপরোক্ত গ্রন্থসমূহে অভিমত প্রকাশিত হয়েছে। তাহলে গ্রাম ও শহরের শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামী ভূমিকাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? কিভাবেই বা ব্যাখ্যা করা যায় সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী সামাজিক অপরাধী-বিরোধী কৃষক-জনতার সংগ্রামকে?

উপরোক্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর পেতে হলে প্রথমেই জেনে নেওয়া প্রয়োজন আন্দোলন বা অভ্যুত্থান বলতে কি বোঝায়? কেননা, এ বিষয়টি জানার ওপরই নির্ভর করছে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মত একটি রাজনৈতিক ঘটনাকে বিশ্লেষনের জন্য কি কি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা প্রয়োজন।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান অনুষ্ঠিত হয়েছিল আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে। একটি সরকারের বিরুদ্ধে যে কোন আন্দোলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পিছনে স্বাভাবিকভাবেই কিছু সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কারণ থাকে। আর এ কারণসমূহ কোন-না-কোনভাবে পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আর সম্পর্কের এ প্রকৃতি কিরূপ হবে তা নির্ভর করে উক্ত বিষয়সমূহের বিকাশের ঐতিহাসিক আন্তঃসম্পর্কের ওপর। তাই, আইয়ুব সরকার পাকিস্তানের জনসাধারণের ওপর যে শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছিল তা শুধু তার ব্যক্তিগত বা তার সরকারের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করেনি, যে রাষ্ট্র-ব্যবস্থাটি দিয়ে তৎকালীন সরকার একটি নির্দিষ্ট ধরনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল তারও একটি ভূমিকা ছিল। ফলে পাকিস্তান রাষ্ট্র কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিভাবে তার বিকাশ ঘটেছিল সে সকল ইতিহাস না জানলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা কঠিন। আর রাষ্ট্রের চরিত্র সম্পর্কে জানতে গেলেই সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করার প্রয়োজন পড়ে রাষ্ট্র বলতে কি বোঝায়, বা কি কি উপাদান নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত হয় সে সম্পর্কিত একটি বিস্তারিত তত্ত্বগত আলোচনা। আর রাষ্ট্র সম্পর্কিত তত্ত্বগত আলোচনা করতে গেলেই এ বিষয়ক চিরায়ত ধারণার কাছে যেতে হয়। কেননা, রাষ্ট্র এমন একটি ব্যাপক বিষয় যে, তার মূলে না গেলে পাকিস্তানের মত একটি রাষ্ট্রের মূল উপাদানসমূহকে চিহ্নিত করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। কারণ রাষ্ট্র সম্পর্কে আধুনিক ধারণাগুলি এত বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত যে, মূল থেকে শুরু না করলে ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যের রাষ্ট্র কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমাজ জীবনে রাষ্ট্রের ভূমিকাগুলিই বা কেন পরিবর্তিত হয়ে যায়, তা বোঝা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

রাষ্ট্র সম্পর্কিত তত্ত্বগত আলোচনায় দেখা যাবে, উপনিবেশত্তর রাষ্ট্র অধিকাংশ সময় সমাজের শ্রেণীসমূহের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, এমনকি কখনও কখনও এসকল রাষ্ট্র এতটাই স্বাধীনতা অর্জন করে যে, সে তার নিজের সামাজিক ভিত্তি তৈরি করার লক্ষ্যে নতুন নতুন শ্রেণীরও জন্ম দেয়। এ সকল শ্রেণীরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সহায়তায় গড়ে উঠলেও তা সব সময়ই রাষ্ট্রের অধীনতাকে মেনে নেবে, বা কোন কোন ক্ষেত্রে নিজের শ্রেণীস্বার্থকে বড় করে দেখবে অথবা এ সকল শ্রেণীরস্বার্থ ও রাষ্ট্রের স্বার্থ সব সময় সমার্থক থাকে কিনা তা নির্ভর করে মূলতঃ উক্ত শ্রেণীসমূহের বিকাশ পর্বে রাষ্ট্রের সহায়তার বাইরে অন্যান্য কারণের (factor) প্রভাবের ওপর। ফলে যে কোন উপনিবেশত্তর সমাজে রাষ্ট্র ও তার ওপর নির্ভরশীল শ্রেণীসমূহ কতটা সঙ্গতিশীল আচরণ করবে তা নির্ভর করবে এসবের বিকাশের পটভূমি ও স্বার্থের প্রকৃতির ওপর। অন্যদিকে, উক্ত শ্রেণীসমূহের বাইরে যে কোন উপনিবেশোত্তর দেশে আরো নানা ধরনের শ্রেণী থাকে। এ সকল শ্রেণীর সাথে রাষ্ট্র কিংবা রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল শ্রেণীসমূহ বা রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত শ্রেণীসমূহের নানাবিধ বিরোধ থাকতে পারে। আবার এসকল শ্রেণীর সাথে বিভিন্ন জাতি বা জাতিসত্তার বিরোধ থাকতে পারে। এ সকল শ্রেণীগত বা জাতিগত বিরোধের ফলাফল হিসাবেই যে কোন সমাজে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ফলে, উনসত্তরের মত একটি সর্বব্যাপী গণঅভ্যুত্থানের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

Dhaka University Institutional Repository

করতে হলে পাকিস্তানের রাষ্ট্র, তার ওপর নির্ভরশীল শ্রেণীসমূহ, অন্যান্য শ্রেণী ও বিভিন্ন জাতি বা জাতিসত্তার ঐতিহাসিক বিকাশের পর্যালোচনা পূর্ণাঙ্গভাবে করা প্রয়োজন। আর এ পর্যালোচনার পরই ফুটে উঠবে বিভিন্ন শ্রেণী, গোষ্ঠী, জাতি বা জাতিসত্তার আশা-আকাংখ্যা এবং পরস্পরের মধ্যে বিরোধের সুস্পষ্ট রূপ। এ পটভূমির আলোচনা শেষ করার পরই পরিষ্কার হয়ে উঠবে রাষ্ট্র এবং বিভিন্ন শ্রেণী ও জাতির মুখপাত্র রাজনৈতিক দলসমূহ এবং অন্যান্য শ্রেণী-পেশার সংগঠনসমূহের আচরণের যৌক্তিকতা। রাষ্ট্র, সরকার, জাতি বা বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ যুক্তির ওপর দাঁড়িয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। নিজের যুক্তির ওপর দাঁড়িয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেও সমাজের প্রভূত্বকারী শ্রেণী বা তার প্রতিনিধি রাষ্ট্র অথবা সরকারের আচরন যখন ব্যাপক সাধারণ মানুষের কাছে বা একটি জাতির অর্ন্তগত প্রায় সকল মানুষের কাছে অগ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে তখনই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। আর এক পক্ষের প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা অন্য পক্ষের প্রতিক্রিয়াকেও প্রভাবিত করে। এভাবেই গড়ে ওঠে গণঅভ্যুত্থানের ভিত। উনসত্তরে গণঅভ্যুত্থানের ঘটনাও এ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

বর্তমান গবেষণাকর্মটি মোট ৯টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে থাকবে ভূমিকা যাতে অন্তর্ভুক্ত হবে প্রধানতঃ প্রকাশনা পর্যালোচনা ও গবেষণাশূন্যতা নির্ণয় করা। বর্তমান অধ্যায়ে ইতিমধ্যেই তা আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে থাকবে তত্ত্বগত আলোচনা। এখানে আন্দোলন, জাতি, জাতীয়তাবাদ, শ্রেণী, রাষ্ট্র ও উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্র সম্পর্কে বিস্তারিত তাত্ত্বিক পর্যালোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। এ দুটি অধ্যায়ে কোন কোন প্রত্যয়কে সুনির্দিষ্ট করতে প্রয়োজনে বেশ কিছু জায়গাতে ঐতিহাসিক বিতর্কসমূহকেও অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের উৎপাদন পদ্ধতির ওপর। এ আলোচনার মধ্য দিয়ে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে ষাট দশকের শেষ পর্যায়ে এসে পশ্চিম পাকিস্তানের সামন্ততান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থা ভেঙ্গে যায় এবং সেখানে গড়ে ওঠে একটি ধনতান্ত্রিক খামার মালিক শ্রেণী। ফলে গ্রামীণ ক্ষমতা-কাঠামোতেও সামন্তঅভিজাত ও তাদের আশীর্বাদপুষ্ট গোষ্ঠীর স্থান ধনি খামার মালিকগণ দখল করে নেয়। অন্যদিকে, একটি শক্তিশালী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর জন্ম হয়, এ শ্রেণী শুধু পশ্চিম পাকিস্তানে নয় পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিকেও নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যদিকে, ষাট দশকের শেষ পর্যায়ে এসে পশ্চিম পাকিস্তানে এরা শিল্প উৎপাদনে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার শুরু করে, ফলে নতুন কিছু সাদা কলার বিশিষ্ট শ্রমিকের জন্য কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হলেও হাজার হাজার সাধারণ শ্রমিক বেকারত্ব বরণ করে। আর এ গ্রামের পুঁজিপতি খামার মালিক ও শহরের বৃহৎ শিল্পপতি-ব্যবসায়ী শ্রেণীটি বিকশিত হয় পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সহায়তায়। ফলে এ দুটি শ্রেণী পাকিস্তান রাষ্ট্রের শ্রেণীভিত্তি হিসাবে কাজ করে।

পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের উৎপাদন পদ্ধতির ওপর। এ আলোচনায় দেখানো হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের পশ্চাদপদ কৃষি পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক বৃহৎ শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের বিকাশের পশ্চাদভূমি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানেও ব্যাপক শিল্প বিকাশ হয়েছে কিন্তু তা প্রধানতঃ পশ্চিম পাকিস্তান-কেন্দ্রিক অবাঙ্গালী শিল্পপতিদের মালিকানায় ও নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে। পূর্ব পাকিস্তানে এদের শোষণের রূপ ছিল ঔপনিবেশিক চরিত্রের। পূর্ব পাকিস্তানের ওপর যাদের শোষণের চুয়িয়েপড়া অংশগ্রহণ করে কিছু পরজীবী বাঙ্গালী ধনিপরিবারের জন্ম হয়েছে। শেষ পর্যায়ে চুয়িয়ে পড়া অর্থের পরোক্ষ ফলাফল আকারে বাঙ্গালী ক্ষুদে শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর হাতে বেশ ভালো রকমের অর্থ সঞ্চিত হয়। কিন্তু সে সঞ্চিত অর্থ নিয়ে যখনই তারা শিল্প কিংবা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করতে যায় তখনই অবাঙ্গালী পুঁজির কাছ থেকে অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়। এভাবেই বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের শ্রেণীগত ভিত্তিটি গড়ে ওঠে। অপর দিকে, রাষ্ট্রের সামাজিক ভিত্তি তৈরির লক্ষ্যে কৃষি জমির সিলিং ১০০ বিঘার স্থলে ১২৫ একরে রূপান্তরিত করার ফলে গ্রামাঞ্চলে জোতদারী শোষণ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। এরই অংশ হিসাবে মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন করে গ্রামাঞ্চলে আরও একটি সামাজিক শক্তির পত্তন ঘটানো হয়, যাদের ওপর ওয়ার্কস কর্মসূচী বাস্তবায়নের দায়িত্ব দিয়ে বিপুল নগদ অর্থ অর্জনের সুযোগ করে দেওয়া হয়। এই মৌলিক গণতন্ত্রীরা অনেক সময়ই গ্রামীণ জোতদার শ্রেণীর সমান্তরাল গোষ্ঠী হিসাবে দেখা দেয়। জোতদারী ক্ষমতার সাথে মৌলিক গণতন্ত্রীর ক্ষমতা যুক্ত হয়ে মৌলিক গণতন্ত্রীরাই গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি হিসাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরা সকল সামাজিক অপরাধের সংরক্ষকে পরিণত হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের চরিত্রের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে, তবে তা বিস্তৃত হয়েছে ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের পূর্ব পর্যন্ত। এ অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে, ঔপনিবেশিক আমলে গঠিত ও ঔপনিবেশিক শোষণের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি আমলাতন্ত্রই পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রকৃত মালিকে পরিণত হয়। ফলে এ আমলাতন্ত্র জনসাধারণের ওপর নির্ভর না করে আমলাতন্ত্রকে আরো শক্তিশালী করে এবং তা প্রয়োগকে নির্বিঘ্ন করতে গড়ে তোলা হয় একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী। আর সামরিক ও আর্থিক সাহায্যের জন্য নির্ভর করা হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সকল ধরনের দাসত্বমূলক শর্তকে মেনে নিয়েই তার সাথে বিভিন্ন সামরিক ও অর্থনৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হয়। এই সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্র যৌথভাবে রাষ্ট্রের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে সঙ্গতকারণেই সামন্ততান্ত্রিক রাজনৈতিক নেতৃত্বের শ্রেণী স্বার্থে আঘাত হানে। সামন্তদের আঞ্চলিক আধিপত্য বিঘ্নিত হতে পারে এমন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে গোটা পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনৈতিক নেতৃত্ব পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিপক্ষে চলে যায়। অপরদিকে, শুরুতে সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের মধ্যে বাঙ্গালীদের প্রায় কোন প্রতিনিধিত্বই ছিল না। অবাঙ্গালী এই আমলাদের কাছে পূর্ব বাংলা বহুদিন পর্যন্ত পাকিস্তান রাষ্ট্রের অংশ হিসাবে বিবেচিত হয়নি বরং পশ্চিম পাকিস্তানের একটি উপনিবেশ হিসাবে গণ্য হয়েছে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ কেন্দ্রীয় সরকার ও পাকিস্তান রাষ্ট্র সমর্থক রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করার পরও দীর্ঘসময় ধরে সঙ্গত কোন কারণ ছাড়াই পাকিস্তানের রাষ্ট্র পূর্ব পাকিস্তানের ওপর কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তন করেছে। ফলে পূর্বপাকিস্তানের[১৬] জনসাধারণ পশ্চিম পাকিস্তান-কেন্দ্রিক সরকার ও রাষ্ট্রের ওপর কোন আস্থা রাখতে পারেনি। এরকম একটি পর্যায়েই সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র সাংবিধানিক সরকারের পতন ঘটিয়ে সামরিক আইন জারি করে। তবে এ সময়ে সামরিক শাসন আসার ক্ষেত্রে সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র ও পশ্চিম পাকিস্তান-কেন্দ্রিক বৃহৎ সামন্তদের বিরোধই মূল ভূমিকা রাখে।

সপ্তম অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা হয়েছে আইয়ুব দশকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের চরিত্র। জনসাধারণের ওপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য যে অসংখ্য অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছিল তার প্রধান প্রধান ধারাসমূহের ওপর ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে এ অধ্যায়ে। এ

[১৬]পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৫৬ সালের সাংবিধান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনার আগ পর্যন্ত পাকিস্তানের পূর্ব অংশ পূর্ববাংলা হিসাবে পরিচিত ছিল এবং তার পর এর নামকরণ হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান। সমগ্র লেখাতে কখনও পূর্ববাংলা আবার কখনও পূর্ব পাকিস্তান লেখা হবে; অধিকাংশ সময়ই তা সময়কেই নির্দেশ করবে কিন্তু কখনও কখনও পূর্ববাংলা লেখা হবে ১৯৫৬ সালের পরের কথা বলতে গিয়েও, তবে তা' বাক্যের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে লেখা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়ে আরো তুলে ধরা হয়েছে এ সময়ে জনসাধারণের সঙ্গত প্রতিবাদ বা যে কোন দাবি-দাওয়াকে কি নির্মমভাবে দমন করা হয়েছে তার সুস্পষ্ট চিত্র। এ অধ্যায়ে পাকিস্তানের উভয় অংশে বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের বিভিন্ন অংশ থেকে পাকিস্তানে রাষ্ট্র তথা আইয়ুব সরকার কি ব্যাপকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল তারও একটি চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এসব আলোচনার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, পাকিস্তান রাষ্ট্র কিভাবে সকল শ্রেণীর উর্ধ্বে অবস্থান করছিল এবং তারই প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টায় তার সামাজিক ভিত্তি হিসাবে গড়ে উঠেছিল পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিপতি খামার মালিক শ্রেণী ও পশ্চিম পাকিস্তান-কেন্দ্রিক অবাঙ্গালী শিল্পপতি-ব্যবসায়ী শ্রেণী।

অষ্টম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে পাকিস্তানের দুই দশকের রাজনীতি ও রাজনৈতিক আন্দোলনের বিকাশ ধারাকে নিয়ে। বিভিন্ন সময়ে ঘটে-যাওয়া রাজনৈতিক ঘটনার কার্যকারণ ব্যাখ্যাও এ অধ্যায়ে করা হয়েছে। এ সকল আলোচনার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ঘটনা ষাট দশকের প্রথমার্ধ থেকেই অনিবার্য হয়ে আসছিল। এ বক্তব্য তিনটি দিক থেকে প্রমাণিত হয়েছেঃ এক, রাজনৈতিক আন্দোলন বিকাশের অনিবার্য পরিণতি হিসাবে; দুই, সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ শিরোনামের ওপর বিবরবস্তু বিশ্লেষনের মধ্য দিয়ে দেখা গেছে সামাজিক চেতনা ক্রমাগত এমনভাবে আইয়ুব সরকার ও পাকিস্তান রাষ্ট্র-বিরোধী হয়ে উঠেছিল যে, একটি গণঅভ্যুত্থান তখন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল; তিন, এ আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণকারী ১৬২জন নেতার ওপর জরিপ চালিয়েও এই একই অভিমত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

নবম অধ্যায়ে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে এবং কয়েকটি ধারাতে গবেষণার ফলাফল তুলে ধরা হয়েছে।

আলোচ্য গবেষণায় প্রধানতঃ উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হবে। পাকিস্তানের বৃহৎ পরিসরে যে বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং জাতিগত দ্বন্দ্বসমূহ সে সময় দেখা দিয়েছিল-- সে সবের সাথে গণঅভ্যুত্থানের কার্যকারণ সম্পর্ক দেখানোই এ গবেষণার লক্ষ্য। ফলে কি কারণে উনসত্তরের মত একটি ব্যাপক গণঅভ্যুত্থান ঘটতে পারলো তা চিহ্নিত করার লক্ষ্যেই এ গবেষণাকর্মটি অগ্রসর হয়েছে। আর এ কারণে এ গণঅভ্যুত্থানের কারণ উদ্‌ঘাটনের জন্য যতোটা সময় ব্যয় করা হয়েছে, এ গণঅভ্যুত্থানের ফলাফল নিয়ে তা করা হয়নি। আর সে কারণেই আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিরোধের অন্তর্নিহিত উৎসসমূহকে চিহ্নিত করার প্রতি যতোটা জোর দেওয়া হয়েছে, রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রতি ততোটা জোর দেওয়া হয়নি। রাজনৈতিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও উনসত্তরের ঘটনাবলীর ওপর যতোটা জোর দেওয়া হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী জোর দেওয়া হয়েছে অতীত ঘটনাবলীর ওপর যাতে উনসত্তরে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর অনিবার্যতা সম্পর্কে আগে থেকেই আঁচ করা যায়।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মত একটি বিরাট ঘটনার পিছনে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক বিরোধের মত মূল মূল বিষয়ের বাইরেও আরো বহুবিধ কারণ থাকতে পারে। বিশেষতঃ শিল্প, সাহিত্য, সভ্যতা, মানসিক গঠন তথা বহুবিধ সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণ থাকতে পারে। কিন্তু এ সকল কারণ উদ্‌ঘাটনের ব্যাপারে বিশেষ কোন নজর এ গবেষণায় দেওয়া হয়নি। এমনকি ঐতিহাসিক কারণকেও ততবেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, ঘটনার সন-তারিখের চেয়ে ঘটনার গুরুত্বের ওপরই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। উপরন্তু, বিভিন্ন ব্যক্তির ব্যক্তিগত ভূমিকাকেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপেক্ষা করা হয়েছে। প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই যে কোন ঘটনা ঘটার কি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা ছিল এবং এ সকল ঘটনা বৃহত্তর কোন ঘটনা জন্ম দেওয়ার ক্ষেত্রে কি ধরনের তাৎপর্য বহন করে সেদিকেই বেশি আলোকপাত করা হয়েছে। আলোচ্য গবেষণায় উপরক্ত পরিধি ও সীমাবদ্ধতার কথা মনে রেখেই গবেষণার জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

বর্তমান গবেষণায় সর্বপ্রথম গবেষণা শূন্যতা (research gape) চিহ্নিত করার লক্ষ্যে প্রকাশনা পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রকাশনা পর্যালোচনা থেকে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে কোন তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলে কিংবা নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি অনুসরণ করে আলোচ্য বিষয়ে ইতিপূর্বে কোন গবেষণা হয়নি। দ্বিতীয়তঃ প্রকাশনা পর্যালোচনার মধ্য দিয়েই ফুটে উঠেছে ইতিপূর্বে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহে সমাজের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের সাথে কার্যকারণ সম্পর্ক দেখিয়ে কোন বিশ্লেষণ করা হয়নি, প্রধানতঃ ঘটনার বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছে। তৃতীয়তঃ কোন পূর্বসিদ্ধান্তকে সামনে রেখে উক্ত গ্রন্থসমূহ লিখিত হয়নি, ফলে উক্ত গ্রন্থসমূহের বক্তব্যকে পরীক্ষা করার কিংবা চূড়ান্ত করার জন্য কোন পন্থার অবলম্বন করা হয়নি।

গবেষণার নির্দিষ্ট পরিধি ও সীমাবদ্ধতার কথা বিবেচনা করে গবেষণাশূণ্যতা পূরণ করে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মত একটি ঘটনার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দিতে গেলে অন্ততঃ তিনটি স্তর অতিক্রম করতে হবে। এক, একটি পূর্ণাঙ্গ তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণ করা যাতে পরিষ্কার হয়ে ওঠে পাকিস্তানের মত উপনিবেশোত্তর একটি দেশে গণঅভ্যুত্থান ঘটতে গেলে কি কি বিষয়ের সংযোজন ঘটা প্রয়োজন হয়। উপরন্তু, উপনিবেশোত্তর দেশগুলিতে নির্দিষ্ট চরিত্রের যে রাষ্ট্রের উত্থান ঘটে তার মধ্যে এমন কি কি ধরনের উপাদান থাকে যা' গণঅভ্যুত্থান ঘটার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করে। দুই, একটি দেশ ও তার অধীনস্ত সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে আন্দোলনের উপযোগী যে সকল প্রবণতা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব পাকিস্তানের মধ্যে তার কি কি প্রবণতার সৃষ্টি হয়েছিল তা নির্ধারণ করা। আর তা করতে গেলে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সেই সমস্ত উপাদানকে চিহ্নিত করা ও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন যেগুলি উনসত্তরের ঘটনা ঘটার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে। তিন, ইতিহাস থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে যতক্ষণ বাস্তব ঘটনাবলী থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সাথে মেলানো না যায় ততক্ষণ তা কোন গ্রহণযোগ্য যুক্তি হয়ে ওঠে না। বাস্তব ঘটনাবলী যেমন বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তেমনই, সে সময়ের ঘটনাবলীর নায়ক ও দর্শকদের স্মৃতিতেও থাকে। আবার সংবাদ মাধ্যমগুলি অব্যাহতভাবে যে সংবাদ পরিবেশন করে তাও জনসাধারণের চেতনাকে প্রভাবিত করে। ফলে, ইতিহাসের তথ্য, সংবাদ মাধ্যমের তথ্য, ঘটনার নায়ক ও দর্শকদের স্মৃতি থেকে পাওয়া তথ্য এবং সংবাদ মাধ্যমের অব্যাহতভাবে পরিবেশিত সংবাদের প্রভাব থেকে সৃষ্ট জনসাধারণের মনোভাব - এ সব যখন ভিন্নতর দিকে প্রবাহিত না হয়ে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর দিকে অগ্রসর হয় তখনই ধরে নেওয়া যায় উক্ত নির্দিষ্ট বিন্দুটি সত্যের খুব কাছাকাছি।

গবেষণার উপরোক্ত তিনটি স্তর অতিক্রমের জন্য ঐতিহাসিক পদ্ধতির কোন বিকল্প নেই। ঐতিহাসিক পদ্ধতি হচ্ছে ইতিহাস থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা এবং গবেষকের বক্তব্যের সমর্থনে তা ব্যবহার করা। কিন্তু ইতিহাসের তথ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। বিশেষতঃ ইতিহাস ঘটনার সাধারণ দিক নিয়ে আলোচনা করে, একেক ঘটনার পিছনে যে আরো অসংখ্য ছোট ছোট ঘটনা কাজ করে তা উপস্থাপনের সময় এর নেই। উপরন্তু, যা ঘটে যায় শুধু তারই বিবরণ বা বিশ্লেষণই ইতিহাসের কাজ কিন্তু গতিপথে এত অসংখ্য ছোট

Dhaka University Institutional Repository

ছোট ঘটনা ঘটে যা' তাৎক্ষণিকভাবে কোন বড় ঘটনার জন্ম দিতে পারেনি কিংবা সব সময়ই সেগুলি পর্দার অন্তরালে থাকে সেগুলিকে উদ্ধার করার দায়িত্ব ইতিহাস নেয় না। এ সকল ঘটনার সাক্ষী একমাত্র সে সকল ছোট ছোট ঘটনার নায়ক কিংবা দর্শক অথবা কোন দলিল-দস্তাবেজ। দলিল থেকে সংগৃহীত তথ্যকেও ঐতিহাসিক পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত তথ্য হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে কিন্তু ঘটনার নায়ক বা দর্শক তথা কোন ব্যক্তির স্মৃতি থেকে গৃহীত তথ্যকে উক্ত পদ্ধতির অধীনস্ত তথ্য হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। কোন ব্যক্তির কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের এ পদ্ধতির নাম হচ্ছে অভিজ্ঞতাবাদী (empirical) পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে দুইভাবে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবঃ (১) কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সাথে বিস্তারিত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা, যাতে সাক্ষাৎকার দানকারীর জানা সকল তথ্য সংগ্রহ করা এবং তার পর উক্ত বিস্তারিত তথ্য থেকে গবেষকের প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহকে ব্যবহার করা। (২) গবেষকের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশ্নমালা তৈরি করা এবং অসংখ্য ব্যক্তির কাছ থেকে উক্ত প্রশ্নমালাভিত্তিক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা। বর্তমান গবেষণায় অভিজ্ঞতাবাদী পদ্ধতির উক্ত দুটি দিকই অনুসরণ করা হয়েছে। অবশ্য, প্রশ্নমালা যা করা হয়েছে তা প্রধানতঃ কাঠামোগত, অর্থাৎ প্রশ্নের পাশে সম্ভাব্য কয়েকটি উত্তর প্রশ্নপত্রেই উপস্থাপন করা হয়েছে। পক্ষপাতিত্ব এড়ানোর জন্য একটি খালি ঘরও রাখা হয়েছে। তবে, জটিল প্রশ্নে সরাসরি উত্তর না চেয়ে ১০/১৫টি সম্ভাব্য উত্তর উপস্থাপিত হয়েছে যা থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কয়েকটিকে পছন্দ (choicc) করতে বলা হয়েছে। এভাবে পক্ষপাতদুষ্টতাকে এড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

যে কোন আন্দোলনে যখন সাধারণ মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ ঘটে তখনই তা অভ্যুত্থানে রূপান্তরিত হয়। আর সাধারণ মানুষের এ অংশগ্রহণ ঘটবে কি ঘটবে না তা নির্ভর করে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে জনসাধারণের চেতনার স্তর ও মনোভাবের ওপর। এক্ষেত্রে সংবাদ মাধ্যমের থাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সংবাদ মাধ্যমগুলির মধ্যে সংবাদপত্র একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তবে সংবাদপত্রের তথ্যকে গ্রহণ করার সবচেয়ে বড় সমস্যা হল সংবাদপত্রের পরিচালক বা মালিকের দৃষ্টিভঙ্গির একটি সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটে সংবাদের মধ্যে। কেননা, প্রতিটি সংবাদপত্রই প্রকাশিত হয় এবং একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। কোন কোনটি আবার একটি নিদিষ্ট দর্শন বা রাজনৈতিক বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার সচেতন উদ্দেশ্য নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করে। ষাটের দশকে আওয়ামী লীগের পক্ষ সমর্থন করে প্রকাশিত হত দৈনিক ইত্তেফাক, ন্যাপ রাজনীতিকে সমর্থন করে প্রকাশিত হত দৈনিক সংবাদ। এ দুটি পত্রিকাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবেই সংবাদ সংগ্রহের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হয়নি, কেননা, তাতে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দর্শনের প্রতি পক্ষপাতিত্বের ভয় ছিল। গ্রহণ করা হয়েছে দৈনিক আজাদকে। এ পত্রিকাটি একদিকে যেমন সে সময় বহুল প্রচারিত বাংলা দৈনিক ছিল, অন্যদিকে, সে কাউন্সিল মুসলিম লীগ নামক এমন একটি রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করতো যার সমাজে তেমন কোন প্রভাব ছিলনা। এ দৈনিকটি সকল ধরনের সংবাদই মোটামুটি নিরপেক্ষভাবে প্রকাশ করতো।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ থেকে সাধারণ মানুষের মনোভাবের কি পরিবর্তন হয়েছিল বা কি ধরনের পরিবর্তন হওয়া সম্ভব ছিল তা নির্ধারণের জন্য ১৯৬৪ সালের ১লা অক্টোবর থেকে শুরু করে ১৯৬৯ সালের ৩০শে মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিনের প্রাসঙ্গিক সংবাদ শিরোনামগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে। ১৯৬৪ সালের শেষ তিন মাস ছিল একটি উত্তপ্ত সময়। একটি উত্তপ্ত সময় থেকে আর একটি উত্তপ্ত সময়, মাঝখানে ঘটে গেছে অসংখ্য ঘটনা। একটি উত্তপ্ত সময়ে মিছিলের যে ভাষা ছিল আর একটি উত্তপ্ত সময়ে মোটেই তা ছিল না। মিছিলের ভাষার পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছিল সংবাদ শিরোনামের ভাষা - আর সেই সাথেই পরিবর্তিত হয়েছিল জনসাধারণের মনোভাব। জনসাধারণের মনোভাবের এ পরিবর্তনকে চিহ্নিত করার লক্ষ্যে দৈনিক আজাদের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সকল রাজনীতি বিষয়ক সংবাদ শিরোনাম সংগ্রহ করা হয়। প্রতিদিনের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলি সংগ্রহের জন্য প্রথম তিনটি শিরোনামও সংগ্রহ করা হয় । ফলে উক্ত ৫৪ মাসের প্রতিদিন যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল তাও বাদ যায়নি। অপর দিকে, রাজনীতি বিষয়ক সংবাদের মধ্যে যেমন সকল বিরোধী রাজনৈতিক দল, শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র সংগঠনসহ অপরাপর গণসংগঠনের কার্যকলাপ সম্পর্কিত সংবাদ সংগ্রহ করা হয়। শুধু তাই নয়, সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষের কর্মকান্ড ও বক্তব্য সম্পর্কিত যে সকল সংবাদ দৈনিক আজাদের প্রথম পাতায় সংবাদ শিরোনাম হিসাবে প্রকাশিত হয় তাও সংগ্রহ করা হয়েছে। এ সকল সংবাদ শিরোনাম সংগ্রহ করার পর সংবাদের প্রকৃতি অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে এবং প্রকাশকাল ও বিষয় অনুযায়ী সারণি তৈরি করে তা প্রকাশ করা হয়েছে। গবেষণা পদ্ধতি হিসাবে এটি বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ (content analysis) পদ্ধতি নামে পরিচিত। এ পদ্ধতি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন বিষয়ে জনসাধারণ কত সংখ্যক বার জ্ঞাত হচ্ছে সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। পছন্দসই কোন্ বিষয় যতবার জনসাধারণ জ্ঞাত হয়, সে বিষয়ের প্রতি তার আস্থা ততো দৃঢ় হয়, অন্যদিকে পছন্দ নয় বা বর্জনীয় কোন বিষয় যতবার জনসাধারণকে জ্ঞাত করানো হয় ততই সে বিষয়ের প্রতি ক্রোধ বা ঘৃণা জন্মাতো। এই সাধারণ মনস্তত্ত্বকে যথার্থ ধরে নিয়ে সংবাদ শিরোনামসমূহকে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

উপরোক্ত পদ্ধতিগত আলোচনাকে সমন্বিত করে বলা যায়, বর্তমান গবেষণায় মোট তিনটি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতিগুলি হচ্ছে ঐতিহাসিক পদ্ধতি, অভিজ্ঞতাবাদী পদ্ধতি এবং বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি।

Dhaka University Institutional Repository

২ঃ উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানঃ একটি তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত

২.১ঃ ভূমিকা

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসের একটি গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা। জনসাধারণের ব্যাপকতর অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের লৌহমানব আইয়ুব খানের পতন হয়েছিল, জনগণের নেতৃবৃন্দ মুক্তি পেয়েছিলেন এবং এতে বাংলাদেশের মানুষের একটি মহান বিজয় অর্জিত হয়েছিল। যে ঘটনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জনসাধারণের এই মহান বিজয় অর্জিত হয়েছিল আদতে তা ছিল একটি আন্দোলন। ফলে এ ব্যাপারে কোন আলোচনায় যাওয়ার আগে আন্দোলন সম্পর্কে যথাযথ একটি ধারণা থাকা প্রয়োজন। প্রথমতঃ আন্দোলন বলতে ঠিক কি বুঝায় তা স্পষ্ট করা প্রয়োজন। আন্দোলন সম্পর্কিত ধারণাকে স্পষ্ট করার জন্যই 'আন্দোলন' প্রত্যয়টি কিভাবে বিকশিত হল তাও জানা আবশ্যক।

সমগ্র পৃথিবীতে অসংখ্য দেশ আছে এবং আছে নানা ধরনের সমাজ। প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে প্রতিটি সমাজেরই রয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। আর এসব বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে প্রতিটি সমাজেরই রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা। বিশ্ব রাজনৈতিক অর্থনীতি এখন বহুদূর এগিয়ে গেছে, ফলে এই নতুনতর রাজনৈতিক অর্থনীতি, সমাজ কিংবা দেশসমূহের সমস্যাসমূহকে জটিল করে তুলেছে। তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ হল বাংলাদেশ। পাকিস্তান আমলেও তাই ছিল, তবে তখন তা ছিল পাঁচটি প্রধান ভাষাভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্রের বাংলাভাষী পূর্ব পাকিস্তান-- যা একটি পশ্চাৎপদ প্রদেশ। প্রধানতঃ সেই প্রদেশের একটি অভ্যুত্থানের কারণে কেন কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের পতন হল তা মূল্যায়ন করতে হলে এ ধরনের একটি দেশে কি কি ধরনের সমস্যা থাকতে পারে সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। আর সে প্রয়োজনেই কত বিচিত্র সমস্যা নিয়ে নানা রকমের আন্দোলন বিভিন্ন সমাজে সংগঠিত হতে পারে তার একটি পর্যালোচনা আবশ্যক। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এ অধ্যায়ের আলোচনাটি নিম্নোক্ত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছেঃ

(১) আন্দোলনের সংজ্ঞা (২) আন্দোলন প্রত্যয়ের উৎস; (৩) আন্দোলনের শ্রেণী বিভাগ; (৪) আন্দোলন ও শ্রেণী; এবং (৫) আন্দোলন ও জাতি। এই পাঁচটি বিষয় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সমগ্র আলোচনাকে ৭টি উপ-অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

২ঃ আন্দোলনঃ একটি সমাজতাত্ত্বিক প্রত্যয়

ইংরেজী শব্দ 'Movement' এর বাংলা প্রতিশব্দ হল 'আন্দোলন'। অক্সফোর্ড অভিধানে 'Movement' তথা আন্দোলন বলতে সাধারণভাবে একটি ক্রিয়া অথবা গতিশীল প্রক্রিয়াকে বুঝানো হয়েছে (The action or process of moving)। ইংরেজী 'Movement' শব্দটি আংশিকভাবে প্রাচীন ফরাসী শব্দ 'Movoir' থেকে এসেছে। 'Movoir' একটি ক্রিয়াবাচক পদ, এর অর্থ হল নড়া বা নড়ানো। 'Move'— উত্তেজিত করা বা ক্ষেপিয়ে তোলা (stir), কিংবা তাড়না করা বা চালিত করা (impel)। পরবর্তীকালে ল্যাটিন শব্দ 'Movimentum'এর সাথে মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তা 'Movement' শব্দে পরিণত হয়েছে।[১]

উক্ত অভিধানে 'আন্দোলন' শব্দটিকে বোধগম্য ক'রে তুলতে যে বিভিন্ন উদাহরণ ও বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা থেকে দেখা যায়: সংঘবদ্ধ কোন গোষ্ঠী বা ব্যক্তিসমষ্টি যখন নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিরতিহীনভাবে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়, তখনই এই সমগ্র কর্মকাণ্ডটি আন্দোলন হিসাবে পরিচিতি লাভ করে।[২] এতে বিভিন্ন উদাহরণ ও বর্ণনাকে সংগঠিত করে আন্দোলনের নিম্নোক্ত সংজ্ঞাটি দেওয়া হয়েছে-

"A course or series of actions and endeavours on the part of a body, persons, moving or Tending more or less continuously towards some special end."[৩]

অক্সফোর্ড অভিধানে আন্দোলনের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তাতে সংঘবদ্ধ মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রতিই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যদিও এখানে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের কথা বলা হয়েছে কিন্তু তার প্রকৃতিকে নির্দিষ্ট করা হয়নি, কিংবা তার প্রতি কোন নির্দেশও করা হয়নি। ফলে উক্ত অভিধানে ব্যবহৃত সংজ্ঞা দ্বারা যেমন সমাজের নতুন অবকাঠামো গড়ে তোলার জন্য কিছু ব্যক্তির যুগপৎ প্রচেষ্টাকে বোঝা যেতে পারে কিংবা ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জনের জন্য যুগপৎ প্রচেষ্টা হতে পারে, আবার কোন সামাজিক বা রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্যও সংঘবদ্ধ জনসমষ্টির যুগপৎ প্রচেষ্টা হতে পারে। এভাবে ব্যাখ্যা করলে 'Movement' শব্দটির যথার্থ অর্থ প্রকাশিত হয় বলে মনে হয় না। শুধু ইংরেজীতে নয়, পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ভাষাতে ইংরেজী 'Movement' শব্দটির যে নানা প্রতিশব্দ আছে তা থেকে দেখা যায় 'আন্দোলন' শব্দটির সাথে জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধভাবে উৎকণ্ঠা প্রকাশের বা বিক্ষোভ প্রদর্শনের একটি সম্পর্ক রয়েছে।[৪] তবে পাশ্চাত্যের সব ভাষাতেই আন্দোলন বলতে সাধারণ মানুষের উৎকণ্ঠা প্রকাশ কিংবা বিক্ষোভ প্রদর্শনের সম্পর্ক থাকলেও উক্ত উৎকণ্ঠা বা বিক্ষোভ প্রদর্শনের ফলাফল ইতিবাচক হবে কি নেতিবাচক হবে, সে সম্পর্কে কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না। ফলাফল সম্পর্কে কোন নির্দেশ না থাকলেও এ উৎকণ্ঠার মাঝে একটি পরিবর্তনের আভাস কিংবা কোন পরিবর্তনকে মেনে না নেওয়ার আভাস থাকে। সমাজ বিজ্ঞানী হেবার্ল এসব প্রশ্নকে সামনে রেখে আন্দোলনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন-

"... The connotation is that there is a commotion, a stirring among the people, an unrest, a disire to approach a visualized goal. A "movement" therefore is a collective ready for action by which some kind of change is to be achieved, some innovation to be made, or a previous condition to be restored."[৫]

---

১ Wilkinson, Paul (1971): Social Movement. Praeger Publishers, London,p.11.
২ The Oxford English Dictionary, Vol::VI, Oxford: At the clarendon press 1933, pp.726-29.
৩ Ibid,p.729.
৪ Heberle, Rudolf (1951): Observations on the Sociology of Social Movements: in Readings in Sociology. edited by Alfred Mcclung Lee, New York: Barnes & Nobles, Inc. p.276.
৫ Heberle, Ibid.

Dhaka University Institutional Repository

হেবার্ল তাঁর সংজ্ঞার মাধ্যমে আন্দোলনের একটি সাধারণ রূপ তুলে ধরেছেন। জনসাধারণ যে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে, বিক্ষোভ প্রদর্শন করে, কিংবা উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে সেটা বিনা কারণে করে না। আবার বিনা কারণে মানুষ সংগঠিতও হয় না। হেবার্ল যেভাবে 'আন্দোলন' প্রত্যয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে দেখা যায়, একটি ঘটনা তখনই আন্দোলন হয়ে ওঠে, যখন: জনসাধারণের মাঝে একটি প্রতিবাদ, বিক্ষোভ বা উৎকণ্ঠার বহিঃপ্রকাশ ঘটে; দ্বিতীয়তঃ, এই প্রতিবাদ, বিক্ষোভ বা উৎকণ্ঠা প্রকাশের প্রয়োজনে তারা সংগঠিত হচ্ছে; এবং তৃতীয়তঃ, এই সংগঠিত বিক্ষোভ, প্রতিবাদ বা উৎকণ্ঠা প্রকাশের পেছনে থাকে নির্দিষ্ট একটি লক্ষ্য অর্জন। এ লক্ষ্য অর্জন আবার উৎকণ্ঠার কারণকে নিরসন করতে চায় অর্থাৎ একটি পরিবর্তনকে দাবি করে। কি ধরনের পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয় তাঁর বিস্তারিত ব্যাখ্যা অবশ্য হেবার্ল তার আন্দোলন সংক্রান্ত বক্তব্যে কোথাও প্রকাশ করেননি। তবে তিনি শুধুমাত্র 'আন্দোলন' প্রত্যয়ের মাঝে তার বক্তব্যকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি দেখিয়েছেন, ইংরেজীতে যাকে 'Movement' বলা হচ্ছে তার মধ্য দিয়ে সুনির্দিষ্ট একটি অর্থ প্রকাশ পায় না। অভিধানে তার বহুবিধ অর্থ আছে। তবে এখানে যেভাবে আন্দোলনকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, ইউরোপের অন্য যে কোন ভাষাতে সেই অর্থটি প্রকাশ করে "Social Movement" নামক শব্দটি। হেবার্ল বলেছেন–

"All the Western languages use the metaphoric term 'Movement' for three phenomenon which we want to define, "Soziale Bewegung" movement "Social" "Sociata morelse.", etc."[৬]

অক্সফোর্ড অভিধানে Movement শব্দটির কয়েকটি অর্থের মধ্য থেকে যে অর্থটিকে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে অথবা হের্বাল যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, পাশ্চাত্যের ভাষাগুলিতে তার প্রকৃত প্রতিশব্দ যে "Social Movement" তা যেমন হেবার্লের উপরোক্ত বক্তব্যে মনে হয়, ঠিক তেমনই অন্যদের লেখাতেই প্রকাশিত হয়েছে। ইতিপূর্বে অক্সফোর্ড অভিধানে Movement শব্দটির যে ব্যাখ্যাকে উদ্ধৃত করা হয়েছে ঠিক সেই অর্থেই পল উইলকিনসন নামক এক সমাজ বিজ্ঞানী "Social Movement" শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন। উইলকিনসনের ভাষায়–

"In terms of general usage, both in England and in other Europian Countries a social movement as a series of actions and endeavours of a body of persons for a special object, has been generally predominant since the early nineteenth century"[৭]

লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে ইতিপূর্বে অক্সফোর্ড অভিধান থেকে Movement শব্দটির যে অর্থটি নেওয়া হয়েছে উইলকিনসন অবিকল ঠিক একই ব্যাখ্যা করেছেন "Social Movement" প্রত্যয়টি সম্পর্কে। অন্যদিকে, হেবার্লের কথা থেকে দেখা যায়, ইংরেজী Movement যে অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তা পাশ্চাত্যের অন্যান্য ভাষাতে ভিন্ন রকম যেগুলির ইংরেজী প্রতিশব্দ একমাত্র 'Social Movement'ই হতে পারে। অবশ্য উইলকিনসন স্বীকার করেছেন ইংরেজী Movement এর প্রতিশব্দ অন্যান্য ভাষায় নেই যে তা নয়, তবে তা ভিন্নতর অর্থ ধারণ করে। আবার তিনি ইংরেজী Movement শব্দটিরও বিভিন্ন রকম অর্থের কথা বলেছেন। তবে তিনি বেশ কয়েকটি সামাজিক প্রপঞ্চকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে Movement শব্দটি ব্যবহার হবার কথা বলেছেন কিন্তু তিনি সাথে সাথে বলেছেন, এ ব্যাখ্যা Moverment এর সর্বজনীন ব্যাখ্যা নয়। যেমন, তিনি দেখিয়েছেন উদারনৈতিক বা প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল কিংবা ধারাকে অনেক সময় 'আন্দোলন' হিসাবে দেখা হয়ে থাকে। আবার অনেক সময় ইতিহাসের কোন সত্য অনুসন্ধানের অগ্রগতির ধারাকেও আন্দোলন হিসাবে চিত্রিত করা হয়, এভাবে অসংখ্য বিষয়ের সাথে আন্দোলন শব্দটিকে যুক্ত করা হয় কিন্তু এগুলিতে আন্দোলনের প্রকৃত অর্থ প্রতিফলিত হয় না বলে উইল কিনসন দেখিয়েছেন।[৮] অর্থাৎ উইলকিনসন যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা থেকে দেখা যায় বাংলা শব্দ 'আন্দোলন' যে অর্থ ধারণ করে তা শুধু মাত্র ইংরেজী Social Movement এর মাধ্যমেই প্রতিফলিত হয়।

কোন কোন লেখক অবশ্য Movement এবং Social movement পদ দুটিকে সামান্য আলাদা অর্থে ব্যবহার করেছেন। যেমন রবার্টস ও ক্লস (১৯৭৯) মত প্রকাশ করেছেন, Social movement পদ দুটির মাঝে অনেক মিল আছে তবে 'Social movement' movement অপেক্ষা অনেক বেশি ব্যাপক। তাদের মতে, যে কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে সমবেত কিছু ব্যক্তির ঐক্যবদ্ধ কোন ক্রিয়াই হল movement. এ লক্ষ্য অর্জনের পর তাদের সংগঠনশীলতায় অস্তিত্ব টিকে থাকার কোন নিশ্চয়তা নেই। অন্যদিকে Social movement হল অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে একটি লক্ষ্যকে নির্ধারণ করা, সে লক্ষ্য অর্জনের জন্য জনসাধারণকে সংগঠিত করা এবং তারপর এই সংগঠিত শক্তিকে ব্যবহার করে লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করা। Social Movement এর মূল লক্ষ্য বলতে রবার্টস ও ক্লস সামাজিক সম্পর্ক কিংবা রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পর্কের পরিবর্তনকে বুঝিয়েছেন। রবার্টস ও ক্লস movement এবং Social movement পদ দুটির মাঝে পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন–

"Movement are a Special kind of social collectivity that is not organized groups; therefore, a movement is a social collective that has some element of planning or goal orientation within it, in sofar as social movements that seek to change the power relationships of a society are political or pre-political, there is political planning within the movements"[৯]

রবার্টস ও ক্লস পদ দুটির মাঝে পার্থক্য করলেও তাঁরা এর জন্য যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ প্রদর্শন করেননি। অন্য কোন লেখক কিংবা কোন অভিধানে পার্থক্য করা হয়েছে কিনা তারও কোন উল্লেখ করেননি। বরং অক্সফোর্ড অভিধানে এর যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে অথবা হেবার্ল যে বিশ্লেষণ করেছেন তার সাথে রবার্ট ও ক্লসের Social movement পদের ব্যাখ্যার কোন তফাৎ নেই। কেননা উক্ত উভয় ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট উৎকণ্ঠাকে নিরসনের জন্য সমবেত জনসমষ্টির ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার কথা বলা হয়েছে– যে প্রচেষ্টার নির্দিষ্ট রূপ হিসাবে প্রতিবাদ বা বিক্ষোভ প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু প্রতিবাদ কিংবা বিক্ষোভের রূপ সম্পর্কে কোন কথা বলা হয়নি। এর অর্থ বিক্ষোভ বা প্রতিবাদের রূপ অত্যন্ত চরম হতে পারে আবার সাদামাটা প্রতিবাদ হতে পারে। অন্যদিকে, জনসাধারণের উৎকণ্ঠা বা অসন্তোষ যখন মানুষের মাঝে সাধারণ রূপ গ্রহণ করে তখন তার পেছনের কারণ যে সামাজিক বা রাজনৈতিক সম্পর্কের মাঝে কোন

---

৬ Heberle, Ibid.
৭ Wilkinson, Poul (1971): op.cit, pp.11-12.
৮ Wilkinson, Paul (1971): Ibid, p.12.
৯ Roberts, Ron E.& Robert Mash Kloss (1979): Social Movements between the balcony and the barrecade. The London: C.V. Mosly company, p.15.

Dhaka University Institutional Repository

অসঙ্গতি থেকে উথিত নয়, এ কথা বলা য়ায় না। বরং রাজনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কের মাঝে অসঙ্গতি, বিশেষতঃ যা রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীয় কার্যকলাপের প্রভাব থেকে উত্থিত, সেটারই প্রতিফলন মানুষের মাঝে সাধারণ উৎকণ্ঠা জাগিয়ে তুলতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করার কথা। রবার্টস ও ক্লস যে movement ও social movement পদ দুটির মাঝে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন তার পেছনে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই, বরং social movement পদটি দ্বারাই আন্দোলন বা movement পদটির যথার্থ অর্থ প্রকাশিত হয়। জেল্ড ও বার্জারও (১৯৭৮) এই মতের পক্ষেই যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন জনসাধারণের অসন্তোষ থেকেই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। কোন একটি সমাজে জনসাধারণ যখন অনিশ্চয়তায় ভোগে, নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে কিংবা তাদের যে সমস্ত মৌল অধিকার থাকার কথা তা লংঘিত হয় বা তাদের ওপর অর্থনৈতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক নিপীড়ন নেমে আসে তখন সাধারণ মানুষ তাদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনেই সংগঠিত হতে থাকে। আর এ সংগঠিত হবার মূল উদ্দেশ্য থাকে তাদের দাবির সপক্ষে প্রতিবাদ বা বিক্ষোভ প্রদর্শনকে জোরালো করা, সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা।[১০] তবে যে সমস্যাগুলির কারণে মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে বাধ্য হয় তার শিকড় থাকে অনেক গভীরে। সমাজের যে মৌল সামাজিক সম্পর্ক, উৎপাদন ও বন্টন সম্পর্ক ইত্যাদি থেকে যে সমস্যাগুলির উদ্ভব হয় তার অনেক কিছুই আর বিরাজমান রাজনৈতিক কাঠামোকে বলবৎ রেখে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। জেল্ড ও বার্জারের মতে মৌল সামাজিক সম্পর্ক পরিবর্তনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবাদ গড়ে ওঠে, সাধারণ বিবৃতি থেকে তা কখনও ব্যাপকতর গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়, কখনও বা তা ভয়ংকর সশস্ত্র যুদ্ধে পর্যবসিত হয় কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় প্রতিবাদের প্রকৃতি ভিন্নতর হলেও এ সমস্ত সামাজিক অস্থিরতার (unrest) মূল লক্ষ্য থাকে বৃহত্তর সমাজের পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা। জেল্ড ও বার্জার এ সমস্ত সামাজিক অস্থিরতা, ধর্মঘট, বিক্ষোভ ইত্যাদিকে কখনও movement বলেছেন, কখনও "mass movement" বলেছেন আবার কখনও "Social Movement" বলেছেন। তাঁর মতে যেহেতু সামাজিক সমস্যা থেকে সামাজিক অস্থিরতার জন্ম সেহেতু ব্যাপক গণসমাবেশ ছাড়া কোন ধর্মঘট কিংবা বিক্ষোভ সফল হতে পারে না। সামাজিক অস্থিরতার এই সমস্ত রূপই আন্দোলন, আর এতে ব্যাপক গণসমাবেশ হয় বলেই তা গণআন্দোলন এবং এই গণআন্দোলনের মূল কারণ হল সামাজিক সমস্যা বা সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন আকাঙ্ক্ষা; তাই এটা "Social Movement"[১১] জেল্ড ও বার্জার শেষে অত্যন্ত জোরের সাথে বলেছেন-

"It is important to note that, while the proximal goal of the movement is to change the behaviour and goals of organizational authorities and the structure of organizations the real goal may be changes in the larger society."[১২]

জেল্ড ও বার্জারের মত অতখানি না এগিয়েও ওপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অন্ততঃ এটুকু বলা যায় যে, আন্দোলন হল গণঅসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ। তবে যে কোন স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদকেই আন্দোলন বলা যাবে না। এর পেছনে থাকতে হবে একটি সচেতন প্রয়াস তথা একটি সংগঠন। অন্যদিকে কর্তৃপক্ষের বা সরকারের আকস্মিক কোন ভুল পদক্ষেপকে (যা সহজেই সংশোধন যোগ্য) বিরোধিতা করা বা তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনকেই আন্দোলন বলা যায় না। যা সরকারের মৌল নীতির সাথে সম্পর্কিত বা বিরাজমান সামাজিক সম্পর্কের সাথে সম্পর্কিত এমন কোন সমস্যাকে অপসারণের লক্ষ্যে যতক্ষুদ্র গন্ডিতে অথবা যত সাদামাটা ধরনের সংগঠিত কোন প্রতিবাদ হোক না কেন তাকেই আন্দোলন বলা যাবে। এক কথায়, কোন সমাজের অন্তর্নিহিত মৌল সামাজিক সম্পর্ক বা মৌল নীতি থেকে উথিত কোন সমস্যাকে কেন্দ্র করে জনসাধারণের সংঘবদ্ধ কোন প্রতিবাদই হল আন্দোলন।

আন্দোলনের এ নির্ধারিত ধারণা থেকে এ কথা পরিষ্কার যে, আন্দোলন, সামাজিক আন্দোলন এবং গণআন্দোলন পদ তিনটির মাঝে কোন অর্থগত পার্থক্য নেই। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, আন্দোলন বলতে যা বোঝানো হয় তার নির্দিষ্ট প্রতিশব্দ ইংরেজী কিংবা অন্যান্য পাশ্চাত্য ভাষাতে একমাত্র Social Movement দ্বারাই প্রকাশ করা চলে। অন্যদিকে আন্দোলন সংক্রান্ত পরবর্তী আলোচনাকে পাশ্চাত্যের বই-পুস্তকের ওপর নির্ভর করেই অগ্রসর করে নিতে হবে, ফলে সেখানে আন্দোলন অর্থেই Social Movement বা সামাজিক আন্দোলন পদটিকে ব্যবহার করা হবে।

২.৩ঃ আন্দোলন প্রত্যয়ের উৎস ও তার প্রতিষ্ঠা

বিদ্যমান সমাজের সামাজিক সম্পর্ককে পরিবর্তনের লক্ষ্যে সংগঠিত প্রতিবাদকে যদি আন্দোলন বলা হয় তাহলে মানব সমাজ শ্রেণী বিভক্ত হওয়ার পর থেকেই আন্দোলন চলছে, তবে তা কখনও বিচ্ছিন্নভাবে অথবা কখনও অধিকতর সংগঠিতভাবে। তবে আন্দোলনকে একটি প্রত্যয় হিসাবে বিবেচনা করে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়। সমসাময়িক কালের দুই জার্মান চিন্তাবিদ কার্ল মার্কস এবং লরেঞ্জ ভন ষ্টেইন বিষয়টির ওপর স্পষ্ট আলোকপাত করে লেখালেখি শুরু করেন। যদিও কার্ল মার্কস আন্দোলনকে একটি প্রত্যয় হিসাবে দেখে তার ওপর সুনির্দিষ্ট আলোচনা করেননি কিন্তু তিনি সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনের গুরুত্বের ওপর খুবই তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন।

কার্ল মার্কস নিজে এবং কখনও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস-এর সাথে যুগ্মভাবে আন্দোলনের ওপর বিপুল লেখালেখি করেছেন। তাঁদের এ বিষয়ক লেখালেখির মধ্যে 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহার' 'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে,' 'গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা' 'ফ্রান্সে শ্রেণীসংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০,' 'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার', 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' অন্যতম। কার্ল মার্কসের দৃষ্টিতে আন্দোলন শ্রেণীসংগ্রাম বৈ অন্য কিছু নয়। অবশ্য মার্কস তাঁর বিভিন্ন লেখাতে, এমনকি, একই লেখার বিভিন্ন অংশে আন্দোলনকে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি আন্দোলনকে কখনও শ্রেণীসংগ্রাম, কখনও গণসংগ্রাম, কখনও গণ অভ্যুত্থান, কখনও বিপ্লব, এমনকি কখনও যুদ্ধ বলেও আখ্যায়িত করেছেন। তবে আন্দোলনের বিকাশ ও তাঁর স্তর ভেদে তারা এই বিভিন্ন নামকরণ করেছেন বলে মনে হয়। মার্কস ও এঙ্গেলস দেখিয়েছেন সমস্ত আন্দোলনই শ্রেণী-আন্দোলন এবং তা শেষ কালে রাজনৈতিক আন্দোলন। তারা রাজনৈতিক আন্দোলনকে

---

১০ Zald, Mayer N. & Michael A. Berger (1978): "Social Movements in organization: Coup d'Etat, Insurgency, and Mass Movements" in American Journal of Socialogy, Vol-88, No-4,p.:840.

১১ Ibid,pp:839-42.

১২ Ibid,P.842.

Dhaka University Institutional Repository

বিপ্লবের প্রশিক্ষক হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। তাদের ভাষায়, 'কেননা এই রাজনৈতিক আন্দোলনই বিপ্লবের জমি তৈরি করে।[১৩] যে আন্দোলন বা সংগ্রাম বিদ্যমান সামাজিক সম্পর্ককে পাল্টে ফেলে, সেটাকে তিনি নামকরণ করেছেন বিপ্লব হিসাবে। অবশ্য এই বিপ্লবকে তিনি অভ্যুত্থান, সশস্ত্র অভ্যুত্থান বা বিজয়ী যুদ্ধ ইত্যাদি নামেও অভিহিত করেছেন। মার্কসের মতে বিপ্লব একটি আন্দোলনের ফলাফল বটে তবে সমস্ত আন্দোলই বিপ্লব নয়। যে শ্রেণীর মুক্তির আন্দোলন চলছে, সেই আন্দোলনে যখন সেই শ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ঘটে তখনই তা অভ্যুত্থানে রূপান্তরিত হয়, আর এ অভ্যুত্থান যদি সশস্ত্র অভ্যুত্থানও হয় , তাহলে অবশ্যই তা আন্দোলন এবং তা আন্দোলনের একটি উচ্চতর পর্যায়ও বটে কিন্তু তা বিপ্লব নয়। মার্কসের মতে বিদ্যমান সামাজিক সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে কেড়ে নেওয়া বা দখল করাই হল বিপ্লব কিন্তু আন্দোলন যত তীব্রই হোক না কেন, তা যত আক্রমনাত্মক অভ্যুত্থান কিংবা সশস্ত্র অভ্যুত্থানই হোক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত এ আন্দোলনের দ্বারা সামাজিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দখল করা না যাচ্ছে, ততক্ষণ তা বিপ্লব হয়ে উঠবে না। আর সে কারণেই মার্কস ১৮৪৮ সালের ফ্রান্সের শ্রমিকদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানকেও বিপ্লব বলেননি।[১৪] ধনী পুঁজিপতিদের সমস্ত চক্রান্তকে মোকাবিলা করে তৎকালীন ফরাসী সরকারের সেনা বাহিনী-বিরাট জাতীয় রক্ষীবাহিনীকে প্রতিহত করা ও সমস্ত প্রশাসনকে ভেঙ্গে ফেলা সত্ত্বেও ফ্রান্সের শ্রমিকশ্রেণীর এ ব্যাপকতর সশস্ত্র অভ্যুত্থান বিপ্লব ছিল না। তার মূল কারণ হল- শ্রমিকশ্রেণী ফ্রান্সের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে পারেনি। আবার এর ২৩ বছর পর ১৮৭১ সালে ফ্রান্সের শ্রমিকশ্রেণী সেই রাজনৈতিক ক্ষমতাকে দখল করে সামাজিক সম্পর্কের নিয়ন্ত্রকে পরিণত হতে পেরেছিল বলেই তা বিপ্লব হয়ে উঠেছিল।[১৫] মার্কসের মতে বিপ্লব বা শ্রমিকশ্রেণীর সশস্ত্র অভ্যুত্থান যেমন আন্দোলন, তেমনই ক্ষমতাসীন ফিনান্স পুঁজিপতি ও অভিজাত বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে ক্ষমতাবহির্ভূত বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে জনমত গঠনের প্রচেষ্টাকেও মার্কস আন্দোলন বলেছেন। এমনকি স্বৈরাচারী শাসনের আওতায় বিরোধী পক্ষের বুর্জোয়াগণের নিতান্ত ভোজসভাগুলিতে মিলিত হয়ে যে আলাপচারিতা করতেন সেগুলিকেও আন্দোলন হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন মার্কস।[১৬] তবে এগুলি নিতান্ত ভোজসভার আলাপচারিতা হলেও এসব আলাপ-আলোচনার পেছনে ছিল সচেতন কিছু উদ্দেশ্য। সেদিনের ক্ষমতাবহির্ভূত বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের শ্রেণীগত বিকাশের স্বার্থেই অধিকতর গণতন্ত্র আদায় করার জন্য নির্বাচন সংস্কার চেয়েছিলেন।[১৭] মার্কস নির্বাচন সংস্কারের লক্ষ্যে নিতান্ত ভোজসভার আলোচনাকে আন্দোলন হিসাবে আখ্যায়িত করলেও অনেক বড় বড় ঘটনাকে আন্দোলন বলে স্বীকার করেননি; সেগুলিকে তিনি Coup d'etat বা জবরদস্তিমূলকভাবে শাসন ক্ষমতা পরিবর্তন হিসাবে গণ্য করেছেন। এর কারণ যে কোন ঘটনা তা বড় কিংবা ছোট সেটা মূখ্য নয়, বরং আসল কথা হল ঘটনার পেছনে উদ্দেশ্যটি কি ছিল তাই। বিরাট ঘটনার পিছনে যদি মূল উদ্দেশ্য থাকে ক্ষমতার হাতবদল বা নিতান্ত অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব নিরসন, তাহলে তাকে আন্দোলন বলা যাবে না; আর ঘটনা যত ছোটই হোক, তার পেছনে যদি মূল উদ্দেশ্য থাকে বিদ্যমান সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন, তাহলে তাকেই বলা হবে আন্দোলন। অর্থাৎ মার্কসের মতে, বিদ্যমান সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তনের লক্ষ্যে জনমত গঠনের ছোট্ট সভা থেকে শুরু করে বিপ্লবী পরিবর্তন পর্যন্ত সংগ্রামের প্রতিটি পর্যায়ই আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত; বিপ্লব, অভ্যুত্থান বা সশস্ত্র সংগ্রাম তার বিভিন্ন পর্যায় মাত্র।

কার্ল মার্কসের মতে, শ্রেণীসমাজ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সমাজ প্রধান দুটিভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। শোষক আর শোষিত। শোষকশ্রেণী শোষিতদের ওপর জবরদস্তিমূলক নির্যাতন চাপিয়ে দিয়েছে, আর শোষিতশ্রেণী তার মুক্তির জন্য লড়াই করে চলেছে। এভাবেই শোষক আর শোষিতের মধ্যে চলছে অনবরত সংঘর্ষ। শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের মুক্তির লড়াইটাই হল আন্দোলন। মার্কসের মতে আন্দোলনের মূলরূপ হল শ্রেণীসংগ্রাম। মার্কসের কথায় উনিশ শতকে যে দুটি শ্রেণী মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল তাহল বুর্জোয়া শ্রেণী আর শ্রমিকশ্রেণী। সে সময়ে বিরাজমান অর্থনীতিই সমাজকে এই দু'ভাগে বিভক্ত করে ফেলে। বুর্জোয়া শ্রেণী তার শোষণমূলক আকাঙ্খা স্থায়ী করার লক্ষ্যে মৌল কাঠামো তথা, অর্থনীতি এবং উপরিকাঠামো তথা, সমগ্র সাংস্কৃতিক কাঠামোর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে আর শ্রমিকশ্রেণী তার অস্তিত্ব রক্ষা ও বিকাশের স্বার্থেই উক্ত মৌল কাঠামো ও উপরিকাঠামোর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। উক্ত দুটি শ্রেণীর মাঝে এটিই বিরোধের মূল কারণ। এ বিরোধই সমাজে প্রতিনিয়ত শ্রেণীসংগ্রামের জন্ম দিচ্ছে। বিকাশমান শ্রেণী হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীই আন্দোলনের প্রধান বাহকে পরিণত হয়েছে।

সমাজ বিজ্ঞানী সি. রাইট মিলস মার্কসের আন্দোলন সংক্রান্ত এ দৃষ্টিভঙ্গিকে সমালোচনা করেছেন। মিলস্ তার "The Marxist" নামক গ্রন্থে (১৯৬২) এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, কার্ল মার্কস আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে নিজের তৈরি ছকের বাইরে যেতে পারেননি,. সমাজ বিকাশের ঐতিহাসিক নিয়তি হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীই যে আন্দোলনের প্রধান বাহক, এই মতের সপক্ষে তিনি বিশ্লেষণ দাঁড় করিয়েছেন। মিলস্-এর মতে মার্কস আন্দোলনের ব্যাপারে বক্তব্য রাখতে গিয়েও নিজস্ব মতাদর্শের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন এবং শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকাকে সুস্পষ্ট করতে গিয়ে অপরাপর শ্রেণীর ভূমিকাকে উপেক্ষা করে গিয়েছেন। মিলস্ বলেছেন,

"Of significance is Marx's clear bias: I. classes are the carriers of movements; 2. class action is above fundamental economic processes and the things that flow from those processes; 3. movements must be analysed in Historical Materialist terms rather than idialist terms; and 4. the dialectical method is the correct method for looking at the socio-economic processes of the world."[১৮]

মিলস-এর এ অভিযোগ সত্য হলেও দোষনীয় নয়; কেননা, যে কোন ব্যক্তি তার নিজস্ব মতাদর্শ ও বিশ্বাসের ভিত্তিতেই কোন কিছুকে ব্যাখ্যা করে থাকেন-- তার বিশ্বাস ও মতাদর্শের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে, কিন্তু কোন মতাদর্শের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে দায়ী করা চলে না। অন্যদিকে, শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি মার্কসের যে পক্ষপাতিত্ব ছিল, তাও ভিত্তিহীন পক্ষপাতিত্ব ছিল না। উনিশ শতকের মাঝামাঝি ইউরোপকে যখন বুর্জোয়া শ্রেণী গ্রাস করে নিয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে বিশাল এক শ্রমিকশ্রেণী, তখন এই শ্রমিকশ্রেণী ছাড়া অন্য কারোরই কি কোন সম্ভাবনা ছিল? সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তনের আন্দোলনে, সম্ভাবনাময় শ্রেণী হিসাবে

---

১৩ ফ্রিডরিক এঙ্গেলস(১৯৮১): "শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক আন্দোলন প্রসংগে" 'মার্কস-এঙ্গেলস নির্বাচিত রচনাবলী', খন্ড ৬, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন।

১৪ মার্কস, কার্ল (-) "ফ্রান্সে শ্রেণীসংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০"; মার্কস-এঙ্গেলস রচনা সংকলন, প্রথম খন্ড, প্রথম অংশ, মস্কো। প্রগতি প্রকাশন, (প্রকাশ কালের উল্লেখ নেই), পৃ:১৫৬-৫৭)।

১৫ ঐ, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় অংশ, পৃ: ১৩৭-২২১।

১৬ ঐ, প্রথম খন্ড, প্রথম অংশ, পৃ: ১৩৭।

১৭ ঐ।

১৮ Mills,C. Wright (1962): The Marxists. New York: Dell Publishing co. Inc,p.12.

Dhaka University Institutional Repository

শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি এ পক্ষপাতিত্ব কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। আন্দোলন নিয়ে যাঁরা ভেবেছেন মার্কসের সমসাময়িক অপরাপর পন্ডিতগণও মার্কসের মতই শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিই বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন।

আন্দোলন বা সামাজিক আন্দোলনকে সর্বপ্রথম একটি প্রত্যয় হিসাবে বিজ্ঞানসম্মতভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন জার্মান ঐতিহাসিক লরেঞ্জ ভন স্টেইন। স্টেইন তাঁর বিখ্যাত "The History of the Social Movement in France: 1789-1850" নামক গ্রন্থে (১৮৫০) ফরাসী বিপ্লবের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণসমূহকে খুব নিবিড়ভাবে অনুসন্ধান করেন। এবং সেই সাথে ঐ বিপ্লবের পর থেকে ১৮৫০ সন পর্যন্ত ঘটে-যাওয়া বিভিন্ন আন্দোলনের অন্তর্নিহিত কারণগুলিকেও তিনি এ গ্রন্থে বিশ্লেষণ করেন। স্টেইন এই অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে দেখান যে, একটি সমাজের রাজনৈতিক পরিবর্তনের উপাদানসমূহ সে সমাজের মধ্যেই নিহিত থাকে। স্টেইন কার্ল মার্কসের মতই মনে করেনঃ প্রতিটি রাষ্ট্র ও সমাজের মাঝেই রয়েছে কিছু অমীমাংসিত বিরোধ। তাঁর মতে সমাজের অভ্যন্তরেই সামাজিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের বাস্তবতা রয়েছে। এই দ্বন্দ্ব-বিরোধের ফল হিসাবেই সমাজে বিচ্ছিন্নতা ও আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।[১৯] কোন ব্যক্তিই যে এ সংগ্রামের আওতা থেকে বাইরে থাকতে পারে না, সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে স্টেইন মন্তব্য করেন:

"Since life represents a constant struggle of the personal self-determining element with the non-personal and natural elements, the life of the human community is a permanent struggle between the state and society"[২০]

স্টেইন দেখিয়েছেন, ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে বিরোধের মূল উৎস হচ্ছে ব্যক্তিগত বৈষয়িক স্বার্থ; আর সাধারণ বৈষয়িক স্বার্থকে সামনে রেখেই শ্রেণীসমূহের মাঝে বিরোধ দানা বেঁধে ওঠে। বৈষয়িক স্বার্থের দিক দিয়ে বিপরীতমুখী শ্রেণীসমূহের মধ্যেকার অভ্যন্তরীণ বিরোধই সমাজ পরিবর্তনের চালিকাশক্তি বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। স্টেইন উনিশ শতকের ইউরোপের বিভিন্ন দেশের উদাহরণ দিয়ে দেখান যে, আজকের যুগের প্রতিটি সমাজের মূল বিরোধ হল সর্বহারাশ্রেণী এবং মালিক শ্রেণীর মধ্যেকার বিরোধ। এই দুটি শ্রেণীর মধ্যেকার বিরোধিতা সামাজিক আন্দোলন রূপে আত্মপ্রকাশ করে।[২১] স্টেইন দেখিয়েছেন, মালিক শ্রেণী যে অস্ত্র প্রয়োগ করে সর্বহারা বা শ্রমিকশ্রেণীর শোষণ বিরোধী অসন্তোষ ও বিক্ষোভকে ধামাচাপা দিয়ে রাখে, তাহলো-- অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা, যার মূর্ত রূপ হল রাষ্ট্র। এই অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর বিদ্রোহকেই স্টেইন নাম দিয়েছেন সামাজিক আন্দোলন।[২২] স্টেইনের মতে সামাজিক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই সমাজ সামনের দিকে অগ্রসর হয়। আর সে আন্দোলনের পেছনে মূল ভূমিকা রাখে বৈষয়িক স্বার্থ। এই বৈষয়িক স্বার্থের ভিত্তিতেই মানুষ পরস্পরের কাছাকাছি আসে, নতুন নতুন মেরুকরণ হয়, গড়ে ওঠে নতুন নতুন সামাজিক আন্দোলন, য়া বিদ্যমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ভেঙ্গে ফেলে সমাজকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।[২৩] পরিশেষে স্টেইন মন্তব্য করেন:

"Interest, which is the centre of all human interaction and therefore of all social motion, is the principle of society"[২৪]

সামাজিক আন্দোলন সম্পর্কিত ধারণার আর একজন প্রতিনিধি ওয়ার্নার সোমবার্ট। সোমবার্ট তার "Socialism and Social movement" নামক গ্রন্থে (১৯০৯) আন্দোলন সম্পর্কে মোটামুটি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সোমবার্ট, স্টেইনের মতই শ্রমিকশ্রেণীর ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আন্দোলন সম্পর্কে সোমবার্টের বক্তব্য কার্ল মার্কসের বক্তব্যের অনুরূপ। সোমবার্ট সামাজিক আন্দোলনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন-

"Social Movement is the conception of all the attempts at emancipation on the part of the proletariat."[২৫]

সোমবার্ট মার্কসের শ্রেণী-তত্ত্বের সাথে একমত প্রকাশ করে মন্তব্য করেন, বর্তমান যুগে বিদ্যমান সামাজিক সম্পর্ককে আমূল পরিবর্তন করার সংগ্রামে একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীই নেতৃত্ব দিতে পারে; তাই বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছ থেকে দাসত্বের শৃংখল ভাঙ্গার লক্ষ্যে শ্রমিকশ্রেণীর যে কোন প্রচেষ্টাই হলো সামাজিক আন্দোলন।[২৬]

সোমবার্ট ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশের উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন, শুধুমাত্র আর্থিক সমস্যার কারণে আন্দোলন গড়ে ওঠে তা নয়, বরং তা গড়ে-ওঠার পেছনে মূল ভূমিকা রাখে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-সচেতনতা। সোমবার্টের মতে আন্দোলন গড়ে-ওঠার গোপন রহস্য হল, শ্রমিকশ্রেণীর এ উপলব্ধিতে পৌঁছানো যে, জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে বাহ্যত পরস্পর বিরোধী দুটি শ্রেণীর মাঝে যে বৈষম্য রয়েছে, তা কোন প্রাকৃতিক কারণে নয়, কিংবা তা অপরিবর্তনীয় এমনও নয়; বরং বিদ্যমান বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দ্বারা উৎসারিত সামাজিক সংগঠনের নির্দিষ্ট রূপই হল এ অবস্থার জন্য দায়ী। সোমবার্ট বলেছেন:

"When we see the proletariat moving in order to emancipate itself,when we see that the movement is accompanied by feelings of hate, envy,or revolt, the cause of all this cannot be actual want."[২৭] তাহলে তারা কি কারণে বিদ্রোহ করে? সোমবার্ট বলেছেন:

---

১৯ Stein, Lorenz Von: (1964): The History of the Social Movement in France-1789-1850. Edited and translated by Dr.K. Mengelberg, New Jersery, Bedministers Press (First Published in 1850), pp: 49-51.
২০ Ibid,p.51.
২১ Ibid,p.53.
২২ bid,pp.53-54.
২৩ Ibid,pp.54-55.
২৪ Ibid, pp.55.
২৫ Sombert, Werner (1968): Socialism and the Social Movement, translated from the sixth(Enlarged) German Edition with Introduction and Notes by M. Epstein (1st German edition in 1909). New York: Tr.M. Kelley; Augustus Publishers, p.1.
২৬ Ibid,p.2.
২৭ Ibid,p.6.

Dhaka University Institutional Repository

"The secret reason in no other than this, that all the peculiarities of their life have their root not in any natural, unchangeable conditions, but in the special conditions of social organizations, in the peculiar form of the prevailing economic system."[২৮]

উপরোক্ত উপলব্ধির কারণেই সোমবার্ট প্রথম যে সংজ্ঞা দিয়ে সামাজিক আন্দোলনের আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন, পরবর্তী সময়ে তিনি আর তার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকতে পারেননি, তার বিবেচনাধীন তথ্যগুলি তাকে আরো কিছুদূর অগ্রসর করে নিয়ে গিয়েছে। তিনি অনুভব করেছেন, শ্রমিকশ্রেণী যদি শুধু তার ওপর বিরাজমান দাসত্ব বন্ধনকে ছিন্ন করার লক্ষ্যেই সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়, তাহলেই তাকে সামাজিক আন্দোলন বলা যাবে না। সামাজিক আন্দোলনের জন্য দাসত্ব বন্ধন ছিন্ন করার আকাঙ্ক্ষা পাশাপাশি শ্রেণী-সচেতনতাও থাকতে হবে। আর সে কারণেই সোমবার্ট তার পূর্বোক্ত সংজ্ঞার সাথে বাকি অংশটুকু যোগ করেছেনঃ

"....and to added, in so far as these attempts at emancipation are characterized by the proletarian spirit"[২৯]

তাহলে যে সমস্ত আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন অংশগ্রহণ ঘটে না, সেগুলিকে কি আন্দোলন হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না? শ্রমিকশ্রেণী ব্যতীত অন্য কোন শ্রেণীর নেতৃত্বে যদি কোন আন্দোলন গড়ে ওঠে, এমনকি, সে আন্দোলন যদি বিদ্যমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোকে পরিবর্তনের লক্ষ্য নিয়েও অনুষ্ঠিত হয়, তাহলেও কি তাকে সামজিক আন্দোলন বলা যাবে না? সোমবার্টের উত্তর হচ্ছে- না। সোমবার্ট অতীতকালের অসংখ্য বিদ্রোহ, এমনকি, উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের বিভিন্ন সংগ্রামগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, এগুলি মানব ইতিহাসের অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা। কিন্তু এগুলি সামাজিক আন্দোলন ছিল না। সোমবার্ট মত প্রকাশ করেছেন, পুঁজিবাদী সমাজের মতই সে সমস্ত এলাকায় একটি কর্তৃত্বকারী শ্রেণী সমস্ত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করতো; এমনকি, কোন কোন দেশে বর্তমান সময়ের মতই পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। শুধু তাই নয়, জনগণের এ সমস্ত আন্দোলনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যও ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও এগুলি শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন তথা, সামাজিক আন্দোলন ছিল না। অংশগ্রহণের দিক থেকে দেখলে এগুলি শ্রমিকশ্রেণীরও আন্দোলন ছিল বটে, কিন্তু লক্ষ্যাদর্শের দিক থেকে দেখলে সেখানে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির কোন প্রতিফলন ছিল না।[৩০] অর্থাৎ এ সমস্ত আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণীর অংশীদারিত্ব ছিল ঠিকই, কিন্তু এ সমস্ত আন্দোলনের লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছিল অন্যান্য শ্রেণীর স্বার্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে। মধ্য শ্রেণী তথা বিকাশমান বুর্জোয়া শ্রেণীই সেদিন এ আন্দোলনের লক্ষ্য নির্ধারণে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। আর শ্রমিকশ্রেণী সেদিন সবেমাত্র একটি শ্রেণী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে কিন্তু সচেতনতার দিক থেকে তখনও এটি ছিল অপরিণত একটি শ্রেণী, এ শ্রেণীর মাঝে আন্দোলনে অংশগ্রহণের কতগুলি সহজাত আকাঙ্ক্ষা ছিল কিন্তু তখনও এ আকাঙ্ক্ষাগুলি সুনির্দিষ্ট দাবির ওপর নিজেকে স্থাপন করতে পারেনি।[৩১] সোমবার্ট আঠারো ও উনিশ শতকের গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রামগুলির উদাহরণ টেনে মত প্রকাশ করেন, এ সমস্ত আন্দোলনে নিঃসন্দেহেই শ্রমিকশ্রেণীর অত্যন্ত বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, কিন্তু এ বীরত্ব ছিল মধ্যযুগীয় অভিজাতদের স্বার্থে যুদ্ধরত তীরন্দাজদের বীরত্বের মতই অর্থহীন। সোমবার্ট বলেনঃ

"The historical events in which the proletariat played a part, but which were not yet proletarian Movements, were the wellknown revolutions which occured in the years 1789,1793,1830 ,1832 and 1848. At bottom all these movements were middle-class movements, and their aim was to give political rights to the middle-classes. If we encounter proletarian elements in the ranks of those classes, we may regard them as being in the same position as the archers who fouhgt the battles of the mediaval nobles"[৩২]

উপরোক্ত বক্তব্যের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সোমবার্টের কাছে সামাজিক আন্দোলন বলতে মৌল অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনের সংগ্রাম বোঝায় না, বরং তার কাছে সামাজিক আন্দোলনের অর্থ শুধুমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর শৃংখল মুক্তির আন্দোলন তথা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন। সোমবার্ট সামাজিক আন্দোলনের সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর কথা উল্লেখ করলেও পরবর্তীকালে তাঁর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছিলেন, বর্তমান সমাজের মূল সামাজিক সম্পর্কটি হচ্ছে বুর্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যকার সম্পর্ক আর সে কারণেই মৌল সামাজিক সম্পর্ক পরিবর্তনের সংগ্রাম বলতে মূলতঃ শ্রমিকশ্রেণীর বন্ধন মুক্তির সংগ্রামকেই বোঝায়। সোমবার্টের এ ব্যাখ্যা থেকে কিন্তু মনে হয়, শ্রমিকশ্রেণীর প্রশ্নটা মূখ্য নয়, বরং মৌল সামাজিক সম্পর্কটি পরিবর্তনের প্রশ্নটি সামাজিক আন্দোলনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রমিকশ্রেণী এবং সামাজিক সম্পর্ক এ দুটি বিষয়কে এভাবে আলাদা করে দেখার প্রয়োজন পড়ছে এ কারণেই যে, সোমবার্ট নিজেই যে সমস্ত আন্দোলনের নামকরণ করেছেন (যেমন, (Movement of Middle-Class) সে সব আন্দোলন তার ব্যাখ্যা অনুযায়ীও তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক পরিবর্তনের লক্ষ্যে পরিচালিত আন্দোলন ছিল। এবং উক্ত মধ্যশ্রেণীই ছিল সেদিনকার বিরাজমান আর্থ-সামাজিক সম্পর্ক পরিবর্তনের সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবার জন্য সবচেয়ে যোগ্যতর শ্রেণী। তবে কেন এ সমস্ত আন্দোলনকে সামাজিক আন্দোলন বলা যাবে না?

স্টেইন ও সোমবার্ট-এর আলোচনা থেকে দেখা যায়, এরা দু'জনই সামাজিক আন্দোলন বলতে সমাজের আমূল পরিবর্তনের সংগ্রামকে বুঝিয়েছেন। আর সোমবার্ট তো শ্রমিকশ্রেণী ছাড়া আর কোন শ্রেণীর মাঝেই কোন সম্ভাবনা দেখতে পাননি। উনিশ শতকের ইউরোপের সমাজের দিকে লক্ষ্য রেখে যদি সামাজিক সম্পর্ক পরিবর্তনের সংগ্রামকে বিশ্লেষণ করতে যাওয়া হয়, তাহলে সোমবার্টের ধারণাকে অস্বীকার করা খুবই কঠিন কিন্তু শুধু ইউরোপই কোন বিষয়ের সর্বজনীন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য একমাত্র ক্ষেত্র হতে পারে না। কেননা এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকাসহ অন্যান্য অঞ্চলের দেশগুলিতেই বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ বাস করে। সব অঞ্চলের সমাজের সামাজিক সম্পর্ক পরিবর্তনের সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণী প্রধান শক্তি কিনা এবং শুধুমাত্র শ্রমিকশ্রেণীই নেতৃত্ব করার মত একমাত্র শ্রেণী কিনা, তা বিশ্লেষণ না করেই সোমবার্ট শ্রমিকশ্রেণীর ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। ফলে, বিনা দ্বিধায় সোমবার্টের বক্তব্য মেনে নেওয়া যায় না।

---

২৮ Ibid,p.8.
২৯ Ibid, p.9.
৩০ Ibid,p.131.
৩১ Ibid,p.131.
৩২ Ibid,pp:131-132.

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে, স্টেইন আন্দোলনকে দেখেছেন ইতিহাসের এক একটি ঘটনা হিসাবে আর সোমবার্ট আন্দোলনকে দেখেছেন একটি বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে; ফলে এদের কেউই আন্দোলনকে একটি প্রত্যয় হিসাবে বিবেচনা করেননি। যদিও সোমবার্ট আন্দোলনের সংজ্ঞা দিয়েছেন কিন্তু সে সংজ্ঞা খানিকটা সংকীর্ণ, কেননা শ্রমিকশ্রেণী ছাড়া আন্দোলনকারী শ্রেণী হিসাবে আর কোন শ্রেণীরই সেখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। স্থান, কাল, পাত্র ভেদে অন্যান্য শ্রেণী, এমনকি বুর্জোয়া শ্রেণীও আন্দোলনে অংশ নিতে পারে কিনা, কিংবা এমনকি নেতৃত্ব দিতে পারে কিনা– সে সম্পর্কে কোন আলোচনায় না গিয়েই সোমবার্ট শ্রমিকশ্রেণী ছাড়া বাকি সমস্ত শ্রেণীর সম্ভাবনাকে বাতিল করে দিয়েছেন।

সমাজ বিজ্ঞানী রুডল্‌ফ হেবার্ল (Rudolf Heberle) তাঁর Social movement– An Introduction to political sociology" গ্রন্থে (১৯৫১) সামাজিক আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। হেবার্লই প্রথম সামাজবিজ্ঞানী যিনি আন্দোলনকে একটি সামাজিক প্রত্যয় হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস গ্রহণ করেন। হেবার্ল মত প্রকাশ করেন যে, সামাজিক আন্দোলনকে নিবিড়ভাবে অনুসন্ধান করা সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্রদের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সামাজিক আন্দোলনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে হেবার্ল বলেন:

"The development of a Comparative, systemic theory of social movements with a more comprehensive system of sociology"[৩৩]

হেবার্লের মতে মানব সমাজের উত্থান–পতন, তার পরিবর্তন এবং অগ্রগতির ক্ষেত্রে সামাজিক আন্দোলনে রয়েছে একটি গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা। ফলে মানব সমাজকে বুঝতে গেলে, তার আন্দোলনসমূহকে নিবিড়ভাবে বোঝা প্রয়োজন। সমাজবিজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সামাজিক আন্দোলনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি আরো বলেনঃ

"Infact, it may be clamied that the study of social movements was one of the origins of sociology."[৩৪]

হেবার্ল সামাজিক আন্দোলনের অর্থকে পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখিয়েছেন, একটি সমাজের সামাজিক অস্থিরতার (unrest) মূল শিকড় তার মূল প্রতিষ্ঠানসমূহের মাঝে নিহিত থাকে। যখন একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে জনজীবনকে ধারণ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে, তখন তার পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে ওঠে। যখন মানব জীবনের পারস্পরিক সম্পর্কের বিদ্যমান রীতিটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন তা পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষায় মানুষের মাঝে এক ধরনের সামাজিক ঐক্যের তাগিদ অনুভূত হয়। সংগঠিত হবার এ তাগিদ জনসাধারণের মাঝে এক ধরনের সচেতনতা তৈরি করে, যা বিচ্ছিন্নভাবে হলেও বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ছোট ছোট বিদ্রোহ রূপে প্রকাশ পায়। এ সমস্ত ঘটনা অবশ্য নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্যকে সামনে রেখে সংগঠিত হয় না, অধিকাংশই কোন বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ আকারে দেখা দেয়। হেবার্ল সামাজিক অসন্তোষের এ রূপগুলিকে আন্দোলন হিসাবে বিবেচনা না করলেও সামাজিক আন্দোলন গড়ে–ওঠার কিছু পূর্বাভাস হিসাবে এ ঘটনাগুলিকে ব্যাখ্যা করেছেন।[৩৫] হেবার্লের মতে সচেতনভাবে বিদ্যমান সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে পরিবর্তনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে জনগণ যখন ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা গ্রহণ করে, তখনই তা সামাজিক আন্দোলন রূপে প্রকাশ পায়। হেবার্ল এ ব্যাপারটি পরিষ্কার করতে গিয়ে বলেছেনঃ

"The connotation in all these languages is that of a commotion, a stirring among the people, an unrest, a collective attempt to reach a visualized goal, especially a change in certain social institutions. Assuming that intention to change the patterns of human relations and social institutions is the essential characteristic of a social movement."[৩৬]

হেবার্ল সামাজিক ঝোঁক (trend) ও প্রবণতা (tendency) থেকেও সামাজিক আন্দোলনকে পৃথক করেছেন। তাঁর মতে, সমাজের বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিগত অথবা সাংগঠনিক উদ্যোগ ও কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে সমাজ পরিবর্তনের কিছু প্রবণতা সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু সেগুলিকে সামাজিক আন্দোলন বলা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, একজন বা কয়েকজন উদ্যোক্তা মিলে যখন একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে তখন, সেই সঙ্গে সে অসংখ্য শ্রমিকেরও সৃষ্টি করে। বাহ্যতঃ উদ্যোক্তাগণ এমন একটি শ্রেণী সৃষ্টি করলো, যারা বিদ্যমান সামাজিক সম্পর্ক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। হেবার্লের মতে উদ্যোক্তাদের কর্মকান্ড সমাজ পরিবর্তনে তথা সামাজিক সম্পর্কের সাথে সম্পর্কিত হয়। আবার নতুন একটি শ্রেণী সৃষ্টি করে, যারা অতীতের উৎপাদন সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন উৎপাদন সম্পর্ক, তথা নতুন সামাজিক সম্পর্কের সাথে সম্পর্কিত হয়। হেবার্লের মতে, উদ্যোক্তাদের এ উদ্যোগ মোটেই সামাজিক আন্দোলন নয়; কেননা, একটি নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ সমর্থন করে বলেই এ উদ্যোগ সফল হতে পেরেছে। হেবার্ল মত প্রকাশ করেছেন:

"Social movements are, of course, very inportant factors in producing tendencies or trends of social change, but not all social change is a result of that kind of concerted social action which we call social movement"[৩৭]

হেবার্ল রাজনৈতিক দল (Political party) ও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর (pressure group) কার্যকলাপ থেকেও আন্দোলনকে পার্থক্য করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, কতকগুলি লোকের সচেতন প্রচেষ্টায় গড়ে–ওঠা রাজনৈতিক দলের সুনির্দিষ্ট কতকগুলি কর্মসূচী থাকে এবং এই কর্মসূচীর প্রতি জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতেই দলটি কাজ করে। বাস্তবে কোন কোন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী সামাজিক পরিবর্তনের জন্য জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করতে পারে ঠিকই কিন্তু রাজনৈতিক দলের কর্মকান্ড বলতেই আন্দোলন বোঝায় না। ছাত্র সংগঠন, শ্রমিক ফেডারেশনসহ বিভিন্ন ধরনের চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর জন্যও এ কথাটি সত্য। হেবার্লের মতে বিভিন্ন গোষ্ঠী (group) সমন্বয়ে যে রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে তার কর্মসূচীতে অসংখ্য দাবির কথা বলা হলেও রাজনৈতিক দলগুলি একটি সুনির্দিষ্ট স্বার্থেরই প্রতিনিধিত্ব করে।[৩৮]

---

৩৩ Heverle, Rudolf (1951): <u>Social Movements-An Introduction to Political Sociology;</u> New York: Appleton-cuntury-crofts,Inc. p.2.
৩৪ Ibid,p.3.
৩৫ Ibid,pp:6-7.
৩৬ bid,p.6
৩৭ Ibid,p.8.
৩৮. Ibid,p.9.

Dhaka University Institutional Repository

হেবার্ল সামাজিক আন্দোলনে সংহতি সৃষ্টির জন্য কতক গঠনমূলক ধারণার (constitutive ideas) প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। এ সম্পর্কে হেবার্ল মত প্রকাশ করেন–

"Constitutive ideas are those ideas considered most essential to the movement. They form the basis of solidarity."[৩৯]

হেবার্লের মতে, এই গঠনমূলক ধারণাটি তিনটি প্রধান সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করে। এই সমস্যাগুলি হল "(1) the final goals or ends of the movement, (2) the ways and means by which the goal is to be attained, Tr. and (3) the reasons for the endeavors of the movement–– that is, the justification of the movement or its ... social philosophy"[৪০]

সামাজিক আন্দোলন গড়ে–ওঠার পিছনে যে গঠনমূলক ধারণার কথা হেবার্ল বলেছেন, তার মূলে রয়েছে শ্রেণী–চরিত্র সংক্রান্ত ধারণাটি। এ ধারণার দ্বারা নির্দিষ্ট শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহ, প্রভাবিত কিংবা উদ্বুদ্ধ হয়। অপরদিকে, অন্যান্য শ্রেণী কর্তৃক এ গঠনমূলক ধারণাটি প্রত্যাখ্যাত হয়। কিন্তু এ ধারণার মধ্য দিয়েই বিদ্যমান সমাজের অন্তঃসারশূন্যতা ফুঠে ওঠে এবং তার মধ্য দিয়েই এ সমাজ পরিবর্তন করে যে একটি নতুন সমাজ গড়ে তোলা প্রয়োজন, তার স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটে। হেবার্লের ভাষায়–

"the particular significance of an appeal to a certain social class or classes is now generally recognized ....social movements .....are therefore as a rule closely bound to certain social classes and opposed by other ....consequently the political and social ideas of an epoch or a society are an expression of the class structure and the state of economic development of that society."[৪১]

সামাজিক আন্দোলন গড়ে–ওঠার জন্য হেবার্ল সাংগঠনিক দিকের ওপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। হেবার্ল পরবর্তীকালে লিখিত এক প্রবন্ধে (১৯৬৮) দেখিয়েছেন যে, বিশ্বের প্রধান প্রধান সকল আন্দোলনের পিছনেই যেমন এক একটি বিশেষ গঠনমূলক ধারণার ভূমিকা রয়েছে, তেমনই সব আন্দোলন গড়ে–ওঠার ক্ষেত্রে সাংগঠনিক দিকেরও রয়েছে বিশেষ ভূমিকা। তিনি এ প্রবন্ধে স্পষ্ট করে বলেছেন যে, বিরাজমান সামাজিক সম্পর্ক নির্যাতিত জনসাধারণকে আন্দোলনের দিকে ঠেলে দেয় ঠিক, তবে, অতীতের প্রতিটি সফল আন্দোলনের পিছনেই একটি সাংগঠনিক কাঠামো বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। উপরন্তু, এ সকল আন্দোলনের প্রতিটিতেই অংশগ্রহণকারী সুনির্দিষ্ট কতকগুলি কর্মসূচীর ভিত্তিতে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল।[৪২]

হেবার্ল এভাবে আন্দোলনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে আন্দোলনকে পরিপূর্ণ একটি সামাজিক প্রত্যয় হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন। হেবার্লের পরে অসংখ্য সমাজবিজ্ঞানী আন্দোলনকে প্রত্যয় হিসাবে দেখে আরো অনেক আলোচনা কররেছেন, তবে আন্দোলন প্রত্যয়ের উৎস অনুসন্ধান করতে গেলে দেখা যাবে হেবার্লই প্রথম সমাজবিজ্ঞানী, যিনি একটি প্রত্যয় হিসাবে আন্দোলনকে দেখেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন এবং তত্ত্বায়ন করেছেন।

২.৪ঃ সামাজিক আন্দোলনের শ্রেণী বিভাগ (Types of Social Movement)

কোন সমাজের অন্তর্নিহিত মৌল সামাজিক সম্পর্ক বা মৌল নীতি থেকে উদ্ভুত কোন সমস্যাকে কেন্দ্র করে জনসাধারণের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদকেই যদি আন্দোলন হিসাবে চিহ্নিত করা যায়, তাহলে আন্দোলনের ধরনও হবে নানা রকম। কেননা যে কোন সমাজে মৌল সামাজিক সম্পর্ক বা মৌল নীতি থেকে উদ্ভুত নানা ধরনের সমস্যা থাকে। আবার এ সমস্যার প্রকৃতি নানা সমাজে নানা রকম। আন্দোলনকে সংজ্ঞায়িত করার সময় দেখা গেছে যে, আন্দোলন হচ্ছে গতানুগতিক সমাজের সামাজিক সম্পর্ক পরিবর্তনের বাহন। ফলে কোন্ সমাজে কি ধরনের সমস্যা রয়েছে তা দ্বারাই নির্ধারিত হয় সে সমাজের আন্দোলনের প্রকৃতি কি রকম হবে।

পূর্বোক্ত আন্দোলনের সংজ্ঞায় দেখা গেছে যে, আন্দোলনের জন্য তিনটি পূর্বশর্ত পূরণ হওয়া প্রয়োজন, যথাঃ (১) বিদ্যমান সামাজিক সম্পর্ক পরিবর্তনের সচেতন লক্ষ্য; (২) আন্দোলনের একটি সাংগঠনিক কাঠামো; এবং (৩) জনসাধারণের অংশগ্রহণ। অর্থাৎ সমগ্র ব্যাপারটি বাহ্যিকভাবে সংস্কৃতির অংশ কিন্তু তার মাঝেও থাকে বস্তুগত অবস্থা পরিবর্তনের প্রনোদনা। যেমন উইলিয়াম আন্দোলনের লক্ষ্য সম্পর্কে বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন–

"a whole way of life, material, intellectual and spiritual ....with historical tendencies."[৪৩] তেমনি আন্দোলনের উদ্দেশ্য থাকবে সমগ্র সাংস্কৃতিক কাঠামোকেই বদলে দেওয়া অর্থাৎ বৃহত্তর সামাজিক সম্পর্ককে পাল্টে দেবার জন্য প্রত্যক্ষ ইচ্ছা এবং উদ্যোগ– দুটিই থাকতে হবে আন্দোলনে।

ঐতিহাসিকভাবেই আন্দোলন একটি বহুমাত্রিক (Multidimensional) সামাজিক ঘটনা এবং তা বিভিন্ন সময় ও সমাজে বিভিন্নরূপ ধারণ করে। রুশ সমাজের আন্দোলনের ইতিহাসে যেমন দেখা গেছে: তিনটি ঐতিহাসিক কালপর্বে আন্দোলনের সাংগঠনিক কাঠামো, লক্ষ্য এবং আন্দোলনের বিন্যাস পরিকল্পনা পাল্টে গেছে। ১৯০৩ সাল থেকে ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রুশ শ্রমিকশ্রেণী সে সমাজের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, পেটি–বুর্জোয়া ও কৃষকের সাথে মৈত্রী করে জারতন্ত্রকে উৎখাতের আন্দোলন করেছে; ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারির পর থেকে শ্রমিকশ্রেণী শুধু গ্রামের দরিদ্র কৃষকের সাথে মৈত্রী করে কেরেনেস্কীর নেতৃত্বাধীন বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থাকে পরিবর্তনের আন্দোলন করেছে; এবং ১৯১৭ সালের নবেম্বরে যখন উক্ত লক্ষ্য সফল হয়, তার পর থেকে তাদের আন্দোলনের প্রকৃতি আবারও পাল্টে গিয়েছিল।[৪৪]

যাই হোক, আন্দোলনের শ্রেণী–বিভাগ নিয়ে সমাজ বিজ্ঞানিগণ প্রধান দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। স্থান, কাল, পাত্র ভেদে আন্দোলন বিভিন্ন রূপ নিতে পারে– এ প্রশ্নে কারো কোন দ্বিমত নেই; তবে তাদের মধ্যে দ্বিমতের ক্ষেত্র হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গিগত প্রশ্ন নিয়ে।

---

৩৯ Ibid,p.24.
৪০ Ibid,p.24.
৪১ Ibid,PP.14-15.
৪২ Heberle,Rudolf(1968): "Types and Functions of Social Movement". in international Encyclopaedia of Social Sciences , New York: Collier Macmillan, pp.438.
৪৩ Williams, Raymod (1961):Culture and Socitey, 1880-1950. Harmonds worth: Penguin Books,p.16.
৪৪ স্তালিন,জে,ভি,(১৩৮৯ বাং) লেনিনবাদের ভিত্তি, চলন্তিকা বইঘর, ঢাকা: পৃ:৮৫–৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

কার্ল মার্কস এবং তার অনুসারিগণ আন্দোলনের যে শ্রেণী-বিভাজন দাঁড় করিয়েছেন, সেখানে তাঁদের বিবেচনার মানদন্ড হচ্ছে শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি। অর্থাৎ কোন আন্দোলনে বিভিন্ন শ্রেণী কি ধরনের ভূমিকা পালন করছে, এ ভূমিকা তাদের সচেতন ভূমিকা কিনা, যে শ্রেণী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে সে শ্রেণীর স্বার্থের সাথে অপরাপর অংশগ্রহণকারী শ্রেণীর স্বার্থগত ঐক্য ও বিরোধ কতটুকু এবং এ সব ব্যাপারে অংশগ্রহণকারীদের সচেতনতার স্তর কোন পর্যায়ে--এসব কিছু বিবেচনার ভিত্তিতেই মার্কসবাদিগণ আন্দোলনের শ্রেণী-বিভাগ করে থাকেন। কার্ল মার্কসের মতে, সমস্ত আন্দোলনই শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক আন্দোলন তথা শ্রেণী-আন্দোলন। কেননা, উৎপাদিকাশক্তির বিকাশের অনিবার্য ফল হিসাবেই উৎপাদন-সম্পর্ক পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে ওঠে। আর তার থেকেই জন্ম নেয় বিভিন্ন ধরনের আন্দোলনের অনুপ্রেরণা।[৪৫]

কার্ল মার্কস 'ফ্রান্সে শ্রেণীসংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০'[৪৬] 'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার'[৪৭] কিংবা 'ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ'[৪৮] নামক তিনটি গ্রন্থে সামাজিক আন্দোলনের যে বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে দেখা যায়--আন্দোলন, যুদ্ধ কিংবা সংগ্রামের পিছনে মূল কারণ হচ্ছে শ্রেণীসমূহের অভ্যন্তরীণ বিরোধ। আর বিভিন্ন সমাজে শ্রেণীসমূহের মধ্যেকার বিরোধের প্রকৃতিগত বিভিন্নতার কারণেই আন্দোলনও বিভিন্নতর রূপ লাভ করে।

মার্কসবাদের বিপরীত ধারার গবেষকগণ মার্কসের এ বিশ্লেষণকে সমালোচনা করেন। সাম্প্রতিককালের গবেষক পল উইলকিনসনই হচ্ছে আন্দোলন সংক্রান্ত গবেষণার আধুনিকতম বুর্জোয়া প্রতিনিধি। তিনি মার্কসের শ্রেণীদৃষ্টিকোণ থেকে আন্দোলনের শ্রেণী-বিভাগ করার পদ্ধতিকে সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন-

"Marx's theory of class is singularly in adiquate for the historical analysis or typology of phenomena such as religious, nativistic, nationalist or intellectual movements"[৪৯] অর্থাৎ মার্কসের শ্রেণী-তত্ত্ব দিয়ে ধর্মীয়, আঞ্চলিক, জাতীয়তাবাদী ও বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনকে ব্যাখ্যা করা যায় না বলে উইলকিনসন দাবি করেছেন। যে ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হিসাবে উইলকিনসন মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গিকে সমালোচনা করেছেন তারও একটি ইতিহাস আছে। এ ইতিহাসের গোড়াপত্তন করেছিলেন গোষ্ঠী তত্ত্বের (group theory) জনক বেন্টলি (১৯০৮)। বেন্টলি (Bently) দাবি করেন, প্রতিটি গোষ্ঠীরই নিজস্ব গোষ্ঠীস্বার্থ আছে। একটি গোষ্ঠী নিজস্ব গোষ্ঠীস্বার্থ দ্বারাই তার অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের ধরে রাখে। আবার গোষ্ঠীস্বার্থকে পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে সমাজব্যবস্থার (Social System) মধ্যে অন্য এক বা একাধিক গোষ্ঠীর ওপর তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়।[৫০] বেন্টলি অবশ্য গণকর্মকান্ডের (Mass activity) ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির মাপকাঠিতে স্বতন্ত্র গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করেছেন।[৫১] তার মতে, কর্মকান্ডের প্রকৃতিগত ঐক্যের ভিত্তিতেই একেকটি গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। ফলে প্রতিটি গোষ্ঠীর মধ্যেই অন্য যে কোন গোষ্ঠীর ওপর প্রভাব বিস্তার করার প্রবণতা আছে। অন্যদিকে, অন্য যে কোন গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে আগত হুমকিকে প্রতিরোধ করার ইচ্ছাও কম-বেশি ক্ষমতা প্রতিটি গোষ্ঠীরই আছে। ফলে প্রতিটি গোষ্ঠীই চায়, অপরের ওপর নিজ প্রভাবকে চাপিয়ে দিতে। বেন্টলির ভাষায়ঃ

" the push and resistance between groups is the motor of political change, and that the state of a society at a given time is equivalent to 'the balance of the group ressures"[৫২] এভাবে একটি সমাজের ভারসাম্য টিকে থাকবে বলে বেন্টলি আশা প্রকাশ করেছেন।

বেন্টলির তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কারণ তিনি তাঁর রাজনৈতিক তত্ত্বের বিশ্লেষণে একটি সমাজকে পৃথিবী থেকে পৃথক করে দেখেছেন। বাইরের কোন প্রভাব যে সমাজের মধ্যে পড়তে পারে তা তিনি দেখতে পাননি। অন্যদিকে, কোন একটি সমাজের প্রতিটি গোষ্ঠীই যে অপরাপর গোষ্ঠীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবকে সহ্য করবে, তার কি নিশ্চয়তা আছে? আর স্বার্থই যখন গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রধান মাপকাঠি, তখন কোন একটি সমাজের অধিকাংশ মানুষের স্বার্থ একই রকম হওয়ার ফলে তাদের নিয়ে গড়ে-ওঠা গোষ্ঠীই হবে বৃহত্তর-- এতে আর আশ্চর্যের কি আছে। আবার বেশি অর্থের মালিকগণ, যাদের অর্থপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা আসে বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষের ওপর শোষণ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তাদের নিয়ে যদি একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী গড়ে ওঠে তাহলে এই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীটির সাথে বৃহৎ গোষ্ঠীটির মধ্যে কিভাবে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা হবে? এসবের কোন উল্লেখ করেননি বেন্টলি। আর দুটি গোষ্ঠীর স্বার্থ যদি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী হয়, তাহলেই বা কিভাবে ভারসাম্য রক্ষিত হবে তাও বেন্টলি বলেননি। তবে তিনি ক্ষমতার পালা-বদলের প্রক্রিয়ায় ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর ওপর ক্ষমতা-বহির্ভূত অন্যান্য গোষ্ঠীর স্বার্থগত কারণে যে চাপ সৃষ্টির কথা বলেছেন, সেটার সাথে আন্দোলনের সঙ্গতি রয়েছে। তবে তা মার্কসের শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বকে বাতিল কিংবা অতিক্রম করেনি, বরং তা অতিরিক্ত কিছু অস্পষ্টতা সৃষ্টি করেছে। বেন্টলির তত্ত্বে কিছু অস্পষ্টতা থাকলেও আমেরিকা ও পাশ্চাত্য সমাজে তত্ত্বটি নিয়ে পরবর্তীকালে প্রচুর গবেষণা হয়; তার সমর্থনে বেশ কয়েকজন তরুণ সমাজ বিজ্ঞানী তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেন। রবার্ট ডাহল (১৯৬৭) আমেরিকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমালোচনা করতে গিয়ে বেন্টলির তত্ত্বকে কাজে লাগান।[৫৩] লা পালমবারা (১৯৬৪) ইতালীর রাজনীতিতে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ওপর কাজ করতে গিয়ে বেন্টলির স্বার্থগোষ্ঠী (Interest group) প্রত্যয়টিকে ব্যবহার করেন।[৫৪] অবশ্য লা পালমবারার অভিমত হচ্ছে এই যে, স্বার্থ গোষ্ঠী প্রত্যয়টি রাজনৈতিক পরিবর্তনের বিশ্লেষণে তেমন কাজে লাগে না, বরং সংগঠন পরিচালনার কাজে এটা ভালভাবে ব্যবহার করা যায়। ফাইনার (১৯৫৮) অবশ্য স্বার্থ গোষ্ঠীর প্রত্যয়কে উপদলীয় জোট (Lobby) গঠন করার কাজে কিভাবে ব্যবহার করা যায়,

---

৪৫ মার্কস, কার্লঃ 'অর্থ শাস্ত্রের সমালোচনা গ্রন্থের ভূমিকা' মার্কস-এঙ্গেলস রচনা সংকলন, প্রথম খন্ড, প্রথম অংশ, মস্কোঃ প্রগতি প্রকাশন, তারিখের উল্লেখ নেই, পৃঃ২৫।
৪৬ মার্কস, কার্লঃ 'ফ্রান্সে শ্রেণী সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০' প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১০-১৩৫।
৪৭ মার্কস, কার্লঃ লুই বোনপার্টের আঠারই ব্রুমেয়ার' ঐ, পৃঃ২৩৬-৩৩৯।
৪৮ মার্কস, কার্লঃ 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ 'মার্কস-এঙ্গেলস রচনা-সংকলন', প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় অংশ", মস্কোঃপ্রগতি প্রকাশন, প্রকাশ তারিখ নেই, পৃঃ১৩৭-২১৫।
৪৯ Wilkinson Paul, op.cit.,p.47.
৫০ Bently Arthus F. (1908): The Process of Government. Chicago: University of Chicago Press. p.258.
৫১ Ibid, p.211.
৫২ Ibid,p.258-59.
৫৩ Dahl, Robert A. (1967): Pluralist Democarcy in the United States. Chicago: Rand McNally,
৫৪ Palombara, J.G.La (1964): Interest groups in Italian Politics. Princeton: Princeton, University Press. New Jersey

Dhaka University Institutional Repository

তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।[৫৫] স্টুয়ার্ট ইংলন্ডের সমাজে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ওপর কাজ করতে গিয়ে এ প্রত্যয়টি প্রয়োগ করেছেন।[৫৬] আলমন্ড ও কলম্যান নামক দুই রাষ্ট্র বিজ্ঞানী তাঁদের 'The Politics of Developing Areas"(1960) নামক গ্রন্থে কিছুটা যুক্তিগ্রাহ্য করে গোষ্ঠী প্রত্যয়টি ব্যবহার করেছেন। তাঁরা স্বার্থ কেন্দ্রিক গোষ্ঠীগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেনঃ

১. প্রাতিষ্ঠানিক (Institutional) 'গোষ্ঠী', (উদাহরণস্বরূপ, সামরিক কর্মকর্তাদের জোট, আমলাতন্ত্রের একটি অংশ ইত্যাদি);

২. অ-প্রাতিষ্ঠানিক (Non-institutional) গোষ্ঠী (উদাহরণস্বরূপ, জাতিগোষ্ঠী, উপজাতি অথবা অন্যান্য বিশেষ ধরনের গোষ্ঠী;

৩. নৈরাজ্যমূলক (Anomic) গোষ্ঠী (উদাহরণস্বরূপ, বিদ্রোহী গোষ্ঠী, বিপ্লবী বা প্রতিবাদকারী গোষ্ঠী; এবং

৪. সংঘবদ্ধ (Associational)গোষ্ঠী (যেমন, কর্মজীবীদের দরকষাকষিমূলক সংগঠন বা সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী (Associational Group) ট্রেড ইউনিয়ন।[৫৭]

এখানে বিভিন্ন গোত্র ও পেশার মানুষ যে বিভিন্নভাবে সংগঠিত তার একটি চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু আন্দোলনের শ্রেণী বিভাগ এর থেকে পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র নৈরাজ্যমূলক গোষ্ঠীর মধ্য দিয়ে তার একটি আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু সঠিক অর্থে সাংগঠনিক বিভাজন ছাড়া আর একে কিছু বলা যায় না।

পরবর্তীকালে স্বার্থগোষ্ঠী সংক্রান্ত প্রত্যয় ব্যবহারকারী বৃটিশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ক্যাসলেস (Francis Castles)-এর অসম্পূর্ণতা খানিকটা দূর করেছেন। ক্যাসলেস (১৯৬৭) আন্দোলনের শ্রেণী বিভাগের ক্ষেত্রে চাপগোষ্ঠী পদটিকে একটি ঢাল বা ছাতা হিসাবে ব্যবহার করেছেন। তিনি চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী(Pressure group) পদটিকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেছেন "any group attempting to bring about political change, whether through government activity or not, and which is not a political party in the sense of being represented, at that particular time, in the legislative body."[৫৮] এভাবে চাপ গোষ্ঠী (Pressure group) পদটিকে সংজ্ঞায়িত করলেও রাজনৈতিক পরিবর্তন বলতে ঠিক কি বুঝিয়েছেন তা তিনি কোথাও পরিষ্কার করেন নি। অবশ্য তিনি চাপ প্রয়োগ করে যে পরিবর্তনগুলি চেয়েছেন তা রাজনৈতিক পরিবর্তনের দিক থেকেও বিবেচনা করা যেতে পারে। তার মতে, চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে "to change the government, and indeed the form of government"[৫৯] বলে ক্যাসলেস "Pressre group" পদটিকে স্পষ্ট করার প্রয়াস পান এবং কি কি ধরনের চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হতে পারে এবং তাদের নেতৃত্বে কত রকম চাপ প্রয়োগ সম্ভব তার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ আলোচনার মধ্য দিয়ে আন্দোলনের বিভিন্ন স্বরূপ সম্পর্কে কিছু ধারণা পাওয়া যায় বটে, তবে 'Pressure group'কে আদতে আন্দোলন বলা যায় কিনা সে ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা যায়। কেননা আন্দোলন হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট ধরনের সামাজিক প্রপঞ্চ, তার একটি সাংগঠনিক, রাজনৈতিক এবং মতাদর্শগত দিক থাকে। কিন্তু সংগঠন, রাজনীতি কিংবা মতাদর্শ থাকলেই আন্দোলন হয় না। আর যেহেতু ক্যাসলেসের 'pressure group' তার সাংগঠনিক চরিত্রের সীমানা পেরিয়ে বের হতে পারেনি, তাই তার যত রূপই থাক না কেন তাকে আন্দোলনের বিভিন্ন প্রকৃতি হিসাবে বিবেচনা করা যায় না।

বেন্টলির (১৯০৮) তত্ত্ব নিয়ে সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকাতে যে উৎসাহ দেখা দিয়েছিল সেই তত্ত্বের পরবর্তী প্রায় ছয় দশকের বিকাশের পরও এর সুনির্দিষ্ট চরিত্র ফুটে ওঠেনি। কি কি রূপে একটি সমাজে রাজনৈতিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় সে সম্পর্কে বেন্টলি এবং তার উত্তরসূরিগণ একটি অস্পষ্ট চিত্র অংকন করেছেন বটে, কিন্তু এর জন্য এত উন্মাদনার কোন কারণ ঘটেনি। এ তত্ত্বের জয় জয়কারের মূল কারণ সম্ভবতঃ অন্য কোথাও অর্থাৎ আন্দোলন সম্পর্কিত মার্কসীয় তত্ত্বের বিপরীতে একটি বিকল্প তত্ত্ব সেদিন হাজির করেছিলেন বেন্টলি; আর তাই বুর্জোয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজতাত্ত্বিকদের কাছে এ বিরল সম্মান তিনি অর্জন করেছিলেন। তাঁর সমসাময়িককালে (১৯০৯) ওয়ার্নার সোমবার্ট একটি গবেষণাধর্মী গ্রন্থে (১৯৬৮) আন্দোলনের বিভিন্ন প্রকৃতি নিয়ে সারগর্ভ আলোচনা করেন অথচ সে ব্যাপারে এ তাত্ত্বিকগণ অনেক ক্ষেত্রে উল্লেখ পর্যন্ত করেননি।

সমাজ বিজ্ঞানী ওয়ার্নার সোমবার্ট ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বিশেষতঃ বৃটেন, ফ্রান্স ও জার্মানের আন্দোলনসমূহকে বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করেছেন। তার মতে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানে প্রধান তিন ধরনের আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে। তার মতে, প্রথম ধরনের আন্দোলনে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকে না। ইউনিয়ন ও সমবায় সমিতির মধ্য দিয়ে এ ধরনের আন্দোলনের সাংগঠনিক ভিত্তি রচিত হয়। দ্বিতীয় ধরনের আন্দোলন সংঘটিত হয় অতীত বিপ্লবী উদ্দীপনা থেকে। অতীত আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকেই আসে এ আন্দোলনের মূল অনুপ্রেরণা। আর তৃতীয় ধরনের আন্দোলন মূলতঃ কার্ল মার্কসের মতাদর্শ দ্বারা উৎসাহিত হয়ে সংগঠিত হয়। এ আন্দোলনে আইনগত, পার্লামেন্টারী কিংবা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহারযোগ্য সমস্ত পদ্ধতিই ব্যবহার করা হয়। সোমবার্ট বলেছেন-

"We shall find that there were three such, each distinct from the other the English, the French and the German type.

The first had no political or socialist aim, it was distinguished by the formation of trade-unions and co-operative societies; in the second, the old revolutionary spirit sought to realize itself a new; and the last type was that of a labour movement in the spirit of Marx, adopting legal, parliamentary and political methods."[৬০]

সোমবার্ট তাঁর প্রথম ধরনের আন্দোলনকে কোন নামকরণ না করে English Type আন্দোলন হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে আঠারো শতকের প্রথম দিকে ইংল্যাণ্ডের ধনবাদী ব্যবস্থা একটি ব্যাপক ভিত্তির ওপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে; অপ্রতিরোধ্য

---

৫৫ Finar,S.E. (1958): Anonyonous Empire,London: Pall Mall Press.
৫৬ Stewart, J.D. (1958): British Pressure groups, London: Oxford University Press.
৫৭ Almond, G. and J. Colemen (1960): The Politics of Developing Areas Princeton: Princeton University Press, Chapter-1.
৫৮ Castles, Francis G. (1967): Pressure Groups and Political culture: A comparative study,London: Routledge and Kegan Paul,P.1.
৫৯ bid,p. 2.
৬০ Werner, Sombert,op.cit,p.145.

Dhaka University Institutional Repository

গতিতে যখন তার সম্প্রসারণ ঘটাতে থাকে তখন সেখানে একটি বৃহৎ শ্রমিকশ্রেণীর জন্ম হয়। ব্রিটেনের বুর্জোয়া শ্রেণী সে সময় বিপুল সমৃদ্ধির মুখ দেখলেও বিশাল শ্রমিকশ্রেণী একেবারে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হয়। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের কোন পথ তাদের জানা ছিল না। তাদের বিশেষ কোন মতাদর্শও ছিল না, সেই নিপীড়নমূলক অবস্থাকে পরিবর্তন করে কি ধরনের সমাজ তারা চায় সে ব্যাপারেও তাদের মধ্যে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা এর পরিবর্তন চেয়েছিল। এই পরিবর্তনের আশায় ব্রিটেনের শ্রমিক শ্রেণী ব্যাপকভাবে বিদ্রোহ শুরু করে। আঠারো শতকের তিরিশ ও চল্লিশের দশক জুড়ে চলেছিল ব্রিটিশের শ্রমিকশ্রেণীর এ গৌরবোজ্জ্বল আন্দোলন। ইতিহাসে ব্রিটেনের শ্রমিকদের এ গৌরবোজ্জ্বল আন্দোলনই ঐতিহাসিক চার্টিস্ট মুভমেন্ট হিসাবে পরিচিত।[৬১] এ আন্দোলন সম্পর্কে সোমবার্ট বলেন–

"The proletariat had no longer the desire for political strife, and had lost its faith in a state of things which might be an improvement on that offered by the capitalist system."[৬২]

দ্বিতীয় ধরনের আন্দোলনকে সোমবার্ট "French Type" আন্দোলন বলেছেন। সোমবার্টের মতে, এ আন্দোলনের মূল বৈশিষ্ট্য হল অতীতের বিপ্লবী ঐতিহ্য দ্বারা প্রতিমূহূর্তে আন্দোলিত হওয়া। এ ধরনের আন্দোলনে সব সময় অস্থিরতা থাকে। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারিগণ এবং তার নেতৃবৃন্দ প্রচন্ড সক্রিয়তা আর গতিশীলতার প্রতি দারুণ বিশ্বাসী। তারা অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী, সব ধরনের পরিস্থিতির জন্যই তারা তৈরী থাকে। সাধারণ নির্বাচনকেও যেমন তারা খুবই আগ্রহের সাথে গ্রহণ করে, আবার নির্বাচনের পরদিনই তারা অস্ত্র হাতে বের হতে কসূর করে না[৬৩] কিন্তু তা সত্ত্বেও এই আন্দোলনের পিছনে পরিকল্পিত কোন লক্ষ্য থাকে না। একটি উদ্দেশ্যে আন্দোলন করে সফল হল তো কালই আর একটি উদ্দেশ্যে নতুন ধরনের এবং নতুন কায়দায় আন্দোলন শুরু করে দেয়। সোমবাট এ ধরনের আন্দোলন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেনঃ

"We may say its chief feature is its nervousness. It has been bubbling and boiling continuously ever since the "glorious" Revolution. Parties arise and fall to pieces, first one policy is adopted, and then another; one day it is the struggle for political power, the next, this policy is succuded by bloody street fights, or by conspiracies and assassinations."[৬৪] ফলে এ ধরনের আন্দোলনের অন্যতম একটি দিক হচ্ছে ব্যাপকতম সন্ত্রাস এবং নৈরাজ্য।[৬৫]

সোমবার্টের তৃতীয় ধরনের আন্দোলন সুস্পষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য দ্বারা পরিচালিত। সোমবার্টের মতে এ আন্দোলন কোন ধরনের সন্ত্রাসমূলক কর্মকান্ডকে অনুমোদন করে না। সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য ও কর্মসূচীকে সামনে রেখে এ আন্দোলন অগ্রসর হয়। আন্দোলনগুলিরও থাকে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক দাবি। নিছক অর্থনীতিবাদী দাবি-দাওয়ার মাঝে তা আটকে থাকে না। এ আন্দোলনের মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্ক পরিবর্তনের সংগ্রামের মূল রূপ হল পার্লামেন্টারী পথ। সোমবার্টের মতে, কোন বিপ্লবী কর্মকান্ডকে এ আন্দোলনের মধ্যে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। অবশ্য সোমবার্ট মনে করেন, এ আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলঃ মার্কসবাদী মতাদর্শ দ্বারা এ আন্দোলনের অধিকাংশ সংগ্রামী কর্মকান্ডগুলি এমন কি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনগুলিও পরিচালিত হয়। সোমবার্টের মতে, এ ধরনের আন্দোলনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল জার্মানীর আন্দোলনগুলি। সোমবার্ট উনিশ শতকের জার্মানীর আন্দোলনগুলি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন–

"In Germany the Social Movement is distinguished by its prevailingly political character, and this finds expression in the tardy recognition of the trade-union and the co-operative movements as equally important factors; it is marked by its anti-revolutionary and strictly parliamentary tactics, and its chief characteristic is its complete absorption of the Marxian ideas."[৬৬]

সোমবার্ট যে তিন ধরনের আন্দোলনের বর্ণনা দিয়েছেন, তাকে প্রধান দুটি ধারায় বিভক্ত করা চলে। একটি হল শোষণ-নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তির আকাংখাকে সামনে রেখে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন, এর লক্ষ্য সম্পর্কে কোন স্পষ্টতা থাকে না। অত্যাচার-নির্যাতনের প্রতিবাদে স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে এর প্রকাশ ঘটে। প্রতিবাদ বা বিদ্রোহের রূপ বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রকম হতে পারে। তবে এ আন্দোলন গড়ে-ওঠার মূল কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক শোষণ; এখানে কোন মতাদর্শ কাজ করে না কিংবা আন্দোলনের ফলাফল সম্পর্কেও আন্দোলনকারীদের কোন স্পষ্ট ধারণা থাকে না। আঠারো ও উনিশ শতকের ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের আন্দোলনসমূহকে এই শ্রেণীতে ফেলা যেতে পারে। কেননা আঠারো ও উনিশ শতকের ফ্রান্সের আন্দোলনগুলিকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় একমাত্র ১৮৭১ সালের ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ ছাড়া অতীতের কোন আন্দোলনেরই সুনির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা, লক্ষ্য কিংবা সুনির্দিষ্ট কোন কর্মসূচী ছিল না। এ সকল আন্দোলনের পিছনে সুস্পষ্ট কোন সাংগঠনিক পরিকল্পনাও ছিল না। ১৮৭১ সালের গৃহযুদ্ধ আন্দোলনের এ ধারাকে পরিবর্তিত করে দেয়।[৬৭] ফলে, ফ্রান্সের আন্দোলনগুলিকে আলাদা কোন ধারা হিসাবে না ধরে ইংল্যান্ডে যে শ্রেণীর আন্দালন গড়ে উঠেছিল, সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা অধিকতর যুক্তিসংগত।

সোমবার্ট আন্দোলনের যে অন্য একটি ধারার কথা বলেছেন সেটি হল সচেতন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে সংঘটিত আন্দোলন যার একটি কর্মসূচী, একটি সাংগঠনিক পরিকল্পনা এবং একটি স্পষ্ট লক্ষ্য থাকে। তবে সোমবার্ট যেমন এই ধারার আন্দোলনকে শুধুমাত্র আইনগত গন্ডির মধ্যে, তথা পার্লামেন্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছেন, তা যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যে আন্দোলনগুলি অনুষ্ঠিত হয় তা যে সব সময় আইনগত কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। শাসকশ্রেণীর মনোভাব, নির্যাতনের রূপ এবং জনসাধারণের মধ্যকার সংকটের অবস্থা ইত্যাদি কারণে সে আন্দোলনের

---

৬১ Ibid,p.145.
৬২ Ibid,p.145.
৬৩ Ibid,pp. 156-57..
৬৪ Ibid,P.156.
৬৫ Ibid,p.162.
৬৬ Ibid,p.165.
৬৭ Ibid,p.157.

Dhaka University Institutional Repository

রূপ নির্ধারিত হয়। রাশিয়াতে সচেতন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে উনিশ শতকের যে রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল, তা ১৯১৭ সালে এসে সফল হয় কিন্তু তার মাঝে অনেক চড়াই-উৎরাই তাকে পার হতে হয়। কখনও আইনগত পথ, কখনও বেআইনী পথ, আবার কখনও আইনী ও বেআইনী পথের সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে এ আন্দোলন অগ্রসর হয়েছে।

সোমবার্টের বক্তব্যের অন্য দুর্বলতা হচ্ছে আন্দোলনে, বিশেষতঃ সচেতনভাবে সংগঠিত আন্দোলনের ব্যাখ্যাতেও তিনি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থান ও মেরুকরণ সম্পর্কে কোন পরিষ্কার ধারণা দিতে পারেননি। অন্যদিকে, একমাত্র শ্রমিকশ্রেণী ছাড়া আর কোন শ্রেণী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে পারে কিনা সে সম্পর্কে তিনি কোন মতামত ব্যক্ত করেননি। তাছাড়া, শাসকশ্রেণীর অত্যাচার-নির্যাতনমূলক নীতির মাঝে যে বিচিত্র ধরনের শ্রেণীস্বার্থের প্রকাশ ঘটে, সে সম্পর্কে তিনি তেমন কিছু আলোচনা করেননি; এমনকি শাসকশ্রেণীর মধ্যেও যে বিভিন্ন ধরনের শ্রেণীস্বার্থের প্রতিফলন ঘটতে পারে তারও কোন স্পষ্ট নির্দেশনা তিনি দেননি।

আন্দোলন সংক্রান্ত সোমবার্টের শ্রেণী-বিভাগের আরও সীমাবদ্ধতা হল এই যে, একটি অনুন্নত জাতি যখন বাইরের অন্য কোন শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং ঔপনিবেশিক শোষণের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয় তখন কি ধরনের আন্দোলন গড়ে ওঠে, সে সম্পর্কে তিনি কিছুই বলেননি। অবশ্য, তিনি যেভাবে আন্দোলনকে দেখেছেন এবং বিভিন্ন ধরনের আন্দোলনকে তিনি যে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন, সে ছকের মধ্যে রেখেই জাতীয় মুক্তির আন্দোলনকেও ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তবে প্রকৃতিগত দিক থেকে জাতীয় মুক্তির আন্দোলন, বিশেষতঃ তার শ্রেণী বিন্যাস, অবশ্যই অন্যান্য আন্দোলন থেকে পৃথক। কেননা একটি জাতি যখন সামগ্রিকভাবে আক্রান্ত হয়, তখন সমাজের সমস্ত শ্রেণীই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে অন্যান্য আন্দোলন থেকে জাতীয় মুক্তির আন্দোলনে যে কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকবে তা অনস্বীকার্য। এ ছাড়া, বিভিন্ন সমাজে কতিপয় ব্যক্তির সমন্বয়ে গড়ে-ওঠা ছোট্ট একটি গোষ্ঠী যখন ক্ষমতাসীন হয়ে ওঠে জনসাধারণের ওপর স্বেচ্ছাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করে, ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থে যে কোন ধরনের প্রতিবাদকেও নির্মমভাবে দমন করে সে ধরনের শক্তির বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে সে সম্পর্কে তিনি কিছু বলেননি।

পল উইলকিনসন এভাবে আন্দোলনের ধরনকে মোটা দাগে বিভক্ত করার বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে, আন্দোলনের শ্রেণী-বিভাগ করতে হবে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে, যাতে কোন সংশয় কিংবা অস্পষ্টতা না থাকে। আন্দোলনের শ্রেণী-বিভাগের মধ্য দিয়ে যেনো তার প্রতিটি প্রকৃতির আদর্শ নমুনা (Ideal type) গড়ে ওঠে। উইলকিনসন এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেনঃ "It is most unlikely that any particular social movement can be accurately categorized in terms of only one ideal type."[৬৮] উদাহরণ হিসাবে তিনি বলেছেন, আমেরিকাতে মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে যে 'সিভিল রাইট মুভমেন্ট' হয়েছিল সে আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে নির্দিষ্ট কোন আন্দোলন সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা পাওয়া যায় না, কেননা সে আন্দোলন ছিল একই সাথে নৈতিক ক্রুসেড, সংস্কার আন্দোলন ও ধর্মান্দোলন; আবার একই সাথে তা ছিল বর্ণবৈষম্য বিরোধী এক ব্যাপক প্রচারণামূলক আন্দোলন। উপরন্তু, উইলকিনসন মনে করেন, আন্দোলনের প্রতিটি প্রকৃতির মাঝেই থাকে তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন সাংগঠনিক কাঠামো। উদাহরণ হিসাবে তিনি দেখিয়েছেন, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, শ্রেণী-আন্দোলন, সংস্কার আন্দোলন কিংবা বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য যে সাংগঠনিক কাঠামোটি থাকার প্রয়োজন হয় তা শুধুমাত্র পরিপূর্ণ একটি রাজনৈতিক দলের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায় না, চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, ট্রেড ইউনিয়ন, যুব সংগঠন, মহিলা সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠন কিংবা এরকম বিভিন্ন ধরনের সংগঠনের মধ্য দিয়েও তা প্রকাশ পায়।[৬৯] এই প্রধান দুটি দিক বিবেচনা করে উইলকিনসন আন্দোলনকে যে মোট ১০টি শ্রেণীতে (Type) বিভক্ত করেন, সে সব নিম্নে দেওয়া হলঃ

১. ধর্মীয়, ঐতিহ্যবাদী বা সাম্প্রদায়িক আন্দোলন;
২. শহর ও গ্রামের অসন্তোষমূলক আন্দোলন;
৩. আঞ্চলিকতাবাদী, জাতীয়তাবাদী বা বর্ণবৈষম্যবাদী আন্দোলন;
৪. স্বাজাত্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী আন্দোলন;
৫. শ্রেণী ও পেশাগত আন্দোলন;
৬. নৈতিক অবক্ষয় বিরোধী ও সংস্কার আন্দোলন;
৭. বিপ্লবী, প্রতিবিপ্লবী ও প্রতিরোধ আন্দোলন;
৮. বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন;
৯. যুব আন্দোলন; এবং
১০. নারী আন্দোলন।[৭০]

উইলকিনসন উল্লিখিত প্রথম ধরনের আন্দোলনের মূল চরিত্র হচ্ছে ব্যক্তির ওপর ঐশ্বরিক শক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা।[৭১] অর্থাৎ সামাজিক সম্পর্ক বা সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের কোন ব্যাপার এখানে নেই। ফলে উইলকিনসনের প্রথম আন্দোলনকে আন্দোলন হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। শুধু প্রথম ধরনটিই নয়, তার বর্ণিত দশ ধরনের আন্দোলনের মধ্যে কয়েকটিকে মোটেই আন্দোলন হিসাবে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। উপরন্তু, তিনি আন্দোলনের প্রকৃতির যে দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করেছেন, তার মধ্যে কয়েকটি তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিদ্যমান থাকতে পারবে না। একে একে যদি এগুলিকে বিবেচনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, উইলকিনসন ইতিপূর্বে আয়োজিত গোষ্ঠী তত্ত্বের মাঝেই ঘুরপাক খাচ্ছেন এবং তিনি যেভাবে গোষ্ঠী তত্ত্বকে প্রয়োগ করেছেন তারও কোন যৌক্তিকতা নেই।

উইলকিনসন নগর ও গ্রামের সকল মানুষকে একই স্বার্থ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। নগর অথবা গ্রামের সকল মানুষের হয়ত বা একটি সাধারণ স্বার্থ আছে, কিন্তু তা দৈনন্দিন জীবনের সমস্যার তুলনায় এত ক্ষুদ্র যে, অন্য সমস্ত কিছুকে বাদ রেখে এই ইস্যুতে যথার্থ কোন আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে না, বিশেষতঃ যদি তাকে সামাজিক সম্পর্ক পরিবর্তনের কোন প্রচেষ্টা হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

---

৬৮ Wilkinson, Paul op.cit,p.51.
৬৯ Ibid,p.51.
৭০ Ibid,pp.51-52.
৭১ bid,p.55.

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনের সংজ্ঞা আলোচনায় দেখা গেছে এর পিছনে একটি ইতিবাচক পরিবর্তনের আকাংখা কাজ করে। সে দিক থেকে যদি সাম্রাজ্যবাদী বা স্বাজাত্যবাদী আন্দোলনকে বিবেচনা করা যায় তাহলে একে কোনভাবেই আন্দোলন হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না। কেননা সাম্রাজ্যবাদী আন্দোলন শব্দটির মধ্য দিয়ে একটি জাত্যাভিমানী শক্তির পরদেশ গ্রাস করার প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ পায়।

উইলকিনসন আন্দোলনের শ্রেণী-বিভাগ করার আগে আদর্শ নমুনা হিসাবে প্রতিটি প্রকৃতির আন্দোলনকে শ্রেণী-বিভক্ত করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু তিনি তা এ পর্যায়ে রাখতে পারেননি। কেননা, নৈতিকতার অবক্ষয় শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়; কেননা, তা ধর্মীয় নৈতিকতা হতে পারে, সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক নৈতিকতা হতে পারে।আর যে নৈতিকতা সংস্কার আন্দোলনের সাথে যুক্ত তা ধর্ম আন্দোলন থেকে পৃথক নয়, কেননা নৈতিক সংস্কার আন্দোলন বলতে সাধারণতঃ ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনকেই বোঝায়।

উইলকিনসন বিপ্লবী আন্দোলন, প্রতিরোধ আন্দোলন এবং প্রতিবিপ্লবী আন্দোলনকে একই শ্রেণীর আন্দোলন হিসাবে দেখেছেন কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেননি প্রতিবিপ্লবী আন্দোলনকে আদতে কোন আন্দোলন হিসাবে বিবেচনা করা যায় কিনা। অন্য দিকে, প্রতিরোধ আন্দোলন বলতে তিনি যা বুঝিয়েছেন তা পরিষ্কার নয়। কেননা প্রতিরোধ বিভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে। আর তিনি যদি বোঝান এই তিন ধরনের আন্দোলনের সাধারণ দিক হল সশস্ত্র যুদ্ধ তাহলে তাতো আর আন্দোলনের শ্রেণী বিভাজন হল না, তা থেকে আন্দোলনের রূপ (form) সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া গেল যা আন্দোলনের শ্রেণী (type) বিভাজন অপেক্ষা আন্দোলনের পর্যায়ের সাথে অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ।

বুদ্ধিজীবী, যুব ও মহিলাদের আন্দোলনকে আলাদা আলাদা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে এবং শ্রেণী ও পেশাজীবীদের আন্দোলন থেকেও তা পৃথক করা হয়েছে, অথচ তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মাঝে পার্থক্য কোথায় তা বলা হয়নি। অন্যদিকে, বুদ্ধিজীবী, যুবক, মহিলা বা অন্য কোন শ্রেণী বা পেশার প্রতিটি লোকই সমাজের একজন সদস্য এবং তারা সমাজে হাজারো ধরনের স্বতন্ত্র স্বার্থ এবং পেশার সাথে যুক্ত থাকে। ফলে বিভিন্ন ধরনের স্বতন্ত্র স্বার্থকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদ বা বিক্ষোভের প্রয়োজন হতে পারে বা তা নয় কিন্তু সমাজের মৌল সামাজিক সম্পর্ককে পরিবর্তন করতে পারে বা প্রভাবিত করতে পারে কিংবা সব সময় এমন ধরনের কোন উদ্দেশ্য এগুলির পিছনেই যে থাকে, তা বলা যায় না। কেননা, সমাজে এমন অনেক স্বার্থেরই অস্তিত্ব আছে, যা সমাজের সাধারণ স্বার্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অন্যদিকে, বুদ্ধিজীবী, যুবক বা মহিলাগণ কখন কোন ইস্যু নিয়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করছে, তার ওপরই নির্ভর করে আদৌ সেই আন্দোলনকে উক্ত নির্দিষ্ট পেশা বা স্তরের মানুষের নিজস্ব আন্দোলন বলা যায় কিনা। কেননা, যুবক বা বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলনও যদি সমাজের সামগ্রিক পরিবর্তনের আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে যায়, তাহলে আর তাকে পেশাগত আন্দোলনের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। কারণ, তখন তারা শুধু নিজস্ব পেশাগত দাবির কথা বলে না, সমগ্র সমাজের জন্য দাবি তোলে।

এতসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের আন্দোলন তা তিনি বেশ স্পষ্ট করে বলেছেন। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিতে যে জাতীয় জাগরণ ঘটেছিল তার মধ্য দিয়েই জন্ম নেয় আধুনিক জাতীয়তাবাদ।[৭২] কিন্তু এ জাতীয়তাবাদের জন্মদাতা হল তৎকালীন উদীয়মান মধ্যশ্রেণী; যে জাতীয়তাবাদের ধারক, বাহক এবং প্রচারক ছিল এই মধ্যশ্রেণী তথা বুর্জোয়ারা। আর জাতীয় জাগরণের নামে যা কিছু বিকশিত হয়েছিল তার সব কিছুরই মালিকে পরিণত হয়েছিল এই বুর্জোয়া শ্রেণী।[৭৩] ফলে সে জাতীয়তাবাদ দেশের সকল মানুষের কথা বলে নিজের অগ্রযাত্রা শুরু করলেও, তা বুর্জোয়া শ্রেণীর মতাদর্শ হিসাবেই কাজ করে। কিন্তু সেই জাতীয়তাবাদই পরবর্তীকালে তথা বিংশশতাব্দীতে এসে এমনকি তার আগে থেকেই ঔপনিবেশিকতাবাদ-বিরোধী আন্দোলনের মতাদর্শগত হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। উইলকিনসনও বিষয়টি এড়িয়ে যাননি।[৭৪] তবে জাতীয়তাবাদ যে আজ তৃতীয় বিশ্বের নির্যাতিত জনগণের জাতীয়মুক্তি আন্দোলনের মতাদর্শে পরিণত হয়েছে- এ কারণে যে উইলকিনসন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের আন্দোলন হিসাবে বিবেচনা করেছেন তা নয়।

সোমবার্ট এবং উইলকিনসন যেভাবে আন্দোলনের আলোচনাকে স্ব স্ব সংকীর্ণ অবস্থান থেকে আলোচনা করেছেন, তাতে তাদের উভয়ের ক্ষেত্রেই কিছু অনিবার্য সীমাবদ্ধতা থেকে গেছে। সোমবার্টের আলোচনাতে দেখা যায়, সেখানে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কোন স্থান নেই। বিভিন্ন শ্রেণী তাদের বিকাশের প্রতিবন্ধকতাকে যৌথভাবে কিংবা যুগপৎ আন্দোলনের মাধ্যমে আঘাত হানতে পারে কিনা সে ব্যাপারেও তিনি কোন স্পষ্ট ধারণা দিতে পারেননি। জাতীয় প্রশ্ন এবং শ্রেণী প্রশ্নের মধ্যে আদৌ কোন ঐক্য আছে কিনা সে প্রশ্নটিও তিনি আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেননি। অন্যদিকে, উইলকিনসন আন্দোলনের বিভিন্ন প্রকৃতিকে ১০টি ভাগে ভাগ করতে গিয়ে শ্রেণীর প্রশ্নটি একেবারেই এড়িয়ে গেছেন। শতাব্দীর গোড়াতে বেন্টলি যে গোষ্ঠীতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেন, উইলকিনসন সেই তত্ত্বের মধ্যেই ঘুরপাক খেয়েছেন। এ ব্যাপারে হার্বার্ট ব্লুমার কিছুটা ব্যতিক্রম। ব্লুমার যদিও শ্রেণী প্রশ্নটিকে প্রত্যক্ষভাবে তার আলোচনার মধ্যে টেনে আনেননি কিন্তু তিনি যেভাবে তার সমগ্র আলোচনাকে বিন্যস্ত করেছেন তাতে শ্রেণী প্রশ্নটি আর উহ্য থাকেনি। একই সাথে জাতীয় প্রশ্নটিও সমভাবে গুরুত্ব পেয়েছে তাঁর আলোচনাতে।

সমাজ বিজ্ঞানী হার্বার্ট ব্লুমার (Herbert Blumer) তাঁর আন্দোলন সংক্রান্ত আলোচনাকে প্রধানতঃ একাডেমিক আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন, ফলে তাঁর আলোচনা সত্যের অনুসন্ধানেই বেশি ব্যাপৃত থেকেছে। সুনির্দিষ্ট কোন মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠা বা বাতিল করার জন্য তিনি চেষ্টা করেননি।

ব্লুমার তাঁর এক প্রবন্ধে (১৯৬৫) বিভিন্ন সমাজের আন্দোলনগুলিকে পর্যালোচনা করে আন্দোলনকে প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন।[৭৫] তাঁর মতে সামাজিক আন্দোলনের ধরনগুলি হচ্ছে:

১. সাধারণ সামাজিক আন্দোলন (General Social Movement);
২. সুনির্দিষ্ট সামাজিক আন্দোলন (Specific Social Movement);
৩. তাৎপর্যপূর্ণ সামাজিক আন্দোলন (Expressive Social Movement)।

---

৭২ Ibid,p.87.
৭৩ এঙ্গেলস, ফ্রেডারিক 'ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' মার্কস-এঙ্গেলস রচনা সংকলন, মস্কোঃ প্রগতি প্রকাশন, দ্বিতীয় খন্ড, প্রথম অংশ, পৃঃ ৯৯।
৭৪ Wilkinson, Poul, op.cit., pp. 92-93
৭৫. Blumer,Hurbert (1965): "Social Movements" Principles of Socialogy, Edited by Alfred Mclung Lee, NewYork: Barnes & Nebles, Inc. P.199.

Dhaka University Institutional Repository

ব্লুমার অবশ্য এ তিন ধরনের আন্দোলনের বাইরেও আরো দু'প্রকার আন্দোলনের কথা বলেছেন, সে দুটি হচ্ছে, পুনর্জাগরণমূলক আন্দোলন (Revival Movement) এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন (Nationalistic Movement)[৭৬]

সাধারণ সামাজিক আন্দোলনঃ

সাধারণ সামাজিক আন্দোলন বলতে ব্লুমার এমন ধরনের আন্দোলনকে বুঝিয়েছেন যা সমাজের প্রচলিত ব্যবস্থাকে (Existing Social Order) আঘাত করে না, শুধুমাত্র জনসাধারণের মূল্যবোধকে পরিবর্তনের জন্য কাজ করে। ব্লুমার পাশ্চাত্য সমাজের শ্রমিক আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন এবং নারী আন্দোলনকে এই শ্রেণীর আন্দোলনের মধ্যে ফেলেছেন।[৭৭] ব্লুমারের মতে, এ আন্দোলনে কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে না, কোন সুবিন্যস্ত সাংগঠনিক কাঠামো থাকে না কিংবা তার সদস্যদেরও কোন ঠিক-ঠিকানা থাকে না। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের ওপর নেতৃত্বের প্রভাব এবং নিয়ন্ত্রণ থাকে খুবই শিথিল। ব্লুমার নারী সমাজের আন্দোলনের উদাহরণ দিতে গিয়ে দেখিয়েছেন, এ ক্ষেত্রে কতকগুলি অস্পষ্ট দাবি নিয়ে আন্দোলন করা হচ্ছে। নারী সমাজের ওপর অবিচারের অবসান করার কথা বলা হচ্ছে, নারী আন্দোলনের পরিবার, বিবাহ, শিক্ষা, শিল্প-কারখানা, রাজনীতি, অফিস-আদালত ও চলাচলের ক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে মেয়েদের সমানাধিকার দাবি করা হচ্ছে অথচ এ দাবিগুলিকে স্পষ্ট মতাদর্শগত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে বলিষ্ঠ কোন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। সমগ্র ব্যাপারটা একটি পোশাকী ব্যাপার তথা বিলাস হিসাবে প্রতিপন্ন হচ্ছে। শুধু নারীদের আন্দোলনই নয়, সাধারণ আন্দোলনগুলিতেও এই একই চরিত্র বিদ্যমান, সাধারণ আন্দোলন সম্পর্কে ব্লুমারের মত হচ্ছে--

"They have only a general direction, toward which they move in a slow, halting, yet persistent fashion. As movements they are unorganized, with neither established leadership nor recognized membership, and little guidance and control."[৭৮]

সুনির্দিষ্ট আন্দোলনঃ

সুনির্দিষ্ট আন্দোলন বলতে ব্লুমার এমন ধরনের আন্দোলনকে বুঝিয়েছেন যা বিদ্যমান সামাজিক ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং এর পরিবর্তনের মাধ্যমে যার নতুন সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে।[৭৯] এ ধরনের আন্দোলনের সুনির্দিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো থাকে, আরও থাকে সুনির্দিষ্ট মতাদর্শ; এবং এই মতাদর্শের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে কর্মসূচীও গ্রহণ করা হয়। অবশ্য তিনি বলেছেন, এ সকল আন্দোলন শুরু থেকেই যে সব চরিত্র অর্জন করতে পারে তা নয়। আন্দোলন বিকাশের অনেক পর্যায় থাকে এবং একেক পর্যায় অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে তার সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালী হতে থাকে এবং তাদের লক্ষ্য জনসাধারণের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ব্লুমারের আন্দোলন সংক্রান্ত আলোচনার প্রধান অংশটুকু এই সুনির্দিষ্ট প্রকৃতির আন্দোলন-কেন্দ্রিক। তিনি এখানে আন্দোলনের স্তর, বিক্ষোভের প্রকৃতি ও তার গুরুত্ব, আন্দোলনের নৈতিকতা, আন্দোলনের মতাদর্শ এবং আন্দোলনে রণকৌশলসহ আন্দোলন সংক্রান্ত খুটিনাটি অনেক বিষয় আলোচনা করেছেন। ব্লুমারের মতে সংস্কারমূলক আন্দোলন ও বিপ্লবী আন্দোলন-- এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং সুনির্দিষ্ট আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, মানুষ নতুন কিছুর সন্ধান পায়। তার কথায়--

"They can be viewed as societies in miniature, and as such, represent the building up of organized and formalized collective behavior out of what was originally amorphous and undifined. In their growth a social organization is developed, new values are formed, and new personalities are organized. These, indeed, constitute their residue. They leave behind an institutional structure and a body of functionaries a new objects and views, and a new set of self conceptions."[৮০]

তাৎপর্যপূর্ণ আন্দোলন (expressive movement)ঃ

ব্লুমারের মতে তাৎপর্যপূর্ণ আন্দোলন হল এমন ধরনের আন্দোলন, যার বিদ্যমান সামাজিক ব্যবস্থা কিংবা তার মূল চরিত্রকে পরিবর্তনের কোন লক্ষ্য থাকে না, যে আন্দোলনের শুধু লক্ষ্য থাকে মানুষের নির্দিষ্ট কোন আচরণকে পরিবর্তন করা। ব্লুমারের কথায়--

"The characteristic feature of expressive movements is that they do not such to change the institution of the social order or its objective character...they are released in some type of expressive behavior which, however, in becoming crystallized, may have profound effects on the personalities of individuals and on the character of the social order."[৮১]

ব্লুমারের মতে, এ সকল আন্দোলন প্রচার-প্রোপাগান্ডার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে। কোন বিশেষ ধর্ম কিংবা কোন বিশেষ পণ্য ব্যবহারের প্রতি মানুষকে আগ্রহী করে তোলার প্রচেষ্টা হল এ ধরনের আন্দোলনের নমুনা। ব্লুমার অবশ্য পুনরুজ্জীবনমূলক আন্দোলন এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকেও অনেকটা একই ধারায় ব্যাখ্যা করেছেন। তবে ব্লুমার মত প্রকাশ করেছেন, এ দুটি আন্দোলন আসলে পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্ক যুক্ত; কেননা একটি জাতি যতক্ষণ পর্যন্ত তার পুরোনো ঐতিহ্যের প্রতি গর্ববোধ না করতে পারে, ততক্ষণ একটি গর্বিত জাতি হিসাবে মাথা উচুঁ করে দাঁড়াতে পারে না। আর পুরোনো ঐতিহ্যের প্রতি গর্বিত হয়ে ওঠার ফলে অপর যে শক্তি দ্বারা জাতিটি পরাধীন হয়ে আছে, তার প্রতি ঘৃণাও প্রখরতর হয়। এভাবেই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মতাদর্শ ও সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে ওঠে। শুরু হয় জাতীয় জাগরণ।[৮২]

ব্লুমার তাৎপর্যপূর্ণ আন্দোলনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রথমে খুবই সাধারণ লক্ষ্যের কথা বললেও তিনি পরিশেষে মত প্রকাশ করেছেন, সাদামাটা লক্ষ্য নিয়ে গড়ে-ওঠা আন্দোলনই এক সময় বিরাট ব্যাপকতা লাভ করতে পারে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বা পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনের সাথে মিশে যেতে পারে। কেননা ধর্ম কিংবা কোন সাংস্কৃতিক প্রশ্ন নিয়েও অনেক সময় জাতীয় জাগরণ

---

৭৬. Ibid,p.219.
৭৭. Ibid,pp.199-200.
৭৮. Ibid,P.200.
৭৯. Ibid,p.202.
৮০. Ibid,p.214.
৮১. Ibid,p.214.
৮২. Ibid,P.219.

Dhaka University Institutional Repository

ঘটে যেতে পারে। বস্তুতঃ তাৎপর্যপূর্ণ আন্দোলনের সাথে সুনির্দিষ্ট আন্দোলনের আর কোন পার্থক্য থাকে না, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অভিন্ন হয়ে ওঠে। এভাবেই বুমার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং শ্রেণী-আন্দোলনের মাঝে অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছেন।

আসলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উৎসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তা মূলতঃ বিকাশমান বুর্জোয়া শ্রেণীর আন্দোলন। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশসমূহের বুর্জোয়া শ্রেণী যখন এশিয়া-আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশসমূহের ওপর উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করলো, তখন থেকেই এ সমস্ত দেশের সমগ্র জনগণের কাছে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মতাদর্শগত হাতিয়ারে পরিণত হল জাতীয়তাবাদ। ফলে এ উপনিবেশবাদ-বিরোধী জাতীয়মুক্তির আন্দোলনের মতাদর্শ হিসাবে জাতীয়তাবাদের যেমন ভিন্নতর ব্যাখ্যায় প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, তেমনিই প্রকৃতিগত দিক থেকে এ আন্দোলন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সমন্বিত এক বিশেষ ধরনের আন্দোলন হয়ে উঠেছে। এ আন্দোলন অবশ্যই অন্যান্য আন্দোলন অপেক্ষা ভিন্ন প্রকৃতির।

উপরোক্ত সমগ্র আলোচনার আলোকে আন্দোলনকে নিম্নোক্ত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:

১) রাজনৈতিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যবিহীন শ্রেণী আন্দোলন;
২) রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পন্ন শ্রেণী আন্দোলন;
৩) ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী জাতীয় মুক্তির আন্দোলন;
৪) স্বৈরাচার-বিরোধী গণ-আন্দোলন।

আন্দোলনের এই প্রধান চারটি ভাগ থাকলেও কিংবা তাকে অসংখ্য উপবিভাগে ভাগ করা গেলেও কোন ধরনের আন্দোলনকেই সঠিকভাবে আন্দোলন বলা যাবে না, যদি তার একটি রাজনৈতিক চরিত্র না থাকে। হয়ত কোন আন্দোলনে অংশগ্রহণকারিগণ এর রাজনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন নয় কিংবা তারা রাজনৈতিক ক্ষমতারও ধার ধারে না। যদিও তা সামাজিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সমস্যাকে কেন্দ্র করেই সংঘটিত হয়। ফলে অবশ্যই তার একটি রাজনৈতিক গুরুত্ব থাকে। এ প্রসঙ্গে নিম্নের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্যঃ

"Although it is sometimes convenient to distinguish between social and political movements, it should be noted that all movements have political implications even if their members do not strive at political power."[৮৩]

২.৫. একটি প্রত্যয় হিসাবে 'শ্রেণী এবং শ্রেণী-আন্দোলন'

শ্রেণীর সংজ্ঞা নিয়ে আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানীদের মধ্যে এখনও তীব্র বিতর্ক রয়ে গেছে।[৮৪] সাধারণভাবে শ্রেণী বলতে একটি সমাজের যে কোন ধরনের স্তরভেদকে বোঝায়। সমাজ বিজ্ঞানিগণ সাধারণভাবে এ পদটি ব্যবহার করেন বর্ণ, সামাজিক বা রাজনৈতিক গোষ্ঠী, পদমর্যাদাশীল গোষ্ঠী ইত্যাদিকে বোঝাতে। তবে আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানীদের লেখায় শ্রেণী সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য ফুটে উঠেছে। যেমন মার্শালের (Marshal) মতে শ্রেণীর ধারণাটি কোন সমাজে বিভিন্ন মানুষের মাঝে যে পার্থক্য আছে তারই শিক্ষা দেয় কিন্তু প্রতিটি সমাজেই যে বহুবিধ সামাজিক সুফল রয়েছে সেগুলিকে এড়িয়ে যায়।[৮৫] বটোমোরের (T.B. Bottomore) মতে শ্রেণী শব্দটির মধ্য দিয়ে কোন জনসমষ্টির সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। এ সামাজিক অবস্থানের দুটি নির্ধারক উপাদান হচ্ছেঃ (১) জন্মগত সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি ও সম্পদ, (২) নিজের অর্জিত গুণাবলী। টি.বি. বটোমোর এর ভাষায়-

"It would be a more accurate description of the social class system to say that it operates, largely through the inheritance of property, to ensure that each individual maintains a certain social position, determined by his birth and irrespective of his particular abilities."[৮৬]

অন্যদিকে এনটনি গিডেন্স (Anthony Giddens) মত প্রকাশ করেছেন- সামাজিক শ্রম-বিভাগই হচ্ছে শ্রেণীর মূল বিষয়। কেননা শ্রম-বিভাজনের মাধ্যমেই পরিষ্কার হয়ে ওঠে, একজন ব্যক্তির সাথে অন্যদের পার্থক্য কোথায়। তার মতে, যে কোন সমাজে মূল উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে; শ্রেণী শব্দটি এই বহুবিধ সম্পর্ককেই নির্দেশ করে।[৮৭]

যাইহোক, শ্রেণী প্রশ্নে আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানিগণের মধ্যে স্পষ্ট যে কয়েকটি বিভাগ রয়েছে তার একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আছে, যে প্রেক্ষাপটের মধ্য দিয়ে 'শ্রেণী' প্রত্যয়কে ব্যাখ্যা করার দুটি দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে। একটি মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং অন্যটি ওয়েবারীয় দৃষ্টিভঙ্গি। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে, শ্রেণী হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন ব্যবস্থায় একই উৎপাদন সম্পর্কে সম্পর্কিত জনসমষ্টি। আদিম সাম্যবাদী সমাজের পর থেকে প্রতিটি সমাজে মানুষ প্রধান দুটি ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একটি শোষক আর অন্যটি শোষিত। দাস-মালিক সমাজে এ দুটি শ্রেণী ছিল স্বাধীন মানুষ ও দাস, সামন্তবাদী সমাজে জমিদার ও ভূমিদাস বা শিল্পকর্তা ও কারিগর এবং ধনতান্ত্রিক সমাজে পুঁজিপতি ও শ্রমিক।[৮৮] এই সব শ্রেণীর প্রত্যেকটির মধ্যে থাকে আবার বিভিন্ন স্তর ভেদ। আদিম সমাজ ভেঙ্গে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত পরস্পর-বিরোধী শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়তে থাকে।[৮৯] অর্থাৎ মার্কসের মতে আদিম সমাজের পর থেকে প্রতিটি সমাজই হচ্ছে কতকগুলি শ্রেণীর সমন্বয়ে গঠিত একটি ব্যবস্থা। ফলে শ্রেণী হচ্ছে সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যেকার নির্দিষ্ট সম্পর্কের ভিত্তিতে বিভাজিত এক একটি গোষ্ঠী মানুষ। আর এ সম্পর্কটি হচ্ছে উৎপাদন-সম্পর্ক।

মার্কসের মতে, একেকটি সমাজে থাকে নির্দিষ্ট ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থা, কোন শ্রেণী থাকে উৎপাদন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক ও উৎপাদন উপায়ের মালিক, সেই হয় উৎপাদিত দ্রব্য বা পণ্যের মালিক আর অপর শ্রেণীটি উৎপাদন প্রক্রিয়ার অপরিহার্য অঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও

---

৮৩. Sills, David L.(ed): International Encyclopedia of the Social Sciences; New York: The Macmillase company & the free press,Vol no.13. p.439.
৮৪ Bottomore, T.B. (1966): Classes in Modern Society, London: George Allen & Unwin, p.5.
৮৫ Marshal, T.H. (1950): The Nature of Class Confliact used in T.B. Bottomore (1966), ibid,p.16.
৮৬ Bottomore, op.cit,p.16.
৮৭ Giddens,Anthony (1973): The Class Structure of the Advanced Societies; London:Hutchinson, pp:108-9.
৮৮ মার্কস, কার্ল ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলসঃ কমিউনিষ্ট পার্টির ইশতেহার, মার্কস-এঙ্গেলস রচনা-সংকলন, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, প্রথম খন্ড, প্রথম অংশ, পৃ:২৬-২৭।
৮৯ প্রাগুক্ত, পৃ:২৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

উৎপাদিত দ্রব্য বা পণ্যের ওপর তাদের কোন অধিকার থাকে না।[১০] উৎপাদনকে কেন্দ্র করে এই প্রধান দুটি প্রতিপক্ষের বাইরেও আরো কিছু স্তর থাকে। তবে তাদের অবস্থান নির্ণিত হয় উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সম্পর্কের ভিত্তিতে। অবশ্য কার্ল মার্কস শ্রেণী-সম্পর্কে কোথাও প্রণালীবদ্ধ কোন আলোচনা করেননি। তবে লেনিন শ্রেণীর ধারণাকে মার্কসের বিভিন্ন আলোচনার আলোকে বিকশিত করেন। ভি.আই.লেনিন মার্কসীয় শ্রেণীগত এ দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরতে গিয়ে লিখেছেন--

"Classes are large groups of people differing from each other by the place they occupy in a historically determined system of social production, by their relation (in most cases fixed and formulated in law) to the means of production, by their role in the social organization of labour, and, consequently, by the dimensions of the share of social wealth of which they dispose and the mode of acquiring it. Classes are groups of people one of which can appropriate the labour of another owing to the different places they occupy in a definite system of social economy."[১১]

অবশ্য মার্কস মত প্রকাশ করেছেন একটি গোষ্ঠী একই অর্থনৈতিক সীমার অধীনে থাকা বা একই উৎপাদন সম্পর্কের অধীনে থাকা কিংবা এমনকি একই ধরনের জীবনযাত্রা বা সংস্কৃতির অধীনে থাকা সত্ত্বেও তারা একটি যথার্থ শ্রেণী হয়ে ওঠে না, যতক্ষণ তাদের মধ্যে নিজের গোষ্ঠী সম্পর্কে সচেতনতা এবং সংগঠনশীলতা গড়ে না ওঠে। মার্কস ফ্রান্সের কৃষকদের উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন ফ্রান্সের কৃষকগণ একই ধরনের জীবনযাত্রা এবং একই ধরনের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও তারা পরিপূর্ণ একটি শ্রেণী হিসাবে গড়ে উঠতে পারেনি, তারা নিতান্তই থেকে গেছে পাশাপাশি অবস্থান গ্রহণকারী সমধর্মী অসংখ্য আলু নিয়ে গঠিত আলুর বস্তা। আলুর বস্তার মতই তারা পাশাপশি থেকেও প্রত্যেকেই তাদের স্বাধীন সত্তা রক্ষা করে চলেছে। মার্কস বলেছেন-

"ক্ষুদে মালিক কৃষক সম্প্রদায় একটি বিশাল জনসমষ্টি, তার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের জীবনযাত্রা একই ধরনের, কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে বহুবিধ সম্পর্ক স্থাপন এরা করে না। তাদের উৎপাদন প্রণালী পরস্পর সংযোগ স্থাপনের বদলে লোকদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে।... লক্ষ লক্ষ পরিবার যখন এমন আর্থিক অবস্থায় জীবনযাপন করে যার ফলে তাদের জীবনযাত্রার ধরন, তাদের স্বার্থ ও সংস্কৃতি অন্যান্য শ্রেণীর থেকে স্বতন্ত্র হয় এবং শেষোক্তদের প্রতি তাদের বৈরীভাব জাগিয়ে তোলে, তখন সেদিক থেকে তারা একটি শ্রেণী বটে। এই ছোট ভূসম্পত্তির মালিক চাষীদের মধ্যে যোগাযোগ যে পরিমাণে স্থানীয় মাত্র, এবং স্বার্থের অভিন্নতা তাদের ভিতর যে পরিমাণে কোনও যৌথসত্তা, জাতিগত বন্ধন অথবা রাজনৈতিক সংগঠন এনে দেয়নি, সেই পরিমাণে তারা আবার শ্রেণী নয়।"[১২]

অর্থাৎ মার্কসের মতে, শ্রেণী দু রকম। একটি সচেতন শ্রেণী এবং অপরটি অসচেতন শ্রেণী। একই আর্থিক অবস্থা, একই উৎপাদন সম্পর্ক কিংবা একই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্তরের অধীনে থাকা সত্ত্বেও যে জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ সম্পর্কে কোন সচেতনতা বা সংগঠনশীলতা গড়ে ওঠেনি— এ ধরনের শ্রেণীকে মার্কস নাম দিয়েছেন class in itself. অন্যদিকে, যে শ্রেণী একই উৎপাদন সম্পর্ক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে একই স্তরের অধীনে থাকার পাশাপাশি তাদের নিজস্ব শ্রেণী সম্পর্কে সচেতনতা ও সংগঠনশীলতা থাকে তাকে মার্কস নামকরণ করেছেন class for itself বা সচেতন শ্রেণী। মার্কসের মতে এটাই শ্রেণীর যথার্থ রূপ। অর্থাৎ একটি শ্রেণী হয়ে ওঠার জন্য একটি গোষ্ঠীর মানুষদের একই উৎপাদন পদ্ধতি ও একই ধরনের উৎপাদন সম্পর্কের অধীনে থাকা এবং চিন্তার ধরন ও জীবন যাত্রার সমতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। যথার্থ একটি শ্রেণী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে হলে নিজেদের মধ্যেকার ঐক্য সম্পর্কে সচেতনতা থাকতে হবে, থাকতে হবে অন্যান্য শ্রেণী থেকে তাদের পার্থক্য সম্পর্কে অনুভূতি। এই অনুভূতিই বিরোধী শ্রেণীর বিরুদ্ধে সাধারণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার উৎসাহ যোগায়। কার্ল মার্কস বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার করতে গিয়ে বলেন--

"...separate individuals form a class only to the extent that they must carry on a common struggle against another class."[১৩]

ম্যাক্স ওয়েবারও শ্রেণী সম্পর্কে স্পষ্টভাবে আলোচনা করেছেন। ওয়েবারের মতে ব্যাপারটি আসলে উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কের ব্যাপার নয়, বরং এটা সমাজবদ্ধ জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার মাপকাঠিতে বিভাজন করার একটি পদ্ধতি। শ্রেণীর অর্থ সম্প্রদায় নয়, তবে একটি শ্রেণী যে কোন প্রশ্নে সম্ভাব্য দৃঢ়তার সাথে একটি সম্প্রদায়ের মতই তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। ওয়েবারের মতে তখনই একটি শ্রেণী গড়ে-ওঠার শর্ত সৃষ্টি হয়। যখন,-

"(1) a number of people have in common a specific causal component of their life chances, in so far as (2) this component in represented exclusively by economic interests in the possession of goods and opportunities for income, and (3) is represented under the conditions the commodity or labour markets."[১৪]

ওয়েবার তার 'শ্রেণী' প্রত্যয়কে পরিষ্কার করতে 'class situation' এবং 'Market situation' এ দুটি পদকে ব্যবহার করেছেন। 'class situation' বলতে ওয়েবার বুঝিয়েছেন জীবনের সম্ভাবনাগত দিক থেকে সব মানুষ একই রকম নয়। কোন কোন মানুষ অত্যন্ত মূল্যবান জিনিসের (goods) মালিক; এই মূল্যবান জিনিসের সুবাদেই তারা অপরাপর সকল মূল্যবান জিনিসের ওপর একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। ক্রয়-বিক্রয় বাজারও এদেরই হাতে করায়ত্ত থাকে। ফলে তারাই সমস্ত সম্পত্তি ও সেবার মালিকে পরিণত হয়; আর যাদের মূল্যবান জিনিস নেই তারা কোন সম্পদ কিংবা সেবাকে নিজেদের স্বার্থে লাগাতে পারে না। অন্যদিকে যারা মূল্যবান জিনিসের মালিক তারা সমস্ত সম্পদ, সেবা ও বাজারের ওপর একচেটিয়া আধিপত্য চালিয়ে ক্রমাগত আরো সম্পত্তির মালিকে পরিণত হয় এবং এ সম্পত্তি ক্রমাগত দ্রব্য পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়। ওয়েবারের মতে জীবনের সম্ভাবনার দিক থেকে বিদ্যমান পার্থক্যই 'class situation'-এর চিত্রকে নির্দেশ করে। ওয়েবারের কথায়,-

---

১০ Bottomore T.B, (1966): Classes in Modern Society: London:George Allen & Unwin Ltd.p.17.
১১ Lenin, V.I. (1965): "A great Beginning" Collected works, progress publishers, Moscow: Vol.29,p.421.
১২ মার্কস:'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার' মার্কস-এঙ্গেলস রচনা সংকলন, মস্কোঃ প্রগতি প্রকাশন, প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃ:৩২৯।
১৩ Quoted in Raymond Aron(1965): Main Currents in Sociological Thought, New York: Penguin Books, Part 1,p.166.
১৪ Weber,Max (1948): Essays in Sociology: Translated, Edited and with an introduction by H.H. gerth and C. wright Mills,London:Routledge & kegan Paul Ltd,p.181.

Dhaka University Institutional Repository

" 'Poperty' and 'Lack of poperty' are, therefore, the basic categories of all class situation."[৯৫]

ওয়েবার 'class situation' প্রত্যয়কে আবার বিভাজন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন সমস্ত সম্পদই শেষ পর্যন্ত মূলধনী দ্রব্যে (capital goods) পরিণত হয় কিন্তু সম্পদের সব ধরন একই রকম নয়, কোন কোন সম্পদ খুবই মূল্যবান কিন্তু সেগুলি সহজে বিনিময়যোগ্য নয় কিংবা স্থানান্তরযোগ্য নয়। আবার কোন কোন সম্পদ খুব সহজেই বিনিময়যোগ্য এবং সেগুলি সহজে স্থানান্তরযোগ্য। বাজারে প্রবেশ করার পর দেখা যাবে, যে ব্যক্তির হাতে বিনিময়যোগ্য ও স্থানান্তরযোগ্য সম্পদ নেই, সে যত মূল্যবান সম্পদেরই মালিক হোক না কেন, সে কোন ধরনের দ্রব্যই ক্রয় করতে পারবে না। আর যাঁর হাতে সহজে বিনিময়যোগ্য এবং সহজে স্থানান্তরযোগ্য সম্পদ আছে সে ইচ্ছামত সব ধরনের দ্রব্যই কিনতে পারবে। ফলে যার কাছে বিনিময়যোগ্য ও স্থানান্তরযোগ্য সম্পদ যত বেশি আছে, সে তত দ্রুত বাজারের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবে। আর সবচেয়ে সহজে বিনিময়যোগ্য ও স্থানান্তরযোগ্য দ্রব্য হল মুদ্রা। ফলে মুদ্রার মালিকই বাজারের ওপর একচেটিয়া আধিপত্য করে। শুধু তাই নয়, সে ঋণের বাজারেও আধিপত্য করে একচেটিয়া।[৯৬] বাজারের এই চিত্রকেই ওয়েবার 'class situation' বলে আখ্যায়িত করেছেন। ওয়েবারের মতে তাই কার কাছে সম্পদ বেশি থাকলো অথবা কম থাকলো সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল কার কাছে সহজে বিনিময়যোগ্য ও স্থানান্তরযোগ্য সম্পদ কত বেশি আছে। ওয়েবার বলেছেন "class situation is, in this sense, ultimately market situation."[৯৭]

এভাবে ওয়েবার দেখিয়েছেন 'Market situation'ই হল শ্রেণী-বিভাজনের মাপকাঠি, তাঁর মতে, বাজারের ওপর নিয়ন্ত্রণের মাত্রাকে মাপকাঠি হিসাবে ধরেই সমাজের সদস্যদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। ওয়েবারের তত্ত্বের দিকে লক্ষ্য করলে সহজেই কতকগুলি জিনিস চোখে পড়ে--

(১) জীবনের সম্ভাবনা (life chances) ও ভাগ্য (fate)কেই তিনি সম্পত্তি থাকা না থাকার নির্ধারক বিষয় হিসাবে ধরে নিয়েছেন। ফলে যাদের সম্পত্তি কম আছে বা যাদের একবারেই সম্পত্তি নেই, তাদের কিছু বলার নেই। যারা অধিক সম্পত্তির মালিক, তাদের সমস্ত সম্পদ ও সেবার ওপর একচেটিয়া আধিপত্য চালানো একটি বৈধ অধিকার।

(২) জমি, দালান বা এ জাতীয় স্থাবর সম্পত্তি যার যত কিছুই থাকুক না কেন তার কাছে যদি বিনিময়যোগ্য ও স্থানান্তরযোগ্য সম্পদ, যেমন মুদ্রা, গরু, মানুষ (দাস)[৯৮] না থাকে তাহলে উক্ত স্থাবর সম্পত্তির কোন মূল্য নেই।

(৩) বাজারের ওপর প্রভাবের মাত্রা দ্বারাই যেহেতু কে কোন্ শ্রেণীতে অবস্থান করে তা নির্ধারিত হয়, তাই, কার কাছে কি পরিমাণ নগদ অর্থ বা বিনিময়যোগ্য পণ্য আছে সেটাই বড় কথা, কে কোন্ পেশায় কিংবা উৎপাদন সম্পর্কের সাথে জড়িত তা বিবেচনার যোগ্য বিষয় নয়। ফলে একই শ্রেণীতে অবস্থান করে এমন জনগোষ্ঠী বিভিন্ন পেশা বা উৎপাদন সম্পর্কের সাথে জড়িত হতে পারে। ফলে জীবনযাত্রা যত কঠিনই হোক না কেন কিংবা কারো ওপর শোষণ যত তীব্রই হোক না কেন তাতে যে তারা একটা সম্প্রদায় (community) হিসাবে সচেতন হয়ে উঠবে কিংবা সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

এভাবে ওয়েবারের শ্রেণী-তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করলে এমন অনেক কিছু দেখা যায়, যা মার্কসীয় শ্রেণী-তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত। যেমন, তিনি দাসকে শ্রেণী হিসাবে বিবেচনা করেন নি, কেননা তার মতে, তাদের বাজারে প্রতিযোগিতায় যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। ওয়েবারের মতে, দাসরা বড়জোর status group হতে পারে।[৯৯] কিন্তু একজন মানুষ কিভাবে দাসে রূপান্তরিত হল তারতো একটি ইতিহাস আছে? দাস সৃষ্টির ইতিহাসের দিকে তাকালেই এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে কি করে কতকগুলি মানুষের কাছে 'Market situation'কে করায়ত্ত্ব করার মত জীবনের সম্ভবনা সৃষ্টি হল। দাসকে বিক্রী করে অর্থ পাওয়া যেতে পারে কিন্তু দাস পরিশ্রম করে মূল্য সৃষ্টি করতে পারে বলেই তার বিনিময়মূল্য আছে। মার্কস তার পুঁজি গ্রন্থে খুব পরিষ্কার করে দেখিয়েছেন কিভাবে দাস ব্যবসা শুরু হয়েছে এবং কিভাবে কতকগুলি লোকের হাতে বিপুল সম্পত্তি কেন্দ্রীভূত হয়েছে। সে হৃদয়বিদারক ইতিহাসকে এড়িয়ে গিয়ে শুধু মাত্র জীবনের সম্ভাবনার কথা বলে শ্রেণী প্রত্যয়কে ব্যাখ্যা করা যাবে না। কেননা কতকগুলি মানুষের হাতে বিপুল সম্পত্তি কেন্দ্রীভূত হওয়ার মূলেই রয়েছে পশ্চাদপদ জাতি বা জনগোষ্ঠীর ওপর আদিম প্রকৃতির শোষণ-লুন্ঠন। অন্যদিকে, স্থাবর সম্পত্তি যেমন, দালান কিংবা জমির মালিকানা এমনিতে জন্মায় না, একটি নির্দিষ্ট শোষণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই জন্মায়; আর দালান ও জমি স্থানান্তরযোগ্য না হলেও তা বিনিময় করা যাবে না তা নয়। উপরন্ত, জমির ওপর মালিকানা থাকলে, মজুর বা ভূমিদাস খাটিয়ে তা থেকে নতুন সম্পদ সৃষ্টি করা যায়। ফলে এ সম্পদগুলির যে বাজারে কোন প্রভাব নেই তা বলা যথার্থ নয়। আর যাদের হাতে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি রয়েছে তারা যেমন একটি শ্রেণী, তেমনই তাদের সম্পদকে রক্ষা ও বৃদ্ধি করতে গেলে সম্পত্তিহীন শ্রেণীর সেবা গ্রহণ করা ছাড়া কোন উপায় থাকে না। এই সম্পত্তিহীন শ্রেণীর সেবা একমাত্র শ্রমশক্তির মধ্য দিয়েই প্রতিপালিত হয় তা বলাই বাহুল্য। কার্ল মার্কস খুব স্পষ্ট করে তার 'মজুরী, শ্রম ও পুঁজি' গ্রন্থে দেখিয়েছেন, সম্পত্তিবানদের সাথে সম্পত্তিহীনদের শ্রমশক্তির ক্রয়-বিক্রয় হয় কি অসম বিনিময়ের মাধ্যমে।[১০০] অন্যদিকে যে কোন রূপেই হোক না কেন, সম্পত্তিহীন শ্রেণী তাদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনেই শ্রমশক্তি বিক্রয় করে। ফলে সম্পত্তিবান শ্রেণীর বিরুদ্ধে সম্পত্তিহীন শ্রেণীর যে বিরোধ ঘটবেই তা অনিবার্য।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায়, ওয়েবারের শ্রেণী-তত্ত্ব কতকগুলি হাল্কা ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত; ফলে, সে ধারণাকে গ্রহণ করা যায় না। শুধু মাত্র ওয়েবার যে এমনভাবে সমাজ বিকাশের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য না করেই শ্রেণী-তত্ত্ব দিয়েছেন তা নয়, তার অনুসারীরা তো বটেই এমনকি মার্কসবাদী (নয়া) বলে পরিচয়দানকারী ইদানীংকার অনেক প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানীও এমনই ভুল করেছেন। ওয়ালার স্টাইনতো দাবি করেছেন, যখন শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করে তখন সমাজে শ্রেণীর প্রায় কোন অস্তিত্বই থাকে না। শুধুমাত্র সমাজে যখন বিবাদ-বিসংবাদ দেখা দেয় তখনই শ্রেণীর উদ্ভব হয় এবং মাত্র দুটি শ্রেণীতে সমগ্র সমাজ বিভক্ত হয়ে পড়ে। তাছাড়া সব সময়ই প্রধানতঃ একটি মাত্র শ্রেণীই সমাজে অবস্থান করে। ওয়ালার স্টাইন মত প্রকাশ করেছেন–

---

৯৫ Ibid,p.182.
৯৬ Ibid, p.183.
৯৭ Ibid,p.182.
৯৮ Ibid,p.182.
৯৯ Ibid,p.183.
১০০ মার্কস, কার্ল:"মজুরী, শ্রম ও পুঁজি," রচনা সংকলন, ১ম খন্ড, ১ম অংশ, পৃঃ৭২-৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

"To say there cannot be three or more classes is not however to say that there are always two. There may be none, though this is rare and traditional. There may be one, and this is most common. There may be two, and this is most explosive... we say there may be only one class, although we have also said that classes only actually exist in conflict situations, and conflicts presume two side."[১০১]

ওয়ালার স্টাইনের মতে এ একমাত্র শ্রেণীটি হচ্ছে "Universal class" যার সদস্য সমাজের সবাই এবং বুর্জোয়া শ্রেণীই হল সেই "Universal class"এর মূল উপাদান; এ ছাড়া, সমাজে যে বিভিন্ন সামাজিক স্তর, তার প্রত্যেকে একেকটি মর্যাদা-গোষ্ঠী (status group) ছাড়া আর কিছু নয়।[১০২]

ওয়ালার স্টাইনের মতে, একটি জনগোষ্ঠীর একটি শ্রেণী হিসাবে আত্মপ্রকাশের জন্য অবশ্যই সচেতনতা প্রয়োজন। কিন্তু এ সচেতনতা অধিকাংশ সময়ই অধিকাংশ মানুষের মাঝে থাকে না। যারা অসচেতন তারা মূলতঃ কোন না কোনভাবে বিদ্যমান বুর্জোয়া সমাজকেই রক্ষা করে চলে।[১০৩] তবে বর্তমান সমাজের ধারক-বাহক বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মত দুটি গোষ্ঠীই আছে, একটি সামন্ত শ্রেণী এবং অন্যটি শ্রমিকশ্রেণী। কিন্তু সামন্ত শ্রেণী পরাজিত ও সংখ্যায় অল্প। ফলে এদের কোন সম্ভাবনা নেই। বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্য ঠিক তখনই ভয়ের কারণ হয় যখন অন্য একটি গোষ্ঠী সচেতন হয়ে ওঠে। এরা হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী। শ্রমিকগণ যখন নিজেদের ব্যাপারে সচেতন হয়ে ওঠে, তখন তারা একটা শ্রেণীতে পরিণত হয় এবং সমাজে দুটি প্রধান শ্রেণীর মাধ্যমে মেরুকরণ ঘটে।[১০৪]

ওয়ালার স্টাইন শ্রেণী-প্রত্যয়কে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে মনে হতে পারে যে, তিনি মার্কসের শ্রেণী তত্ত্বকেই একটু অগ্রসরমান কায়দায় ব্যাখ্যা করছেন। কিন্তু তা ঠিক নয়, কেননা মার্কস তার শ্রেণীর ব্যাখ্যায় গিয়ে যেখানে অসংখ্য শ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছেন, সেখানে তিনি মোটা দাগে শ্রেণীগুলিকে দুভাগে ভাগ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, অতীতে সংখ্যালঘুদের স্বার্থে সমাজের প্রধান অংশ মানুষ বিপ্লবে অংশ নিয়েছে, কিন্তু এই প্রধান অংশ মানুষ বিভিন্ন পরস্পর-বিরোধী শ্রেণীতে বিভক্ত থাকা সত্ত্বেও তাদের শ্রেণী সম্পর্কে তারা সচেতন ছিল না। ফলে জনগণের এ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ জেনে-শুনে বা অজ্ঞাতসারে যোগ দিয়েছে সংখ্যালঘুদের স্বার্থের আন্দোলনে।[১০৫] কিন্তু তাই বলে যে তারা শ্রেণী ছিল না তা নয়। তাদের প্রত্যেকটি শ্রেণীর ছিল উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে আলাদা আলাদা সম্পর্ক। উৎপাদনের প্রক্রিয়াতে তাদের স্বার্থও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। অবশ্য মার্কস তার পূঁজি গ্রন্থের তৃতীয় খন্ডের শেষে 'classes' শিরোনামে যে ছোট্ট অধ্যায়টি অসমাপ্ত অবস্থায় রেখে গেছেন, সেখানে তিনি বুর্জোয়া সমাজে তিনটি প্রধান শ্রেণীর কথা বলেছেন, এ শ্রেণীগুলি হচ্ছে মজুরী শ্রমিক, পুঁজিপতি ও জমিদার। মার্কস বলেছেন--

"The owners merely of labour-power, owner of capital, and land owners, whose respective sources of income are wages, profits and ground rent, in other wages labours, capitalists and land owners, constitute them three big classes of modern society based upon the capitalist mode of production."[১০৬]

মার্কস এভাবে তিনটি বৃহৎ শ্রেণীর উল্লেখ করলেও তিনি এখানে দেখিয়েছেন, এই তিনটি সামাজিক গোষ্ঠীর যারা সদস্য তারা নিজ নিজ মালিকানার সম্পদকে কাজে লাগিয়ে নিজ নিজ সত্তাকে গড়ে তোলে, এভাবে সমসত্তা-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে গড় ওঠে একেকটি শ্রেণী। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি কোন্ শ্রেণীতে পড়বে তার নির্ধারক বিষয় হচ্ছে সে নিজের কোন্ সম্পদকে ব্যবহার করে উপার্জন করছে। সেদিক থেকে পুঁজিবাদী সমাজে উপরোক্ত শ্রেণীসমূহ ছাড়াও আরও বিভিন্ন ধরনের গোষ্ঠী আছে যাদের আয়ের পথ ভিন্নতর। মার্কস বলেছেন--

"However, from this stand point, physicians and officials, e.g., would also constitute two classes, for they belong to two distinct social groups, the members of each of these groups receiving their revenue from one and the same source. The same would also be true of the infinite fragmentation of interest and rank into which the division of social labour splits labourers as well as capitalists and landlords the latter, i.g.,into owners of vineyards, farm owner, owners of forests, mine owners, and owners of fisheries."[১০৭]

কার্ল মার্কস অন্যত্র ফ্রান্সের শ্রেণী সংগ্রামের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখিয়েছেন, ফ্রান্সের সমাজে সেদিন মোট ৬টি শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল। এ শ্রেণীগুলি হচ্ছে: (১) ফিনান্স অভিজাতবর্গ, (২) শিল্প-পুঁজিপতি, (৩) পেটি-বুর্জোয়া, (৪) কৃষক, (৫) প্রলেতারিয়েত, এবং (৬) লুম্পেন প্রলেতারিয়েত বা আধা প্রলেতারিয়েত।[১০৮] এছাড়াও তিনি উপরোক্ত শ্রেণীগুলির মতাদর্শগত প্রতিনিধি ও মুখপাত্র তথা, পন্ডিত, আইনবিশারদ, চিকিৎসক প্রভৃতি নিয়ে ভিন্ন একটি শ্রেণী গঠনের কথা বলেছেন।[১০৯] ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস জার্মানির কৃষক যুদ্ধ গ্রন্থের ভূমিকায় জার্মানির সমাজের শ্রেণী-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শ্রেণীসমূহকে মোট ৯টি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। এই শ্রেণীগুলি হচ্ছে: (১) সামন্ত অভিজাত শ্রেণী, (২) বুর্জোয়া শ্রেণী, (৩) পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণী, (৪) উচ্চ ও মধ্য কৃষক, (৫) স্বাধীন ক্ষুদে কৃষক, (৬) দাস কৃষক, (৭) কৃষি মজুর, (৮) শিল্প শ্রমিক, এবং (৯) লুম্পেন প্রলেতারিয়েত।[১১০]

মার্কস এবং এঙ্গেলস উভয়েই দেখিয়েছেন এই শ্রেণীগুলি তাদের আয়ের পথকে কেন্দ্র করেই দুটি দেশের বিভিন্ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে এবং এর মাধ্যমে তাদের ভিতর মেরুকরণ ঘটেছে। কোথাও সচেতনভাবে আবার কোথাও অস্বচ্ছভাবে অবস্থান গ্রহণ করেছে কিন্তু সর্বত্রই শ্রেণীসমূহ তাদের উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতেই, ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবেই, আন্দোলনগুলিতে তাদের স্ব-স্ব অবস্থান গ্রহণ করেছে।

---

১০১ Wallerstein, Immanual (1974f): The Modern World System, London: Academic Press Inc. Vol-1, p.351.
১০২ Ibid,p.352.
১০৩ Ibid,p.352.
১০৪ Ibid,p.352.
১০৫ মার্কস, কার্ল 'ফ্রান্সে শ্রেণী সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০' মার্কস-এঙ্গেলস রচনা সংকলন, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, প্রথম খন্ড, প্রথম অংশ, পৃ:১১৫।
১০৬ MarX, Karl (1967): Capital-A critique of Political Economy New York: International Publishers,Vol-111, p.885.
১০৭ Ibid,p.886.
১০৮ মার্কস, কালঃ 'ফ্রান্সের শ্রেণী সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০,' প্রাগুক্ত, পৃ:১৩৩।
১০৯ প্রাগুক্ত, পৃ:১৩৩।
১১০ এঙ্গেলস, ফ্রেডারিখ; "জার্মানির কৃষক যুদ্ধ গ্রন্থের ভূমিকা," মার্কস-এঙ্গেলস রচনা-সংকলন, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় অংশ, পৃ:৩১৮-৩২০।

Dhaka University Institutional Repository

ওপরের সমস্ত বক্তব্যকে পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্ক তথা নিজের সম্পদ ব্যবহার করে যে বিভিন্ন ধরনের আয়ের পথ গড়ে ওঠে তার ভিত্তিতেই নিজ সম্পদের ধরন অনুযায়ী সমাজের মানুষগুলি বিভিন্ন বর্গে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই সামাজিক বর্গগুলিই হচ্ছে শ্রেণী। এই শ্রেণীসমূহের নিজস্ব সম্পদের ধরন বিভিন্ন রকমঃ যেমন, ভূমি ও তার পরিবেশ, পুঁজি, শ্রম, পান্ডিত্য, পেশাগত দক্ষতা ইত্যাদি। তবে বিদ্যমান সমাজের প্রধান যে উৎপাদন ব্যবস্থাটি অস্তিত্বমান থাকে, তার সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত শ্রেণীগুলিকে নিয়েই গড়ে ওঠে প্রধানতম শ্রেণীসমূহ। বাকি শ্রেণীগুলি প্রধান শ্রেণীগুলির মধ্যবর্তী কতকগুলি উপশ্রেণী, যারা তাদের আয়ের পথ অনুযায়ীই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রধান শ্রেণীর পক্ষ নেয়। যেমন, একজন ক্ষুদ্র কারখানা মালিকের জীবনযাত্রার মান একজন শ্রমিকের মতই হতে পারে, কিন্তু এ দু'জনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তার ধরন ভিন্নতর। যে কোন প্রশ্নে এদের দু'জনের প্রতিক্রিয়াও হবে ভিন্নতর। আবার শ্রমিকের ব্যবহারযোগ্য কোন পণ্য যা, উক্ত ক্ষুদ্র মালিকের কারখানাতে উৎপাদিত হয়, তার মূল্য যদি ওঠা-নামা করে, তাহলেও দু'জনের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হবে ভিন্নতর। অর্থাৎ 'Market situation' নয়, উৎপাদনের সাথে সম্পর্কের প্রকৃতি দ্বারাই শ্রেণী-অবস্থান নির্ধারিত হয়।

শ্রেণীর ধারণা থেকেই এ কথাটি পরিষ্কার যে, একটি উৎপাদন ব্যবস্থা যখন একটি শ্রেণীর বিকাশকে রুদ্ধ করে দেয় বা বাধা সৃষ্টি করে তখন সে শ্রেণী তার অস্তিত্বের স্বার্থেই প্রতিবাদ করবে। তবে কখনও সচেতনভাবে, অধিকতর সংগঠিতভাবে এবং সুনির্দিষ্ট পরিবর্তনের লক্ষ্য নিয়ে সে প্রতিবাদ বা আন্দোলন সংগঠন করবে, আবার কখনও সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে আন্দোলনে নামবে। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিদ্যমান অবস্থার পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষাই আন্দোলন সংগঠনের ক্ষেত্রে মূল উৎসাহ যোগায়। আর সচেতন কিংবা অসচেতন যেভাবেই এ আন্দোলন হোক না কেন তা যেহেতু একটি পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখে অনুষ্ঠিত হচ্ছে; তাই অবশ্যই তার একটি রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। আর, এ জন্যই সম্ভবতঃ কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস দাবি করেছেন, প্রতিটি শ্রেণী-আন্দোলনই রাজনৈতিক আন্দোলন।[১১১] আর, যে শ্রেণীসমূহ বিদ্যমান অবস্থা পরিবর্তনের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে, তার মধ্যে কোন্ শ্রেণী নেতৃত্বে থাকবে, তা নির্ধারিত হয় সচেতনতার ওপর। নির্যাতিত শ্রেণীগুলির মধ্যে যে শ্রেণীটি সবচেয়ে সচেতন, বাকি শ্রেণীসমূহকে যে সবচেয়ে যোগ্যতার সাথে পক্ষে টানতে পারে, সেই শ্রেণীই সে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়। কেননা আন্দোলনের এগিয়ে যাওয়ার পথ, শর্ত এবং শেষ সাধারণ ফলাফল সম্বন্ধে তাদের স্বচ্ছ বোধ রয়েছে।[১১২] ফলে স্বাভাবিকভাবে বিকাশাকাঙ্ক্ষি শ্রেণীগুলির মধ্যে একাধিক শ্রেণীর যুগপৎ নেতৃত্বেই আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয়। তবে শাসকশ্রেণীর সাথে অপরাপর বিভিন্ন শ্রেণীর যে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, অবশ্যই তা উৎপাদন-সম্পর্ক দ্বারা নির্ধারিত হয়, তার দ্বারাই নির্ধারিত হয় কোন্ শ্রেণী কোন্ দিকে অবস্থান গ্রহণ করবে।[১১৩]

২.৬ জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

সাধারণতঃ 'জাতীয়তাবাদ' প্রত্যয়টি রাজনীতি ক্ষেত্রে অহরহ ব্যবহৃত হয়। জাতীয়তাবাদের নামে যেমন শাসকশ্রেণী তার ক্ষমতাকে ধরে রাখে, ঠিক তেমনই, গণতান্ত্রিক বিশ্বের বিরোধী দলগুলিও তাদের রাজনৈতিক প্রচারণার প্রধান ইস্যু হিসাবে গ্রহণ করে জাতীয়তাবাদ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেখানে জাতীয়তাবাদী শ্লোগানকে বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংস্কৃতি, দর্শন, আত্মপরিচয়, শ্রেণী কিংবা আধুনিকায়নের প্রশ্নগুলিকে দূরে রাখা হয়-- অথচ এগুলিই জাতীয়তাবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।[১১৪] কোন কোন লেখক অবশ্য জাতীয়তাবাদ বলতে শুধু মাত্র জাতীয় আদর্শ, জাতীয় চেতনা, জাতীয় সংস্কৃতি বা জাতীয় সচেতনতার প্রতিফলন, কিংবা শুধু মাত্র জাতীয় স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী মতাদর্শ হিসাবে দেখে থাকেন,[১১৫] তারা শ্রেণীর প্রশ্নটিকে একেবারেই গুরুত্ব দেন না। অথচ জাতীয়তাবাদের বিকাশের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এটা ছিল এক ঐতিহাসিক শ্রেণী-আন্দোলন। কেননা মধ্য যুগের ইউরোপে রাজা এবং সংগঠিত চার্চই ছিল সমাজ এবং তার অর্থনীতি পরিচালনার মূল শক্তি; ব্যক্তির তখনও কোন স্বাধীনতা ছিল না। কৃষক, কারিগর ও বিকাশমান বুর্জোয়ার স্বাধীনভাবে কোন কিছুই করার অধিকার ছিল না। আঠারো শতকের শেষ পর্যন্ত বলা চলে জাতি (nation) কিংবা জাতীয়তাবাদের তেমন কোন রাজনৈতিক গুরুত্বই ছিল না।[১১৬] বুর্জোয়া শ্রেণী তার অস্তিত্ব বিকাশের স্বার্থেই সামন্ততান্ত্রিক সেই নিয়ন্ত্রণের প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলে। জাতীয়তাবাদের ওপর ঐতিহাসিক গবেষণা কর্মগুলির[১১৭] দিকে তাকালে দেখা যাবে জাতীয়তাবাদ বিকাশের আদি কারণ হল বিকাশমান বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশের তাড়না। বুর্জোয়া শ্রেণী ইউরোপের ওপর চেপে-বসা সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচারী শক্তিকে হটাতে আন্তর্জাতিক মিত্রেরও খোঁজ করে; আর তাই, সেদিন জাতীয়তাবাদের দেখা দেয় একটি আন্তর্জাতিক চরিত্র। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস এই বুর্জোয়া শ্রেণী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন--"বিকাশের পথে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে সমানে চলেছিল সে শ্রেণীর রাজনৈতিক অগ্রগতি। এই যে বুর্জোয়ারা ছিল সামন্ত প্রভুদের আমলে একটা নিপেষিত শ্রেণী,...সেই বুর্জোয়া শ্রেণী অবশেষে আধুনিক যন্ত্রশিল্প ও বিশ্ববাজার প্রতিষ্ঠার পর, আজ-কালকার প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্রের মধ্যে নিজেদের জন্য পরিপূর্ণ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অর্জন করতে পেরেছে। ...বুর্জোয়া শ্রেণী যেখানেই প্রাধান্য পেয়েছে, সেখানেই সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক, পিতৃতান্ত্রিক ও প্রকৃতি-শোভন সম্পর্ক শেষ করে

---

১১১ মার্কস, কার্ল ও ফ্রেডারিখ এঙ্গেলসঃ 'কমিউনিষ্ট পার্টির ইশতেহার' মার্কস-এঙ্গেলস রচনা-সংকলন, মস্কোঃ প্রগতি প্রকাশন, প্রথম খন্ড, প্রথম অংশ, পৃ:৩৪।

১১২ প্রাগুক্ত, পৃ:৩৮।

১১৩ এঙ্গেলস, ফ্রেডারিখ 'জার্মানির কৃষক যুদ্ধ গ্রন্থের ভূমিকা,' প্রাগুক্ত, পৃ:৩২০।

১১৪ John Breuilly (1982): Nationalism and the State. Manchester: Manchester University Press, p.1.

১১৫ Ibid, p.1.

১১৬ Wilkinson (1971):op.cit,p.89.

১১৭ নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি জাতীয়তাবাদ কিভাবে একটি ধারণা হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করলো তা জানার জন্য একেকটি ঐতিহাসিক দলিল। জাতি ও জাতীয়তাবাদের ওপর ব্যাপকতম জরিপকর্ম সমৃদ্ধ এ গ্রন্থগুলি থেকে দেখা যায়, যখন বাক স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার দাবিতে উদারতাবাদ বুর্জোয়াদের মতাদর্শ হিসাবে বিকশিত হতে থাকে তখন সামন্ততান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে সমগ্র ইউরোপ জুড়ে ব্যাপকতর গণজাগরণ সৃষ্টি হয় আর এ গণজাগরণের নেতৃত্বে ছিল বুর্জোয়া শ্রেণী। আর জাতীয়তাবাদ তাদের মতাদর্শ হিসাবে আবির্ভূত হয়। এই গ্রন্থগুলি হচ্ছে H.M.Chadwick(1966): The Nationalities of Europe and the growth of National Idiologies, Chambridge: Chambridge University Press; Kohn,Hans(1962): The Age of Nationalism, New York: Machmillan, FmÂ Snyder, Louir L. (1964): The Dynamics of nationalism. Readings in its Meaning and Development. Princeton: Princeton University Press.

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েছে"।[১১৮] বুর্জোয়া শ্রেণী এ ধরনের ঐতিহাসিক ভূমিকা নিতে পেরেছিল তার কারণ তার বিকাশের ধারাকে অব্যাহত রাখতে এটা প্রয়োজন ছিল। আর এ ঐতিহাসিক অগ্রগতির ধারাকে মতাদর্শগতভাবে সমর্থন জানাতে গড়ে উঠেছিল জাতীয়তাবাদ। কিন্তু পুঁজিবাদ যখন আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করলো, তার নিজস্ব বিকাশ যখন অন্যান্য দেশের বিকাশের সামনে হুমকি হয়ে দাঁড়ালো, তখনই সাম্য, মৈত্রী ও গণতন্ত্রের মতাদর্শগত ভিত্তি-- জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যা নিয়ে নতুনভাবে প্রশ্ন উঠলো। জাতীয়তাবাদ ক্রমশঃ, জাত্যাভিমান-- স্বৈরতন্ত্র বা অন্য দেশের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টির ভিত্তি হিসাবে আবির্ভূত হতে থাকলো। ব্লাউট এ কারণেই প্রশ্ন তুলেছেন---

"If it is not class struggle, then a theory of national struggle can go on to argue that there is a primordial "nationalist ideology" and that this ideology either is part of some broad democratic ideology of 'modernization', which diffuses outwards from civilized Europe to an uncivilized Third World, or is part of a more sinister, hate-driven ideology which embraces fascism, xenophobia, and the arrogance of nationality."[১১৯]

যে জাতীয়তাবাদ একদিন বুর্জোয়া সমাজের মুক্তির মতাদর্শগত ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছিল সেই জাতীয়তাবাদই পরবর্তীকালে নিপীড়িত দেশ-জাতি-জনগণের ওপর শোষণ-নিপীড়নের হাতিয়ারে পরিণত হয়। এ পর্যায়ে জাত্যাভিমানী উন্নত দেশের নেতৃত্ব অভ্যন্তরীণভাবে যেমন দেশে ব্যাপক স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করে-- তেমনি, বাজার দখলের নেশায় তারা পশ্চাৎপদ দেশগুলির ওপর ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা করে। আর এই বাজার দখলের প্রতিযোগিতায় গিয়ে জাত্যাভিমানী দেশগুলির শাসক বুর্জোয়া শ্রেণী, নিজেদের মধ্যেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এ পর্যায়ে জাতীয়তাবাদ যে কি হিংস্ররূপ ধারণ করতে পারে তা মূর্ত হয়ে উঠেছিল এ শতকের তিরিশের দশকে জার্মান আর ইতালিতে।[১২০] অন্যদিকে, এই জাত্যাভিমানী জাতিগুলির যখন পশ্চাৎপদ দেশগুলি বাজার দখল করে এবং এক পর্যায়ে সে দেশের ওপর চরম ঔপনিবেশিক শাসন চাপিয়ে দেয়, তখন এশিয়া-আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার এ দেশগুলিতে ঔপনিবেশিক পুঁজির বাজার সৃষ্টির ফলে ক্ষুদ্র হলেও একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে ওঠে। সে সাথে গড়ে ওঠে আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির আঘাতে নির্যাতিত ও যুদ্ধে বিধ্বস্ত দেশীয় পুঁজির টিকে থাকার ব্যাকুলতা।[১২১] এভাবে এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও বিকাশাকাঙ্ক্ষী

দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণীই প্রথমে রাজনৈতিকভাবে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরোধিতা শুরু করে, অর্থাৎ এরাই সচেতনভাবে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। তাদের চার পাশে সমবেত করে সমগ্র জনসাধারণকে। ঔপনিবেশিক শক্তি পশ্চাৎপদ এই দেশগুলিতে যেমন আদিম প্রকৃতির শোষণ করে, তেমনই রাষ্ট্র প্রশাসনের এমন ধরনের পরিবর্তন আনে যা পরিপূর্ণ অর্থেই ঔপনিবেশিক শক্তির স্বার্থে। বারনেল (১৯৮৬) এ ব্যাপারটি লক্ষ্য করেই বলেছেন-

"These changes were, in the eye of natives, specially designed to suit the commercial and financial interests of aliens and outsiders. There was local communal resentment at the appropriation of some of the best economic opportunites and the occupancy of privileged positions in society by foreigners."[১২২]

এই বিদেশীরা যেমন জাতি-বর্ণগতভাবে পৃথক এবং তেমনই অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা অনেক দূরবর্তী দেশের, ফলে শিক্ষা, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ এমনকি ধর্মগতভাবেও তারা পৃথক। ফলে দেশীয় জনগণের কাছে তাদের শাসন কখনই গ্রহণযোগ্য হয় না। অধিকাংশ এশিয়া ও পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলির ক্ষেত্রে দেখা যায় বিদেশী ব্যবসায়ীগণ সেখানকার সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্যকে করায়ত্ত করেছে এবং কিছু ছোট চাকুরী দেশীয়দের দিলেও গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি তারাই দখল করে আছে। এতে দেশীয় লোকের মধ্যে বিশেষতঃ বিকাশমান দেশীয় বুর্জোয়া ও মধ্যবিত্তের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। শুধুমাত্র বৈষয়িক প্রশ্নটিই যে দেশীয়দের মধ্যে কাজ করেছে তা নয়, জাতিবর্ণগত পার্থক্যও বিদেশীদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।[১২৩] দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণী ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ব্যবসা ও চাকুরীর সুযোগ না পাওয়ার ফলে বিদেশী শাসকদের প্রতি তাদের মাঝে যে বিক্ষোভ জন্ম নেয়, তা মূলতঃ সচেতন বিক্ষোভ। এ দুটি শ্রেণী চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের অন্যান্য শ্রেণীকেও বিদেশীদের প্রতি বিক্ষুব্ধ করে তোলে। অন্যান্য শ্রেণীকে বিক্ষুব্ধ করে তোলার ব্যাপারে বৈষয়িক ক্ষতির পাশাপাশি জাতিবর্ণগত ভিন্নতাও বিশেষভাবে কাজে লাগে। এভাবেই পশ্চাৎপদ পরাধীন দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদী ধারণার জন্ম হয়, যার মূল লক্ষ্য ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান। পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের সাথে এর মিল এখানেই যে, দুটি ধারণারই মূল উদ্দেশ্য দেশ ও জাতির উন্নতি। অবশ্য ঔপনিবেশিক শাসকগণ তাদের শাসনকে টিকিয়ে রাখতে বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করে। ঔপনিবেশিক শাসনের ফলাফল আকারে উপনিবেশের কোন কোন অঞ্চল অন্য অঞ্চল অপেক্ষা খানিকটা এগিয়ে যেতে পারে। আর এর প্রতিফলন হিসাবে আধুনিক অর্থে একটি বুর্জোয়া শ্রেণী, একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং একটি শ্রমিকশ্রেণীর জন্ম হয়। ফলে শুরু হয়ে যায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। সে আন্দোলনকে পথভ্রষ্ট করতে, বিশেষতঃ অন্যান্য পশ্চাৎপদ এলাকার জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে সে অঞ্চলের উন্নত এলাকার ব্যবসায়ীদের জন্য ব্যবসার কিছু সুযোগ করে দেয় কিংবা ঔপনিবেশিক কাঠামোর অধীনে রেখেই দেশীয়দের নিয়ে একটি আমলাতন্ত্র গড়ে তোলা হয়। আর জাতিবর্ণগতভাবে যদি পশ্চাৎপদ এলাকার মানুষ অন্যদের থেকে অপেক্ষাকৃত পৃথক হয় তাহলে ঔপনিবেশিক শক্তির আরও সুবিধা হয়। এ পার্থক্যকে কাজে লাগিয়ে তারা অপেক্ষাকৃত উন্নত অঞ্চলের ব্যবসায়ী ও আমলাগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অঞ্চলের লোকদের ক্ষেপিয়ে তোলার অবস্থা সৃষ্টি করে। বৈষয়িক প্রশ্নতো বটেই, পশ্চাৎপদ এলাকার লোকেরা উন্নত অঞ্চলের লোকদের বিরুদ্ধে যাতে বর্ণগত প্রশ্ন তুলতে পারে তারও ব্যবস্থা করে দেয়। এর উদাহরণ আমরা দেখতে পাই ঔপনিবেশিক যুগে বার্মার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দিকে লক্ষ্য করলেই। বার্মার জাতীয়তাবাদের আঘাতের লক্ষ্যবস্তু যতটা ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসকগণ ছিল, তার থেকে অনেক বেশি ছিল মূল ভারত

---

[১১৮] মার্কস, কার্ল ও ফ্রেডারিখ এঙ্গেলসঃ 'কমিউনিষ্ট পাটির ইশতেহার' প্রাগুক্ত, পৃঃ২৮।

[১১৯] Blaut James M. (1987): The National Question-Decolonizing the theory of Nationalism, London: Zed Books Ltd,pp.11-12.

[১২০] Breuilly, John, op.cit,pp.253-63.

[১২১] রহমান,আতিউর ও লেনিন আজাদ (১৯৮৯)ঃ 'ভাষা আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক পটভূমিঃ একটি তাত্ত্বিক কাঠামোর সন্ধানে' বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, ঢাকা: বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ৬ষ্ঠ খন্ড, বিশেষ সংখ্যা, পৃঃ১৪।

[১২২] Burnell,Peter J. (1986): Economic Nationalism in the third world, Colorado: westview press,p.55.

[১২৩] Hagen,E.E(1962): On the theory of social change:Home Wood: The Dorsey Press, Part-111,ch.18.

Dhaka University Institutional Repository

বংশোদ্ভূত ব্যবসায়ী ও আমলা গোষ্ঠী।[১২৪] ঔপনিবেশিক শক্তির এই একই নীতির ফলশ্রুতিতে উনিশ শতকেরশেষদিকে কলকাতার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত তথা বাংগালী জাতির প্রতি সারা ভারতব্যাপী একটি বিদ্বেষের ভাব গড়ে উঠেছিল।[১২৫] এই নীতির ভিত্তিতেই ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের শোষণ শাসনকে দীর্ঘতর করে ছিল, আর উপনিবেশের মধ্যে জাতিতে জাতিতে, ধর্ম ও জাতি-বর্ণ ইত্যাদি ভেদে আন্তঃ বিরোধ লাগিয়ে রাখে। বৈদেশিক শাসনের অবসানের পরও বহু বছর ধরে সে নীতির ফলাফলের বোঝা ভোগ করতে হয় দেশীয় জনসাধারণকে। অনেক ক্ষেত্রে কোন কোন জাতি দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে, অনেক ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ এলাকার জনগণকে নতুনতর ঔপনিবেশিক শাসনের বোঝা কাঁধে নিয়েই ঔপনিবেশিক প্রত্যক্ষ শাসন থেকে মুক্তি পেতে হয়। ফলে স্বাধীন হয়েও এ পশ্চাৎপদ অঞ্চল বা জাতিকে নতুন করে স্বাধীনতার আন্দোলনে অংশ নিতে হয়। বাংলাদেশ এ দুটি দিকেরই এক বাস্তব উদাহরণ। আরব জাতীয়তাবাদও সে ধরনেরই আর একটি উদাহরণ।[১২৬] আবার অনেক ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক শোষণের কবল থেকে মুক্তি পাবার লক্ষ্যে পশ্চাৎপদ জাতিগুলির মধ্যে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে, সেই আন্দোলনে অনেক জাতির একমাত্র শত্রু হয়ে দাঁড়ায় ঔপনিবেশিক শক্তি। ফলে সেখানে জাতীয়তাবাদ, ঔপনিবেশিক শাসন-বিরোধী চেতনার পাশাপাশি জাতিগুলির নিজেদের মধ্যে ঐক্যের অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করে। জাতীয়তাবাদ এই সমস্ত ক্ষেত্রেই আন্দোলনকারীদের মতাদর্শগত ভিত্তি হিসাবে কাজ করে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন সময়ে জাতীয়তাবাদ যে বিভিন্ন রূপ নিয়ে জাতীয় জাগরণের মতাদর্শ হিসাবে কাজ করে এসেছে, জন ব্রেইলি (১৯৮২) তার সব রূপকেই মূল্যায়ন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, বিভিন্ন দেশে যে নানা চরিত্রের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে বিদ্যমান রাষ্ট্রের সাথে আন্দোলনকারীদের তিন ধরনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ব্রেইলি লিখেছেন--

"The principle of classification should be based on the relationship between the nationalist movement and the existing state. Very broadly, a nationalist opposition can stand in one of three relationships to the existing state. It can seek to break away from it, to take it over and reform it, or to unite it with other states. I call this objectives separation, reform and unification."[১২৭] পল উইল কিনসনও (১৯৭১) অবশ্য জাতীয়তাবাদকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন; তবে তার বিভাজন ব্রেইলির বিভাজন থেকে স্বতন্ত্র। উইলকিনসনের মতে এই তিন শ্রেণীর জাতীয়তাবাদ হল নিম্নরূপ:

১. কৃষ্টি ও ভাষাগত জাতীয়তাবাদ (Cultural-linguistic nationalism);

২. তৃতীয় বিশ্বের ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী জাতীয়তাবাদ (Anti-colonial nationalism in the third world);

৩. জাতীয় বিবেক ও জাতীয় পুনর্জাগরণ (National conscience and National rejuvenation) মূলক জাতীয়তাবাদ।[১২৮]

এ দু' ধরনের শ্রেণী-বিভাগের পেছনেই যথেষ্ট যুক্তি আছে, কিন্তু দুটি ক্ষেত্রেই কিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়। ব্রেইলির শ্রেণী-বিভাগের 'সংস্কার' এবং উইলকিনসনের শ্রেণী-বিভাগের জাতীয় বিবেক ও জাতীয় পুনর্জাগরণের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। কেননা জাতীয়তাবাদের উষালগ্নে এর যে রূপ পরিলক্ষিত হয় তাতে যেমন দীর্ঘদিন ধরে ঝিমিয়ে-থাকা জাতিগুলির মাঝে আত্মোপলব্ধি হয় বা পুনরুজ্জীবন ঘটে; ঠিক তেমনই, সংস্কারের দাবি নিয়েও আন্দোলনকারিগণ পথে নামে। যে জাতীয়তাবাদ সেদিন সংস্কার আন্দোলনের মতাদর্শ হিসাবে কাজ করেছিল, সেটাই মূলতঃ জাতীয়তাবাদের চিরায়ত রূপ। ফলে সে জাতীয়তাবাদকে চিরায়ত জাতীয়তাবাদ বলাই অধিকতর যুক্তিসংগত। অন্য দিকে, বিচ্ছিন্ন হওয়া, একীভূত হওয়া কিংবা তৃতীয় বিশ্বের জনগণের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ থেকে মুক্তি লাভের জন্য আন্দোলন ইত্যাদির পিছনে মূলতঃ একই চেতনা কাজ করে। কেননা পশ্চাৎপদ দেশগুলির ওপর যখন ঔপনিবেশিক শাসন এসে চেপে বসে, কখন সে সমস্ত দেশের অধীনস্থ বিভিন্ন জাতির বিকাশের সামনে ঔপনিবেশিক শক্তি সাধারণ বাধায় পরিণত হয়, ফলে ঔপনিবেশিক শক্তির অধীন সমস্ত জাতি ও জনগণের সাধারণ শত্রুতে পরিণত হয় ঔপনিবেশিক শক্তি। ফলে পরাধীন জাতিগুলির মধ্যে একটি ঐক্যবদ্ধ চেতনার জন্ম হয়, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কিছুদিন চলতে থাকলে এ ঐক্য আরো দৃঢ়তর হয়। ঔপনিবেশিক শক্তির পক্ষ থেকে পরাধীন জাতিগুলির ওপর অত্যাচার-নিপীড়ন যত তীব্রতর হয়, ততই এই ঐক্যের চেতনা দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়ায়। শুধু আরবের বিভিন্ন জাতির ক্ষেত্রেই নয়, ভারতের ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটেছে। হাজার বছর ধরে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাসকারী ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ছোট ছোট জাতিকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ঐক্যবদ্ধ করে ফেলেছিল, তবে তার মাঝে যতটুকু বিভাজন ছিল তা ঔপনিবেশিক শক্তির ষড়যন্ত্রের কারণেই ঘটেছিল। ঔপনিবেশিক শক্তির ষড়যন্ত্রের কারণে বিভিন্ন আঞ্চলিক, ধর্মীয় বা জাতিগত বিরোধ নিয়ে যে আন্দোলনগুলি গড়ে উঠেছিল, তাও মূলতঃ একই কারণ থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল। অর্থাৎ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের শৃংখল থেকে মুক্তি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল। উপনিবেশোত্তরকালে এখনও বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার নিয়ে বা ঐক্যবদ্ধ হবার প্রশ্ন নিয়ে যে আন্দোলনগুলি হচ্ছে, তা প্রধানত ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের জের কিংবা জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার লংঘিত হবার ফল হিসাবেই তা ঘটছে। এভাবে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে যে আন্দোলনসংগঠিত হচ্ছে এবং যে জাতীয়তাবাদ তার মতাদর্শগত ভিত্তি হিসাবে কাজ করছে তা পূর্বোক্ত চিরায়ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও মতাদর্শ থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। চিরায়ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ছিল নির্যাত শ্রেণী-সংগ্রাম, কিন্তু জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীকারের প্রশ্ন নিয়ে যে আন্দোলন হচ্ছে তাকে প্রকৃত অর্থে শ্রেণী-সংগ্রাম বলা চলে না। কেননা এসব অঞ্চলে পুরো জাতিই যখন বাইরের কোন শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে, তখনই জাতীয়তাবাদী চেতনা সক্রিয়তা লাভ করছে। ফলে শ্রেণী নির্বিশেষে সমগ্র জাতিই এ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শরিক। অবশ্য এ জাতীয়তাবাদের একটি শ্রেণী ভিত্তি নিশ্চয়ই থাকে; তবে তা ভিন্ন প্রকৃতির। জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ- তা আজও বিকশিত হচ্ছে; আর এ কারণেই এ জাতীয়তাবাদ আধুনিক। তাই ঔপনিবেশিকতাবাদ-বিরোধী জাতীয়তাবাদকে আধুনিক জাতীয়তাবাদ বলাই অধিকতর যুক্তি সংগত।

ভাষা ও কৃষ্টিগত সমস্যা নিয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যে রূপগুলি দেখা যায়, সেগুলিকেও স্বতন্ত্র কোন শ্রেণীর জাতীয়তাবাদের অধীনে আনার কোন প্রয়োজন নেই; কেননা একটি জাতিসত্তার ওপর ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের ফলশ্রুতিতে এ সমস্ত

---

[১২৪] বার্মার জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন Golay, F.H.et.al.,(1969): Underdevelopment and Economic Nationalism in Southeast Asia. New York: Cornell University Press,chap.4.

[১২৫] উমর,বদরুদ্দীন (১৯৮৭): ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন, ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান,পৃ: ৬৪-৬৬.

[১২৬] Breuilly, John:op.cit, pp: 245-247.

[১২৭] Ibid,p.11.

[১২৮] Wilkinson,Paul, op.cit, pp:91-93.

Dhaka University Institutional Repository

সমস্যা দেখা দিতে পারে। আবার, একই দেশের ভিতর অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী জাতির নেতৃত্ব কর্তৃক পশ্চাৎপদ জাতিটি পদানত হতে পারে, কিন্তু এই উভয় ক্ষেত্রেই আগ্রাসী শক্তির পিছনে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার আকাংখা কাজ করে; যার মূল অনুপ্রেরণা জোগায় বুর্জোয়া শ্রেণীর বাজার দখলের আকাংখা- সে আন্তর্জাতিক পাশ্চাত্য বুর্জোয়া শ্রেণীই হোক অথবা তৃতীয় বিশ্বের অপেক্ষাকৃত অগ্রসর বুর্জোয়া শ্রেণীই হোক। যে কোন শক্তিই ভাষা-সংস্কৃতি অথবা অর্থনীতির ওপর আগ্রাসন চালাক না কেন, আক্রান্ত জাতির কাছে প্রতিরোধ আন্দোলনের চরিত্র এক। কেননা ভাষা কিংবা সংস্কৃতি অর্থনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় ঐতিহ্যকে বহন করার মত যদি একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং ক্ষুদ্র হলেও বিকাশমুখীন একটি বুর্জোয়া শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকে, তাহলে অর্থনীতি, সংস্কৃতি কিংবা ভাষা যার ওপরই আগ্রাসন হোক না কেন এরা প্রতিরোধ আন্দোলনে এগিয়ে আসবেই, কেননা ভাষা বা সংস্কৃতির ওপর আগ্রাসন শুধু তার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে না, এ দুটোর পথ ধরেই অর্থনীতির ওপর আগ্রাসন আসে কিংবা অর্থনৈতিক আগ্রাসনের প্রতিফলন হিসাবেই ভাষা-সংস্কৃতির ওপর আগ্রাসন আসে। ফলে ভাষা-সংস্কৃতির ওপর আগ্রাসনের প্রতিবাদে যে আন্দোলন সংগঠিত হয় তারও মতাদর্শগত ভিত্তি হিসাবে কাজ করে আধুনিক জাতীয়তাবাদই। অর্থাৎ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আন্দোলন আর ভাষা-সংস্কৃতির ওপর আগ্রাসনের প্রতিবাদে আন্দোলন-- এ দু'ধরনের আন্দোলনের মতাদর্শগত ভিত্তি এক। তাই, এটাকে জাতরিতাবাদের আলাদা কোন শ্রেণীভুক্ত করা যথাযথ নয়।

এ আধুনিক জাতীয়তাবাদের ধারণাটি স্পষ্ট করার জন্য জাতীয় প্রশ্ন নিয়ে অনুষ্ঠিত অতি সাম্প্রতিককালের একটি বিতর্ককে সামনে আনা প্রয়োজন। কেননা এ বিতর্কের ভিতর দিয়ে বর্তমান যুগের জাতীয়তাবাদ, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন শ্রেণীর মাঝে বিভিন্ন ধরনের কি আবেদন নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানকে বিশ্লেষণ করার জন্যও এ বিতর্কের উপস্থাপনা খুবই প্রাসংগিক। এ বিতর্কের সুত্রপাত করেন টম নায়ারণ (১৯৭৭)। নায়ারণ তার গ্রন্থে[১২৯] জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে মার্কসবাদীদের প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বকে চ্যালেঞ্জ করেন। পরবর্তীকালে নিকোস পোলানত্জাস (১৯৭৮) এবং হোয়াস ডেভিস (১৯৭৮) এই চ্যালেঞ্জের শরিক হন। তবে এরা নায়ারণ থেকে ভিন্নতর অবস্থান গ্রহণ করেন।

উপরোক্ত লেখকদের বক্তব্যকে বোঝার জন্য মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয়তাবাদ কি, সে বিষয়টি পরিষ্কার করা প্রয়োজন। মার্কসবাদীরা মনে করেন সমাজবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে জনসাধারণের মধ্যে যে রাজনৈতিক আচরণ পরিলক্ষিত হয় তা মূলতঃ বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেকার অভ্যন্তরীণ সংঘাতেরই প্রতিফলন। সমাজ বিকাশের গতিপথে নতুন নতুন শ্রেণীর বিকাশ হয়, আর পুরোনো শ্রেণীসমূহের সাথে উক্ত নবতর শ্রেণীর বিরোধ ঘটে। বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্মের মধ্য দিয়েই জাতি নামক বর্গটির বিকাশ সূচিত হয়। কেননা, জাতি শুধু মাত্র একটি ঐতিহাসিক বর্গ (category) নয়, নির্দিষ্ট যুগের একটি ঐতিহাসিক বর্গ। সে যুগ পুঁজিবাদের অভ্যুত্থানের যুগ। সামন্তবাদের অবলুপ্তির যুগ। সামন্ততন্ত্রের অবলুপ্তি ও পুঁজিবাদের অগ্রগতির এ প্রক্রিয়া আসলে জনগণের জাতি হিসাবে সংগঠিত হবারও একটি প্রক্রিয়া।[১৩০] নিশ্চিতভাবেই এ জাতি গঠন প্রক্রিয়াতে নববিকশিত বুর্জোয়া শ্রেণীই নেতৃত্ব দেয়। এটা সামন্তবাদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণীর এক ঐতিহাসিক শ্রেণী-সংগ্রাম। অগ্রসর পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে নববিকশিত বুর্জোয়া শ্রেণী, বিভিন্ন ধরনের বৈষয়িক অধিকার ও গণতন্ত্রের দাবিতে ব্যাপক সাধারণ মানুষকে তাদের নেতৃত্বে সংগঠিত করেছিল। এই বুর্জোয়া শ্রেণী প্রতিষ্ঠা করেছিল উন্মুক্ত বাজার অর্থনীতি। ঠিক এর বিপরীতে এ বুর্জোয়া শ্রেণীই পরবর্তীকালে অপরাপর দেশের পুঁজিবাদী বিকাশের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ইউরোপে এমনটাই ঘটেছিল। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে একটু আগেই পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেছিল। ফলে এরা দ্রুতই সমগ্র ইউরোপের বাজারের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। এদের শাসকশ্রেণীর কাছ থেকে পূর্ব ইউরোপীয়রা রাষ্ট্র গঠনের পথে প্রচন্ড বাধার সম্মুখীন হয়েছিল। পূর্ব ইউরোপের বিকাশমান বুর্জোয়া শ্রেণীর সামনে পশ্চিম ইউরোপের প্রবল দেশগুলির বুর্জোয়া শ্রেণী কিংবা তাদের নেতৃত্বে শাসকশ্রেণীর জোটই ছিল প্রধান বাধা। সে বাধার মূল রূপ ছিল বাজারের ওপর আগ্রাসন, যাকে সমর্থন করতো পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহ। এ পরিস্থিতিই পূর্ব ইউরোপের নবীন জাতিগুলিকে সংগ্রামের পথে ঠেলে দিয়েছিল; আর সে সংগ্রামের নেতৃত্বে ছিল সে সব দেশের নব্য বিকাশমান বুর্জোয়া শ্রেণী। বাজারের ওপর আগ্রাসনের ফলে পূর্ব ইউরোপের বুর্জোয়া শ্রেণীই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, আর এটাই ছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বের ভূমিকায় যাওয়ার মূল কারণ। বিকাশমান নতুন বুর্জোয়া শ্রেণী চেয়েছিল ঘরের বাজার দখল করতে এবং এভাবে পশ্চিম ইউরোপের বুর্জোয়াদের সাথে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হতে। এভাবেই পূর্ব ইউরোপের জাতীয়তাবাদের বিকাশ হয়। স্তালিনের কথায়-"বাজারই হচ্ছে বুর্জোয়া শ্রেণীর জাতীয়তাবাদ শিক্ষার প্রধান স্কুল।"[১৩১]

পশ্চিম ইউরোপের বুর্জোয়া শ্রেণী পূর্ব ইউরোপের শুধুমাত্র অর্থনীতির ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর ওপর তেমন কোন হস্তক্ষেপ করেনি। কিন্তু পুঁজিবাদ যখন সাম্রাজ্যবাদে রূপলাভ করে তখনই তারা এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলির অর্থনীতির উপরতো বটেই, সে সব দেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও প্রচন্ড আঘাত হানে। লেনিন দেখান, সাম্রাজ্যবাদ যখন পশ্চাৎপদ এই দেশগুলির ওপর ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা করে, তখন এ ঔপনিবেশিক শাসনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে গিয়ে তারা একটি শিক্ষিত শ্রেণী গড়ে তুলতে বাধ্য হয়, এ প্রক্রিয়ায় একটি ক্ষুদ্র বুর্জোয়াশ্রেণী এবং একটি শ্রমিকশ্রেণীর জন্ম দেয়। সাম্রাজ্যবাদ এবং তার সহযোগী দালাল দেশীয় শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে উক্ত শ্রেণীসমূহের ব্যাপক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তোলে।[১৩২] পশ্চাৎপদ দেশের জনগণের এ সংগ্রাম বাহ্যিকভাবে জাতীয় সংগ্রাম। বুর্জোয়া শ্রেণী প্রধানতঃ এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলেও কৃষক, শ্রমিকসহ অপরাপর শ্রেণী যতদিন এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করে ততদিন এ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সফল হতে পারে না। আর উক্ত বিভিন্ন শ্রেণী যে এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে তা উক্ত শ্রেণীসমূহের অস্তিত্ব রক্ষা ও বিকাশের আকাঙ্ক্ষা থেকেই। কোন্ শ্রেণী এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকে তার ওপরই নির্ভর করে আন্দোলনের সফল পরিসমাপ্তির পর বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রেণীগত সমস্যার সমাধান হবে কি হবে না। কিন্তু শ্রেণী আকাঙ্ক্ষা ছাড়া শুধু মাত্র জাতীয় সমস্যার কথা শুনে কৃষক-শ্রমিকসহ অপরাপর নির্যাতিত শ্রেণী এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে না। অর্থাৎ জাতীয় সংগ্রামও শ্রেণী সংগ্রামের অধীন ও তার অংশ।

---

[১২৯] Nairn,Tom,(1977): The Breakup of Britain, London: New Left Books.

[১৩০] স্তালিন, জে.ভি,(১৯৭৪): স্তালিন রচনাবলী, কলিকাতাঃ নবজাতক প্রকাশনা, দ্বিতীয় খন্ড (রচনাকাল ১৯০৭-১৩),পৃঃ-২৮৩। জাতির বিকাশের প্রক্রিয়া সম্পর্কে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন টম নায়রণ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩৪-৪১।

[১৩১] স্তালিন,জে.ভি, প্রাগুক্ত, পৃ:২৬।

[১৩২] Lenin,V.I. (1970): Collected Works, Moscow, Progress publishers,Vol.23,pp:60-61.

Dhaka University Institutional Repository

টম নায়ারণ লেনিনের এ ধারণাকে খন্ডন করতে গিয়ে মত প্রকাশ করেছেন যে, জাতীয়তাবাদ একটি মতাদর্শগত শক্তি। এটি আধুনিকায়ন এবং অসম উন্নয়নের ফসল। শ্রেণী-সংগ্রামের সংগে এর সম্পর্ক খুব সামান্যই। জাতীয়তাবাদ প্রশ্নে মার্কসবাদের এটা একটি ঐতিহাসিক ব্যর্থতা।[১৩৩] পোলানৎজার যুক্তি হল জাতি হচ্ছে স্বচালিত এবং একটি বাস্তব ব্যাপার। শ্রেণী নিরপেক্ষতাবেই থাকতে পারে এর অস্তিত্ব।[১৩৪] আর হোরাস ডেভিস আরো একটু কায়দা করে বলেছেন, জাতীয় সংগ্রাম আর শ্রেণী-সংগ্রাম পরস্পর পরিপূরক। একটি আরেকটির সংগে সম্পর্কিত। কিন্তু এদের প্রত্যেকেরই রয়েছে নিজস্ব চরিত্র।[১৩৫]

টম নায়ারণ পশ্চাৎপদ দেশগুলিতে ঔপনিবেশিক শক্তির আগ্রাসন সম্পর্কিত বিভিন্ন মার্কসবাদী তাত্ত্বিককে সমালোচনা করেন। নায়ারণের মতে পিছিয়ে পড়া দেশগুলিতে প্রবল দেশগুলির সামরিক ও অর্থনৈতিক উপস্থিতির দু' ধরনের প্রতিক্রিয়া পড়ে--

১. অসম উন্নয়নের বিকাশ ধারায় পিছিয়ে পড়া দেশগুলিতে শিল্পোন্নত পশ্চিম ইউরোপের উপস্থিতির ফলে সেখানে পাশ্চাত্য আধুনিকায়নের জের এসে পড়ে। ফলে পশ্চাৎপদ দেশগুলিতে কমবেশি একটি উন্নয়নের ধারা সৃষ্টি হয়।[১৩৬]

২. আধুনিকায়নের রাজনৈতিক বহিঃপ্রকাশের ফল হিসাবে পশ্চাৎপদ দেশগুলিতে জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের আকাক্ষা তথা, জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনার সৃষ্টি হয়।[১৩৭]

নায়ারণ মত প্রকাশ করেছেন, পশ্চিমা দেশগুলি পশ্চাৎপদ দেশগুলিতে আসার আগে এসকল দেশ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকেই শুধু পিছিয়ে ছিল না, চিন্তা-চেতনার দিক থেকেও তারা ছিল অনগ্রসর। পাশ্চাত্য শিল্পোন্নত দেশের উপস্থিতির পর এসব দেশের লোকেরা তাদের কাছ থেকে কোন কিছুই গ্রহণ করতে চায় না। তাদের অসচেতনতা, অযৌক্তিক আচার-আচরণ এবং অন্ধবিশ্বাস দ্বারা তারা আচ্ছন্ন থাকে। ফলে বিভিন্ন দিক থেকে স্থবিরতায় আচ্ছন্ন রক্ষণশীল এ মানুষদের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে প্রাপ্তির ব্যাপক পার্থক্য দেখা দেয়। ফলে সৃষ্টি হয় হিংসা, বিদ্বেষ ও হতাশা। সেই সাথে তৈরি হয় প্রচন্ড লালসা। এসব অযৌক্তিক মনোভাব থেকেই তৈরি হয় তাদের মাঝে জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন।[১৩৮] তার মতে, জাতীয়তাবাদের সাথে শোষণের কোন সম্পর্ক নেই। গণনির্যাতনের সাথেও এর কোন সম্পর্ক নেই। এমনকি এর সাথে সাম্রাজ্যবাদের প্রশ্নকে যুক্ত করারও কোন যুক্তি নেই। আসলে, পিছিয়ে-পড়া অঞ্চলে অভিজাত শ্রেণীর ক্ষমতাচ্যুত হবার কারণেই তাদের মাঝে হারানো স্বর্গ ফিরে পাবার আকাঙ্ক্ষা থেকে এসব ধারার জন্ম দেয়। এদিক থেকে জাতীয়তাবাদ এবং ফ্যাসিবাদের মতাদর্শগত ভিত্তি অভিন্ন। নায়ারণের মতে পশ্চাৎপদ সমাজের সনাতন এলিটবর্গ জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনার নেতৃত্ব দেয়। এখানে সাধারণ মানুষের তেমন কোন ভূমিকা থাকে না। ফলে সকল দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে শ্রেণী-সংগ্রামকে যুক্ত করা অর্থহীন।[১৩৯] টম নায়ারণের সমগ্র ধারণাকে সংক্ষেপিত করে ব্লাউট নিজের ভাষায় বলেন--

"The actors in this process are the elites of backward areas: it is they who are frustrated and envious, and who therefore decide to fight for state sovereignty, for an independent nationstate, in order to speed the development process, mobilizing the necessary mass support for this effort by means of ideological trickery."[১৪০]

নিকোস পোলানৎজা অবশ্য জাতীয়তাবাদকে টম নায়ারণের মত করে সমালোচনা করেননি, তবে "জাতীয়তাবাদের শ্রেণী-সংগ্রামের সাথে কোন সম্পর্ক নেই।"[১৪১] নায়ারণের এই বক্তব্যকে প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি জাতীয়তাবাদের ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে শ্রেণী-সংগ্রাম সম্পূর্ণ পৃথক একটি ব্যাপার বলে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেন, "we have to recognize that there is no Marxist theory of nation"[১৪২] তিনি দাবি করেন, জাতীয়তাবাদ শ্রেণী-সংগ্রাম থেকেও পুরোনো একটি বিষয় থেকে উদ্ভুত। আর সেটা হচ্ছে জাতি। আর যে মতাদর্শ একটি জাতিকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করায় তাই-ই হচ্ছে জাতীয়তাবাদ। এ জাতীয়তাবাদ আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করে। জাতীয়তাবাদ কোন কিছুর অধীন নয়, বরং তা একটি স্বয়ংক্রিয় শক্তি। পোলানৎজার জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত বক্তব্যকে ব্লাউট সংক্ষিপ্ত করে নিজের ভাষায় বলেছেন--

"The nation, therefore, is a truely basic, truely autonomous entity, something 'transhistorical', and something which obviously cannot be reduced to class processes and class struggle.....The state is substantial, material, and autonomous be-cause it is anchored in the nation– is, in the last analysis, a nation state. The state's specific autonomy from class struggle is explained in the same way:the state is rooted not in class but in a deeper an more obeding substance, the nation."[১৪৩]

পোলানৎজার উপরোক্ত বক্তব্য থেকে মনে হয়, তিনি শ্রেণী-সংগ্রাম বলতে শুধু বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীকেই বুঝে থাকেন, সমাজ বিকাশের ঐতিহাসিক ধারায় আদিম সমাজের পর থেকেই শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিত-নির্যাতিত শ্রেণীর শ্রেণী-সংগ্রাম চলছে বলে মার্কসবাদীরা ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন যে, তিনি মার্কসবাদীদের শ্রেণী-সংগ্রাম সংক্রান্ত এ ধারণাকে তেমন গুরুত্বই দেননি। তিনি তাঁর বক্তব্যে জাতি কিংবা রাষ্ট্র কিভাবে শ্রেণী বা শ্রেণী-সমাজ উদ্ভবের চেয়েও পুরোনো ব্যাপার, তারও কোন ব্যাখ্যা দেননি। ফলে তার স্বচালিত শক্তি বিষয়ক জাতীয়তাবাদী ধারণাটি অস্পষ্টই থেকে গেছে।

হোরাস ডেভিসও জাতীয়তাবাদকে স্বচালিত শক্তি হিসাবে দেখেছেন কিন্তু তার আলোচনা অনেক বেশী বিশ্লেষণাত্মক ও তথ্যপূর্ণ। ডেভিস জাতীয়তাবাদকে মার্কসবাদী তত্ত্বের বাইরের কোন তত্ত্ব হিসাবেও দেখাননি। তিনি শুধু 'জাতীয়তাবাদ শ্রেণী-সংগ্রামের সাথে

---

১৩৩ Nairn,Tom,op.cit.,pp:329-30.
১৩৪ Poulantzas, Nicos (1978): State,Power, Socialism,London, New Left Books,pp:96-97.
১৩৫ Davis, Horace(1978): Toward a Markist Theory of Nationalism,New York,Monthly Review press,pp:3-12.
১৩৬ Nairn,Tom,op.cit,pp:334-41.
১৩৭ Ibid,pp.96-104.
১৩৮ Ibid,p.336.
১৩৯ Ibid,pp.335-39.
১৪০ Blaut,James,op.cit.,p.65.
১৪১ Polantzas,Necos,op.cit.,p.99.
১৪২ Ibid, p.93.
১৪৩ Blaut,James M,op.cit.,p.64.

Dhaka University Institutional Repository

ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এই মার্কসবাদী প্রত্যয়কে চ্যালেঞ্জ করেছেন। তিনি শুরু করেছেন জাতীয় প্রশ্ন নিয়ে লেনিন ও লুক্সেমবার্গের মধ্যেকার বিতর্ক দিয়ে। তিনি সে বিতর্কের সার সংক্ষেপ করে দেখিয়েছেন যে, জাতীয়তাবাদ প্রশ্নে লেনিন ও লুক্সেমবার্গের মধ্যকার পার্থক্যটি মৌলিক নয়। কেননা, তাঁদের মধ্যকার বিরোধের মূল বিষয়টি হলো: জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ বলতে কি বোঝায়, এই অধিকার একটি জাতির থাকা উচিত কি উচিত নয় এবং তা থাকলে কতটুকু থাকা উচিত ইত্যাদি নিয়ে। কিন্তু যখন জাতির ওপর নিপীড়ন নেমে আসে তখন জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রশ্নটি যে বড় হয়ে ওঠে তা তাদের কেউই অস্বীকার করেননি।[১৪৪] এখানে লক্ষ্য করার মত ব্যাপার হল ডেভিস ও টম নায়ারণ ও পোলানত্জার মত জাতীয়তাবাদ আর আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামকে এক করে ফেলেছেন। আগেই লক্ষ্য করা গেছে যে, পশ্চাৎপদ কোন দেশ বা জাতি যখন অগ্রসর ধনবাদী কোন রাষ্ট্র কর্তৃক কিংবা ঔপনিবেশিক কোন শক্তি কর্তৃক আক্রান্ত হয়, তখন সে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার আদায়ের সংগ্রামের পেছনে যে জাতীয়তাবাদ মতাদর্শ হিসাবে কাজ করে, সে জাতীয়তাবাদ চিরায়ত জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্নতর। তাই ঢালাওভাবে জাতীয়তাবাদকে ব্যবহার করার এ পদ্ধতি বিভ্রান্তিকর সিদ্ধান্তেই নিয়ে যাবে। অন্যদিকে, মার্কসীয় বই-পুস্তকে জাতীয়তাবাদকে যেভাবে শ্রেণী-সংগ্রামের সাথে যুক্ত করা হয়েছে, তাকে খন্ডন করার জন্য ডেভিসের লেখাতে শুধু মাত্র ঔপনিবেশিক শক্তি কর্তৃক আক্রান্ত জাতির সার্বভৌমত্ব রক্ষার লড়াই প্রসঙ্গে যেখানে আলোচনা করা হয়েছে সেখান থেকেই বেছে বেছে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে; চিরায়ত জাতীয়তাবাদ যে সেদিন সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল, তার সাথে কোনই পার্থক্য করা হয়নি। সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য একটি জাতির যে সংগ্রাম, তাও জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ দ্বারা পরিচালিত কিন্তু তা চিরায়ত জাতীয়তাবাদ থেকে ভিন্ন। কেননা, এ সংগ্রাম সমগ্র জাতির প্রতিটি শ্রেণীর অস্তিত্বের সংগ্রাম। নায়ারণ ও পোলানত্জার মতই ডেভিস কথাটি বুঝতে পারেন নি।

ডেভিস নির্যাতিত জাতিসমূহের মুক্তির আন্দোলন সম্পর্কে লেনিনের বক্তব্যকেও ভুলভাবে উপস্থাপন করেছেন এবং লুক্সেমবার্গের বক্তব্যের সাথে তার বক্তব্যকে গুলিয়ে ফেলেছেন। ডেভিস মত প্রকাশ করেছেন, দু'জন বিপ্লবীরই নৈতিক অবস্থান ছিল অভিন্ন, তবে কৌশল ছিল ভিন্ন। তার মতে, লুক্সেমবার্গের চেয়ে লেনিনের কৌশল যে বেশি কার্যকর প্রমাণিত হয়েছিল, সে কথা বলা যাবে না; কেননা, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সমুন্নত রাখার যে কৌশল লেনিন নিয়েছিলেন, বাস্তবে সেটি ১৯১৯ সালের বলশেভিকদের কংগ্রেসে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।[১৪৫]

তিন দিক থেকে ডেভিসের এ কথাগুলি সঠিক নয়। প্রথমত, লেনিন স্পষ্ট মতামত রেখেছিলেন, পুঁজিবাদী শাসনের আওতায় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জিত হবার আগ পর্যন্ত জাতীয় নিপীড়ন বন্ধ হতে পারে না। লুক্সেমবার্গ কখনই তা বুঝতে চাননি। এ বিষয়টি ডেভিসের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, ডেভিস যাকে লেনিনের ধারণা বলে বুঝেছেন, তার অনেক কিছুই আদতে লেনিনের মতামত নয়। ফলে জাতীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে সাধারণ জাতীয় সংগ্রাম বলতে লেনিন যা বলেছেন তার সাথে লুক্সেমবার্গের মতামতকে তিনি একাকার করে ফেলেছেন। যেমন, একটি দেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিকে জোরালোভাবে তুলে ধরা গেলে জাতীয় নিপীড়ন-বিরোধী লড়াই অনেক বেশি শক্তিশালী হতে পারে, লেনিনের এ অভিমতকে লুক্সেমবার্গ স্বীকার করেননি। ডেভিস ঐ দু'জনের মধ্যকার এ সুনির্দিষ্ট পার্থক্যকেও নির্দেশ করতে পারেননি। তৃতীয়ত, ১৯১৯ সালের কংগ্রেসে লেনিনের জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের তত্ত্ব বাতিল হয়নি, বরং লেনিনের সুপারিশ অনুযায়ীই পার্টির মূল কর্মসূচী থেকে 'আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার' সংক্রান্ত ধারাটি বাদ দেওয়া হয়। লেনিন উক্ত তত্ত্বটি বাতিল না করে কিছু সংশোধনীর মাধ্যমে বক্তব্যকে আরো জোরালো করেন। লেনিনের মতে 'আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার' শব্দটি অত্যন্ত দ্ব্যর্থক শব্দ। তার জায়গায় একটি নিশ্চিত অর্থ জ্ঞাপক 'অপসারণের অধিকার' শব্দটি যোগ করার উপদেশ দেন লেনিন।[১৪৬]

ডেভিস যে যুক্তিতে জাতীয় সংগ্রামকে শ্রেণী-সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন একটি ব্যাপার হিসাবে দেখাতে চেয়েছেন তাও ঠিক নয়। কেননা, তাঁর মতে যেখানে শ্রেণী আছে সেখানেই শুধু জাতীয় সংগ্রামে শ্রেণীগত অংশগ্রহণের প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক। কিন্তু যে সমাজে শ্রেণী নেই, সেখানকার জাতীয় সংগ্রামকে এর পর্যায়ভুক্ত করা চলে না।[১৪৭] ডেভিসের এ ধারণাকে মেনে নেওয়া যায় না। কেননা, শ্রেণী-বিভাজন ছাড়া কোন জাতিকে কল্পনা করা যায় না। মার্কস-এঙ্গেলস্ যেমন তাঁদের কমিউনিস্ট ইস্তেহারে খুব জোরালো ভাষায় বলেছেন 'আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গেছে তাদের সকলের ইতিহাস (লিখিত ইতিহাস) শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস'।[১৪৮] তাঁদের কথা বাদ দিলেও একটি জাতি গঠনের প্রক্রিয়াকে লক্ষ্য করলেই দেখা যায়: শুধু শ্রেণী-বিভাজন নয়, বুর্জোয়া শ্রেণী বিকাশের আগ পর্যন্ত কোন জনগোষ্ঠীই জাতি হয়ে উঠতে পারে না। ডেভিস আদিবাসী সংখ্যালঘুদের প্রশ্ন তুলেছেন। যে সমস্ত আদিবাসী এখনও শ্রেণীহীন সামাজিক অবস্থানে রয়ে গেছে, তারা যদি তাদের বাসস্থান ও ভূখন্ডকে রক্ষা করার জন্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রামেও অবতীর্ণ হয় তাহলেও তাদের সে সংগ্রাম জাতীয় সংগ্রাম নয়; বড়জোর তা একটি মানব গোষ্ঠীর অস্তিত্বের লড়াই মাত্র।[১৪৯]

বিখ্যাত মার্কসবাদী তাত্ত্বিক এরিক হবস্‌বম (১৯৭৭) টম নায়ারণের জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত ধারণাকে পরিপূর্ণরূপে খন্ডন করেন। হবস্‌বম শুধু নায়ারণের বক্তব্যকেই খন্ডন করেননি, জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গিও গড়ে তুলেছেন। হবস্‌বম যথাযথভাবে বুঝতে পারেন যে, যে জাতীয়তাবাদ একদিন পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করেছিল, জাতীয় অগ্রগতির ক্ষেত্রে কালজয়ী ভূমিকা রেখেছিল সে জাতীয়তাবাদের এখন আর সে সময় নেই। তার মতে উনিশ শতকের ইউরোপেরও জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, কিন্তু এখন আর জাতীয়তাবাদ তা পারে না। সেদিন পেরেছিল তার কারণ, সে সময় জাতীয় রাষ্ট্রগুলিই বিশ্ব পুঁজিবাদের রসদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল।[১৫০] কিন্তু সে সময় এখন বদলে গেছে। তাঁর মতে,

---

[১৪৪] Davis,Horace B. op.cit,pp:54-65.
[১৪৫] Ibid,p.54-65.
[১৪৬] Lenin, V.I. op.cit., p.472.
[১৪৭] Davis,Horace B. op.cit., pp:220-28.
[১৪৮] মার্কস কার্ল ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস, 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার' প্রাগুক্ত, পৃঃ২৬।
[১৪৯] রহমান, আতিউর ও লেনিন আজাদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ১৮।
[১৫০] Hobsbawm Eric, (1977): "Some Reflections on The Break-up of Britain", LondonG New Left Review,No. 105,pp:3-4.

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যমান রাষ্ট্রসমূহকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করার প্রক্রিয়াই হচ্ছে বর্তমান যুগের জাতীয়তাবাদ।[১৫১] হবস্‌বম তাঁর প্রবন্ধে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে কয়েকটি সিদ্ধান্ত টানেন- সেগুলির প্রথম তিনটি হল-

(1) The nature and goals of national movements have changed profoundly since the first world war. Some of the older forms were national, and all could be judged from the stand point of a national theory. This is not true of newer forms.

(2) The development of capitalism has tended to diminish the importance of sovereignty, of nation states, which are losing their significance in proportion as capitalism becomes more fully international.

(3) The virtual disappearance of formal empires (colonealism) has snapped the mainlink between anti-imperialism and the slogan of national self-determination. Struggles against neocolonialism are not national struggles. Therefore, nationalism today is mainly confined to the fission of "developed" capitalist states.[১৫২]

হবস্‌বমের এ ধারণাগুলি গড়ে উঠেছে বিশ্ব অর্থনীতি ও রাজনীতি পরিবর্তনের বিশ্লেষণ থেকে। তিনি দেখিয়েছেন পাশ্চাত্য পুঁজিবাদের বিকাশ যখন জাতীয় পরিসর থেকে বেরিয়ে আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করে তখন অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ দেশগুলিতে যে আন্দোলন সূচিত হয়েছিল তার মধ্য দিয়ে আধুনিক জাতীয়তাবাদের প্রকৃত প্রতিফলন ঘটেছিল। এ সময় পূর্ব ও মধ্য ইউরোপের বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল অগ্রসর দেশগুলির প্রবল বুর্জোয়া শ্রেণী। তাই নবীন বুর্জোয়াদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামতে হয়। ফলে সে সব এলাকায় গড়ে ওঠে জাতীয় রাষ্ট্র। নবীন বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে গোটা জাতিই সংগঠিত হতে থাকে। এ জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে একদিকে যেমন পুরোনো সামন্তবাদী শাসনের অবসান ঘটে, আবার অন্যদিকে, সামাজিক অর্থনৈতিক বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়। এ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই বিচ্ছিন্ন ভূখন্ড ও জনসাধারণকে তারা একত্রিত করার প্রয়াস পায়।[১৫৩] কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে জাতীয়তাবাদের এ ধারা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। আন্তর্জাতিক অবস্থার এমন পরিবর্তন ঘটে যে, ধনী দেশগুলির জন্যও ঔপনিবেশিক শাসন আর লাভজনক থাকে না। ফলে, অধিকাংশ দেশকে তারা স্বাধীনতা প্রদান করে, কিন্তু তারা এমন শ্রেণীর কাছে ক্ষমতা প্রদান করে, যাতে ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোটি টিকে থাকে। অন্যদিকে, এ সমস্ত দেশকে এমনভাবে মুক্তি দেওয়া হয় যাতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশে এই পশ্চাৎপদ দেশগুলি বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলে, এ সমস্ত দেশের আন্তর্জাতিক অর্থনীতির ওপর প্রভাব খাটাবার কোন ক্ষমতা থাকে না এবং অর্থনৈতিকভাবে হয়ে পড়ে নির্ভরশীল। অন্যদিকে, তারা বহুজাতিক সংস্থাসহ বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অনুন্নত সদ্য স্বাধীন দেশগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে থাকে। এভাবে, পশ্চাৎপদ বিশ্বকে অসংখ্য ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করার পিছনে মূল কারণ ছিল, পাশ্চাত্য শক্তি ও পুঁজির সঙ্গে এদের দরকষাকষির গড়-পড়তা আকার ও ক্ষমতাকে কমিয়ে আনা। হবস্‌বম বলেছেন-

"The multiplication of independent sovereign states substantially changed the sense of the term 'independence' for most of them into a synonym for 'dependence' ....we may leave aside the obvious fact that many of them exist as independent states only on sufferance or under protection. ....They are economically dependent in two ways: generally, on an international economy they cannot normally hope to influence as individuals: and specifically— in inverse proportion to their size— on the greater powers and transitional corporations. The fact that they today prefer— or find indispensable— a neocolonial relationship rather than something like a formalized dependence, should not mislead us. On the contrary. The optimal strategy for a neocolonial transnational economy is precisely one in which the number of officially sovereign states is maximized and their average size and strength— i.e. their power to effectively impose conditions under which foreign powers and foreign capital will have to operate— is minimized."[১৫৪]

তাই ঔপনিবেশিক শক্তির জন্য পশ্চাৎপদ দেশগুলি যত বিভক্ত হয় ততই ভাল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে পাশ্চাত্য বিশ্ব যখন এ কথা বুঝতে পারলো, তখন থেকেই উপনিবেশবাদ-বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলির মধ্যে এমন সব বীজ বপন করতে শুরু করলো যে উপনিবেশগুলি অসংখ্য ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় এবং এই খন্ড-বিখন্ড রাষ্ট্রগুলিও অসংখ্য আত্মবিরোধ নিয়ে জন্মলাভ করে। ঔপনিবেশিক শক্তির নানা ধরনের নীতির কারণেই উপনিবেশের কোন কোন অঞ্চল অন্ধকারাচ্ছন্ন থেকে যায়, আর কোন কোন অঞ্চল আংশিকভাবে উন্নতি লাভ করে। ফলে, একই প্রশাসনের অধীনস্থ উপনিবেশের মধ্যেই বিভিন্ন আঞ্চলিক স্বার্থ গড়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ, বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির "Divide and Rule" নীতির কারণে সমগ্র ভারতবর্ষ, এমনকি সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার জনতার মধ্যকার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয়তাবাদী ধারণাটি কোন দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পারেনি। বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে এমন ধরনের অভ্যন্তরীণ সংকট দেখা যায় যে, সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বেশ কয়েকটি দেশে ভাগ হয়ে যায়। বৃটিশরাজের সে নীতির কারণেই কৃত্রিম মুসলিম জাতীয়তাবাদী ধারণা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ করে, এর পরিণতিতে বাংলাকে বিভক্ত করে তার পূর্ব অংশকে বহু দূরবর্তী একটি অঞ্চলের সাথে জুড়ে দিয়ে পাকিস্তান নামক একটি কৃত্রিম রাষ্ট্র সৃষ্টি করা হয়; যে রাষ্ট্র পুনরায় আবার ভাঙ্গনের বীজ সাথে নিয়েই জন্ম লাভ করেছিল।[১৫৫] আসলে উপনিবেশসমূহে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শাসন দীর্ঘস্থায়ী করার লক্ষ্যে তারা উক্ত কৌশলগুলি গ্রহণ করে। কিন্তু যখন পুঁজিবাদের ব্যাপকতম বিকাশের কারণে তার অভ্যন্তরীণ কাঠামোতে পরিবর্তন সূচিত হয়, সরাসরি উপস্থিত না থেকেও পুঁজির শোষণকে অব্যাহত রাখা যায়, তখন আর উপস্থিত থেকে দেশীয়দের কাছ থেকে ঘৃণা কুড়াবার অর্থ কি হতে পারে। আগের দিনের বৃহৎ জনশক্তি ও সম্পদের ধারণা পাল্টে গিয়ে এখন আন্তর্জাতিক বাজারে কে কতটুকু প্রভাব বিস্তার করছে তা দ্বারাই রাষ্ট্রের গুরুত্ব নির্দেশিত হচ্ছে। কেননা আগে যেমন উক্ত সম্পদগুলি সামরিক শক্তির স্মারক হিসাবে ব্যবহৃত হত, কিন্তু এখানকার এই পারমাণবিক যুগে সামরিক শক্তির নিয়ামক এসব কিছুই নয়।[১৫৬] হবস্‌বমের মতে বহুজাতিক কর্পোরেশন বিকাশের মধ্য দিয়ে বিশ্ব

---

১৫১ Ibid, p.7.
১৫২ Ibid, Sammarized by Blaut, op.cit.,p.104.
১৫৩ Hobsbawm,Eric, Ibid, pp:5-6.
১৫৪ Ibid,pp.7-8.
১৫৫ রহমান,আতিউর ও লেনিন আজাদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ৩৪-৩৫।
১৫৬ Hobsbawm,Eric. op.cit.,pp.6-7.

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনীতির এই ব্যাপক পরিবর্তন সুচিত হয়েছে; যার ফলে ঔপনিবেশিক শক্তি ঘরে বসেই সারা বিশ্বকে শোষণ করতে পারছে। এ প্রসঙ্গে হবস্‌বম বলেছেন–

"Quite apart from the fact that in the era of nuclear superpower even a fairly high potential of production, men, and resources is no longer sufficient for the military status which was formerly the criterion of a 'great power', the rise of the transnational corporational division of labour and its management have transformed both the international division of labour and its mechanism, and changed the criterion of a state's 'economic viability.' This is no longer belived to be an economy sufficiently large to provide an adequate 'national market' and sufficiently varied to produce most of the range of goods from foodstuffs to capital equipment, but a strategic position somewhere along the complex circuits of an integrated world economy, which can be exploited to secure an adequate national income."[১৫৭]

হবস্‌বম আরো বলেন, পুরোনো দিনের সংজ্ঞায় অর্থনীতির আকার যেমন জরুরী ছিল, নতুন প্রেক্ষাপটে তা মোটেই জরুরী নয়। অনেক বড় রাষ্ট্রের বেলাতেও কথাটি প্রযোজ্য। তবে বৃটেন ও বার্বোডাসের মধ্যে যে তফাৎ সেটি শুধু পরিমাণের দিক থেকেই নয়, মাত্রার দিক থেকেও। ফলে বার্বোডাসের মত একটি দেশের পক্ষে স্বাধীনতা অর্জন করেও বৃটেনের মত একটি শক্তিশালী দেশের সাথে যে কোন ধরনের প্রতিযোগিতায় এঁটে ওঠা সম্ভব নয়।[১৫৮] আর যে সমস্ত নতুন দেশ জন্ম থেকেই বিভিন্ন ধরনের জাতিগত বিরোধ নিয়ে স্বাধীনতা পেয়েছে সে সমস্ত দেশ আন্তর্জাতিকভাবে যেমন ঔপনিবেশিক বিভিন্ন ধরনের শৃংখলে আবদ্ধ, আবার দেশীয়ভাবেও বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় জর্জরিত। সদ্য স্বাধীন দেশসমূহের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উন্নত জাতিগুলিই অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে এগিয়ে। তাই তারাই দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বও দখল করে।

হবস্‌বমের এ ধারণা গড়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ ও জাতীয় রাষ্ট্র সংক্রান্ত তার চিন্তা–চেতনার প্রতিফলন হিসাবে। আজকের দিনে জাতি সমস্যাকে উপলব্ধি করার জন্য হবস্‌বমের কথাগুলি খুবই প্রণিধানযোগ্য। কেননা, ইতিহাসের যে স্তরে জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ পৃথিবীকে আলোড়িত করেছিল, দেশে দেশে প্রগতির জোয়ার বয়ে গিয়েছিল, যুগসন্ধিক্ষণের সেই ঝড়ো সময় এখন আর নেই। কিন্তু কি কারণে পরিস্থিতির এই পরিবর্তন ঘটলো তার বিশ্লেষণ কিন্তু হবস্‌বম করেননি। শুধু মাত্র বহুজাতিক করর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার কারণেই কি এই ধরনের পরিবর্তন হয়েছে? ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে উনিশ শতকের শেষ থেকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছিল এবং যা ঔপনিবেশিক শক্তির অবসান পর্যন্ত চলেছিল, সে সংগ্রামের পরিসমাপ্তি কিভাবে হয়েছিল, সে প্রশ্নটি কিন্তু হবস্‌বম আলোচনায় আনেননি। যে শ্রেণী সেদিন অধিকাংশ সদ্য স্বাধীন দেশের নেতৃত্ব পেয়েছিল; তাদের জন্ম, বিকাশ এবং নেতৃত্ব অর্জনের ইতিহাস হবস্‌বমের আলোচনায় আসেনি। আর তা আসেনি বলেই তিনি অনেক সত্য উদ্‌ঘাটনের পরও কতকগুলি ভুল সিদ্ধান্তে গিয়ে উপনীত হয়েছেন। তিনি সিদ্ধান্তে পৌছিয়েছেন বর্তমানে পুঁজির বিকাশের জন্য বিশাল দেশ কিংবা অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কেননা, পুঁজিবাদ আজ আন্তর্জাতিক ব্যাপ্তি পেয়েছে। রাষ্ট্র তাই জাতীয় অর্থনীতির সঙ্গে কার্যকর সম্পর্ক রক্ষা করতে পারছে না।[১৫৯] আর তাই, জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব দু'ই কমে গেছে।

পুঁজিবাদ আন্তর্জাতিক ব্যাপ্তি পেয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু সদ্য স্বাধীন একটি দেশের বিকাশের জন্যও কি অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের কোন প্রয়োজন নেই? হাঁ, বৈদেশিক ঋণ এবং বহুজাতিক সংস্থার কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে কিছু পরিমাণে শিল্পের অগ্রগতি হতে পারে বটে, কিন্তু জাতীয় পুঁজি বিকাশের ক্ষেত্রে তার অবদান থাকে কতটুকু? আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে প্রভাব বৃদ্ধির ক্ষেত্রেই বা তার কতটুকু অবদান থাকে। আর কোন্ শ্রেণীর নেতৃত্বে এই উন্নয়ন কর্মকান্ডগুলি ঘটবে তা না প্রকাশ করলে গোটা ব্যাপারটাই ধোঁয়াটে থেকে যায়, কেননা এমন হতেই পারে যে, আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের সমর্থক, সহযোগী এবং ক্ষুদে অংশীদার একটি দালাল শ্রেণীর কাছে এ নেতৃত্ব চলে গিয়েছে। এমন সন্দেহের সংগত কারণও আছে, কেননা অধিকাংশ পরাধীন দেশেরই স্বাধীনতা এসেছে ঔপনিবেশিক শক্তির শর্তে ও ইচ্ছায়। তার অর্থ, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে যে দেশগুলি স্বাধীনতা পেয়েছে তা নয়, বরং ঔপনিবেশিক শক্তিই তার পছন্দ মত শক্তির হাতে দেশগুলির নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়েছে। ফলে তৈরি হয়েছে নয়া–ঔপনিবেশবাদ। নয়া উপনিবেশিক শোষকেরা আন্তর্জাতিক পূঁজির স্বার্থে দেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিচ্ছে, আর অন্যদিকে, জনসাধারণের ওপর চালানো হচ্ছে নির্যাতনের ষ্টীমরোলার। আর এ কারণেই সম্ভবত হবস্‌বম নিজেই লক্ষ্য করেছেন, ঔপনিবেশিক আমলের চেয়ে নয়া–ঔপনিবেশিক আমলের সরকারগুলি বেশি স্বৈরাচারী।[১৬০] কিন্তু জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ দ্বারা যদি সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধ হয় এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সফল পরিসমাপ্তির মধ্য দিয়ে যদি দেশ স্বাধীন হয়, তাহলে সমগ্র জনগণের ওপর কতিপয় লোকের শাসন প্রতিষ্ঠা হতে পারে না; সে সরকারে থাকবে সাম্রাজ্যবাদ–বিরোধী সমস্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব। নেতৃত্ব যে কোন একটি শ্রেণীর হাতে থাকতে পারে কিন্তু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যদি সাম্রাজ্যবাদ–বিরোধী সমস্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব থাকে এবং শ্রেণীসমূহের যৌথ প্রচেষ্টায় যদি আন্দোলনের পরিসমাপ্তি হতে হয়, তাহলে উক্ত আন্দোলনে কর্তৃত্বশীল শ্রেণীর নেতৃত্বাধীন বাহিনীই পারে তা সফল করতে। এই বাহিনীই পরবর্তীকালের গণতন্ত্রের নিশ্চয়তা দিতে পারে। কেননা, যে কোন শ্রেণী কিংবা গুটিকয়েক ব্যক্তি যদি স্বাধীনতার লক্ষ্যের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহলে এ বাহিনীই সে চক্রান্ত থেকে দেশকে রক্ষা করবে। আর যদি সাম্রাজ্যবাদের সাথে আপোসের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা আসে তাহলে, ঔপনিবেশিক আমলের বাহিনীই সে চক্রান্তকে রক্ষা করে অথবা তার নেতৃত্ব দেয়। আজ তৃতীয় বিশ্বের সদ্য স্বাধীন দেশগুলির চিত্র মূলত তাকেই নির্দেশ করে। হবস্‌বম এ দিকটি বিবেচনা না করেই ঢালাও মন্তব্য করেছেন।

হবস্‌বম বর্তমানের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বলতে শুধু মাত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে দেখেছেন কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেননি যে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হচ্ছে তা ঔপনিবেশিক শাসনেরই জের। ঔপনিবেশিক শক্তির কাছ থেকে আপোসের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভ করে, দালাল নেতৃত্ব ঔপনিবেশিক আমলের সামরিক বাহিনী ও আমলাতন্ত্রকে দিয়ে অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলির ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করছে; পশ্চাৎপদ জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে লংঘন করছে। সে কারণেই পশ্চাৎপদ

---

[১৫৭] Ibid,p.7.
[১৫৮] Ibid :p-7.
[১৫৯] Ibid,p.8.
[১৬০] Ibid, p.8.

Dhaka University Institutional Repository

জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিতে নতুন করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যদি সফল পরিসমাপ্তি ঘটে, তাহলে আর একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন দেশের জন্ম হয় ঠিক, কিন্তু তাতে সাম্রাজ্যবাদের বাড়তি কোন সুবিধা হয় না। বরং এই ছোট্ট জাতিটির ওপর তার সহযোগী অপেক্ষাকৃত উন্নত অঞ্চলের আমলা মুৎসুদ্দি শ্রেণীটির যে শোষণ-শাসন চলছিল তার অবসান ঘটে। যথার্থ জাতীয়তাবাদী শক্তির হাতে ক্ষমতা আসলে শুধু উন্নত অঞ্চলের স্বার্থই বিনষ্ট হয় না, আন্তর্জাতিক বুর্জোয়া শ্রেণীরও স্বার্থের হানি ঘটে। যত ছোট বাজারই হোক না কেন এটা তার হাত ছাড়া হয়। কষ্ট হলেও সে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে, অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের পরিমাণই সে সময় তাকে রক্ষা করতে পারে। অন্যদিকে, যদি তা বড় এলাকা হয়, তাহলে পায়ের নিচে মজবুত ভিত্তি নিয়েই সে বিকাশের যাত্রা শুরু করতে পারে। তবে বুর্জোয়া শ্রেণী এর নেতৃত্ব দিলে তার স্বাধীন সত্তা রক্ষা করে চলতে পারে কিনা তা নিয়ে অনেক বিতর্ক হতে পারে। ইতিপূর্বে এ নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে। সে বিতর্কে না গিয়েও বলা যায়, যে শ্রেণীর অস্তিত্ব রক্ষা ও বিকাশ নির্ভর করে বিশ্ব পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে অব্যাহত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, সেই ধরনের কোন শ্রেণীর নেতৃত্বে যদি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে সদ্য স্বাধীন কোন দেশের জন্য অসংখ্য হুমকি থাকলেও তা নয়া-ঔপনিবেশ হয়ে যাবার কোন সম্ভাবনা থাকতে পারে না।

২.৭. ফ্যাসিবাদি ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলন (Fascism and Anti-fascist Movement)

উপরোক্ত শ্রেণীগত আন্দোলন এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন উভয় ক্ষেত্রেই আন্দোলনকারীদেরকে অনেক সময়ই ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে অংশ নিতে হয়। কেননা সমগ্র দেশের ওপর ক্ষুদ্র একটি শ্রেণী কিংবা সমগ্র জাতির ওপর বৈদেশিক কোন শক্তির সমগ্র ক্ষমতা (Total Power) প্রয়োগ করার যে নীতি, তাই ফ্যাসিবাদ। ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত ধারণা হল, ব্যাপক জনসাধারণের ওপর কতিপয় সংখ্যালঘু ব্যক্তির গোষ্ঠীগত ইচ্ছাকে চাপিয়ে দেওয়া। বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়ার জার সরকার ফ্যাসিবাদী সরকার ছিল, তার কারণ, সেখানে ব্যাপক জনসাধারণের ওপর সংখ্যালঘুদের একচেটিয়া ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। হেবার্ল এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, রুশ সরকার ছিল, "the Fascists because they represented a minority aiming at total power."[১৬১] ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত এ ধারণাটির আলোকেই বর্তমান আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে। অগণতান্ত্রিক চরিত্রের কারণেই ফ্যাসিবাদ বা স্বৈরাচার সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ওপর নির্যাতন চালায়, ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী ইচ্ছামত সরকার পরিচালনা করে। ঔপনিবেশিক সরকার সব সময়ই স্বৈরাচারী এবং সে স্বৈরাচার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সমস্ত শ্রেণীর ওপরই প্রয়োগ হয়। ফলে ঔপনিবেশিকতাবাদের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে এ সংগ্রাম মূলত গোটা জাতির সংগ্রাম। ফলে এর মতাদর্শ থাকে জাতীয়তাবাদ। অন্যদিকে, একটি দেশের মধ্যে যখন কতিপয় ব্যক্তির বা কোন প্রতিষ্ঠানের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, যে শাসনের কোন বৈধতা থাকে না, সেই ধরনের সরকারের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন, তা মূলত শ্রেণী-আন্দোলন। এ স্বৈরাচার সবশ্রেণীকেই আঘাত করে না, ফলে কোন কোন শ্রেণী এ শাসনকে রক্ষা করে। যে শ্রেণীগুলি স্বৈরাচার দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়, সে সমস্ত শ্রেণী তাদের স্ব-স্ব মতাদর্শ থেকেই উক্ত স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে এগিয়ে আসে।

স্বৈরাচার-বিরোধী আন্দোলন কখনও জাতীয়তাবাদী রূপ গ্রহণ করে, আবার কখনও শ্রেণী রূপ গ্রহণ করে। কিন্তু জাতীয়তাবাদী রূপ সম্পন্ন যে স্বৈরাচার-বিরোধী আন্দোলন তাকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হিসাবেই দেখা হয়ে থাকে, কেননা, সেখানে জাতীয় চেতনা প্রাধান্য পায়। কিন্তু একটি দেশের অভ্যন্তরে যখন স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ কোন ন্যায্যতা ছাড়াই কোন গোষ্ঠী কিংবা কোন প্রতিষ্ঠান ক্ষমতায় আসীন হয়, বিদ্যমান মূল্যবোধকে অগ্রাহ্য করে; তখন যে আন্দোলনের সূচনা হয়, তা শ্রেণী-আন্দোলন থেকে ভিন্ন। বিদ্যমান আইন, মূল্যবোধ, এমনকি, প্রচলিত প্রথা যে শাসনকে ন্যায্যতা দেয় না, তাকে স্বাভাবিকভাবেই জনতার ওপর বলপূর্বক শাসন চালাতে হয়। অবশ্য, অনেক সময় নির্বাচিত সরকারও স্বৈরাচারী হয়ে যেতে পারে। কেননা, সে এক পর্যায়ে সংবিধানকে লংঘন করে কিংবা জনমতকে অগ্রাহ্য করে বলপূর্বক ক্ষমতাকে আঁকড়ে থাকে। পাকিস্তানের আইয়ুব খান বা ফিলিপাইনের মার্কোস ছিল এমন এক একজন স্বৈরাচারী।

২.৮ সার সংক্ষেপঃ

আন্দোলন হল বিদ্যমান সামাজিক সম্পর্ক পরিবর্তনের লক্ষ্যে সচেতন জনগোষ্ঠীর সংঘবদ্ধ যে কোন ধরনের প্রতিবাদ। এ প্রতিবাদ সাধারণ গণসমাবেশ থেকে শুরু করে ধর্মঘট, বিক্ষোভ কিংবা সশস্ত্র যুদ্ধ পর্যন্ত হতে পারে।

আন্দোলনের ধরন চার রকম, যথা-অসচেতন শ্রেণী আন্দোলন, সচেতন শ্রেণী-আন্দোলন, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং স্বৈরাচার-বিরোধী আন্দোলন।

অসচেতন শ্রেণী-আন্দোলনঃ একটি শ্রেণীর যখন অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রতিবাদ বা বিদ্রোহ না করে কোন উপায় থাকে না, কিন্তু এ প্রতিবাদ বা বিদ্রোহের মাধ্যমে সুনির্দিষ্টভাবে কি প্রতিষ্ঠা করতে চায় সে সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট কর্মসূচী থাকে না; অথচ, যে অবস্থায় পড়ে তারা প্রতিবাদ বা বিদ্রোহ করতে বাধ্য হয়েছে তার থেকে মুক্তি চায়-- এ ধরনের আন্দোলনকেই বলা যায় অসচেতন শ্রেণী আন্দোলন।

সচেতন শ্রেণী-আন্দোলনঃ এক বা একাধিক শ্রেণীর নিজস্ব মতাদর্শ অনুযায়ী কর্মসূচীকে সামনে রেখে সুনির্দিষ্ট পরিবর্তনের লক্ষ্যে যে আন্দোলন সংগঠিত হয়--সেটাই হচ্ছে সচেতন শ্রেণী-আন্দোলন।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনঃ সমগ্র জাতি যখন জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের ভিত্তিতে জাতীয় স্বার্থকে রক্ষার জন্য, তার বিকাশের জন্য আন্দোলন করে-- তখনই তা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হয়ে ওঠে।

স্বৈরাচার-বিরোধী আন্দোলনঃ যে শাসকের ক্ষমতায় টিকে থাকার কোন বৈধতা নেই, এমন ধরনের স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে দলমত ও শ্রেণী-নির্বিশেষে যে আন্দোলন হয়-- তাই স্বৈরাচার-- বিরোধী আন্দোলন।

শ্রেণীঃ উৎপাদনের সাথে নির্দিষ্ট ধরনের সম্পর্কে সম্পর্কিত এবং নিজের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন এমন একটি জনগোষ্ঠীকে মিলে একটি শ্রেণী গঠিত হয়। এ ধরনের সচেতন শ্রেণী যে কোন সমাজে খুব বেশি থাকে না। তবে শুধু মাত্র একই উৎপাদন-সম্পর্কের ভিত্তিতে যদি শ্রেণী-বিভাজন করা যায়, তাহলে যে কোন সমাজে বেশ কয়েকটি শ্রেণীর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, শ্রেণী দু'রকমঃ একটি সচেতন শ্রেণী এবং অপরটি অসচেতন শ্রেণী।

---

[১৬১] Heberle,Ruodolf (1951): op.cit.,p.388.

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয়তাবাদঃ পশ্চিম ইউরোপে যখন সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অভ্যন্তর থেকে একটি পুঁজিপতি শ্রেণীর জন্ম হয় এবং ক্রমে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে এসে একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে থাকে, তখনই জাতীয়তাবাদের জন্ম। জাতীয়তাবাদ একটি মতাদর্শ। শুরুতে এ মতাদর্শ ছিল বিকাশমান বুর্জোয়া শ্রেণীর মতাদর্শ। এ মতাদর্শের ভিত্তিতে সামন্ততান্ত্রিক শৃংখল ছিন্ন করার যে আন্দোলন হয়েছিল, তা ছিল মূলতঃ শ্রেণী-সংগ্রাম। জন্মের সময় এ মতাদর্শের মূল শ্লোগান ছিল পুনরুজ্জীবন, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা। অবশ্য এ স্বাধীনতা অন্য কোন শক্তির কাছ থেকে নয়, এ স্বাধীনতা, ইচ্ছামত উৎপাদন, বাণিজ্য এবং সম্পদ সংরক্ষণের স্বাধীনতা। যে বুর্জোয়া শ্রেণী এই মহান শ্লোগান নিয়ে সামান্তবাদকে উচ্ছেদ করেছিল, সেই বুর্জোয়া শ্রেণী আবার আঠারো ও উনিশ শতকে এসে অন্যান্য দেশের পুঁজিবাদী বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। ফলে, জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের অর্থ যায় পাল্টে; জাতীয় জাগরণের অর্থটা ঠিকই থাকে কিন্তু সে আন্দোলন শুধু বুর্জোয়া শ্রেণীর আন্দোলন বা মতাদর্শ থাকে না, সমস্ত শ্রেণীই সে মতাদর্শকে গ্রহণ করে। অবশ্য বিভিন্ন শ্রেণী এ মতাদর্শকে গ্রহণ করে নিজ নিজ শ্রেণী-স্বার্থের আলোকে। এ সময় জাতীয়তাবাদ দুটি রূপে আত্মপ্রকাশ করে, একটি জাতীয়মুক্তি সংগ্রামের মতাদর্শ হিসাবে এবং অপর রূপটি পরদেশ গ্রাস করার মতাদর্শ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। পুরোনো জাতীয়তাবাদ তার ঐতিহাসিক পরিণতিই হচ্ছে পরদেশ গ্রাস করার দিকে অগ্রসর হওয়া, কেননা এটা শুধু মাত্র বুর্জোয়া শ্রেণীর মতাদর্শ, বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশের সাথে সাথে পুরোনো জাতীয়তাবাদের এ পরিণতিটিই অনিবার্য। অন্যদিকে, নতুন জাতীয়তাবাদ নির্যাতিত জাতির সমগ্র জনগণের মতাদর্শে পরিণত হয়। বর্তমান শতকে এসে বিশেষতঃ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে জাতীয়তাবাদ নতুন একটি মোড় নিয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসনের জের হিসাবে চরম কৃত্রিমতা ও অসংখ্য আত্মবিরোধ নিয়ে অনেক দেশ এক সাথে স্বাধীন হয়েছে। এ সকল সদ্য স্বাধীন দেশসমূহের নেতৃত্ব অধিকাংশই ঔপনিবেশিক শক্তির অনুগত; নেতৃত্ব অনুগত না থাকলেও যেহেতু, দেশগুলি স্বাধীন হয়েছে আপোস-মীমাংসার মধ্যে দিয়ে, তাই রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য শক্তি, ঔপনিবেশিক আমলের সামরিক বাহিনী ও আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক কাঠামো রয়ে গেছে, রয়ে গেছে অসংখ্য ঔপনিবেশিক স্বার্থসমূহ। তাই দেশগুলি আজ নয়া-ঔপনিবেশিক রূপ ধারণ করেছে। ঔপনিবেশিক শক্তির পাহারাদার নয়া-ঔপনিবেশিক শাসকগণ এ দেশগুলির অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন জাতি ও অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য না কমিয়ে বরং বাড়িয়ে তুলেছে। ফলে এই নয়া-ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে নির্যাতিত জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের আন্দোলন শুরু হয়েছে। এ সব আন্দোলনেরও মতাদর্শ থাকে আধুনিক জাতীয়তাবাদ বা উপনিবেশবাদ-বিরোধী জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদ এখানেও নির্যাতিত জাতিটির সমগ্র জনতার মুক্তির মতাদর্শ হিসাবেই কাজ করে।

Dhaka University Institutional Repository

৩ঃ রাষ্ট্রঃ একটি সমাজতাত্ত্বিক প্রত্যয়

৩ঃ১ রাষ্ট্রের সংজ্ঞা

বর্তমান বিশ্বে রাষ্ট্র প্রত্যয়টি অত্যন্ত জটিল একটি বিষয়ে পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্র এমন একটি প্রত্যয়, যাকে সামন্ত যুগ পর্যন্ত মনে করা হত এটা ঈশ্বর প্রদত্ত মহা পবিত্র একটি জিনিস, যাকে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা প্রদান ও মান-মর্যাদা সংরক্ষণ করার জন্য। ঐ যুগের মতাদর্শ, দর্শন ও ধর্মের মূল ধারা জুড়েই ছিল: রাষ্ট্র যে একটি নিরপেক্ষ এবং অতিপ্রাকৃত (Supernatural) একটি উপাদান, তার পক্ষেই বিভিন্ন ধরনের যুক্তি।[১] ফ্রেডারিক এঙ্গেলস সর্বপ্রথম বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে এ ধরনের চিন্তার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই বলে মতামত প্রকাশ করেন। এঙ্গেলস মতপ্রকাশ করেন, রাষ্ট্র কোন ক্রমেই সমাজের বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া একটি শক্তি নয়, বরং এটি সমাজ বিকাশের একটি বিশেষ স্তরে সমাজ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। এঙ্গেলসের মতে, সমাজ নিজের ভিতরকার অমীমাংসিত বিরোধগুলির মধ্যে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে, এমন সমাধানহীন দ্বন্দ্বে সে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, যার নিরাকরণ করতে সে অক্ষম। কিন্তু যাতে এসব বিরোধের মধ্য দিয়ে বিরোধী অর্থনৈতিক স্বার্থসংবলিত শ্রেণীগুলি নিজেদের এবং সমাজকে নিষ্ফল সংগ্রামের মাধ্যমে ধ্বংস করে না ফেলে, তাই দরকার হল এমন একটি শক্তি, যা আপাতদৃষ্টিতে সমাজের উর্ধ্বে থাকবে এবং এই সংগ্রামকে সংযত করবে। এঙ্গেলসের মতে, এই শক্তি সমাজ থেকেই উদ্ভূত হয়, কিন্তু উদ্ভবের পর সমাজের উর্ধ্বেই নিজেকে সে প্রতিষ্ঠিত করে এবং ক্রমাগত সমাজ থেকে পৃথক হতে থাকে- এই শক্তিই হল রাষ্ট্র।[২] এঙ্গেলস মত প্রকাশ করেছেন, সমাজ বিকাশের নির্দিষ্ট স্তরে সমাজ যখন বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায়, বিশেষতঃ শোষক এবং শোষিত শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায়, তখন শোষক শ্রেণীর শোষণকে বৈধতা প্রদান করতেই রাষ্ট্রের মত একটি যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সন্দেহ নেই, সমাজের পরাক্রমশালী শ্রেণীই, যেমন, দাস যুগে দাস-প্রভু, সামন্ত যুগে সামন্তপতি, পুঁজিবাদী যুগে পুঁজিপতি শ্রেণী ইত্যাদি, রাষ্ট্রযন্ত্রকে তাদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে ব্যবহার করে। এই রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যবহার করে সে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও আধিপত্যকারী শ্রেণীতে পরিণত হয়। এঙ্গেলস বলেছেন-

"As the State arose from the need to hold class antagonisms in check, but as it arose, at the same time, in the midst of the conflict of these classes, it is, as a rule, the state of the most powerful, economically dominant class, which, through the medium of the state, becomes also the politically dominant class, and thus acquires new means of holding down and exploiting the oppressed class"[৩]

এঙ্গেলস দেখিয়েছেন, রাষ্ট্র বিমূর্ত কোন বিষয় নয়; রাষ্ট্রের থাকে কতকগুলি উপাদান যেমন, একটি সশস্ত্রবাহিনী, জেলখানা ও বিভিন্ন রকমের জবরদস্তিমূলক প্রতিষ্ঠান।[৪] মার্কস এসব প্রতিষ্ঠানকে সম্মিলিতভাবে বলেছেন, সরকারী যন্ত্র। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এ যন্ত্র দিয়েই শোষক শ্রেণী তার বিপরীত শ্রেণীসমূহকে দাবিয়ে রাখে। তাই মার্কস রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন-

"...infact, by the word "State" is meant the government machine, or the State in so far as it forms a special organism separated from society through division of labour"[৫]

রাষ্ট্র সম্পর্কিত মার্কস-এঙ্গেলস-এর উক্ত ধারণা তাদের সমসাময়িক কাল থেকেই বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। তাদের সমকালীন প্রতিপক্ষগণ প্রধানতঃ বহুত্ববাদী (Pluralism) দৃষ্টিভঙ্গিতে রাষ্ট্র সম্পর্কিত ধারণা প্রকাশ করেন। মিলিব্যান্ড (Miliband) এ সকল তত্ত্বকে বিস্তারিতভাবে মূল্যায়ন করেন, যার মূল কথা হলঃ সমাজে বসবাসরত মানুষের জীবনকে নির্বিঘ্ন করে তুলতেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে।[৬] এসব পাশ্চাত্যবাদী তাত্ত্বিকদের মতে, সমাজকে প্রগতির পথে নিয়ে যাওয়ার যে সামাজিক দাবি রয়েছে, তাকে কার্যকরী করার হাতিয়ার হিসাবেই রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে। রাষ্ট্র জনজীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনতে জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অন্যান্য সেবামূলক কাজ ছাড়াও সম্পদের পুনর্বন্টনের দায়িত্ব পালন করে। এন্থনি গিডেন্স (Anthony Giddens) এসব তাত্ত্বিকের বক্তব্যের নির্যাসকে সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করতে গিয়ে বলেছেন-

"....the State was a benign instrument for the progressive achievement of goals of social reform: the redistribution of wealth, the spread of welfare programmes, the ever-increasing expansion of education, and so on."[৭]

কার্ল মার্কসের আগেও রাষ্ট্র নিয়ে অনেকেই আলোচনা করেছেন। কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম আলোচনা করেন সেন্ট সাইমন (Saint-Simon)। সেন্ট সাইমনের বিভিন্ন ভাবনা দ্বারা পরবর্তীকালে যে সব সমাজ বিজ্ঞানী বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে এমিল ডুর্খীম অন্যতম। ডুর্খীম মার্কস-এঙ্গেলস-এর রাষ্ট্র সম্পর্কিত আলোচনাকে তেমন কোন সমালোচনা করেন নি, কিন্তু তিনি রাষ্ট্র সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দেন তা মার্কস-এঙ্গেলস-এর ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়, বরং সে ধারণার বিপরীত। তিনি সমাজের শ্রম-বিভাজন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মত প্রকাশ করেছেনঃ শ্রম-বিভাজন সমাজের অগ্রগতির জন্য খুবই

---

১. Lenin (1976): The State, Moscow: Progress Publishers, p.7

২. এঙ্গেলস, ফ্রেডারিক (-): 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি', মার্কস- এঙ্গেলস রচনা সংকলন, মস্কোঃ প্রগতি প্রকাশন; ২য় খণ্ড, ১ম অংশ, পৃ:৩১৭।

৩. Engels, Friedrich (1959): The Origin of the Family, Private Property and the State, Marx & Engels: Basic Writings on Politics & Philosophy, Edited by Lewis S. Finer, New York: Anchor Books, p. 392.

৪. এঙ্গেলস, ফ্রেডারিক, প্রাগুক্ত, পৃ:৩১৮.

৫. Marx, Karl (1959): 'Critique of the Gotha - Program' Marx & Engels: Basic Writings on Politics & Philosophy, op.cit., p.129.

৬. Miliband, Ralph (1970): The State in Capitalist Society, London: Wiedenfeld & Nicolson. preface.

৭. Giddens, Anthony (1981): 'The State: Class Conflict and Political Order', A Contemporary Critique of Historical Materialism, Berkeley: University of California Press, p.203

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজনীয়, কিন্তু শ্রম-বিভাজনের কারণে সমাজ এমন একটি পর্যায়ে উপনীত হয় যে, সমাজের বিভিন্ন অংশ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু এ ধরনের বিভাজন সামাজিক শৃংখলার জন্য কাম্য হতে পারে না। ফলে সমাজ সংগঠনগুলির মধ্যে ঐক্যের তাগিদ দেখা দেয়। আর এ তাগিদ থেকেই গড়ে ওঠে এমন একটি কাঠামো (organism), যা স্বাধীন এবং শ্রম-বিভাজনের ফলে সৃষ্ট সকল বিরোধকে ধারণ করতে সক্ষম। ডুর্খীমের মতে এই কাঠামোই হচ্ছে রাষ্ট্র। ডুর্খীমের ভাষায়-

"The diversity of functions is useful and necessary, but as unity, which is not less indispensable, does not spontaneously spring up, the care of realizing it and of maintaining it would constitute a special function in the social organism, represented by an independent organ. This organ is the state or government".[৮]

ডুর্খীম রাষ্ট্র এবং সরকারকে আলাদা করে দেখেননি। তিনি মত প্রকাশ করেছেন, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড কিভাবে চলবে সে ব্যাপারে রাষ্ট্রের কোন হাত নেই, রাষ্ট্র বা সরকারী কর্মকান্ডের মূল লক্ষ্যই হ'ল শ্রম-বিভাজনের কারণে বিভিন্ন পেশার মানুষের মাঝে বিভিন্ন দিক দিয়ে যে দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে তা হ্রাস করে নৈকট্য প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু শক্তি প্রয়োগ করে সে নৈকট্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। শুধুমাত্র নৈতিক গুণ বিকশিত করার মাধ্যমেই তা সম্ভব। ডুর্খীম মত প্রকাশ করেছেন, রাষ্ট্র এমন একটি নৈতিক বল জাগরিত করার চেষ্টা করে, যার ফলে জনসাধারণের মধ্যে একটি সমষ্টিগত অনুভূতির (collective sentiment) সৃষ্টি হয় এবং সামাজিক ঐক্য গড়ে ওঠে। ডুর্খীমের ভাষায়-

"The government cannot at every instant, regulate the conditions of the different economic markets, fixing the prices of their commodities and services or keeping production within the bounds of consumptionary needs, etc... Governmental action would have as its object the maintenance of a certain moral uniformity among occupations. But this uniformity cannot be maintained by force and against the nature of things."[৯]

ডুর্খীমের মতে, এ সমষ্টিগত ধারণা বিকশিত করা খুবই প্রয়োজনীয়, কেননা তা না হলে সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পার্থক্য আরো তীব্রতর হবে। যদি পরিকল্পিতভাবে এ সমষ্টিগত ধারণার বিকাশ ঘটানো না যায়, তাহলে ক্রমবর্ধমান শ্রম-বিভাজনের ফলে বিদ্যমান সমষ্টিগত অনুভূতি (collective sentiment) টুকুও দূর্বল হয়ে পড়বে- যা সমাজের অস্তিত্বের জন্যও হুমকি স্বরূপ।[১০] ডুর্খীম তাই সামাজিক সংহতি (Social solidarity) রক্ষার জন্য এমন একটি সুশিক্ষিত, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও নৈতিক বলে দৃঢ় ব্যক্তিদেরকে মনোনীত করে তাদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা প্রদান করতে চান, যারা শত শ্রম-বিভাজন সত্ত্বেও নাগরিকদের মাঝে সমষ্টিগত অনুভূতি কার্যকরীভাবে গড়ে তুলতে পারবেন। এভাবে ডুর্খীম সামাজিক সংহতি সৃষ্টির জন্য এমন এক নিখুঁত চিত্র তৈরি করেছেন যা অগাস্ট কোঁতের সেই বিখ্যাত ইউটোপিয়াকেও হার মানায়। কোঁৎ একটি সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি সুশিক্ষিত সমাজ গড়ে তোলার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে বলেছিলেন-

"We must make an ever greater speciality of the study of scientific generalities. A new class of scholars, prepared by suitable education, without devoting themselves to a special culture of any particular branch of natural philosophy, will busy themselves with considering the various positive science in their present state."[১১]

আর এ সুশিক্ষিত নাগরিকবৃন্দ যখন রাষ্ট্র পরিচালনার ভার পাবে তখনই সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে শান্তি।

ডুর্খীম এবং কোঁতে দু'জনই ছিলেন সেন্ট সাইমনের ভাবশিষ্য। এঁরা দু'জনই সেন্ট সাইমনের চিন্তা ধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন; কিন্তু রাষ্ট্র সম্পর্কে এঁদের দু'জনের চিন্তাই ছিল সেন্ট সাইমনের চিন্তা থেকে ভিন্নতর। সেন্ট সাইমন মনে করতেন, রাষ্ট্র হচ্ছে একটি জননিপীড়নকারী সংস্থা, সামরিক সন্ত্রাস ও একটি ভৌগোলিক অঞ্চলের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাই তার কাজ। এন্থনি গিডেন্স সেন্ট সাইমনের রাষ্ট্রবিষয়ক ধারণাগুলির নির্যাস চমৎকারভাবে অথচ সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরেছেন-

"...the state in an industrial society is integrally involved with military violence, or that administrative control within definite teritorial boundaries is a significant feature of the state."[১২]

ডুর্খীম এবং কোঁৎ সেন্ট সাইমনের এ ধারণাকে সরাসরি বাতিল বা অযৌক্তিক প্রমাণ করেননি, বরং তাঁরা রাষ্ট্রকে এমন একটি নৈতিক নেতৃত্বের প্রতিনিধি (Moral agency) হিসাবে দেখেছেন, যা সব সময় সমাজের সার্বিক কল্যাণের জন্যই ব্যাপৃত থাকে।[১৩]

৩.২ রাষ্ট্র প্রত্যয় নিয়ে ঐতিহাসিক বিতর্কঃ ভ.ই.লেনিন ও ম্যাক্স ওয়েবার

রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেলস যে মতামতটি প্রকাশ করেন, শুধু ডুর্খীম নন, অনেক সমাজ বিজ্ঞানীই তা গ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু তাই বলে বিতর্ক থেমে থাকেনি। রাষ্ট্র-প্রত্যয় নিয়ে দুই ধারায় চলেছে বিতর্ক। বর্তমান শতকে এসে এ বিতর্ক আরো পরিপক্কতা লাভ করে। এ বিতর্কের অংশ হিসাবেই ইউরোপের দু'প্রান্ত থেকে সমসাময়িক দু'জন তাত্ত্বিক একই সময়ে (১৯১৭ সালের গ্রীষ্ম কালে) একটি বিষয় নিয়ে দুটি প্রবন্ধ[১৪] রচনা করেন। এ দু'টি প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ছিল এক, তথা-রাষ্ট্রের চরিত্র, আমলাতন্ত্র এবং রাজনীতি। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন বিখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার, যিনি জার্মানীর একজন উদারনৈতিক একাডেমিসিয়ান হিসাবে পরিচিত; অপরজন ছিলেন ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন, ইনি এমন একজন পেশাগত বিপ্লবী, যিনি তখন রুশ বিপ্লব সম্পন্ন করেছেন।

---

৮. Durkhiem, Emile (1964): The Division of Labour in Society, New York: Free Press, p.359.

৯. Ibid, pp.360-61.

১০. Ibid, p.361.

১১. Comte, A. euqted in Durkhiem, Ibid,p.359.

১২. Giddens, Anthony, op.cit., p.204

১৩ ibid, p.205; গিডেন্স অবশ্য শুধুমাত্র ডুর্খীমের ব্যাপারেই এ মতামতটি রেখেছিলেন।

১৪ 'Parliament and Government in a Reconstructed Germany' প্রবন্ধটি ম্যাক্স ওয়েবারের Econmy and Society নামক গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। অন্যদিকে লেনিনের প্রবন্ধ 'The State and Revoluation' সন্নিবেশিত হয়েছে লেনিনের ৪৫ খন্ড রচনাবলীর ২৯তম খন্ডে; লেনিনের এ প্রবন্ধ বিভিন্ন জায়গায় প্রকাশিত হয়েছে, তবে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে প্রগতি প্রকাশন কর্তৃক ১৯৭০ সালে তিন খন্ডে প্রকাশিত Selected Works এর ২য় খন্ড থেকে।

Dhaka University Institutional Repository

ম্যাক্স ওয়েবার ও লেনিনের প্রবন্ধ দু'টি এ জন্যই এত গুরুত্ব বহন করেছে যে, রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসবাদ-বিরোধী ব্যাখ্যা এবং মার্কসবাদী ব্যাখ্যা, এ দু'টি প্রবন্ধের মধ্য দিয়েই পরিপক্ক ব্যাখ্যা হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে। পরিণত বয়সের এ দু'জন চিন্তাবিদ রাষ্ট্র সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দাঁড় করান, তা ছিল স্ব স্ব ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সম্পর্কিত চিন্তার সর্বশেষ বিকাশ। আর এ কারণেই সম্ভবতঃ রাষ্ট্র নিয়ে দুই ধারার তাত্ত্বিকদের মধ্যে পুরোনো ধাঁচের সে বিতর্ক আর এগোয়নি। বিশ্বে নতুন নতুন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সে বিতর্ক ভিন্নতর রূপলাভ করেছে। তাই এখানে রাষ্ট্র সম্পর্কিত সাম্প্রতিককালের বিতর্কে আসার আগে ওয়েবার ও লেনিন যে সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করতে চেয়েছিলেন, সেগুলির মধ্য থেকে এখানে নিম্নোক্ত তিনটি প্রশ্নকে আলোচনা করে রাষ্ট্র সম্পর্কিত ধারণাকে স্পষ্টতর করে নেওয়া হয়েছে। প্রশ্নগুলি নিম্নরূপঃ

১. কিভাবে রাষ্ট্রের বিভিন্ন উপাদান নিয়ন্ত্রিত হয় এবং রাষ্ট্রের উপাদানসমূহই বা কি কি?

২. বুর্জোয়া সমাজে বিভিন্ন প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানের সাথে রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রের কি কোন সম্পর্ক আছে? থাকলে তার রূপ কি?

৩. আমলাতন্ত্র কি রাষ্ট্র ক্ষমতাকে করায়ত্ত করতে পারে? যদি পারেই তাহলে তা কিভাবে?

এ বিষয়গুলির দিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে, ম্যাক্স ওয়েবার তাঁর পূর্বসূরীদের রাষ্ট্র বিষয়ক ধারণা থেকে সরে এসেছেন; কেননা তাঁর আলোচিত প্রশ্নগুলি থেকেও এ কথা স্পষ্ট যে, রাষ্ট্র যে সর্বজনীন জনসেবা ও সমাজ প্রগতির উদ্দেশ্যেই জন্মলাভ করেছে তা আর তিনি মনে করেন না। কেননা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ক্রমবর্ধিত হারে আমলাতন্ত্রের হাতে চলে যেতে দেখে তিনিও শংকিত। তবে বলাবাহুল্য, সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা করার ক্ষেত্রে ওয়েবারের উদ্দেশ্য ছিল কিভাবে বুর্জোয়া সমাজের অধীনে থেকেও যুক্তিসিদ্ধ আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিদ্যমান রাষ্ট্রকে পরিবর্তন করা যায়; আর লেনিনের উদ্দেশ্য ছিল সদ্য সমাপ্ত বলশেভিক বিপ্লবের পর কিভাবে রাষ্ট্রকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যবহার করা যায়। ওয়েবার ও লেনিনের রাষ্ট্র বিষয়ক বক্তব্যকে তুলনামূলক পর্যালোচনা করতে গিয়ে এরিক ওলিন রাইট (Eric Olin Wright) ঠিকই বলেছেন–

"In the immediate years following the publications of the essays, attempts were made to put the idea of both into practice: Lenin's ideas in the attempt to build socialism after the Bolshevik Revolution, and Weber's in the attempt to create a viable parliamentary democracy in the weimar Republic."[১৫]

যাহোক, উপরোক্ত তিনটি প্রশ্নের মীমাংসা করতে পারলে বর্তমান সময়ে যে সব বিষয় নিয়ে বিতর্ক চলছে সেসবের সমাধান হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়। এ আলোচনার শুরুতেই ওয়েবার ও লেনিন, রাষ্ট্র বলতে ঠিক কি বুঝিয়েছেন তা' স্পষ্ট করে নেওয়া প্রয়োজন।

ওয়েবার রাষ্ট্র--প্রত্যয়টিকে সরাসরি সংজ্ঞায়িত না করে প্রথম সংগঠনের (organization) সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং মত প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্র হচ্ছে একটি বিশেষ ধরনের সংগঠন, এবং এটা একটি রাজনৈতিক সংগঠন।[১৬] ফলে ওয়েবারের রাষ্ট্র সম্পর্কিত ধারণাকে স্পষ্ট করার প্রয়োজনে তার সংগঠন সম্পর্কিত ধারণাকে পরিষ্কার করে নেওয়া প্রয়োজন। ওয়েবারের মতে সংগঠন হচ্ছে একটি সামাজিক সম্পর্ক, যার এমন একটি উপাদানকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হয়, যা নেতৃত্ব দেন এক বা একাধিক ব্যক্তি; এটাকে পরিচালনার ক্ষেত্রে একজন প্রধান থাকেন এবং তার অধীনে থাকেন কিছু কর্মচারী। এছাড়া, এ উপাদানের আরো একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছেঃ সদস্য ব্যতীত এ সামাজিক সম্পর্কের ভিতর অন্য কারো প্রবেশাধিকার অত্যন্ত সীমিত বা একেবারেই নিষিদ্ধ। ওয়েবারের ভাষায়–

"A Social relationship which is either closed or limits the admission of outsiders will be called an organization when its regulations are enforced by specific individuals: a chief and, possibly, an administrative Staff."[১৭]

ওয়েবারের মতে যে সংগঠন শাসনকার্যে নিয়োজিত থাকে তাকেই রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে বিবেচনা করা যায়। রাজনৈতিক সংগঠন তার অঞ্চলের ওপর যে কোন ধরনের হুমকি কিংবা কোন শারীরিক শক্তি প্রয়োগের হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ওয়েবারের ভাষায়–

"A'ruling organization' will be called 'political' insofar as its existence and order is continuously safeguarded within a given territorial area by the threat and application of physical force on the part of the administrative staff."[১৮]

উপরোক্ত দু'টি প্রত্যয়কে ব্যাখ্যা করার পর ওয়েবার রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিয়েছেন। ওয়েবারের মতে রাষ্ট্র হচ্ছে উচ্চতম সংগঠন। এ সংগঠনের আওতাভুক্ত লোকালয়, ব্যক্তি ও বস্তুর ওপর থাকে তার একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অধিকার। যে কোন কিছুর ওপর বলপ্রয়োগের ন্যায্য অধিকার একমাত্র রাষ্ট্রই দাবি করতে পারে। এদিক থেকে রাষ্ট্র হচ্ছে একটি আবশ্যিক রাজনৈতিক সংগঠন, যার কোন নির্দিষ্ট লোকালয়ের জনসাধারণ এবং তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার চূড়ান্ত অধিকার রয়েছে। এ অধিকারের ন্যায্যতা প্রদান করে সংবিধান। ওয়েবারের ভাষায়–

"A compulsory political with continuous operations will be called a 'State' insofar as it successfully upholds the claim to the monopoly of the legitimate use of physical force in the enforcement of its order."[১৯]

ম্যাক্স ওয়েবার এ সংজ্ঞার পর রাষ্ট্রের ধারণাকে স্পষ্ট করতে গিয়ে মতপ্রকাশ করেন– রাষ্ট্রসহ যে কোন ধরনের রাজনৈতিক সংগঠনকে সংজ্ঞায়িত করা খুব জটিল। কেননা যুক্তির বিচারে যে কোন রাজনৈতিক সংগঠনের সদস্যদের নির্ধারিত নীতিমালা ও শৃংখলার প্রতি অনুগত থাকার কথা, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ঘটে তার উল্টো। জনসাধারণের ব্যক্তিগত নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করার জন্য যে

---

১৫. Wright, Erik Olin (1978): Class, Crisis and the state, London: NLB, p.182.

১৬. Weber, Max (1968): Economy and Society, edited by Guenther Roth, New York: Bediminister Press, pp.48-54

১৭. Ibid, p.48

১৮. Ibid, p.54

১৯. Ibid, p.54

Dhaka University Institutional Repository

ন্যায়নীতি ভিত্তিক প্রশাসন চালু করা প্রয়োজন, তা করতে গেলে এমন কাউকেই পাওয়া যাবে না যে, সে নীতিমালার সমস্ত কিছুর সাথেই একমত। ফলে কোন সংগঠনের রাজনৈতিক চরিত্র বলতে যা বাকি থাকছে তা হচ্ছে শক্তি প্রয়োগের অধিকার। ওয়েবারের ভাষায়-

"Thus it is possible to define the 'political' character of an organization only in terms of the means peculior to it, the use of force."[২০]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, ওয়েবারের রাষ্ট্র-প্রত্যয়ের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে একক কোন ব্যক্তি বা কতকগুলি ব্যক্তির সমন্বয়ে গড়ে-ওঠা একটি গোষ্ঠী এবং তাদের অধীনস্থ কর্মচারীদের সমন্বয়ে গড়ে-ওঠা একটি শাসন কাঠামোর ধারণা। এ কাঠামোটির শীর্ষে একজন 'chief' থাকবেন, অবশ্য কখনও কখনও কতকগুলি ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত একটি গোষ্ঠীও 'chief'-এর ভূমিকা পালন করতে পারে, কিন্তু এ গোষ্ঠীকে কখনই তিনি একটি শ্রেণী হিসাবে চিহ্নিত করেন নি। দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্র এমন একটি উপাদান, যার জনগণকে শাসন করার ন্যায্য অধিকার রয়েছে, বিদ্যমান সমাজই রাষ্ট্রকে সে ন্যায্যতা প্রদান করে থাকে, কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তিই যেহেতু নির্ধারিত আইন-কানুন মেনে চলে না, সেহেতু জনজীবনের নিরাপত্তার স্বার্থে অবাধ্য ব্যক্তিদের ওপর তা প্রয়োগ করতে হয়- যার ফলে শক্তি প্রয়োগই হয়ে ওঠে রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এর অর্থই হচ্ছে শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতাই রাষ্ট্রের প্রধান উপাদান।

লেনিনও রাষ্ট্রের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে এটাকে অত্যন্ত জটিল প্রত্যয় হিসাবে বর্ণনা করেছেন। 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' প্রবন্ধটি প্রকাশের দু'বছর পর এক বক্তৃতা দিতে গিয়ে এ জটিলতার প্রশ্নটি তিনি বার বার তুলেছিলেন।[২১] বিরোধী তাত্ত্বিকদের নানাবিধ বক্তব্যই যে এ সংশয় সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিল, সে দিকে গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে লেনিন বলেন-

"....the questions of the state is a most complex and difficult one, perhaps one that more than any other has been confused by bourgeois scholars, writers and philosophers."[২২]

লেনিনের রাষ্ট্র বিষয়ক আলোচনা শুরু করার প্রথমেই বলে নেওয়া আবশ্যক যে, রুশ বিপ্লবের পর রাষ্ট্রকে কিভাবে পূনর্গঠন করা হবে এবং তাকে কিভাবে শ্রমজীবী জনগণের কাজে লাগানো যাবে, সেটাই ছিল লেনিনের কাছে মূল সমস্যা। তাই 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' প্রবন্ধটি রচনার সময় লেনিন মার্কসের একটি বক্তব্যকে প্রতিজ্ঞা হিসাবে ধরে নেন, 'স্রেফ তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে দখল করে নিয়েই নিজের কাজে তা লাগাতে পারে না শ্রমিক শ্রেণী"।[২৩] তাই লেনিন রাষ্ট্রের আলোচনার শুরু থেকেই শ্রেণীর সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্কের বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তোলেন। লেনিন মতপ্রকাশ করেন, সমাজে পরস্পর স্বার্থ বিরোধী শ্রেণীগুলির মধ্যেকার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব যখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যখন সে দ্বন্দ্ব শান্তিপূর্ণভাবে নিরসন করার আর কোন সুযোগ থাকেনা, তখনই রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। অর্থাৎ যখনই কোন সমাজে শ্রেণী-বিরোধ মীমাংসার সীমাকে অতিক্রম করে, তখনই সেখানে রাষ্ট্রের জন্ম হয়। সোজা কথায়, শ্রেণী-বিরোধের নিষ্পত্তিহীনতার ফল বা অভিব্যক্তি হিসাবেই গড়ে ওঠে রাষ্ট্র; আর রাষ্ট্রের অস্তিত্বই প্রমাণ করে যে, শ্রেণীসমূহের মধ্যকার বিরোধ সমাধানের অতীত। এঙ্গেলসের উদ্ধৃতি দিয়ে লেনিন দেখান যে, সুনির্দিষ্ট বিকাশের পর সমাজ এমন কতকগুলি পরস্পর স্বার্থ-বিরোধী শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে যে, সে বিরোধ যদি বিদ্যমান না থাকে, তাহলে শ্রেণীসমূহের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে ওঠে। এ সত্য উপলব্ধি করে লেনিন সিদ্ধান্ত টেনেছেন-

"The State is a product and a menifestation of the irreconcilability of class antagonisms. The state arise where, when and insofar as class antagonisms objectively cannot be reconciled. And, conversely, the existence of the state proves that the class antagonisms are irreconcilable."[২৪]

এ সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে লেনিন আরো স্পষ্ট করে তোলেন রাষ্ট্রের সাথে শ্রেণীর আন্ত সম্পর্ককে। শুধু বুর্জোয়া তাত্ত্বিকগণই নন, মার্কসবাদী বলে পরিচিত তাত্ত্বিকদের ভ্রান্ত চিন্তাকে পরাস্ত করার লক্ষ্যে লেনিন রাষ্ট্রের সাথে শ্রেণীর সম্পর্কটি আরো স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। কিছু তাত্ত্বিক শ্রেণীশোষণের প্রয়োজনে রাষ্ট্রের উৎপত্তির কথা স্বীকার করলেও, রাষ্ট্রের উৎপত্তি যে শ্রেণীশোষণকে বিধিবদ্ধ ও আইনসম্মত করার জন্যই, মার্কসের-এঙ্গেলসের এ প্রতিজ্ঞার প্রতি যারা বিশ্বস্ত থাকেন না, এ তাত্ত্বিকগণ শ্রেণী সমন্বয় কিংবা বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আপোস-রফার সংস্থা হিসাবে রাষ্ট্রকে চিহ্নিত করতে থাকেন। লেনিন দেখান, রাষ্ট্র শুধু যে শ্রেণীসংঘাতের ওপর একটি রাজনৈতিক প্রলেপ দিয়ে তাকে একটু নরম করার চেষ্টা করে তাই নয়, রাষ্ট্র একটি শ্রেণী-আধিপত্যেরও সংস্থা। প্রভুত্বকারী শ্রেণীর হাতিয়ার হিসাবে রাষ্ট্র এমনভাবে কাজ করে যায় যাতে এক শ্রেণীর ওপর অপর শ্রেণীর শোষণ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। লেনিনের ভাষায়-

"The state is an organ of class rule, an organ for the oppression of one class by another."[২৫]

লেনিন মার্কস-এঙ্গেলস-এর ধারণাকে খানিকটা অগ্রসর করে নিয়ে গিয়েছেন। মার্কস এঙ্গেলস রাষ্ট্রকে শ্রেণী শাষণের হাতিয়ার হিসাবে গণ্য করেছিলেন, কিন্তু লেনিন সেখানে যোগ করেছেন রাষ্ট্র শুধু শ্রেণী শোষণেরই হাতিয়ার নয়, এটা শ্রেণী-নিপীড়নেরও হাতিয়ার। তিনি দেখান রাষ্ট্র হল একটি সংগঠন এবং তা' ক্ষমতা প্রয়োগ করে। লেনিনের মতে রাষ্ট্র, ক্ষমতা প্রয়োগের কাজে ব্যবহৃত এমন একটি বিশেষ সংগঠন, যা বিদ্যমান সামাজিক সম্পর্ক তথা শোষণমূলক সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখার জন্য বলপ্রয়োগ করতে সব সময় প্রস্তুত থাকে। অর্থাৎ রাষ্ট্র হচ্ছে একটি বলপ্রয়োগের সংগঠন, যা শ্রেণী নিপীড়নের কাজে ব্যবহৃত হয়। লেনিনের ভাষায়-

"The state is a special organization of violence for the supression of some classes"[২৬]

লেনিন দেখিয়েছেন, শ্রেণী-নিপীড়নের প্রয়োজনে বল প্রয়োগ রাষ্ট্রের জন্য কোন নতুন ঘটনা নয় কিংবা তার দিন শেষ হয়ে গেছে তাও নয়। এঙ্গেলস তার 'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি নামক' গ্রন্থে যা দেখিয়েছিলেন তাকে লেনিন আরো স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। লেনিনের মতে, মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হওয়ার পাশাপাশি বলপ্রয়োগের উপাদানসমূহেরও পরিবর্তন হয়েছে। লেনিন আরও মত প্রকাশ করেন, বলপ্রয়োগ কিংবা সন্ত্রাসের প্রকৃতিগত পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু যেখানে রাষ্ট্র নামক সত্তাটি

২০. Ibid, p.55

২১. Lenin (1976): The state, Moscow: Progress Publishers, pp.5-7.

২২. Ibid, p.5

২৩. মার্ক্সকার্ল (---- 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ', মার্কস-এঙ্গেলস- রচনা-সংকলন মস্কোঃ প্রগতি প্রকাশন, পৃঃ১৬৩।

২৪. Lenin, V.I. (1970): 'The State and Revolution' selected works, 3 vols, Moscow: Progress Publishers, p.290.

২৫. Ibid, p. 291

২৬. Ibid, p.303

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যমান সেখানে বলপ্রয়োগের প্রশ্নটি থেকেই যায়। কে বল প্রয়োগ করবে, কে নির্যাতিত হবে, তার হাতে নির্যাতনের উপাদানগুলি কেন্দ্রীভূত হবে, বলপ্রয়োগের হাতিয়ারগুলিই বা কি রকম হবে ইত্যাদি বিষয় নির্ভর করে কৃৎকৌশল ও সমাজ বিকাশের স্তরের ওপর, কিন্তু এ বিষয়টি খুবই স্পষ্ট যে, যে সমাজে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রয়েছে সে সমাজে বল প্রয়োগের ব্যাপারটি নিরাকরণ হতে পারে না। লেনিনের ভাষায়-

"The methods of violence changed, but whenever there was a state there existed in every society, a group of persons who ruled, who commanded, who dominated and who in order to maintain their power possessed an apparatus of physical coercion, an apparatus of violence, with those weapons which corresponded to the technical level of the given epoch."[২৭]

তবে লেনিন বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, রাষ্ট্রের এ বল প্রয়োগের ক্ষমতা কিংবা রাষ্ট্রের বিভিন্ন উপাদানের নানাবিধ ক্ষমতা ইত্যাদির কোনই প্রয়োজন হত না, যদি শ্রেণী-শোষণের কোন প্রয়োজন না থাকতো। লেনিনের মতে প্রবল শ্রেণীর প্রতি অধীনস্থ শ্রেণীগুলিকে অনুগত রাখার প্রয়োজনেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি। এ কারণেই লেনিন রাষ্ট্রকে যন্ত্রের সাথে তুলনা করেছেন, যে যন্ত্র শ্রেণী-শোষণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। লেনিনের মতে রাষ্ট্র এমন একটি যন্ত্র, যা শোষণমূলক ব্যবস্থাকে পাহারা দেয়, সে ব্যবস্থার প্রতি যে কোন রকম প্রতিবাদকে দমন করে এবং শোষিত শ্রেণীগুলিকে শোষক শ্রেণীর প্রতি অনুগত থাকতে বাধ্য করে। লেনিনের ভাষায়-

"The state is a machine for the oppression of one class by another, a machine for holding in obedience to one class other, subordinated classes."[২৮]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায়, লেনিন মার্কস-এঙ্গেলস-এর মতই মনে করেন রাষ্ট্র হচ্ছে একটি যন্ত্র, এ যন্ত্রটি প্রভুত্বকারী শ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থের প্রহরী। একটি শ্রেণী যখন অপর শ্রেণীকে শোষণ করে তখন তার বিরুদ্ধে গড়ে-ওঠা যে কোন প্রতিবাদ বা প্রতিরোধকে দমন করার দায়িত্ব থাকে রাষ্ট্রের ওপর। রাষ্ট্রের শ্রেণী-নির্যাতনমূলক এ চরিত্রকে বিধিসম্মত করতে গড়ে তোলা হয় তার বিভিন্ন উপাদান। শ্রেণী-শোষণের রূপ, দমনের কৌশল, বিচার বিভাগের ভূমিকা, আইন বিভাগ বা রাষ্ট্রের অন্যান্য উপাদানসমূহের চরিত্র ইত্যাদিতে বাহ্যিকভাবে পরিবর্তন আসতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের উপরোক্ত চরিত্রের কোন পরিবর্তন হয় না। এক কথায়, রাষ্ট্র হচ্ছে এক শ্রেণীর ওপর অপর শ্রেণীর শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় একটি যন্ত্র বিশেষ। লেনিনের ভাষায়-

"The state is a machine for maintaining the rule of one class over another."[২৯]

ভ,ই, লেনিন এবং ম্যাক্স ওয়েবার এ দু'জনের লেখায় যদি রাষ্ট্রের উপাদানসমূহকে শনাক্ত করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে বেশ মিল আছে। এরা দু'জনই রাষ্ট্রের যে প্রধান দুটি উপাদানকে বিশেষ ধরেছেন- সে দুটি উপাদানের একটি হচ্ছে আমলাতন্ত্র (Bureaucracy) এবং অন্যটি সংসদ (Parliament)।[৩০] কিন্তু দু'জনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের এ দু'টি উপাদান একই রকম গুরুত্ব বহন করে না।

ওয়েবারের মতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যতই বিকশিত হচ্ছে সমাজ ততই জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে। সমাজের এ জটিলতাসমূহ নিরসন করা যেতে পারে একমাত্র যুক্তিমূলক প্রশাসনের বিকাশ ঘটানোর মধ্য দিয়েই। শুধু পরিমাণগতভাবেই নয়, গুণগতভাবেও যদি প্রশাসনের বিকাশ ঘটানো যায় শুধু তাহলেই ক্রমে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি আমলাতন্ত্রায়নের (bureaucratization) দিকে এগিয়ে যাবে। ওয়েবার অবশ্য আমলাতন্ত্রায়নকে কখনও খারাপ অর্থে দেখেননি, বরং তিনি আনুষ্ঠানিক আমলাতন্ত্রের যে রূপ তুলে ধরেছেন তা অন্ততঃ বাহ্যিক দিক দিয়ে হলেও বেশ কার্যকর।[৩১] কেননা ওয়েবার বর্ণিত আমলাতন্ত্রে ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করার কোন সুযোগ নেই- নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করাই তাদের একমাত্র কাজ। অত্যন্ত শৃংখলাপূর্ণ ও কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত কোন প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত হয়ে যোগ্য কোন ব্যক্তিকে যদি স্বীয় দায়িত্ব পালন করার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তাহলে ভালভাবে সে দায়িত্ব পালিত না হওয়ার কোন কারণ নেই; কেননা ওয়েবারের মতে পরিপূর্ণ বিকশিত আমলাতন্ত্রের বিভিন্ন উপাদানকে একমাত্র যন্ত্রের সাথেই তুলনা চলে, যন্ত্র যেমন তার নির্দিষ্ট ধারায় নির্মোহভাবে কাজ করে যায়, আমলাতন্ত্রের বিভিন্ন অংশও ঠিক একইভাবে তার

---

২৭. Lenin (1976): op.cit., p.13.

২৮. Ibid, p.15.

২৯. Ibid, p.13

৩০. Weber,Max (1968): Economy and Society, Ibid, pp.220-222, 988, 991, 1404 etc. Lenin (1970); State and Revolution, ibid, pp.318-319, 309.

৩১. ওয়েবার আমলাতন্ত্রের নিম্নোক্ত উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন:

1. [Officials] are personally free and subject to authority only with respect to their impersonal official obligations.
2. They are organized in a clearly defined hierarchy of offices.
3. Each office nas clearly defined sphere of competence in the legal sense.
4. The office is filled by a free contractual relationship. Thus, in principle, there is free selection.
5. Candidates are selected on the basis of technical qualifications. In the most national case, this is tested by examination or guaranted by deplomascertifying technical training or both. They are apointed, not selected.
6. They are remunarated by fixed salaries in money.
7. The office is treated as the sole, or at least the primary, occupation of the incumbent.
8. It constitutes a career. There is a system of promotion according to seniority or to achievement or both. Promotion is dependent upon the judgement of superiors.
9. The official works entirely separated from ownership of the means of administration and without appropriation of his position.
10. He is subject to strict and systematic discipline and control in the conduct of the office. (Weber, 1968, ibid, pp.220-21).

Dhaka University Institutional Repository

কলাকৌশল ও কারিগরি জ্ঞান ব্যবহার করে নির্ধারিত কাজগুলি সম্পন্ন করতে থাকবে। নীতি নির্ধারণের পর তা কার্যকরী করার জন্য এ ধরনের একটি কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা ওয়েবার খুব বেশি গুরুত্ব অনুভব করেছেন। ওয়েবার লিখেছেন–

"This decisive reason for the advance of bureaucratic organization has always been its purely technical superiority over any other form of organization. The fully developed bureaucratic apparatus compares with other organizations exactly as does the machine with the non-mechanical modes of production."[৩২]

শুধু রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে নয়, ওয়েবারের মতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য সংগঠনকে যদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে হয় তাহলে একটি যুক্তিসিদ্ধ (Rational) আমলাতন্ত্র সর্বক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রয়োজন। কেননা সমাজ যত জটিলতর হচ্ছে যে কোন প্রতিষ্ঠানের বিকাশও ততই প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। তাই কোন সংগঠন কতটা সাফল্য অর্জন করবে তা নির্ভর করছে, সে সংগঠনের প্রশাসনিক কাঠামো, বিশেষতঃ আমলাতান্ত্রিক কাঠামোটা কতটা যৌক্তিক হয়ে উঠেছে তার ওপর।[৩৩] ওয়েবার তাই মন্তব্য করেছেন– "The future belongs to bureaucratization."[৩৪]

তবে ওয়েবার মত প্রকাশ করেছেন, আমলাতন্ত্রায়ন যত বৃদ্ধি পায়, আমলাদের ক্ষমতাও ততই বৃদ্ধি পায়। আমলাদের এ ক্ষমতা শুধুমাত্র পরিপূর্ণ আমলাতান্ত্রিক কাঠামো যেখানে প্রতিষ্ঠিত সেখানেই বৃদ্ধি পায় না, আমলাতন্ত্রহীন সংগঠনেও তা বৃদ্ধি পায়। আমলাতন্ত্রের মধ্যেও অ-আমলাতান্ত্রিক উপাদানসমূহের অধিকমাত্রায় সমাবেশ ঘটতে থাকে। ওয়েবার এ প্রসঙ্গে লিখেছেন–

"The power of a fully developed bureaucracy is always great, under normal conditions, overtowering. The political master always finds himself, vis-a-vis the trained official, in the position of a dilettante facing the expert."[৩৫]

আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা এভাবে ক্রমাগত প্রক্রিয়ায় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই আমলারা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বহুবিধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। নিম্নোক্ত তিনটি কারণে আমলাদের এ ক্ষমতা প্রয়োজনের পরিধি আরো ব্যাপকতর হয়–

১. আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের বাস্তব অপরিহার্যতা এবং অপরিবর্তনীয়তা অনেক বৃদ্ধি পায়;
২. বিশেষজ্ঞোচিত কারিগরি জ্ঞান আমলাদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়;
৩. প্রশাসনিক গোপনীয়তা (আমলাতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ অফিস সম্পর্কিত জ্ঞান) পরিপূর্ণভাবেই আমলাদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়।[৩৬]

উপরোক্ত তৃতীয় উপাদানটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর বাইরের যে কেউ এ ব্যাপারটি নিয়ে বেশ বেকায়দায় পড়ে এমনটি নয়, বরং দপ্তরের সমস্ত ফাইলপত্র, তথ্য এবং কার্যপ্রণালীসহ সবকিছু আমলাদের হাতে থাকে। এভাবে আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকায় পরিস্থিতি ক্রমশঃ সংকটময় হয়ে ওঠে। এ পর্যায়ে এসেই ওয়েবারের আমলাতন্ত্রের তত্ত্বটি সমালোচনার সম্মুখীন হয়। আমলাতন্ত্র যখন উপরে আলোচিত পর্যায়ে এসে উপনীত হয়, তখন কি যে কোন ধরনের ব্যক্তিগত ক্ষমতা এই রাষ্ট্রীয় আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে? ওয়েবার যেখানে আমলাতন্ত্রের আদর্শ নমুনার উল্লেখ করেছেন সেখানে এর একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এখানে ওয়েবার মত প্রকাশ করেছেন আমলাতন্ত্রের শীর্ষে এমন কিছু যোগ্য ও দক্ষ লোক নিয়োজিত থাকবেন, যাঁদের অন্যতম কাজ হবে আমলাতান্ত্রিক এ ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা। ওয়েবারের ভাষায়–

"...at the top of a bureaucratic organization there is necessarily an element which is at least not purely bureaucratic. The category of bureaucracy is one applied only to the exercise of control by means of a particular kind of administrative staff."[৩৭]

ওয়েবারের মতে এই দক্ষ ও যোগ্য লোকদের নিয়ে গড়ে–ওঠা সর্বোচ্চ কাঠামোটি আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে। একেই ওয়েবার রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্র হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।[৩৮] কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কারা এই রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রের পদগুলি অলংকৃত করবেন? ওয়েবার মত প্রকাশ করেছেন, রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রের এ পদগুলি তৈরি করে পার্লামেন্ট। পার্লামেন্টে মনোনীত ব্যক্তিবর্গ সমন্বয়ে গড়ে–ওঠা একটা কাঠামোই আমলাতন্ত্রের বিভিন্ন শাখাকে নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করে। ওয়েবার যে এ কাঠামো বলতে মন্ত্রী পরিষদকেই নির্দেশ করেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওয়েবারের মতে যতদিন পর্যন্ত এই অ-আমলাতান্ত্রিক প্রধানগণ (Non-bureaucratic top) তাদের রাজনৈতিক ইচ্ছা অনুযায়ী সর্বকাজ পরিচালনা করে, ততদিন পর্যন্ত তার অধীনস্থ আমলাকাঠামো সুষ্ঠুভাবে কাজ করে যায়, কিন্তু আমলাতান্ত্রিক কাঠামো শুধুমাত্র উক্ত প্রধানের নির্দেশই পালন করে না, উক্ত প্রধান তথা মন্ত্রীকেও প্রভাবিত করে। এ প্রক্রিয়ায় মন্ত্রীর হাতে প্রাপ্তব্য ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়, যে ক্ষমতাকে মোকাবিলা করার ক্ষমতা পার্লামেন্টেরও থাকে না। ফলে ওয়েবার মত প্রকাশ করেছেন, প্রধানদের এ ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা ক্রমশঃ রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রকে পরিপূর্ণভাবে আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতায় পর্যবসিত করে, প্রধানগণই হয়ে পড়েন আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর অংশ। এভাবে পুরো আমলাতান্ত্রিক কাঠামোটাই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। তখন কার্যত আমলাতন্ত্রকে পরিচালনা করা কিংবা নিয়ন্ত্রণ করার মত কেউ অবশিষ্ট থাকে না। ওয়েবার লিখেছেন–

"In view of the growing indispensability of the state bureaucracy and its corresponding increase in power, how can there be any guarantee that any powers will remain which can check effectively control the tremendous influence of this stratum."[৩৯]

অবশ্য ওয়েবার লিখেছেন উক্ত প্রধানগণ যে সব সময় নিজেরাই আমলা হয়ে ওঠেন এমন নয়, কিন্তু প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবের কারণে অনেক সময়ই তারা আমলা–কাঠামোর শিকারে পরিণত হয়। কিন্তু এ অবস্থা সমাজকে একটি

---

[৩২] Weber, Ibid, p.973
[৩৩] Ibid.p.1399.
[৩৪] Ibid, p.1401
[৩৫] Ibid, p.991
[৩৬] Wright, Erik Olin (1978): Class, Crisis and the State, op.cit., p.185.
[৩৭] Weber, op.cit., p.222.
[৩৮] Ibid.p.1403.
[৩৯] Ibid, p.1403.

Dhaka University Institutional Repository

অস্থিরতার দিকে ঠেলে দেয়, শুরু হয় রাজনৈতিক সংকট। রাজনৈতিক সংকট যখন দেখা দেয় তখন কিন্তু এই আমলাদের অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান কোন কাজেই লাগে না। এ রাজনৈতিক সংকট নিরসনের ক্ষেত্রে তারা চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয় দেয়।[৪০] সে সময় একমাত্র প্রতিনিধিত্বশীল এক বা একাধিক রাজনৈতিক শক্তিই পারে সে অবস্থাকে মোকাবিলা করতে। ওয়েবার মত প্রকাশ করেছেন প্রতিনিধিত্বশীল রাজনৈতিক শক্তি এসে সাময়িকভাবে রাজনৈতিক সংকটকে মোকাবিলা করলেও, এ ধরনের অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটা অসম্ভব নয়। ওয়েবারের মতে যে রাজনৈতিক শক্তি রাজনৈতিক সংকটকে মোকাবিলা করতে সক্ষম সেই একই রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যেই যদি অধিকতর যোগ্য ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা সম্পন্ন নেতৃত্ব গড়ে তোলা যায়, তাহলেই শুধু মাত্র সে নেতৃত্ব তার স্বকীয়তাকে অক্ষুণ্ন রেখে আমলাতন্ত্রকে যথাযথভাবে পরিচালনা করতে পারবে। কিন্তু ওয়েবারের মতে রাজনীতিবিদগণ মোটেই পেশাজীবী আমলার চেয়ে বেশি নৈতিক কিংবা সৎ নয়। ফলে তাঁরা রাজনৈতিক ক্ষমতা পেয়েই বিভিন্ন রকমের বৈষয়িক সুবিধা অর্জনের চেষ্টা চালাতে থাকেন। আর আমলাগণ নিজেদের পদোন্নতি কিংবা অন্য কোন সুবিধা আদায়ের জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের বৈষয়িক সুবিধা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। ওয়েবারের মতে, মানবাচরণের এই চিরাচরিত ধারাই যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রধান বাধা। ওয়েবারের ভাষায়-

"The motives of party members are no more merely idealist than are the usual philistine interests of bureaucratic competitors in promotions and benifices. Here, as there, personal interests are usually at stake....these universal human frailties do not prevent the selection of capable leaders."[৪১]

এ সব ব্যাখ্যার পর ওয়েবার একটি সমাধানের প্রতি নির্দেশ করেছেন। ওয়েবার মত প্রকাশ করেছেন- জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গড়ে-ওঠা পার্লামেন্টের ক্ষমতাকে যদি নিশ্চিত করা যায়, সকল ক্ষেত্রে যদি তাদের হস্তক্ষেপের সুযোগ থাকে, পার্লামেন্টকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সব আমলাতন্ত্র বা মন্ত্রী পরিষদ ইত্যাদিকে তার অধীনস্থ করা যায় তাহলেই আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। ওয়েবারের মতে আমলা নিয়ন্ত্রিত যে কোন প্রতিষ্ঠান কিংবা কার্যক্রমকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা কিংবা মূল্যায়নের পরিপূর্ণ অধিকার পার্লামেন্টের থাকা প্রয়োজন। পার্লামেন্ট যাতে যথাযথভাবে বিষয়সমূহকে অনুধাবন করতে পারে তার জন্য স্ব স্ব ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এভাবেই একটি সমাজে আমলাতন্ত্রের ওপর পার্লামেন্টের প্রাধান্য অর্জিত হতে পারে এবং প্রশাসনিক প্রধানদের ওপর একটি জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।[৪২] ওয়েবার এ ধরনের পার্লামেন্টকে বলেছেন কার্যকরী পার্লামেন্ট (working parliament)। ওয়েবারের মতে একমাত্র এই কার্যকরী পার্লামেন্টই পারে, প্রকৃত নেতৃত্বের জন্ম দিতে, একটি কার্যকরী প্রশাসনযন্ত্রকে পরিচালনা ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে, এবং সকল ক্ষেত্রে জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থার একটি অব্যাহত ধারা সৃষ্টি করতে। ওয়েবারের ভাষায়-

"Only working, not merely speach-making parliament, can provide the ground for the growth and selective ascent of genuine leaders, not merely demagogic talents. A working parliament...is one which supervises the administration by continuously sharing its work."[৪৩]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায়, আমলাতন্ত্র ও পার্লামেন্টের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে রাষ্ট্রের চরিত্র কি হবে। রাষ্ট্রের ওপর যদি পার্লামেন্টের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে আমলাতন্ত্র পার্লামেন্টের নির্ধারিত পথে সমাজকে অগ্রসর করে নিয়ে যায়। কিন্তু পার্লামেন্টের এ অধিকার যদি কোন কারণে ক্ষুণ্ন হয়, তাহলে আমলাতন্ত্র নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে; আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, ফলে আমলাতন্ত্রের মধ্যেই আমলাতান্ত্রিক নীতি-বিবর্জিত উপাদানসমূহের সমাবেশ ঘটে। এ পর্যায়ে আমলাতন্ত্র হয়ে ওঠে স্বাধীন। অন্য দিকে, পার্লামেন্ট যদি রাজনৈতিক প্রজ্ঞাসম্পন্নযোগ্য ও সৎ ব্যক্তিদের নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে আর আমলাতন্ত্র স্বাধীনভাবে আচরণ করতে পারে না। আর পার্লামেন্টের সর্বোচ্চ ক্ষমতা যদি নিশ্চিত হয় তাহলেও ক্রমে যোগ্য ব্যক্তিগণই পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হবে। স্বাভাবিকভাবেই যে শ্রেণীর প্রতিনিধিদের নিয়ে পার্লামেন্ট গঠিত হবে, রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে সে শ্রেণী স্বার্থেরই প্রতিফলন ঘটবে। কিন্তু পার্লামেন্টের চূড়ান্ত ক্ষমতা যদি স্বীকৃত হয় তাহলে পার্লামেন্ট অবমাননা করে আমলাতন্ত্রের পক্ষে নির্দিষ্ট কোন শ্রেণীর পক্ষে কিংবা নিজেদের স্বার্থে কাজ করা সম্ভব নয়। তাতে আমলাতন্ত্রের মধ্যে অ-আমলাতান্ত্রিক প্রবণতার অনুপ্রবেশ ঘটাও অসম্ভব।

লেনিন কিন্তু বুর্জোয়া পার্লামেন্টের ওপর এতটা আস্থা রাখতে পারেননি। লেনিন দেখিয়েছেন পার্লামেন্ট হচ্ছে পুঁজিবাদী সমাজে বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ-রক্ষাকারী একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। লেনিনের মতে পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজিপতিরা শুধু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করতেই চায় না, এ প্রতিষ্ঠানসমূহ এমনভাবে গঠন করা হয় যাতে সেগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠারও নিশ্চয়তা থাকে। লেনিনের মতে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রই পুঁজিপতি শ্রেণীর সম্পদ রক্ষা ও শোষণমূলক সম্পর্ক বজায় রাখার সবচেয়ে উত্তম ব্যবস্থা। পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখার একটি খোলস হিসাবে এ রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ব্যবহার করা হয়। এ খোলসটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের এমন একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যা পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ককে বৈধ করে তুলতেই এটি ক্রিয়াশীল থাকে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে রক্ষার জন্য এমনভাবে রাষ্ট্রের কাঠামোটি গঠিত হয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কোন একটি অংশের ছোটখাটো পরিবর্তনে তার কোন হেরফের হয় না। লেনিনের মতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র এমন ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, তার যে কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যেমন পার্লামেন্টের দু'-চারজন ব্যক্তি, এমনকি সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্টির পরিবর্তনেও পুঁজিবাদী শ্রেণীর ক্ষমতার কোন পরিবর্তন হয় না। লেনিনের ভাষায়-

"A democratic republic is the best possible political shell for capitalism, and therefore, once capital has gained possession of this very best shell....it establishes its power so securely, so firmly, that no changes of persons, institutions or parties in the bourgeois-democratic republic can shake it." [৪৪]

---

৪০. Ibid, p.1417.

৪১. Ibid, p.1416.

৪২. Ibid, P.1418.

৪৩. Ibid, p.1416.

৪৪. Lenin, V.I. (1970): op.cit., p.296,

Dhaka University Institutional Repository

লেনিনের মতে, বুর্জোয়া পার্লামেন্টই হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যা পুঁজিবাদী আধিপত্যের নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে। এ বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করতে, লেনিন দুটি কারণকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেনঃ (১) পার্লামেন্ট হচ্ছে বাগাড়ম্বরের একটি প্রকৃষ্ট স্থান, যেখানে কাজের কাজ কিছুই হয় না, জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে অনর্গল তর্ক–বিতর্ক চলে;[৪৫] (২) বুর্জোয়া সমাজের গঠনপ্রণালী এমনই যে, বুর্জোয়া শ্রেণীই সাধারণতঃ পার্লামেন্ট নিয়ন্ত্রণ করে।[৪৬]

লেনিনের মতে বুর্জোয়া সমাজে জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার মূল অস্ত্র হচ্ছে পার্লামেন্ট। পার্লামেন্টকে জনগণের সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যে, পার্লামেন্টই যেন ক্ষমতাকাঠামোর মূল অংশ, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই যেন রাষ্ট্রের মূল পরিচালক, তারাই যেন সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে; আদতে কিন্তু তা নয়, বরং সত্যিকারের রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম চলে যবনিকার অন্তরালে এবং তা চালায় বিভিন্ন দপ্তরের পরিচালক আমলাগণ। পার্লামেন্টগুলি কেবল বাক্য বিস্তার করে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেয়। লেনিনের ভাষায়–

"The any parliamentary country, from America to Switzerland, from France to Britain, Norway and so forth in these countries the real business of "State" is performed behind the scenes and is carried on by the departments chancelleries and General Staffs. Parliament is given up to talk for the special purpose of fooling the "common people," This is so true that even in the Russian republic, a bourge is democratic republic, all these sins of parliamentarism came out at once, even before it managed to set up a real parliament."[৪৭]

অর্থাৎ বুর্জোয়া সমাজে পার্লামেন্টের বিশেষ কোন ক্ষমতা নেই, সকল ক্ষমতা মূলতঃ আমলাতন্ত্রের হাতেই। উপরন্তু পার্লামেন্টের যদি বা কিছু ক্ষমতা থাকেও, তাতেও জনগণের কোন লাভ হয় না। কেননা, বুর্জোয়া সমাজে পার্লামেন্ট সবসময়ই বুর্জোয়া শ্রেণীরই হাতে থাকে। লেনিনের মতে, পুঁজিবাদী সমাজের বিকাশ পর্বের সর্বাধিক অনুকূল পরিস্থিতিতেই গণতন্ত্রের অনুশীলন করা হয়। কিন্তু এ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সর্বদাই পুঁজিবাদী শোষণের সংকীর্ণ গন্ডিতে পিষ্ট ও সংকুচিত থাকে। আর সে কারণেই সাধারণ জনগণ, বিশেষতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ সে গণতন্ত্রের সুফল থেকে বঞ্চিত থাকে। ফলে বুর্জোয়া সমাজের গণতন্ত্র বলতে সর্বদাই নগণ্য সংখ্যালঘু অংশের গণতন্ত্রকে বুঝায়, অর্থাৎ এটি কেবল সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলির জন্য গণতন্ত্র।[৪৮] লেনিনের ভাষায়–

"Democracy for an insignificant minority, democracy for the rich that is the democracy of capitalist society."[৪৯]

লেনিন দেখিয়েছেন, শ্রেণী–সমাজে গণতন্ত্রের অতি আদিম অবস্থাতেও দেখা যায়, সব সময়ই সমাজের স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তিই গণতন্ত্র ভোগ করছে। দাস সমাজে গণতন্ত্রের যে উদাহরণ পাওয়া যায় সেখানে একমাত্র দাস–মালিক শ্রেণীই গণতন্ত্র ভোগ করত। আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজে শোষণের তীব্রতার কারণে গরীব জনসাধারণ অভাব ও দারিদ্র্যে এতই অবদমিত থাকে যে, লোক দেখানো এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জনসাধারণের অধিকাংশই অংশগ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে, বুর্জোয়া সমাজের আইন–কানুন এমনভাবে নির্ধারিত থাকে যে, সমাজের অধিকাংশ মানুষ তাদের নিজস্ব দাবি–দাওয়া ও অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে সংগঠিত হতে গেলে পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হয়। দৈনিক সংবাদপত্র থেকে শুরু করে, প্রচারমাধ্যমগুলি থাকে সমাজের সংখ্যাল্পদেরই দখলে, প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানসমূহের কৃৎকৌশল সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা ইত্যাদি কারণে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ বুর্জোয়া গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ থেকে সব সময়ই থাকে বঞ্চিত।[৫০] ফলে অধিকাংশ জনগণের ওপর শোষক ও নিপীড়কের ভূমিকায় যারা অবতীর্ণ তাদের মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচিত করার প্রহসনে অংশগ্রহণ করা ছাড়া তাদের কোন উপায় থাকে না। সে কারণেই লেনিন লিখেছেন–

"To decide once every few years which member of the ruling class in to repress and crush the people through parliament-this is the real essence of bourgeois parliamentarism, not only in parliamentary-constitutional monarchies,but also in the most democratic repeblics."[৫১]

লেনিন তার 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' গ্রন্থে বুর্জোয়া রাষ্ট্রে বুর্জোয়াদের শ্রেণী আধিপত্যকে নিশ্চিত করতে কিভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয় তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তিনি এ গ্রন্থে, বিশেষতঃ গ্রন্থের দ্বিতীয় ও পঞ্চম পরিচ্ছেদে যে বিষয়টি বিশেষভাবে স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন তার সার–সংকলন করলে দেখা যায় ঃ বুর্জোয়া সমাজে আমলাতন্ত্র পুঁজিপতিদের শ্রেণীশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মৌল কাঠামোর ভূমিকা পালন করে। অধিকন্তু, আমলাতন্ত্র যাতে ধনবাদী আধিপত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে তার উপযোগী করেই আমলাতন্ত্রের সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে ওঠে।

লেনিন তিনটি যুক্তির ওপর নির্ভর করে উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন; এ যুক্তিগুলি হচ্ছে (১) মূলত পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রাখার জন্যই আমলাতন্ত্রকে সংহত করা হয়; (২) ছোট অথবা বড় সব ধরনের আমলাই বুর্জোয়াশ্রেণীর ওপর নির্ভরশীল; এবং (৩) আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের অস্তিত্বের কারণেই প্রশাসনের ওপর জনগণের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

প্রথমতঃ লেনিন দেখিয়েছেন সামন্ততন্ত্রের যে সময় অবলুপ্তি ঘটছিল, সে সময় বুর্জোয়া শ্রেণী রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে, বিশেষত: আমলাতান্ত্রিক কাঠামোকে এমনভাবে পরিবর্তন ও পুনর্গঠন করে, যাতে বুর্জোয়া শ্রেণীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটাকে কাজে লাগানো যায়। সামন্ততন্ত্রের পতন পর্যায়ে প্রতিটি রাজনৈতিক পরিবর্তনের সময়ই রাষ্ট্রের এ দু'টি উপাদান, যথা আমলাতন্ত্র ও সামরিক বাহিনী সুবিন্যস্ত ও সংহত হয়েছে। ইউরোপের উদাহরণ টেনে লেনিন বলেছেন–

"The development, perfection and strengthening of the bureaucratic and military apparetus proceeded during all the numerous bourgeois revolutions which Europe has witnessed since the fall of feudalism."[৫২]

---

৪৫. Ibid, p.320.
৪৬. Ibid, p.350.
৪৭. Ibid, p.320.
৪৮. Ibid, p.350.
৪৯. Ibid, p.350.
৫০. Ibid, P.350.
৫১. Ibid, p.319
৫২. Ibid, p.307.

Dhaka University Institutional Repository

লেনিন কার্ল মার্কসের উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন, বুর্জোয়া শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার প্রক্রিয়াতেই উপলব্ধি করে এমন একটি কার্যনির্বাহক ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন, যা জনগণের নাগালের বাইরে থাকবে এবং একমাত্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার কাজেই নিয়োজিত থাকবে। এই কার্যনির্বাহক ক্ষমতা যাদের নিয়ে গঠিত তার মূল উপাদান হচ্ছে বিরাট আমলাতন্ত্র ও সামরিক সংগঠন-- এদের পিছনে থাকে অভিন্ন আকৃতির সামরিক একটি বিশাল ও রাজকর্মচারী বাহিনী। বুর্জোয়া শ্রেণী বিভিন্ন উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে এ উপলব্ধিতে পৌঁছে যে, রাজনৈতিক পট পরিবর্তন যতই ঘটুক না কেন এই আমলাতন্ত্র ও সামরিক বাহিনীই শেষ পর্যন্ত তাদের শ্রেণীস্বার্থকে রক্ষা করতে পারে। ফলে প্রতিটি পট পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই রাষ্ট্রের এ দুটি উপাদান শক্তিশালী ও নিখুঁত হয়েছে। লেনিন লিখেছেন-

"The centralized state power that is peculiar to bourgeois society came into being in the period of the fall of absolutism. Two institutions most characteristic of this State machine are the bureaucracy and the standing army."[৫৩]

লেনিন ১৮৫২ সালের প্যারি কমিউনের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করতে গিয়ে মত প্রকাশ করেন যে বুর্জোয়া রাষ্ট্র যত বেশি সংকটের সম্মুখীন হয় ততই তার বিভিন্ন উপাদান কেন্দ্রীভবনের দিকে অগ্রসর হয়।[৫৪] অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়া সমাজকে রক্ষার দায়িত্ব পড়ে আমলাতন্ত্র ও সামরিক বাহিনীর ওপর। আর সে কারণেই বুর্জোয়া সমাজে সংকট যত ঘনীভূত হয় ততই এ দু'টি উপাদানের প্রসার ঘটে। আর তাইতো লেনিন লক্ষ্য করেছেন, পুঁজিবাদ যখন সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হয়েছে, ব্যাংক পুঁজি তথা অতিকায় পুঁজিবাদী একচেটিয়ার যুগে এবং যখন একচেটিয়া পুঁজিবাদ রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদে রূপান্তরিত হচ্ছে ঠিক সেই সময় রাষ্ট্রযন্ত্রের তথা আমলাতন্ত্র ও সামরিক শক্তির অসাধারণ শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছে।[৫৫] এর কারণ হিসাবে লেনিন মত প্রকাশ করেছেন, পুঁজিবাদ যত একচেটিয়া রূপলাভ করে ততই শ্রমিকশ্রেণী তথা বুর্জোয়া সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ওপর শোষণ-নিপীড়ন বৃদ্ধি পায়। এর বিপরীতে উক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ তাদের অস্তিত্বের কারণেই সংগঠিত হয় এবং তাদের শোষণমুক্তির লড়াই তীব্রতর করে। একচেটিয়া পুঁজিবাদের যুগে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে রাষ্ট্রযন্ত্রে বিভিন্ন উচ্চ পদের পুনর্বন্টন নিয়ে তীব্র দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলতে থাকলেও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বের লড়াইয়ের তীব্রতাই রাষ্ট্রযন্ত্রের এসব উপাদানকে শক্তিশালী করতে বাধ্য করে। লেনিন লিখেছেন-

"...the more the bureaucratic apparatus is "re-distributed" among the various bourgeois and petty-bourgeois parties.. . the more keenly aware the oppressed classes, and the proletariat at their head, become of their irreconcilable hostility to the whole of bourgeois society. Hence the need for all bourgeois parties, even for the most democratic and "revolutionary democratic" among them, to intensity repressive measures against the revolutionary proletariate, to strengthen the apparatus of coercion, i.e, the state machine."[৫৬]

লেনিন ফ্রান্স, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, জার্মানীসহ বিভিন্ন দেশের উদাহরণ টেনে দেখিয়েছেন বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন প্রশ্নে যত দ্বন্দ্ব-সংঘাতেই লিপ্ত হোক না কেন, বুর্জোয়া ব্যবস্থার ভিত্তি না বদলিয়ে বিভিন্ন পদ পুনর্বন্টন নিয়ে বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়ারা যতই ঝগড়া-বিবাদ করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-সংগ্রামের হাত থেকে বাঁচার জন্য রাষ্ট্রের 'কার্যনির্বাহক ক্ষমতা' তথা আমলাতান্ত্রিক কাঠামো ও সামরিক যন্ত্রটাকে সমুন্নত ও সংহত করাটা জরুরী হয়ে পড়ে।[৫৭]

দ্বিতীয়তঃ উপরের আলোচনা থেকে এ কথা পরিষ্কার যে, লেনিনের মতে, আমলাতন্ত্রের উচ্চপদগুলি বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীর দখলে থাকে। ফলে, বিভিন্ন স্তরের আমলাদের পদোন্নতি ও অন্যান্য সুবিধার জন্য উক্ত উচ্চ পদাধিকারী আমলাদের দৃষ্টি আকর্ষণ খুবই প্রয়োজনীয়। অন্যদিকে, যে পুঁজিবাদ আমলাতন্ত্রকে এই সীমাহীন ক্ষমতা প্রদান করেছে তা বজায় রাখার জন্য তথা আমলাতন্ত্রের অস্তিত্বের প্রয়োজনেই বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে রক্ষা করা প্রয়োজন। লেনিন বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া দলগুলির মধ্যে উচ্চপদ বন্টন-পুনর্বন্টনের কথা যেভাবে বলেছেন, তাতে মনে হয় তিনি মন্ত্রী পদগুলির দিকেই নির্দেশ করেছেন। লেনিনের আলোচনা থেকে ইতিপূর্বে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, নানা কারণে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রতিনিধিদের পক্ষে পার্লামেন্ট দখল করা সম্ভব হয় না, আর পার্লামেন্ট যদি দখল না করা যায়, তাহলে মন্ত্রীত্ব বা অন্য কোন উচ্চপদ দখলের প্রশ্নই ওঠে না। অন্যদিকে, এমন পরিস্থিতি যদি সৃষ্টি হয়ও, যখন সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ পার্লামেন্ট দখল করেছে, তখনও আমলাতন্ত্রকে নিজ শ্রেণী-স্বার্থের পক্ষে কাজে লাগানো সম্ভব হয় না। আর সে কারণেই তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিজ শ্রেণীর পক্ষে কাজে লাগানো সম্ভব নয় বলে লেনিন শ্রমিকশ্রেণীকে উপদেশ দিয়েছিলেন, সে কথা ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে। লেনিন দেখিয়েছেন, উপরোক্ত কারণ ছাড়াও আমলাতন্ত্র স্থায়ী সেনাবাহিনীর ছোট-বড় বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাগণ বুর্জোয়া শ্রেণীর সাথে এত বিভিন্ন বন্ধনে আবদ্ধ থাকে যে, তাদের পক্ষে বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের বিভিন্ন স্তরের পদাধিকারীদেরকে লেনিন পেটি-বুর্জোয়া হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। এই পেটি-বুর্জোয়া আমলারা গ্রামের কৃষক, ক্ষুদে কারখানার মালিক ও ছোট ব্যবসায়ী পরিবারসমূহের উপরস্থ স্তর থেকে আসে। এই স্তরগুলি একদিকে যেমন পুঁজিপতি শ্রেণীর সাথে বিভিন্ন অর্থনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ, অন্যদিকে বুর্জোয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থার সুবাদে জনগণের ওপরওয়ালা হওয়ার মত সুবিধাজনক, নির্ঝঞ্ঝাট ও সম্মানীয় চাকুরী লাভে সক্ষম হয়। লেনিনের ভাষায়-

"In there Works Marx and Engels repeatedly show that the bourgeoisie are connected with these institutions [the bureaucracy and the standing army] by thousands of threads. Every worker experiences, illustrates this connection in an extremely graphic and impressive mannar.... In particular, it is the petty bourngeoisie who are attracted to the side of the big bourgeoisie and are largely subordinated to them through

---

৫৩. Ibid, p.317
৫৪. Ibid, p.309.
৫৫. Ibid, p.309.
৫৬. Ibid, P.308.
৫৭. Ibid, p.309.

Dhaka University Institutional Repository

this apparatus, which provides the upper sections of the peasants, small artisans, tradesman and the like with comparatively comfortable, quiet and respectable jobs raising their holders above the people"[৫৮]

লেনিনের মতে, এসকল কারণে সব স্তরের আমলাই বুর্জোয়া শ্রেণীর ওপর নির্ভরশীল।

তৃতীয়তঃ রাষ্ট্র ও আমলাতন্ত্র সম্পর্কে লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গির ওপরে যেভাবে আলোচিত হয়েছে, তা থেকে দেখা যায়, শ্রমিকশ্রেণী যদি শাসক শ্রেণী হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে চায়, তাহলে তার উপযোগী করেই রাষ্ট্রের উপাদানসমূহকে গড়ে তুলতে হবে। লেনিন আরো মত প্রকাশ করেছেন যে, আমলাতান্ত্রিক সংগঠনটি এমনভাবে গঠিত, যাতে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। কেননা যে যোগ্যতা থাকলে উচ্চ চাকুরীর জন্য প্রার্থী হওয়া সম্ভব, সে যোগ্যতা সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিবারের সদস্যদের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়-- বুর্জোয়া শ্রেণীর শোষণ-শাসনের ফলেই। আর তা ছাড়া, এ পদগুলি কোন নির্বাচিত পদ নয়, তাই জনসাধারণের কাছে জবাবদিহি করার কোন প্রয়োজন নেই। অন্যদিকে, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কোন সদস্য যদি উচ্চ পদের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করেও, তাহলেও মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় নিরপেক্ষতার অভাবে চাকুরী পাওয়া প্রায় সম্ভব হয়ে ওঠে। ফলে আমলাতান্ত্রিক কাঠামো মূলতঃ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বহীনই থেকে যায়। এছাড়া, আমলাদের মোটা বেতন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা এমনভাবে বুর্জোয়া স্বার্থের সাথে যুক্ত করে ফেলে যে, পদাধিকারীর শ্রেণী উৎস যাই হোক না কেন তাকে বুর্জোয়া শ্রেণী স্বার্থকে রক্ষা করতেই হয়।[৫৯] তাছাড়া, বুর্জোয়া সুবিধা, শিক্ষা, জীবন সংগ্রাম এবং ন্যায্য দাবিতে সংগঠিত হওয়া ও সংগ্রামের অধিকারে সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি কারণে বুর্জোয়া সমাজে পার্লামেন্ট প্রায় সব সময়ই থাকে বুর্জোয়া শ্রেণীর দখলে। এ সকল কারণে আমলাতন্ত্র এবং রাষ্ট্রের অন্যান্য মূখ্য উপাদান সব সময়ই থাকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন। আর এজন্য কখনও যদি শ্রমিকশ্রেণী তথা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি পার্লামেন্ট দখলও করে সে পার্লামেন্টের পক্ষে আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং তাকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাজে লাগানো সম্ভব হবে না। তাই লেনিন লিখেছেন-

"it is clear that the old executive apparatatus, the bureaucracy, which is connected with the bourgeois, would be unfit to carry out the orders of the proletarian state."[৬০]

তাই লেনিন মত প্রকাশ করেছেন, সামরিক আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্রটার ধ্বংস হচ্ছে যে কোন সত্যিকার গণবিপ্লবের প্রাথমিক শর্ত। এই যন্ত্রটাকে না ভেঙ্গে কোনভাবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী পুরোনো যন্ত্রটাকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে না। লেনিনের ভাষায়-

"...the destruction of the bureaucratic military state machine is the precondition for every real people's revolution."[৬১]

রাষ্ট্র সম্পর্কে ম্যাক্স ওয়েবার ও ভ.ই. লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে উপরোক্ত পর্যালোচনা থেকে দু'জনের মধ্যে কয়েকটি মিলের দিক দেখা যায়ঃ

(১) রাষ্ট্রযন্ত্রের দুটি অংশ; একটি, আমলাতন্ত্র এবং অন্যটি পার্লামেন্ট;

(২) সাধারণভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রের মূল উপাদান হচ্ছে সামরিক ও বেসামারিক আমলাতন্ত্র, যা রাষ্ট্রের মূল কাজগুলি করে থাকে; এবং

(৩) আমলাতন্ত্রের উচ্চতম পদগুলি পূরণ হয় পার্লামেন্টের মনোনীত ব্যক্তিদের দ্বারা।

তবে সুনির্দিষ্ট কতকগুলি প্রশ্নে ওয়েবার ও লেনিনের মধ্যে তীব্র মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ওয়েবার আমলাতন্ত্রকে দেখেছেন সমাজের নিয়মানুবর্তিতা রক্ষার জন্য অপরিহার্য একটি সংগঠন হিসাবে। অন্যদিকে, লেনিন এটাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের ওপর সংখ্যালঘু বৃহৎ বুর্জোয়াদের শোষণ-শাসনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার হাতিয়ার হিসাবে দেখেছেন।

ওয়েবার আমলাতন্ত্রকে আধুনিক সমাজের [বুর্জোয়া সমাজ] জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান হিসাবে গণ্য করেছেন এবং তিনি এটাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আর লেনিন আমলাতন্ত্রকে বুর্জোয়া সমাজের জন্য অপরিহার্য রাষ্ট্রীয় উপাদান হিসাবে গণ্য করলেও এর ভূমিকাকে একমাত্র বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা ও বুর্জোয়া শ্রেণীর ওপর নির্ভরশীল উপাদান হিসাবে দেখেছেন। ওয়েবার আমলাতন্ত্রকে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় উপাদান হিসাবে গণ্য করলেও আমলাতন্ত্রের কর্মকান্ড নিয়ে যখন আলোচনা করেছেন, সেখানে কিন্তু তিনি তাঁর উপরোক্ত বক্তব্যে স্থির থাকতে পারেননি। তিনি দেখিয়েছেন প্রযুক্তিগত দক্ষতা, বিভাগীয় গোপনীয়তা সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা এবং সীমাহীন বিভাগীয় ক্ষমতা তাদেরকে এমন কতকগুলি কার্যকরী ক্ষমতা প্রদান করে যে, তা ব্যবহার করে তাদের পক্ষে নানা ধরনের ব্যক্তিগত সুবিধা আদায় করা সম্ভব। এ ব্যাপারে ওয়েবারের সাথে লেনিনও একমত। কিন্তু ওয়েবার যেখানে মত প্রকাশ করেন যে, সকল শ্রেণীস্বার্থের উর্ধে একটি স্বতন্ত্র আমলাতান্ত্রিক স্বার্থ গড়ে ওঠে এবং তা যে কোন সময় সব ধরনের সামাজিক শ্রেণীস্বার্থের সাথে বিরোধাত্মক হয়ে উঠতে পারে, তখন আর লেনিন একমত হতে পারেননি। লেনিন মতপ্রকাশ করেছেন আমলাতান্ত্রিক কর্মকর্তাদের নিজস্ব পেশাগত স্বার্থ থাকতেই পারে। কিন্তু তা কখনও অর্থনৈতিকভাবে প্রভুত্বকারী শ্রেণী, তথা বুর্জোয়া শ্রেণীর বিপক্ষে দাঁড়াতে পারে না; বুর্জোয়া শ্রেণীর নিজেদের মধ্যেকার ভাঙ্গন ও বিভিন্ন রকম সংকটের কারণে আমলা কাঠামোর মধ্যেও ভাঙ্গন দেখা দিতে পারে। কিন্তু এ সকল ঘটনা এই আমলা কাঠামোকে আরও শক্তিশালী ও সংহত করে তোলে, যাতে তাদের শ্রেণীস্বার্থ বিরোধী যে কোন ধরনের আঘাত বা হুমকিকে দক্ষতার সাথে প্রতিহত ও নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

ওয়েবার আমলাতন্ত্রের উচ্চ পদগুলি পার্লামেন্ট মনোনীত প্রতিনিধিদের দিয়ে পূরণ হবার কথা বললেও তিনি স্বীকার করেছেন যে, পার্লামেন্টের এ প্রতিনিধিগণ আমলাতন্ত্রের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে নিয়ন্ত্রণহীন ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে। এই উচ্চ পদাধিকারিগণ আমলা-কাঠামোর বাইরে থেকে আসে আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে। কিন্তু আমলাতন্ত্রের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে এরাই আমলাতন্ত্রের অংশে

---

৫৮. Ibid, p.307.

৫৯. Ibid, pp.315-18

৬০. Ibid, p.328.

৬১. Ibid, p.314.

Dhaka University Institutional Repository

পরিণত হয়। আর সাধারণতঃ এই পদাধিকারিগণ একেকটি দপ্তরের চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়, তাই তার ওপর নিয়ন্ত্রণ করার আর কেউ থাকে না। রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অভাব, নৈতিকভাবে দুর্বল ও দুর্বলচিত্তের এ উচ্চ পদাধিকারিগণ ক্ষমতা পেয়েই বৈষয়িক সুবিধা অর্জনের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। এভাবে অধীনস্থ আমলাদেরও বৈষয়িক সুবিধা অর্জনের ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। সমগ্র আমলা-কাঠামোই এভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এ দুর্নীতিগ্রস্থতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ওয়েবার পার্লামেন্ট সদস্য ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে ছোট ছোট তত্ত্বাবধায়ক গোষ্ঠী গঠনের সুপারিশ করেছেন, যে সব গোষ্ঠী সমগ্র আমলা-কাঠামো যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কি-না, তা পর্যালোচনা করবে। বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চতম পদাধিকারীর যে বিভাগীয় সর্বময় ক্ষমতা রয়েছে এই ক্ষমতাকে ব্যবহার করে উক্ত তত্ত্বাবধায়ক গোষ্ঠীকেও বিভিন্ন অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা সম্ভব। কিন্তু এ তত্ত্বাবধায়ক গোষ্ঠীকে কিভাবে উক্ত আর্থিক সুবিধার আওতা থেকে বাইরে রাখা যাবে, সে সম্পর্কে তিনি তেমন কিছু বলেননি। অন্যদিকে, পার্লামেন্ট কিভাবে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের প্রতিনিধি হয়ে উঠবে সে সম্পর্কেও কোন স্পষ্ট বক্তব্য উপস্থাপন করেননি, বিশেষতঃ সমাজের যারা পিছিয়ে-পড়া সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ, পার্লামেন্টে তাদের প্রতিনিধিত্ব কিভাবে নিশ্চিত হবে সেটাও ওয়েবার স্পষ্ট করে বলেননি। ফলে পার্লামেন্টের নিজস্ব নিরপেক্ষতা নিয়েই প্রশ্ন উঠে যায়। অন্যদিকে, যদিও বা আংশিকভাবে নিরপেক্ষ হয়ও, কিংবা সে প্রশ্ন বাদ দিলেও, পার্লামেন্ট সদস্যদের নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক গোষ্ঠীগুলি কিভাবে নিরপেক্ষ থাকবে তারও কোন স্পষ্ট জবাব ওয়েবার দেননি।

অন্যদিকে, লেনিন এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে মত প্রকাশ করেছেন, যখন পদাধিকার ও বিভিন্ন বৈষয়িক স্বার্থ নিয়ে আমলা-কাঠামো এবং তার উচ্চতম পদাধিকারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে, তখন বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ওপর শাসন-শোষণও বৃদ্ধি পায়। উপরোক্ত প্রক্রিয়াগুলি যত তীব্র হয়, ততই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ওপর শোষণ-নির্যাতন তীব্রতর হয়। ফলে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য মরণপণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। এ পর্যায়ে উচ্চ পদাধিকারী থেকে শুরু করে বুর্জোয়া শ্রেণীর সবাই আমলাতন্ত্রকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেয়। শাসক বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে কেন্দ্রীভবন ঘটতে থাকে, বুর্জোয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থা ধ্বংসের পূর্ব পর্যন্ত এ কেন্দ্রীভবন ও আমলাতন্ত্রকে শক্তিশালী করার প্রক্রিয়া চলতেই থাকে। কিন্তু বুর্জোয়াদের এ কেন্দ্রীভবন কিংবা আমলাতন্ত্রের এ সংহতকরণ প্রক্রিয়া মোটেই প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করা কিংবা আমলাতন্ত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ঘটে না, বরং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর শ্রেণীসংগ্রামকে কিভাবে ধ্বংস করে দেওয়া যায় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতার ওপর শাসন-শোষণও পাকাপোক্ত করা যায়, তার উদ্দেশ্যেই ঘটে। এ পর্যায়ে জনগণের শ্রেণীসংগ্রাম বিজয়ী না হয়ে যদি বিপর্যস্ত হয়, যদি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিরোধ বাড়িয়ে তুলে, কার্যকরী শ্রেণীসংগ্রামের ভিত্তিটিই যদি নষ্ট করে দেওয়া যায়, ঠিক তখন বুর্জোয়া রাষ্ট্রের এই অতি শক্তিশালী সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের ভূমিকা কোন্ পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হবে এ ব্যাপারে লেনিন কিন্তু কোন ব্যাখ্যা দেননি।

লেনিনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী জনগণের শ্রেণীসংগ্রাম যখন তীব্রতর হয় তখন বুর্জোয়াদের মধ্যে কেন্দ্রীভবন ঘটে। অন্যদিকে, জনগণের শ্রেণীসংগ্রাম যখন অসংগঠিত ও বিশৃংখল অবস্থায় থাকে, তখন বুর্জোয়া শ্রেণীর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-বিরোধ বৃদ্ধি পায়। তাহলে সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের সীমাহীন শক্তিবৃদ্ধি ঘটিয়ে যখন বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর শ্রেণীসংগ্রামকে দমন ও বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং তার পরবর্তী সময়ে যখন সাধারণ নিয়মেই বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্ব বিরোধ তীব্রতর হয়ে ওঠে, তখন এই অতি শক্তিশালী বা অতি বিকশিত আমলাতন্ত্রের ভূমিকা কি হবে, তাও লেনিন স্পষ্টভাবে আলোচনা করেননি। আর এ আলোচনা লেনিন করেননি বলেই এ পর্যায়েও আমলাতন্ত্র পরিপূর্ণভাবে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতি অনুগত ও নির্ভরশীল থাকে কি না সে প্রশ্নেরও কোন মীমাংসা তিনি করতে পারেননি। তবে লেনিনের অধিকাংশ রচনাই যেহেতু রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের সচেতন উদ্দেশ্যে নিবেদিত, সে কারণে তার লেখায় গণজাগরণের সহায়ক দিকটিই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে।

ওয়েবার এবং লেনিন রাষ্ট্র বিষয়ক আলোচনায় চূড়ান্তভাবে যে জায়গাতে এসে পরস্পর-বিরোধী অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাহল বিভিন্ন শ্রেণীর সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক। ওয়েবারের মতে, রাষ্ট্র শ্রেণী-নিরপেক্ষ, তবে আমলাতন্ত্রের আদর্শ রূপের প্রতিষ্ঠা না হলে সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রসারিত হয়, ফলে রাষ্ট্র তার ন্যায্যতা হারিয়ে ফেলে। অস্তিত্বকে বজায় রাখতে রাষ্ট্র সমগ্র জনসাধারণের ওপর নিপীড়ন চালাতে শুরু করে। এ নিপীড়ন নির্দিষ্ট কোন শ্রেণীর ওপর চলে তা নয়, রাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্য হুমকি স্বরূপ সকল শ্রেণীর ওপরই নিপীড়ন চালায়। লেনিন ওয়েবারীয় যুক্তিকে খন্ডন করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, রাষ্ট্র মোটেও শ্রেণী-নিরপেক্ষ নয়, বরং এক বা একাধিক শ্রেণীস্বার্থকে রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই রাষ্ট্রযন্ত্রটি কাজ করে চলে।

৩ঃ৩ বুর্জোয়া রাষ্ট্র সম্পর্কে আধুনিক তত্ত্বঃ

ওয়েবার ও লেনিনের আলোচনা থেকে সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন জাগে রাষ্ট্র কি কখনই নিরপেক্ষ হতে পারে না? পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের প্রকৃতি নিয়ে পরবর্তীকালে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁদের মধ্যে নিকোস পোলান্‌তজা (Nicos Poulantzas) এ বিষয়টি নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

পোলানতজা মত প্রকাশ করেছেন, সাধারণভাবে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র পুঁজিবাদী শ্রেণীর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থকেই রক্ষা করে চলে, কিন্তু এটাই চূড়ান্ত কথা নয়। পুঁজিবাদী সমাজে এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এমন কতকগুলি দ্বন্দ্ব-বিরোধ বিদ্যমান থাকে যে, রাষ্ট্রের পক্ষে অধিকাংশ সময়ই একক কোন শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব হয় না, কিংবা তার কোন অপরিহার্যতা থাকে না। এ ধরনের অবস্থা তীব্রতর হয় যখন পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজি একচেটিয়া রূপের ধারণ করতে থাকে। একদিকে পুঁজিবাদ বনাম শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব সমাজের মূল দ্বন্দ্ব রূপে আত্মপ্রকাশ করার ফলে বিভিন্ন শ্রেণী উপাদান নিয়ে গঠিত রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে একটি নিরপেক্ষতার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়, অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান একচেটিয়া পুঁজির ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা নিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যেই দেখা দেয় তীব্রতর দ্বন্দ্ব। এভাবেও রাষ্ট্রযন্ত্রটি আপেক্ষিকভাবে স্বাধীন হয়ে ওঠে। পোলান্‌তজার ভাষায়-

"This relative autonomy is registerd both in the principal contradiction (bourgeoisie/working class), and.... in the struggles and contradictions within monopoly capital itself."[৬২]

---

৬২. Poulantzas, Nicos (1975): Classes in contemporary capitalism, London: NLB, p.158.

Dhaka University Institutional Repository

পোলানত্জার মতে বুর্জোয়া শ্রেণীর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বই হচ্ছে রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাধীনতার মূল কারণ।[৬৩] কেননা পুঁজিবাদী সমাজে রাষ্ট্রই সকল ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সংগঠকের ভূমিকা পালন করে। ফলে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান দ্বন্দ্ব-বিরোধকে কাজে লাগিয়ে রাষ্ট্রই হয়ে ওঠে সমস্ত ক্ষমতার অধিপতি। অর্থাৎ পোলানৃতজার মতে পুঁজিবাদী সমাজে রাষ্ট্র কার্যত বুর্জোয়া শ্রেণীর বিভিন্ন গোষ্ঠীর সেতু-বন্ধন হিসাবে কাজ করে। পোলানৃতজা বলেন-

"Today as always, the state plays the role of political unifier of the powerblocs and political organizer of the hegemony of monopoly capital within the power bloc, which is made up of several fractions of the bourgeois class and is divided by internal contradiction."[৬৪]

ফলে পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজি যত একচেটিয়া রূপ লাভ করে ততই রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাধীনতার পরিমাণ কমতে থাকে। ক্রমশঃ রাষ্ট্র উক্ত একচেটিয়া পুঁজির পাহারাদারের ভূমিকা পালন করতে থাকে। অর্থাৎ পুঁজির একচেটিয়া রূপ লাভের সাথে সাথে রাজনৈতিক, মতাদর্শগত এবং অর্থনৈতিকভাবে শ্রমিকশ্রেণীর ওপর চূড়ান্ত শাসন-শোষণের কাজে রাষ্ট্রকে ব্যবহার করা হয়।[৬৫] কিন্তু যখন পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজি একচেটিয়া চরিত্র অর্জনে অক্ষম হয়ে ওঠে, বিভিন্ন পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর মধ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-বিরোধ বিদ্যমান থাকে কিংবা তা ক্রমাগত বাড়তে থাকে; সে সময় রাষ্ট্র বুর্জোয়াদের এই বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সমন্বয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

পুঁজিপতি শ্রেণীর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাধীনতার কারণ হিসাবে পোলানৃতজা উল্লেখ করলেও পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁর এ অবস্থানে দাঁড়িয়ে থাকেননি। বরং তিনি বুর্জোয়া সমাজের অভ্যন্তরে বিদ্যমান শ্রেণী-বিরোধকেই রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাধীনতার মূল উপাদান হিসাবে বর্ণনা করেছেন। পোলানৃতজার ভাষায়-

"...the relative autonomy of the state, founded on the separation (constantly being transformed) of the economic and the political, is inherent in its very structure (the state is a relation) is so far as it is the resultant of contradictions and of the class struggle as expressed, always in their own specific mannar, within the state itself- this state which is both shot through and constituted with and by these class contradictions.[৬৬]

পোলানত্জা তার উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি দেখিয়েছেনঃ পুঁজিবাদী সমাজে আমলাতন্ত্র একটি নির্ধারক ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন শ্রেণী উৎস থেকে আগত আমলা গোষ্ঠী সব সময় যে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর পক্ষেই কাজ করে যাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। বরং তা অনেকাংশেই অসম্ভব। কেননা পোলানৃতজার মতে, এ আমলাতন্ত্র যাদেরকে নিয়ে গঠিত তারা ব্যক্তিগতভাবে কোন না কোন শ্রেণীতে অবস্থান করলেও স্বতন্ত্রভাবে আমলাদের নিয়ে নির্দিষ্ট কোন শ্রেণী কিংবা শ্রেণীর অংশ বিশেষ গড়ে ওঠে না। পোলানৃতজার কথায়-

"... the specific role of the bureaucracy which, although it constitutes a specific social category, is not a group standing above, outside or to one side of classes an elite, but one whose members also have a class situation or membership."[৬৭]

ফলে ক্ষমতাসীন শ্রেণী তথা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী শ্রেণী যখন তাদের শ্রেণীস্বার্থকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে রাষ্ট্রকে ব্যবহার করতে চায় তখন রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সাংবিধানিক নির্দেশ হচ্ছে রাষ্ট্র সব সময়ই ক্ষমতাসীনদের নিরাপত্তা বিধানে ব্যাপৃত থাকবে, কিন্তু যখন ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর শ্রেণীস্বার্থ আমলাতন্ত্রের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থের সাথে অসংগতিপূর্ণ হয়ে ওঠে, যখন শাসক শ্রেণীর সাথে অপরাপর প্রধান শ্রেণীর বিরোধটি তীব্রতর হয়ে ওঠে ঠিক সে সময় রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের ভিতর অভ্যন্তরীণ বিরোধের সূত্রপাত হয়। পোলানৃতজার মতে বর্তমান কালের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে শ্রেণী-বিভাজনটা সুস্পষ্টভাবে ঘটে না। অর্থাৎ এটি বিভিন্ন শ্রেণীস্বার্থের সাথে এমনভাবে জড়িত হয়ে পড়ে যে, মোটাদাগে একটি শ্রেণী থেকে আর একটি শ্রেণীকে পৃথক করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। তাই শাসক শ্রেণী যখনই তার শ্রেণীস্বার্থকে প্রতিষ্ঠিত করতে সুনির্দিষ্ট কোন পদক্ষেপ নেয় তখনই অপরাপর বিভিন্ন শ্রেণী কিংবা স্তরের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এর এক পর্যায়ে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে এমন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় যার ফলে পুরো রাষ্ট্র কাঠামোটিই ভাঙ্গনের মুখোমুখি হয়। মন্ত্রিসভা ও সরকারী অফিস কর্মাধ্যক্ষ, মন্ত্রিসভা ও পার্লামেন্ট, কেন্দ্রীয় প্রশাসন ও স্থানীয় বা আঞ্চলিক প্রশাসন ইত্যাদির মধ্যে কর্মকাণ্ডের আর সঙ্গতি থাকে না। সেনাবাহিনী বা বিচার বিভাগের মধ্যেও বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়ে। ফলে পুঁজিবাদী সমাজে শাসক গোষ্ঠী যত শক্তিশালীই হোক না কেন সমাজের জটিল বিন্যাস এবং শ্রেণী-সংঘাতের বৈশিষ্ট্যের কারণেই গোটা রাষ্ট্রকে পরিপূর্ণভাবে একটি শ্রেণীর পক্ষে লাগাতে গেলে আমলাতন্ত্রকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। আর এভাবেই রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র ভূমিকা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয় বলে পোলানৃতজা অভিমত প্রকাশ করেছেন। পোলানৃতজার ভাষায়-

"....the relative autonomy of the state with respact to this or that fraction of the power bloc, which is essential to its role as political unifier of this bloc under the hegemony of a class or fraction (at present the monopoly capitalist fraction), thus appears, in the process of constitution and functioning of the state, as a resultant of inter-organ and inter-branch contradictions (the State being divided). These inter-organ contradictions,

---

৬৩. Ibid, p.157.

৬৪. Ibid, p.157

৬৫. Ibid, p.168.

৬৬. Poulantzas, Nicos (1976): "The capitalist state: A Reply to Miliband and Laclau" New Left Review, no-95, p.74.

৬৭. Ibid, p.75.

Dhaka University Institutional Repository

moreover, are themselves inherent in the very structure of the capitalist state seen as the condensate of a class relation, founded on the separation of the political and the economic."[৬৮]

অর্থাৎ পোলান্তজার মতে পুঁজিবাদী সমাজে শাসক শ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করাটা রাষ্ট্রের কাজ হলেও বর্তমান বুর্জোয়া সমাজের জটিল গঠন রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাধীনতার জন্য ক্ষেত্র তৈরি করে দেয়। এ ক্ষেত্রে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিভিন্ন অংশের মধ্যেকার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব থেকে রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাধীনতার ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় বলে মনে হলেও বুর্জোয়া সমাজে বিদ্যমান শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও শ্রেণী-সংঘাতই রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাধীনতার মূল কারণ বলে পোলান্তজা মত প্রকাশ করেছেন।

পোলানতজার অনুরূপ রাল্‌ফ মিলিবান্ড ও (Ralf Miliband, ১৯৮৩) মত প্রকাশ করেছেন পুঁজিবাদী সমাজে প্রভুত্বকারী শ্রেণীটি যখন নিচের তলার মানুষদের অব্যাহত এবং প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয় শুধুমাত্র তখনই রাষ্ট্র স্বাধীন একটি অবস্থান গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া, অন্য কোন সময় রাষ্ট্রের স্বাধীনতা বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকে না। প্রভুত্বকারী শ্রেণী তথা বুর্জোয়া শ্রেণী যখন সমাজের ওপর অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র সহ সব কিছুর ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে তখন নিচের তলার মানুষের বিরোধিতা করার মত কোন সংগতি থাকে না। অর্থাৎ এরকম অবস্থায় রাষ্ট্রের স্বাধীনতা (autonomy) বলতে আর কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকে না। মিলিবান্ডের ভাষায়-

".The degree of autonomy which the state enjoys for most purposes in relation to social forces in capitalist society depends above all on the extent to which class struggle and pressure from below challenge the hegemony of the class which is dominant in such a society. Where a dominant class is truely hegemonic in economic, social, political and cultural terms, and therefore free from any major and effective challenge from below, the chances are that the state itself will also be subject to its hegemony, and that it will be greatly constrained by the various forms of class power which the dominant class has at its disposal. Where on the other hand, the hegemony of a dominant class is persistently and strongly challenged, the autonomy of the state is likely to be substantial."[৬৯]

যদিও মিলিবান্ড স্বীকার করেছেন, রাষ্ট্র শুধু মাত্র একটি ক্ষমতা প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানই নয়, এটা অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ একটি উপাদান তথাপি রাষ্ট্রকে সাধারণভাবে বিশেষত, নিচের তালার মানুষদের পক্ষ থেকে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন না হলে, স্বাধীন একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেখতে তিনি রাজী নন। মিলিবান্ড মত প্রকাশ করেছেন, নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উপাদানের জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়নে কিংবা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে, কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার মূল দায়িত্ব পালন করে থাকে শুধুমাত্র রাষ্ট্রের অভ্যন্তরের গুটিকয়েক ব্যক্তিই। এমনকি, এটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে একক কোন ব্যক্তির ওপর গিয়েই বর্তায়। আর এই একক ব্যক্তি বা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর সিদ্ধান্ত অন্যদের আপত্তির কারণে খুব কম সময়ই পরিবর্তিত হয়। মিলিবান্ডের ভাষায়-

"No doubt, there are many powerful influences and constraints, from outside the state, international as well as indigenous, ..But it is ultimately a very small group of people in the state– often a single person who decide what is to be done or not done; are left with no range of choice at all."[৭০]

ফলে একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে গোটা রাষ্ট্রের স্বাধীন হয়ে ওঠার কোন সুযোগ নেই। মিলিবান্ড মত প্রকাশ করেছেন, এটা ঠিকই যে, রাষ্ট্র অসংখ্য লোভনীয় চাকুরীর ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে যারা চাকুরী করে তারা অনেক উচ্চ বেতন পায়, একটি সীমিত পরিসরে এ পদাধিকারিগণ প্রচুর ক্ষমতা ভোগ করে। সরাসরি সরকারী কাঠামোর বাইরেও বিভিন্ন সংস্থাকে কেন্দ্র করে এমন কিছু পদ তৈরি করে যে, সেগুলিও বেতন, পদমর্যাদা কিংবা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার দিক থেকে খুবই লোভনীয়। আর এভাবে এই হাজার হাজার পদাধিকারী নিয়ে একটি রাষ্ট্রীয় বুর্জোয়া শ্রেণী গড়ে ওঠে বলেও মিলিবান্ড মতপ্রকাশ করেছেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও এই বিশাল পদাধিকারী গোষ্ঠী এমন কোন সাধারণ সত্তার বিকাশ ঘটায় না যার ফলে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা অর্জনের কোন ক্ষেত্র সৃষ্টি হতে পারে। কেননা, এই পদাধীকারীগণ যতই বুর্জোয়া ধ্যান-ধারণায় পুষ্ট হয়ে উঠুক না কেন, এরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত থাকে না। ফলে বুর্জোয়া শ্রেণীস্বার্থকে সংরক্ষণের ব্যাপারে তাদের ভিতর তেমন কোন গরজ অনুভূত হয় না। বরং তারা তাদের চাকুরী কিংবা পদোন্নতির বিষয় নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকে। পুঁজিবাদী স্বার্থকে এই পদাধিকারিগণ একেবারে উপেক্ষা করে যায় তা নয়, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে এ স্বার্থটি রক্ষা করার জন্য কোন সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব তাদের ওপর বর্তায় না, কিংবা সে ধরনের অধিকারও তাদের নেই। মিলিবান্ডের ভাষায়-

"The state is not the only institution which makes the exercise of great power possible, but it is by far the most important one. Nor does it only make possible the exercise of power as such, crucial though that is: it is also the source of high salaries, status, privilege and access to well-paid and otherwise desirable positions outside the state. Nor is this only relevant for those people who are at the very center of the decision-making process. Thousands of people in the upper reaches of the state are involved, whom the state provides with high salaries and all that goes with state service at this level, not only in government departments, but also in innumerable boards, commissions, councils and other public bodies. Such people constitute a 'state bourgeoisie', linked to, but separate from those who are in charge of corporate capitalist enterprise. Their first concern is naturally with their jobs and careers. Capitalist interests are in no danger of being overlooked; but they are not the sole or primary concern of these office holders.[৭১]

---

৬৮. Ibid, P.75.

৬৯. Meliband, Ralph (1983): 'State Power and Class Interests' New Left Review, No-138, p.61,

৭০. Ibid, p.61,

৭১. Ibid, p.63

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রীয় আমলাদের মধ্যে এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও রাষ্ট্র যে কখনও কখনও স্বাধীন হয়ে ওঠে তার কারণ কি? মিলিবান্ডের মতে, যখন নিচের তলার মানুষ একত্রিত হয়ে বুর্জোয়া শ্রেণীর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভুত্বকে প্রতিহত করতে মরণপণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় ঠিক তখনই বুর্জোয়া শ্রেণী রাষ্ট্রের সাথে আপোস করে, রাষ্ট্রের সাথে জোট গঠন করতে বাধ্য হয়। প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাষ্ট্রে শুধুমাত্র বুর্জোয়া শ্রেণীর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসাবে না থেকে, রাষ্ট্রীয় আমলাগোষ্ঠীর ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষার কাজেও ব্যবহৃত হতে থাকে। এ পর্যায়ে রাষ্ট্রের সাথে বুর্জোয়া শ্রেণীর একটি অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বুর্জোয়া শ্রেণীর সাথে রাষ্ট্রের এ সম্পর্ক সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে মিলিবান্ড বলেন–

"....the relationship between the dominant class in advanced capitalist societies and the state is one of partnership between two different, separate forces, linked to each other by many threads"[৭২]

মিলিবান্ড অবশ্য বলেছেন বুর্জোয়া শ্রেণী ও রাষ্ট্রের মধ্যে এ ধরনের অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্ক থাকলেও তা তাদের স্ব স্ব গন্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। ফলে যে কোন সময় এ সমঝোতার প্রকৃতি পাল্টে যাবার সুযোগ থাকে। মিলিবান্ডের মতে এ অংশীদারিত্বমূলক বা সমঝোতামূলক সম্পর্ক কোন স্থায়ী কিছু নয়। যে কোন সময় তা পাল্টে যেতে পারে। সামাজিক শক্তির মধ্যে ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটার সাথে সাথে এ সমঝোতা আরো বাড়তে পারে আবার নিঃশেষও হয়ে যেতে পারে। এটা কতটা স্থায়ী হবে, বাড়বে না কমবে তা নির্ভর করে বাস্তব পরিস্থিতির ওপর। তবে সামাজিক শক্তিসমূহের ভারসাম্য যত বুর্জোয়া সমাজের প্রভুত্বকারী শ্রেণীর বিপক্ষে চলে যেতে থাকে ততই রাষ্ট্রের স্বাধীনতার পরিমাণ বাড়তে থাকে। মিলিবান্ড বলেছেন–

"The terms of that partnership are not fixed but constantly shifting, and affected by many different circumstances, and notably by the state of class struggle. It is not at any rate a partnership in which the state may be taken necessarily to be the junior partner.[৭৩]

মিলিবান্ড মত প্রকাশ করেছেন, সামাজিক উত্তেজনা, শ্রেণীসংগ্রাম ইত্যাদি কারণে বুর্জোয়া সমাজে রাষ্ট্র যে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে, তা অনেক সময়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করে বটে, কিন্তু কখনও তা সীমা অতিক্রম করতে পারেনা। রাষ্ট্র তার নিজের স্বার্থে অনেক কিছু করতে পারে। যতদিন রাষ্ট্র তার স্বাধীনতা ভোগ করেও পুঁজিবাদী স্বার্থকে পরিপূর্ণভাবে রক্ষা করতে পারে ততদিন রাষ্ট্রের এ স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন থাকে। কিন্তু কখনই তা বুর্জোয়া শ্রেণীর বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করতে পারে না– এটাই রাষ্ট্রের স্বাধীনতার সীমা বলে মিলিবান্ড মত প্রকাশ করেছেন। মিলিবান্ডের মতে, বুর্জোয়া সমাজে কখনও কখনও দীর্ঘকাল ধরে রাষ্ট্র স্বাধীনতা ভোগ করে চলে, কখনও কখনও নীতি–নির্ধারণী ভূমিকায় গিয়েও অবতীর্ণ হয়, কিন্তু যখন দেখা যায়, রাষ্ট্র পুঁজিবাদী স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিচ্ছে বা পুঁজিবাদী স্বার্থকে ধারাবাহিকভাবে বিঘ্নিত করছে ঠিক তখন উক্ত রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকার আর টিকে থা কতে পারে না। বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী সরকারের অবসান ঘটে এবং সেই সাথে রাষ্ট্রের স্বাধীনতার পরিসমাপ্তি ঘটে। এমন একটি সরকার তখন গঠিত হয় যা পুঁজিবাদী স্বার্থকে পরিপূর্ণভাবে রক্ষা করতে সক্ষম। মিলিবান্ডের ভাষায়–

So long as a government works within it, so long does the partnership hold. If it seeks to pose a fundamental threat to capitalist interests, or a threat which capitalist interests judge to be fundamental, the partnership is dissolved and replaced by the determination of these interests to see the governments destroyed."[৭৪]

মিলিবান্ডের মতে যদি একটি বাম রাজনৈতিক শক্তি কখনও সরকার গঠন করে তাহলেও তার পক্ষে দীর্ঘকাল ধরে পুঁজিবাদী স্বার্থকে ক্ষুণ্ন করে চলা সম্ভব হয় না। কেননা যারা সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের অংশে পরিণত হয় তারা সমগ্র রাষ্ট্রের তুলনায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশ। অন্যদিকে, যারা রাষ্ট্রের বিভিন্ন উচ্চপদে স্থায়ীভাবে অবস্থান করে, যেমন, বিচারক–মন্ডলী, সামরিক বাহিনীর বড় কর্মকর্তা, পুলিস ও অন্যান্য দপ্তরের উচ্চ পদাধিকারী, এরা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বেরতুলনায় অনেক বেশি সংঘবদ্ধ এবং এরা প্রত্যেকে একেকটি বিশাল বিশাল সংঘবদ্ধ কার্যকরী ও প্রশাসনিক কাঠামোর শীর্ষে অবস্থান করে।[৭৫] ফলে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ক্ষমতার ভারসাম্য থাকে এদের পক্ষেই। উপরন্তু, বুর্জোয়া সমাজ যে সাংবিধানিক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, তা বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থকে সংরক্ষণেরই নির্দেশ দেয়। ফলে সরকার বামশক্তিকে নিয়ে হলেও সরকারকে বুর্জোয়া স্বার্থ রক্ষা করার পক্ষেই কাজ করে যেতে হয়। এরকম সময় ক্ষমতা বহির্ভূত বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছ থেকে বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হয় অন্যদিকে, বুর্জোয়া শ্রেণীর গঠিত সরকার থাকার সময়ও যদি বুর্জোয়াদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিভিন্ন ব্যবসায়িক স্বার্থ নিয়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিদ্যমান থাকে, তাহলেও বুর্জোয়ারা তাদের শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণের ব্যাপারে সবাই থাকে একমত। এমন কি সরকার যদি শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণের স্বার্থে অত্যন্ত আপত্তিকর কোন ঘটনাও ঘটিয়ে দেয় তাহলেও বুর্জোয়া শ্রেণী জাতীয় স্বার্থের ধুয়ো তুলে তাকে সমর্থন করে। মিলিবান্ডের ভাষায়–

"Great antagonism to the government might be expressed by members of the dominant class, business interests and their many agencies; but there was always a clear understanding on the part of these class forces that, even though the government might be doing some reprehensible things, it was also seeking to maintain the existing social order, to help business, to discipline and subdue labour, and to defend, in international and defence matters..., what dominant class interests and the government both agreed to be the 'national interest.'[৭৬]

নিকোস পোলানতজা এবং রালফ মিলিবান্ড উভয়ই একটি ব্যাপারে একমত যে, বুর্জোয়া সমাজে যখন নিচের তলার মানুষ তথা শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়া শ্রেণীর আধিপত্যের সামনে হুমকি হয়ে ওঠে তখন বুর্জোয়া শ্রেণী রাষ্ট্রকে পরিপূর্ণভাবে নিজের স্বার্থে লাগাতে পারে না। কেননা নিচের তলার মানুষ যখন বুর্জোয়া শ্রেণীর আধিপত্যকে অস্বীকার করে এবং তার অবসানের জন্য সংঘবদ্ধ শ্রেণীসংগ্রাম গড়ে তোলে তখন বুর্জোয়া শ্রেণী তার নিজ শ্রেণীস্বার্থের পাহারাদার হিসাবে রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে নিচের তলার মানুষের শ্রেণীসংগ্রামের হাত থেকে বুর্জোয়া স্বার্থকে রক্ষা করতে পারে না। এ ব্যাপারে দু'জন তাত্ত্বিকই একমত হলেও পোলানতজার সাথে মিলিবান্ডের সুনির্দিষ্ট কিছু

---

৭২. Ibid, p.65
৭৩. Ibid, p.65.
৭৪. Ibid, p.65.
৭৫. Ibid, p.65.
৭৬. Ibid, p.66.

Dhaka University Institutional Repository

পার্থক্য রয়েছে। মিলিবান্ড স্পষ্টতঃই মত প্রকাশ করেছেন– বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের স্বার্থগত দ্বন্দ্ব সব সময় লেগে থাকলেও সামগ্রিকভাবে বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব–বিরোধ তীব্রভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তখন রাষ্ট্র তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ রাখার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। এ কথাটি মিলিবান্ডও অস্বীকার করেননি, কিন্তু তিনি মত প্রকাশ করেছেন, বুর্জোয়া শ্রেণী যতই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হোক না কেন তাতে রাষ্ট্রের স্বাধীন হয়ে ওঠার কোন অবকাশ সৃষ্টি হয় না। কেননা, নিজেদের মধ্যে যতই দ্বন্দ্ব–বিরোধ থাক না কেন শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণের ব্যাপারে বুর্জোয়াদের মধ্যে কোনই বিরোধ নেই। তাছাড়া, বুর্জোয়া শ্রেণী ঐক্যবদ্ধ থাক অথবা না থাক বুর্জোয়া শ্রেণীরস্বার্থকে সংরক্ষণের ব্যাপারে রাষ্ট্রতো সাংবিধানিকভাবেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসছে, যখন বুর্জোয়া শ্রেণী অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়ে তখন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ কাঠামো কি ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারে? কেননা রাষ্ট্রতো কোন অখন্ড সত্তা নয়, এটার রয়েছে অসংখ্য উপাদান– যাদেরকে মোটা দাগে বিভক্ত করলে দু'ভাগে বিভক্ত করা চলে: আমলাতন্ত্র এবং পার্লামেন্ট। বুর্জোয়া শ্রেণী বহুধা বিভক্ত হয়ে যাওয়ার অর্থ পার্লামেন্টও বিভক্ত হয়ে যাওয়া। আর পার্লামেন্ট বিভক্ত হয়ে যাওয়ার অর্থ রাষ্ট্রও বিভক্ত হয়ে পড়া। তাহলে ঠিক এ পর্যায়ে বুর্জোয়া শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করার দায়িত্ব পালন করবে কে? এ পর্যায়ে স্বাভাবিকভাবেই আমলাতন্ত্রের ওপর গিয়েই সে দায়িত্ব বর্তায়। অর্থাৎ আমলাতন্ত্র এ পর্যায়ে বুর্জোয়া শ্রেণীর ঐক্যের প্রতীক হয়ে ওঠে। আমলাতন্ত্রের সকল স্তর না হলেও স্বাভাবিকভাবেই উচ্চ পদমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তাগণ সিদ্ধান্ত নেবারও অধিকার পেয়ে যায়। অর্থাৎ এ বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় মিলিবান্ড যে দাবি করেছেন– বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে বিভক্তি আসলেও নিচের তলার মানুষের দিক থেকে যদি কোন হুমকি না আসে তাহলে রাষ্ট্র স্বাধীন হয়ে উঠতে পারেনা– তা ঠিক নয়।

কিন্তু পোলানত্জা যেভাবে রাষ্ট্রের ভূমিকাকে বড় করে দেখেছেন তাকে অনেকেই সমালোচনা করেছেন। কেননা পুঁজিবাদী সমাজে প্রভুত্বকারী শ্রেণী তথা বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব থাকতে পারে ঠিকই, কিন্তু তা কি এমনই প্রকট রূপ নিতে পারে যে, শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়াদেরকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে? হালডুন গুলাল্ফ (Huldun Gulalp) সে কারণেই অভিযোগ করেছেন–

"It is fundamentally assumed that the dominant class (the bourgeoisie) does not have class consciousness and that its horizon is limited by its shortterm economic interest."[৭৭]

গুলাল্ফের মতে, বুর্জোয়া সমাজে প্রভুত্বকারী শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং রাজনৈতিক স্বার্থকে পৃথক করে দেখার ফলেই পোলানত্জার এ ভুলটি হয়েছে। অন্যদিকে, পেট্রাস এবং গন্ডলে (Petras & Gundle,1982) মত প্রকাশ করেন, পোলানত্জার এ তত্ত্বায়নে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বাধীন ও স্বকীয় ভূমিকাকে স্বীকার করা হয়েছে কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার ভূমিকাকে খুবই খাটো করে দেখা হয়েছে। বরং বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে রাষ্ট্রের ওপর।[৭৮] বুর্জোয়া শ্রেণী ও রাষ্ট্র সম্পর্কে এই যদি উপলব্ধি হয় এবং বুর্জোয়াদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিরোধের সময় যদি বুর্জোয়া শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ রাখার দায়িত্ব পালন করতে হয় রাষ্ট্রকেই, তাহলে রাষ্ট্রের স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু পোলানত্জা যখন কোন প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতাকে শ্রেণীগত ক্ষমতা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে উঠতে পারে না বলে মত প্রকাশ করেছেন তখন রাষ্ট্রের স্বাধীনতার প্রশ্নটিই সংশয়পূর্ণ হয়ে ওঠে। পোলানত্জা বলেছেন–

"...the relative autonomy of the various institutions (power centres) in relation to social classes is not due to the fact that they possess a power of their own distinct from class power."[৭৯]

এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে পোলানত্জা স্বীকার করে নিচ্ছেন যে, যে কোন প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট কোন শ্রেণীকেই প্রতিনিধিত্ব করে। এটা যদি স্বীকার করে নেওয়া হয় তাহলে যখন বুর্জোয়া সমাজে শ্রেণীসংগ্রাম তীব্র রূপ ধারণ করে তখন রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানটিকে ক্ষমতাসীন শ্রেণী তথা বুর্জোয়া শ্রেণীরই পক্ষ অবলম্বন করার কথা। এ পর্যায়ে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষ থাকার কোন উপায় নেই; কেননা, বুর্জোয়া রাষ্ট্র বুর্জোয়া শ্রেণীর শ্রেণীগত শক্তির ওপর দাঁড়িয়েই রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করেছে। কিন্তু পোলানত্জা এভাবে বিশ্লেষণ করতে রাজী নন, বরং তিনি পরবর্তীকালের এক প্রবন্ধে দাবি করেছেনঃ বুর্জোয়া সমাজে যখন শ্রেণীসংগ্রাম দেখা দেয়, তখন রাষ্ট্র বুর্জোয়া শ্রেণীর বিভিন্ন অংশকে ঐক্যবদ্ধ করার দায়িত্ব আর গ্রহণ করে না, বরং রাষ্ট্র পরস্পর–বিরোধী শ্রেণীগুলির মধ্যে সমঝোতাকারীর ভূমিকা গ্রহণ করে।[৮০] পোলানত্জা বলেছেন–

"As the material condensation of a contradictory relationship, the state does not at all organize the unity of the power bloc from outside, by resolving class contradictions at a distance. On the contrary... the play of these contradictions within the state's materiality alone makes possible the state's organizational role"[৮১]

এর অর্থ রাষ্ট্রের স্বাধীনতার পরিধি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণী যখন বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়ে কিংবা বুর্জোয়া শ্রেণী যখন প্রচন্ড শ্রেণীসংগ্রামের সম্মুখীন হয় তখন আর রাষ্ট্রের কোন ভূমিকা থাকে না। এভাবে পোলানত্জা বার বার তার অবস্থান পরিবর্তন করেছেন এবং সর্বশেষে তিনি তার আপেক্ষিক স্বাধীনতার প্রত্যয়কে একেবারে রাষ্ট্রের মধ্যে নিয়ে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছেন। পোলান্তজা মত প্রকাশ করেছেন, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই রয়েছে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব, আর সে কারণেই বুর্জোয়া রাষ্ট্রের পক্ষে কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর পক্ষে কাজ করে যাওয়া সম্ভব হয় না। এভাবেই রাষ্ট্র স্বাধীন হয়ে ওঠে। পোলানত্জাবলেছেন–

"The states autonomy is therefore not set against the fraction of the powerbloc: it is not a functions of the state's capacity to remain external to them, but rather the result of what takes place within the state. Its autonomy is concretely manifested in the diverse, contradictory measures that each of these classes and fraction's

---

৭৭. Gulalp, Haldun (1987): 'Capital Accumulation, Classes and The Relative Autonomy of the State' in Science of Society, vol.51,No.3.p.294.

৭৮. telras, T., and S. Gundle (1982): "A Creitique of Structuralist State Theorizing" in Contemporary Crisis, vol-6, p.172.

৭৯. Poulantzas, Nicos(1973): Political Power and Social Classes, London: NLB, P.115.

৮০ Poulantzas, Nicos(1978): State, Power, Socialism, London: NLB, pp.124-125.

৮১. Ibid, p.133.

Dhaka University Institutional Repository

through its specific presence in the state and the resulting play of contradictions, manages to have integrated into state policy."[৮২]

অর্থাৎ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরের বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর পরস্পর স্বার্থগত বিরোধই রাষ্ট্রের চরিত্রে একটি আপেক্ষিক স্বাধীনতার ভিত্তি তৈরি করে। গুলাল্প পোলানত্জার 'আপেক্ষিক স্বাধীনতা' প্রত্যয়টিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন–

"Thus the state's relative autonomy is a product of the diversity of interests which are represented within the state. It is the divisions within the state that allow it to be relatively autonomous from any particular class or fraction."[৮৩]

বুর্জোয়া রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন শ্রেণীস্বার্থের অবস্থান রাষ্ট্রের চরিত্রে কি ধরনের পরিবর্তন সূচিত করে তা স্পষ্ট না হলে রাষ্ট্র কিভাবে স্বাধীন হয়ে ওঠে সে ধারণাটি পরিষ্কার হয়ে উঠবে না। তাই পোলানত্জার রাষ্ট্র বিষয়ক তত্ত্বকে স্পষ্ট করার স্বার্থে পোলানত্জার শ্রেণীর ধারণাটি সামনে রাখা প্রয়োজন।

পোলানত্জার শ্রেণীর ধারণা

পোলানত্জার শ্রেণীর ধারণাটি গড়ে উঠেছে কার্ল মার্কস নির্ধারিত তিনটি প্রস্তাবনার (premises) ওপর ভিত্তি করেঃ

১. শ্রেণী সংগ্রামকে বর্জন করে কোনভাবেই শ্রেণীকে সংজ্ঞায়িত করা যায় না।[৮৪] পোলানত্জা এ বিষয়টির ওপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পোলানত্জা মত প্রকাশ করেছেন গতিহীন বা নিশ্চল কোন সমাজে শ্রেণী অস্তিত্ব অসম্ভব। বিপরীতভাবে কোন সমাজের গতিই সে সমাজে শ্রেণীর অস্তিত্বকে প্রকাশ করে। পোলানত্জা শ্রেণীর মার্কসবাদী ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন–

"Social classes involve in one and the same process both class contradictions and class struggles Social classes donot firstly exist as such, and only then enter into a class struggle. Social classes coincide with class practices, i.e. the class struggle,and are only defined in their mutual opposition"[৮৫]

অবশ্য, পোলানত্জা কার্ল মার্কসের শ্রেণী ধারণা থেকে একটু সরে এসেছেন। পোলানত্জা শ্রেণী অস্তিত্বের জন্য মার্কসের সচেতনতা বিষয়ক বিতর্ককে এড়িয়ে গিয়েছেন। তিনি মত প্রকাশ করেছেন, সচেতনতা এবং সংগঠনশীলতা না থাকলে যে সামাজিক শক্তি হিসাবে কোন শ্রেণী শ্রেণীসংগ্রামে অংশ নিতে পারে না এমন নয়, বরং সামাজিক শ্রম–বিভাজনের প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন স্তরের জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে দ্বন্দ্বাত্মক ও বিপরীতমুখী অবস্থানে ঠেলে দেয় তাইই শ্রেণীসমূহকে শ্রেণীসংগ্রামের পথে ঠেলে দেয়। পোলানত্জা মত প্রকাশ করেন, যেখানে শ্রেণীসমূহ চূড়ান্তভাবে অসংগঠিত সেখানেও শ্রেণীসংগ্রাম বিদ্যমান।[৮৬]

২. সামাজিক শ্রম–বিভাজনের মাধ্যমে একটি শ্রেণীর পরিচিতি নির্দেশিত হয়, কিন্তু তার অবস্থানটি কোথায় হবে তা নির্ধারিত হয় তার যোগ্যতা দ্বারা। কোন শ্রেণীর অবস্থানই পূর্ব নির্ধারিত নয়, কিংবা অবস্থান সম্পর্কে কোন কিছু আরোপ করাও উচিত নয়। পোলানত্জার ভাষায়–

"The class determination, while it coincides with the practices (struggle) of classes and includes political and ideological relations, designates certain objective places occupied by the social agents in the social division of labour: places which are independent of the will of these agents."[৮৭]

পোলানত্জা আরও মতপ্রকাশ করেন, কোন একজন ব্যক্তি শ্রম–বিভাজন প্রক্রিয়ায় একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীতে অবস্থান করে ঠিকই, কিন্তু এ অবস্থানটি সব সময় টিকে থাকবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কেননা প্রতিনিয়ত প্রত্যেকটি শ্রেণীর মধ্যে পুনঃ পুনঃ বিভাজন প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। এ বিভাজনের মধ্য দিয়ে কেউ এক ধাপ উপরের শ্রেণীতে উঠে যাচ্ছে, আবার কেউ এক ধাপ নিচেই নেমে গিয়ে পূর্বোক্ত শ্রেণীর অধীনস্থ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ছে। পোলানত্জা বলেছেন–

"...the questions of who occupies a given position,.i.e. who is or becomes a bourgeois, proletarian, petty-bourgeois, poor peasant, etc., and how and when he does, is subordinate to the first aspect – the reproduction of the actual positions occupied by the social classes."[৮৮]

৩. নিঃসন্দেহে শ্রেণীসমূহের অবস্থান কাঠামোগতভাবে নির্দিষ্ট (structurally determined), কিন্তু তা শুধু অর্থনৈতিক সূচক দ্বারাই নির্ধারিত হবে এমন নয়, বরং রাজনৈতিক এবং মতাদর্শগত সূচক দ্বারাও শ্রেণীর অবস্থানটি নির্দিষ্ট হতে পারে।[৮৯] পোলানত্জা যদিও বলেছেন, "the economic place of the social agents has a principal role in determining social classes."[৯০] কিন্তু তথাপি তিনি শ্রেণীর আধিপত্য বা আনুগত্যমূলক সম্পর্কের প্রশ্নে মতাদর্শগত এবং রাজনৈতিক দিকটিকে প্রায় সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেছেন। পোলানত্জা মত প্রকাশ করেছেন –

"It must be emphasized that ideological and political relations,i.e. the places of political and ideological domination and subordination, are themselves part of the structural determination of class: there is no question of objective place being the result only of econmic place within the relations of production, while political and ideological elements belong simply to class positions."[৯১]

এখানে পোলানত্জা যেভাবে শ্রেণী–অবস্থানকে নির্দেশ করেছেন তাতে দেখা যায়: একজন ব্যক্তি অর্থনৈতিক সম্পর্কের দিক থেকে একটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হলেও সে রাজনীতিগতভাবে বা মতাদর্শগতভাবে অন্য শ্রেণী–অবস্থানে থাকতে পারেন, এবং শ্রেণীসংগ্রামের সময় সে নিজের অর্থনৈতিক শ্রেণী অবস্থানকে ভুলে গিয়ে রাজনৈতিক বা মতাদর্শগত অবস্থানের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে

---

৮২. bid, p.135.
৮৩. Gulalp, Haldun(1987) op.cit., p.295.
৮৪. এরিক ওলিন রাইট (১৯৭৮) পোলানত্জার বক্তব্যের নির্যাসকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। Wright (1978): Class, Crisis and the State, p.32.
৮৫. Poulantzas, Nicos(1975): Classes in Contemporary Capitalism, London: NLB, p.14.
৮৬. Ibid, p.14.
৮৭. Ibid, p.14.
৮৮. Poulantzas, Nicos(1973): "On the Classes", New Left Review, no-78. pp.49-50.
৮৯. Wright, Eric olin (1973): Class, Crisis and the State, London: NLB, p.33.
৯০. Poulantzas, Nicos(1975), op.cit.,p.14
৯১. Ibid, pp.16.

Dhaka University Institutional Repository

পোলানত্জা শ্রমিক আভিজাত্যের (Labour aristocracy) উদাহরণ দিয়েছেন এবং মত প্রকাশ করেছেন, একজন অভিজাত শ্রমিক জীবনাচরণে কিংবা রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত দিক থেকে বুর্জোয়া শ্রেণী অবস্থানটি অর্জন করতে পারে, কিন্তু এ থেকে মোটেই এটা প্রমাণিত হয় না যে, সে বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে বা বুর্জোয়া শ্রেণীর কোন অংশে পরিণত হয়েছে। উৎপাদন-সম্পর্কের দিক থেকে সে তখনও অবশ্যই শ্রমিকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। একইভাবে একজন টেকনিসিয়ান-- উৎপাদন-সম্পর্কের ভিত্তিতে যে একজন পেটি-বুর্জোয়া হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার শ্রেণী-অবস্থানটি শ্রমিকশ্রেণীর কাছাকাছি। কিন্তু তার অর্থ মোটেই এটা নয় যে, সে শ্রমিকশ্রেণীর অংশে পরিণত হয়েছে।[৯২] এভাবে পোলান্তজা শ্রেণী এবং শ্রেণী অবস্থানের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে দেখিয়েছেন, উৎপাদন-সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্দেশিত শ্রেণী, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত ক্ষেত্রে একই অবস্থান নাও গ্রহণ করতে পারে। এভাবেই তিনি দেখিয়েছেন সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে কে কোন দিকে মেরুভূত (Polarised) হবে তা তার কাঠামোগত শ্রেণী-অবস্থান দ্বারা নির্ধারিত হয় না, বরং সেই সাথে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত শ্রেণী-অবস্থানটিও বিশেষভাবে গুরুত্বের দাবি রাখে। এই সূত্র ধরেই পোলানত্জা তার শ্রেণী-বিশ্লেষণে নতুন পেটি-বুর্জোয়া (New Petty Bourgeoisie) নামক একটি নতুন প্রত্যয় ব্যবহার করেছেন।

সাধারণভাবে পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণী বলতে বোঝানো হয় শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যবর্তী সামাজিক স্তরসমূহকে। সুনির্দিষ্টভাবে এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত স্তরসমূহ বলতে স্বাধীন কারিগর, ক্ষুদে দোকানদার ইত্যাদিকে বোঝায়।[৯৩] এই শ্রেণীকে পোলানত্জা সনাতন পেটি-বুর্জোয়া নামে আখ্যায়িত করেছেন। অপরদিকে, তিনি নতুন পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণী বলতে উল্লেখ করেছেন ধোপ-দুরস্ত চাকুরীজীবী, টেকনিসিয়ান, সুপারভাইজার, সিভিল সার্ভেন্ট ইত্যাদিকে।[৯৪] পোলানত্জার মতে বুর্জোয়া সমাজের শ্রেণীসমূহের প্রকৃতিকে বুঝতে হলে শ্রমিকশ্রেণী এবং নতুন পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যেকার পার্থক্যকে নির্দিষ্ট করে নেওয়া আবশ্যক।

৩:৩:১:১ অর্থনৈতিক মাপকাঠিঃ

পোলানত্জা শ্রমিকশ্রেণী থেকে পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীকে পার্থক্য করার যে অর্থনৈতিক মাপকাঠিকে ব্যবহার করেছেন তার মূল কথাটি হচ্ছে উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রমের ধরন। পোলানত্জার মতে উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত তথা উৎপাদনমুখী শ্রম যে প্রদান করে সেই হল শ্রমিক বা প্রলেতারিয়েত, আর যার শ্রম সরাসরি উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার হয় না সেই হচ্ছে পেটি-বুর্জোয়া। পোলানত্জা উৎপাদনশীল শ্রমের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন-

"Productive labour, in the capitalist mode of production, is labour that produces surplus-value while directly reproducing the material elements that serves as the substratum of the relation of exploitation: Labour that is directly involved in material production by producing use-values that increase material wealth."[৯৫]

পোলানত্জা উৎপাদনশীল শ্রমের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে দেখা যায় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালতের কর্মচারী, টেকনিসিয়ান, সুপারভাইজার বা সিভিল সার্ভেন্টের শ্রম উৎপাদনশীল শ্রমের অন্তর্ভুক্ত নয়। এই অনুৎপাদনশীল শ্রমের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে উদাহরণ হিসাবে পোলানত্জাবাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত চাকুরীজীবীদের উদাহরণ দিয়েছেন এবং বলেছেন অবশ্যই এ সকল বেতনভোগী কর্মচারিগণ শোষিত হচ্ছে এবং তাদের বেতনের টাকার মধ্য দিয়েই শ্রমের পুনরুৎপাদন হচ্ছে, এমনকি তার শ্রমের একটি অংশের দাম সে পাচ্ছে না তথা উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করছে, কিন্তু যেহেতু এ উদ্বৃত্তমূল্য মূল পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তিতে শোষিত হচ্ছে না তাই এই বেতনভুক কর্মচারিগণ প্রলেতারিয়েত নয়। পোলানত্জা বলেছেনঃ

"Surplus labour is thus extorted from wage-earners in commerce, but these are not directly exploited in the form of the dominant capitalist relation of exploitation, the creation of surplus value."[৯৬]

অর্থাৎ অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিচারে উৎপাদনশীল শ্রম এবং অনুৎপাদনশীল শ্রমের মধ্যে পার্থক্যের মূল বিষয়টি হচ্ছে উৎপাদনশীল শ্রমের ধারক শ্রমিকশ্রেণী মূল পুজিবাদী সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে সরাসরি উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে এবং উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করে, কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় যাদের শ্রম সরাসরি উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত হয় না কিংবা উদ্বৃত্তমূল্য সৃষ্টিতে সরাসরি কোন ভূমিকা পালন করে না তাদের শ্রম হচ্ছে অনুৎপাদনশীল শ্রম। এই অনুৎপাদনশীল শ্রমের ধারকগণই হচ্ছে নয়া পেটি-বুর্জোয়া। পোলানত্জা এই বিষয়টি নির্দিষ্ট করতেই মজুরী-শ্রমিক (wage-labour) শব্দটি ব্যবহারের বিরোধিতা করেছেন। কেননা মজুরী-শ্রমিক বললে কোন্ ধরনের শ্রমের সাথে শ্রমশক্তি বিনিয়োজিত হল তা অস্পষ্ট থেকে যায়। কেননা মজুরী হচ্ছে সামাজিক উৎপাদন বন্টনের একটি উপায়, বাজারে শ্রম ক্রয়-বিক্রয়ের একটি পথ, সুনির্দিষ্ট কোন্ খাতে শ্রমটি বিনিয়োজিত হবে তা এর মাধ্যমে বোঝার উপায় নেই। পোলানত্জা তাই মন্তব্য করেছেনঃ

"Although every worker is a wage-earner, every wage-earner is certainly not a worker, for not every wage-earner is engaged in productive labour."[৯৭]

৩:৩:১:২ রাজনৈতিক মাপকাঠি

পোলানত্জার মতে, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কে পরিদর্শকের (supervisor) ভূমিকা পালন করে, এবং কে তা করে না এ বিষয়টি শ্রমিকশ্রেণী এবং নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেকার রাজনৈতিক অবস্থানের মধ্যে পার্থক্যকে নির্দেশ করে। পোলানত্জার শ্রেণী বিষয়ক আলোচনার এ দিকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষতঃ ব্যবস্থাপনা ও পরিদর্শনা বিষয়ক শ্রমের সাথে যারা জড়িত তাদের শ্রেণী অবস্থান নির্দেশনার বিশ্লেষণে।[৯৮] সন্দেহ নেই, ব্যবস্থাপক বা পরিদর্শকগণ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে কিন্তু এরা উৎপাদনের জন্য সরাসরি তাদের শ্রম ব্যয় করে না, বরং যারা উৎপাদন কাজে সরাসরি জড়িত তাদের শ্রম কার্যকরীভাবে ব্যবহারকে নিশ্চিত

---

৯২. Ibid,pp.15-16.
৯৩. Wright, op.cit., p.34.
৯৪. Poulantzas(1975); op.cit., p.20.
৯৫. Ibid, p.216.
৯৬. Ibid, p.212.
৯৭. Ibid, p.20.
৯৮. Wright, op.cit., p.36.

Dhaka University Institutional Repository

করাতেই তারা নিয়োজিত থাকে। শ্রম প্রদানের এই বিশেষ ধরনই পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে শ্রমিকশ্রেণী ও ব্যবস্থাপকদের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্ককে নির্ধারণ করে। পোলানজাস বলেছেন–

"Inawoard, the despotism of the factory is precisely the form taken by the domination of the technical division of labour by the social, such as this exists under capitalism. The work of management and supervision, under capitalism is the direct reproduction, within the process of production itself, of the political relations between the capitalist class and the working class."[৯৯]

পোলানজাসের এভাবে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করার কারণ হচ্ছে; যদিও অর্থনৈতিক বিবেচনায় শ্রমিক এবং পরিদর্শক উভয়ই পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় একইভাবে শোষিত হচ্ছে, কিন্তু রাজনৈতিক অবস্থানের দিক থেকে দেখলে এদের দু'জনের ভূমিকা দু'রকম। শ্রমিক সরাসরি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়ে শোষিত হতে বাধ্য হচ্ছে, অন্যদিকে পরিদর্শক ও ব্যবস্থাপক শ্রমিকদের ওপর পুঁজির আধিপত্যকে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে। এ বিষয়টিকে সুনির্দিষ্ট করতে পোলানজাস সামাজিক শ্রম-বিভাজনের পাশাপাশি শ্রম বিভাজনের আরও একটি মাত্রা ব্যবহার করেছেন এবং তা হচ্ছে কৃৎকৌশলগত শ্রম-বিভাজন (technical division of labour)। যদিও তিনি সামাজিক শ্রম-বিভাজন ও কৃৎকৌশলগত শ্রমবিভাজন এ দু'টি প্রত্যয়ের মাঝে পার্থক্যকে নির্দেশ করতে সুস্পষ্ট আলোচনা করেননি, তবে তার অন্যান্য আলোচনা থেকে এ দু'য়ের পার্থক্য সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। সাধারণ বিচারে কৃৎকৌশলগত শ্রম-বিভাজন, উৎপাদিকা-শক্তির অভ্যন্তরে সুনির্দিষ্ট যে প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয় তার কাঠামোগত অবস্থানকে নির্দেশ করে। এখানে শ্রমিক এবং পরিদর্শকের অবস্থানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কেননা দুজনই এ প্রযুক্তির অধীন এবং অনুগত। অন্যদিকে, সামাজিক শ্রম-বিভাজন, উৎপাদন সম্পর্কের সামাজিক সংগঠনকে নির্দেশ করে। সামাজিক সংগঠনের ক্ষেত্রে কিন্তু শ্রমিক এবং পরিদর্শকের অবস্থান অভিন্ন নয়। পরিদর্শক মালিকের পক্ষে শ্রমিকশ্রেণীকে নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা পালন করে। পোলানজাস পরিদর্শককে শ্রমিকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতী নয় কেন, তার উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন–

"The reason why these agents do not belong to the working class, is that their structural class determination and the place they occupy in the social division of labour are marked by the dominance of the political relations that they maintain over the aspect of productive labour in the division of labour. Their principal function is that of extracting surplus-value from the workers 'collecting' it. They exercise powers that derive from the place of capital, capital that has seized hold of the 'control function' of the labour process; these powers are not necessarily exercised by the capitalists themselves."[১০০]

৩:৩:১:১:৩ মতাদর্শগত মাপকাঠিঃ

মতাদর্শগত মাপকাঠি অনুযায়ী বিভাজনের মাধ্যম হচ্ছে কায়িক শ্রম এবং মানসিক শ্রমের মধ্যে পার্থক্য। পোলানজাসের মতে শ্রমিকশ্রেণী শুধু অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিকভাবেই শোষিত হয় না, মতাদর্শগতভাবেও সে অধীনতা বরণ করতে বাধ্য হয়। পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এমন সব জটিল প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় যে, সে প্রযুক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার মত যথেষ্ট প্রযুক্তিগত জ্ঞান শ্রমিকশ্রেণীর থাকে না। এ যন্ত্রকৌশলকে নিয়ন্ত্রণ করে বিভিন্ন স্তরের প্রকৌশলী ও বিশেষজ্ঞগণ। এভাবেই পুঁজিপতিগণ শ্রমিকশ্রেণীর ওপর আধিপত্যকে নিশ্চিত করে। বিশেষত: শ্রমিকশ্রেণীর কাছে এমনভাবে বিষয়গুলি উপস্থাপন করা হয় যে, তারা এসব যন্ত্রকৌশলকে আয়ত্ত করার জন্য যথেষ্ট যোগ্য নয়, এভাবে পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রমিকশ্রেণীর ওপর পুঁজিপতির আধিপত্যকে ন্যায্যতা প্রদান করা হয়ে থাকে। পোলানজাস বলেছেন–

"We could thus say that every form of work that takes the form of a knowledge from which the direct producers are excluded, falls on the mental labour side of the capitalist production process, irrespective of its emperical/natural content, and that this is so whether the direct producers actually do know how to perform this work but do not do so (again not by chance), or whether they infact do not know how to perform it (since they are systematically kept away from it), or whether again there is quite simply nothing that needs to be known."[১০১]

এভাবে পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সমস্ত পরিকল্পনা ও নীতি-নির্ধারণী কর্মকান্ড থেকে শ্রমিকশ্রেণীকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। এ সমস্ত কাজে অবশ্য পরিদর্শকগণও অংশগ্রহণের সুযোগ পায় না, পরিপূর্ণভাবেই এগুলির কর্তৃত্বে থাকে বিভিন্ন ধরনের বিশেষজ্ঞ ও ব্যবস্থাপকগণ। কিন্তু এই বিশেষজ্ঞ ও ব্যবস্থাপকের নির্ধারিত নীতি বা সিদ্ধান্তসমূহকে কার্যকরী করা হয় পরিদর্শকদের মাধ্যমে। এভাবে শ্রমিকশ্রেণীর সাথে পরিদর্শকের কাজের প্রকৃতির মাঝে স্পষ্ট পার্থক্য রচিত হয়।

পোলানজাস অবশ্য অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে শ্রম-বিভাজন করতে গিয়ে মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন উৎপাদনশীল শ্রম ও অনুৎপাদনশীল শ্রমকে। তবে সেখানে যে ব্যতিক্রমের কথা তিনি বলেছেন, সেগুলি মতাদর্শগত মাপকাঠি আলোচনা করতে গিয়ে তিনি স্পষ্ট করেছেন। তিনি মত প্রকাশ করেছেন, প্রকৌশলী বা টেকনিশিয়ানগণ অবশ্যই উৎপাদনশীল শ্রম দিয়ে থাকে, কিন্তু এ শ্রমকে যদি কায়িক ও মানসিক —এই মাত্রা দ্বারা বিভাজন করা যায় তখন শ্রমিকশ্রেণীর শ্রমের প্রকৃতি থেকে তাদের শ্রমের প্রকৃতিকে পৃথক করা যাবে। এদের শ্রম প্রধানত: মানসিক শ্রম। উপরন্তু যত নিম্নস্তরের টেকনিশিয়ানই হোক না কেন, এদের শ্রমের একটি অংশ কায়িক শ্রম হলেও তা ব্যবহৃত হয় প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে। এভাবে শ্রমিকদের থেকে তারা পৃথক হয়ে ওঠে এবং উৎপাদনযন্ত্রের ওপর তাদের আধিপত্য স্বীকৃত হয়। এভাবে পোলানজাস দেখিয়েছেন, সরাসরি কায়িক শ্রমের সাথে যুক্ত নয় বা প্রধানত মানসিক শ্রমের সাথে যুক্ত এমন নিম্ন কর্মচারী থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পদে আসীন, উৎপাদন উপায়ের মালিক নয়, এমন সব স্তরের ব্যক্তিগণই নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। পোলানজাস এভাবে ব্যাখ্যা করলেও এই নয়া মধ্যবিত্তের মধ্যকার বিভিন্ন উপবিভাজন সম্পর্কে তিনি সচেতন। তিনি মত প্রকাশ করেছেন, এই নয়া মধ্যবিত্তের বিভিন্ন অংশের মাঝে কখনও কখনও বিরোধ এতো তীব্ররূপ ধারণ করে যে, এরা পরস্পর বিপরীত

---

৯৯. Poulantzas (1975), op.cit.,pp.227-28.

১০০. Ibid, pp.228-29.

১০১. Ibid.p. 238.

Dhaka University Institutional Repository

মেরুতে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করে। অথচ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং মতাদর্শগতভাবে এই সমগ্র নয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণী একই বর্গের অন্তর্ভুক্ত বলে পোলানত্জা মত প্রকাশ করেছেন। পোলান্তজা লিখেছেন-

"The mental labour aspect does not affect the new petty bourgeoisie in an undifferentiated mannar. Certain sections of it are affected directly; others, subjected to the reproduction of the mental/manual labour division within mental labour itself, are only affected indirectly, and while these sections are still affected by the effects of the basic division, they also experience a hierarchy within mental labour itself."[১০২]

পোলানত্জা যে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কথা বলেছেন, তাকে কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা কোন শ্রেণী হিসাবে তিনি বিবেচনা করেননি। তিনি মত প্রকাশ করেছেন, যদিও বর্তমান পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সনাতন পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীর শ্রেণীগত অস্তিত্ব অসম্ভব কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজনৈতিক ও মতাদর্শগতভাবে নতুন পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণী সনাতন পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণী অপেক্ষা ভিন্ন কিছু নয়। ফলে সনাতন পেটি-বুর্জোয়া এবং নতুন পেটি-বুর্জোয়া উভয়ে মিলেই একটি একক পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণী গঠন করে। পোলানত্জামত প্রকাশ করেন-

"The Structural ditermination of the new petty-bourgeoisie in the social division of labour has certain effects on the ideology of its agents, which directly influences its class position. These ideological effects on the new petty-bourgeoisie exhibit a remarkable affinity to these which the specific class determination of the traditional petty-bourgeoisie has on the latter, thus justifying their attribution to one and the same class, the petty- bourgeoisie."[১০৩]

এর মূল কারণ হিসাবে পোলানত্জামত প্রকাশ করেন যে, শ্রমিকশ্রেণী এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যেকার নিরত শ্রেণীসংগ্রামের দ্বন্দ্বে পুরোনো ও নতুন উভয় ধরনের পেটি-বুর্জোয়াই রাজনৈতিক ও মতাদর্শগতভাবে অভিন্ন সম্পর্ক রক্ষা করে চলে। ফলে মতাদর্শগত মেরুকরণ যখন ঘটে তখন এ দু'টি সামাজিক বর্গ একটি সাধারণ পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। কারণ মতাদর্শের দিক থেকে এদের উভয়েরই অবস্থান এক। পোলানত্জার ভাষায়-

"If the traditional and the new petty-bourgeoisie can be considered as belonging to the same class, this is because social classes are only determined in the class struggles and because this groupings are precisely both polorized in relationship to the bourgeoisie and the proletariat."[১০৪]

পোলানত্জা দেখিয়েছেন ফ্রান্সের মত একটি পুঁজিবাদী সমাজে শতকরা ৫ ভাগ পুঁজিপতি, ৭৫ ভাগ মধ্যবিত্ত এবং মাত্র ২০ ভাগ শ্রমিকশ্রেণীর লোক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এ প্রবণতা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বাড়তে শুরু করে। শিক্ষাখাতের সহজ সুযোগ এবং মহিলাদের ব্যাপকভাবে চাকুরীতে আগমন মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে প্রসারিত করে তোলার ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করেছে। তবে যদিও মধ্যবিত্ত বা পেটি-বুর্জোয়ার এই ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে, কিন্তু শ্রমশক্তি পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এ সব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিবার থেকে যে তরুণ-তরুণী নতুন চাকুরী কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্যে ঢুকছে তাদের অত্যন্ত স্বল্পসংখ্যক পুঁজিবাদী হতে পারছে, একটি ক্ষুদ্র অংশ পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণী অবস্থানটি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারছে এবং বাকি গোটা অংশ শ্রমিক হিসাবে কর্মে নিয়োজিত হচ্ছে।[১০৫] এ হিসাব থেকে পোলানত্জা যুক্তি দেখাচ্ছেন যে, কতকগুলি মাপকাঠির ভিত্তিতে নির্ধারিত একটি বিশাল মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে দেখা গেলেও এটা একটি অখন্ড শ্রেণী হিসাবে কখনই ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না। কখনও ঐক্যবদ্ধ কোন রাজনৈতিক আচরণও তাদের পক্ষে অসম্ভব। কেননা উক্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অমীমাংসীয় বিরোধ বিদ্যমান। পোলানত্জা এর বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করেছেন, তবে তার মধ্যে নিম্নের কয়েকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ:

১. সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পদাধিকারিগণ এত বেশি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে যে, পুঁজিবাদী সমাজ তাদের কাছে এক বিরাট আর্শীবাদ হিসাবে প্রতিভাত হয়। ফলে এরা এদের সামাজিক ও বৈষয়িক সুবিধার প্রেক্ষিতে পুঁজিবাদী সমাজের কট্টর সমর্থক হয়ে ওঠে। এদেরকে পোলানত্জা বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হিসাবে বিবেচনা করেছেন।

২. শিক্ষালাভ সহজসাধ্য হয়ে ওঠার ফলে শিক্ষার হার যেমন বেড়ে গেছে, তেমনই সার্টিফিকেটের মূল্যও সাংঘাতিকভাবে হ্রাস পেয়েছে। ফলে মানসিক শ্রমের সাথে যুক্ত থেকেও অসংখ্য সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের চাকুরীজীবী এত কম বেতন পায় যে, শ্রমিকশ্রেণীর মানুষ অপেক্ষাও তাদের নিম্নতর জীবনযাপন করতে হয়। ফলে তারা বুর্জোয়া, এমনকি পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণী অপেক্ষা শ্রমিকশ্রেণীর সাথেই অধিক মাত্রায় ঐক্য বোধ করে।

৩. পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে উচ্চ ও নিম্ন পর্যায়ের কর্মচারীদের মাঝখানে এদের যে অংশটি আছে, তারা বর্তমান পুঁজিবাদী অর্থনীতির বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধা লাভ করে, ঠিক তেমনই অনেক আকাঙ্ক্ষাই তাদের পূরণ হয় না।[১০৬]

পোলানত্জার মতে পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে এই তিনটি উপ-শ্রেণী থাকার কারণে সমাজে শ্রেণীসংগ্রাম যখন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তখন উপর ও নিচের অংশ দ্রুত স্ব স্ব পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে; মাঝখানের অংশটি দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে।

পোলানত্জার শ্রেণী বিশ্লেষণ সম্পর্কে নানা ধরনের সমালোচনা রয়েছে।[১০৭] সেদিকে না গিয়ে পুঁজিবাদী সমাজে রাষ্ট্র কিভাবে স্বাধীন হয়ে উঠতে পারে সেটাই বিশেষভাবে এখানে দেখা প্রয়োজন।

পোলানত্জার রাষ্ট্র বিষয়ক বক্তব্যে ইতিপূর্বে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, রাষ্ট্রের স্বাধীন হয়ে ওঠার বিষয়টি শুধুমাত্র তখনই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, যখন রাষ্ট্রের আমলাতন্ত্র স্বাধীন ভূমিকা নিতে পারে কি পারে না, তা বিবেচনা করা সম্ভব হয়ে। পোলানত্জার শ্রেণী বিশ্লেষণ থেকে একথা খুবই স্পষ্ট যে, আমলাতন্ত্র যে সব ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত হয় তারা সবাই পেটি-বুর্জোয়া বা নব্য-পেটি-

---

১০২. Ibid, p.256.

১০৩. Ibid, p.287.

১০৪ Ibid, p.294.

১০৫. Ibid, p.319.

১০৬. Ibid, p.325.

১০৭. Abercrombe, Necholas and John Urry (1983); Capital, Labour and the Middle Classes, London; George Allen & Unwin, pp.72-74. Wright, Erik Olin (1978) op.cit., pp.43-61.

Dhaka University Institutional Repository

বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। পোলানত্‌জা আরও স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে, এই নব্য পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীটি কখনও শ্রেণীগতভাবে স্বাধীন বা স্বকীয় কোন ভূমিকা নিতে পারে না। তারা শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশাগত বৈচিত্র্য এবং সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে এত অসংখ্য স্তরে বিভক্ত যে, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিকভাবে পরস্পর থেকে বহুদূরবর্তী স্তরে অবস্থান করে।[১০৮] ফলে এই সমগ্র শ্রেণীটির বিভিন্ন অংশ স্বাভাবিক নিয়মেই যে কোন রাজনৈতিক মেরুকরণে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করবে। তাহলে যে শ্রেণীকে নিয়ে পুঁজিবাদী সমাজে রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান উপাদান হিসাবে আমলাতন্ত্র গড়ে ওঠে, তা কিভাবে স্বাধীন হয়ে ওঠে? এটা কি আমলাতন্ত্রের মধ্যে নব্য মধ্যবিত্তের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে বলে? পোলানত্‌জার মতে, মোটেও তা নয়। আমলা-কাঠামোতে পদমর্যাদা, ক্ষমতা, সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদির দিক থেকে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান, কিন্তু এ পার্থক্যের কারণে সৃষ্ট মতদ্বৈধতা মোটেই আমলা-কাঠামোকে প্রভাবিত করতে পারে না। কেননা আমলাতন্ত্র এমন একটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, নির্দিষ্ট কোন শ্রেণীস্বার্থের বাইরে তার পক্ষে কাজ করা অসম্ভব। আমলাতন্ত্র রাষ্ট্রের একটি অন্যতম উপাদান মাত্র, রাষ্ট্র রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হলেও, রাষ্ট্রের ওপর নির্ভর করে বুর্জোয়া সমাজে রাজনৈতিক ক্ষমতা গড়ে ওঠে না, রাজনৈতিক ক্ষমতা গড়ে ওঠে বিদ্যমান শ্রেণীসমূহের ভারসাম্যের ভিত্তিতেই। পোলানত্‌জা বলেছেন-

"...the state is not the foundation of political power but the centre of the political power belonging to diterminate classes."[১০৯]

এর কারণ হিসাবে তিনি দেখান, পুঁজিবাদী সমাজে আমলা-কাঠামোটি যে কোন শ্রেণীর লোক নিয়েই গঠিত হোক না কেন, আমলাতান্ত্রিক কর্মকান্ডে এ সব শ্রেণী-স্বার্থের প্রতিফলন ঘটাবার কোন সুযোগ থাকে না। কেননা আমলাতন্ত্র এমন একটি সামাজিক বর্গ, যাকে রাষ্ট্রের কার্যাবলীকে সুচারুরূপে সমাধা করার জন্যই গড়ে তোলা হয়। আর যে শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহ নির্দিষ্ট রাষ্ট্রটি গড়ে তোলে তাদের শ্রেণী-স্বার্থের বাইরে আমলাতন্ত্রের কোন কিছুই করার থাকে না। আমলাতন্ত্র যতই সংহত হোক না কেন, যতই বিভিন্ন শ্রেণী থেকে এরা নিয়োগ প্রাপ্ত হোক না কেন এবং যতই নিজেদের মধ্যে পদমর্যাদাগত পার্থক্য থাক না কেন কিংবা যতই তাদের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য থাক না কেন, তাদের কাজই হচ্ছে রাষ্ট্রকে সেবা করে যাওয়া। আর যে শ্রেণী ভিত্তির ওপর রাষ্ট্রটি গঠিত সে শ্রেণীর স্বার্থ আমলাতন্ত্রের অধীনস্থ সদস্যদের নিজস্ব শ্রেণী-স্বার্থের সম্পূর্ণ বিপরীত হলেও, রাষ্ট্রীয় উপাদানের অংশ হিসাবে তাকে রাষ্ট্রের স্বার্থকেই দেখে যেতে হবে। পোলানত্‌জা বলেছেন-

"The whole problem of the bureuacracy is that it constitutes a specific category. This means that its particular functioning (what specifies it as a category) is not directly determined by its class membership, by the political functioning of those classes or fractions from which it originates: it depends on the concrete functioning of the state aperatus, i.e. on the place of the state in the ensemble of a formation and on its complex relations with the various classes and fractions."[১১০]

পোলানত্‌জা মত প্রকাশ করেছেন, যে শ্রেণী ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, সে শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার প্রশ্নে আমলা-কাঠামোর অধীনস্থ ব্যক্তিসমূহের প্রভুত্বকারী শ্রেণী-স্বার্থের প্রতিফলনও যেমন ঘটে না, তেমনই আমলা-কাঠামোর অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন শ্রেণী-দ্বন্দ্বের প্রতিফলন ঘটার কোন সুযোগ নেই। সব সময়ই রাষ্ট্রের অনুগত একটি উপাদান হিসাবে যন্ত্রের মত সে কাজ করে যায়। কিন্তু যে শ্রেণী ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে কোন নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা সেই শ্রেণীটি বা শ্রেণীসমূহ যদি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে ক্ষমতার চূড়ান্ত লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয় কিংবা তীব্র শ্রেণীসংগ্রাম মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, তখন রাষ্ট্র বা তার অধিনস্থ আমলাতন্ত্রের ভূমিকা কি হবে? পোলানত্‌জা মত প্রকাশ করেছেন, এরকম পর্যায়ে কোন শ্রেণী হিসাবে নয়, একটি অখন্ড প্রতিষ্ঠান হিসাবে সে আত্মপ্রকাশ করবে। আমলাতন্ত্র নামক এ প্রতিষ্ঠানটি তখনই একটি স্বাধীন অবস্থান গ্রহণ করবে যখন সেটি যে কোন শ্রেণী-স্বার্থের প্রভাব মুক্ত থাকবে। তবে আমলাতন্ত্র এমনই একটি পদমর্যাদাগত (heirarchical) বাঁধুনীতে আবদ্ধ যে, নিম্ন স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্বার্থের প্রতিফলন সেখানে ঘটার কোন সুযোগ নেই।[১১১] পোলানত্‌জা অভিমত প্রকাশ করেছেন, এভাবে আমলাতন্ত্র যখন স্বাধীন একটি অবস্থান গ্রহণ করে তখন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি শ্রেণীগত ক্ষমতা হিসাবেই সে তার স্বাধীনতাকে প্রয়োগ করে। ক্রমে উৎপাদন প্রক্রিয়াতে সে হস্তক্ষেপ করে। এভাবেই তৈরি হয় রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের রাজনৈতিক ও বৈষয়িক শর্ত। সৃষ্টি হয় স্বৈরতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মত একেকটি বিশেষ ধরনের রাষ্ট্র।[১১২] এধরনের রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্র রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদন সম্পর্কের একটি বিশেষ অবস্থানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে, এমন কি, বিদ্যমান উৎপাদন সম্পর্ককেই পরিবর্তন করে ফেলে। নিঃসন্দেহে এ ঘটনার মধ্য দিয়ে একটি শ্রেণী-স্বার্থের প্রকাশ ঘটে। তবে তা আমলাতন্ত্রের কোন স্বতন্ত্র শ্রেণীসত্তাকে প্রকাশ করে না, আমলাতন্ত্রের কর্তৃত্বে যারা আছে তাদের শ্রেণী-স্বার্থকেই প্রকাশ করে মাত্র। পোলানত্‌জা লিখেছেন-

"...the state bourgeoisie in certain developing countries: the bureaucracy may, through state, establish a specific place for itself in the existing relations of production, or even in the not-yet-existing relations of production. But in that case it does not constitute a class by virtue of being effective class."[১১৩]

যাহোক, এভাবেই পোলানত্‌জা দেখিয়েছেন, পুঁজিবাদী সমাজে রাষ্ট্র প্রধানত বুর্জোয়া শ্রেণীরই স্বার্থ রক্ষা করে চলে। তবে, যখন বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে প্রচন্ডভাবে অভ্যন্তরীণ বিরোধ দেখা দেয় কিংবা শ্রেণীসংগ্রাম তীব্রতর হয়ে ওঠে তখন রাষ্ট্র আপেক্ষিকতাবে স্বাধীন হয়ে ওঠে। অর্থাৎ পোলানত্‌জার মতে, রাষ্ট্র স্বাধীন হয়ে উঠবে কি উঠবে না তার মূল মাপকাঠি হচ্ছে, যে শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহের স্বার্থ

---

১০৮. Poulantzas, Nicos (1975): op.cit., 'The Class Fractions of the New Petty Bourgeoisie in the Present Situation; especially in pp.316-327.

১০৯. Poulantzas, Nicos (1973): Political Power and social classes, London: NLB, p.336.

১১০. Ibid, p.335.

১১১. Ibid, pp.338-39.

১১২. Poulantzas, Nicos (1976): The Crisis of the Dictatorship; London: NLB, p.90.

১১৩. Ibid, Political Power and Social Classes, p.334.

Dhaka University Institutional Repository

অক্ষুণ্ন রাখার জন্য বিদ্যমান রাষ্ট্রটি গঠিত হয়েছিল সেই শ্রেণীটি কতটা সংহত, কিংবা বিরোধী শ্রেণীসমূহের সংগ্রামকে প্রতিরোধ করতে কতটা সে উপযোগী। তার মতে অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের বুর্জোয়া শ্রেণী সংহত নয়, কিংবা বিপরীত শ্রেণীসমূহের শ্রেণীসংগ্রাম প্রতিরোধে যোগ্য নয়। আর এ কারণেই এ সব দেশের রাষ্ট্র আপেক্ষিকতাবে স্বাধীন।

উপরোক্ত সমগ্র আলোচনা থেকে দেখা যায়, নানাবিধ উপাদান নিয়ে বুর্জোয়া রাষ্ট্রটি গড়ে উঠলেও তার মূল উপাদান থাকে দুটিঃ আইন বিভাগ বা পার্লামেন্ট এবং শাসন বিভাগ বা আমলাতন্ত্র। অন্যদিকে, বিদ্যমান একটি সমাজের রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। সমাজের আধিপত্যকারী শ্রেণীটির আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণের পক্ষেই রাষ্ট্র ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে, আধিপত্যকারী শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহের মাঝে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব কিংবা নিচের স্তরের শ্রেণীসমূহের মাঝে যখন বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ দেখা দেয়, তখন রাষ্ট্র আপেক্ষিকতাবে স্বাধীন হয়ে ওঠে। বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজে বুর্জোয়াশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণী এখনও প্রধান দু' প্রতিপক্ষ হিসাবে বিদ্যমান থাকলেও, প্রযুক্তিগত ব্যাপক বিকাশের ফলে সেখানে এমন কিছু সামাজিক বর্গের উদ্ভব ঘটেছে যে, শ্রেণী মেরুকরণের বিষয়টি জটিল হয়ে উঠেছে। যে কোন ব্যক্তির উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্ক পক্ষ-অবলম্বনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও তার মতাদর্শ ও রাজনীতি তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। অন্যদিকে, উৎপাদন উপায়ের মালিক নয়, এরকম একটি বিশাল নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠেছে, যার একটি অংশ ধনতান্ত্রিক সমাজের বিশেষ সুবিধা ভোগের সুযোগ পেয়ে বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষ অবলম্বন করে, কিন্তু এদের বাকি বিশাল অংশটিই ধনতান্ত্রিক সমাজে নির্যাতন ভোগ করতে বাধ্য হয়, ফলে তারা বিদ্যমান সমাজের রক্ষক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। এদের এ সংগ্রাম কখনও স্বৈরাচার-বিরোধী সংগ্রাম রূপে প্রকাশ পায়, আবার কখনও তা শ্রেণীসংগ্রাম রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এসব আন্দোলনে কোন্ শ্রেণীটির শ্রেণীগত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, তা নির্ভর করে দ্বন্দ্বের প্রকৃতির ওপর। কখনও তা নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একক নেতৃত্বে হতে পারে, আবার কখনও তা শ্রমিকশ্রেণীর একক নেতৃত্বে হতে পারে। কখনও আবার তা উক্ত দু'টি শ্রেণীর যুগপৎ নেতৃত্বে সংগঠিত হতে পারে। যে আন্দোলন বিদ্যমান সামাজিক সম্পর্ককে পরিবর্তনের লক্ষ্যে সংগঠিত হয়, সে আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীগত নেতৃত্বকে অস্বীকার করার উপায় থাকে না; তবে উক্ত নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীটির প্রধান অংশ, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং মতাদর্শগতভাবে এমন একটি হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতির শিকারে পরিণত হয়েছে যে, বিদ্যমান সামাজিক সম্পর্ককে পরিবর্তন করা তাদের জন্যও জরুরী হয়ে পড়েছে। উপরন্তু, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে এরা বেশ খানিকটা অগ্রসর হওয়ার কারণে শ্রেণীগত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় তাদের রয়েছে কিছু বাড়তি সুবিধা। 'শৃংখল ছাড়া সর্বহারার হারাবার কিছু নেই' বর্তমান বুর্জোয়া সমাজে এ বাস্তবতা আর এখন বিরাজ করে না কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের রক্ত নিংড়ানো শ্রমশক্তি থেকেই যে বুর্জোয়া শ্রেণীর মুনাফা নিশ্চিত হয়-- এ বাস্তবতা এখনও সমানভাবেই ক্রিয়াশীল। ফলে যারা 'শ্রম করে এবং শোষিত হয়', তারাই হবে বিদ্যমান রাষ্ট্র কাঠামোকে ভাঙ্গার মূলশক্তি। রাষ্ট্র ভাঙ্গার কোন আন্দোলনে এদেরই থাকবে শ্রেণীগত নেতৃত্ব। শোষিত হওয়ার মত শ্রম করে শ্রমিকশ্রেণী এবং নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যাপক অংশ, ফলে এ দু'টি শ্রেণীরই থাকবে রাষ্ট্র -বিরোধী কোন আন্দোলনের শ্রেণীগত নেতৃত্ব।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান কার বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়েছিল এবং কোন্ শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহ তার নেতৃত্ব দিয়েছিল তা বুঝতে হলে পাকিস্তানের রাষ্ট্র এবং পাকিস্তান সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর চরিত্রকে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। আর তা করতে হলে পাকিস্তান রাষ্ট্র ও তার শ্রেণীসমূহের সাধারণ প্রবণতাটি প্রথম স্পষ্ট করে তোলা প্রয়োজন। তৎকালীন পাকিস্তান ছিল উপনিবেশোত্তর একটি তৃতীয় বিশ্বভুক্ত দেশ। তাই পাকিস্তানের রাষ্ট্র ও শ্রেণীসমূহের সাধারণ প্রবণতাকে চিহ্নিত করার জন্য এ পর্যায়ে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্র ও শ্রেণীর ওপর আলোকপাত করা আবশ্যক।

৩ঃ৪ তৃতীয় বিশ্বে রাষ্ট্র ও শ্রেণী

সাম্প্রতিককালে 'তৃতীয় বিশ্বে শ্রেণী ও রাষ্ট্র' সম্পর্কিত প্রপঞ্চটি খুবই আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এ বিষয়টি নিয়ে তত্ত্বগতভাবে আলোচনার সূত্রপাত করেন হামজা আলাভী (১৯৭২)।[১১৪] আলাভী মত প্রকাশ করেছেন, দীর্ঘ উপনিবেশোত্তর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে যে আর্থ-সামাজিক কাঠামোটি গড়ে উঠেছে, স্বাধীনতার পরও সে কাঠামোর কোন পরিবর্তন হয়নি। ফলে নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এ দেশগুলিতে শক্তিশালী কোন শ্রেণীর বিকাশ ঘটতে পারেনি।[১১৫] আর এ কারণেই উপনিবেশোত্তর শাসকগণ এসব দেশ থেকে চলে গেলেও তাদের হাতে গড়া রাষ্ট্র কাঠামোটি এখনও টিকে আছে। ফলে এসকল দেশে অভ্যন্তরীণ সামাজিক শক্তি হিসাবে, রাষ্ট্র হয়ে উঠেছে নিয়ন্ত্রণহীন। সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্র যৌথভাবে এত বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে, উপনিবেশোত্তরকালে এরাই হয়ে উঠেছে রাষ্ট্রের মূল উপাদান। উপনিবেশোত্তর সমাজের কোন শ্রেণীর পক্ষেই তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা আজ আর সম্ভব নয়। ফলে এ ধরনের সমাজসমূহে সামরিক-আমলাতান্ত্রিক স্বৈরাচার একটি সাধারণ চিত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।[১১৬] যে সব কারণে এ সকল সমাজে সামরিক আমলাতান্ত্রিক স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে বলে আলাভী মত প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে অন্যতম দু'টি কারণ হচ্ছেঃ সমাজের সামাজিক উপাদানসমূহের মধ্যে রাষ্ট্র হচ্ছে অতি বিকশিত এবং দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্র আপেক্ষিকতাবে স্বাধীন।[১১৭]

আলাভী তার আলোচনায় সুনির্দিষ্টভাবে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের উদাহরণ টেনে প্রান্তিক রাষ্ট্রের প্রধান দুটি দিককে বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন। তার মতে, প্রান্তিক রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাধীনতার দুটি কারণই নিহিত রয়েছে এসকল সমাজের, বিশেষতঃ উপনিবেশোত্তর সমাজের মধ্যেই। আলাভী মত প্রকাশ করেন, এ সকল সমাজে উপনিবেশোত্তর আমলেই বুর্জোয়া বিপ্লব ঘটে গেছে।[১১৮] এ সময় মেট্রোপলিটান পুঁজিপতি শ্রেণী উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে সকল দেশীয় শ্রেণীর ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে। যখন

---

১১৪. Alavi, Hamza (1972): 'The State in Postcolonial Societies: Pakistan and Bangladesh', Imperialism and Revolution in South Asia, Edited by Katleen Gough and Hari P. Sharma, New York: Monthly Review Press.

১১৫. Ibid, pp.147-48.

১১৬. Ibid, p.145.

১১৭. Ibid,pp.147-48.

১১৮. Ibid,p.147.

Dhaka University Institutional Repository

এসব দেশ স্বাধীনতা লাভ করে তখন দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণীসহ (Indigenous bourgeoisie) অন্যান্য শ্রেণী এত বেশি দুর্বল ছিল যে, তাদের পক্ষে রাষ্ট্রের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল না।[১১৯] ফলে উপনিবেশোত্তর শাসনব্যবস্থার সুবাদে যে শ্রেণীগুলি সম্পত্তিবান হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছিল সেই দেশীয় বুর্জোয়াশ্রেণী, মেট্রোপলিটান বুর্জোয়াশ্রেণী এবং ভূস্বামী–– এই তিনটি শ্রেণীর মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করার দায়িত্ব গিয়ে পড়ল রাষ্ট্রের ওপর।[১২০] আলাভীর মতে এ তিনটি শ্রেণীর মধ্যে রাষ্ট্রের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা নিয়ে পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা আছে, কিন্তু এদের মধ্যে শ্রেণীস্বার্থগত কোন বিরোধ নেই। কেননা, দেশীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর সামন্তবাদ–বিরোধী কোন ভূমিকা নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ বুর্জোয়া বিপ্লব ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়ে গেছে। আর তাছাড়া, জাতি–রাষ্ট্র গঠিত হবার ফলে পুঁজিবাদী বিকাশের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে। দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদকেও বিরোধিতা করবে না, কেননা এ দেশীয় বুর্জোয়াশ্রেণী তার উষালগ্নে যেমন মেট্রোপলিটান বুর্জোয়া শ্রেণীর সাথে পরস্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে, তেমনই এদের মধ্যে এ সহযোগিতা ক্রমাগত বাড়তে থাকবে। কেননা একদিকে যেমন দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্ষুদ্র পুঁজি এবং প্রাচীন প্রযুক্তি দিয়ে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব, অন্যদিকে মেট্রোপলিটান বুর্জোয়ার পক্ষেও দেশীয় বুর্জোয়াদের সহযোগিতা ছাড়া তার পরিধিকে বিস্তৃত করা কঠিন। তাই, এ দুটি শ্রেণীর মধ্যে এক নিবিড় সহযোগিতা বিদ্যমান থাকে। অবশ্যই এ পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে মেট্রোপলিটান বুর্জোয়া শ্রেণীর থাকে আধিপত্য; দেশীয় বুর্জোয়ারা তাদের অনুগত (client) শ্রেণী হিসাবেই টিকে থাকে। আলাভী মত প্রকাশ করেছেন–

"The mutual relationship of the native bourgeoisie and the metropolitan bourgeoisie is no longer antagonistic; it is collaborative. The collaboration is, however, unequal and hierarchical because the native bourgeoisie of a postcoloneal society assumes a subordinate-client status in the structure of its relationship with the metropolitan bourgeoisie."[১২১]

যাহোক, উপরের আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, উপনিবেশোত্তর দেশে সম্পত্তিবান উক্ত তিনটি শ্রেণীর মধ্যে কোন শ্রেণী–স্বার্থগত দ্বন্দ্ব নেই। অন্যদিকে, এ তিনটি শ্রেণীর মধ্যে রয়েছে কতক প্রতিযোগিতা। এ প্রতিযোগিতাকে মধ্যস্থতা করার দায়িত্ব পড়ে রাষ্ট্রের ওপর; আর এভাবেই রাষ্ট্র হয়ে ওঠে স্বাধীন। আলাভী মত প্রকাশ করেছেন–

"...the state in the postcolonial society is not the instrument of a single class. It is relatively autonomous and it mediates the competing interests of the three propertied classes; the metropolitan bourgeoise, the indigenous bourgeoisie, and the landed classes."[১২২]

উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাধীনতার দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে রাষ্ট্রের অতি বিকশিত (overdeveloped) সত্তা। আলাভী মত প্রকাশ করেন ঔপনিবেশিক আমলে মেট্রোপলিটান বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের নিজস্ব স্বার্থেই যে রাষ্ট্রের পত্তন ঘটায়, তা উপনিবেশের অভ্যন্তরীণ কাঠামোর তুলনায় অপেক্ষাকৃত বিকশিত, ফলে এ রাষ্ট্রের পক্ষে সহজেই সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। এবং ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র দ্রুতই একটি শক্তিশালী সামরিক আমলাতান্ত্রিক উপাদান সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। আর তারই উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্র। স্বাধীনতার সময় এসব রাষ্ট্র মেট্রোপলিটান বুর্জোয়া শ্রেণীর সরাসরি নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি পায়, কিন্তু দেশীয় শ্রেণীসমূহের মধ্যে শক্তিশালী কোন শ্রেণী গড়ে না ওঠার কারণে তার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কেউ থাকে না। এভাবে উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্রটি আপেক্ষিকভাবে স্বাধীন হয়ে ওঠে।[১২৩] রাষ্ট্র শুধু স্বাধীনই হয়ে ওঠে না, দুর্বল দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর ওপর রাষ্ট্র তার সামরিক–আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতা এমনভাবে প্রয়োগ করে যে, বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে কিছুই করার থাকে না, বরং রাষ্ট্রই সমগ্র সমাজের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। আলাভীর ভাষায়-

"At the moment of independence, weak indigenous bourgeoisie find themselves enmeshed in bureaucratic controls by which those at the top of the hierarchy of the bureaucratic military apparatus of the state are able to maintain and even extend their dominant power in society, having been freed from direct metropolitan control."[১২৪]

পরবর্তীকালে রাষ্ট্রের এ আধিপত্য আর হ্রাস পায় না, বরং রাষ্ট্রের সামরিক–আমলাতান্ত্রিক স্বৈরাচারী ক্ষমতাকে ব্যবহার করে সে আধিপত্যকে টিকিয়ে রাখে এবং নিজের স্বাধীনতা আরো পাকাপোক্ত করে। এ ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে রাষ্ট্র অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের প্রধান অংশকে আত্মসাৎ করে এবং তার নিপীড়নমূলক উপাদানসমূহকে শক্তিশালী করে। কেননা অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত যা হয় তা খুবই আমলাতান্ত্রিক উপায়ে রাষ্ট্রের শক্তিবৃদ্ধির কাজেই লাগানো হয়ে থাকে।[১২৫] প্রতিনিধিত্বশীল রাজনৈতিক দলসমূহের পক্ষ থেকে স্বৈরাচার–বিরোধী যে কোন কর্মকান্ড কিংবা রাষ্ট্রের আগ্রাসী শক্তিমত্তা–বিরোধী যে কোন হুমকিকে মোকাবিলা করাই থাকে রাষ্ট্রের একমাত্র লক্ষ্য।[১২৬] আলাভীর মতে, উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্রের এ দমনমূলক প্রবণতাটি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। আর এ কারণেই উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্র তার প্রাক্তন প্রভু মেট্রোপলিটান বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য দেশীয় অন্যান্য সম্পত্তিবান শ্রেণীর সাথে সংযোগ ঘটিয়ে দেয়, তবে ঔপনিবেশোত্তর রাষ্ট্র যত মেট্রোপলিটান বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করুক না কেন, এ ব্যাপারে তার স্বাধীনতার পরিমাণটি সীমাহীন নয়। কেননা সরাসরি ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের পর তৃতীয় বিশ্বের সমাজসমূহ হয়ে উঠেছে শ্রেণী সমাজ। দেশীয় শ্রেণীসমূহ স্বল্প বিকশিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের যুগপৎ আন্দোলনের কারণে প্রত্যক্ষভাবে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটেছে। আর তাই এসব শ্রেণীর অন্ততঃ একাংশের সহযোগিতা ছাড়া রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারে না। অন্যদিকে, ঔপনিবেশিক আমল থেকেই রাষ্ট্রের

---

১১৯. Ibid,p.147.
১২০. Ibid,pp.147-49.
১২১ Ibid,pp.147-49.
১২২ Ibid,p.148.
১২৩. Ibid, P.147.
১২৪. Ibid, pp.147-48.
১২৫. Ibid,p.148.
১২৬. Ibid,pp.151-52.

Dhaka University Institutional Repository

সামরিক কর্মকর্তা ও আমলাতান্ত্রিক পদগুলিকে পূরণ করা হত মেট্রোপলিটান বুর্জোয়া শ্রেণীর সহযোগী সম্পত্তিবান পরিবারসমূহের ব্যক্তিদের নিয়ে। ফলে সামরিক-আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে নির্ভর করতে হয় দেশীয় সম্পত্তিবান শ্রেণীসমূহের ওপর, এদের সহযোগিতার ওপর নির্ভর করে মেট্রোপলিটান বুর্জোয়া শ্রেণীর অনুপ্রবেশ ঘটে। এ কারণে মেট্রোপলিটান পুঁজি নতুন করে ব্যাপকভাবে ঢুকে পড়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে। অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্যের নামে যে মেট্রোপলিটান পুঁজি উপনিবেশোত্তর সমাজে ঢুকে পড়ে তার দ্বারা একদিকে যেমন রাষ্ট্র আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে, অন্যদিকে দেশীয় সম্পত্তিবান শ্রেণীসমূহও বিভিন্নভাবে লাভবান হয়।[১২৭] এসব শ্রেণীর প্রত্যক্ষ লাভের সুযোগ না থাকলে মেট্রোপলিটান পুঁজির নতুনভাবে অনুপ্রবেশ সহজতর হত না। আর সে কারণেই ঔপনিবেশোত্তর রাষ্ট্রের স্বাধীনতা আপেক্ষিক। এ প্রসঙ্গে আলাভী লিখেছেন :

"The role of the bureaucratic military oligarchy in postcolonial societies is only relatively autonomous, because it is determined within matrix of a class society and not outside it, for the preservation of the social order based on the institution of private property unites all the three competing propertied social classes. That common commitment situates the bureaucratic-military oligarchy within the social matrix. Nevertheless, the role of the bureaucratic military oligarchy is relatively autonomous because, once the controling hand of the metropolitan bourgeoisie is lifted at moment of independence, no single class has exclusive command over it."[১২৮]

তবে রাষ্ট্রের এ স্বাধীনতা আপেক্ষিক হলেও একমাত্র কিছু আঞ্চলিক সমস্যা ও জাতিসত্তাসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নকে বাদ দিলে উপনিবেশোত্তর সমাজে রাষ্ট্রের এ স্বাধীনতাকে মোকাবিলা করার মত কোন সামাজিক শক্তি নেই বলে আলাভী মত প্রকাশ করেছেন। আলাভীর মতে, রাজনৈতিক দলসমূহ কখনও কখনও রাষ্ট্রের সামরিক-আমলাতান্ত্রিক স্বৈরাচারের সামনে হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে, কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের জন্য এখনও তা একটি ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা। সাধারণ ব্যাপার হল, উপনিবেশোত্তর সমাজে যেখানে রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব রয়েছে সেখানে রাজনৈতিক দলসমূহ রাষ্ট্রের সামরিক আমলাতান্ত্রিক স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠায় একটি পরিপূরক শক্তি হিসাবে কাজ করে। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সমঝোতাকারীর ভূমিকা পালন করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রকে সহায়তা করে। আলাভীর মতে, রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং রাজনৈতিক দল শুধু রাষ্ট্রকে সহায়তাই করে না, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সমঝোতা, কিংবা সামরিক-আমলাতান্ত্রিক স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠায় অংশগ্রহণও করে। রাজনৈতিক দল ক্রমে স্বৈরাচারের অন্যতম অংশীদারে পরিণত হয়। আলাভীর ভাষায়-

"...as a political leadership participates in the performance of that mediatory role and in the preservation of the relative autonomy of the state apparatus, it is valuable for the purposes of the bureaucratic-military oligarchy; it becomes their partner, a third component of the oligarchy."[১২৯]

আলাভীর উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্রের ধারণাটি উপলব্ধি করতে কতকগুলি সমস্যাই পড়তে হয়। প্রথমতঃ, মেট্রোপলিটান বুর্জোয়া শ্রেণী বলতে ঠিক কি বুঝিয়েছেন তা কোথাও তিনি ব্যাখ্যা করেন নি। দ্বিতীয়তঃ, তিনি মত প্রকাশ করেছেন মেট্রোপলিটান বুর্জোয়াশ্রেণীর ওপর নির্ভর করে শুধু রাষ্ট্রই গড়ে ওঠেনি, অভ্যন্তরীণ সম্পত্তিবান শ্রেণী তথা ভূস্বামী শ্রেণী ও দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণীও গড়ে উঠেছে। কিন্তু তিনি ব্যাখ্যা করেননি এই অভ্যন্তরীণ সম্পত্তিবান শ্রেণীসমূহের সাথে মেট্রোপলিটান বুর্জোয়াশ্রেণীর সহযোগিতার ধরনটি কি রকম। তাছাড়া, সামাজিক শক্তি হিসাবে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র এবং দেশীয় সম্পত্তিবান শ্রেণীসমূহ উভয়ে মেট্রোপলিটান বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে বলে মত প্রকাশ করা হলেও রাষ্ট্র অতিমাত্রায় বিকশিত হতে পারলো অথচ এ সকল সম্পত্তিবান শ্রেণী সেভাবে বিকশিত হল না। এর কারণকে আলাভী সুস্পষ্ট করেননি। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রের অতিবিকশিত রূপের সাথে শ্রেণীসমূহের অধীনতার কি সম্পর্ক তাও তিনি ব্যাখ্যা করেননি; কেননা আগের অধ্যায়ে রাষ্ট্রের আলোচনায় দেখা গেছে যে, প্রতিটি শ্রেণী-সমাজেই রাষ্ট্রের অবস্থান থাকে কেন্দ্রীয় এবং আধিপত্যকারী শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহ তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রাধান্যকে নিশ্চিত করার প্রয়োজনেই রাষ্ট্রের বিভিন্ন উপাদানকে বর্ধিত করে। শ্রেণী বিকাশের স্তরের সাথে রাষ্ট্রের বিকাশের কি সম্পর্ক তা বিশ্লেষণ করা ছাড়া বিষয়টি পরিষ্কার হতে পারে না। চতুর্থতঃ, রাষ্ট্রের বিকাশের স্তরের সাথে বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রেণীগত ভূমিকার কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হয় কি-না তা আলাভী স্পষ্ট করেননি; আর এ কাজটি না করেই তিনি অতি বিকশিত রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে দেখিয়ে মত প্রকাশ করেছেন, আপেক্ষিকভাবে অতিবিকশিত রাষ্ট্রের অস্তিত্বের কারণেই দেশীয় শ্রেণীসমূহ রাষ্ট্রের অনুগত। পঞ্চমতঃ, রাষ্ট্রের সামরিক-আমলাতান্ত্রিক উপাদানটি কোন শ্রেণীর লোকদের নিয়ে গঠিত হচ্ছে, তার ওপর রাষ্ট্রের উক্ত উপাদানের চরিত্রে কোন পরিবর্তন সূচিত হয় কি-না, অথবা উক্ত রাষ্ট্রীয় উপাদানের চরিত্র গঠনে কোন ভূমিকা পালন করে কি-না আলাভী তা বিশ্লেষণ করেননি। অথচ তিনি তা না করেই উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্রের সামরিক-আমলাতান্ত্রিক উপাদানটি দেশীয় সম্পত্তিবান শ্রেণীসমূহভুক্ত পরিবারের ব্যক্তিদের নিয়ে গড়ে উঠেছে বলেই উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্র যে অভ্যন্তরীণ সম্পত্তিবান শ্রেণীসমূহের মাঝে সমঝোতাকারী ভূমিকা পালন করে তার পক্ষে একটি প্রধান যুক্তি হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। এ থেকেও আলাভীর তত্ত্বের অস্পষ্টতা লক্ষ্যনীয় হয়ে উঠেছে। ষষ্ঠতঃ, আলাভী অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ঔপনিবেশিক আমলেই মেট্রোপলিটান বুর্জোয়া শ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া বিপ্লব সম্পন্ন হয়ে গেছে, ফলে সামন্তবাদের সাথে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরোধের পরিসমাপ্তি হয়েছে। কিন্তু দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর সাথে মেট্রোপলিটান বুর্জোয়া শ্রেণীর আদৌ কোন দ্বন্দ্ব আছে কি-না তা তিনি সুস্পষ্ট করে বলেননি। তিনি বলেছেন, এ দু'টি শ্রেণীর মধ্যে আছে কিছু প্রতিযোগিতা। কিন্তু সে প্রতিযোগিতার রূপ কি তাও আলাভী সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেননি। ফলে দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশের সকল পর্যায়েই মেট্রোপলিটান বুর্জোয়া শ্রেণীর সাথে সম্পর্কটি সহযোগিতামূলক ও প্রতিযোগিতামূলকই থেকে যাচ্ছে। আলাভীর মতানুযায়ী কখনই সেখানে পারস্পরিক সম্পর্ক বিরোধাত্মক হয়ে ওঠার সুযোগ থাকছে না। এ বিষয়টিও আলাভীর তত্ত্বকে অস্পষ্ট করে তুলেছে। সপ্তমতঃ, রাষ্ট্র একটি মূর্ত প্রপঞ্চ। এর রয়েছে দু'টি অংশ; একটি জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী নীতি নির্ধারণকারী সংগঠন বা পার্লামেন্ট এবং অন্যটি আমলাতন্ত্র।

---

১২৭. Ibid,PP.161-62.
১২৮. Ibid,P.161.
১২৯. Ibid,p.150.

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রের স্বাধীন হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে কি ভূমিকা থাকে কিংবা আদৌ কোন ভূমিকা থাকে কি না তা আলোচনায় আনেননি। আর সে কারণে উপনিবেশোত্তর দেশে যখন গণতন্ত্র চালু থাকে তখন কিভাবে রাষ্ট্র স্বাধীন হয়ে ওঠে তা পরিষ্কার হয়ে ওঠেনি।

এ সব বিষয় নিয়ে বেশ কিছু সংশয় ও সমালোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। তবে কিছু কিছু বিষয়ে যে প্রশ্ন উঠেছে, সেগুলি সহজেই সমাধানযোগ্য। আলাভী যে মেট্রোপলিটান বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রত্যয়টি বার বার ব্যবহার করেছেন তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা না দিলেও বিভিন্ন আলোচনায় এর যে চিত্রটি ফুটে উঠেছে তা এ,জি, ফ্রাঙ্কের বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার (world capitalist system) ধারণার আলোকেই গ্রহণ করা হয়েছে। সেখানে ফ্রাঙ্ক পুরো বিশ্বকে একক পুঁজিবাদী বিশ্ব ব্যবস্থার অধীন হিসাবে দেখেছেন। তাঁর মতে পুরো বিশ্ব আজ একটি পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার অধীন; এ বিশ্বব্যবস্থাটি দ্বি-স্তর বিশিষ্ট, যা কেন্দ্র এবং প্রান্ত (Matropolitan and satellite's) বলে অভিহিত। বিশ্বের দেশগুলি পুঁজি নিয়ন্ত্রণের মাত্রা অনুযায়ী কেন্দ্র ও প্রান্তে বিভক্ত। বিশ্বের সামাজিক শ্রেণী-বিন্যাসেও কেন্দ্র-প্রান্ত সম্পর্কটি বিদ্যমান। বিশ্ব পুঁজিবাদী কেন্দ্রের সাথে সম্পর্কিত মেট্রোপলিটান শ্রেণীটি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে।[১৩০] অর্থাৎ উপনিবেশোত্তর দেশে যে শ্রেণীটি আন্তর্জাতিক এ পুঁজির সাথে যুক্ত সেই শ্রেণীটিই মেট্রোপলিটান বুর্জোয়া শ্রেণী।

আলাভীর তত্ত্ব সম্পর্কে অনেকে এমন কিছু সামলোচনা করেছেন যা আলাভীর তত্ত্বের জন্য প্রযোজ্য নয়। যেমন লেইস (Leys) আলাভীর অতিবিকশিত রাষ্ট্র সম্পর্কে সমালোচনা করতে গিয়ে মত প্রকাশ করেছেন যে প্রান্তিক দেশগুলির রাষ্ট্র অপেক্ষা উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির রাষ্ট্র অনেক শক্তিশালী। কিন্তু সেখানে রাষ্ট্র সেসব সমাজের অভ্যন্তরীণ শ্রেণীসমূহকে অতিক্রম করতে পারছে না, অথচ প্রান্তিক রাষ্ট্রগুলি কিভাবে শ্রেণীসমূহের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারছে? এ প্রশ্ন রেখে লেইস আলাভীর তত্ত্ব সম্পর্কে মত প্রকাশ করেছেন যে, এটি একটি ভ্রান্ত (Misleading) তত্ত্ব।[১৩১] আসলে, আলাভী মোটেও এ কথা বলেননি যে, উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্র অতিবিকশিত। তিনি বলেছেন, উপনিবেশোত্তরকালে যে সামাজিক শক্তিসমূহ থাকে তার মধ্যে রাষ্ট্র হচ্ছে অপেক্ষাকৃত অতিবিকশিত। শুধু লেইস-ই নন, আলাভীর আপেক্ষিকভাবে অতিবিকশিত রাষ্ট্রের প্রত্যয়টিকে অনেকেই ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। হালডন গুলাল্প (Haldon Gulalp) আলাভীর এ বক্তব্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন-

"...the observation of an 'over-developed' state may itself be unfounded."[১৩২]

যাহোক, আলাভীর উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্র বিষয়ক তত্ত্বটি প্রকাশিত হওয়ার পর সারা বিশ্বে বেশ আলোড়ন তোলে। অনেকেই বিষয়টি নিয়ে বিতর্কে অবতীর্ণ হন। প্রথম পর্যায়ে যারা এ বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন তাদের মধ্যে জন সোল (John S. Saul) অন্যতম। সোল তাঞ্জিনিয়ার অভিজ্ঞতার আলোকে আলাভী কথিত রাষ্ট্রের ভূমিকার কথা মেনে নিয়েছেন এবং বেশ কিছু নতুন বক্তব্য সংযোজন করেছেন। আলাভী উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্রের যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন, জন সোল তার সাথে রাষ্ট্রের আরো একটি নতুন ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন; এটি হচ্ছে, উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ভূমিকা গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষ আদর্শভিত্তিক কর্মকান্ড পরিচালনা।[১৩৩] সোলের মতে রাষ্ট্রের এই ত্রিমাত্রিক ভূমিকার মাধ্যমে উপনিবেশোত্তর সমাজে শুধু একটি কায়েমী স্বার্থবাদই প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তা নয়, রাষ্ট্রের কর্মকান্ডের অন্যতম দিক হচ্ছে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সরাসরি হস্তক্ষেপ, যার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় প্রবণতাটিই সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। সোলের ভাষায়-

"...the post-colonial state's centrality to the process of creating these conditions (like its centrality in promoting economic development) further reinforces Alavis point about the state importance."[১৩৪]

সোলের মতে রাষ্ট্রের এই কেন্দ্রীয় প্রবণতা একটি পিতৃসুলভ কর্তৃত্বের মাধ্যমে সামরিক-আমলাতান্ত্রিক স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠার কারণ হয়ে উঠতে পারে।[১৩৫]

কলিন লেইস (Colin Leys) হামজা আলাভীর উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্রের ধারণা প্রসঙ্গে একটি সঙ্গত প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর কথায় স্বাধীনতালাভের পর উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্র যে ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারকে বহন করে চলেছে, স্বাধীনতার আগেও তো সে রাষ্ট্রটি ছিল এবং শুধু ছিলই না, মেট্রোপলিটান বুর্জোয়া শ্রেণীও তার পিছনে ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন্ শক্তির বলে এ সব দেশ স্বাধীনতা অর্জন করলো? বস্তুত লেইস আরো গভীর তর প্রেক্ষিতে প্রশ্নটি উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মতে, ঔপনিবেশিক শক্তি ভারতবর্ষ বিজয়ের মধ্য দিয়ে যে সাফল্য অর্জন করেছিল সে তুলনায় তার সেনাবাহিনীটি ছিল খুবই ক্ষুদ্র। আর সে সময় মেট্রোপলিটান বুর্জোয়া শ্রেণী বা তার বিভিন্ন অংশ মিলে যে সেনা সমাবেশ ঘটিয়েছিল তা যখন এ সমাজকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অক্ষম হয়ে উঠেছিল তখনই না বাড়তি সৈন্য ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় উপাদানকে বিকশিত করার প্রয়োজন পড়লো।[১৩৬] তাহলে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের ওপর এ চাপটি কোথা থেকে এসেছিল? লেইস এর মতে, নিশ্চিতভাবেই এ চাপটি এসেছিল উপনিবেশের অভ্যন্তরীণ শ্রেণীসমূহ থেকে।[১৩৭] আর এ শ্রেণীসমূহের রাজনৈতিক চাপের মুখেই ঔপনিবেশিক শক্তি সে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। ফলে কলিন লেইসের কথায়, রাষ্ট্র অভ্যন্তরীণ শ্রেণীসমূহ অপেক্ষা অধিক বিকশিত-- এ ধরনের ধারণাকে উপনিবেশোত্তর দেশগুলির ওপর চাপিয়ে দেওয়ার কোন সুযোগ নেই, বরং যে কোন সমাজ

---

১৩০. Frank, Andre Gunder (1967): Capitalism and Under-development in Latin America, New York: Monthly Review Press. P.10.

১৩১. Leys,Colin (1976): "The 'Overdeveloped' Post-colonial State": A Re-Evaluation," Review of African Economy, No.5, Pp. 41-42.

১৩২. Gulalp, Haldun (1987): "Capital Accumulation, Classes and the Relative Autonomy of the State," Science and Society, Vol.51, No.3,P.303.

১৩৩. Saul, John S. (1974): "The State in Post-colonial Societies: Tanzania," Socialist Register, p.150-51.

১৩৪. Quoted in Kirsten Westergoard (1981): "The State-A Review of Some Theoretical Issues," The Journal of Social Studies, Vol.13,p.3.

১৩৫. জন সোলের এ বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে বেশ কিছু আলোচনা সমালোচনা হয়েছে। মূল প্রবন্ধটি না পাবার কারণে জন সোলের বক্তব্যকে মূল থেকে নেওয়া সম্ভব হয়নি। ওয়েস্টার গার্ড-এর পূর্বোক্ত প্রবন্ধ এবং কে,এ,এম,সা'দ উদ্দিনের 'অনুন্নত বিশ্বে রাষ্ট্রের প্রকৃতিঃ একটি তাত্ত্বিক সমীক্ষা,' সমাজ নিরীক্ষণ/১৪,১৯৮৪. পৃঃ ৬৮-৮০ থেকে সোলের ধারণাটি গ্রহণ করা হয়েছে।

১৩৬. Leys, Colin, op.cit.,p.42.

১৩৭. Ibid,p.44.

Dhaka University Institutional Repository

কাঠামোতে আধিপত্যকারী শ্রেণীর শ্রেণী-স্বার্থের রক্ষা ও বর্ধিত করার হাতিয়ার হিসাবেই রাষ্ট্র ব্যবহৃত হয়। আর রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্রও নির্ধারিত হয় সমাজ কাঠামোতে বিদ্যমান শ্রেণীসম্পর্কের ভিত্তিতেই। কলিন লেইস বলেন-

"...the first question must always be which class is dominant in a given social formation; since this dominance must be enforced by the state, the class character of the state is.given by this relationship."[১৩৮]

ফলে রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী বা আমলাতন্ত্র কোন শ্রেণীর সদস্য নিয়ে গড়ে উঠলো এটা মোটেও রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ণয়ের মাপকাঠি হতে পারে না, বরং সমাজ কাঠামোতে প্রভুত্বকারী শ্রেণী চরিত্রই হবে রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্র নির্ণয়ের মূল মানদন্ড।[১৩৯] এভাবে লেইস রাষ্ট্রের মার্কসবাদী ব্যাখ্যাকে তুলে ধরে আলাভীর উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্র সম্পর্কিত মূল থিসিসকেই বেকায়দায় ফেলে দিয়েছেন। কেননা আলাভী উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্রের স্বাধীন হয়ে-ওঠা এবং সামরিক আমলাতান্ত্রিক স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন সম্পর্কে স্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করেন,

"These are conditions which defferentiate the postcolonial state fundamentally from the state as analyzed in classical Marxist theory."[১৪০]

যাহোক, কলিন লেইস এভাবে আলাভীর উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্রের তত্ত্বকে খন্ডন করেও বলেছেন যে, আলাভীর অতিবিকশিত রাষ্ট্রের তত্ত্বটি শুধুমাত্র ভারতীয় উপমহাদেশের জন্যই কিছুটা প্রাসঙ্গিক, কিন্তু আলাভী যেভাবে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন মোটেই সে কারণে এসব দেশে উপনিবেশোত্তরকালে রাষ্ট্র বিকশিত হয়নি; বরং ভিন্নতর কারণে এখানকার রাষ্ট্রসমূহ বিকশিত হয়েছে। তার মতে এ সব দেশে উপনিবেশোত্তরকালেও পুরোনো তথা ঔপনিবেশিক আমলের সামাজিক কাঠামোকে রক্ষা করার মত শক্তিশালী কিছু শ্রেণী সেখানে টিকে থাকে। আর সেসব শ্রেণীর স্বার্থকে রক্ষা করার প্রয়োজন থেকেই স্বাধীনতা উত্তরকালে রাষ্ট্রের বিভিন্ন দুর্বল উপাদানকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। লেইসের মতে ভারতীয় উপমহাদেশের দেশগুলিতে সে কারণেই –

"...the civil service and armed forces were expanded more rapidly than either national income or population in the years following 1947."[১৪১]

লেইস মতপ্রকাশ করেছেন ভারতীয় উপমহাদেশের ভিন্নতর বিশেষ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের কারণেই এটা ঘটতে পেরেছে, কিন্তু এটা মোটেই উপনিবেশোত্তর দেশসমূহের সাধারণ বৈশিষ্ট্য নয়। তিনি তাঞ্জানিয়ার অভিজ্ঞতা থেকে মত প্রকাশ করেন যে, পুরোনো তথা ঔপনিবেশিক আমলের সমাজ কাঠামোকে রক্ষা করতে পারে বা তার পক্ষে সমর্থন করতে পারে এমন কোন শক্তিশালী শ্রেণীরই সেখানে অস্তিত্ব নেই।[১৪২] কিন্তু তাঞ্জানিয়ায় পুরোনো সমাজকে রক্ষা করার মত শক্তিশালী শ্রেণী না থাকলেও রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করার মত কোন্ শ্রেণী সেখানে বিদ্যমান ছিল, সে সম্পর্কে তিনি কিছু বলেন নি। উপরন্তু, কোন্ বস্তুগত কারণে উপনিবেশোত্তর দেশগুলিতে রাষ্ট্র অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং আদর্শগত ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং আলাভীর ভাষায় রাষ্ট্রই সব কিছুর মূলে-- এ বক্তব্যের পক্ষে বা বিপক্ষে শক্তিশালী কোন যুক্তি প্রদর্শন না করেই কলিন লেজ আলাভীকে অনেকটা অবিজ্ঞোচিতভাবে (Non-academic) সমালোচনা করেছেন, যেমন-

"...the important point is not so much that the idea of the 'overdeveloped' state is empty; it is really that this whole way of approaching the question of the significance of any state, i,e. of starting out from its structure or scope, whether inherited from an earlier situation or not, is a mistake."[১৪৩]

আন্দ্রে গুন্দার ফ্রাঙ্ক উন্নয়নশীল বিশ্বের তথা তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্র সম্পর্কে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন।[১৪৪] ফ্রাঙ্ক তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আলাভীর বক্তব্যকে সাধারণভাবে মেনে নিয়েছেন। তবে তিনি মত প্রকাশ করেছেন তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্র সম্পর্কে আলাভীর বক্তব্য শুধুমাত্র এশিয়ার কয়েকটি উপনিবেশোত্তর দেশের জন্যই প্রযোজ্য, এ বক্তব্য উপনিবেশোত্তর পুরো বিশ্বকে প্রতিফলিত করে না।[১৪৫] তবে তিনি আলাভীর রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাধীনতার বিষয়টিকে সমগ্র তৃতীয় বিশ্বের জন্যই সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। তার মতে অতিবিকশিত রাষ্ট্র সম্পর্কিত আলাভীর ধারণাটিকে সংশোধন করার দাবি রাখে। কেননা এশিয়ার অনেক দেশেই দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণী যতটা বিকশিত, উপরিকাঠামো হিসাবে তাকে অতিক্রম করতে পারেনি।[১৪৬]

এ, জি, ফ্রাঙ্ক এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশসমূহের ওপর আলোকপাত করে দেখিয়েছেন যে কিভাবে রাষ্ট্র এসব দেশে স্বাধীন অবস্থান নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তার প্রভাব বিবেচনা করলেই তা বোঝা যায়। এসব দেশে রাষ্ট্র উন্নয়ন প্রকল্পের দায়িত্বে থাকে; সে সবধরনের কর রাজস্বের দাবিদার, সকল বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক অর্থকে নিয়ন্ত্রণ করে, আমদানি-রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় সকল পারমিট-লাইসেন্স বিলি-বন্টন করে, অভ্যন্তরীণ মুদ্রা বাজারকে সে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সর্বোপরি কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ অধিকাংশ অর্থবিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকেও সে নিয়ন্ত্রণ করে। মোট কথা, তৃতীয় বিশ্বে রাষ্ট্রই সমস্ত উন্নয়নমূলকও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে।[১৪৭] শুধু এসবই নয়, ফ্রাঙ্ক তৃতীয় বিশ্বভুক্ত বিভিন্ন দেশের উদাহরণ দিয়ে দেখান-

"...the State is increasing its investment in public, mixed (state capital-private capital), and joint (state capital- foriegn capital) enterprises. Such investment encourages the state to subsidize private capital with subsequent state-subsidized production and sale of cheap inputs of electricity, steel, equipment, transportation,

---

১৩৮ .Ibid,p.44.
১৩৯ . Ibid,P.44.
১৪০ . Alavi, Hamza, op.cit., p.148.
১৪১ . Leys,Colin, op. cit, p.42.
১৪২ . Ibid,p.43.
১৪৩ . Ibid,p.43.
১৪৪ . আন্দ্রে গুন্ডার ফ্রাঙ্ক অবশ্য শুধুমাত্র উন্নয়নশীল বিশ্বের রাষ্ট্র সম্পর্কে স্বতন্ত্র কোন গ্রন্থ প্রকাশ করেননি; তবে তার Crisis in the Third World (1981) নামক গ্রন্থে 'Economic Crisis and the State in the Third World' শিরোনামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় সন্নিবেশিত হয়েছে।
১৪৫ . Frank, A.G.(1981): Crisis: In The Third World New York: Holmes and Meier Publishers, p. 235.
১৪৬ . Ibid, p.235.
১৪৭ . Ibid,pp.248-49.

Dhaka University Institutional Repository

improved land and /or water resources, technological research, and other facilities to national and foreign private, enterprise."[১৪৮]

ফ্রাঙ্ক এভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্বে রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ভূমিকাকে স্পষ্ট করে তোলেন। তার মতে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্র এই কেন্দ্রীয় ভূমিকার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন উৎপাদন উপায়ের প্রধান অংশের মালিকে পরিণত হয়, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক সহযোগী মেট্রোপলিটান পুঁজির অভ্যন্তরীণ সংকট নিরসনের কাজে তার বিভিন্ন উপাদানকে ব্যবহার করে। মেট্রোপলিটান পুঁজির জন্য সস্তা শ্রমের বাজারকে নিশ্চিত করে, আন্তর্জাতিক পুঁজির সাথে অথবা রাষ্ট্রীয় পুঁজির সাথে যুক্ত দেশীয় বৃহৎ পুঁজিপতিদের জন্য পুঁজিবিনিয়োগের নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি করে দেয় এবং এদের উৎপাদিত দ্রব্য জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক বাজারে চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করে।[১৪৯] ফ্রাঙ্কের মতে আয় বন্টনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকায় দিকে লক্ষ্য করলে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ভূমিকা আরো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। অর্থনৈতিক ও রাজস্ব নীতিসহ সমস্ত পরিকল্পনাকে এমনভাবে বিন্যাস করা হয় যে, আয়ের প্রধান অংশ দরিদ্রদের কাছ থেকে ধনিক শ্রেণীর কাছে চলে যায়, শ্রমের মূল্য শ্রমিক পায় না, পায় পুঁজিপতি, আর জাতীয় আয় জাতি পায় না, পায় আন্তর্জাতিক পুঁজি। ফ্রাঙ্ক এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন–

"The most important are the state's influence over the distribution of income through its control of monetary and fiscal policy, state employment and expenditures, and the state's substantial economic and political control over prices and particularly wages. Income is being shifted from the poor to the rich, from labour to capital, and from the national economy to the imperialist capital....These shifts in distribution of income are both a requisite and an effect of the Third World's present participation in the international division of labour"[১৫০]

ফ্রাঙ্কের মতে রাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের ওপর যে শোষণ প্রক্রিয়াটি চলে তা বর্তমানে রাষ্ট্র নিজে এবং আন্তর্জাতিক পুঁজির সহযোগী দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণীই চালায়। এমন একটা সময় ছিল যখন দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর অভ্যন্তরীণ বাজার দখল নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করার সুযোগ ছিল না। সে সময় দেশীয় বুর্জোয়াগণ আন্তর্জাতিক পুঁজির চাহিদা অনুযায়ী রপ্তানির জন্য পণ্য উৎপাদন করতে বাধ্য হত, আর দেশীয় চাহিদা পূরণ হত আন্তর্জাতিক পুঁজির কাছ থেকে আমদানি করা পাকামাল দিয়ে। ফলে তখন জাতীয় পুঁজির সাথে আন্তর্জাতিক পুঁজির সম্পর্ক ছিল নিপীড়নমূলক। কিন্তু বর্তমানে সে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়ে গেছে। দেশীয় পুঁজিই এখন দেশীয় বাজারের চাহিদাকে পূরণ করার মত যথেষ্ট পণ্য উৎপাদন করতে পারছে, আর আন্তর্জাতিক পুঁজির আয়তন বর্তমানে এত বেশি স্ফীত হয়েছে যে, এই পুঁজি রপ্তানি করেই তৃতীয় বিশ্বের কাছ থেকে সমপরিমাণ মুনাফা অর্জনে সক্ষম হচ্ছে। আর সেই সাথে যুক্ত হয়েছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি রপ্তানির ব্যাপারটি। এই বিশাল পুঁজি ও প্রযুক্তির ওপর আন্তর্জাতিক পুঁজির একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের কারণেই তৃতীয় বিশ্বের ওপর তার নিয়ন্ত্রণটি নিশ্চিত হচ্ছে। ফ্রাঙ্কের ভাষায়–

"Today the matropolis is no longer interested in exporting the actual finished goods, since the metropolitan bourgeoisie can now achieve greater economic control and earnings at home and abroad by exporting the equipment and technology which is its new source of monopoly power, as well as financial control."[১৫১]

এই প্রক্রিয়ায় তৃতীয় বিশ্বের ওপর আন্তর্জাতিক পুঁজির নিয়ন্ত্রণ থাকলেও রাষ্ট্রীয় পুঁজি এবং দেশীয় ব্যক্তিগত খাতের পুঁজির প্রবৃদ্ধির কিছু সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে, আগে আন্তর্জাতিক পুঁজির সাথে দেশীয় পুঁজির যে একটি দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক ছিল তা বর্তমানকালে এসে সহযোগিতামূলক সম্পর্কে রূপান্তরিত হয়েছে। কিছু অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ উৎপাদন প্রক্রিয়া ছাড়া উৎপাদন ব্যবস্থার অন্যান্য ক্ষেত্রে দেশীয় পুঁজি তার ইচ্ছামত পণ্য উৎপাদনে সক্ষম, তবে তা চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। ফলে দেশগুলিতে দেখা দিয়েছে দু'টি খাত, একটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ আন্তর্জাতিক পুঁজির খাত, যাকে কেন্দ্র করে মধ্যবিত্ত মানসিকতা সম্পন্ন 'ভদ্রলোক' শ্রমিকের জন্ম হচ্ছে, অন্যদিকে অবশিষ্ট বিরাট ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় খাতটি পড়ে রয়েছে পুরোনো প্রযুক্তির নিগড়ে। রাষ্ট্র ও দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু দখল করে আছে আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ খাতটি, ফলে পুরোনো খাতটি টিকে থাকতে পারছে না। অন্যদিকে, শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের একটি অংশ আধুনিক প্রযুক্তিজ্ঞান অর্জন করে আধুনিক খাতে মোটা বেতনের চাকুরী সংগ্রহে সমর্থ হচ্ছে। এরা আধুনিক খাতটি প্রতিষ্ঠায় পরিকল্পনাবিদ বা বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিয়োজিত হয়ে আন্তর্জাতিক পুঁজির অংশে পরিণত হয়েছে।[১৫২] এভাবে বিরাট পশ্চাদপদ খাতের প্রতি আন্তর্জাতিক পুঁজির আগ্রহ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার ফলে এ খাতটিতে লে-অফ, ছাঁটাই আর বন্ধ ঘোষণা লেগেই আছে। অন্যদিকে, আধুনিক খাতটিও বাড়তি কর্মক্ষেত্র তৈরিতে তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারছে না। উপরন্ত আধুনিক খাতে নিয়োগ প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাবে অধিকাংশই অযোগ্য বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে। ফলে সমস্যা সমাধানের উপায় হিসাবে বাড়তি জনশক্তিকে বিদেশ প্রেরণের প্রবণতা দেখা দিয়েছে।[১৫৩] কিন্তু এসব করে মৌলিক সমস্যার কোন সমাধান হচ্ছে না, সমাজে সৃষ্টি হচ্ছে সীমাহীন বেকারত্ব, দারিদ্র্য ও হতাশা। আর এ কারণেই দেখা দিচ্ছে অসন্তোষ ও বিদ্রোহ। এ অসন্তোষ আর বিদ্রোহকে দমন করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রকে গণনির্যাতনের পথে যেতে হচ্ছে। এ গণনির্যাতনের জন্য যখন সাংবিধানিক পন্থা অকার্যকর হয়ে উঠছে তখনই জন্ম হচ্ছে সামরিক-আমলাতান্ত্রিক একনায়কত্বের। ফ্রাঙ্কের মতে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা এবং মেক্সিকোর মতো দেশগুলিতে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার এটাই মূল কারণ।[১৫৪]

ফ্রাঙ্ক তৃতীয় বিশ্বে সামাজিক অসন্তোষের আরো একটি দিকের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। তার মতে, আন্তর্জাতিক পুঁজির সহায়তায় প্রতিবছর বাজেটের কলেবর বৃদ্ধি করা হয় অথচ বছর শেষে প্রবৃদ্ধির হার আশানুরূপ সংযোজন ঘটে না। ফলে বৈদেশিক ঋণের সুদ ও মূলের অংশ পরিশোধ করতে গিয়ে আরো বেশি অর্থের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পরবর্তী বছর বাজেট ঘাটতির ব্যাপক

---

১৪৮. Ibid,p.249.
১৪৯. Ibid,p.249.
১৫০. Ibid,p.249-50.
১৫১. Frank,A.G. (1972): Lumpen bourgeoisie and Lumpen development: Dependency, Class, and Politics in Latin America. New York: Monthly Review Press.p.120.
১৫২. Ibid,p.135.
১৫৩. Ibid,p.120.
১৫৪. Ibid,p.121.

Dhaka University Institutional Repository

অর্থের সংকুলান করতে গিয়ে সেবামূলক খাতগুলিকে সংকুচিত করতে হয়, অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের ওপর থেকে ভর্তুকি হ্রাস করতে হয় এবং জনগণের ওপর ধার্যকৃত কর ও রাজস্ব বৃদ্ধি করতে হয়।[১৫৫] কর ব্যবস্থাটি এমনভাবে বিন্যাস করা হয়, যাতে আন্তর্জাতিক পুঁজি ও তার দেশীয় সহযোগিদের স্বার্থ অক্ষুণ্ন থাকে। ফলে বাজেট ঘাটতি পোষাতে গিয়ে পুরো চাপটি গিয়ে পড়ে সাধারণ মানুষের ওপর। ফ্রাঙ্কের মতে যারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুঁজির উৎপাদিত পণ্যের ক্রেতা সেই সাধারণ মানুষ তথা শ্রমজীবী শ্রেণীসমূহ ও ব্যাপক সংখ্যক দরিদ্র জনতাই এ বাজেট ঘাটতির শিকারে পরিণত হয়।[১৫৬] তার বিবেচনায় এটাও তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রের প্রতি জনসাধারণের বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ার অন্যতম কারণ।

তাই তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহকে ব্যাপক গণঅসন্তোষ, প্রতিবাদ ও আন্দোলনকে মোকাবিলা করার লক্ষ্যে ক্রমাগত রাষ্ট্রীয় ব্যয় বৃদ্ধি করতে হয়। রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমাগত ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকলেও জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষারমত সেবামূলক খাতগুলির ব্যয় মোটেই বৃদ্ধি পায় না। অন্যদিকে, প্রশাসনিক ও সামরিক খাতটি দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে।[১৫৭] ফ্রাঙ্ক তৃতীয় বিশ্বভূক্ত একান্নবইটি দেশের ওপর জরিপ চালিয়ে দেখিয়েছেন যে কিভাবে এসব দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সকল দেশে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উৎপাদনশীল খাতে যে ব্যয় হচ্ছে সে অর্থকে বাদ দিয়েও দেখা যাচ্ছে কোন কোন দেশে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ২৫ ভাগকেই ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ১৯৬১ থেকে-১৯৭১ এই দশ বছরে প্রায় সব দেশেই রাষ্ট্রীয় ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৬১ সালে যে সব দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যয় মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ১৫ ভাগের নিচে ছিল তাদের সংখ্যা ছিল শতকরা ৭২ ভাগ, কিন্তু ১৯৭১ সালে এদের সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র শতকরা ৫৫ ভাগে।[১৫৮] রাষ্ট্রীয় ব্যয় প্রধানত তিনটি খাত বিভক্তঃ (১) সরকারী প্রশাসন, পুলিস ও নিরাপত্তা বিভাগ, (২) সমাজসেবা, জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষা, এবং (৩) শিল্প বিনিয়োগ ও অবকাঠামো নির্মাণ। এ তিনটি খাতের মধ্যে প্রথম খাতটিই অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বেড়ে গেছে। বিশেষ করে, পুলিস বাহিনী ও অন্যান্য নিপীড়নকারী সংস্থার পিছনে ব্যয় বৃদ্ধি ঘটেছে সবচেয়ে বেশি।[১৫৯] এভাবে ফ্রাংক রাষ্ট্রের যে চিত্র তুলে ধরেছেন তা থেকে দেখা যায়, তৃতীয় বিশ্বে রাষ্ট্র জনগণের ওপর একটি আগ্রাসী শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে; সে আগ্রাসনের শিকার রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পুঁজির সহযোগী নির্ভরশীল বুর্জোয়া শ্রেণী ছাড়া অন্যান্য সকল শ্রেণী। আর এসব দেশে সামরিক শাসন যখন বলবৎ হয় তখন কৃষক, শ্রমিক, পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীসহ সমগ্র মেহনতী জনতার ওপর দ্বিগুণ পরিমাণ নির্যাতন নেমে আসে।[১৬০] এভাবে ফ্রাঙ্ক তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ভূমিকা সম্পর্কে বিবরণ দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, সমাজের অর্থনীতি, রাজনীতি ও আদর্শগত দিকের ওপর রাষ্ট্র সরাসরি হস্তক্ষেপ করে, আর তা জনজীবনের সংকট ঘনীভূত হওয়ার সাথে সাথে যে কোন প্রতিবাদকে নির্মমভাবে দমন করে। ফ্রাঙ্কের ভাষায়-

"Third world countries is called upon to intervene most actively, The state intervenes through the economic, political, forceful, and ideological discipline and repression of labour and the poor in general. It uses its power to cut wages, reduce employment, eliminate social services, crush unions, disorganize and silence political opposition and public opinion, and to repress countless individuals through death, imprisonment, torture, terror, unemployment, and many other measures. These measures are often enorced under emergency rule, martial law, military government, and other emerging institutional forms."[১৬১]

ফ্রাঙ্ক অবশ্য আলাভীর উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্রসংক্রান্ত তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ কিছু দুর্বলতাকে দূর করার চেষ্টা করেছেন বিশেষতঃ, রাষ্ট্র কিভাবে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়, তা তিনি খুব স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন। কিন্তু এটা দেখাতে গিয়ে তিনি আন্তর্জাতিক পুঁজির ওপর এত বেশি জোর দিয়েছেন যে, রাষ্ট্রের স্বাধীনতার আপেক্ষিক দিকটি অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। বরং মনে হয়েছে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলি প্রধানতঃ আন্তর্জাতিক পুঁজির পাহারাদার শক্তি হিসাবেই তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে অবস্থান করছে। ফলে এসব দেশে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের জন্য যে এক গৌরবময় আন্দোলনের ইতিহাস রয়েছে তাকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এছাড়া আলাভীর রাষ্ট্র সংক্রান্ত বক্তব্যের আর যে সব দুর্বলতা রয়েছে তার সবই পুরোপুরিই রয়ে গেছে। যেমন, তৃতীয় বিশ্বে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা এবং রাষ্ট্রের কাঠামোগত দিকের ওপর মোটেই আলোকপাত করা হয়নি। ফ্রাঙ্ক অবশ্য তার অন্যান্য লেখায় খুব বিস্তারিতভাবে দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণীসহ অপরাপর শ্রেণীর বিকাশের অন্তরায়সমূহ বা বিকৃত বিকাশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কারণসমূহকে ব্যাখ্যা করেছেন।[১৬২] কিন্তু রাষ্ট্র কি কারণে শ্রেণী নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে আসতে পারে তা রাষ্ট্রের বিভিন্ন উপাদানকে ব্যবচ্ছেদ করে দেখানোর কোন প্রচেষ্টা তিনি কখনও নেননি।

বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী অধ্যাপক অনুপম সেন উপনিবেশোত্তর ভারতের ওপর খুবই পান্ডিত্যপূর্ণ একখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন।[১৬৩] এ গ্রন্থে তিনি ভারতের বিস্তারিত প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক অংশ হচ্ছে তার রাষ্ট্র বিষয়ক ব্যাখ্যা। অধ্যাপক সেন সমগ্র গ্রন্থে বিভিন্ন শ্রেণীর বিকাশ এবং তার সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক নিয়েই তার আলোচনাকে কেন্দ্রীভূত রেখেছেন এবং প্রায় প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে গিয়ে দেখিয়েছেন এ শ্রেণীসমূহ রাষ্ট্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম নয়।

---

১৫৫. Frank, A.G.(1981): op.cit.,p.250.

১৫৬. Ibid,p.250.

১৫৭. Ibid,p.251.

১৫৮. Ibid,pp.253.

১৫৯. Ibid,pp.253-54.

১৬০. Ibid,p.247.

১৬১. Ibid,p.247.

১৬২. ফ্রাঙ্কের প্রাগুক্ত গ্রন্থের ৩৪৬-৪৭ পৃষ্ঠাতে তার ১৭টি গ্রন্থ ও প্রবন্ধের তালিকা দেওয়া আছে। এ ছাড়াও তার আরো অসংখ্য লেখা রয়েছে, সেগুলিতে ফ্রাঙ্ক প্রধানতঃ তৃতীয় বিশ্বে স্বল্পবিকশিত ও বিকৃত ভাবে বিকশিত বিভিন্ন শ্রেণী এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের স্বল্পোন্নয়নের আর্থ-সামাজিক পটভূমি ব্যাখ্যা করেছেন।

১৬৩. Sen, Anupam (982): The State.Industrialization and Class Formations in India, London: Routledge and Kegan Paul.

Dhaka University Institutional Repository

সেনের মতে, ভারতীয় ইতিহাসের শেষ তিনটি পর্যায়েই রাষ্ট্র ছিল স্বাধীন। প্রথম পর্যায়ে তথা মোগল আমলে মোগল সম্রাটই ছিল রাষ্ট্রের অংশ। আর সমাজ ছিল প্রধানতঃ এশিয়াটিক ও আংশিকভাবে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার অধীন। ফলে রাষ্ট্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মত কোন শক্তিশালী শ্রেণী ছিল সেখানে অনুপস্থিত। ঔপনিবেশিক ও উপনিবেশোত্তর পর্যায় দুটিতে ভারতের উৎপাদন ব্যবস্থায় পুঁজিবাদের সংযোজন ঘটে। পুঁজিবাদ যখন সমাজে একটি অবস্থান গ্রহণ করেছিল তখনও পূর্বতন উৎপাদন পদ্ধতি দুটি সমাজে টিকে ছিল এবং এখনও টিকে আছে। সমাজের শেষ দুটি যুগে যে নতুন উৎপাদন পদ্ধতির সমাবেশ ঘটেছে, তার ফলে রাষ্ট্রের স্বাধীন অবস্থানের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। উপনিবেশোত্তর আমলে তো বটেই স্বাধীনতা-পরবর্তীকালেও বুর্জোয়া শ্রেণী এখনও এতটা শক্তি অর্জন করতে পারেনি যে, রাষ্ট্রের স্বাধীন ভূমিকার সামনে বাধা হয়ে উঠতে পারে।[১৬৪]

সেন তাঁর গ্রন্থে খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রাক-উপনিবেশোত্তর এবং উপনিবেশোত্তর আমলে কিভাবে রাষ্ট্র স্বাধীন ভূমিকা গ্রহণ করতে পেরেছিল তার বিবরণ দিয়েছেন এবং বাকি সমগ্র আলোচনাটাই করেছেন স্বাধীন ভারতের অর্থনীতি ও সমাজ নিয়ে। তার গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন ভারতীয় সমাজে কিভাবে রাষ্ট্রের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল। তিনি এখানে দেখিয়েছেন ক্ষয়িষ্ণু শিল্প-কারখানাকে ঢেলে সাজানো ও তাকে বিকশিত করার জন্য রাষ্ট্র কি প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব গ্রহণ করে। ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর সীমাহীন অযোগ্যতাকে কাটিয়ে উঠাবার জন্য রাষ্ট্র যে ভূমিকা পালন করেছিল তা থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, স্বাধীনতাউত্তরকালে রাষ্ট্রের ওপর বুর্জোয়া শ্রেণীর কোন কর্তৃত্ব ছিল না। অন্যদিকে, বুর্জোয়া শ্রেণীর এ দুর্বলতার কারণেই শক্তিশালী কোন রাজনৈতিক দল সেখানে গড়ে উঠতে পারেনি, আর তাই রাষ্ট্রের ওপর রাজনৈতিক দলের কোন কর্তৃত্ব গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না।[১৬৫]

এর ফলে স্বাধীনতার ২৫ বছরেও ভারতীয় সমাজে রাষ্ট্রের স্বাধীন ভূমিকার কোন পরিবর্তন ঘটেনি, বরং সমাজের ওপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

অনুপম সেনের এ গ্রন্থের ওপর অনেক সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে, তবে গ্রন্থটিকে সামগ্রিকভাবে যিনি সমালোচনা ও মূল্যায়ন করেন এবং নিজস্ব বক্তব্য খুব যুক্তিগ্রাহ্যভাবে তুলে ধরেন তিনি হচ্ছেন নজরুল ইসলাম।[১৬৬] ইসলাম অনুপম সেনের একাধিক বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, বেশ কিছু জায়গায় সংশয় প্রকাশ করেন। তবে তার প্রশ্নসমূহের মধ্যে বর্তমান আলোচনার জন্য খুব প্রাসঙ্গিক কতকগুলি প্রশ্ন রয়েছে। নজরুল ইসলামের মতে, সেন রাষ্ট্রের অধ্যাপক কার্যনির্বাহকদের (Functionaries) সম্পর্কে অনেক আলোচনা করেছেন, কিন্তু কখনও তিনি রাষ্ট্রের কার্যনির্বাহক বলতে কাদেরকে বোঝাচ্ছেন তার উল্লেখ করেননি। ফলে রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যর্থতার দায় ভাগ যখন ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্বের ওপর আরোপ করছেন তখনই সংশয় সৃষ্টি হয়। কেননা, ১৯৪৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত সীমিত অধিকার সম্পন্ন সরকারগুলি শেষ দিকে এসে দেশীয় রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল, কিন্তু তখনও মূল ক্ষমতা ছিল উপনিবেশোত্তর শক্তির হাতেই। আবার তিনি স্বাধীনতা-উত্তরকালের রাষ্ট্রের কার্যনির্বাহক বলতে আমলাতন্ত্রকে নির্দেশ করেছেন। ইসলামের বিবেচনায়, সেন রাজনৈতিক দল, সমিতি, সংগঠন, চাপ প্রয়োগকারীগোষ্ঠী সম্পর্কে প্রায় নীরব থেকেছেন; রাষ্ট্রের ওপর এদের কোন নিয়ন্ত্রণ কিংবা প্রভাব থাকতে পারে কি না সে ব্যাপারেও কোন আলোকপাত করেননি। এমনকি, সমগ্র বৃটিশ আমলে এবং তার পরে স্বাধীন ভারতে যে ব্যাপক কৃষক অভ্যুত্থানের ইতিহাস রয়েছে সেন সে ব্যাপারটির উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি।[১৬৭] অথচ রাষ্ট্রের ওপর এসব উপাদানের প্রভাব থাকা খুবই স্বাভাবিক।

ইসলামের মূল সমালোচনাটি হচ্ছে রাষ্ট্রের ওপর ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ ছিল কি ছিল না-এ প্রশ্নটির ওপর। ইসলাম বিভিন্ন তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়ে দেখান যে, ভারতে পুঁজিপতি শ্রেণীটি মোটেই এতটা দুর্বল ছিল না যে, রাষ্ট্র তার ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে, বরং কাদেরকে নিয়ে সরকার প্রতিষ্ঠা হবে এবং কে প্রধান মন্ত্রী হবে সেটা পর্যন্ত ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর মেনে নেওয়ার ওপরই স্বাধীনতার সমসাময়িককালে সরকার প্রতিষ্ঠা হতে পেরেছিল। এ তথ্য উপস্থাপন করার পর ইসলাম মন্তব্য করেছেন-

"...the autonomy or the hegemony of the state over the classes also do not find much support from the history of India. The bourgeoisie not only developed there but exercise control over the state apparatus as well."[১৬৮]

ইসলাম যে প্রশ্নটি তুলেছেন সেটাই আসলে অনুপম সেনের গ্রন্থের সবচেয়ে দুর্বল অংশ। কেননা তিনি তার গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ভারতীয় রাষ্ট্র কিভাবে বিভিন্ন ধরনের সামাজিকী করণের নামে রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রকে গড়ে তুলেছিল। কিন্তু কখনও তিনি বিবেচনা করেননি যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ কারী পার্লামেন্ট রাষ্ট্রের অংশ হলেও তা জনগণের প্রতিনিধিদের নিয়েই গঠিত এবং পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্যই কোন না কোন রাজনৈতিক দল তথা কোন না কোন শ্রেণীর প্রতিনিধি। আর যে সময় ভারতবর্ষে এ 'সামাজিকীকরণ' চলছিল তখন ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণী কি ভূমিকা নিয়েছিল কিংবা ভারতবর্ষের মধ্যবিত্ত শ্রেণীসহ অপরাপর শ্রেণী কি ভূমিকা নিয়েছিল, তারও কোন উল্লেখ করা হয়নি। আর যে শ্রেণীসমূহের প্রচণ্ড আন্দোলনের চাপে ঔপনিবেশিক শক্তি ভারত ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল, সেই শ্রেণীসমূহের ওপর ঔপনিবেশিক শক্তির রেখে যাওয়া আমলা কাঠামোটি কিভাবে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে তা সেন স্পষ্ট করার চেষ্টা এ গ্রন্থে করেননি। অথচ এ বিষয়টিকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রের স্বাধীনতার বিষয়টি আলোচনার কোন মূল্য থাকে না। কেননা গুলাসপ এর মতে সকল রাষ্ট্রেরই সমাজে কেন্দ্রীয় ভূমিকা থাকে; প্রশ্ন হচ্ছে এ রাষ্ট্রটিকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি হিসাবে পার্লামেন্ট যদি অনুপস্থিত থাকে বা অকার্যকর হয়ে পড়ে তাহলেই রাষ্ট্রের স্বাধীনতার প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক। কিন্তু যদি পার্লামেন্ট ও রাজনৈতিক দল কার্যকর থাকে, তার প্রতিটি নীতি নির্ধারণে তারাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন; এবং নিয়মিত জনগণের দ্বারা পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ থাকে তাহলে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা বলতে পার্লামেন্টের স্বাধীন অবস্থানকেই বোঝায়, যা রাষ্ট্রের ওপর শ্রেণী আধিপত্যকেই প্রকাশ করে। আলাভী রাষ্ট্রের আলোচনায় নানা সংশয় সৃষ্টি করলেও রাষ্ট্রকে বোঝার ক্ষেত্রে এ ভুলটি করেননি। তিনি রাজনৈতিক দলকে সামরিক-আমলাতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্রের অন্যতম অংশীদার হিসাবে দেখিয়ে রাষ্ট্রকে আপেক্ষিকভাবে স্বাধীন বলে বিবেচনা

---

১৬৪. Ibid,pp.6-7.
১৬৫. Ibid,p.87 and, pp..94-99.
১৬৬. Islam, Nazrul (1983): "The State, Industrialization and class formation in India," The Journal of Social Studies. Vol. 20 pp.122-141.
১৬৭. Ibid, pp.132-33.
১৬৮. Ibid, p.136.

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। আলাভী অবশ্য পরবর্তী একটি প্রবন্ধে[১৬৯]এ বিষয়টি আরো স্পষ্ট করেছেন। তিনি এ প্রবন্ধে দেখিয়েছেন সামরিক-আমলাতান্ত্রিক শক্তি যদিও প্রান্তিক দেশগুলির রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে কিন্তু তাদের এ নিয়ন্ত্রণকে ন্যায্যতা প্রদান করতে প্রয়োজন হয় পার্লামেন্টের সমর্থন। সামরিক আমলাতন্ত্রের সহযোগী ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলটিই সামরিক আমলাতন্ত্রের সে সমর্থন জোগায়। পরাক্রমশালী রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে পার্লামেন্ট নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করা হয়। নির্বাচনের এ খেলায় যদি জনগণের কোন সমর্থন প্রয়োজন হয় আমলাতন্ত্রকে ব্যবহার করে সহজেই নির্বাচনের রায়টি নিজের পক্ষে নিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়। আলাভীর ভাষায়-

"The question of legitimacy infact is a crucial aspect of any state, for in the long run a state is not viable if it must resort to constant violence against the people. An ideological force is needed. Although the bureaucracy in most peripheral capitalist societies is at the core of the state power, in as much as it shapes its day to day action..., it is generally unable to legetimize itself and rule in its own name,. The role of political parties and variously elected parliamentary assemblies is to provide such legitimacy."[১৭০]

আলাভীর মতে সামরিক-আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র পারত পক্ষে নির্বাচন দিতে চায় না। সাধারণতঃ জনগণের চাপে পড়েই নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়। যদি সে নির্বাচন থেকে ইচ্ছামত ফলাফল নিশ্চিত করা অসম্ভব হয়ে ওঠে তাহলে রাষ্ট্র স্বভাবতই সামরিক শক্তি ব্যবহার করেই জনগণের চাপকে দমন করে। পরবর্তীকালে সুযোগ বুঝে নির্বাচনের খেলা শুরু হয়। নির্বাচনের ধরন সম্পর্কে বিবরণ দিতে গিয়ে আলাভী বলেন-

"Government by political parties does not, however, necessitate genuine elections or mass mobilization. It is often the case. (especially in one party system) that the "ruling party" is an empty shell, buttressed by the bureaucracy, which not only sees no need to mobilize mass support but fears it."[১৭১]

রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা প্রশ্নে আলাভী পরিষ্কার একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন সত্য, কিন্তু আরো যে সব প্রশ্ন এখানে উথাপিত হয়েছে সে সব বিষয়ে সঙ্গত কোন জবাব তিনি এ প্রবন্ধে দেননি। আমলা-কাঠামোতে যারা বিদ্যমান তাদের শ্রেণী উৎস যে রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ণয়ে বিশেষ অবদান রাখে সে বিষয়ের পক্ষেই তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। তার মতে যে শ্রেণী উৎস থেকে আমলাগণ আসে, সে শ্রেণীর প্রভাব আমলাদের মধ্যে থাকে বলেই অনেক কায়েমী স্বার্থ বিরোধী সংস্কার বাস্তবায়িত হয় না।[১৭২] কিন্তু যে সরকার এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো তার প্রজ্ঞার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ না করে আমলাদের ওপর দোষ চাপানোর কোন অর্থ হয় না। কেননা একজন আমলা ব্যক্তিগতভাবে যে কোন ধরনের মত পোষণ করতে পারে, কিন্তু তাকে যে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করে তার নীতির ব্যাপারে যদি সে দৃঢ় থাকে তাহলে উক্ত আমলা তা বাস্তবায়িত করতে বাধ্য। তবে সামরিক-আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোর সহযোগী যে সরকার, তার কোন নির্দেশ কোন আমলা তো পালন না করতেই পারে। সে কারণে তত্ত্বগতভাবে একক কোন আমলার ব্যক্তিগত মতাদর্শ রাষ্ট্রের চরিত্রকে প্রভাবিত করতে পারে বলে স্বীকার করে নেওয়া যায় না।

আলাভী রাষ্ট্রের সহযোগী তিনটি শ্রেণী সম্পের্কে যে কথা আগের প্রবন্ধে বলেছিলেন, বর্তমান প্রবন্ধে তিনি তা কিছুটা সংশোধন করেছেন। এখানে তার মতে, ভুস্বামী, দেশীয় বুর্জোয়া এবং মেট্রোপলিটান বুর্জোয়া আসলে স্বতন্ত্র তিনটি শ্রেণী নয়, বরং একই শ্রেণীর তিনটি অংশ মাত্র। ফলে এদের মধ্যে দ্বন্দ্বের কোন সুযোগ নেই; যা আছে তা প্রতিযোগিতা মাত্র। উন্নত পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজিপতি শ্রেণীর মধ্যে যেমন শিল্প পুঁজিপতি, লগ্নি পুঁজিপতি এবং বাণিজ্যিক পুঁজিপতি রয়েছে।[১৭৩] কিন্তু যে শ্রেণীটির এসব একেকটি অংশ, সেই মূল শ্রেণীটি কি তা তিনি প্রকাশ করেননি। ফলে তার তত্ত্বের এ দিকটি পরিষ্কার হয়ে ওঠেনি। অন্যদিকে, দেশীয় বুর্জোয়া কিংবা মেট্রোপলিটান বুর্জোয়া একই উৎপাদন পদ্ধতির সাথে যুক্ত, সে কারণে এদের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতামূলক সম্পর্ক থাকতে পারে; কিন্তু আলাভীর মতানুযায়ী বুর্জোয়া বিপ্লব সম্পন্ন হওয়ার পরও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ভূস্বামীর যে সম্পর্ক তা যদি অক্ষুণ্ন থেকে যায় তাহলে বিভিন্ন ধরনের বুর্জোয়াদের পারস্পরিক সম্পর্ক কিরূপ হবে, তা আলাভী স্পষ্ট করেননি। হার্টমুট এলসেনহানস্ (Hartmut Elsenhans) অবশ্য এ ব্যাপারে একটি চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি তার এক প্রবন্ধে বলেছেন, উন্নয়নশীল দেশে ভূস্বামী, দেশীয় বুর্জোয়া এবং মেট্রোপলিটান বুর্জোয়া শাসকদের এ তিনটি অংশ এমন একটি সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তোলে, যা অনেকটা একক শ্রেণীর মত মনে হয়। এলসেনহানস্ তাকে নাম দিয়েছেন State Classes বা রাষ্ট্রীয় শ্রেণীসমূহ।[১৭৪]

তৃতীয় বিশ্বে ভূস্বামীর অস্তিত্ব মানেই সেখানে ভূমির সাথে সংশ্লিষ্ট একটি খাজনা প্রদানকারী উৎপাদক শ্রেণী আছে। এলসেনহানস্ এর মতে এটা একটি প্রমাণিত সত্য যে, খাজনার ভিত্তিতে কৃষি উৎপাদন একটি অত্যন্ত স্বল্প উৎপাদনশীল উৎপাদন ব্যবস্থা, কিন্তু তা সত্ত্বেও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে তা আজও টিকে আছে কেন?[১৭৫] বিভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেনঃ এ খাতের মাধ্যমে ভূস্বামীই শুধু খাজনা ভোগ করে না, রাষ্ট্রও এ খাত থেকে উৎপাদিত কাঁচামাল বিদেশে রপ্তানি করে খাজনা হিসাবে বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। অথচ এর জন্য রাষ্ট্রকে কোন পুঁজিই বিনিয়োগ করতে হয় না। অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির জন্য এটা একটা রিজার্ভ ফান্ড। ফলে তৃতীয় বিশ্বের শাসকশ্রেণী এই পশ্চাদপদ উৎপাদন ব্যবস্থাকে শুধু অনুমোদনই করে না, এ উৎপাদন ব্যবস্থাটি রক্ষা করা তাদের জন্য প্রয়োজনীয়ও। এলসেনহানস্ এর ভাষায়-

---

১৬৯ .Alavi, Hamza(1982): "State and Class Under Peripharal Capitalism," Introduction to the Sociology of 'Developing Societies' edited by Hamza Alavi and Teodor Shanin, London.The Macmillan Press Ltd. pp. 289-307.
১৭০ .Ibid,p.305.
১৭১ .Ibid,p.305.
১৭২ .Ibid,p.300.
১৭৩ .Ibid,p.298.
১৭৪ . Elsenhans, Hartmut (1987): "Dependency, Under-development and the Third World State." Law and State. A Biaunual collection of Recent German contributions to these feild, Institute for Sceantific Co-operationn, Vol. 36, p. 77.
১৭৫ . Ibid, p.74.

Dhaka University Institutional Repository

"Rent appropriation therefore necessitates state intervention, which should result in the creation of a non-capitalist ruling class. The outcome of this possibility of appropriating rent is that a non-capitalist centralized ruling class in the underdeveloped countries controls considerable portions of the financial reserves."[১৭৬]

অন্যদিকে ভূস্বামী শ্রেণীরও এই ভূমিদাস কৃষকদের ওপর নিয়ন্ত্রণকে অব্যাহত রাখতে রাষ্ট্রকে ব্যবহার করা খুব প্রয়োজন। মেট্রোপলিটান বুর্জোয়া ও তার সহযোগী দেশীয় বুর্জোয়ার সাথে এখানেই ভূস্বামীদের ঐক্যের মূলসূত্রটি নিহিত।

আলাভী অন্য একটি ক্ষেত্রেও তার তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রের ধারণাকে অগ্রসর করেছেন। তিনি তার ধারণার সাথে পোলানৎজাস্ নব্য পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণীর (New Petty-Bourgeoisie) ধারণাটিকে যুক্ত করেছেন। অবশ্য আলাভী তাকে বেতন-ভোগী মধ্যবিত্ত হিসাবে চিত্রিত করেছেন। আলাভীর মতে এই নব্য পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীটি প্রান্তিক দেশগুলির রাজনীতিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এরা শিক্ষিত, ফলে সহজে সমাজের ভালমন্দ বুঝতে পারে। আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও সংস্কৃতির সাথে এরা পরিচিত। উন্নত বিশ্বের সাথে সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পার্থক্যটি কোথায় তা তারা সহজে ধরতে পারে এবং এ পার্থক্যের কারণও তারা অনুসন্ধান করে। ফলে নিজ সমাজে গণতন্ত্রহীনতা, অধিকারহীনতা ও আঞ্চলিক বৈষম্যের কারণ তাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে ওঠে এবং স্বাভাবিক নিয়মেই তারা এর প্রতিবাদ করে। প্রান্তিক দেশগুলিতে এই নব্য পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণী জাতীয় সংস্কৃতির পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে এবং জাতীয় সংস্কৃতিকে বাধাগ্রস্ত করছে এমন সব কিছুরই বিরোধিতা করে। অন্যদিকে, এই শ্রেণীটিই রাষ্ট্রীয় উচ্চপদ, সামরিক কর্মকর্তার পদ কিংবা মেট্রোপলিটান পুঁজির দেশীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি এদের নিয়েই পূরণ হয়।[১৭৭] ফলে এদের আশা-আকাংখা পূরণে ব্যর্থতা প্রান্তিক রাষ্ট্রসমূহের যে কোন সরকারের জন্যই বিপদজনক হতে পারে। আলাভীর মতে এরা প্রান্তিক রাষ্ট্রগুলোতে রাজনীতির ক্ষেত্রেও রাখে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। আলাভীর ভাষায়-

"Members of the educated middle class play an active and vigorous role in the politics of peripharal capitalist societies and much of the thrust of their political demands is directed toward positions of power in the state apparatus as such."[১৭৮]

এভাবে আলাভী তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্র সম্পর্কিত তার ধারণাকে পূর্ণাঙ্গ রুপ দিয়েছেন। তার পরও এ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তৃতীয় বিশ্বভূক্ত দেশ হলেই যে, সেখানে রাষ্ট্রের চরিত্র থাকবে কেন্দ্রীয়; বিষয়টিকে সেভাবে দেখা ঠিক নয়। বরং একটি দেশের সামাজিক ইতিহাসই রাষ্ট্রের চরিত্র নিরূপণের মূল উপায়। কেননা উপনিবেশোত্তর শাসনের নিগড় থেকে কি ধরনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এবং কি ধরনের মতাদর্শগত ভিত্তি সম্পন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে স্বাধীন হয়েছে তা উক্ত দেশের রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ণয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে দেখা প্রয়োজন। অবশ্য, উপনিবেশোত্তর আমলে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর বিকাশ ও তার সচেতনতার স্তরের ওপরই নির্ভর করে সে সমাজে উপনিবেশবাদ-বিরোধী রাজনীতির মতাদর্শগত অবস্থানটি কি হবে। আর সে ধরনের মতাদর্শগত অবস্থানটি শক্তিশালী থাকলে একটি দুর্বল বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষেও জাতীয় অর্থনীতিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভিত্তির ওপর দাঁড় করতে রাষ্ট্রকে ব্যবহার করাও অসম্ভব নয়। এমনকি, আন্তর্জাতিক পুঁজির সহায়তায় ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশের একটা পর্যায়ে এসে তার চরিত্রে পরিবর্তন ঘটে যাওয়াও অসম্ভব নয়।[১৭৯]

---

১৭৬. Ibid, p.76.

১৭৭. Alavi,Hamza (1982): op.cit.,pp. 299-300.

১৭৮. Ibid, pp. 299-300.

১৭৯. Sobhan, Rehman (1984): "The State and the Development of Capitalism in The Third World," in The Journal of Social Studies, vol.25, p.7.

Dhaka University Institutional Repository

৪. পশ্চিম পাকিস্তানের উৎপাদন পদ্ধতি ও সামাজিক শ্রেণী–বিভাজনের প্রকৃতি

উপনিবেশিক শক্তি ভারতীয় উপমহাদেশ দখল করার পর আদিম প্রকৃতির শোষণ প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে এখানে তার একটি সামাজিক ভিত্তি গড়ে তুলেছিল। উর্ডরাফ (Wordruff) মত প্রকাশ করেছেন সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে ঔপনিবেশিক আমলে জনসাধারণের ওপর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে নতুন শ্রেণীসমূহ আবির্ভূত হয়, সেগুলি ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রত্যক্ষ অভিভাবকত্বেই গড়ে ওঠে এবং প্রকৃত অর্থে ঔপনিবেশিক শক্তিই এই নব্য শ্রেণীসমূহ গঠনে প্রতিষ্ঠাতার ভূমিকা পালন করেছে।[১] ১৯৬৯–এর পাকিস্তানও এ ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ফলে তৎকালীন পাকিস্তানের উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে, এ পটভূমিকে এড়িয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই।

৪.১. পশ্চিম পাকিস্তানে ভূমি কাঠামোর রূপান্তর

উপনিবেশোত্তর একটি দেশ হিসাবে পাকিস্তানের অর্থনীতি ছিল প্রধানতঃ কৃষি–নির্ভর। আর কৃষি অর্থনীতিতে উৎপাদনের প্রধান উপায় হচ্ছে জমি। তাই পাকিস্তানের কৃষি–অর্থনীতি ভিত্তিক উৎপাদন পদ্ধতিকে বুঝতে হলে জমি মালিকানার ধরন, উৎপাদনে প্রযুক্তি ব্যবহার ও উৎপাদিত দ্রব্যের বন্টনের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। ১৯৬৯ সালের পাকিস্তান ছিল ভৌগোলিকভাবে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন দু'টি অঞ্চল নিয়ে গঠিত। তাই দ'ুটি অঞ্চলের উৎপাদন পদ্ধতিকে আলাদা আলাদাভাবেই আলোচনা করা হবে। তবে পাকিস্তানের দু'টি অংশই যেহেতু একই ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর অধীন ছিল, তাই এ দু'টি অঞ্চলের মাঝেও ছিল একটি মিলের দিক। ঔপনিবেশিক শাসকগণ এখানে এসেই ভূমি প্রশাসনের ক্ষেত্রে একটি নতুন কাঠামো তৈরি করে। বার্কীর (Burki) মতে, ভারতীয় উপমহাদেশের যে কোন অঞ্চলের গ্রামীণ কাঠামোর পরিবর্তনের ওপর গবেষণা করতে গেলে ভূমি কাঠামোর এই নতুন বিন্যাস থেকেই শুরু করতে হবে।[২] বেরিংটন মুর মত প্রকাশ করেছেন, ভূমি কাঠামোর এই নতুন বিন্যাসই হচ্ছে "The basis of a political and economic system in which the foreigner, the landlord, and the moneylender took the economic surplus away from the peasantry"।[৩] অর্থাৎ নতুন ভূমি বিন্যাসের ফলে গ্রামীণ সমাজের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য শুধু একটি ভূস্বামি শ্রেণীরই জন্ম হয়নি, কৃষকদের ওপর এ ভূস্বামিদের দমন–পীড়নের এমন অধিকার প্রদান করা হয়েছিল যে, এ ব্যবস্থার অধীনে থেকে কৃষকগণ দ্রুত নিঃস্বতর হয়ে পড়েছিল। আর এর অনিবার্য পরিণতি হিসাবে সারা উপমহাদেশে গড়ে ওঠেছিল একটি মহাজন শ্রেণী। পশ্চিম পাকিস্তানও এ অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। সেখানে রায়তওয়ারী ব্যবস্থা ও মহালওয়ারী ব্যবস্থার অধীনে থেকে একদিকে যেমন খোদ কৃষকগণ জমির ওপর সমস্ত অধিকার হারিয়েছিল, অন্যদিকে, ভূস্বামিদের দফায় দফায় খাজনা বৃদ্ধির যাঁতাকলে পড়ে তারা নিঃস্বতর হয়ে পড়েছিল। এ সুযোগে এখানকার গ্রামীণ সমাজে মহাজনদের প্রভাব–প্রতিপত্তি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল।[৪] পশ্চিম পাকিস্তান যে অঞ্চল নিয়ে গঠিত সেখানে এব্যবস্থার প্রভাব হ্রাস করার লক্ষ্যে ১৯০১ সালে একটি আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল বটে,[৫] তবে মহাজনী ব্যবস্থা বিলুপ্ত হওয়ার মত কোন বস্তুগত ভিত্তি সেখানে গড়ে ওঠেনি। বর্তমান শতকের পঞ্চাশের দশক পর্যন্তও সেখানে গুটিকয়েক ভূস্বামির মালিকানায় অধিকাংশ জমি রয়ে গিয়েছিল, অথবা দরিদ্র কৃষকগণ যাতে নিঃস্ব না হয় তার জন্য তখনও পর্যন্ত কোন আর্থিক সহায়তা তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছেনি।[৬]

১৯৪৭ সালে যখন এ উপমহাদেশে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটে তখন পাকিস্তানের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক শূণ্যতাকে পূরণ করে মূলতঃ ভূমি অভিজাতবর্গ। কেননা, মুসলিম লীগ নামে যে দলটি এখানে ক্ষমতাসীন হয়, সে দলের নেতৃত্বের একটি বড় অংশই দখল করেছিল এ ভূমি অভিজাতবর্গ। খালিদ–বিন–সাইয়িদ দেখিয়েছেন, স্বাধীনতা লাভের সময় পাকিস্তান মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির ৫০৩ জন সদস্যের মধ্যে ১৬৩ জনই ছিল এই ভূমি অভিজাত শ্রেণীর লোক।[৭] বলাবাহুল্য, এ ভূমি অভিজাতবর্গের অধিকাংশই ছিল পাঞ্জাব ও সিন্ধুর বড় বড় এস্টেটের মালিক। মুসলিম লীগের সভাপতি মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ছিলেন শহরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত একজন ব্যক্তি। তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের প্রাক্কালে আইনজীবী, শিক্ষক ও চিকিৎসকসহ বিভিন্ন পেশাজীবীদের নিয়ে উক্ত ভূস্বামিদের ক্ষমতাকে মোকাবিলা করার মত মধ্যবিত্তদের একটি শক্তিশালী ক্ষমতা কেন্দ্র গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন, কিন্তু যে সব এলাকার মুসলমানরা তুলনামূলকভাবে অধিক হারে শহরে বসবাস করতো, সেসব এলাকা ছিল প্রধানতঃ হিন্দু প্রধান।[৮] ফলে যে অঞ্চলে মুসলিম মধ্যবিত্তদের পক্ষ থেকে ভূস্বামিদের ক্ষমতাকে মোকাবিলার সম্ভাবনা ছিল সে সব এলাকা দেশ বিভাগের সময় ভারতের ভাগে পড়ে। বিপুল সংখ্যক

---

১. ফিলিপ উর্ডরাফ তার গ্রন্থের (১৯৫৪) যে অধ্যায়ে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস বিকাশের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন, সেখানে তিনি 'Founders', এবং 'Guardias'. শিরোনামে দু'টি উপ–অধ্যায়ের সংযোজন ঘটিয়েছেন। এখানে তিনি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন সিভিল সার্ভেন্টদের মাধ্যমে কিভাবে ঔপনিবেশিক শক্তি এ উপমহাদেশে বিভিন্ন নব্য শ্রেণী সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাতার ভূমিকা পালন করে। এখান থেকে এটাও খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, দেশের সাধারণ মানুষের ওপর অর্থনৈতিক শোষণ প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার মত যোগ্যতাসম্পন্ন শ্রেণী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কিভাবে অভিভাবকের ভূমিকা পালন করেছিল। দেখুন
Wordruff, Philip (1954) : *The Men who Ruled India:* The Guardians. London: Jonathan Cape.

২. Burki, Shahid Javed (1976): "The Development of Pakistan's Agriculture: An Interdisciplinary Explanation", in *Rural Development in Bangladesh and Pakistan,* Edited by Stevens, Robert D. et al., Honolulu : An East Center Book . p. 299.

৩. Moore, Berrington (1966) : Social Origins of Dietatership and Democracy, Boston: Beacon Press. p. 344.

৪. রহমান, আতিউর ও লেনিন আজাদ (১৯৯০) : ভাষা–আন্দোলনঃ অর্থনৈতিক পটভূমি, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড; পৃঃ১৭ ।

৫. Burki, *op. cit.* p.199

৬. Ibid, p.301.

৭. Sayeed, Khalid B.(1968) : *Pakistan: The Formative Phase, 1857-1948,* London: Oxford University Press. p. 207.

৮. Hazelhurst, Leighton W. (1966): Enterpreneurship and the Merchant Castes in the Punjab City,. Durham: Commonwealth Studeis Center, Duke University, pp.11-15.

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম মধ্যবিত্ত নাগরিক পাকিস্তানে চলে আসা সত্ত্বেও, তারা প্রায় কোন এলাকাতেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। ফলে এ মধ্যবিত্ত শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভূমি আভিজাত শ্রেণীর ক্ষমতাকে প্রতিরোধ করার মত শক্তি অর্জন করতে পারেনি।[৯] বস্তুত, দেশ বিভাগের পর পরই এ ভূমি আভিজাতবর্গ শুধু কৃষকদের ওপর অর্থনৈতিক আধিপত্যই প্রতিষ্ঠা করেনি, দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎসগুলিও তাদের দখলে চলে যায়। বার্কী এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, "Thus, a year after the emergence of Pakistan as an independent state, the landed aristocracy found itself not only in full control of the economic surplus generated by the peasantry, but also in charge of the country's political apparatus."[১০]

ফলে, স্বাধীনতা লাভের পর ঔপনিবেশিক আমলে গঠিত ভূমি কাঠামোর কোন পরিবর্তন ঘটেনি, বরং পশ্চিম পাকিস্তানের গ্রামীণ অর্থনীতি ও রাজনীতির ওপর ভূমি অভিজাতবর্গের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৯ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের ভূমি সংস্কার কমিশন রিপোর্ট থেকে দেখা যায়, পাঞ্জাবে মাত্র ১০০০টি ভূমি অভিজাত পরিবার মোট চাষযোগ্য জমির শতকরা ১০.৩ ভাগ দখল করে ছিল। এ ভূমি ভিজাতবর্গের প্রত্যেকের মালিকানাধীন জমির পরিমাণ ছিল কমপক্ষে ৫০০ একর এবং এদের খামারের গড় আয়তন ছিল ২,২৯৫ একর।[১১] উত্তর–পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধুতে এ ভূমি অভিজাতদের ভূমির ওপর আধিপত্য ছিল আরো অধিক। উত্তর–পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এ ভূমি অভিজাত শ্রেণীর মালিকানায় মোট চাষযোগ্য জমির শতকরা ১২.৫ ভাগ ছিল; আর সিন্ধু প্রদেশে এ শ্রেণীর মালিকানায় ছিল শতকরা ৩০ ভাগ জমি।[১২]

পশ্চিম পাকিস্তানের মোট চাষযোগ্য জমির শতকরা ৫৯.৪২ ভাগই সে সময় পাঞ্জাব প্রদেশে ছিল।[১৩] ফলে পাঞ্জাবের ভূমি কাঠামোর চিত্রটি তুলে ধরলে পশ্চিম পাকিস্তানের গ্রামীণ সমাজের চিত্রটি আরোও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

সারণি–৪.১
১৯৪৯ সালে পাঞ্জাবে ভূমি মালিকানার ধরন

খামারের আয়তন (একর)	একর		মালিকের সংখ্যা	
	হাজার	শতকরা হার	হাজার	শতকরা হার
১০ একরের কম	৭,০৯২	৩১.৪	১,৮০৯	৭৮.৭
১০ থেকে ৯৯ একর	১০,৪২৮	৪৬.৭৪	৭৬	২০.৭
১০০ –৪৯৯ একর	২,৫০২	১১.২	১২	০.৫
৫০০ একর ও তার ওপরে	২,২৯৫	১০.৩	১	০.১
মোট	২২,৩১৭	১০০.০	২,২৯৮	১০০.০

সূত্রঃ Government of Pakistan 1959.[১৪]

এ তথ্য থেকে দেখা যায়, পাঞ্জাবের মাত্র শতকরা ০.৬ ভাগ খামার মালিক প্রদেশের শতকরা ২১.৫ ভাগ জমিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। অন্যদিকে, শতকরা ৭৮.৭ ভাগ খামার মালিক নিয়ন্ত্রণ করছে মাত্র শতকরা ৩১.৪ ভাগ জমি। অর্থাৎ পাঞ্জাবের ক্ষেত্রেও সংখ্যার দিক থেকে অতি ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠী তথা ভূমি অভিজাত ও জোতদার পরিবারগুলিই সেখানকার গ্রামীণ সমাজের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। সমাজের ওপর এদের আধিপত্য কতটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা ১৯৫১ সালের পাঞ্জাবের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য করলে বিশেষভাবে ফুটে ওঠে। এ নির্বাচনে ভূমি অভিজাত শ্রেণীটি শতকরা ৮০টি আসন লাভ করে। এ সংখ্যার ভিতর জোতদারগণ (অর্থাৎ যাদের জমির পরিমাণ ১০০–৫০০ একর) যে আসনগুলি দখল করে তা ধরা হয়নি। সিন্ধুতে এই ভূমি অভিজাতগণ ১৯৫৩ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে শতকরা ৯০ ভাগ আসন লাভ করে। উত্তর–পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও এরা প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন দখল করে।[১৫] অর্থাৎ সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানের গ্রামীণ অর্থনীতিতে তো বটেই, এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিতেও তাদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত প্রবল। আর সে কারণেই মুসলিম লীগের ভূমি সংস্কার কমিটি ১৯৪৯ সালে ভূমি মালিকানার প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করার লক্ষ্যে যে সুপারিশমালা প্রদান করে তা মুসলিম লীগ শাসন আমলে এতটুকুও কার্যকরী হতে পারেনি। শুধু মুসলিম লীগ শাসন আমলেই নয়, আইয়ুব আমলেও ভূমি সংস্কারের জন্য বড় বড় অনেক কথা বলা হলেও এমন কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয়নি যাতে এই ভূমি অভিজাতবর্গের স্বার্থ মৌলিকভাবে ক্ষুণ্ণ হতে পারে। মাহমুদ হাসান খান ঠিকই বলেছেন, "Under the Ayub Khan Goverment, ...the political system created no new pressures which the landed elite could not successfully resist".[১৬]

আর সে কারণেই ১৯৫৯ সালের সামরিক আইনের ৬৪ নম্বর ধারা অনুসারে যে ভূমি সংস্কার হয়েছিল,[১৭] তা পরবর্তী ১০ বছরের মধ্যেও কার্যকরী হয়নি। কেননা, ভূমি সংস্কারের ফলে সম্ভাব্য যে জমি সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনার কথা ছিল, তা ভূমিহীন বা প্রায় ভূমিহীনদের মাঝে বন্টনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়; কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে ভূমিহীনদের জন্য প্রথমে এমন কোন সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়নি, যার মাধ্যমে সরকারের কাছে ভূমি অভিজাতদের প্রদত্ত জমির ওপর তারা দখল প্রতিষ্ঠা করতে পারে।[১৮] সরকারের আইন

৯. Burki, *op. cit*, pp. 299-300.
১০. Burki, *Ibid*, p.300.
১১. Burki, *ibid* 301.
১২. Government of West Pakistan (1959): *Report of the Land Reform Commission*, Lahore: Government Printing, Government of West Pakistan. p:13.
১৩. Arnald . F.B et al, (1955): Pakistan: Economic and Commercial Conditions in Pakistan, 1954, London: Her Majesty's Stationery Office, p: 142.
১৪ বার্কী উক্ত সূত্র থেকে সংগ্রহ ও সংকলণ করে বর্তমান আকারে তার প্রবন্ধে ব্যবহার করেছেন Burki, Ibid,p. 301.
১৫. Maniruzzaman, Talukder, (1966): "Group Interests in Pakistan's Politics" *Pacific Reviw*, Vol.39, p.86.
১৬. Khan, Mahmood Hasan (1981) : *Underdevelopment and Agrarian Strueture in Pakistan*, Boulder, Colorado: Westview Press. p. 150.
১৭. Government of Pakistan (1964): *Economic Survey, 1962-1963*, Rawalpindi: Ministry of Finance, Government of Pakistan, P. 33.
১৮. Khan, *op.cit*, p.180.

Dhaka University Institutional Repository

অনুযায়ী একজন ভূমিহীনকে জমি পেতে হলে নিজে যে একজন ভূমিহীন– এ মর্মে কোর্ট থেকে একটি ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হ'ত। এ ছাড়পত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে সরকারের যেমন কোন আর্থিক কিংবা আইনগত সহায়তা প্রদানের কোন কর্মসূচী ছিল না, অন্যদিকে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় যাতে কোন ভূমিহীন এ কাজটি না করতে পারে সে জন্য ভূমি অভিজাতবর্গ যথেচ্ছভাবে তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতো। এ ব্যাপারে সরকারের কোন মাথা ব্যথাই ছিল না।[১৯]

সামরিক সরকার ১৯৫৯ সালে ভূমি সংস্কারের যে আইন পাস করে তাতে পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর–পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মোট ৯০২ জন ভূমি অভিজাত তাদের উদ্বৃত্ত জমির মালিকানা সরকারের কাছে হস্তান্তর করে। এ ভূমি অভিজাতগণ প্রত্যেকে এত বিশাল বিশাল এস্টেটের মালিক ছিল যে, এদের খামারের গড় আয়তন ছিল ১১,২৮০ একর। আর এদের মধ্যে এমন একজনও ছিল না যার অত্যন্ত উন্নত সেচ সমৃদ্ধ জমির পরিমাণ ৮৫০ একরের কম ছিল।[২০] এ থেকেই বোঝা যায় তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল কত ব্যাপক। বারকী দেখিয়েছেন, পাঞ্জাবের গ্রামগুলিতে গড়ে ৬০০ একর করে জমি আছে। যদি কোন ভূমি অভিজাতের সমস্ত জমি অবিচ্ছিন্ন একটি এলাকায় থাকে তাহলেও তার অন্ততঃ ২০টি গ্রামের ওপর আধিপত্য থাকে। কিন্তু প্রায় কোন ভূমি অভিজাতেরই জমি অবিছিন্ন ছিল না। সমস্ত এলাকাতেই বিভিন্ন শ্রেণীর খামার মালিকের আস্তিত্ব ছিল এবং ভূমি অভিজাতদের জমি একেকটি বিশাল এলাকায় বিস্তৃত ছিল। অর্থাৎ এসব ভূমি অভিজাতদের প্রত্যেকের ৫০ থেকে ১০০টি গ্রামের ওপর আধিপত্য ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে যে সব ভূমি অভিজাত রাজনৈতিকভাবে কিছুটা সক্রিয় ছিল, তাদের এই বিশাল জমি মালিকানার সুবাদেই কয়েক শ' গ্রামের ওপর আধিপত্য ছিল। তাছাড়া, এরা শুধু জমির মালিকই ছিল তা নয়, এরা প্রত্যেকে ছিল গ্রাম–প্রধান, প্রধান বিচারক ও মহাজন, এবং সর্বোপরি, এরা ছিল প্রত্যেকটি এলাকার খুবই প্রভাবশালী ব্যক্তি। ফলে এই বিশাল ভূ–সম্পত্তির অধিকারী প্রভাবশালী ভূমি অভিজাতদেরকে আইয়ুব সরকারের পক্ষে অবহেলা করা সম্ভব ছিল না। আর তাইতো, যে ৯০২ জন ভূমি অভিজাত ১৯৫৯ সালের পর তাদের জমির একটি অংশকে সরকারের কাছে হস্তান্তর করেছিল, তাদের মধ্যে ১০৮ জন তথা শতকরা ১২ জনই আইয়ুবের কেন্দ্রীয় সরকার কিংবা পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর–পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সরকারগুলির মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিল।[২১] যে শ্রেণীটি সমাজের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে এতটা ক্ষমতা ধারণ করতে সক্ষম, সে শ্রেণীর স্বার্থ ক্ষুন্ন হবার মত এমন কোন পদক্ষেপ ততদিন পর্যন্ত আইয়ুব সরকারের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি, যতদিন পর্যন্ত সমাজে পাল্টা কোন শ্রেণীর বিকাশ ঘটেনি। ১৯৬৭ সালেই কার্যত প্রথম এ জমিকে ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বন্টন করা শুরু হয়।[২২] ততদিনে, আইয়ুবের 'সবুজ বিপ্লবের' বদৌলতে গ্রামে একটি শক্তিশালী ধনি কৃষক শ্রেণী এবং শহরে একটি পুঁজিপতি ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠেছে।

আইয়ুব সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে বেশ কিছু 'গুরুত্বপূর্ণ' ঘোষণার পর উপলব্ধি করে যে, তা পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকার বিশাল বিশাল ভূমি অভিজাতদের দ্বারা পরিবৃত্ত হয়ে পড়েছে; এই ভূমি অভিজাত শ্রেণীটি তাদের একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ভিত্তির কারণেই আইয়ুবের সামরিক আমলাতান্ত্রিক স্বৈরাচারকে বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নিতে রাজি ছিলনা। অন্যদিকে, এই শ্রেণীটি ঐতিহাসিক কারণেই উৎপাদনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল না, উপরন্তু এরা গ্রামেও বসবাস করতো না। ফলে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার তথা কৃষকদের ওপর স্থায়ীভাবে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য এ ভূমি অভিজাত শ্রেণীটি তেমন নির্ভরযোগ্য নয়। বরং আইয়ুবের সামরিক সরকারের জন্য এমন একটি শ্রেণী প্রয়োজন হয়ে পড়ল, যে শ্রেণীটি সরাসরি উৎপাদনের সাথে যুক্ত থাক অথবা না থাক অন্তত গ্রামে বাস করবে, গ্রামের সাধারণ মানুষের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম এবং তারা সংখ্যায়ও নিতান্ত কম নয়। এসব দিক থেকে গ্রামীণ মাঝারি ভূস্বামিই ছিল এরকম একটি শ্রেণী।[২৩] এ শ্রেণীটি সম্মিলিতভাবে, ভূমি অভিজাতদের তুলনায় অধিক পরিমাণ অর্থনৈতিক ক্ষমতা ধারণা করে। সেই সাথে, ভূমি অভিজাত শ্রেণীর হাত থেকে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার একাংশ এ শ্রেণীর হাতে হস্তান্তরিত করার লক্ষ্যে আইয়ুব ১৯৫৯ সালের অক্টোবরে 'মৌলিক গণতন্ত্র' নামে নতুন একটি ব্যবস্থার পত্তন ঘটান।[২৪] এই মাঝারি ভূস্বামিদের পক্ষে আনার লক্ষ্যে আইয়ুব সরকার তাদেরকে নানা ধরনের সুযোগ–সুবিধা প্রদানের ঘোষণা দেন। এর ফলাফল হিসাবে দেখা যায়, ১৯৫৯ সালের মৌলিক গণতন্ত্র নির্বাচনে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মাঝারি গ্রামীণ ভূস্বামি মৌলিক গণতন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত হন।[২৫] এক সময় এ শ্রেণীটির, বেসামরিক আমলাতন্ত্রের ওপর তেমন কোন প্রভাব ছিল না, কিন্তু আইয়ুবের আমলে এসে তারা সেই আমলাতন্ত্রের সহযোগিতার ওপর ভিত্তি করেই সংগঠিত হওয়ার সুযোগ পায়।[২৬]

সন্দেহ নেই, এই মাঝারি ভূস্বামিগণ প্রত্যেকে যে পরিমাণ সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা ধারণ করতো, ভূমিঅভিজাত শ্রেণীর যে কোন ব্যক্তির সাথে তার কোন তুলনা হয়না, তবে শ্রেণীগতভাবে পরবর্তীকালে যে এরা একটি বিশেষ অবস্থান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল, তার জন্য একটি দীর্ঘ বন্ধুর পথ তাদের অতিক্রম করতে হয়েছিল। আইয়ুব সরকারের নীতিগত সমর্থন যে শ্রেণীটির পক্ষে ছিল না তা নয়, তাদের বিকাশের ক্ষেত্রে একটি অনুকূল বাস্তবতাও বিরাজ করেছিল। তবে আইয়ুব সরকারের ভূমি সংস্কার আইন আর মৌলিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই ভূমিঅভিজাতদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ থেকে এই মাঝারি ভূস্বামিদেরকে মুক্ত করে। কেননা, ১৯৫৯ সালের ভূমিসংস্কারের ফলে যদিও দরিদ্র বা ভূমিহীন কৃষকগণ তেমন কোন জমি পায়নি, বিভিন্ন ধরনের বৈধ ও অবৈধ পথে ভূমি

---

১৯. Ibid, p.180.
২০. Burki, *op.cit*, p:302
২১. Ibid, p.302.
২২. Perry, Douglas H. (1981).'Book Review on Mahmaood Hassain Khan (1981), *op.cit*, in The Pakistan Development Review, Vol xx,No.4, p. 467.
২৩. Burki, *op.cit*, p.307.
২৪. Ibid, p.307.
২৫. Burki, Shahid Javed (1971): "Interest Group Involvement in West Pakistan's Rural Works Program", *Public Policy* , No.19, pp. 178-79.
২৬. Burki, Shahid Javed (1969): "Twenty Years of Civil Service of Pakistan", Asian Sarvey No. 9. pp.250-51.

Dhaka University Institutional Repository

অভিজাতদের আত্মীয়-স্বজন ও নিকটস্থ কায়ো নামে জমিগুলি স্থানান্তরিত হয়েছে।[২৭] কিন্তু এ ভূমি সংস্কারের ফলে অন্ততঃ কৃষকদের উপর থেকে ভূমি অভিজাতদের প্রত্যক্ষ জায়গিরদারী ও মধ্যস্বত্ব ভোগী স্বার্থের অবসান ঘটেছে। ১৯৫৯ সালে ভূমি সংস্কার আইনে জায়গিরদারী ও মধ্যস্বত্ব ভোগী ব্যবস্থার বিলোপ ঘটানো হয়।[২৮] আর সে কারণেই ৯০২ জন ভূমি অভিজাত তাদের জায়গিরদারী ও মধ্যেস্বত্ব ভোগী স্বার্থকে সরকারের কাছে হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়। এসব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মাঝারি ভূস্বামিদের জন্য যে অনুকূল অবস্থা তৈরি হয়, তার প্রধান দু'টি দিক হচ্ছেঃ (১) এই প্রথম তারা ভূমিঅভিজাতদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি পায়; (২) এ মাঝারি ভূস্বামিগণ বিপুল পরিমাণ জমির মালিক ছিল। এ দু'টি অনুকূল অবস্থার সাথে বাড়তি সুযোগ সৃষ্টি হয় মৌলক গণতান্ত্রিক নির্বাচনে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে। এভাবেই পশ্চিম পাকিস্তানের গ্রামীণ অর্থনীতি ও সমাজে মাঝারি ভূস্বামিদের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান গ্রহণের ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়। মাঝারি ভূস্বামি বলতে কাদেরকে বোঝানো হচ্ছে সে ব্যাপারটি এ পর্যায়ে পরিষ্কার করে নেওয়া প্রয়াজন।

১৯৫৯ সালের ভূমি সংস্কার আইনে একদিকে যেমন ইজারাদারী ও মধ্যস্বত্ব ভোগী ব্যবস্থার অবসান ঘটানো হয়, তেমনই বলা হয়, যে সকল ভূস্বামিদের সেচের অধীন জমি ৫০০ একরের বেশি কিংবা সেচ-বহির্ভূত জমি ১০০০ একরের ওপরে আছে তাদের অতিরিক্ত জমিকে সরকারের আওতায় আনা হবে।[২৯] ভূমি অভিজাতগণ তাদের অতিরিক্ত জমি প্রত্যাহার করার ফলেই যে মাঝারি ভূস্বামি হয়ে গেল এমন নয়, বরং অর্থনৈতিক সামর্থ্যের বিবেচনায় যে ভূস্বামিগণ গ্রামে থাকতে বাধ্য হয় এবং নিজের তত্ত্বাবধানে চাষাবাদ করে এরকম শ্রেণীকেই মাঝারি ভূস্বামি হিসাবে বিবেচনা করা চলে। বার্কী এই মাঝারি ভূস্বামি বলতে যাদের ৫০ একর থেকে ১০০ একরের মধ্যে জমি আছে তাদেরকে বুঝিয়েছেন।[৩০] এভাবে জমি মালিকানার সীমা নির্ধারণ না করে বরং গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম যে শ্রেণীটি গ্রামে অবস্থান করে এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত সেই শ্রেণীকেই মাঝারি ভূস্বামি বলা অধিকতর যুক্তিসংগত। কেননা আইয়ুব সরকার তার বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে গ্রামীণ বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল। ফলে, একটি সীমার মধ্যে এশ্রেণীকে আবদ্ধ করার কোন যৌক্তিকতা নেই।

পাকিস্তানে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে কৃষি উৎপাদকদের জন্য যে অর্থনৈতিক সুবিধা ও ভর্তুকি প্রদান করা হয়েছে সেদিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, কৃষিউৎপাদনের সাথে জড়িত গ্রামীণ বৃহৎ ভূস্বামিদের জন্যই বেশি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ যে যত বেশি পরিমাণ জমিকে চাষের আওতায় আনতে পারবে, সেই হবে তত বেশি লাভবান। অবশ্য, এখানে বৃহৎ ভূস্বামি বলতে ভূমি অভিজাতগণকে বোঝানো হচ্ছে না। বরং কৃষিজ উৎপাদনের সাথে যুক্ত ভূস্বামীদের বোঝানো হচ্ছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গম উৎপাদকদের গমের দাম নিশ্চিত করা হয়েছে, রাসায়নিক সার, উন্নত বীজ, নলকূপ ও কলের লাঙ্গলসহ বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি এবং যান্ত্রিক চাষাবাদের জন্য প্রয়াজনীয় বিভিন্ন উপাদানের উপর ভর্তুকি প্রদানের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে।[৩১] দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে এসব পদক্ষেপের ব্যাপক ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পড়লেও সেচ সুবিধা প্রদানের জন্য ব্যবহৃত যান্ত্রিক নলকূপের জন্য পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি; ফলে অধিক মূল্যে জ্বালানি সংগ্রহ করতে হয়েছে কৃষকদের। এ অসুবিধা দূর করার জন্য পাকিস্তানের তৃতীয় পরিকল্পনাতে ব্যাপক সংখ্যক বিদ্যুৎ সংযোগের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং স্বল্প মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে গৃহীত লক্ষ্যের চেয়েও অধিক হারে বিদ্যুৎ সংযোগ কর্মসূচী কার্যকরী করা হয়।[৩২] রাসায়নিক সার যাতে কৃষি উৎপাদকগণ স্বল্প মূল্যে পেতে পারে সে জন্য বিদেশ থেকে আমদানি করা সারের ওপর বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি প্রদান করা হয়। এজন্য সরকারকে বার্ষিক ২ কোটি মার্কিন ডলার ক্ষতি স্বীকার করতে হয়।[৩৩] গম উৎপাদকগণ যাতে গমের ন্যায্যমূল্য পায় তার জন্য বাজার মূল্য অপেক্ষাও শতকরা ১৩ ভাগ বেশি দামে গম ক্রয় করার নিশ্চয়তা দেয়া হয়। ১৯৬৭ সালে যখন গমের গড় বাজার মূল্য চলছিল প্রতি মণ ১৫ টাকা, ঠিক সে সময় গমের সর্বনিম্ন সরকারী ক্রয়মূল্য বেঁধে দেওয়া হয় ১৭ টাকায়। এজন্যও সরকারকে ১ কোটি মার্কিন ডলার ক্ষতি স্বীকার করতে হয়।[৩৪] এসব পদক্ষেপের কারণেই পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষি উৎপাদন দারুণভাবে বেড়ে যায়। পঞ্চাশের দশকে যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষি উৎপাদনের বার্ষিক অগ্রগতির হার ছিল মাত্র শতকরা ১.৩ ভাগ, সেখানে ষাটের দশকে এসে অগ্রগতির হার দাঁড়ায় শতকরা ৪.৫ ভাগে। খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ অগ্রগতির হার ছিল আরো বেশি, শতকরা ৫.৪ ভাগ। ১৯৬৫-৭০ এই পাঁচ বছরে পশ্চিম পাকিস্তানে গম ও ধান উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ৭৫ ভাগ বেড়ে যায়, অর্থাৎ তৃতীয় পরিকল্পনাকালে গম ও ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে অগ্রগতির হার ছিল বার্ষিক শতকরা ১৫ ভাগ।[৩৫] কৃষিক্ষেত্রে এই ব্যাপক অগ্রগতির ফলে একদিকে উৎপাদন পদ্ধতিতে যেমন বেশ পরিবর্তন এসেছে, তেমনি ভূমি সংস্কার ছাড়াও উৎপাদন পদ্ধতিতে পরিবর্তনের প্রতিফলন হিসাবে জমি মালিকানার ধরনেও বেশ পরিবর্তন এসেছে। অবশ্য পরিবর্তনের এ ধরনকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল তথ্যের স্বল্পতা। ১৯৪৯ সালের পরবর্তী ২০ বছরের মধ্যে এ সম্পর্কেঃ ব্যাপক কোন জরিপ কাজ পরিচালনা করা হয়নি। মাহমুদ হাসান খান ১৯৭২ সালে পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের, বিভিন্ন সরকারী অফিস থেকে যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন মূলত সেসবের ওপর ভিত্তি করেই পরিবর্তনের ধরনকে চিহ্নিত করা সম্ভব।

---

২৭. Khan, Mahmood Hasan (1985): Lectures on Agrarian Transformation in Pakistan, Islamabad: Pakistan Institute of Development Economics. p.42.

২৮. Government of Pakistan (1960): The Second Five Year Plan (1960-65), Government of Pakistan; Planning Commission, pp. 184-85. Article No.192.

২৯. *Ibid*, P.184.

৩০. Burki; (1976),*op.cit*, p. 307.

৩১. Government of Pakistan (1960): *op cit*, pp. 143-44, Article No. 45,47.

৩২. Hasan, Parvez (1976): "Agricultural Growth and Planning in the 1960's", Rural Development in Bangladesh and Pakistan, Edited by Robert D, Stevens *et.al*, pp. 234-35.

৩৩. *Ibid*, p.239.

৩৪. *Ibid*, p. 236.

৩৫. *Ibid*, p.232.

Dhaka University Institutional Repository

৪.২ নং সারণি থেকে দেখা যায়, পশ্চিম পাকিস্তানে আবাদযোগ্য মোট জমির পরিমাণ ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ ৮ হাজার একর। এর মধ্যে পাঞ্জাবে শতকরা ৫৯.৪২ ভাগ, সিন্ধুতে শতকরা ৩০.০৪ ভাগ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে শতকরা ৭.৫১ ভাগ এবং বেলুচিস্তানে শতকরা ৩.০৩ ভাগ। উপরোক্ত সারণিটি যে সকল তথ্যের ওপর নির্ভর করে তৈরি করা হয়েছে তাতে পাঞ্জাব ও সিন্ধুর দু'সময়ের তথ্য পাওয়া গেলেও বেলুচিস্তানের কোন সময়েরই শ্রেণীগত তথ্য পাওয়া যায়নি। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ১৯৫০ -এর তথ্য পাওয়া গেলেও ১৯৭১ সালের তথ্য পাওয়া যায়নি। এসব সত্ত্বেও, শতকরা ৯০ ভাগ জমির বিতরণ ব্যবস্থা সম্পর্কিত পরিপূর্ণ তথ্য এখানে আছে। উপরোক্ত সারণিতে খামারগুলিকে প্রধান চার ভাগে ভাগ করা হয়েছেঃ প্রান্তিক খামার (৫ একরের নিচে), ছোট খামার (৫-২৫ একর), মাঝারি খামার (২৫-১০০ একর), বড় খামার (১০০ একরের ওপরে)। বড় খামার থেকে অতিবড় খামার (যাদের জমি ৫০০ একরের ওপরে) বলে আরো একটি শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে, তবে এদের সম্পর্কে ১৯৭১ সালের তথ্য পর্যাপ্ত নয়।

উপরোক্ত সারণি থেকে দেখা যায়, ১৯৫০ সালে খামারগুলির মধ্যে শতকরা ৬৪.৪ ভাগ খামারই ছিল প্রান্তিক খামার। এবং এদের হাতে যে জমি ছিল তা মোট চাষযোগ্য জমির মাত্র শতকরা ১৫.৩ ভাগ। সে সময় ছোট খামারের সংখ্যা ছিল মোট খামারের শতকরা ২৮.৭ ভাগ এবং এদের আওতায় ছিল মোট জমির শতকরা ৩১.৭ ভাগ। মাঝারি খামারের সংখ্যা সে সময় ছিল মাত্র শতকরা ৫.৭ ভাগ এবং এদের অধীনে জমি ছিল শতকরা ২১.৮ ভাগ। সে সময় পশ্চিম পাকিস্তানে বড় খামার ছিল মোট খামার সংখ্যার মাত্র শতকরা ২.১ ভাগ, আর এদের আওতায় সে সময় জমি ছিল মোট জমির শতকরা ৩১.২ ভাগ, এ বড় খামারগুলির মধ্যেও যাদের খামারগুলি খুব বেশি রকমের বড় ছিল তাদের সংখ্যা ছিল মোট খামারের অধীনে মাত্র ০.১ ভাগ অথচ এদের হাতে ছিল শতকরা ১৫.৪ ভাগ পরিমাণ জমি। অর্থাৎ ১৯৫০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের শতকরা ৬৪.৪ ভাগ খামারের অধীনে যে পরিমাণ জমি ছিল, তার থেকে অধিক পরিমাণ জমি ছিল মাত্র শতকরা ০.১ ভাগ খামারের অধীনে। এ অবস্থার পরিবর্তন পরবর্তী ২০ বছরেও তেমন ঘটেনি, তবে বিভিন্ন সময় ভূমি সংস্কারের প্রশ্ন আসার ফলে বড় বড় ভূস্বামিগণ তাদের মালিকানাধীন জমিকে বিভিন্ন নামে পরিবর্তন করে ফেলে। কেননা, ভূস্বামি বা ভূমি অভিজাতদের জমি অন্য কারো নামে স্থানান্তর করা যাবে না বলে কিছু নির্দেশ থাকলেও তা প্রায় মোটেই কার্যকরী হয়নি, কেননা ১৯৫০ সালের হিসাব থেকে দেখা যায়, একমাত্র পাঞ্জাবেই ২,২৯৫জন ভূমি অভিজাত ছিল, অথচ এরা সংখ্যায় মোট খামারের মাত্র ০.১ ভাগ ছিল। সিন্ধুতে এদের সংখ্যা ছিল শতকরা ০.৯ ভাগ, ফলে এখানে এদের সংখ্যা ছিল অন্ততঃ ১০ হাজার। সব মিলিয়ে ভূমি অভিজাত বা অতিবড় খামারের সংখ্যা সে সময় অন্তত ১৫ হাজার ছিল, অথচ মাত্র ৯০২ জন ভূমি অভিজাতের মালিকানাধীন জমির একটি অংশ সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। আর যে জমি হস্তান্তর করেছে তার পরিমাণ যেমন অত্যন্ত কম এবং তেমনই প্রায় অর্ধেক জমিই অনাবাদী। যাহোক, বিভিন্ন নামে-বেনামে ভূমি অভিজাতদের জমি নিজ শ্রেণীর মধ্যেই রয়ে যায়, কিন্তু আইনগতভাবে ১৯৭১ সাল নাগাদ ৫০০ একরের ওপর কারো জমি থাকার বিধান ছিল না। আর সে কারণেই ১৯৭১ সালের যে হিসাব ২নং সারণিতে দেওয়া হয়েছে তাতে অতিবড় খামারের কোন তথ্য নেই। অন্যদিকে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তানের তথ্য না থাকার কারণে গোটা পাকিস্তানের চিত্র এখানে পাওয়া যাবে না, তবে শতকরা ৯০ ভাগ জমি যে দু'টি প্রদেশে সেই পাঞ্জাব ও সিন্ধুর দু'সময়ের তথ্যই এখানে আছে।

১৯৫০ সালের হিসাব থেকে দেখা যায়, পাঞ্জাবে প্রান্তিক খামার সংখ্যা মোট খামারের শতকরা ৬৬.৩ ভাগ এবং তাদের অধীনে জমির পরিমাণ ছিল শতকরা ১৫.৭ ভাগ। আর ১৯৭১ সালে এ শ্রেণীর খামার সংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৬০.৪ ভাগে এবং জমির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০.৬ ভাগে। এ সময়ে ১১ লক্ষ ৯৩ হাজার একর জমি ভূমিহীন বা প্রায় ভূমিহীনদের মাঝে বিতরণ করার প্রত্যক্ষ ফল এটা; কেননা যে ভূমিহীনদের জমি দেয়া হয়েছিল তারা যেমন একদিকে ছিল প্রান্তিক কৃষকদের নিচের অংশের, আবার অন্যদিকে, তাদের প্রত্যেককে ৬ একর করে জমি দেওয়াতে তাঁদের শ্রেণী অবস্থান পরিবর্তিত হয়ে ছোট কৃষকে পরিণত হয়। ফলে প্রান্তিক কৃষকদের মোট সংখ্যা হ্রাস পেলেও তাদের আওতায় জমির পরিমাণ বেড়ে যায়। অন্য দিকে, পুঁজিবাদী ও জোতদারী, এই দ্বৈত শোষনের যাঁতাকলে পড়ে অসংখ্য ছোট কৃষক এ সময় প্রান্তিক কৃষকে পরিণত হয়। এ প্রক্রিয়াটি সিন্ধুতে ঘটে আরো দ্রুত গতিতে। সিন্ধুতে ১৯৫০ সালে যেখানে মোট খামারের শতকরা ২৯.৮ ভাগ ছিল প্রান্তিক খামার, পরবর্তী ২০ বছরে এ খামার সংখ্যার হার দাঁড়িয়েছে শতকরা ৩৬.৭ ভাগ। ১৯৫০ সালে প্রান্তিক খামারগুলির কাছে জমি ছিল শতকরা ৩.৬ ভাগ, ১৯৭০ সালে তা বেড়ে শতকরা ৫.৬ ভাগে দাঁড়িয়েছে।

পাঞ্জাবে ১৯৫০ সালে ছোট খামার সংখ্যা ছিল মোট খামারের শতকরা ১৮.৯ ভাগ এবং তাদের অধীনে জমির পরিমাণ ছিল মোট জমির শতকরা ৩৯.০ ভাগ। পরবর্তী ২০ বছরে এ শ্রেণীর খামার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৩৫.৬ ভাগ এবং তাদের অধীনস্থ জমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে শতকরা ৪৫.৭ ভাগে। অবশ্য সিন্ধুতে এ সময়ে ছোট খামারের আনুপাতিক হার হ্রাস পেয়েছে। ১৯৫০ সালে এখানে ছোট খামারের সংখ্যা ছিল মোট খামারের শতকরা ৪৬.০ ভাগ আর ১৯৭১ সালে তা দাঁড়ায় শতকরা ৪২.৯ ভাগে। এ সময়ে সিন্ধুতে ছোট খামারগুলির সংখ্যা আনুপাতিক হারে হ্রাস পেলেও এ সময়ে এদের জমির পরিমাণ শতকরা ১৮.৮ ভাগ থেকে বেড়ে ২৯.৯ ভাগে গিয়ে উপনীত হয়। পাঞ্জাব এবং সিন্ধু এ দু'টি প্রদেশের ক্ষেত্রেই দেখা যায় এ সময় ছোট খামার মালিকগণ তুলনামূলকভাবে শক্তি অর্জন করেছে।

১৯৫০ সালের হিসাব থেকে দেখা যায়, পাঞ্জাবে মাঝারি খামারের সংখ্যা শতকরা ৪.১ ভাগ; পরবর্তী ২০ বছরে তার পরিমাণ হ্রাস পেয়ে শতকরা ৩.৫ ভাগে দাঁড়িয়েছে। এ সময়ে এদের সংখ্যা বেশ কিছুটা হ্রাস পেলেও এদের অধীনস্থ জমির পরিমাণ হ্রাস পায়নি। সিন্ধুতে মাঝারি খামারগুলির সংখ্যা হ্রাস না পেয়ে বরং কিছুটা বেড়েছে, এ সময়ে খামার সংখ্যা শতকরা ১৬.২ ভাগ থেকে বেড়ে শতকরা ১৭.৭ ভাগে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এ সময়ে এই মাঝারি কৃষকদের অধীনস্থ জমির পরিমাণ বিস্ময়কর রকমভাবে বেড়ে গেছে, শতকরা ২৩.২ ভাগ থেকে বেড়ে শতকরা ৪০.৩ ভাগে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৯৫০ সালের তুলনায় ১৯৭১ সালে পাঞ্জাব এবং সিন্ধু-উভয় এলাকাতেই বড় খামারের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে, তবে পাঞ্জাবের তুলনায় সিন্ধুতে অনেক বেশি হারে হ্রাস পেয়েছে। পাঞ্জাবে ১৯৫০ সালে বড় খামারের সংখ্যা ছিল মোট খামারের শতকরা ০.৭ ভাগ, পরবর্তী ২০ বছরে তা সামান্য হ্রাস পেয়ে শতকরা ০.৫ ভাগে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে, সিন্ধুতে ১৯৫০ সালে বড় খামারের সংখ্যা ছিল মোট খামারের শতকরা ৮.০ ভাগ, পরবর্তী ২০ বছরে তা যেমন হ্রাস পেয়েছে, তেমনই এ খামারের অর্ন্তভুক্ত জমির পরিমাণও

Dhaka University Institutional Repository

গুরুত্বপূর্ণভাবে হ্রাস পেয়েছে। এ সময়ে পাঞ্জাবে বড় খামারের অন্তর্ভুক্ত জমির পরিমাণ মোট জমির শতকরা ২৩.৪ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে শতকরা ১২.১ ভাগে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আর সিন্ধুতে এ সময়ে এদের পরিমাণ শতকরা ৫৪.৪ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে ২৪.২ ভাগে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

সারণি-৪.২

পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশে মোটচাষাযোগ্য জমি ও তার মালিকানার ধরন

	পশ্চিম পাকিস্তান		পশ্চিম পাঞ্জাব		সিন্ধু		উঃ পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ		বেলুচিস্তান	
	১৯৫০	১৯৭১	১৯৫০	১৯৭১	১৯৫০	১৯৭১	১৯৫০	১৯৭১	১৯৫০	১৯৭১
মোট চাষযোগ্য জমি (লক্ষ একর)	৩৭৮.০৮	৩৭৮.০৮	২২৪.৬৬	২২৪.৬৬	১১৩.৫৮	১১৩.৫৮	২৮.৪০	২৮.৪০	১১.৪৪	১১.৪৪
(শতকরা	(১০০)	(১০০)	(৫৯.৪২)		(৩০.০৪)		(৭.৫১)		(৩.০৩)	
মালিকানার ধরন (হার)										
প্রান্তিক খামার	৬৪.৪	–	৬৬.৩	৬০.৪	২৯.৮	৩৬.৭	৭০.৩	–	–	–
ছোট খামার	২৮.৭	–	২৮.৯	৩৫.৬	৪৬.০	৪২.৯	২১.৬	–	–	–
মাঝারি খামার	৫.৭	–	৪.১	৩.৫	১৬.২	১৭.৭	৬.৯	–	–	–
বড় খামার	১.২	–	০.৭	০.৫	৮.০	২.৭	১.২	–	–	–
অতি বড় খামার	০.১	–	০.১	–	০.৯	–	০.১	–	–	–
জমির আয়তন (হার)										
প্রান্তিক খামার	১৫.৩	১৯.৬	১৫.৭	২০.৬	৩.৬	৫.৬	৩১.৯	৩২.৬	–	–
ছোট খামার "	৩১.৭	৩৯.৪	৩৯.০	৪৫.৭	১৮.৮	২৯.৯	২১.৬	৪২.৬	–	–
মাঝারি খামার "	২১.৮	–	২১.৯	২১.৬	২৩.২	৪০.৩	১৯.৭	–	–	–
বড় খামার "	৩১.২	–	২৩.৪	১২.১	৫৪.৪	২৪.২	২৩.৩	–	–	–
অতি বড় খামার "	১৫.৪	–	৯.৯	–	২৯.১	–	১২.৪	–	–	–

প্রান্তিক খামার = ৫ একরের নিচে, ছোট খামার = ৫ –২৫ একর, মাঝারি খামার = ২৫–১০০ একর, বড় খামার =১০০ একরের ওপরে অতিবড় খামার =৫০০ একরের ওপরে।
সূত্রঃ Mahmood Hasan khan (1985): Lectures on Agrarian Transformation in Pakistan, Islamabad: Pakistan Institute of development Economics. compiled from Table no.2. p. 21. and ; F.B. Arnold et. al.,(1955) : Pakistan:Economic and Commercial conditions in Pakistan- 1954. London: Her Majesty's Stationery office, p:142.

৪.২ নং সারণিতে যাদেরকে মাঝারি খামার (২৫–১০০ একর) হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে, তাদেরকে বার্কী মাঝারি কৃষক[৩৭] হিসাবে বিবেচনা করলেও, আলাভী কিন্তু এদেরকে মাঝারি কৃষক হিসাবে বিবেচনা করতে রাজী নন।[৩৮] কেননা আলাভীর মতে, কোন একক পরিবারের পক্ষে ২৫ একরের চেয়ে বড় খামার প্রধানতঃ পারিবারিক শ্রমের ওপর নির্ভর করে আবাদ করা সম্ভব নয়, ফলে সে খামারগুলির অধীনস্থ জমির একটি অংশ হয় বর্গা দিতে হয়, না হয় শ্রমশক্তি ক্রয়ের জন্য পুঁজি বিনিয়োগ করতে হয়। যে কৃষক প্রধাণত ভাড়া করা শ্রমের ওপর নির্ভর করে চাষাবাদ করে বা জমির প্রধান অংশ বর্গা দেয়, তাকে মাঝারি কৃষক বলা যায় না – আলাভীর এ যুক্তি মেনে নিলে দেখা যায়, পাঞ্জাবে ১৯৫০ সালে বড় খামারের সংখ্যা ছিল শতকরা ৪.৮ ভাগ এবং এদের অধীনস্থ জমির পরিমাণ ছিল শতকরা ৪৫.৩ ভাগ; ১৯৭১ সালে এ সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে শতকরা ৪.০ ভাগ ও শতকরা ৩৩.৭ ভাগ অর্থাৎ পাঞ্জাবে এ সময়ে বড় কৃষকদের সংখ্যা যে হারে হ্রাস পেয়েছে তার থেকে অনেক বেশি হারে হ্রাস পেয়েছে তাদের আয়ত্তাধীন জমির পরিমাণ। অন্যদিকে, সিন্ধুতে ১৯৫০ সালে বড় খামারের সংখ্যা ছিল মোট খামারের শতকরা ২৪.২ ভাগ, পরবর্তী ২০ বছরে তা পরিবর্তিত হয়ে ২০.৪ ভাগে দাঁড়িয়েছে। সিন্ধুতে এ সময়ে এদের অধীন জমির পরিমাণ শতকরা ৭৭.৬ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে ৬৪.৫ ভাগে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে বড় খামারগুলির সংখ্যা যেমন এ সময়ে হ্রাস পেয়েছে, তেমনই হ্রাস পেয়েছে বড় খামারগুলির আয়ত্ত্বাধীন জমির পরিমাণও। দুটি অঞ্চলেই বড় খামারের সংখ্যা জমির আয়তন উভয়ই হ্রাস পেলেও বড় খামারগুলির সবই একই রকম ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। ২৫–১০০ একর পর্যন্ত যাদের খামার আয়তন, পাঞ্জাবের ক্ষেত্রেও তাদের কোন ক্ষতি হয়নি, বরং ১৯৫০ সালের শতকরা ৪.১ ভাগ খামার যে আয়তনের জমি নিয়ন্ত্রণ করতো, ১৯৭১ সালে এসে শতকরা ৩.৫ ভাগ খামারই প্রায় সমপরিমাণ জমি নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যদিকে, সিন্ধুর ক্ষেত্রে ১৯৫০ সালে শতকরা ১৬.২ ভাগ খামার যে আয়তনের জমিকে নিয়ন্ত্রণ করতো, ১৯৭১ সালে এসে প্রায় সমসংখ্যক খামার তার থেকে প্রায় দ্বিগুণ আয়তনের জমিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এ সময়ে তাহলে ক্ষতি হয়েছে কার? স্পষ্টতই ক্ষতি হয়েছে ১০০ একরের চেয়েও যেসব খামারের আয়তন বেশি সে সমস্ত খামার মালিকের। যে খামারগুলির আয়তন ১০০ একরের বেশি তাদের মধ্যে একটি বড় অংশ ছিল ভূমি অভিজাত। এদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার একটি প্রধান কারণ হচ্ছে, ১৯৫৯ সালের ভূমি সংস্কার। তবে এ ভূমি অভিজাতদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আর একটি প্রক্রিয়া শুরু হয় আইয়ুবের 'সবুজ বিপ্লব' শুরুর পর থেকে, তবে প্রক্রিয়াটি ছিল পরোক্ষ। কেননা, কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকে যাদের জমির পরিমাণ ২৫ একরের ওপরে, তাদের সেই বাড়তি জমি নিজের নিয়ন্ত্রিত আবাদের অধীনে নিয়ে আসা সম্ভব হল, তবে আবাদের জন্য যে যত বেশি পুঁজি বিনিয়োগে সক্ষম হয়েছিল তার পক্ষেই তত বেশি পরিমাণে জমিকে আপন আবাদের অধীনে আনা সম্ভব হয়েছিল। বিনিয়োগযোগ্য পুঁজি থাকলেই যে তা সব ক্ষেত্রে কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিনিয়োজিত হয়েছিল তা নয়, বরং যাদের আগে থেকেই চাষের সাথে সম্পর্ক ছিল তারাই বেশি বেশি করে কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণের সুযোগ গ্রহণে সক্ষম হয়। বার্কী অভিমত প্রকাশ করেছেন, এর ফলে সামাজিক ও রাজনৈতিক এলিট

---

৩৭. বার্কী অবশ্য ২৫ একর থেকে ৫০ একর আয়তনের খামারগুলির মালিককেও মধ্য শ্রেণীর কৃষক হিসাবে বিবেচনা করেন নি, তার মতে মধ্য শ্রেণীর কৃষক বলতে ৫০–১০০ একর আয়তনের খামার মালিকদেরকেই বোঝায়। Burki (1976) : *Ibid*, p. 309.

৩৮. Alavi, Hamza (1976): "The Rural Elite and Agricultural Development in Pakistan", in *Ruaral Development in Bangladesh and Pakistan*, Edited by Robert D. Stevens *et. al.* Honolulu: An East-West Centre Book, p. 335.

Dhaka University Institutional Repository

হিসাবে প্রাক্তণ ভূমি অভিজাতগণ তখনও টিকে থাকলেও, অর্থনৈতিক এলিট হিসাবে ক্রমেই মাঝারি খামার মালিকদের অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি হতে থাকে। একদিকে ছোট ও প্রান্তিক কৃষকদের জমিকে নিজের মালিকানায় নিয়ে আসার মধ্যে দিয়ে, আর অন্যদিকে, কৃষি উপকরণের বিভিন্ন খাতে সরকারের দেওয়া ভর্তুকি ও সুবিধাকে বেশি হারে গ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে।[৩৯] কিন্তু আলাভী বার্কীর এ যুক্তিকে খন্ডন করে বলেন যে, এ দু'টি সুযোগ যে শুধু মাঝারি খামার মালিকগণই গ্রহণ করেছিল তা ঠিক নয়, বরং বড় খামার মালিকগণও এ সুযোগ বিশেষভাবেই গ্রহণ করেছিল। ফলে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতাতো বটেই, পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ক্ষমতাও বড় খামার মালিকদেরই তখনো ছিল। মাঝারি খামার মালিকদের পক্ষে বড় খামার মালিকদের ক্ষমতাকে অতিক্রম করে যাওয়া কিংবা মোকাবিলা করার মত অর্থনৈতিক শক্তি গড়ে ওঠার কোন সুযোগ ছিল না।[৪০] কেননা আলাভীর মতে, কৃষি খাতকে কেন্দ্র করে যান্ত্রিকীকরণের যে প্রক্রিয়া শুরু হয় তাতে দেখা যায়,অধিক জমির মালিকেরাই বেশি পরিমাণে তা গ্রহণ করে। কলের লাঙ্গলের মালিকদের জমির পরিমাণের মধ্যে তুলনা করে আলাভী দেখিয়েছেন, ১৯৬৮ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের যে পরিমাণ জমি যান্ত্রিক চাষাবাদের অধীনে আনা সম্ভব হয়, তার মধ্যে বার্কী–কথিত মাঝারি খামার মালিকদের জমি ছিল সামান্যই। তিনি দেখান, এ সময়ে যে সব খামার মালিক তাদের জমিকে যান্ত্রিকীকরণের আওতায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়, তারাও ছিল দেশের শতকরা ২৫ ভাগ কলের লাঙ্গলের মালিক; এদের মালিকানাধীন যে জমিকে যান্ত্রিকীকরণের আওতায় আনা হয়েছিল তার খরচের পরিমাণ ছিল মোট যান্ত্রিক চাষের অধীন জমির মাত্র ১০ ভাগ।[৪১] অর্থাৎ এই মাঝারি কৃষকদের যে হারে কলের লাঙ্গল ছিল, যান্ত্রিকীকরণের আওতাধীন জমির পরিমাণ ছিল তার থেকে অনেক কম। আলাভী দেখিয়েছেন, ১৯৬৮ সালে ১০০ একরের ওপরে যাদের খামার আয়তন ছিল, তাদের মালিকানায় মোট শতকরা ৫৫ ভাগ কলের লাঙ্গল ছিল, অথচ যান্ত্রিকীকরণের আওতাধীন জমির পরিমাণ এদের মালিকানায় ছিল শতকরা ৮৬.৫ ভাগ।[৪২]

সারণি–৪.৩

ষাটের দশকে কলের লাঙ্গরের মালিকদের খামার আয়তন ভিত্তিক শ্রেণী বিভাগ

খামারের আয়তন (একর)	মোট জমির পরিমাণ (%	খামারের গড় আয়তন (একর)	নিজের অধীনে মোট আবাদি জমির পরিমাণ (%	আবাদীখামারের গড় আয়তন (একর)	কলের লাঙ্গল পিছু গড় আবাদী জমির পরিমাণ (একর)
৫০০ একর এবং তার উপরে	৫২.৩	১,৩১৭	৪৩.০	১,২৩১	৭১৪
২০০–৪৯৯ একর	২৫.৪	৩৪২	২৬.০	৩৩৪	২৭০
১০০–১৯৯ একর	১১.৯	১৫৬	১৭.৫	১৫৫	১৪৫
৫০–৯৯ একর	৬.৯	৮১	১০.০	৮২	৭৯
২৫– ৪৯ একর	২.৫	৪৩	২.৮	৪৪	৪২
২৫ একরের নিচে	০.৪	–	০.৭	–	২১

সূত্রঃ Hamza Alavi (1976) : p: 340, Table No. 8.

আলাভী এই বিষয়ে পরিষ্কার চিত্র তুলে ধরার জন্য যে সারণিটি ব্যবহার করেছেন তাকে৪.৩নং সারণি আকারে এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ সারণি থেকে আলাভী দেখিয়েছেন, যাদের জমির পরিমাণ ১০০ একরের উর্ধে এরকম কলের লাঙ্গল মালিকদের কাছে শুধু কলের লাঙ্গলই বেশি আছে তাই নয়। মোট জমির পরিমাণ কিংবা তাদের নিজস্ব চাষাধীন জমির পরিমাণও রয়েছে অনেক বেশি, ফলে কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণের কারণে মাঝারি খামার মালিকগণ (৫০–১০০ একর জমির মালিক) গ্রামীণ অর্থনীতির নিয়ন্ত্রকে পরিণত হতে চলেছে বলে বার্কী যে মন্তব্য করেছেন, আলাভী এ তথ্য পরিবেশন করে তা বাতিল করে দেন। অবশ্য৪.৩নং সারণিতে প্রদত্ত তথ্য থেকে একটি ভিন্ন চিত্রও ফুটে ওঠে। তথ্য থেকে দেখা যায়, ৫০০ একরের উর্ধে যাদের জমির পরিমাণ তারা তাদের সমস্ত জমিকে নিজের যান্ত্রিক চাষের অধীনে আনতে সক্ষম হয়নি। এরা কলের লাঙ্গল মালিকদের মোট জমির শতকরা ৫২.৩ ভাগের মালিক হওয়া সত্ত্বেও যান্ত্রিক চাষের আওতাধীন মোট জমির মধ্যে তাদের জমির পরিমাণ মাত্র শতকরা ৪৩.০ ভাগ। অথচ যে সমস্ত খামারের আয়তন ২০০ একরের নিচে, এরকম খামার মালিকের মালিকানার মোট জমির মাত্র শতকরা ২২.৩ ভাগ থাকা সত্ত্বেও তাদের অধীনে যান্ত্রিক চাষের অধীনস্থ জমির পরিমাণ শতকরা ৩১.১ ভাগ অর্থাৎ জমির মালিকানার দিক দিয়ে বিচার করলে, আলাভী কর্তৃক মাপকাঠি ব্যবহার করলেও দেখা যায় বৃহত্তর খামারগুলির তুলনায় আপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র খামার মালিকদের লাভ হয়েছে বেশি। তবে কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণের কারণে সবচেয়ে যারা বেশি লাভবান হয়েছেন তাঁরা হচ্ছেন ১০০–১৯৯ একর আয়তনের খামার মালিক কেননা এঁরা নিজেরা যে পরিমাণ জমির মালিক, তার থেকে প্রায় দেড় গুণ আয়তনের জমিকে তারা যান্ত্রিক চাষের আওতায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। আলাভী আরো একটি দিককে তেমন গুরুত্ব দেননি। উক্ত সারণি থেকেই দেখা যায়, যাদের খামার যত বড়, তাদের কলের লাঙ্গল–প্রতি আবাদী জমির পরিমাণ তত বেশি। এর থেকে এমন মূল্যায়ণ করা খুবই সম্ভব যে, তুলনামূলকভাবে ছোট খামারগুলিতে যান্ত্রিক চাষের ঘনত্ব বেশি। তবে চাষের ঘনত্ব (Copping Intensity) বেশি হওয়া শুধু কলের লাঙ্গলের ওপর নির্ভর করে না, বিনিয়োগযোগ্য পুঁজির পর্যাপ্ততাসহ অন্যান্য বিষয়ের ওপরও নির্ভর করে। এর আর একটি দিক হচ্ছে, উক্ত সারণিতে কলের লাঙ্গল মালিকদের নিজ চাষের অধীনস্থ জমিকেই এখানে ধরা হয়েছে, কিন্তু কলের লাঙ্গল যে সমস্ত জমিতে ভাড়া খাটে সে জমিকে যান্ত্রিক চাষের আওতাভুক্ত করা হয়নি। কলের লাঙ্গলের ক্ষমতা সম্পর্কেও কোন ধারণা দেওয়া হয়নি, ফলে ছোট খামার মালিকদের লাঙ্গল অলস বসে থাকে কি না তাও বোঝা যায় না। মাহমুদ হাসান খান (১৯৮৫) আলাভীর বক্তব্যের এসব দিককে সমালোচনা করে মত প্রকাশ করেছেন, শুধু মাত্র কলের লাঙ্গল দিয়ে চাষ হচ্ছে কি না সেটাই কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণের প্রধান বিষয় হতে পারে না; সেচ প্রয়োগ, রাসায়নিক সার প্রয়োগ, উন্নতবীজ ও বিদ্যুৎসহ অন্যান্য

৩৯. Burki(1976): *op.cit,*. pp 309 -311.
৪০. Alavi (1976): *op.cit.*,p.340.
৪১. Alavi (1976): *Ibid*, p. 339.
৪২. Alavi (1976(: *Ibid*, pp. 339-40.

Dhaka University Institutional Repository

যান্ত্রিক উপকরণের ব্যবহারও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য।[৪৩] সবচেয়ে বেশি করে যা' বিবেচনা করা প্রয়োজন, তা হচ্ছে উৎপাদন পদ্ধতির দিকটি। কৃষিকে যান্ত্রিকীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহের পর্যাপ্ততার হেরফেরের কারণে এককেটি অঞ্চলে এককে ধরনের উপকরণ বেশি ব্যবহৃত হতে পারে, তাই বলে কোথাও একটি নির্দিষ্ট উপকরণ ব্যবহার হচ্ছে না বলে তা যান্ত্রিক চাষাবাদের বহির্ভূত বিবেচনা করা চলে না। ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা প্রয়োজন উৎপাদন উপায়ের মালিকানা ও উৎপাদিত ফসলের বন্টন ব্যবস্থাকে।[৪৪] মাহমুদ হাসান খান উপরোক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের খামার মালিকদেরকে মোট চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। এ শ্রেণীগুলি হচ্ছেঃ ভূস্বামি, পুঁজিপতি খামার মালিক, পারিবারিক কৃষিজোত ও বর্গা কৃষক। খান এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে যে সব তথ্য ব্যবহার করেছেন, তা'৪.৪নং সারণিতে দেখানো হয়েছে। এ সারণি থেকে দেখা যায়, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ-- এই তিনটি প্রদেশেই এ চারটি শ্রেণী আছে। ধান উৎপাদন পদ্ধতির দিক থেকে খামারগুলিকে চার ভাগে ভাগ করলেও খামারের আয়তনের দিক থেকে তাকে তিনি ৭টি ভাগে ভাগ করেছেনঃ যথা, ১ একরের নিচে, ১-৫ একর, ৫-১২.৫ একর, ১২.৫-২৫.০ একর, ২৫.০-৫০.০ একর, ৫০.০-১৫০.০ একর এবং ১৫০ একরের ওপরে। এ সারণি থেকে দেখা যায়, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ভূস্বামী খামারের সংখ্যা মোট খামারের শতকরা যথাক্রমে ০.২১, ০.৭২ ও ০.২৫ ভাগ। এরা প্রধানতঃ অনুপস্থিত ভূস্বামী এবং এরাই ছিল প্রধাণতঃ ভূমি অভিজাত। তবে এদের অনেকে চাকুরী, ব্যবসা বাণিজ্য কিংবা অন্যান্য পেশার সাথে যুক্ত হওয়ার কারণেও অনুপস্থিত ভূস্বামিতে পরিণত হয়েছে। এ খামারসমূহের প্রধান অংশ ৫০.০-১৫০.০ একর আয়তনের খামার মালিক। এ খামারগুলির অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশ ১৫০.০ একরের উর্ধের খামারসমূহের মালিক।

সারণি নং-৪.৪

১৯৭১/৭২ সালে পাকিস্তানের গ্রামীণ পরিবারসমূহের খামার- আয়তন ও শ্রেণী ভিত্তিক বিভাজন (শতকরা হার)

শ্রেণীর নাম	প্রদেশের নাম	১.০০ একরের নিচে	১.০-৫.০ একর	৫.০-১২.৫ একর	১২.৫-২৫০ একর	২৫.০-৫০.০ একর	৫০.০-১৫০.০ একর	১৫০.০-একর এবং তার উপর	মোট
ভূস্বামী	পাঞ্জাব						০.১৭	০.০৩	০.২১
	সিন্ধু						০.৭২	০.১০	০.৭২
	উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ					০.২৩	০.০২	০.২৫	০.৫০
পুঁজি পতি খামার মালিক	পাঞ্জাব				১২.৭২	১০.২৩	৩.৫৬	০.৩৭	২৬.৮৮
	সিন্ধু				১২.৮৭	৫.৪৮	২.১০	০.৪২	২০.৮৮
	উঃ পঃ সীঃ প্রঃ				৩.৭১	৪.৩১	২.৯৫	.৭২	১১.৬৯
পারিবারিক কৃষি জোত	পাঞ্জাব	২.৮০	১৪.৭৪	২১.১৭	১১.১০				৪৯.৮২
	সিন্ধু	০.৩২	৬.৬৯	১১.১১	৯.২১				২৭.৩২
	উঃ পঃ সীঃ প্র	৯.১১	২৯.৯৯	১৭.২৬	৬.০১				৬২.৩৭
বর্গাচাষী পরিবার	পাঞ্জাব	০.৮৫	৫.৯০	১৬.৩৪					২৩.০৯
	সিন্ধু	০.১০	১১.২৮	৩৯.৭০					৫১.০৮
	উঃ পঃ সীঃ প্র	২.৪১	১২.২০	১১.০৮					২৫.৬৯
সমস্ত শ্রেণী	পাঞ্জাব	৩.৬৫	২০.৬৫	৩৭.৫১	২৩.৮২	১০.৩২	৩.৭৩	০.৪০	১০০.০০
	সিন্ধু	০.৪২	১৭.৯৭	৫০.৮১	২২.০৮	৫.৪৮	২.৭২	০.৫২	১০০.০০
	উঃ পঃ সীঃ প্র	১১.৫২	৪২.১৯	২৮.৩৪	৯.৭২	৪.৩১	৩.১৮	০.৭৪	১০০.০০

সূত্রঃ Mohmood Hasan Khan (1985): Lectures on Agrarian trans formation in Pakistan, Islamabad: Pakistan Insutute of Development Economics, Table No.1, p:15.

৪.৪নং সারণি থেকে দেখা যায়, যে খামারগুলির আয়তন ১৫০ একরের উর্ধে তিনটি প্রদেশে তাদের প্রধান অংশই পুঁজিপতি খামার মালিক। তাদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে খুব সামান্য সংখ্যক খামার মালিকই ভূস্বামি হিসাবে টিকে আছে। পাঞ্জাব, সিন্ধু.ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মোট খামারগুলির মধ্যে ১৫০ একরের উর্ধের খামারগুলির শতকরা হার যথাক্রমে ০.৪০, ০.৫২ ও ০.৭৪ ভাগ অথচ তাদের মধ্যে পুঁজিপতি খামারের হার যথাক্রমে ০.৩৭ ০.৪২ ও ০.৭২ ভাগ। এ থেকে দেখা যায়, বড় খামার মালিকগণ সংখ্যায় কম তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদের প্রায় প্রত্যেকেই পুঁজিপতি খামার মালিক। ফলে এই অতি বৃহৎ খামার মালিকগণকে অতিক্রম করে, অন্য কোন শ্রেণীর পক্ষে গ্রামের অর্থনীতির প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী শ্রেণীতে পরিণত হওয়া শুধু কঠিনই নয়, দুরূহও বটে। তাছাড়া, অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ঠিক তখনই শ্রেণীগত প্রতিযোগিতা দেখা দিতে পারে, যখন শ্রেণীসমূহের মধ্যে মৌল কোন বিরোধের অস্তিত্ব থাকে। উক্ত সারণি থেকে দেখা যায়, ১২.৫ একরের উপর যাদের জমি, তাদের বড় অংশ পুঁজিপতি কৃষক। আবার ফসলের বাজার যেহেতু সরকার নিয়ন্ত্রণ করত, ফলে বাজারকে কেন্দ্র করেও কারো পক্ষে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ছিল না। কলের লাঙল বা শক্তিচালিত নলকূপের ওপরও বৃহৎ খামার মালিকদের নিয়ন্ত্রণ গড়ে উঠতে পারে। মাঝারি পুঁজিপতি খামার মালিকগণ যদি সে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে তাহলে তারা তাদের অস্তিত্বকে শক্তিশালী করতে পারে মাত্র, কিন্তু অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বৃহৎ খামার মালিকদেরকে অতিক্রম করাটা তাদের জন্য সহজ নয়। পুঁজিপতি খামার মালিকদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যায় তার কারণ মৌলিক কোন বিরোধ নয়। কেননা তারা সবাই মূলতঃ একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তবে বড় খামার মালিকগণের অনেকে যেহেতু একই সাথে জমি বর্গাও দেয়, ফলে তাদের সাথে বর্গা কৃষকদের একটি শ্রেণীগত বিরোধ রয়েছে, কিন্তু মাঝারি পুঁজিপতিদের সাথে তাদের মৌল বিরোধের কোন ভিত্তি নেই। অন্যদিকে, পুঁজিবাদী খামার মালিকদের মধ্যে যাদের ১২.৫-২৫.০

৪৩. Khan, Mahmood Hasan (1985): *op. cit.*, pp. 12-14.
৪৪. Khan. *Ibid.* pp. 13-14.

Dhaka University Institutional Repository

একর পর্যন্ত জমি রয়েছে তাদের সংখ্যা ছিল অনেক; পাঞ্জাবে মোট খামারের শতকরা ১২.৭২ ভাগ আর সিন্ধুতে ১২.৮৭ ভাগ। ২৫.০-৫০.০ একর আয়তনের পুঁজিপতি খামারের সংখ্যাও প্রচুর, পাঞ্জাবে শতকরা ১০.২৩ ভাগ। ফলে অন্ততঃ পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে পুঁজিবাদী খামারগুলির মধ্যে ১২.৫-৫০.০ একর গোষ্ঠীর পুঁজিপতি খামার মালিকের সংখ্যাই সর্বাধিক, ফলে সংখ্যাগত দিক থেকে এরা পশ্চিম পাকিস্তানে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী শ্রেণী ছিল। অবশ্য যাদের জমি ৫০.০ একরের ওপরে এরাই ছিল সে সময় শতকরা ৯৭ ভাগ কলের লাঙ্গলের মালিক এবং মোট জমির এক-তৃতীয়াংশের মালিক। আবার, এদের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগই ছিল পুঁজিপতি খামার মালিক; পাঞ্জাবে এদের মধ্যে পুঁজিবাদী খামার মালিক ছিল শতকরা ৯৫ ভাগ; সিন্ধুতে প্রায় শতকরা ৭৮ ভাগ এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এরা ছিল শতকরা প্রায় ৯৪ ভাগ। ২৫-৫০ একর আয়তনের ১০০ ভাগ খামার ছিল পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার অধীন; ১২.৫০-২৫.০ একর আয়তনের খামারের অধিকাংশই ছিল পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার অধীন। তাই স্পষ্টভাবেই বলা যায়, পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষি ব্যবস্থা ছিল প্রধানত পুঁজিবাদী কৃষি ব্যবস্থা। খামারের সংখ্যার দিক থেকে পরিবারিক কৃষি জোত ও বর্গাচাষী মিলে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ ছিল; পাঞ্জাবে শতকরা ৭৩ ভাগ, সিন্ধুতে ৭৮ ভাগ এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে শতকরা ৮৮ ভাগ। কিন্তু মোট জমির দিক থেকে তাদের আওতাধীন জমির পরিমাণ ছিল খুবই কম। তাই৪৪নং সারণির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সমসাময়িককালে পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষির সাথে সর্ম্পকযুক্ত পরিবারগুলি প্রধান চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল।

ভূস্বামীঃ

এরা প্রচুর পরিমাণ জমির মালিক। এদের সবারই ৫০ একরের বেশি জমি ছিল এবং এরা নিজে কিংবা নিজের নিয়ন্ত্রণে চাষাবাদ করতো না। এরা তাদের জমি প্রধানতঃ বর্গা দিতো। যারা এ সময় তাদের জমিকে বর্গা দিত, স্বভাবতই এরা ছিল প্রাক্তন ভূমি অভিজাত পরিবারসমূহ কিংবা চাকুরী বা ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে শহরে থাকে এমন অনুপস্থিত ভূস্বামি পরিবারসমূহ। এদের সংখ্যা কম হলেও, প্রাক্তন ভূমি অভিজাত হিসাবে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে এদের অবস্থান শক্তিশালী থাকার কথা। অন্যদিকে, কৃষিকে যান্ত্রিকীকরণের পরিপূর্ণ সুযোগ থাকা এবং কৃষিতে উৎপাদন লাভজনক হওয়া সত্ত্বেও যে সমস্ত পরিবার সেদিকে আগ্রহ দেখায়নি তাদের নিশ্চয়ই অন্য কোন বিকল্প পেশা ছিল, যা কৃষির চেয়েও লাভজনক ছিল। অর্থাৎ তাদের যেমন পারিবারিক প্রভাব ছিল, তেমনই ছিল শহরভিত্তিক অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান। উৎপাদন পদ্ধতির অন্যান্য দিক নিয়ে আলোচনার সময় বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

পুঁজিপতি খামার মালিকঃ

এরাই ছিল সেই সময় পশ্চিম পাকিস্তানের গ্রামীণ অর্থনীতির সবচেয়ে শক্তিশালী শ্রেণী। সংখ্যার দিক থেকে এরা যেমন গ্রামীণ পরিবারগুলির মধ্যে প্রায় এক-চতুর্থাংশ। অন্যদিকে, এরা কৃষি অর্থনীতিতে ব্যবহার্য উৎপাদন উপায়ের প্রধান অংশের মালিক। যারা প্রধানতঃ মুনাফা ভিত্তিক কৃষি উৎপাদনের সাথে যুক্ত ছিল তারাই এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যাদের সে সময় কম পক্ষে ১২.৫ একর জমি ছিল তাদের পক্ষেই মুনাফা ভিত্তিক যান্ত্রিক চাষাবাদ করা সম্ভব হয়েছিল। তবে জমি ভিত্তিক শ্রেণী বিভাগ করলে দেখা যায় ২৫.০-৫০.০ একর আয়তনের খামারগুলির ১০০ ভাগই ছিল পরিপূর্ণ অর্থেই পুঁজিবাদী খামার। তবে এদের পুঁজি বিনিয়োগের সামর্থ্য ছিল কম, ফলে প্রচন্ড আকাঙ্খা থাকলেও তাদের পক্ষে গ্রামীণ অর্থনীতিতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল না। ১২.৫০-৫০.০ একর আয়তনের পরিবারগুলি গ্রামীণ অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার সামর্থ্য অর্জন করতে না পারলেও অবস্থানগত কারণেই এদের গ্রামীণ অর্থনীতি ও সমাজে এদের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব থাকা সম্ভব ছিল। কেননা একদিকে যেমন এদের বর্গা দেওয়ার মত অধিক জমি ছিল না, অন্যদিকে অন্য কারো কাছ থেকে জমি বর্গা নেওয়ারও কোন প্রয়োজন ছিল না। কৃষি যন্ত্রপাতির মালিকানা আবার এদের হাতে খুব সামান্যই ছিল, কলের লাঙ্গলের হিসাব থেকে দেখা যায়, এরা মাত্র শতকরা ৩ ভাগ যন্ত্রের মালিক ছিল, ফলে এরা বড় খামার মালিকদের কাছ থেকে যন্ত্র ভাড়া নিতে বাধ্য হত। ফলে পুঁজিবাদী খামার মালিকানার দিক থেকে এদের যেমন বড় পুঁজিপতি খামারগুলির সাথে একটি বিশেষ ঐক্যের দিক ছিল, ঠিক তেমনই কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে বড় পুঁজিপতি খামার মালিকদের সাথে তাদের কিছু বিরোধের দিকও ছিল। বড় খামার মালিকদের সাথে এ বিরোধ শুধু ১২.৫০-৫০.০০ একর আয়তনের খামারগুলিরই ছিল না, ছোট আয়তনের খামারের সাথেও তাদের এ বিরোধ বিদ্যমান ছিল। কেননা কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণের প্রক্রিয়ায় কারো সামর্থ্য থাক অথবা না থাক অত্যাবশ্যক কতকগুলি উপাদান ব্যবহার না করে উৎপাদন ব্যবস্থাকে চালু রাখা সম্ভব নয়, যেমন রাসায়নিক সার, উন্নত বীজ, পানি ইত্যাদি। কিন্তু এসব উপাদানের ওপর নিয়ন্ত্রণ ছিল বড় খামারগুলির প্রায় একচেটিয়া। ফলে বড় পুঁজিপতি খামারগুলির সাথে, সমস্ত ছোট ও মাঝারি খামারেরই ছিল এক বিশেষ ধরনের বিরোধ। কিন্তু ১২.৫০-৫০.০০ আয়তনের খামারগুলির সাথে ছোট ও প্রান্তিক খামারগুলির সে ধরনের বিরোধ ছিল খুব সামান্য। ক্ষেত মজুরদের সাথেই শুধু তাদের একটি মৌলিক বিরোধ ছিল, তবে বড় খামারগুলির সাথে ক্ষেত মজুরদের এ বিরোধ ছিল আরো তীব্র। ফলে শ্রেণীগত দিক দিয়ে দেখলে পশ্চিম পাকিস্তানের গ্রামীণ জনসাধারণের ব্যাপক অংশের স্বাভাবিক নেতা এই ১২.৫০-৫০.০০ একর আয়তনের পুঁজিপতি খামার মালিকদেরই হওয়ার কথা।

পারিবারিক কৃষিজোত

জমির মালিকানার দিক থেকে যাদের জমির পরিমাণ ২৫ একরের নিচে তাদের খামারের বড় অংশটি পারিবারিক কৃষিজোতের অধীনে কৃষি উৎপাদনের সাথে জড়িত। যাদের জমি ১২.৫০-২৫.০০ তাদের বড় অংশটি পুঁজিপতি খামার মালিক হলেও বাকি অংশটি এই ব্যবস্থার অধীন। তবে যাদের জমির পরিমাণ ১২.৫০ একরের নিচে তাদের মধ্যে কারো পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার অধীনে থাকা সম্ভব হয় না, এদের বড় অংশটি বর্গাচাষী। পারিবারিক কৃষিজোতের উৎপাদন কর্ম চলে প্রধানতঃ পারিবারিক শ্রমের মাধ্যমেই। এদের একটি অংশ মৌসুমের সময় কিছু কিছু ভাড়া করা শ্রমিক নিয়োগ করলেও যাদের প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম জমি আছে, বিশেষতঃ যাদের ৫ একরের চেয়ে কম জমি আছে এরকম পরিবারগুলিতে অধিকাংশ সময়েই বাড়তি শ্রম থাকে, ফলে ক্ষেতমজুর হিসাবে তারা অন্যের জমিতে ভাড়া খাটে। ১২.৫০ একরের নিচে যাদের জমি আছে তাদের মধ্যে যারা বর্গাজমি পায় তারা বর্গা চাষ করে কিন্তু যারা তা পায় না তারা ক্ষেত মজুর হিসাবে শ্রমশক্তি বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এই শ্রেণীটির সাথে সামন্তবাদের বিরোধ তত প্রত্যক্ষ নয়। এদের সাথে প্রত্যক্ষ বিরোধ বড় খামার মালিকদের, যারা একই সাথে বিপুল পরিমাণ জমি এবং প্রায় সমস্ত উৎপাদনযন্ত্র তথা প্রযুক্তির মালিক।

Dhaka University Institutional Repository

বর্গাচাষীঃ

এরা ছিল তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের গ্রামীণ অর্থনীতিতে পশ্চাদপদ সামন্তবাদী উৎপাদন পদ্ধতির অনুসঙ্গ। এরা প্রধানতঃ ভূস্বামিদের থেকে জমি বর্গা নিয়ে নিজেদের পরিবারের বাড়তি শ্রমের কর্মক্ষেত্র তৈরি করে। এরা গতানুগতিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে বাধ্য হয়, কেননা উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদিত পণ্যের অর্ধেকটা জমির মালিককে দিতে হলে তাদের আর কিছুই থাকে না। উপরন্তু উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজিও তাদের হাতে ছিল না। তাছাড়া, যান্ত্রিকীকরণের প্রক্রিয়ায় একদিকে পুঁজিপতি খামার মালিকগণ ক্রমেই যেমন তাদের বাড়তি জমিকে বর্গাচাষীর কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে নিজের পুঁজিবাদী খামারের অন্তর্ভূক্ত করছিল; অন্যদিকে, অনুপস্থিত ভূস্বামিগণ তাদের জমিকে বর্গাচাষের অধীনে না রেখে তা চুক্তির ভিত্তিতে পুঁজিপতি কৃষকদের কাছে ভাড়া দিতে শুরু করেছিল। ফলে বর্গাচাষিগণ সব সময়ই জমি ছাড়িয়ে নেওয়ার ভয়ে তটস্থ থাকতো। এছাড়া, পুঁজিপতি কৃষক ও পারিবারিক কৃষিজোতের একাংশ একটি স্বাধীন অর্থনীতির ওপর দাঁড়াতে পেরেছিল, ফলে এমনিতেই তাদের মধ্যে নির্ভরশীল মানসিকতা হ্রাস পাচ্ছিল; তার ওপর শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার ও উন্নত প্রযুক্তির সুযোগ গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে তারা ক্রমে সচেতন হয়ে উঠতে পেরেছিল, কিন্তু বর্গাচাষিগণ এ দু'টি প্রক্রিয়া থেকেই বঞ্চিত থাকার কারণে ভূস্বামিদের প্রতি একান্তভাবেই অনুগত থেকে যায়। আলাভীর মতে, এই বর্গাচাষিগণই ভূস্বামিদের সবচেয়ে অনুগত সমর্থনকারী।[৪৫]

উপরোক্ত শ্রেণী বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১৯৬৯ সালের পাকিস্তানের গ্রামীণ সমাজের ক্ষমতা কাঠামোর শীর্ষে ছিল গ্রামে অবস্থানরত বড় পুঁজিবাদী খামার মালিকগণ। এরা একদিকে অধিক পরিমাণ জমির মালিক, ফলে বেশ কিছু সংখ্যক বর্গাচাষীর ওপর তাদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ থাকে, অন্যদিকে, এদের হাতে থাকে আধুনিক কৃষিযন্ত্রপাতির অধিকাংশ, যেমন গভীর নলকূপ ও কলের লাঙ্গল, ফলে এদিক থেকেও গ্রামের ক্ষুদ্র পুঁজিপতি কৃষক ও খোরাকী কৃষকদের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ থাকে। উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতই পাকিস্তানের গ্রামীণ সমাজে ক্ষমতার আর একটি বিশেষ দিক ছিল, সেটা হচ্ছেঃ গ্রামীণ সমাজের বিস্তৃত আত্মীয় গোষ্ঠীর প্রভুত্ব। আলাভী এদিকটি বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন, পাকিস্তানের গ্রাম সমাজে এ আত্মীয় গোষ্ঠীর বন্ধন এত শক্তিশালী যে, শ্রেণীগতভাবে ঘোরতর শত্রুও পরম বন্ধু হিসাবে যুগ যুগ ধরে পরস্পরের সাথে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান করেছে।[৪৬] আত্মীয় গোষ্ঠীর এ বন্ধনের কারণেই গ্রামে অবস্থনরত বড় খামার মালিকগণ তাদের গোষ্ঠীভূক্ত অপরাপর অনুপস্থিত খামার মালিকগণের জমির ওপর খবরদারী করে। ফলে গ্রামে অবস্থানরত বড় বড় খামার মালিকদের অনেকের বিশাল বিশাল এলাকার ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রামের এ বৃহৎ খামার মালিকগণ তাদের অধীনস্থ বর্গাচাষিদের আত্মীয় গোষ্ঠীর ওপরও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পায়। শুধু বর্গাচাষিই নয়, গ্রামের অপরাপর শ্রেণীভুক্ত পরিবারগুলির ওপরও বড় খামার মালিকগণ আধিপত্য করে। জনসাধারণের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উপাদান হচ্ছে বল প্রয়োগ ও নির্যাতন। এটা দুটি ধারায় চলে। প্রথমতঃ এরা প্রত্যেকে লাঠিয়াল বাহিনী হিসাবে ব্যবহারের জন্য বেশ কিছু নির্ভরশীল ব্যক্তিকে মদদ যোগায়, এ ছাড়া, এদের প্রত্যেকের থাকে কিছু পোষা গুন্ডা। দ্বিতীয়তঃ এরা গোষ্ঠীপতি হওয়ার কারণে বিচারের দায়িত্বও থাকে এদের ওপর। ফলে, যে কোন ব্যক্তি বড় খামার মালিকের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন হয়ে উঠলে তাকে শাস্তি প্রদানের জন্য খুব সহজেই ন্যায্য ভিত্তি তৈরি করে নেওয়া যায়। এছাড়া, শিক্ষা-দীক্ষা, শহরের সাথে যোগাযোগ, প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদির কারণে গ্রামের বড় খামার মালিকগণ স্থানীয় প্রশাসনকে ব্যবহার করতে পারে। ফলে গ্রামে বড় খামারপতিগণই পাকিস্তানের গ্রাম সমাজের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে থেকে গেছে। তবে এরা আগের ভূমি অভিজাত শ্রেণী থেকে ভিন্নতর। একটি অঞ্চলে একক কোন ব্যক্তির আধিপত্যের পরিবর্তে ষাটের দশকে একটি শ্রেণী আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা হয়। ফলে আইয়ুবের বুনিয়াদী গণতন্ত্রী হিসাবে এরা অথবা এদের সমর্থনপুষ্টরাই নির্বাচিত হয়। এভাবে আইয়ুব পাকিস্তানের গ্রাম সমাজে ক্ষমতা কাঠামো পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়। গ্রামের এসব পরিবর্তনের ফল হিসাবে যে একটি নব্য শিক্ষিত সমাজ গড়ে ওঠে, এরা আগের ভূস্বামি ভূমিঅভিজাত পরিবার থেকে আগত শিক্ষিত সমাজ থেকে পৃথক। আগের মধ্যবিত্ত সমাজের কাছে আইয়ুব খুব দ্রুত অপ্রিয় হয়ে উঠলেও, গ্রামীণ পুঁজিপতি খামার মালিক পরিবার থেকে আগত শিক্ষিত সমাজের আচরণ একই রকম হয় না। বরং তারা অনেক ক্ষেত্রে আইয়ুবের সমর্থকে পরিণত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যবিত্ত শ্রেণীসহ অন্যান্য নাগরিক শ্রেণী ওপর আলোচনার সময় বিষয়টি আরো পরিস্কার হয়ে উঠবে; তবে এখানে অন্তত এটুকু বলা যায়, পশ্চিম পাকিস্তানের গ্রামীণ অর্থনীতির পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যে একটি নব্য শিক্ষিত সমাজ গড়ে ওঠার সুযোগ সৃষ্টি হয়, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে তা একবারেই হয়নি।

৪.২ পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পায়ণ

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় পাকিস্তানের অর্থনীতির প্রায় একমাত্র ভিত্তি ছিল কৃষি। কিন্তু সামগ্রিকভাবে কৃষিও ছিল খুবই পশ্চাদপদ ও গতানুগতিক। শুধুমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানে মোটামুটি সুবিন্যস্ত একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বিস্তির্ণ একটি সেচ ব্যবস্থাই ছিল নির্ভর করার মত একটি সম্পদ। আধুনিক শিল্প বলতে প্রায় কোন কিছুরই অস্তিত্ব ছিলনা পাকিস্তানে। বস্তুতঃ একমাত্র কৃষি ছাড়া, আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থা কিংবা তেমন কোন শক্তিশালী কোন বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানেরও কোন অস্তিত্ব ছিল না তৎকালীন পাকিস্তানে।[৪৭] দেশ বিভাগের সময় পাকিস্তানের অংশে যে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল সেগুলির মোট মূল্য ছিল ৫৮ কোটি টাকা, কিন্তু তার মধ্যেও তাতে মুসলমানদের অংশ ছিল খুবই সামান্য। ফলে তৎকালীন পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দকে পাকিস্তানের অগ্রগতির জন্য প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা মুসলিম ধনী ব্যক্তিদের ওপর নির্ভর করতে হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পরই বার্মা থেকে আদমজী পরিবার পাকিস্তানে আসে, পূর্ব আফ্রিকা থেকে ব্যবসা গুটিয়ে পাকিস্তানে আসে ফেনসি পরিবার এবং বোম্বাই থেকে ব্যবসা গুটিয়ে নিয়ে পাকিস্তানে

---

৪৫. Alavi(1976) :*op.cit.*, 344.
৪৬. Ibid, pp.344-45.
৪৭. Papanek, Gustav F. (1967): *Pakistan's Development:Social goals and private Incentives*, Cambridge: Harbard University Press. p: 3

Dhaka University Institutional Repository

স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে হাবিব, দাউদ এবং বোহরা পরিবারসমূহ।[৪৮] কি করুণ অবস্থা থেকে পাকিস্তানের শিল্পন্নয়নের যাত্রা শুরু তা পরিষ্কার করার জন্য ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান ও ভারত–এ দুটি নব্য স্বাধীন দেশের শিল্পের তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন প্রাসঙ্গিক হবেঃ

সারণি–৪.৫
১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তানের শিল্প প্রতিষ্ঠানের তুলনামূলক চিত্র

দেশ	মোট ফ্যাক্টরি		মোট শ্রমিক কর্মচারী		প্রধান প্রতিষ্ঠান		মোট শ্রমিক–কর্মচারী	
	সংখ্যা	হার	সংখ্যা	হার	সংখ্যা	হার	সংখ্যা	হার
পাকিস্তান	১,৪০৫	১০	২০৬,০০০	৭	৩৪	৪	২৬,০০০	২
ভারত	১৩,১৬০	৯০	২,৯৩৬,০০	৯৩	৮৮৭	৯৬	১,১১০,০০০	৯৮

সূত্রঃ Fritochier, A.L. (1965): 'Industrialists and the Government Process in Pakistan', Unpublished Ph.D dissertation, Syracuse University.

উপরোক্ত সারণি থেকে দেখা যায়, দেশ বিভাগের সময় অবিভক্ত ভারতবর্ষের মোট শিল্পোদ্যোগের মাত্র শতকরা ১০ ভাগ পড়ে পাকিস্তানের ভাগে, বাকি শতকরা ৯০ ভাগই পড়ে ভারতের পক্ষে। শ্রমিক সংখ্যাকে বিবেচনা করলে দেখা যায় শিল্প–কারখানায় চাকুরিরত মোট শ্রমিক কর্মচারীর শতকরা ৯৩ ভাগই ভারতের পক্ষে পড়ে, মাত্র ৭ ভাগ পড়ে পাকিস্তানের পক্ষে। মূল ও ভারী শিল্পকে তুলনার মাপকাঠি হিসাবে বিবেচনা করলে দেখা যায়, শিল্পোন্নয়নের দিক থেকে পাকিস্তান ভারত অপেক্ষা অনেক বেশি পিছিয়ে ছিল। ভারতে যখন ৮৮৭টি মূল ও ভারী শিল্প ছিল, ঠিক সে সময় মাত্র ৩৪টি এ ধরনের শিল্প নিয়ে পাকিস্তানের যাত্রা শুরু হয়। অর্থাৎ মূল ও ভারী শিল্পের দিক থেকে পাকিস্তানের পক্ষে পড়ে মাত্র শতকরা ৪ ভাগ, আর বাকি ৯৬ ভাগই পড়ে ভারতের পক্ষে। এসব কারখানায় কর্মরত শ্রমিক–কর্মচারীদের সংখ্যাকে বিবেচনা করলে দেখা যায়, ভারতের পক্ষে যে কারখানাগুলি পড়ে সেগুলি আয়তনের দিক থেকে অনেক বড়। বড় প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যার দিক থেকে পাকিস্তানের পক্ষে শতকরা ৪ ভাগ প্রতিষ্ঠান পড়লেও, সে সব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল মাত্র শতকরা ২ ভাগ।

পাকিস্তানের অংশে যে শিল্পপতিগণ পড়েছিল তারা শুধু আয়তনেই ক্ষুদ্র ছিল না, শিল্পপতি হিসাবে এদের আত্মপ্রকাশের ইতিহাসও ছিল খুবই সাম্প্রতিক। সারণি ৪.৬ থেকে দেখা যায়, শিল্পপতিদের মধ্যে শতকরা মাত্র ১৭ ভাগের প্রাক্তন পেশা ছিল বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প এবং এদের বর্তমান (১৯৪৭) বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল মোট শিল্প বিনিয়োগের মাত্র শতকরা ১৬ ভাগ। শতকরা ১৮ ভাগ শিল্পপতির প্রাক্তন মূল পেশা ছিল ক্ষুদে শিল্প ও কুটির শিল্প এবং এ ধরনের শিল্পপতিদের এ কালপর্বে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল মাত্র শতকরা ৬ ভাগ। ১৯৪৭ সালে যাদের সর্বাধিক পরিমাণে শিল্প বিনিয়োগ ছিল, তাদের প্রাক্তন মূল পেশা ছিল বড় ব্যবসায় অর্থাৎ এরা আগে আমদানি–রপ্তানি বাণিজ্যের সাথে যুক্ত ছিল। দেশ বিভাগের সমসাময়িককালে এদের সংখ্যা ছিল মোট শিল্পপতির শতকরা ১৭ ভাগ এবং এদের বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল মোট বিনিয়োগের শতকরা ৪০ ভাগ। এ কালপর্বে সংখ্যার দিক থেকে যারা সবচেয়ে বেশি ছিল তাদের প্রাক্তন মূল পেশা ছিল ছোট ব্যবসা। এরা পূর্বে প্রধানতঃ অভ্যন্তরীণ ব্যবসার সাথেই যুক্ত ছিল। ১৯৪৭ কালপর্বে এরা সংখ্যার দিক থেকে মোট শিল্পপতির শতকরা ২৮ ভাগ ছিল এবং এদের বিনিয়োজিত পুঁজির পরিমাণ ছিল শতকরা ২৯ ভাগ। যে শিল্পপতিগণ পূর্বে মূল পেশা হিসাবে চাকুরী বা বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত ছিল, এ পর্যায়ে তাঁদের সংখ্যা ছিল মোট শিল্পপতির শতকরা ১৬ ভাগ এবং এদের বিনিয়োজিত পুঁজির পরিমাণ ছিল শতকরা ৬ ভাগ। যে শিল্পপতিগণ পূর্বে কৃষিজীবী ছিলেন তাদের সংখ্যা শতকরা ৩ ভাগ এবং এদের বিনিয়োগের পরিমাণও ছিল শতকরা ৩ ভাগ। উপরোক্ত তথ্য থেকে দেখা যায় পাকিস্তানের জন্মলগ্নে যাঁরা বড় ও মাঝারি শিল্পের মালিক ছিলেন তাদের প্রাক্তন পেশা ছিল প্রধানত ব্যবসা। ছোট, মাঝারি ও বড় ব্যবসায়িগণই এ সময়ের শিল্পপতিদের সংখ্যার শতকরা ৪৫ ভাগ ছিল; আর এঁদের বিনিয়োজিত পুঁজির পরিমাণ ছিল শতকরা ৬৯ ভাগ। শিল্পপতিদের প্রাক্তণ দ্বিতীয় পেশার দিকে লক্ষ্য করলেও দেখা যায় ব্যবসায়ীদের একক প্রাধান্য। শিল্পপতিদের শতকরা ৬৯ জনের প্রাক্তণ দ্বিতীয় পেশা ছিল ব্যবসা এবং এঁদের বিনিয়োজিত পুঁজির পরিমাণ ছিল মোট শিল্প বিনিয়োগের শতকরা ৪৯ ভাগ। প্রাক্তন দ্বিতীয় পেশা হিসাবে যাঁরা শিল্পপতি ছিল তারা সংখ্যায় শতকরা ৪ ভাগ হলেও এঁদের বিনিয়োজিত পুঁজির পরিমাণ ছিল শতকরা ৩০ ভাগ। যাঁদের প্রাক্তন দ্বিতীয় পেশা ছিল ক্ষুদে শিল্প ও কুটির শিল্প তাদের সংখ্যা মোট শিল্পপতির শতকরা ২৩ ভাগ হলেও তাঁদের বিনিয়োজিত পুঁজির পরিমাণ ছিল শতকরা মাত্র ৭ ভাগ। ১৯৪৭ কালপর্বে যাঁরা শিল্পপতি ছিল তাঁরা কোন্ সামাজিক স্তর থেকে এসেছিল তা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে শিল্পপতিদের পিতার পেশার দিকে লক্ষ্য করলেই।

সারণি–৪.৬ থেকে আরো দেখা যায়, শতকরা মাত্র ৮ জন শিল্পপতির পিতা ছিলেন শিল্পপতি, শতকরা ১৭ জনের পিতা ছিলেন ক্ষুদে শিল্পপতি বা কুটির শিল্পী, শতকরা ১২ জন শিল্পপতির পিতা ছিলেন বড় ব্যবসায়ী অর্থাৎ আমদানি –রপ্তানি কারক; শতকরা ৩৪ জনের পিতা ছিলেন ক্ষুদে ব্যবসায়ী, শতকরা ১৬ জনের পিতা ছিলেন চাকুরীজীবী বা পেশাজীবী এবং মাত্র শতকরা ১২ জনের পিতা ছিলেন কৃষিজীবী। অর্থাৎ মাত্র ৫৮ কোটি টাকার সম্পদ–সমৃদ্ধ যে শিল্প খাতটি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্মলগ্নে অবস্থান করছিল, তার প্রধান অংশটিই ঘিরে ছিল খুবই নব্য শিল্পপতিগণ। এ কালপর্বের শিল্পতিদের শতকরা ৯২ ভাগই এসেছিল অশিল্পপতি সামাজিক স্তর থেকে। ফলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই নব্য শিল্পপতিদের পক্ষে পাকিস্তানের মত একটি বৃহৎ দেশের অর্থনীতিকে নেতৃত্ব দেওয়া মোটেই সম্ভব ছিল না। উপরন্তু, পূর্ব বাংলা তো বটেই, পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প ও ব্যবসা–বাণিজ্যের ব্যাপক অংশও ছিল হিন্দু, জৈন মাড়োয়ারী ও শিখ সমাজের হাতে। এমন একটি ঐতিহাসিক পটভূমিতে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা হয় যে ভারত থেকে যেমন একটি বিরাট সংখ্যক মুসলিম নাগরিক পাকিস্তানে চলে আসে, ঠিক তেমনই পাকিস্তান থেকেও বিপুল সংখ্যক হিন্দু ও শিখ নাগরিক ভারতে চলে যায়। পাকিস্তান থেকে যে অমুসলিম নাগরিকগণ ভারতে চলে যায়, তাদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নাগরিকই ছিল শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী।[৪৯] এই হিন্দু, জৈন, মাড়োয়ারী ও শিখ নাগরিকগণ ভারতে চলে যাবার ফলে পাকিস্তানে দেখা দেয় তীব্র ব্যবসা ও শিল্প সংকট। অবশিষ্ট নব্য ও ক্ষুদ্র শিল্পপতিদের পক্ষে পাকিস্তানের অর্থনীতি বিকাশের নেতৃত্ব দেওয়া তো দুরের কথা, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ন্যূনতম প্রয়োজনটুকু

৪৮. Altaf, Zafar (1983): *Pakistan Enterpreneurs: Their Development*, Characteristics and Attitudes, London: Croom Helm. p:1.

৪৯. সোবহান, রহমান (১৯৮২) ঃ *বুর্জোয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংকট* ঢাকাঃ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, পৃঃ ৭০–৭১

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ৪.৬
পাকিস্তানী শিল্পপতিদের প্রাক্তন পেশার তুলনামূলক চিত্র

প্রাক্তন পেশার ধরণ	শিল্পপতির প্রাক্তন মূল পেশা		শিল্পপতির প্রাক্তন দ্বিতীয় পেশা		শিল্পপতির পিতার পেশা (%)
	শিল্পপতির সংখ্যা (%)	বর্তমান বিনিয়োজিত পুঁজির পরিমাণ (%)	শিল্পপতির সংখ্যা (%)	বর্তমান বিনিয়োজিত পুঁজির পরিমাণ (%)	
১. বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পপতি	১৭	১৬	৪	৩০	৮
২. ক্ষুদে শিল্পপতি ও কুটির শিল্প মালিক	১৮	৬	২৩	৭	১৭
৩. বড় ব্যবসায়ী (আমদানী কারক ও রপ্তানিকারক)	১৭	৪০	৩০	২৫	১২
৪. ছোট ব্যবসায়ী (যারা শুধু অভ্যন্তরীন ব্যবসার সাথে যুক্ত)	২৮	২৯	৩৯	২৪	৩৪
৫. চাকুরীজীবী বা পেশাজীবী	১৬	৬	৪	১২	১৬
৬. কৃষিজীবী	৩	৩	–	১	১২
মোট	৯৯	১০০	১০০	৯৯	১০১

Source: Papanek, G.F. (1971): 'The Development of Enterpreneurship'; in *Enterpreneurship and Economic Development* edited by P.Kilby, New York: The Free Press.

মেটানোও তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ সংকট সমাধানের জন্য সরকারকেই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়। সরকারী উদ্যোগের ফলে সংকটের একাংশকে পুরণ করে ভারত ও অন্যান্য দেশ থেকে আগত মুসলিম শিল্পপতিগণ। আর বাকি অংশ পূরণ করা হয় সরকারীভাবে। শিল্প খাতে পুঁজি বিনিয়োগের মধ্যে দিয়ে সরকারী বিনিয়োগের এ খাতগুলি ছিল প্রধানত সামরিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ, জল বিদ্যুৎ, রেল, টেলিফোন ও বেতারযন্ত্র নির্মাণ কারখানা।[৫০] পাকিস্তানের শিল্প কাঠামোকে গড়ে তোলার স্বার্থে ১৯৪৭–৫২ কালপর্বে সরকারীভাবেই পশ্চিম পাকিস্তানে পুঁজি বিনিয়োগ করা হয় মোট ১১১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।[৫১] এভাবে সরকারের ব্যাপক বিনিয়োগ এবং ভারত ও অন্যান্য দেশ থেকে আগত মুসলিম শিল্পপতিদের বিনিয়োগের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে মোটামুটি দ্রুততার সাথে শিল্প ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটতে থাকে। এই অব্যাহত অগ্রগতির ফলেই, প্রায় শূণ্য থেকে যাত্রা করে মাত্র এক যুগের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন শিল্পের (সামরিক খাতের অধীনস্থ শিল্পকে এখানে ধরা হয়নি) স্থায়ী সম্পদের মূল্য দাঁড়ায় ১৯২ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকায় (সারণি ৪.৭)।

সারণি ৪.৭
পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন শিল্পে স্থায়ী সম্পদের অগ্রগতির ধারা (কোটি টাকার হিসাবে)

খাতের নাম (শতকরা হার)	১৯৫৯–৬০	১৯৬০–৬১	১৯৬১–৬২	১৯৬২–৬৩	১৯৬৩–৬৪	১৯৬৪–৬৫	১৯৬৫–৬৬	১৯৬৬–৬৭	১৯৬৭–৬৮	১৯৬৮–৬৯	১৯৬৯–৭০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১.খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত কারখানা	১৪.১১ –	২২.৬৮ (৬০.৭৪)	২৩.৫৩ (৩.৭৫)	২৪.০৫ (২.২১)	২৭.২৯ (১৩.৪৭)	৪৬.৩৭ (৬৯.৯২)	৬৬.৮০ (৪৪.০৬)	৭৪.১৫ (১১.০০)	৮০.০৮ (৮.০০)	৮৭.৪৬ (৯.২২)	৯৮.৯০ (১৩.০৮)
২. বস্ত্র শিল্প	৬০.৫৮ (–)	৬৬.৩৪ (৯.৫১)	৬৮.৫১ (৩.২৭)	১২২.১৭ (৭৮.৩২)	১০৪.১২ (–১৪.৭৭)	১২৫.২৭ (২০.৩১)	১৪৯.৩০ (১৯.১৮)	১৭৯.১৩ (১৯.৯৮)	২০৫.৩৩ (১৪.৬৩)	২২৪.৪৫ (৯.৩১)	২৩৯.৬৭ (৬.৭৮)
৩. রাসায়নিক ও রাসায়নিকজাত শিল্প	১৬.২৪ –	৬৭.৫০ (৩১৫.৬৪)	৭২.১৭ (৬.৯২)	৭৫.৮৩ (৫.০৭)	৭৭.০১ (১.৫৬)	৭৭.৮২ (১.০৫)	৭৩.০৩ (–৬.১৬)	৮০.০১ (৯.৫৬)	৭৩.৬৪ (–৭.৯৬)	৯৫.৩৭ (২৯.৫১)	১২৩.৯৪ (২৯.৯৬)
৪. অধাতু খনিজ শিল্প (পেট্রোল গ্যাস ও কয়লা)	৯.৭২ –	১০.৫১ (৮.১৩)	৯.৯৪ (৫.৪২)	৯.১১ (৮.৩৫)	২১.১৭ (১৩২.৩৮)	৩৫.৩৭ (৬৭.০৮)	৪৫.৫৫ (২৮.৭৮)	৫২.৬৮ (১৫.৬৫)	৬০.৪১ (১৪.৬৭)	৬১.৩৭ (১.৫৯)	৫৯.০১ (–৩.৮৫)
৫. মৌল ধাতু ও ধাতু নির্ভর সামগ্রী নির্মাণ	৮.৪৬ –	১০.৪৪ (২৩.৪০)	১৮.২৩ (৭৪.৬২)	২১.৮২ (১৯.৬৯)	২৩.২৭ (৬.৬৫)	৩৪.১২ (৪৬.৬৩)	৩৭.৪৪ (৯.৭৩)	৪০.৬৭ (৮.৬৩)	৪৫.২৯ ১১.৩৬)	৪৬.৭১ (৩.১৪)	৪৯.৩৭ (৫.৬৯)
৬. যন্ত্রপাতি নির্মাণ কারখানা (বৈদ্যুতিক সহ)	৬.৭৪ –	৮.৭৪ (২৯.৬৭)	১০.৩৭ (১৮.৬৫)	১২.৯৯ (২৫.২৭)	১৪.৮১ (১৪.০১)	৩২.৩০ (১১৮.১০)	৪৩.৮২ (৩৫.৬৭)	৫১.২১ ১৪.৮৬)	৫৪.৯৯ (৭.৩৮)	৫৭.৯৭ (৫.৪২)	৫৯.৫৩ (২.৬৯)
৭. পরিবহন যন্ত্রপাতি নির্মাণ কারখানা	৭.৭৪ –	৯.০৫ (১৬.৯৩)	৯.৮২ (৮.৫২)	১০.৯৯ (১১.৯১)	১৩.১৫ (১৯.৬৫)	১৪.৭৬ (১২.২৪)	১৫.২৮ (৩.৫২)	১৭.১৩ (১২.১১)	২৪.৪৪ (৪২.৬৭)	২৩.৮১ (–২.৫৮)	২৩.৩৩ (২.০২)
৮. কাগজ ও কাগজ জাত পণ্য নির্মাণ কারখানা	৩.২৪ –	৩.৫২ (৮.৬৪)	৩.৭৫ (৫.৯৭)	৪.০৮ (৯.৩৮)	৪.৫৪ (১১.২৭)	৭.৭৩ (৭০.২৬)	২০.৫০ (১৬৫.২০)	২৫.৫২ (২৪.৪৯)	২৯.৩৩ (১৪.৯৩)	৩৭.০০ (২৬.১৫)	৩৭.৭৪ (২.০০)
৯. অন্যান্য*	৬৫.৫০ –	৭২.৫০ (১০.৬৯)	৭৪.২১ (২.৩৬)	৮০.৩০ (৮.২০)	৯০.১২ (১২.২৩)	৯৮.৪৬ (৯.২৫)	১১০.১৫ (২২.২৩)	১১৭.৮০ (৬.৯৫)	১১৭.৯৭ (০.১৪)	১২১.০৮ (২.৬৪)	১১৭.০১ (–৩.৩৬)
মোট	১৯২.৩৩ –	২৭১.২৮ (৪১.০৫)	২৯০.৫১ (৭.০৯)	৩৬১.৩৪ (২৪.৩৮)	৩৭৫.৪৮ (৩.৯১)	৪৭২.২০ (২৫.৭৬)	৫৬১.৮৭ (১৮.৯৯)	৬৩৭.৩০ (১৩.৬০)	৬৯১.৪৭ (৮.৩৩)	৭৫৫.২২ (৯.২২)	৮০৭.৫০ (৭.০৫)

(১৯৬০–৬৫) পঞ্চবর্ষে গড় অগ্রগতি= ২৯.২১%(১৯৬৫–৭০) পঞ্চবর্ষে গড় বার্ষিক অগ্রগতি = ৮.৭৮%

*অন্যান্য খাতের মধ্যে আছেঃ পানীয়, তামাকজাত দ্রব্য, জুতা, কাঠজাত দ্রব্য, আসবাবপত্র, প্রকাশনা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, চামড়াজাত দ্রব্য, রবারসহ অন্যান্য অনির্ধারিত খাত,

সূত্রঃ A.R. Kamal (1976): "Consistant Time Series Data Relating to Pakistan's Large-Scale Manufacturing Industries", The Pakistan Development Review, vol. XV. No 1. compiled from the appendix Table No 1, pp: 41- 57.

---

৫০. Altaf, Zavar (1983) : op. cit, p: 3.

৫১. রহমান, আতিউর ও লেনিন আজাদ (১৯৯০) *ভাষা আন্দোলনঃ অর্থনৈতিক পটভূমি, ঢাকাঃ* ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড; পরিশিষ্ট.১২, কলাম ৫–৬, পৃঃ১৭১।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের দু'ই অংশের শিল্পের স্থায়ী সম্পদের মূল্য যেখানে ছিল মাত্র ৫৮ কোটি টাকা, সেখানে ১৯৫৯-৬০ কালপর্বে এসে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পের স্থায়ী মুল্য ১৯২ কোটি টাকায় দাঁড়ানো ছিল এক বিরাট ঘটনা। বিশেষতঃ যেখানে হিন্দু, মাড়োয়ারী ও শিখ পুঁজিপতিরা তাঁদের সম্পদ প্রত্যাহার করে ভারতে চলে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে বিশেষতঃ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী (১৯৬০-৬৫) পরিকল্পনাকালে এ অগ্রগতির ধারা আরো বেড়ে যায়। ১৯৫৯-৬০ অর্থবছরে যেখানে শিল্পের স্থায়ী সম্পদের মূল্য ছিল ১৯২ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা (১৯৬০ সালের মুদ্রামানকে স্থায়ী মূল্য ধরে), সেখানে তার পরবর্তী বছর তথা ১৯৬০-৬১ অর্থবছরে শিল্পের স্থায়ী মূল্য দাঁড়ায় ২৭১ কোটি ২৮ লক্ষ টাকাতে। অর্থাৎ স্থায়ী সম্পদের দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এবছর শিল্পের অগ্রগতি হয় শতকরা ৪১.০৫ ভাগ। পরবর্তী বছরগুলিতেও এ অগ্রগতি থেমে থাকে না, ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৬০-৬১ সাল থেকে এর পরবর্তী চার বছর তথা ১৯৬৪-৬৫ সাল পর্যন্ত অগ্রগতির হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ৭.০৯ ভাগ, ২৪.৩৮ ভাগ, ৩.৯২ ভাগ ও ২৫.৭৬ ভাগ। ১৯৬০-৬৫ সালে পঞ্চবর্ষে শিল্পের স্থায়ী সম্পদের মূল্যের বার্ষিক গড় অগ্রগতি ছিল শতকরা ২৯.১০ ভাগ। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পের ব্যাপক অগ্রগতি ও পাকিস্তানের দু'অংশের মধ্যে বৈষম্য তীব্রতর হয়ে ওঠার কারণে তৎকালিন পাকিস্তান সরকার দু'অংশের মধ্যেকার বৈষম্য দূর করার জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তৃতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনাতে (১৯৬৫-৭০) সরকারী খাতে পূর্ব পাকিস্তানে বিনিয়োগের জন্য বরাদ্দ করা হয় যেখানে ৩১০.০ কোটি টাকা, সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ করা হয় মাত্র ১৩৭ কোটি টাকা। ব্যক্তিগত বা বেসরকারী খাতে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান অপেক্ষা কিছু বেশি বরাদ্দ করলেও পশ্চিম পাকিস্তানে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৫৮৭ কোটি টাকা, যা পূর্ব পাকিস্তান অপেক্ষা ১০৩ কোটি টাকা কম।[৫২] কিন্তু তা সত্ত্বেও এ পাঁচ বছরে পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পের অগ্রগতির ধারা থেমে থাকেনি। এ সময়ে শিল্পের স্থায়ী সম্পদের মূল্য ৪৭২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা থেকে ৮০৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকায় পৌঁছেছে। অর্থাৎ এ পাঁচ বছরে অগ্রগতির গড় বার্ষিক হার শতকরা১৪.২৪ ভাগ এবং মোট প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ৩৩৬ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য শিল্প খাতে মোট যে টাকা বরাদ্দ করা হয় তার অর্ধেকও যদি স্থায়ী সম্পদ তৈরিতে বিনিয়োজিত হয় তাহলেও এ অগ্রগতির জন্য আরো প্রায় ৪৩ কোটি টাকার প্রয়োজন হয়। বলা বাহুল্য, অতিরিক্ত টাকা এসেছিল বিভিন্ন ব্যক্তিগত খাত থেকে। অর্থাৎ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী (১৯৬০-৬৫) পরিকল্পনা সমাপ্তির পর পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প এমনই এক শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে সক্ষম হয় যে সে নিজের আত্মগত শক্তির ওপর দাঁড়িয়েই সামনের দিকে অগ্রসর হতে সক্ষম হয়ে ওঠে। ষাটের দশকে পাকিস্তানের শিল্প বিনিয়োগের চরিত্রের ওপর গবেষণা করে রশিদ আমজাদ দেখিয়েছেন, তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বৈদেশিক সাহায্যের হ্রাস প্রাপ্তির ফলে সরকারী বিনিয়োগের পরিমাপ সাংঘাতিকভাবে কমে যায় ,বিভিন্ন অর্থ লগ্নি কারী প্রতিষ্ঠানও পর্যাপ্ত ঋণ প্রদানে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশের প্রধান শিল্পগুলির ওপর কোন নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া পড়ে না। অভ্যন্তরীণ উৎসগুলির ওপর দাড়িয়েই তৃতীয় পরিকল্পনাকালে পাকিস্তানের মূল ও ভারি শিল্পগুলি ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করে।[৫৩] রশিদ আমজাদ ষাট দশকের প্রধান প্রধান ৯৬টি শিল্প-কারখানার ওপর গবেষণা করে দেখিয়েছেন সরকারী পুঁজির প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও এ কারখানাগুলির ওপর কোন নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া পড়েনি। শিল্পের অগ্রগতির প্রবাহমান ধারাকে নির্দেশ করে আমজাদ দেখিয়েছে-

" This suggests that the more severe restrictions on investment by the government during this period of third plan didnot affect our sample of firms"[৫৪]

আর তাই তো দেখা যায়, সামগ্রিকভাবে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পের অগ্রগতি তৃতীয় পরিকল্পনাকালেও প্রায় সমহারেই অব্যাহত থাকে। শিল্পের অগ্রগতির প্রকৃত চিত্রটি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন মূল্যমানের ভিত্তিতে শিল্প-পণ্য উৎপাদনের পরিমাণে অগ্রগতির ধারার প্রতি লক্ষ্য করা হয়। সারণি-৪.৮ থেকে দেখা যায়, খাদ্য-দ্রব্য প্রস্তুত শিল্পে যেখানে ১৯৫৯-৬০ অর্থ বছরে উৎপাদিত হয়েছিল ৫৫ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকার পণ্য, সেখানে ১৯৬৯-৭০ উৎপাদন হয় ৩৪১ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকার পণ্য; রাসায়নিক ও রাসায়নজাত শিল্পে যেখানে ১৯৫৯-৬০ অর্থবছরে মাত্র ২১ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকার পণ্য উৎপাদিত হয়, সেখানে ১৯৬৯-৭০ অর্থ বছরে ১৭৯ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার পণ্য উৎপাদিত হয়। বিদ্যুৎজাত যন্ত্রসহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্পে যেখানে ১৯৫৯-৬০ অর্থবছরে মাত্র ১৫ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকার পণ্য উৎপাদিত হয়, সেখানে ১৯৬৯-৭০ অর্থবছরে উৎপাদিত হয় ১৪২ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা মূল্যের পণ্য।কাগজ ও কাগজজাত পণ্য নির্মাণ শিল্পে ১৯৫৯-৬০ অর্থবছরে উৎপাদিত হয় যেখানে মাত্র ৪ কোটি ১৩ লক্ষ টাকার পণ্য, সেখানে ১৯৬৯-৭০ অর্থবছরে উৎপাদিত হয় ৯৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা মূল্যের পণ্য। এভাবে বস্ত্র শিল্প, পরিবহন যন্ত্রপাতিসহ বিভিন্ন শিল্পে এ কালপর্বে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়। সারণি-৪.৮ থেকে আরো দেখা যায়, ১৯৫৯-৬০ অর্থবছরে শিল্প খাতে মোট ৫৮৫ কোটি ২৯ লক্ষ টাকার পণ্য উৎপাদিত হয়। কিন্তু মাত্র ১০ বছর পর তথা ১৯৬৯-৭০ অর্থবছরে উৎপাদিত হয় ২১৯৬ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা মূল্যের পণ্য। অর্থাৎ মাত্র ১০ বছরে পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্প-পণ্য উৎপাদনের পরিমাণ চার গুণে গিয়ে উন্নিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধিকে বিবেচনা করেও দেখা যায়, এ সময়ে মাথাপিছু শিল্প উৎপাদনও ব্যাপক হারে বেড়ে গেছে। ১৯৫৯-৬০ অর্থবছরে পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু শিল্প-পণ্য উৎপাদনের মোট মূল্য ছিল ১৪৬ টাকা, ১৯৬৯-৭০ সালে তা' বেড়ে ৩৬৬ টাকায় গিয়ে উন্নিত হয়।[৫৫]

---

৫২. Soofi , Anwar Khan (1968): "Evolution of Indus trial policy and Pattern in Pakistain", *Pakistan in the development decade: patteru and Peuformance,* Editid by Agha M. Ghouse, Lahore: The Economic Development Seminar, p: 37.

৫৩. Amjad, Rahid (1976): 'A study of Investment Behaviour in Pakistan, 1972-70", The Pakistan Development Review, Vol. XV, No. 2, P: 149

৫৪. Ibid, P. 147

৫৫. ১৯৫১ সালের জনগণনা অনুসারে পশ্চিম পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যা ছিল ৪ কোটি ২৮ লক্ষ। ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ সাল এ ১০ বছরে যে হারে পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, সেই একই হার বজায় থাকলে ১৯৬৯-৭০ সাল পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যার পরিমাণ ৬ কোটিকে অতিক্রম করার কথা নয়, তবে ১৯৭২ সালের জনগণনাতে দেখা যায়, পাকিস্তানের জনসংখ্যা দাড়িয়েছে ৬ কেটি ৪১ লক্ষ। এখানে মাথাপিছু শিল্পোৎপাদনকে বের করার জন্য ১১৯৫৯-৬০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যা ধরা হয়েছে ৪ কোটি এবং ১৯৬৯-৭০ সালে ধরা হয়েছে ৬ কোটি। তথ্যের জন্য দেখুন,
Krotki, Karol J. and Parveen, Khalida (1976), " Population Size and Growth in Pakistan: Early Reperts of 1972 Ceusus", The pakistan Development Review,Vol.XV, No .3, Table-1, pp: 298- 99.

সারণি - ৪.৮

মূল্যমানের ভিত্তিতে পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্প পণ্য উৎপাদনে উন্নয়ন ধারা (কোটি টাকার হিসাব)

খাতের নাম	১৯৫৯-১৯৬০	১৯৬০-১৯৬১	১৯৬১-১৯৬২	১৯৬২-১৯৬৩	১৯৬৩-১৯৬৪	১৯৬৪-১৯৬৫	১৯৬৫-১৯৬৬	১৯৬৬-১৯৬৭	১৯৬৭-১৯৬৮	১৯৬৮-১৯৬৯	১৯৬৯-১৯৭০
১. খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত কারখানা	৫৫.৯৩	৭১.৭৩	৮৭.৬৪	১০৩.৫৫	১০৬.৩৪	১৯৩.৭৭	২১৪.৪৭	২০৯.৯৩	২০৮.৪৮	২৭৯.৯২	৩৪১.৩৬
২. বস্ত্র শিল্প	১৪৪.৫৮	১১২.৭৭	১০৩.৪৪	১৫৪.৯০	১৬৫.২৮	১৯৭.৩৭	২০২.২৩	২৪৯.২০	৩৯৩.৯৭	৪১৫.২৩	৪২৫.১১
৩. রাসায়নিক ও রাসায়নিকজাত শিল্প	২১.৮৩	৮১.৬৮	৭৭.৯৪	৭১.৯৫	৮৬.৪৭	১০১.৮৬	১০৩.৫৯	৮৯.৬৩	৯১.১৮	১৩৩.৫১	১৭৯.২৫
৪. অধাতু খনিজ শিল্প (পেট্রল, গ্যাস ও কয়লা)	১৪.৬৬	১৪.৩৯	১২.৩৩	১০.৩৭	১৭.৮৩	৪০.৫০	২৪.০২	৫৪.২৮	৭৭.৪৪	৬১.৯৮	৪৩.৩৫
৫. মৌল ধাতু ও ধাতু নির্ভর সামগ্রী নির্মাণ	২২.০৪	২৯.২৮	৫৫.৪৮	৬৯.৭৮	৫৯.৮৪	৯৯.৬৭	৯৫.১১	৯৬.৪৯	১৪১.৮৩	১২৯.১৩	১১৮.৩৮
৬. যন্ত্রপাতি নির্মাণ কারখানা (বিদ্যুৎজাতসহ)	১৫.৩৮	১৮.৬৭	২১.০৯	২৪.২৪	২৮.৮০	৬৬.৪৫	৯০.৬৮	১১০.৭৩	১৩১.৫৫	১৩৮.৬৪	১৪২.৬৬
৭. পরিবহন যন্ত্রপাতি নির্মাণ কারখানা	১১.৮৮	১১.৬৭	১০.৩১	৮.৮৯	২৩.২৫	২৮.২৮	২৪.৩৭	৩৩.১০	৪৭.৭৯	৪৬.১৯	৪৪.৭৩
৮. কাগজ ও কাগজজাত পণ্য নির্মাণ কারখানা	৪.১৩	৬.৩৬	৮.৫৮	১০.৮১	১০.৮৮	১৩.০৭	৪০.৭২	৪২.০৩	৬৮.৫৬	৯১.০৩	৯৪.৭৫
৯. অন্যান্য*	২৯৪.৮৬	২৭৯.০৯	২৫৫.২৫	২১০.৪৫	৫৬২.৭৪	৪৩৭.৯৫	৪৯৭.৩৮	৫৪২.৩৯	৬৭০.৩৯	৭৩৮.৩৮	৮০৭.৩৪
মোট	৫৮৫.২৯	৬২৫.৬৪	৬৩২.২১	৬৬৪.৯৪	১০৬১.৪৩	১১৭৮.৯২	১৩০২.৫৭	১৪২৭.৭৮	১৮৩৯.১৯	২০৩৪.০১	২১৯৬.৯৩
	–	(৬.৮৯)	(১.০৫)	(৫.১৮)	(৫৯.৬৩)	(১১.০৭)	(১০.৪৯)	(৯.৬১)	(২৮.৮১)	(১০.৫৯)	(৮.০১)

*অন্যান্য খাতের মধ্যে আছেঃ পানীয়, তামাকজাত দ্রব্য, জুতা, কাঠজাত দ্রব্য, আসবাবপত্র, প্রকাশনা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, চামড়াজাত দ্রব্য ও রাবার সহ অনির্ধারিত বিভিন্ন খাত।

সূত্রঃ A.R. Kamal (1976): "Constant Time Series Data Relating ot Pakistanis Large-Scale Manaufacturing Industires" in The Pakistan Development Review, Vol. XV. No. 1, Compiled from the Appendix Table 1, pp. 41-57.

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩ শিক্ষা

কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রেই যে শুধু ষাটের দশকে পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপক অগ্রগতি ঘটেছে তা নয়, শিক্ষা ক্ষেত্রেও এ সময় সেখানে ব্যাপক অগ্রগতি ঘটেছে। নাওসিন মাহমুদ তার এক প্রবন্ধে (১৯৭৮) পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পরবর্তী ২৫ বছরে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে ব্যাপক অগ্রগতি ঘটেছে তার একটি বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরেছেন।[৫৬] মাহমুদ অবশ্য ১০ বছরের নিচের বয়সের শিক্ষিত কিশোরদেরকে শিক্ষিত বলে গণ্য করেন নি। তার সংজ্ঞা অনুসারে ১০ বছর কিংবা তার বেশি বয়সের এমন সব মানুষকেই শিক্ষিত বলে বিবেচনা করা যায় যারা যে কোন একটি ভাষায় লিখতে, পড়তে এবং বুঝতে পারে।[৫৭] তিনি দেখিয়েছেন ১০ বছর কিংবা তার বেশি বয়সের মানুষ ১৯৫১, ১৯৬১ এবং ১৯৭২ সালে যথাক্রমে ২ কোটি ২৭ লক্ষ, ২ কোটি ৬৫ লক্ষ এবং ৪ কোটি ২৯ লক্ষ জন ছিল। তিনি দেখিয়েছেন, পশ্চিম পাকিস্তানে প্রথম দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সেভাবে ঘটেনি, ১৯৫১–৬১ কালপর্বে উক্ত বয়সের জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেছে মাত্র শতকরা ১৬.৭৪ ভাগ, কিন্তু এ দশকে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৬২.৫২ ভাগ। অবশ্য, এ পর্যায়ে শিক্ষার হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেলেও মহিলাগণ সেভাবে এগিয়ে আসতে পারেনি। উক্ত দশকে মহিলা জনগোষ্ঠীর বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১৭.৩ ভাগ কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রে তাদের বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র শতকরা ১১.৬৬ ভাগ। অন্যদিকে, পুরুষ জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগত বৃদ্ধির হার মহিলাদের থেকে কম (১৬.২৬ %) থাকলেও শিক্ষার দিক থেকে তাদের বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৮৪.০০ ভাগ। পরবর্তী দশকেও পুরুষদের শিক্ষা ক্ষেত্রে এ অগ্রগতির হার অব্যাহত থাকে; তবে মহিলাদের ক্ষেত্রে এ দশকে এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটে। ১৯৬১–৬২ কালপর্বে পশ্চিম পাকিস্তানে শিক্ষিত মহিলার সংখ্যা শতকরা ১২৮.৫১ ভাগ বেড়ে যায়। (দ্রষ্টব্যঃ সারণি ৪.৯)।

সারণি ৪.৯

পশ্চিম পাকিস্তানে শিক্ষিতেব হারে পরিবর্তন

	মোট জনসংখ্যা			মোট শিক্ষিত জনসংখ্যা			শিক্ষিত জনগণের হার		
	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭২	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭২	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭২
পুরুষ	১২,৩৯৬,২০৬	১৪,৪১১,৯৪১	২৩,৩৫১,৪৬০	২,১১০,৬৭৮	৩,৮৮৩,৬৫৬	৭০৪৪,৫১৫	১৭.০	২৬.৯	৩০.২
(পরিবর্তনের শতকরা হার)	–	(১৬.২৬)	(৬২.০৩)	–	৮৪.০০)	(৮১.৩৯)	–	(৫৮.২৪)	(১২.২৭)
মহিলা	১০,৩১৬,১৮৫	২,১০০,৯৯৮	১৯,৫৬৫,৪৫০	৮৯১,২৯৮	৯৯৫,২১০	২,২৭৪,১৭৭	৮.৬	৮.২	১১.৬
(পরিবর্তনের শতকরা হার)	–	(১৭.৩০)	(৬১.১৫)	–	(১১.৬৬)	(১২৮.৫১)	–	(–৪.৬৫)	(৪১.৪৬)
মোট	২২,৭১২,৩১১	২৬,৫১২,৯৩৯	৪২,৯১৬,৯১০	৩,০০১,৯৭৬	৪,৮৭৮,৮৬৬	৯.৩১৮,৭৭২	১৩.২	১৮.৪	২১.৭
(পরিবর্তনের শতকরা হার)	–	(১৬.৭৪)	(৬১.৮৯)	–	(৬২.৫২)	(৯১.০০)	–	(৩৯.৩৯)	(১৭.৯৩)

*শিক্ষিত ব্যক্তির সংজ্ঞাঃ ১০ বছর কিংবা তার বেশী বয়সের এমন সব মানুষকেই শিক্ষিত বলে বিবেচনা করা হবে যারা যে কোন একটি ভাষায় লিখতে, পড়তে এবং বুঝতে পারে (Who were able to read and write in some language with understanding)

Source: Naushins Mahmood (1978) : 'Literacy and Educational Attainment Levels in Pakistan's : 1951-1973 : in The Pakistan Development Review vol,XVII.No3. compiled from the Table -1.p.271.

মাহমুদ প্রদত্ত তথ্য দ্বারা নির্মিত সারণি–৪.৯ থেকে দেখা যায় ১৯৬১–৭২ কালপর্বে পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষিত জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৯১.০০ ভাগ। সারণি ৪.৯ থেকে আরো দেখা যায়, ১৯৫১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানে শিক্ষিত জনসংখ্যার হার ছিল শতকরা ১৩.২ ভাগ; তার মধ্যে পুরুষরা ছিল শতকরা ১৭ ভাগ আর মহিলাদের শিক্ষিতের হার ছিল শতকরা ৮.৬ ভাগ। ১৯৬১ সালে সেখানে শিক্ষিতের হার ছিল শতকরা ১৮.৪ ভাগ– এর মধ্যে পুরুষদের মধ্যে শিক্ষিতের হার ছিল ২৬.৯ ভাগ এবং মহিলাদের শতকরা ৮.২ ভাগ। ১৯৭২ সালে শিক্ষিতের হার শতকরা ২১.৭ ভাগে গিয়ে উন্নিত হয়, এ পর্যায়ে পুরুষ নাগরিকদের মধ্যে শিক্ষিতের হার ছিল শতকরা ৩০.২ ভাগ আর মহিলাদের মধ্যে এ হার ছিল শতকরা ১১.৬ ভাগ। শিক্ষা ক্ষেত্রে এই ব্যাপক অগ্রগতির কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হামজা আলাভী (১৯৭৬) মত প্রকাশ করেছেন, সরকারী দপ্তর, সেনাবাহিনী এবং শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ব্যাপকভাবে চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টির ফলেই প্রথম দিকে শিক্ষা ক্ষেত্রে বেশ বড় রকমের অগ্রগতি ঘটে, তবে সে সময় অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ এলাকাগুলিতে সেভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটেনি। আলাভীর মতে যে কোন তরুণ শিক্ষিত হলেই পিতার খামারের কাজে অংশগ্রহণ করা অপেক্ষা শহরের চাকুরিকেই বেশি পছন্দ করতো, ফলে বিত্তবান কৃষক পিতাগণই বরং সন্তানদের শিক্ষার প্রতি তেমন উৎসাহ দেখাতো না, কিন্তু যে অঞ্চলের মানুষ কৃষির ওপর সেভাবে নির্ভর করতে পারতো না, সে অঞ্চলের লোকেরা সন্তানের, বিশেষতঃ পুরুষ সন্তানের শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগী ছিল।[৫৮] আলাভী আরো মতপ্রকাশ করেছেন, যে পর্যায়ে কৃষি ব্যাপকভাবে যান্ত্রিক চাষাবাদের আওতায় চলে আসলো, উন্নত বীজ, কীটনাসক ঔষুধ, সার, বিদ্যুৎ বা অপরাপর যন্ত্র ব্যবহার কৃষি উৎপাদনের জন্য অপরিহার্য উপাদানে পরিণত হল, তখন কৃষকের উৎপাদন ব্যবস্থাকে স্বার্থকভাবে চালু রাখার জন্য বিদ্যাশিক্ষা অপরিহার্য হয়ে পড়লো।[৫৯] সারণি–৪.৯–এর তথ্য আলাভীর এ বক্তব্যকেই সত্য প্রতিপন্ন করে।

১৯৫১, ১৯৬১ ও ১৯৭২ সালের জনগণনা রিপোর্টের তথ্যকে পাশাপাশি স্থাপন করে শিক্ষার স্তরকে মাত্রা হিসাবে ধরে যদি পশ্চিম পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীকে স্তরবিন্যাস করা যায় তাহলে শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতির প্রকৃত চিত্রটি ফুটে উঠবে। সারণি–৪.১০–এ রকম একটি চিত্র তুলে ধরার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।[৬০]

---

৫৬. Mahmood, Naushin (1978), "Literaey and Educational Attainment Levels", Pakistan: 1951-1963' in The Pakistan Development Review, Vol. XX11, No 3. .

৫৭. Ibid,P:211.

৫৮. Alavi, Hamza (1976) : op.cit. p. 327.

৫৯. Ibid, P: 327

৬০. জনগণনার তিনটি পর্বে শিক্ষিত ব্যক্তির সংজ্ঞাঃ তিন রকম। ১৯৫১ সালের জনগণনাতে সংজ্ঞা হিসাবে নির্ধারণ করা হয়, যে কোন একটি ভাষায় লিখতে পড়তে পারলেই সে শিক্ষিত। এ সংজ্ঞার সমস্যা হল যারা আরবী লিখতে বা পড়তে পারে, তাদের কেউ শিক্ষিত বলে গণ্য করা হয়, ফলে অসংখ্য অউর্দুভাষী

Dhaka University Institutional Repository

সারণি নং-৪.১০
পশ্চিম পাকিস্তানে শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতির ধারা

		মোট জনসংখ্যার বিন্যাস								শিক্ষিত জনসংখ্যার বিন্যাস		
		মোট জনসংখ্যা	মোট শিক্ষিত জনসংখ্যা	শিক্ষিত জনসংখ্যার হার (%)	প্রাথমিক শিক্ষার হার (%)	প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক	ডিগ্রি ও তার উপরে	প্রাথমিক শিক্ষার নিচে	প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক	মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক	ডিগ্রি ও তার উপরে
১৯৫১	পুরুষ	১২,৩৯৬,২০৬	২,১১০,৬৭৮	১৭.৩	৪.০	১০.৯	১.৬	০.৪	৩২.৫	৬৪.৫	৯.৫	২.৫
	মহিলা	১০,৩১৬,১৮৫	৮৯১.২৯৮	৮.৬	৪.০	৪.২	০.৪	০.১	৪৬.৭	৪৮.৪	৪.২	০.৭
	মোট	২২,৭১২,৩৯১	৩,০০১,৯৭৬	১৩.২	৪.০	৭.৮	১.২	০.৩	৩০.৪	৫৯.৭	৭.৯	২.০
১৯৬১	পুরুষ	১৪,৪১১,৯৪১	৩,৫৪২,১৬৩	২৪.৬	৭.৪	১৩.১	৩.৫	০.৫	৩০.১	৫৩.৫	১৪.৪	১.৯
	মহিলা	১২.১০০.৯৯৮	৭৭৮,৭৩৩	৬.৪	২.৪	৩.৪	০.৬	০.১	৩৬.৭	৫২.৬	৯.৩	১.৩
	মোট	২৬,১২৯,৯৩৯	৪,৩২০,৮৯৬	১৬.৬	৫.১	৮.৭	২.২	০.৩	৩১.৩	৫৩.৩	১৩.৫	১.৮
১৯৭২*	পুরুষ	২৩,৩৫১.৪৬০	৮,৬৬১,০০৮	৩৭.৩	৬.৯	২০.৩	৮.৭	১.৪	১৮.৯	৫৪.৩	২৩.২	৩.৯
	মহিলা	১৯,৫৬৫,৪৫০	২,৪৮১,৪০৪	১২.৯	২.৭	৭.০	২.৯	০.৪	২০.৭	৫৩.৯	২২.১	৩.২
	মোট	৪২,৯১৬,৯১০	১১,১৪২,৪৯২	২৬.৩	৫.০	১৪.৩	৬.১	১.০	১৮.৯	৫৪.২	২২.৯	৩.৮

*এখানে ধর্মীয় বা মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিতদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

Sources: GOP. Karachi Sensusof Pakistan 1951 VO1.1 . pp.9-12.
Cesnsus Organization, GOP Karachi, Census of Pakistan Census 1961. VOl.1. pp.iV-66
GOP, Islamabad, The 1972 Census, VOl,1.pp.24-26

সারণি-৪.১০ থেকে দেখা যায়, ১৯৫১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের মোট জনগোষ্ঠীর শতকরা ১৩.২ ভাগ শিক্ষিত ছিল। এ শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর প্রধান অংশ তথা শতকরা ৫৯.৭ ভাগ ছিল প্রাথমিক বা নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষিত লোক, শতকরা ৭.৯ ভাগ ছিল মাধ্যমিক ও উচচ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষিত ব্যক্তি এবং শতকরা ২ জন ছিল ডিগ্রীধারী। অর্থাৎ সে সময় ডিগ্রীধারী লোকের সংখ্যা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে মোট ৬৮ হাজার জন। সন্দেহ নেই সে সময় এই ৬৮ হাজার ব্যক্তিই তৎকালীন পাকিস্তানের সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি অলংকৃত করেছিল। ৪.১০নং সারণিতে ১৯৬১ সালের যে চিত্র পাওয়া যায় তাতেও ডিগ্রীধারী ব্যক্তির সেরকম কোন অগ্রগতি ঘটতে দেখা যায় না। তবে এ পর্যায়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি দেখা যায়। কিন্তু ১৯৭২ সালের যে তথ্য উক্ত সারণিতে পাওয়া যায়, তাতে ডিগ্রীধারী শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর এক ব্যাপক বিকাশকেই প্রতিফলিত করে। এ সময়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষিত গণগোষ্ঠীরও ব্যাপক সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে। এ পর্যায়ে যারা শিক্ষিত জনগোষ্ঠী হিসাবে গণ্য হয়েছিল তাদের শতকরা ৩.৮ ভাগ ছিল ডিগ্রীপ্রাপ্ত এবং শতকরা ২২.৯ ভাগ ছিল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় শিক্ষিত। অর্থাৎ এ পর্যায়ে পশ্চিম পাকিস্তানে ডিগ্রীপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যাই ছিল ৪ লক্ষ ২৯ হাজার জন এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরেরের শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৬ লক্ষ ২৭ হাজার জন। এই মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রীপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিয়ে এই শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা দাঁড়ায় মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭ ভাগ এবং মোট শ্রমশক্তির শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানের শিল্পে ও কৃষিতে যতই বিকাশ ঘটুক না কেন, এই বিশাল শিক্ষিত জনসংখ্যাকে আত্মীকরণ করার ক্ষমতা তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের থাকার কথা নয়, কেননা ১৯৬১ সালের জনগণনার তথ্য থেকেই দেখা যায়, শুধু পশ্চিম পাকিস্তানেই এ সময় বেকার (অর্থাৎ কাজ পেতে খুবই উৎসাহী কিন্তু তা পায় না) সংখ্যা ছিল প্রায় ২ লক্ষ জনের মত।[৬১] অথচ এ সময় মাধ্যমিক পর্যায় ও তার থেকে বেশি শিক্ষিত লোকের সংখ্যা নারী-পুরুষ মিলিয়ে ছিল মোট মাত্র ৪ লক্ষ ১৫ হাজার। সারণি ৪.১১ থেকে দেখা যায়, উক্ত বেকার লোক সবাই ছিল অকৃষি শ্রমশক্তির অংশ, ফলে এদের অধিকাংশই যে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষিত তা বলাই বাহুল্য।

১৯৬১ সালের জনগণনা অনুসারে পশ্চিম পাকিস্তানের মোট সামাজিক শ্রমশক্তির সংখ্যা ছিল ১ কোটি ২৭ লক্ষ ৬৩ হাজার ২৪ জন; তার মধ্যে কৃষিশ্রম শক্তির হার ছিল শতকরা ৫৯.৩১ ভাগ এবং অকৃষি শ্রমশক্তির হার ছিল শতকরা ৪০.৬৯ ভাগ। অকৃষি শ্রমশক্তির প্রধান অংশ নিয়োজিত ছিল শিল্প ও সরকারী চাকুরিতে। শিল্পে নিয়োজিত শ্রমশক্তির সংখ্যা ছিল ১৭ লক্ষ ৮ হাজার ৫৬৭ জন, আর সরকারী চাকুরিতে নিয়োজিত শ্রমশক্তির সংখ্যা ছিল ১৬ লক্ষ ৭৯ হাজার ৩৩৩ জন, অর্থাৎ শিল্পে ও সরকারী চাকুরিতে নিয়োজিত শ্রমশক্তির হার ছিল সমগ্র সামাজিক শ্রমশক্তির যথাক্রমে শতকরা ১৩.৩৯ ভাগ ও ১৩.১৬ ভাগ। এ সময় নির্মাণ কর্মে নিয়োজিত শ্রমশক্তির সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৬১ হাজার ৭৪৯ জন, গণসংযোগ ও পরিবহন খাতে নিয়োজিত শ্রমশক্তির সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার ৩৭৬ জন, বাণিজ্যে ৮ লক্ষ ৭৭ হাজার ২৫৩ জন, বেকার ১ লক্ষ ৯১ হাজার ৩৮১ জন এবং অন্যান্য যেমন বন, মৎস্য ও পশুপালন, খনিজ সম্পদ, জনসেবা, বীমাসহ বিভিন্ন খাতে নিয়োজিত শ্রমশক্তির সংখ্যা ১ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫৮১ জন। অর্থাৎ অকৃষি খাতে যে শ্রমশক্তি নিয়োজিত ছিল তার শতকরা ৩২.৮০ ভাগ শিল্পে, ৩২.২৪ ভাগ সরকারী চাকুরিতে, ১৬.৮৪ ভাগ বাণিজ্যে, ৬.৪৬ ভাগ গণসংযোগ ও পরিবহনে, ৫.০৩ ভাগ নির্মাণ কাজে, ৩.৬৭ ভাগ বেকার এবং বাকি ২.৬৭ ভাগ অন্যান্য নানাবিধ খাতে নিয়োজিত ছিল (দ্রষ্টব্যঃ সারণি ৪.১১)।

কোরান পাঠেসক্ষম অশিক্ষিত নাগরিককেও শিক্ষিত নাগরিক হিসাবে গণ্য করা হয়। এ সংজ্ঞা পূর্ব বাংলার জন্য মোটেই উপযুক্ত না হলেও পশ্চিম পাকিস্তানের যে নাগরিক উর্দুভাষা বোঝে এবং কোরান পড়তে ও আরবী বর্ণমালা লিখতে জানে সে আরবী শিক্ষিত না হলেও উর্দু ভাষায় শিক্ষিত বটে; কেননা উর্দু ভাষা লিখিত হয় আরবী বর্ণমালা ব্যবহার করেই। এ অসুবিধা দূর করে পাকিস্তানের দু'অংশের জনগণের জন্য একটি সাধারণ সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে ১৯৬১ সালের জনগণনায় ব্যাপক সংখ্যক ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিকে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর আওতা বহির্ভূত করা হয়। ১৯৭২ সালের জনগণনার জন্য আর আগের সংজ্ঞাতে স্থীর থাকার প্রয়োজন ছিল না। এরকম সব ভিন্নতার কারণেই সারণী ৪.৮ ও সারণী ৪.৯-এর মধ্যে সংখ্যাগতভাবে কিছু বৈসাদৃশ্য দেখা যায়।

৬১. Census of Pakistan 1961 (1964) : *Non agriculheral Labour fource; West Pakistan* , Islamabad; GOP, vol. 6. part. 11, P: 1381.

সারণি -৪.১১

১৯৬১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের সামাজিক শ্রমশক্তির (১০বছরের ঊর্ধে) পেশাগত বিন্যাস(শতকরা হার)

প্রধান খাতসমূহ	সংখ্যা	হার (%)	প্রযুক্তিবিদ ও পেশাজীবী	প্রাসন ও ব্যবস্থাপনা	কেরাণী*	দোকান কর্মচারী	কৃষি	খনি শ্রমিক	যোগাযোগ শ্রমিক	শিল্প শ্রমিক	দক্ষ নির্মাণ	সাধারণ শ্রমিক · কর্মী	সেবা ও অন্যান্য খাত	মোট	অকৃষি শ্রমশক্তির বিন্যাস
মোট সামাজিক শ্রম শক্তি	১,২৭,৬৩,০২৪	১০০.০০	১.৭৬	০.৭৭	২.৯৫	৬.০৬	৬০.০০	০.১৩	২.৩১	১২.৪৪	১.৪৪	৪.৪৭	৭.৪৯	১০০.০০	-
মোট কৃষি শ্রমশক্তি	৭৫,৬৯,২৪০	৫৯.৩১	-	-	-	-	১০০.০০	-	-	-	-	-	১০০.০০	-	
মোট অকৃষি শ্রমশক্তি	৫১,৯৩.২৪০	৪০.৬৯	৪.৩৪	১.৮৯	৭.২৭	১৪.৯২	১.৬৯	০.৩৩	৫.৬৮	৩০.৬১	৩.৫৪	১১.০১	১৪.৪৩	১০০.০০	১০০
শিল্প	১৭,০৮,৫৬৭	১৩.৩৯	১ ০.২৬	১.০০	১.৮৬	০.১৪	০.১১	-	০.৮৫	৮৯.৭০	৩৪১	১.৭৫	০.৮৮	১০০.০০	৩২.৮০
নির্মাণ	২,৬১.৭৭৯	২.০৫	১.৮০	৩৪৭	১.০০	-	-	-	০.৪১	১.৭১	৩৭.০৫	৫৪.০৪	০.৪৯	১০০.০০	৫.০৩
যোগাযোগ ও পরিবহন	৩,৩৬,৩৭৬	২.৬৪	০.৫৭	১.২১	১০.৭৭	-	-	-	৭৩.০৪	২.১৩	১.১৪	৭.০১	৪.০৬	১০০.০০	৬.৪৬
বাণিজ্য	৮,৭৭,২৫৩	৬.৮৭	০.০৫	৫.১৯	১.২৩	৮৭.৫৬	২.৫৪	-	০.২৯	০.৩১	০.৩৩	২.১৯	০.২৩	১০০.০০	১৬.৮৪
সরকারী চাকুরী	১৬,৭৯,৩৩৩	১৩.১৬	১২.৬০	১.২০	১৬.০২	০.১১	০.১২	-	১.৬৬	১.৮৮	০.৬০	১৯.৭৭	৪৫.৯৬	১০০.০০	৩২.৪৬
বেকার	১,৯১,৩৮১	১.৫০	০.৫৫	০.০৯	২.৩০	১.২৫	০.৩২	০.০৫	০.৯৮	৪.৪১	১.০২	১২.৬৪	৭৬.৪৩	১০০.০০	৩.৬৭
অন্যান্য**	১,৩৮,৫৮১	১.০৯	১.২৮	১.৫৯	১৭.১৬	১.০২	৪৪.৪১	১২.০৪	১.৩৮	৪.৭৬	৭.৪৮	২.০৬	৬.৫০	১০০.০০	২.৬৭

* টেলিফোন-টেলিগ্রাম অপারেটর, টিকেট সংগ্রাহক ও পরিদর্শক, ডাককর্মী ইত্যাদি

** অন্যান্যের মধ্যে আছে বন, মৎস্য ও পশু পালন, খনিজ সম্পদ, জনসেবা ও বীমা

Census of Pakistan– Population 1961 (1964) : Non-Agricultural Labour Force, 1961 ; West, Pakistan, vol. 6, port-(ii), Islamabad ; GOP. compiled from pp:1380-81.

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ৪.১১ থেকে দেখা যায়, শিল্প খাতে যে শ্রমশক্তি নিয়োজিত ছিল তার শতকরা ৮৯.৭০ ভাগ শিল্পশ্রমিক, এছাড়া শতকরা ০.৩১ ভাগ দক্ষ নির্মাণকর্মী, ১.৭৫ ভাগ সাধারণ শ্রমিক, ০.৮৫ ভাগ যোগাযোগ শ্রমিক, ০.১১ ভাগ কৃষি শ্রমিক, ০.১৪ ভাগ দোকান কর্মচারী, ১.৮৬ ভাগ কেরাণী, ১.০০ ভাগ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার কাজিতে নিয়োজিত, ০.২৬ জন প্রযুক্তিবিদ ও পেশাজীবী এবং বাকি শতকরা ৩.৮৮ ভাগ নিয়োজিত সেবা ও অন্যান্য খাতে। সরকারী চাকুরিতে নিয়োজিত শ্রমশক্তির প্রধান অংশ তথা শতকরা ৪৫.৯৬ ভাগ নিয়োজিত সেবা ও সেবামূলক অন্যান্য খাতে। এছাড়া শতকরা ১২.৯০ ভাগ প্রযুক্তিবিদও পেশাজীবী, ১.২০ ভাগ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত, ১৬.০২ ভাগ কেরাণী, ০.১২ ভাগ কৃষি-শ্রমিক, ১.৬৬ ভাগ যোগাযোগ-শ্রমিক, ১.৮৮ ভাগ শিল্প শ্রমিক, ০.৯০ ভাগ দক্ষ নির্মাণকর্মী এবং বাকি ১৯.২২ ভাগ সাধারণ শ্রমিক। বাণিজ্যে নিয়োজিত শ্রমশক্তির প্রধান অংশ দোকান কর্মচারী হিসাবে নিয়োজিত ছিল। এই দোকান কর্মচারিগণ মোট বাণিজ্যে নিয়োজিত শ্রমশক্তির শতকরা ৮৭.৫৬ ভাগ। এছাড়া বাণিজ্যে নিয়োজিত শ্রমশক্তির ০.০৫ ভাগ প্রযুক্তিবীদ ও পেশাজীবী, ৫.১৯ ভাগ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত, ১.২৩ ভাগ কেরাণী, ২.৫৪ ভাগ কৃষির সাথে জড়িত, ০.২৯ ভাগ যোগাযোগ-শ্রমিক, ০.৫১ ভাগ শিল্প-শ্রমিক, ০.৩৩ ভাগ দক্ষ নির্মাণকর্মী, ২.১৯ ভাগ সাধারণ শ্রমিক এবং বাকি ০.২৩ ভাগ সেবা ও অন্যান্য কাজে নিয়োজিত। নির্মাণ খাতে নিয়োজিত শ্রমশক্তির প্রধান তিনটি বিভাগ হচ্ছেঃ সাধারণ শ্রমিক, দক্ষ নির্মাণকর্মী এবং প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা – এ তিনটি বিভাগে নিয়োজিত শ্রমশক্তির হার যথাক্রমে শতকরা ৫৬.০৪ ভাগ, ৩৭.০৫ ভাগ ও ০.৫২ ভাগ। যারা সেবার খাতের শতকরা ৭৬.২৩ ভাগ সেবামূলক কাজে নিয়োজিত, শতকরা ১২.৬২ ভাগ সাধারণ শ্রমিক এবং শতকরা ২.৩৩ ভাগ কৃষিভিত্তিক পেশায় নিয়োজিত। এভাবে সমস্ত অকৃষি শ্রমশক্তিকে যদি মোট ১১টি ভাগে ভাগ করা যায়, তাহলে দেখা যায় উক্ত ৯১ লক্ষ ৫৩ হাজার ২৪০ জন ব্যক্তির শতকরা ৪.৩৫ ভাগ নিয়োজিত প্রযুক্তিবীদ ও পেশাজীবি হিসাবে, ১.৮৯ ভাগ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কাজে, ৭.২৭ ভাগ কেরাণী, ১৪.৯২ ভাগ দোকান কর্মচারী, ১.৬৯ ভাগ কৃষি, ০.৩৩ ভাগ খনি শ্রমিক, ৫.৯৮ ভাগ যোগাযোগ-শ্রমিক, ৩০.৯১ ভাগ শিল্প-শ্রমিক, ৩.৫৪ ভাগ দক্ষ নির্মাণকর্মী, ১১.০১ ভাগ সাধারণ শ্রমিক এবং শতকরা ১৪.৪৩ ভাগ সেবাকর্মসহ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। ইতিপূর্বেকার তাত্ত্বিক আলোচনার আলোকে উক্ত ১১টি বিভাগকে প্রধান ৪টি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। এই শ্রেণীগুলি হচ্ছেঃ ১. বুর্জোয়া ২. পেটিবুর্জোয়া-১,৩. পেটিবুর্জোয়া-২ এবং ৪. শ্রমিক। বুর্জোয়া শ্রেণীতে পড়বে প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ। পেটি বুর্জোয়া-১ এ পড়বে প্রযুক্তিবীদ ও পেশাজীবী জনগোষ্ঠী, পেটি বুর্জোয়া-২ -এ পড়বে কেরাণী, দোকান কর্মচারী, দক্ষ নির্মাণকর্মী এবং সেবা ও -এ ধরনের অন্যান্য কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ। আর শ্রমিক-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবে কৃষিতে নিয়োজিত অকৃষক কর্মী, খনি শ্রমিক, যোগাযোগ শ্রমিক, শিল্প-শ্রমিক ও সাধারণ শ্রমিকগণ। এই বিভাগের ভিত্তিতে ১৯৬১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের অকৃষিজ শ্রম শক্তিকে শ্রেণী প্রকৃতির ভিত্তিতে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করলে নিম্নরূপ চিত্রটি ফুটে ওঠে।

সারণি-৪.১২
পশ্চিম পাকিস্তানের অকৃষি শ্রমশক্তির শ্রেণী বিন্যাস

শ্রেণির নাম	শ্রমশক্তির সংখ্যা	শ্রমশক্তির শতকরা হার
১. বুর্জোয়া শ্রেণী	৯৮,৯৫২	১.৮৯
২. পেটি বুর্জোয়া-১	২,২৫,৩৮৭	৪.৩৫
৩. পেটি বুর্জোয়া-২	২০,৮৭,৬০৫	৪০.১৬
৪. শ্রমিক শ্রেণী	২৭,৮৫,৯৮৭	৫৩.৬১
মোট	৫১,৯৫,২৪০	১০০.০৫

৪.৫ রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টাঃ নতুন সামাজিক স্তরের উত্থান

১৯৬১ সালের জনগণনা এমন একটি সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল যখন পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিবাদী বিকাশের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এ ধারা সূচিত হয়। এক হিসাব থেকে দেখা যায় ১৯৪৮-৪৯ থেকে ১৯৫৩-৫৪ এই ৬ বছরে পাকিস্তানের উন্নয়ন বাজেটে মোট বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ১৩১৬ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা এবং এ অর্থের মধ্যে ১২৫২ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকাই ব্যয় করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে।[৮২] অন্য এক হিসাব থেকে দেখা যায়, ১৯৪৮-৫২ কালপর্বে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার মোট ৫৩৪ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করে, এ অর্থের মধ্যে ৫৭০ কোটি ১৮ লক্ষ টাকাই ব্যয় করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন খাতের উন্নয়নের জন্য।[৮৩] শক্তিশালি সেনা গঠনের নামে নতুন রাজধানি, সামরিক দপ্তর ও সরকারী উদ্যোগে শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য উক্ত বিপুল অর্থ ব্যয় করা হয়।[৮৪] অবশ্য সরকারী উদ্যোগে শিল্প প্রতিষ্ঠা শুরু হয় ১৯৫২ সাল থেকে এবং শিল্পের ব্যক্তিগত খাতকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যেই এ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। কেননা ইতিপূর্বে ব্যক্তিগত খাতে যে শিল্পগুলি গড়ে উঠেছিল তা অস্বাভাবিকভাবে বর্ধিতহার শক্তির দিকে যাচ্ছে, আর সে কারণেই প্রয়োজন হয় সরকারী সহযোগীতার। এ সময় তৎকালীন পাকিস্তান সরকার নিজ উদ্যোগে লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে থাকে এবং তা শিল্পপতিদের কাছে নাম মাত্র মূল্যে বিক্রি করে দিতে থাকে। এভাবেই মূলত পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প বিকাশের গোড়াপত্তন হয়।[৮৫] শিল্পের দ্রুত বিকাশের জন্য সরকার যেসব নীতি গ্রহণ করে সেগুলোর মধ্যে দিয়ে শিল্পপতিগণ উচ্চমূল্যে শিল্প-পণ্য বিক্রির সুযোগ পায়, মুদ্রার বিনিময়মূল্য বেড়ে যাওয়ার কারণে আমদানি বাণিজ্য লাভজনক হয়ে উঠে এবং নিম্ন মজুরীতে শ্রমিক সংগ্রহ করাও হয়ে ওঠে সহজতর। আকবর আলতাফ এ প্রসঙ্গে বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন -

---

৮২. হোসেন, আনিসুর ও প্রমিত অজয় (১৯৯০) প্রাগুক্ত, পরিশিষ্ট ১১, পৃ- ২৬৮-৭০।
৮৩. Government of Pakistan (1956): Statistical year Book of East Pakistan Daka: Planning Department, East pakistan. vol. 111, p.626.
৮৪. হোসেন, আনিসুর ও প্রমিত অজয় (১৯৯০) ঃ প্রাগুক্ত, পৃ.১০০।
৮৫. Altaf, Zafar (1983): op.cit. p.3. 21.

Dhaka University Institutional Repository

"In 0rder to accelerate industrialization the policy intruments used by the government consisted of an overvalued exchange rate, exchange and import controls (direct and indirect), compulsory procurement of food grains at prices below the market level for industrial labour, a low level of direct taxation and a very heavy indirect taxation"[৬৬]

এই নীতির ফলে পঞ্চাস ও ষাটের দশকে খুবই দ্রুত গতিতে শিল্পের বিকাশ ঘটে বটে, কিন্তু ব্যাপক উদ্যোগ সত্ত্বেও কৃষি উন্নয়ন স্থবিরতার সম্মুখীন হয়। অবশ্য ষাটের দশকে এসে সরকারের প্রধান দুটি পদক্ষেপের কারণে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এ পদক্ষেপ দুটি হচ্ছেঃ ১. ব্যাপক হারে বিভিন্ন ধরনের সাহায্য প্রদান; এবং ২. বাজার মূল্য অপেক্ষা বেশি দামে ফসল ক্রয়ের নিশ্চয়তা প্রদান।[৬৭] যাহোক, পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পের দ্রুত বিকাশের পিছনে আরো একটি উপাদান বিশেষভাবে ভূমিকা পালন করে, আর তা হচ্ছে বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণের সুবিধা লাভ।

সারণি-৪.১৩

১৯৪৭-৭০ কালপর্বে পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পোন্নয়নের লক্ষ্যে আগত বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণের খতিয়ান

(মিলিয়ন ডলার)

বৈদেশিক সাহায্যের ধরন	প্রথম পরিকল্পনার পূর্বে (১৯৪৭-৫৫)	১ম পরিকল্পনা (১৯৫৫-৬০)	২য় পরিকল্পনা ১৯৬০-৬৫০	৩য় পরিকল্পনা (১৯৬৫-৭০)
সাহায্য (Grants)	২১৫.৬	৫৭৮.২	১,১০৫.২	৭০৩.৯৭
ঋণ (Loans)	১২১.২	৯৬.৬	১,৮০৬.২	২,২৩৩.১
মোট	৩৩৬.৮	৬৭৪.৮	২,৯১১.৪	২,৯৩৭.৭

সূত্রঃ Altaf, Zafar (1983): Pakistani Enterpreneurs London: crom Helm; Table1.11, p.13.

উপরে যে সাহায্যের খতিয়ান দেওয়া হয়েছে তার পুরোটাই ব্যবহৃত হয়েছিল ভোগ্যপণ্য তৈরির কাঁচমাল, আধা কাঁচামাল ও শিল্প-কারখানার যন্ত্রপাতি আমদানির কাজে।[৬৮] এ ছাড়া এ কালপর্বে পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পের শুধু মাত্র ব্যক্তি মালিকানা খাতকে সম্প্রসারিত করার জন্য আই, এম, এফ ১.৭৩ বিলিয়ন ডলার মূল্যের অর্থ অনুমোদন করে।[৬৯] ফলে পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পের ব্যক্তিগত খাত খুব দ্রুত বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়।

উপরোক্ত তথ্যের পাশাপাশি ৪.১৩নং সারণির দিকে লক্ষ্য করলে আরো একটি চিত্র ফুটে ওঠে। উক্ত সারণি থেকে দেখা যায়, প্রথম পরিকল্পনার সমাপ্তি পর্যন্ত বৈদেশিক সাহায্যের শতকরা প্রায় ৮৬ ভাগই অফেরৎযোগ্য অনুদান বা সাহায্য হিসাবে আসে, ফলে এ পর্ব পর্যন্ত কোন দায় ছাড়াই শিল্প বিকাশকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব হয় কিন্তু এর পর থেকে উক্ত বৈদেশিক সাহায্যের প্রধান অংশই আসে ঋণ হিসাবে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে তো শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই আসে ঋণ হিসাবে। তাছাড়া পঞ্চাশের দশকে তৎকালীন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আগত মুসলিম সম্প্রদায়ের বিনিয়োগকারীগণও ব্যক্তি খাতে বিপুল পরিমাণে পুঁজি বিনিয়োগ করে, কিন্তু ষাটের দশকে এ ধরনের কোন ব্যক্তিগত পুঁজিবিনিয়োগ হতে দেখা যায় না। ফলে, ৬০ দশকে এসে পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পের অগ্রগতি ক্রমেই বৈদেশিক পুঁজিনির্ভর হয়ে ওঠে। অন্য দিকে, যে আই, এম এফ (IMF) ঋণ পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্প বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল, সেই ঋণের শর্ত ছিল তিন বছরেরমধ্যে ঋণের সমুদয় টাকা ফেরৎ দেওয়ার।[৭০] ফলে এ পর্যায়ে পশ্চিম পাকিস্তানে পুঁজিঘন শিল্পের প্রতি আগ্রহ বেড়ে যায়। পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প বিকাশের গোড়াতে শিল্পের মূলরূপ ছিল ভোগ্যপণ্য উৎপাদন এবং প্রধানতঃ সেগুলি ছিল খুবই সাধারণ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প।[৭১] কিন্তু পরবর্তীকালে শিল্পের পুঁজিঘন খাতে বিনিয়োগের প্রবণতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।[৭২] আর আই,এম, এফ, থেকে স্বল্প মেয়াদী ঋন সুবিধা পাওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবেই এ প্রবণতা দ্রুততর হয়। আর এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে শিল্প,ব্যাংকিং, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশেক বাণিজ্যসহ অকৃষি খাতের অধিকাংশ সম্পত্তির মালিকে পরিণত হয় কয়েকজন ব্যক্তি (এ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের চরিত্র বিষয়ক অন্য একটি অধ্যায়ে)। ফলে এ সকল বৃহৎ মালিকসকল তাদের সমস্ত কারবারে পুঁজিঘন শিল্পের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিতে থাকে। এ প্রবণতার প্রতিক্রিয়া কি রকম হয়েছিল তা বোঝার জন্য মূল ও ভারী শিল্প খাতটির দিকে লক্ষ্য করলেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ইতিপূর্বে ৪.৭ ও ৪.৮ নং সারণিতে দেখা গেছে, ১৯৫৯-৭০ কালপর্বে ভারী শিল্পের পুজি বিনিয়োগ ও উৎপাদন মাত্রা ব্যাবকভাবে বেড়ে গেছে, কিন্তু এই একই সময়ে এসব শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিক কর্মচারী সংখ্যা সেই একই হারে বাড়েনি। বরং কোন কোন সময় হ্রাস পেয়েছে। বিশেষ করে, ষাটের দশকের শেষে দিকে এসে শ্রমিক কর্মচারী সংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে শুরু করে (দ্রষ্টব্যঃ সারণি ৪.১৪)। সারণি ৪.১৪থেকে দেখা যায় দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বেশ দ্রুত গতিতে শ্রমিক-কর্মচারী সংখ্যা বাড়তে থাকে। একমাত্র ১৯৬৩-৬৪ অর্থবছরে এদের সংখ্যা হ্রাস পেলেও পরবর্তী বছর শতকরা ১৪.৪৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। তৃতীয় পরিকল্পনার গোড়ার বছর শ্রমিক-কর্মচারী সংখ্যা বৃদ্ধির হার কিছুটা কম হলেও (১.৬৫% পরবর্তী দু'বছর খুব দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি ঘায়। ১৯৬৬-৬৭ ও ১৯৬৭-৬৮ অর্থবছরে শ্রমিক-কর্মচারী সংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ১১.৩২ ভাগ ও ৩০.৩০ ভাগ। কিন্তু এর পর থেকে ধস নামা শুরু হয়। উন্নত প্রযুক্তি সমৃদ্ধ নতুন নতুন কারখানা প্রতিষ্ঠা ও নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হলেও ব্যাপকভাবে শ্রমিক-কর্মচারী সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। শুধু মাত্র ১৯৬৮-৬৯ অর্থবছরেই ভারী শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মচারী সংখ্যা প্রায় ৪৩ হাজার হ্রাস পায়। ভারী শিল্পের এই ক্রমহ্রাসমান ধারা পরবর্তী বছরও অব্যাহত থাকে। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার ও পুঁজি ঘন শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সবচেয়ে

---

৬৬. Ibid, p:4.
৬৭. Ibid, p:4
৬৮. Ibid,p:14.
৬৯. Ibid,pp:13-14.
৭০. Ibid,p:14.
৭১. Ibid,p:5.
৭২. Ibid,p:18.

Dhaka University Institutional Repository

বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় বস্ত্র শিল্প, অধাতুখনিজ শিল্প, মৌল ধাতু ও ধাতু-নির্ভর সামগ্রী নির্মাণ শিল্প, কাগজ ও কাগজজাত পণ্য নির্মাণ শিল্প এবং প্রকাশনা শিল্পসহ অন্যান্য শিল্প। এসব ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে কিছু দক্ষ ব্যক্তির নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি ও ছিটো

সারণি-৪.১৪
পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন ভারী শিল্পে কর্মরত সদস্য সংখ্যা অগ্রগতির ধারা (হাজার লোকের হিসাব)

খাতের নাম	১৯৫৯-৬০	১৯৬০-৬১	১৯৬১-৬২	১৯৬২-৬৩	১৯৬৩-৬৪	১৯৬৪-৬৫	১৯৬৫-৬৬	১৯৬৬-৬৭	১৯৬৭-৬৮	১৯৬৮-৬৯	১৯৬৯-৭০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১. খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত কারখানা	২৩.০৭	২৫.১২	২৭.১৬	২৯.২১	২৫.২৩	৩৮.৬৮	৪৩.০৮	৩৭.৬৬	৪৭.১৬	৪৮.৩৪	৪৯.৫১
২. বস্ত্র শিল্প	১৬৬.৮২	১৫২.৫৭	১৩০.১৬	১৭৮.০০	১৭৭.৩৭	১৮৫.৩৭	১৯১.৮২	২২২.৫৬	৩২০.৮০	৩১৪.২৩	২৮৩.৮৬
৩. রাসায়নিক ও রাসায়নিক জাত শিল্প	১৪.১১	৪৭.২৫	৪৩.৩০	৩২.৮৮	২৯.২৮	৩০.৪৪	২৭.৮১	২৪.৫৬	২৭.৪১	৩৮.১৫	৪২.৭৬
৪. অধাতু খনিজ শিল্প (পেট্রোল গ্যাস ও কয়লা)	১২.৬৩	১২.৬১	১০.৯৪	৮.৮২	১২.৮২	২৭,৫২	১৪.৫২	৩৪.৩৩	৩৪.৫৯	২৪.৫৫	১৮২৯
৫. মৌল ধাতু ও ধাতু নির্ভর সামগ্রী নির্মাণ কারখানা।	৩০.২৪	৩৮.৭৬	৭০.৬০	৮৪.৫৯	৫২.৫৩	৭৬.৫৩	৭৫.০৮	৭১.৮৪	৮৮.৯০	৮৩.২৬	৮০.১৭
৬. যন্ত্রপাতি নির্মাণ কারখানা (বিদ্যুৎজাতসহ)	১৯.১৫	২৫.৫২	৩১.১৯	৩৯.৪৮	৩৬.২৫	৫৭.৮৫	৭৪.৫৮	৮১.৪১	৯৩.৯০	৯৪.২২	৮৯.১৯
৭. পরিবহন যন্ত্রপাতি নির্মাণ কারখানা	১৩.৬৫	১৪.৪৭	১৩.৭৫	১৩.৬০	২৪.৫৮	১৪.৮৪	২১.২০	১৯.৬৬	২৯.৬৮	৩০.৯৫	৩১.২২
৮. কাগজ ও কাগজজাত পণ্য নির্মাণ কারখানা	২.৫৬	৩.২২	৩.৮৬	৪.৫৪	৪.৬৮	৪.৮০	১০.৪২	১৪.৬২	২৩.০৪	২২.২৩	১৪.২৯
৯. অন্যান্য**	১১৯.৭৪	১১৯.০৩	১১২.০৭	১২১.৭৩	১৪০.৪২	১৩৯.৮৪	১২৬.৮৭	১৪৫.০১	১৮৩.৫৯	১৮০.৮৯৩	১৭৩.৭৫
মোট	৪০১.৯৭	৪৩৮.৫৫	৪৪৩.০৩	৫১২.৯৫	৫০৩.১৬	৫৭৫.৮৭	৫৮৫.৩৮	৬৫১.৬৫	৮৪৯.০৭	৮০৬.৬১	৭৮৩.০৪
	-	(৯.১০)	(১.০২)	(১৫.৭৮)	(-১.৯১)	(১৪.৪৫)	(১.৬৫)	(১১.৩২)	(৩০.৩০)	(-৫.০০)	(-২.৯২)

**অন্যান্য খাতের মধ্যে আছে পানীয়, তামাকজাত দ্রব্য, সূতা, কাঠজাত দ্রব্য, আসবাব পত্র, প্রকাশনা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, চামড়াজাত দ্রব্য, রবার সহ অন্যান্য অনির্ধারিত খাত,
A.R. Kamal (1976) : "consistant time series Data Relating to Pakistans largescale Monufacturing Industries" in The Pakistan Development Reveiw, vol.xv, No,1, compiled from the Appendix table-1, pp: 41-57.

সুবিধাজনক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে সত্য, কিন্তু পুরোনো প্রযুক্তি ব্যবহারে অত্যন্ত অসংখ্য শ্রমিক-কর্মচারী নতুন প্রযুক্তির বিবেচনায় অদক্ষ জনশক্তিতে পরিণত হয় এবং ব্যাপক হারে বেকার হতে থাকে। ফলে সারণি ৪.১৪-তে ষাটের দশকের শেষ ভাগে এসে শ্রমিক-কর্মচারী হ্রাসের যে চিত্র ফুটে উঠেছে, বাস্তব অবস্থা ছিল এর চেয়েও ভয়াবহ। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে শিল্প ক্ষেত্রে সরকারী সহায়তা হ্রাস করার ফলে দেশীয় অর্থলগ্নীকারক প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভরশীল খুদে ও মাঝারি শিল্পগুলি প্রচন্ডভাবে পুঁজি সংকটের মুখোমুখি হয়। অন্য দিকে, বৃহৎ প্রতিষ্ঠানসমূহ আই. এম. এফ-এর কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ ঋণ পেয়ে খুব দ্রুতগতিতে উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পুঁজিঘন শিল্পসমূহ গড়ে তুলতে থাকে। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিপুলসংখ্যক নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম তিন বছরে শ্রমিক-কর্মচারীদের যে ব্যাপক বৃদ্ধির চিত্র সারণি ৪.১৪-তে ফুটে উঠেছে তা উক্ত ঘটনারই প্রতিফলন। এই নতুন ও পুঁজিঘন খাতে পরবর্তী দু'বছর প্রায় একই হারে কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হতে থাকে, কিন্তু পুরোনো প্রযুক্তি ব্যবহারকারী শ্রমঘন শিল্পগুলি প্রথম তিন বছর কোনক্রমে টিকে থাকার পর এ সময়ে এসে একেবারে ধ্বংসের মুখোমুখি হয়। এভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।[৭৩]

সারণী-১৫
পশ্চিম পাকিস্তানে ১৯৫৯- ১৯৭০ কালপর্বে বৃহৎ শিল্প-কারখানার স্থায়ী সম্পদের মূল্য, উৎপাদিত পণ্যের মূল্য এবং শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মচারী সংখ্যার অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র।

খাতের নাম	১৯৫৯-৬০	১৯৬০-৬১	১৯৬১-৬২	১৯৬২-৬৩	১৯৬৩-৬৪	১৯৬৪-৬৫	১৯৬৫-৬৬	১৯৬৬-৬৭	১৯৬৭-৬৮	১৯৬৮-৬৯	১৯৬৯-৭০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ক. শিল্প কারখানার স্থায়ী সম্পদের মূল্য (কোটি টাকা)	১৯২.৩৩	২৭১.২৮	২১০.৫১	৩৬১.৩৪	৩৭৫.৪৮	৪৭২.২০	৫৬১.৮৭	৬৩৮.৩০	৬৯১.৪৭	৭৫৫.২২	৮০৮.৫০
খ. উৎপাদিত পণ্যের মূল্য (কোটি টাকা)	৫৮৫.২৯	৬২৫.৬৪	৬৩২.২১	৬৬৪.৯৪	১০৬১.৪৩	১১৭৮.৯২	১৩০২.৫৭	১৪২৭.৭৮	১৮৩৯.১৯	২০৩৪.০১	২১৯৬.৯৩
গ. শিল্প কারখানায় কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারী সংখ্যা(হাজারে	৪০১.৯৭	৪৩৭.৫৫	৪৪৩.০৩	৫১২.৯৫	৫০৩.১৬	৫৭৫.৮৭	৫৮৫.৩	৬৫১.৬৫	৮৪৯.০৭	৮০৬.৬১	৭৮৩.০৪

৭৩. Ahmed, FeroZ (1972):"Structure and contradiction in Pakistan", *Imperialism and Revlution in South Asia,* Edited by kathleen Gough and Hari p.Sharma, Newyork; Monthly Review press. pp:178-79.

Dhaka University Institutional Repository

রেখা চিত্র নং-২

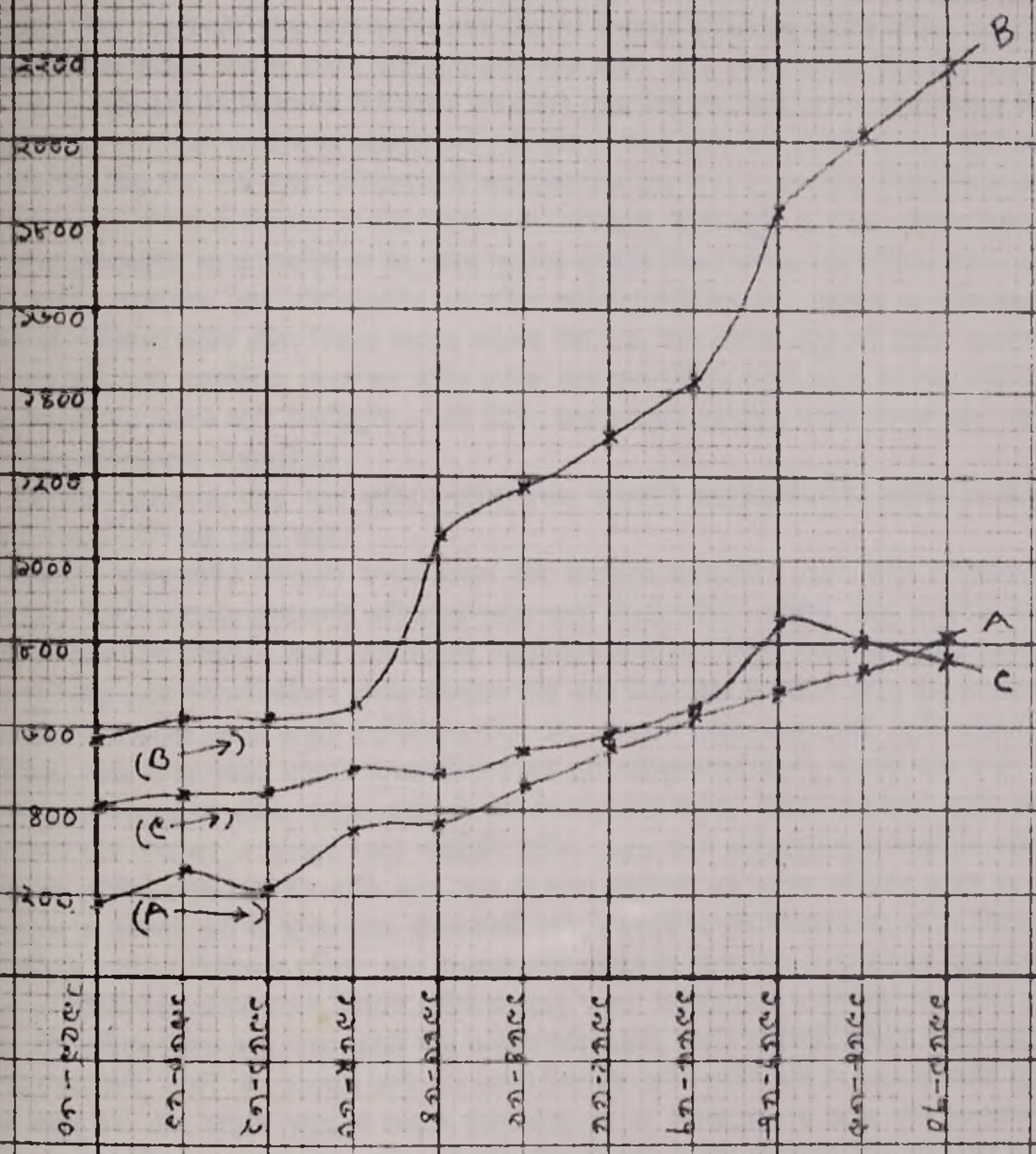

A = শিল্প কারখানার মোট উৎপাদনের মূল্য নির্দেশক রেখা (কোটি টাকার হিসাবে)

B = উদ্বৃত্ত [illegible] মূল্য নির্দেশক রেখা (কোটি টাকার হিসাবে)

C = শিল্প কারখানায় কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারী সংখ্যা নির্দেশক রেখা (হাজার লোকের হিসাবে)

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ৪.১৫ -তে বৃহৎ শিল্পের স্থায়ী মূল্যে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য এবং উক্ত শিল্পে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারী সংখ্যার পরিবর্তন ধারার ওপর একটি তুলনামূলক চিত্র দেওয়া হয়েছে। এখানে ১৯৫৯-৬০ থেকে ১৯৬৯-৭০ কালপর্বে উক্ত তিনটি খাত যে পরিবর্তন হয়েছে তা থেকে দেখা যায় প্রথম দুটি খাতে এ সময় ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। উক্ত ১১ বছরে শিল্প-কারখানার স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রায় সাড়ে চার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, উৎপাদিত শিল্পপণ্যের বৃদ্ধি ঘটেছে প্রায় চার গুণ কিন্তু শ্রমিক-কর্মচারী সংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ দ্বিগুণের চেয়েও অনেক নিচে। প্রথম ৯ বছরে শ্রমিক কর্মচারী সংখ্যা দ্বিগুণের চেয়ে বেশ কিছু বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি পেলেও শেষ দু'বছর এদের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে ৬৬ হাজারেরও বেশি। ১নং রেখা চিত্রের দিকে তাকালে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়ে উঠবে। এ চিত্র থেকে দেখা যায় শিল্প-কারখানার স্থায়ী সম্পদ নির্দেশক রেখাটি সবচেয়ে নিচে থেকে শুরু হয়েছে কিন্তু তার গতি কখনই নিচের দিকে নয় এবং অব্যাহতভাবে ওপরের দিকে উঠতে উঠতে ১৯৬৯-৭০ সালে এসে শ্রমিক-কর্মচারী নির্দেশক রেখাটিকে অতিক্রম করে গেছে। উৎপাদিত পণ্যের মূল্য নির্দেশক রেখাটিও সব সময় উপরের দিকে উঠেছে। তবে তা কখনও তীর্যকভাবে আবার কখনও সামান্য অবনতভাবে কিন্তু তার উপরে ওঠার ধারা কখনও থেমে যায় নি। উপরোক্ত দুটি রেখার তুলনায় শ্রমিক-কর্মচারী সংখ্যার অগ্রগতির ধারা ছিল খুব শ্লথ এবং অস্থির। প্রায় B রেখার কাছাকাছি থেকে শুরু করেও সেটা কখনও কখনও স্থির হয়ে পড়েছে, কখনও নিচের দিকে সামান্য নেমে গেছে এবং আবার কখনও তীর্যকভাবে উপরে উঠে গেছে কিন্তু শেষ দিকে এসে ধারাবাহিকভাবে নিচে নেমে A রেখা ভেদ করে নিচেই নেমে এসেছে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে ঠিক যে সময় থেকে উক্ত রেখাটি নিচের দিকে অব্যাহতভাবে নামতে শুরু করে ঠিক তার কিছু দিন পরই সারা পাকিস্তানব্যাপী আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। C রেখাটির নিচের দিকে নেমে যাওয়ার সাথে উক্ত আন্দোলনের কোন সম্পর্ক যে ছিল না, সে কথা বলা যাবে না। যাইহোক, উন্নত প্রযুক্তি ও পুঁজিঘন শিল্পের বিকাশের ফলে যে শুধু শ্রমঘন বৃহৎ কলকারখানাগুলিই পরাস্থ হয়েছিল তা নয়, সমস্ত ক্ষুদ্রশিল্প ও কুটির শিল্পের ওপরও তার ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে প্রকটভাবে। শিল্পখাত ছাড়াও ব্যবসা-বাণিজ্যেও বৃহৎ পরিবারগুলির একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিভাবে এ পরিবারগুলির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা পাকিস্তান রাষ্ট্রের চরিত্র বিষয়ক অধ্যায়ে পরিষ্কার করা হবে; তবে এখানে এটুকু বলা যায়ঃ একদিকে, ব্যাপক হারে শিক্ষিত জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সাথে তাল মিলিয়ে অকৃষি খাতে কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি না হওয়া এবং তার ওপর শ্রমিক কর্মচারীদের ব্যাপক হারে চাকুরিচ্যুতি – এই ত্রিবিধ কারণে অকৃষি শ্রমশক্তির অত্যন্ত ব্যাপক অংশ ষাটের দশকের শেষ পর্যায়ে এসে ব্যাপক অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হয়।

উপরোক্ত আলোচনার মধ্যে দিয়ে ষাটের দশকের পশ্চিম পাকিস্তানী সমাজের উৎপাদন পদ্ধতির যে চিত্র ফুটে ওঠে তা সংক্ষেপে নিম্নোক্ত উপায়ে বর্ননা করা যেতে পারে।

মোটামুটি সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক-প্রধান কৃষি ব্যবস্থাকে সাথে নিয়ে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তনের জন্ম হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের তিনটি এলাকার গ্রামাঞ্চলই গুটিকয়েক সামন্ত প্রভুর নিয়ন্ত্রণে ছিল। পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এই তিনটি এলাকার মধ্যে সিন্ধুতেই সামন্ত অধিপতিদের নিয়ন্ত্রণ ছিল সার্বাধিক। সিন্ধুর সামন্তপতিগণ এত বেশি ভূসম্পত্তির মালিক ছিল যে, এ ভূসম্পত্তি থেকে সামান্য পরিমাণ খাজনা আসলেও তার ওপর নির্ভর করে অনায়াসে শহরে জীবনযাপন করা সম্ভব ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলের আরো একটি বৈশিষ্টসূচক দিক হল, সেখানে শহরে বসবাসকারী ভূমি অভিজাতদের নিয়ন্ত্রণ ছিল প্রায় একচেটিয়া। গ্রামে বসবাসকারী মাঝারি সামন্তপতিগণও এই ভূমি অভিজাতদের অনুগত থাকতে বাধ্য হ'ত। এরা ভূমি অভিজাতদের হয়ে কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা তুলতো এবং ভূমি অভিজাতদের কাছে অনুগত থাকতে বাধ্য হত। ষাটের দশকের আগে গোটা পশ্চিম পাকিস্তানের গ্রাম সমাজের এ অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। ১৯৫৯ সালে আইয়ুবের ভূমি সংস্কারের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানী ভূমি কাঠামোতে মৌলিক কোন পরিবর্তন হয়নি সত্য, তবে উৎপাদন পদ্ধতিতে এক ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। এ ভূমি সংস্কারের মধ্য দিয়ে প্রধান যে ঘটনাটি ঘটে তা হচ্ছেঃ গ্রামে বসবাসকারী মাঝারি ভূস্বামিগণ ভূমি অভিজাতদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি পায়। সেই সাথে কৃষিতে ব্যাপক যান্ত্রিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হওয়াতে গ্রামে অবস্থানরত সামন্তপতি ও জোতদাররা বুর্জোয়া কৃষকে পরিণত হয়। ভূমি সংস্কার ও যান্ত্রিকীকরণ প্রক্রিয়ার ফল হিসাবে গ্রামীণ সমাজের ক্ষমতা কাঠামোতেও আমুল পরিবর্তন সূচিত হয়। গ্রামের পরিবারগুলি প্রধান ৫টি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েঃ একটি ক্ষুদ্র ও দুর্বল সামন্ত শ্রেণী, একটি শক্তিশালী বুর্জোয়া কৃষক শ্রেণী, একটি বিশাল স্বনির্ভর মাঝারি কৃষক শ্রেণী, একটি ক্ষুদ্র ভাগচাষী শ্রেণী এবং একটি দিনমজুর শ্রেণী। গ্রামীণ কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বুর্জোয়া কৃষকগণের ব্যাপক মুনাফা অর্জন করা এবং তাদের শহুরে না হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, সরকারের পক্ষ থেকে কৃষি উৎপাদন উপকরণে ব্যাপক ভর্তুকি প্রদান এবং সরকারীভাবে ফসলের মূল্য বেঁধে দেওয়াতে পুঁজিবাদী কৃষি ব্যবস্থা লাভজনক কৃষি ব্যবস্থাতে পরিণত হয়। আর মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি করার মত তখনও এমন ব্যাপক অংশ জমি যান্ত্রিক চাষের আওতা বহির্ভূত রয়ে গিয়েছিল যাকে প্রান্তিক কৃষকগণকে নিঃস্ব করে ও বর্গাকৃষকের চেয়ে বেশি ভাড়া প্রদানের বিনিময়ে তা যান্ত্রিক চাষের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব ছিল।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরুতে জনসাধারণের দিক থেকে শিল্পোদ্যোগের প্রতি তেমন কোন আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়নি। শুরুতে ভারত এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে আগত মুসলমান শিল্পপতিগণ অল্প অল্প করে শিল্পোদ্যোগ শুরু করে। কার্যত বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভর করে সরকারী শিল্পোদ্যোগের মাধ্যমেই পাকিস্তানের শিল্পায়ন শুরু হয়। আর পাকিস্তান সরকার অত্যন্ত স্বল্প মূল্যে এ সমস্ত শিল্প-কারখানাগুলি গুটিকয়েক বৃহৎ শিল্পপতি পরিবারের হাতে তুলে দেয়- এভাবেই পাকিস্তানে কতকগুলি বৃহৎ শিল্পপতি পরিবারের গোড়াপত্তন ঘটে। তবে পঞ্চাসের দশকের শেষ কিংবা এমনকি ষাটের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প ছিল অত্যন্ত শ্রম ঘন। কিন্তু ষাটের দশকের শেষ পাঁচ বছরে পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পসমূহ উন্নত প্রযুক্তি-নির্ভর ও পুজিঘন হয়ে উঠতে থাকে। ফলে শিল্প-পণ্য উৎপাদনের পরিমাণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেলেও উদ্যোক্তার সংখ্যা মোটেও বাড়েনি, বরং ১৯৬৮ সালে থেকে দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। বৃহৎ শিল্প পরিবারগুলির পক্ষ থেকে তাদের শিল্পের জন্য বিপুল পরিমাণ আই. এম. এফ ঋণ ও নিজস্ব মুনাফা থেকে অর্জিত পুঁজি উন্নত প্রযুক্তি ও পুঁজিনিবিড় শিল্পখাতে বিনিয়োগ করার ফলে ছোট ও মাঝারি শিল্পউদ্যোক্তাগণ ধ্বংশের মুখোমুখি এসে উপনীত হয়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরুতে সরকারী প্রশাসনের বিভিন্ন পদে বিপুল সংখ্যায় লোক নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয়। শিক্ষিত যুবকদের জন্য এটা ছিল একটি বিরাট সুযোগ। ফলে জনসাধারণের মধ্যে লেখাপড়ার প্রতি ব্যাপক আগ্রহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। শিল্প ও ব্যবসা-

Dhaka University Institutional Repository

বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটার পরিণতি হিসাবে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া, কৃষি ক্ষেত্রে সামন্তবাদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের অবসান এবং কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণের প্রতিক্রিয়া হিসাবে ব্যাপকভাবে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। কিন্তু যে হারে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পায়, সেই একই হারে কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি না হওয়ার ফলে ব্যাপক সংখ্যায় শিক্ষিত বেকার সৃষ্টি হতে থাকে। সবকিছু মিলিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের অকৃষি খাতের পরিবারগুলি ১৯৬৮-৬৯-এ এসে প্রধান চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ চারটি শ্রেণী হচ্ছেঃ বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণী, মাঝারি বুর্জোয়া শ্রেণী বা পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী-১, পেটি বুর্জোয়াশ্রেণী-২ এবং শ্রমিক শ্রেণী।

উপরোক্ত সমগ্র আলোচনা থেকে দেখা যায়, ষাটের দশকের শেষ দিকে এসে পশ্চিম পাকিস্তানের উৎপাদন পদ্ধতিতে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যাসস্থাই প্রধান ধারা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু বৃহৎ বুর্জোয়াগণ শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান অংশটি দখল করে থাকলেও এরা ছিল আই. এম. এফ ও বিশ্ব ব্যাংকসহ বিভিন্ন উৎস থেকে আসা পশ্চিমা পুঁজির ওপর নির্ভরশীল একটি শ্রেণী। ফলে পশ্চিমা যে পুঁজি সমগ্র জনগণের স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করতো, সে পুঁজির বিরুদ্ধে এ বৃহৎ বুর্জোয়াদের পক্ষে বিশেষ কোন ভূমিকা পালন করা সম্ভব ছিল না। শুধু বৃহৎ বুর্জোয়াগণই নয়, গ্রামাঞ্চলের বৃহৎ পুঁজিবাদী খামার মালিকও ছিল পশ্চিমা পুঁজির ওপর নির্ভরশীল একটি শ্রেণী। ফলে শহরের বৃহৎ বুর্জোয়া ও গ্রামের বুর্জোয়া খামার মালিকেরাই যৌথভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর বিকাশের সামনে প্রধান বাঁধা হিসাবে আবির্ভূত হয়। উৎপাদন পদ্ধতির আলোচনা থেকে এভাবে শ্রেণীগত বিরোধের চিত্রটি ফুটে উঠলেও সমাজে প্রধানতঃ দ্বন্দ্বের প্রকৃতি কি ছিল তা স্পষ্ট করতে হলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের চরিত্র ও ভূমিকা সম্পর্কে সুস্পষ্ট আলোচনা অপরিহার্য কেননা সে আলোচনার মধ্য দিয়েই জনসাধারণের বিভিন্ন অংশের বিকাশের সামনের মৌলিক বাধাগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠবে, স্পষ্ট হয়ে উঠবে মৌল উৎপাদন সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন অন্য এমন কোন শ্রেণী বা গোষ্ঠী ছিল কি না যে, উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে দূরে থেকেও উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর সীমাহীন প্রভাব রাখতে সক্ষম। পাকিস্তান রাষ্ট্রের চরিত্রটি স্পষ্টভাবে তুলে ধরার স্বার্থে তৎকালীন পাকিস্তানের অপরাংশ অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের উৎপাদন ব্যবস্থার চিত্রটি স্পষ্ট করে নেওয়া প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

৫.পূর্ব পাকিস্তানের উৎপাদন পদ্ধতি ও সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস

তাত্ত্বিক বিষয় সম্পৃক্ত পূর্বেকার অধ্যায়গুলিতে দেখা গেছে, কোন সমাজের অভ্যন্তরে বিভিন্ন শ্রেণী বা বর্গের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফল হিসাবেই সেখানে সামাজিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানকে বুঝতে হলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সমাজ ও তার অর্থনীতিকে বুঝে নেয়া প্রয়োজন। আর তাহলেই সমাজের অভ্যন্তরে বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থান এবং তাদের মধ্যকার ঐক্য ও দ্বন্দ্বকে সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যাবে।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছিল পাকিস্তানের একটি প্রদেশ। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের সমাজ ও অর্থনীতিকে বুঝতে হলে পাকিস্তান সম্পর্কিত সামগ্রিক আলোচনাকে বাদ দেওয়া যায় না। তবে সে সামগ্রিক আলোচনার আগে পূর্ব পাকিস্তানের সমাজ ও অর্থনীতি স্বতন্ত্রভাবে কেমন ছিল তা প্রথমে দেখে নেওয়া প্রয়োজন। আর তা দেখতে গিয়ে আলোচনা করা হবে অর্থনীতির প্রধান দু'টি দিক, তথা কৃষি ও শিল্পকে এবং এ দু' টি খাতের সাথে সম্পর্কিত শ্রেণীসমূহের বিকাশের স্তর ও তার সম্ভাবনাকে। সেই সাথে সমাজের অপরাপর অংশ, বিশেষত মধ্যবিত্ত শ্রেণী তথা ছাত্র, শিক্ষক, আইনজীবীসহ অপরাপর শিক্ষিত পেশাজীবীর সামাজিক অবস্থানকে। অবশ্য এ সকল শ্রেণীর বিকাশের সম্ভাবনা এবং সমস্যাকে স্পষ্ট করতে হলে পাকিস্তানের পুরো অর্থনীতি ও রাজনীতিকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার ওপরও বিশেষভাবে আলোকপাত করা আবশ্যক। সে যা হোক,বর্তমান অধ্যায়ে শুধু মাত্র পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতির বিশ্লেষণের নিরিখে সে সমাজের শ্রেণী বিন্যাসের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া হবে। এ অধ্যায়ের মূল লক্ষ্য হচ্ছে: ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সময় পূর্ব পাকিস্তানের যে অগণিত মানুষ আন্দোলনে সমবেত হয়েছিল, তাদের বিভিন্ন শ্রেণী কোন্ অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছিল তা চিহ্নিত করা।

৫.১ পূর্ব পাকিস্তানের কৃষিকাঠামো

যেকোন কৃষিপ্রধান সমাজের মতো তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সমাজে গ্রামের প্রধান উৎপাদনের উপায় ছিল ভূমি। এই ভূমি নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে যে উৎপাদন কৌশল ব্যবহৃত হয় এবং তার ফলে যে বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে,তার সামাজিক রূপই হচ্ছে কৃষি কাঠামো।[১] অবশ্য ভূমির মালিকানা, বিভিন্ন ধরনের স্বত্বাধিকার চুক্তির ধরন কিংবা মজুরীর প্রকৃতি, ঋণ এবং তার ব্যবহার ইত্যাদিও গ্রামীণ কাঠামোর অধীন।[২] তবে কৃষি কাঠামো সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা পেতে হলে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনকেও (Social organization) তার অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। কেননা যদিও অর্থনৈতিক কাঠামোই কোন সমাজ কাঠামোর মূল ভিত্তি,[৩] কিন্তু উপরিকাঠামোর বিভিন্ন দিক, যেমন, ক্ষমতা, গোষ্ঠী ও শ্রেণী এবং শ্রেণী সংগ্রামের ধরন ও তার ফলাফল ঐতিহাসিক সংগ্রামগুলির গতিকে প্রভাবিত করে। এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের রূপ নির্ধারণে উপরিকাঠামোই প্রধান হয়ে ওঠে।[৪] এদিক থেকে আন্দ্রে বেঁতে কৃষিকাঠামোর সংজ্ঞা নিরূপণের জন্য অত্যন্ত সংগত পরামর্শ দিয়েছেন। বেঁতের মতে গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর অর্থপূর্ণ সংজ্ঞা নির্ধারণের জন্য জমির মালিকানা, জমির ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং তা ব্যবহারের প্রকৃতির পাশাপাশি সামাজিক সংগঠনকেও বিশ্লেষণের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। কেননা যে সমাজে জমিই হচ্ছে সামাজিক অসমতার মূল ভিত্তি সে সমাজের সামাজিক সংগঠনগুলিকে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে সমাজের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যকে সহজেই চিহ্নিত করা সম্ভব।[৫] তাই কৃষিকাঠামো বলতে এখানে গ্রামীণ ভূমিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা এবং তার ওপর নির্ভর করে গড়ে-ওঠা বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্ক ও সংগঠনের সমন্বিত রূপকে বোঝানো হয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তানের কৃষিকাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই ভূমি সংস্কারের প্রশ্নটি এসে পড়ে। পূর্ব পাকিস্তান ভূমি সংস্কারের ইতিহাস বেশ প্রাচীন, তবে ষাট দশকের কৃষিকাঠামোকে বুঝতে হলে ১৯৫০ সালের পাকিস্তান জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনকে পাশ কাটিয়ে সে আলোচনাকে স্পষ্ট করা যায় না। সাধারণভাবে এ আইনের দু'টি প্রধান দিক ছিল। প্রথমতঃ এ আইনের বলে জমির খাজনা গ্রহণের অধিকার থেকে জমিদার শ্রেণীকে বিচ্যুত করা হয় এবং সে দায়িত্ব সরকার নিজে গ্রহণ করে। এভাবে সরকারের সাথে প্রজাসাধারণের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং প্রজা সাধারণ সরকারকে সরাসরি খাজনা প্রদানের অধিকার পায়। এ আইনের দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, পরিবার পিছু ১০০ বিঘার অতিরিক্ত জমি অধিগ্রহণ করে নেওয়ার কথা বলা হয় এবং তা ভূমিহীন ও ছোট কৃষকদের মধ্যে বন্টনের লক্ষ্য ঘোষিত হয়।

অবশ্য জমিদারদের কাছ থেকে বিনামূল্যে জমি অধিগ্রহণ করা হয়নি, কারণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদানের লক্ষ্যও এ আইনে রাখা হয়েছিল। এ আইনে জমি ইজারা দেওয়ার অধিকার নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়, অবশ্য বর্গা প্রথাকে জমি ইজারা হিসাবে গণ্য করা হয় না, তাকে ক্ষেতমজুর নিয়োগ করে চাষাবাদ করা হিসাবে গণ্য করা হয়। এ ছাড়া, বাণিজ্যিক চাষাবাদ কিংবা যৌথ খামার ইত্যাদির মাধ্যমে ১০০ বিঘার ওপরের জমির মালিকানাকে অনুমোদন করা হয়।[৬]

কামাল সিদ্দিকী এ ভূমি সংস্কার আইনের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াকে তিন ভাগে ভাগ করে দেখিয়েছেনঃ

১. স্বল্প সংখ্যক জমিদারের অধীন জমির ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতেই দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। ফলে ইতিমধ্যে অতিরিক্ত জমিকে জমিদার ও জোতদারগণ বেনামীতে জাল দলিল করে এবং ঘুষ দিয়ে স্বত্ব গোপন করতে সক্ষম হয়।

২. জমি ভাড়া দেওয়া বেআইনী করা হলেও কার্যতঃ দেখা গেল ফসলের অর্ধেক অংশ হিসাবে বর্গাচাষকে ভাড়া হিসাবে গণ্য করা হয়নি। আসলে, যা বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছিল সেই ইজারা ব্যবস্থা অপেক্ষাও বর্গাচাষ অনেক বেশি ক্ষতিকর। কার্যতঃ জমি ভাড়া

---

১. আজাদ, লেনিন (১৯৯০): 'বাংলাদেশের কৃষিকাঠামোঃ প্রত্যয়গত সমস্যা ও তিন দশকের পরিবর্তন' *Sociology and Development*, Edited by K.A.M. Salauddin et.al, Dhaka: BSA. p.155.

২. Rahman, Atiqur (1979): `Agrarian Structure and Capital Formation - A Study of Bangladesh Agriculture with Farm Level Data;' Ph.D. Dissertation, Clarc College; University of Cambridge, p.1.

৩. মার্কস, কার্ল (-): 'অর্থ শাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থের ভূমিকা' *মার্কস-এঙ্গেলস রচনা সংকলন*, প্রথম খন্ড, প্রথম অংশ, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, পৃ.২৫।

৪. এঙ্গেলস, ফ্রেডারিক (-): ' ই ব্লক সমীপে চিঠি' প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় খন্ড, দ্বিতীয় অংশ, মস্কো; প্রগতি প্রকাশন, পৃ.১৭৫।

৫. Beteille (1974): *Studies in Agrarjan Social Structure* Delhi: Oxford University Press, pp. 51-52.

৬. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, কামাল সিদ্দিকী (১৯৮১): *বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি*, ঢাকা: বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, পৃ. ৩০-৩২।

Dhaka University Institutional Repository

প্রদানও বন্ধ হয়নি, বরং মৌখিক ও প্রচ্ছন্নভাবে ইজারা প্রদান বেড়ে যায়। ফলে রায়তী স্বত্ব আরো অধিক নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে এবং এটা একটা নির্বিচার খাজনা ব্যবস্থার রূপ পরিগ্রহ করে।

৩. ভাগচাষকে মজুরী শ্রমের সঙ্গে এক করে দেখার ফলে জমি ইজারা প্রদান এবং খাজনা গ্রহণের মধ্যবর্তী স্বার্থগুলির ওপর নিষেধাজ্ঞা অর্থহীন হয়ে পড়ে। উপরন্তু এটি একটি উৎপাদন বিরোধী ব্যবস্থায় পরিণত হয়। কেননা উৎপাদনের ব্যয় ভাগাভাগির ব্যাপারে এই আইনে কিছুই উল্লেখ না থাকায় বর্গাচাষীকে অধিক উৎপাদনের লক্ষ্যে উন্নত বীজ, যন্ত্রপাতি ও সার ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করে তোলে। এর ফলে অধিক ফসল ফললেও জমির মালিককে ফসলের অর্ধেক (কোন কোন ক্ষেত্রে তার চেয়েও বেশি) দিতে গিয়ে বর্গাদারের উৎপাদন খরচ পোষায় না।[৭]

উপরোক্ত ত্রিবিধ কারণে উক্ত ভূমি সংস্কারের সুফল পূর্ব পাকিস্তানের ভূমিহীন ও ছোট কৃষকদের জন্য প্রায় কোন কাজেই আসেনি।

সারণি ৫.১
১৯৫১-৬১ কালপর্বে আবাদী জমির সাথে কৃষকদের সম্পর্কের প্রকৃতি

বছর	আবাদী জমি (%) মালিকানাধীন	আবাদী জমি (%) বর্গাচাষাধীন	মালিক পরিবার (%)	ভাগচাষী পরিবার (%)	বর্গা জমির ওপর নির্ভরশীল ভাগচাষী (%)
১৯৫১	৬৮	৩২	৬১.৩০	৩৮.৭	১১.৫
১৯৬১	৭১	২৯	৬০.০০	৪০.০	১২.০

সূত্রঃ কামাল সিদ্দিকী (১৯৮১)ঃ বাংলাদেশে ভূমিসংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি, ঢাকাঃ বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, পৃঃ৩৪।

সারণি ৫.১ থেকে দেখা যায়, উক্ত ভূমি সংস্কার কার্যকরী হওয়ার আগে এবং তার পরে অন্ততঃ বর্গাচাষীদের অবস্থার কোনই পরিবর্তন হয়নি। ১৯৫১ সালে মোট আবাদী জমির শতকরা ৬৮ ভাগ জমি মালিকের নিজ চাষের অধীন ছিল, আর শতকরা ৩২ ভাগ জমি ছিল বর্গাচাষের আওতাভুক্ত। অন্যদিকে, ১৯৬১ সালে মালিকের চাষের অধীন জমির পরিমাণ শতকরা ৩ ভাগ বেড়ে ৭১ ভাগে গিয়ে দাঁড়ায় এবং বর্গাচাষের অধীনস্থ জমির পরিমাণ হ্রাস পেয়ে শতকরা ২৯ ভাগে গিয়ে উপনীত হয়। উল্লিখিত ১০ বছরে বর্গা চাষের অধীনস্থ মোট জমির পরিমাণ বেশ কিছুটা হ্রাস পেলেও ভাগচাষী পরিবারের সংখ্যা একটুও হ্রাস পায়নি, বরং শতকরা ১.৩ ভাগ বেড়ে গেছে। ১৯৫১ সালে যেখানে বর্গাচাষীর সংখ্যা ছিল শতকরা ৩৮.৭ ভাগ, সেখানে ১৯৬১ সালে এসে এর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে শতকরা ৪০.০ ভাগে। পরিপূর্ণভাবে বর্গাচাষের ওপর নির্ভরশীল ভাগচাষীর সংখ্যাও এ সময়ে শতকরা ১১.৫ ভাগ থেকে বেড়ে শতকরা ১২.০ ভাগে গিয়ে উপনীত হয়েছে।

১৯৫০ সালের জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের অন্য একটি দিক হচ্ছে এই যে, এখানে জমিদার বা কৃষক সবার জন্যই ১০০ বিঘার উপর জমির মালিকানাকে বেআইনী করা হয়েছে। কিন্তু কৃষক প্রজা (Cultivating Tenant) হিসাবে গণ্য করা হয়েছে এমন সকল প্রজাকে যারা তার পুরো জমি নিজে চাষ করে, বর্গাদারকে দিয়ে চাষ করায় কিংবা ক্ষেতমজুরকে দিয়ে চাষ করায়।[৮] কৃষক প্রজা সম্পর্কে এ ধরনের সংজ্ঞা নির্ধারিত হওয়ায় এমন অসংখ্য পরিবার কৃষক প্রজা হিসাবে স্বীকৃতি পায় যারা কৃষির সাথে কোনভাবেই যুক্ত নয়। এরা যে শুধু কোন দৈহিক পরিশ্রমই করে না তা নয়, তারা চাষাবাদকে দেখাশোনা পর্যন্ত করেনা। এমনকি, তাদের অনেকের বাসস্থানও তার মালিকানাধীন জমির কাছাকাছি নয়।[৯] ফলে অনুপস্থিত ভূস্বামীদের পক্ষে অন্য পেশায় যুক্ত থেকেও জমি বর্গা প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদিত ফসলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ভোগ করার সুবিধা থেকে যায়। কার্যতঃ এ সত্যকে পরবর্তীকালে পাকিস্তানের পরিকল্পনা কমিশনও স্বীকার করে। যেমন, পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশনের মতে, "In Fact, there is tendency to absentee landlordism and the reappearing of tenancy"[১০]

অন্যদিকে, এ আইনে জমি ভাড়া দেওয়াকে নিষিদ্ধ করা হলেও এর মধ্যেই লুকিয়েছিল বেশ কিছু ফাঁক। কেননা এতে আবার ভাগচাষ অথবা বর্গা ব্যবস্থাকে জমি ভাড়া দেওয়া হিসাবে বিবেচনা করা হয়নি। তাদেরকে বিবেচনা করা হয়েছে কৃষি শ্রমিক বা ক্ষেতমজুর হিসাবে। জোতের ওপর প্রজার অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে রাজনৈতিক পরিমন্ডলে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল, ভাগ চাষীদেরকে কৃষিশ্রমিক প্রতিপন্ন করার ফলে সে প্রতিক্রিয়ার হাত থেকেও রক্ষা পাওয়া সম্ভব হল।[১১] এর ফলে বড় খামারের মালিকরা বর্গাচাষ ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদিত ফসলের ওপর একটি স্থায়ী অধিকার অর্জন করল। এ অধিকার গতানুগতিক অধিকার থেকে কোন অংশে কম নয়, বরং পূর্বে ভাগচাষীদের জমির ওপর স্থায়ী অধিকার অর্জনের যে দাবি ছিল-তাকেও পাশ কাটানো সম্ভব হল।[১২] অর্থাৎ এ আইনের মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান জমির ওপর বহুপূর্ব থেকেই বিদ্যমান কায়েমী স্বার্থকেই পুনর্বার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান করা হল।[১৩]

১৯৫০ সালের জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন হওয়ার পর তা কার্যকরী হতে বেশ কয়েক বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। নিঃসন্দেহে এ আইনের ফলে বেশ কিছু ভূমিহীন বা ছোট কৃষক কিছু কিছু করে জমিও পেয়েছিল, কিন্তু এ আইন প্রতিষ্ঠার ফলে যে লক্ষ্যে পরিবদে বিলটি উত্থাপিত হয়েছিল তা অর্জিত হয়নি। কেননা পরবর্তীকালে ভূমিহীনতার হার মোটেও হ্রাস পায়নি, বরং অত্যন্ত দ্রুত গতিতে তা বেড়ে গেছে। বর্গাচাষের শর্তসমূহও এমন হয়ে আসে যে, শুধু মাত্র বর্গা চাষের ওপর নির্ভর করে অস্তিত্ব রক্ষা কঠিন হয়ে পড়ে। কেননা বর্গা ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান করার ফলে ভাগচাষীর ওপর ক্রমাগত চাপ বাড়তে থাকে। ভাগচাষী জমির

---

৭. সিদ্দিকী, কামাল (১৯৮১): প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২-৩৩।
৮. বিস্তারিত ভাবে জানার জন্য দেখুন, Abdullah, Abu (1976): "Land Reforms and Agrarian Changes in Bangladesh", *The Bangladesh Development Studies*, Vol.4, No.1, January.
৯. Saha, Bimal Kumar (1990): 'Agrarian Structure, Technological Change and Productivity: A Comparative Study of Bangladesh and West Bengal Agriculture.' (Ph.D Dissertation), Economics Department, University of Calcutta. p.54.
১০. Government of Pakistan (1970): *The Budget in Brief, 1970-71*, Islamabad: Ministry of Finance. p. 309.
১১. বিস্তারিতভাবে জানার জন্য দেখুন, Dutt, K., Das Gupta, R. and Chatterjee, A. (1973): *Bangladesh Economy: An Analytical Study*, Calcutta: Peoples Publishing House.
১২. Jannuzi, F.T. and Peach, J.T (1982): *The Agrarian Structure of Bangladesh: An Impediment to Development*, Madras: Sangram Books, p.12.
১৩. Shaha, *op.cit.*, p.55.

Dhaka University Institutional Repository

মালিকের দাবি মেটাতে গিয়ে নিজের যে জমিখন্ডটুকু ছিল তার ওপর হাত দিতে বাধ্য হয়। নিজের সবটুকু সম্পত্তি হারিয়ে শেষ পর্যন্ত পরিপূর্ণ ভাগচাষীতে পরিণত হবার পরও যখন অস্তিত্ব রক্ষা অসম্ভব হয়ে ওঠে, তখন তাকে বাধ্য হয়ে ভাগ চাষের পাশাপাশি ক্ষেতমজুরী পেশাকে গ্রহণ করতে হয়। এই চিত্রটিই ফুটে উঠেছে সারণি ৫.২-এ।

সারণি৫.২

১৯৫১-৬১ কালপর্বে কৃষিতে নিয়োজিত শ্রমশক্তির বিন্যাস (লক্ষ লোকের হিসাব)

প্রকার ভেদ	সংখ্যা		শতকরা হার		পরিবর্তনের হার
	১৯৫১	১৯৬১	১৯৫১	১৯৬১	
আবাদী জমির সবটুকুর মালিক কৃষক নিজে	৩৭.৪০	৫০.১০	৩৪.৮৯	৩৪.৮৪	৩৩.৯৬
কিছুটা নিজের এবং কিছুটা বর্গা নেয়া কিংবা পুরোটাই বর্গা নেয়া	৪৯.৬০	৫৬.০০	৪৬.২৭	৩৮.৯৪	১২.৯০
বর্গাচাষ করে, একই সাথে কৃষিমজুর	৪.১০	১০.১০	৩.৮২	৭.০২	১৪৬.৩৪
ভূমিহীন কৃষিমজুর	১৬.১০	২৭.৬০	১৫.০২	১৯.১৯	৬৩.৬০
মোট কৃষি শ্রমশক্তি	১০৭.২০	১৪৩.৮০	১০০.০০	১০০.০০	৩৩.৮০

সূত্রঃ কামাল সিদ্দিকী (১৯৮১)ঃ পৃঃ৪০।

সারণি৫.২ থেকে দেখা যায়, ১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের কৃষিতে মোট ১ কোটি ৭ লক্ষ ২০ হাজার জন শ্রমশক্তি নিয়োজিত ছিল। পরবর্তী ১০ বছরে তা শতকরা ৩৩.৮০ ভাগ বেড়ে ১ কোটি ৪৩ লক্ষ ৮০ হাজার জনে গিয়ে উপনীত হয়। এ সময়ে মোট কৃষি শ্রমশক্তির সংখ্যা শতকরা ৩৩.৮০ ভাগ বাড়লেও কৃষিশ্রমের সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি শ্রেণীর পরিবর্তন একই হারে ঘটেনি। যে সকল পরিবার তাদের সমস্ত শ্রমশক্তিটুকুই নিজ মালিকানাধীন আবাদী জমিতে নিয়োগ করে, তাদের সংখ্যা ১০ বছরে শতকরা ৩৩.৯৬ ভাগ বৃদ্ধি পায়। এদের বৃদ্ধির হার গোটা শ্রমশক্তির বৃদ্ধির হার অপেক্ষা সামান্য কিছু বেশি। অর্থাৎ একটি ক্ষুদ্র অংশ হলেও প্রজাস্বত্ব আইনের সুফল পেয়ে কিছু কৃষক পরিবার নিজ মালিকানাধীন জমিতে পুরো শ্রমশক্তিটুকু নিয়োজিত করতে সক্ষম হয়েছিল। অন্যদিকে, যে সকল পরিবার আংশিক বা পরিপূর্ণ অর্থে বর্গাচাষী ছিল তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে পরিবর্তন ঘটে। এ সকল কৃষক ১৯৫১ সালে মোট শ্রমশক্তির শতকরা ৪৬.২৭ ভাগ সরবরাহ করতো, কিন্তু ১৯৬১ সালে এদের সরবরাহ করা শ্রমশক্তির সংখ্যা এসে দাঁড়ায় শতকরা ৩৮.৯৪ ভাগে। শ্রমশক্তির মোট বৃদ্ধির হার শতকরা ৩৩.৮০ ভাগ হলেও, এদের বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র শতকরা ১২.৯০ ভাগ। ভূমি সংস্কারের সুফল পেয়ে এদের একটি অংশ বর্গাচাষ ছেড়ে দেয়, কিন্তু বর্গাচাষী ক্ষেতমজুরদের প্রতি আলোকপাত করলেই এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে,এদের প্রধান অংশই নিজের শ্রেণী অস্তিত্ব হারিয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে। এই শ্রেণীটি ১৯৫১ সালে মোট শ্রমশক্তির শতকরা ৩.৮২ ভাগ সরবরাহ করতো, কিন্তু ১৯৬১ সালে এই শ্রেণী কর্তৃক সরবরাহকৃত শ্রমশক্তির শতকরা হার ৭.০২ ভাগে দাঁড়ায়। আর এদের বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়ায় শতকরা ১৪৬.৩৪ ভাগ। অর্থাৎ ১৯৫১ সালে এদের যে সংখ্যা ছিল তা ১৯৬১ সালে প্রায় আড়াই গুণ বৃদ্ধি পায়। শুধু যে ভাগচাষী কৃষি মজুরের সংখ্যাই এভাবে বেড়ে গেছে তাই নয়, ভূমিহীন কৃষিমজুরের সংখ্যাও বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ১৯৫১ সালে এই শ্রেণীটি মোট কৃষি শ্রমশক্তির শতকরা ১৫.০২ ভাগ সরবরাহ করতো, যা ১৯৬১ সালে ১৯.১৯ ভাগে পৌছায়। অর্থাৎ ১০ বছরে এদের বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ৬৩.৫০ ভাগে দাঁড়ায়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, ১৯৫০ এর উক্ত আইন মোতাবেক জমি পুনর্বন্টনের কাজটি প্রকৃতপক্ষে বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। উপরন্তু যে সামান্য জমি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল, তা ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের এবং বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে বিদ্যমান। এর কারণ, জমির মালিকদের নিজেদের ইচ্ছামত বেছে জমি রাখার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল।[১৪] এই আইন বলে কিছু জমি সরকারের খাস জমিরূপে রেকর্ড হবার কথা ছিল, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সেগুলি ব্যক্তি বিশেষের নামে দলিলভুক্ত করা হয়।[১৫] অনুরূপভাবে, যদিও কাগজে-কলমে অনেক বাড়তি জমি সরকারের হাতে এসে গিয়েছিল, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কর্মচারীরা দীর্ঘকাল সেগুলির ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেনি।[১৬] অধিকন্ত আইয়ুব সরকার তার সামাজিক সমর্থনকে সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে[১৭] ১৯৬১ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রজাস্বত্ব আইনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ জমির সীমা ৩৩ একর থেকে বাড়িয়ে ১২৫ একরে পুনর্নিধারণ করে। বলাবাহুল্য, জমির সর্বোচ্চ এ সীমা খামারের গড় আয়তন অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। মাত্র ৪৩৯টি পরিবারের কাছেই এর চেয়ে বেশি পরিমাণে জমি ছিল এবং এ সকল খামার থেকে যে পরিমাণ জমি খাস হওয়ার সম্ভাবনা ছিল তার মোট পরিমাণ মাত্র ১ লক্ষ ৬৩ হাজার ৭৪১ একর, যা মোট আবাদী জমির তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কম।[১৮] আবু আবদুল্লাহ্ (১৯৭৬) দেখিয়েছেন যে, পুনর্বন্টনযোগ্য এই স্বল্প পরিমাণ জমিও ভূমিহীনদের পাওয়ার কোন সুযোগ ছিল না; কেননা দুর্নীতিবাজ সরকারী কর্মচারীরা এত উচ্চ হারে সালামী দাবি করতো যা ভূমিহীনদের পক্ষে মিটানো অসম্ভব ছিল।[১৯] এ সকল কারণেই ১৯৫০ সালের জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন অনুসারে জমি পুনর্বন্টনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোন ইতিবাচক প্রভাব পড়েনি।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এ আইনের মূল প্রভাব পড়েছিল আয় পূনর্বন্টনের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ জমির খাজনা সংগ্রহের যে দায়িত্ব জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছে ছিল তা তখন সরকারের কাছে ন্যস্ত হয়। জনসাধারণ বড়জোর এটুকু উপলব্ধি করে যে, সে কোন

১৪. Abdullah, Abu, *op.cit.*, p.83.
১৫. Report of the Land Revenue Administration Enquiry Committee, 1962-63, Dacca: Govt. of East Pakistan, Revenue Department, 1963, p.54.
১৬. *Ibid*, p. 62.
১৭. Shaha, *op.cit*, p.55.
১৮. Abdullah, *op.cit.*, pp. 82-88.
১৯. *Ibid*, p. 83.

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তির কাছে খাজনা দিচ্ছে না, সে সরাসরি সরকারকে খাজনা দিচ্ছে। জমির উন্নয়নের ক্ষেত্রেও কোন কিছু করা হয়নি। সাধারণতাবে খাজনা সংগ্রহের দায়িত্ব জমিদারের নায়েব-গোমস্তাদের কাছ থেকে সরকারী প্রশাসনের নিম্নপর্যায়ে হস্তান্তরিত হয়। নিম্ন পর্যায়ের এই কর্মচারীরা তথা তহসিলদারেরা জমিদারেরঅত্যাচারী নায়েব-গোমস্তাদের তুলনায় কদাচিৎ কম অত্যাচারী বলে মনে হয়। তৎকালীন একটি সরকারী রিপোর্টেই এদের সম্পর্কে বলা হয়,

".... we are told in many places by ordinery people that the *tahsildars* are really *zamindars* in a new grab with all their oppression and they are all the more powerful and dangerous as they have the authority of government behind them."[২০]

ফলে এই তহসিলদাররাই কৃষিকাঠামোর কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এদের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতেই গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোও আবর্তিত হতে থাকে। কেননা জমি সংক্রান্ত জটিলতা সৃষ্টিতে সে সময় এদের কোন জুড়ি ছিল না। উপরোক্ত সরকারী রিপোর্টে এদের সম্পর্কে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা সংক্ষে প করে কামাল সিদ্দিকী নিম্নোক্ত রূপে উপস্থাপন করেছেন ঃ

"১. খাসজমি বিতরণে স্থানীয় কর্মচারীরা দীর্ঘসূত্রতা গ্রহণ করে।

২. প্রার্থীদের নির্ভুলভাবে নির্বাচিত করা হয় না।

৩. একই জমি একাধিক ব্যক্তির নামে বন্দোবস্ত দেয়া হয়।

৪. মনোনীত ব্যক্তিদের জমির মালিকানা দেবার পদ্ধতি ছিল ত্রুটিপূর্ণ।"[২১]

এসব কারণে কৃষকদের মধ্যে যেমন জমি নিয়ে আত্মকলহ লেগে থাকতো, তেমনি এ সকল আত্মকলহের পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে গ্রামের এক শ্রেণীর জোতদার তাদেরকে সর্বস্বান্ত করে নিজস্ব খামারের আয়তন বৃদ্ধি করতো। উক্ত আইন প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে গ্রামীণ এই জোতদারগণ একদিকে যেমন তহসিলদারদের কাজে লাগিয়ে নামে-বেনামে বিপুল পরিমাণ ভূসম্পত্তি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল, অন্যদিকে ভাগচাষ ব্যবস্থার নিশ্চয়তা পেয়ে বিপুল পরিমাণ জমি থেকে এরা একটি নিশ্চিত আয়ের পথ পেয়ে যায়। উপরন্ত সরকারী ব্যবস্থাপনায় কৃষি উন্নয়ন এবং গ্রামের দরিদ্র কৃষকদের জন্য কোন প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ব্যবস্থা না থাকার কারণে উক্ত জোতদাররাই ঋণ প্রদানের মূল উৎসে পরিণত হয়। বলাবাহুল্য, জোতদারদের শর্তেই ছোটখামার মালিকদের কাছে এ ঋণ লেন-দেন হত। সারণি ৫.৩ থেকে সে সম্পর্কে স্পষ্ট একটি ধারণা পাওয়া যাবে।

সারণি ৫.৩ থেকে দেখা যায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মোট খামারের শতকরা ৪৯.১৩ ভাগ খামারই ছিল ঋণগ্রস্ত। যে সকল খামার ঋণগ্রস্ত ছিল তাদের শতকরা ৬৬.৮১ ভাগ খামারের ঋণের পরিমাণ ছিল ২৫০ টাকার নিচে; শতকরা ২৬.০৬টি খামারের ঋণের পরিমাণ ছিল ২৫০ টাকা থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত এবং অবশিষ্ট ৩.৮১ ভাগ খামারের ঋণের পরিমাণ ছিল ১০০০ টাকার উপরে। উপরোক্ত সারণিতে খামারগুলিকে মোট পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ২.৫০ একরের নিচে যাদের জমি, এরাই ছিল সে সময় মোট খামারের শতকরা ৫১.৬৪ ভাগ এবং সে সময়ে জমির উৎপাদনশীলতার মাত্রা যা' ছিল তাতে এ পরিমাণ জমি নিয়ে প্রায় কারো পক্ষেই সংসার পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। ফলে এদেরকে বর্গাচাষ ও কৃষিমজুরীকে পার্শ্বপেশা হিসাবে গ্রহণ করতে হত। তবে এদের অনেকে এত কম জমির মালিক ছিল যে, তাদের জন্য ঋণ সংগ্রহও কঠিন ছিল। এ সকল খামার মালিকদের শতকরা ৪৫.৮৪ ভাগই সেদিন ঋণগ্রস্ত ছিল; এদের শতকরা ৭৪.৪৫ ভাগ ২৫০ টাকার কম ঋণ গ্রহণ করেছিল,শতকরা ২৩.৪০ ভাগের ঋণের পরিমাণ ছিল ২৫০-১০০০ টাকার মধ্যে এবং বাকি শতকরা ২.০৬ জন ১০০০ টাকার বেশি ঋণ গ্রহণ করেছিল। অর্থাৎ সে সময় এদের অনেকে তাদের গোটা জমির বিক্রয় মূল্যের সমান কিংবা তার চেয়েও বেশি পরিমাণ ঋণী ছিল। কেননা সে সময় ১ ভরি সোনার মূল্য ছিল মাত্র ১৫৬ টাকা।[২২]

সারণি ৫.৩

১৯৬০ সালে ভূমি মালিকানা ও মহাজনী ঋণের ধরন

খামারের আয়তন (একর)	খামারের বন্টন(%	ঋণগ্রস্ত খামার মালিকের বন্টন(%	২৫০/টাকার নিচে যাদের ঋণ(%	২৫০-১০০০-টাকা পর্যন্ত যাদের ঋণ (%	১০০০-টাকার উপরে যাদের ঋণ (%
২.৫০ একরের নিচে	৫১.৬৪	৪৫.৮৪	৭৪.৫৪	২৩.৪০	২.০৬
২.৫০-৫.০০	২৬.৩১	৫৩.৮৭	৬৫.৯৮	৩১.৬১	২.৪১
৫.০০-৭.৫০	১১.৩৭	৩৮.৫৪	৭৯.৫৫	১৩.০১	৭.৪৪
৭.৫০-২৫.০০	১০.৬০	৪৯.৫২	৪৪.৮৭	৪২.৩১	১২.৮২
২৫.০০ একরের উপরে	০.০৮	৪৫.৭৭	২৭.৭৩	৩১.০৯	৪১.১৮
মোট	১০০.০০	৪৯.১৩	৬৬.৮১	২৬.০৬	৩.৮১

সূত্রঃ Agricultural census 1960, Compiled from East Pakistan Statistical Digest 1965, Dacca: EPBS,pp. 86 87.

২.৫০ থেকে ৫.০০ একর আয়তনের খামারগুলির অবস্থা ছিল আরো খারাপ। এদের মধ্যে শতকরা ৫৩.৮৭ ভাগ ছিল ঋণগ্রস্ত। এবং এদের শতকরা ৬৫.৯৮ জনের ঋণের পরিমাণ ছিল ২৫০ টাকার নিচে, শতকরা ৩১.৬১ জনের ঋণের পরিমাণ ছিল ২৫০ টাকা থেকে ১০০০ টাকার মধ্যে এবং বাকি শতকরা ২.৪১ জনের ঋণের পরিমাণ ছিল ১০০০ টাকার উপরে। ওপরোক্ত দুইটি শ্রেণীর মাথায় এই বিপুল পরিমাণ ঋণ থেকেই এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এই বিপুল সংখ্যক কৃষকের পক্ষে জোতের জমি রক্ষা করা কত কঠিন ছিল। এরা ছোট খামারের মালিক হওয়া সত্ত্বেও ২৫০ টাকার ওপরে এদের এত বিপুল সংখ্যক খামার ঋণগ্রস্ত থাকার পিছনে একটিই সঙ্গত কারণ থাকা সম্ভব, আর তা'হচ্ছে জমি বন্ধক রেখে কিংবা আরো অধিক শোষণমূলক শর্তে তারা ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হত। কেননা ৫.০০-৭.৫০ একর আয়তনের মাঝারি কৃষকগণের মধ্যে যেমন ঋণগ্রস্ত ছিল শতকরা ৩৮.৫৪ জন, তেমনই এসব ঋণগ্রস্ত খামারের শতকরা

২০. Report of the Land Revenue Administration Enquiry Committe, 1962-63, *op.cit*, Quoted in Shaha, *op.cit.*, p.56.

২১. সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯।

২২. *Statistical Digest of East Pakistan*, No. 3: 1965, Dacca: EPBS Table No. 6.26, p. 293.

Dhaka University Institutional Repository

৭৯.৫৫ ভাগেরই ঋণের পরিমাণ ছিল ২৫০ টাকার নিচে। অর্থাৎ এদের জমির পরিমাণ এমন ছিল যে, আয়-ব্যয় মোটামুটি সমান ছিল। সে কারণেই এদের ঋণের পরিমাণ যেমন একদিকে ছিল কম, তেমনই এদের ভিতর যারা ঋণী ছিল তাদের অধিকাংশেরই ঋণের পরিমাণ অতি সামান্য। ৭.৫০-২৫.০০ একর গ্রুপের খামারগুলিকে ধনী কৃষকের খামার হিসাবে বিবেচনা করা যায়। কিন্তু তাদেরও শতকরা ৪৯.৫২ ভাগ খামার ঋণগ্রস্ত ছিল। এ গ্রুপের ঋণগ্রস্ত পরিবারগুলির শতকরা ৪৪.৮৭ ভাগের ঋণ ২৫০ টাকার নিচে ছিল। এছাড়া, শতকরা ৪২.৩১ ভাগের ঋণের পরিমাণ ছিল ২৫০ টাকা থেকে ১০০০ টাকার মধ্যে এবং কেবলমাত্র শতকরা ১২.৮২ ভাগের ঋণ ছিল ১০০০ টাকার অপেক্ষা বেশি। উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, এদের মধ্যেও এক উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ঋণগ্রস্ত পরিবার বেশ ভাল রকমের সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল। তবে এদের মালিকানায় যে বিপুল পরিমাণ জমি ছিল তা থেকে মনে হয় এদের অনেকেই আবার ঋণ প্রদানেও সমর্থ ছিল। ফলে ঋণের কারণে এ শ্রেণীর খামারগুলির অস্তিত্বের সংকট দেখা দেওয়ার কথা নয়। তাছাড়া, এদের অনেকেই হয়ত তাদের ঋণের অর্থ দরিদ্রতর কৃষকদের জমি খন্ডটি নিজ মালিকানায় নিয়ে আসার কাজে ব্যবহার করেছিল। ২৫.০০ একরের উর্ধে যাদের জমি তাদেরও শতকরা ৪৫.৭৭ ভাগ ঋণী ছিল, তবে তাদের সম্পর্কেও উপরোক্ত একই কথা প্রযোজ্য। কেননা এরাই ছিল সেদিন গ্রামীণ সামাজিক স্তর বিন্যাসের শীর্ষে। সাধারণভাবে যাদের ২৫ একরের উপরে জমি ছিল, তাদের পক্ষে এই বিপুল পরিমাণ জমি চাষাবাদ করা সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে, এ জমি বর্গা দিয়েও তাদের পক্ষে বিপুল পরিমাণে ফসল লাভ সম্ভব ছিল। এ ছাড়াও, ২৫ একরের নিচে যাদের জমি ছিল তাদেরও অনেকের আয়ের মূল অংশটা আসতো বর্গা দেওয়া জমি থেকে। পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাবে, সে সময় শিল্প বা ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙ্গালীদের জন্য তেমন কোন সুযোগ-সুবিধা ছিল না। তাই, এই বড় খামার মালিকগণ তাদের সম্পদ ও ক্ষমতা ছোট খামারগুলিকে নিঃস্ব করার কাজেই ব্যবহার করত। কৃষি বহির্ভূত কোন পেশায় উন্নতি করার সুযোগ না থাকার কারণে এই অতিকায় খামার মালিকগণ বর্গাজমির ফসলি খাজনা গ্রহণ, চাপ প্রদান করে ঋণের জন্য চড়া হারে সুদ গ্রহণ এবং তহসিলদারদের যোগসাজশে দুর্বল জনগোষ্ঠীর মালিকানাধীন জমি অধিগ্রহণসহ এ ধরনের নানাবিধ কাজ করতো। এভাবে এই বড় খামার মালিকগণ অচিরেই জমিদারদের মতই একটি পরজীবী শ্রেণীতে পরিণত হয়। ফলে ১৯৫০ সালের জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কৃষিকাঠামোতে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়নি, বরং এরা গ্রামীণ সমাজে একটি নতুন পরজীবী শ্রেণী হিসাবে গড়ে উঠে, যাদের থেকে পূর্বতন গ্রামীণ জমিদারদের পার্থক্য খুব সামান্য। এ সম্পর্কে বিমলকুমার সাহা মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, ..."the act could bring perceptible changes in the sphere of power structure in favour of *jotedars* and rich tenants by eliminating the parasitic class of *zamindars*, the old feudal landed class." [২৩]

এই বিকাশমান জোতদার শ্রেণী পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামীণ সমাজের অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজে সে সময় কি ভূমিকা পালন করেছিল, তা ভিন্ন একটি উপ-অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে, তবে উক্ত জোতদারদের শোষণমূলক ভূমিকা এবং অন্যান্য কারণে ষাট দশকে পূর্ব পাকিস্তানের ভূমি বিন্যাসে যে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয় তা এখানে বিশ্লেষণ করা হবে। এ আলোচনার মধ্য দিয়ে পরিষ্কার হয়ে উঠবে, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ঠিক পূর্ব মূহূর্তে, অর্থাৎ ১৯৬৮ সালে গ্রামীণ সমাজের শ্রেণী বিন্যাসের রূপটি।.

সারণি ৫.৪

১৯৬০ ও ১৯৬৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানের খামার সংখ্যা ও খামার আয়তনের তুলনামূলক চিত্র।

খামারের আয়তন(	খামার সংখ্যার বন্টন %		খামার সংখ্যার বন্টন %		চাষাধীন জমির আয়তনের বন্টন %		চাষাধীন জমির আয়তনের বন্টন %	
	১৯৬০	১৯৬৮	১৯৬০	১৯৬৮	১৯৬০	১৯৬৮	১৯৬০	১৯৬৮
০.৫ একরের নিচে	১৩.১০	১২.২৬			০.৯৫	১.১৫	১৬.২৬	২১.৩২
০.৫-১.০	১১.২৪	১২.৭০	৫১.৬৪	৫৬.৬৩	২.৩০	২.৯৯		
১.০-২.৫০	২৭.৩০	৩১.৬৭			১৩.০১	১৭.১৮		
২.৫০-৫.০০	২৬.৩০	২৬.৩২	৩৭.৬৯	৩৫.৫২	২৬.৩৮	২৯.৯৭	৪৫.৬৮	৩৯.৭৪
৫.০০-৭.৫০	১১.৩৯	৯.২০			১৯.৩০	৯.৭৭		
৭.৫০-১২.৫০	৭.২০	৫.১৫			১৯.১৪	২৩.৫২		
১২.৫০-২৫.০০	২.০৬	২.১৬	১০.৬৭	৭.৮৫	১০.১২	১০.৯৫	৩৮.০৬	৩৮.০৬
২৫.০০-৪০.০০	০.৬১	০.৩৬			২.৯১	৩.৩০		
৪০.০০-এর উপরে	০.৮০	০.০৮			৫.৮৯	১.১৭		
মোট (হাজার)	৬১,৩৯,৪৮০ (১০০)	৬৮,৭০,০০০ (১০০)	১০০	১০০	১,৯১,৩৮,১০৯ (১০০)	১,৯৬,৯৬,০০০ (১০০)	১০০	১০০

উৎসঃ Pakistan Census of Agriculture 1960. Vol 1, East Pakistan, Agricultural Census Organisation. Ministry of Food & Agriculture, GOP, Table 3.2 Master Survey of Agriculture in Bangladesh 1967-68.(Seventh Round, second phase). B B S. 1972. Table-2(a). p.II, and Table.7.p.21.

সারণি ৫.৪ থেকে দেখা যায়, পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৬০ সালে মোট ৬১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৪৮০টি খামার ছিল এবং ১৯৬৮ সালে তা বেড়ে ৬৮ লক্ষ ৭০ হাজারে গিয়ে দাঁড়ায়। ১৯৬০ সালে শতকরা ৫১.৬৪ ভাগ ছিল ছোট খামার (২.৫০ একরের নিচে) শতকরা ৩৭.৬৯ ভাগ মাঝারি খামার (২.৫০-৭.৫০একর), এবং শতকরা ১০.৬৭ ভাগ ছিল বড় খামার (৭.৫০ একরের উপরে)। ৮ বছর পর অর্থাৎ ১৯৬৮ সালে ছোট খামারের হার শতকরা ৫৬.৬৩ ভাগে গিয়ে উপনীত হয়, মাঝারি খামারের সংখ্যা কিছুটা হ্রাস পেয়ে শতকরা ৩৫.৫২ ভাগে গিয়ে দাঁড়ায় এবং বড় খামারের সংখ্যা বিপুল সংখ্যায় হ্রাস পেয়ে শতকরা ৭.৮৫ ভাগে পর্যবসিত হয়। এখানে লক্ষ্য করার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ছোট খামারগুলির সংখ্যা যেমন এক দিকে বেড়ে গেছে, ঠিক তেমনই বড় খামারের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। শতকরা হারের দিক থেকে বিপুল সংখ্যায় হ্রাস পাওয়ার পেছনে সম্ভাব্য দুইটি কারণ থাকতে পারে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে

২৩. Shaha, *op.cit.*, p.56.

Dhaka University Institutional Repository

৭.৫০ একরের উপরে যেসব পরিবারের জমি ছিল তাদের অনেকেই জমি ধরে রাখতে পারেনি। অন্য একটি সম্ভাব্য কারণ হচ্ছে, বড় খামারগুলির মধ্যে এ সময়ে ভাঙ্গনের হার কম ছিল। পরিবার ভাঙ্গনের জন্য ৮ বছর তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সময় নয়। তাই প্রথম কারণটিই বড় খামারের সংখ্যাগত হ্রাস প্রাপ্তির মুখ্য বিষয়। আর তাইতো দেখা যায় ছোট খামারের সংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে মাঝারি খামার সে হারে হ্রাস পায়নি। অর্থাৎ এ সময়ে বিপুল সংখ্যক মাঝারি খামারের মালিকরা জমি হারিয়ে ছোট খামারে পরিণত হলেও বড় খামারগুলির অনেকে জমি হারিয়ে কিংবা পারিবারিক ভাঙ্গনের কারণে মাঝারি খামারে পরিণত হয়ে এখানে এসে জড়ো হয়েছে। এ সময়ে ছোট খামারগুলির অনেকেই ভূমিহীনে পরিণত হয়েছে, ফলে ছোট খামারের বৃদ্ধির যে হার সারণি ৫.৪-এ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, প্রকৃত অবস্থা এর চেয়েও ভয়াবহ।

পূর্বোক্ত সারণির অপর তাৎপর্যপূর্ণ দিক হচ্ছে, ১৯৬০ সালে ছোট খামারগুলি শতকরা ১৬.২৬ ভাগ জমির মালিক ছিল; মাঝারি খামারগুলি মালিক ছিল শতকরা ৪৫.৬৮ ভাগ জমির এবং শতকরা ৩৮.০৬ ভাগ জমির মালিক ছিল বড় খামার। পরবর্তী আট বছরের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, মাঝারি খামারের সংখ্যা যেমন তুলনামূলকভাবে হ্রাস পেয়েছে, তাদের অধীনস্থ জমির পরিমাণও এসময়ে হ্রাস পেয়েছে। উপরন্তু এ সময়ে মাঝারি খামার সংখ্যার হ্রাস পাপ্তির হার অপেক্ষাও অনেক দ্রুত হারে তারা জমি হারিয়েছে। অবশ্য ছোট খামারগুলির সংখ্যা যেভাবে বেড়েছে তার চেয়েও দ্রুত হারে তাদের জমির পরিমাণ বেড়েছে। ১৯৬৮ সালে মাঝারি খামারের অধীনস্থ জমির পরিমাণ শতকরা ৪৫.৬৮ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে শতকরা ৩৯,৭৪ ভাগে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, ছোট খামারের অধীন জমির পরিমাণ শতকরা ১৬.২৬ ভাগ থেকে বেড়ে শতকরা ২১.৩২ ভাগে গিয়ে পৌঁছেছে। সম্ভবতঃ এর মূল কারণ, ছোট খামারগুলির মধ্যে যেগুলি ক্ষুদ্রতর সেগুলি এ সময়ে নিঃস্ব হয়ে গেছে, আর অন্যদিকে মাঝারি খামার থেকে জমি হারিয়ে অনেকেই ছোট খামার কাঠামোর উপর অবস্থান নিয়েছে। সারণি ৪.৪এর দিকে লক্ষ্য করলে সে সত্যটিই ফুটে ওঠে। কেননা ১.০০-২.৫০ আয়তনের খামারগুলির সংখ্যা এ সময়ে শতকরা ২৭.৩০ ভাগ থেকে বেড়ে শতকরা ৩১.৬৭ ভাগে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে, এদের আওতাধীন জমির পরিমাণও শতকরা ১৩.০১ ভাগ থেকে বেড়ে শতকরা ১৭.১৮ ভাগে গিয়ে উপনীত হয়েছে।

বড় খামারগুলির পরিবর্তনই হচ্ছে উল্লিখিত সারণির সবচেয়ে নির্দেশক দিক। বড় খামার মালিক শ্রেণী ঐ ৮ বছরে সংখ্যাগত দিক থেকে শতকরা প্রায় ২৭ ভাগ গুরুত্ব হারিয়েছে, কিন্তু এরা একটুও জমি হারায়নি। বরং এ সময়ে এ শ্রেণীটি বিপুল পরিমাণ নতুন জমি করায়ত্ত করেছে। কেননা ১৯৬০ সালে এদের আয়ত্তে শতকরা ৩৮.০৬ ভাগ জমি ছিল, কিন্তু ১৯৬৮ সালে এসে এদের সংখ্যা শতকরা ২৭ ভাগ হ্রাস পাওয়ার পরও মোট জমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে শতকরা ৩৮.৯৪ ভাগে। অধিকন্তু এই ৮ বছরে আবাদী জমির পরিমাণ প্রায় ৬ লক্ষ একর বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ ১৯৬৮ সালে এসে গ্রামের শতকরা ৮ ভাগেরও কম সংখ্যক পরিবারের হাতে শতকরা ৩৯ ভাগ ভূসম্পত্তি কিন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে। এ সময়ের সাধারণ প্রবণতা হল গ্রামের বিপুল সংখ্যক কৃষক ভূমিহীন বা দরিদ্র কৃষকে পরিণত হওয়া, মাঝারি কৃষক পরিবারের আয়তন ছোট হয়ে আসা এবং বড় কৃষকদের হাতে সকল ভূসম্পত্তি সঞ্চিত হওয়া। নিম্নোক্ত সারণি ৫.৫-এর দিকে লক্ষ্য করলেই কি প্রক্রিয়ায় ছোট ও মাঝারি কৃষকগণ জমি হারায় সে সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে।

সারণি ৫.৫ থেকে দেখা যায়, পূর্ব পাকিস্তানের খামারগুলি তিনভাবে আবাদ হত। কিছু খামারে মালিক নিজেই আবাদ করতো এবং কিছু খামারের আবাদী জমির কিছু অংশ আবাদকারীর নিজ মালিকানাধীন ছিল ও কিছু অংশ ছিল বর্গা নেওয়া। যে সকল খামার কৃষক নিজে আবাদ করতো তার মধ্যে শতকরা ৩২.৪৮ ভাগের আয়তন ছিল ১.০০ একরের নিচে, শতকরা ৩১.৪১ ভাগের আয়তন ছিল ১.০০-২.৫০ একরের মধ্যে, শতকরা ২৯.৩৬ ভাগ ছিল ২.৫০-৭.৫০ একরের ভেতর সীমাবদ্ধ এবং শতকরা ৬.৭৫ ভাগের আয়তন ছিল ৭.৫০ একরের উপরে।

যে সকল খামার পরিপূর্ণ বর্গা খামার হিসাবে চাষাবাদ হত সেগুলির শতকরা ৩৩.৪৩ ভাগের আয়তন ১.০০ একরের নিচে, শতকরা ২৭.৮১ ভাগের আয়তন ১.০০ থেকে ২.৫০ একর, শতকরা ৩১.১৮ ভাগের আয়তন ২.৫০-৭.৫০ একর এবং শতকরা ৭.৫৮ ভাগের আয়তন ৭.৫০ একরের উপরে। যে খামারগুলির অধীনস্থ জমির কিছু অংশ নিজের এবং কিছু অংশ বর্গা নেওয়া সেগুলির শতকরা ৭.২৮ ভাগের আয়তন ১.০০ একরের নিচে, শতকরা ৩২.৭১ ভাগের আয়তন ১.০০-২.৫০ একর, শতকরা ৪৯.৭৩ ভাগের আয়তন ২.৫০-৭.৫০ একর এবং শতকরা ১০.২৮ ভাগের আয়তন ৭.৫০ একরের উপরে।

384943

সারণি ৫.৫
১৯৬৭-৬৮ সালে জমি ব্যবহারের প্রকৃতির ভিত্তিতে খামারের শ্রেণীবিন্যাস

খামার আয়তন	আবাদী খামার সংখ্যা (শতকরা হার)				চাষের অধীন জমির পরিমাণ (শতকরা হার)			
	নিজ খামার	বর্গা খামার	আংশিক নিজ আংশিক বর্গা(%	মোট	নিজ খামার	বর্গা খামার	আংশিক নিজ আংশিক বর্গা	মোট
১.০০ একরের নিচে (শতকরা হার)	৩২.৪৮ (৮৬.৫১)	৩৩.৪৩ (৪.৭৭)	৭.২৮ (৮.৭৪)	২৪.৯৬ (১০০)	৬.০৪ (৮৩.২৪)	৬.০১ (৪.৭৩)	১.৩৩ (১২.০৩)	৪.২৪ (১০০)
১.০০-২.৫০ (শতকরা হার)	৩১.৪১ (৬৫.৯৩)	২৭.৮১ (৩.১৩)	৩২.৭১ (৩০.৯৪)	৩১.৬৭ (১০০)	১৮.৯২ (৬৪.৬৯)	১৫.৬২ (৩.০৫)	১৪.৪০ (৩২.২৬)	১৭.০৮ (১০০)
২.৫০-৭.৫০ (শতকরা হার)	২৯.৩৬ (৫৪.৯৪)	৩১.১৮ (৩.১২)	৪৯.৭৩ (৪১.৯৩)	৩৫.৫৩ (১০০)	৪৫.১৯ (৫৫.২৮)	৪৪.১৪ (৩.০৮)	৫১.৯৫ (৪১.৬৪)	৪৭.৭৪ (১০০)
৭.৫০ একরের উপরে (শতকরা হার)	৬.৭৫ (৫৭.২৬)	৭.৫৮ (৩.৪৪)	১০.২৮ (৩৯.৩০)	৭.৮৪ (১০০)	২৯.৮৫ (৫৬.৩৪)	৩৪.২৩ (৩.৬৮)	৩২.৩২ (৩৯.৯২)	৩০.৯৪ (১০০)
মোট (শতকরা হার)	১০০ (৬৬.৪৮)	১০০ (৩.৫৬)	১০০ (২৯.৯৬)	১০০ (১০০)	১০০ (৫৮.৪০)	১০০ (৩.৩৩)	১০০ (৩৮.২৭)	১০০ (১০০)

সূত্র : MASTER SURVEY OF AGRICULTURE IN BANGLADESH 1967-68 (Seventh Round, Second Phase), Dacca: B B S, Table No- 2 (a), p. II.

উপরোক্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, যে খামারগুলি মালিক নিজেই আবাদ করে সেগুলির মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক খামারের আয়তন ১.০০ একরের নিচে। তবে মালিক নিজে চাষ করলেও এ সকল খামারের আয়তন এত ক্ষুদ্র যে, অন্য কোন পেশার সাহায্য ছাড়া এ সকল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

খামার মালিকের পক্ষে পারিবারিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভবপর নয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এরা কৃষিমজুরী বা অন্য কোন কিছুকে প্রধান বা পার্শ্বপেশা হিসাবে বেছে নিতে বাধ্য হয়। ১.০০-২.৫০ একর আয়তনের খামারগুলির মালিকদের অবস্থাও অনুরূপ। এদের হাতে মালিক কর্তৃক আবাদী খামারের শতকরা ৩১.৪১ ভাগ অর্থাৎ মালিক কর্তৃক আবাদী খামারের শতকরা ৬৪ ভাগ খামার মালিক আবাদ বহির্ভূত অন্য কোন পেশার সাথে সম্পর্কিত হতে বাধ্য হয়। ষাট দশকে পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলে কৃষিবহির্ভূত অন্যান্য পেশার আয়তন যেমন ছিল ক্ষুদ্র, তেমনই উপার্জনের দিক থেকেও সেগুলি ছিল খুবই অনিশ্চিত। ফলে যে কোন সংকট মুহূর্তে তাদের পক্ষে গ্রামীণ ধনী ও জোতদার পরিবারের কাছে ধর্না দেওয়া ছাড়া তাদের কোন উপায় থাকতো না। আর স্বাভাবিকভাবেই, এ সকল ক্ষুদ্র জোতের মালিকরা নিজের প্রয়োজনে ঋণ বা সাহায্যের জন্য যখন ধনী পরিবারগুলির কাছে যায়, তখন তাদের শর্ত অনুযায়ীই যে কোন ঋণ বা সাহায্য নিতে হয়। অন্যদিকে, যে সকল আবাদী খামারের আংশিক নিজ মালিকানাধীন এবং আংশিক বর্গা নেওয়া, সে সকল খামারের প্রধান অংশের (শতকরা ৪৯.৭৩ ভাগ) আয়তন ২.৫০-৭.৫০ একরের মধ্যে এবং সবচেয়ে স্বল্প সংখ্যক (শতকরা ৭.২৮ ভাগ) খামারের আয়তন ১.০০ একরের নিচে। আসলে আবাদ করার সামর্থ্য যাদের কম তারা ইচ্ছা করলেও বর্গাজমি পায় না এবং তুলনামূলকভাবে সঙ্গতি সম্পন্নদের বর্গাজমি পেতে অসুবিধা হয় না। আর তাই বর্গাজমি যাদের সবচেয়ে বেশি দরকার, তারাই বর্গাজমি পায় না। আসল কথা হচ্ছে, বর্গাজমি পাওয়া চাষীর প্রয়োজনের মাত্রার ওপর নির্ভর করে না, বর্গাদাতার লাভের মাত্রার ওপর নির্ভর করে। যার পক্ষে ভাল ফলন দেওয়া সম্ভব হবে তার পক্ষেই জমি বর্গা পাওয়া সহজতর হবে। (অবশ্য, গোষ্ঠী, দল, ক্ষমতা ইত্যাদি সামাজিক উপাদানও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।) ফলে ক্ষুদ্রতর খামার মালিকগণ দ্রুত শেষ সম্বলটুকু হাতছাড়া করতে বাধ্য হয়। বিভিন্ন আয়তনের খামারের চাষের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে।

সারণি ৫.৫ থেকে দেখা যায়, যে সকল খামারের আয়তন ১.০০ একরের নিচে তাদের মধ্যে শতকরা ৮৬.৫১ ভাগ খামারই মালিক নিজে আবাদ করে। এ আয়তনের খামারের শতকরা ৪.৭৭ ভাগ আবাদ হয় ভাগ চাষী দ্বারা, বাকি শতকরা ৮.৭৪ ভাগ খামারের আবাদকারী নিজে খামারের একাংশের মালিক এবং বাকি অংশটা তার বর্গা নেওয়া। এ থেকে প্রমাণ হয় প্রান্তিক (যে সকল আবাদী খামারের আয়তন ১.০০ একরের নিচে) খামারসমূহের আবাদকারিগণ মূলত বর্গার জন্য কোন জমি পায় না। তাই তো প্রান্তিক খামারগুলির অধীনস্থ জমির শতকরা ৮৩.২৪ ভাগের পরিপূর্ণ জমিটুকু নিজের, শতকরা ১২.০৩ ভাগ জমির অংশ বিশেষ বর্গা নেওয়া এবং মাত্র শতকরা ৪.৭৩ ভাগ জমি পরিপূর্ণভাবে বর্গা নেওয়া। ছোট খামার (১.০০-২.৫০ একর) গুলির অবস্থাও প্রায় অনুরূপ। এদের মধ্যেও শতকরা ৬৫.৯৩ ভাগ খামার নিজের জমি নিজে চাষ করে এবং মাত্র শতকরা ৩.১৩ ভাগ খামার আবাদের অধীনস্থ পরিপূর্ণ জমি বর্গা নেয়। অবশ্য এদের মধ্যে শতকরা ৩১.৬৭ ভাগ খামার আবাদের অংশ বিশেষ বর্গা নিতে সক্ষম হয়। এ সকল খামারের অধীনস্থ জমির শতকরা ৫৪.৬৯ ভাগ জমি আবাদ করে মালিক নিজেই, শতকরা ৩.০৫ ভাগ আবাদ করে পরিপূর্ণরূপে বর্গাদার এবং শতকরা ৩২.২৬ ভাগ জমির মালিক অংশত আবাদকারী নিজে ও অংশত তার বর্গা নেওয়া। বর্গা নেওয়ার সুযোগ সবচেয়ে বেশি পায় মাঝারি কৃষকগণ (যাদের খামারের আয়তন ২.৫০-৭.৫০ একর)। এদের মধ্যে মাত্র শতকরা ৫৪.৯৪ ভাগ খামার মালিক কোন জমি বর্গা নেয় না, বাকি শতকরা ৪৫ ভাগ খামারের জমিই অংশত বা পরিপূর্ণরূপে বর্গাধীন। যেসব খামারে পরিপূর্ণরূপে বর্গাচাষ হয়, সেসব খামারের শতকরা ৪৪.১৪ ভাগই মাঝারি খামার। যে খামারগুলি নিজেদের দ্বারা চাষাবাদ হয়, তার অধীনস্থ জমির শতকরা ৪৫.১৯ ভাগ মাঝারি খামারভুক্ত, যদিও এরা মোট খামারের মাত্র শতকরা ২৯.৩৬ ভাগ। আংশিক নিজের, আংশিক বর্গা নেওয়া জমি নিয়ে যে খামারগুলি গঠিত হয়েছিল তার অধীনস্থ জমিরও শতকরা ৫১.৯৫ ভাগ মাঝারি খামারভুক্ত। তাই দেখা যায়, গ্রামের বড় খামার মালিকগণ, বিশেষত যারা জোতদার (যাদের সে সময় ২৫ একরের চেয়ে বেশি জমি ছিল) তাদের ফসলি খাজনা শোষণের মূল ক্ষেত্র ছিল মাঝারি আয়তনের আবাদী খামারগুলি, যারা নিজের কিছু অংশ জমির সাথে কিছু অংশ বর্গা নিয়েছিল বা সম্পূর্ণ জমি বর্গা নিয়ে তার আবাদী খামারের আয়তন ২.৫০-৭.৫০ একরে উন্নীত করেছিল। এ মাঝারি খামারগুলির মালিকরা জোতদারদের দ্বারা শুধু সেদিন ফসলি খাজনার মাধ্যমেই শোষিত হয়নি, জোতদারদের ক্ষমতা প্রয়োগ ও তার বিস্তারের ক্ষেত্রেও তাদের নির্ভরযোগ্য মিত্র হিসাবে ভূমিকা পালন করতে হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামীণ সমাজে জোতদার ও ধনী পরিবারগুলির ক্ষমতা প্রয়োগের বিষয়টি সেদিন কি সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল তা গ্রামীণ সমাজে ক্ষমতা কাঠামো বিষয়ক উপ অধ্যায়ে পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

সারণি ৫.৫ থেকে দেখা যায়, বড় খামারগুলির (৭.৫০ একরের উপর যাদের আয়তন) মধ্যেও অনেকে আংশিক কিংবা পরিপূর্ণ জমি বর্গা নিয়ে তাদের আবাদী খামারের আয়তন এত বড় করেছে। খামার মালিক নিজে চাষ করে এমন খামারের সংখ্যা বড় খামারগুলির অংশে শতকরা ৫.৭৫ ভাগ পড়লেও এ ধরনের খামারের আওতাধীনে শতকরা ২৯.৮৫ ভাগ জমি ছিল। যে সকল খামার পরিপূর্ণ বর্গা নিয়ে বড় খামারে উন্নীত হয়েছিল, সে সকল খামারের অধীনে ছিল পরিপূর্ণ বর্গা চাষভুক্ত খামারের অধীনস্থ মোট জমির শতকরা ৩৪.২৩ ভাগ। আর আংশিক নিজ মালিকানা, আংশিক বর্গা নিয়ে গঠিত বড় খামারগুলির অধীনেও ছিল এ ধরনের খামারের অধীনস্থ মোট জমির শতকরা ৩২.৩২ ভাগ। অর্থাৎ স্বল্পসংখ্যক খামার হওয়া সত্ত্বেও বড় খামারগুলির অধীনেই সেদিন গড়ে এক-তৃতীয়াংশ জমি আবাদ হত। অন্যদিকে, বড় খামারগুলির অধীনে মোট যে জমি আবাদ হত তার মধ্যেও বর্গা নেওয়া জমির পরিমাণ নেহাত কম ছিল না। শতকরা ৫৬.৩৪ ভাগ জমি নিজ মালিকানাধীন আবাদী খামারভুক্ত, শতকরা ৩.৬৮ ভাগ জমি পরিপূর্ণ বর্গা নেওয়া আবাদী খামারভুক্ত, এবং শতকরা ৩৯.৯২ ভাগ জমি আংশিক বর্গা, আংশিক নিজ মালিকানাধীন আবাদী খামারভুক্ত। বড় খামারগুলির মাঝেও কি করে জমি বর্গা নেওয়ার এ প্রবণতা ছিল তা কৃষি উপকরণ ও কৃষি যন্ত্রপাতির ওপর মালিকানার ধরনের দিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে।

পূর্ব পাকিস্তানের কৃষি ব্যবস্থায় গবাদিপশু অন্যতম একটি কৃষি উপকরণ, এটি কৃষিতে বিনিয়োজিত পুঁজির পরিমাণকেও নির্দেশ করে। ষাট দশকের National sample survey (third round) এর তথ্য থেকে দেখা যায়, শতকরা ৩৭ ভাগ খামারের অধীনে সে সময় কোন গবাদিপশু ছিল না।[২৪] এ থেকেই ধারণা করা যায় কৃষক পরিবারগুলির মাঝে কৃষি উপকরণের ওপর মালিকানার ক্ষেত্রে কি নিদারুণ বৈষম্য বিদ্যমান ছিল। উক্ত সারণি থেকে দেখা যায়, জমি মালিকানার বিবেচনায় উপরের ১০ ভাগ পরিবারের মালিকানায় ছিল শতকরা ৩৭ ভাগ গবাদিপশু। অন্যদিকে .৫০ একরের নিচে যাদের জমি তাদের মধ্যে মাত্র শতকরা ১০ ভাগ পরিবারের কোন না কোন প্রকৃতির গবাদিপশু ছিল, এবং যারা ১.০০ একর জমির মালিক তাদের মধ্যে মাত্র শতকরা ২৮ ভাগ পরিবারের হাতে কোন না কোন

---

২৪. National Sample Survey (2nd Round), Central Statistical Office, Economic Affairs Division, Government of Pakistan, 1960, Table: 39.

Dhaka University Institutional Repository

ধরনের গবাদিপশু ছিল। অথচ যাদের মালিকানায় ১২.৫ একর কিংবা তার বেশি পরিমাণে জমি ছিল তাদের শতকরা ৯৫–৯৮ ভাগ পরিবারের হাতেই গবাদিপশু ছিল। ৪০.০০ একরের চেয়ে বেশি জমির মালিকদের পরিবার-প্রতি গড় গবাদিপশুর সংখ্যা ছিল ১০টি করে, ২৫–৪০ একর আয়তনের পরিবারগুলির পরিবার-প্রতি গড় গবাদিপশু সংখ্যা ছিল ৭টি করে এবং ১২.৫–২৫ একর আয়তনের খামার মালিকদের পরিবার-প্রতি গড় গবাদিপশুর সংখ্যা ছিল ৫টি করে।[২৫] উক্ত Sample survey-এর তৃতীয় রাউন্ডের রিপোর্টে জানা যায়, শতকরা ৬৮ ভাগ গ্রামে গবাদিপশুর অভাব ছিল এবং যে কারণে কৃষকদের জমি চাষ করা খুবই অসুবিধা হচ্ছিল।[২৬] ফলে তারা হয় কঠিনতর দৈহিক পরিশ্রম করে জমি চাষ করতো, নয়তো বিত্তবানদের কাছ থেকে গবাদিপশু ধার নিতে বাধ্য হত।[২৭] নিঃসন্দেহে এ পরিস্থিতি ছোট খামারগুলির জন্য বড় খামারগুলির সাথে নির্ভরশীল (dependency) সম্পর্কের একটি ক্ষেত্র তৈরি করেছিল।

কৃষি উৎপাদনের জন্য লাঙ্গল হচ্ছে একটি অন্যতম হাতিয়ার। ১৯৬০ সালের কৃষিশুমারি থেকে জানা যায়, সে সময় মোট খামারের এক-তৃতীয়াংশের মালিকানায় কোন লাঙ্গল ছিল না।[২৮] ১.০০ একর কিংবা তার কম পরিমাণ জমির মালিক খামারগুলি মোট খামারের এক-চতুর্থাংশ, অথচ এদের মাত্র শতকরা ১৬.৭ ভাগের কাছে লাঙ্গল ছিল। অন্যদিকে যে সকল খামারের আয়তন ৫.০০ একর কিংবা তার উপরে তাদের শতকরা প্রায় ১০০ ভাগের কাছেই লাঙ্গল ছিল। উক্ত সারণি থেকে জানা যায়, ৪০.০০ একরের চেয়ে বেশি আয়তনের খামারগুলির মালিকানায় খামার-প্রতি গড় লাঙ্গল সংখ্যা ছিল ৫.৫টি; ২৫ থেকে ৪০ একর আয়তনের খামারগুলির মালিকানায় খামার-প্রতি গড় লাঙ্গলের সংখ্যা ছিল ৩.৫টি। এ থেকেই পরিষ্কার হয়ে ওঠে, সে সময় কি নিদারুণভাবে বড় খামারগুলির কাছে কৃষি উৎপাদনের অন্যতম উপকরণ লাঙ্গল কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বিপুল সংখ্যক লাঙ্গলহীন খামার মালিক লাঙ্গলের ব্যাপারে বড় খামারগুলির ওপর নির্ভরশীল ছিল। লাঙ্গলের ব্যাপারে ছোট খামার মালিকদের বড় খামারগুলির ওপর এ নির্ভরতা পরবর্তী চার বছরে একটুও কমেনি।[২৯]

উপরে জমির বন্টন, ঋণ, বর্গাচাষ, গবাদিপশু ও লাঙ্গলের বন্টন সম্পর্কে যে চিত্র ফুটে ওঠে তা থেকে দেখা যায় যে, ষাট দশকে পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলে শুধু মাত্র ছোট খামারগুলির মাঝেই দারিদ্র্য বিদ্যমান ছিল না। সেখানে দারিদ্র্য ছিল বলা চলে সর্বব্যাপী। প্রান্তিক ও ছোট খামারগুলিতো বটেই, এমনকি মাঝারি খামার মালিকগণও নির্মম দারিদ্র্যের তাড়নায় জোতদারদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। সে সময় মোট খামারের এক-তৃতীয়াংশ এবং ছোট ও প্রান্তিক খামারগুলির প্রধান অংশই বড় খামারগুলির ওপর অর্থনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এদের বিনিয়োগ করার কোন ক্ষমতা ছিল না। প্রতিবছরই এসব পরিবারে ঘাটতি পড়তো। আর সে ঘাটতি পূরণ করতে গিয়ে তাদের মালিকানাধীন জমির একাংশ হাতছাড়া করতে হত। ছোট ও নিম্ন মাঝারি খামারগুলির এই জমি হারানোর প্রক্রিয়া ভূমিহীন হয়ে পড়বার আগ পর্যন্ত অব্যাহত থাকতো।[৩০] সে সময় গ্রামীণ দারিদ্র্য যে কোন্ পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয়েছিল তা আয়ের বন্টনের দিকে লক্ষ্য করলেই পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

সারণি ৫.৬

পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামীণ এলাকায় আয়ের বন্টনের স্বরূপ

মাসিক আয়ের শ্রেণী বিভাগ	পরিবারের শতকরা হার	আয়ের শতকরা হার	গড় মাসিক আয়
১০০ টাকার নিচে	৪১.৩	১৭.২	৮৩.৭০ টাকা
১০০–২৫০ টাকা	৪৪.৪	৪২.৬	১৪৮.৭৬ "
২৫০–৫০০ "	১১.৫	২৪.৮	২৭৪.৮৫ "
৫০০ টাকার উপরে	২.৮	১৪.৭	৭৮১.০০ টাকা
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১৫২.৯০ "

সূত্রঃ National Sample Survey (2nd Roumd), Central Statistical Office, Economic Affairs Division Government of Pakistan, 1961, Table No .6.1.

উপরোক্ত সারণি থেকে বোঝার কোন উপায় নেই যে, ভূমি বিন্যাসের ভিত্তিতে কোন্ শ্রেণীর আয় কত, তবে আগের আলোচনা থেকে এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে, যে সকল খামার বেশি পরিমাণ জমি নিয়ন্ত্রণ করে, অধিকসংখ্যক গবাদিপশু ও লাঙ্গলসহ অন্যান্য কৃষি উপকরণের মালিক এবং যারা বিনা বিনিয়োগে ভাগ চাষের সুবাদে ফসল ভোগ করার সুযোগ পায় তারাই বেশি আয়-গ্রুপে পড়বে। অবশ্য মহাজনী ব্যবসাসহ অন্যান্য পার্শ্ব আয়ের কারণও আয় বন্টনের চিত্রের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে, কিন্তু ষাট দশকের গ্রামে বাড়তি অর্থের প্রধান উৎস ছিল যেহেতু জমি সেহেতুযে কোন আয়ই খামারের আয়তন বৃদ্ধিতেই সে সময় কাজে লাগতো।[৩১]

উপরোক্ত সারণি থেকে দেখা যায়, মোট গ্রামীণ পরিবারের শতকরা ৪১.৩ ভাগের মাসিক আয়ই ১০০ টাকার নিচে এবং তাদের গড় মাসিক আয় মাত্র ৮৩.৭০ টাকা। এসব পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা যদি ৫ ধরা হয়, তাহলে এ সব পরিবারের মাথাপিছু মাসিক আয় দাঁড়ায় মাত্র ১৬.৭৪ টাকা। উক্ত সারণি থেকে দেখা যায় ১০০–২৫০ টাকা আয় স্তরের পরিবার মোট গ্রামীণ পরিবারের শতকরা ৪৪.৪ ভাগ এবং এদের গড় মাসিক আয় ১৪৮.৭৬ টাকা। অর্থাৎ এ স্তরে কারো কারো মাসিক আয় ২৫০ টাকার কাছাকাছি হলেও অধিকাংশ পরিবারের আয় ১০০ টাকার বেশি নয়। এ আয় স্তরেরর পারিবারিক আয়তন ৫.৫ ধরলে এদের মাসিক মাথাপিছু আয় দাঁড়ায় মাত্র ২৭.০৫ টাকা অর্থাৎ এদের বার্ষিক মাথাপিছু আয় মাত্র ৩২৫ টাকা। সে সময় গ্রামীণ সমাজে পরিবার পিছু গড় মাসিক আয় ছিল ১৫৩ টাকা: এবং মাসিক মাথাপিছু আয় ছিল ২৮ টাকা; যারা তখন দারিদ্র্যসীমার অনেক নিচে অবস্থান করছিল। তাহলে উপরোক্ত আলোচনা

২৫. *Ibid*,
২৬. Sobhan, Rehman (1968): *Basic Democracies, Works Programme And Rural Development In East Pakistan*, Dacca: Bureau of Economic Research, p.10.
২৭. *Ibid*. pp.10-11.
২৮. Pakistan Census of Agriculture 1960. Vol.1, East Pakistan, Agricultural Census Organization, Ministry of Food & Agriculture, Government of Pakistan Table No.20.
২৯. Sobhan, Rehman, *op.cit*., p.11.
৩০. *Ibid*, p.12.
৩১. *Ibid*,p.12.

Dhaka University Institutional Repository

থেকে একথা খুবই স্পষ্ট যে, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামীণ সমাজে শতকরা ৮৫.৭ ভাগ পরিবার এমন দরিদ্রতর জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছিল যে, তাদের পক্ষে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করে কৃষি উৎপাদনে বিনিয়োগ করার কোন ক্ষমতা ছিল না। যদিও শতকরা এই ৮৫.৭ ভাগ পরিবারই যে কৃষি উৎপাদনের সাথে যুক্ত ছিল এমন নয়; এদের অনেকেই কৃষিমজুর বা অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত ছিল। তা সত্ত্বেও এ থেকে খুব পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় গ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিবার(প্রায় ৮৬%) তখন অর্থনৈতিকভাবে অন্য শ্রেণীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সারণি ৫.৬ থেকে আবার এর একটি বিপরীত চিত্রও ফুটে ওঠে। গ্রামের সবাই যে সে সময় দরিদ্র জীবন যাপন করতো তা নয়। গ্রামে সে সময় শতকরা ২.৮ ভাগ পরিবারের মাসিক আয় ছিল ৫০০ টাকার উপরে এবং এ সকল পরিবারের মাসিক গড় আয় ছিল ৭৮১ টাকা। এরা গ্রামের মাত্র শতকরা ২.৮ ভাগ পরিবার হওয়া সত্ত্বেও এরা ছিল মোট আয়ের শতকরা ১৪.৭ ভাগের মালিক অর্থাৎ সংখ্যার তুলনায় তাদের আয়ের পরিমাণ ছিল সোয়া পাঁচ গুণ। এরাই ছিল সে সময় গ্রামের সবচেয়ে বড় উদ্বৃত্ত শ্রেণী, এদের পক্ষে সহজেই প্রান্তিক ও ছোট খামার মালিকদের ক্ষুদ্রায়তন ভূমি খন্ড নিজের মালিকানায় নিয়ে আসা সম্ভব ছিল। অবশ্য ২৫০-৫০০ টাকা আয় গ্রুপের অনেকের পক্ষেও সে সময় উক্ত নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া সম্ভব ছিল , কেননা তাদের মাসিক গড় আয় মোট গড় আয় অপেক্ষা শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ বেশি ছিল। এরা ছিল মোট গ্রামীণ পরিবারের শতকরা ১১.৫ ভাগ, যারা মোট আয়ের শতকরা ২৪.৮ ভাগের মালিক ছিল। অর্থাৎ সংখ্যার তুলনায় এদের আয়ের পরিমাণ দ্বিগুণেরও বেশি ছিল। উপরোক্ত এ দুইটি শ্রেণীই সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামীণ পরিবারের ঘাটতির সুযোগ নিয়ে তাদের সম্পত্তির পরিমাণ বাড়িয়ে চলেছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Bureau of Economic Research গ্রুপের পক্ষ থেকে অধ্যাপক রেহমান সোবহান (১৯৬৮) দেখতে পান, ষাট দশকের মাঝামাঝি সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিবার ছিল ঘাটতি পরিবার। ঘাটতির মাত্রা সম্পর্কে সারণি ৫.৭ থেকে কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে।

সারণি ৫.৭
খামারে উৎপাদিত ফসলের সাথে সংসারের প্রয়োজনের সম্পর্কের মাত্রা

বছরের অবস্থা	উৎপাদিত ফসলে যাদের সংসারের প্রয়োজন মেটে (%)	উৎপাদিত ফসলে প্রয়োজন মেটে না (%)	মোট (%)
খারাপ বছর	১৫.৬	৮৪.৪	১০০
ভাল বছর	৩৯.৭	৬০.৩	১০০
গড়	২৭.৬৫	৭২.৩৫	১০০

সূত্র : Rehman Sobhan (1968) *Ibid*, Table No 18 p.18

উপরের সারণি থেকে দেখা যায়, জমি থেকে যে আয় হয় তা দিয়ে গড়ে শতকরা মাত্র ২৭.৬৫ ভাগ খামার মালিক তাদের সাংসারিক প্রয়োজন মেটাতে পারে। আর বাকি শতকরা ৭২.৩৫ ভাগ পরিবারেরই প্রতিবছর ঘাটতি পড়ে। ভাল বছর হলে অর্থাৎ ফসল ফললে শতকরা ৩৯.৭ ভাগ খামার মালিক কোন ক্রমে তাদের প্রয়োজন মেটায় তথা ঘাটতির হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম হয়, কিন্তু এই ভাল বছরেও বাকি শতকরা ৬০.৩ ভাগ খামার মালিক ঘাটতির হাত থেকে নিস্তার পায় না। আর যে বছর ফসল মার যায়, সেবার শতকরা মাত্র ১৫.৬ ভাগ খামার মালিক তাদের পরিবারকে ঘাটতির হাত থেকে কোন রকমে রক্ষা করতে পারে, বাকি শতকরা ৮৪.৪ ভাগ পরিবারেরই ঘাটতি পড়ে। অর্থাৎ খারাপ বছর হোক আর ভাল বছর হোক, মোটামুটি শতকরা ১৫ ভাগ পরিবার কখনই ঘাটতির সম্মুখীন হয় না, বাকি ৮৫ ভাগের কেউ কেউ ভাল ফসল ফললে পারিবারিক ঘাটতিকে এড়াতে পারে ঠিকই, কিন্তু তাদের সব সময়ই ঘাটতির চিন্তায় উৎকণ্ঠিত থাকতে হয়। আর এদের এ অসহায়ত্বের সুযোগ গ্রহণ করে উক্ত ১৫ ভাগ ধনী পরিবার।

অধ্যাপক রেহমান সোবহান তার গবেষণা নিয়ে সারা পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলের মোট ৩০২০ জন উত্তরদাতার কাছে প্রশ্ন করে জানতে পারেন ১৯৬৪ সালে তাদের প্রধান অংশের আর্থিক অবস্থা আগের তুলনায় খারাপ হয়ে গেছে। তাদের শতকরা মাত্র ২৫.৬ ভাগ উত্তর দেন ১৯৫৭ সাল অপেক্ষা এখন তারা ভাল আছেন, শতকরা ২৩.৬ জন উত্তর দেন ১৯৪৭ সালের তুলনায় এখন তারা ভাল আছেন। অন্যদিকে, শতকরা ৭০.৪ ভাগ ও শতকরা ৭৩.৬ ভাগ উত্তর দেন যথাক্রমে ১৯৫৭ সাল ও ১৯৪৭ সাল অপেক্ষা তাদের আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। আর যথাক্রমে শতকরা ৪.০ ভাগ ও শতকরা ২.৮ ভাগ নিরুত্তর থাকেন।[৩২] এদের শতকরা ৬৭.৫ ভাগ ও শতকরা ৭০.১ ভাগ উত্তর দেন যথাক্রমে ১৯৫৭ ও ১৯৪৭ সাল অপেক্ষা ১৯৬৪ সালে তাদের ধার-দেনার পরিমাণ বেড়ে গেছে। শতকরা ৭৪.৩ ভাগ ও শতকরা ৭৬.০ ভাগ উত্তরদাতা জানিয়েছেন যথাক্রমে ১৯৫৭ সাল ও ১৯৪৭ সালের তুলনায় তাদের মালিকানাধীন গবাদিপশুর সংখ্যা ১৯৬৪ সালে এসে হ্রাস পেয়েছে। উত্তরদাতাদের শতকরা ৭৪.৩ ভাগ জানান ১৯৫৭ সাল অপেক্ষা ১৯৬৪ সালে তাদের মালিকানাধীন জমির পরিমাণ কমে গেছে, মাত্র শতকরা ৬.৭ ভাগ উত্তরদাতা জানিয়েছেন এ সময়ে তাদের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষকগণ যে খারাপ বছর এবং ভাল বছরের কথা বলেছেন, তার মূল কারণ বন্যা, অনাবৃষ্টি বা এ ধরনের অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ। পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) এমন একটি এলাকা নিয়ে গঠিত যে, যেখানে প্রায় সব ঋতুতেই কোন না কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ লেগেই থাকে। National Sample Survey (third round) থেকে জানা যায়, শতকরা ৭০.৭ ভাগ গ্রামের জনসাধারণ জানিয়েছেন ১৯৬৪ সালে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে তাদের ফসলহানি ঘটেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে বন্যা সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করতো। বন্যার কারণে যাদের ফসলহানি ঘটেছে তারা গ্রামের শতকরা ৪১.৪ ভাগ এবং ফসল ও বাড়িঘর দুইই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে যারা দাবি করেছে তাদের সংখ্যা শতকরা ৩২ ভাগ।[৩৩]

স্বাভাবিক সময়েই গ্রামের অধিকাংশ পরিবারে যেখানে ঘাটতি পড়ে সেখানে এ ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় তাদেরকে আরও বেশি শংকিত করে তুলতো। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হত সবচেয়ে বেশি প্রান্তিক ও ছোট খামার মালিকগণ। এ অসহায়ত্বের সুযোগ গ্রহণ করতো গ্রামের বিত্তবানেরা।

এই ছিল যখন গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থা, তখন সরকারের পক্ষ থেকে তো এ সকল সমস্যার সমাধান করার কোন প্রচেষ্টা গ্রহণ করাই হয়নি, বরং বিভিন্ন অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন গ্রামাঞ্চলের শ্রেণী

---

৩২. *Ibid*, Table No. 1.9, p.19.
৩৩. *Ibid*,p.39.

Dhaka University Institutional Repository

বৈষম্যকে তীব্রতর করে তোলা হয়েছে, তেমনই অন্যদিকে, সরকারের সামাজিক ভিত্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে একশ্রেণীর বিত্তবান ব্যক্তির কাছে ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে। যে সময় প্রয়োজন ছিল সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা, খোদ কৃষকের কাছে জমি প্রদান করা অথবা অন্ততঃ খোদ কৃষকদের কাছ থেকে জমি হাতছাড়া যাতে না হতে পারে তার ব্যবস্থা করা এবং উৎপাদনের উপকরণ যাতে খোদ কৃষকদের হাতে পৌঁছাতে পারে তার ব্যবস্থা করা। কিন্তু এসব কিছু না করে সরকার মৌলিক গণতন্ত্রীদেরকে খুশি রাখার জন্য সম্ভাব্য সব কিছু করেছে। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে এই মৌলিক গণতন্ত্রী ও তাদের সহযোগীদের মিলে পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলে গড়ে উঠেছিল ক্ষমতার এমন একটি শক্ত ভিত্তি যাকে ভেদ করে কৃষক সমাজের নিজের দাবির কথা বলা এবং সে জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠেছিল। গ্রামীণ সমাজে ক্ষমতা প্রয়োগ বিষয়ক নিম্নোক্ত উপাধ্যায়ে পরিষ্কার হয়ে উঠবে মৌলিক গণতন্ত্রী ও তাদের সহযোগীদের নিয়ে গ্রামীণ ক্ষমতাকাঠামো ষাট দশকে কি শক্ত ভিত্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং সাধারণ কৃষকদের মধ্যে তারা কি তীব্র শ্রেণী ঘৃণার কারণ হয়েছিল।

৫.২ গ্রামীণ সমাজে ক্ষমতা কাঠামোর স্বরূপ

ষাট দশকে গ্রামীণ সমাজে ক্ষমতা কাঠামোর ওপর আলোকপাত করতে হলে প্রথমেই গ্রামীণ সমাজের নেতৃত্বের ধরন নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। কেননা গ্রামীণ সমাজে তখন একজন নেতা হয়ে ওঠার পিছনে কোন্ উপাদানগুলি বিশেষভাবে কাজ করত তা চিহ্নিত করতে পারলেই ক্ষমতা প্রয়োগের রূপকে চিহ্নিত করা সহজ হবে।

গ্রামীণ সমাজে মাতবর বা সরদারের একটি বিশেষ অবস্থান রয়েছে। যদিও এদের গুরুত্বের আইনগত কোন ভিত্তি নেই, কিন্তু স্থানীয়ভাবে তাদের পদমর্যাদা, সম্মান ও প্রভাব প্রতিপত্তির বিশেষ সামাজিক স্বীকৃতি রয়েছে। এদেরকে সাধারণতঃ স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ হিসাবে পরিচয় দেওয়া হয়ে থাকে।[৩৪] গ্রামে সরদার বা মাতবর কে হবে তার কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই। সরদার বা মাতবর হওয়ার প্রধান দুইটি পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়ঃ একটি জন্মসূত্রে এবং অন্যটি অর্জনের মাধ্যমে।[৩৫] সাধারণভাবে মাতবরের ছেলেকে মাতবর হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়ে থাকে-এটাই জন্মসূত্রে মাতবর হওয়ার প্রথা। এছাড়াও মাতবরী অর্জন করার আরো কয়েকটি পথ আছে। অনেক সময় প্রখর বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি মাতবর হিসাবে স্বীকৃতি পেয়ে থাকে। মাতবর পরিবার ছাড়াও ঐতিহ্যগতভাবেই প্রভাবশালী পরিবারের সদস্যগণ গ্রামে অবস্থান করলে মাতবর হিসাবে স্বীকৃতি পেয়ে থাকে। গতানুগতিকভাবে মাতবর হওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট কোন যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কতকগুলি আর্থ সামাজিক কারণে সকল মাতবরের পদমর্যাদা ও প্রভাব সমান থাকে না। বৈষয়িক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়লে পারিবারিক ঐতিহ্যের কারণে মাতবর হয়েও ক্ষমতাহীন হয়ে পড়তে হয়, আবার উক্ত গোষ্ঠীরই অন্য একজন বৈষয়িক সফলতার কারণে নতুন করে মাতবরী অর্জন করে সেইই প্রধান মাতবরে পরিণত হতে পারে। তবে সাধারণভাবে সে সময় গ্রামীণ সমাজে খামারের আয়তন দ্বারাই প্রভাব-প্রতিপত্তির পরিমাণ নির্ধারিত হত।[৩৬] আর যে সময় বড় খামার আয়তন আর পারিবারিক মাতবরী সমন্বিত হত, তখন মাতবরী ক্ষমতা আরো দৃঢ় ভিত্তি পেতো। মাতবরদের মূল কাজ হচ্ছে সামাজিক কোন অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দেওয়া, গ্রামবাসীদের মধ্যে কোন ব্যাপারে বিরোধ বাঁধলে তার মীমাংসা করা। গ্রামবাসীদের মধ্যে বিরোধের মূল কারণ হচ্ছে ভূমির মালিকানা।[৩৭] যে কোন বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রেই মাতবরগণ নিজের গোষ্ঠী ও সামাজিক স্তরের দিকে নজর রেখে বিরোধ মীমাংসা করে। অন্যদিকে, অসম শ্রেণীর মধ্যে যদি বিরোধ বাঁধে, বিশেষতঃ জমির মালিকানা নিয়ে তাহলে বড় খামার মালিকের বিপক্ষে সাধারণত কোন রায় দেওয়া হয় না। কেননা মাতবর নিজেও জমি-জমা সংক্রান্ত অসংখ্য বিরোধের সাথে জড়িত। আর সে মাতবর বলেই বিরোধ থাকা সত্ত্বেও নির্বিবাদে জমি ভোগ করে যেতে পারে।

খামারের বড় আয়তন যেমন একজন মাতবরের ক্ষমতাকে সে সময় সংহত করে তুলতো, তেমনই প্রশাসনের সাথে সংযোগও মাতবরের এ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দিতো।[৩৮] কেননা স্থানীয় প্রশাসন, ভূমি রাজস্ব ও আইন-শৃংখলা রক্ষা ইত্যাদি বিভাগের স্থানীয় শাখাগুলির ওপরই ছিল সে সময় গ্রামীণ উন্নয়ন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও ভূমি প্রশাসনের মূল দায়িত্ব। ঐতিহাসিকভাবেই সার্কেল অফিসার এবং ও.সি.র প্রতি গ্রামীণ মানুষের এক ধরনের ভয় রয়ে গেছে। ফলে যে সকল ব্যক্তির সাথে উক্ত কর্মকর্তাদের সরাসরি যোগাযোগ ছিল তারাও জনসাধারণের কাছে ভীতিকর ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত ছিল।[৩৯]

অন্যদিকে, স্থানীয় রাজস্ব কর্মচারীদের সংগে বড় খামার মালিকগণ নানাবিধ কারণে বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল। প্রথমতঃ জমিদারী ব্যবস্থা ভেঙ্গে দেওয়ার পর দ্রুততার সাথে কর্মচারী নিয়োগ করতে গিয়ে অসংখ্য অবাঞ্ছিত লোক প্রশাসনে ঢুকে পড়ে; দ্বিতীয়তঃ সরকারের মধ্যে জমিদার সমর্থিত যারা ছিল, তাদের প্রভাবে জমিদারীর অনেক পুরানো কর্মচারীকে স্থানীয় কর্মচারী/কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; তৃতীয়তঃ এই কর্মচারীদের বেতন অত্যন্ত কম থাকার কারণে অবৈধ আয় ও জীবন ধারণে তারা বাধ্য হত। এ পরিস্থিতিতে তারা অনেক সময়ই গ্রামের ক্ষমতাশালীদের 'আতিথ্য' গ্রহণ করে তাদের হাতের পুতুলে পরিণত হত।[৪০] এই অবস্থাটা প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের শাসনামলে মৌলিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার মধ্য দিয়ে আরও ব্যাপকতা লাভ করে।

১৯৫৯ সালের ২৭শে অক্টোবর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব 'Basic Democracies Order শিরোনামে এক আইন জারি করেন। এ আইনের ধারাগুলি ছিল নিম্নরূপ ঃ

1. A Union council for a union (union consists of a number of villages) in rural areas and a Town committee for a Town or a union committee for a union in urban areas.
2. A Thana council for a Thana in East Pakistan, and a Tahsil council for a Tahsil in West Pakistan,
3. A District council.

---

৩৪. Rahim, S.A (1965): *Communication and Personal Influence in an East Pakistan Village*, Comilla: The Academy for Rural Development, pp.26-33.
৩৫. Rashiduzzaman, M. (1968): *Politics and Administration in the Local Councils*, Dacca: Oxford University Press. p.21.
৩৬. Ibid, p.21.
৩৭. Ibid, p.21.
৩৮. Ibid, p:21
৩৯. Ibid, p.21.
৪০. সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

4. A Divisional council.
5. Two Provincial council;Development Advisory councils for East Pakistan and West Pakistan"[৪১]

মূল নির্দেশে ইউনিয়ন কাউন্সিলের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যকে মনোনীত করার কথা বলা হয়েছিল এবং তা ১৯৬০ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত বহাল ছিল। কিন্তু কার্যত দেখা গেল থানা পর্যায়ের যে সকল কর্মকর্তার ওপর এ মনোনয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজের খেয়াল-খুশি মত নির্বাচন করতো। ফলে স্বাভাবিকভাবেই কর্মকর্তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট লোকেরাই নির্বাচিত হত। এতে একদিকে যেমন জনসাধারণের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিতো, অন্যদিকে অধিকাংশ নির্বাচিত সদস্যদের থেকে সরকারের বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। অর্থাৎ যে লক্ষ্যে এ মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল, এই মনোনয়ন দানের বিষয়টি তা ব্যাহত করে।[৪২] ফলে ১৯৬৫ সালে এসে এ মনোনয়নের ব্যাপারটি বাদ দিয়ে ইউনিয়ন কাউন্সিলের সকল সদস্যকেই নির্বাচিত হওয়ার নির্দেশ জারি করা হয়।

সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত ৬ থেকে ৯ জন সদস্যকে নিয়ে গড়ে উঠতো ইউনিয়ন কাউন্সিল। ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যগণ নিজেরা ভোট দিয়ে নিজেদের মধ্য থেকেই একজন চেয়ারম্যান ও একজন ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচন করতেন। এ কাউন্সিলের মেয়াদকাল ছিল ৫ বছর। এ ৫ বছরের মধ্যে একমাত্র জেলা প্রশাসক ছাড়া আর কেউ এ কাউন্সিলকে ভেঙ্গে দিতে পারতো না।[৪৩]

চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ছিল কাউন্সিলের মিটিংএ সভাপতিত্ব করা। স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণই থাকতো এসব মিটিং-এর উদ্দেশ্য। তবে ইউনিয়ন কাউন্সিলের আওতাভুক্ত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করা ও এক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেওয়া ছিল চেয়ারম্যানেরমূল দায়িত্ব। ভাইস-চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সম্পর্কে তেমন কিছুই উক্ত নির্দেশে লেখা ছিল না, শুধু মাত্র চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে কাউন্সিলের মিটিং-এ সভাপতিত্ব করার কথা উল্লেখ ছিল।[৪৪] চেয়ারম্যান যদি একটু অধিক বয়স্ক হতেন এবং ভাইস-চেয়ারম্যানের সাথে যদি তার সুসম্পর্ক থাকতো তাহলে সমস্ত কর্মকান্ডে ভাইস-চেয়ারম্যানই অধিকতর সক্রিয় থাকতেন। চেয়ারম্যান অপেক্ষাকৃত কম বয়স্ক ও সক্রিয় হলে ভাইস-চেয়ারম্যানের স্বতন্ত্র কোন কাজই থাকতো না। উক্ত দুইজনের মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃতির ওপরই আসলে নির্ভর করতো কে কতটা ভূমিকা পালন করবে।[৪৫]

প্রথমদিকে, চেয়ারম্যান বা ভাইস-চেয়ারম্যানের প্রতি সদস্যদের অনাস্থা জ্ঞাপনের কোন অধিকার ছিল না। এর ফলে প্রত্যেক ইউনিয়নে সরকারের একটি সামাজিক ভিত্তি গড়ে ওঠার বদলে চেয়ারম্যানের একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ফলে অনবরতই বিসদৃশভাবে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ করতে হয়। এর এক পর্যায়ে আর্টিকেল ২৫(এ)-এর মাধ্যমে চেয়ারম্যান/ভাইস-চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা পেশ করে পদচ্যুত করার অধিকার দেওয়া হয়।[৪৬]

চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান অথবা সদস্যকে পদচ্যুত করার পথ ছিল তিনটিঃ ১.পদত্যাগ; ২.দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের অনাস্থা এবং ৩. নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা কর্তৃক অব্যাহতি প্রদান।[৪৭] আর যেহেতু নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বা জেলা প্রশাসক যে কোন কারণে যে কোন সদস্য বা চেয়ারম্যান/ভাইস-চেয়ারম্যানকে পদচ্যুত করতে পারতো, তাই জেলা প্রশাসকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অথবা তার সম্মতি না নিয়ে, চেয়ারম্যান/ভাইস-চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য যত দায়িত্বহীন ও দুর্নীতিবাজই হোক না কেন তার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। কেননা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার যে কোন কর্মকান্ড সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার কোনরকম অধিকার কাউন্সিল সদস্যদের দেওয়া হয়নি, এমনকি তাদের সম্পর্কে যে কোন প্রশ্ন তোলা ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্য বা চেয়ারম্যানদের জন্য ছিল নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কে এম রশিদুজ্জামান বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেনঃ

The controlling authority of the union council has also been empowered to remove a Chairman or a Vice-Chairman for physical incapacity, and any one removed from office on this ground shall cease to be a member of a local council. No one can question the decision of controlling authority in removing a person from his office.[৪৮]

আর সে কারণে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান/ভাইস-চেয়ারম্যানগণ সব সময় পদচ্যুত হওয়ার ভয়ে শংকিত থাকতো। ফলে তারা সব সময়ই সরকারী প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের খুশি করার কাজে ব্যস্ত থাকতো। সেহেতু যে কোন রাষ্ট্রীয় নির্দেশ তারা সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সম্পন্ন করার জন্য তৎপর থাকতো। ফলে ইউনিয়ন কাউন্সিলের মেম্বর-চেয়ারম্যানগণ জনসাধারণের স্বার্থের তুলনায় সরকারী প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের স্বার্থের প্রতি সে সময় অধিক অনুরাগী হয়ে পড়েছিল। এই মেম্বার-চেয়ারম্যান তথা সকল মৌলিক গণতন্ত্রীদের শ্রেণী অবস্থানও এমন ছিল যে, তাদের নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ সাধারণ কৃষকদের স্বার্থের অনুকূল নয়, তাই তারা প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের সুবাদে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থকে সংরক্ষণ ও সম্প্রসারিত করার সুযোগ গ্রহণ করতো। এই মৌলিক গণতন্ত্রীগণ কিভাবে জনসাধারণের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে সরকার, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও নিজ শ্রেণীস্বার্থকে সংরক্ষণ করতো সে আলোচনায় যাওয়ার আগে মৌলিক গণতন্ত্রীদের শ্রেণী অবস্থানের প্রতি প্রথমে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

১৯৬৪/৬৫ সালের মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচনে যারা নির্বাচিত হয়েছিল,তাদের ওপর এক জরিপ চালিয়ে দেখা যায়, ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্যদের শতকরা ৭৭.৭৮ জনের পেশা কৃষি, শতকরা ১৬.৯৬ জনের পেশা ব্যবসা বা ঠিকাদারী এবং বাকি ৫.২৬ ভাগের পেশা আইন ব্যবসা, শিক্ষকতা, ডাক্তারী ও অন্যান্য। আর চেয়ারম্যানদের মধ্যে শতকরা ৭০.৩৫ জনের পেশা কৃষি, শতকরা ২৩.৯৭ জনের পেশা ব্যবসা ও ঠিকাদারী এবং বাকি শতকরা ৫.৬৮ ভাগের পেশা ডাক্তারী, আইন ব্যবসা, শিক্ষকতা বা অন্যান্য।[৪৯] এম.

---

৪১. Rashiduzzaman, *op.cit.*, pp.7-8.
৪২. *Ibid*, p.9.
৪৩. *Ibid*,p.10.
৪৪. A Handbook of Basic Democracies. Government of East Pakistan, 1964. Basic Democracies Order. No.39(2).
৪৫. Rashiduzzaman, *op.cit.*, p.10.
৪৬. *A Hand Book of Basic Democracies, op.cit., p.16.*
৪৭. Rashiduzzaman, *op.cit.*, p.11.
৪৮. *Ibid*, p.11.
৪৯. *Ibid*, Table 8 (IV), p.37.

Dhaka University Institutional Repository

রশিদুজ্জামান সারা পূর্ব পাকিস্তানের ৩,৬৭৫ জন চেয়ারম্যানের ওপর এক সমীক্ষা চালিয়ে দেখতে পান, এদের মধ্যে শতকরা ৬১.১২ ভাগ চেয়ারম্যানের বার্ষিক আয় ৪ হাজার টাকার উপরে, ২ হাজার থেকে ৪ হাজার টাকার মধ্যে যাদের আয় তাদের শতকরা হার ২৮.৭৯ ভাগ। আর বাকি শতকরা ৯.৬৯ জনের বার্ষিক আয় ২ হাজার টাকার নিচে। আগে আমরা দেখেছি, সে সময় পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলের শতকরা ৮৫.৭ ভাগ পরিবারের বার্ষিক আয় ছিল ২০০০ টাকার নিচে, মাত্র শতকরা ১৪.৩ ভাগ পরিবারের বার্ষিক আয় ছিল ২ হাজার টাকার উপরে। অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলের শতকরা যে ১৪.৩ ভাগ মানুষের বার্ষিক আয় ছিল ২ হাজার টাকার উপরে তাদের থেকে মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিল শতকরা ৮৯.৯১ ভাগ। এদের মধ্যেও শতকরা ৬১.১২ ভাগের বার্ষিক আয় ৪ হাজার টাকার উপরে। অর্থাৎ গ্রামের উচ্চবিত্ত পরিবারগুলিরই মৌলিক গণতান্ত্রীদের মধ্যে ছিল একক প্রাধান্য। জমির মালিকানার দিক থেকে বিবেচনা করলেও দেখা যায়, মৌলিক গণতন্ত্রীদের প্রধান অংশই ছিল বড় খামারের মালিক। উল্লিখিত তথ্য থেকে দেখা যায়, সে সময় মৌলিক গণতন্ত্রীদের শতকরা ৪২.৪০ ভাগের খামার আয়তন ছিল ১২.৫ একরের উপরে এবং শত ২০.৪১ ভাগ মৌলিক গণতন্ত্রীর খামার আয়তন ছিল ৭.৫-১২.৫০ একরের মধ্যে, শতকরা ২১.১৭ ভাগ মৌলিক গণতন্ত্রীর খামার আয়তন ছিল ৫.০-৭.৫০ একর, শতকরা ১৩.২৬ ভাগের খামার আয়তন ছিল ২.৫-৫.০ একর এবং বাকি শতকরা ২.২৯ ভাগের জমির পরিমাণ ছিল ১.০-২.৫০ একর। এমন কোন মৌলিক গণতন্ত্রী ছিল না যাদের খামার আয়তন ছিল ১ একরের নিচে।[৫০] আমরা আগের আলোচনায় দেখেছি ১২.৫০ একরের উপর যাদের জমি ছিল ১৯৬৮ সালে তারা ছিল মোট খামারের মাত্র ২.৬ ভাগ, অথচ এদের থেকেই মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিল শতকরা ৪২.৪০ ভাগ। মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভূমি-ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস করলে দেখা যায়, তাদের শতকরা ৬২.৮১ ভাগ বড় খামারের মালিক ছিল, অথচ এরা ছিল মোট খামারের শতকরা মাত্র ৭.৮৫ ভাগ। শতকরা ৩৪.৪৩ ভাগ মৌলিক গণতন্ত্রী ছিল মাঝারি খামারের মালিক, অবশ্য এদের প্রধান অংশের খামারের আয়তন ছিল ৫ একরের উপরে। অথচ যারা মোট খামারের শতকরা ৫১.৬৪ ভাগ, সেই ছোট খামার মালিকদের থেকে নির্বাচিত হয়েছিল শতকরা মাত্র ২.২৯ ভাগ মৌলিক গণতন্ত্রী। গ্রামাঞ্চলের বিশাল জনগোষ্ঠী তথা ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষক পরিবার থেকে কোন ব্যক্তিই মৌলিক গণতন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত হয়নি, অথচ এরাই ছিল সে সময় গ্রামের মোট পরিবারের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ। অর্থাৎ এই পঞ্চাশ ভাগ পরিবারের পক্ষে স্থানীয় সরকারে কোন প্রতিনিধিত্বই ছিল না।

মৌলিক গণতন্ত্রীদের ওপর সে সময় তিন ধরনের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। এ দায়িত্বগুলি হচ্ছেঃ

১. প্রেসিডেন্ট, প্রাদেশিক পরিষদ এবং জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে ভোট প্রদান করা;

২. স্থানীয় ওয়ার্কস প্রোগ্রামের কাজ তত্ত্বাবধান করা;

৩. স্থানীয় সরকার ও রাষ্ট্র নির্ধারিত রাজস্ব ও কর সংগ্রহের কাজে সহযোগিতা করা। সেই সাথে স্থানীয় আইন- শৃংখলা রক্ষা করা ও সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করার কাজে সরকারকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করা।[৫১]

যেহেতু এ মৌলিক গণতন্ত্রীদের সরকার নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই এদেরকে খুশি রাখা সরকারের জন্য ছিল অপরিহার্য। স্থানীয়ভিত্তিক ওয়ার্কস প্রোগ্রামের কাজ যেভাবে সম্পন্ন হত তার প্রতি দৃষ্টি দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে ওঠে। রেহমান সোবহান ওয়ার্কস প্রোগ্রামের ওপর বিস্তারিত গবেষণা করে দেখিয়েছেন, ওয়ার্কস প্রোগ্রামের ওপর যথার্থ কোন জবাবদিহিমূলক তত্ত্বাবধান ছিল না। হিসাব-নিকাশের ওপরও কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। ফলে একদিকে যেমন ওয়ার্কস প্রোগ্রাম লক্ষ্য অর্জনে সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থ হয়, অন্যদিকে ওয়ার্কস প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে নিয়োজিত মৌলিকগণতন্ত্রী ও বড় খামার মালিকগণ ফুলে-ফেঁপে ওঠে।[৫২] রেহমান সোবহান হিসাব করে দেখিয়েছেন ১৯৬৪-৬৫ সালে ওয়ার্কস প্রোগ্রামে যত টাকা বরাদ্দ করা হয়, সরকারী হিসাব অনুযায়ীই তার শতকরা ১৮.৩৯ ভাগ অপচয় হয়।[৫৩] নয়টি খাতের মধ্যে শুধুমাত্র ছোট ছোট দু`টি খাতেই ঠিকমত কাজ হয় এবং বাকি ৭টি খাতেই ব্যাপক অপচয় হয়। জেলা, থানা ও ইউনিয়ন কাউন্সিল খাতে মোট ১৪৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়, কিন্তু এসব খাতে খরচের যে হিসাব পাওয়া যায় তার পরিমাণ মাত্র ১১৪.৮২ কোটি টাকা। অর্থাৎ এসব খাতে বরাদ্দকৃত টাকার শতকরা ২০.২৬ ভাগের কোন হিসাবই পাওয়া যায় না।[৫৪] আর এসব কাজের একটি বড় অংশের তত্ত্বাবধান করে মৌলিকগণতন্ত্রীরা।

মৌলিক গণতন্ত্রীদের সবাই যে খারাপ ছিল তা নয়: এদের কার্যকলাপ কেমন হবে তার অনেকটাই নির্ভর করতো থানা ও জেলা কাউন্সিলের ওপর;কেননা এরাই ইউনিয়ন কাউন্সিলগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতো। তাই দেখা গেছে, মৌলিক গণতন্ত্রীগণ অনেক জায়গাতেই ওয়ার্কস প্রোগ্রামের কাজের মাধ্যমে স্থানীয় অবকাঠামো, খাল খনন, স্কুল ঘর নির্মাণ ইত্যাদিতে বেশ ভাল অবদান রেখেছে। সে কারণেই কোথাও কোথাও দেখা গেছে, বেশ কম টাকাতেই অনেক উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন হয়েছে, আবার অধিকাংশ জায়গায় সামান্য কিছু কাজের পিছনেই প্রচুর টাকা খরচ হয়ে গেছে। রেহমান সোবহান অনুসন্ধান করে দেখিয়েছেন, ইউনিয়ন কাউন্সিল ও থানা কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন বিভিন্ন প্রকল্পের খরচের পরিমাণ বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন রকম দেখানো হয়েছে। বাঁধ নির্মাণ ও খাল খণন কর্মসূচীকে তিনি মূল্যায়ণ করে দেখিয়েছেন, কোথাও যে পরিমাণ কাজ করতে খরচ পড়েছে মাত্র ৫০০ টাকার নিচে, আবার কোথাও সেই একই পরিমাণ কাজ সম্পন্ন করতে খরচ পড়েছে ৫০০০ টাকারও বেশি। তিনি দেখিয়েছেন প্রতি বাঁধ নির্মাণ করতে ১০% মহকুমাতে খরচ হয়েছে ৫০০ টাকার কম, ১০% মহকুমার ৫০০-১০০০ টাকা,২৩% এর ১০০০-১৫০০ টাকা, ১৫% এর ১৫০০-২০০০ টাকা, ১৩% মহকুমার খরচ হয়েছে দুই থেকে আড়াই হাজার টাকা, ১০% মহকুমার খরচ হয়েছে আড়াই থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা, ৮% এর খরচ হয়েছে সাড়ে তিন থেকে সাড়ে চার হাজার টাকা এবং বাকি ১০% এর খরচ হয়েছে আরও বেশি।[৫৫] থানা কাউন্সিলের অধীনস্থ কাজেও এ ধরনের অসমতা আরও বেশি দেখা গেছে। থানা কাউন্সিল বাঁধ নির্মাণের কাজে শতকরা ২৩ ভাগ মহকুমাতে প্রতি ইউনিটের জন্য খরচ পড়েছে সাড়ে চার হাজার টাকারও বেশী, শতকরা মাত্র ৫ ভাগের খরচ পড়েছে এক হাজার টাকার নিচে। খাল খননের ক্ষেত্রেও সেই একই চিত্রের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। সেখানে শতকরা ১৮ ভাগ মহকুমাতে ইউনিয়ন কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানের কাজে একক প্রতি খরচ পড়েছে এক হাজার টাকারও নিচে, শতকরা ৪৩ ভাগের একক প্রতি খরচ পড়েছে এক থেকে দুই হাজার টাকা। অন্যদিকে শতকরা ১১

---

৫০. Rashiduzzaman, M. *op.cit.*, Table No. 13(II.V),p.43.
৫১. Sobhan, Rehman (1968): *op.cit.*, pp.VI-VII.
৫২. *Ibid*, pp.141-43.
৫৩. *Ibid*, p.186.
৫৪. *Ibid*, p.187. Table 5-13.
৫৫. *Ibid*. p.200, table 5-17.

Dhaka University Institutional Repository

ভাগ মহকুমাতে একক প্রতি খরচ পড়েছে সাড়ে চার হাজার টাকারও উপরে। আর এই একই কাজের যে অংশ থানা কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে হয়েছে তার মাত্র ৫ ভাগ ক্ষেত্রে একক প্রতি খরচ পড়েছে এক হাজার টাকার নিচে আর শতকরা ৩৮ ভাগ ক্ষেত্রেই এককপ্রতি খরচ পড়েছে সাড়ে চার হাজার টাকার উপরে।[৫৬] এছাড়াও বরাদ্দের পদ্ধতি, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের ধরন ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনার সাথে এ সকল তথ্য পরিবেশন করে রেহমান সোবহান দেখিয়েছেন, ওয়ার্কর্স প্রগ্রামের ওপর মূলতঃ কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না, ইচ্ছামত মৌলিকগণতন্ত্রী ও প্রশাসনের কর্মচারীগণ বরাদ্দকৃত অর্থ আত্মসাৎ করতো এবং মর্জিমত কাজের হিসাব প্রদান করতো। আর এ কারণেই সমপরিমাণ কাজের জন্য বিভিন্ন মহকুমাতে ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে বিভিন্ন রকম। আর এর মধ্যদিয়ে মৌলিকগণতন্ত্রীরা বিশেষতঃ ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানরা বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়েছে।প্রায় কপর্দক শূণ্য অবস্থায় যেসকল মৌলিকগণতন্ত্রী চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিল, মাত্র কয়েক বছরের মাথায় তাদের অনেকের বার্ষিক আয় দাঁড়িয়েছিল ৪০ হাজার টাকারও উপরে। রেহমান সোবহান এসব চেয়ারম্যানদের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

The Chairmen now appear transformed from penniless adventurers to men of considerable substances, with 58.5% earning incomes above Rs.5000 and 23% in the happy position of having incomes of Rs.10,000 and above. In fact two of them seem to be positively rolling in wealth, with incomes above Rs.40,000.[৫৭]

ওয়ার্কস প্রোগ্রামের অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সেচব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং জলাবদ্ধতার নিরসন।[৫৮] এ লক্ষ্যগুলিকে সামনে রেখে ১৯৬২-৬৩ অর্থবছর থেকে ত্রি-বার্ষিক পরিকল্পনা নিয়ে কাজও শুরু হয়। যে সকল এলাকায় বেশ হাঁকডাক করে কাজ শুরু হয়, তার মধ্যে কয়েকটি এলাকার ওপর নিবিড় অনুসন্ধান করে জানা যায়, প্রথম বছরই একটি এলাকার বাজারজাতযোগ্য কৃষি উদ্বৃত্ত শতকরা ২৪.৪ ভাগ হ্রাস পায়। সংখ্যার দিক থেকে পরবর্তী বছর উদ্বৃত্ত পরিবারের সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু ওয়ার্কস প্রোগ্রাম শুরুর আগের সংখ্যা থেকে অনেক কম। যে সকল পরিবার তাদের উৎপাদিত ফসলের শতকরা ৩০ ভাগ বাজারজাত করে এমন পরিবারের সংখ্যা ১৯৫৭-৫৮ সালে ছিল শতকরা ১৫.৩ ভাগ, ১৯৬২-৬৩ সালে এসে তাদের শতকরা হার দাঁড়ায় মাত্র ৫.১ ভাগ এবং ১৯৬৩-৬৪তে এসে তার হার দাঁড়ায় শতকরা ৬.৪ ভাগ।[৫৯] অন্যান্য অঞ্চলের সমীক্ষা থেকেও একই ধরনের চিত্র পাওয়া যায়। ওয়ার্কস প্রোগ্রামের মাধ্যমে জমির উৎপাদনশীলতার ওপর কোন পরিবর্তন এসেছে কিনা তা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে এমন চারটি থানার ওপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখা যায়, একমাত্র পাট উৎপাদনের ক্ষেত্রেই সামান্য ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে, ধান ও আখ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ঘটেছে নেতিবাচক পরিবর্তন। উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন না ঘটার কারণ হিসাবে রেহমান সোবহান লক্ষ্য করেন, উদ্বৃত্ত খামারগুলি উদ্বৃত্তকে উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে বিনিয়োগ করছে না, বরং উদ্বৃত্তকে মহাজনী কারবার ও জমি ক্রয়ের জন্য ব্যয় করা হচ্ছে।[৬০]

তাই বলা যায়, ওয়ার্কস প্রোগ্রাম চালু করার কারণে উৎপাদনের ক্ষেত্রে পশ্চাদ্গামিতা (Backwardness) আরো সম্প্রসারিত হয়। কেননা ওয়ার্কস প্রোগ্রাম থেকে আত্মসাৎ করা অর্থ মৌলিকগণতন্ত্রী ও তাদের সহযোগিগণ উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে বিনিয়োগ করেনি। অন্যদিকে, মৌলিকগণতন্ত্রীদের অধিকাংশই যেহেতু বড় খামারের মালিক ছিল সেহেতু তাদের সদ্য ক্রয় করা জমি নিজের খামারের অধীনে না এনে বর্গা দেওয়া হত। মহাজনীর টাকাও উৎপাদন ক্ষেত্রে পশ্চাদ্গামিতারই নিদর্শন। ওয়ার্কস প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে যে বাঁধ তৈরি ও খাল খনন করা হয়েছিল তাতেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। অধ্যাপক সোবহান তাঁর গবেষণায় দেখতে পেয়েছেন, ওয়ার্কস প্রোগ্রামের মাত্র শতকরা ৩৫.৪ ভাগ বন্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে।[৬১] ওয়ার্কস প্রোগ্রাম শুরুর পর গ্রামীণ কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার কোন ইতিবাচক পরিবর্তন হয়নি। বরং এ সময়ে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। ঋণের পরিমাণ এবং রাজস্ব ও করের পরিমাণ আরো বেড়ে গেছে। রেহমান সোবহান এ সময়ের চারটি মহকুমার ওপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখতে পেয়েছেন, ১৯৫৭-৫৮ সালে শতকরা যতটি পরিবারের বার্ষিক আয় ১ হাজার টাকার নিচে ছিল, ১৯৬৩-৬৪ সালে তার হার আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। কুমিল্লার যে এলাকাতে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় ওয়ার্কস প্রোগ্রামের কাজ চালানো হয়, সেখানে ১৯৫৭-৫৮ সালের বার্ষিক ১ হাজার টাকার কম আয়ক্ষম পরিবারের সংখ্যা শতকরা ৩৮.৯ ভাগ ছিল। ১৯৬৩-৬৪ সালে তার সংখ্যা বেড়ে শতকরা ৫২.৪ ভাগে গিয়ে উপনীত হয়।[৬২] স্মরণযোগ্য যে, এই ৭ বছরে টাকার মান মোটেই বাড়েনি, বরং উল্লেখযোগ্য হারে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। অর্থাৎ এ সময়ে নিম্ন আয়ভুক্ত লোকের হার প্রকৃত অর্থে অনেক বেশি ছিল। এ সময়ে গ্রামীণ মানুষের পরিবারপিছু ঋণের পরিমাণও ভয়ানকভাবে বেড়ে যায়। একমাত্র কুমিল্লার কোতোয়ালী থানাতেই দেখা যায় সমবায় ভিত্তিতে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, কুমিল্লার অপরাপর অংশ এবং অন্য তিনটি মহকুমার হিসাব থেকে দেখা যায়- সে সকল জায়গায় ঋণের মূল উৎস হচ্ছে মহাজন।[৬৩] সঞ্চয়ের ক্ষেত্রেও দেখা যায় ওয়ার্কস প্রোগ্রামের কারণে কোন ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পড়েনি, শুধু মাত্র কুমিল্লার কোতোয়ালীতে সঞ্চয়ের পরিমাণ ও সঞ্চয়কারীর সংখ্যা মোটামুটি শতকরা ১০ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাকি এলাকাগুলি তথা নড়াইল, বোদা এবং শিবালয়ে এ সময়ে সঞ্চয়ের পরিমাণ সামান্য বাড়লেও সঞ্চয়কারীর সংখ্যা মোটেই বাড়েনি। প্রকৃত পক্ষে এ সময়ে গ্রামের অধিকাংশ পরিবার বিপুল পরিমাণ ঘাটতির হাত থেকেও নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারেনি। নড়াইল থানার শতকরা ৭৪.৮ জন, শিবালয়ের শতকরা ৮৫.৫ জন এবং বোদা থানার শতকরা ৪০.১ জন এই কালপর্বে বার্ষিক ৫০০ টাকা করে ঘাটতির সম্মুখীন হয়েছে। ৫০০ টাকার নিচে যাদের ঘাটতি পড়েছে তাদের সংখ্যাও প্রচুর।[৬৪] ফলে সঞ্চয়ের ব্যাপারটি তাদের কাছে কল্পনা বিলাস হিসাবেই রয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে রেহমান সোবহান মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

---

৫৬. *Ibid.*
৫৭. *Ibid*, p.87.
৫৮. *Ibid*, p.113.
৫৯. *Ibid*, p.213.
৬০. *Ibid*, 218.
৬১. *Ibid*. p.227.
৬২. *Ibid*, p.229.
৬৩. *Ibid*, p.231.
৬৪. *Ibid*, p.233.

Dhaka University Institutional Repository

The majority of the villagers cannot meet their minimum consumption requirements so that savings becomes a rather academic question.[৬৫]

যে সময় সঞ্চয় বাড়ছে না, ঘাটতি পরিবার সংখ্যার ও শতকরা হার প্রতি বছর বাড়ছে, ঠিক সে সময়ে গ্রামের কৃষকদের ওপর রাজস্ব ও করের বোঝা মোটেই হ্রাস পায়নি। বরং বেশ কিছু ক্ষেত্রে বেড়েছে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের চারটি থানার ওপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, ১৯৫৭-৫৮ সালের পর থেকে প্রতি বছর করের পরিমাণ বেড়ে গেছে। যেমন, কুমিল্লাতে ১৯৫৭-৫৮ সালে আয়ের ২%এর বেশি কেউ কর দিত না, কিন্তু ১৯৬৩-৬৪ সালে ৩% পরিবারকে ২% এর বেশি কর দিতে হয়েছিল। শিবালয়ের হিসাব থেকে দেখা যায়, সেখানে কর দিতে হয় না এমন পরিবারের সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পেতে পেতে এদের হার ১৯৬৩-৬৪ সালে মাত্র ৩.৯% এ দাঁড়ায়। এ সময়ে আয়ের ২%-এর বেশি কর দিতে বাধ্য হত এমন পরিবারের সংখ্যাও কিছু বৃদ্ধি পায়। বোদা এলাকার হিসাব থেকে দেখা যায়, সেখানে ১৯৫৭-৫৮ সালে ৮৬.৫% পরিবার কর দিত, ১৯৬৩-৬৪ সালে কর দাতাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৯৩.৪%-এ। সেই সাথে এখানে ১৯৫৭-৫৮ সালে ২%-এর বেশি আয়কর দিত এমন পরিবারের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪.৫% ১৯৬২-৬৩ সালে এদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮.৫%-এ এবং ১৯৬৩-৬৪ সালে তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ২১.১%-এ। নড়াইলের তথ্য থেকেও এই একই চিত্র ফুটে ওঠে, বরং সেখানে ১৯৬৩-৬৪ অর্থবছরে আয়ের ২%-এর বেশি কর দিতে হয়েছিল ২৭.৭% পরিবারকে।[৬৬]

উপরোক্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, ষাট দশকে গ্রামীণ পরিবারগুলির ওপর ক্রমাগত করের বোঝা চাপতে থাকে। যদিও ওয়ার্কস প্রোগ্রামের কারণে গ্রামের ক্ষুদ্র একটি শ্রেণীর লাভ হয়েছিল, কিন্তু এ লাভের খেসারত দিতে হয়েছিল সমগ্র গ্রামবাসীকে। শুধু করের ক্ষেত্রে খেশারত দিয়েই তারা পার পায়নি, তাদেরকে রাজস্বের ক্ষেত্রেও বিপুল পরিমাণে খেশারত দিতে হয়েছিল। ১৯৫৭-৫৮ সালের হিসাব থেকে দেখা যায়, কুমিল্লাতে ৬% পরিবারের কোন খাজনা দিতে হত না, ৮৩.৫% পরিবার খাজনা দিয়েছিল আয়ের ২%-এর নিচে এবং বাকি ১০.৫% খাজনা দিত আয়ের ২%-এর উপরে। কিন্তু ১৯৬২-৬৩ সালে ৩.১% কোন খাজনা দেয় নি, ৪২.৫% খাজনা দিয়েছে আয়ের ২% এর নিচে, বাকি ৫৪.৪%ই খাজনা দিয়েছে আয়ের ২%-এর বেশি।১৯৬৩-৬৪ সালেও ৪৯.৬% পরিবারকে আয়ের ২%-এর বেশি রাজস্ব দিতে হয়েছে। অন্যদিকে, ১৯৫৭-৫৮ সালে আয়ের ৪%-এর বেশি খাজনা দিতে হয়েছিল মাত্র ১.৯% পরিবারকে, কিন্তু ১৯৬২-৬৩ সালে আয়ের ৪%-এর বেশি খাজনা দিতে হয় ১৭.৮% পরিবারকে। বোদার ক্ষেত্রেও ঠিক একই ঘটনা ঘটে। ১৯৫৭-৫৮ সালে ১১.৪% পরিবারকে কোন খাজনা দিতে হয়নি, ৪২.০% পরিবার খাজনা দিয়েছে আয়ের ২%-এর কম. ৩৩.৭% দিয়েছে আয়ের ২-৪% এবং বাকি ১২.৯% খাজনা দিয়েছে ৪%-এর বেশি। অন্যদিকে, ১৯৬২-৬৩ সালে মাত্র ২.২% পরিবার খাজনার হাত থেকে রেহাই পেয়েছে, আর ৪২.৩% পরিবারকেই আয়ের ৪%-এর বেশি পরিমাণে খাজনা দিতে হয়েছে। ১৯৬৩-৬৪ সালেও এদের ৩১.৪% কে আয়ের ৪%-এর বেশি হারে খাজনা দিতে হয়েছে। অন্যান্য এলাকার অবস্থাও প্রায় একই রকম।[৬৭]

উপরোক্ত কর ও খাজনা বিষয়ক তথ্য থেকে দেখা যায়, ষাট দশকে উল্লেখযোগ্য হারে কর ও খাজনার পরিমাণ বেড়ে যায়। আগের আলোচনাতে দেখা গেছে, এ সময় গ্রামের মানুষের গড়পড়তা আয়ের পরিমাণ বা সঞ্চয়কারী পরিবারের সংখ্যা সাংঘাতিকভাবে হ্রাস পেতে থাকে। তার ওপর যদি এভাবে কর ও রাজস্বের পরিমাণ বেড়ে যেতে থাকে তাহলে কৃষকদের কি অবস্থা হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা সম্ভব। শুধুমাত্র উক্ত চারটি এলাকাতেই নয়, ১৯৫৮ সালের পর থেকে সারা পূর্ব পাকিস্তানে ভূমি খাজনার পরিমাণ খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এক হিসাব থেকে দেখা যায়, পূর্ব পাকিস্তান জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন জারির পূর্বে, চাষীদের কাছে জমিদারদের বৈধ চাহিদা ছিল মোট ৮ কোটি ৪৩ লাখ টাকা কিন্তু ১৯৫৮ সালের পর থেকে খাজনার পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭০ সালে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮ কোটি ৫০ লাখ টাকা।[৬৮] তার ওপর জমির খাজনার সঙ্গে যুক্ত ছিল শিক্ষা, স্থানীয় সরকার, ত্রাণকার্য, উন্নয়ন প্রভৃতির জন্য ধার্য করা বর্ধিত খাজনা, যার নমুনা উপরের আলোচনায় দেখা গেছে। ষাট দশকে খাজনা পরিশোধ না করাকে অত্যন্ত কঠোরভাবে নেয়া হত। ১৯৫০ এর জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইনেই এমন বিধান ছিল যে, কোনো জমির খাজনা পরিশোধ না করা হলে সেটি নিলামে দেয়া যেতে পারে। ১৯৬১ সালে এ বিধানের পরিবর্তন করে আরো কঠোরতর আইন Bengal Public Demands Recovery Act 1913-কে পুনরুজ্জীবিত করা হয়, যাকে ১৭৯৭ সালের 'কানুন হাপ্তম'-এর সাথেই শুধু তুলনা করা চলে।[৬৯] জমিদারী আমলেও খাজনা কখনও মাফ করা হত না, তবে স্থানীয় পর্যায়ে প্রভাব খাটিয়ে বা জমিদার ও তার খাজনা উসুলকারী কর্মচারীর সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে পরিশোধের সময় বাড়িয়ে নেয়া যেত। কিন্তু এই নতুন আইনে খাজনা না দেয়ার অপরাধের শাস্তি হিসাবে প্রথম দিকে বডি ওয়ারেন্ট জারি করা হতে থাকে। পরে এর কিছুটা পরিবর্তন করে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির ওপর আঘাত আসতে থাকে। খাজনা বাকি পড়লে হর-হামেসাই মালপত্র নিলামে দেয়া হতে থাকে, গবাদিপশুসহ অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করা হতে থাকে।[৭০] এ ধরনের অত্যাচার নির্যাতন সত্ত্বেও খাজনা ওঠানো সম্ভব হয়নি। তাইতো এক হিসাব থেকে দেখা যায়, এ ধরনের বকেয়া উসুল করার জন্য ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সারা বাংলাদেশে কৃষকদের ওপর প্রায় ৬০ লাখ সার্টিফিকেট মামলা চলছিল।[৭১]

অর্থাৎ ষাট দশক তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কৃষকদের জন্য ছিল এমন একটি সময়, যখন কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল ভীষণভাবে পশ্চাদগামী, কৃষকগণ মহাজনী ঋণে ছিল জর্জরিত, খাজনা-ট্যাক্সের ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে হয়ে উঠেছিল দিশেহারা এবং তার ওপর এ সকল দাবি মেটাতে না পারার ফল হিসাবে তাদের ওপর নেমে এসেছিল নির্বিচার ক্রোক ও ধন সম্পত্তির লুণ্ঠন। আর এ লুঠতরাজ কায়েমে নেতৃত্ব দিয়েছিল তথাকথিত মৌলিকগণতন্ত্রীগণ। এ মৌলিকগণতন্ত্রীরা একদিকে ছিল বড় খামারের মালিক; ফলে তাদের কৃষি উদ্বৃত্ত দিয়ে ক্রমাগত তাদের খামারের আয়তন বাড়িয়ে চলেছিল। অন্যদিকে, সেই বাড়তি জমিকে বর্গা দিয়ে পশ্চাদগামী উৎপাদন ব্যবস্থাকে আরো প্রসারিত করে চলেছিল। অধিকন্তু তারা ওয়ার্কস প্রোগ্রামের টাকা আত্মসাৎ করে উক্ত পশ্চাদগামী উৎপাদন পদ্ধতিকে আরো গভীরতর করেছিল। যেহেতু, এই মৌলিকগণতন্ত্রীরা সরকারী প্রশাসনের সম্পূর্ণ অধীন ও অনুগত থাকতে বাধ্য ছিল, সেহেতু

৬৫. *Ibid.*
৬৬. *Ibid*, p.235.
৬৭. *Ibid*, p.234.
৬৮. সিদ্দিকী, কামাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪-৪৫।
৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ.৪৫।
৭০. উমর, বদরুদ্দীন (১৯৭৮): *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলার কৃষক*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, পৃ.৪০।
৭১. সিদ্দিকী, কামাল, প্রাগুক্ত, পৃ.৬২।

Dhaka University Institutional Repository

সরকারী খাজনা-ট্যাক্সের দাবি মেটাবার কাজে জবরদখল আদায় ও ক্রোকী কার্যকলাপের সাথে থাকতে তারা বাধ্য হত এবং প্রতিবেশী গরীব কৃষককে খাজনা বাকির অপরাধে ধরে নিয়ে গেলেও তাদের কিছু বলার থাকতো না। এ সবের অনিবার্য পরিণতি হিসাবে এই মৌলিক গণতন্ত্রীরাই গ্রামাঞ্চলে আইয়ুবী স্বৈর শাসনের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি হিসাবে প্রতিপন্ন হতে থাকে। মৌলিক গণতন্ত্রীগণ যেমন একদিকে বড় খামারের মালিক ছিল, তেমনি অন্যদিকে তাঁরা ছিল প্রধান প্রধান গোষ্ঠীর প্রতিনিধি। গ্রামীণ ক্ষমতার উৎস হিসাবে বিবেচিত প্রধান দু'টি উপাদানেরই সমাবেশ ঘটেছিল মৌলিক গণতন্ত্রীদের কাছে। রাষ্ট্রের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে এদের ক্ষমতা হয়ে উঠেছিল সীমাহীন। মৌলিক গণতন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণে ছিল চৌকিদার-দফাদার। এরা সে সময় গ্রাম পুলিশ হিসাবে বিবেচিত হত। মালক্রোক থেকে শুরু করে জনসাধারণের ওপর যে কোন ধরনের সরকারী বল প্রয়োগমূলক কাজের সাথে এরা জড়িত থাকতো। ফলে এরা জনসাধারণের কাছে অত্যন্ত ভীতিকর ব্যক্তি হিসাবে বিবেচিত হত। আর এই চৌকিদার-দফাদারদেরকে পরিচালনা করতো মৌলিকগণতন্ত্রীগণ। এ সকল কারণে মৌলিকগণতন্ত্রীরা এক সময় সামাজিক সন্ত্রাসের মূল উৎসে পরিণত হয়। রাজনৈতিক দিক থেকে প্রায় সব মৌলিকগণতন্ত্রীই পাকিস্তানবাদী ধারণার জোর সমর্থক ছিলেন। কেননা সরকারী কর্মকর্তাদের মনোরঞ্জন করার জন্য এটা ছিল এক অন্যতম হাতিয়ার। ফলে মৌলিকগণতন্ত্রীরা যেমন একদিকে ছিল গ্রামীণ শ্রেণী সমাজের শোষক, অন্যদিকে তারাই ছিল জাতীয় শোষকের স্থানীয় প্রতিভু। রাষ্ট্রযন্ত্র, মৌলিকগণতন্ত্রী এবং জোতদার মহাজনসহ অপরাপর শোষক শ্রেণী গ্রামীণ সমাজে যে ক্ষমতার আবর্ত (Ring) তৈরি করেছিল, তার প্রভাব শহুরে সমাজে, বিশেষতঃ ছাত্রদের ওপর না পড়ে পারে না। কেননা সে সময় মোট ছাত্রদের তো বটেই, এমনকি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের প্রধান অংশ এসেছিল গ্রাম থেকে। কৃষক পিতার ওপর বিপুল হারে খাজনা-ট্যাক্সের বোঝা আর অর্থকরী ফসলের নিম্নমূল্যের কারণ যে ছাত্র বুঝতে পারে সে যে সহজেই বিদ্রোহী হয়ে উঠবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই এ কথা সহজেই ধারণা করা যায়, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানকালে লক্ষ লক্ষ শহুরে ছাত্র-জনতা যে অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিল, তা গ্রামীণ জনসাধারণের জীবন সংগ্রামের সাথে সম্পর্কহীন ছিল না।

৫.৩ শিল্প

এবারে পাকিস্তান আমলে তার পূর্বাঞ্চলে শিল্প-উৎপাদনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যেতে পারে। পাকিস্তানের জন্মলগ্নে তার পূর্বাংশ তথা পূর্ব পাকিস্তানে আধুনিক কোন শিল্পই গড়ে ওঠেনি। শুধু পূর্ব পাকিস্তান নয়, সমগ্র পাকিস্তানেই তখন শিল্প বিকাশের মাত্রা ছিল খুবই নিম্ন পর্যায়ে। বৃটিশ ভারতের যে অংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় সে অংশ মোট বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের শতকরা ৪ ভাগের (৯২১টির মধ্যে ৩৪টি); মোট শিল্প শ্রমিকের শতকরা ২ ভাগের (১১,৩৭,১৫০ জনের মধ্যে ২৬,৪০০ জন) এবং মোট বৈদ্যুতিক শক্তির শতকরা মাত্র ৫.৩ ভাগের অংশীদারিত্ব লাভ করে।[৭২] এছাড়া, অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠানই কেন্দ্রীভূত ছিল দেশের পশ্চিমাংশে। মোট ১৭টি কাগজের কলের মধ্যে মাত্র ৬টি পূর্ব পাকিস্তানের অংশে পড়ে। ৫টি সিমেন্ট কারখানার মধ্যে মাত্র ১টি পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে পড়ে এবং একমাত্র তেল শোধনাগার ছিল পাকিস্তানে, তাও পশ্চিমাংশের ভাগে পড়ে।[৭৩] সে সময় আধুনিক শিল্প বলতে যাকে বোঝাতো এই ছিল তার ফিরিস্তি। পূর্ব পাকিস্তান পৃথিবীর শতকরা ৭৫ ভাগ পাট উৎপাদনকারী জমির মালিক হওয়া সত্ত্বেও সেখানে কোন পাটকল ১৯৫১ সালের আগে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।[৭৪] দেশ বিভাগের সময় যে শিল্প-কারখানাগুলি পূর্ব পাকিস্তানে ছিল তার প্রধান অংশটি ছিল সুতা ও বস্ত্র উৎপাদন কারখানা। এ সকল কারখানাতে ১৯৪৭-৪৮ অর্থ বছরে মোট ৪৯ লক্ষ ২৯ হাজার ৭৭ পাউন্ড সুতা উৎপাদিত হয় এবং ১৬ লক্ষ ৮৯ হাজার ৭৭২ গজ লংক্লথ, মার্কিন ও শার্টিং জাতীয় কাপড় উৎপাদিত হয়।[৭৫] শাড়ি ও ধুতি মিলে প্রায় ২ কোটি ৪৬ লক্ষ ৩৫ হাজার ৭৩৬ গজ কাপড় ১৯৪৭-৪৮ অর্থবছরে উৎপাদিত হয় বটে, কিন্তু এর মধ্যে কি পরিমাণ মিলে তৈরি তার কোন হিসাব পাওয়া যায়নি। তবে এর অধিকাংশটুকুই যে হস্তচালিত তাঁত শিল্পে উৎপাদিত হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য, কেননা ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানে মোট ২ লক্ষ ৫০ হাজারটি হস্তচালিত তাঁত ছিল। অবশ্য পরবর্তী ৩/৪ বছরে তা হ্রাস পেয়ে ১ লক্ষ ৮৩ হাজারে এসে উপনীত হয়।[৭৬] দেশ বিভাগের সময় চিনি শিল্পও অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ে ছিল। ১৯৪৭-৪৮ সালে মোট চিনি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল মাত্র ৬ লক্ষ ২৪ হাজার ১৪৯ মন।[৭৭] উল্লিখিত অর্থবছরে একমাত্র সিমেন্ট কারখানায় সিমেন্ট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩২ হাজার ৮০৭ টন।[৭৮] ১৯৪৭-৪৮ অর্থবছরে ম্যাচ উৎপাদনের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫৬ হাজার ৭৫০ গ্রোস।[৭৯]

উপরোক্ত শিল্পসমূহে উৎপাদন মাত্রা এত কম থাকলেও পণ্যজাত পানীয়ের উৎপাদন কিন্তু একেবারে কম ছিল না। ১৯৪৭-৪৮ অর্থবছরে এর উৎপাদন ছিল ৬ লক্ষ ৫২ হাজার ৪০৮ গ্যালন। পরবর্তীকালে অবশ্য এর উৎপাদন সাংঘাতিকভাবে হ্রাস পায় এবং ১৯৫০-৫১ অর্থবছরে এর উৎপাদন ছিল মাত্র ৭৯ হাজার ৬৮৬ গ্যালন।[৮০] অর্থাৎ ১৯৪৭-৪৮ অর্থবছরের উৎপাদনের মাত্র শতকরা ১২ ভাগ। শুধু এ জাতীয় পণ্যই নয়, দেশ বিভাগের পর গোটা শিল্পের উপরই এক মহা দুর্যোগ নেমে আসে এবং তা ১৯৫০-৫১ অর্থবছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এতবড় বিশাল সম্ভাবনাময় পাট উৎপাদন এলাকাতে ১৯৫১-৫২ পর্যন্ত একটিও পাট কল ছিল না। আধুনিক শিল্প গড়ে ওঠার পূর্বশর্ত বিদ্যুৎ প্রবাহের পরিমাণও ছিল খুবই স্বল্পমাত্রায়। ১৯৪৮ সালে মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ ছিল মাত্র ১ কোটি ৩৪ লক্ষ ৬৬ হাজার ১৮০ কিলোওয়াট ঘন্টা। তার মধ্যে মাত্র ৩০ লক্ষ ৩২ হাজার ৩৯০ কিলোওয়াট ঘন্টা ব্যবহৃত হয় শিল্প উৎপাদনে আর বাকি শতকরা ৭৮ ভাগই ব্যবহৃত হয় অন্যান্য কাজে।[৮১] অর্থাৎ যে সময় পূর্ব পাকিস্তানে মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ ছিল

---

৭২. বারানভ, এস,এস (১৯৮৬): পূর্ববাংলাঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য (১৯৪৭-১৯৭১) ঢাকাঃ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, পৃঃ ১০-১১।
৭৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১।
৭৪. Government of East Pakistan (1955): Statistical Abstract for East Pakistan- Containing Statistical data on Variour subjects for the years 1947-48 to 1952-53. Dacca: Planning Department, Govt. of East Bangol. p:249.
৭৫. *Ibid*, p. 247.
৭৬. বারানভ, এস,এস (১৯৮৬): প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।
৭৭. Government of East Pakistan (1955): op.cit, p.247, Table. 59.
৭৮. Ibid, p. 248, Table 60.
৭৯. Ibid, p. 249, Table. 62.
৮০. Ibid, P. 249, Table. 63.
৮১. Ibid, P. 250, Table. 63a.

Dhaka University Institutional Repository

বছরে মাত্র ০.৩১ কিলোওয়াট ঘণ্টা। ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানের মোট ৬১টি শহরের মধ্যে মাত্র ১৮টি শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা ছিল।[৮২] বিদ্যুৎ সরবরাহের এই স্বল্পতার দিকে লক্ষ্য করলেই শিল্প বিকাশের পশ্চাদ্‌পদতার কারণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সে সময় পূর্ব পাকিস্তানে যে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল তা এ অঞ্চলের ভৌগোলিক ও অভ্যন্তরীণ বাজার বিকাশের প্রয়োজনে সৃষ্টি হয়নি। এর সৃষ্টি হয়েছিল কলিকাতা ও চট্টগ্রাম বন্দর মারফত সহজে কাঁচামাল রপ্তানির একমাত্র লক্ষ্যে। উপরন্তু, ১৪১৮ মাইল দীর্ঘ যে রেললাইন ছিল তার অধিকাংশই কারিগরি বিবেচনায় ছিল অকেজো। ১০২৮ মাইল দীর্ঘ পাকা রাস্তার মধ্যে মাত্র ২৪০ মাইল রাস্তা ছিল সারা বছর চলাচলের জন্য উপযোগী। সে সময় ২০ হাজার ১৭২ মাইল দীর্ঘ কাঁচা রাস্তা ছিল।[৮৩] এসব সত্ত্বেও দেশ বিভাগের ফলে যে বিষয়টি বিশেষভাবে অনুভূত হতে থাকে, তাহল উক্ত স্বল্প আয়তনের রাস্তার অধিকাংশকেই দ্রুত মালামাল সরবরাহের কাজে ব্যবহার করা যাচ্ছে না। কেননা এ সকল রাস্তার অধিকাংশেরই গতিমুখ ছিল কলিকাতাকেন্দ্রিক। এর প্রচন্ড প্রভাব পড়ে পাটের বাজারে। কেননা পাট বাজারজাতকরনের চ্যানেল পরিবর্তিত হওয়ার কারণে পাট বাজারের বিদ্যমান নেটওয়ার্ক ভেঙ্গে পড়ে। ফলে খুব দ্রুত পাটের দাম হ্রাস পেতে থাকে। এর সবচেয়ে বড় শিকার হয় উৎপাদক কৃষকগণ, মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবসায়ীরাও এতে প্রচন্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে ঠিক এই একই সময়ে পাটের রপ্তানি মূল্য বাড়তে থাকে। পঞ্চাশের কোরিয়ান যুদ্ধের সময় তা চূড়ান্ত আকার ধারণ করে। এর পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহন করে পাট রপ্তানিকারকগণ।[৮৪]

দেশ বিভাগের পরবর্তী কয়েক বছর ধরে শিল্প পণ্যের অপর্যাপ্ততার কারনে এ সকল পণ্যের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। ফলে আমদানি বাণিজ্যও অধিক মুনাফার অন্যতম ক্ষেত্র হিসাবে আবির্ভূত হয়। আমদানি এবং রপ্তানির উভয় ক্ষেত্রেই এখানকার বৈদেশিক বাণিজ্য এমন লাভজনক ক্ষেত্র হিসাবে দেখা দেয় যে, স্বল্প সময়ের মধ্যেই এ সকল ব্যবসায়ী বিপুল অর্থের মালিকে পরিণত হয়। আর এ বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্যতম যোগসূত্রকারী হিসাবে আবির্ভূত হয় প্রাথমিক প্রক্রিয়াজাত কাঁচা পাট। ব্যবসায়িক স্বার্থেই এ সকল রপ্তানিকারকগণ এক বা একাধিক 'জুট প্রেস' ইন্ডাষ্ট্রি গঠনে মনোনিবেশ করে। এভাবেই পূর্ব পাকিস্তানে ব্যক্তিমালিকানায় বৃহৎ পাটকলসমূহের গোড়াপত্তন ঘটে। আদমজী, বাওয়ানী, ইস্পাহানীসহ বিভিন্ন যে সকল পাটকল গড়ে ওঠে তাদের মালিকগণ ছিল প্রথম পর্যায়ের উক্ত বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশগ্রহনকারী।[৮৫] এসব সত্ত্বেও ১৯৫১ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে কয়েকটি পাটকল ছাড়া আর তেমন কোন শিল্পের বিকাশ ঘটেনি। ১৯৫১ সালের এক হিসাব থেকে দেখা যায়, সে সময় ছোট বড় মিলিয়ে উল্লেখযোগ্য কারখানার সংখ্যা ছিল মোট ১৫২টি এবং এগুলির অধিকাংশই ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরকে ঘিরে স্থাপিত হয়েছিল।[৮৬] এছাড়াও আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ৩২৭টি ফ্যাক্টরীর অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু এগুলির অধিকাংশই ছিল কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাত শিল্প। এগুলির মধ্যে মাত্র ৬২টি ফ্যাক্টরী ছিল শিল্পোদ্যোগ।[৮৭] ১৯৫১ সালের অর্থনৈতিক জরিপ থেকেও অনুরূপ তথ্য পাওয়া যায়। উক্ত জরিপ থেকে দেখা যায়, শতকরা মাত্র ২২ ভাগ শিল্প প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎ ব্যবহার করে এবং এর সংখ্যা ছিল মাত্র ৫১টি।[৮৮] এ জরিপে উল্লেখ করার মত মোট ৩৩৩টি কারখানার কথা বলা হয় এবং তাতে নিয়মিত ও অনিয়মিত শ্রমিক সংখ্যা ছিল মাত্র ৬৬,৬৪৮ জন। রেলওয়ের কয়েকটি ওয়ার্কশপ আর সদ্য প্রতিষ্ঠিত তিনটি পাটকল ভিন্ন অবশিষ্ট অধিকাংশ কারখানাই ছিল খুব ক্ষুদ্র। হাতে গোণা কয়েকটি কারখানাতেই একশ বা ততধিক সংখ্যক শ্রমিক নিয়োজিত ছিল।

যে সকল ব্যবসায়ী তাদের বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে প্রাপ্ত মুনাফা দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে পাটকল গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহন করে, তারা একদিকে ব্যবসায়িক দিক থেকে সরকারের বিশেষ আনুকূল্য লাভ করে; ঠিক তেমনই তারা সরকারী নীতিনির্ধারণ কিংবা প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ, পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করার লক্ষ্যে যখন পিআইডিসি গঠিত হয় তখন উক্ত কর্পোরেশনের অন্যতম দু'জন পরিচালক মনোনীত হন আদমজী ও ইস্পাহানী।[৮৯] এরা এমনিতেই বৈদেশিক বাণিজ্য এবং জুট প্রেসিং ফ্যাক্টরির মাধ্যমে বিপুল অর্থের মালিক ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছিলেন। তার ওপর সরকারী সহায়তা পেয়ে এরা দ্রুতই বিশাল বিশাল কারখানা মালিকে পরিণত হন। ১৯৫০ সালে পিআইডিসি গঠিত হবার পর থেকেই বলা চলে পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন ধরনের শিল্প গড়ে উঠতে শুরু করে। পিআইডিসি-এর উদ্দেশ্য ছিল দেশের বড় বড় ব্যবসায়ীদের সাথে যৌথভাবে কারখানা প্রতিষ্ঠা করে তা লাভজনক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া এবং তারপর সরকারী পুঁজি প্রত্যাহার করে তাকে ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তর করা।[৯০] কিন্তু এ ব্যবস্থাটি শুধু মাত্র পাটকল তৈরির ক্ষেত্রেই কিছুটা অর্থবহ হয়, অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে কেউ এগিয়ে আসেনি। ফলে পিআইডিসি শতকরা ১০০ ভাগ পুঁজি নিজে বিনিয়োগ করে শিল্প সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ ধরনের কর্মসূচী গ্রহনের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি মূল কারণ হিসাবে কাজ করেছিল সে গুলি হচ্ছেঃ খুব দ্রুত শিল্পের বিকাশ ঘটানো, পুঁজির অভাবজনিত কারণে যাতে শিল্প সম্প্রসারণ বাঁধাগ্রস্ত না হতে পারে, যে ধরনের শিল্পে বিনিয়োগ করলে পাটকল কিংবা অন্য কোন লাভজনক কারবারের মত মুনাফা আসার সম্ভাবনা ছিল না, এবং পিআইডিসি এমন একটি দক্ষ ও যোগ্য কর্মী-বাহিনী গড়ে তুলতে চেয়েছিল যাতে করে পরবর্তীকালে এ বিকাশমান প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে হেক্সনার বলেন, In retrospect four principal reasons explain the PIDC's 100 per cent ownership of all its investment except for the jute industry. First was the desire to make the investments rapidly, which meant very little patience to ferreout joint venture partners. Second, there seemed to be a scarcity of industrialists with sufficient capital or experience, particularly ones from East Pakistan. Third, the profit potential of these PIDC investments matched neither jute

---

৮২. হাসানত, এস,এম (১৯৮৬): প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২।
৮৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।
৮৪. Ahmed, Kamruddin (1975): A Socio-Political History of Bengol and the Birth of Bangladesh,Dacca; p. 97.
৮৫. হাসানত, এস,এম (১৯৮৬): প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪।
৮৬. Labour Commissioner of East Pakistan (1951): *Directory of Labour in East Pakistan* Dacca, Vol. 3, Statement 99, P: 123.
৮৭. Ibid, P. 129.
৮৮. Central Statistical Offece (1957): Economic Survay of East Pakistan, Karachi: GOP, P. 29.
৮৯. Hexner, J. Tomas (1969): 'EPIDC: A Conglomerate in Pakistan-The Spin-off Process', Cambridge: Development Advisory Service. mimeo. p. 9.7.
৯০. Ibid, p.

Dhaka University Institutional Repository

manufacturing nor several other investment opportunities. Fourth, PIDC had built up a staff and like most staff they wanted absolute control over a growing sphere of influence.[৯২]

সারণি ৫.১

পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫২–১৯৬২ কালপর্বে PIDC বিনিয়োগের বিবরণ

বিনিয়োগের খাত (কোটি টাকা)	টাকার পরিমাণ	উদ্যোগ সংখ্যা
পাট কল	২২.১২	১২
সুতীবস্ত্র	২.০০	১
কাগজ কল	২১.৫৯	২
রসায়ন সেমেন্ট ও প্রাকৃতিক	৫.৭৪	২
চিনি শোধনাগার	৮.৬৪	৩
সার কারখানা	২৪.৩৯	১
মোট	৮৫.২৮	২১

Source: EPIDC Planning Division (1969): EPIDC Progress report 1966-67, Dacca: EPIDC Public Relations Department.

তবে দুইটি কারণেই যে PIDC–কে যৌথ উদ্যোগ (Joint Venture) থেকে সরিয়ে এনেছিল তা খুবই স্পষ্ট; এক, বাঙালিরা ব্যবসায় থেকে পুঁজি প্রত্যাহার করে নতুন উদ্যোগে শিল্প সম্ভাব্য লোকসানের ঝুঁকি নেবে নিতে রাজী হয়নি, দুই; PIDC–এর বিপুল পরিমাণ পুঁজির সাথে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে গেলে PIDC–এর অধীনস্থ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল। ফলে PIDC এককভাবেই পূর্ব পাকিস্তানে শিল্পোদ্যোগ শুরু করে এবং ১৯৬২ সাল নাগাদ মোট ২১টি শিল্প ইউনিট প্রতিষ্ঠা করে। এ ২১ টি কারখানার মধ্যে ১২টি পাট ও পাটজাত পণ্য উৎপাদন কারখানা, ১টি তুলাজাত পণ্য উৎপাদন কারখানা, ২টি কাগজকল, ২টি রাসায়নিক সেমেন্ট ও প্রাকৃতিক কারখানা, ৩টি চিনি শোধন কারখানা এবং ১টি সার কারখানা। এ কারখানাগুলি প্রতিষ্ঠায় মোট ৮৫ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এর মধ্যে ১২টি পাটকলের পিছনে ব্যয় হয় ২২ কোটি ১২ লক্ষ টাকা, সার কারখানার পিছনে ব্যয় হয় ২৪ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা, কাগজকলের পিছনে ব্যয় হয় ২১ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা এবং বাকি শিল্পগুলিতে ব্যয় হয় ১৬ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা (সারণি ৫.১)। এভাবে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নত কলাকৌশল সম্বলিত ও পুঁজিঘন কারখানাগুলি বিকশিত হতে থাকে। এর পর ১৯৬২ সালে এসে পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন PIDC কে ভেঙে পূর্ব পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন EPIDC প্রতিষ্ঠা করে। এর উপরই ন্যস্ত করা হয় পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প উন্নয়নের দায়িত্ব।[৯৩] ১৯৬২ সাল থেকে শুরু করে ১৯৬৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত এ সংস্থাটি মোট ৩০টি শিল্পে ৯২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে। এ টাকার মধ্যে ২২টি পাটকলে বিনিয়োগ করা হয় মোট ৩৫ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা, একটি বৃহৎ ইস্পাত শিল্পে বিনিয়োগ করা হয় ৩৩ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা, ৬টি চিনি পরিশোধন শিল্পে বিনিয়োগ করা হয় ১২ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা এবং বাদবাকি ৯ টি শিল্পে বিনিয়োগ করা হয় মোট ১০ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা।[৯৪] এ শিল্পগুলির মধ্যে ছিল ২টি কাপড় কল, ২টি বড় ধরনের কাগজকল, ৩টি সারকারখানা এবং ২টি অন্যান্য কারখানা। এ সকল শিল্পে পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৯৬৭–৬৮ (জুলাই–জুন) অর্থবছরে EPIDC বিনিয়োগ করে মোট ২৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। ১৯৬৮ সালের জুন মাসে EPIDC আরো ৪৪টি নতুন প্রকল্প হাতে নেয়। এগুলির মধ্যে ১২টি রাসায়নিক সার কারখানা, ১০টি পাটকল, ৬টি রসায়ন সেমেন্ট ও প্রাকৃতিক প্রকল্প, ৩টি ধাতু খনিজ পদার্থজাত কারখানা, ৫টি চিনি পরিশোধন কারখানা, ২টি যন্ত্রপাতি জ্বালানি ও খনিজ শিল্প, ২ টি সরবরাহ ব্যবস্থা প্রকল্প, বাকি ২টি প্রকল্পের ১টি কাগজ কল ও ১টি ইস্পাত শিল্প। এ ৪৪টি শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ ধরা হয় ৩৭৮ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা। তার মধ্যে জ্বালানি ও খনিজ শিল্পের ২টি উদ্যোগের জন্যই ব্যয় ধরা হয় মোট খরচের শতকরা প্রায় ২৮ ভাগ, রাসায়নিক সার কারখানাগুলির জন্য ব্যয় ধরা হয় মোট খরচের শতকরা প্রায় ৩২ ভাগ। বাকি ৩০টি শিল্পের জন্য ব্যয় ধরা হয় মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের শতকরা ৪০ ভাগ।[৯৫] পুরানো প্রকল্পগুলোসহ এ সকল নতুন প্রকল্পে EPIDC ১৯৬৮–৬৯ অর্থবছরেই ব্যয় করে মোট ৪২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা।[৯৬] এভাবে EPIDC ব্যাপকভাবে পুঁজি বিনিয়োগ করার ফলে সদ্য বিকাশমান শিল্প পারিবারিক গোষ্ঠীর বাঙালিরা পর্যায়ে যেতে না পারলেও পূর্ব পাকিস্তানের সামাজিক কাঠামোতে নতুনতর সামাজিক শক্তি বিকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রায় শূন্য থেকে শুরু করে ১৯৫৯–৬০ অর্থবছরে এসে সরকারী অনুমোদন প্রাপ্ত প্রধান প্রধান কারখানার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫২৪টিতে (সারণি–৯)। এর পর থেকে শিল্পকারখানার সংখ্যা খুব দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে এবং ১৯৬৪–৬৫ অর্থবছরে এর সংখ্যা দাঁড়ায় মোট ৩৫৩৬টিতে। বৃদ্ধির এ গতি ১৯৬৫ সালে পাক–ভারত যুদ্ধের কারণে সাময়িক বাঁধাগ্রস্ত হলেও পরবর্তীকালে আবার বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৬৭–৬৮ অর্থবছরে তার সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫৮৭টিতে। অবশ্য এর পর থেকে হঠাৎ করেই কারখানা সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে এবং ১৯৬৯–৭০ সালে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৩১২৪ টিতে।

সারণি ৫.৯ থেকে দেখা যায়, পাকিস্তান আমলে অন্ততঃ সংখ্যার দিক দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প বিকাশের শীর্ষকাল ছিল ১৯৬৪–৬৫ থেকে ১৯৬৭–৬৮–এই চার বছর। ১৯৬৭–৬৮ সালে মোট ৩৫৮৭টি শিল্পের মধ্যে শতকরা ১৩টি শিল্প ছিল খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, শতকরা ৩৫ ভাগ শিল্প ছিল পাট ও বস্ত্র শিল্প, প্রকাশনা শিল্পের সংখ্যা ছিল মোট শিল্পসংখ্যার শতকরা ৪ ভাগ, প্রসাধনসামগ্রী শিল্প ছিল মোট শিল্প সংখ্যার শতকরা ১৮ ভাগ, যৌগ ধাতুনির্ভর শিল্প ছিল মোট শিল্প সংখ্যার শতকরা ৮ ভাগ এবং পানীয়, তামাক, আসবাবপত্র, রাবার, কাগজ, ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিসহ অন্যান্য শিল্প ছিল মোট শিল্প সংখ্যার শতকরা ১১ ভাগ। ৫.৯ নং সারণির এ চিত্র থেকে এটা খুবই পরিস্কার হয়ে উঠে যে, পূর্ব পাকিস্তানে পাট ও বস্ত্র শিল্পেই সেদিন শিল্প সম্পদের প্রধান অংশ ছিল। মাত্র ৬টি সূতা ও বস্ত্র শিল্প নিয়ে যে পূর্ব পাকিস্তানের যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৪৭ সালে, ২০ বছরে তার সংখ্যা ২০০ শত ছাড়িয়ে যায়।

---

[৯২]. Ibid, pp. 9.8-9.9.
[৯৩]. Ibid, p. 9.10.
[৯৪]. Ibid, pp. 9.10-9.11, Table 9.2.
[৯৫]. Ibid, P. 9.15, Table 9.4.
[৯৬]. Ibid, P. 9.14.

Dhaka University Institutional Repository

অথচ ১৯৬৮ সালের জুন মাসে নতুন ৪৪টি প্রকল্পে বিপুল পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ করা সত্ত্বেও শিল্প বিকাশের সেই ধারাঅব্যাহত থাকতে পারেনি।

সারণিঃ ৫.৯
সরকারী অনুমোদন প্রাপ্ত পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান প্রধান শিল্পকারখানার সংখ্যা

শিল্প কারখানার ধরন	১৯৫৯-৬০	১৯৬০-৬১	১৯৬১-৬২	১৯৬২-৬৩	১৯৬৩-৬৪	১৯৬৪-৬৫	১৯৬৫-৬৬	১৯৬৬-৬৭	১৯৬৭-৬৮	১৯৬৮-৬৯	১৯৬৯-৭০
খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প	-	-	-	৩৯৬	৩৮৫	৪২৩	৪০৮	৪১৬	৪৩০	৪০৬	৪০৮
পাট ও বস্ত্র শিল্প	-	-	-	১০০৯	১০৯৩	১২০১	১১৭০	১২০৩	১২৩২	৯৯৮	৯৯৮
প্রকাশনা শিল্প	-	-	-	১০৮	১১৪	১৩৯	১৪০	১৪৮	১৪৭	১৪৩	১৪১
চামড়া শিল্প	-	-	-	৯৯	১১৬	১৬৭	১৪৮	১৫১	১৪৯	১৪৯	১৪৯
রসায়নজাত শিল্প	-	-	-	৩৪৫	৩৮১	৬০৭	৫৭২	৬১৮	৬৪২	৫৭৬	৫৭২
মৌল ধাতু নির্ভর শিল্প	-	-	-	৩২৯	২৯১	৩১০	২৮৭	২৯৮	২৯৭	২৯৩	২৯২
অন্যান্য শিল্প *	-	-	-	৩৯৮	৪৬৩	৬৯১	৬৩৭	৬৫৫	৬৮৫	৫৬৫	৫৬৪
মোট	১৫২৪	১৫৯৬	২৪৪৫	২৬৮৪	২৮৪৩	৩৫৩৮	৩৩৩২	৩৪৮৯	৩৫৮২	৩১৩০	৩১২৪

সূত্রঃ Statistical Digest of Bangladesh, No. 8: 1972, Dacca: BBS. Table No. 5.1.pp: 70-71. No. 5: 1968, Table 6.1. p. 98 and No. 2, 1964. Table 4.1, P:96.
*অন্যান্য শিল্প বলতে পানীয়, তামাক, আসবাবপত্র, রাবার, কয়লা, ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে।

সারণিঃ ৫.১০
পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত ভারি শিল্পসমূহে ষাট দশকে উৎপাদনের পরিমাণ

পণ্যের নাম	মাপের একক	১৯৬০-৬১	১৯৬১-৬২	১৯৬২-৬৩	১৯৬৩-৬৪	১৯৬৪-৬৫	১৯৬৫-৬৬	১৯৬৬-৬৭	১৯৬৭-৬৮	১৯৬৮-৬৯
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১. পাটজাত পণ্য	(হাজার টন)	২৫৭	২৬৮	২৯৮	৩৩১	২৮৯	৪০৯	৪০৪	৫১৩	৫১৮
২. তুলা I) সুতা	(বিলিয়ন পাউন্ড)	৪৮	৫৪	৫৪	৬৪	৬৪	৭৩	৭৪	৭৭	৯৬
II) বস্ত্র	(বিলিয়ন পাউন্ড)	৬৯	৬৭	৫৫	৪৮	৪৯	৪০	৫৫	৫২	৬১
৩. চিনি	(হাজার টন)	৫৬	৬৮	৭৫	৮৮	৭৭	৮৫	১১৩	১১০	৫৭
৪. কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট	(হাজার টন)	৬০	৬৭	৬৪	৬২	৭৯	৭৬	৭১	৭৮	৮৩
৫. ম্যাচ	(হাজার গ্রোস)	৯,১৭১	৯,৬২২	১০,০১৩	১১,৫৪৮	১০,৬৯৬	১২,১৮১	১০,৩৭২	১১,০৬৪	১৩,১৯১
৬. সিমেন্ট	(হাজার টন)	৮৬	৭০	৯৪	৬৫	৫৬	৪৩	৭৫	৮২	৬৩
৭. সিগারেট	(মিলিয়ন)	১,৪৫০	২,৭৬০	৩,৭২৯	৪,৮৮৫	৫,৫৩৭	৯,৫৭৬	১৩,১৩৪	১৪,৯০৫	১৭,৮১১
৮. সার (ইউরিয়া)	(হাজার টন)	-	১৭	৭২	১০৬	৭২	৯১	৯৩	১১২	৮৭

Source: Planning Department Government of Pakistan (1970): Economic Survey of East Pakistan 1969-70. Dacca: East Pakistan Govt: Press. Table -3, p-105.

শুধুমাত্র সংখ্যার দিক থেকেই শিল্পকারখানার সংখ্যা বেড়েছে তা নয়, উৎপাদনের পরিমাণও এ সময়কালে বিপুল পরিমাণে বেড়ে গেছে। সারণি ৫.১০ থেকে দেখা যায়, যে পাটজাত শিল্প পঞ্চাশের দশকের গোড়াতে একবারে শূন্য থেকে তার বিকাশ শুরু করেছিল, মাত্র ১০ বছরের মাথায় শুধুমাত্র ভারী শিল্পসমূহেই তার উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ২ লক্ষ ৫৭ হাজার টনে। এখানেই এর অগ্রগতি থেমে থাকেনি, পরবর্তী বছরগুলিতেও পাট শিল্প দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে এবং ১৯৬৮-৬৯ অর্থবছরে এ শিল্পে উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৫ লক্ষ ১৮ হাজার টনে। প্রায় শূন্যের কোঠা থেকে শুরু করে ভারী শিল্পসমূহে ১৯৬০-৬১ অর্থবছরে সূতা উৎপাদন হয় ৪ কোটি ৮০ লক্ষ পাউন্ড, কাপড় উৎপাদিত হয় ৬ কোটি ৯০ লক্ষ গজ, চিনি উৎপাদন হয় ৫৬ হাজার টন, কাগজ (নিউজপ্রিন্টসহ) উৎপাদন হয় ৬০ হাজার টন, ম্যাচ উৎপাদন হয় ৯১ লক্ষ ৭১ হাজার গ্রোস, সিমেন্ট উৎপাদন হয় ৮৬ হাজার টন এবং সিগারেট উৎপাদন হয় ১৪৫ কোটিটি। পাটজাত পণ্যের মতই সিগারেট উৎপাদনও ১৯৬০-৬১ অর্থবছরের পর দ্রুত হারে বাড়তে থাকে, ১৯৬৮-৬৯ অর্থবছরে সিগারেট উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭৮১ কোটি ১০ লক্ষটিতে।

সারণি ঃ ৫.১১
১৯৪৯/৫০ থেকে ১৯৬৮/৬৯ কালপর্বে পূর্ব বাংলার শিল্পপণ্য উৎপাদনের খতিয়ান
(১৯৫৯ সালের মূল্যকে স্থায়ী মূল্য হিসাবে ধরে)

পণ্যের নাম	১৯৪৯/৫০-১৯৫৩/৫৪	১৯৫৪/৫৫-১৯৫৮/৫৯	১৯৫৯/৬০-১৯৬৩/৬৪	১৯৬৩/৬৪-১৯৬৮/৬৯	১৯৪৯/৫০-১৯৮৮/৬৯
ভারী শিল্প (কোটি টাকা)	৫৪.৩	১৪১.২৯	৩০৬.১০	৩৯০.৮০	৮৯৩.২৪
শতকরা হার	২৬.৬৭	৪১.৫১	৫৪.২৯	৫১.৮৯	৪৮.১৪
বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার	২৬.৯৬	৩২.০৪	২৩.৪৪	৫.৪৭	৩০.৯৯
ক্ষুদ্র শিল্প (কোটি টাকা)	১৪৯.৩০	১৯১.০১	২৫৮.৪০	৩৬৩.৫০	৯৬২.২৬
শতকরা হার	৭৩.৩৩	৫৭.৪৮	৪৫.৭১	৪৮.১৯	৫১.৮৬
বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার	৪.৩৭	৫.৫৯	৭.০৬	৮.১৩	৭.১৭
শিল্প পণ্যের মোট মূল্য (কোটি টাকা)	২০৩.৬০	৩৩২.৩০	৫৬৫.৩০	৭৫৪.৩০	১৮৫৫.৫০
শতকরা হার	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার	৮.৯৭	১২.৬৪	১৪.০২	৬.৬৯	১৩.৫২

সূত্রঃ Alamgir & Berlage (1974): Bangladesh: National Income and Expenditure 1949/50-1969/70, Dacca: BIDS, pp. 167-170, Table-4.

১৯৬০-৬১ অর্থবছরের পরবর্তী কয়েক বছরে শিল্প উৎপাদন সামগ্রিকভাবে বেড়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু সব শিল্পের বৃদ্ধির হার সমান নয়। এমন কি, কোন কোন শিল্পে উৎপাদনের পরিমাণ পরবর্তীকালে হ্রাস পেয়েছে। যেমন, মিলে তৈরি সূতার উৎপাদন ১৯৬০-৬১ অর্থবছরের তুলনায় শতকরা ১০০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬৮-৬৯ সালে ৯ কোটি ৬০ লক্ষ পাউন্ডে গিয়ে উপনীত হয়েছে কিন্তু মিলে তৈরি কাপড়ের উৎপাদন ঐ সময়ে মোটেই বাড়েনি, বরং দ্রুত হ্রাস পেয়ে ১৯৬৪-৬৫ অর্থবছরে ৪ কোটি গজে গিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

দাঁড়িয়েছে, পরবর্তী ৩ বছরে আবার কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ৬ কোটি ১০ লক্ষ গজে গিয়ে উপনীত হয়েছে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ অস্থিরতা শুধু বস্ত্র শিল্পেই পরিলক্ষিত হয়নি; চিনি, সিমেন্ট, রাসায়নিক সার এমনকি কাগজ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ভারী শিল্পসমূহে উৎপাদন ক্ষেত্রে এই অস্থিরতার বহুবিধ কারণ থাকতে পারে। তবে এখানে আলোচনার জন্য প্রাথমিক কারণটি হচ্ছেঃ হালকা ও ভারী শিল্পের মধ্যে প্রতিযোগিতা শিল্প-উৎপাদন ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। সারণি ৫.১১ থেকে দেখা যায় ১৯৪৯-৫০ থেকে ১৯৬৮-৬৯ এই ২০ বছরে পূর্ব পাকিস্তানে সামগ্রিকভাবে শিল্পের বার্ষিক অগ্রগতির হার ছিল শতকরা ১৩.৫২ ভাগ। কিন্তু এ হার কখনও বেড়েছে আবার কখনও কমেছে।

১৯৪৯-৫০ থেকে ১৯৫৩-৫৪ অর্থবছরে শিল্পের সামগ্রিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল বার্ষিক শতকরা ৮.৯৭ ভাগ। পরবর্তী ৫ বছরে তথা ১৯৫৪-৫৫ থেকে ১৯৫৮-৫৯ কালপর্বে এ বৃদ্ধির বার্ষিক হার শতকরা ১২.৬৪ ভাগে গিয়ে উপনীত হয়। তার পরবর্তী ৫ বছরে এ বৃদ্ধির হার আরো বেড়ে গিয়ে বার্ষিক শতকরা ১৪.০২ ভাগে গিয়ে উপনীত হয়। কিন্তু বৃদ্ধির এ ধারা আর পরবর্তীকালে অব্যাহত থাকে না। ১৯৬৩-৬৪ থেকে ১৯৬৮-৬৯ এ পাঁচ বছরে শিল্প পণ্য উৎপাদনের অগ্রগতির হার হ্রাস পেয়ে বার্ষিক শতকরা ৬.৬৯ ভাগে নেমে যায়। পণ্য উৎপাদনের বৃদ্ধির হার ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে তা হঠাৎ করে হ্রাস পায় শেষ পাঁচ বছরে। অগ্রগতির হারে হঠাৎ এ হ্রাসপ্রাপ্তির প্রবণতা দেখা গেছে ভারী শিল্পসমূহে প্রকটভাবে। প্রথম পাঁচ বছরে ভারী শিল্পের বার্ষিক অগ্রগতির হার ছিল শতকরা ২৬.৯৬ ভাগ, দ্বিতীয় পাঁচ বছরে এ অগ্রগতির হার আরো বেড়ে গিয়ে বার্ষিক শতকরা ৩২.০৪ ভাগে গিয়ে উপনীত হয়। তৃতীয় পাঁচ বছর থেকে অগ্রগতির হারে ভাটা পড়তে শুরু করে, বার্ষিক অগ্রগতির হার শতকরা ৩২.০৪ ভাগ থেকে নেমে গিয়ে বার্ষিক শতকরা ২৩.৪৪ ভাগে গিয়ে দাঁড়ায়। চতুর্থ পাঁচ বছর তথা ১৯৬৪-৬৫ থেকে ১৯৬৮-৬৯ সালে অগ্রগতির এ হার ভীষণভাবে হ্রাস পেয়ে বার্ষিক শতকরা ৫.৪৭ ভাগে এসে দাঁড়ায়। PIDC ও EPIDC-এর বিপুল পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে ভারী শিল্পের দ্রুত বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে কিছুটা আঁচ করা যায়। বিভিন্ন উৎস থেকে পুঁজি সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে। তবে এখানে অন্ততঃ এটুকু বলা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানের ভারী শিল্পের বিকাশ কোন সরল ও অব্যাহত ধারা মেনে চলেনি। ভারী শিল্পের উত্থান ঘটেছে প্রচন্ড গতিতে। কিন্তু ষাট দশকের শেষে এসে সে গতি প্রায় থেমে গেছে। কিন্তু এখানকার ক্ষুদ্র ও হালকা শিল্পের ক্ষেত্রে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। শুরুতে ক্ষুদ্র শিল্পের অগ্রগতির হার ছিল বেশ নিচু পর্যায়ে, বার্ষিক বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৪.৩৭ ভাগ। নিচের থেকে শুরু করলেও এক্ষেত্রে অগ্রগতির হারে কখনও ভাটা পড়েনি, ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয় পাঁচ বছরে ক্ষুদ্র শিল্পের অগ্রগতির বার্ষিক হার ছিল শতকরা ৫.৫৯ ভাগ। তৃতীয় পাঁচ বছরে বার্ষিক অগ্রগতির হার ছিল শতকরা ৭.০৬ ভাগ এবং চতুর্থ পাঁচ বছরে ক্ষুদ্র শিল্পের বার্ষিক অগ্রগতির হার এসে উপনীত হয় শতকরা ৮.১ ভাগে। সারণি৫.১১ তে আরো দেখা যায়, প্রথম পাঁচ বছরে মোট শিল্প পণ্যের শতকরা ৭৩.৩৩ ভাগ উৎপাদিত হয় ছোট শিল্পে, দ্বিতীয় পাঁচ বছরেও ছোট শিল্প মোট উৎপাদনের দিক থেকে তার প্রাধান্যকে অক্ষুণ্ণ রাখে। কিন্তু তৃতীয় পাঁচ বছরে এসে দেখা যায়, ভারী শিল্প তাকে ব্যাপকভাবে অতিক্রম করে গেছে। তৃতীয় পাঁচ বছরে মোট বিক্রীত শিল্পসামগ্রীর শতকরা ৫৪.১৯ ভাগই আসে ভারী শিল্প থেকে। এভাবে প্রচন্ড গতি নিয়ে এগিয়ে এসেও পরবর্তী পাঁচ বছরে তার অবস্থানকে ধরে রাখতে পারেনি, মোট উৎপাদনের পরিমাণ ক্ষুদ্র শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের কাছাকাছি চলে আসে। পণ্যের বাজারে গিয়ে যে ক্রমবর্ধমান হারে ভারী শিল্প তার আধিপত্য বিস্তার করে চলেছিল, ক্ষুদ্র শিল্প তার সরল বিকাশ সত্ত্বেও তা প্রতিহত করতে পারেনি। ১৯৫৯/৬০ সালে এসে ক্ষুদ্র শিল্প ভারী শিল্পের কাছে মার খায়। কিন্তু দুইটি উৎপাদন ধারা প্রত্যক্ষ প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে চলেছে। এমনই একটি পর্যায়ে তথা ১৯৬৩/৬৪ সাল থেকে প্রতিযোগিতার মোড় ঘুরে যায়, হালকা শিল্প ভারী শিল্পের সাথে বাজারে হেরে যেতে রাজি নয়। এ পর্যায়ে তারা বরং ভারী শিল্পের আধিপত্যকে খর্ব করে চলেছে। আগের পাঁচ বছরের তুলনায় এ কালপর্বে হালকা শিল্প বিক্রি করেছে ১০৫ কোটি ১০ লক্ষ টাকা মূল্যের বেশি পণ্য, আর অন্যদিকে ভারী শিল্প বিক্রি করেছে আগের পাঁচ বছরের চেয়ে মাত্র ৮৩ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা মূল্যের বেশি পণ্য। বিষয়টির সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্ব খুবই প্রণিধানযোগ্য। আধুনিক শিল্পের মধ্যেকার ভারী শিল্প, যা রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠে এক পর্যায়ে ব্যক্তিতান্ত্রিক একচেটিয়া পুঁজিতে পরিণত হয়েছিল,সেই একচেটিয়া পুঁজি তার অগ্রগতির অব্যাহত ধারাকে টিকিয়ে রাখতে পারেনি। কিভাবে এসব একচেটিয়া পুঁজিতে পরিণত হয়েছিল তা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হবে। তবে এ পর্যায়ে অন্ততঃ এটুকু বলা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানের ভারী শিল্পসমূহ ষাট দশকের মাঝামাঝিতে এসে প্রচন্ডভাবে সংকটের সমুখীন হয়। অন্যদিকে ক্ষুদ্র শিল্প ধীরে হলেও তার অগ্রগতির বিকাশমান হারকে বলবৎ রাখে এবং ষাট দশকের মাঝামাঝি বা শেষে এসে বৃহৎ শিল্পের অগ্রগতির হারকে ছাড়িয়ে সে অনেক দূর এগিয়ে যায়। ক্ষুদে শিল্পের এই অব্যাহত ও সরল প্রবৃদ্ধি এমন একটি শ্রেণীর বিকাশকে নির্দেশ করে যা অব্যাহত বিকাশের মধ্য দিয়ে স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে চায়। গতির দিক থেকে ষাট দশকের মাঝামাঝিতে এসে ভারী শিল্পের মালিকরা সংকটে নিপতিত, আর ক্ষুদ্র শিল্পের মালিকরা আত্মপ্রতিষ্ঠার আপ্রাণ প্রচেষ্টায় নিয়োজিত। বাজার নিয়ে এই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রতিফলন সমাজ ও রাজনীতিতে না পড়ে পারে না। বড় পুঁজি ও ছোট পুঁজির মধ্যেকার এ তীব্র দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক মেরুকরণ ও কর্মসূচী প্রণয়নের ওপর কি ধরনের প্রভাব রেখেছে তা চিহ্নিত করতে পারলেই এ দ্বন্দ্বের সমাজতত্ত্বকে চিহ্নিত করা যাবে। যাহোক, সারণি ৫.১১ থেকে অন্ততঃ এটুকু পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, ষাট দশকের শেষে এসে পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পপতি সমাজ আর মোটেই অখন্ড শ্রেণী ছিল না। অখন্ড স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হবার ভিত্তি ছিল কিনা তা শনাক্ত করা না গেলেও অন্ততঃ এটা স্পষ্টভাবেই বলা যায় যে, বড় শিল্পপতিদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করার মত বৈষয়িক ভিত্তি ক্ষুদে শিল্পপতিদের ইতোমধ্যেই তৈরী হয়ে গিয়েছিল।

পূর্বেকার আলোচনাতে দেখা গেছে, ১৯৬৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানের ৪৪টি বৃহৎ শিল্পে EPIDC বিপুল পরিমাণ মূলধন লগ্নি করে। সে সময় সরকারী প্রত্যক্ষ সহায়তায় বড় শিল্পগুলি খুব দ্রুত বিকশিত হতে হতে ষাট দশকের শেষে এসে হঠাৎ তার বিকাশের গতি প্রায় থেমে যেতে থাকে। অন্যদিকে ক্ষুদ্র শিল্পসমূহের বিকাশ ধারাবাহিকতাবে উচ্চতর পর্যায়ের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, সেরকম পর্যায়ে ক্ষুদ্র শিল্পকে সাহায্য না করে বৃহৎ শিল্পখাতকে বিপুল পরিমাণে সহায়তা করে। কিন্তু তাতেও দেখা যায়, ততদিনে ক্ষুদ্র শিল্পগুলি এতটা পরিমাণে শক্তি অর্জন করেছে যে, সরকারের সহায়তা ছাড়াই সে সর্বাধিক হারে মুনাফা অর্জন করে চলেছে। ১৯৬৯-৭০ অর্থবছরে শিল্প-কারখানার ওপর পরিচালিত শুমার থেকে দেখা যায় যে, সে সময় পূর্ব পাকিস্তানে মোট সরকারী নিবন্ধনকৃত কারখানার সংখ্যা ছিল ৩০৪০টি, এর মধ্যে যে কারখানাগুলিতে কর্মরত ন্যূনতম সংখ্যক শ্রমিক ছিল এরকম ১৫৮০টি কারখানার উৎপাদন, বিক্রয়, স্থায়ী সম্পদ, শিল্প ব্যয় (Industrial cost) মজুরী, মুনাফা ইত্যাদির ওপর গৃহীত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র কারখানাগুলির মুনাফার হারই সর্বাধিক। এ সমস্ত তথ্যকে বিন্যাস করে সারণি ৫.১২ তৈরি করা হয়েছে। এ সারণিতে বিষয়টি সম্পর্কে একটি স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণিঃ ৫.১২

১৯৬৯-৭০ সালে প্রধান প্রধান শিল্পে স্থায়ী ও চলতি মূলধনের পরিমাণ, উৎপাদনের পরিমাণ ও মুনাফার হার

(মূল্য হাজার টাকায়)

শিল্পের ধরন (১)	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা (% (২)	মোট স্থায়ী সম্পদ (% (৩)	বছর শেষে মজুদের পরিমাণ (%(৪)	মোট মূলধন (৩+৪) (% (৫)	মোট শিল্প ব্যয় (Industrial Cost) (%(৬)	মোট কর্মচারী বেতন (% (৭)
ক্ষুদ্র শিল্প*	৯৭৩	৩২৯৬৮৮	২১৩৬২৮	৫৪৩৩১৬	৩৩০২৩৮	২২০৭২
	(৬১.৫৮)	(১৪.৮৩)	(২১.৬৭)	(১৬.৯৩)	(১৭.১৩)	(১৯.৩৭)
মাঝারি শিল্প**	৪৯০	৬৫২৯৭০	২৯০৫৩৮	৯৪৩৫০৮	৭১৬৪৬৮	৪৪০১০
	(৩১.০১)	(২৯.৩৬)	(২৯.৪৮)	(২৯.৩০)	(৩৭.১৭)	(৩৮.৬২)
বড় শিল্প***	১১৭	১২৪১০৫১	৪৮১৫৬৯	১৭২২৬২১	৮৮০৭৫৫	৪৭৮৬১
	(৭.৪১)	(৫৫.৮১)	(৪৮.৮৫)	(৫৩.৬৭)	(৪৫.৭০)	(৪২.০১)
মোট****	১৫৮০	২২২৩৭১০	৯৮৫৭৩৫	৩২০৯৪৪৫	১৯২৭৪৬১	১১৩৯৪৩
	(১০০)	(১০০)	(১০০)	(১০০)	(১০০)	(১০০)

(সারণি ১২ ক্রমশ)ঃ-

শিল্পের ধরন	মোট মজুরীর পিছনে ব্যয় (% (৮)	মোট মজুরীও বেতন (% (৯)	মোট উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় মূল্য) (% (১০)	মোট মুনাফা (% (১০-৬-৯) (১১)	মুনাফার হার (মোট মূলধনের নিরিখে) (ক্ষয় ৫%সহ) ১১/৫ X ১০০	মুনাফার হার (বিক্রয় মূল্যের নিরিখে) (ক্ষয় ৫%সহ) ১১/১০ x ১০০
ক্ষুদ্র শিল্প*	৪৪৪৫৬	৬৬৫২৮	৭১০১০০	৩১৩৩৩৪	৫৭.৬৭	৪৪.১৩
	(১৩.৫২)	(১৫.০৩)	(১৯.৩৬)	(২৪.১৪)	`(৫২.৭৯)	(৪১.৬৮)
মাঝারি শিল্প**	৪৮৭০৬	৯২৭১৬	১০৫৯৭১৬	২৫০৫৩২	২৬.৫৫	২৩.৬৪
	(১৪.৮২)	(২০.৯৪)	(২৮.৮৯)	(১৯.৩০)	(২২.১১)	(২০.৪০)
বড় শিল্প***	২৩৫৬০১	২৮৩৪৬২	১৮৯৮৫২৮	৭৩৪৩১১	৪২.৬৩	৩৮.৬৮
	(৭১.৬৬)	(৬৪.০৩)	(৫১.৭৫)	(৫৬.৫৬)	(৩৭.৪২)	(৩৫.২৪)
মোট****	৩২৮৭৬৩	৪৪২৭০৬	৩৬৬৮৩৪৪	১২৯৮১৭৭	৪০.৪৫	৩৫.৩৯
	(১০০)	(১০০)	(১০০)	(১০০)	৩৫.৫১)	(৩২.২০)

* ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে রয়েছেঃ পানীয়, পাট ও তুলাজাত তাঁত ছাড়া অন্যান্য তাঁত, কাগজ জাত পণ্য, মুদ্রণ ও প্রকাশনা, চামড়া, রাবার, পেট্রোলিয়াম পদার্থ, অধাতুজ খনিজ পদার্থ, ধাতব পদার্থ খুচরা যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, পরিবহন যন্ত্রাংশ, ফুটওয়ার পণ্য, কাঠজাত পণ্য ও ফার্নিচার।

** মাঝারি শিল্পের মধ্যে রয়েছেঃ খাদ্য প্রক্রিয়াজতকরণ শিল্প-রাসায়নিক সামগ্রী ও বিবিধ

*** বড় শিল্পের মধ্যে রয়েছেঃ তামাক, পাট ও তুলাজাত তাঁত, কাগজ ও মৌল ধাতু শিল্প।

**** মোট ৩০৪০টি শিল্প-কারখানার মধ্যে এখানে শুধু সেই কারখানাগুলিকে নেওয়া হয়েছে যাদের সর্বনিম্ন শ্রমিক সংখ্যা ১০ জন।

Source: Government of the People's Republic of Bangladesh (1978): Census of Manufacturing Industries of Bangladesh: 1969-70 Dacca: Bangladesh Government Press. Compiled from Table 1, pp. 1-7.

সারণি ৫.১২ থেকে দেখা যায়, ৩০৪০টি নিবন্ধনকৃত কারখানার মধ্যে ক্ষুদ্রতর (যাদের শ্রমিক সংখ্যা ১০ জনের চেয়েও কম) ১৪৬০টি কারখানাকে বাদ দিলেও যে ১৫৮০টি কারখানা পাওয়া যায়- তার মধ্যে শতকরা ৬১.৫৮টি কারখানা ক্ষুদ্র, শতকরা ৩১.০১টি কারখানা মাঝারি এবং শতকরা মাত্র ৭.৪১টি কারখানা ছিল বৃহৎ।[৯৬] সংখ্যার দিক থেকে বৃহৎ কারখানাগুলি ক্ষুদ্র হলেও, তাদের অধীনেই ছিল সে সময়ের শিল্প খাতের মোট স্থায়ী সম্পদের শতকরা ৫৫.৮১ ভাগ। অন্যদিকে বিপুল সংখ্যক ক্ষুদ্র শিল্পের অধীনে স্থায়ী সম্পদের পরিমাণ ছিল শতকরা ১৪.৮৩ ভাগ। বছর শেষে মজুদের পরিমাণকে যদি চলতি মূলধন হিসাবে বিবেচনা করা যায় তাহলে দেখা যায় চলতি মূলধন তুলনামূলকভাবে ভারী শিল্পের চেয়ে হালকা শিল্পের অধীনেই বেশি। ছোট, মাঝারি ও বড় কারখানাগুলির অধীনস্থ চলতি মূলধনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে শতকরা ২১.৬৭ ভাগ, ২৯.৪৮ ভাগ এবং ৪৮.৮৫ ভাগ।

উক্ত তিন ধরনের কারখানাসমূহের মধ্যে আকারের দিক থেকে কি বিপুল রকমের পার্থক্য ছিল তা স্থায়ী সম্পদের গড়ের দিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে। ক্ষুদ্র শিল্পগুলির গড় স্থায়ী সম্পদের পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ৩৮ হাজার ৮৩৭ টাকা, মাঝারি শিল্পগুলির গড় স্থায়ী সম্পদের পরিমাণ ছিল ১৩ লক্ষ ৩২ হাজার ৫৯২ টাকা এবং বৃহৎ শিল্পগুলির গড় স্থায়ী সম্পদের পরিমাণ ছিল ১০ কোটি ৬০ লক্ষ ৭ হাজার ২৮২ টাকা। অর্থাৎ ১টি বৃহৎ শিল্প একাই প্রায় ৮টি মাঝারি শিল্পের এবং প্রায় ৩২টি ক্ষুদ্র শেল্পের স্থায়ী সম্পদের সমপরিমাণ মালিক ছিল। চলতি এবং স্থায়ী উভয় মূলধনকে একত্রিত করলেও দেখা যায়, শতকরা ৫৩.৬৭ ভাগ মূলধন বৃহৎ কারখানাগুলোর মালিকানায়, শতকরা ২৯.৩০ ভাগ মূলধন মাঝারি কারখানগুলোর অধীন এবং ক্ষুদ্র শিল্পসমূহের অধীনে রয়েছে মাত্র শতকরা ১৬.৯৩ ভাগ মূলধন। তিন ধরনের শিল্পের মধ্যে তুলনামূলকভাবে মাঝারি শিল্পের শিল্প-ব্যয় (Industrial cost) সবচেয়ে বেশি। স্থায়ী সম্পদের শতকরা ২৯.৩৬ ভাগের মালিক হলেও মাঝারি শিল্পের শিল্প-ব্যয় শতকরা ৩৭.১৭ ভাগ। ক্ষুদ্র ও বড় শিল্পের শিল্প ব্যয় যথাক্রমে শতকরা ১৭.১৩ ভাগ ও ৪৫.৭০ ভাগ। উল্লেখ্য যে, শিল্প-ব্যয়ের মধ্যে কাঁচা মাল, পরিবহন, জ্বালানি, বিদ্যুৎ ইত্যাদিকে নেওয়া হলেও স্থায়ী মূলধনের ক্ষয় (depriciation)কে ধরা হয়নি। ধরা হলে স্বাভাবিকভাবেই বড় শিল্পসমূহে শিল্প ব্যয় অনেক বেড়ে যেত। তবে স্থায়ী মূলধনের ক্ষয়কে স্থায়ী মূলধন থেকে বাদ দেয়া হয়েছে এবং নতুন যন্ত্রপাতির মূল্যকে যোগ করা হয়েছে। এভাবে স্থায়ী মূলধন থেকে ক্ষয় (depriciation) কে বাদ দেয়ার ফলে এ মুনাফার প্রকৃত হার অপেক্ষা বেশি প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯৬৯-৭০-এর উক্ত সেন্সাসকে যাঁরা ব্যাখ্যা করেছিলেন তাঁদের এই স্পষ্ট ত্রুটির কারণে শিল্প ক্ষেত্রে মুনাফার হারে বেশ ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে গেছে এবং এর ফলে বড় শিল্প অর্থাৎ যেগুলির স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ বেশি সেগুলির মুনাফার হারে অনেক বেশি প্রতিক্রিয়া পড়েছে। Depreciation এর অংশটি শিল্প-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত, কিন্তু তা না হয়ে স্থায়ী মূলধন থেকে বাদ দেওয়ার কারণে যেমন একদিকে উৎপাদন-ব্যয় কম দেখা

[৯৬]. এখানে ক্ষুদ্র শিল্প বলতে সে সকল শিল্পকে বোঝানো হয়েছে যেগুলির অধীনস্থ স্থায়ী সম্পদের মূল্য ১০ লক্ষ টাকার নিচে। মাঝারি শিল্প কারখানাসমূহের স্থায়ী সম্পদের মূল্য ১০ লক্ষ টাকা থেকে ২০ লক্ষ টাকার মধ্যে। বৃহৎ কারখানা বলতে সেই সকল কারখানাকে বোঝানো হয়েছে যেগুলির অধীনস্থ স্থায়ী সম্পদের মূল্য ২০ লক্ষ টাকার অধিক।

Dhaka University Institutional Repository

যাচ্ছে, অন্যদিকে বিনিয়োজিত পুঁজির পরিমাণ কম দেখা যাচ্ছে। ফলে মুনাফার পরিমাণও বেশি দেখা যাচ্ছে। আর তাই যার স্থায়ী পুঁজি যত বেশি তার ক্ষেত্রে তত বেশি হারে প্রকৃত মুনাফা অপেক্ষা বেশি মুনাফা দেখা যাবে। তথ্যের এরূপ ত্রুটি সত্ত্বেও সারণি ৫.১২ থেকে দেখা যাচ্ছে ক্ষুদ্র শিল্পগুলিতে মুনাফার হার সর্বাধিক। মোট পুঁজি বিনিয়োগের বিবেচনায় ক্ষুদ্র শিল্পসমূহে মুনাফার হার বার্ষিক শতকরা ৫৭.৬৭ ভাগ। মাঝারি শিল্পে শতকরা ২৬.৫৫ ভাগ এবং বৃহৎ শিল্পে শতকরা ৪০.৪৫ ভাগ।উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়মূল্যের নিরিখে বিচার করলে মুনাফার হার কিছুটা কমে আসে, তবে এক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্পে মুনাফার হার সবচেয়ে বেশী হ্রাস পায়। সারণী ৫.১২ থেকে দেখা যায় উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়মূল্যের নিরিখে বিবেচনা করলে ক্ষুদ্র শিল্পে মুনাফার হার শতকরা ৪৪.১৩ ভাগ, মাঝারি শিল্পে শতকরা ২৩.৬৪ ভাগ এবং বড় শিল্পে শতকরা ৩৫.৩৯ ভাগ।

স্থায়ী মূল ধনের ক্ষয় (depreciation) যদি তার শতকরা ৫ ভাগও ধরা যায় তাহলেও দেখা যায়, মুনাফার হারে তেমন কোন পরিবর্তন আসে না। স্থায়ী মূলধনের শতকরা ৫ ভাগ depreciation ধরলে স্থায়ী মূল্যের সাথে তার শতকরা ৫.২৫ ভাগ অর্থযোগ করে এবং মোট মুনাফা থেকে সে অর্থ বিয়োগ করে মুনাফার হার বের করলে দেখা যায়, ক্ষুদ্র কারখানাগুলিতে মূলধনের নিরিখে মুনাফার হার দাঁড়ায় শতকরা ৫২.৭৯ ভাগ, মাঝারি শিল্পে শতকরা ২২.১১ ভাগ এবং বড় শিল্পে শতকরা ৩৫.৫১ ভাগ। অর্থাৎ এখান থেকেও দেখা যায় ১৯৬৯-৭০ অর্থবছরেও ক্ষুদ্র শিল্পে প্রতি ১ টাকা বিনিয়োগ করলে এক বছরে টাকার নিজের মূল্যকে অক্ষুণ্ন রেখেও অতিরিক্ত ৫৩ পয়সা মুনাফা তৈরি করতে পারতো, যা মাঝারি শিল্পে পারতো ২২ পয়সা এবং বড় শিল্পে পারতো ৩৬ পয়সা।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা খুবই স্পষ্ট যে, ষাট দশকের শেষ সময়ে এসে মাঝারি বা বড় শিল্পের তুলনায় ক্ষুদে শিল্পে নতুন মূল্য সৃষ্টির ক্ষমতা বেশি ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তৎকালীন সরকার ক্ষুদ্র শিল্পকে উৎসাহিত না করে বৃহৎ শিল্পের প্রতিই বিশেষভাবে নজর দিয়েছিলেন। বিকাশমান ক্ষুদে শিল্পপতিদের কাছে সরকারী এ পদক্ষেপ মোটেই গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠার কথা নয়। কেননা শিল্পের বিকাশ যদি সরকারের লক্ষ্য হয়ে থাকে তাহলে যে খাতটি সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনাময় এবং যে খাতটি তুলনামূলকভাবে কম মূলধন টানে সে খাতকেই বেশি সহায়তা করার কথা। কিন্তু তা না করে ভিন্ন কিছু করলে সরকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অন্তত উক্ত ক্ষুদে শিল্পপতিদের ভাল ধারণা থাকতে পারে না। উপরন্ত, ক্ষুদে ও বৃহৎ শিল্পপতি এবং বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী বিভাজনটা যদি সমান্তরাল হয়ে ওঠে তাহলে তো কোন কথায় নেই। যাহোক, এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কি করে এখানে ক্ষুদ্র শিল্পগুলি এমন ধারাবাহিকভাবে বিকশিত হয়েছিল কিংবা এত উচ্চতম হারে মুনাফা অর্জনে সক্ষম হয়েছিল তা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে উঠতে পারে। সারণি ৫.১৩ থেকে এ প্রশ্নের একটি সম্ভাব্য উত্তর পাওয়া যায়। এ সারণিতে প্রধানতঃ দেখানো হয়েছে ১৯৫৯-৬০ থেকে ১৯৬৮-৬৯ কালপর্বে পূর্ব পাকিস্তানের ব্যক্তিগত খাতে বিভিন্ন উৎস থেকে যে পুঁজি বিনিয়োজিত হয়েছিল তার পরিমাণ ও উৎসের প্রকৃতি। এ সারণি থেকে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে পূর্ব পাকিস্তানের ব্যক্তিগত খাতের বিকাশে পুঁজি বিনিয়োগের বিভিন্ন উৎসের মধ্যে কার ভূমিকা কতটুকু।

সারণি ৫.১৩ থেকে দেখা যায়, ১৯৫৯-৬০ থেকে ১৯৬৮-৬৯ কালপর্বে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োজিত পুঁজির পরিমাণ ছিল মোট ৬৬৬ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা (স্থায়ী মূল্যে)। এর মধ্যে সরকারী ঋণের অবদান ছিল মাত্র শতকরা ২.৫৫ ভাগ, ব্যাংক ঋণের অবদান ছিল শতকরা ১৭.৬৪ ভাগ, বিশেষ ধরনের পুঁজি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের ঋণের অবদান ছিল শতকরা ৮.৩৭ ভাগ, সমবায় সমিতি ঋণের অবদান ছিল শতকরা ১৬.৬৭ ভাগ আর ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের অবদান ছিল শতকরা ৫২.৯৯ ভাগ। উপরোক্ত বিবরণ থেকে দেখা যায়, পূর্ব পাকিস্তানের ব্যক্তিগত খাতের বিকাশে সরকারের অবদান ছিল না বললেই চলে। ব্যক্তিগত সঞ্চয়ই এ খাতটি বিকাশের ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করেছে। এক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণ আর সমবায় সমিতি প্রদত্ত ঋণ বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। ব্যক্তিগত খাতটি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সরকার ১৯৬৩/৬৪ সাল পর্যন্ত সামান্য হলেও কিছুটা ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করেছে এবং এ কালপর্বে যে বছর সরকার সর্বাধিক পরিমাণে অবদান রেখেছিল সেবছর মোট বিনিয়োগের মধ্যে সরকারী ঋণের অবদান ছিল শতকরা ৬.৬৮ ভাগ। ঠিক এর পরবর্তী বছরই তথা ১৯৬৪/৬৫ অর্থবছরে সরকারী ঋণের অবদান ছিল মোট বিনিয়োগের মাত্র ০.৩৭ ভাগ। পরবর্তীকালে তা' আরো হ্রাস পায়।

সারণিঃ ৫.১৩

১৯৫৯/৬০-১৯৬৮/৬৯ কালপর্বে পূর্ব পাকিস্তানের ব্যক্তিগত খাতে বিনিয়োজিত পুঁজির পরিমাণ ও তার উৎস

(১৯৫৯/৬০ সালের মূল্যকে স্থায়ী মূল্য হিসাবে ধরে কোটি টাকার হিসাব)

পুঁজির উৎস	১৯৫৯-৬০	১৯৬০-৬১	১৯৬১-৬২	১৯৬২-৬৩	১৯৬৩-৬৪	১৯৬৪-৬৫	১৯৬৫-৬৬	১৯৬৬-৬৭	১৯৬৭-৬৮	১৯৬৮-৬৯	১৯৫৯-৬০ ১৯৬৮-৬৯
১. সরকারী ঋণ	১.৯	২.৩৩	২.৪২	৩.০০	৪.২৭	০.২৭	০.৯০	০.২১	১.৩৯	০.৬৫	১৭.৩৪
(শতকরা হার)	(৪.০০)	(৪.৬৭)	(৪.৫৩)	(৫.০৬)	(৬.৬৮)	(০.৩৭)	(১.২৩)	(০.৩১)	(১.৫৫)	(০.৪১)	(২.৫৫)
২. ব্যাংক ঋণ	২.৬	৫.৫৩	৭.৬৫	৬.০০	১৪.৭৫	৩০.১১	৭.৮৪	১৭.৬০	৭.৮৬	১৯.৮৩	১১৯.৭৭
(শতকরা হার)	(৫.৪৭)	(১১.০৮)	(১৪.৩২)	(১০.১১)	(২৩.০৩)	(৩৮.০০)	(১০.৭৪)	(২৫.৬৪)	(৮.৭৭)	(২৩.৫৩)	(১৭.৬৪)
৩. বিশেষ ধরনের পুঁজি বিনিয়োগ-কারী প্রতিষ্ঠানের ঋণ	১.৩	৪.৪৭	৪.৪৮	৫.৭২	৬.১১	৭.৫৭	৭.৯২	৫.৫১	৭.০৯	৬.৬৬	৫৬.৮৩
(শতকরা হার)	(২.৭৪)	(৮.৯৬)	(৮.৩৮)	(৯.৬৪)	(৯.৫৫)	(৯.৫৫)	(১০.৮৫)	(৮.০৩)	(৭.৯১)	(৭.৯০)	(৮.৩৭)
৪. সমবায় সমিতির ঋণ	৯.৩০	১৭.০৮	১১.১৯	১১.৮১	১০.৭৭	৭.৩৯	৭.৮৪	৮.৪১	১৯.২৭	১০.১১	১১৩.১৭
(শতকরা হার)	(১৯.৫৮)	(৩৪.২২)	(২০.৯৪)	(১৯.৯০)	(১৬.৮২)	(৯.৩৩)	(১০.৭৪)	(১২.২৫)	(২১.৫১)	(২৩.৮৬)	(১৬.৩৭)
৫. ব্যক্তিগত সঞ্চয়	৩২.৪	২০.৫০	২৭.৭০	৩২.৮১	২৮.১৮	৩৩.৮৯	৪৮.৯০	৩৬.৯১	৫৩.৯৬	৪৪.৪৯	৩৫৯.৭৪
(শতকরা হার)	(৬৮.২১)	(৪১.০৭)	(৫১.৮৩)	(৫৫.২৯)	(৪৪.০১)	(৪২.৭৭)	(৬৭.০০)	(৫৩.৭৬)	(৬০.২৪)	(৫২.৬৯)	(৫২.৯৯)
মোট সঞ্চয়	৪৭.৫০	৪৯.৯৯	৫৩.৪৪	৫৯.৩৪	৬৪.০৮	৭৯.২৩	৭৩.৪	৬৮.৬৪	৮৯.৫৭	৮১.৭৪	৬৬৬.৮৫
(শতকরা হার)	(১০০.০০)	(১০০.০০)	(১০০.০০)	(১০০.০০)	(১০০.০০)	(১০০.০০)	(১০০.০০)	(১০০.০০)	(১০০.০০)	(১০০.০০)	(১০০.০০)

Source: Mohiuddin Alamgir and Atiqur Rahman (1974): Saving in Bangladesh 1959/60-1969/70, Research Monograph-2.

ব্যাংক ঋণও প্রথম দিকে সেভাবে ভূমিকা পালন করতে পারেনি। ১৯৫৯/৬০ অর্থবছরে এর অবদান ছিল মাত্র শতকরা ৫.৪৭ ভাগ। এর পর থেকে এর অবদান ক্রমে বাড়তে বাড়তে ১৯৬৪-৬৫ অর্থবছরে মোট বিনিয়োগের শতকরা ৩৮.০০ ভাগে এসে উপনীত হয়। তবে এ হার পরবর্তীকালে অব্যাহত থাকেনি; ব্যাংকঋণের পরিমাণের ক্ষেত্রে খুবই বেশি উত্থানপতন ঘটেছে। অর্থাৎ ব্যক্তিগত খাতে পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংকের ভূমিকা বেশ ভালই ছিল বলে মনে হয়। কিন্তু ঋণের পরিমাণে এই বিপুল পরিমাণ উত্থানপতন থেকে মনে

Dhaka University Institutional Repository

হয় ব্যক্তিগত খাতে পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংক কোন নির্ভরযোগ্য উৎস ছিল না। বিশেষ ধরনের পুঁজি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের অবদান শুরুতে বেশ ক্ষুদ্র পর্যায় থেকে শুরু হলেও এর ভূমিকা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। ১৯৬৫/৬৬ সালে পুঁজি বিনিয়োগের ব্যক্তিগত খাতের শতকরা ১০.৮৫ ভাগ পুঁজি এই প্রতিষ্ঠানগুলি সরবরাহ করে। তবে এর পর থেকেই এ উৎস থেকে ঋণের পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে। এ উৎসটি পুঁজি বিনিয়োগের ব্যক্তিগত খাতের বিকাশে খুব বড় কোন অবদান রেখেছে তা নয়, কিন্তু এ উৎসটি যতটুকু ভূমিকা পালন করেছে তা মোটামুটিভাবে সরলগতিতে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই পূর্ব পাকিস্তানের বিনিয়োজিত পুঁজির ব্যক্তিগত খাতের বিকাশে এটি ছিল একটি নির্ভরযোগ্য উৎস।

সমবায় সমিতির ঋণ পূর্ব পাকিস্তানের বিনিয়োগ কর্মকান্ডের ব্যক্তিগত খাত বিকাশের ক্ষেত্রে গোড়া থেকেই বিশেষ অবদান রেখেছে। ষাট দশকের মাঝামাঝি সময়ের দু'তিন বছর ছাড়া এর অবদান ছিল বেশ ধারাবাহিক। ১৯৬০-৬১ অর্থবছরে সমবায় সমিতির ঋণ থেকে আসা পুঁজির পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ব্যক্তিগত খাতে পুঁজি বিনিয়োগের শতকরা ৩৪.২২ ভাগ। সমবায় সমিতির ঋণের মত ব্যক্তিগত খাতে পুঁজি বিনিয়োগে ব্যক্তিগত সঞ্চয়ও বেশ ধারাবাহিক ভূমিকা পালন করেছে। শুরুতে তথা ১৯৫৯-৬০ অর্থবছরে ব্যক্তিগত খাতে মোট পুঁজি বিনিয়োগের শতকরা ৬৮.২১ ভাগ আসে ব্যক্তিগত সঞ্চয় থেকে। পরবর্তী বছর ঠিক একই হারে পুঁজি বিনিয়োগ না করতে পারলেও ব্যক্তিগত সঞ্চয় থেকে পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়তে থাকে, ১৯৬৫-৬৬ অর্থবছরে ব্যক্তিগত খাতে মোট বিনিয়োজিত পুঁজির শতকরা ৬৭ ভাগ বিনিয়োজিত হয় ব্যক্তিগত সঞ্চয় থেকে। ব্যক্তিগত সঞ্চয় থেকে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ১৯৬৭/৬৮ সালে ৫৩ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকাতে গিয়ে উপনীত হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায়, ব্যক্তিগত সঞ্চয়ই পূর্ব পাকিস্তানের পুঁজি বিনিয়োগের ব্যক্তিগত খাত বিকাশের ক্ষেত্রে নির্ধারক ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়া, সমবায় সমিতির হাতে গচ্ছিত পুঁজিও মূলতঃ ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের সমাহার। সমবায় সমিতির পুঁজিকে ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের পর্যায়ভুক্ত ধরলে পূর্ব পাকিস্তানের পুঁজি বিনিয়োগের ব্যক্তিগত খাত বিকাশে ব্যক্তিগত সঞ্চয় ষাট দশকের কোন কোন বছর শতকরা ৯০ ভাগ অবদান রেখেছে এবং কোন বছরই এর অবদান শতকরা ৭৫ ভাগের নিচে নামেনি। এ থেকে একটি সিদ্ধান্ত করা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীই ছিল আত্মনির্ভর। আর যারা ব্যক্তিগতভাবে বিনিয়োগ করতো তাদের অধিকাংশই ছিল ক্ষুদে শিল্পপতি ও ক্ষুদে ব্যবসায়ী। তাই এ ক্ষুদে মালিকগণ বড় পুঁজির আধিপত্যকে সহজভাবে মেনে নেবে এ ধারণা করার কোন কারণ নেই। উপরন্তু পূর্ব পাকিস্তানের বড় পুঁজির মালিকগণই ছিল বরং রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল। উপরোক্ত আলোচনা থেকে পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের মাঝে প্রধান দু'টি শ্রেণীর অস্তিত্ব পাওয়া যায়ঃ এর একটি অংশে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা নিয়ে বিপুল পুঁজির মালিক হয়েছিল, আর অন্যটি যার সংখ্যা প্রচুর, প্রধানতঃ ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের ওপর নির্ভর করে ক্রমাগত বিকশিত হয়ে চলেছিল। বিকাশের এই প্রকৃতি থেকে ধারণা করা যায়, বড় পুঁজির মালিকেরা ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল ও তার স্বার্থরক্ষাকারী। আর অন্যদিকে ছিল বিপুল সংখ্যক ক্ষুদে ও মাঝারি আয়তনের শিল্পের মালিকেরা, যারা নিজস্ব ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে শিল্পোন্নয়নে ভূমিকা রেখে চলেছিল, অর্থাৎ সরকারী তরফ থেকে যারা কোন রকম সহযোগিতা পায়নি। ফলে রাষ্ট্রের প্রতি এদের ক্ষুব্ধ থাকারই কথা।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, শিল্প বিকাশের মধ্য দিয়ে শুধু মাত্র শিল্পপতি শ্রেণীরই জন্ম হয় না; অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসাবে একটি শ্রমিক শ্রেণী গড়ে ওঠে, গড়ে ওঠে শ্রমিক ও শিল্পপতিদের মাঝামাঝি অবস্থানকারী একটি কর্মচারী গোষ্ঠী। এই কর্মচারীরা সংখ্যায় নিতান্ত কম নয়। এদের সবার শ্রমের ধরন মানসিক; কিন্তু শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নিচের লাইন সর্দার-সুপারভাইজর থেকে শুরু করে মোটা বেতনের বিশেষজ্ঞ বা পরিচালক পর্যন্ত সবাই এর অন্তর্ভূক্ত। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, উপর স্তরের এ ধরনের পদাধিকারীর সংখ্যা মোট কর্মচারীদের মধ্যে খুবই নগণ্য। এই কর্মচারীগণ উৎপাদনের সাথে যে ধরনের সম্পর্কে সম্পর্কিত, সেই একই ধরনের উৎপাদন সম্পর্কের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সমাজে আরো অনেক ছিল। একারণে এদের সম্পর্কে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হল না। তাছাড়া, উপরোক্ত আলোচনাতে শুধুমাত্র শিল্প শ্রমিকদের সম্পর্কেই ধারণা পাওয়া যায়- শ্রমিকশ্রেণীর অপরাপর অংশ সম্পর্কে তেমন কোন ধারণা পাওয়া যায় না। ফলে শ্রমিকশ্রেণী সম্পর্কিত আলোচনাটিও এখানে বিস্তৃত করা হল না।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী কিভাবে বিকশিত হয়েছিল সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে হলে সে সমাজের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের বিভিন্ন খাতের বিকাশের দিকে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। সারণি ৫.১৪তে এ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এ সারণি থেকে দেখা যায়, ১৯৪৯/৫০ থেকে ১৯৬৮/৬৯ অর্থবছর পর্যন্ত এ ২০ বছরে পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন হয়েছিল স্থায়ী মূল্যে মোট ৩০ হাজার ৩১০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার। এর মধ্যে শতকরা ৫৯.২৪ ভাগ হয়েছিল কৃষি থেকে এবং শতকরা মাত্র ৬.১২ ভাগ উৎপাদিত হয়েছিল শিল্প সেক্টর থেকে; বাকি শতকরা ৩৪.৬৪ ভাগই উৎপাদিত হয়েছিল অন্যান্য খাতে। ফলে সমাজের শ্রেণী বিন্যাস করার ক্ষেত্রে কৃষি ও শিল্পের বাইরের উক্ত সব খাতসমূহকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

সারণি ৫.১৪তে প্রদত্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষি খাতের অবদানই ছিল সবচেয়ে বেশী, তবে সময়ের সাথে সাথে তার অবদান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে। ১৯৪৯/৫০ থেকে ১৯৫৩/৫৪-এ চার বছরে কৃষি খাতের অবদান ছিল মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের শতকরা ৬৫.১৩ ভাগ। উৎপাদনের মোট পরিমাণের কোন অবনতি না ঘটলেও পরবর্তীকালে উৎপাদনের আনুপাতিক হার হ্রাস পেতে পেতে ১৯৬৪/৬৫-১৯৬৮/৬৯ কালপর্বে কৃষির অবদান মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের শতকরা ৫৪.৭৭ ভাগে এসে দাঁড়ায়। কৃষির পর প্রত্যক্ষ উৎপাদনের দ্বিতীয় খাতটি হল শিল্প। শিল্প খাতটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছোট খাত হিসাবেই অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে ভূমিকা রেখে চলেছিল। কিন্তু মোট উৎপাদন কিংবা আনুপাতিক হার উভয় দিক থেকেই তার অবস্থান ক্রমাগত শক্তিশালী হতে থাকে। শুরুতে তথা ১৯৪৯/৫০-থেকে ১৯৫৩/৫৪ কালপর্বে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে শিল্পের অবদান ছিল মাত্র শতকরা ৩.৩১ ভাগ। পরবর্তীকালে তা ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে শেষ পর্যন্ত শতকরা ৭.৭৫ ভাগে গিয়ে উপনীত হয়। উৎপাদনের পরিমাণ শুরুর চার বছরের ২০৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা থেকে প্রায় চার গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬৪/৬৫-১৯৬৮/৬৯ কালপর্বে গিয়ে ৭৫৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকাতে গিয়ে উপনীত হয়। ইতিপূর্বে শিল্প সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে তাতে শুধুমাত্র ১০ জনের অতিরিক্ত শ্রমিক যে সকল কারখানায় কাজ করে এবং কোন না কোন ধরনের কৃত্রিম শক্তি (জ্বালানি বা বিদ্যুৎ) ব্যবহার করা হয় সেগুলির মধ্যেই আলোচনা সীমিত রাখা হয়েছে। শিল্পের উক্ত বৃহৎ খাতটি ছাড়াও সে সময় পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প কাঠামোতে একটি ক্ষুদ্র ও গতানুগতিক খাত ছিল

Dhaka University Institutional Repository

সারণিঃ ৫.১৪

১৯৪৯/৫০–১৯৬৮/৬৯ কালপর্বে পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের খাতওয়ারী খতিয়ান

(১৯৫৯/৬০ সালের মূল্যকে স্থায়ী মূল্য হিসাবে ধরে কোটি টাকার হিসাব)

	১৯৪৯/৫০–১৯৫৩/৫৪	১৯৫৪/৫৫–১৯৫৮/৫৯	১৯৫৯ /৬০–১৯৬৩/৬৪	১৯৬৪/৬৫–১৯৬৮/৬৯	১৯৪৯/৫০–১৯৬৮/৬৯
১. কৃষি	৪০০১.৬	৪০১৫.২	৪৬১০.২	৫৩২৯.৬	১৭৯৫৬.৬
	(৬৫.১৩)	(৬১.৫০)	(৫৮.৩০)	(৫৪.৭৭)	(৫৯.২৪)
২. শিল্প	২০৩.৬	৩৩২.৩	৫৬৫.৩	৭৫৪.৩	১০৫৫.৫
	(৩.৩১)	(৫.০৯)	(৭.১৫)	(৭.৭৫)	(৬.১২)
৪ পরিবহন ও যোগাযোগ	৩৩৭.১	৪০৪.৯	৫০৭.২	৬.৩০	১৮৬২.৫
	(১১.৬৫)	(১১.২৩)	(১১.২৯)	(১১.০০)	(১১.২৬)
৩. ব্যবসা	৭১৫.৭	৭৩৩.৪	৮৯২.৫	১০৭০.৪	৩৪১২.০
	(৫.৪৯)	(৬.১০)	(৬.৪১)	(৬.৩০)	(৬.১৪)
৫. নির্মাণ	৪৬.১	৭৭.০০	১৯৭.৭	৫১০.০	৮৩০.৮
	(০.৭৫)	(১.১৮)	(২.৫০)	(৫.১৪)	(২.৭৪)
৬. গণপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	১৭২.১	১৮১.৩	২১৮.৪	৩৩৮.৭	৯১০.৫
	(২.৮০)	(২.৭৮)	(২.৭৬)	(৩.৪৮)	(৩.০০)
৭. অন্যান্য*	৬৬৭.৬	৭৮৪.৬	৯১৬.৩	১১১৪.০	৩৪৮২.৫
	(১০.৮৭)	(১২.১২)	(১১.৫৯)	(১১.৪৫)	(১১.৪৯)
৮. মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন	৬১৪৩.৮	৬৫২৮.৭	৭৯০৭.৬	৯৭৩০.৩	৩০৩১০.৪
	(১০০)	(১০০)	(১০০)	(১০০)	(১০০)

*অন্যান্যর মধ্যে রয়েছেঃ বনিজ, উপযোগ, ব্যাংক ও বীমা, গৃহ সংস্থান ও বিভিন্ন প্রকৃতির সেবা

Source: Mohiuddin Alamgir & Lodewijk J.J. B. Berlage (1974): Bangladesh: National Income and Expenditure-1949/50-1969/70 Dacca: BIDS, Table- 4, P: 167-69.

এবং সেখানে ছিল একটি শ্রম বিভাজন ও শ্রেণী বিন্যাস। শিল্পের ক্ষুদে সেক্টরে উদ্যোক্তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেই কারিগর, কোন কোন ক্ষেত্রে দুই চারজন সহযোগী শিক্ষানবিস কিংবা শ্রমিক নিয়োগ করে থাকে। তবে শিল্পের এ সেক্টরটি প্রধানত গিল্ড চরিত্রের। এখানে একদিকে যেমন শ্রমিকদের সংগঠিত হবার কোন সুযোগ নেই, অন্যদিকে অধিকাংশ শ্রমিকই থাকে শিক্ষানবিস। ফলে শিল্পের এ সেক্টরে আধুনিক অর্থে কোন শ্রমিকশ্রেণীর জন্ম হয় না। তবে এ ক্ষুদে উদ্যোক্তাগণ তাদের সীমিত সামর্থ্য দিয়ে বাজারের জন্য পণ্য উৎপাদন করে এবং তা করতে গিয়েই তাকে কাঁচামাল সংগ্রহ, পাকামাল বিক্রয় ইত্যাদি নিয়ে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এভাবেই উক্তসব ক্ষুদে উদ্যোক্তাদের মাঝে গড়ে ওঠে একটি সাধারণ স্বার্থ, যা, তাদেরকে স্বতন্ত্র একটি শ্রেণীস্বত্তা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে উদ্বুদ্ধ করে। এ শ্রেণীর আয়তন কত বড় সে আলোচনা পরে করা হবে। তবে উৎপাদন সম্পর্কের বিবেচনায় এটা একটা মালিক শ্রেণী হলেও বিকাশের সম্ভাবনা ও পরিপূর্ণ আকাংখা নিয়েও এরা ছিল প্রতি মূহূর্তে অস্তিত্বের সংকটে শংকিত। যে কারণে এদেরকে উৎপাদক পেটি-বুর্জোয়া হিসাবে বিবেচনা করা যায়।

পুরো পাকিস্তান আমল ধরেই পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে অবদানের দিক থেকে ব্যবসার অবস্থান ছিল দ্বিতীয়। ব্যবসা প্রত্যক্ষভাবে কোন কিছু উৎপাদন করে না; তবে এর পুরো প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকে ছোট–বড় অসংখ্য বিনিয়োগকারী এবং বিভিন্ন স্তরের অসংখ্য কর্মচারী। আয়তনের দিক থেকে ১৯৪৯/৫০ অর্থবছরের পর থেকে ব্যবসার ক্রমাগত বৃদ্ধি ঘটলেও অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে পুরো ২০ বছরেই এর আনুপাতিক অবদান ছিল মোটামুটি সমান। শুরুতে এর অবদান ছিল শতকরা ১১ ভাগের কিছু বেশি এবং শেষে তথা ১৯৬৪/৬৫–১৯৬৮/৬৯ কালপর্বে তা শতকরা ১১.০০ ভাগে নেমে আসে।

উক্ত ২০ বছরে পরিবহন ও যোগাযোগ খাতটি অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অবদানের ক্ষেত্রে শতকরা ৫.৪৯ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৬.৩০ ভাগে গিয়ে উন্নীত হয় এবং এ সময়ে আয়তনের দিক থেকে তা প্রায় দ্বিগুণ হয়। এই সেক্টরটির সাথে যেমন সরকার ও কারখানা মালিকদের সম্পর্ক আছে, তেমনই সম্পর্ক আছে একটি বড় মালিক গোষ্ঠীর – যারা বাস, ট্রাক, লঞ্চ ইত্যাদি পরিবহন ও যোগাযোগ সামগ্রীর মালিক। এছাড়াও এ খাতে একটি বৃহৎ পরিবহন শ্রমিকশ্রেণী জড়িত থাকে।

নির্মাণ খাত অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে অবদান গ্রহণকারী খাতগুলির মধ্যে সে সময় তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র ছিল। উক্ত ২০ বছরে এর অবদান ছিল মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের শতকরা মাত্র ২.৭৪ ভাগ। তবে শুরুতে এটা যত ছোট খাত ছিল, পরবর্তীকালে তা আর অত ছোট থাকে নি। ১৯৪৯/৫০–১৯৫৩/৫৪ এ পাঁচ বছরের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে এ খাতের অবদান ছিল মাত্র শতকরা ০.৭৫ ভাগ। কিন্তু এ খাতটি খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬৪/৬৫–১৯৬৮/৬৯ কালপর্বে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের শতকরা ৫.২৪ ভাগ অবদান রাখতে সক্ষম হয়। এ খাতটির দ্রুত বিকাশের মধ্য দিয়ে যেমন একটি ঠিকাদার শ্রেণীর শক্তিশালী অবস্থান নির্দেশিত হয়, ঠিক তেমনই একটি বিকাশমান প্রযুক্তিবিদ, সাধারণ কর্মচারী ও নির্মাণ শ্রমিকের আবির্ভাবের ধারণাও মিলে।

গণপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা খাতটি বরাবর প্রায় একই পরিমাণ অবদান রাখে এবং ১৯৬৪/৬৫–১৯৬৮/৬৯ কালপর্বে অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে এর আনুপাতিক অবদান কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৩.৪৮ ভাগে উন্নীত হয়। এ খাতের সাথে যারা যুক্ত তারা সবাই সাংবিধানিক দিক দিয়ে রাষ্ট্রের অংশ। প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যগণ এবং প্রশাসনের উচ্চ কর্মকর্তাগণ তো পাকিস্তান রাষ্ট্রের অত্যন্ত শক্তিশালী অংশ ছিল। তবে গণপ্রশাসনে কর্মরত ব্যক্তিদের মধ্যকার একটি গরিষ্ঠ অংশ ছিল দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী। জীবন জীবিকার সংকট এদেরকেও রেহাই দিত না। ফলে আর্থ–সামাজিক–রাজনৈতিক পরিবর্তনকামী শক্তি হিসাবে এদেরকেও বিবেচনা করতে হয়।

এছাড়া, খনিজ, উপযোগ, ব্যাংক–বীমা ও বিভিন্ন ধরনের সেবামূলক খাত ছিল, যেগুলির যুগপৎ অবদান ছিল মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের শতকরা ১১.৪৯ ভাগ। প্রায় সব সময়ই এর আনুপাতিক অবদান মোটামুটি সমান ছিল। এ খাতেও যারা জড়িত ছিল তাদের মধ্যেও ছিল একটি স্তরবিন্যাস– যাদের মধ্যেকার অধিকাংশই ছিল স্বল্প সুযোগ সুবিধার অধিকারী।

উপরোক্ত বিভিন্ন আর্থিক খাতে নিয়োজিত সকল শ্রমশক্তিকে যদি মোটা দাগে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় তাহলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসের একটি স্পষ্ট চিত্র ফুটে ওঠে। এ শ্রেণী বিন্যাসের লক্ষ্যে বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

সারণি৫.১৫ প্রস্তুত করা হয়েছে। সারণি৫.১৫-তে ১৯৬১ ও১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানের মোট শ্রমশক্তির বিভিন্ন অংশ যে নানাবিধ কর্মে নিয়োজিত ছিল, সেসবের ধরনের ভিত্তিতেই এদের শ্রেণী বিন্যাস করা হয়েছে।

সারণি ৫.১৫ থেকে দেখা যায়, উক্ত বছরে পূর্ব পাকিস্তানে মোট শ্রমশক্তির সংখ্যা ১ কোটি ৭৪ লক্ষ ৪২ হাজার থেকে শতকরা ৪১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২ কোটি ৪৫ লক্ষ ৭০ হাজারে গিয়ে উপনীত হয়। এ সময়ে শ্রমশক্তির বিন্যাসে দু'টি ক্ষেত্রে লক্ষণীয় পরিবর্তন পরিদৃষ্ট হয়। তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে কৃষিজীবী। ১৯৬১ সালে এদের আনুপাতিক অবস্থান ছিল শতকরা ৮৬ ভাগ, পরবর্তী ৮ বছরে আনুপাতিক হার শতকরা ৪.১৫ ভাগ হ্রাস পেয়ে শতকরা ৮১.০৫ ভাগে গিয়ে দাঁড়ায়। দ্রুত পরিবর্তনশীল আর একটি খাত হল পরিবহন ও উৎপাদন। মাত্র ৮ বছরে এ খাতে নিযুক্ত শ্রমশক্তির সংখ্যা দ্বিগুণের চেয়েও বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আনুপাতিক অবস্থানের দিক থেকে শতকরা ৬.৩১ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৯.১৫ ভাগে গিয়ে উপনীত হয়েছে। দ্রুত পরিবর্তনশীল উক্ত দু'টি খাতই দৈহিক পরিশ্রমের সাথে যুক্ত। অর্থাৎ এ সময়ে শ্রমশক্তির একটি বড় অংশ কৃষিশ্রম থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নিয়ে পরিবহন ও শিল্পে নিয়োজিত করেছে। ১৯৬৯ সাল নাগাদ ২২ লক্ষ ৪৭ হাজার লোকের একটি বিশাল বাহিনী অকৃষি দৈহিক শ্রমের সাথে যুক্ত হয়ে গেছে– যাদের একটি অংশ প্রত্যক্ষ উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট; আর অবশিষ্ট অংশ বিভিন্ন ধরনের পরিবহনের সাথে জড়িত।

সারণিঃ ৫.১৫

বিভিন্ন পেশায় কর্মরত সক্রিয় শ্রমশক্তির বিন্যাস*

(হাজারে)

সাল	পেশাজীবী ও প্রযুক্তিবিদ	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	কেরাণী	দোকান কর্মচারী	সেবা	কৃষিজীবী	পরিবহন ও উৎপাদন	অনির্ধারিত বা বেকার	মোট	পুরুষ	মহিলা
১৯৬১	১৮৯	৩৩	১৬৯	৫২৮	৩০০	১৫০০০	১১০০	১২৩	১৭৪৪২	১৪৮০১	২৬৪১
শতকরা হার	(১.০৮)	(০.১৯)	(০.৯৭)	(৩.০৩)	(১.৭২)	৮৬.০০	৬.৩১	(০.৭১)	১০০	(৮৪.৮৬)	(১৫.১৪)
১৯৬৯	৩৭৪	৪১	২১৩	৯৩৪	৩৮৬	২০১১১	২২৪৭	২৬৪	২৪৫৭০	-	-
শতকরা হার	(১.৫২)	(০.১৭)	(০.৮৭)	(৩.৮০)	(১.৫৭)	(৮১.৮৫)	(৯.১৫)	(১.০৭)	(১০০)		

* এ সারণিটি প্রস্তুত করার জন্য কয়েকটি উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছেঃ

1. Alamgir Mohiuddin & Lodewijk J.J. B. Berlage (1974): Bangladesh: National Income and Expenditure-1949/50-1969/70, Dacca: BIDS. PP: 175-76.
2. Statistical Digest of Bangladesh No. 8. 1972, Dacca, BBS, pp.33-62, 235-52.
3. Economic Research Bureau (1st edn.) : Statistical Abstract of Bangladesh, Calcutta: Society & Commerce Publications pp: 25-31.
4. Population Census of Bangladesh 1974, Dacca: BBS, 1977, Table no. 42, p.41.

১৯৬১ থেকে ১৯৬৯ এই আট বছরে শ্রমশক্তির আনুপাতিক অবস্থানে আর যে সকল ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে সেগুলির মধ্যে অন্যতম দু'টি হচ্ছে– পেশাজীবী ও প্রযুক্তিবিদ এবং দোকান কর্মচারী। লক্ষণীয় যে, পেশাজীবী ও প্রযুক্তিবিদের মধ্যে ডাক্তার, প্রকৌশলী, আইনজীবী ইত্যাদি উচ্চ আয়গোষ্ঠীর শ্রমশক্তির পাশাপাশি নিম্ন আয়গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নিম্নস্তরের শিক্ষক, টেকনিশিয়ান, মুহুরি ইত্যাদি পেশাজীবীরাও পড়ে। তবে এ চিত্র থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, উক্ত কালপর্বে শ্রমশক্তির গড় বৃদ্ধির তুলনায় উক্ত জনগোষ্ঠীর বৃদ্ধি হয়েছিল অনেক বেশি দ্রুত। উক্ত ৮ বছরে এদের সংখ্যা শতকরা ৮৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩ লক্ষ ৭৪ হাজার লোকের এক বিশাল শহুরে জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল। দোকান কর্মচারী খাতেও অত্যন্ত দ্রুত গতিতে শ্রমশক্তির বৃদ্ধি ঘটেছে। এদের সংখ্যা ১৯৬১ সাল থেকে পরবর্তী ৮ বছরে শতকরা ৭৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৯ লক্ষ ৮৬ হাজারের এক বিশাল জনগোষ্ঠীতে দাঁড়িয়েছে। এ উভয় জনগোষ্ঠীই অকৃষি শ্রমের সাথে যুক্ত, তথা এদের প্রায় সবাই মানসিক শ্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট। পেশাজীবী ও প্রযুক্তিবিদরা তো বটেই; দোকান কর্মচারীগণও সমাজের অপেক্ষাকৃত সচেতন অংশ। দোকান কর্মচারীদের ক্ষুদ্র একটি অংশ গ্রামে অবস্থান করলেও এর প্রধান অংশই শহরের নাগরিক। প্রাইমারী ও হাইস্কুল শিক্ষকদের বড় একটি অংশ গ্রামে অবস্থান করলেও তাদের কিছু অংশ শহরে বাস করে। আর এ সকল সচেতন ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠী গ্রামে বাস করে বলেই শহরের সাথে গ্রামের যোগাযোগ দ্রুত বাড়তে থাকে। এছাড়াও, কেরাণী, সেবা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা মিলে ১৯৬৯ সালে আরো ৬ লক্ষ ৪০ হাজার শ্রমশক্তি শহরে অবস্থান করছিল।

১৯৬৯ সালে শতকরা ৯০.৮৫ ভাগ শ্রমশক্তি নিয়োজিত ছিল গ্রামীণ এলাকায়। অর্থাৎ গ্রামীণ শ্রমশক্তির মোট সংখ্যা ছিল ২ কোটি ২৩ লক্ষ ২১ হাজার ৮৪৫ জন। এদের মধ্যে ২ কোটি ১ লক্ষ ১১ হাজার জন কৃষিজীবী। গ্রামীণ তাঁত শিল্পে নিয়োজিত ছিল ৫ লক্ষ ১১ হাজার ২১৩ জন।[৯৭] বাকি ১৬ লক্ষ ৯৯ হাজার ৬৩২ জন ছিল শিক্ষকতা, ব্যবসা, চা শিল্পসহ নানাবিধ কুটির শিল্প ও অন্যান্য পেশার সাথে যুক্ত।

শহরে কর্মরত মোট শ্রমশক্তির সংখ্যা ছিল ২২ লক্ষ ৪৮ হাজার ১৫৫ জন। এদেরকে বিন্যস্ত করলে নিম্নোক্ত চিত্র পাওয়া যায়ঃ

সারণি ৫.১৬

শহরে শ্রমশক্তির বিন্যাস[৯৮]

শ্রেণী/পেশা	সংখ্যা	শতকরা হার
কারখানা শ্রমিক	৩,১৩,৩৭৭	১৩.১৪
পরিবহন ও ক্ষুদে কারখানা শ্রমিক	১,৮৯,১৩৮	৮.৪১
১. মোট শ্রমিক	৫,০২,৫১৫	২২.৩৫
দোকান কর্মচারী (নিবন্ধনকৃত দোকান)	৭০,৯৭৪	৩.১৫
ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মচারী	৩৯,৩১৮	১.৭৫
শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মচারী	৩০,২৬৬	১.৩৫
সরকারী, আধাসরকারী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কেরাণী	১,৭৮,২২৯	৭.৯৩
২. মোট কর্মচারী ও কেরাণী	৩,১৮,৭৮৭	১৪.১৮
৩. আইনজীবী ও ডাক্তার (রেজিস্টার্ড)	১৪,২৩০	০.৬৩
৪. প্রযুক্তিবিদ ও অন্যান্য পেশাজীবী (শিক্ষক বাদে)	১,৯১,৮৬৪	৮.৫৩
৫. সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা	৪১,০০০	১.৮৩
৬. প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সেবা কর্মে নিয়োজিত	৩,৪৫,১৫১	১৫.৩৫
৭. শিক্ষক, স্বাধীন বৃত্তিজীবী, ব্যবসায়ী, অনিবন্ধনকৃত দোকান কর্মচারী ও অন্যান্য	৮,৩৪,৬০৮	৩৮.১২
মোট শহরে শ্রমশক্তি (১+২+৩+৪+৫+৬+৭)	২২,৪৮,১৫৫	১০০.০০

[৯৭]. Economic Research Bureau (1st. edition): *Statistical Abstract of Bangladesh.* Calcutta: Society of Commerce Publications. p.25.

[৯৮]. সারণী ৫.১৫তে নির্দেশিত তথ্যগুলি উপরে ব্যবহৃত বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত সারণি থেকে দেখা যায় যে, ১৯৬৯ সালে মোট শ্রমিক ছিল শহরে মোট শ্রমশক্তির শতকরা ২২.৩৫ ভাগ। সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কেরাণী ও কর্মচারীর সংখ্যা ছিল শতকরা ১৪.১৮ ভাগ। এছাড়া, আইনজীবী ও রেজিস্টার্ড ডাক্তারের সংখ্যা ছিল মোট শহরে শ্রমশক্তির মাত্র ০.৬৩ ভাগ। প্রযুক্তিবিদ তথা প্রকৌশলী ও টেকনিশিয়ান এবং অনিবন্ধনকৃত ডাক্তার, নার্স, সাংবাদিক, গবেষক, চিত্রশিল্পী, সাংস্কৃতিককর্মী ইত্যাদি মিলে এদের সংখ্যা ছিল শতকরা ৮.৫৩ ভাগ। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রশাসনিক কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল শতকরা ১.৮৩ ভাগ। প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা, ব্যাংক, বীমা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, পরিবেশ সংরক্ষণসহ বিভিন্ন সেবা কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল মোট শহরে শ্রমশক্তির শতকরা ১৫ ভাগ। এছাড়া, শহরের স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছোট দোকান কর্মচারী ও দোকানদার, হকার, ব্যবসায়ী, স্বাধীন বৃত্তিজীবীসহ অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত মোট শ্রমশক্তির সংখ্যা ছিল শহরে শ্রমশক্তির শতকরা ৩৮.১২ ভাগ।

গ্রাম ও শহরে কর্মরত উক্ত শ্রমশক্তির বাইরেও সারা পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে এমন একটি বিশাল জনগোষ্ঠী সেদিন অবস্থান করছিল যারা শ্রমশক্তি হিসাবে বিবেচিত হয় না। কিন্তু সচেতনতার দিক দিয়ে জনসাধারণের গড় মান অপেক্ষা তারা অনেক অগ্রসর। এরা হচ্ছে ছাত্র সমাজ। সে সময় তথা ১৯৬৯ সালে মোট বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রী ছিল প্রায় ১৩ হাজার, কলেজ ছাত্র-ছাত্রী ছিল ২ লক্ষ ৩৩ হাজার এবং হাইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ছিল ১৩ লক্ষ ২৮ হাজার। প্রায় ১৬ লক্ষ উক্ত জনসমষ্টি সেদিন সারা পূর্ব পাকিস্তান, বিশেষতঃ শহরাঞ্চলে ছড়িয়ে ছিল। এদেরকে নির্দিষ্ট কোন শ্রেণীর অর্ন্তগত না করা গেলেও প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক ঐক্যবদ্ধ সামাজিক শক্তি হিসাবে এরা ছিল সবচেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এরা দেশের মোট শ্রমিক অপেক্ষা সংখ্যায় তিন গুণেরও অধিক। প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক সংগঠিত জনসংখ্যার মধ্যে এরাই সবচেয়ে বেশি।

উপরোক্ত সমগ্র আলোচনার প্রেক্ষিতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সমাজ কাঠামোর নিম্নোক্ত শ্রেণীসমূহকে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

গ্রামীণ জোতদার

এ শ্রেণীটি ষাট দশকের পূর্ব পাকিস্তানে গ্রামীণ সমাজে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সবচেয়ে শক্তিশালি শ্রেণী ছিল। এরা আইয়ুবের ভূমি সংস্কার নীতির সুযোগে বিপুল পরিমাণ ভূসম্পত্তিকে সংরক্ষণ করে এবং নামে -বেনামে আরো নতুন নতুন ভূসম্পত্তি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। বর্গা ব্যবস্থার সুযোগে বিনা বিনিয়োগে ও বিনা পরিশ্রমে এরা ভূসম্পত্তি থেকে ফসলের অর্ধেক পায়, অন্যদিকে, সরকারী পর্যায়ের বা ব্যাংক ঋণের অনুপস্থিতির কারণে এরা গ্রামীণ মহাজনী ব্যবসায়ে প্রাধান্য বিস্তার করার সুযোগ পায়। মহাজনী ব্যবসা আইন সিদ্ধ না থাকার কারণে ছোট ও প্রান্তিক কৃষকদের জমি দলিল করে এবং সাদা কাগজে দস্তখত করিয়ে টাকা ধার দেয়। সম্ভবতঃ ঋণগ্রস্ত কৃষকরা উচ্চ মাত্রার চক্রবৃদ্ধি সুদ ও আসল টাকা যথা সময়ে পরিশোধ করতে না পারার কারণেই এরা তাঁদের জমির ওপর দখল প্রতিষ্ঠা করে। এভাবে এরা গ্রামীণ প্রান্তিক কৃষকসহ বিভিন্ন শোষিত শ্রেণীর কাছে অচিরেই ঘৃণার পাত্র হয়ে ওঠে। অপরদিকে, তারা বিপুল পরিমাণ জমি বর্গা প্রদানের সুযোগে বেশ কিছু সংখ্যক বর্গা কৃষকের ওপর চূড়ান্ত আধিপত্য কায়েম করে। উক্ত নির্ভরশীল বর্গা কৃষকগণ তাদের চাষের অধিন বর্গা জমিকে রক্ষা করতেই জোতদারের আধিপত্য মেনে নেয়। ফলে গ্রামীণ সমাজে জোতদার শ্রেণীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই বর্গা কৃষকগণ অনেক সময় হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

গ্রামীণ জোতদারদের বিকাশের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, প্রাক্তণ জমিদারী ব্যবস্থা উচ্ছেদের সংগ্রামে তাদের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। গ্রামীণ পর্যায়ে ইংরেজ সৃষ্ট জমিদারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংঘটিত সংগ্রামের ইতিহাস দীর্ঘ দিনের। এ সংগ্রাম বিশের দশকের শেষে এসে একটি পরিণতি লাভ করে। তার পর থেকে সামাজিকভাবে গ্রামীণ জোতদারদের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে এবং পাকিস্তান আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এরা গ্রামীণ কৃষকদের নেতৃত্ব দখল করে। এ সকল কারণে গ্রামীণ জোতদার শ্রেণী ষাট দশকে এসে গ্রামীণ সমাজের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণকে প্রতিষ্ঠিত করতে তাদের গোষ্ঠীগত প্রাধান্যকে সহজেই ব্যবহার করতে পারে। গ্রামীণ সমাজের সব গোষ্ঠী প্রধান বা মাতবর জোতদার না হলেও অধিকাংশ জোতদারই ছিল মাতবর। ফলে এ মাতবরী ক্ষমতাকেও জোতদাররা তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে বিশেষভাবে কাজে লাগায়।

গ্রামীণ সমাজে ক্ষমতা প্রয়োগের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে স্থানীয় সরকারের নেতৃত্ব দখল। জোতদার হিসাবে অর্থ ব্যয়ের ক্ষমতা তাদের প্রচুর, ব্যাপক সংখ্যক প্রচারকর্মী সংগ্রহ করা তাদের জন্য সহজ, এবং গোষ্ঠীগত প্রাধান্য, মাতবরী ও প্রভাবশালী আত্মীয়-স্বজনের সাহায্যে জোতদারগণ সহজেই গ্রামীণ পর্যায়ের নির্বাচনে অন্যতম প্রার্থী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। সে কারণে জোতদারদের মধ্য থেকেই সে সময় অধিকাংশ জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হত। আইয়ূবের আমলে মৌলিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সময় ইউনিয়ন কাউন্সিলের সবচেয়ে আধিপত্য বিস্তারকারী সদস্যই অন্যান্য সদস্যের সমর্থন লাভে সমর্থ হত এবং সেই সুবাদে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এলাকার সবচেয়ে বড় জোতদার কিংবা তার সমর্থিত ব্যক্তিই চেয়ারম্যান নির্বাচিত হত।

আইয়ূব আমলে ইউনিয়ন কাউন্সিলের মেম্বার ও চেয়ারম্যানরা এমন একটি আইনানুগ কাঠামোর অধীনে ছিল যে, তাদের পক্ষে সরকারী দল ও সরকারী কর্মকান্ডকে সমর্থন না করে উপায় ছিল না। অন্যদিকে, ইউনিয়ন কাউন্সিলের অধীনে যে সকল উন্নয়নমূলক কাজ হত তার ওপর কোন সরকারী তত্ত্বাবধান ছিল না বললেই চলে। এভাবে খুব সহজ উপায়ে সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করার সুযোগ তারা পেয়ে যায়, কয়েক বছরের মধ্যে এই ইউনিয়ন কাউন্সিল মেম্বার চেয়ারম্যানগণ মোটামুটি ধনাঢ্য ব্যক্তিতে পরিণত হয়। ১৯৬৪ সালের নির্বাচনে আইয়ূবের বিজয়ের মধ্য দিয়ে কার্যত সকল মৌলিক গণতন্ত্রীই আইয়ুব সরকারের আনুগত্য মেনে নেয়। এভাবে গ্রামের জোতদার বা তাদের সমর্থকরা মিলে গ্রামীণ স্থানীয় সরকারের নেতৃত্ব দখল করে এবং একটি শক্তিশালী ক্ষমতাবলয় তৈরি করে। এরা একাধারে উৎপাদন উপায়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশের মালিক; অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে এরা ক্ষমতার প্রায় সকল উৎস নিজেরা দখল করে নেয়। ফলে এদের জোতদারী, মহাজনী কার্যকলাপ, রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি আত্মসাৎ এবং জনগণের ওপর জবরদস্তিমূলক কর্মকান্ডকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কারো ছিল না। অবশ্য কিছু রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি ও সরকারী ক্ষমতা লাভে ব্যর্থ কিছু জোতদার আইয়ুব সরকারের সমর্থক ছিল না। কিন্তু এরা শাসন-শোষণের ক্ষেত্রে অন্যদের সমগোত্রীয় ছিল। এদের কিছু বাড়তি সুযোগ ছিল। এলাকা বা গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসাবে এরা থানা প্রশাসন, রাজস্ব প্রশাসন ও অন্যান্য বিভাগের কাছ থেকে বিশেষ সুবিধা পেতো। ফলে এরা শুধু আইয়ুব সরকার সমর্থক বলে নয়, শ্রেণী হিসাবেই এরা ছিল পশ্চাৎপদ উৎপাদন পদ্ধতির ধারক ও বাহক। ওরাই ছিল

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামীণ জনসাধারণের বিকাশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাঁধাসরূপ। এ কারণে ষাট দশকে পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলে উক্ত শোষক শ্রেণীর অন্যায় অত্যাচার ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে কৃষক জনগোষ্ঠীর ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছিল।

ধনী কৃষক

প্রয়োজনের তুলনায় এদের জমির পরিমাণ ছিল বেশি। এরা নিজ খামারের অধীনে অধিকাংশ জমি চাষাবাদ করতো, কিছুটা বর্গা দিত। এদের চাষাবাদের কাজে নিয়োজিত শ্রমশক্তির প্রধান অংশ আসতো তাড়া করা শ্রম থেকে। এরা একদিকে যেমন শ্রম শোষণ করতো; অন্যদিকে আকাংখানুযায়ী অর্থকরী ফসলের দাম পেতো না। ফলে আইয়ুব সরকারের গৃহীত ব্যবস্থার প্রতি তাদের ক্ষোভের কিছু বস্তুগত কারণ ছিল। এরা আবার স্থানীয় সরকারে অংশগ্রহণ, গোষ্ঠী প্রাধান্য, মাতবরী ইত্যাদির মাধ্যমে কিছু ক্ষমতা প্রয়োগ করারও সুযোগ পেতো। অবশ্য শ্রেণীগত দিক থেকে এরা ক্ষেতমজুরদের শোষক ও ক্ষমতা প্রয়োগের অংশীদার হলেও জোতদার শ্রেণীর আধিপত্য ও বড় পুঁজির বাজারের ওপর আধিপত্য তাদের বিকাশকে বাঁধাগ্রস্ত করে। তবে শ্রেণীগতভাবে এরা পাকিস্তান রাষ্ট্র ও আইয়ুব সরকারের প্রতি কি মনোভাব পোষণ করতো বা করা সম্ভব ছিল তা পাকিস্তান রাষ্ট্রের চরিত্রের ওপর আলোচনার পরই পরিষ্কার হয়ে উঠবে। কেননা ষাট দশকে পাকিস্তান রাষ্ট্র যে সকল কর্মসূচী গ্রহণ করে, তা কোন শ্রেণীর বিকাশের জন্য কতটা অনুকুল বা প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করে তার ওপরই নির্ভর করে কোন্ শ্রেণী কি ধরনের ভূমিকা পালনের উপযোগী।

মাঝারি কৃষক

শ্রমশক্তির তুলনায় এদের ভারসাম্যমূলক পরিমাণ জমি ছিল। খরা, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় কবলিত এ ভূখন্ডে এ ধরনের কৃষক পরিবারের ভাল বা খারাপ থাকাটা নির্ভর করতো ভাগ্যের ওপর। প্রাকৃতিক দুর্যোগ না থাকলে ভালই চলতো, প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে যৎসামান্য সঞ্চয়ের ওপর হাত পড়তো। পর পর একাধিক মৌসুমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে এদের মহাজন বা জোতদারদের কাছ থেকে কঠিন শর্তে ঋণ গ্রহণ করতে হত। আকাংখা অনুযায়ী অর্থকরী ফসলের দাম না থাকার কারণে কখনই এরা বিদ্যমান সরকার ও রাষ্ট্রের প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে পারতো না। তার ওপর জোতদারদের নেতৃত্বে আইয়ুব সরকারের পক্ষে স্থানীয় ক্ষমতা বলয় সৃষ্টি হওয়ার কারণে এরা প্রায় সব সময়ই বিব্রত বোধ করত। আইয়ুব সরকারের আমলে উক্ত স্থানীয় ক্ষমতা বলয় ছাড়াও সরকারের প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠার অন্য কোন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ ছিল কিনা তা পাকিস্তান রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্র নিয়ে আলোচনা করলেইপরিষ্কার হয়ে উঠবে। তবে সংখ্যাগত দিক থেকে এরা এত বিরাট একটি শ্রেণী ছিল যে, এদের যে কোন ধরনের ভূমিকা আন্দোলনের গতিমুখকে পরিবর্তন করে দিতে পারতো।

ছোট ও প্রান্তিক কৃষক

জমির পরিমাণের স্বল্পতার কারণে এরা কখনও সচ্ছল হতে পারে না। জোতদার বা ধনী কৃষকের জমি বর্গা নিয়ে এরা পরিবারের বাড়তি শ্রমশক্তির কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করে। এরা একদিকে যেমন বর্গা শোষণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত, অন্যদিকে আকাংখানুযায়ী অর্থকরী ফসলের দাম না পাওয়ার কারণে সরকারের প্রতি থাকত অসন্তুষ্ট। ষাট দশকে এ শ্রেণীটি খুব দ্রুত তাদের ক্ষুদ্র জমিজমা হারাতে থাকে। ঘাটতি বাজেটের কারণে ভাল বছর এরা কোনক্রমে এদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে। কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বছর এদের অস্তিত্ব রক্ষায় কোন উপায় থাকত না। তারা তাদের শেষ সম্বল জমি ও হালের গরু বিক্রি করতে বাধ্য হয়। ফলে এ শ্রেণীটি যেমন একদিকে জমি বন্ধক রেখে চড়া সুদে ঋণ নিতে বাধ্য হত, তেমনই সুদসহ ঋণের টাকা ফেরৎ দেয়াও এদের পক্ষে সম্ভব হত না। তাই স্থানীয় জোতদারদের ক্ষমতা বলয়ের মূল চাপটা এদের ওপরই পড়ে। সংখ্যায় এরা একটি বিশাল শ্রেণী। এদের নিরাপত্তা ও অস্তিত্বের প্রশ্ন নিয়ে এদেরকে সংগঠিত করায় যে কোন উদ্যোগ সফল হওয়ার জন্য ষাট দশকের শেষ বছরগুলি ছিল অত্যন্ত অনুকূল। তবে এই বিশাল শ্রেণীটির ভূমিকা কি রকম হওয়া সম্ভব ছিল তা এদের সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় নীতি এবং রাজনৈতিক দলসমূহের উদ্যোগ ও কর্মসূচীর ওপর নির্ভর করছে।

ভূমিহীন ও ক্ষেতমজুর

এরাও ছিল ছোট ও প্রান্তিক কৃষকদের মত একটি বিশাল শ্রেণী। উৎপাদনের উপায় বলতে দুই একটি হালের বলদ ও কাস্তে-নিড়ানি ছাড়া কিছুই এদের ছিল না। এদের একটি অংশ জোতদারদের জমি বর্গা নিয়ে চাষাবাদ করতো, তবে এদের উৎপাদনের উপকরণ খুব কম থাকার কারণে বর্গা জমি সেভাবে পেতো না। তবুও নিজের জমিগুলি হারিয়ে যারা একমাত্র বর্গা জমির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল, ভূমিহীনদের সেই ক্ষুদ্র অংশটি গ্রামীণ সমাজের সবচেয়ে অসহায় শ্রেণী। এদের বিদ্রোহ বা প্রতিবাদ করার কোন শক্তি ছিল না, বলা চলে জোতদারদের করুণার ওপর এরা কোন রকম বেঁচে থাকতো। ভূমিহীনদের অপর অংশ ক্ষেতমজুরে পরিণত হয়েছিল। ক্ষেতমজুরদের কেউ কেউ ইতিমধ্যে শহরে রিকশা চালক কিংবা মুটে-মজুরের কাজ জুটিয়ে নিয়েছিল। দিনমজুরী কাজের খোঁজে এরা নিজের গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রাম, অন্য থানা কিংবা অন্য জেলাতে যেতে শুরু করেছিল। এদের জীবন-জীবিকা অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হলেও এরা প্রান্তিক চাষী ও বর্গা ভূমিহীনদের চেয়ে একটি সচেতন জনগোষ্ঠী ছিল। এলাকার ক্ষেত্রে জোতদার কিংবা ধনী কৃষকের বিরুদ্ধে মজুরী বৃদ্ধির আন্দোলনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে এদের কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্বের কারণ থাকলেও এলাকার বাইরে গিয়ে এ ধরনের কোন আন্দোলনে অংশ নিতে এদের কোন অসুবিধা ছিল না। অবশ্য এরা কতটা আন্দোলনে অংশ নিতে পেরেছিল তা রাজনৈতিক দলসমূহের কর্মসূচী ও পদক্ষেপের ওপর নির্ভর করেছিল। তবে ষাট দশকের শেষে এসে এই ক্ষেতমজুর শ্রেণীটি যেবস্তুগতভাবে একটি লড়াকু শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য বাস্তব অবস্থা যতই অনুকূল হোক না কেন, সচেতন শ্রেণী মেরুকরণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পদক্ষেপই মূল ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক দলসমূহের কর্মসূচী ও পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা করার সময়ই এদের ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

গ্রামীণ কুটির শিল্প

এরা সংখ্যায় একটি বিরাট জনগোষ্ঠী, শহরে শ্রমিকের চেয়ে এরা ছিল কয়েকগুণ। এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে দুইটি অংশ ছিল। একটি অংশ খুবই গতানুগতিক উৎপাদন রীতিকে তখনও আঁকড়ে ছিল এবং আধুনিক বাজার ব্যবস্থার প্রসারের কারণে তাদের উৎপাদিত পণ্যের অনেক বিকল্প ইতোমধ্যেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে তখনও কোন কিছু আত্মপ্রকাশ করেনি; যেমন কুমার বা মুচীদের উৎপাদিত মাটির তৈজসপত্র বা বাঁশ,বেত দিয়ে তৈরি জিনিষকে আধুনিক শিল্প প্রত্যক্ষভাবে আঘাত করেনি। তবে এ সকল দ্রব্যের অসংখ্য বিকল্প তৈরি হওয়ার কারণে ষাট দশকে এসব কুটির শিল্প ধ্বংসের মুখোমুখি এসে উপনীত

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছিল। কিন্তু হিন্দু জাত প্রথার কারণে এই জনগোষ্ঠী নিয়তির লিখন হিসাবে তা মেনে নিয়েছে, কোন প্রতিবাদের শক্তি তাদের মধ্যে বিকাশ লাভ করেনি। অন্যদিকে, কুটির শিল্পের অপর অংশ, বিশেষতঃ তাঁতশিল্প, আধুনিক তাঁতের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। আধুনিক তাঁতশিল্প এ গতানুগতিক তাঁতকে ধ্বংস করতে সাধারণ বাঙ্গালী পোশাককে হিন্দুয়ানী পোষাক বলে অপপ্রচারণা করতেও ছাড়েনি। হস্তচালিত এই তাঁত শিল্প দুই শত বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়েও বাঙ্গালীর বিশেষ ধরনের বস্ত্র ব্যবহার রীতির কারণে মোটা শাড়ি, গামছা আর লুঙ্গিকে কেন্দ্র করে কোন রকম টিকে ছিল। দেশ বিভাগের পর মিলে তৈরি শাড়ি, ধুতি ইত্যাদির সরবরাহে সংকট দেখা দিলে হস্তচালিত তাঁত শিল্পটি আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর বৃহৎ তাঁত শিল্প গড়ে ওঠার কারণে এই ক্ষুদ্র কুটির শিল্পটি আবার সংকটের সম্মুখীন হয়। এই শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের অধিকাংশ নিজে মালিক হলেও উপযুক্ত দামে সূতা পাওয়া এবং তা বিক্রি করার ক্ষেত্রে বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার কারণে এরা ষাট দশকের শেষ দিকে এসে বেশ সমস্যার সম্মুখিন হয়। আর সে কারণেই কুটির শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন ষাট দশকের প্রথম থেকে আনুপাতিকভাবে প্রতিবছর হ্রাস পেয়েছে। ১৯৫১ সালের শুমার থেকে দেখা যায়, ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ২৮৯ টি তাঁতী পরিবারকে ঘিরে চার লক্ষাধিক শ্রমশক্তি নিয়োজিত ছিল[৯৯] কিন্তু তার ১৬ বছর পর তথা ১৯৬৬ সালের হস্তশিল্প শুমারে দেখা যায় এদের সংখ্যা সেভাবে বাড়েনি। অর্থাৎ আধুনিক তাঁত শিল্পের বিকাশ এদের অস্তিত্বকে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত করেছে। এই জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক কোন ভূমিকা আদৌ ছিল কিনা তা শুধু রাজনৈতিক দল বা তাঁতী সমিতির কর্মসূচীর প্রতি আলোকপাত করলেই বোঝা যাবে।

বড় শিল্পপতি

গুটিকয়েক ব্যক্তির নেতৃত্বে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বিশাল পুঁজির অধিকারী একটি শ্রেণীর জন্ম হয়। এদের রাজনৈতিক ভূমিকাকে চিহ্নিত করার জন্য তাদের বিকাশ ধারাকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের চরিত্রের সাথে মিলিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। তবে ইতিপূর্বেকার আলোচনা থেকে দেখা যায়, এই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীটি পূর্ব পাকিস্তানের আধুনিক শিল্পের স্থায়ী মূলধনের প্রধান অংশের মালিক এবং উৎপাদিত পণ্যের প্রধান অংশের জোগানও এদের থেকেই এসেছে। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে মাত্র এক যুগে এদের এই বিপুল অগ্রগতির কারণ ও প্রক্রিয়াকে চিহ্নিত করতে পারলেই এদের চরিত্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

মাঝারি ও ক্ষুদে শিল্পপতি

আধুনিক প্রযুক্তির ধারক ও সীমিত মূলধনের অধিকারী এ শ্রেণীটি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে একটি বর্ধিষ্ণু শ্রেণী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। দেশ বিভাগের পর মাত্র শতকরা চার ভাগ প্রবৃদ্ধির হার নিয়ে শ্রেণীটির যাত্রা শুরু হয়। ষাট দশকের শেষে এসে এর বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৯ ভাগে উপনীত হয়। সরকার কিংবা অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের কোনরকম সাহায্য ছাড়াই মূলতঃ ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের ওপর নির্ভর করেই এদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে। আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও এদের স্থায়ী মূলধন ছিল এক লক্ষ টাকা থেকে শুরু করে ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। এই শ্রেণী সৃষ্টির সামাজিক উৎস সম্পর্কে ধারণা না থাকলে এদের ভূমিকা সম্পর্কে যথাযথ মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। এ শ্রেণী সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় নীতি বিষয়ক আলোচনাও এদের ভূমিকা চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক।

এই মাঝারি ও ক্ষুদে শিল্পপতিরা একদিকে যেমন বৃহৎ পুঁজির প্রসারে শংকিত, ঠিক তেমনি এরা বিকাশউন্মুখ। কিন্তু সরকার থেকে কোন সাহায্য না পাওয়ার কারণে তারা স্বাভাবিকভাবেই সরকারের প্রতি ক্ষুব্ধ। অন্যদিকে এদের কাজকর্ম যেমন স্বল্প পুঁজি নিয়ে, ঠিক তেমনি এদের অধীনস্থ শ্রমিক সংখ্যাও কম। ফলে আদিম রীতিতে শোষণ করতে তাদের কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। ফলে শ্রমিক স্বার্থের প্রশ্নে তাদের ভূমিকা বড় শিল্পপতিদের চেয়ে মোটেই ভাল নয়। বরং বড় শিল্পে সব কিছুরই যেমন একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ থাকে, ছোট শিল্পে তা থাকে না- ফলে সেখানে শোষণের মাত্রা থাকে অত্যধিক।

শহুরে মধ্যবিত্ত

শহুরে মধ্যবিত্তরা প্রধানতঃ কয়েকটি উপ-শ্রেণীতে বিভক্ত। এ উপ-শ্রেণীগুলি হচ্ছেঃ ১. শিক্ষিত পেশাজীবী যেমন, ডাক্তার, প্রকৌশলী, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, আইনজীবী, বিজ্ঞানী, গবেষক, সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ইত্যাদি। ২. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সাধারণ কর্মচারী ও কেরাণী। ৩. ব্যক্তি উদ্যোগে গড়ে ওঠা ক্ষুদে শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক, ব্যবসায়ী ও ঠিকাদার। ৪. অসংখ্য ছোটখাটো ব্যবসায়ী, ছোট দোকানদার, ফেরিওয়ালা ইত্যাদি।

মধ্যবিত্তদের এ সব উপ-বিভাগই মধ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তবে এদের একটি অংশ রাষ্ট্রের সহায়তায় বা রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিজের ভবিষ্যৎকে নিরাপদ করে তুলতে সক্ষম। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আইনজীবী, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মী ইত্যাদি সরাসরি কোন উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত থাকে না, অভাব অনটনের প্রাবল্যও এদের মধ্যে কম। কিন্তু এরা বেশ সচেতন ও অগ্রসর নাগরিক বিধায় তারা দেশের ভালমন্দ বিচার করতে পারে। আর তুলনামূলকভাবে স্বাধীন অবস্থানের কারণে এরা যে কোন ঘটনায় দ্রুত প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করতে পারে। অন্যদিকে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নিম্ন কর্মচারী, যেমন শিল্প-কারখানার কেরাণী ও সুপারভাইজর, সরকারী-বেসরকারী অফিসের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী প্রত্যক্ষভাবে কোন উৎপাদনের সাথে জড়িত নয়। তাদের যে বৈধ আয়ের পরিমাণ তা দিয়ে ভদ্রজনোচিত জীবন-জীবিকা নির্বাহ করা কঠিন। এরা শহুরে সমাজের একটি বিশাল জনগোষ্ঠী। অবস্থানের দিক থেকে এরা মধ্যবিত্ত হলেও, এমনকি কলকারখানায় এরা শ্রমিকদের ওপর মালিকের প্রতিনিধি হিসাবে উচ্চতম শ্রম শোষণের কাজে নিজেদের নিয়োজিত রাখা সত্ত্বেও এরা মধ্যবিত্তের জীবনাচরণের জন্য প্রয়োজনীয় কোন শর্তই পুরণ করতে পারে না। এদেরই মত স্কুল শিক্ষক, ক্ষুদে দোকানদার, দোকান কর্মচারী, আপন শ্রম-নির্ভর ফ্যাক্টরী মালিক ইত্যাদি নামমাত্র মধ্যবিত্ত হয়ে নিম্নবিত্তের জীবন যাপনে বাধ্য হয়।

মধ্যবিত্তের একটি অংশ, যারা সরকারী কর্মকর্তা, সরকারের সহযোগিতার সুযোগে পারমিট লাইসেন্সধারী বড় ব্যবসায়ী ও ঠিকাদার, এদের জীবিকার পথই এমন যে, সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ছাড়া তাদের কোন উপায় থাকে না। ফলে এরা বিদ্যমান রাষ্ট্রের ও সরকারের অনুগত থাকতে অভ্যস্ত। সংখ্যার দিক থেকে এরা অত্যন্ত ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী। যাইহোক, ষাট দশকের শেষ দিকে মধ্যবিত্তের সংখ্যাই ছিল শহুরে জনগোষ্ঠীর তিন-চতুর্থাংশ। এদের মধ্যে গুটিকয়েক সরকার ও রাষ্ট্রের অনুগত আমলা ও

[৯৯]. Government of East Pakistan (1976): Statistical Abstract for East Pakistan, Dacca: Planning Department, East Pakistan, p. 22.

Dhaka University Institutional Repository

সহযোগিতাকারী মুৎসুদ্দী পর্যায়ভুক্ত বিত্তবান ব্যক্তি ছাড়া বাকি সমগ্র জনগোষ্ঠী ছিল সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতার আওতার বাইরে। শিক্ষিত পেশাজীবীগণ মোটামুটি উন্নত জীবন যাপন করার কারণে চেতনাগতভাবে তাদের প্রভাবমুক্ত থাকার কথা। অবশিষ্ট বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী মধ্যবিত্ত হয়েও অবিরত অস্তিত্বের সংকটে নিমজ্জিত ছিল।

এই বিশাল জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন অংশের কখন কি ভূমিকা নেওয়া সম্ভব হয়েছিল তা ঘটনা দ্বারাই প্রমাণিত হবে। তবে এখানে এটুকু বলা যায়ঃ ষাট দশকের শেষে পূর্ব পাকিস্তানের শহরাঞ্চলে এমন একটি বিশাল মধ্য শ্রেণীর জন্ম হয়েছিল যারা জীবন-জীবিকার দিক থেকে নিম্নবিত্ত হয়েও উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে মধ্যবিত্তের পর্যায়ভুক্ত ছিল। যদি কোন রাজনৈতিক কর্মসূচী এই বিশাল জনগোষ্ঠীর বিকাশের আকাংখা পূরণ করতে পারবে বলে তাদের মনে প্রত্যয় জন্মাতে পারে তাহলে এ জনগোষ্ঠীকে আন্দোলনে সামিল করা কঠিন হবার কথা নয়। আর এই বিশাল মধ্যবিত্তের সন্তানরাই প্রধানত শহরের স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। জীবন-জীবিকার সংগ্রাম এ শ্রেণীভুক্ত ছাত্রকে আঘাত করবেই; অন্যান্য পেশার পরিবার থেকে আগত ছাত্র তার সচেতনতার কারণেই শিক্ষক-সাংবাদিকদের মত মধ্যবিত্তে রূপান্তরিত হয়। ফলে সমগ্র ছাত্র সমাজ মধ্যবিত্তের পর্যায়ভুক্ত; এদের প্রধান অংশ মধ্যবিত্তের জীবন সংকটের প্রতিচ্ছবিকে বহন করে। অপরাংশ আপন সচেতনতা দিয়ে মধ্যবিত্তের চরিত্র অর্জন করে। এরা জানে তাদের কৃষক পিতার কষ্ট, জানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিকূল পরিস্থিতির কথা। যে কোন সমাজের যে কোন শ্রেণী বা উপ-শ্রেণীর বিকাশের জন্যও যে দেশের সামগ্রিক উন্নতি প্রয়োজন এ কথাও তাদের অজ্ঞাত নয়। এ কারণেই ছাত্রদের চেতনার মান সাধারণতঃ উন্নত। সে যা হোক, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত উচ্চ শিক্ষাঙ্গন ভিত্তিক ছাত্র মধ্যবিত্তেরাই ছিল ষাট দশকের শেষদিকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কেন্দ্র বিন্দু। তবে এরা মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশের ধারাকে কতটা সফলভাবে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে পেরেছে এবং তা তুলে ধরতে কিভাবে সরকার ও রাষ্ট্র কর্তৃক বাঁধাপ্রাপ্ত হয়েছে- এসব মিলিয়েই মধ্যবিত্ত সমাজের বিভিন্ন অংশের ভূমিকা নির্দিষ্ট হতে পারে।

শহুরে শ্রমিকশ্রেণী

শ্রমিকশ্রেণীর প্রধান অংশ কারখানা শ্রমিক। এরা সদ্য বিকাশমান একটি জনগোষ্ঠী। প্রত্যক্ষভাবে এরা শ্রমের সাথে যুক্ত ছিল সন্দেহ নেই, তবে এরা যে শ্রেণীতে অবস্থান করতো সেই শ্রেণীর নিজস্ব সমস্যার কতটুকু তাদেরকে সরকার-বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে সহায়তা করেছিল তা চিহ্নিত করা প্রয়োজন। সেই সাথে অন্যান্য শ্রেণীর ওপর অন্যায় অত্যাচার কিংবা সহযোগিতার প্রতিক্রিয়া কিভাবে শ্রমিকশ্রেণীর ওপর পড়েছিল তাও যাচাই করা প্রয়োজন। শ্রমিকশ্রেণী বিভিন্ন ইস্যুতে ষাটের দশকে যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল, সেদিকে লক্ষ্য করলেই শ্রমিকশ্রেণীর ইচ্ছা ও প্রবণতা সম্পর্কে ধারণা করা যাবে। তবে কারখানা শ্রমিকগণ যে পরিবর্তনকামী শ্রেণী হিসাবে একটি অত্যন্ত বলিষ্ঠ শ্রেণী ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের উৎপাদন পদ্ধতিকে পর্যালোচনা করে উপরোক্ত যে সব শ্রেণী চিহ্নিত করা হল, এগুলি শুধু মাত্র তাদের অস্তিত্বেরই স্বীকৃতি। বিভিন্ন শ্রেণীর স্ব স্ব স্বার্থ ও চিন্তা-ভাবনার স্বরূপ সম্পর্কে কোন নির্দেশনাই এখানে দেয়া যায়নি এবং সে চেষ্টাও এখানে করা হয়নি। উপরোক্ত আলোচনা থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর আয়তন বা সংখ্যাগত যে ধারণা পাওয়া যায় তা মনে রেখে পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিভিন্ন পদক্ষেপকে যখন বিচার করা হবে, কিংবা তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ও ভূমিকাকে বিচার করা হবে তখন বিভিন্ন শ্রেণী বা সামাজিক শক্তি কি ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারে তা পরিষ্কার হয়ে উঠবে। সে আলোচনার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠবে বিভিন্ন সামাজিক বর্গের মধ্যে কোন্ বর্গটি বা কোন্ শ্রেণীটি বিদ্যমান রাষ্ট্র কিংবা সরকার-বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম। কেননা ইতিপূর্বেকার তত্ত্বগত আলোচনা থেকে দেখা গেছে, যে শ্রেণীটির জন্য পরিবর্তন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সেই যে নেতৃত্ব দেবে তা ঠিক নয়; বরং যে শ্রেণীটি পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি সচেতন এবং উদগ্রীব সেইই নেতা হিসাবে বেরিয়ে আসে। আর ব্যক্তি হিসাবে কে সামনে থাকলো তা মোটেই নির্ধারক বিষয় নয়, বরং যে শ্রেণীর মুখপাত্র হয়ে সে কাজ করছে সেই শ্রেণীটির নেতৃত্বই আন্দোলনে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করা হবে এবং তার মধ্য দিয়ে এই নির্দিষ্ট প্রকৃতির রাষ্ট্র পূর্ব পাকিস্তানের সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতির ওপর যে সুগভীর ছাপ ফেলেছিল তা সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৬. পাকিস্তান রাষ্ট্রের চরিত্রঃ ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮

৬.১. পটভুমি

গবেষণাধীন বিষয়ের তাত্ত্বিক আলোচনায় দেখা গেছে যে, রাষ্ট্রের থাকে প্রধান দুটি উপাদানঃ এক, আইন প্রণয়ন বা নীতি নির্ধারণী বিভাগ এবং দুই, নীতিসমূহকে কার্যকরীকরণের বিভাগ। সহজ কথায় একটি রাজনৈতিক বিভাগ এবং অন্যটি প্রশাসনিক বিভাগ। তাই পাকিস্তান রাষ্ট্রকে বিচার করতে হলে তার রাজনৈতিক বিভাগের উত্তরণের ইতিহাসকে যেমন বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন, তেমনি প্রশাসনিক বিভাগ তথা আমলাতন্ত্রের উত্থান ও বিকাশ নিয়েও আলোচনা করা আবশ্যক।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাজনৈতিক উপাদানকে চিহ্নিত করা কিংবা তাকে বিচার করতে হলে পাকিস্তানের জন্মলগ্নে যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটি দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করে সেই রাজনৈতিক দল ও তার নেতৃত্বের চরিত্র যেমন আলোচনা করা প্রয়োজন, তেমনি যে সাংবিধানিক ক্ষমতা নিয়ে এ নেতৃত্ব ক্ষমতা গ্রহণ করলো সেগুলিকেও খতিয়ে দেখা আবশ্যক। কেননা যে উত্তরাধিকার নিয়ে নতুন একটি রাষ্ট্রের জন্ম, সে উত্তরাধিকার রাষ্ট্রের পরবর্তী বিকাশের পর্যায়গুলিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে।

পাকিস্তান রাষ্ট্রটি জন্মের পর পাকিস্তান মুসলিম লীগ শুধু এ রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব তারই গ্রহণ করেনি, তার প্রধান নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ব্যক্তিগতভাবে নতুন রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন। এখন দেখা যাক, পাকিস্তান মুসলিম লীগ, একটি রাজনৈতিক দল হিসাবে কি চরিত্রের দল ছিল এবং তার নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ কি চরিত্রের নেতা ছিলেন।

ইসলামী বিশ্বের সমসাময়িক ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এ সকল দেশের নেতৃবৃন্দ ধর্মের প্রতি তত অনুরাগী নন, কিন্তু তাঁরা রাজনৈতিকভাবে কিংবা সামরিক দিক দিয়ে বিশেষ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন– এটাই ব্যাপক গণমানুষের পক্ষ থেকে তাদেরকে সমর্থন করার মূল কারণ। মোহাম্মদে আলী জিন্নাহ্ ছিলেন এমনই একজন সফল নেতা, যিনি রুচি ও আচার–আচরণে পরিপূর্ণভাবে একজন পাশ্চাত্যপন্থী মানুষ ছিলেন এবং তিনি কোন দিনই দাবি করেননি যে তিনি একজন ধর্মীয় নেতা কিংবা একজন ধর্মানুরাগী মানুষ। অথচ তিনিই ভারতবর্ষের কোটি কোটি মুসলমানের কাছে একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতায় পরিণত হয়েছিলেন।[১] সন্দেহ নেই, জিন্নাহ্ ছিলেন একজন অত্যন্ত মেধাবী ও ধনী আইনজীবী; তাঁর নিজ যোগ্যতা গুণেই তিনি যেমন, খোজা ও বোহরাদের মত ভারতবর্ষের প্রায় সকল মুসলিম ধনাঢ্য গোষ্ঠীর সমর্থন লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত সংবিধান বিশেষজ্ঞ, তাঁর সমকালীন সংসদীয় সরকারের সংসদে সম্ভবত তিনিই বিভিন্ন কুশলী বক্তৃতায় সবচেয়ে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনিই আবার সংবিধানকে এবং পরবর্তীকালে পাকিস্তান সরকারকে নিজের কর্তৃত্বের অধীনস্ত করেছিলেন। আর এ কর্মকান্ডে যা' তাকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছিল তা হচ্ছে মুসলিম লীগের গঠনতন্ত্র।[২]

১৯৪০ সালের কাউন্সিল থেকে মুসলিম লীগের সকল ক্ষমতা সভাপতির হাতে কুক্ষিগত করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। ১৯৪৪ সালের কাউন্সিলে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বকে কাজে লাগিয়ে সে প্রচেষ্টাকে সফল করে তোলেন। মুসলিম লীগের ১৯৪৪ সালের কাউন্সিলে সংযোজিত ৩৩ নং ধারায় বলা হয়ঃ

"The President shall be the principal head of the whole organization, shall exercise all the power inherent in his office and be responsible to see that all the authorities work in consonance with the constitution and rules of the All India Muslim League."[৩]

অন্যদিকে, সভাপতির নির্বাচন পদ্ধতিটিও এমন ছিল যে, মুসলিম লীগের সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্য তাঁদের ইচ্ছামত যে কোন ব্যক্তিকে সভাপতি নির্বাচন করতে পারতো না। কেননা, সভাপতি নির্বাচনের দায়িত্ব ছিল বিভিন্ন প্রাদেশিক কমিটিগুলির মনোনীত প্রতিনিধিদের ওপর। মুসলিম লীগের অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি কার্যকরী কমিটি ছিল। এ কমিটির সদস্য মনোনীত করতেন সভাপতি নিজে, আর এ কার্যকরী কমিটির হাতে এমন সব সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল যার বলে এ কমিটি ইচ্ছা করলেই যে কোন প্রাদেশিক কমিটিকে বাতিল করতে পারতো, ভেঙ্গে দিতে পারতো এবং সম্পর্কচ্ছেদ করতে পারতো। এর জন্য প্রাদেশিক কমিটির বা অন্য কারো কাছে জবাবদিহি করার প্রয়োজন ছিল না। ফলে প্রাদেশিক কমিটি দ্বারা মনোনীত প্রতিনিধিদের পক্ষে কার্যকরী কমিটির ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিকে সভাপতি নির্বাচন করা সম্ভব ছিল না। ১৯৪০ সালের কাউন্সিলেই কার্যকরী কমিটি এই ব্যাপক ক্ষমতা পায়, আর ১৯৪৪ সালের কাউন্সিলে কার্যকরী কমিটির সদস্যদের ওপর সভাপতির চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে খালিদ বিন সাইয়িদ লিখেছেনঃ

The working committee was a creature of the president in the sense that its members were nominated by the President each year at the time of the annual session from amongst the members of the council.[৪]

১৯৪২ সালের কাউন্সিলের মধ্যদিয়ে কার্যকরী কমিটি এত অধিক ক্ষমতা অর্জন করে যে, পরবর্তী কাউন্সিলের অনুমোদন সাপেক্ষে যে কোন ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারত।[৫] আর এ কার্যকরী কমিটির আয়তন ছিল খুবই ক্ষুদ্র। ১৯৪৫–৪৭ কাল পর্বে কার্যকরী কমিটির সদস্য ছিল মাত্র ২১ জন। এদের মধ্যে যুক্তপ্রদেশের ছিল ৪ জন, পাঞ্জাব ও বাংলার সদস্য ছিল ৩ জন করে; উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বিহার এবং আসামের সদস্য ছিল ২ জন করে; বেলুচিস্তান, সিন্ধু, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশের সদস্য ছিল মাত্র ১ জন করে। এ ছাড়া পুরোনো কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসাবে যথাক্রমে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ও লিয়াকত আলী খানও ছিলেন কার্যকরী কমিটির সদস্য।[৬] এই কার্যকরী কমিটির সর্বমোট ২৩ জন সদস্যের মধ্যে মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ প্রদেশের সদস্য ছিল মাত্র ১০ জন এবং বাকী ১৩ জন সদস্যই এসেছিল মুসলিম সংখ্যা লঘু প্রদেশগুলি থেকে। মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশসমূহের সদস্যদের

---

১. Sayeed, Khalid B. (1968): Pakistan: The Formative Phase 1857-1948. London: Oxford University Press. p. 184.

২. *Ibid*, p. 185.

৩. Quoted in Sayeed, Ibid, p.185.

৪. Ibid, p. 186.

৫. Ibid, p. 186.

৬. Ibid, pp. 188-89.

Dhaka University Institutional Repository

প্রাধান্য শুধুমাত্র কার্যকরী কমিটিতেই ছিল না, সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিল সদস্যদের মধ্যেও ছিল। ১৯৪২ সালের কাউন্সিল সদস্যদের হিসেব থেকে দেখা যায়, মোট ৫০৩ জন কাউন্সিল সদস্যের মধ্যে মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশসমূহের সদস্যই ছিল ২৪৫ জন।[৭] অর্থাৎ মুসলিম লীগের সভাপতি হিসাবে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র পক্ষে নিজের ইচ্ছাকে দলের ওপর চাপিয়ে দেওয়া কিংবা নিজের সিদ্ধান্তকে দলের সিদ্ধান্ত হিসাবে চালিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধা ছিল না। কেননা একদিকে কার্যকরী কমিটি নিজ মনোনীত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল, অন্যদিকে সংখ্যালঘু প্রদেশগুলি থেকে যাঁরা কাউন্সিল সদস্য হতেন তাঁদের এক বড় অংশ সংগঠনের উপরস্থ নেতৃত্বের কাছে অনুগত থাকতেন। ফলে অবশিষ্ট সদস্যদের মধ্য থেকে একাংশের সমর্থন পেলেই তাঁরা আপন কৃতকর্মের সব কিছুই কাউন্সিল দ্বারা অনুমোদন করে নিতে পারতেন।

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট যখন পাকিস্তান নামে একটি নতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয় তখন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ছিলেন মুসলিম লীগের সভাপতি। ব্যক্তিত্ব হিসাবেও মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে এমন কোন নেতা সে সময় ছিলেন না যিনি জিন্নাহ্‌র কোন কাজে বাধা দিতে পারতেন। তাছাড়া, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ বৃটিশ সরকার কর্তৃক পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল মনোনীত হলেন। জিন্নাহ্‌র গভর্ণর জেনারেল পদে নিযুক্তি পত্রে এমন কতকগুলি অধিকার প্রদান করা হল যেসবের মাধ্যমে পাকিস্তানের সর্বময় কর্তৃত্ব জিন্নাহ্‌র করায়ত্ত হল। জিন্নাহ্‌কে গভর্ণর জেনারেল হিসাবে নিযুক্তি পত্রে যেসব অধিকার প্রদান করা হয় সেসবের মধ্যে কয়েকটি ধারাকে উদ্ধৃত করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠবে। ষষ্ঠজর্জের নামে বৃটিশ সরকারের দেওয়া এ নিযুক্তি পত্রে বলা হয়ঃ

" I. We do by this our commission under our sign Manual appoint you, the said Muhammad Ali Jinnah, to be, during our pleasure, Governor General of Pakistan with all the powers, rights, privileges, and advantages to said office belonging or appertaining.

II. And we do hereby authorize, empower and command you to exercise and perform all and singular the powers and duties conferred and imposed upon our Governor General of Pakistan by and under provisions of the Act passed in this the tenth and eleventh year of our reign intituled the Indian Independance Act 1947.

..... VI. And we do hereby further authorize and require you by yourself or by any other person to be appointed by you in that behalf to administer to every person appointed by you to be a Chief Commissioner the Oaths of Allegience and Office and of Secretary here to appended......"[৮]

অর্থাৎ ১৯৩৫ সালের ভারত সরকারের আইন অনুযায়ী ভারতের গভর্ণর জেনারেলকে যে সকল ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল তাঁর সব কিছুই পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেলকে দেওয়া হল। উপরন্তু, সে সময় পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেলকে নিয়োগ করার ব্যাপারে যেমন বৃটিশ সরকারের হাত ছিল, তেমনই তাকে পদচ্যুত করার ক্ষমতাও বৃটিশ সরকারের ছিল। কেননা, গভর্ণর জেনারেলকে নিযুক্তির ক্ষেত্রে গণপ্রতিনিধিদের অধিকার প্রয়োগের কোন সুযোগ রাখা হয়নি। ফলে আগে বৃটিশ ভারতের গভর্ণর জেনারেলকে বৃটিশ সরকারের অধীনে থেকেই যে কোন কাজ করতে হত। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় গভর্ণর জেনারেলকে নিয়োগ করার ক্ষেত্রে বৃটিশ সরকারের হাত থাকলেও তাকে অপসারণ কিংবা তাকে পরিচালনা বা পরামর্শ প্রদানের কোন সুযোগ আর থাকেনি। শুধু তাই নয়, বৃটিশ ভারতে প্রাদেশিক গভর্ণর নিয়োগের দায়িত্ব ছিল বৃটিশ সরকারের ওপর। কিন্তু ১৯৪৭ সালের পর প্রাদেশিক গভর্ণর নিয়োগ সহ সকল ধরনের নিয়োগের অধিকার এসে গেলো গভর্ণর জেনারেলের হাতে। উপরন্তু এর আগে শাসন কার্য ঠিকমত পরিচালিত হচ্ছে কিনা বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে দেখা শুনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য একজন সচিব নিযুক্ত করা হত। এবং তিনিই মূলতঃ সমগ্র বৃটিশ ভারতের প্রশাসনকে পরিচালনার মূল দায়িত্ব পালন করতেন কিন্তু ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়ে যাবার পর সে পদটির বিলুপ্তি ঘটলো।[৯] ভারত সংক্রান্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন কিংবা কোন নির্দেশ প্রদানের দায়িত্ব আর বৃটিশ পার্লামেন্টের থাকলো না, দায়িত্ব এসে পড়লো ভারত বা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের ওপর। অবশ্য, আইন পরিষদের ওপর আইন প্রণয়নের দায়িত্ব থাকলেও দেশ বিভাগের সময় গভর্ণর জেনারেলকে পরামর্শ দেওয়ার কোন অধিকার পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ অর্জন করলো না, বরং গভর্ণর জেনারেল ইচ্ছা করলে পার্লামেন্টকে ভেঙ্গে দিতে পারতেন। এর জন্য তাকে কারো কাছে জবাব দিহি করার প্রয়োজন ছিল না-তাঁর ব্যক্তিগত বিবেচনা বা ইচ্ছা অনুযায়ীই তিনি এ কাজ করতে পারতেন। এমনকি, গভর্ণর জেনারেল ইচ্ছা করলে প্রয়োজনে ১৯৩৫ সালের কোন ধারাকেও সংশোধন, পরিবর্তন কিংবা সংযোজন করার অধিকার লাভ করেন।[১০] সাধারণভাবে কথা ছিল, দেশে যতদিন একটি নতুন সংবিধান রচিত না হবে, ততদিন ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইন অনুযায়ীই দেশ পরিচালিত হবে। ১৯৩৫ সালের আইনে কিছু কিছু গণতান্ত্রিক ধারা ছিল। যেমন নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ছিল। প্রাদেশিক গভর্ণর কিংবা কেন্দ্রীয় গভর্ণর জেনারেল স্ব স্ব পার্লামেন্টের অনুমতি সাপেক্ষেই সমস্ত কাজ পরিচালনা করতেন, এ নীতি মেনে না চললে বৃটিশ সরকার কর্তৃক পদচ্যুত হওয়ার ভয় ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর কেন্দ্রীয় গভর্ণর জেনারেলকে পদচ্যুত করার অধিকার কারো ছিল না বলেই তাঁর ক্ষমতার পরিধি হয়ে পড়ে সীমাহীন। দেশ বিভাগের পর থেকেই এ সীমাহীন ক্ষমতার বহিঃ প্রকাশ ঘটতে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, ১৯৩৫ সালের আইন অনুযায়ীই, গভর্ণর জেনারেল ইচ্ছা করলে জরুরী আইন ঘোষণা করে পার্লামেন্ট ও সংবিধানকে বাতিল বা স্থগিত ঘোষণা করতে পারতেন-তাঁর জন্য তাকে পার্লামেন্টের কাছে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন ছিল না- পার্লামেন্ট বসতে পারুক অথবা না পারুক তার জন্য গভর্ণর জেনারেলকে অপেক্ষা করতে হত না। ১৯৩৫ সালের আইনের ৯৩ নং ধারামতে জরুরী আইন সংক্রান্ত বিধিটি সন্নিবেশিত হয়। কিন্তু এ ধারাকে সংক্ষিপ্তভাবে বিবরণ দিতে গিয়ে Alen Gledhill বলেনঃ

" The Governor General could legislate by ordinance in emergencies. Whether the Assembly was sitting or not, and there was no time limit for the validity of such legislation."[১১]

---

৭. *Ibid*, p. 206.

৮ COMMISSION OF MUHAMMAD ALI JINNAH, in Sayeed, Khalid B. (1468), op.cit, Appendix II. 306-7.

৯ Gledhill, Alen (1957): Pakistan: The Development of its Laws and Constitution. London: Stevens of sons Ltd, p. 64.

১০ Ibid, p. 64.

১১ Ibid, p. 65.

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু এ অধিকার থাকলেও যে কোন প্রদেশের আইন-শৃংখলাবিরোধী কোন তৎপরতাকে দমন করার জন্য এ আইনটি যথেষ্ট ছিল না। কেননা, প্রাদেশিক পার্লামেন্টকে ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য কিংবা শুধু মাত্র একটি বা দুটি প্রদেশে জরুরী আইন প্রয়োগ করার কোন সহজ পথ ছিল না। কেননা তখন জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে হলে সারা দেশব্যাপী জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে হত, যা অনুগত প্রদেশগুলিকেও ক্ষেপিয়ে দিতে পারতো। ফলে প্রয়োজনে যাতে শুধুমাত্র একটি প্রদেশেও জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা যায় সে লক্ষ্যে জাতীয় নিরাপত্তার নামে ১৯৩৫ সালের আইনকে সংশোধন করে ৯২ ক ধারা সংযোজক করা হয়। এ সম্পর্কে Gledhill বলেছেন,

"Though Section 93 had been struck out of the act when independence came, Section 92 A was inserted in 1948. This empowered the Governor-General to direct a governor to assume, on his behalf, the government of a province, if the security of Pakistan was endangered, or if the provincial constitution could not be worked.[১২]

নতুন সংবিধান তৈরীর পূর্ব পর্যন্ত পাকিস্তানের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন একমাত্র পদাধিকারী ব্যক্তি গভর্ণর জেনারেল। অবশ্য ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে পার্থক্যের কারণে এ পদাধিকারীদের মধ্যে ক্ষমতা প্রয়োগের প্রকৃতিতে কিছু পরিবর্তন হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত নতুন সংবিধান এসে গভর্ণর জেনারেলের পদ বিলুপ্ত হয়নি ততদিন পর্যন্ত এ পদাধিকারীই ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের একমাত্র প্রতিনিধি। তিনি ইচ্ছা করলে যে কোন পদাধিকারীকে পদচ্যুত করতে পারতেন, নতুন নিয়োগ দিতে পারতেন, যে কোন ব্যক্তির পদোন্নতি ঘটাতে পারতেন। ফলে এই গভর্ণর জেনারেলদের গড়িমসি, খামখেয়ালী বা অনিচ্ছার কারণে একদিকে যেমন পাকিস্তানের নতুন সংবিধান তৈরী হতে নয় বছর লেগে যায়, তেমননি গভর্ণর জেনারেল হিসাবে যিনি পদাধিকারী ছিলেন তাঁর ক্ষমতার সমপর্যায়ের ক্ষমতা ধারণ করতে সক্ষম এমন একটি পদ নতুন সংবিধানে রাখা হয়। যদিও প্রেসিডেন্ট পদাধিকারীকে জাতীয় পার্লামেন্টের পুর্ণাঙ্গ অধিবেশনে অনুমোদিত হতে হয় কিন্তু একবার নির্বাচিত হয়ে গেলে তাকে আর পদচ্যুত করা সম্ভব হয় নি। কেননা তাকে পদচ্যুত করার জন্য সংবিধানে এমন এক জটিল প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে যাতে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে তাকে সরানো প্রায় অসম্ভব।[১৩] শুধু তাই নয়, প্রেসিডেন্ট প্রয়োজনে পার্লামেন্টকেই ভেঙ্গে দেওয়ার অধিকার পেয়ে যান। পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেওয়ার পর পরবর্তী সংসদ নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত প্রেসিডেন্টের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করার মত কোন সংস্থার আর অস্তিত্ব ছিলনা। এ পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট একাই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে পড়েন। তিনি জরুরী আইন ঘোষণা করতে পারেন যা ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইনের ৯৩ ধারা বা সংযোজিত ৯২ক ধারা প্রদত্ত গভর্ণর জেনারেলের ক্ষমতার অনুরূপ। শুধু তাই নয়, তিনি সংবিধানকে স্থগিত কিংবা তাতে নতুন নতুন ধারা সংযোজনও করতে পারেন।[১৪] ১৯৫৬ সালের সংবিধানে প্রেসিডেন্টের এই বিপুল ক্ষমতা সংরক্ষণ করার কারণেই মেজর জেনারেল (অব) ইসকান্দার মির্জার পক্ষে সামরিক আইন ঘোষণা করে পার্লামেন্টকে ভেঙ্গে দেওয়া সম্ভব হয়। আর পার্লামেন্ট বিহীন অবস্থাটিই জেনারেল আইয়ুবের ক্ষমতা গ্রহণের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়।

উপরে ১৯৪৭ সাল থেকে শুরু করে ১৯৫৮ সালের আইয়ুবের ক্ষমতা দখল পর্যন্ত অগণতান্ত্রিক ও ব্যক্তিতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য যেসব সাংবিধানিক ক্রটির কথা আলোচনা করা হয়েছে- সেসবের মধ্য দিয়ে গভর্ণর জেনারেল বা প্রেসিডেন্ট কিভাবে ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে পারতেন সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেল। কিন্তু এ ধরনের সাংবিধানিক ক্রটি থাকা সত্বেও পৃথিবীর সব দেশে এভাবে একক কোন ব্যক্তির কাছে ক্ষমতা কুক্ষিগত হয় না। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত একই সাংবিধানিক ঐতিহ্য নিয়ে ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা পেয়েছিল। কিন্তু সেখানে কখনও একক কোন ব্যক্তির কাছে ক্ষমতা কুক্ষিগত হয়নি বা অসাংবিধানিক কোন সরকারও সেখানে আসেনি। সেখানে নতুন সংবিধান রচিত হতেও এত দীর্ঘ দিন লাগেনি। কিন্তু পাকিস্তানে কেন এমনটা ঘটলো এটাই এখানে বিশেষভাবে বিবেচ্য।

---

১২ Ibid, p. 65.

১৩ ১৯৫৬ সালের সংবিধানের তৃতীয় খন্ডের ১ নং অধ্যায়ে প্রেসিডেন্টের নির্বাচন এবং তার ক্ষমতা ও অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত ধারা সমূহকে উল্লেখ করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের ১৩ নং ধারাতে প্রেসিডেন্টের প্রতি অনাস্থা করতে হলে বা তাকে পদচ্যুত করতে হলে যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করা প্রয়োজন পড়তো তা লিপিবদ্ধ হয়েছিল। এ ধারায় বিভিন্ন উপধারা থেকে দেখা যায়, প্রেসিডেন্টের প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব আনতে হলে সে প্রস্তাবের সপক্ষে মোট পার্লামেন্ট সদস্যের এক তৃতীয়াংশ সদস্যের সই লাগতো, কম পক্ষে তিন চতুর্থাংশ সদস্যের সমর্থন পেলেই শুধু মাত্র সে বিল পাস হতো এবং যদি সে বিলের সপক্ষে মোট সদস্য সংখ্যার অর্ধেকের চেয়ে কম সদস্য তাতে সমর্থন করতো তাহলে প্রস্তাব উত্থাপনকারী সদস্যদের পার্লামেন্ট সদস্যপদ বাতিল বলে গণ্য হতো। ১৩ নং ধারার কয়েকটি উপধারা এখানে উদ্ধৃত করা হলোঃ

1. Not less than one third of the total number of the members of the National Assembly may give written notice signed by each of them to the Speaker of the Assembly that they intend to move a resolution in the Assembly for the removal of the President from office on a charge that he has wilfully violated this constitution or has been guilty of gross misconduct.........
6. If, after consideration by the National Assembly of the resolution, it is passed by the Assembly by the votes of not less than three-quarters of the total number of members of the Assembly, the President shall forthwith holding public office for a period of ten years from the passing of the resolution.
7. If less than one half of the total number of members of the National Assembly vote in support of the resolution, the members who gave notice of the resolution to the speaker of the Assembly shall cease to be members of the Assembly forthwith after the result of the voting on the resolution is declared."

Cited in Vorys, Karl Von (1965): Political Development in Pakistan, Princeton: Princeton University Press, Appendices B. The Constitution of the Republic of Pakistan (extracts), pp. 307-333.

১৪ ১৯৫৬ সালের সংবিধানের তৃতীয় খন্ডের ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৯ ও ৩০ নং ধারায় বিভিন্ন উপধারায় মধ্যে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা ও অধিকার সম্পর্কে বর্ণণা করা হয়েছে। ২৩ নং ধারায় ১ উপধারাতে বলা হয়েছে- Subject to this Article, the President may at any time dissolve the National Assembly.

৩০ নং ধারাতে বলা হয়েছে-

"1. If the President is satisfied that a grave emergency exists........the President may issue a Proclamation of Emergency.

4. If, at a time when a proclamation of Emergency is in force (whether or not National Assembly stands (whether or not the National Assembly stands dissolved or is in session at that time), the President is satisfied that immidiate legislation is necessary to assist in meeting the imergency that gave rise to the issue of the Proclamation, he may, subject to this Article, make and promulgate such Ordinances as appear to him to be necessary to meet the emergency, and any such ordinance shall, subject to this Article, have the same force of law as an Act of the Central Legislature.
6. The National Assembly shall have no power to disapprove of the ordinance but if, before the ordinance ceases to have effect, the National Assembly, by resolution, approves of the ordinance, the Ordinance shall be deemed to have become an Act of the Central Leglisature." *Ibid*, pp. 311-316. অর্থাৎ প্রেসিডেন্টের জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার অধিকার ছিল, এই সংসদ বিহীন অবস্থায় কিংবা তার আগেই জরুরী আইন ঘোষণা করার অধিকার ছিল এবং জরুরী আইনের আওতায় নতুন নতুন অর্ডিন্যান্স জারি করার অধিকার ছিল। অন্যদিকে সংসদের এ অর্ডিন্যান্স গুলিকে বাতিল করার কোন অধিকার ছিল না, বরং এগুলি আইনে পরিণত হত।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বেকার অধ্যায়গুলিতে তাত্ত্বিক আলোচনায় লক্ষ্য করা গেছে, রাষ্ট্র সমাজে প্রভুত্বকারী শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহের পক্ষে অবদমিত শ্রেণীসমূহের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মুখ্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে থাকে। পুঁজিবাদী সমাজে রাষ্ট্র বুর্জোয়া শ্রেণীর শ্রেণীআধিপত্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে কাজ করে। আর উপনিবেশোত্তর দেশসমূহে রাষ্ট্র একক কোন্ শ্রেণীর পক্ষে কাজ না করলেও অবনত শ্রেণীসমূহের ওপর রাষ্ট্রের চূড়ান্ত আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে উপনিবেশোত্তর সমাজে রাষ্ট্র কোন শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহের স্বার্থকে রক্ষা করবে তা নির্ভর করে সে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী বা বর্গের বিকাশের স্তর ও প্রকৃতির ওপর। দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্রের থাকে দুটি বিভাগ। একটি বিভাগের দায়িত্ব থাকে আইন প্রণয়ন করা এবং অন্য বিভাগের দায়িত্ব থাকে তা কার্যকরী করা। সমাজ বিকাশের স্তর অনুযায়ীই আইন প্রণয়নের এ বিভাগটি কাদের নিয়ে গঠিত হবে তা নির্ভর করে। তৃতীয়তঃ রাষ্ট্রের চরিত্র অনুযায়ীই বিভিন্ন সমাজের শ্রেণীসমূহ রাষ্ট্রের সাথে নির্দিষ্ট সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়। যে কোন শ্রেণী তার বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থের সাথে সঙ্গতি রেখে রাষ্ট্রের সাথে নির্দিষ্ট সম্পর্ক গড়ে তোলে। তবে সব সময় রাষ্ট্রের সাথে শ্রেণীসমূহ তাঁদের নিজস্ব স্বার্থের সাথে সঙ্গতি রেখে সম্পর্ক তৈরী করতে পারেনা। কেননা, শ্রেণীর বিকাশের স্তর তথা তাঁর সংখ্যাগত বৃদ্ধি ও সচেতনতার ওপর তা নির্ভর করে। অন্যদিকে, সমাজের প্রভুত্বকারী শ্রেণীটি অন্য যে প্রধান শ্রেণীটির ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রক্ষমতাকে ব্যবহার করে-তার বাইরেও থাকে অনেকগুলি সামাজিক স্তর। এমধ্যবর্তী স্তরগুলিও তাঁদের শ্রেণীস্বার্থের নিরিখে রাষ্ট্রের সাথে নির্দিষ্ট সম্পর্ক গড়ে তোলে। যেমন পুঁজিবাদী সমাজে বিশাল মধ্যবিত্ত শ্রেণীটি অখন্ড কোন শ্রেণী নয়। এর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বুর্জোয়া সমাজ থেকে বিপুল পরিমাণে সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে কিংবা তার বিকাশের জন্য অনেকগুলি পথ পেয়ে যায়- ফলে এরা বুর্জোয়া সমাজ ও রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য বুর্জোয়া রাষ্ট্রের পক্ষে দাঁড়ায়, কিন্তু এ শ্রেণীর প্রধান অংশ উৎপাদন সম্পর্কের দিক থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্তরে থাকলেও তার বৈষয়িক অবস্থা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সুযোগ সুবিধা বা রাজনৈতিক অধিকার ইত্যাদি প্রশ্নে বুর্জোয়া রাষ্ট্র এদেরকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। বরং উৎপাদন সম্পর্কের বিবেচনায় এরা মধ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হলেও ক্রমাগত শ্রমিক শ্রেণীর সাথে এদের পার্থক্য করার মত যুক্তি সংগত সূচক ব্যবহার করা যায় না। ফলে, বর্তমানের বুর্জোয়া সমাজভূক্ত জনসাধারণের প্রধান অংশ মধ্য শ্রেণীর মত উৎপাদন সম্পর্কের সাথে সম্পর্কিত থাকলেও তারা প্রধান দুটি পক্ষে বিভক্ত হয়ে যায়। তবে তার রাজনৈতিক প্রকাশ কোথায় কিভাবে হবে তা নির্ভর করে প্রধানতঃ নীচের স্তরের সামাজিক শ্রেণীসমূহের শ্রেণী সচেতনতা ও সংগঠনশীলতার ওপর। উপনিবেশোত্তর সমাজেও এ ধরনের বেশ কিছু মধ্যবর্তী স্তরের সামাজিক বর্গ থাকে এবং তারা নিজ নিজ শ্রেণী স্বার্থ ও শ্রেণী সচেতনতার ভিত্তিতে একেকটি পক্ষকে সমর্থন করে কিংবা নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করে।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র বিশ্লেষণ করতে হলে পাকিস্তানের অধীনস্ত বিভিন্ন সমাজের শ্রেণীসমূহ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। ইতিপূর্বের দুটি অধ্যায়ে তথা পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের উৎপাদন পদ্ধতি সংক্রান্ত আলোচনায় দুটি অঞ্চলের সমাজ দেহে যে বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল তাঁদের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে সেখানে আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনা থেকে দেখা যায়ঃ ১৯৪৭ সালে যখন পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল তখন পাকিস্তানের উভয় অংশ মিলে খুবই ক্ষুদ্র একটি শিল্পপতি শ্রেণী ছিল। কিন্তু সেগুলির প্রধান অংশ ছিল হিন্দু, শিখ ও জৈন মাড়োয়ারীদের নিয়ে গঠিত। দেশ বিভাগের অপরিহার্য ফল হিসাবে এই হিন্দু, শিখ ও মাড়োয়ারী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীগণও পাকিস্তান ত্যাগ করে। ফলে স্বাধীনতা পূর্ব আমলের শিল্পের মধ্যে খুবই ক্ষুদ্র অংশ নিয়েই পাকিস্তানের যাত্রা শুরু হয়। অবশ্য ভারত থেকে মুসলমান শিল্পপতিদের অনেকে এসে সে শূণ্যস্থানের কিছু অংশ পুরণ করে কিন্তু পাকিস্তানের সামগ্রিক প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল খুবই নগণ্য। তবে ভারত থেকে আগত শিল্পপতিদের বিকাশের একটি ইতিহাস ছিল; ফলে পাকিস্তানে আসার সময় তার পুঁজির দিক থেকে বিবেচনা করার মত উল্লেখযোগ্য কোন পুঁজি ও প্রযুক্তি না আনতে পারলেও তারা একটি শ্রেণীগত অবস্থান নিয়েই পাকিস্তানের রাজনৈতিক মঞ্চে এসে অবস্থান গ্রহণ করে। এদের সাথে যুক্ত হয় কিছু অভারতীয় মুসলিম শিল্পপতি, যারা বিভিন্ন দেশ থেকে তাঁদের শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যকে গুটিয়ে পাকিস্তানে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। শেষোক্তদের শ্রেণীগতভাবে তেমন কোন রাজনৈতিক প্রভাব না থাকলেও এরা আসার ফলে ভারত থেকে আগত শিল্পপতিদের রাজনৈতিক প্রভাব খানিকটা বৃদ্ধি পায়। এই ভারত প্রত্যাগত ও বহিরাগত শিল্পপতিদের পৈতৃক বাসস্থান পাকিস্তানে না হওয়ার কারণে কোন নির্দিষ্ট এলাকার প্রতি এদের পক্ষপাতিত্ব থাকার কথা ছিলনা। কিন্তু প্রায় একশত বছর ধরে মুসলিম রাজনীতির কেন্দ্র ভারতের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে হওয়া এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তার রাজধানী করাচীতে স্থাপিত হওয়ার কারণে এসকল বহিরাগত শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীগণ পশ্চিম পাকিস্তান কেন্দ্রিক শিল্প উদ্যোগ ও ব্যবসাবাণিজ্য শুরু করে। অন্যদিকে, পূর্ববাংলায় যে দুইচারটি হিন্দু শিল্পকারখানা ছিল তার প্রায় সবই ছিল হিন্দু মালিকানাধীন। হিন্দু সমাজের ব্যাপক হারে দেশ ত্যাগের ফলে যে দু'চারজন শিল্পপতি দেশে থাকলো তারাও শিল্পপতি শ্রেণীর মূল ধারার সাথে সম্পৃক্ত হতে পারেনি। ফলে পাকিস্তানের শুরুতে শিল্পপতি শ্রেণী বলতে মূলতঃ পশ্চিম পাকিস্তানকেন্দ্রিক অবাঙ্গালী শিল্পপতিদেরকেই বোঝাতো।

পাকিস্তান জন্মের সময় পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয় অঞ্চলে একটি শক্তিশালী ভূস্বামী শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে হিন্দু ও শিখ ভূস্বামীগণ দেশত্যাগ করায় পরও সেখানে অত্যন্ত শক্তিশালী একটি ভূস্বামী শ্রেণীর অস্তিত্ব থেকে যায়। আর পশ্চিম পাকিস্তানের স্থায়ী নাগরিকদের মধ্যে যারা পাকিস্তান আন্দোলনে নেতৃত্বদায়ী ভূমিকা পালন করেছিল তাঁদের অধিকাংশই ছিল এই ভূস্বামী শ্রেণীরভূক্ত। মুসলমান ভূস্বামীদের পাকিস্তান আন্দোলনে নেতৃত্বদানের ভূমিকা থাকার কারণে প্রজাসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারেনি। এ প্রশ্নে পূর্ববাংলার অবস্থাটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। পূর্ববাংলায় একটি শক্তিশালী ভূস্বামী শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকলেও তাঁদের অধিকাংশই ছিল পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধী। কেননা পূর্ববাংলার ভূস্বামীদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু সমাজভূক্ত। তবে মুসলমানদের মধ্যে যারা ভূস্বামী ছিল তাঁদের অধিকাংশ পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থক ছিল বটে, কিন্তু পূর্ব বাংলার পাকিস্তান আন্দোলন তীব্র রূপ নেওয়ার ক্ষেত্রে একটি ভিন্নতর পটভূমি কাজ করেছিল। দীর্ঘদিন ধরে এখানে অব্যাহত ছিল জমির ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জমিদার বা ভূস্বামী শ্রেণী বিরোধী প্রজা আন্দোলন। ত্রিশের দশকের শেষদিকে এসে জমিদার বিরোধী আন্দোলন পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে মিশে যায়। পাকিস্তান জন্মের সময় পূর্ব বাংলায় যারা পাকিস্তান আন্দোলনে নেতৃত্বকারী ভূমিকায় ছিলেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ জমিদার শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হলেও, তাঁদের প্রধান অংশ ছিল প্রজা-পারিবারিক পটভূমি থেকে আগত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। অন্যদিকে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় বাংলা বিভাগ প্রশ্নে মুসলিম মধ্যবিত্তদের প্রতিনিধিত্বশীল অংশ মুসলিম লীগের মূল নেতৃত্বের সাথে থাকতে পারেনি। বাংলায় মুসলিম জমিদারদের প্রতিনিধি খাজা নাজিমুদ্দীন হন পূর্ববাংলার প্রথম প্রধান মন্ত্রী। মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির মধ্যে সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম বা ফজলুল

Dhaka University Institutional Repository

হকের মত কোন প্রতিনিধিত্বশীল মধ্যবিত্ত ব্যক্তিত্ব অন্তর্ভুক্ত হননি। প্রকৃত পক্ষে প্রজা আন্দোলনের ধারাবাহিকতা হিসাবে বাংলায় পাকিস্তান আন্দোলন গণআন্দোলনে রূপ লাভ করলেও, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় কেন্দ্রীয় মুসলিমলীগে বাংলার প্রতিনিধি ছিলেন মুসলিম জমিদার ও তার সমর্থকগণ। অর্থাৎ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় দেশের উভয় অংশে নেতৃত্বদানকারী ভূমিকায় ছিল জমিদার, ভূস্বামী বা শ্রেণী।[১৫]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় দেশের উভয় অংশে ক্ষুদ্র হলেও একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম হয়। পূর্ব বাংলায় এই শ্রেণীটির একটি বিশেষ রাজনৈতিক প্রভাব ছিল। শুধু পূর্ববঙ্গেই নয়, সারা ভারতবর্ষের রাজনীতিতেই এই পেশাজীবী মধ্যবিত্তদের প্রভাব ছিল উল্লেখ যোগ্য।

১৯৪৭ সালে যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় তখন পাকিস্তান আন্দোলনের মূল নেতৃত্ব এসেছিল উক্ত তিনটি শ্রেণী থেকেই। সমসাময়িককালে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অধিবেশনে উপস্থিত সদস্যদের শ্রেণী অবস্থান নির্দেশ করতে গিয়ে দেখা যায়, বিভিন্ন প্রাদেশিক কমিটি থেকে নির্বাচিত বা মনোনীত প্রতিনিধিদের মধ্যে জমিদার বা ভূস্বামীদের সংখ্যাগত অবস্থান ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী।[১৬] মোট ৫০৩ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১৬৩ জনই ছিলেন ভূস্বামী। এই ১৬৩ জনের মধ্যে পাঞ্জাব থেকে আগত ভূস্বামী প্রতিনিধির সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক, অর্থাৎ ৫১ জন। অবশ্য আনুপাতিক দিক দিয়ে ভূস্বামী প্রতিনিধিদের সংখ্যা সিন্ধু থেকে আগত প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিল সর্বাধিক। সিন্ধুর মোট ২৫ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১৫ জন প্রতিনিধিই ছিল ভূস্বামী। আর এসব ভূস্বামীর জমিদারীর আয়তন ছিল খুবই বিশাল। বাংলা থেকে আগত প্রতিনিধিদের মধ্যেও ভূস্বামী বা জমিদার প্রতিনিধি ছিল, কিন্তু পাঞ্জাব বা সিন্ধুর ভূমি অভিজাত প্রতিনিধিদের তুলনায় এদের জমিদারীর আয়তন ছিল খুবই ক্ষুদ্র।

মুসলিম লীগের কাউন্সিল প্রতিনিধিদের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তরসংখ্যক প্রতিনিধির পেশা ছিল আইন ব্যবসা। এই আইনজীবী প্রতিনিধিদের মোট সংখ্যা ছিল ১৪৫ এবং এরা প্রধানতঃ এসেছিল বাংলা ও বোম্বাই প্রদেশ থেকে। এসকল আইনজীবী প্রতিনিধিদের কর্মক্ষেত্র প্রধানতঃ কলকাতা ও বোম্বাই নগরী। ব্যবসায়ী, ব্যাংকার বা শিল্পপতিদের মধ্য থেকে সে সময় প্রতিনিধির সংখ্যা ক্রমে বাড়ছিল। তবে তখনও এদের সংখ্যা সীমিতই ছিল।[১৭] শিক্ষক, সাংবাদিক, প্রাক্তন সরকারী কর্মকর্তা বা প্রাক্তন সামরিক কর্মকর্তাদের সংখ্যাও এ সময় বাড়তে থাকে। তবে মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক নেতৃত্বের মধ্যে জমিদারদের অবস্থান ছিল অনেক বেশী শক্তিশালী। কেননা এক মোহম্মদ আলী জিন্নাহ্ ছাড়া মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের অধিকাংশই ছিলেন জমিদার। মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক স্বয়ং লিয়াকত আলী খান ছিলেন যুক্ত প্রদেশের বিখ্যাত নবাব পরিবারের সন্তান। যুক্ত প্রদেশের নওয়াব পরিবারের অন্য এক সন্তান নবাব ইসমাইল খান ছিলেন মুসলিম লীগের কার্যকরী কমিটির চেয়ারম্যান ও যুক্তপ্রদেশের সভাপতি। মামদোতের নবাব ছিল পাঞ্জাব প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি, স্যার আব্দুল্লাহ হারুন এবং স্যার মোহাম্মদ সাদুল্লাহ-এই দুই ভূমি অভিজাত ছিলেন যথাক্রমে সিন্ধু ও আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি। এরকমভাবে এই ভূমি অভিজাতরাই অধিকাংশ প্রাদেশিক মুসলিম লীগের নেতৃত্বে ছিলেন।[১৮] সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের রাজনীতিতে এসব ভূমি অভিজাতগণ একটি বিশেষ ভূমিকায় থাকলেও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এর কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। মুসলমান সংখ্যালঘু রাজ্যগুলি থেকে পাকিস্তানে আসার ফলে ভূস্বামীগণ তাঁদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিকে হারিয়ে ফেলে। কিন্তু মুসলিম লীগের জাতীয় কমিটির ভূস্বামীদের মধ্যে এদের সংখ্যাই ছিল অর্ধেক। এরা ছাড়াও অন্যান্য মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশের পেশাজীবী ব্যবসায়ী বা অন্যান্য পেশার সাথে যুক্ত সদস্যদের মিলে মুসলিম লীগের জাতীয় কমিটিতে কিংবা কার্যকরী কমিটিতে এদের সংখ্যা ছিল দুই তৃতীয়াংশেরও বেশী। সংখ্যায় এরা বেশী হলেও অর্থনৈতিক ভিত্তির দিক থেকে দুর্বলতার কারণে সিন্ধু ও পাঞ্জাবের জমিদারদের কাছে এদের অবস্থান ছিল খুবই দুর্বল। তাই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্র মত প্রবল ব্যক্তিত্বের পক্ষেও ভূমি অভিজাতদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হতে পারে এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।[১৯]

পাকিস্তানের আমলাতন্ত্র

জন্মলগ্নে পাকিস্তান এমন একটি আমলা প্রশাসন ঐতিহাসিকসূত্রে লাভ করে যা দীর্ঘদিন ধরে ভারতবর্ষে বৃটিশের ঔপনিবেশিক শাসন শোষণকে বলবৎ রাখতে মূল ভূমিকা পালন করে আসছিল।[২০] বৃটিশ ভারতের আমলাতন্ত্র অত্যন্ত দক্ষ একটি আমলাতন্ত্র হিসাবে বিবেচিত হয় এবং এখানে বৃটিশের ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠায় খুবই 'সুখ্যাতি' অর্জন করে। এ আমলাতন্ত্র বৃটিশ উপনিবেশগুলির মধ্যে অন্যতম একটি যোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিজেদেরকে প্রমাণ করে।[২১] অন্যান্য ঔপনিবেশিক প্রশাসনের মত ভারতবর্ষের বৃটিশ প্রশাসনও আইন ও শৃংখলা (law and order) মোতাবেক কাজ করতে অভ্যস্ত ছিল এবং তারা সব সময়ই একটি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সবকিছুকে দেখতো।[২২] ১৯৪৭ সালে সদ্য স্বাধীন দুটি দেশে (ভারত ও পাকিস্তান) আমলাতন্ত্রের কার্যাবলীর দৃষ্টিভঙ্গিই পাল্টে গেল। ঔপনিবেশিক শাসন বজায় রাখার লক্ষ্যে আমলাতন্ত্র আর ব্যবহৃত হওয়ার আবশ্যকতা থাকলো না। পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ নিজেই প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের প্রতি এক ভাষণে এই পরিবর্তিত প্রশাসনিক দর্শনের কথা উল্লেখ করেন।[২৩] কিন্তু জিন্নাহ্র এ ঘোষণা কিংবা তার সদিচ্ছা থাকলেও বৃটিশ ঐতিহ্যের একটি আমলা গোষ্ঠী দিয়ে জিন্নাহ্র সে ইচ্ছা পুরণ করা সম্ভব ছিল না।

---

১৫ Ahmad, Kamruddin (1975): Socio Political History of Bengal and the Birth of Bangladesh, Dacca: Inside Library, pp.15-61.

১৬ Syeed, Khaled Bin (1968): *op. cit,* 207.

১৭ *Ibid*, p. 207.

১৮ *Ibid*, P. 207.

১৯ *Ibid*, P. 295, 299.

২০ Haque, Abunasar Shamsul (1970): *Administrative Reform in Pakistan*, Dacca: National Institute of Public Administration, p. 69.

২১ Callard, Keith (1957): *Pakistan: A Potitical Study* New York: The Macmillan Company, p.284.

২২ *Ibid*, p. 287.

২৩ Braibanti, Ralph (1966): *Research on the Bureaucracy of Pakistan*, Durham: Duke University Press. Appendix 1, P. 346.

Dhaka University Institutional Repository

কেননা অতীত ঐতিহ্যের দিক থেকে এসব আমলা ছিল সমাজ ও জনসাধারণের ওপর আধিপত্য করতে অভ্যস্ত একটি গোষ্ঠী। এরা নীতি নির্ধারণেও যেমন মূল ভূমিকা পালন করতো তেমনই সেগুলি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও নেতৃত্ব দিতো। ফলে সমাজের সবচেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি বলে তাঁদের নিজেদের সম্পর্কে ধারণা জন্মায়। তারা তাঁদের প্রাক্তন ঐতিহ্য নিয়ে খুবই গর্ববোধ করত এবং তারা আশা করতো আমলাতন্ত্রের শীর্ষ পদগুলি কেবল তাঁদের অলংকৃত করতে পারে। এদের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে অধ্যাপক মোহাম্মদ মোহব্বত খান মতপ্রকাশ করেছেনঃ

"The Civil Service of Pakistan, had been developed, influenced, and conditioned largely by its administrative heritage, which was unmistakenly British and its elitist character, which ensured its exclusive monopoly over key policy-making and policy implementing positions in the realm of the public service. The members of the Civil Service of Pakistan were proud of their heritage and considered it only natural that key positions in the bureaucracy should be filled from among them"[২৪]

উপরোক্ত মানসিকতাকে পুঁজি করে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে অংশ গ্রহণকারী প্রাক্তন বৃটিশ ভারতীয় আমলারা তাঁদের পুরোনো ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকেন। পাকিস্তান সরকারের কিছু চেষ্টা সত্ত্বেও পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস তার পুরোনো ঐতিহ্যকেই টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়।[২৫] ফলে পাকিস্তান সরকারের প্রতিটি সংস্কার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং এসকল প্রচেষ্টার ফলে আমলা প্রশাসনে জন্ম নেয় একধরনের বদ্ধ পরিবেশ (Statiecondition)।[২৬] অবশ্য, একথা মোটেও সত্য নয় যে, বৃটিশ ভারতীয় এ সকল কর্মকর্তাগণ অদক্ষ ছিলেন। আংগিক গড়ন, প্রশিক্ষণ ও পেশাগত দক্ষতার দিক থেকে বৃটিশ ভারতীয় আমলা প্রশাসন একটি উন্নত প্রশাসন হিসাবে স্বীকৃত। কিন্তু তাঁদের এ দক্ষতা নতুন অবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতে পারেনি। বরং তাঁদের সেই দক্ষতা ও যোগ্যতাই সকল সংস্কারমূলক প্রচেষ্টাকে সহজেই অকার্যকর করে দিতে সক্ষম হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই বৃটিশ ভারতীয় কর্মকর্তাগণ তাঁদের পেশাগত যোগ্যতার বলেই অনভিজ্ঞ রাজনৈতিক নেতৃত্বকে তাঁরা নিজেদের মত করে ব্যবহার করেছে। ফলে খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই তারা পুরো রাষ্ট্রপ্রশাসনের ওপরও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ব্রায়বান্তির মন্তব্যটি প্রনিধানযোগ্যঃ

The CSP is perhaps unique among the system inheriting the imperial tradition of the ICS in respect that its sense of exclusiveness and imperiousness have only been slightly affected since independence. It remains a destructive, cohesive entity with a high degree of elan. It is the matrix through which preindependance British values are diffused throughout the bureaucratic system and at the same time it controls the arena in which highly dynamic reform is taking place.[২৭]

স্বাধীনতার পরও বৃটিশ ভারতীয় আমলা প্রশাসনের উত্তরাধিকারী হিসাবে পাকিস্তানে আমলা প্রশাসনের ঔপনিবেশিক চরিত্রের কোন পরিবর্তন না হওয়ার পিছনে যে সকল সম্ভাব্য কারণ ক্রিয়াশীল ছিল সেগুলি নিম্নরূপঃ

১. সামাজিক
২. রাজনৈতিক
৩. অর্থনৈতিক
৪. প্রশাসনিক

সামাজিক কারণ

তত্ত্বিক আলোচনায় দেখা গেছে, কোন সমাজে রাষ্ট্রের প্রশাসনিক বিভাগের চরিত্র কিরকম হবে তা নির্ভর করে বিভিন্ন শ্রেণীর বিকাশ এবং রাষ্ট্রের সাথে শ্রেণীসমূহের সম্পর্কের ওপর। সামন্তবাদী সমাজে আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত মালিক থাকেন একক কোন সামন্তপতি কিংবা সামন্ত শ্রেণী। ফলে সেখানে সামন্তবাদী শাসন ব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত করার লক্ষ্যেই সমস্ত আইন তৈরী হয়। সেখানে শিল্প বলতে যা কিছু থাকে তা সামন্তবাদী সরকারের অধীনে কিংবা সামন্তবাদের অনুগত ছোট ছোট গিল্ডের অধীনে। এ ব্যবস্থাটা ততদিন পর্যন্ত টিকে থাকে যতদিন পর্যন্ত পাল্টা কোন শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহ এ বিদ্যমান রাষ্ট্র ব্যবস্থা বা সম্পত্তি মালিকানা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে না দিচ্ছে। ইউরোপের ইতিহাসে দেখা যায়, বুর্জোয়া শ্রেণীই এই বিপ্লবী কাজটি সম্পাদন করেছে। ইউরোপের এই বুর্জোয়া শ্রেণীটি তাঁদের নিজস্ব শ্রেণীর বিকাশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে পুরোনো রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তে গড়ে তুলেছে নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা। এ রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূল কাজই হচ্ছে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশকে ত্বরান্বিত করা। সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রব্যবস্থাটি বুর্জোয়া শ্রেণীর অনুগত। ফলে সে রাষ্ট্রের প্রশাসনিক বিভাগ বুর্জোয়া শ্রেণীর অগ্রগতিকে সহজতর করে তোলার কাজেই ব্যবহৃত হয়– বলা চলে প্রশাসনিক বিভাগের দায়িত্ব থাকে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ পরিমাণে সেবা প্রদান। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গড়ে ওঠা পার্লামেন্টকে এ প্রশাসনের মাথার ওপর বসিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের ঘটনাটা ঘটেছে ভিন্নভাবে। ইউরোপীয় বুর্জোয়া শ্রেণী তার ব্যবসায়িক সম্প্রসারণের প্রয়োজনে ভারতবর্ষসহ সারা বিশ্বের অসংখ্য সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণী বা সম্রাট কর্তৃক শাসিত দেশসমূহকে সামরিকভাবে দখল করেছে। কোন কোন এলাকায় সামন্তবাদও সুনির্দিষ্ট কোন শ্রেণী ভিত্তি নিয়ে দাঁড়াতে পারেনি– এরকম অবস্থাতেই সে সব দেশ বা অঞ্চলের জনগণ বা শাসক ইউরোপীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে পদানত হয়েছে। ভারতবর্ষে এসে বৃটিশ বুর্জোয়া শ্রেণী ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রকে ভেঙ্গে ফেলেছে এবং বৃটিশ বুর্জোয়াদের ঔপনিবেশিক শোষণমূলক ব্যবস্থাকে যাতে সর্বোতভাবে সাহায্য করতে পারে সে লক্ষ্যে এখানে গড়ে তোলা হয়েছে একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা।[২৮] সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণী তার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হারিয়েছে। বৃটিশ বুর্জোয়া শাসকদের প্রয়োজনেই এখানে গড়ে তোলা হয়েছে তাঁদের অনুগত একটি সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণী কিংবা রক্ষা করা হয়েছে বিভিন্ন এলাকার সামন্ততান্ত্রিক

---

[২৪] Khan, Mohammad Mahabbat (1980): <u>Bureaucratic Self-preservation: Failure of Major Administrative Reform Efforts in the Civil Service of Pakistan.</u> Dacca: University of Dacca, p. 113.

[২৫] Braibanti, Ralph (1966): *op. cit*, p. 97.

[২৬] Khan, Mohammad Mohabbat (1980): *Op. cit*, p.114.

[২৭] Braibanti, Ralph (1966): " The Higher Bureaucracy of Pakistan." in <u>Asian Bureaucratic System: Emergent from British Imperial Tradition.</u> Edited by Braibanti *et. al.* Durham: Duke University Press. p. 254.

[২৮] এসব বক্তব্য প্রমাণের জন্য কোন সূত্রের উল্লেখ অনাবশ্যক। কেননা অসংখ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভ ও পুস্তকের মাধ্যমে এ সত্যটি সর্বজন গ্রাহ্য সত্যে পরিণত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

স্বার্থ ও সম্পত্তি ব্যবস্থাকে। এ সকল সামন্তপ্রভু এদের অধীনস্ত জনসাধারণ কিংবা সম্পত্তির ওপর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কম বেশী রক্ষা করতে পারলেও যে রাষ্ট্রটি বা প্রশাসনটির মাধ্যমে তারা এ কাজটি করছে সে রাষ্ট্র বা প্রশাসন তার নয়। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার আত্ম বিরোধ, অর্থনৈতিক সংকট ও সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে ভারতবর্ষেও গড়ে উঠেছে একটি দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণী। কিন্তু ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রীয় প্রশাসন এ দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর নিজস্ব সৃষ্টি নয়, বরং এ বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ প্রক্রিয়াটি বৃটিশ ভারতীয় আমলা প্রশাসনের সাথে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে বজায় রেখেই এগিয়েছে। অন্যদিকে, ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক শাসনের অন্য একটি মারাত্মক পরিণতি হচ্ছে, এখানকার স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে ফেলা। বিশেষতঃ বিশেষ কোন পুঁজিবাদী বিকাশ ছাড়াই এখানে গণমানুষের নৈমিত্তিক প্রয়োজন মিট্‌তো স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যের মাধ্যমেই। জীবন ছিল সরল, প্রয়োজনও ছিল সীমিত। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন তা ভেঙ্গে ফেলে জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যের তালিকা করেছে অনেক ভারী। স্থানীয় ও গতানুগতিক উৎপাদন ব্যবস্থার যে অবশেষটুকু রয়ে গিয়েছিল তা জনসাধারণের প্রয়োজনের ন্যূনতম অংশও পূরণ করতে পারেনা। একটি পুঁজিপতি বা বুর্জোয়া শ্রেণীই সে অভাব পূরণ করতে পারে। কিন্তু যে এলাকা নিয়ে পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল সে এলাকাতে তেমন কোন বুর্জোয়া শ্রেণী ছিল না। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সহ প্রায় সকল ধরনের পণ্যের জন্য এদেরকে নির্ভর করতে হতো কলকাতা, বোম্বাই, আহমদাবাদ সহ ভারতীয় ইউনিয়নের অধীনস্ত অন্যান্য নগরের ওপর। ফলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এ সকল পণ্য সরবরাহের দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপর পড়ে।

রাজনৈতিক কারণ

ইতিপূর্বের আলোচনা থেকে দেখা গেছে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্মলগ্নে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত কয়েকটি প্রাদেশিক পার্লামেন্ট এবং একটি জাতীয় পার্লামেন্ট থাকলেও এদের কোন ক্ষমতা ছিল না। সমস্ত ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী ছিলেন পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল। অন্যদিকে, যিনি পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর জেনারেল ছিলেন তিনিই ছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী প্রতিষ্ঠান মুসলিমলীগের সভাপতি। মুসলিম লীগের দলীয় সংবিধান অনুযায়ী সভাপতি ছিলেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার মুখ্য ব্যক্তি। তাঁর সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত। তাঁর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোন আপত্তির সুযোগ ছিল না। ক্ষুদ্র একটি কার্যকরী কমিটি যা ছিল তা সভাপতির মনোনীত সদস্যদের নিয়ে গঠিত। কার্যকরী কমিটি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকতো, সভাপতিকে যে কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে কার্যকরী কমিটি শুধু পরামর্শ দিতে পারতো। ফলে যে ব্যক্তি যুগপৎ মুসলিমলীগের সভাপতি এবং পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল তাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা কারো থাকেনা। তাছাড়া মুসলিম লীগের সভাপতি ও পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ছিলেন এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। ফলে আমলা প্রশাসনের সাথে যুক্ত ব্যক্তিগণ প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে একমাত্র গভর্ণর জেনারেলের অনুগত থাকলেই চলতো, আর কারো কোন তোয়াক্কা করার প্রয়োজন তাঁদের ছিল না। দ্বিতীয়তঃ ঔপনিবেশিক আমলের আমলাতান্ত্রিক কাঠামোকে ভেঙ্গে না ফেলে তাকেই বহাল রাখা হয়। ফলে ঔপনিবেশিক আমলে প্রশাসন পরিচালনার জন্য যে নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াটি (Chain of Command) ছিল, সেটাই টিকে থাকে। জনসাধারণ কিংবা তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এর ওপর কোন কর্তৃত্ব ছিল না। তৃতীয়তঃ একমাত্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের জমিদারী উচ্ছেদ কর্মসূচী ছাড়া পাকিস্তান আন্দোলনের একমাত্র রাজনৈতিক ভিত্তি ছিল ১৯৪০ সালে উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাব। স্বাধীনতার পর কিভাবে ব্যাপক গণমানুষ দেশ গঠন ও নিজস্ব বিকাশের কাজে অংশগ্রহণ করবে তার কোন দিক নির্দেশনা সেখানে ছিল না। ফলে সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানের নাগরিকদের কাছে পাকিস্তানের কাছে চাওয়ার মত কোন কিছু ছিল না। আর এ কারণেই স্বাধীনতার পর বহুদিন পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণ রাষ্ট্র কিংবা প্রশাসনের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে যায়নি।[২৯] অর্থাৎ সমগ্র পাকিস্তানে আমলা কাঠামোটি ঔপনিবেশিক আমলের মতই জনসাধারণের ওপর বিনা বাধায় অত্যাচার নির্যাতন চালিয়ে এসেছে। মুসলিম লীগের আর্থ-সামাজিক কর্মসূচীতে আমলা কাঠামো সংস্কারের কোন সুযোগ না থাকায় জনসাধারণের ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা ছিল না।

অর্থনৈতিক কারণ

পূর্বেই বলা হয়েছে ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর ভারত থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের যোগান বন্ধ হয়ে যায়। দেশেও সেরকম কোন উৎস ছিল না, যা থেকে সে অভাব পূরণ করা যায়। ফলে দেশের বাইরে থেকে এ সমস্ত পণ্য আসার জন্য সরকারকেই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়। সরকার নিজেই বিদেশ থেকে বিভিন্ন ধরনের পণ্য আমদানী করতে থাকে, আবার দেশের ব্যবসায়ীগণ যাতে পণ্য আমদানী-রফতানী করতে পারে সে লক্ষ্যে পারমিট-লাইসেন্স দেওয়া শুরু হয়। রপ্তানী বাণিজ্যও প্রথম দিকে পুরো সরকারী নিয়ন্ত্রণে চলে। পরবর্তীকালে ব্যবসায়ীদের অনুমতি দেওয়া হয়। আমদানী-রপ্তানীর গোটা বিষয়টি নিয়ন্ত্রিত হত আমলা প্রশাসনের মাধ্যমে। এ ছাড়া, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ ও নিয়ন্ত্রণের ভারও আমলা প্রশাসনের ওপর পড়ে। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মূল বিষয়গুলি সরকারী পর্যায়ে সম্পন্ন হওয়ার কারণে আমলা প্রশাসন দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে দ্রুতই মুখ্য ভূমিকায় চলে যায়। ফলে রাজনৈতিক নেতৃত্বের পক্ষে এ আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আর থাকে না। এছাড়া, দেশের নতুন রাজধানী গড়ে তোলা, শিল্প কারখানা স্থাপন করা ইত্যাদিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হয় আমলা প্রশাসনকেই। পকিস্তান রাষ্ট্রের কার্যপ্রণালীর ওপর আলোকপাত করলেইপরিষ্কার বুঝা যাবে কিভাবে আমলাতন্ত্র সেখানে শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশাসনিক কারণ

আগেই বলা হয়েছে, বৃটিশ ভারতের আমলা প্রশাসন কাঠামোকে ভেঙ্গে না দিয়ে পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক এলিট এ আমলাতন্ত্রকে সংস্কারের উদ্যোগ নেয়। উক্ত সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়িত না হওয়ার পিছনে যে সব কারণ মুখ্যতঃদায়ী সেগুলি নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

(ক) ১৯৪৭ সনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় মোট ৫০ জন বৃটিশ কর্মকর্তা পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগ দেয়।[৩০] এদের মধ্যে ৩৬ জন এসেছিল ভারতীয় সিভিল সার্ভিস (ICS) থেকে এবং অন্যরা ভারতীয় রাজনৈতিক সার্ভিসের (IPS) অন্তর্ভুক্ত। এ সকল বৃটিশ বংশোদ্ভুত কর্মকর্তার মধ্যে মাত্র আঠারো জনের পেশাগত অভিজ্ঞতা ছিল ১৫ বছরের বেশী এবং পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে তাঁদের

---

২৯ এই বিষয়টি মোটামুটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে রাজনৈতিক বিকাশ সংক্রান্ত অধ্যায়ে।

৩০ Braibauti, Ralph (1962): "Public Bureaucracy and Judiciary in Pakistan" _Bureaucracy and Political Development,_ Edited by Joseph La Palombara Princeton: Princeton University Press, p. 367.

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থান ছিল শতকরা ৩৪ ভাগ। সংখ্যায় এরা স্বল্প হলেও কিংবা তাঁদের প্রধান অংশ অনভিজ্ঞ হলেও এই বৃটিশ কর্মকর্তাগণই পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের শীর্ষপদগুলি অধিকার করে এবং তারাই প্রশাসনিক সংস্কারের মূল দায়িত্বটি গ্রহণ করে।[৩১]

সংস্থাপন বিভাগ প্রশাসনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাজকে পরিচালনা করেঃ (১) প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস; (২) চাকুরীর নিয়মনীতি, গঠন প্রণালী ও সি এস পি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, এবং (৩) সি, এস, পি কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত বিষয়াদি তথা, পোস্টিং, পদোন্নতি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা।[৩২] আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই যে, ১৯৫৯ সালের কিছু সময় ছাড়া ১৯৬১ সাল পর্যন্ত এ বিভাগটি নিয়ন্ত্রণ করতো একজন বৃটিশ কর্মকর্তা।[৩৩]

নতুন কর্মকর্তাদের নিয়োগ করার পর প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য লাহোর শহরে যে সিভিল সার্ভিস একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা হয় তার দায়িত্বেও ছিলেন ১৯৬০ সাল পর্যন্ত একজন বৃটিশ কর্মকর্তা। এমনকি, প্রশাসনের প্রাথমিক পুনর্গঠন রিপোর্ট গঠনের জন্য যে কমিটি গঠন করা হয় তারও চেয়ারম্যান ছিলেন একজন বৃটিশ কর্মকর্তা।[৩৪] এভাবে বৃটিশ কর্মকর্তারা প্রশাসনের বিভিন্ন শীর্ষ পদে থেকে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসকে পুনর্বিন্যাসের দায়িত্ব নেয় এবং তারাই পাকিস্তানের কর্মকর্তাদের পুরানো ধ্যান ধারণা ও মূল্যবোধকে পরিবর্তন করে নতুন চেতনা ও মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করে তোলার মূল দায়িত্ব গ্রহণ করে। সম্ভবতঃ সে কারণেই তাঁদের সে প্রচেষ্টা পাকিস্তানকে নতুন কিছু উপহার দিতে পারেনি। কেননা আমলা প্রশাসন সম্পর্কে তাঁদের নিজস্ব যে ধারণা, সে ধারণাকে পুঁজি করেই উপনিবেশোত্তর একটি দেশে তাঁরা সংস্কারের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তাঁদের ধারণার মধ্যে বুর্জোয়া ব্যবস্থার আদর্শ আমলাতন্ত্রের একটি দিক থাকলেও, তারা ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক পটভূমি থেকেই এসেছিলেন। ফলে পাকিস্তানের কর্মকর্তাদের মধ্যে যে একটি স্বদেশী মানসিকতা গড়ে তোলা প্রয়োজন ছিল- অন্ততঃ এই বৃটিশ কর্মকর্তাদের পক্ষে একাজটি করা সম্ভব ছিলনা। ফলাফলও ঘটেছে তেমনই। অধ্যাপক মোহাম্মদ মোহব্বত খান এ দিকটি লক্ষ্য করেই মন্তব্য করেছেনঃ

By holding important and key positions, British officers were not only instrumental in moulding the behaviour and attitudes of the members of the CSP through the inculcation of *alien followed* the British so closely that they hardly behaved or acted like Pakistanis.[৩৫]

(খ) বৃটিশ আমলে সব সময়ই আমলা প্রশাসন দেশীয় রাজনীতিবিদদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। একথাটি আই, সি, এস, অফিসারদের জন্য অনেক বেশী সত্যছিল। কেননা এরা শুধুমাত্র বৃটিশ রাজের প্রতিনিধি গভর্ণর জেনারেলের কাছে দায়ী থাকতো। আর গভর্ণর জেনারেলই ছিল ভারতীয় আমলা প্রশাসনের কার্যকরী প্রধান। সে সময় ভারতীয় রাজনীতিবিদগণ স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম করতো, আর আমলা কর্মকর্তারা, সে বৃটিশ হোক আর ভারতীয় হোক, ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনকে অব্যাহত রাখার দায়িত্বে নিয়জিত ছিল। এসব কারণে ভারতীয় রাজনীতিবিদেরাও এসব কর্মকর্তাদের প্রতি খুবই খারাপ মনোভাব পোষণ করতেন। ফলে ভারতে বৃটিশ রাজত্বের শেষ অবধি আমলা কর্মকর্তাদের সঙ্গে রাজনীতি বিদদের সম্পর্ক ছিল খুবই শীতল।[৩৬]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এ সম্পর্ক শুধু যে অব্যাহত ছিল তাই নয়, তা আরও দৃঢ় হয়।[৩৭] এর পিছনে দু'টি কারণ বিশেষভাবে কাজ করেছিল; প্রথমতঃ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, আমলা প্রশাসনের ওপর নিয়ন্ত্রণের একমাত্র পদাধিকারী ছিলেন গভর্ণর জেনারেল, পরবর্তীকালেও কখনই গনপ্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণ তাঁদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পুরো পাকিস্তান আমলে কখনই সংবিধানে এমন কোন ধারা সংযোজিত হয়নি যা' দ্বারা তাঁদের ওপর জন প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। বরং সংবিধান স্বয়ং তাঁদের এ নিয়ন্ত্রণ মুক্ত অবস্থার জন্য একটি রক্ষাকবচ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। দ্বিতীয়তঃ পাকিস্তানের প্রথম দশক ছিল রাজনৈতিকভাবে প্রচণ্ড অস্থির একটি দশক, আর পরবর্তী একযুগছিল নিরঙ্কুশ সামরিক শাসন। সামরিক শাসন আমলে আমলা কর্মকর্তাদের একমাত্র সামরিক কর্মকর্তা ব্যতীত কাউকে তোয়াক্কা করার কোন প্রয়োজন পড়তোনা। এ অবস্থার পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিল তারা।[৩৮] প্রায় পুরো পাকিস্তান আমল জুড়েই তাঁদের কাজ তদারক করা কিংবা তাঁদের কাজের হিসেব নে'য়ার মত কেউ ছিল না।

(গ) বৃটিশদের ঔপনিবেশিক শাসনের সাধারণ নীতি ছিল 'বিভক্তি ও শাসন'। আর এটাই সাধারণ মানুষ থেকে আই, সি, এস, দের বিচ্ছিন্ন করে রাখে। সামাজিক পদমর্যাদা, গুরুত্ব ও প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক থেকেও তারা খুবই উপরতলায় উঠে যায়। এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, জেলা প্রশাসকগণই সাধারণ মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে।[৩৯] পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এ অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি, বরং তা আরো গণবিরোধী চরিত্র ধারণ করে।[৪০] বিভাগীয় প্রশাসক, জেলা প্রশাসক বা মহকুমা প্রশাসক প্রত্যেকে তাঁর নিজস্ব পরিধিতে কাজ করতো। জনগণের সাথে তাঁদের কোন সম্পর্কই ছিল না। জনসাধারণের প্রতি যেমন তাঁদের কোন বিশ্বাস ছিল না, তেমনই তাঁদের প্রতি জনগণের আস্থা রাখার মতও কোন কারণ ঘটেনি।[৪১] তবু আগে বৃটিশ পার্লামেন্ট ভারতীয় প্রশাসনের নীতি প্রণয়ন করতো কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর নীতি প্রণয়নের দায়িত্ব আমলা প্রশাসনের নিজের ওপর এসে পড়াতে এ বিচ্ছিন্নতা আরো ব্যাপকতর হয়। এ বিষয়টি নিম্নোক্ত বক্তব্যে অত্যন্ত স্পষ্টঃ

---

৩১ Khan, Mohammad Mohabbat (1980): Op. cit, p. 115.

৩২ Braibanti, Ralph (1962): Op. cit, p. 371.

৩৩ Khan, Mohammad Mohabbat (1980): Op, cit, p. 115.

৩৪ *Ibid*, p. 116.

৩৫ *Ibid*, p. 116.

৩৬ *Ibid*, p. 117.

৩৭ পাকিস্তানের রাজনীতিতে বেসামরিক আমলাদের রাজনৈতিক ভূমিকা পালনের পরিপ্রেক্ষিত আলোচনা করলেই বিষয়টি পরিস্কার হয়ে উঠবে। দ্রষ্টব্যঃ Syeed, Khalid B. (1958): " The Political Role of Pakistan's Civil Service," Pacific Affairs June, Vol- 31, pp. 131-46.

৩৮ Khan, *Op. cit*, pp. 117-118.

৩৯ *Ibid*, p. 118.

৪০ Abedin, Najmul (1969): Bureaucratic Behaviour and Attitudes and the Politico-Social Environment in Pakistan." Administrative Science Review, Dacca, Vol, 3. September, pp. 1-45. বিষয়টি বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হয়েছে নিম্মোক্ত গ্রন্থে Ahmad, Muneer (1964): *The Civil Servants in Pakistan.* Dacca: Oxford University Press.

৪১ Abbas, B.A. (1969): "Experiences of Major Administrative Reforms for Development" *Administrative Science Review*, Dacca, September, Vol. 3, p. 88.

Dhaka University Institutional Repository

" During the decade after partition, the inner I C S -oriented bureaucracy reassembled, consolidated and enlarged its forces. It reasserted its traditional dominance in key policy making positions at all levels of government and by so doing its permeative power as a transmitter of values throghout the total bureaucracy was thereby strengthened. It drew on the sources of its traditions"[৪২]

(ঘ) প্রশাসনিক এলিট বলতে ইংরেজ আমলে যারা ছিল, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও এদের এ ভূমিকার কোন পরিবর্তন হয়নি। ইংরেজ আমলে সামন্ততান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটি ভেঙ্গে গেলে ১৯৪৭ সনের পর তা আর পুনঃস্থাপিত হয়নি। বটোমোর এই প্রশাসনিক এলিটদের সম্পর্কে বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেনঃ

"Principally in being relatively small, well defined, homogeneous (as a result of training and the practice of the occupation) and cohesive. Furthermore it is directly involved in the exercise of political power."[৪৩]

বটোমোর বর্ণিত প্রশাসনিক এলিটদের সকল গুণাগুণ পাকিস্তানের আমলা প্রশাসকদের ছিল কিনা তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। তবে পাকিস্তানের আমলা কাঠামো এমন কিছু চিহ্নিত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল, যাঁরা তাঁদের পরিধিতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারতো, তাঁদের প্রভাব ছিল অপরিসীম এবং সাধারণ মানুষের ওপর নিয়ন্ত্রণ ছিল প্রায় প্রশ্নাতীত। আর তাঁদের এ ঐতিহ্যকে বজায় রাখতে নতুন নিয়োগের সময় প্রার্থীদের পারিবারিক আভিজাত্যকে যাচাই করা হত।[৪৪] তাছাড়া, এদের নিয়োগ, পদোন্নতি, স্থানান্তর, প্রশিক্ষণ কিংবা প্রয়োজনে শাস্তি প্রদানসহ সব কিছুর জন্য সিভিল সার্ভিসের কাঠামোটি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। এসব ব্যাপারে কারো কোন হস্তাক্ষেপের অধিকার ছিল না। এ প্রসঙ্গে গুডনাউ এর মন্তব্যটি প্রণিধান যোগ্যঃ

"CSP --- controlled its own recruitment, training and indoctrination, disciplinery procedures, performance ratings, promotions and transfers, and administrative investigations. The CSP, like the ICS, was autonomous,"[৪৫] উল্লিখিত কারণে অত্যন্ত ক্ষমতাবান ক্ষুদ্র এ গোষ্ঠীটির আভিজাত্য ও প্রভুত্বকে কখনও খর্ব করা যায়নি।

উপরোক্ত চারটি প্রশাসনিক কারণ বৃটিশ ভারতীয় আমলা কাঠামোকে অপরিবর্তিত রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এর সাথে আগে আলোচিত তিনটি কারণ যথা– সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক, একত্রিত হয়ে পাকিস্তানের আমলা প্রশাসনকে আপেক্ষিকভাবে একটি স্বাধীন ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়। আর এই স্বাধীন ও নিয়ন্ত্রণ মুক্ত প্রতিষ্ঠানটিই পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় চরিত্রকে করে তোলে স্বৈরাচারী। আর সে সাথে যুক্ত হয় মুসলিম লীগের মত অগণতান্ত্রিক একটি রাজনৈতিক দলের শাসন, যা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরুতেই শক্তিশালী কেন্দ্র গঠনের নামে সারা দেশের আয় ও অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থকে অগণতান্ত্রিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলকে গড়ে তোলার কাজে ব্যয় করতে থাকে। এ ব্যাপারে মুসলিমলীগ সরকারকে আমলাতন্ত্রই শুধু সহায়তা করে তাই নয়, পরবর্তীকালে আমলাতন্ত্রের মতই গণবিচ্ছিন্ন, স্বনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খল একটি প্রতিষ্ঠান–সামরিক বাহিনীও বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তবে দেশে অগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েমের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে সুসংগঠিত বেসামরিক ও সামরিক আমলাতন্ত্র যেমন সহায়তা করে তেমনই এই প্রতিষ্ঠান দুটিতে অবস্থানরত উচ্চ স্তরের কর্মকর্তাদের আঞ্চলিক বিন্যাসও বিশেষভাবে অবদান রাখে। কেননা আত্মীয় গোষ্ঠী সম্পর্কের কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ এই ভারতীয় উপমহাদেশের কোন এক অঞ্চল যদি প্রায় শূণ্য থেকে তার অগ্রগতির পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তাহলে রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় অবস্থানে যারা থাকেন তাঁদের নিজস্ব এলাকা বা নিজস্ব গোষ্ঠী ও আত্মীয় স্বজনের অধিকতর সুযোগ সুবিধা না পাওয়ার কোন কারণ নেই। তবে রাষ্ট্রের চরিত্রকে সুস্পষ্ট করতে হলে এর অপরিহার্য মৌলিক অঙ্গ সামরিক বাহিনীর অবস্থানকে আরও স্পষ্ট করা প্রয়োজন। কেননা তত্বিক আলোচনায় দেখা গেছে রাষ্ট্র শুধু শ্রেণী–শোষণের হাতিয়ারই নয়, তা বল প্রয়োগের হাতিয়ারও বটে। আর এ বল প্রয়োগের চূড়ান্ত ক্ষমতা ধারণ করে যে কোন রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী। আগের দু'টি অধ্যায়ে পাকিস্তানের দুই অংশে বিভিন্ন শ্রেণীর উথান ও বিকাশকে দেখানো হয়েছে। এসকল শ্রেণীর যতটা বিকাশ হয়েছিল তাতে এদের পক্ষে রাষ্ট্রের ওপর কতটা প্রভাব প্রতিষ্ঠা সম্ভব ছিল সামরিক বাহিনীর বিকাশের চিত্রটি সামনে আনলে তা আরও স্পষ্ট হবে।

পাকিস্তানে সামরিক বাহিনীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা

ঔপনিবেশিক আমলে আমলাতন্ত্র যেমন ঔপনিবেশিক প্রশাসনের অংশীদার ছিল তথা উক্ত প্রশাসনের সকল ভারতীয় কর্মকর্তাও ঔপনিবেশিক শাসন–শোষণকে অব্যাহত রাখার কাজে নিয়োজিত থাকত এবং ব্যক্তিগতভাবেই তারা নিপীড়নমূলক ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে ক্ষমতা প্রয়োগ করতো– সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে তেমনটি হবার সুযোগ ছিল না। কেননা সেনাবাহিনীর সাথে সে সময় জনসাধারণেরকোন সম্পর্ক ছিল না। ইংরেজের বৈদেশিক স্বার্থ রক্ষনাবেক্ষণের জন্য এদেশে নিযুক্ত বৃটিশ সেনাবাহিনীকে সাহায্য করাই ছিল স্বাধীনতাপূর্ব ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রাথমিক কাজ।[৪৬] ফলে ভারতীয় নাগরিকের প্রতি তাঁদের বিশেষ অশ্রদ্ধা জাগার কোন কারণ ছিল না, কিংবা ভারতীয় জন সাধারণের সাথে বৃটিশ বাহিনীর ভারতীয় সদস্যদের প্রত্যক্ষ কোন বিরোধ ছিল না। কেননা তাঁদেরকে প্রত্যক্ষ আন্দোলন–সংগ্রাম প্রতিহত করা কিংবা জনসাধারণকে নিয়ন্ত্রণ করার কোন প্রত্যক্ষ দায়িত্ব ছিল না। অপর দিকে, সামরিক বাহিনীতে কাজ করার ফলে ইংরেজ সৈনিকদের সাথে যৌথভাবে একই ব্যারাকে বসবাস করতে হত। ফলে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মূল্যবোধগত পার্থক্য তাঁদের মাঝে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতো। এমনকি, উপনিবেশের লোক হিসাবে সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে বৃটিশদের সাথে এক ধরণের মর্যাদাগত পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। একই সেনাবাহিনীতে অবস্থান করেও ভারতীয়দেরকে নিকৃষ্ট জীব হিসাবে বিবেচনা করা হত। পেশাগত প্রশিক্ষণে বিলাতে গিয়ে আইয়ুব খানের যে দুঃখজনক অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি লেখেনঃ

"আমরা (ভারতীয়রা) এক সংগে থাকতাম। আমরা অনুভব করতাম যে, মানুষ হিসাবে আমাদের নিকৃষ্ট জীব মনে করা হচ্ছে। কোনও কোনও দেশ যেমন প্রকাশ্যে বর্ণ–বৈষম্যের নীতি অনুসরণ করে, ইংরেজ তা করেনা বটে; কিন্তু তারা বর্ণ–বৈষমের ব্যাপারে

---

৪২. Braibanti, Ralph (1962): " Public Bureaucracy and Judiciary in Pakistan" *Op. cit*, p. 381.

৪৩. Bottomore, T.B (1964): " The Administrative Elite" The New Sociology, Edited by Irving Rouis Horowitz, New York: Oxfrod University Press. p. 359.

৪৪. Khan (1980), *Op.cit.*, p. 121.

৪৫. Goodnow, Henry Frank (1964): *The Civil Service of Pakistan: Bureaucracy in a New Nation*, New Haven: Yale University Press, pp. 230-31.

৪৬ খান, মুহম্মদ আইয়ুব (১৯৬৮): প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

কারও চাইতে কম সজাগ নয়। সেকালে পরাধীন দেশ থেকে যারা আসতো তাঁদেরকে মানুষ হিসাবে নিম্নশ্রেণীর বলে গণ্য করা হতো। আমি এর তিক্ততা অত্যন্ত বেশী অনুভব করতাম। ইংল্যান্ডের স্বাধীন আবহাওয়ার মধ্যে আমরা যে, পরাধীন দেশ থেকে এসেছি, সে অনুভূতিতে আমাদের মন খুব খারাপ হয়ে যেত।"[৪৭]

এ বিবরণ থেকেই বোঝা যায়, বৃটিশ বাহিনীতে থেকেও ভারতীয়রা স্বতন্ত্র একটি অনুভূতি নিয়ে সেখানে অবস্থান করতো এবং তাঁদের দায়-দায়িত্বের মধ্যে এমন কোন দিক ছিলনা- যার ফলে ভারতীয় জনসাধারণ থেকে তাঁদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হবে। অন্যদিকে, একই ছাউনীতে থাকতে গিয়ে কি ধরনের সাংস্কৃতিক সংঘাত সৃষ্টি হত সে সম্পর্কে এক উদাহরণ দিতে গিয়ে আইয়ুব খান লিখেছেন,

"ইংরেজ ও ভারতীয় অফিসারদের মধ্যে, মন কষাকষি নানাভাবে এবং সময় সময় অত্যন্ত সামান্য ঘটনাকে আশ্রয় করে প্রকাশ পেতো। মেসে গোলমাল হত খাওয়াদাওয়া নিয়ে। আমরা যা খেতে চাইতাম ইংরেজ অফিসাররা তা দিতে চাইতো না, বিশেষ করে ঝাল তরকারী ,যা শুধু সোম, বৃহস্পতি এবং রবিবারে দেওয়া হতো। গান-বাজনা নিয়ে মতভেদ হতো। আমরা ভারতীয় এবং ইউরোপীয়ান উভয় রকম রেকর্ডই শুনতে চাইতাম। এক সময় এমন অবস্থা হলো যে, কয়েকজন শিখ এবং হিন্দু অফিসার কয়েকজন বৃটিশ অফিসারকে এক ঘরে করার জন্য সভা ডাকলো।"[৪৮]

এ দুটি উদ্ধৃতি থেকে এটা খুবই পরিষ্কার যে, বৃটিশ ভারতীয় বেসামরিক আমলাতন্ত্র ও সামরিক আমলাতন্ত্রের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য ছিল। সেনাবাহিনীর অবস্থানগত কারণেই তাঁদের প্রধান অংশ ছিল দেশপ্রেমিক। কিন্তু আমলারা বৃটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসনের অংশে পরিণত হওয়ার ফলে ঔপনিবেশিক শোষণের অংশবিশেষ বখরা পাওয়ায় সুবিধা পেতো। তারা নিজের পদাধিকারের বলেও সামাজিক প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আর সেনা বাহিনীর সে চরিত্র টিকে থাকার বাস্তবতা ছিলনা। কেননা তাঁদের ওপর প্রভুত্ব করার মত আর কেউ থাকেনি। বরং দুর্বল আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে গণনিপীড়নে সাহায্য করার জন্য মাঝে মাঝেই তাঁদেরকে জনগণের মুখোমুখি হতে হত। উপরন্তু, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মধ্যে পাঞ্জাবী তথা পশ্চিম পাকিস্তানীদের একক প্রাধান্য থাকার কারণে তারাই প্রভুত্বকারী মানসিকতা সম্পন্ন হয়ে উঠে।[৪৯] যাহোক, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফল হিসাবে বৃটিশ ভারতীয় বাহিনীও বিভক্ত হয়ে যায়। আর এ বিভক্তির ফলে পাকিস্তানী সেনা বাহিনীকে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। প্রথমতঃ বৃটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে হিন্দু কিংবা গুর্খাদের যেমন সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং অখন্ড দল ছিল, মুসলমানদের তা ছিল না। দেশ বিভাগের পর ভারতের বিভিন্ন ইউনিট থেকে স্বল্পসংখ্যক মুসলমান সৈনিক পাকিস্তানী সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। ফলে বিভিন্ন ইউনিট থেকে আগত সৈনিকদের নিয়ে যেসব নতুন ইউনিট গঠিত হয়েছিল সেসবের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপক অনৈক্য থেকে যায়। এদের মধ্যে প্রশিক্ষণ পায়নি এমন সৈনিক যেমন ছিল, তেমনই অর্ধ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কিংবা সুশিক্ষিত সৈনিকও ছিল। ফলে এই পাঁচ মিশেলি সৈনিকদের নিয়েই পাকিস্তানের প্রাথমিক সেনা ইউনিটগুলি গড়ে তুলতে হয়।[৫০] দ্বিতীয়তঃ বৃটিশ ভারতীয় বাহিনীর অধিকাংশ সেনানিবাস ছিল ভারতীয় ভূখন্ডে, সদরদপ্তর কিংবা সামরিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষনের যায়গাগুলিও ছিল সেখানে। ফলে দেশ বিভাগের পর যখন সামরিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি বন্টন হয় তখন ভারতীয় বাহিনীর ইচ্ছা মাফিক তা পাকিস্তানকে গ্রহণ করতে হয়। আর তাই, অত্যন্ত পুরানো ও অকেজো সব লোহা-লক্কর ছাড়া তেমন কিছুই পাকিস্তানের ভাগ্যে জোটেনি।[৫১] অর্থাৎ প্রায় শূণ্য থেকেই পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে যাত্রাশুরু করতে হয়। কিন্তু দেশ বিভাগের সময় থেকেই এমন কিছু ঘটনা ঘটে গেল যে, পাকিস্তানের সাথে ভারতের সুসম্পর্ক আর রক্ষা করা গেল না। এ পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃত্ব একটি শক্তিশালী সেনা বাহিনী গঠনকেই প্রধান কর্তব্য হিসাবে বিবেচনা করে। আইয়ুব খানের বিবরণ থেকেও তেমন একটি মনোভাবই প্রকাশ পায়। আইয়ুব খান লিখেছেনঃ "আমাদের কোন সুগঠিত ইউনিট, যুদ্ধের সরঞ্জাম, এমনকি গোলাবারুদ বলতেও বেশী কিছু ছিল না। অবস্থা এত খারাপ ছিল যে, প্রথম কয়েক বছর আমরা প্রত্যেক সৈনিককে শুধুমাত্র অভ্যাস বজায় রাখার জন্য বছরে মাত্র পাঁচবার ছোড়ার মত গুলির রসদ দিতে পারতাম। .....কিন্তু যে মূহূর্তে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলো তখন থেকেই আমি একটি বিষয় নিশ্চিত জানতাম যে, পাকিস্তানের অস্তিত্ব একটি সুষ্ঠু ট্রেনিংপ্রাপ্ত, সুসজ্জিত এবং সুপরিচালিত সেনাবাহিনী গঠনের সংগে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রয়েছে।"[৫২]

মূলতঃ ভারতের হুমকি মোকাবিলার জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে দ্রুত শক্তিশালী করে গড়ে তোলার প্রয়োজন পড়েছিল।[৫৩] কয়েকটি কারণে পাকিস্তানের সাথে ভারতের বিরোধ বাধে। প্রথমতঃ ভারতীয় নেতৃত্ব কখনও চাননি যে, ভারত বিভক্ত হোক, কিন্তু পাকিস্তানী নেতৃত্বের মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনা ভিত্তিক আন্দোলন ভারতীয় মুসলমানদের কাছে স্বাধীনতার অর্থই পাল্টে দেয়। ভারতীয় মুসলিম সমাজ দৃশ্যতঃ স্বাধীনতা বলতে শুধু ইংরেজ রাজত্বের অবসানকে বুঝতো না, তাঁদের কাছে স্বাধীনতার অর্থ ছিল ইংরেজ ও হিন্দু উভয়ের কবল থেকেই মুক্তি লাভ।[৫৪] ফলে ভারতীয় মুসলিম নেতৃত্বের প্রভাবশালী অংশ ও মুসলিম জনতার ব্যাপক অংশ মনে প্রাণে ভারতের বিভক্তি চেয়েছে। দ্বিতীয়তঃ ভারত বিভক্তির প্রস্তাবটি মেনে নিলেও ভারতের পক্ষ থেকে প্রস্তাব থাকে, দুইটি দেশে একটি সাধারণ সেনাবাহিনী থাকবে। কিন্তু পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ এতে রাজি হয় নি; বরং পাকিস্তানের জন্য একটি স্বতন্ত্র সেনাবাহিনীর সপক্ষে তারা জোর প্রচারণা চালাতে থাকে। তৃতীয়তঃ দেশ বিভাগের সময় বাংলা ও পাঞ্জাবে, বিশেষ করে, পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মারাত্মক রূপ ধারণ করে। পূর্ব পাঞ্জাব থেকে লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে যেমন পশ্চিম পাঞ্জাবে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, তেমনি পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে হিন্দু ও শিখদেরকেও বাস্তুত্যাগে বাধ্য করা হয়। পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে শিখদের আন্দোলন হঠাৎ এক ভয়াবহ আক্রমনাত্মক আকার ধারণ করে। ১৪ ই আগষ্ট পূর্ব পাঞ্জাবে মুসলমান পুলিশদের পর্যন্ত নিরস্ত্র করা হয় এবং এর ফলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরক্ষা

---

৪৭ প্রাগুক্ত, পৃ.১৩।

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮।

৪৯. Jahan, Rounaq (1973): <u>Pakistan- Failure in National Integration</u> ,Dacca: Oxford University Press. p. 25.

৫০. খান, মুহম্মদ আইয়ুব, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭।

৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

৫৩ হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর পার্লামেন্ট বক্তৃতা, ২২ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭ দেখুন, আবদুল্লাহ, কাজী আবু মোহাম্মদ (১৯৭০)ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭-৮৪।

৫৪ খান, মুহম্মদ আইয়ুব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

বাহিনী, এমনকি, নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল।[৫৫] চতুর্থতঃ ভারত কাশ্মীর সম্পর্কিত সমঝোতা ভঙ্গ করলো এবং নিয়মবহির্ভূত পদ্ধতিতে কাশ্মীরের ওপর ভারতীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চাইলো। ফলে পাকিস্তানও কাশ্মীরকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লো। কাশ্মীর ছাড়াও ভারত ঘন ঘন পাকিস্তান সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করতে থাকলো।[৫৬]

ভারতের সঙ্গে বিরোধ ও শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তার পটভূমি সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৫৭ সালের ২২ শে জানুয়ারী জাতীয় পরিষদে সরকারের পররাষ্ট্র সম্পর্কিত নীতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে বলেনঃ

"........দেশ বিভাগের ফলে অবিভক্ত ভারতের সম্পত্তিসমূহ বিভক্ত করা হয় এবং সমরাস্ত্রের একটি অংশ আমাদের ভাগে পড়ে। দুর্ভাগ্য বশতঃ এ ব্যাপারে যে চুক্তি হয়, ভারত তা পালন করেনি এবং আমাদের এসব অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ করেনি। ফলে আমাদের দেশ বিভাগের পরবর্তীকালীন অবস্থা ছিল ক্ষীণ ও দুর্বল এবং এ সময় আমরা আমাদের সীমান্ত, আমাদের স্বাধীনতা ও অখন্ডতা রক্ষায় অক্ষম ছিলাম। যদিও ভারতে এমন কতিপয় দল ও ব্যক্তি ছিল, যারা পাকিস্তান ও ভারতকে পুনরেকত্রীকরণের এবং দেশ বিভাগকে বানচাল করার পরিকল্পনা করে, তথাপি আমরা ভারতের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলাম যে, দেশ বিভাগকে বানচাল করার ইচ্ছে তার নেই। অতএব ১৯৪৯ সালের প্রারম্ভে কাশ্মীরে হানাহানির অবসান ঘটিয়ে একটি সাময়িক মীমাংসা হওয়া সত্ত্বেও ভারত যখন ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে তাঁদের বিবেচনায় কোন যুক্তিযুক্ত কারণে পাকিস্তানের সীমান্তসমূহে আক্রমনোন্মুখভাবে তার সেনাবাহিনী সমাবেশ করে, তখন আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি। ঐ সময় কার্যতঃ আমাদের কোন রক্ষা ব্যবস্থা ছিল না। একটি মীমাংসায় পৌছার জন্যও আসন্ন হামলা প্রতি নিবৃত্ত করার জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে তখন ভারত সফর প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। মীমাংসা হয় এবং কিছুকালের জন্য বিপদাশংকা প্রতি নিবৃত্ত হয়। কিন্তু আবার ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে ভারত অপর কয়েকটি বিরোধের সুরাহা করার জন্য আমাদের সীমান্তসমূহে তার সেনাবাহিনী সমাবেশ আবশ্যক ও যুক্তিযুক্ত মনে করে। এবারেও আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। কারণ যে সরকার পাকিস্তানকে স্বীকৃতি দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সে যে আমাদের ভীতি বিহ্বল ও আক্রমণ করার চেষ্টা করবে, তা আমরা ভাবতে পারিনি।"[৫৭]

এ সময় ভারতের সকল কার্যকলাপ এমন স্থূলভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ছিল যে, স্থিরচিত্ত প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান পর্যন্ত ভারতের সাথে যুদ্ধের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু হিসেব করে যখন দেখা গেল পাকিস্তানের সামরিক শক্তি তখনও এতই দুর্বল যে, ভারতকে আক্রমণ করে তাকে সায়েস্তা করাতো দূরের কথা, সাধারণ একটি হামলাকে প্রতিহত করার ক্ষমতা পাকিস্তানের ছিল না। তখন পাকিস্তানের সমরাস্ত্রের মধ্যে ছিল মাত্র ১৩ টি ট্যাঙ্ক এবং এর ইঞ্জিনগুলির জীবনকাল ছিল মাত্র ৪০ থেকে ৬০ ঘন্টা।[৫৮] এ প্রসঙ্গে বিবরণ দিতে গিয়ে আইয়ুব খান লিখেছেনঃ

১৯৫১ সালে যখন ভারত আমাদের বিরুদ্ধে সমগ্র সীমানা ধরে সৈন্য সমাবেশ করছিল, মনে হয় যুদ্ধের সম্ভাবনা সম্পর্কে জনাব লিয়াকত আলী খানের মনে তখন কোন সন্দেহ ছিলোনা। তিনি বললেন, "আমি এদের এই বিপজ্জনক ভাবভঙ্গী এবং মারাত্মক গতিবিধি দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আসুন এর আমরা একটা চূড়ান্ত ফয়সালা করে ফেলি। আমি তাঁকে বললাম, 'কোনও একটা সিদ্ধান্ত নেবার আগে যুদ্ধ করা যাদের পেশা তাঁদের অভিমত গ্রহণ করা তাঁর উচিত।"[৫৯]

পাকিস্তান এমন একটি সময় সামরিক দিক থেকে এরকম একটি প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলা করছে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পুঁজিবাদীবিশ্ব সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গণচীনকে সামরিকভাবে ঘেরাও করে ফেলার পরিকল্পনা আটছে। ইতিপূর্বেই ন্যাটো জোট গঠিত হয়েছে, রণসজ্জা ও রণকৌশলকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে মার্কিন সমর বিশারদদের নেতৃত্বে তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশকে নিজের প্রভাব বলয়ে নিয়ে আসার জন্য বিভিন্ন ধরনের সামরিক ও অর্থনৈতিক চুক্তি করে চলেছে। অবশ্য এই একই সময় সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে ওয়ারশো জোট হয়েছে। সারা পৃথিবীব্যাপী জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন একটি জনপ্রিয় আন্দোলন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। উল্লেখ্য, ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী জহর লাল নেহেরু সে আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন। সে রকম একটি পর্যায়ে সমাজতান্ত্রিক শিবিরকে রণকৌশলগতভাবে মোকাবিলা করার জন্য পাকিস্তানের উক্ত রাজনৈতিক অবস্থান ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানে তার আধিপত্য বিস্তারের জন্য পাকিস্তানের উক্ত সামরিক প্রতিকূল অবস্থার পুরো সুযোগ গ্রহণ করে। অবশ্য পাকিস্তানের তৎকালীন নেতৃত্বও সোভিয়েত ইউনিয়নের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বেশী পছন্দ করেছিল, আর তাই স্তালিনের আহবান থাকা সত্ত্বেও সেটাকে একটি দর কষাকষির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে। এবং অত্যন্ত অশোভনভাবে সোভিয়েতকে কিছু না জানিয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান আমেরিকায় যান।[৬০] আর এভাবেই পাকিস্তানের সেনাবাহিনী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে গাঁট ছড়া বাধে। ভারতের হুমকির মুখে পাকিস্তানের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব নয়-এটাই ছিল পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃত্বের মূল যুক্তি। মার্কিনীদের সাথে সিয়াটো চুক্তি ও পরবর্তীকালে বাগদাদ চুক্তিতে যোগ দেয়ার অপরিহার্যতা ও যৌক্তিকতা সম্পর্কে বিবরণ দিতে গিয়ে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বলেন,

"আমরা এমন সব বিপদ দেখেছি, যা কয়েকদিক থেকে আমাদের বেষ্টন করেছে। আমরা নিজেদের রক্ষা করার মত যথেষ্ট বড় নই, যথেষ্ট শক্তিশালী নই। আমাদেরকে অন্যদের কাছ থেকে সামরিক সাহায্য চাইতে হয়। কারণ আমাদের সংগতি নেই। ....ভারত একটি বিরাট দেশ। সে বিদেশে কোন কিছুর জন্য অর্ডার পেশ করে তার মূল্য দিতে পারে। যেখানে আমাদের একটি মাঝারি ধরনের বোমারু বিমান নেই, সেখানে তারা ৬৫ টি ক্যানবেরা বিমান কিনতে পারে। ক্যানবেরা বিশ্বের দূরতম পাল্লার সর্বাধিক আধুনিক বোমারু বিমান। আর সে গুলি নিজস্ব সম্পদ দ্বারা কিনবার মত সংগতি ভারতের রয়েছে। ভারত ৩০০ সেঞ্চুরিয়ান ট্যাঙ্ক,- যা বিশ্বের

---

৫৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

৫৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

৫৭ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পার্লামেন্ট বক্তৃতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭-৭৮।

৫৮ খান, মুহম্মদ আইয়ুব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

৫৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

৬০ আহাদ, অলি (প্রকাশ কাল নেই): *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫*. ঢাকাঃ বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, পৃ. ১৮১।

Dhaka University Institutional Repository

শক্তিশালী ট্যাঙ্ক, কিনতে পারে এবং সেগুলির মূল্য দেয়ার মত ক্ষমতা রাখে। ....৫ কোটি পাউন্ড মূল্যে একটি নৌবহর খরিদ করতে পারে, ...তারা বিমানবাহী জাহাজ, ডেষ্ট্রয়ার ও ক্রুজারও খরিদ করতে পারে। ......পাকিস্তানের সমগ্র সম্পদ, যা সরকারের হাতে আসে, তার দ্বারা এসব সম্ভব নয়। আর সে জন্যই আমাদের অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হয়। ... এ জন্যই আমাদের প্রয়োজন বন্ধুর, যাঁরা আক্রমণাত্মক যুদ্ধের সময় আমাদের রক্ষা করতে পারেন।"[৬১]

বৃহৎ একটি দেশ ভারত, যার নিজের সম্পদের ওপর দাঁড়িয়েই বড় ধরনের সমরসজ্জা করার ক্ষমতা রয়েছে, সে ধরনের একটি দেশের পক্ষ থেকে পাকিস্তানের নিরাপত্তা হুমকি হয়ে ওঠেছিল বলেই তার সেনা বাহিনীকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু শক্তিশালী একটি সামরিক বাহিনী গড়ে তোলার জন্য যে আভ্যন্তরীন সম্পদ দরকার ছিল তা পাকিস্তানের ছিলনা। পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাবে, পাকিস্তানের প্রথম ৯ বছরে সদর দপ্তর ও প্রতিরক্ষা খাতেই ব্যয় করা হয়েছে তার জাতীয় আয়ের শতকরা ৭০ ভাগ অর্থ এবং নিরাপত্তা বাহিনী গড়ে তোলার কাজেই সে অর্থের সিংহ ভাগ ব্যয় হয়েছে। কিন্তু এ অর্থ দিয়েও ভারতের সাথে সমর সজ্জার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের একাংশও অর্জন করা সম্ভব নয় বলে সোহরাওয়ার্দী দাবি করেছেন। তার মতে একমাত্র মার্কিনের সহযোগিতা নিয়েই এ যোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব। যে পরিস্থিতিতে ১৯৫০ কিংবা ১৯৫১ সালে ভারত পাকিস্তানকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছিল এবং পাকিস্তান আপোস রফার মাধ্যমে সে আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করেছে– সে রকম অবস্থা আবার সৃষ্টি হলে যাতে নিজ সামরিক শক্তি বলে তাকে প্রতিহত করা যায়– এটাই ছিল পাকিস্তানের সমর সজ্জার উদ্দেশ্য।[৬২] সে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পাকিস্তান বন্ধু অনুসন্ধান করতে থাকে। সোহরাওয়ার্দীর ভাষায়, "আমাদের সম্পদ সীমাবদ্ধ এবং আমরা সম্পূর্ণরূপে প্রতিরক্ষামূলক উদ্দেশ্যে আমাদের সেনাবাহিনীর জন্য জাতীয় অর্থনীতির সক্ষমতার চাইতেও অনেক বেশী অংশ ব্যয় করেছি। অতএব মিত্রের খোঁজ করা আমাদের প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং সৌভাগ্য ক্রমে এমন সব দেশ আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে, যারা জীবন সম্পর্কে একই দৃষ্টিভঙ্গির এবং গণতান্ত্রিক সরকার সম্পর্কে একই পদ্ধতির অনুসারী। আমরা আমাদের মিত্র যুক্তরাষ্ট্রকে সামরিক সাহায্য দানের অনুরোধ জ্ঞাপনের আবশ্যকতা বোধ করি এবং তদনুযায়ী একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী আমরা কিছু পরিমাণ সামরিক সাহায্য পেয়েছি।

" আমেরিকা আরো ৪০ টি দেশের ন্যায় আমাদেরও যে অর্থনৈতিক সাহায্য দিচ্ছে, তার বাইরে প্রাপ্ত এই সাহায্য আমাদেরকে যে কোন মহল থেকে হামলার মোকাবেলা করার মত যথেষ্ট শক্তিশালী করেছে।"[৬৩] সোহরাওয়ার্দীর উপরোক্ত বক্তব্য থেকে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়; ১. পাকিস্তান এমন একটি শক্তিশালী মিত্র অনুসন্ধান করছিল যে নীতিগতভাবেও পাকিস্তানের সাথে একমত; ২. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল পাকিস্তানের সে ধরনের একটি মিত্র দেশ, যে এত বিপুল পরিমাণ সাহায্য দিয়েছে যা, যে- কোন মহলের হামলাকে প্রতিহত করার মত পাকিস্তানকে যথেষ্ট শক্তিশালী করেছিল। অর্থাৎ পাকিস্তানকে দেওয়া মার্কিনী এ সামরিক সাহায্য ছিল এত ব্যাপক যে, পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর মত একটি দুর্বল বাহিনীও সম্ভাব্য ভারতীয় আক্রমণকে মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছে।

উপরে নীতিগত অবস্থানের কথা বলা হলেও পাকিস্তান যে সে সময় সর্বাধিক পরিমাণে সামরিক সাহায্য পেতেই বেশী আগ্রহী ছিল সে কথা সোহরাওয়ার্দীর নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, "কিন্তু আমরা মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সহযোগিতা না করলে যে পরিমাণে আমরা এ সাহায্য লাভ করেছি, সে পরিমাণে তা পাওয়া যেতনা। এ জন্য তুরস্ক ও ইরাকের মধ্যকার চুক্তির সুযোগ গ্রহণ এবং বাগদাদ মোটে যোগদান আমাদের আবশ্যক হয়ে পড়ে।"[৬৪] অর্থাৎ এ সকল জোটে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের কোন নীতিগত অবস্থান কাজ করেনি, বরং এ সকল জোটের সাথে থাকলে বেশী বেশী সামরিক অর্থনৈতিক সাহায্য পাওয়া যাবে এটাই হচ্ছে আসল কথা। তাই সোহরাওয়ার্দী বলেছেন, "আমার কাছে একটি স্বাধীন সত্ত্বা হিসাবে পাকিস্তানের অস্তিত্বই মুখ্য ব্যাপার। আর এ জন্য সর্ব প্রকার সম্ভাব্য পন্থা গ্রহণ না করলেই আমি আমার কর্তব্যচ্যুত হব।'[৬৫] তিনি অন্য এক বিদেশীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "আপনার নিজের অস্তিত্বই যদি বিপন্ন হয়ে পড়ে, তাহলে সাহায্যের জন্য শয়তানের কাছে যাওয়াও আপনার পক্ষে যুক্তিযুক্ত হবে"।[৬৬] অর্থাৎ এসব বক্তব্য থেকে এটা খুবই পরিষ্কার যে, মার্কিনী অস্ত্র সাহায্য গ্রহণের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের কোন নীতিগত অবস্থান ছিল না। দ্বিতীয়তঃ বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিরাট সামরিক সাহায্য পেয়ে পাকিস্তান দুর্বল সামরিক অবস্থান থেকে ভারতের কাছে হুমকি হয়ে ওঠেছিল। আর এজন্য তাকে মার্কিনীদের কাছে নিঃশর্ত আনুগত্য প্রকাশ করতে হয়েছিল। এটা শুধু রাজনৈতিক আনুগত্যের ব্যাপার ছিল না। সোহরাওয়ার্দীর উক্ত বক্তৃতাতেই ফুটে উঠেছে যে, এটা ছিল পরিপূর্ণভাবে সামরিক আনুগত্য। আর এ আনুগত্য যে কত গভীর ছিল তা সোহরাওয়ার্দীর নিম্নোক্ত কথাগুলি থেকে বোঝা যায়। সোহরাওয়ার্দী তার দীর্ঘ বক্তৃতার এক পর্যায়ে বলেছেনঃ "আমি যদি একথা বলে আমার বক্তব্য শুরু করতাম যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অন্তরঙ্গতার চাইতেও বেশী সুনিবিড় তাহলে আমি বেশি আনন্দিত হতাম, এবং সেটাই যথাযথ হতো। যুক্তরাষ্ট্র আমাদের বন্ধু ও মিত্র। যথেষ্ট ক্ষমতাবান এমন একটি দেশ আপনার পেছনে থাকলে সেটা মঙ্গলের কথা। যে দেশ আপনার আঞ্চলিক অখন্ডতা ও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের নিশ্চয়তা দিতে পারে, যারা বিপদের ঝুকি গ্রহণ করতে প্রস্তুত রয়েছে, তাদের সংখ্যা বেশী নয়। ...এই নিশ্চয়তা ছাড়াও তাঁদের কাছ থেকে আমরা এমন সাহায্য পেয়েছি যাতে আমরা বিপদের আশঙ্কায় ডানে বামে ও সমুখে পশ্চাতে না তাকিয়ে আমাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অনেকখানি উৎসাহিত হয়েছি। ....তারা যেভাবে আমাদের খাদ্যসংকট নিরসনে সাহায্য করেছে এবং আমাদেরকে খাদ্যের প্রয়োজন মেটাবার ব্যাপারে সক্ষম করে তুলছে, তাতে আমরা তাঁদের কাছে দ্বিগুণ পরিমানে কৃতজ্ঞ।"[৬৭]

সোহরাওয়ার্দী মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রকে অভয় দেওয়ার জন্য আরো বলেছেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি এবং আমাদের সাথে সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য যাঁরা দায়ী, আমাদের প্রশংসা দৃষ্টে তারা নিশ্চয়ই খুশী হয়েছেন। এথেকে তাঁদের এ শিক্ষাই গ্রহণ করা উচিত যে, পাকিস্তানীরা বন্ধুদের গুণের স্বীকৃতি দিতে জানে। তাঁদের স্মরণরাখা উচিত যে, আমরা সর্বান্তঃকরণেই তাঁদের সঙ্গে আছি। তাঁরাও

---

৬১ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পার্লামেন্ট বক্তৃতা, প্রাগুক্ত, পৃ-৮২, ১১৩।
৬২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।
৬৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮–৭৯।
৬৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।
৬৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।
৬৭ প্রাগুক্ত, পৃ.৯২।

Dhaka University Institutional Repository

সর্বান্তঃকরণেই আমাদের সঙ্গে আছেন। আমরা ছোট হতে পারি, ক্ষুদ্র হতে পারি, কিন্তু সময় আসলেই তাঁরা দেখতে পাবেন, আমাদের চেয়ে বড় ও নির্ভরযোগ্য বন্ধু আর কেউ নেই।"[৬৮]

সোহ্‌রাওয়ার্দী তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বিভিন্ন ধরনের চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার কারণ ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করার পর পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত বিলটি জাতীয় পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।[৬৯] অর্থাৎ পাকিস্তান তার জন্মের প্রথম দশকের মধ্যেই সামরিক শক্তি ও অর্থনৈতিক দিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। জাতীয় উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সকল খাতকে যথাযথ গুরুত্ব না দিয়ে, জাতীয় আয়ের প্রধান অংশকে সামরিক খাতে ব্যয় করেও যখন পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ভারতীয় বাহিনীর একাংশের কাছাকাছিও পৌঁছাতে পারেনি, সে পর্যায়ে মার্কিন অস্ত্র সাহায্যের বদৌলতে পাকিস্তান বাহিনী ভারতীয় বাহিনীর জন্য রীতিমত হুমকির কারন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সামরিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানকে ১৯৫৭ সালের মধ্যেই এ পর্যায়ে পৌঁছাতে স্বাভাবিকভাবেই যে জাতীয় উন্নয়নের অন্যান্য খাতকে উপেক্ষা করতে হয়েছে তা পাকিস্তানের প্রথম নয় বছরের উন্নয়নের আলোচনাতেই পরিষ্কার হয়েছে। ফলে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চেয়ে সামরিক বাহিনীর এ বিস্ময়কর ও দ্রুততম বর্ধন। আর তাই প্রথমে প্রতিরক্ষা সচিব ইস্কান্দার মির্জাকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীরূপে নিয়োগ এবং তারপর স্বয়ং সেনাবাহিনী প্রধান আইয়ুব খানকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীরূপে নিয়োগ সামরিক বাহিনীর স্বকীয় ও স্বাধীন অস্তিত্বকে নির্দেশ করে। আর সামরিক বাহিনী যে সরকার থেকে কতটা নিয়ন্ত্রণমুক্ত ছিল তা তৎকালীন প্রধান মন্ত্রীর সাথে সামরিক বাহিনী প্রধানের কথপকথনের মাধ্যমে খুবই পরিষ্কার রূপে ফোটে ওঠেছে। পাকিস্তানে তখন সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। হাসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী তখন প্রধানমন্ত্রী। সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে প্রধান সেনাপতি আইয়ুব খানের কিছু পূর্ব মনোমালিন্য ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশের প্রধানমন্ত্রী ও সেই সুবাদে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত সোহ্‌রাওয়ার্দী সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে আইয়ুব খান লিখেছেনঃ

"সোহ্‌রাওয়াদী প্রেসিডেন্ট ভবনে এসেছিলেন। আমি তাকে বললাম, আমার প্রতি তাঁর কি মনোভাব তা আমার জানা আছে এবং নিশ্চয় তিনিও তাঁর প্রতি আমার মনোভাবের বিষয় জ্ঞাত রয়েছেন। তবু তিনি আইনতঃ এবং সঙ্গতভাবে যেসব আদেশ দেবেন প্রধান সেনাপতি হিসাবে তা আমি প্রতিপালন নিশ্চয়ই করবো। এবং একই সময়ে আমি এও প্রত্যাশা করবো যে, সেনাবাহিনীর আভ্যন্তরীন ব্যাপারে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হবে না।"[৭০] সরকার প্রধান এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তির সাথে এ ধরনের ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ কিভাবে একজন প্রধান সেনাপতি করতে পারেন? এটা ব্যক্তিগত সাহস কিংবা যোগ্যতার কোন ব্যাপার নয়। আসলে রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণকারী শ্রেণী বা প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষমতা-ভারসাম্যের নির্দিষ্ট অবস্থাই প্রধান সেনাপতিকে এ ধরনের আচরণ করার সাহস যুগিয়েছে। আইয়ুবের স্বীকারোক্তি অনুযায়ীই দেখা যায়, সোহ্‌রাওয়ার্দীর সরকার কোন দিনই সামরিক বাহিনীর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোন রকম হস্তক্ষেপ করেননি।[৭১] এমনকি, অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে যখন আবুল মনসুর আহমদ দায়িত্ব প্রাপ্ত তখন সেনাবাহিনী সম্পর্কে সাধারণ খোঁজ খবর নিতেও তাকে লজ্জাকরভাবে বাধা দেওয়া হয়েছে।[৭২] অর্থাৎ সেনাবাহিনীর ওপর সরকারের বা রাষ্ট্রের অপরাপর অংশের কোন নিয়ন্ত্রণই ছিলনা। এটা যে অপ্রকাশ্য একটি ব্যাপারছিল তা নয়, সেনাবাহিনী তা প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েই তাঁদের নিয়ন্ত্রণহীন সত্ত্বাকে প্রকাশ করতো। সমাজে এবং রাজনীতিতে তাঁদের প্রভাব এতটা ছিল যে, সরকার কখনও কোন সংকটে গড়লে সেনাবাহিনীর কাছে গিয়ে সমাধান চাইতো। ১৯৫৬ সালে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর সরকার যখন বিপর্যস্ত তখন প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলী প্রধান সেনাপতির কাছে গিয়ে কাকুতি-মিনতি করে বলছেন, "আপনি সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ করে আমাকে এ বিপদ থেকে বাঁচান না কেন?"[৭৩] একজন সাংবিধানিক সরকারের প্রধান কি অবস্থায় সেনাবাহিনী প্রধানের কাছে মিনতি করতে পারেন? সেনাবাহিনীকে রাষ্ট্রের সমান্তরাল ভাবলেও একজন বিপর্যস্ত প্রধানমন্ত্রী এ ধরনের প্রস্তাব প্রধান সেনাপতির কাছে দিতে পারে না। ১৯৫৪ সালেই পাকিস্তানের রাজনীতিতে সেনাবাহিনী কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেছিল তার প্রমাণ তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল গোলাম মুহম্মদ প্রধান সেনাপতির কাছে যে সব প্রস্তাব দিয়েছিলেন তার প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য করলেই পাওয়া যায়। সে সময় জাতীয় পরিষদের এক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গভর্ণর জেনারেলের কিছু ক্ষমতাকে খর্ব করা হয়েছিল। উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা কিংবা একে অনুমোদন না করার ক্ষমতা গভর্ণর জেনারেলের যে ছিল তা আগের আলোচনাতেই দেখা গেছে। কিন্তু গভর্ণর জেনারেল তার সে ক্ষমতাকে প্রয়োগ না করে প্রধান সেনাপতিকে তুষ্ট করার জন্য বিভিন্ন ধরণের ক্ষমতা ও অধিকার তাকে প্রদান করার প্রস্তাব করেছেন। দেশে অনেক সংবিধান বিশেষজ্ঞ থাকা সত্ত্বেও তিনি সেনাবাহিনী প্রধানকে তিন মাসের মধ্যে একটি সংবিধান প্রনয়নের খসড়া প্রস্তুত করার প্রস্তাব করেছেন। আইয়ুব খান লিখেছেন, "....তিনি বালিশের তলা থেকে টেনে দুখানি দস্তাবেজ বের করলেন। একখানার ওপর এ রকম লেখা ছিলঃ আমি গোলাম মুহম্মদ অমুক অমুক পরিচয়, এ-কারণে ও-কারণে জেনারেল আইয়ুব খানকে এ-প্রকার সে-প্রকার ইত্যাকার ক্ষমতা প্রদান করিতেছি। আদেশ প্রদান করিতেছি তিনি তিন মাসের মধ্যে একটি শাসনতন্ত্র প্রস্তুত করিয়া আমাকে প্রদান করিবেন। ....অন্য দস্তাবেজটি ছিল এইভাবে লিখিত যে, আমি তার প্রস্তাব গ্রহণ করেছি।"[৭৪] প্রসংগত উল্লেখ যোগ্য যে, আইয়ুব খান এ সকল ক্ষমতা ও অধিকার না নিলেও সংবিধান রচনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। আইয়ুব প্রস্তাবিত এ সংবিধান জাতীয় পরিষদে পরিপূর্ণ রূপে অনুমোদন হয়নি সত্য। কিন্তু আইয়ুব উথাপিত এ প্রস্তাবের কারণেই সকল রাজনৈতিক দল সন্ত্রস্ত হয়ে 'মারি চুক্তি'তে সম্মত হয় এবং যারই সংশোধিত ও বিকৃত ফলাফল আকারে ১৯৫৬ সালের সংবিধান রচিত ও অনুমোদিত হয়।[৭৫] সে সময় আইয়ুবের প্রস্তাবিত সংবিধান জাতীয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত না হলেও সামরিক শাসন কায়েম করে আইয়ুব তার সেই মূল নীতির ভিত্তিতেই বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করেন। আইয়ুব খান যখন পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনা ও নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে উক্ত

---

৬৮ প্রাগুক্ত, পৃ.১০৩।
৬৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।
৭০ খান, মুহম্মদ আইয়ুব (১৯৬৮)ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।
৭১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।
৭২ আহমদ, আবুল মনসুর (১৯৬৮)ঃ আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর। ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, পৃ. ৪১৭-১৯।
৭৩ খান, মুহম্মদ আইয়ুব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।
৭৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭-৬৮।
৭৫ আহমদ, আবুল মনসুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪, ৩১৯।

Dhaka University Institutional Repository

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন ঠিক তখনই জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়োজিত হন। ইস্কান্দার মির্জা সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তা হিসাবেই বৃটিশ ভারতের রাজনৈতিক সার্ভিসে যোগ দেন। সে সুবাদেই তিনি পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা সচিব নিযুক্ত হন। ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর নিযুক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি উক্ত পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি খুব স্বল্প সময় পূর্বপাকিস্তানের গভর্ণর থাকার পরই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রে চলে আসেন।[৭৬] এর পরই ১৯৫৬ সালে প্রথমে অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন এবং তারপর পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। অর্থাৎ পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি থেকে আইয়ুব খান আর ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্র বিন্দুতে চলে আসেন। যা হোক, উপরোক্ত আলোচনা থেকে একটি বিষয় খুব পরিস্কার যে, পঞ্চাশের দশকে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণমুক্ত ও স্বাধীন একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। আর তখন থেকে দেশের উন্নয়নের সকল খাতকে উপেক্ষা করে একমাত্র সেনাবাহিনীকে গড়ে তোলার জন্য উন্নয়ন বাজেটের প্রধান অংশকে ব্যয় করা শুরু হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রাপ্ত বিপুল পরিমাণ সামরিক সাহায্যের বদৌলতে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী এতটা প্রবল সামাজিক শক্তি রূপে আত্মপ্রকাশ করে যে, রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা সরকার অথবা কোন রাজনৈতিক দল ও শ্রেণী-পেশার সংগঠন। কারো পক্ষেই সামরিক বাহিনীর প্রতি পক্ষেই পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে। তবে এখানে একথা বলা খুবই প্রাসঙ্গিক যে, পঞ্চাশের দশকের গোড়া থেকেই সামরিক বাহিনী পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রায় একমাত্র নিয়ামক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। অর্থাৎ সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধান কখন কি ভাবছেন তার চেয়েও সেনাবাহিনীর অভিমতটিই নিয়ামক বিষয় হিসাবে সামনে চলে আসে। আর সে কারণেই সম্ভবতঃ সোহ্‌রাওয়ার্দীর মত একজন বিশাল ব্যক্তিত্বকেও ভারতের বিরুদ্ধে অনলবর্ষী বক্তৃতা করতে হয়, মার্কিনের সাথে বিভিন্ন সামরিক চুক্তির সপক্ষে জোরালো যুক্তি দিয়ে তথাকথিত "শূণ্য তত্ত্ব" হাজির করতে হয়। এমনকি, প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় 'পূর্ব পাকিস্তানে আটানব্বই ভাগ সায়ত্বশাসন এসে গেছে'- এ ধরনের বক্তব্যও তাকে বলতে হয়। কিন্তু রাষ্ট্র ক্ষমতার বাইরে কিংবা অনুকূল পরিবেশে ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় তাকে কোন দিনই এ ধরনের বক্তব্যকে প্রশ্রয় দিতে দেখা যায়নি।[৭৭]

তবে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের অধীনে আভ্যন্তরীন শক্তি বিন্যাসের মধ্যে সামরিক বাহিনীর এই প্রভূত্বকারী অবস্থান থাকলেও এটাই পাকিস্তান রাষ্ট্রের চরিত্রকে বোঝার জন্য যথেষ্ট নয়। পঞ্চাশের দশকের গোড়া থেকেই পাকিস্তান তার সার্বভৌমত্ব রক্ষার নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশের সাথে যে-সকল সামরিক চুক্তি সম্পাদন করে, রাষ্ট্রের চরিত্রকে বুঝতে হলে সেগুলিকেও বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। ১৯৫৪ সালের ১৯শে মে পাকিস্তানের সাথে আমেরিকার যে সামরিক চুক্তি সম্পাদিত হয় তার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা নীচে উল্লেখ করা হলোঃ

<u>১ম পরিচ্ছেদ, ২য় অনুচ্ছেদঃ</u> " যে উদ্দেশ্যে এই সাহায্য দেওয়া হচ্ছে, পাকিস্তান সরকার যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পূর্বে চুক্তিবদ্ধ না হয়ে অপর কোন উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার করতে পারবে না।" উল্লেখ যোগ্য যে, এই অপ্রকাশিত ধারা অনুসারে পাক বাহিনীর চল্লিশ হাজার সৈন্যের যাবতীয় ব্যয়ভার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বহন করতো এবং এর বিনিময়ে পেশওয়ারের সন্নিকটে যুক্তরাষ্ট্রকে সামরিক ঘাঁটি নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।[৭৮]

<u>৪র্থ পরিচ্ছেদ, ১ম অনুচ্ছেদঃ</u> "যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নিকট থেকে পাকিস্তান সরকার যে সকল কর্মচারী পাবেন, তাঁরা চুক্তি অনুসারে পাকিস্তানে অবস্থান করে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের দায়িত্ব পালন করবে এবং চুক্তি অনুযায়ী প্রদত্ত সাহায্য কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করার কর্তৃত্ব ও প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা পাবেন।"

<u>৫ম পরিচ্ছেদ ২ (ক) অনুচ্ছেদঃ</u> "পারস্পরিক সাহায্যের নীতি অনুসারে পাকিস্তান সরকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজনে এমন সব কাঁচামাল বা আংশিকভাবে নির্মিত দ্রব্যাদির উৎপাদন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি বা যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হস্তান্তর করবে, যা পাকিস্তানে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন সম্ভব।"

<u>৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ</u> "পারস্পরিক নিরাপত্তার প্রয়োজনে বিশ্ব শান্তির পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ এমন সব রাষ্ট্রের সাথে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে পাকিস্তান সরকার যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সহযোগিতা করবে।"[৭৯]

পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির উপরোক্ত ধারাসমূহের দিকে লক্ষ্য করলেই একথা খুবই পরিস্কার হয়ে ওঠে যে, এ চুক্তিবলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে কোন সময়ে পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতি, আভ্যন্তরীন অর্থনীতি ইত্যাদিতে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি পেয়েছিল। আর মার্কিন বিশেষজ্ঞদের সরাসরি উপস্থিতি এবং সামরিক সাহায্যের ওপর তাঁদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সামরিক বাহিনীর ওপর তারা গভীরভাবে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। পরবর্তীকালে যে বাগদাদ চুক্তি ও সিয়াটো চুক্তি করা হয় তার মধ্যে অন্যতম যে ধারাটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তা হচ্ছেঃ শর্ত মোতাবেক চুক্তিভুক্ত কোনদেশ যদি আভ্যন্তরীন ধ্বংসাত্মক কার্যাবলীর দ্বারা বিপদাপন্ন হয়, তবে চুক্তিভুক্ত অন্যান্য দেশ বিপদাপন্ন মিত্র দেশে পুলিশ ও ফৌজ পাঠিয়ে সাহায্য করবে।[৮০] বলা বাহুল্য, এসব চুক্তির মূল উদ্যোক্তা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

উল্লিখিত চুক্তি দুটির শর্তাবলী থেকেও দেখা যায় যে, পাকিস্তান প্রায় পরিপূর্ণভাবে মার্কিনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক দিক থেকে এসকল চুক্তির প্রতিকূল প্রভাব খুব বেশী না থাকলেও সামরিক ক্ষেত্রে পাকিস্তান হয়ে পড়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল। কেননা, যে-আধুনিক প্রযুক্তির সংযোজনের ফলে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী শক্তিশালী হতে পেরেছিল সে প্রযুক্তি ব্যবহারের স্বাধীনতা তার ছিল না। অর্থাৎ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর শক্তির এ ব্যাপারটা হয়ে পড়ে শর্তাধীন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুমতি ব্যতিরেকে পাকিস্তান কোন ধরনের আধুনিক সামরিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারত না। শুধু তাই নয়, সেনাবাহিনীর স্বাধীন ভূমিকার ব্যাপারেও এসব শর্ত প্রত্যক্ষ ক্রিয়াশীল ছিল। আর এভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের চরিত্রের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বিশেষভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে।

---

৭৬. Aleem-al- Razee (1988): <u>Constitutional Glimpses of Martial Law in India, Pakistan and Bangladesh</u>, Dhaka: UPL, P.26.

৭৭. আবদুল্লাহ, কাজী আবু মোহাম্মদ (১৯৭০)ঃ <u>শহীদ সোহরাওয়ার্দী</u>, ঢাকাঃ সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ, পৃ. ১৫-৫০।

৭৮. আহাদ, অলি (-) <u>জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫</u>, ঢাকাঃ বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি, পৃ.১৬৬।

৭৯. উধৃত,প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬-৬৭।

৮০. প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

৬.২ পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অর্থনীতিঃ ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮

পাকিস্তান রাষ্ট্র ১৯৬৮-৬৯ সালে এসে যে পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল এবং তার মাধ্যমে যে সকল কর্ম সম্পাদিত হয়েছিল তা সম্যকরূপ অনুধান করতে হলে তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। আর তা করতে হলে পাকিস্তান যে প্রধান দু'টি অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয়েছিল এবং ভারত বিভাগের ফলাফল সে দু'টি অঞ্চলে কিরকম হয়েছিল তা প্রথমেই জেনে নেওয়া আবশ্যক। এরপর সামগ্রিকভাবে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের অবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ দরকার। এ দু'টি বিষয় পরিষ্কার হলে রাষ্ট্রের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের যৌক্তিকতা ও পরম্পর্য খুঁজে বের করা সহজ হবে। যদিও তাত্ত্বিক আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে যে, বিভিন্ন শ্রেণীর সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্কের ভিত্তিতেই তার চরিত্রের নির্দিষ্ট রূপটি নিরূপিত হয়ে থাকে, তবু হাজার মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত দুই অঞ্চল নিয়ে যে রাষ্ট্রটি গঠিত সেখানে একটি অঞ্চলের একটি শ্রেণীর বিকাশ অন্য অঞ্চলে এই শ্রেণীর বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে কিনা তার ওপরই দুই অঞ্চলের উক্ত শ্রেণীর সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্কটির ধরন নির্ভর করে। এরকম সমস্যাদেখা দিলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের চরিত্র বিশ্লেষণের জন্য নতুন একটি মাত্রা যোগ করা প্রয়োজন হবে।

পাকিস্তানের জন্মলগ্নেই তার অঞ্চল দুটিতে কিছু বাস্তব বৈষম্য লক্ষণীয়। যদিও পূর্ববাংলা ছিল উর্বর জমি আর প্রচুর বৃষ্টিপাত সমৃদ্ধ একটি অঞ্চল কিন্তু কলকাতাকে কেন্দ্র করে শুধু বাংলায় একটি পরিপূরক অর্থনীতিগড়ে উঠেছিল যা, বাংলা ভাগ হওয়া তথা কলকাতার ওপর অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে ভেঙ্গে পড়ে। তাই পাকিস্তানের জন্মলগ্নেই পূর্ববাংলা পাকিস্তানের একটি অনুন্নত প্রদেশ হিসাবে আবির্ভূত হয়।[৮১] অন্যদিকে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলার বিত্তবান শ্রেণী বলতে যাদেরকে বোঝাতো সেই জমিদারদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু সমাজভুক্ত। ব্যবসায়ী ও মহাজনরাও বেশির ভাগ ছিল হিন্দু। ভারত বিভাগের পর এই বিত্তবান হিন্দুদের অধিকাংশই পূর্ববাংলা ছেড়ে চলে যায়। তারা তাঁদের সম্পত্তির প্রধান অংশ বিভিন্ন রকম বৈধ ও অবৈধ পন্থায় ভারতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এর ফলে পূর্ববাংলার বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি হাত ছাড়া হয়।[৮২] পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভারত বিভাগের সময় পাঞ্জাবের পুর্বাঞ্চল থেকে যেমন মুসলমানদেরকে বিতাড়িত করা হয়। তেমনি পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে ধনবান শিখদের সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে তাঁদেরকে নিঃস্ব করে ভারতে বিদায় করে দেওয়া হয়।[৮৩] ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের অর্থনৈতিক প্রাধান্য গুরুত্বপূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়। পশ্চিম পাঞ্জাব বস্তিচ্যুত শিখদের সমুদয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের মালিক হয়। এছাড়া, ভারত থেকে যে সকল মুসলমান ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি পাকিস্তানে আসে তাতে পশ্চিম পাকিস্তানের বেশ লাভ হয়। কেননা পাকিস্তানের পশ্চিমাংশে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং মুসলিম লীগের মুলনেতৃত্ব পশ্চিম পাকিস্তান কেন্দ্রিক হওয়ার কারণে এমনকি পাকিস্তানবাদী রাজনীতির মূল কেন্দ্রবিন্দু পশ্চিম পাকিস্তানে থাকার কারণে একদিকে যেমন লক্ষ লক্ষ মুহাজির পশ্চিমাঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে, তেমনি যেসব ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি ভারত থেকে এসেছিল তারাও পশ্চিম পাকিস্তানে বসতি স্থাপন করে। ব্যপক সংখ্যক মুহাজিরের পুর্নবাসন আর শক্তিশালী কেন্দ্র গঠনের নামে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তী বছরগুলিতে দেশের সমূদয় সম্পত্তি পশ্চিম পাকিস্তানের নগরকেন্দ্র সমূহে পুঞ্জিভূত হয়।

সারণী ৬.১

১৯৪৮/৪৯-১৯৫১/৫২ (এপ্রিল-মার্চ) কালপর্বে পাকিস্তানের পুঁজি সঞ্চালনের (Capital Movement) স্বরূপ (কোটি টাকার হিসেব)

এলাকা/সাল	মোট প্রাপ্তি (Receipts)			মোট প্রদান (Payments)			ভারসাম্য
	মুহাজির পুঁজিরআন্তঃ প্রবাহ	কেন্দ্র থেকে রাজস্ব উদ্বৃত্ত	মোট	কালোবাজারী ও বৈদেশিক মুদ্রা পাচার বাবদ হিন্দু পুঁজির বহির্গমন	কেন্দ্রের জন্য রাজস্ব উদ্বৃত্ত	মোট	
পূর্ব পাকিস্তান							
১৯৪৮-৪৯	-	-	-	১৩৭.০০	১৩.০৫	১৫০.০৫	-১৫০.০৫
১৯৪৯-৫০	-	-	-	১৬.৩২	২০.৩৩	৩৬.৬৫	-৩৬.৬৫
১৯৫০-৫১	-	-	-	৪৫.২৭	২১.৩৪	৬৬.৬১	-৬৬.৬১
১৯৫১-৫২	-	-	-	৭৩.৭৩	৩৪.৯৫	১০৮.৬৮	-১০৮.৬৮
মোট(১৯৪৮/৪৯-১৯৫১/৫২)	-	-	-	২৭২.৩২	৮৯.৬৭	৩৩১.৯৯	-৩৬১.৯৯
পশ্চিম পাকিস্তান							
১১৯৪৮-৪৯	-	১৩.০৫	১৩.০৫	-	-	-	+১৩.০৫
১৯৪৯-৫০	৫.৫৮	২০.৩৩	২৫.৯১	-	-	-	+২৫.৯১
১৯৫০-৫১	-	২১.৩৪	২১.৩৪	-	-	-	+২১.৩৪
১৯৫১-৫২	-	৩৪.৯৫	৩৪.৯৫	-	-	-	+৩৪.৯৫
মোট(১৯৪৮/৪৯-১৯৫১/৫২)	৫.৫৮	৮৯.৬৭	৯৫.২৫	-	-	-	+৯৫.২৫
মোট পাকিস্তান							
১৯৪৮-৪৯	-	১৩.০৫	১৩.০৫	১৩৭.০০	১৩.০৫	১৫০.০৫	-১৩৭.০০
১৯৪৯-৫০	৫.৫৮	২০.৩৩	২৫.৯১	১৬.৩২	২০.৩৩	৩৬.৬৫	-১০.৭৪
১৯৫০-৫১	-	২১.৩৪	২১.৩৪	৪৫.২৭	২১.৩৪	৬৬.৬১	-৪৫.২৭
১৯৫১-৫২	-	৩৪.৯৫	৩৫.৯৫	৭৩.৭৩	৩৪.৯৫	১০৮.৬৮	-৭৩.৭৩
মোট(১৯৪৮/৪৯-১৯৫১/৫২)	৫.৫৮	৮৯.৬৭	৯৫.২৫	২৭২.৩২	৮৯.৬৭	৩৬১.৯৯	-২৬৬.৭৪

সূত্রঃ- Government of East Pakistan (1955): Statistical Abstract for East Pakistan Dacca: Planning Department of E.P.Govt. Vol.I, p.253.

---

৮১. রহমান, আতিউর ও লেনিন আজাদ (১৯৯০)ঃ ভাষা আন্দোলনঃ অর্থনৈতিক পটভূমি. ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃ. ১০৩।

৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩-৪।

৮৩. সোবহান, রহমান (১৯৮২)ঃ বর্জোয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংকট. ঢাকাঃ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, পৃ. ৭০।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৬.১ থেকে দেখা যায় ১৯৪৮/৪৯–১৯৫১/৫২ কালপর্বে পাকিস্তানে যে মুহাজির পুঁজি এসেছে তার মোট পরিমাণ হল ৫ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা। এর কোন অংশই পুর্ববাংলায় আসেনি, পুরোটাই গেছে পশ্চিম পাকিস্তানে। দেশ গঠনের জন্য এ সময় কেন্দ্র থেকে রাজস্ব উদ্বৃত্ত হিসাবে মোট ৮৯ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। এই রাজস্ব উদ্বৃত্তের সমুদয় অর্থই খরচ করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। অর্থাৎ উক্ত চার বছরে পশ্চিম পাকিস্তান অতিরিক্ত ৯৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা লাভ করে। অপর দিকে, পূর্ব বাংলা দেশ বিভাগের ফল হিসাবে কোন অর্থই পায়নি, বরং এসময় পাট, সোনা ও অন্যান্য পণ্যের কালোবাজারের ফলে ও অবৈধ পন্থায় বৈদেশিক মুদ্রা পাচারের মাধ্যমে পূর্ববাংলা মোট ২৭২ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা হারায়। তাছড়া, দেশ পুনর্গঠন বাবদ রাজস্ব উদ্বৃত্ত হিসাবে পূর্ববাংলাকে মোট ৮৯ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা কেন্দ্রকে প্রদান করতে হয়। ফলে পূর্ব বাংলার জন্য ১৯৪৮/৪৯–৫১/৫২ কাল পর্বে মোট ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৬১ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা। এসব অর্থসম্পদের স্থানান্তরের ফলে পাকিস্তানকে সামগ্রিকভাবে মোট ২৬৬ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। কিন্তু এতে অঞ্চলগতভাবে পশ্চিম পাকিস্তান ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে বরং বিপুল পরিমাণে লাভবান হয়। অর্থাৎ একমাত্র পুঁজি সঞ্চালন প্রক্রিয়ায় পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল পশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষা ৪৫৭ কোটি ২৪ লক্ষ টাকার সম্পদের পরিমাণে পিছিয়ে পড়েছিল।

সারণী ৬.২

১৯৪৮/৪৯–১৯৫১/৫২ (এপ্রিল– মার্চ) কাল পর্বে পাকিস্তানের আমদানী রফতানীর ভারসাম্যের স্বরূপ (কোটি টাকায় হিসেব)

এলাকা/সাল	বেসরকারী পর্যায়ের আমদানী	মোট আমদানী ব্যয় — সরকারের সামরিক যন্ত্র–পাতি ক্রয়	সরকারের অন্যান্য পণ্য আমদানী	মোট আমদানী ব্যয়	মোট রপ্তানী আয়	আমদানী রফতানী ভারসাম্য
পূর্ব পাকিস্তান						
১৯৪৮–৪৯	২৪.৮০	০.১৩	১.২৬	২৬.১৯	১৪৭.৪৭	+১২১.২৮
১৯৪৯–৫০	৪২.৩৫	০.১৭	২.৮৩	৪৫.৩৫	৮৫.০২	+৩৯.৬৭
১৯৫০–৫১	৩৫.৯৬	০.৪১	২.৭০	৩৯.০৭	১১১.৭০	+৭২.৬৩
১৯৫১–৫২	৫৮.৩০	০.৮৩	৭.৭৮	৬৬.৯১	১৪০.০৬	+৭৩.১৫
মোট(১৯৪৮/৪৯–১৯৫১/৫২)	১৬১.৪১	১.৫৪	১৪.৫৭	১৭৭.৫২	৪৬৪.২৫	+২৮৬.৭৩
শতকরা হার (%	(২৯.০৫)	(২.৮৯)	(৩১.৬২)	(২৬.৬৮)	(৫৪.৯৪)	(+১৫৯.৫৪)
পশ্চিম পাকিস্তান						
১৯৪৮–৪৯	৯২.৮৭	৮.৯২	৭.৭৬	১০৯.৫৫	৬৮.৪১	–৪১.১৪
১৯৪৯–৫০	৯০.৪৯	১৩.২২	৪.৮২	১০৮.৫৩	৬৬.৭৫	–৪১.৭৮
১৯৫০–৫১	৯৯.২৪	১১.৮৭	১৩.৭৮	১২৪.৮৯	১৪৬.৬২	+২১.৭৩
১৯৫১–৫২	১২১.৬৬	১৮.০০	৫.৭৫	১৪৪.৮১	৯৮.৮৯	–৪৫.৮২
মোট(১৯৪৮/৪৯–১৯৫১/৫২)	৪০৪.২৬	৫২.০১	৩১.৫১	৪৮৭.৭৮	৩৮০.৭৭	–১০৭.০১
শতকরা হার (%	(৭০.৯৫)	(৯৭.১১)	(৬৮.৩৮)	(৭৩.৩২)	(৪৫.০৬)	(–৫৯.৫৪)
মোট পাকিস্তান						
১৯৪৮–৪৯	১১৭.৬৭	৯.৮৫	৯.০২	১৩৫.৭৪	২১৫.৮৮	+৮০.১৪
১৯৪৯–৫০	১৫২.৮৪	১৩.৩৯	৭.৬৫	১৫৩.৮৮	১৩১.৭৭	–২২.২১
১৯৫০–৫১	১৩৫.২০	১২.২৮	১৬.৪৮	১৬৩.৯৬	২৫৮.৩২	+৯৪.৩৬
১৯৫১–৫২	১৭৯.৯৬	১৮.৮৩	১২.৯৩	২১১.৭২	২৩৯.০৫	+২৭.৩৩
মোট(১৯৪৮/৪৯–১৯৫১/৫২	৫৫৫.৬৭	৫৩.৩৫	৪৬.০৮	৬৬৫.৩০	৮৪৫.০২	+১৭৯.৭২
শতকরা হার (%	(১০০.০০)	(১০০.০০)	(১০০.০০)	(১০০.০০)	(১০০.০০)	(১০০.০০)

সূত্রঃ- Government of East Pakistan (1955) : *Statistical Abstract for East Pakistan,* Dacca: Planning Department of E.P. Govt. Vol. 11, p.252.

শুধু পুঁজি সঞ্চালন নয়, আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও পুর্ববাংলা ওই সময়ে বিপুল পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সারণী ৬.২ থেকে দেখা যায়, ১৯৪৮/৪৯–১৯৫১/৫২ কাল পর্বে পাকিস্তান পণ্য রপ্তানী বাবদ মোট ৮৪৫ কোটি ২ লক্ষ টাকা আয় করে। এর মধ্যে শতকরা প্রায় ৫৫ ভাগ আয় হয় পূর্ববাংলার পণ্য রপ্তানী করে, আর অবশিষ্ট শতকরা ৪৫ ভাগ আয় আসে পশ্চিম পাকিস্তানের পণ্য রপ্তানী করে। এ কালপর্বে বিদেশ থেকে পাকিস্তান মোট ৬৬৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার পণ্য আমদানী করে। এর মধ্যে মাত্র শতকরা ২৬.৬৮ ভাগ অর্থের পণ্য আমদানী হয় পূর্ববাংলায়, আর বাকী শতকরা ৭৩.৩২ ভাগ অর্থের পণ্য আমদানী করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। রপ্তানী আয় থেকে আমদানী ব্যয় বাদ দিলে পূর্ব পাকিস্তানের হাতে অতিরিক্ত ২৮৬ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা মজুদ থাকার কথা, কিন্তু তা থাকেনি। এ অর্থের পুরোটাই চলে যায় কেন্দ্রের হাতে। এ অর্থ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের ১০৭ কোটি ১ লক্ষ টাকার আমদানী–রপ্তানী খাতের ঘাটতি পুরণ করা হয় এবং বাকী ১৭৯ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে স্থাপিত শক্তিশালী কেন্দ্র গঠনের কাজে ব্যয় করা হয়। সরকার যে সামরিক ও বেসামরিক খাতের পণ্য দেশের দুই অঞ্চলের জন্য আমদানী করে তার মধ্যেও কোন সংগতি ছিল না। সামরিক সরঞ্জাম ক্রয় বাবদ যে ব্যয় করা হয় তার শতকরা ৯৭.১১ ভাগই আমদানী করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য এবং বাকী মাত্র শতকরা ২.৮৯ ভাগ অর্থের পণ্য পূর্ববাংলার ভাগে পড়ে৷ সরকারের বেসামরিক পণ্য আমদানী ও ব্যক্তিগত আমদানীতেও অসংগতি ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানে শুধু বেসরকারী পর্যায়ে যে পণ্য আমদানী হয় তাও পশ্চিম পাকিস্তানের মোট রপ্তানী আয় অপেক্ষা ২৩ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা বেশী। সরকারী পর্যায়ে যে আমদানী হয়েছে তা যদি মোট রপ্তানী আয় থেকে বাদ দেওয়া যায় তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যক্তিগত খাতের উক্ত বিপুল পরিমাণ আমদানীর জন্য যে ১০৭ কোটি ১ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয় তা ব্যক্তি মালিকগণ কোথায় পেলো? সন্দেহ নেই, পূর্ববাংলার বৈদেশিক বাণিজ্যের সিংহ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করতো পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যক্তিমালিকগণ। আর পুর্ববাংলার আমদানী–রপ্তানী ভারসাম্যের জন্য যে ২৮৬ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হয় তাও পূর্ব বাংলার কোন কাজে লাগেনি, বরং পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গিয়েছে। উক্ত সময়ের পাকিস্তানের দুইঅংশের অর্থনৈতিক ভার সাম্যের দিকে লক্ষ্য করলে এটা অতিসহজেই বুঝা যায়।

সারণী ৬.৩ থেকে দেখা যায়, ১৯৪৮/৪৯–১৯৫১/৫২ কাল পর্বে রাজস্ব ও রপ্তানীখাত থেকে পাকিস্তান মোট ১২৬০ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা আয় করে। এর মধ্যে রাজস্ব খাত থেকে আয় হয় ৪১৫ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা। রাজস্ব আয়ের শতকরা ৭৩.৯৭ ভাগ আয় করে পশ্চিম পাকিস্তান, আর বাকী শতকরা ২৬.০৩ ভাগ আয় হয় পূর্ববাংলা থেকে। মোট ১২৬০ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকার মধ্যেও শতকরা ৫৩.৭৩ ভাগ আয় আসে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এবং বাকী শতকরা ৪৬.২৭ ভাগ আয় আসে পূর্ব বাংলা থেকে। অন্যদিকে,

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৬.৩
১৯৪৮/৪৯–১৯৫১/৫২ (এপ্রিল –মার্চ) কালপর্বে পাকিস্তানের দু' অংশে অর্থনৈতিক ভারসাম্যের স্বরূপ (কোটি টাকার হিসেবে)

এলাকা/সাল	মোট আয়			মোট আত্মীকরণ						
	রাজস্ব আয়	রপ্তানি আয়	মোট	উন্নয়ন ব্যয়	আমদানী ব্যয়	মোট	আয়ও আত্মীকরণের ভারসাম্য	আয় উদ্বৃত্তের কেন্দ্রে গমন	হিন্দু পুঁজি বহির্গমন	পুঁজি বহির্গমনের মোট পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
পূর্বং পাকিস্তান										
১৯৪৮–৪৯	১৬.২৩	১৪৭.৪৭	১৬৩.৭০	৩.১৯	২৬.১৯	২৯.৩৮	১৩৪.৩২	১৩৪.৩২	১৩৭.০০	২৭১.৩২
১৯৪৯–৫০	২২.০৮	৮৫.০২	১০৭.১০	১.৭৬	৪৫.৩৫	৪৭.১১	৫৯.৯৯	৫৯.৯৯	১৬.৩২	৭৬.৩১
১৯৫০–৫১	২৫.৮৫	১১১.৭০	১৩৭.৫৫	৪.৫২	৩৯.০৭	৪৩.৫৯	৯৩.৯৬	৯৩.৯৬	৪৫.২৭	১৩৯.২৩
১৯৫১–৫২	৩৫.১০	১৪০.০৬	১৭৫.১৬	০.১৫	৬৬.৯১	৬৭.০৬	১০৮.১০	১০৮.১০	৭৩.৭৩	১৮১.৮৩
মোট(১৯৪৮/৪৯-১৯৫১/৫১)	৯৯.২৬	৪৮৪.২৫	৫৮৩.৫১	৯.৬২	১৭৭.৫২	১৮৭.১৪	৩৯৬.৩৭	৩৯৬.৩৭	২৭২.৩২	৬৬৮.৬৯
শতকরা হার(%	(২৬.০৩)	(৫৪.৯৪)	(৪৬.২৭)	(১.৮২)	(২৬.৬৮)	(১৫.৩৭)			(১০০.০০)	
পশ্চিম পাকিস্তান										
১৯৪৮–৪৯	৪৯.৮৭	৬৮.৪১	১১৮.২৮	৮৪.৬৫	১০৯.৫৫	১৯৪.২০	–৭৫.৯২	–১৩৪.৩২	–	–১৩৪.৩২
১৯৪৯–৫০	৬৩.৩০	৬৬.৭৫	১৩০.০৫	১৪১.৬৬	১০৮.৫৩	২৫০.১৯	–১২০.১৪	–৫৯.৯৯	–	–৫৯.৯৯
১৯৫০.৫১	৯০.৯৯	১৪৬.৬২	২৩৭.৬১	১২৭.৮৯	১২৪.৮৯	২৫২.৭৮	–১৫.১৭	–৯৩.৯৬	–	–৯৩.৯৬
১৯৫১–৫২	১০৩.৫৫	৯৮.৮৯	২০২.৪৪	১৬৪.৯৭	১৪৪.৮১	৩০৯.৭৮	–১০৭.৩৪	–১০৮.১০	–	–১০৮.১০
মোট(১৯৪৮/৪৯-১৯৫১/৫২	৩০৭.৭১	৩৮০.৭৭	৬৮৮.৩৮	৫১৯.১৭	৪৮৭.৭৮	১০০৬.৯৫	–৩১৮.৫৭	–৩৯৬.৩৭	–	–৩৯৬.৩৭
শতকরা হার(%	(৭৩.৯৭)	(৪৫.০৬)	(৫৩.৭৩)	(৯৮.১৮)	(৭৩.৩২)	(৮৪.৩৩)				
মোট পাকিস্তান										
১৯৪৮–৪৯	৬৬.১১	২১৫.৮৮	২৮১.৯৯	৮৭.৮৪	১৩৫.৭৪	২২৩.৫৮	+৫৮.৪০	–	১৩৭.০০	১৩৭.০০
১৯৪৯–৫০	৮৫.৩৮	১৩১.৭৭	২১৭.১৫	১৪৩.৪২	১৫৩.৮৮	২৯৭.৩০	–৬০.১৫	–	১৬.৩২	১৬.৩২
১৯৫০–৫১	১২৫.৮৪	২৫৮.৩২	৩৮৪.১৬	১৩২.৪১	১৬৩.৯৬	২৯৬.৩৭	+৭৮.৭৯	–	৪৫.২৭	৪৫.২৭
১৯৫১–৫২	১৩৮.৬৪	২৩৯.০৫	৩৭৭.৬৯	১৬৫.১২	২১১.৭২	৩৭৬.৮৪	+০.৭৬	–	৭৩.৭৩	৭৩.৭৩
মোট(১৯৪৮/৪৯-১৯৫১/৫২	৪১৫.৯৭	৮৪৫.০২	১২৬০.৯৯	৫২৮.৭৯	৬৬৫.৩০	১১৯৪.০৯	৭৭.৮০	–	২৭২.৩২	২৭২.৩২
শতকরা হার(%	(১০০.০০)	(১০০.০০)	(১০০.০০)	(১০০.০০)	(১০০.০০)	(১০০.০০)			(১০০.০০)	

সূত্র: Compiled from A. Sadeque (1956): The Economic Emergence of Pakistan, Part II, op.cit, Tablew 8(a), pp.

সমগ্র পাকিস্তানে এ কালপর্বে মোট ১১৯৪ কোটি ৯ লক্ষ টাকা আত্মীকরণ করা হয়। অর্থাৎ মোট আত্মীকরণকৃত অর্থের পরিমাণ মোট আয় অপেক্ষা মাত্র ৭৭ কোটি ৮০ লাখ টাকা কম। এক্ষেত্রেও পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে কোন সংগতি নেই। আত্মীকরণকৃত অর্থের শতকরা ৮৪.৩৩ ভাগ ব্যয় হয় পশ্চিম পাকিস্তানে, আর বাকী শতকরা ১৫.৬৭ ভাগ পূর্ববাংলায় ব্যয় হয়। পূর্ববাংলা রাজস্ব ও রপ্তানী খাত থেকে মোট যে ৫৮৩ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা আয় করে।তারও খুব সামান্য অংশই সেখানে ব্যয় হয়। পূর্ববাংলা তার উন্নয়ন ব্যয় ও আমদানীর জন্য তার মোট আয়ের মাত্র শতকরা ৩২.০৭ ভাগ অর্থ নিজের জন্য ব্যয় করার সুযোগ পায়। বাকী শতকরা ৬৭.৯৩ ভাগ অর্থ তথা তার আয় থেকে ৪০৫ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা পশ্চিম পাকিস্তানের আমদানী ব্যয় ও উন্নয়নের জন্য স্থানান্তরিত হয়। অন্যদিকে, রাজস্ব ও রপ্তানী আয় বাবদ পশ্চিম পাকিস্তান এ সময় মোট ৬৮৮ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা আয় করে, কিন্তু তার উন্নয়ন ও আমদানী খাতে ব্যয় করে ১০০৬ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তান যা আয় করে, ব্যয়ের পরিমাণ তার চেয়েও ৩১৮ কোটি ৫৭ লাখ টাকা বেশী। নিঃসন্দেহে পূর্ববাংলার উদ্বৃত্ত আয় থেকে এ সমুদয় অর্থ আসে। ফলে পূর্ববাংলা পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় আরো অনেক বেশী পিছিয়ে পড়ে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক নীতির কারণে পূর্ববাংলা তার নিজ আয় থেকে প্রায় ৪০৬ কোটি টাকা বঞ্চিত হয়, অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান তার সমুদয় আয় তার নিজের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করার পরও ৩১৮ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করে। ফলে এ ঘটনার মধ্য দিয়ে পূর্ববাংলা উক্ত চার বছরে পশ্চিম পাকিস্তান অপেক্ষা ৭২৪ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকার সমমূল্যের অগ্রগতি থেকে পিছিয়ে পড়ে। তাছাড়া, এ সময়ে পূর্ববাংলা থেকে মোট ২৭২ কোটি ৩২ লক্ষ টাকার মূল্যের বৈদেশিক অর্থ কালোবাজারী ও বিভিন্ন অবৈধ পন্থায় পূর্ববাংলা থেকে ভারতে চলে যায়। ফলে এ চার বছরে পূর্ববাংলার নীট ক্ষতির পরিমাণ মোট ৬৬৮ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। আর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পিছিয়ে পড়ার পরিমাণ টাকার হিসাবে মোট ৯৯৬ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকায় পৌঁছায়। এ পরিমাণ অর্থ তখন যে কত বিপুল পরিমাণ মূল্য ধারণ করতো তা সে সময়ের সোনার মুল্যের সাথে তুলনা করলেই বোঝা যাবে। ১৯৫২ সালের জুন মাসে ঢাকায় প্রতি তোলা সোনার মূল্য ছিল মাত্র ৮৯ টাকা।[৮৪] সে হিসাবে উক্ত ৯৯৬ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা দিয়ে মোট ১১ কোটি ২০ লক্ষ ৮ হাজার ৯৮৯ তোলা বা ১২৭২ টন ৮২৯ কেজি ৪২০ গ্রাম সোনা কেনা যেত যার বর্তমান মূল্য (ভরিপ্রতি: ৬৩০০ টাকা) ৭০,৫৬৫ কোটি ৬৬ লক্ষ ৩০৭ টাকা। এ খবর সে সময় পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষ, এমনকি সচেতন রাজনৈতিক কর্মীরাও রাখতো না। কিন্তু যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা একই দেশের অন্য একটি অঞ্চলের ওপর এত বিপুল পরিমাণে অন্যায় করতে পারে, তার পক্ষে উক্ত অঞ্চল সম্পর্কে একটি 'উপনিবেশের' বেশী কিছু ধারণা করা কঠিন। পূর্ব বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর দমন–পীড়নের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের এ মনোভাবের প্রকাশ প্রথম ঘটে। শক্তিশালী কেন্দ্র গঠনের আবেগময় পাকিস্তানবাদী ধারণা অর্থনৈতিক নিঃস্বকরণের ভয়াবহ চিত্রের প্রতি দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে দেয়। কিন্তু বাস্তব জীবনাচরনের ব্যাপারেও যখন বাঙ্গালীদের ওপর পাকিস্তানী রাষ্ট্র শর্তারোপ করলো তখন আর বাঙ্গালী তরুনরা ঘরে বসে থাকেনি। তারা পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। পাকিস্তান রাষ্ট্র এ বিদ্রোহকে ঔপনিবেশিক কায়দায় দমন

[৮৪]. রহমান, আতিউর ও লেনিন আজাদ (১৯৯০): প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১।

Dhaka University Institutional Repository

করতে গিয়ে ১৯৫২ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের মিছিলের ওপর গুলি চালায়। এতে কয়েকজন শহীদ হন। এ ঘটনা বাঙ্গালীর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনায় মৌলিক পরিবর্তন আনে। তারা বুঝতে শুরু করে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসন বাঙ্গালীদের প্রতি অবিচার করছে। খুব দ্রুতই বিভিন্ন দিক থেকে পূর্ব বাংলায় স্বায়ত্তশাসনের দাবি ওঠে, গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট ও তার কর্মসূচী বাঙালীর বাঁচার দাবি ২১ দফা। 'পূর্ব বাংলা শ্মশান কেন' বা এ জাতীয় অসংখ্য শিরোনামে বই, প্রবন্ধ, গান ও কবিতা রচনা হতে থাকে। বাঙালীদের মধ্যে শুরু হয় জাতীয় চেতনা। এ রাজনৈতিক চেতনা ও প্রতিক্রিয়ার বিকাশকে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। তবে যে সময়ে যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্বে বাঙালীর বাঁচার দাবির সপক্ষে যুক্তফ্রন্টের ব্যাপক বিজয় সম্পন্ন হয়েছিল- সে সময়ের এ রাজনৈতিক পটভূমির কথা মনে না রেখে অর্থনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ করলে পরিস্থিতি স্পষ্টতর হয়ে ওঠবে না। যাহোক, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীকে হত চকিত করে দেয়। ১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলার নির্বাচনকে সামনে রেখেই ব্যাপকভাবে বৈষম্যের প্রতিবাদ, প্রচার-আন্দোলন ও বক্তৃতা প্রদান শুরু হয়। এরকম একটি পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করার স্বার্থেই সম্ভবত পূর্ব বাংলার প্রতি স্বল্প সময়ের জন্য কিছুটা নজর দেওয়া হয়। সারণী ৬.৪ থেকে দেখা যায়, ১৯৪৭/৪৮-১৯৫২/৫৩ কাল পর্বে পূর্ব বাংলায় উন্নয়ন খাতে মাত্র মোট ৩৯ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়, তার মধ্যে শুধুমাত্র ১৯৫২-৫৩ অর্থ বছরেই ব্যয় করা হয় ২৪ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা। বাকী পাঁচ বছর ধরে ব্যয় করা হয় মাত্র ১৪ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা। এ পাঁচ বছরে পূর্ব বাংলায় পুঁজি বিনিয়োগ খাতে প্রকৃত পক্ষে কোন অর্থব্যয় করা হয়নি। উপরন্তু ১৯৫১-৫২ অর্থবছরে এখাতে আগে বিনিয়োজিত পুঁজি থেকে মোট ৪ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা প্রত্যাহার করে পুরো অর্থই পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। পাকিস্তানের প্রথম নয় বছরের মধ্যে সেবছরই পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন খাতে সর্বাধিক পরিমাণ অর্থব্যয় করা হয়। ১৯৫১-৫২ অর্থ বছরে পূর্ব বাংলায় যেখানে মোট উন্নয়ন ব্যয়ের পরিমাণ মাত্র ১৫ লক্ষ টাকা, সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয়ের পরিমাণ ১৬৪ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ উক্ত অর্থ বছরে পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন ব্যয়ের পরিমাণ সমগ্র পাকিস্তানের উন্নয়ন ব্যয়ের শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ।

সারণী ৬.৪

১৯৪৭/৪৮-১৯৫৫/৫৬ (এপ্রিল-মার্চ) কালপর্বে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন বাজেটের (প্রকৃত ব্যয়) স্বরূপ (কোটি টাকার হিসেব)

	পূর্ব পাকিস্তান				পশ্চিম পাকিস্তান				মোট পাকিস্তান			
সাল	প্রতিরক্ষাও সদর দপ্তর	পুঁজি বিনিয়োগ	প্রশাসন যোগাযোগ ও অন্যান্য	মোট	প্রতিরক্ষা ও সদর দপ্তর	পুঁজি বিনিয়োগ	প্রশাসন যোগাযোগ ও অন্যান্য	মোট	প্রতিরক্ষাও সদর দপ্তর	পুঁজি বিনিয়োগ	প্রশাসন যোগাযোগ ও অন্যান্য	মোট
১৯৪৭-৪৮*	০.৭৭	০.১৯	৩.৮০	৪.৭৬	১২.৩৫	৫.২২	৮.৩৬	২৬.০৩	১৩.২২	৫.৪১	১২.২৬	৩০.৭৯
১৯৪৮-৪৯	০.৬৪	০.১৫	২.৪১	৩.১৯	৫৭.০০	২১.৫৫	৬.১০	৮৪.৬৫	৫৭.৬৪	২১.৭০	৮.৫১	৮৭.৮৪
১৯৪৯-৫০	০.৮৩	০.৫৭	০.৩৬	১.৭৬	১২৫.০৯	৮.১৪	৮.৪৩	১৪১.৬৬	১২৫.৯২	৮.৭১	৮.৭৯	১৪৩.৪২
১৯৫০-৫১	১.৬২	১.৪৭	১.৪২	৪.৫২	৮৬.৬৭	৩৫.৫৪	৫.৬৭	১২৭.৭৫	৮৮.২৯	৩৭.০১	৭.০৯	১১৭.৪০
১৯৫১-৫২	২.৮৫	-৪.৪১	১.৭২	০.১৫	১১১.১৩	৪১.১৩	১২.৭১	১৬৪.৯৭	১১৩.৯৮	৩৬.৭২	১৪.৪৩	১৬৫.১২
১৯৫২-৫৩	৩.০৩	১৮.৫৬	৩.৩২	২৪.৯১	৮৭.২৪	২৬.০৮	১৮.৬৫	১৩১.৯৭	৯০.২৭	৪৪.৬৪	২১.৯৭	১৫৬.৮৮
মোট(১৯৪৭/৪৮-১৯৫২/৪৩ শতকরা হার(%)	৯.৭৪ (১.৯৯)	১৬.৪৭ (১০.৭২)	১৩.০৩ (১৭.৮৪)	৩৯.২৯ (৫.৪৮)	৪৭৯.৪৮ (৯৮.০১)	১৩৭.৬৬ (৮৯.২৮)	৬০.০২ (৮২.১৬)	৬৭৭.০৩ (৯৪.৫২)	৪৮৯.২২ (১০০)	১৫৪.১৯ (১০০)	৭৩.০৫ (১০০)	৭১৬.৩২ (১০০)
১৯৫৩-৫৪	২.১৯	-৪.৬৪	২.৯৩	০.৪৮	৭১.৪৭	১০.৪৮	১৬.০০	৯৭.৯৫	৭৩.৬৬	৫.৮৪	১৮.৯৩	৯৮.৪৩
১৯৫৪-৫৫	২.৪৬	১.৭২	২.৫৬	৬.৭১	৬৬.০৯	১৪.৮২	১৪.৫৪	৯৫.৪৫	৬৮.৫৫	১৬.৫৪	১৯.১০	১০৪.১৯
১৯৫৫-৫৬	২.৩৩	০.০৩	২.৮৪	৫.২০	৭৯.১৮	-৯.০০	২২.০৪	৯২.২২	৮২.৫১	-৮.৯৭	২৪.৮৮	৯৭.৪২
মোট(১৯৫৩/৫৪-১৯৫৫/৫৬ শতকরা হার(%)	৬.৯৮ (২.২৫)	-২.৮৯ (-১৮.০৩)	৮.৩৩ (১৬.৪২)	১২.৩৯ (৪.১৬)	২১৬.৭৪ (৯৭.৭৫)	১৬.৩০ (১১৮.০৩)	৫২.৫৮ (৮৩.৫৮)	২৮৫.৬২ (৯৫.৮৪)	২২৩.৭২ (১০০)	১৩.৪১ (১০০)	৬২.৯১ (১০০)	৩০০.০৪ (১০০)
মোট(১৯৪৭/৪৮-১৯৫৫/৫৬ শতকরা হার(%)	১৬.৭২ (২.০৮)	১৩.৫৮ (৮.৩৬)	২১.৩৬ (১৭.১৮)	৫১.৬৮ (৫.০৯)	৬৯৬.২২ (৯৭.৯২)	১৫৩.৯৬ (৯১.৬৪)	১১২.৬ (৮২.৮২)	৯৬২.৬৫ (৯৪.৯১)	৭১২.৯৪ (১০০)	১৬৮.০০ (১০০)	১৩৫.৯৬ (১০০)	১০১৬.৩৬ (১০০)

১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট থেকে ১৯৪৮ সালের ৩১সে মার্চ পর্যন্ত সময়কাল ।

সূত্রঃ- A. Sadeque (1956): The Economic Emergencc of Pakistan, Part II, op.cit. Compiled from pp. 8 (a)-8 (b):

১৯৫২-৫৩ অর্থ বছরে পুঁজি বিনিয়োগ খাতে পাকিস্তানের দুই অংশে ব্যয়ের ক্ষেত্রে মোটামুটি কিছুটা সংগতি দেখা যায়। উল্লিখিত খাতে এ বছর মোট ব্যয় করা হয় ৪৪ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা। তার মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হয় ২৬ কোটি ৮ লক্ষ টাকা, আর পূর্ব পাকিস্তানে ১৮ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা। এটাই ছিল পাকিস্তানের প্রথম নয় বছরের মধ্যে পুঁজি বিনিয়োগ খাতে পূর্ব বাংলায় সর্বাধিক পরিমাণে ও সর্বাধিক অনুপাতে ব্যয়ের উদাহরণ। কিন্তু এর পরের বছরই অর্থাৎ ১৯৫৩-৫৪ অর্থ বছরে আবার পূর্ব বাংলার এখাত থেকে মোট ৪ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা প্রত্যাহার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। কি কারণে অনুমোদিত পুঁজির সবটুকু পূর্ব বাংলার শিল্প উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা যায়নি সে বিষয়টি স্পষ্ট হবে যখন পাকিস্তানের আমলাতন্ত্রে দেশের দুই অংশের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে আলোচনা করা হবে। তবে তখনকার বাস্তবতা হচ্ছে, প্রথম নয় বছরে পূর্ব বাংলার পুঁজি বিনিয়োগ খাতে মোট ২২ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা অনুমোদন করা হয়, কিন্তু তার থেকে আবার ৯ কোটি ৫ লক্ষ টাকা ফেরত নিয়ে যাওয়া হয়। ফলে পূর্ব বাংলায় সরকার বিনিয়োজিত পুঁজির পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ১৩ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা।

অবশ্য পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিবিনিয়োগ খাত থেকে ১৯৫৫-৫৬ অর্থ বছরে ৯ কোটি টাকা প্রত্যাহার করা হয়। কিন্তু তা পূর্ব বাংলায় বিনিয়োগের জন্য পাঠানো হয়নি। সে বছর সরকারীভাবে পূর্ব বাংলায় মাত্র ৩ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়। ১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলার সাধারণ নির্বাচনের পর ভাবা হয়েছিল পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরনের কিছুটা পরিবর্তন হবে। কিন্তু সে ভাবনা মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছিল। ১৯৫৪ সালের কিছু আগে থেকেই দুই অঞ্চলের বৈষম্যের কথাটি যখন খুবই আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়েছিল ঠিক সেই ১৯৫৩-৫৪ অর্থবছর থেকে পরবর্তী তিন বছরের উন্নয়ন বাজেটের দিকে লক্ষ্য করলেও দেখা যায় পূর্ব বাংলার প্রতি পাকিস্তান রাষ্ট্রের ঔপনিবেশিক চরিত্রের কোন পরিবর্তন হয়নি। সারণী ৬.৪ থেকে দেখা যায় যে, এ তিন বছরে পাকিস্তানের উন্নয়ন খাতে মোট

Dhaka University Institutional Repository

ব্যয় হয়েছে ২৯৮ কোটি ১ লক্ষ টাকা, তন্মধ্যে পূর্ব বাংলায় ব্যয় হয়েছে মাত্র ১২ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা, যা মোট ব্যয়ের মাত্র শতকরা ৪.১৬ ভাগ।

পাকিস্তানের উন্নয়ন বাজেটের দিকে লক্ষ্য করলে অন্য একটি বিশেষ দিক ফুটে ওঠে। এ সময় কেন্দ্রীয় প্রশাসন আর প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তোলার পিছনেপাকিস্তানের উন্নয়নবাজেটের সিংহ ভাগ ব্যয় হয়। আর তা পশ্চিম পাকিস্তানেই করা হয়েছে। সারণী ৬.৪ থেকে দেখা যায়, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৫২-৫৩ অর্থবছর পর্যন্ত উন্নয়ন খাতে মোট ৭১৬ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এরমধ্য থেকে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় প্রশাসন আর প্রতিরক্ষা খাতেই ব্যয় করা হয়েছে ৪৮৯ কোটি ২২ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এখাতে মোট উন্নয়ন ব্যয়ের শতকরা ৬৮.২৯ ভাগ অর্থই ব্যয় করা হয়েছে। উল্লিখিত খাতে ব্যয়িত ৪৮৯ কোটি ২২ লক্ষ টাকার মধ্যে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানেই মোট অর্থের শতকরা ৯৮.০১ ভাগ ব্যয় করা হয়েছে এবং পূর্ব বাংলায় অবশিষ্টশতকরা ১.৯৯ ভাগ। পরবর্তী বছরগুলিতেও এ ধারার কোন পরিবর্তন হয়নি, বরং অধিকতর হারে এখাতে ব্যয় বৃদ্ধি করা হতে থাকে। ১৯৫৩/৫৪-১৯৫৫/৫৬ এই তিন বছরে পাকিস্তানের উন্নয়ন ব্যয় ছিল মোট ৩০০ কোটি ৪ লক্ষ টাকা। এরমধ্যে কেন্দ্রীয় প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা খাতেই ব্যয় করা হয়েছে ২২৩ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এ তিন বছরের মোট উন্নয়ন বাজেটের শতকরা ৭৪.৪০ ভাগ।

১৯৪৭ সালের আগষ্ট থেকে ১৯৫৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত কেন্দ্রীয় প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা খাতে যে ৭১২ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে তার শতকরা ৬৪.০৪ ভাগ অর্থ ব্যয় হয়েছে প্রতিরক্ষা খাতে আর বাকী শতকরা ৩৫.৯৬ ভাগ অর্থ কেন্দ্রিয় প্রশাসনের জন্য খরচ করা হয়েছে। ১৯৫২-৫৩ অর্থ বছর পর্যন্ত প্রতিরক্ষা ও কেন্দ্রীয় প্রশাসন খাতে অর্থ ব্যয় হয় মোট ৪৮৯ কোটি ২২ লক্ষ টাকা। এর শতকরা ৬০.৬৪ ভাগ অর্থই ব্যয় হয় প্রতিরক্ষা খাতে এবং বাকী শতকরা ৩৯.৩৬ ভাগ অর্থ কেন্দ্রীয় প্রশাসন খাতে। কিন্তু এর পর থেকে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়ের আনুপাতিক হার আরও বাড়তে থাকে। ১৯৫৩/৫৪ - ১৯৫৫/৫৬ এই তিন বছরে প্রতিরক্ষা ও কেন্দ্রীয় প্রশাসন খাতে ব্যয় হয় মোট ২২৩ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে শুধুমাত্র প্রতিরক্ষাতেই ব্যয় করা হয় ১৫৯ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ প্রতিরক্ষা ও কেন্দ্রীয় প্রশাসন খাতে বরাদ্দ অর্থের শতকরা ৭১.৪৭ ভাগ অর্থই ব্যয় হয় প্রতিরক্ষা খাতে এবং বাকী শতকরা ২৮.৫৩ ভাগ অর্থ কেন্দ্রীয় প্রশাসনের জন্য ব্যয় হয়।[৮৫] অবশ্য এ কারণে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ক্ষেত্রে ব্যয় মোটেই হ্রাস পায়নি। কেন্দ্রীয় প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত প্রধান খাত তিনটিঃ এগুলি হচ্ছে সাধারণ প্রশাসন, মুদ্রার জন্য পুঁজি বিনিয়োগ এবং করাচী নগর প্রশাসন। এ তিনটি খাতে ১৯৫৫-৫৬ সাল পর্যন্ত সাধারণ প্রশাসনের পিছনে মোট ১৩৫ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় এবং এ ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়তে থাকে। শেষ বছরে এসে এখাতে ব্যয়ের পরিমাণ ২৫ কোটি ১৯ লক্ষ টাকায় গিয়ে দাঁড়ায়। মুদ্রার জন্য যে অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছিল তার মোট পরিমাণ ছিল ১১৫ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা। এখাতে যা ব্যয় হয়েছিল তার সবটুকুই ১৯৫২-৫৩ অর্থ বছরের আগে। অন্যদিকে, করাচীর জন্য এখাত থেকে যা ব্যয় হয়েছিল তার পরিমাণও খুব বেশী নয়। ফলে সাধারণভাবে ১৯৫২-৫৩ অর্থবছরের পর যে কেন্দ্রীয় প্রশাসন খাতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ তুলনামুলকভাবে হ্রাস পেয়েছিল বলে মনে হয়, আসলে তা নয়। কেননা কেন্দ্রীয় সাধারণ প্রশাসন বলতে যাকে বোঝায় তার কাঠামোটি ক্রমাগতই শক্তিশালী হয়েছে। তবে ১৯৫৪ সালে সামরিক বাহিনী প্রধান আইয়ুব খান স্বয়ং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ার ফলে সামরিক খাতের ব্যয় যে অধিকতর কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। আর কেন্দ্রীয় প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা খাতে পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই যে উন্নয়ন বাজেটের সিংহ ভাগ ব্যয় হয়েছে তা থেকে এটা খুব সহজেই অনুমান করা যায় যে, পাকিস্তান শুরু থেকেই একটি আমলাতান্ত্রিক ও সামরিক শক্তি-নির্ভর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। পাকিস্তান প্রথম নয় বছর সংবিধানবিহীন একটি রাষ্ট্র ছিল। এ সময়কালেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অত্যন্ত শক্তিশালী একটি আমলাতন্ত্র এবং একটি সামরিক বাহিনী গড়ে উঠেছিল। এরা এ দীর্ঘ ন'বছরে একেবারে প্রায় স্বাধীনভাবে তাঁদের ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে; তাঁদের সাংবিধানিক কোন বাঁধাবিঘ্ন মোকাবিলা করতে হয়নি। পাকিস্তান আমলাতন্ত্র ও সামরিক বাহিনী এভাবে স্বয়ং সম্পূর্ণ দুটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। সামরিক বাহিনীর প্রধান প্রতিরক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ার কারণে শুধু ব্যক্তি আইয়ুবই নয় গোটা সামরিক বাহিনীই প্রতিষ্ঠানগতভাবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সামরিক চুক্তির রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে পড়েছিল। পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাবে যে, এসবের মাধ্যমে পাকিস্তানের সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্র ১৯৫৬ সালের মধ্যেই এমন শক্তি অর্জন করে যে, ১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের সাংবিধানিক সরকারের পক্ষে আর এ দুটি প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ছিল না। সম্ভবতঃ এ কারণেই সাংবিধানিক সরকার দুইবছরের বেশী টিকতে পারেনি। বলাবাহুল্য, এটাই ছিল পাকিস্তানের ২৪ বছরের ইতিহাসে প্রথম ও শেষ সাংবিধানিক সরকার। সাংবিধানিক সরকার হওয়া সত্ত্বেও তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে অনেক মন্ত্রী, এমনকি একসময় প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত ছিলেন প্রাক্তন আমলা। উল্লেখ্য, সেসময় সামরিক বাহিনীর প্রধান হিসাবে আইয়ুব খান ছিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। কি কারণে পাকিস্তানের সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র এতটা শক্তি অর্জন করেছিল এবং কি কারণে তা প্রধানতঃ পশ্চিম পাকিস্তানী আমলাদের নিয়ন্ত্রিত সংগঠনে পরিণত হয়েছিল সে ব্যাপারে আলোকপাত করা বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়।

৬.৩ পাকিস্তানে সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও আঞ্চলিক পার্থক্য

ইতিপূর্বে দেখানো হয়েছে যে, পাকিস্তানের আমলা প্রশাসন প্রধানতঃ বৃটিশ আমলাদের নেতৃত্বে ও পরিচালনায় গঠনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। শতকরা ৬৬ জন পাকিস্তানী আমলা ও শতকরা ৩৪ জন বৃটিশ আমলাকে নিয়ে যে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের গোড়াপত্তন হয়েছিল তা আগেই বলা হয়েছে। কোন সাংবিধানিক সরকারের অনুপস্থিতির কারণে এবং প্রধানতঃ স্বল্প অভিজ্ঞ বৃটিশ কর্মকর্তাদের উপস্থিতির সুযোগে পাকিস্তানী আমলারা খুব দ্রুতই নিজেদের পদোন্নতি ঘটাতে থাকে।[৮৬] এভাবে ১৯৫২ সাল নাগাদ মোট ১৩ জন পাকিস্তানী আমলা পূর্ণাংগ সচিবের পদে উন্নতি হয়। বলা বাহুল্য, এ ১৩ জন সচিবের সবাই পশ্চিম পাকিস্তানী।[৮৭] উক্ত সূত্র থেকে আরও জানা যায়, এ সময়ে মোট যে ১৯ জন আমলা যুগ্মসচিব হিসাবে পদোন্নতি লাভ করে, তাঁদের মধ্যে মাত্র ১ জন্য ছাড়া বাকী সবাই

---

৮৫. Government of Pakistan (1956): The Economic Emergence of Pakistan (Spiceal Emphasis on East Pakistan) Dacca: Planning Division of GOEP, Part-11, p. 8 (b).

৮৬. খান, মুহম্মদ আইয়ুব (১৯৬৮)ঃ প্রভু নয় বন্ধু,(বাংলা অনুবাদ) ঢাকাঃ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, পৃ.৬৪।

৮৭. Pakistan: Constituent Assembly (legislative) Debates, Vol. I, No. 18, April 5, 1952, pp. 1066-68.

Dhaka University Institutional Repository

ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী। এছাড়া, মোট ৫৯ জন আমলা এ সময় উপ-সচিব রূপে পদোন্নতি পায়। এদের মধ্যে মাত্র ৪ জন ছিল পূর্ব পাকিস্তানী। অর্থাৎ মোট ৯১ জন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার মধ্যে মাত্র ৫ জন তথা শতকরা মাত্র ৫.৫ ভাগ কর্মকর্তা ছিল পূর্ব পাকিস্তানী। আই. সি. এস অফিসারদের মধ্যে যারা সি. এস. পি. তে যোগ দিয়েছিল তাঁদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতিনিধিত্ব যে এত কম ছিল তা নয় আসলে সদর দপ্তরের সাথে ঘনিষ্ঠতা ও পক্ষপাতিত্বের কারণে পশ্চিম পাকিস্তানীরা উচ্চ পদে আসীন হয়ে প্রভূত্ব বিস্তারের মাধ্যমে প্রাধান্য অর্জন করে। প্রশাসনের উক্ত পদে পশ্চিম পাকিস্তানীদের আধিপত্য পরবর্তীকালেও অব্যাহত থাকে। তবে ততদিনে কিছু সংখ্যক পূর্ব পাকিস্তানী উচ্চ পদে পদোন্নতি পেতে সক্ষম হয়। নীচের সারণীতে তা লক্ষ্য করা যায়।

সারণী ৬.৫
১৯৫৫ সালে কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে কর্মকর্তাদের মধ্যে পাকিস্তানের দুইঅংশের প্রতিনিধিত্বের স্বরূপ

পদের নাম	মোট	পূর্ব পাকিস্তানী	পশ্চিম পাকিস্তানী	পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতিনিধিত্বের হার (%
সচিব	১৯	-	১৯	-
যুগ্ম সচিব	৪১	৩	৩৮	৭.৩২
উপ সচিব	১৩৩	১০	১২৩	৭.৫২
নিম্ন পদস্থ সচিব	৫৪৮	৩৮	৫১০	৬.৯৩
মোট	৭৪১	৫১	৬৯০	৬.৮৮

সূত্র: Pakistan, Constituent Assembly (Legislative) Debates, Vol. I. January 17, 1956, P. 1844.

সারণী ৬.৫ থেকে দেখা যায়, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে ১৯৫৫ সালে যে মোট ৭৪১ জন বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ছিল তাঁদের মধ্যে মাত্র শতকরা ৬.৮৮ জন ছিল পূর্ব পাকিস্তানী। নিম্নপদস্থ সচিব ছিল মোট ৫৪৮ জন, এদের মধ্যে শতকরা ৬.৯৩ ভাগ ছিল পূর্ব পাকিস্তানী। ১৩৩ জন উপসচিবের মধ্যে শতকরা ৭.৩২ জন ছিল পূর্ব পাকিস্তানী। মোট সচিব ছিল ১৯ জন, এদের সবাই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী। অর্থাৎ ১৯৫৫ সালেও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সচিবালয় তথা যেখানে পাকিস্তানের জনসাধারণের ভাগ্য নির্ধারিত হত সেখানে পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতিনিধিত্ব ছিল নিতান্তই কম। শুধু কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে যে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যাল্পতা ছিল তাই নয়, সামরিক বাহিনীতেও এদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম। সামরিক বাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানীদের অবস্থান আমলাতন্ত্র অপেক্ষাও সর্বগিন ছিল। সারণী ৬.৬ এ সে সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যায়।

সারণী ৬.৬
১৯৫৫ সালে সামরিক আমলাদের অঞ্চলগত বিন্যাস (সংখ্যা)

বাহিনীর নাম	পূর্ব পাকিস্তানী	পশ্চিম পাকিস্তানী	মোট	পূর্ব পাকিস্তানীদের শতকরা হার (%
সশস্ত্র বাহিনী	১৪	৮৯৪	৯০৮	১.৫৪
নৌবাহিনী	৭	৫৯৩	৬০০	১.১৭
বিমান বাহিনী	৬০	৬৪০	৭০০	৮.৫৭
মোট	৮১	২১২৭	২২০৮	৩.৬৭

সূত্র: Jahan, Rounaq (1973): Pakistan- Failure in National Integration, Dacca: Oxford University Press. Table 11.9, p.25.

সারণী ৬.৬ থেকে দেখা যায়. ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর তিন বিভাগে মোট ২২০৮ জন বিভিন্ন পদমর্যাদার কর্মকর্তা নিয়োজিত ছিল, তাঁদের মধ্যে মাত্র ৮১ জন কর্মকর্তা ছিল পূর্ব পাকিস্তানী। বাকী ২ হাজার ১২৭ জন কর্মকর্তাই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী। অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানীদের উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিনিধিত্ব ছিলনা। সামরিক বাহিনীতে তাঁদের প্রতিনিধিত্ব ছিল মাত্র শতকরা ৩.৬৭ জন। একমাত্র বিমান বাহিনীতেই শতকরা ৮.৫৭ জন পূর্ব পাকিস্তানী কর্মকর্তা নিয়োজিত ছিল। অর্থাৎ মোট ৭০০ জনের মধ্যে ৬০ জন। অন্য দুই বাহিনীতে বাঙালীদের কোন অবস্থান ছিলনা বললেই চলে। নৌ-বাহিনীর মোট ৬০০ জন কর্মকর্তার মধ্যে মাত্র ৭ জন ছিল পূর্ব পাকিস্তানী এবং সশস্ত্র বাহিনীতে মোট ৯০৮ জন কর্মকর্তার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৪ জন। সশস্ত্র বাহিনী ও নৌ-বাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানীদের শতকরা হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ১.৫৪ জন ও ১.১৭ জন। অর্থাৎ পাকিস্তানের সেনাবাহিনী বলতে পশ্চিম পাকিস্তানের কর্মকর্তা নিয়ন্ত্রিত একটি সেনাবাহিনী বোঝাতো। পরবর্তীকালে অবশ্য এর কিছু পরিবর্তন আসে। কিন্তু এতটা বৈষম্য নিয়ে যে বাহিনী গঠিত হয়েছিল সে বাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পরবর্তী সময়ে যতই কর্মকর্তা নিয়োগ করা হোক না কেন, নেতৃত্ব দেওয়াতো দূরের কথা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য ন্যূনতম অবস্থাও সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। সে যাহোক, ১৯৫৫ সালের পর সামরিক কর্তাদের সম্পর্কে আর কোন তথ্য পাওয়া যায়না। তবে ১৯৫৫ সালের যে তথ্য পাওয়া গেছে এবং পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীসহ পাকিস্তানের কর্তাব্যক্তিক শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গড়ে তোলার জন্য আমেরিকা ও বৃটেনসহ বিভিন্ন দেশের সাথে যে সকল সামরিক চুক্তি বাস্তবায়িত করার যেসব পদক্ষেপ নিয়েছেন[৮৮] তাতে সামরিক বাহিনী নিঃসন্দেহে আরো শক্তিশালী হয়েছে। অবশ্য পরবর্তী কালের উন্নয়ন ব্যয়সংক্রান্ত তথ্যসমূহ থেকে সামরিক বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি পাকিস্তানের প্রধান দুই অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বের সঠিক চিত্র পাওয়া যাবে।

১৯৫৫ সালের পর সামরিক বাহিনী সংক্রান্ত যথেষ্ট তথ্য পাওয়া না গেলেও বেসামরিক আমলা প্রশাসন সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ১৯৬৩ সালে পাকিস্তান সরকারী প্রকাশনা দপ্তর থেকে বেসামরিক কর্মকর্তাদের সম্পর্কে দুইটি খন্ডে যে পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশিত হয় তা থেকে আমলাতন্ত্রের প্রসার সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। সারণী ৬.৭ থেকে দেখা যায়, ১৯৬৩ সালে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে মোট ৪ হাজার ১৪১ জন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা নিয়োজিত ছিল। এদের মধ্যে শতকরা ৮০.৯৭ ভাগ কর্মকর্তার স্থায়ী ঠিকানা পশ্চিম পাকিস্তানে, আর অবশিষ্ট ১৯.০৩ ভাগ কর্মকর্তার স্থায়ী ঠিকানা পূর্ব পাকিস্তানে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব কর্মকর্তা বিভিন্ন সময়ে নিয়োজিত হয়েছিল। নিয়োগ প্রাপ্তির তারিখের ভিত্তিতে প্রথমত কর্মকর্তাদেরকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যে সকল কর্মকর্তা ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্টের আগে চাকুরিতে নিয়োজিত হয়ে পাকিস্তানের প্রশাসনিক কাঠামোতে যোগদান করেছিলেন

৮৮. আবদুল্লাহ, কাজী আবু মোহাম্মদ (১৯৭০): *শহীদ সোহরাওয়ার্দী*. ঢাকা: সোসাইটি ফর পাকিস্তান ষ্টাডিজ, পৃ. ৭৭-৮১।

Dhaka University Institutional Repository

এদেরকে একটি শ্রেণীভূক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাদের অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে তারা ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট থেকে ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারীর পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। উক্ত সামরিক শাসনের সময় থেকে ১৯৬৩ সালের ১লা জানুয়ারী পর্যন্ত যারা নিয়োজিত হয়েছিলেন তারা তৃতীয় শ্রেণীভূক্ত। ১৯৬৩ সালের পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রশাসনে কর্মরত কর্মকর্তাদের মধ্যে যারা দেশ বিভাগের আগে নিয়োজিত হয়েছিল ১৯৬৩ সালে তাঁদের মোট সংখ্যা ছিল ৫০৮ জন। এদের মধ্যে

সারণী ৬.৭

১৯ মার্চের, ৬৩ সালে ১লা জানুয়ারী তারিখে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে নিয়োজিত প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের স্থায়ী বাসস্থান ভিত্তিক বিন্যাস

নিয়োগের সময়/	প্রেসিডেন্টের সচিবালয়	প্রতিরক্ষা বিভাগ	অর্থমন্ত্রণালয়	শিল্প ডিভিশন	তথ্য ও বেতার ডিভিশন	খাদ্য ও কৃষি ডিভিশন	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	পিএস.সি বা আই.সি.এস	অন্যান্য ডিভিশন কর্মকর্তা	মোট মন্ত্রণালয়
১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্টের আগেঃ										
পূর্ব পাকিস্তান (%	৩(৮.১১)	০(০.০০)	৩(৮.১১)	৬(১৫.৭৯)	২(১৪.২৯)	২(৯.৫২)	৩(১৬.৬৬)	২৬(১১.৯৩)	১৫(১৫.১৩)	৬০(১০.১২
পশ্চিম " (%	৩৪(৯১.৮৯)	৩২(১০০)	৩৪(৯১.৮৯)	৩২(৮৪.২১)	১২(৮৫.৭১)	১৯(৯০.৪৮)	১৫(৮৩.৩৪)	১৯২(৮৮.০৭)	৭৮(৮৩.৮৭)	৪৪৮(৮৯.৮৮)
মোট সংখ্যা (%	৩৭(১০০)	৩২(১০০)	৩৭(১০০)	৩৮(১০০)	১৪(১০০)	২১(১০০)	১৮(১০০)	২১৮(১০০)	৯৩(১০০)	৫০৮(১০০)
১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট থেকে ১৯৫৮ সালের ১৫ই অক্টোবরের মধ্যেঃ										
পূর্ব পাকিস্তান (%	১৪(১৪.১৪)	২০(৮.৭০)	৯০(২৯.৩২)	১৭(২৮.৩৩)	২২(২২.২২)	২৫(২৬.৬০)	১৫(৩০.৬১)	২৯২(৩৫.১৪)	৯৮(২৯.৮৮)	৫৯৩(২৮.২৮)
পশ্চিম পাকিস্তান (%	৮৫(৮৫.৮৬)	২১০(৯১.৩০)	২১৭(৭০.৬৮)	৪৩(৭১.৬৭)	৭৭(৭৭.৭৮)	৬৯(৭৩.৪০)	৩৪(৬৯.৩৯)	৫৩৯(৬৪.৮৬)	২৩০(৭০.১২)	১৫০৪(৭১.৭২)
মোট সংখ্যা (%	৯৯(১০০)	২৩০(১০০)	৩০৭(১০০)	৬০(১০০)	৯৯(১০০)	৯৪(১০০)	৪৯(১০০)	৮৩১(১০০)	৩২৮(১০০)	২০৯৭(১০০)
১৯৫৮ সালের ১৬ অক্টোবরের পরে নিয়োজিতঃ										
পূর্ব পাকিস্তান (%	২৪(১৮.১০)	১৩(৬.৯৫)	৩১(২৮.১৮)	৯(২১.৪৩)	৫(৯.৬২)	১৬(১৩.২২)	৩(৪.৪৮)	১৪৬(৩৪.৬০)	৬৬(১৭.৪৬)	৩১৩(২০.৮১)
পশ্চিম পাকিস্তান (%	১০৩(৮১.৯১)	১৭৪(৯৩.০৫)	৭৯(৭১.৮২)	৩১(৭৮.৫৭)	৪৭(৯০.৩৮)	১০৫(৮৬.৭৮)	৬৪(৯৫.৫২)	২৭৬(৬৫.৪০)	৩১২(৮২.৫৪)	১১৯১(৭৯.১৯)
মোট সংখ্যা (%	১২৭(১০০)	১৮৭(১০০)	১১০(১০০)	৪০(১০০)	৫২(১০০)	১২১(১০০)	৬৭(১০০)	৪২২(১০০)	৩৭৮(১০০)	১৫০৪(১০০)
১৯৬৩ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখ মোট কর্মকর্তার সংখ্যাঃ										
পূর্ব পাকিস্তান (%	৪১(১৫.৩৬)	৩৩(৭.১৫)	১২৪(২৭৬৬)	৩৩(২২.৮৬)	২৯(১৭.৩৭)	৪৩(১৮.২২)	২১(১৫.৬৭)	২৮৬(১৯.১৯)	১৭৯(২২.১৩)	৭৮৮(১৯.০৩)
পশ্চিম পাকিস্তান (%	২২৬(৮৪.৬৪)	৪১৬(৯২.৬৫)	৩২৫(৭২.৩৪)	১০৮(৭৭.১৪)	১৩৮(৮২.৬৩)	১৯৩(৮১.৭৮)	১১৩(৮৪.৩৩)	১২০৪(৮০.৮১)	৬৩০(৭৭.৮৭)	৩৩৫৩(৮০.৯৭)
মোট সংখ্যা (%	২৬৭(১০০)	৪৪৯(১০০)	৪৪৯(১০০)	১৪০(১০০)	১৬৭(১০০)	২৩৬(১০০)	১৩৪(১০০)	১৪৯০(১০০)	৮০৯(১০০)	৪১৪১(১০০)

সূত্রঃ Govermment of Pakistan (1963) : (Civil List of Class I Officers Serviug under Govermment of Pakistan. Ist January. 1963
Karachi: P.G. Press. Part I, (Compiled Whote the book)

শতকরা ৮৯.৮৮ জন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী এবং বাকী মাত্র শতকরা ১০.১২ জন ছিল পূর্ব পাকিস্তানী। যদিও এখানেও পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতিনিধিত্ব ক্ষুদ্রই বলা যায় তবু ইতিপূর্বে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের যে হিসেব দেওয়া হয়েছে সেখানে পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতিনিধিত্ব যত ক্ষুদ্র ছিল এখনকার প্রতিনিধিত্ব তত ক্ষুদ্র নয়। এ চিত্র থেকে দেখা যায়, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় প্রশাসনে পূর্ব পাকিস্তানের যে সকল কর্মকর্তা নিযুক্ত ছিল তারা সংখ্যাগততাবে এমনিতেই ক্ষুদ্র ছিল কিন্তু পদোন্নতির দিক থেকে বৈষম্যের কারণেই সংখ্যাগত অনুপাতের চেয়ে অনেক স্বল্প হারে তারা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হতে পেরেছে। ভারত বিভাগের পূর্বে যারা চাকুরীতে নিয়োজিত হয়েছিল একমাত্র প্রতিরক্ষা বিভাগ ছাড়া অন্যকোন বিভাগে এরকম মারাত্মক অসামঞ্জস্য দেখা যায়না। অন্যান্য বিভাগে পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের কর্মকর্তাদের প্রতিনিধিত্ব ছিল শতকরা ৮ থেকে ১৬ এর মধ্যে। একমাত্র প্রতিরক্ষা বিভাগে কর্মরত মোট ৩২ জন কর্মকর্তার সকলই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী। ১৯৬৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ যে সব কর্মকর্তা ভারত বিভাগের পরবর্তী ১১ বছরের মধ্যে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিল তাঁদের মোট সংখ্যা ছিল ২ হাজার ৯৭ জন। তখন একটি উল্লেখ যোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তা পূর্ব পাকিস্তান থেকে নিয়োজিত হয়েছিল। এ সময়ে নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রধান অংশ পশ্চিম পাকিস্তানী হলেও এদের শতকরা ২৮.২৮ জন কর্মকর্তা ছিল পূর্ব পাকিস্তানী। অর্থাৎ কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে এসময় কিছুটা হলেও বৈষম্য কমে আসে। পি, এস, সির মাধ্যমে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়। পাকিস্তানের চাকুরী প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পূর্ব পাকিস্তানী চাকুরী লাভে সমর্থ হয়। এ সময়ে পি, এস, সির মাধ্যমে যে মোট ৮৩১ জন লোক নিয়োগ করা হয়, তার মধ্যে শতকরা ৩৫.১৪ জন ছিল পূর্ব পাকিস্তানী। অবশ্য এ সময়ে প্রতিরক্ষা বিভাগ এবং প্রেসিডেন্টের সচিবালয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত খুব কম সংখ্যক কর্মকর্তাই ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানী। প্রতিরক্ষা দপ্তরে নিযুক্তমোট ২৩০ এর মধ্যে মাত্র ২০ জন পূর্ব পাকিস্তানী আর প্রেসিডেন্ট সচিবালয়ের মোট ৯৯টি পদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানীরা পায় মাত্র ১৪টি। অবশ্য এ অবস্থাটি আগের তুলনায় বেশ ভালই বলতে হবে। তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়েও পূর্ব পাকিস্তানীদের নিয়োগ প্রাপ্তি ঘটেছে স্বল্প হারে, তবে, দেশ বিভাগের আগের তুলনায় তত খারাপ নয়। এ দপ্তরে পূর্ব পাকিস্তানীদের নিয়োগ প্রাপ্তির হার ছিল শতকরা ২২.২২ ভাগ।

১৯৫৮ সালের ১৫ই অক্টোবরের পরবর্তী ৪ বছর ২ মাস ১৫ দিনের মধ্যে যারা নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছিল, তাঁদের মোট সংখ্যা ছিল ১৫০৪ জন। লক্ষণীয় যে, আগের ১১ বছরে যে সংখ্যক কর্মকর্তাকে নিয়োগ করা হয়েছিল উক্ত ৪ বছরে তার প্রায় সমসংখ্যক কর্মকর্তাকে নিয়োগ দান করা হয়। এই বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তার নিয়োগ একটি শক্তিশালী আমলা প্রশাসন গড়ে তোলারই প্রকৃষ্ঠ উদাহরণ। কিন্তু এ চার বছরে যাদেরকে নিয়োগ দান করা হয় তাঁদের মধ্যে আগের ১১ বছরের তুলনায় অনেক কম হারে পূর্ব পাকিস্তানীরা নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছে। আগের ১১ বছরে যেখানে মোট নিয়োগ প্রাপ্তির শতকরা ২৮.২৮ জন ছিল পূর্ব পাকিস্তানী, সেখানে এই চার বছরে পূর্ব পাকিস্তানী নিয়োগ প্রাপ্তির হার ছিল মাত্র শতকরা ২০.৮১ জন। এ সময়ে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত পি, এস, সি কর্মকর্তাদের সংখ্যা সেভাবে হ্রাস পায়নি। এ ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানীরা শতকরা ৩৪.৬০ ভাগ পদ লাভে সক্ষম হয়। অর্থাৎ মোট ৪২২ জন পি, এস,সির নতুন নিয়োজিত কর্মকর্তার মধ্যে ১৪৬ জন ছিল পূর্ব পাকিস্তানী। কিন্তু সরকারী কয়েকটি দপ্তরে চাকুরীর ক্ষেত্রে মারাত্মক অবনতি ঘটে। প্রতিরক্ষা দপ্তরে এ চার বছরে মোট যে ১৮৭ জন নতুন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় তাঁদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতিনিধিত্ব ছিল মাত্র শতকরা ৬.৯৫ ভাগ। তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ে মোট ৫২ জন নতুন কর্মকর্তার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৫ জন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নূতন নিয়োগপ্রাপ্ত মোট ৬৭ জন কর্মকর্তার মধ্যে মাত্র ৩ জন ছিল পূর্ব পাকিস্তানী। গুরুত্বপূর্ণ এ তিনটি দপ্তরে ব্যাপক সংখ্যক পশ্চিম পাকিস্তানীর নিয়োগ প্রদান থেকে মনে করাঅসংগত হবেনা যে, সচেতন ও উদ্দেশ্যমূলকতাবেই এসব দপ্তরে পূর্ব পাকিস্তানীদের বঞ্চিত করা হয়েছে। ইতি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে,কেন্দ্রীয় আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনের মাধ্যমে সমস্ত পাকিস্তানের প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করা হত। অর্থ্যাৎ পূর্ব পাকিস্তানও কেন্দ্রীয় প্রশাসনের বাইরে ছিল না। ১৯৬৩ সালের হিসেব থেকে দেখা যায়, পূর্ব পাকিস্তানী প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় প্রশাসনের অধীনস্থ মোট ৬২০ জন কর্মকর্তা নিয়োজিত ছিল। (দ্রষ্টব্যঃ সারণী নং ৬.৮)। ৬.৮ নং সারণী থেকে দেখা যায়, ১৯৬৩ সালে পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োজিত কেন্দ্রীয় প্রশাসনের আওতাভূক্ত কর্মকর্তাদের উক্ত ৬২০ জনের মধ্যে ২৪৪ জন ছিল সি. এস.পি. কর্মকর্তা। অবশিষ্ট ৩৭৬ জন ছিল অন্যান্য ধরনের কর্মকর্তা। ২৪৪ জন সি. এস. পি কর্মকর্তার মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চিম পাকিস্তানী ছিল শতকরা ৮৪.০২ জন এবং বাকী শতকরা ১৫.৯৮ জন ছিল পূর্ব পাকিস্তানী। তাছাড়া, যারা সি. এস. পি নয় অথচ কেন্দ্রীয় প্রশাসনের আওতাধীন এমন ৩৭৬ জন কর্মকর্তার মধ্যে শতকরা ৮৪.০৪ জন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী, আর শতকরা ১৫.৯৬ জন ছিল পূর্ব পাকিস্তানী। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে মোট ৬২০ জনের মধ্যে মোট ৫২১ জন তথা শতকরা ৮৪.০৩ জন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী। আর মাত্র ৯৯ জন তথা শতকরা ১৫.৯৬ জন ছিল পূর্ব পাকিস্তানী।

সারণী ৬.৮

১৯৬৩ সালে পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রিত কর্মকর্তাদের স্থায়ী ঠিকানা ও বেতন অনুযায়ী বিন্যাস

ক্যাডারের নাম/ বাসস্থানের এলাকা	৪০০টাকার নীচে	৪০০–	৭০০–	১০০০–	১৫০০–	২৫০০–	৪০০০+	মোট
পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস (সি এস পি) পূর্ব পাকিস্তান (%	-	-	-	-	৩৪ (২১.৭৯)	৩ (৫.০০)	২ (৭.১৪)	৩৯ (১৫.৯৮)
পশ্চিম পাকিস্তান (%	-	-	-	-	১২২	৫৭	২৬	২০৫
মোট পাকিস্তান	-	-	-	-	১৫৬	৬০	২৮	২৪৪
সি.এস.পি নয় এমন কর্মকর্তা পূর্ব পাকিস্তান (%	-	৩ (৮.৫৭)	৪ (১২.৯০)	-	৪৩ (২০.৭৭)	৯ (১৬.৩৬)	১ (৪.৭৬)	৬০ (১৫.৯৬)
পশ্চিম পাকিস্তান (%	১২ (১০০)	৩২ (৯১.৪৩)	২৭ (৮৭.১০)	১৫ (১০০)	১৬৪ (৭৯.২৩)	৪৬ (৮৩.৬৪)	২০ (৯৫.২৪)	৩১৬ (৮৪.০৪)
মোট পাকিস্তান (%	১২ (১০০)	(১০০)	(১০০)	(১০০)	(১০০)	(১০০)	(১০০)	(১০০)
মোট কর্মকর্তা পূর্ব পাকিস্তান (%	-	৩ (৮.৫৭)	৪ (১২.৯০)	-	৭৭ (২১.২১)	১২ (১০.৪৩)	৩ (৬.১২)	৯৯ (১৫.৯৭)
পশ্চিম পাকিস্তান (%	১২ (১০০)	৩২ (৯১.৪৩)	২৭ (৮৭.১০)	১৫ (১০০)	২৮৬ (৭৮.৭৯)	১০৩ (৮৯.৫৭)	৪৬ (৯৩.৮৮)	৫২১ (৮৪.০৩)
মোট (%	১২ (১০০)	৩৫ (১০০.০০)	৩১ (১০০)	১৫ (১০০)	৩৬৩ (১০০)	১১৫ (১০০.০০)	৪৯ (১০০)	৬২০ (১০০)

সারণী ৬.৮ থেকে আরও দেখা যায়, পূর্ব পাকিস্তানে যেসব সি, এস, পি কর্মকর্তা নিয়োজিত ছিল বেতনের পরিমানের দিক থেকে তারা সবাই ছিল উচ্চ স্তরের কর্মকর্তা। উক্ত ২৪৪ জন সি, এস, পি কর্মকর্তার কেউই ১৫০০ টাকার নীচে বেতন পেতো না। এদের মধ্যে যারা ১৫০০ টাকা থেকে ২৫০০ টাকার মধ্যে মাসিক বেতন পেতো তারা পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োজিত মোট সি, এস,পি কর্মকর্তার শতকরা ৬৩.৯৩ ভাগ। যাদের মাসিক বেতন ছিল ২৫০০ টাকা থেকে ৪০০০ টাকার মধ্যে তাঁদের সংখ্যা ছিল শতকরা ২৪.৫৯ ভাগ এবং যাদের মাসিক বেতন ছিল ৪০০০ টাকার উপরে তাঁদের সংখ্যা ছিল শতকরা ১১.৪৮ ভাগ। উক্ত তিন স্তরের কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রথম স্তরে পূর্ব পাকিস্তানী কর্মকর্তাদের প্রতিনিধিত্ব ছিল শতকরা ২১.৭৯ ভাগ, দ্বিতীয় স্তরের কর্মকর্তাদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতিনিধিত্ব ছিল মাত্র শতকরা ৫ ভাগ এবং তৃতীয় স্তরের কর্মকর্তাদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানী কর্মকর্তাদের প্রতিনিধিত্ব ছিল শতকরা মাত্র ৭.১৪ ভাগ। অর্থাৎ উচ্চ স্তরের সি, এস, পি কর্মকর্তাদের মধ্যে যারা পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োজিত ছিল তাঁদের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানীদের একক প্রাধান্য ছিল। যাদের মাসিক বেতন ২৫০০ টাকার উপরে ছিল তাঁদের মোট সংখ্যা ছিল ৮৮ জন। তাঁদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানী কর্মকর্তা ছিল মাত্র ৫ জন। পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োজিত উচ্চ পদস্থ সি, এস, পি কর্মকর্তার মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানীদের এই একচেটিয়া আধিপত্য স্বাভাবিকভাবেই পূর্ব পাকিস্তানবাসীর কাছে একটি বিজাতীয় প্রশাসন ভাবার জন্য উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি করে। কেননা সি এস পি কর্মকর্তাদের মধ্যেই শুধু নয় সি এস পি কর্মকর্তার বাইরে যে সকল কেন্দ্রীয় প্রশাসনের আওতাভুক্ত কর্মকর্তা পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োজিত ছিল তাঁদের মধ্যেও পশ্চিম পাকিস্তানীদের প্রাধান্য ছিল এক চেটিয়া। সারণী ৬.৮ থেকেই দেখা যায়, কেন্দ্রীয় সচিবালয় নিয়ন্ত্রিত সি, এস, পি কর্মকর্তা নয় এমন ৩১৬ জন কর্মকর্তার মধ্যে শতকরা ৮৪.০৪ জনই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী। যারা ৪০০ টাকার নীচে বেতন পেতো এমন ১২ জন কর্মকর্তার মধ্যে সবাই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী এবং যাদের মাসিক বেতন ছিল ৪০০০ টাকারও ওপরে পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োজিত এমন ২১ জন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার মধ্যে মাত্র ১ জন ছিল পূর্ব পাকিস্তানী, বাকী ২০ জনই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী। এদের মধ্যে মাঝারি স্তরের কর্মকর্তা যারা ছিল অর্থাৎ যাদের মাসিক বেতন ছিল ১ হাজার টাকা থেকে দেড় হাজার টাকার মধ্যে এরকম ১৫ জন কর্মকর্তার মধ্যে সবাই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী। অর্থাৎ এ সকল কর্মকর্তাদের তিনটি স্তরের কোথাও বাঙালীদের কোন প্রতিনিধিত্বই ছিল না। অন্যান্য ক্ষেত্রে যারা ছিল তাঁদের সংখ্যাও কোথাও শতকরা ২০ ভাগকে অতিক্রম করেনি। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের সামগ্রিক প্রশাসন যন্ত্রকে যারা নিয়ন্ত্রণ করতো সেই পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সচিবালয় নিয়ন্ত্রিত কর্মকর্তাদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যা এত নগন্য ছিল যে, তাঁদের পক্ষে স্বতন্ত্র স্বত্তা রক্ষা করাই অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তানে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী যে ৪৬ জন পদাধিকারী কর্মকর্তা ছিলেন তাঁদের মধ্যে ৪৩ জনই পশ্চিম পাকিস্তানী এবং বাকী মাত্র ৩ জন ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানী। প্রশাসনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানীদের এ শোচনীয় অবস্থা থেকেই অনুমান করা যায়, পাকিস্তানী প্রশাসন যন্ত্র সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর ধারণা কিরকম হতে পারে। এছাড়া, সারণী ৬.৭ এ প্রদত্ত তথ্যে লক্ষ্য করা গেছে, কেন্দ্রীয় প্রশাসনের অধীনস্থ সকল কর্মকর্তার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতিনিধিত্ব শতকরা মাত্র ১৯ ভাগ। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরতদের মধ্যে তাঁদের সংখ্যা ১৬ ভাগ। এ বিষয়টিও পূর্ব পাকিস্তানবাসীর মনে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ঔপনিবেশিক চরিত্রের ধারনা জন্মায়।

পূর্ব পাকিস্তানী শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর চাকুরীর অন্যতম ক্ষেত্র ছিল পূর্ব পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস বা ই.পি.সি.এস। এখানেই পূর্ব পাকিস্তানীরা অধিক সংখ্যাই চাকুরী লাভের সুযোগ পায়। ১৯৬৩ সালের ১লা জানুয়ারী ই.পি.সি.এস কর্মকর্তা হিসাবে যারা নিয়োজিত ছিলেন তাঁদের মোট সংখ্যা ৩৯১ জন। সারণী ৬.৯ থেকে দেখা যায়, পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকারের অধীনস্থ এ কর্মকর্তাদের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

শতকরা ৮০.৮২ জন ছিল পূর্ব পাকিস্তানী, শতকরা ১৮.৬৭ জন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী এবং শতকরা ০.৫১ জন ছিল বিদেশী। এ সকল কর্মকর্তার বেতনের পরিমাণকে মাপকাঠি হিসাবে ধরে ছয়টি স্তরে বিভক্ত করলে দেখা যায়, শতকরা ১.৫৩ জনের বেতন ছিল

সারণী ৬.৯

১৯৬৩ সালে পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত ই পি সিএস কর্মকর্তাদের স্থায়ী ঠিকানা ও বেতন অনুযায়ী বিন্যাস

বাসস্থানের এলাকা	বেতন নির্ধারিত হয়নি	৩০০ টাকা থেকে ৪৯৯ টাকা	৫০০ টাকা থেকে ৭৪৯ টাকা	৭৫০ টাকা থেকে ৯৯৯ টাকা	১০০০ টাকা থেকে ১৪৯৯	১৫০০ টাকার উপরে	মোট
পূর্ব পাকিস্তান	৪	৭৩ (৯২.৪১)	১০৫ (৮৯.৭৪)	৬২ (৭৩.৮১)	৪৫ (৭০.৩১)	২৭ ৬৫.৮৫)	৩১৬ (৮০.৮২)
পশ্চিম পাকিস্তান	২	৬ (৭.৫৯)	১২ (১০.২৬)	২২ (২৬.১৯)	১৮ (২৮.১৩)	১৩ (৩১.৭১)	৭৩ (১৮.৬৭)
অন্যান্য	–	–	–		–	১ (১.৫৬)	১ (২.৪৪) ২ (০.৫১)
মোট	৬	৭৯ (১০০)	১১৭ (১০০)	৮৪ (১০০)	৬৪ (১০০)	৪১ (১০০)	৩৯১ (১০০)

সূত্রঃ Government of Pakistan (1963): Civil List of Class 1 Officers Serving under Government of Pakistan 1st January. 1963, Karachi: : P.G.Press, Part.II (Complited)

অনির্ধারিত, শতকরা ২০.২০ জনের বেতন ছিল ৫০০ টাকার নীচে, শতকরা ২৯.৯২ জনের বেতন ছিল ৫০০ টাকা থেকে ৭৫০ টাকার মধ্যে, শতকরা ২১.৪৮ জনের বেতন ছিল ৭৫০ টাকা থেকে ১০০০ টাকার মধ্যে, শতকরা ১৬.৩৭ জনের বেতন ছিল ১০০০ টাকা থেকে ১৫০০ টাকার মধ্যে এবং শতকরা ১০.৪৯ জনের বেতন ছিল ১৫০০ টাকার ওপরে। ৫০০ টাকার নীচে যারা বেতন পেতো তাঁদের মোট সংখ্যা ছিল ৭৯ এবং এদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানী ছিল শতকরা ৯২.৪১ ভাগ, ৫০০ টাকা থেকে ৭৫০ টাকার মধ্যে যাদের বেতন ছিল তাঁদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানী ছিল ৮৯.৭৪ ভাগ, ৭৫০ টাকা থেকে ১০০০ টাকার মধ্যে যাদের বেতন ছিল তাঁদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানী ছিল শতকরা ৭৩.৮১ ভাগ, ১০০০ টাকা থেকে ১৫০০ টাকার মধ্যে যাদের বেতন ছিল তাঁদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানী ছিল শতকরা ৭০.৩১ ভাগ এবং ১৫০০ টাকার উপরে যারা বেতন পেতো তাঁদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানী ছিল শতকরা ৬৫.৮৫ ভাগ। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান সরকারের আমলা প্রশাসনে সামগ্রিকভাবে পূর্ব পাকিস্তানীদের অবস্থান শক্তিশালী হলেও নিম্ন স্তরের কর্মকর্তাদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানীদের অবস্থান যতটা শক্তিশালী ছিল, উপরের স্তরে ততটা ছিল না। বরং যতই উচু স্তরের দিকে যাওয়া হয়েছে ততই পূর্ব পাকিস্তানীদের অবস্থান দুর্বল হতে শুরু করেছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানীদের অবস্থান শক্তি শালী হয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায়, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় পাকিস্তান প্রশাসনে যে সকল কর্মকর্তা যোগ দিয়েছিল তাঁদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক পূর্ব পাকিস্তানী কর্মকর্তা থাকলেও তাঁদের মধ্যে খুব স্বল্প সংখ্যক কর্মকর্তা ছিল উচ্চপদস্থ। পশ্চিম পাকিস্তানী কর্মকর্তারা খুব দ্রুত বৃটিশ কর্মকর্তাদের ছেড়ে যাওয়া পদগুলি দখল করে। প্রথম ১১ বছরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পূর্ব পাকিস্তানী কেন্দ্রীয় প্রশাসনে নিয়োজিত হতে সক্ষম হলেও সামরিক শাসন আসার পর পূর্ব পাকিস্তানীদের আমলা প্রশাসনে প্রবেশের হার বেশ হ্রাস পায়। পূর্ব পাকিস্তানী চাকুরী প্রার্থীরা প্রশাসনের যেকোন বিভাগে পশ্চিম পাকিস্তানীদের চেয়ে অযোগ্য ছিল এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলিতে পূর্বপাকিস্তানীরা তুলনামূলকভাবে ভাল করেছে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে যতদিন দেশ শাসিত হয়েছিল ততদিন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতে তো বটেই, সাধারণ নিয়মে নিয়োগের ক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তানীদের মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তিকে কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ দান করা হয়। কিন্তু সামরিক শাসন আসার পর প্রথম চার বছরে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানীদের আগের ধারা মোটামুটি অব্যাহত থাকলেও সাধারণ নিয়মে নিয়োগের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানীরা খুবই প্রতিকুল অবস্থার সম্মুখীন হয়। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই উচ্চ পদগুলি পশ্চিম পাকিস্তানীরা অধিকার করে। এমনকি পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের কাজের জন্য যারা দায়িত্ব প্রাপ্ত হয় তাঁদের মধ্যেও বড় পদগুলিতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের অবস্থান ছিল একচেটিয়া। এছাড়া, পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অধীনস্থ প্রশাসনের বড়পদগুলির মধ্যেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পদ পশ্চিম পাকিস্তানীরাদখল করে। অবশ্য ১৯৬৩ সালের পর থেকে এ অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হতে থাকে। সম্ভবতঃ ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনের সময় বাঙ্গালী ছাত্র ও তরুণদের যে বিদ্রোহ ঘটে তারপর থেকে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পাকিস্তানী কেন্দ্রীয় শাসনের নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হতে শুরু করে। ফলে একদিকে যেমন বৈষম্য হ্রাস কারার জন্য প্রকাশ্য ঘোষণা দেওয়া হতে থাকে এবং তৃতীয় ও চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ অনুমোদন করা হয় তেমনি অন্যদিকে আমলা প্রশাসনেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পূর্ব পাকিস্তানী তরুণকে নিয়োগ দান করার জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হয়। আর তারই পরিণতি হিসাবে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে বাঙ্গালী কর্মকর্তাদের সংখ্যা তখন থেকে ক্রমে বাড়তে থাকে।

সারণী ৬.১০

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যাগত অবস্থান

সাল শতকরা	পূর্ব পাকিস্তানী	পশ্চিম পাকিস্তানী	মোট	পূর্ব পাকিস্তানীদের
১৯৬৩	১২১	৬৫৩	৭৭৪	১৫.৬৩
১৯৬৪	১৩২	৬৯৯	৮৩১	১৫.৮৮
১৯৬৬	১৭১	৬৩১	৮০২	২১.৩২
গড়	১৪১	৬৬১	৮০২	১৭.৫৮

সূত্রঃ- Government of Pakistan, Civil List of Class I Officers Serving under the Government of Pakistan, Karachi: P.G. Press. compiled from three reports of 1st January. 1963. 1964. and 1966.

সারণী ৬.১০ থেকে দেখা যায়, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে ১৯৬৩ সালে যে মোট ৭৭৪ জন কর্মকর্তা নিয়োজিত ছিল, তাঁদের মধ্যে শতকরা মাত্র ১৫.৬৩ ভাগ বা ১২১ জন কর্মকর্তা ছিল পূর্ব পাকিস্তানী। ১৯৬৪ সালের ১ লা জানুয়ারী কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের মোট

Dhaka University Institutional Repository

৮৩১ জন কর্মকর্তার মধ্যে ১৩১ জন কর্মকর্তা ছিল পূর্ব পাকিস্তানী, এবং ১৯৬৬ সালের ১লা জানুয়ারী মোট ৮০২ জন কর্মকর্তার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানীর সংখ্যা ছিল ১৭১ জন। এ সময়ে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে গড়ে ৮০২ জন করে কর্মকর্তা নিয়োজিত ছিল, যাদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানীদের গড় সংখ্যা ছিল ১৪১ জন। এ সময়কালে কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে পূর্ব পাকিস্তানীদের অবস্থান ছিল গড়ে শতকরা ১৭.৫৮ জন। ১৯৬৩, ১৯৬৪ ও ১৯৬৬ সালে যথাক্রমে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যা ছিল শতকরা ১৫.৬৩, ১৫.৮৮, এবং ২১.৩২ ভাগ। অর্থাৎ এ সময়ে কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকে।

সরকারী চাকুরী ক্ষেত্রে বৈষম্যের অভিযোগ পঞ্চাশের দশক থেকেই প্রবল হতে থাকে। তাই আইয়ুব খান ক্ষমতাসীন হয়েই এ বৈষম্যের কথা স্বীকার করেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন চাকুরীর ক্ষেত্রে এ বৈষম্য খুব দ্রুতই হ্রাস করা হবে। সে লক্ষ্যে সি, এস, পি অফিসার যাতে উভয় প্রদেশ থেকে সমান সংখ্যক নেওয়া যায় তার জন্য তিনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কিন্তু এটা ছিল প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের একটি নিকৃষ্টতম কূটচাল। কেননা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে সি. এস. পি কর্মকর্তা নিয়োগের সংখ্যা এত কমানো হয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানীদের সমান সংখ্যক কেন, নতুন নিয়োগ দানযোগ্য সবগুলি পদও যদি পূর্ব পাকিস্তানীরা পেতো তাহলেও পরবর্তী ২০ বছরের মধ্যেও পশ্চিম পাকিস্তানী কর্মকর্তাদের সমপর্যায়ে ওঠা কিংবা এমনকি সমসংখ্যায় আসা সম্ভব ছিল না। আইয়ুব খান ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই প্রতি বছর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সি. এস. পি পদ সংখ্যাকে ৩০/৩২ জনের মধ্যে সীমিত করে ফেলা হয়।

সারণী ৬.১১
১৯৫৯-৬৭ কাল পর্বে সি. এস.পি পদে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের
নিয়োগের তুলনামূলক চিত্র

সাল	পূর্ব পাকিস্তানী	পশ্চিম পাকিস্তানী	মোট	পূর্ব পাকিস্তানীদের শতকরা হার (%)
১৯৫৯	১২	১২	২৪	৫০.০
১৯৬০	১০	১৯	৩১	৩২.৩
১৯৬১	১০	১৭	২৭	৩৭.০
১৯৬২	১২	১৫	২৭	৪৪.৫
১৯৬৩	১৩	১৮	৩১	৪১.৯
১৯৬৪	১৪	১৯	৩৩	৪২.২
১৯৬৫	১৫	১৫	৩০	৫০.০
১৯৬৬	১৪	১৬	৩০	৪৬.৬
১৯৬৭	১৩	১৭	৩০	৪৩.৩
মোট	১১৩	১৫০	২৬৩	৪৩.০

সূত্রঃ- Compiled from Government of Pakistan, Establishment Division: Civil List of Class 1 Officers Serving under the government of Pakistan, 1st January, 1965; and Gradation List of the Civil Service of Pakistan, July 1, 1967.

সারণী ৬.১১ থেকে দেখা যায়, ১৯৫৯ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত এই নয় বছরে মোট ২৬৩ জন সি. এস,পি কর্মকর্তাকে নিয়োগ দান করা হয়েছে। এদের মধ্যে পূর্বপাকিস্তানী ছিল মোট ১১৩ জন বা শতকরা ৪৩.০ ভাগ। সি.এস.পি কর্মকর্তারা এভাবে উল্লেখযোগ্য হারে নিয়োগ প্রাপ্ত হলেও এ সময়ে মোট ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা নিয়োগের তুলনায় এদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। ফলে সি.এস.পি কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে মোটামুটি সমতার ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান করা হলেও এ ব্যাপারটিকে নিয়ে আইয়ুব সরকার যখন রাজনৈতিক ফায়দা লাভের কৌশল গ্রিহণ করে তখন আঞ্চলিক বৈষম্যের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানীরা আরো গভীর মনোযোগী হয়ে উঠে। খুব সহজেই তদের সামনে সত্য উদঘাটিত হয়। কেননা যে হারে পূর্ব পাকিস্তানী ছাত্ররা ডিগ্রী লাভ করছিল সেই হারে সি.এস. পিতে তারা প্রবেশ করতে পারছিল না। যেমন,১৯৬৩ সালে পূর্ব পাকিস্তানে মোট ৩৯০৫ জন বি.এ ডিগ্রী লাভ করে, কিন্তু তাঁদের মধ্যে মাত্র ৫০৩ জন সি.এস.পি পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ লাভ করেছে এবং পাস করেছে ১২৭ জন। আর সি.এস.পি কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছে মাত্র ১৩ জন।[৮৯] অন্যদিকে, অন্যান্য চাকুরীতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব অব্যাহতই রয়েছে। ফলে শুধুমাত্র সি.এস.পিতে বা শেষ পর্যায়ে (১৯৬৫ সালের পরে) কিছু বেশী সংখ্যায় পূর্ব পাকিস্তানীদের নিয়োগ প্রদান করা হলেই যে পূর্ব পাকিস্তানী শিক্ষিত তরুণ সন্তুষ্ট হবে তা বলা কঠিন। দ্বিতীয়তঃ গোটা কেন্দ্রীয় প্রশাসনে পূর্ব পাকিস্তানী তথা বাঙ্গালী কর্মকতারা ছিল সংখ্যালঘু। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে যত বেশি করে স্বায়ত্তশাসনের দাবি উঠেছে ততই দ্রুত হারে প্রশাসনের মূল ধারা থেকে বাঙ্গালী কর্মকর্তাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার আশংকা দেখা দিয়েছে। তৃতীয়তঃ যে ক্ষমতা ও অধিকার পাকিস্তানী আমলা প্রশাসন প্রয়োগ করার সুযোগ পেয়েছিল তাতে সংখ্যালঘু বাঙালীদের পক্ষে গণনিপীড়ন কিংবা বাঙ্গালী নিপীড়নের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব ছিল কিনা সেটাও ভেবে দেখার মত বিষয়। সর্বোপরি, পাকিস্তান রাষ্ট্র যে শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহের স্বার্থ রক্ষা করে ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল তাঁদের মধ্যে একটি বিশেষ শ্রেণী হচ্ছে বৈদেশিক পুঁজি-নির্ভর পশ্চিম পাকিস্তান কেন্দ্রিক বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠী (এ বিষয়টি আগের দুইটি অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রকে উক্ত শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করতে হলে তার সমগ্র জনসাধারণের ওপর শোষণমূলক ব্যবস্থাটি কায়েম করা ছিল অপরিহার্য। আর যেহেতু রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী পরিচালনার প্রধান বাহন আমলাতন্ত্র. সেইহেতু আমলা তন্ত্রের হাতে কুক্ষিগত সকল কলাকৌশলই পাকিস্তানী আমলাতন্ত্রকে ব্যবহার করতে হয়েছে। ফলে আমলাতন্ত্রের সাধারণ চরিত্র নিপীড়নমূলক না হয়ে পারে নি।

৬.৪ পঞ্চাশের দশকের মধ্যভাগে পাকিস্তান রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্রের রূপান্তর

ইতিপূর্বের আলোচনায় দেখানো হয়েছে, যে রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই মুসলিম লীগের দলীয় সংবিধান ছিল খুবই অগণতান্ত্রিক। দলের সভাপতির হাতেই কেন্দ্রীভূত ছিল প্রায় সমস্ত ক্ষমতা। অপর দিকে, সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী গভর্ণর জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন মুসলিম লীগ সভাপতি মোহম্মদ আলী জিন্নাহ্। ফলে জিন্নাহ্‌র হাতে রাষ্ট্র ও পার্টির সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। কিন্তু জিন্নাহ্‌র মৃত্যুর পর গভর্ণর জেনারেল এবং মুসলিমলীগের সভাপতি পদ দু'টি দু'জনের হাতে চলে

৮৯. Jahan, Rounaq (1973): Pakistan-Failure in National Integration, Dacca: Oxford University Press, p. 106.

Dhaka University Institutional Repository

যায়। ফলে এক ধরনের তারসাম্যমূলক অবস্থার সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে, প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারী পাকিস্তানের দ্বিতীয় জাতীয় নেতা নবাব লিয়াকত আলীখান প্রধানমন্ত্রী থাকায় এ তারসাম্যমূলক অবস্থা আরো বিস্তৃতি পায়। কিন্তু লিয়াকত আলী খানের মৃত্যুর পর দুর্বল ব্যক্তিত্বের অধিকারী খাজা নাজিমুদ্দিন গভর্ণর জেনারেলের পদ ছেড়ে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করার পর একজন প্রাক্তন আমলা গোলাম মোহাম্মদ গবর্নর জেনারেল পদে নিয়োজিত হন। পাকিস্তানের ইতিহাসে এরকম গুরুত্বপূর্ণ পদে একজন প্রাক্তন আমলার নিয়োজিত হওয়ার ঘটনা এই প্রথম।[৯০] এর ফলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের কেন্দ্রিয় ক্ষমতার ভারসাম্য ভেঙ্গে পড়তে থাকে। গোলাম মোহাম্মদ তার ক্ষমতাকে সংহত করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক নেতৃত্বের পরিবর্তে সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের ওপর নির্ভর করতে থাকেন এবং এক পর্যায়ে সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের সহায়তায় খাজা নাজিমুদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণ করেন।[৯১] সামন্ত অভিজাত শ্রেণীভূক্ত মুসলিম লীগের পার্লামেন্টারী দলের প্রবীণ নেতা খাজা নাজিমুদ্দীনকে অপসারিত করে এমন একজনকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হয় যিনি জাতীয় পরিষদের সদস্য নন, এমনকি তিনি জাতীয় পরিষদের সদস্যদের সমর্থনেও নেতা নির্বাচিত হননি। তিনি হচ্ছেন বগুড়ার মোহাম্মদ আলী। তাঁকে ওয়াশিংটনস্থ পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব থেকে সরাসরি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করা হয়।[৯২] কিন্তু শুধু আমলাতন্ত্রকে সাথে নিয়ে গোলাম মোহম্মদ নিজেকে নিরাপদ মনে করলেন না; কেননা পাকিস্তানের মত দেশে একমাত্র ভূস্বামী শ্রেণী ছাড়া শাসক গোষ্ঠীর মধ্যেকার আর কেউ কখনও ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে তাঁদের সামাজিক ভিত্তি গড়ে তুলতে পারেনি।[৯৩] ফলে আমলাতন্ত্র নির্ভর গবর্নর জেনারেল গোলাম মোহম্মদ পশ্চিম পাকিস্তানের তিন বিরাট ভূস্যধিকারীকে তিন প্রদেশের গভর্ণর নিয়োগ করেন– এরা হচ্ছেন পাঞ্জাবে ফিরোজ খান নুন, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সরদার আব্দুর রশিদ এবং সিন্ধুতে পীরজাদা আবদুস সাত্তার।[৯৪] এভাবে সামন্ত অভিজাতদের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন করার ফলে সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রকে বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হল। বিশেষতঃ নাজিমুদ্দীনের মত করুণ পরিণতি যাতে না হয়, তার জন্য গভর্ণর জেনারেলের ক্ষমতাকে সীমিত করার লক্ষ্যে নতুন প্রধান মন্ত্রী মোহম্মদ আলী জাতীয় পরিষদে আইন পাসের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।[৯৫] ভূমি–অভিজাত শ্রেণীভুক্ত গবর্নরগণ ও এ শ্রেণীর অন্যান্য জাতীয় পরিষদ সদস্যগণ প্রধান মন্ত্রীকে এ কাজে সহযোগিতা ও উৎসাহিত করেন। ইতিমধ্যে মোহম্মদ আলী মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং এর মাধ্যমে তিনি তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতাকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করেন।[৯৬] এ পটভূমিতে গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহম্মদ আমলাতন্ত্র ও সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সার্বভৌম পাকিস্তান জাতীয় সংসদকে ভেঙ্গে দেন[৯৭] এবং দুইজন জেনারেলকে গুরুত্ব পূর্ণ দুটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেন। আগেই বলা হয়েছে, এদের মধ্যে একজন হচ্ছেন জেনারেল আইয়ুব খান, যিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নিয়োজিত হন এবং অন্যজন মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা, যিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান। এভাবে খোদ সরকারী কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ পদে সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের নিয়োগ করা হয়। ফলে পঞ্চাশের দশকের মধ্যভাগে সকল রাষ্ট্রীয় ও সরকারী ক্ষমতা সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। গোলাম মোহম্মদের পর বৃটিশ আমলাতন্ত্রের রাজনৈতিক সার্ভিসের সদস্য ও দীর্ঘদিনের পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা সচিব উক্ত ইস্কান্দার মির্জা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীত্ব থেকে সরাসরি গভর্ণর জেনারেল পদে নিয়োজিত হন। ইস্কান্দার মির্জাও গোলাম মোহম্মদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। এ পর্যায়ে আবার পাকিস্তানে সাংবিধানিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

ইতিমধ্যে পূর্ব বাংলায় ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে যুক্ত ফ্রন্টের কাছে সরকারী দল মুসলিম লীগের ভরাডুবি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এ ঘটনা পাঞ্জাব কেন্দ্রিক ক্ষমতাবান ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদেরকে শংকিত করে তোলে। কেননা পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্ট ব্যাপকভাবে বিজয়ী হলে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদেও যে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্বশাসনপন্থীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হবে এতে আর কোন সন্দেহ ছিল না। তার অর্থ পাঞ্জাব কেন্দ্রিক ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের একচেটিয়া স্বার্থের প্রতি চরম আঘাত অত্যাসন্ন।[৯৮] পূর্ব বাংলার যুক্তফ্রন্ট তখন সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের দুই অংশের প্রতিনিধিত্বে যে ব্যাপক বৈষম্য বিরাজ করছিল তা দ্রুত দূর করে পরিপূর্ণ সমতার দাবি জোরালোভাবে তুলে ধরে। এতে সামরিক–বেসামরিক আমলাতন্ত্রের মধ্যেও শংকা ছড়িয়ে পড়ে।[৯৯] এরই প্রেক্ষিতে পূর্ব বাংলার ন্যায্য দাবি ঠেকাতে পাকিস্তানের সামরিক–বেসামরিক আমলাতন্ত্র এবং পাঞ্জাব কেন্দ্রিক শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা পশ্চিম পাকিস্তানের সবগুলি প্রদেশকে ভেঙ্গে দিয়ে এক ইউনিট প্রতিষ্ঠার জন্য গভর্ণর জেনারেলের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহম্মদ তাঁর পদাধিকার বলে এক ইউনিট প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। এ নিয়ে পাকিস্তানের শাসক শ্রেণীসমূহের মধ্যকার মৌলিক বিরোধটি প্রকাশ হয়ে পড়ে। মুসলিম লীগের আঞ্চলিক নেতারা তথা সামন্ত অভিজাতগণ একযোগে এ ঘোষণার প্রতিবাদ করেন। জাতীয় পরিষদেও পাঞ্জাবের কিছু সদস্য ছাড়া পূর্ববাংলাসহ পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য সকল প্রদেশের অধিকাংশ সদস্য এর বিরোধিতা করে। তারিক আলী এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন:

"The contradictions involved in the one unit plan were enormous. Many provincial political leaders (i.e. landlords) did not want to strengthen the hand of their {Punjabi Peers too much. They saw one unit as a threat to the development of their own areas. As a result, when the unification proposals were discussed by the Muslim

---

৯০. Kumar, Satish (1984): 'Problems of Federal Politics in Pakistan' Pakistan: Society and Politics, South Asian Studies Series, 6. Edited by Pandav Nayak, New Delhi: South Asian Publishers Pvt, Ltd. p. 26.

৯১. Ahmad, Kamruddin (1975): A Socio Political History of Bengal and the Birth of Bangladesh, Dacca: Inside Library, p. 112.

৯২. *Ibid*, p. 112.

৯৩. Nayak, Pandav (1984) : 'Political Economy of the State of Pakistan' *Pakistan: Society and Politics, op. cit*, p. 62.

৯৪. Kumar, Satish (1984): *Op, cit*, p. 28.

৯৫. খান, মুহম্মদ আইয়ুব (১৯৬৮)ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।

৯৬. খান, মুহম্মদ আইয়ুব (১৯৬৮)ঃ প্রাগুক্ত, পৃ.৬৫।

৯৭. *Ibid*, p. 112.

৯৮. Ali, Tariq (1970): *Pakistan: Military Rule or* People's *Power*, London: Janathan Cape. p. 65.

৯৯. *Ibid*, p. 65.

Dhaka University Institutional Repository

League Parliamentary Party they were turned down by a majority of Muslim Leaguers belonging to Bengal,Sind and Baluchistan".[১০০]

এভাবে প্রথম দফায় এক ইউনিট গঠনের প্রচেষ্টা বাতিল হয়ে যায়। এতে প্রাক্তন আমলা, পাঞ্জাবী গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহম্মদ প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীনের প্রতি ভীষণ ক্ষুব্দ হন এবং কোন সংগত কারণ ছাড়াই নাজিমুদ্দীনকে প্রধান মন্ত্রীর পদ থেকে অব্যাহতি প্রদান করেন। মুসলিম লীগের মধ্যেকার উক্ত বিরোধ শুধু নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব বিরোধ ছিল না। এটা ছিল মূলত শাসক দলের আভ্যন্তরীণ শ্রেণী দ্বন্দ্বের এক বহিঃপ্রকাশ।

পাকিস্তানের সমাজ কাঠামোয় নতুন শ্রেণী সৃষ্টিতে, বিশেষত ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি শ্রেণীর বিকাশে যুক্তরাষ্ট্রের ছিল একটি বিশিষ্ট ভূমিকা। এসকল নতুন শ্রেণী সৃষ্টি ছাড়া পাকিস্তানকে দিয়ে মার্কিনী সামরিক পরিকল্পনাও কার্যকরি করা সম্ভব ছিল না। কেননা তাত্ত্বিক আলোচনায় লক্ষ্য করা গেছে তৃতীয় বিশ্বে মেট্রোপলিটান বুর্জোয়া শ্রেণী সৃষ্টি করাটা পুঁজিবাদী কেন্দ্রীয় দেশের জন্য খুবই জরুরী। এই মেট্রোপলিটান শ্রেণীই কেন্দ্রীয় পুঁজিবাদী দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের প্রধান পাহারাদার। পাকিস্তানে সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র এবং বিদেশী অর্থ ও সুযোগ-সুবিধার ওপর নির্ভরশীল শিল্পপতিদের সমন্বয়ে যে মেট্রোপলিটান বুর্জোয়াশ্রেণী গড়ে উঠতে শুরু করে- তারই প্রতিনিধি ছিলেন পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ। এ কারণে সামন্ত শ্রেণীভুক্ত মুসলিম লীগ নেতাদের সাথে গোলাম মোহম্মদের এ বিরোধ ছিল একটি অনিবার্য ব্যাপার।[১০১]

নাজিমুদ্দীনকে অপসারিত করেও গোলাম মোহম্মদ কিন্তু সংকট এড়াতে পারেননি। পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী মোহম্মদ আলীকে দিয়ে যখন আবার এই এক ইউনিট প্রথা প্রতিষ্ঠা করতে গেলেন তখন তার বিরোধিতা আরো প্রবল রূপ ধারণ করলো, যদিও গোলাম মোহম্মদ তার এক ইউনিট পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নের জন্য পূর্ব বাংলায় ৯২ ক ধারা বলবৎ করে প্রাদেশিক নেতাদেরকে শায়েস্তা করেছেন, সিন্ধুর মূখ্য মন্ত্রীকে বরখাস্ত করে সেখানে এন.এ. খুরো নামক একজন প্রাক্তন সামরিক আমলাকে বসিয়েছেন এবং সিন্ধুর প্রাদেশিক পরিষদ সভার চারিদিকে পুলিশ দিয়ে ঘিরে এমনভাবে চাপ সৃষ্টি করা হয় যাতে এক ইউনিট প্রথার সপক্ষে সদস্যগণ ভোট দান করে।[১০২] শেষ পর্যন্ত একটি অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে গোলাম মোহম্মদ পশ্চিম পাকিস্তানকে এক ইউনিটের অধীনস্থ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপের কারণে তা সম্ভব হয়নি।[১০৩] অতঃপর ১৯৫৫ সালের জুন মাসে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশসমূহে যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে মুসলিমলীগ বিপুলভাবে জয়যুক্ত হয়। বলাবাহুল্য, সামন্ত অভিজাত শ্রেণীভুক্ত মুসলিমলীগ নেতাদের আঞ্চলিক আধিপত্যের কারণেই এ বিজয় সম্ভব হয়েছিল। ফলে সামন্ত শ্রেণীভুক্ত এসকল নেতার প্রভাব অক্ষুন্নই থেকে যায়। এ অবস্থায় নতুন গভর্ণর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করেন। অন্যদিকে পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনসহ পূর্ব বাংলার কতকগুলি দাবি মেনে নেয়ার শর্তে পূর্ব বাংলার নেতাগণ 'মারি চুক্তি'তে সই করেন।[১০৪] এভাবেই পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে এক ইউনিট সংক্রান্ত বিল পাস হয়। কিন্তু এ ঘটনা পশ্চিম পাকিস্তানের সামন্ত অভিজাত শ্রেণীভুক্ত পার্লামেন্ট সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। মুসলিমলীগের বড় ভূস্বামী সদস্যগণ ততদিনে উপলব্দি করেছে যে,মুসলিম লীগ সরকার তাঁদের শ্রেণী স্বার্থ রক্ষা করতে পারবেনা। ফলে তারা রিপাবলিকান পার্টি নামে নতুন রাজনৈতিক দলের জন্ম দেয়। ইস্কান্দার মির্জা নিজের ক্ষমতাকে নিরাপদ করার স্বার্থেই এ উদ্যোগকে সমর্থন করে। কিন্তু রিপাবলিকান পার্টি এক ইউনিট ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে বিরোধিতা শুরু করে। পার্লামেন্টারিয়ান পার্টিতেও ব্যাপক বিভক্তি ঘটে। পশ্চিম পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের ৩০৬ জন সদস্যের মধ্যে ১৮৯টি ভোটই রিপাবলিকান পার্টির পক্ষে পড়ে। ফলে সংগত কারণেই পশ্চিম পাকিস্তানে রিপাবলিকান পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। আর সেই সাথে সারা পশ্চিম পাকিস্তানের ভূস্বামীরা রিপাবলিকান দলে যোগ দেয়। আর যেহেতু এই বড় ভূস্বামীরাই স্থানীয় মুসলিম লীগকে নিয়ন্ত্রণ করতো, সেহেতু সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানে রিপাবলিকানপার্টির বিশাল সংগঠন গড়ে উঠে।[১০৫] এভাবেই পশ্চিম পাকিস্তানে পাঞ্জাব কেন্দ্রিকে মেট্রোপলিটান বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে সামন্ত ভূস্বামীদের প্রতিরোধ গড়ে উঠলো। যে শ্রেণীর সাথে দ্বন্দ্বের কারণে পশ্চিম পাকিস্তানের সামন্ত ভূস্বামীগণ মুসলিম লীগ ভেঙ্গে রিপাবলিকান দলের জন্ম দিয়েছিল, পূর্ববাংলার যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে, সেই শ্রেণী তথা পাঞ্জাব কেন্দ্রিক শিল্পপতি-ব্যবসায়ী, সামরিক-বেসামরিক আমলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য শহরের সুবিধাভোগী শ্রেণী সমন্বিত মেট্রোপলিটান বুর্জোয়া শ্রেণীর সাথেই সে সময় পূর্ব বাংলার জনগণের মূল বিরোধটি দেখা দিয়েছিল। এভাবেই সেদিন পশ্চিম পাকিস্তানের সামন্ত ভূস্বামীদের দল রিপাবলিকান পার্টির সাথে পূর্ব বাংলার উন্নয়নকামী বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি আওয়ামী লীগের আশ্চর্যজনক এক আঁতাত গড়ে উঠেছিল- যার বদৌলতে আওয়ামী লীগ নেতা সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হতে সমর্থ হয়েছিলেন। এটা লক্ষ্য করে তারিক আলী লিখেছেনঃ

"The aspiring bourgeoisie of East Bengal combined with the most reactionary land lords and businessmen in West Pakistan"[১০৬]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায়, পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকেই পাকিস্তান রাষ্ট্র সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। তখন পাকিস্তানের সমর সজ্জা প্রায় পরিপূর্ণভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভশীল। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, বিশেষতঃ শিল্প বিকাশেও ইউ.এস.এইড নির্ভর। অন্যদিকে আমলাতন্ত্রের পক্ষপাতিত্ব ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতার মাধ্যমে সৃষ্ট ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি শ্রেণীও রাষ্ট্রের অনুগত গোষ্ঠী হিসাবে আর্বিভূত হয়। এরা সবাই আমলাতন্ত্রের ওপর নির্ভর শীল হলেও শিল্পপতিদের একাংশ আমলাতন্ত্রের সহায়তায় বিপুল পরিমাণে মার্কিন পুঁজি সংগ্রহে সমর্থ হয়। এবং সে সুবাদে এই শিল্পপতি শ্রেণীর এ অংশটিও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অনুগত গোষ্ঠীতে পরিণতঃ হয়। এর ফলে পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোয় মার্কিন স্বার্থ, মার্কিনের অনুগত শিল্পপতিদের স্বার্থ,

---

১০০. *Ibid*, pp. 56-66.
১০১. *Ibid*, p. 66.
১০২. Ibid, p. 67.
১০৩. *Ibid*, p. 68.
১০৪. আহমদ, আবুল মনসুর, প্রাগুক্ত, পৃ-২১৪
১০৫. Ali, Tariq (1970): *Op. cit*, p. 70.
১০৬. *Ibid*, p. 71.

Dhaka University Institutional Repository

আমলাতন্ত্রের অনুগত ব্যবসায়ী শ্রেণীর স্বার্থ এবং সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের স্বার্থের মধ্যে এক অশুভ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এ সকল সামাজিক শ্রেণী ও গোষ্ঠীর বিকাশ ও শক্তি অর্জনের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশকে এক ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক ছিল। অন্যদিকে, পশ্চিম পাকিস্তানের ভূমি অভিজাত শ্রেণীর সাথে এদের প্রত্যক্ষ কোন অর্থনৈতিক বিরোধ ছিল না। কেননা ভূমি অভিজাতদের শ্রেণীগত রাজনৈতিক ক্ষমতা অনেক আগেই লোপ পেয়েছিল। শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর এদের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিলনা। এসকল সামাজিক শ্রেণী ও গোষ্ঠীর উন্নতির ক্ষেত্রে সামন্ত অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। কিন্তু এক ইউনিট ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে ভূমি অভিজাতদের পক্ষে আঞ্চলিক প্রভাবও আধিপত্যের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা ক্রমশঃ অসম্ভব হয়ে উঠবে এটাই ছিল এদের কাছে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। রাষ্ট্রের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত উক্ত চারটি স্বার্থ গোষ্ঠীর কাছে এক ইউনিট ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ছিল দ্বিবিধঃ প্রথমতঃ শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানে অবাধ সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে, যা মার্কিন পুঁজির নিরাপত্তার জন্য খুবই সহায়ক। দ্বিতীয়তঃ এক ইউনিট হলে গোটা পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর পাঞ্জাবী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে- যা' পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবির বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী বর্ম হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু যখন সকল প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদে এক ইউনিট বিরোধী প্রবল মতামত উপস্থাপিত হল এবং এই এক ইউনিট বিরোধী মনোভাব পশ্চিম পাকিস্তানে এক গণআন্দোলনের সৃষ্টি করল তখন সদ্য প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) ও রিপাবলিকান পার্টি এ আন্দোলনের সম্মুখভাগে এসে দাঁড়ালো। উক্ত গণআন্দোলনের চাপে কিংবা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয়ে মুসলিমলীগও এক ইউনিট ব্যবস্থা বাতিলের সপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। ফলে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে প্রকৃত পক্ষে এক ইউনিটের পক্ষে বলবার মত প্রায় কোন সদস্যই ছিল না।[১০৭] পাকিস্তান রাষ্ট্রে ও মার্কিনযুক্ত রাষ্ট্রের স্বার্থের সাথে সম্পর্কিত উল্লিখিত সামাজিক শ্রেণী-গোষ্ঠীর জন্য এ অবস্থাটি মোটেই স্বস্তিকর ছিলনা। কারণ ১৯৫৯ সালের মার্চে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে এক ইউনিট বিরোধীরা এবং পূর্ব বাংলার স্বায়ত্ত শাসনবাদীদেরই বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। অন্যদিকে, এ সুযোগে পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলিমলীগ মার্কিন বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ন হয়।[১০৮] ফলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য নির্ভর করার মত কোন রাজনৈতিক দলই থাকলো না। পাকিস্তান রাষ্ট্রের যারা ঘনিষ্ঠ অংশীদার ছিল তারা একদিকে জনগণের ওপর নির্যাতক ও শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল, অন্যদিকে জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে বারবার হস্তক্ষেপ করার কারণে গণবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রের অংশীদার উক্ত চারটি স্বার্থগোষ্ঠী সব সময়ই এমনভাবে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পড়ে যে, সাধারণ মানুষ এতে বিভ্রান্ত হয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বকেই দোষারোপ করতে থাকে।[১০৯] কিন্তু তা সত্ত্বেও রাষ্ট্রের ওপর উক্ত চারটি স্বার্থ গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ এমন প্রবল রূপ ধারণ করল যে, বিদ্যমান কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষেই আর তাদের দাবি পূরণ করা সম্ভব ছিল না। ফলে খোদ মার্কিন স্বার্থ, মার্কিন পুঁজি ও রাষ্ট্রীয় পুঁজির অনুগত শিল্প পতিদের স্বার্থ, আমলাতন্ত্রের অনুসারী ব্যবসায়ীদের স্বার্থ এবং সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের নিজস্ব স্বার্থ- এই চারটি স্বার্থ একত্রে রক্ষা করে কোন গ্রহণযোগ্য সাংবিধানিক সরকার টিকিয়ে রাখার আর কোন বাস্তবতা সে সময় পাকিস্তানে ছিল না। এই স্বার্থগুলি রক্ষার প্রয়োজনেই গণমানুষের ওপর বল প্রয়োগ করাটা তাঁদের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আর বল প্রয়োগের মুল শক্তিটি সামরিক বাহিনীর হাতে থাকায় এসব স্বার্থের প্রতিভূ হিসাবে সেনা বাহিনীই সামনে চলে আসে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর সমগ্র পাকিস্তানের জনগণের উপর সামরিক শাসনের জগদল পাথর চেপে বসে।

---

১০৭. উপরোক্ত তথ্যসমূহ মুহম্মদ আইয়ুব খান (১৯৬৮), আবুল মনসুর আহমদ (১৯৬৮), অলি আহাদ ( ) তারিক আলী (১৯৭০) ও কামরুদ্দীন আহমদ (১৯৭৫)- এ পাঁচ জন লেখকের প্রাগুক্ত গ্রন্থ সমূহ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

১০৮. আহাদ, অলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১।

১০৯. আবুল মনসুর আহমদ খুব স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন, কিভাবে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ পত্র লিখিয়ে নেন। মির্জার কুটিল চাল এবং তার স্বার্থ গোষ্ঠীসমূহের সহযোগিতা এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যে, জাতীয় পরিষদে সংখ্যা গরিষ্ঠতা যাচাই-এর আগেই সোহরাওয়ার্দী স্বেচ্ছায় পদত্যাগ পত্র প্রদান করেন। আর পদত্যাগ পত্র হাতে পেয়েই ইস্কান্দার মির্জা কোন রকম বিলম্ব না করেই তা অনুমোদন করেন। ইস্কান্দার মির্জা সে সময় জানতেন যে জাতীয় পরিষদে অনাস্থা প্রস্তাব এনে তাকে সরানো যাবে না। তাই তিনি প্রকাশ্যে জোরালোভাবে সোহরাওয়ার্দীর বিভিন্ন নীতিকে সমর্থন করতে শুরু করেন, আর সোহরাওয়ার্দীকে বোঝাতে সক্ষম হন যে, তার সরকারকে আরো মজবুত করার লক্ষ্যেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ওপর চাপ প্রয়োগের জন্য মির্জার হাতে একটি পদত্যাগ পত্র-দরকার, যার কোন-কার্যকারিতা থাকবেনা। কিন্তু বিরোধী দলগুলিকে তার পক্ষে আনা যাবে। দ্রষ্টব্যঃ আহমদ, আবুল মনসুর, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৯-৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

৭.পাকিস্তান রাষ্ট্রের চরিত্রঃ আইয়ুব আমল

আগের অধ্যায়ের আলোচনা থেকে দেখা গেছে, ১৯৫৮ সালের শেষার্ধে পাকিস্তান রাষ্ট্র এমন একটি অবস্থায় এসে উপনীত হয় যে, রাষ্ট্রের অংশীদার সবগুলি শ্রেণীকে ধারণ করার ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলে। প্রশ্ন দেখা দেয়, রাষ্ট্রের ওপর খবরদারী করার অধিকার পশ্চিম পাকিস্তানের ভূস্বামী শ্রেণীর হাতে থাকবে, না সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র ও তাদের ওপর নির্ভরশীল পুঁজিপতি শ্রেণীর হাতে থাকবে। এপর্যায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এবং মার্কিন ঋণ ও সাহায্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও বিকাশমান বুর্জোয়া শ্রেণীর বিস্তৃতির আকাঙ্খার সাথে সামন্ত শ্রেণীর কায়েমী আধিপত্যের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব প্রকাশ্য রূপ ধারণ করে। পশ্চিম পাকিস্তানকে এক ইউনিট করার অর্থ ভূ-স্বামীদের আধিপত্য খর্ব হওয়া, আবার প্রদেশসমূহ বিভক্ত থাকলে শিল্পপতি শ্রেণীর বিকাশের ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। যদি আইন পরিষদ আলাদা থাকে তাহলে শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের স্বার্থের অনুকূলে আইন প্রণয়নের ব্যাপারটি হয়ে পড়ে অনিশ্চিত; বিশেষতঃ পাঞ্জাবভিত্তিক বৃহৎ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের মুনাফার অর্থকে কেন্দ্রে সমাবেশ করার ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে, পশ্চিম পাকিস্তান কয়েকটি প্রদেশ ও অঞ্চলে বিভক্ত থাকলে পুলিস বাহিনীসহ প্রশাসনের তরকেন্দ্রগুলি বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। সামরিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাথে মার্কিন স্বার্থ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকার কারণে এমনিতেই সে সময় পাকিস্তানের উভয় অংশে প্রবল মার্কিন বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি হতে থাকে। এছাড়া, মার্কিন স্বার্থের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত সামরিক 'বাহিনী, আমলাতন্ত্র ও শিল্পপতিদের চাপের মুখে এক ইউনিট বিল পাশ হওয়ার কারণে বিশেষতঃ পশ্চিম পাকিস্তানে মার্কিন-বিরোধী মতামত আরও প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়। এ অবস্থায় ক্ষমতাসীন সরকারও এক ইউনিট ব্যবস্থা রক্ষা করার জন্য তেমন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেনি। এ কারণে রিপাবলিকান দল এবং মুসলিমলীগসহ দেশের প্রায় সকল রাজনৈতিক দলই এসময় মার্কিন বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এ পরিস্থিতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে দেশের উভয় অঞ্চলে সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র, বড় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি শ্রেণী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধী শক্তিই যে জয়লাভ করবে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তখন উক্ত সামাজিক শ্রেণীসমূহ ও বিদেশী শক্তির স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়। এ পর্যায়ে একটি অসাংবিধানিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই এসব দ্বন্দ্ব নিরসনের একমাত্র পথ বলে এদের কাছে বিবেচিত হয়, যা পাকিস্তানের সামরিত আইন জারী করার পথ প্রশস্ত করে। তখন সামরিক বাহিনী উল্লিখিত শ্রেণীসমূহ ও গোষ্ঠী স্বার্থের পাহারাদার হিসাবে নিম্নোক্ত দায়িত্বগুলি পালন করেঃ

১. পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির ওপর আপন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করে। যাতে কোনক্রমেই সামরিক সরকার হুমকির সম্মুখীন না হয় সে জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

২. কতক অর্থনৈতিক সংস্কার করে, যাতে সামরিক শাসনের পক্ষে একটি সামাজিক ভিত্তি গড়ে ওঠে।

৩. উক্ত চারটি শ্রেণী ও গোষ্ঠী স্বার্থের পরিপন্থী রাজনৈতিক শক্তিগুলি যাতে পুনরায় মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় আইনসমূহের প্রয়োগ ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিয়ন্ত্রণের কাজে এসব ব্যবহার করে। বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনা উক্ত তিনটি বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এছাড়া, পূর্ব পাকিস্তানের উপর এ সকল পদক্ষেপের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল তাও অনুসন্ধান করা বর্তমান অধ্যায়ের অন্যতম লক্ষ্য। উপরোক্ত তিনটি মৌলিক বিষয়কে স্বতন্ত্র তিনটি উপ-অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্রের সুনির্দিষ্ট রূপ ও তার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের স্বরূপ কি তা চতুর্থ উপ-অধ্যায়ে বিবেচিত হবে।

৭.১ আইয়ুবের সামরিক সরকারের অধীনে আইনগত ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে সাংবিধানিক সরকারের ক্ষমতাচ্যুতি ঘটে। প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল (অবঃ) ইস্কান্দার মির্জা সামরিক আইনের যে পাঁচটি ধারা প্রদান করেন সেগুলি হচ্ছেঃ

(ক) ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল;

(খ) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের অবসান;

(গ) জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহের বিলুপ্তি;

(ঘ) সকল রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করা; এবং

(ঙ) বিকল্প কোন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার পূর্ব পর্যন্ত পাকিস্তানে সামরিক শাসন বলবৎ রাখা। উক্ত ঘোষণা অনুযায়ী পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি জেনারেল মুহাম্মদ আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ করা হয় এবং সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্যকে নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত হয়।[১]

সামরিক উক্ত ঘোষণা প্রদানের পটভূমি হিসাবে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা তার বক্তৃতায় নিম্নোক্ত কারণগুলি উল্লেখ করেনঃ

---

১. উক্ত ঘোষণা প্রদান করতে গিয়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট তাঁর বক্তৃতায় বলেনঃ

.... I have, therefore, decided that:

(A) The constitution of the 23rd, March, 1956 will be abrogated,

(b) The Central and Provencial Governments will be dismissed with immediate effect.

(c) The National Parliament and Provincial Assembliees will be dissolved.

(d) All Political Parties will be abolished.

(e) Until alternative arrangements are made. Pakistan will come under Martial Law. I hereby appoint General Muhmmad Ayub Khan, Commander-in-Chief, Pakistan Army, as the Chief Martial Law Administrator and place all the Armed Forces of Pakistan under his command."

Proclamation (Dated 7th october, 1958, made by the President of Pakistan) No. F. 81/ Press/58, 25th octover, 1968, Gazette, 31st october,1958.

Dhaka University Institutional Repository

১. নির্লজ্জ রাজনীতিবিদদের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে কামড়াকামড়ি ও দুর্নীতি এমন একটি পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে যে, সৎ, দেশপ্রেমিক ও শ্রমজীবী জনগণের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এর ফলে ধনীরা আরো ধনী হচ্ছে, আর গরীব জনগোষ্ঠী অনাহারে দিন যাপন করছে।

২. একটি সংঘবদ্ধ কালোবাজারী চক্র কৃত্রিমভাবে খাদ্য সংকট সৃষ্টি করেছে; সাংবিধানিক সরকার তার প্রতিকার করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে।

৩. কিছুসংখ্যক রাজনীতিবিদ রক্তাক্ত বিপ্লবের কথা বলছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার দেশদ্রোহীর মত চিন্তা-ভাবনা করছে--বিদেশের সহযোগিতায় দেশকে বিভক্ত করে ফেলার এটাই উপযুক্ত সময়।

৪. আইন সভার অধিবেশনে সদস্যরা সৌজন্য বোধ ও ভদ্রতার শেষ সীমা লংঘন করে চলেছে এবং ইতিমধ্যেই একটি প্রাদেশিক পরিষদের ডেপুটি স্পিকার হট্টগোল ও মারামারিতে মৃত্যুবরণ করেছে। দেশের গোটা রাজনীতি এখনব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত ও আঞ্চলিক স্বার্থের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় নির্বাচন হলে এই সংকীর্ণমনা রাজনীতিবিদরাই নির্বাচিত হয়ে আসবে। এদের কাছ থেকে ভাল কিছু আশা করা যায় না। এদেরকে নির্বাচিত হয়ে আসতে দিলে রাজনৈতিক মঞ্চে পুনঃ পুনঃ বিয়োগান্ত নাটকই অনুষ্ঠিত হতে থাকবে।

৫. আমাদের বৈদেশিক নীতিকে যেভাবে নির্বোধের মত দায়িত্বহীন সমালোচনা করা হচ্ছে তার পিছনে কোন দেশপ্রেম নেই, বরং তার পিছনে রয়েছে একটি গভীর স্বার্থপর দৃষ্টিভঙ্গি। আর এসবের জন্য মূখ্যতঃ রাজনীতিবিদরাই দায়ী।

৬. শুধুমাত্র গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য গত তিন বছর ধরে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছি, জনসাধারণের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে একের পর এক কোয়ালিশন সরকার গঠনকে অনুমোদন করেছি, কিন্তু এ ধরণের রাজনীতিবিদদের দ্বারা তা হওয়ার নয়।

৭. দীর্ঘ সময়ের অভিজ্ঞতা থেকে জনসাধারণের মধ্যে খুব ভালই উপলব্ধি হয়েছে যে, বর্তমান সরকার পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের মঙ্গলের কোন আশা নেই, বরং ইতিমধ্যেই তারা বুঝেছে যে, এই পদ্ধতির সরকার থাকলে দেশের ধড়িবাজ, অসৎ ও ক্ষমতালোভী রাজনীতিবিদদের হাতে পড়ে তাদের সব কিছু হারাতে হবে। ইসকান্দার মির্জা এ বিষয়ে আরো বলেছেন,

" It is seriously threatened by the ruthlessness of traitors and political adventurerers whose selfishness, thirst for power and unpatriotic conduct cannot be restrained by a government set up under the present system, Nor can I any longer remain a spectator of activities designed to destroy the country."

৮. আমি পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর সাথে তার জন্মলগ্ন থেকে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থেকে বুঝেছি যে, এরা সত্যিকার অর্থেই শৃংখলা পরায়ন ও দেশপ্রেমিক। দেশের এই সংকটকালে একমাত্র তারাই পারে দেশ ও জনগণের সার্বিক মঙ্গল ও নিরাপত্তা বিধান করতে।

৯. সেনাবাহিনী দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার পর কিছুদিনের মধ্যেই আশা করা যায় দেশে স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে; অন্যদিকে এই শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের মধ্যদিয়েই দেশের রাজনীতিবিদদেরকে সংশোধন করার প্রক্রিয়া শুরু হবে। ইসকান্দার মির্জার ভাষায়-

"To rectify them, the country must first be taken to sanity by a peaceful revolution. Then, it is my intention to collect a number of patriotic persons to examine our ploblems in the political field and devise a constitution more suitable to the genius of the Muslin people. When it is ready, and at the appropriate time, it will be submitted to the referendum of the people."[২]

ইস্কান্দার মির্জার এঘোষণার প্রতি ছত্রেছত্রে যেভাবে সকল সংকটের কারণ হিসাবে রাজনীতিবিদদেরকে দায়ী করা হয়েছে তাতে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, রাজনীতিবিদদের মধ্যে এমন কেউই ছিলনা যার ওপর ইস্কান্দার মির্জা নির্ভর করতে পারতেন। তার এ ঘোষণার মধ্যে রাজনীতিবিদদের প্রতি প্রচন্ড অশ্রদ্ধা ও খাটো করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়, যা মুহম্মদ আইয়ুব খানের জীবনীমূলক গ্রন্থেও ফুটে উঠেছে। আইয়ুব খান পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তী ১০ বছরের অভিজ্ঞতার বিবরণ দিতে গিয়ে রাজনীতিবীদদের সম্পর্কে এভাবে একটি দুঃখজনক চিত্র তুলে ধরেছেন। তার কথায়ঃ "কে কোন দলে তা কেউ জানতো না। শুধু লেবেল বদলালেই হতো। আজ যে মুসলিম লীগপন্থী কাল সে রিপাবলিকান; গতকালের দেশদ্রোহী আগামীকালের উজিরে আলা। কোনটা লাউ আর কোন্‌টা কুমড়ো তা আলাদা করে দেখার উপায় ছিল ন।"[৩] রাজনীতিবিদদের সুবিধাবাদের বিবরণ দিতে গিয়ে আইয়ুব খান বলেছেন, খাজা নাজিমউদ্দীনকে অন্যায়ভাবে বরখাস্ত করার পর যখন নতুন একজনকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হল তখন "নাজিমউদ্দীন-মন্ত্রীসভার অধিকাংশ সদস্যই, লোভে কি-না বলতে পারি না কিন্তু বিনা দ্বিধায় এই নয়া মন্ত্রিসভায় যোগদান করলেন।"[৪] আইয়ুব খান প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মুহম্মদ আলী একটি বক্তব্য উল্লেখ করেনঃ "আমার দল আমাকে ত্যাগ করেছে। সব কিছু শেষ হয়ে গেছে।.....এটা অত্যন্ত ভয়ানক ব্যাপার। আপনি সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ করে আমাকে এ ব্যাপার থেকে বাঁচান না কেন?"[৫]

পশ্চিম পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মুসলিম লীগ প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রীর অপসারণ দাবি করলে গবর্ণর তাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন।" মুসলিম লীগের মন্ত্রীরা মন্ত্রিত্বে ইস্তফা দিলেন এবং শূণ্য পদসমূহ রাতারাতি মুসলিম লীগের মধ্য থেকেই তাদের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের দ্বারা পূরণ করা হলো।[৬]

বিশৃংখল রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিবরণ দিতে গিয়ে আইয়ুব খান বলেন, "রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ঐক্য ও শৃংখলা না থাকাতে হুমকি ও চাপ প্রদানের রেওয়াজ বেড়ে গেল। পরিষদ সদস্যরা পরিষদ কক্ষের মেঝে অতিক্রম করে ইচ্ছামত এ'দল থেকে অন্য দলে

---

২. Ibid, reprinted in Patwari, A.B.M. Mofizul Islam (1988). Protection of the Constitution and Fundamental Rights under the Martial Law in Pakistan-1958-1962. Dhaka: University of Dhaka, Appendix-1, pp.187-91.

৩. খান, মুহম্মদ আইয়ুব (১৯৬৮)ঃ প্রভু নয় বন্ধু, ঢাকাঃ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস; পৃ.৭০।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

Dhaka University Institutional Repository

যোগ দিচ্ছিলেন।"[৭] "রাজনীতিবিদদের নিকট সাধারণ নির্বাচন এমন লোভনীয় মনে হচ্ছিল যে, তারা দেশব্যাপী যে আন্দোলন করছিলেন সেটা প্রকাশ্যভাবে যদিও মনে হতো তাঁদের নিজস্ব দলকে সমর্থনের জন্য করছেন, কিন্তু আসলে তা ছিল তাদের বিরুদ্ধ দলকে সন্ত্রস্ত করে তোলার প্রয়াস। এর মধ্যে সবার আগে যিনি ছিলেন, তিনি হলেন খান আবদুল কাইয়ুম খান। তিনি সারা দেশ পরিভ্রমণ করে অগ্নি উদ্‌গীরণ করছিলেন এবং গৃহযুদ্ধের কথা বলছিলেন। তিনি খোলাখুলিভাবে বলছিলেন তাঁর দল যদি জয়লাভ না করে তা হলে রক্তের নদী প্রবাহিত হবে। খান আবদুল কাইয়ুম খান প্রায় ৬০.০০০ লোক নিয়ে মুসলিমলীগ ন্যাশনাল গার্ড সংগঠন করেন। তারা ইউনিফর্ম পরিধান করে, লোহার টুপি মাথায় দিয়ে রাইফেল নিয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় কুচকাওয়াজ করে চলে ফিরে বেড়াতে লাগলো। মুসলিম লীগের কার্যনির্বাহক কমিটি ২৮ সেপ্টেম্বর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করলো যে, যদি প্রয়োজন হয় নীতি বহির্ভূত উপায়েই সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা হবে।"[৮]

সেনাবাহিনীর রাজনীতির সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য রাজনীতিবিদদের দায়ী করে আইয়ব খান বলেন, "সরকার ছিলো সম্পূর্ণরূপে বিভ্রান্ত এবং বলতে গেলে প্রায় নেতৃত্বহীন। আমি জানতাম রাজনীতিবিদদের দৃষ্টি ছিল সেনাবাহিনীর উপর। সেনাবাহিনীর মধ্যে তাঁদের নিজস্ব সমর্থক গোষ্ঠী তৈরি করতে চাচ্ছিলেন।"[৯] জনসাধারণের চাপ ও আকাংখ্যাই যে সেনাবাহিনীকে ক্ষমতা গ্রহণে "বাধ্য" করেছে তার বিবরণ দিতে গিয়ে আইয়ুব খান বলেন, "সেনাবাহিনী চারদিকের পরিস্থিতির প্রভাব থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে পারেনি। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে, অফিসার এবং সৈনিকরা হতাশা এবং নিরুৎসাহ অনুভব করছিলো। প্রায়শঃ তাঁদেরকে লোকে বলতো তোমরা আর্মিওয়ালারা তোমাদের নেমকের প্রতি খাঁটি হও। দেশ গোল্লায় যাচ্ছে আর তোমরা মৌজে আছ। শুধু আমাকেই দোষারোপ করা হত না, ইউনিফরম পরিহিত প্রত্যেককেই দোষারোপ করা হত। বেশ সম্ভ্রান্ত সব লোক আমার কাছে আসতেন আর বলতেন, আপনি এ পরিস্থিতি থেকে দেশকে রক্ষা করতে পারেন, কিন্তু আপনি সে ঝুঁকি নিতে চাননা। আমার কোন কোন বন্ধু এর চাইতেও স্থূলভাবে কথা বলতেন, অবস্থার আরও যখন অবনতি হল তখন আরো বেশি বেশি লোক আমার কাছে এসে সেই একই সুরে কথা বলতে লাগলেন। তাঁদের চোখের মধ্যে হতাশার কালিমা আমি দেখতেও পেতাম। আমি যখন যেখানে যেতাম এবং বহু স্থানে আমি গিয়েছি, এক সেনাবাস থেকে অন্য সেনাবাসে সৈন্যদল পরিদর্শন করতে গিয়েছি, এবং যেখানে লোকে একত্রিত হয়েছে সেখানেই তাদের চোখে আমি সেই একই রকম কালিমা দেখেছি। নৈরাশ্যব্যঞ্জক মানসিক অবনতি জনসাধারণের প্রতিটি স্তরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা খোলাখুলিভাবে বলতে শুরু করেছিল, কোন একটি লোক দেশটাকে রক্ষা করুক। এর অন্তর্নিহিত অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। শুধু মাত্র সেনাবাহিনী এই দাঙ্গা হাঙ্গামার মধ্যে এসে দাঁড়াতে পারে। এটাই একমাত্র সুশৃংখল সংস্থা, যেটা দেশকে স্বস্তি দিতে পারে এবং চারদিকের অনিষ্টকর বস্তু থেকে মুক্ত করতে পারে।"[১০] আইয়ুব খান তার ডায়রীতে ১৯৫৮ সালের ২২ মে তারিখে এ সকল অনুভূতি প্রকাশ করে লেখেন, "নির্বাচন অবশ্য কাছে এসে যাচ্ছে। রাজনীতিবিদরা যে কোন প্রকারে হোক না কেন, ক্ষমতায় আসতে চেষ্টা করছেন এবং ক্ষমতা হাতে পেলে তাঁরা জানেন দেশে আরও বিভেদ সৃষ্টি করা ছাড়া তাঁদের অন্য কিছু করার থাকবেনা। যে ক্ষেত্রে তাঁদেরকে সেনাবাহিনীর ও আমার মুখোমুখি হতে হবে। আমি আমার কর্তব্য পালনের জন্যই তাদের প্রধান শত্রুতে পরিণত হচ্ছি। তাঁদের বিবেক বলে কোন বস্তু নেই। যে কোন প্রকার রাজনৈতিক সুবিধা পাওয়ার জন্য তাঁরা যে সেনাবাহিনী দেশের একমাত্র বর্ম, তাকেও ধ্বংস করতে কুণ্ঠিত হবেন না। গোলাম মুহম্মদ যখন আমাকে ক্ষমতা গ্রহণ করবার অনুরোধ করেছিলেন, তখন তা আমি প্রত্যাখান করেছিলাম। তখন আমার আশা ছিল, রাজনীতিবিদদের মধ্যেই কেউ না কেউ দেশপ্রেম, নিঃস্বার্থতা এবং দেশের অগ্রগতি সাধনের জন্য উৎসাহ দেখাবেন। কিন্তু তাঁদের সকলকেই পরীক্ষা করা হয়েছে, আমি এখন নিশ্চিত যে, যদি দেশকে তাঁদের কাছে ছেড়ে দেওয়া হয়, তা হলে আমরা ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই আশা করতে পারিনে। আমার মনে হয়, আমাদের এমন ধরনের একটি সরকার এক যুগ কিংবা সেই রকম সময়ের জন্য থাকা দরকার যা আমাদেরকে গণতন্ত্রের জন্য তৈরী করবে এবং অপেক্ষাকৃত বড় সমস্যাগুলো সমাধান করতে সাহায্য করতে পারবে। বিশৃংখলা সৃষ্টি এবং ক্ষতিসাধন ছাড়া বর্তমান শাসনতন্ত্রের অন্য কোন শক্তি নেই।"[১১]

ইস্কান্দার মির্জার বক্তব্যের মতই আইয়ুবের লেখাতেও তৎকালীন রাজনীতিবিদদের প্রতি অশ্রদ্ধা ঘৃণা ও অবহেলা প্রকাশ পেয়েছে। আইয়ুব সাংবিধানিক সরকারের পতন ঘটিয়ে এক বিশেষ ধরনের শাসন ব্যবস্থা চালু করে জনসাধারণকে 'গণতন্ত্রের শিক্ষা' দিতে চেয়েছেন। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা কর্তৃক আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করার মধ্য দিয়েই সে সুযোগ আসে। আইয়ুব খান প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত হয়েই 'বিবেকহীন' ও 'অদেশপ্রেমিক' রাজনীতিবিদদের শায়েস্তা করার জন্য ঘোষণা করলেনঃ

১. যেহেতু আমি জাতীয় প্রয়োজনের তাগিদে পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক সীমানার অভ্যন্তরে আমার ক্ষমতা প্রয়োগ করা অপরিহার্য বিবেচনা করছি, সেহেতু আমি পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক হিসাবে এতদ্বারা নিম্নোক্ত নোটিশ প্রদান করেছি।

২. সম্ভাব্য সুবিধাজনক পন্থায় সামরিক আইনের রেগুলেশন ও হুকুমনামা প্রকাশ করা হবে। উল্লিখিত রেগুলেশন ও হুকুম নামা লংঘন করলে যে কোনও ব্যক্তি সামরিক আইন অনুসারে এসব রেগুলেশনে বর্ণিত দন্ড ভোগের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

৩. সাধারণ আইন অনুসারে নির্ধারিত অপরাধের জন্য উল্লিখিত রেগুলেশনসমূহে বিশেষ দন্ডের বিধান প্রদান করা যেতে পারে।

৪. উল্লিখিত রেগুলেশন ও হুকুমনামা লংঘনের অপরাধ এবং সাধারণ আইন অনুসারে নির্ধারিত অপরাধের বিচার করার ও শাস্তি প্রদান করার জন্য উল্লিখিত রেগুলেশনের মাধ্যমে বিশেষ আদালত করা যেতে পারে।[১২]

---

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪-৭৫।

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮-৭৯।

১২. সামরিক আইন ঘোষণা (পাকিস্তান সরকারের বিজ্ঞপ্তি নং ৯৭৭/৫৮, তারিখ ৭ই অক্টোবর ১৯৫৮। গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যা, ১৫ই অক্টোবর, ১৯৫৮ সাল) ঘোষণাটি সন্নিবেশিত হয়েছে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৮২)ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিল পত্র, দ্বিতীয় খন্ড, ঢাকাঃ তথ্য মন্ত্রণালয়। পৃ. ১।

Dhaka University Institutional Repository

এ ঘোষণার তিন দিন পর অর্থাৎ ১০ অক্টোবর, ১৯৫৮-তে জারীকৃত Laws (Continuance in Force) Order, 1958' শিরোনামে সামরিক আইনের কয়েকটি বিশেষ দিক নিম্নরূপঃ

১. পুনরায় ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত সামরিক শাসনের আগে কার্যরত সকল আদালতই চালু থাকবে। সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী পাকিস্তানের সকল আদালত বিচারকর্ম সম্পন্ন করবে। সুপ্রিম কোর্ট এবং হাই কোর্টসমূহে রীট আবেদন করার সুযোগ থাকবে। কিন্তু প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বা উপ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক কিংবা সামরিক শাসনের আওতায় ক্ষমতা প্রয়োগ করছেন এমন যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক নির্দেশিত কোন কিছুর বিরুদ্ধে রীট আবেদন করা যাবেনা। এমনকি, কোন রিট আবেদন গ্রহণ করাও যাবেনা, যেখানে সামরিক শাসনের অধীনে কোন রেগুলেশন, হুকুম কিংবা নির্দেশের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।[১৩]

২. কোন আদালত কিংবা ব্যক্তি নিম্নোক্ত বিষয়ে কোন মতপ্রকাশ করতে পারবেনা কিংবা সে অধিকার দেওয়া হবে নাঃ

(ক) সামরিক আইন ঘোষণা ;

(খ) সামরিক আইন ঘোষণার পরিপুরক কোন হুকুম কিংবা সামরিক আইনের অধীনে যে কোন হুকুম কিংবা রেগুলেশন;

(গ) বিশেষ সামরিক আদালত বা সংক্ষিপ্ত (Summary) সামরিক আদালতের যে কোন রায়, হুকুম কিংবা যে কোন ধরনের বিবৃতি;[১৪]

এরপর প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল আইয়ুব খান একের পর এক সামরিক আইন রেগুলেশন ঘোষণা করতে থাকেন। সাধারণ আইন-শৃঙ্খলা ও বিচার বিভাগ এবং প্রশাসন বিষয়ক রেগুলেশনগুলি ঘোষণা করার পর সামরিক আইন রেগুলেশন নং ৪ ঘোষণা করা হয়। এ ঘোষণার মধ্য দিয়ে সকল ধরনের প্রচার মাধ্যমগুলির ওপর প্রি-সেন্সরশীপ আরোপ করা হয়। এ হুকুমের কোন রকম বরখেলাপ করা হলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হবে বলে ঘোষণা করা হয় এবং সে শাস্তি ৭ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড হতে পারে। M.L..R. No 4 এ বলা হয়ঃ

"Any matter tauching Martial Law which is intended to be announced, published and telegraphed through radio stations, Printing presses and telegraph offices in Pakistan respectively, by any person other than by any officer of Armed Forces authorised by me, will be subject to pre-censorship by the respective Martial Law Administrators. Omission to comly with this regulation is punishable. Maximum sentence 7 years R.I."[১৫]

সামরিক আইন রেগুলেশন নং ৬ এ বলা হয়, যদি কোন ব্যক্তি জ্ঞানতঃ কাউকে সামরিক সরকারের প্রতি অবাধ্য আচরণ করতে প্ররোচিত করে কিংবা কারো কোন অবাধ্য আচরণকে সমর্থন করে, এমনকি অবাধ্য কোন ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে বাধা দেয়, তাহলে তার ভাগ্যে মৃত্যুদন্ড লেখা আছে, অন্তত কোনভাবেই যে এর চেয়ে লঘু শাস্তি হবে না তা নিশ্চিত করে বলা যায়।[১৬]

১৩নং সামরিক আইন রেগুলেশনে ঘোষণা করা হয়, কোন ব্যক্তি যদি সেনাবাহিনীর কোন সদস্যকে আক্রমণকরে, তার কার্যক্রমে বাধা দেয় বা তাকে আহত করে কিংবা কেউ যদি এ ধরনের ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে এবং এ জন্য সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান হবে মৃত্যুদন্ড। সাধারণ কোন নাগরিক যে কোন স্তরের অফিস কর্মকর্তা/কর্মচারী কিংবা প্রধান সেনাপতির অধীনস্থ সামরিক বাহিনীর কোন সদস্য সবার জন্যই এ ঘোষণা সমানভাবে প্রযোজ্য হবে।[১৭]

১৬ নং সামরিক আইন রেগুলেশনে ঘোষণা করা হয়ঃ কোন ব্যক্তিই নিম্নোক্ত হুকুমসমূহ অমান্য করতে পারবে না;

(ক) সামরিক আইনের অধীনস্থ হুকুমসমূহের প্রতি অমান্য বা অবজ্ঞা করা চলবে না;

(খ) সামরিক শাসনের অধীনে যে কোন ধরনের দায়িত্ব পালনরত কোন ব্যক্তির কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করা, বাঁধা প্রদান করা কিংবা হস্তক্ষেপ করা চলবে না;

(গ) কোন পাস বা পারমিট গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন রকম মিথ্যা তথ্য প্রদান করা চলবে না।

উপরোক্ত ধরনের অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি হবে ১৪ বছর সশ্রম কারাদন্ড।[১৮]

২৪নং সামরিক আইন রেগুলেশনে ঘোষণা করা হয়, কোন ব্যক্তি মুখের কথায়, লেখনীর সাহায্যে কিংবা এমনকি আভাসে ইঙ্গিতেও এমন কিছু বলবে না যাতে জনসাধারণের মধ্যে নৈরাশ্যের জন্ম হতে পারে কিংবা সেনাবাহিনী বা পুলিসবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে তাতে অসন্তোষ দেখা দিতে পারে। এ ধরনের অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি হবে ১৪ বছরের সশ্রম কারাদন্ড।[১৯]

---

১৩. Laws (continuance in Force) order, 1958; Presidents orders (Post-Proclamation) No. 1 of 1958. 10th October 1958, Gazette, Extraordinary, 10th October, 1958. Reprinted in Patwari, A.B.M. Mafizul Istam, op.cit. Appendix-iii, pp. 193-94, Clause no. 2. subclouse 1,2,3,4,5,6 and 7.

১৪. ibid, p. 194, Clause No. 3.

১৫. M.L.R No. 4, Reprinted in Patwari, A.B.M. Mafizul Islam, op.cit., Appendix-4,p.199.

১৬. M.L.R. No. ৬ এর অন্তর্ভূক্ত বাক্যগুলি নিম্নরূপঃ
"If with intent to help the recal citrants any person does any act which in designed or is likely to give assistance to the operations of the recalcitrants, or to impede operations of Pakistan Forces, or to endanger life. he shall suffer death and no less punishments". M.L.R. No. 6, Ibid, p.200.

১৭. M.L.R. No. 13 এর অন্তর্ভূক্ত বাক্যগুলি নিম্নরূপঃ
"Any person who attacks, resists or injures, or couses to be attacked resisted, or injured any member of the forces, whether civil or military under my command or any civil official, shall be punishable. Maximum punishment death." M.L.R. No. 13, Ibid, p.200.

১৮. M. L. R. No. 16, Ibid, p.200.

১৯. "No one by word of mouth, or in writing or by signals, or otherwise will spread reports, calculated to create alarm or dispondency amongst the public, or calculated to create dissatisfaction towards the Armed Forces and Police, or any member thereof. maximum punishment 14 Years R.I.". M.L.R. No. 24. Ibid, p. 201.

Dhaka University Institutional Repository

এর পর ১৯ নং সামরিক আইন রেগুলেশন ঘোষণার মাধ্যমে সারা পাকিস্তানের বিশেষ সামরিক আদালত ও সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালতের অধিকারসমূহ সম্পর্কিত একটি বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় এবং কি ধরনের শাস্তি এ আদালতগুলি দিতে পারবে তারও একটি বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়।[২০]

সে শাস্তিগুলির মূল মূল কয়েকটি হচ্ছেঃ

১. মৃত্যুদন্ডঃ

২. যাবজ্জীবন নির্বাসন বা কমপক্ষে ৭ বছর সশ্রম কারাদন্ড;

৩. সশ্রম কারাদন্ড ১৪ বছরের অধিককালের জন্য হবে না;

৪. বেত্রাঘাত দন্ড দিলে তার সর্বোচ্চ সংখ্যা হবে ৩৪টি (মহিলা কিংবা ৪৫ বছরের বেশী বয়সের কাউকে এ দন্ড প্রদান করা যাবে না।)

৫. জরিমানার ক্ষেত্রে যদি সর্বোচ্চ জরিমানার পরিমাণকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া না হয় তাহলে তার পরিমাণ সীমাহীন বলে বিবেচিত হবে।

৬. সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত সংক্রান্ত দন্ডের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে কিংবা আংশিকভাবে দন্ডিত ব্যক্তির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অধিকার থাকবে, আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে সম্পদের ক্ষতিসাধনের দন্ড প্রদানের অধিকারও তার থাকবে (তবে যদি কোন্ ব্যক্তি তার বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তি বা ধ্বংসাপ্রাপ্ত কোন সম্পত্তিকে রক্ষা করতে চায় তাহলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে কোন্ স্বার্থত্যাগের বিনিময়ে তা সে রক্ষা করতে প্রস্তুত তা জানিয়ে আবেদন করতে হবে।[২১]

উপরোক্ত বিবরণ থেকে দেখা যায়, ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর সামরিক শাসনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের ন্যূনতম মৌলিক অধিকারকেও হরণ করে নেওয়া হয়। বিভিন্ন ঘোষণা ও হুকুম প্রদানের মাধ্যমে এমন অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছিল যে, মানুষের স্বাধীনভাবে চলার মতও কোন সুযোগ রাখা হয় নি। এমনকি, পুলিস ও মিলিটারীর হাতে এমন ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল যে প্রতিবাদ সভা বা ধর্মঘট তো দূরের কথা, একজন সাধারণ মানুষ পথে ঘাটেও মুক্তভাবে চলা ফেরা করার স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে। দেশের জন সাধারন যেনো এক অভিভাবকহীন অনাথ লোকালয়ের বাসিন্দায় পরিণত হয়ে ছিল। এ সময় সব ধরনের মত প্রকাশের অধিকারকে কেড়ে নেওয়া হয়; সামরিক শাসনের ব্যাপারে যে কোন ধরনের সমালোচনাকে কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করা হয়, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা পরিপূর্ণভাবে হরণ করা হয়, সামরিক কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে গঠিত বিভিন্ন ধরনের সামরিক আদালতের হস্তে শাস্তি প্রদানের চূড়ান্ত অধিকার অর্পন করা হয়। আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত দন্ডাদেশ প্রদানের ক্ষমতা এ সকল কোর্টের ওপর অর্পণ করা হয়। এ সকল দন্ডাদেশ প্রদানের বিরুদ্ধে আপিল করারও কোন সুযোগ রাখা হয়নি। নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের হাতে এমন ক্ষমতা প্রদান করা হয় যে কেউ ইঙ্গিতেও যদি সামরিক শাসনকে কিংবা সামরিক বাহিনীকে সমালোচনা বা বিদ্রুপ করছে বলে তারা মনে করে তাহলেও শুধুমাত্র তার স্বাক্ষের ওপর ভিত্তি করে ন্যূনতম শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে ৭ বছর সশ্রম কারাদন্ড। ফলে সমগ্র পাকিস্তানের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত সামরিক বাহিনীর সদস্যগণ এমন ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠার বাস্তব ভিত্তি তৈরি হয়েছিল যে, যে কোন ব্যক্তিকে যখন তখন তারা অপমান করতে পারতো, শার্টের আস্তিন গুটিয়ে চললে, পথের বাম দিক দিয়ে হাটলে, ময়লা কাপড় গায়ে থাকলে রাস্তা অপরিষ্কার থাকলে কিংবা অভিভাবকহীন কুকুর পথে চলা ফেরা করলে, এমনকি মিলিটারীদের প্রতি সোজাভাবে তাকালে পর্যন্ত এলাকার জনসাধারণের জন্য শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হত। ডঃ আলিম আল রাজী তাইবলেছেনঃ

" ....Iskandar Merza's Proclamation and Ayub's MLRs and orders- touching even sweeping the roads, walking by the right-hand side of the streets, killing of pyedogs - would become a comprehensive mannual of Military rule in Pakistan"[২২]

এ ধরনের কঠিন সামরিক শাসন পাকিস্তানের জনসাধারণের ওপর চাপিয়ে দিয়েও জেনারেল আইয়ুবের সামরিক সরকার নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। প্রতি মুহূর্তে খোজ খবর নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে দেশের কোথায় কি ঘটছে। দুটি প্রদেশের বিভিন্ন জেলা ও অঞ্চলে নিজস্ব সামরিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে খবর সংগ্রহ করে যখন দেখা গেলো এত কঠিন শাসন চাপিয়েও পরিস্থিতিকে পরিপূর্ণভাবে সামরিক সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না, তখন বিকল্প পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এর পটভূমি হিসাবে যে সকল রিপোর্টের বিশেষ অবদান ছিল সে রকম একটি গোপন রিপোর্ট থেকে দেখা যায় পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শাসনের তেমন কোন ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পড়েনি। সামরিক শাসনের পর কেন্দ্রীয় সরকারের নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সামরিক শাসনের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হয়েছিল। ২১ মে, ১৯৬০ তারিখে পাঠানো এ ধরনের একটি অনুসন্ধানমূলক রিপোর্ট থেকে দেখা যায় পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শাসনের নিম্নোক্ত ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছিলঃ

১. পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক প্রশাসনের ওপর সামরিক শাসনের প্রতিক্রিয়া মোটেই ইতিবাচক হয়নি। বিশেষতঃ বেসামরিক প্রশাসনের ক্ষমতা ও অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপকে তারা মোটেই ভালভাবে গ্রহণ করেনি। তারা খুব দ্রুতই এর অবসান চায়।

২. জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে তেমন কোন উন্নতির ছাপ দেখা যাচ্ছেনা। প্রশাসন ও জনসাধারণের মধ্যেকার যোগাযোগ ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়েছে। এর মূল কারণ হচ্ছে এই যে, সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি যে কোন সমস্যাকে দ্রুত সমাধানের ক্ষেত্রে তেমন কিছুই করতে পারেনি।

৩. এখানে কর্মরত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের ধারণা রাজনৈতিক দলসমূহের সহযোগিতা ছাড়া পূর্বপাকিস্তানের মত একটি প্রদেশে জনসমর্থন লাভ করা কঠিন। পশ্চিম পাকিস্তানে যেখানে বেসামরিক প্রশাসনের দায়িত্ব সামরিক বাহিনী সরাসরি গ্রহণ করে অত্যন্ত সফলভাবে উদ্ভূত পরিস্থিতির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে সেখানে, পূর্বপাকিস্তানে বেসামরিক প্রশাসন অনেক বেশি পরিমানে স্বাধীনতা পেয়েও রাজনীতিবিদদের চেয়েও নেতিবাচকভাবে সামরিক শাসন সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করছে। জনসাধারণের মধ্যেও যে সামরিক

---

২০. Razee, Aleem-Al (1988): Constitutional Glimpses of Martial Law- in India, Pakistan and Bangladesh. Dhaka: University Press Limited. p. 31.

২১. Patwari, A.B.M. Mofizul Islam (1988): op.cit., p. 90.

২২. Razee, Aleem -Al (1988): op.cit., p. 32.

Dhaka University Institutional Repository

সরকার সম্পর্কে ভাল প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় নি তা ৭ অক্টোবর সেনাবাহিনী দিবস পালনের দিনই বোঝা গেছে। এ অনুষ্ঠানের প্রতি জনসাধারণের কোন রকম স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল না, কার্যত অন্তর্ঘাতমূলক শক্তি বৈদেশিক গণমাধ্যমের অপপ্রচারে প্রভাবিত হয়ে সামরিক সরকারের প্রতি পরিপূর্ণ অনাস্থা প্রকাশ করেছে। রিপোর্টের ভাষায়–

" ....If on that day sufficient enthusiasm is not spontaneously expressed by the people, it is bound to be interpreted as a silent vote of no confidence on the regime which will be fully exploited by subversive elements and by hostile forign press."[২৩]

৪. পূর্ব পাকিস্তানে বর্তমানে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তাতে মনে হয়, অন্তর্ঘাতক শক্তি অবশ্যই তাদের কার্যক্রম চালু রেখেছে। যদিও রাজনৈতিক দলসমূহ নিষিদ্ধ ঘোষিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের কার্যক্রম বন্ধ হয়নি। রাজনৈতিক নেতারা ঘরোয়া সভাগুলিতে কথাবার্তা বলছেন এবং রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলাপ–আলোচনা করছেন। অন্তর্ঘাতক শক্তি তাদের অসন্তোষ সৃষ্টিকারী মতামত প্রকাশ ও প্রচারণার মাধ্যমে তাদের কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। ইতিমধ্যে মার্শাল লিখিত বৈদেশিক নীতি বিষয়ক একটি প্রবন্ধ মানুষের হাতে হাতে ঘুরছে, সন্দেহ নেই বর্তমান সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে মতামত গঠন করাই এ প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য।[২৪]

উপরোক্ত তথ্য থেকে খুব স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এত কঠিন ধরনের সামরিক কালা–কানুন জারি করেও পূর্ব পাকিস্তানের ওপরে জেনারেল আইয়ুবের সামরিক সরকার কোন রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। বরং আত্মগোপনকারী রাজনৈতিক নেতৃত্ব তখনও সামরিক সরকারের প্রধানতম মাথা ব্যথার কারণ হয়ে বিদ্যমান রয়েছে। দ্বিতীয়ত, পূর্ব পাকিস্তানের ওপরে সহজে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা যাবে বলে যে সামরিক সরকারের ধারণা ছিল, যে কারণে সেখানে বেসামরিক প্রশাসনের ওপর অধিক ক্ষমতা প্রদান করে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা ছিল, সে আকাঙ্খা পূর্ণ হয়নি। বরং বেসামরিক প্রশাসনের পক্ষ থেকেই সামরিক সরকারের বিরোধিতা এসেছে। তৃতীয়তঃ শুধুমাত্র রাজনৈতিক নেতৃত্বের পক্ষ থেকেই নয়; জনসাধারণ সামরিক শাসনের প্রতি নীরবে অনাস্থা জ্ঞাপন করেছে। এ সকল কারণে সামরিক সরকারকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও অসহযোগী বেসামরিক প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের শায়েস্তা করার জন্য আরো স্থূল ধরনের হুকুমনামা জারি করতে হয়। এ ধরনের একটি হুকুমনামা ছিল ১৯৫৯ সালের ৬ আগষ্ট ঘোষিত THE ELECTIVE BODIES (DISQUALIFLCATION) ORDER, 1959 (এবডো)। এ হুকুমনামার ৪নং ধারাতে বলা হয়, এবডোর অধীনস্থ বিচার সভার দায়িত্ব হবে সেই সমস্ত বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী ব্যক্তিদের শাস্তিপ্রদান করা, যারা সরকারী কোন পদে অবস্থান করেছেন কিংবা যে কোন ধরনের নির্বাচিত সংস্থার সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রে যারা ১৪ অক্টোবর, ১৯৫৫ সালের পর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির দায়ে অভিযুক্ত হবেন তারাই শুধুমাত্র এদন্ডের আওতায় পড়বেন।[২৫] এ হুকুম নামার ৫ নং ধারায় বলা হয়, যে কোন নির্বাচনী কাঠামোর নির্বাচিত সদস্যগণ বা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারীগণের মধ্যে তারা ১৯৬৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত যে কোন ধরনের নির্বাচনী কাঠামোতে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করার অধিকার হারাবেন, যারা নিম্নলিখিত অভিযোগে অভিযুক্ত বলে প্রমাণিত হবেনঃ

(ক) যদি কেউ সরকারী কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্পোরেশনের দায়িত্ব থেকে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে কিংবা অযোগ্য প্রতিপন্ন হয়ে চাকুরীচ্যুত হন বা বাধ্যতামূলকভাবে অবসর গ্রহণ করানো হয়; বা

(খ) যদি কেউ পাকিস্তান নিরাপত্তা আইন, ১৯৫২ বা এ ধরনের কোন আইনের আওতায় পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নীতি বা নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক বলে অভিযুক্ত হন কিংবা তার বিরুদ্ধে যদি সরকার সরবরাহ বিভাগ বা সরকারের অত্যাবশ্যকীয় কোন সেবা কার্যক্রমে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অসদুপায় গ্রহণের অভিযোগ থাকে; বা

(গ) যদি কেউ ১৯৪৯ সালের সরকারী ও প্রতিনিধিত্বশীল দপ্তর (অযোগ্য) আইনের অধীনে ফেডারেল কোর্ট, হাইকোর্ট বা অন্য কোন আদালতে দোষী সাব্যস্ত হন; বা

(ঘ) যদি কেউ যে কোন অভিযোগে দুই বছরের জন্য কারা দন্ডে দন্ডিত হন বা যে কোন সময়ের জন্য নির্বাসন দন্ডে দন্ডিত হন।[২৬]
৬নং ধারার ২ নং উপধারার খ অনুচ্ছেদে বলা হয়, আদালত বিভিন্ন কমিটি ও সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছে এই

---

২৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৮২)ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র (হাসান হাফিজুর রহমান কর্তৃক সম্পাদিত) ঢাকাঃ তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২য় খন্ড, পৃ. ১৩।

২৪. উক্ত রিপোর্টে লিখিত বাক্যগুলি ছিল নিম্নরূপঃ
"In creating the present mood and temper in East Pakistan, hostile forces are certainly at work. The political parties have been banned but their working has not stopped inpractice. Polictical leaders talk in private meetings and discuss political problems. The subversive forces are spreading hostile views and propaganda in their usual way. Incidentally, the article that was written by morshall in the ~Foriegn Affairs" was, it is said, circulated from hand to hand to foster opimion against the new regime." বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

২৫. প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৬–১৭।

২৬. ৫ নং ধারাটি নিচেই উদ্ধৃত করা হল
"Disqualification of certain persons-(1) Notwith standing anything contained in this order, or in any other law, a person shall stand disqualified until the thirtyfirst day of December 1966, for being a member or a candidate for the membership of any elective body,-
(a) If he is dismissed, removed or made to retire from the service of Government or of a public Statutory corporation, on a charge other than that of inefficiency; or
(b) if an order under section 3 of the Security of Pakistan Act, 1952 (XXXV of 1952), or a similar order under any other law relating to the prevention of acts prejudicial to the defence, or the external affairs, or the security of Pakistan or any part thereof, or to the maintenance of supplies and services essential to the community or the maintenance of public order, has ever been made against him; or
(c) if he was found guilty by the Federal Court, a High Court or a Tribunal under the Public and Representative.
(d) if he has been convicted of any offence and sentenced to a term of imprisonment for more than two years or to transportation for any term". বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

মর্মে নোটিশ প্রদান করবেন যে, তার নামে উল্লিখিত বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ রয়েছে; কেন তাকে যে কোন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য অযোগ্য ঘোষণা করা হবে না।[২৭]

এ হুকুমনামায় ৭নং ধারাতে বলা হয়েছে, যদি কেউ তার কাছে পাঠানো নোটিশের জবাব না দিয়ে স্বেচ্ছায় ১৯৬৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত নাগরিক জীবন যাপন থেকে অব্যাহতি নিতে চান তাহলে তিনি তা নির্বিঘ্নে নিতে পারেন।[২৮]

৮নং ধারার ১নং উপধারাতে বলা হয় যদি কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগকে অস্বীকার করেন তাহলে আদালত বিভিন্ন তথ্য ও প্রমাণের মাধ্যমে উক্ত অভিযোগকে প্রমাণ করবেন। এক্ষেত্রে আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তির কার্যকলাপের কারণে দেশ যে পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তার সমপরিমানে বা যে কোন পরিমাণে অর্থ জরিমানা করতে পারবেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি যে তার জরিমানার টাকা প্রদান করলেই কোনরকম মাপ পেয়ে যাবেন তা নয়, তার কৃতকর্মের জন্য তাকে শাস্তি পেতেই হবে। তিনি যদি ইতিপূর্বেকার কোন নির্বাচনী কাঠামোর সদস্য হয়ে থাকেন কিংবা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে থাকেন তাহলে তাকে অবশ্যই ১৯৬৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত যে কোন ধরনের নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে।[২৯]

১০নং ধারায় বলা হয়ঃ (১) এবডোর অধীনে গঠিত আদালত যে কোন ব্যক্তির কাছে প্রয়োজনীয় যে কোন তথ্য জানতে চাইতে পারেন কিংবা যে কোন ব্যাপারে জবাবদিহি করতে পারেন। (২) যে কোন মামলার জন্য প্রয়োজনীয় বই-পুস্তক বা হিসাব- নিকাশ সংক্রান্ত যে কোন ধরনের দলিল কিংবা বিভিন্ন অভিযোগ সংক্রান্ত যে কোন ধরনের কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করার জন্য আদালত যে কোন গেজেটেড পুলিস কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিতে পারবেন। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী পুলিস কর্মকর্তা যে কোন স্থান থেকে যে কোন ধরনের বই-পুস্তক বা দলিল-দস্তাবেজ বাজেয়াপ্ত করতে পারবে। (৩) এবডোর অধীনে গঠিত আদালত যে কোন অবাধ্য ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদানের জন্য হাই কোর্টকে নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন।

(৪) এ আদালত সরকারের যে কোন আদালত বা দপ্তরের কাছে যে কোন ধরনের দলিল বা রেকর্ড উক্ত আদালতের নিকট সোপর্দ করার নির্দেশ দিতে পারে।[৩০]

এবডোর ১১ নং ধারাতে বলা হয় যে, এ আদালত কোন সাক্ষীর সাক্ষ্যকে বাতিল করতে পারবে কিংবা আদালতের ধারাবিবরণী থেকে যে কোন সাক্ষ্যকে বাদ দিতে পারবে। এ ধারাতে আরো বলা হয়, যদি কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি তার প্রতি দন্ডাদেশকে মেনে না নিয়ে আপিল করতে চান তা তিনি পারবেন, কিন্তু তিনি তার পক্ষে কথা বলার জন্য তার কোন বন্ধু বা পেশাদার আইনজীবী নিয়োগ করতে পারবেন না, তার যা বলার তা আদালতের সামনে দাঁড়িয়ে তার নিজেকেই বলতে হবে।[৩১]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এবডোর যে পরিচয় পাওয়া গেল তা থেকে দেখা যায়, বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ১৯৪৭ সনের পর থেকে কোন ব্যক্তি যে কোন নির্বাচনে যদি কোন দিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তাহলে তিনি জয়লাভ করুণ অথবা না করুণ তিনি এ আইনের আওতায় পড়েছেন। নির্বাচনে যিনি দাঁড়িয়েছেন শুধু তিনিই নন, উক্ত কালপর্বে যিনি যে কোন সরকারী বা আধাসরকারী কোন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকুন না কেন তিনিই এ আইনের আওতায় পড়েছেন। দেশের যে সকল ব্যক্তি নিচের কিংবা ওপরের যে কোন স্তরের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন তাঁদের নিশ্চয়ই এমন কিছু যোগ্যতা থাকে যাতে তিনি জনসাধারণের সমর্থন পাবেন বলে আশা করছেন। প্রাক্তন চাকুরীজীবী কোন ব্যক্তিও তুলনামূলকভাবে সমাজের অগ্রসর ব্যক্তি। অর্থাৎ সমাজের অগ্রসর অংশ বলতে যাদেরকে বোঝায় তাদের সবাই এ আইনের আওতায় পড়েছিলেন। শুধু তাই নয়, যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যদি এমন কোন অভিযোগ দাঁড় করানো যায় যে, তিনি দেশের নিরাপত্তার জন্য হুমকি স্বরূপ তাহলেই এ আইনের আওতায় ফেলে তাকে ১৯৬৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত নাগরিক অধিকার হরণ করে নেওয়া যাবে। যদি কেউ কোন দিন যে কোন ধরনের অভিযোগে অভিযুক্ত হন এবং ২ বছরের জন্য কারাদন্ড ভোগ করেন তাহলেই তিনি যে কোন ধরনের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার হারাবেন। এবডোর অধীনে গঠিত আদালতের হাতে এমন ধরনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল যে, যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে তার নাগরিক অধিকার হরণ করতে পারবে। যদি কেউ শাস্তি স্বেচ্ছায় মাথা পেতে নেয় তাহলে তার জন্য বাড়তি কোন ঝুঁকি ঝামেলা পোহাতে হবে না, কিন্তু যদি কেউ এ অভিযোগকে গ্রহণযোগ্য মনে না করেন তাহলে তাকে বিভিন্ন ধরনের ঝামেলা ও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। অভিযুক্ত ব্যক্তি যে তার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আইনজীবী নিয়োগ করবেন তারও কোন অধিকার থাকে না। যদি কোন কারণে মামলায় তার পরাজয় হয় তাহলে তাকে বড় অংকের জরিমানা দিতে হবে। মামলায় জেতার সম্ভাবনাও থাকে খুবই ক্ষীণ, কেননা আদালত ইচ্ছা করলেই যে কোন সাক্ষ প্রমাণকে অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা করতে পারেন। এবডোর অধীনে গঠিত আদালতকে আরো এমন ক্ষমতা প্রদান করা হয় যে, আদালত যে কোন পুলিস কর্তকর্তাকে এমন অধিকার প্রদান করতে পারবেন যে, যে কোন বাড়ি বা দপ্তরে তিনি থানা তল্লাশী চালাতে পারবেন এবং যে কোন ধরনের বই পুস্তক, দলিলপত্র কিংবা যে কোন ধরনের লিখিত বা অলিখিত রেকর্ড পত্র বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন। আর এ জন্য যেহেতু কোন লিখিত নির্দেশের প্রয়োজন ছিলনা সেহেতু যে কোন পুলিস অফিসার কোন নাগরিকের বাড়ি যখন তখন তল্লাশী করতে পারতেন যা ন্যূনতম নাগরিক অধিকারের চরমতম লংঘন। উপরন্তু, যেহেতু এবডো আদালত ছিল স্বাধীন অর্থাৎ তার ওপর হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্ট কোন রকম নির্দেশ জারি করতে পারতো না, বরং এবডো আদালতই হাইকোর্টের ওপর নির্দেশ জারি করতে পারতো সেহেতু তার আদেশ অনুযায়ী যদি কোন পুলিশ কর্মকর্তা যে কোন নাগরিকের বাড়িতে থানা তল্লাশী করেন বা বই পুস্তকসহ যে কোন কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করেন তা হলে উক্ত নাগরিকের পক্ষে কারো কাছে অভিযোগ উত্থাপনের কোন যায়গা থাকেনা। কিন্তু ১৯৫২ সালের নিরাপত্তা আইন অনুযায়ী সন্দেহ ভাজন যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হলেও তার বিরুদ্ধে কোন আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের কোন সুযোগ ছিল না। অর্থাৎ এবডো ঘোষণার পর সমগ্র দেশের সাধারণ মানুষ হয়ে পড়ে পরিপূর্ণভাবে নিরাপত্তাহীন। সরকারের বিরোধিতা করা তো দূরে

---

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

থাকুক, ঘরোয়া পরিবেশেও রাজনীতি সংক্রান্ত কোন বিষয়ে আলাপ আলোচনা করা এবডোর কারণে আইনগতভাবে মারাত্মক রকমের আপত্তিকর বলে গণ্য হয়।

৭.২ ১৯৬২ সালের সংবিধান

সামরিক আইনের হুকুমনামা ও ঘোষণাসমূহের কয়েকটির ওপর আলোকপাত করার মধ্য দিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের আধিপত্যমূলক ভূমিকার যে চিত্র পাওয়া যায়, সামরিক শাসন প্রত্যাহার করে নেওয়ার পরও সে ভূমিকার কোন ব্যত্যয় ঘটেনি। বরং শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করার নামে জেনারেল আইয়ুব এমন একটি সংবিধানকে জাতির সামনে উপস্থাপন করলেন যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা ব্যক্তিগতভাবে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের হাতে গিয়ে কেন্দ্রীভূত হল। সংবিধানে প্রায় কোন সুযোগই রাখা হল না যাতে করে সাংবিধানিক উপায়ে প্রেসিডেন্টকে অপসারণ করা যায়। গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ১৯৫৪ সালে যখন ভাবী প্রেসিডেন্টের ক্ষমতাকে নির্বিঘ্ন করতে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেনারেল আইয়ুবকে তিন মাসের মধ্যে একটি সংবিধান রচনা করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন, সেই সময়ে প্রস্তুত সংবিধানের খসড়াই হয়েছিল জেনারেল আইয়ুবের নতুন সংবিধানের মূল ভিত্তি। সে সূত্র থেকেই ১৯৬২-এর সংবিধানের মূল ধারাগুলি প্রণীত হয়েছিল। জেনারেল আইয়ুব সে সংবিধানের খসড়াতে যে দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন তা থেকে দেখা যায়, তিনি জনসাধারণের জ্ঞান বুদ্ধির ওপর মোটেই আস্থা রাখতে পারেননি। তিনি এমন একটি নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের ছবি এঁকেছেন যেখানে রাষ্ট্রের শীর্ষ ব্যক্তিটি থাকবেন প্রশ্নের উর্দ্ধে, তার ওপরই থাকবে সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করার মূল দায়িত্ব, সংসদ সদস্যরা একটি মন্ত্রী পরিষদ গঠন করবেন, এ মন্ত্রীপরিষদকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করবেন একজন গভর্ণর এবং গভর্ণরকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন প্রেসিডেন্ট। গভর্ণর যিনি থাকবেন তিনি একদিকে যেমন সকল সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর স্বার্থরক্ষা করবেন তেমনই তিনি মন্ত্রীপরিষদকে প্রয়োজন মনে করলে ভেঙ্গে দিতে পারবেন। 'অশিক্ষিত ও পশ্চাদপদ জনসাধারণ' যে কোন সময় সুযোগ-সন্ধানী রাজনীতিবিদদের খপ্পরে বিশেষত 'কমিউনিস্টদের খপ্পরে' পড়ে যেতে পারে, আর সে কারণেই তাদেরকে পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার প্রদান করা দেশ ও জনসাধারণের স্বার্থের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। জেনারেল আইয়ুবের ভাষায়,

" We, therefore, have to have a controlled form of democracy, with checks and counter checks. This indicates that ligislature finds the cabinet, whose actions are controllable by a Governor, who inturn is controlled by the head of the state (President); in certain circumstances, the Governor having the power to remove Ministers or Ministry. He should also be in a position to protect the rights of the services and have them carry out their obligations."[৩২]

আইয়ুব এ মেমোরেন্ডামে অভিমত প্রকাশ করেছেনঃ গণতন্ত্রে শেষ কথা বলে কিছু নেই; এমনও কোন কথা নেই যে, কোন রকম সংশোধন বা সংযোজনছাড়া তা সব দেশে একইভাবে ব্যবহৃত হবে। পাকিস্তানের মত পশ্চাদপদ জনগণের একটি দেশে তাই ছোট ছোট অঞ্চলের জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচনের দায়িত্বই শুধু জনসাধারণের ওপর দেওয়া যেতে পারে। এ জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত নির্বাচকমন্ডলী, যা হবে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট নির্বাচিত করবে। আর এটাই হবে এ দেশে সবচেয়ে সহজে নিয়ন্ত্রণযোগ্য দায়িত্বশীল সরকার গঠনের উত্তম পথ।[৩৩]

আইয়ুব রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে রাজনীতিবিদদের হস্তক্ষেপকে দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাঁধা হিসাবে বিবেচনা করেছেন। তাই মেমোরেন্ডামে তিনি এমন কতকগুলি পদ সৃষ্টির ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, যেসব শীর্ষস্থানীয় সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের দিয়ে পূরণ করা হবে, যাতে কোনভাবেই রাজনীতিবিদগণ প্রতিরক্ষা ও প্রশাসনিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে না পারে। আইয়ুব লিখেছেনঃ

".........To do that, a system of joint staff headed by a supreme commander will have to be introduced. The supreme commander should be appointed by the President. In addition to other duties, he should be made the Defence Member and an ex-officio member of the cabinet. This will not only knit the service together, but would put a stop to any attempt by politicians to interfere in the internal affairs of the services to promote their personal interests."[৩৪]

জেনারেল আইয়ুব অবশ্য ক্ষমতাসীন হওয়ার পর প্রেসিডেন্টের নীচে সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের নিয়ে এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কোন পদ সৃষ্টিতে আগ্রহী হননি, প্রেসিডেন্ট পদাধিকারীকেই সকল নিয়ন্ত্রণের ভার তুলে দিতে বিশেষভাবে উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। তিনি এমনভাবে প্রেসিডেন্ট নামক কাঠামোটি তৈরি করেছেন একমাত্র পদত্যাগ কিংবা মৃত্যু ছাড়া উক্ত পদাধিকারীকে অপসারণ করার কোন পথই প্রায় রাখেননি।[৩৫] ১৯৬২ সালের সংবিধানের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বিভিন্ন ধারা এবং উপধারাকে সংযোজিত করে আইয়ুব প্রেসিডেন্ট পদটিকে এমনভাবে পাকাপোক্ত করেছেন যাতে এ পদটি কোন রকম হুমকির সম্মুখীননা হয়।

বাষট্টির সংবিধানে কিভাবে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতাকে সবকিছুর ওপরে স্থান দিয়ে একক কর্তৃত্বের অধিকারী করে তোলা হয়েছে তা উক্ত সংবিধানের বিভিন্ন ধারা ও উপধারাকে বিশ্লেষণ করলেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এ সংবিধানে রাষ্ট্র কিংবা সরকারের যে কোন পদাধিকারীকে পদচ্যুত করার ক্ষমতা থাকলেও প্রেসিডেন্টকে অপসারণ করার প্রায় কোন সুযোগই রাখা হয়নি। সংবিধানের ২৩ নং ধারাতে বলা হয়েছেঃ

উপধারা ১ঃ প্রেসিডেন্ট যে কোন সময় জাতীয় সংসদকে বাতিল করতে পারবেন।

---

৩২. Khan, General Mohammad Ayub (1954): A Short Appreciation of Present and Future Problems of Pakistan (Memorendam), cited in Vorys, Korl Von (1965): Political Development in Pakistan. Princeton: Princeton University Press. p. 302.

৩৩. Ibid, p. 302.

৩৪. Ibid, p. 305.

৩৫. Government of Pakistan (1962): The Constitution of the Republic of Pakistan, Karachi: Government of Pakistan Press. p. 17.

Dhaka University Institutional Repository

উপধারা ২ঃ প্রেসিডেন্ট উক্ত ক্ষমতা সংসদ নির্বাচনের পর ১২০ দিন অতিবাহিত হওয়ার আগে প্রয়োগ করতে পারবেন না।

উপধারা ৩ (ক)ঃ প্রেসিডেন্টের শারীরিক অযোগ্যতা কিংবা সমর্থন হীনতার কারণে যদি তাকে অপসারণের জন্য সংসদে কোন বিল আনা হয়, তাহলে এ পর্যায়ে তিনি সংসদকে বাতিল করতে পারবেন না।

উপধারাঃ ৩ (খ)ঃ উক্ত বিল যে দিন সংসদে আলোচিত হবে তার থেকে ৩০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট সংসদ বাতিল করতে পারবেন না।[৩৬]

উক্ত উপধারাগুলিতে জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেওয়ার অধিকারের কথা যেমন বলা হয়েছে তেমনই কখন কখন তিনি সংসদ ভেঙ্গে দিতে পারবেন না, সে কথাও বলা হয়েছে। এ দিকে লক্ষ্য করলে সংবিধানের একটি গণতান্ত্রিক দিকই ফুটে ওঠে কিন্তু তা যে ছিল নিতান্তই প্রহসন সেটা সংবিধানের ১৩ নং ধারাটি উপস্থাপন করলেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

উপধারা ১ঃ প্রেসিডেন্ট যদি উদ্দেশ্যমূলকভাবে সংবিধান লংঘন করেন, অথবা তিনি মারাত্মক কোন অপরাধ করে বসেন তাহলে সংসদের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য তাদের প্রত্যেকের সাক্ষরসহ এ সকল অভিযোগ সম্বলিত একটি লিখিত নোটিশ সংসদের স্পীকারের কাছে প্রদান করবেন।

উপধারা ৩ঃ স্পীকার এ নোটিসের একটি কপি প্রেসিডেন্টকে প্রদান করবেন।

উপধারা ৪ঃ নোটিস প্রদানের ১৪ দিন থেকে ৩০ দিনের মধ্যে অভিযোগটি সংসদে উত্থাপিত হতে হবে। যদি এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগটি সংসদে উত্থাপিত না হয় কিংবা উত্থাপিত হলেও যদি তা পাস না হয় তাহলেও স্পীকার সংসদে সমন জারি করতে পারবেন।

উপধারা ৫ঃ অভিযোগটি সংসদে উত্থাপিত হওয়ার পর ব্যক্তিগতভাবে প্রেসিডেন্ট সংসদের সামনে হাজির হয়ে তার আত্মপক্ষ সমর্থন করে বিবৃতি প্রদান করতে পারবেন।

উপধারা ৬ঃ অভিযোগটি সংসদে উত্থাপিত হওয়ার পর যদি মোট সদস্যের তিন-চতুর্থাংশসংখ্যক সদস্য প্রেসিডেন্টকে অপসারণের সপক্ষে ভোট প্রদান করে তাহলে অভিযোগটি সিদ্ধান্ত আকারে গৃহীত হবে এবং প্রেসিডেন্ট অন্যূন ১০ বছরের জন্য এ পদে আসীন হওয়ার যোগ্যতা হারাবেন।

উপধারা ৭ঃ সংসদে বিষয়টি নিয়ে ভোটাভুটির সময় যদি দেখা যায় অভিযোগের সপক্ষে মোট সংসদ সদস্যের শতকরা ৫০ ভাগ সদস্যের কমসংখ্যক তা সমর্থন করেছে তাহলে নোটিশ প্রদানকারী সদস্যরা তাদের সদস্যপদ হারাবেন।[৩৭]

উপরোক্ত উপধারাগুলিকে ২৩ নং ধারায় নির্দেশিত উপধারাগুলির সাথে মিলিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যাবে সংসদ সদস্যদের পক্ষে কোন ক্রমেই প্রেসিডেন্টকে ইমপিচমেন্ট করা সম্ভব নয়। কেননা যদিও স্পীকারের কাছে সংসদ সদস্যগণ প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে অভিযোগনামা সম্বলিত নোটিশ প্রদান করার পর আর প্রেসিডেন্ট সংসদকে বাতিল করতে পারেন না, কিন্তু কতসংখ্যক সদস্য প্রেসিডেন্টের বিপক্ষে যেতে পারে তা সংসদ নির্বাচনের পরই প্রেসিডেন্ট ধারণা করতে পারেন। ফলে সংসদ সদস্যদের নিয়ে যদি প্রেসিডেন্ট নিজের ক্ষমতাকে নিশ্চিত মনে না করতে পারেন তাহলেই প্রেসিডেন্ট সংসদকে ভেঙ্গে দেবেন। উপরন্তু ইমপিচমেন্টের জন্য কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে নোটিশ প্রদানের আগেই প্রেসিডেন্টের পক্ষে তা জেনে ফেলা সম্ভব এবং সে কারণে নোটিশ প্রদানের আগেই সংসদকে ভেঙ্গে দিতে পারেন। তৃতীয়তঃ সংসদ অধিবেশনে উপস্থিত সদস্যদের নয়, মোট সদস্যের তিন-চতুর্থাংশ যদি ইমপিচমেন্টের পক্ষে সমর্থন দেন শুধুমাত্র তাহলেই প্রেসিডেন্ট অপসারিত হবেন। কিন্তু এত বিপুলসংখ্যক সদস্য প্রেসিডেন্টের বিপক্ষে যেতে পারেন এমন পরিস্থিতি হওয়ার আগেই প্রেসিডেন্ট সংসদ ভেঙ্গে দিতে পারেন। কেননা নোটিশ প্রদানের এক মাসের মধ্যে এমন কোন পরিস্থিতি হতে পারে না যার ফলে এত বিপুলসংখ্যক সদস্য প্রেসিডেন্টের বিপক্ষে চলে যেতে পারে। আর ভবিষ্যতে নতুন পরিস্থিতি উদ্ভব হতে পারে এ আশার ওপর নির্ভর করে কোন সংসদ সদস্যের পক্ষে ইমপিচমেন্ট নোটিশে সাক্ষর করা সম্ভব নয়। কেননা সংসদে এ নিয়ে ভোটাভুটির সময় যদি অর্ধেকসংখ্যক সংসদ সদস্য নোটিশের সপক্ষে ভোট প্রদান না করে তাহলে তার সংসদ সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে। আর প্রেসিডেন্ট ক্ষমতাসীন থাকলে পরবর্তীকালে আরো মারাত্মক হুমকি আসার সম্ভাবনা থাকতে পারে বলে যে কোন সংসদ সদস্যের এতে স্বাভাবিক আশংকা থাকবে। তবে সংসদ নির্বাচনের ১২০ দিনের মধ্যে যদি সংসদ সদস্যদের একটি অংশ এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে তাহলে আর প্রেসিডেন্টের পক্ষে করার মত কোন কিছু উক্ত ধারা দু'টিতে রাখা হয়নি। কিন্তু এ কারণেই যে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হয়ে গড়েছে তা নয়, ২৯ নং ধারায় প্রেসিডেন্টের আরো যে সকল অধিকার প্রদান করা হয়েছে সে সকল অধিকার বলে প্রেসিডেন্ট সহজেই উক্ত ১২০ দিনের সময়সীমাকে অতিক্রম করতে সক্ষম। ২৯ নং ধারার বিভিন্ন উপধারাগুলি নিচে তুলে ধরা হলঃ

উপধারা ১ঃ যখন সংসদ ভেঙ্গে দেওয়া হয় কিংবা সংসদীয় কার্যক্রম স্থগিত থাকে বা সংসদের অধিবেশন চলে না সে রকম সময় প্রেসিডেন্ট প্রয়োজন বোধ করলে বিদ্যমান পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে যে কোন ধরনের অর্ডিন্যান্স জারি করতে পারেন। এ রকম পর্যায়ে ঘোষিত অর্ডিন্যান্স পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত এ্যাক্ট বা অর্ডিন্যান্সের মতই কার্যকরী হবে।

উপধারা ২ঃ যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে সংসদের কাছ থেকে এ অর্ডিন্যান্সকে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

উপধারা ৪ঃ নির্দিষ্ট সময়কাল অতিবাহিত হবার আগে যদি সংসদ এ অর্ডিন্যান্সকে অনুমোদন করে বা অনুমোদন না করে এবং এ ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের কোন মতামত না থাকে তাহলে নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর এ অর্ডিন্যান্সটির আর কার্যকারিতা থাকবে না।

উপধারা ৬ঃ দু'টি পদ্ধতিতে উক্ত সময়ে সীমা নির্ধারিত হবে ঃ-

(ক) অর্ডিন্যান্স জারির পর সংসদের প্রথম বৈঠকের ৪২ দিন অতিবাহিত হলেই উক্ত অর্ডিন্যান্স তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলবে। কিংবা

(খ) অর্ডিন্যান্স জারির পর ১৮০ দিন অতিবাহিত হওয়ার মধ্য দিয়ে উক্ত অর্ডিন্যান্স তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলবে।

---

৩৬. Ibid, p. 22.
৩৭. Ibid, p. 18.

Dhaka University Institutional Repository

তবে এ দু'টির মধ্যে যে ঘটনাটি আগে ঘটবে তার পরিপ্রেক্ষিতেই অর্ডিন্যান্সটি তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলবে।[৩৮]

উপরোক্ত ধারা থেকে দেখা যায়, একটি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য হলেও প্রেসিডেন্ট যে কোন ধরনের অর্ডিন্যান্স জারি করে যে কোন ধরনের নির্দেশ প্রদান করতে পারেন। ফলে নবনির্বাচিত কোন সংসদের অধিকাংশ সদস্য যদি তার প্রথম ১২০ দিনের মধ্যে প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেও চায় তা হলেও তা প্রতিরোধ করার মত যথেষ্ট আইনগত সুবিধা বাষট্টি সালের সংবিধানে প্রেসিডেন্টের হাতে রেখে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, পার্লামেন্টের প্রতি যে কোন সময় সমন জারি করার ক্ষমতা রয়েছে প্রেসিডেন্টের হাতে; ফলে যে কোন সময় প্রেসিডেন্ট ইচ্ছা করলেই পার্লামেন্ট বৈঠক অনুষ্ঠানকে বিলম্বিত করতে পারেন। এমনকি, বৈঠক অনুষ্ঠানকে স্থগিতও করতে পারেন।[৩৯] ফলে পার্লামেন্ট যতই ঐক্যবদ্ধ হোক না কেন বাষট্টির সংবিধানকে মেনে চলে প্রেসিডেন্টকে অপসারণ করার কোন পথ কার্যত খোলা ছিল না।

বাষট্টির সংবিধানে শুধু প্রেসিডেন্টকে অপসারণ করার কোন পথই রাখা হয়নি তা নয়, তার হাতে এমন সব ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে যে, যার ফলে প্রেসিডেন্টের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সামান্য কোন কাজ করারও সুযোগই রাখা হয়নি। বাষট্টি সালের সংবিধানে পার্লামেন্টকে কি পরিমাণে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল তা উক্ত সংবিধানের ২৭ নং ধারার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায়ঃ

উপধারা ১ঃ পার্লামেন্টে কোন বিল পাস হলে তা অনুমোদনের জন্য প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠাতে হবে;

উপধারা ২ঃ পেসিডেন্ট বিলটি হাতে পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে নিম্নোক্ত যে কোন একটি কাজ করতে পারেনঃ

(ক) বিল অনুমোদন করে দেওয়া;

(খা বিল অনুমোদনকে স্থগিত ঘোষণা; অথবা

(গ) বিলের কোন কোন অংশকে পরিবর্তন করার অনুরোধ জানিয়ে তা সংসদের কাছে ফেরৎ পাঠানো।

উক্ত তিনটি কাজের একটিও যদি প্রেসিডেন্ট না করেন তাহলে বিলটি অনুমোদিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে।

উপধারা ৩ঃ প্রেসিডেন্ট যদি বিল অনুমোদনকে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সংসদে যদি কোন রকম সংশোধন ছাড়াই মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে পুনরায় তা পাস হয় তাহলে উক্ত বিলটি অনুমোদনের জন্য আবার প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠানো হবে।

উপধারা ৪ঃ প্রেসিডেন্টের সুপারিশসহ বিলটি সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পাস হতে পারে এবং তা প্রেসিডেন্টের সাক্ষর ছাড়াই অনুমোদন হয়ে যেতে পারে। কিন্তু যদি সংসদে বিলটি পূর্ব অবস্থায় সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে পাস হয় তাহলে তা অনুমোদনের জন্য আবার প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠাতে হবে।

উপধারা ৫ঃ প্রেসিডেন্ট যদি উপধারা ৩ ও ৪ অনুযায়ী বিলটি একইভাবে ফেরত পান তাহলে প্রেসিডেন্ট দু'টি কাজ করতে পারেন-

(ক) বিলটি অনুমোদন করতে পারেন; কিংবা

(খ) নির্বাচকমন্ডলীর কাছ থেকে উক্ত বিলের পক্ষে 'হ্যা' 'না' ভোট গ্রহণ করতে পারেন।

এ দু'টি কাজের একটিও যদি প্রেসিডেন্ট না করেন কিংবা ইতিমধ্যেই যদি সংসদ ভেঙ্গে দেওয়া না হয় তাহলে প্রেসিডেন্ট বিলটি হাতে পাওয়ার ১০ দিনের মধ্যে অনুমোদন করেছেন বলে ধরে নিতে হবে।[৪০]

অর্থাৎ প্রেসিডেন্টের অনুমতি ছাড়া বাষট্টি সালের সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় পার্লামেন্টের পক্ষে কোন কিছুই করা সম্ভব ছিল না। আর প্রেসিডেন্ট যখন ইচ্ছা করলেই পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দিতে পারতেন সেখানে প্রেসিডেন্ট যা পছন্দ করবেন না এমন কোন বিল উত্থাপিত হলেও তা পার্লামেন্ট কর্তৃক পাস হওয়ার সামান্য সম্ভাবনা থাকে। উপরোক্ত ধারা বলে প্রেসিডেন্টের মনোভাবের বিরুদ্ধে পার্লামেন্টের মতামত গ্রহণের সুযোগ ছিল।কিন্ত কোন কোন ক্ষেত্রে সে সুযোগও রাখা হয়নি। যেমন, প্রেসিডেন্ট যদি জরুরী আইন ঘোষণা করেন তাহলে তা পার্লামেন্টের অনুমোদন না করার কোন অধিকার রাখা হয়নি। তবে পার্লামেন্ট উক্ত জরুরী আইনকে অনুমোদন করলে তা আইনে পরিণত হওয়ার সুযোগ ছিল। উক্ত সংবিধানের ৩০ নং ধারার ৬ উপধারাতে বলা হয়েছে-

"The National Assembly shall have no power to disapprove of the Ordinance but if, before the ordinance ceases to have effect, the National Assembly, by resolution, approves of the ordinance, the ordinance shall be deemed to have become an Act of the central legislature.[৪১]

পার্লামেন্টের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার দ্বারা শুধু সীমাবদ্ধ ছিল না, কিংবা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ কিংবা বার্ষিক বাজেট তৈরির ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য ছিল। বার্ষিক বাজেট প্রসঙ্গে পার্লামেন্ট সদস্যগণ শুধুমাত্র মতামত প্রকাশ করতে পারতেন। কিন্তু এ বাজেটকে অনুমোদন কিংবা বাতিল করার জন্য ভোট প্রদানের কোন অধিকার তাদের ছিল না। সংসদ সদস্যগণ শুধুমাত্র অনুদান চাইতে পারতেন এবং তাও ছিল খুবই সীমিত।[৪২] কিন্তু কেন্দ্রীয় মূল খাতের কোন অংকের ব্যাপারে তাদের কিছু বলার ছিল না। সংবিধানের ৪১ নং ধারার ১ উপধারাতে বলা হয়েছে-

"So much of an Annual Budget statement as relates to expenditure charged upon the central consolidated Fund may be discussed in, but shall not be submitted to the vote of, the National Assembly"[৪৩]

যে সকল ধারা সম্পর্কে উপরে আলোচনা করা হল সেগুলি হচ্ছে বাষট্টির সংবিধানের প্রকৃতি সম্পর্কে সামান্য কিছু নমুনা মাত্র। সংবিধান সংশোধনসহ সকল বিষয়েই প্রেসিডেন্টের কর্তৃত্ব ছিল প্রশ্নাতীত। জনসাধারণের মৌলিক অধিকারসহ বিভিন্ন ধরনের

৩৮. Ibid, pp.25-26.
৩৯. Ibid, p.21.
৪০. bid, p. 27.
৪১. Ibid, p. 27.
৪২. Ibid, p. 32.
৪৩. Ibid, p. 31.

Dhaka University Institutional Repository

অধিকারকে কিভাবে লংঘন করা হয়েছে এ সংবিধানে তার একটি মাত্র নমুনা এখানে উপস্থিত করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। বাষট্টি সালের সংবিধানের ৩০ নং ধারার ১ উপধারাতে জরুরী আইন ঘোষণার জন্য দু'টি বাস্তবতাকে তুলে ধরা হয়েছে;

(ক) পাকিস্তানের যে কোন অংশে বা অঞ্চলে যদি দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এমন কোন ঘটনা ঘটে বা যুদ্ধ লেগে যায় বা বহিঃশত্রু কর্তৃক যদি দেশ আক্রান্ত হয়; অথবা

(খ) যদি পাকিস্তানের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এমন ধরনের কোন অর্থনৈতিক সংকট শুরু হয় বা এমন কোন অভ্যন্তরীণ বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়, যা প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না বলে মনে হয় তাহলে প্রেসিডেন্ট জরুরী আইন ঘোষণা করতে পারবেন।[৪৪]

উক্ত ধারার ৩ ও ৪ নং উপধারাতে বলা হয়েছে প্রেসিডেন্ট ইচ্ছা করলেই এ জরুরী আইনকে স্থগিত করতে পারেন বা রদ করতে পারেন। প্রেসিডেন্ট যদি মনে করেন জরুরী আইন ঘোষণার পর তার কোন কোন ধারা সংশোধন বা নতুন ধারা-উপধারা সংযোজন করা প্রয়োজন তাহলে তিনি নির্বিঘ্নে তা করতে পারবেন। সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অন্যান্য সাধারণ আইনের মতই জরুরী আইনের ধারা-উপধারাগুলি কার্যকরী হতে থাকবে।[৪৫] আগেই বলা হয়েছে, এ আইনগুলি বাতিল করার কোন অধিকার পার্লামেন্টের নেই, একমাত্র অনুমোদন করারই অধিকার আছে মাত্র।

কেন্দ্র পর্যায়ে প্রেসিডিন্টের যে ক্ষমতা প্রদেশ পর্যায়ে গভর্ণরকে অনুরূপ ক্ষমতা প্রদান করা হয়; তবে গভর্ণর থেকে শুরু করে মন্ত্রী, সংসদ সচিব, এটর্নি জেনারেল বা ওই ধরনের সকল পদে নিয়োগ দানের অধিকার বা পদচ্যুত করার অধিকার এ সংবিধানে একমাত্র প্রেসিডেন্টের হাতেই সংরক্ষিত করা হয়েছে।[৪৬] ফলে উক্ত পদাধীকারী সকলই প্রেসিডেন্টের ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। এ প্রশ্নে সংবিধানের শুধুমাত্র একটি উপধারাকে উদ্ধৃত করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবেঃ

ধারা নং ১১৮ (১)ঃ " A Governor, a Minister or Parliamentery Secretary appainted by a president, and the Attorney General, shall hold office during the pleaser of the president, and may be removed from office at any time by the presidednt without any reason being assigned for his removal."[৪৭]

এ ধরনের একটি সংবিধান প্রণয়ন করে সকল ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে জেনারেল আইয়ুব প্রেসিডেন্ট হিসাবে একের পর এক বিভিন্ন ধরনের আইন ও অধ্যাদেশ জারি করতে লাগলেন। ১৯৬২ সালের ৩০শে জুন থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত যে সকল আইন ও অধ্যাদেশ জেনারেল আইয়ুব জারি করেছিলেন সেগুলির কয়েকটি সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হল।

বাষট্টি সালের সংবিধানের ১৭৩ নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছিল যে, কেন্দ্রীয় আইনসভার অনুমতি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি একটি রাজনৈতিক দলের সদস্য হিসাবে কোন ধরনের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেনা।[৪৮] সে ধারার সূত্র ধরেই ঘোষণা করা হয় The Politacal parties Act, 1962. উক্ত আইনে বিদ্যমান রাজনৈতিক দলসমূহকে প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে; এর একটি হচ্ছে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল দল (foreign aided party) এবং রাজনৈতিক দল (Political Party)। বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল দলকে নিম্নোক্ত কায়দায় সংজ্ঞায়িত করা হয়েছেঃ

(ক) বৈদেশিক কোন সরকার কিংবা রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ মদতে গড়ে ওঠা কোন সংগঠন;

(খ) বৈদেশিক কোন সরকার কিংবা রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পর্কযুক্ত কোন সংগঠন।;

(গ) বৈদেশিক কোন সরকার, রাজনৈতিক দল কিংবা ব্যক্তি বিশেষের কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থ বা অন্য কোন রকম সহযোগিতা নিয়ে গড়ে ওঠা সংগঠন।[৪৯]

রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে; কতকগুলি ব্যক্তি যখন একত্রিত হয়ে কোন সাংগঠনিক কাঠামো দাঁড় করানোর পর তারা চাঁদা সংগ্রহের মাধ্যমে তহবিল গঠন করে বা সম্পদ সৃষ্টি করে এবং নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতামতের সপক্ষে প্রচারনা পরিচালনা করে কিংবা নানা ধরনের রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালায় তখন তাকে রাজনৈতিক দল বলা যেতে পারে।

উক্ত উভয় ধরনের রাজনৈতিক দলই স্বীকৃতি প্রাপ্তির অযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। শুধু তাই নয়, যে সকল সংগঠনের আচরণ ইসলামী আদর্শের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় কিংবা পাকিস্তানের ঐক্য ও নিরাপত্তাকে সংহত করার জন্য কাজ করেনা তাদেরকেও রাজনৈতিক দল হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। এ আইনের ৩ নং ধারায় বলা হয়েছে;

"(i) No Political party shall be formed with the object of propagating any opinion, or acting in a mannar, Prejudicial to the Islamic idelogy, or the integrity, or security of Pakistan.

(ii) No person shall form, organise, set up or convene a foreign aided party or many way be associated with any such party."[৫০]

চার ধরনের ব্যক্তিকে কোন রাজনৈতিক দলের কর্মকর্তা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া যাবে নাঃ

(১) যে কোন অভিযোগে যিনি অন্যূন দুই বছর জেল খেটেছেন, তিনি মুক্তি লাভের পরবর্তী পাঁচ বছর পর্যন্ত রাজনৈতিক দলের কর্মকর্তা হতে পারবেন না।

(২) প্রেসিডেন্ট কিংবা গভর্ণর কর্তৃক যদি কোন ব্যক্তি সরকার কিংবা প্রশাসনের উচ্চপদ থেকে অযোগ্যতার অভিযোগে পদচ্যুত হন, তাহলে তার অযোগ্যতার মেয়াদকাল উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক দলের কর্মকর্তা হতে পারবেন না;

---

৪৪. Ibid, p. 26.

৪৫. Ibid, p. 26.

৪৬ Ibid, p.

৪৮. Ibid, p. 85.

৪৯. Political Parties Act, 1962, Act no. III of 1962 Government of Pakistan (1964): A Collection of the Central Acts and Ordinances for the Year 1962, Karachi: Government of Pakistan Press. Act no. III of 1962. p. 1.

৫০. Ibid, p. 2.

Dhaka University Institutional Repository

(৩) কোন ব্যক্তি যদি সরকারী চাকুরী থেকে বরখাস্ত হন তাহলে চাকুরীচ্যুতির দিন হতে পরবর্তী পাঁচ বছর পর্যন্ত তিনি কোন রাজনৈতিক দলের কর্মকর্তা হতে পারবেন না।

(৪) কোন ব্যক্তি যদি এবডোর আওতায় পড়েন, তাহলে তার নির্দিষ্ট মেয়াদকাল অতিক্রান্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনিও কোন রাজনৈতিক দলের কর্মকর্তা হতে পারবেন না।[৫১]

উক্ত আইনের ৬নং ধারায় বলা হয়, ৩নং ধারার আদেশসমূহ অমান্য করে যদি কোন রাজনৈতিক দল গঠিত হয় তাহলে উক্ত রাজনৈতিকদলের সকল কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হবে এবং তার সমস্ত সম্পদ ও তহবিল পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার বাজেয়াপ্ত করতে পারবে।[৫২] ৭নং ধারায় বলা হয় ৫ ও ৬ নং ধারার যে কোন একটি নির্দেশকেও যদি কোন ব্যক্তি অমান্য করে কোন রাজনৈতিক দলের কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করেন তাহলে তার এ কার্যক্রম শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে এবং এ জন্য তাকে দুই বছর পর্যন্ত কারাদন্ড বা অর্থদন্ড কিংবা দুই ধরনের শাস্তিই প্রদান করা যেতে পারে।[৫৩] উক্ত আইনের ৮ নং ধারায় বলা হয়, যদি কোন পার্টি কিংবা ব্যক্তি ৬নং ধারা অনুযায়ী নিষিদ্ধ হয়ে থাকে তাহলে সে পার্টি বা ব্যক্তি জাতীয় বা প্রাদেশিক নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার হারাবে; এমনকি, যদি কোন ব্যক্তি উক্ত দলের সদস্য হিসাবে জাতীয় বা প্রাদেশিক নির্বাচনে প্রার্থী হন তাহলে তার প্রার্থিতা বাতিল বলে গণ্য হবে। ৭ নং ধারা অনুযায়ীও যদি কেউ শাস্তি পেয়ে থাকেন তাহলেও তিনি জাতীয় বা প্রাদেশিক নির্বাচনে প্রার্থী হবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন।[৫৪] উক্ত আইনের ৯ নং ধারায় বলা হয়, একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি ছাড়া এসবল নির্দেশের বিরুদ্ধে কোন রকম মামলা দায়ের করা যাবে না।[৫৫] উপরোক্ত আদেশগুলি যে সকল রাজনৈতিক দলের জন্য প্রযোজ্য হবে তা The Political Organisations (Prolibition of unregulated Activity) ordinance, 1962[৫৬] এর সিডিউলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই রাজনৈতিক দলগুলি হচ্ছে ১. আওয়ামী লীগ, ২. কমিউনিস্ট পার্টি, ৩. জামাত-ই-ইসলামী, ৪. কৃষক প্রজা পার্টি, ৫. মুসলিম লীগ, ৬. ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ, ৭. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, ৮. নিজামী-ই-ইসলাম পার্টি ও ৯. রিপাবলিকান পার্টি। এসকল দল রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনা করার অধিকার পাওয়ার যোগ্য কিনা কিংবা এসকল দলের কর্মকর্তাগণ রাজনৈতিক অধিকার পাওয়ার যোগ্য কিনা তার ছাড়পত্র সুপ্রিম কোর্টের কাছ থেকে[৫৭] আসতে হবে অর্থাৎ ১৯৬২ সালের সংবিধান প্রণয়ন করার পরও রাজনৈতিক অধিকারের ব্যাপারটি এমনভাবে শর্তাধীন ধরা হয় যে, কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দলের পক্ষে স্বাধীনভাবে কোন মতামত প্রকাশের অধিকার থাকলো না। যে ধরনের রাজনৈতিক মতামত কোন রাজনৈতিক দল প্রদান করার আগে সুপ্রীম কোর্টের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে। যে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না কিংবা যে সকল মতামত দেশের স্বার্থ ও নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর বলে বিবেচিত তার নিরিখেই সুপ্রীম কোর্ট কোন রাজনৈতিক দলের মতামত প্রচারযোগ্য কিনা তা পরীক্ষা করে দেখবেন। ঠিক একইভাবে যে সকল ব্যক্তি উক্ত রাজনৈতিক দলের কর্মকর্তা তারা যে সত্যিই রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করার যোগ্য তারও ছাড়পত্র সুপ্রীম কোর্ট থেকে আনতে হবে। অর্থাৎ রাজনীতির বিষয়টিকে এমনভাবে বিভিন্ন আইন ও অধ্যাদেশের অধীনস্থ করা হয়েছিল যে, যে কোন ধরনের স্বাধীন মতামত প্রকাশই আইনত দন্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবার যোগ্য হয়ে ওঠে। কোন স্বাধীন মতামত প্রকাশ শুধুমাত্র উক্ত ব্যক্তির রাজনৈতিক অধিকারকেই ক্ষুন্ন করতে পারে তাই নয়, যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সে কর্মকর্তা সে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানও এ জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যেতে পারে। আর এ জন্য যে আদালতের আশ্রয় নিয়ে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রমাণ করতে চাইবেন যে, আসলে উক্ত বক্তব্য নিতান্ত একজন ব্যক্তির বক্তব্য বা এ বক্তব্য মোটেই দেশের স্বার্থ বা নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর নয় এ অধিকারও কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য রাখা হয়নি। অর্থাৎ রাজনৈতিক দল বিধির অধীনে কোন ব্যক্তি বা দল যদি অভিযুক্ত হয় তাহলে সে অভিযোগ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তোলাকেই আইনানুগভাবে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে।

রাজনৈতিক দল বিধির বাইরেও রাজনৈতিক কর্মীদের নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে আরো কঠোরতর কালাকানুন বলবৎ করা হয়। ১৯৫২ সালের পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনকে বলবৎ রাখা হয়; উপরন্তু, সে আইনের অধীনেও যে আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ ছিল বা সীমিত সময় পর ডিটেনশন প্রাপ্ত ব্যক্তি মুক্তি পেতে পারতো বা আইনের আশ্রয় নিতে পারতো সে সুযোগগুলিও বাতিল করা হয়। উক্ত নিরাপত্তা আইনকে আরো কঠোরতর রূপ দান করার জন্য ঘোষণা করা হয় 'The Preventive Detention Laws Amendment Act, 1962.[৫৮] এই আইনে নিরাপত্তা আইনের সাথে এমন কতকগুলি ধারা ও উপ-ধারা সংযোজিত করা হয় যার ফলে ডিটেনশনের সীমা প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত অভিমতের অধীনস্থ হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৫২ সালের নিরাপত্তা আইনের ৭(ক) উপধারাতে কোন নিরাপত্তা বন্দীকে দু'মাসের বেশি বিনা বিচারে আটক রাখার বিধান ছিল না। কিন্তু ১৯৬২ সালে তা সংশোধন করে সে ধারার সাথে ছোট্ট একটি শর্ত জুড়ে দেওয়া হয় এবং তা হল 'কর্তৃপক্ষীয় বোর্ডের আপত্তি না থাকলে' অর্থাৎ আগে যেখানে যে কোন নিরাপত্তা বন্দী দু'মাস আটক থাকার পর বিচার দাবি করতে পারতো এবং বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেতে পারতো সেখানে এমুক্তির ব্যাপারটি কর্তৃপক্ষীয় বোর্ডের ইচ্ছার অধীন হয়ে পড়লো। আর এ কর্তৃপক্ষীয় বোর্ডের সদস্য থাকতেন দু'জন, যাদের মধ্যে একজন ছিলেন সুপ্রীম কোর্টের বিচারক যিনি প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত হতেন এবং অন্যজন ছিলেন একজন উচ্চস্তরের সরকারী কর্মকর্তা যিনি সরাসরি প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মনোনীত হতেন। এদু'জন সদস্যের যে কোন একজনের আপত্তি থাকলেই আর বিনাবিচারে আটকের সময়সীমা উক্ত দু'মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো না। এ আইনের ২ নং ধারায় ১(গ) উপধারাতে বলা হয়েছে-

৫১. Ibid, p. 2.
৫২. Ibid, p. 2.
৫৩. Ibid, p. 3
৫৪. Ibid, p. 3.
৫৫. Ibid, p.3.
৫৬. Ordinance No. XVIII of 1962, 9th may 1962, Government of Pakistan (1964): op.cit.
৫৭. Political Parties Act, 1962, op.cit. p.2.
৫৮. Act No. IV of 1962 (22nd July, 1962), Sited in Governmcen of Pakistan (1964): op.cit., p. 1.

Dhaka University Institutional Repository

A person shall not be detained ......for a period longer than two months without the authority of a Board consisting of a Judge of the Supreme Court, who shall be nominated by the Chief Justice of that Coart, and another senior officer in the service of Pakistan, who shall be nominated by the president"[৫৯]

অর্থাৎ এ আইন বলবৎ হওয়ার ফলে প্রেসিডেন্ট কিংবা উক্তবোর্ড ইচ্ছা করলে বিনা বিচারে যে কোন ব্যক্তিকে বছরের পর বছর ধরে আটক রাখতে পারতো। শুধু তাই নয়, এই আইনে এমন কিছু ধারার সমাবেশ ঘটানো হয় যে, বছরের পর বছর ধরে নিরাপত্তা বন্দী আটকাবস্থায় থেকেও তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কি অভিযোগ রয়েছে তা জানতে পারত না। যদিও সেখানে বলা হয়েছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিরাপত্তাবন্দীকে কি কারণে গ্রেফতার করা হয়েছে তা জানানো হবে এবং অবশ্যই তা ১৫ দিনের বেশী হবে না। কিন্তু একই সাথে একটি শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে 'প্রেসিডেন্ট যদি দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে বন্দীকে গ্রেফতারের কারণ গোপন রাখতে না বলেন।[৬০] ফলে এ ব্যাপারটিও প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার অধীনস্থ হয়ে পড়ে। প্রেসিডেন্টের ইচ্ছানুসারে যে কোন ব্যক্তি বছরের পর বছর ধরে তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের কথা না জেনেই বন্দী অবস্থায় থাকতে পারেন। অর্থাৎ যারা তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের কথা না জেনেই বন্দী জীবন যাপনে বাধ্য হন তাদের কাছে ব্যক্তিগতভাবেই প্রেসিডেন্ট দায়ী হয়ে ওঠেন।

এ সংশোধনী আইনের ৩ নং ধারায় আরো বেশ কিছু শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়। এগুলির মধ্যে ৩নং উপধারাটিতে বলা হয়, যদি কোন ক্ষেত্রে-A person ....shall not be entitled to appear by any legal practitioner in any matter connected with a case referred to the Board, and the proceedings of the Board shall be secret."[৬১] অর্থাৎ নিরাপত্তা বন্দীকে যখন কর্তৃপক্ষীয় বোর্ডের মুখোমুখি আনা হয় তখন নিরাপত্তাবন্দীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কোন আইনজীবীর সাহায্য নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়নি এবং এই পুরো বিষয়টি গোপনে অনুষ্ঠিত হওয়ার বিধান রাখা হয়েছে।

আর এভাবে ১৯৬২ সালের এ সংশোধনীর ফলে পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনটি যে কোন ব্যক্তির ওপর রাষ্ট্রের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আরো শক্তিশালী অস্ত্র হয়ে উঠলো। রাষ্ট্র যে কোন ব্যক্তিকে সন্দেহ জনক বলে মনে করলেই তাকে বিনা বিচারে বছরের পর বছর আটক করে রাখতে পারত। এজন্য বন্দীর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ আনার প্রয়োজন পর্যন্ত ছিল না কিংবা নিরাপত্তাবন্দীদের বিচার চাওয়ার ন্যূনতম কোন সুযোগ ছিল না। যে সকল ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষীয় বোর্ড কিংবা স্বয়ং প্রেসিডেন্ট হস্তক্ষেপ না করতেন সে সব ক্ষেত্রেও স্থানীয় প্রশাসন ইচ্ছা করলেই যে কোন ব্যক্তিকে দু'মাস বিনা বিচারে আটক করে রাখতে পারতো। এ দু'মাস সীমা ও রাষ্ট্রের আধিপত্যকে বলবৎ রাখার জন্য যথেষ্ট ছিল না বলে ১৯৬৪ সালে তা সংশোধন করে বিনা বিচারে আটক রাখার সময়সীমাকে ৩ মাসে উন্নীত করা হয়।[৬২]

১৯৬২ সালের সংবিধানে জরুরী আইনের যে ধারা সম্পর্কে ইতিপুর্বে আলোচনা করা হয়েছে তারই পরিপূরক একটি অধ্যাদেশ জারি করা হয় The Disturbed Areas (special powers) Ordinance, 1962 (ordinance no. LIV of 1962)তে। এঅধ্যাদেশ বলে প্রাদেশিক সরকার তার অধীনস্থ যে কোন এলাকাকে উপদ্রুত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করার ক্ষমতা পায়। আর কোন এলাকাকে উপদ্রুত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করার ফলে সামান্য একজন ম্যাজিস্ট্রেট প্রয়োজন মনে করলেই পাঁচজন ব্যক্তি বা তার চেয়ে বেশিসংখ্যক ব্যক্তির সমাবেশ কিংবা যে কোন ধরনের অস্ত্র বাহকের প্রতি গুলীবর্ষণের অধিকার পায়।[৬৩] শুধু ম্যাজিস্ট্রেটই নয়, যে কোন এলাকা উপদ্রুতবলে ঘোষিত হলে সামরিক বাহিনীর যে কোন কর্মকর্তা বা বেসামরিক নিরাপত্তা বাহিনীর যে কোন কর্মকর্তা উপরোক্ত ক্ষেত্রে গুলীবর্ষণের নির্দেশ দিতে পারে। এ ছাড়া, তারা যে কোন ব্যক্তিকে কোন রকম ওয়ারেন্ট ছাড়াই গ্রেফতার করতে পারে। যে কোন সময় তারা উক্ত এলাকার যে কোন বাড়িতে তল্লাশী চালাতে পারে কিংবা প্রয়োজন মনে করলে উক্ত বাড়ির যে কোন দ্রব্য, বই-পুস্তক, দলিলপত্র ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করতে পারে।[৬৪] অন্যদিকে এ সকল কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তির মামলাকে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হওয়ার পথও রুদ্ধ করা হয়।[৬৫]

এভাবে অর্ডিন্যান্স ও আইন জারি করে জেনারেল আইয়ুবের নেতৃত্বে পাকিস্তান রাষ্ট্র জনসাধারণের ওপর চূড়ান্ত কর্তৃত্ব আরোপ করতে থাকে। সে কর্তৃত্বের আওতা থেকে ছাত্র সমাজসহ অপরাপর পেশা ও শ্রেণীর জনসাধারণও বাদ পড়েনি। বরং তাদের ওপর এ কর্তৃত্বের পরিমাণ আরো বেশী ছিল। ছাত্র সমাজের ওপর যে কোন ধরনের রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্টতাকে কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। এমনকি, কোন ছাত্রের আলাপচারিতা বা তার লিখিত কোন কিছুর মধ্যেও যদি রাজনীতির সাথে কোন রকম সংশ্লিষ্ঠতা প্রকাশ পায় তাহলেও তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়। যে কোন ছাত্রের রাজনীতির সাথে সম্পর্ক রয়েছে কিংবা কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা বা সদস্য কোন ছাত্রকে রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত করছে এমন প্রমাণ পেলে তাকে দু'বছর জেল কিংবা বড় অংকের জারিমানা বা উভয় ধরনের শাস্তি একই সাথে প্রদান করার বিধান রাখা হয়। এ সম্পর্কে The Pakistan penal code (Second Amendment) ordinance, 1962-এর ২ নং ধারাতে নিম্নোক্ত বাক্যগুলি সংযোজিত করা হয়েছেঃ

Whoever by words, either spoken or written, or by signs, or by visible representations, or otherwise, induces or attempts to induce any students, or any class of students, or any institutions interested in or connected with

---

৫৯. Ibid, p. 1.

৬০. Ibid, p. 2.

৬১. Ibid, p. 2.

৬২. Further to amend the Security of Pakistan Act, 1952, Ordinance No. X of 1964. Sited in Government of Pakistan (1966): A Collection of the Central Acts and Ordinance for the Year 1964. karachi: Government of Pakistan.

৬৩. The Disturbed Areas (special Powers) Ordinance, 1962, Ordinance No. LIV of 1962, Sited in Government of Pakistan (1966): Ibid, Section 3, Subsection 1 and 2.

৬৪. Ibid, Section 4, Subsection a, b and c.

৬৫. Ibid, Section 5.

Dhaka University Institutional Repository

students, to take part in any political activity shall by punished with impresonment which may extend to two years or with time or with both.'[৬৬]

পূর্ব পাকিস্তানের শ্রমিকশ্রেণীও তার মৌলিক অধিকার তথা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হারায়। ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের পরবর্তী বছর Industrial Disputes ordeinance, 1959 নামে এক আদেশনামা ঘোষণা করা হয় এবং এ আদেশ নামার মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীর ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকারটুকুও কেড়ে নেওয়া হয়। এই আদেশ নামার সামান্য কিছু সংশোধনসহ ১৯৬৫ সালের ৩রা আগষ্ট পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সংসদে অনুমোদিত হয় এবং East Pakistan Labour Disputes Act, 1965 নামের আইনেপরিণত হয়।[৬৭] এর মাত্র পাঁচদিন পর ১৯২৬ সালের Trade Unnion Act-এর গণতান্ত্রিক ধারাগুলিকে কেটে তৈরী করা হয় East Pakistan Trade Unions Act, 1965.[৬৮] এ আইনের মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়নে রেজিষ্ট্রেশন প্রক্রিয়াকে জটিলতর করে তোলা হয় এবং তা পরিপূর্ণভাবে আমলাতন্ত্র ও মালিক পক্ষের অনুমোদনের অধীন করে ফেলা হয়। আর রেজিষ্টার্ড ট্রেড ইউনিয়ন ছাড়া অন্য কারো ন্যূনতম কোন বিষয়েও কথা বলার অধিকারকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ১৯৬৫ সালের জুলাই ও আগষ্ট মাসে অনুষ্ঠিত পূর্বপাকিস্তান সংসদের অধিবেশনে শ্রমিক অসন্তোষ দমন করার দিনও অনেকগুলি আইন প্রণয়ন করা হয়। পূর্ব পাকিস্তান সরকারের শ্রমিক অসন্তোষ আইনে শ্রমিক অসন্তোষকে এমনভাবে মোকাবেলা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় যে, সরকারী কিছু আমলা এবং তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিষ্ঠিত কিছু লেবার কোর্টের ওপর তাদেরকে শায়েস্তা করার চূড়ান্ত অধিকার দেওয়া হয়। এআইনের ১১ নং ধারায় তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিষ্ঠিত আদালতের কার্যাবলীর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়। এসবদায়িত্বের মধ্যে ছিল শ্রমিক অসন্তোষ বিষয়ক যে কোন অভিযোগকে তদন্ত করে দেখা, দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা, অসন্তোষ দমনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ গ্রহণের সুপারিশ করা ইত্যাদি। এ ধরণের শ্রম আদালতের ক্ষমতা ও অধিকার ১২ নং ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে। এধারার বিভিন্ন উপধারাতে এ আদালতকে পূর্ণাঙ্গ নাগরিক আদালতের মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। আমলাদের নিয়ে গড়ে তোলা এ আদালতকে শুধু রায় প্রদানের অধিকারই প্রদান করা হয়নি, এরায়ের বিরুদ্ধে কেউ আপিল করতে চাইলে তা করতে পারবে কি পারবে না তারও দায় দায়িত্ব প্রদান করা হয় এ আদালতের কাছে।[৬৯] এর আগেই তথা সামরিক শাসন আসার আগেই ঘোষিত হয়েছিল The East Pakistan Essential services (second) ordinance, 1958. সামরিক শাসনের অধীনে বিভিন্ন সংশোধনী ও অধ্যাদেশের মাধ্যমে এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, শুধু জরুরী সরবরাহের সাথে সম্পর্কিত শ্রমজীবী মানুষেরই ধর্মঘট করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয় না, বিভিন্ন ধরনের ছোট–বড় যন্ত্রচালক,গাড়ী চালক, ফোরম্যান, রাজমিস্ত্রিসহ মোট ৫০ রকম কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদেরও ধর্মঘট করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়।[৭০] এছাড়া, আভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন, সড়ক পরিবহন, গণযোগাযোগসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শ্রমজীবী মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পৃথক পৃথক আইন ও অধ্যাদেশ জারি করা হয়। এগুলির মাধ্যে কোন কোনটি আবার সামরিক শাসন আসার পূর্বেই জারি করা হয়েছিল। এ সকল আইন ও হুকুম কতটুকু নিপীড়নমূলক ছিল তার জন্য একটিমাত্র উপমাই যথেষ্ট হবে। The Communication and Transport Services Maintenance Ordinance, 1957-এর ৩ নং ধারার ১ উপধারায় বলা হয়ঃ If the central Government is satisfied that in the public interest it is necessary or expedient so to do, it may, by general or special order, prohibit strikes in any communication and transport service specified in the order.[৭১] এ ধারার অন্য তিনটি উপধারাতে এ নির্দেশের অধীনস্থ বিষয়গুলিকে স্পষ্টতর করা হয়েছে এবং ৪ নং উপধারায় এসে ১নং ধারাকে সুনির্দিষ্ট করে যে দু'টি নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে যোগাযোগ ও পরিবহন কর্মে নিয়োজিত যে কোন চাকুরিজীবীর জন্যই ধর্মঘট নিষিদ্ধ এবং এচাকুরিতে কর্মরত কোন ব্যক্তি যদি ধর্মঘটের ডাক দেয় বা ধর্মঘট শুরু করে তাহলে তার নিয়োগদান এ নির্দেশ প্রদানের পূর্বে কিংবা পরে যখনই হোকনা কেন তা অবৈধ বলে ঘোষিত হবে।

এঅধ্যাদেশের ৪নং ধারায় বলা হয়েছে, যদি কোন ব্যক্তি যে কোন ধরনের ধর্মঘটে যোগদান করে তাহলে সে কারাদন্ড বা অর্থদন্ড কিংবা উভয় ধরনের শাস্তি পাবার যোগ্য অপরাধী হিসাবে গণ্য হবে। কারাদন্ডের মেয়াদ হবে ৬ মাস এবং অর্থদন্ডের পরিমাণ হবে ২০০ টাকা। এ অধ্যাদেশের ৫ নং ধারায় বলা হয় যদি কোন ব্যক্তি এ ধরনের কোন ধর্মঘটে যোগদানের জন্য কাউকে অনুপ্রাণিত করে কিংবা ধর্মঘট সংগঠনে ভূমিকা পালন করে তাহলে তার শাস্তির মেয়াদ হবে ১ বছরের কারাদন্ড বা এক হাজার টাকা জরিমানা কিংবা কারাদন্ড ও জরিমানা উভয়টিই।

অধ্যাদেশের ৬ নং ধারায় বলা হয়, যদি কোন ব্যক্তি এধরনের কোন ধর্মঘট অনুষ্ঠানের জন্য জেনে শুনে চাঁদা প্রদান করে তাহলে তারও শাস্তির মেয়াদ হবে ১ বছর কারাদন্ড এবং এক হাজার টাকা জরিমানা কিংবা উভয়টিই।

এঅধ্যাদেশের ৭ নং ধারায় সবচেয়ে কঠিণতর নির্যাতনমূলক ধারাটি সংযোজিত হয়। এই ধারার মাধ্যমে যে কোন পুলিস কর্মকর্তা যে কোন ব্যক্তিকে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার করার অধিকার পায়। এই ধারার কথাগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হলঃ

" 7. Power to arrest without warrant. Not withstanding anything contained in the code of Criminal procedure, 1898 (iv of 1898), any police officer may arrest without warrant any person who is reasonably suspected of having committed any office under this ordinance."[৭২]

---

৬৬. The Pakistan Penal Code (Second Amendment) Ordinance, 1962. ordinance no. LXX of 1962. Sited inGovernment of Pakistan (1966): Ibid, Section 2.

৬৭. The East Pakistan Labour Disputes Acts, 1965, Sited in Shafi, M. (1969): East Pakistan Labour Code-with commentry Karachi: Bureau of Labour Publications. pp. 69-89.

৬৮. Shafi, M (1969): Ibid, pp. 89-106.

৬৯. Ibid, p. 78.

৭০. Ibid, p. 329.

৭১. Ordinance No. XII of 1957, Ibid, p. 325.

৭২. Ibid, p. 326.

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে যখন ছাত্র, শ্রমিক, রাজনৈতিক কর্মী ও জনসাধারণের বিরুদ্ধে একের পর এক অর্ডিন্যান্স জারি করে তাদের নাগরিক অধিকারের ওপর পাকিস্তান রাষ্ট্র একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করলো তখনও দেশের লেখকদের কিছু স্বাধীনতা থেকে গিয়েছিল। ১৯৬২ সালের Copy right অধ্যাদেশ জারি করার পরও একজন লেখক কিংবা একজন শিল্পী অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে তার গ্রন্থ কিংবা শিল্প কর্ম প্রকাশ করতে পারতো।[৭৩] কিন্তু শিল্পী সাহিত্যিকদের এ অধিকারও পাকিস্তান রাষ্ট্রে অব্যাহত থাকেনি। বিশেষত, পূর্ব পাকিস্তান সরকার বেআইনীভাবে শিল্পী সাহিত্যিক তথা বুদ্ধিজীবিদের এ অধিকারকে কেড়ে নিল। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর আবদুল মোনেম খান এক অধ্যাদেশ জারি করে বই প্রকাশ কিংবা সংগীত রচনা, মানচিত্র বা এ ধরণের কোন শিল্পকর্মকে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করার অধিকারকে হরণ করে নেয়।[৭৪] ১৯৬০ সালের Press and publications ordinance এর মাধ্যমে সংবাদপত্রের ওপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল তা ১৯৬৫ সালের এ অধ্যাদেশ জারি করে মোনেম খান শিল্পী সাহিত্যিকদের ওপরও সে আঘাতটি হানলো। অথচ একথা সুবিদিত যে, শিল্পী সাহিত্যিকদের সরাসরি মত প্রকাশের ক্ষেত্র খুবই সীমিত।

এ অধ্যাদেশের ৩ নং ধারায় বলা হয়, যে কোন ব্যক্তিই বিদেশে প্রকাশিত কোন গ্রন্থ বা কোন শিল্প কর্ম কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া প্রকাশ করতে পারবেনা। এ ধরনের কোন প্রকাশনা যদি উক্ত অধ্যাদেশ জারির আগে দু'মাসের মধ্যে প্রকাশিত হয় তাহলে তা প্রচার ও বন্টনের আগে দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিতে হবে।

অধ্যাদেশের ৪ নং ধারায় বলা হয়, যে কোন ব্যক্তি যদি কোন সাহিত্য বা শিল্প কর্মকে প্রকাশ করতে চান তাহলে অনুমতির জন্য নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করে নির্ধারিত পরিমাণ ফি জমা দিয়ে আবেদন করতে হবে। প্রাদেশিক সরকার বা তার দ্বারা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে এ সাহিত্য বা শিল্পকর্ম দেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি বা জাতীয় স্বার্থের সাথে অসংগতিপূর্ণ তাহলে তা বাতিল করতে পারবেন।

অধ্যাদেশের ৫ নং ধারায় বলা হয়, যদি কোন সাহিত্য বা শিল্পকর্ম প্রকাশের অযোগ্য বলে বিবেচিত হয় তাহলে উক্ত আবেদনকারী উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করতে পারবেন। কিন্তু উক্ত উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ যে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে সে ব্যাপারে কোন প্রশ্ন তোলা যাবে না বা কোন আদালতের কাছে বিচার পার্থনা করা যাবেনা।

অধ্যাদেশের ৬,৭ ও ৮ নং ধারায় বলা হয়, প্রাদেশিক সরকার যে কোন গ্রন্থ বা প্রকাশিত শিল্পকর্মকে পরীক্ষা করতে পারবে এবং প্রয়োজন বোধে তার প্রচার নিষিদ্ধ করতে পারবে। যদি কোন ব্যক্তি প্রাদেশিক সরকারের এ সিদ্ধান্ত অমান্য করে তাহলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে এবং এ জন্য শাস্তির মেয়াদ হবে দু'বছর কারাদন্ড বা এক হাজার টাকা জরিমানা কিংবা অবস্থাভেদে দু'ধরনের শাস্তি একই সাথে প্রয়োগ করা হবে। যদি এ অপরাধে কারো শাস্তি হয় তাহলে তার উক্ত গ্রন্থ বা শিল্পকর্মের সমস্ত কপি সারা পূর্ব পাকিস্তানের যেখানে দেখা যাবে সেখান থেকেই বাজেয়াপ্ত করা হবে'।

অধ্যাদেশের ৯ নং ধারায় বলা হয়, একমাত্র প্রাদেশিক সরকার বা তার কোন দায়িত্বশীল প্রতিনিধি যদি উক্ত শাস্তির ব্যাপারে ভিন্ন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করে তাহলে কোন আদালতেরই উক্ত শাস্তির ব্যাপারে কোন বিচার অনুষ্ঠানের অধিকার থাকবেনা। কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে যদি কোন আদালতে বিচার অনুষ্ঠিত হয় তাহলেও আসামী নির্দোষ প্রমাণিত হবার পূর্ব পর্যন্ত জামিন পাবে না।[৭৫]

এভাবে একদিকে যেমন সমগ্র পাকিস্তানের ওপর আইয়ুব সরকার বিভিন্ন আইন ও অধ্যাদেশের মাধ্যমে একাধিপত্যমূলক কালাকানুন চাপিয়ে দিয়ে মত প্রকাশের সামান্যতম অধিকারটুকুও হরণ করে নিয়েছিল, ঠিক তেমনি পূর্ব পাকিস্তানে বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক নীতি অব্যাহত রেখেছিল। চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে পাকিস্তানের উভয় অংশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর আলাদাভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। যদি দুই অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নকে পাশাপাশি এনে আলোচনা করা যায় তাহলে তাদের ভিন্নতর অর্থনৈতিক বিকাশের রাজনৈতিক অর্থনীতি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

৭.৩ আইয়ুব সরকারের অর্থনৈতিক সংস্কারের ফলাফল

সেনা বাহিনী ক্ষমতা গ্রহণের কারণে যখনজেনারেল আইয়ুব খান সামরিক সরকারের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন তখন তিনি প্রথমেই দেশের ওপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য কতকগুলি আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। দেশের ওপর প্রাথমিকভাবে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পরই তার সামনে প্রশ্ন দেখা দেয় কিভাবে তার শাসনের পক্ষে সারা দেশে একটি সামাজিক ভিত্তি গড়ে তোলা যায়। কেননা ততদিনে আইয়ুব খান বুঝেছেন যে, তাঁর সরকারের প্রতি জনসাধারণের তেমন কোন সমর্থন নেই। আর সে কারণেই তাঁকে এমন সব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয় যাতে দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে তাঁর একটি সামাজিক ভিত্তি গড়ে উঠতে পারে। আর সে উদ্দেশ্যেই সামরিক সরকার শুরুতেই সামাজিক ভিত্তি গড়ে তোলার জন্য সহায়ক হতে পারে এমনবেশ কিছু অর্থনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করলো। এ সকল কর্মসূচী সম্পর্কে আলোচনায় যাওয়ার আগে সামরিক সরকারের জন্য কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক হয়ে পড়েছিল সে বিষয়ে সামান্য আলোকপাত করা প্রয়োজন। কেননা পাকস্তান রাষ্ট্রে ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন ছিল বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের শ্রেণী স্বার্থের মধ্যেকার প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বের ফল। কেবলমাত্র কোন জেনারেল বা তৎকালীন প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ চরিতার্থের জন্য কিংবা কোন বৈদেশিক শক্তির খামখেয়ালীর কারনে ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন এসেছিল তা নয়। মূলতঃ পাকিস্তানের পশ্চাদপদ অর্থনীতি ও সমাজের তুলনায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের অতি বিকশিত প্রতিষ্ঠানগুলির অস্তিত্ব ও বিকাশকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের কর্ণধাররা অনুমোদন করেনি। আর তাই যে সকল শ্রেণীর সাথে বিরোধের কারণে রাষ্ট্রের পক্ষে সাংবিধানিক সরকারকে সমর্থন করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল, সে সকল শ্রেণীর বাইরে তথা নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার পক্ষে সামাজিক ভিত্তি হিসাবে কাজ করতে সক্ষম এমন সব শ্রেণীর মধ্যেই 'বন্ধু শ্রেণী' অনুসন্ধানের প্রয়োজন পড়ে।

---

৭৩. The Copyright Ordinance, 1962, Ordinance No. XXXIV of 1962, Sited in Govt. of Pakistan (1964): op.cit., section no. 5.

৭৪. Government of East Pakistan (1965): The East Pakistan Publication of Books (Regulation and Control) Ordinance, 1965, East Pakistan Ordinance No. V of 1965. Sited in The Dacca Gazette, Extra ordinary, Published by Authority, Section 2, p. 2156.

৭৫. Ibid, pp. 2156-57.

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রে কোন্ শ্রেণীর পক্ষে এ নব্য শাসকদের সামাজিক ভিত্তি হিসাবে গড়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল তা খুবই স্পষ্ট। কেননা যেখানে সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র ও তাদের অনুগত শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের রাজনৈতিক স্বার্থের প্রধান বিরোধী ছিল ভূমি অভিজাত শ্রেণী। ফলে ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে গ্রামীণ কৃষক সমাজের মধ্যেকার উচ্চতম স্তরকে সহজেই পক্ষে নিয়ে আসা সম্ভব ছিল। কারণ ভূমি অভিজাতদের সামন্ততান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ থেকে তারা বের হয়ে আসতে চায়। তাই আইয়ুবের সামরিক সরকার পরবর্তীকালে যে ভূমিসংস্কার করে তা যতটা ছিল দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য তার চেয়ে অনেক বেশী ছিল সামরিক সরকারের পক্ষে একটি সামাজিক ভিত্তি তৈরী করার রাজনৈতিক লক্ষ্যে গৃহীত। অবশ্য এ ব্যাপারে অনেকে মনে করেন যে আইয়ুবের পারিবারিক শ্রেণী অবস্থানের বিশেষ প্রভাব ছিল।[৭৬] ৪র্থ অধ্যায়ে পশ্চিম পাকিস্তানের ভূমি সংস্কার বিষয়ক আলোচনায় এটা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, সেখানে গ্রামের সম্পত্তি সম্পর্কে, এমন কি ক্ষমতা কাঠামোর ক্ষেত্রে আইয়ুব দশকে এক ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ভূমি অভিজাত শ্রেণীর বিপরীতে সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় একটি শক্তিশালী পুঁজিপতি-খামার মালিক শ্রেণীর জন্ম হয়েছিল, যারা আপন চাষের অধীনে যে শুধু বিপুল পরিমাণ জমিই রেখেছিল তা নয়, পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নত প্রযুক্তি-সমৃদ্ধ চাষ ও সেচ যন্ত্রপাতিও তাদের করায়ত্ত ছিল। এর ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলের ক্ষমতা কাঠামোয়ও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। ভূমিসংস্কারের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে পশ্চিম পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষ তাদের আজন্ম অধীনতাসুলভ বন্ধন থেকে মুক্তি পায়। অর্থাৎ এই প্রথম একজন কৃষক তার অধীনস্থ আবাদী জমির মালিক বলে দাবি করতে পারে সে নিজে। ফলে যখন গ্রামাঞ্চলে চাষের যন্ত্রপাতি, বিশেষত ট্রাক্টর ও সেচ ইত্যাদির প্রচলন ঘটে তখন এসব খামার মালিক তাদের সামর্থ্যমত উক্ত আধুনিক প্রযুক্তির ওপর নিজের মালিকানা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়। অন্যদিকে, উৎপাদিত ফসলের ন্যূনতম দাম বেঁধে দেওয়ায় এবং বিপুলভাবে বৈদ্যুতিক শক্তির সরবরাহের ফলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক উল্লম্ফন ঘটে, যার প্রায় সম্পূর্ণ সুযোগ লাভ করে গ্রামীণ পুঁজিপতি খামার মালিকগণ। এভাবেই পশ্চিম পাকিস্তানে ভূমি অভিজাতদের বিপরীতে একটি ভিন্ন শ্রেণী গড়ে ওঠার বৈষয়িক শর্ত পুরণ হয়। যদিও ভূমি মালিকানার একটি উচ্চতম সীমা বেঁধে দেওয়ার কারণে সরকার খুব বেশী পরিমাণ জমি পুনঃবন্টনের জন্য উদ্ধার করতে পারেনি; অর্থাৎ অধিকাংশ উদ্বৃত্ত জমিই ভূমি অভিজাতশ্রেণীর অনুগত লোকজন ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাধীনে বন্টিত হয়েছে, ভূমি অভিজাতদের জমি হস্তান্তরের ফলে এমন একটি শ্রেণীর জন্ম হয়েছে যারা উৎপাদন সম্পর্কের দিক থেকেই ভিন্নতর একটি শ্রেণী। কিন্তু বড় ভূস্বামীদের নিকট থেকে জমি প্রাপ্ত অধিকাংশ ব্যক্তিই পরবর্তীকালে গোষ্ঠীগত বন্ধন ও 'বিরাদারী' প্রথার কারণে রাজনৈতিকভাবে প্রাক্তণ মনিব বা ভূমি অভিজাতের সাথেই রয়ে গেছে। তবে এদের মধ্যে যারা পুঁজিপতি খামার মালিকে পরিণত হয়েছিল তারা শ্রেণী হিসাবে পশ্চিম পাকিস্তানের সমাজে সম্পূর্ণ একটি নতুন শ্রেণী, যাদের সাথে পশ্চাদপদ উৎপাদন রীতির ধারক ভূমি অভিজাতদের দ্বন্দ্বের প্রকৃতিটি মৌলিক। আর যে শাসন ব্যবস্থার কারণে এই নতুন শ্রেণীটির জন্ম হতে পেরেছিল তা হচ্ছে আইয়ুবের সামরিক শাসন। আর এজন্যই আইয়ুব সরকার খুব সফলভাবে এই গ্রামীণ পুঁজিপতি শ্রেণীটিকে সামাজিক ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থাটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।

দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান ছিল পাকিস্তানের অপেক্ষাকৃত একটি অনগ্রসর অঞ্চল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় পর প্রথম ১২ বছরে এখানে বলতে গেলে তেমন কোন উন্নয়ন কর্মকান্ডই পরিচালিত হয়নি। এখানে অর্থনৈতিকভাবে এমন কোন শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের ওপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য কোন প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে পারে। যে জমিদার শ্রেণীটি ছিল, সে শ্রেণীটি ১৯৫০ সালের ভূমি সংস্কারের কারণে কার্যত ধ্বংস হয়ে যায়। তেমন কোন ব্যবসায়ী শ্রেণী কিংবা শিল্পপতি শ্রেণীরও জন্ম হয়নি যে, পাকিস্তানের শক্তিশালী রাষ্ট্রের ওপর অধিপত্য প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত হতে পারে। এমনকি, এখানে সে রকম কোন শ্রেণী থাকলেও সামন্ত শ্রেণীর সাথে তাদের ক্ষমতার দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। তাছাড়া, যে সকল দ্বন্দ্বের কারনে পাকিস্তানে সাংবিধানিক সরকারের পতন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল সে সকল দ্বন্দ্বের প্রায় কোনটিই পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্যমান ছিল না। এমনকি, পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বিলোপের পক্ষে সে সময় যে প্রবল দাবি উঠেছিল সে দাবির বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ (এ বিষয়টি পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে)। এখানকার রাজনৈতিক শক্তিসমূহের শুধু একাংশের মধ্যেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দাবিটি প্রবল ছিল। এ অবস্থায় কোন্ শ্রেণীর মধ্যে সামরিক সরকার তার সামাজিক ভিত্তি গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে? এটা নির্ধারণের জন্য ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে।

পূর্ব পাকিস্তানের উক্ত সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শাসনের সমর্থক পূর্বপাকিস্তান মুসলিম লীগ চূড়ান্তভাবে পরাজয়বরণ করে, আর বিপুল সংখ্যা গড়িষ্ঠতা নিয়ে বিজয়ী হয় হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে গঠিত যুক্ত ফ্রন্ট। যুক্ত ফ্রন্ট প্রদত্তযেসব দাবি পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করেছিল সেসব দাবির প্রতি দৃষ্টি দিলে বোঝা যাবে কোন্ শ্রেণীটি আইয়ুবের সামরিক শাসনের সামাজিক ভিত্তি গড়ে তুলতে পারে।

যুক্ত ফ্রন্টের ২১ দফায় মোট ৪১টি শ্রেণীর দাবি সন্নিবেশিত হয়েছিল। ১৯৬১ সালের হিসাব অনুযায়ী শ্রম শক্তি ও উক্ত ৪১টি দাবির ভিত্তিতে তৈরী করা হয়েছে সারণি ৭.১। ১৯৫৪ সালের তুলনায় ১৯৬১ সালে শহরে বসবাসকারীর সংখ্যা কিছুটা বেড়েছে বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও উক্ত সময়ের শ্রেণী কাঠামোর ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্টের দাবিসমূহ বিন্যস্ত করলে তার তাৎপর্য ক্ষুন্ন হবেনা। কেননা এ সময়ে শহরে বসবাস কারী মধ্যবিত্ত ও শিল্পপতি ব্যবসায়ীদের সংখ্যাগত গুরুত্ব সামান্য হলেও বৃদ্ধি পেয়েছে সত্য। কিন্তু তখনও পূর্ব পাকিস্তানের বিপুলসংখ্যক মানুষ গ্রামে বাস করতো।

যাহোক, সারণি ৭.১ থেকে দেখা যায়, মোট শ্রম শক্তির সংখ্যা ১ কোটি ৭৪ লক্ষ ৪২ হাজার। এদের মধ্যে শতকরা ২৮.৭২ ভাগ শ্রমশক্তি নিজের জমিতেই কৃষি কাজ করে, শতকরা ৩৭.৯০ ভাগ শ্রমশক্তি বর্গা জমিতে কাজ করে। (এদের মধ্যে অংশবিশেষ পরিপূর্ণভাবেই বর্গাচাষ করে এবং অংশ বিশেষ নিজের জমির পাশাপাশি বর্গাজমিতে কাজ করে), শতকরা ১৫.৮২ ভাগ ক্ষেত মজুরীতে নিয়োজিত, শতকরা ৬.৩২ ভাগ শ্রমশক্তি অকৃষি দৈহিক শ্রমের সাথে যুক্ত, শতকরা ৬.৯৯ ভাগ শ্রমশক্তি মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত, শতকরা মাত্র ০.০২ ভাগ শ্রমশক্তি শিল্প উদ্যোগ কিংবা ব্যবসা বানিজ্যের সাথে যুক্ত এবং বাকি শতকরা ০.৬২ ভাগ শ্রমশক্তি অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত। ২১ দফা কর্মসূচীয় অন্তর্গত ৪১টি শ্রেণী-দাবীর মধ্যে শতকরা ৪৩.৯০ ভাগই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এ দাবি, শতকরা ২৪.৩৯ ভাগ

---

৭৬. Kumar, Satish (1984): 'Problems of Federal Politics in Pakistan', Pakistan: Society and Politics, South Asian Series, 6. Edited by Pondav Nayak, New Delhi: South Asian Publishers Pvt. Ltd. p. 28.

Dhaka University Institutional Repository

স্বনিয়োজিত কৃষকের দাবি, শতকরা ৯.৭৬ ভাগ বর্গা কৃষকের, শতকরা ৭.৩২ ভাগ দাবি শ্রমিক শ্রেণীর, শতকরা ২.৪৪ ভাগ দাবি ক্ষেতমজুরের, শতকরা ২.৪৪ ভাগ দাবি অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের এবং শতকরা ৯.৭৬ ভাগ দাবি শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের। এ তথ্য থেকে দেখা যায়, শতকরা ৮২.৪৪ ভাগ মানুষ সে সময় কৃষি শ্রমের সাথে যুক্ত ছিল অথচ এদের দাবি ছিল মাত্র ১৫টি, যা মোট শ্রেণী দাবির মাত্র শতকরা ৩৬.৫৯ ভাগ। অন্যদিকে, শতকরা মাত্র ৬.৯৯ ভাগ শ্রমশক্তি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত ছিল, অথচ এদের দাবি ছিল শতকরা ৪৩.৯০ ভাগ। বিস্ময়কর ব্যাপার হল এই যে, সে সময় পূর্ব পাকিস্তানে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের সংখ্যা ছিল মোট শ্রমশক্তির মাত্র শতকরা ০.০২ ভাগ অথচ এদের দাবি ছিল শতকরা ৯.৭৬ ভাগ। অর্থাৎ বিভিন্ন শ্রেণীভূক্ত মানুষের কাছে ২১ দফার গুরুত্ব অভিন্ন ছিল না। দাবিসমূহের মধ্যে শ্রেণীগত গুরুত্ব পরিমাপ করলে দেখাযায় যে, একই কর্মসূচীর মধ্যে একজন মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি যে পরিমাণ গুরুত্ব অনুভব করতো একজন বাঙালী শিল্পপতি তার চেয়ে ৭৭.৫৬ গুণ বেশি গুরুত্ব অনুভব করতো, যা' একজন স্বনিয়োজিত কৃষক একজনক্ষেত মজুরের তুলনায় যথাক্রমে ৫৭৪.৮৮ ও ৩২৫৭.৬৭ গুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য কোন শ্রেণীর আয়তন ছোট হোক আর বড় হোক, সে শ্রেণীর সপক্ষে কর্মসূচীর সংখ্যাই হচ্ছে মূল বিষয়। কিন্তু কোন শ্রেণী তার দাবি আদায় করতে সক্ষম হবে কি হবে না তা ঐ শ্রণীর আয়তনের ওপর অনেকখানি নির্ভর করে। ১৯৫৪ সালের ছোট-বড় শিল্পপতি বা ব্যবসায়ী সকল যদি এক জোট হয়েও বিচ্ছিন্নভাবে সরকারের কাছে কোন দাবি করতে চাইত তাতেও তা অর্জিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। ফলে একজন শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীর পক্ষে ২১ দফা কর্মসূচীকে যেভাবে দেখা সম্ভব ছিল অন্য শ্রেণীভূক্ত ব্যক্তির কাছে অত বেশি আন্তরিকভাবে দেখার কথা নয়। অবশ্য সংখ্যার দিক দিয়ে ২১ দফা কর্মসূচীতে মধ্যবিত্তের গুরুত্ব সর্বাধিক এবং তার পরেই স্বনিয়োজিত কৃষকদের স্থান। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, স্বনিয়োজিত কৃষকের সন্তানগণই তখন প্রথম প্রজন্মের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত। ফলে কৃষকের দাবি উক্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে আলোড়িত না করে পারেনা। আর স্বাভাবিকভাবেই নবপ্রজন্মের এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী গ্রামের উদ্বৃত্ত কৃষক পরিবারের সন্তান, তাই স্বনিয়োজিত কৃষক পরিবারের দাবি ছিল মুলতঃ এ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দাবি। যে সকল রাজনৈতিক দল নিয়ে যুক্ত ফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল তাদের শ্রেণী চরিত্র বিশ্লেষণ করলে এটা সহজেই বুঝা যাবে যে, এ সকল রাজনৈতিক দলের কোনটিই গ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা তথা দরিদ্র কৃষক বা বর্গা কৃষক ও ক্ষেত মজুরের পক্ষের রাজনৈতিক দল ছিল না। আর সে কারনেই উক্ত জনগোষ্ঠীর দাবি ২১ দফা কর্মসূচীতে সেভাবে প্রতিফলিত হয়নি। অন্যদিকে, এ সারণির তথ্য চিত্রের দিকে দৃষ্টি দিলে সহজেই অনুমান করা যায়, সামন্ত স্বার্থের কোন প্রতিফলন উক্ত কর্মসূচীর মধ্যে নেই। অর্থাৎ যুক্তফ্রন্ট নামক রাজনৈতিক জোটটি সামন্ত স্বার্থের কোন প্রতিভূ ছিল না।

সারণি ৭.১

যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচীতে শ্রেণীগত দাবিসমূহের স্বরূপ

শ্রেণীসমূহের নাম (১)	মোট শ্রমশক্তি (লক্ষ) (২)	শতকরা হার (৩)	মোট দাবী সংখ্যা (৪)	দাবীর শতকরা হার (৫)	দাবীর মধ্যে শ্রেণীগত গুরুত্বের তীব্রতা ৫ X১০০/৩	কর্মসূচীতে শ্রেণীগতগুরুত্ব
মধ্যবিত্ত শ্রেণী	১২.১৯	৬.৯৯	১৮	৪৩.৯০	৬২৮.০৪	১.২৬
শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী	.০৪	০.০২	৪	৯.৭৬	৪৮৮০০.০০	৯৭.৭৩
জোতদার/জমিদার	৬.৩০	৩.৬১	-	-	-	-
স্বনিয়োজিত কৃষক	৫০.১০	২৮.৭২	১০	২৪.৩৯	৮৪.৯২	০.১৭
বর্গা কৃষক (আংশিক বা সম্পূর্ণ)	৬৬.১০	৩৭.৯০	৪	৯.৭৬	২৫.৭৫	০.০৫
ক্ষেতমজুর	২৭.৬০	১৫.৮২	১	২.৪৪	১৫.৪২	০.০৩
শ্রমিক	১১.০০	৬.৩২	৩	৭.৩২	১১৫.৮২	০.২৩
অন্যান্য ১.০৯	০.৬২	১	২.৪৪	২৬৪.২২	৬.৫৩	
মোট	১৭৪.৪২	১০০.০০	৪১	১০০.০০	৪৯৯৩৪.১৭	১০০.০০

সূত্রঃ সারণি ৬.২ ও ৬.১৫ এর সমন্বয়ে তৈরি; দাবিগুলি নেওয়া ২১ দফা কর্মসূচী থেকে।

সূত্রঃ সারণি ৬.২ ও ৬.১৫ এব সমন্বয়ে তৈরি; দাবিগুলি নেওয়া ২১ দফা কর্মসূচী থেকে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা খুবই স্পষ্ট যে, যুক্ত ফ্রন্টের ২১ দফা ছিল মুলতঃ পূর্ব পাকিস্তানের বিকাশমান মধ্যবিত্ত, স্বনির্ভর কৃষক এবং শিল্পপতি ব্যবসায়ীদের কর্মসূচী। আর এসকল শ্রেণীই আইয়ুবের সামরিক শাসন আমলে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তথা তাদের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। অর্থাৎ ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে নির্বাচন হলে এসকল শ্রেণীভুক্ত প্রার্থীরাই অধিকাংশ বিজয়ী হত। আর এরা বিজয়ী হলে হয় এককভাবে নয় পশ্চিম পাকিস্তানের সামন্ত শ্রেণীর সাথে জোট বেধে ক্ষমতাসীন হত। তবে পূর্ব পাকিস্তানী মধ্যবিত্ত স্বনির্ভর কৃষক ও ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদেরই এককভাবে ক্ষমতাসীন হওয়ার সম্ভবনা ছিল বেশি কেননা ১৯৫৬ সালের সংবিধানে যুক্ত-নির্বাচন বিধি অনুমোদিত হয়ে গিয়েছিল। ফলে অমুসলমান সদস্যদের পক্ষে চাপ সৃষ্টির কোন সুযোগ ছিল না। সে কারণে সামরিক শাসন জারির পর প্রচন্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত উক্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণী, স্বনিয়জিত কৃষক ও শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের ভিতর সামরিক সরকারের সামাজিক ভিত্তি অনুসন্ধান করার চেষ্টা নিশ্চিতভাবেই ব্যথতায় পর্যবসিত হত। অবশ্য জোতদার শ্রেণী যুক্তফ্রন্টের রাজনীতির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে সে আমলে সীমিত বৈষয়িক সুবিধা নিয়ে টিকে ছিল। কেননা মাত্র ১০০ বিঘা জমির জোতদারী ক্ষমতা নিয়ে তাদের পক্ষে কতটুকুই ব া বিকশিত হওয়া সম্ভব ছিল।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতেই সামরিক সরকারের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্কারের ফলাফল সংক্রান্ত বিভিন্ন দিকের বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে।

চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে দেখা গেছে; আইয়ুব আমলে ভূমি সংস্কারের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলে গড়ে উঠেছে একটি শক্তিশালী পুঁজিপতি খামার মালিক শ্রেণী; অন্যদিকে, পূর্ব পাকিস্তানে তেমন কোন ভূমি সংস্কারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি, বরং জমির সিলিং ১০০ বিঘা থেকে ৩৭৫ বিঘায় বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানে জোতদার শ্রেণীর বিকাশের পথ খানিকটা উন্মুক্ত হয়েছে। উপরন্তু, খাজনার পরিমাণ তিনগুণভাবে বাড়িয়ে দিয়ে মাঝারি কৃষকদের জন্যও টিকে থাকার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করা হয়েছে। কৃষি পণ্যের মূল্য নির্ধারণ না করায় কারণে একদিকে যেমন ভোগ্যপণ্যের দাম অস্বাভাবিক মাত্রায় বেড়ে গেছে, অন্যদিকে অর্থকরী ফসলের দাম মৌসুমের সময় মাত্রাতিরিক্তভাবে হ্রাস পেয়েছে। ফলে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে একটি মহাজন ও মজুদদার শ্রেণীর জন্ম হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে প্রায় কোন রকম ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা না থাকায় মাঝারি কৃষক, এমনকি কোন কোন বছর ধনী কৃষকও মহাজনের উপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হয় এবং একারণে খুব দ্রুততার সাথে গ্রামাঞ্চলে ছোট ও মাঝারি কৃষকগণ জমি হারাতে থাকে। এভাবে ষাট

Dhaka University Institutional Repository

দশকের শেষ দিকে পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলে জোতদার শ্রেণীটি একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়। তাছাড়া, মৌলিক গণতন্ত্র নামক একটি ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে উক্ত জোতদার শ্রেণীর একাংশ এক বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক ক্ষমতাও লাভ করে। ওয়ার্কস প্রোগ্রাম ও প্রশাসনিক কর্মকান্ডের সহযোগী হিসাবে গ্রামের ক্ষমতাবান জোতদার শ্রেণীর একাংশের পাশাপাশি একটি টাউট শ্রেণীরও দ্রুত বিকাশ ঘটে। মৌলিক গণতন্ত্রীদের বিশেষ ক্ষমতা, ওয়ার্কস প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ এবং আমলাতন্ত্রের সহযোগিতা ইত্যাদির মাধ্যমে ষাট দশকে পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলে রাজনৈতিক-সামাজিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় ইউনিয়ন কাউন্সিল। প্রকৃতপক্ষে ইউনিয়ন কাউন্সিলই এপর্যায়ে আইয়ুব সরকারের গ্রামীণ প্রতিনিধিতে পরিণত হয়।

চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচনায় আরো দেখা গেছে যে,আইয়ুব আমলে পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পের অগ্রগতি প্রচন্ড গতি লাভ করে। সরকারের বিভিন্ন সংস্থা, অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান ও বৈদেশিক ঋণের সহযোগিতায় রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্প কারখানার খুব দ্রুত বিকাশ ঘটে। ১৯৬৫ সাল নাগাদ পশ্চিম পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় খাতটি এত শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে, পরবর্তী পাঁচ বছরে এ খাত তেমন কোন সহযোগিতা ছাড়াই প্রচন্ড শক্তি নিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। অন্যদিকে, ব্যক্তিখাতটিও ততদিনে তাৎপর্যপূর্ণ শক্তিশালী অবস্থান গ্রহণ করে। অধিকতর বৈদেশিক ঋণ ও সহযোগিতা পেয়ে এখাতটি দ্রত গতিতে বিকশিত হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়ে বড় কারখানাগুলিতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সংযোজনের ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি সূচীত হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পর্যন্ত এখাতে যে একটি অবাধ প্রতিযোগিতা চলছিল এবং ক্ষুদে মাঝারী শিল্পগুলিও বেশ দ্রুত বিকশিত হচ্ছিল, পরবর্তী বছরগুলিতে আর সে সুযোগ থাকেনি। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভারী শিল্পের বিকাশকে প্রধান্য দেওয়া হয়। কারণ উক্ত পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের মূল লক্ষ্য হিসাবে উল্লেখ করা হয়,

" a beginning must be made with the setting up of heavy industries notably industries to produce machinary and equipment and other capital goods"[৭৭] ফলে উন্নত প্রযুক্তি ও অধিক পুঁজির সমাহারে গঠিত বড় বড় কারখানার সাথে ছোট ও মাঝারী কারখানাগুলি প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারেনা। সে কারনে দেখা যায় ১৯৬৬ সারের পর পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা মোটেই বাড়েনি, বরং বেশ দ্রুতগতিতে কারখানার সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। নতুন নতুন পূঁজির সমাবেশ ঘটলেও কারখানাগুলিতে কর্মক্ষেত্র মোটেও বাড়েনি। বরং উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে কিছু দক্ষ ও নূতন লোকের কর্মসংস্থান হলেও বিপুলসংখ্যক শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। ছোট ও মাঝারী কারখানাগুলির এক বড় অংশ বন্ধ হয়ে যায়। রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিমালিকানাধীন বড় পুঁজি যৌথভাবে দেশের বাজারের ওপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

পূর্ব পাকিস্তানে ভিন্ন দিক লক্ষণীয়। দেশ বিভাগের গোড়ারদিকে এখানে তেমন কোন শিল্পোন্নয়ন ঘটেনি। প্রথম পরিকল্পনা থেকে প্রায় শূণ্য থেকে শিল্পোন্নয়ন শুরু হয় বলে খুব দ্রুত গতিতে ভারী শিল্পের অগ্রগতি সাধিত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনা পর্যন্ত ভারী শিল্প বিকাশের উচ্চহার বলবৎ থাকে। কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ভারী শিল্পের অগ্রগতি ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে। অন্যদিকে,ছোট ও মাঝারী শিল্পের অগ্রগতির হার অত্যন্ত নিম্ন স্তর থেকে ক্রমাগত বেড়ে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বেশ উচু স্তরে গিয়ে পৌঁছায়। ছোট ও মাঝারী শিল্পপতিদের অগ্রগতি কিছুটা উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছালেও বৃহৎ শিল্পের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য পর্যাপ্ত শক্তি তারা অর্জন করতে পারেনি। ভারী শিল্পগুলিই উপরোক্ত শিল্পোন্নয়ণের জন্য দেশী ও বিদেশী অর্থের প্রায় পুরোটাই লাভ করে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে হালকা ও ভারী শিল্পের মধ্যে ক্রমান্বয়ে একটি গভীরতর দ্বন্দ্ব বিকাশলাভ করে। পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও ছোট মাঝারী শিল্পের সাথে বড় ও ভারী শিল্পের প্রচন্ড বিরোধ ছিল। কিন্তু সেখানে ছোট ও মাঝারী শিল্পগুলি বড় পুঁজির কাছে হেরে গিয়ে পিছু হটছিল। পক্ষান্তরে, পূর্ব পাকিস্তানে এই ছোট মাঝারী শিল্পগুলি আত্মগত দিক দিয়ে তেমন শক্তিশালী না হলেও তাদের বিকাশের ত্বরিত গতি ছিল অব্যাহত। তাই বিকাশমান এ ছোট মাঝারি শিল্পপতিদের সাথে বড় ও ভারী শিল্পগুলির বিরোধ ষাট দশকের শেষ দিকে সুস্পষ্ট রূপ ধারন করে।

চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে উপরোক্ত বিষয়গুলি লক্ষ্য করা গেলেও পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের মধ্যে শিল্প বিকাশসহ অর্থনৈতিক অগ্রগতির তুলনামূলক কোন চিত্র পাওয়া যায় নি। উক্ত অধ্যায় দুটিতে আইয়ুব আমলে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলে শ্রেণী বিরোধের প্রকৃতি সম্পর্কে জানা গেলেও তাদের মধ্যে আন্তঃআঞ্চলিক কোন দ্বন্দ্ব ছিল কিনা তা স্পষ্ট হয়ে ফুঠে ওঠেনি। তাই বর্তমান গবেষণার জন্য সে বিষয়টি স্পষ্ট করা খুবই জরুরী। কেননা পাকিস্তান রাষ্ট্র ষাট দশকের শেষে যে ধরনের বিভিন্ন দ্বন্দ্বের মধ্যে নিপতিত হয়েছিল, যার জন্য শাসকবর্গকে পশ্চাদাপসরণ করতে হয়েছিল, সে দ্বন্দ্বের বিভিন্ন দিকটি বোঝার জন্য এ দিককে উপেক্ষা করা যায় না। অতএব এ দিকটি উন্মোচিত করার জন্য পাকিস্তানের দু'অংশের বানিজ্যিক ভারসাম্য, আয়-ব্যয়, উৎপাদন ও শিক্ষাসহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা প্রয়োজন।

৭.৪. পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়ণের বৈশিষ্ট্যঃ

আইয়ুবের সামরিক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করেই পাকিস্তানের দু'অংশের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্যকে দূর করার ঘোষণা দিয়েছিল কিন্তু কঠোর সামরিক শাসনামলে রাজনৈতিক দল কিংবা জনসাধারণের মত প্রকাশের কোন রকম স্বাধীনতা ছিল না। আইয়ুবের ব্যক্তিগত অভিমতই তার শাসন কর্মের মধ্যে প্রতিফলিত হত। দেশ বিভাগের পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বঞ্চিত করার যে প্রক্রিয়া শুরু হয় তা তখনও অব্যাহত থাকে। সারণি ৭.২ থেকে দেখা যায়, ১৯৫৮/৫৯-১৯৬১/৬২ কালপর্বে অর্থাৎ আইয়ুবের প্রত্যক্ষ সামরিক শাসনকালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের কোন পরিবর্তন হয়নি। উক্ত চার বছরের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, এ সময়ে পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান উৎস হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান, কিন্তু ব্যয়ের প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তান। সারণি ৭.২ থেকে আরও দেখা যায়, উক্ত চার বছরে পাকিস্তান রপ্তানি বাণিজ্য থেকে অর্জন করেছে মোট ৬৮৫ কোটি ৭ লক্ষ টাকা মুল্যের বৈদেশিক মুদ্রা। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে যথাক্রমে শতকরা ৬৫.৯৮ ও ৩৪.০২ ভাগ অর্থ।

---

৭৭. Soofi, Anwar Kahn (1968): 'Evoluton of Industrial Policy and Pattern in Pakistan' Pakistan in the Development Decade- Problems and Performance, Proceedings of the Third Economic Development Seminar, Karachi, March 30- April 2, 1968, Edited by Agha M. Ghouse, Karchi: The Economic Development Seminar , P. 135.

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ৭.২
১৯৫৮–৬২ কালপর্বে পাকিস্তানের দু'অংশে আমদানি–রপ্তানি বাণিজ্যের চিত্র
(কোটি রুপীর হিসাব)

সাল	আমদানী বাণিজ্য			রপ্তানি বাণিজ্য			ব্যালান্স		
	পূর্বপাক	পশ্চিম পাক	মোট	পূর্বপাক	পশ্চিম পাক	মোট	পূর্বপাক	পশ্চিম পাক	মোট
১৯৫৮–৫৯	৫৫.৩৮	১০২.৪৬	১৫৭.৮৪	৮৮.১০	৪৪.৪৪	১৩২.৫৪	–৩২.৭২	৫৮.০২	২৫.৩০
(শতকরা হার)	(৩৫.০৯)	(৬৪.৯১)	(১০০)	(৬৬.৪৭)	(৩৩.৫৩)	(১০০)	(–১২৯.৩৩)	(+২২৯.৩৩)	(১০০)
১৯৫৯–৬০	৬৫.৫৩	১৮০.৫৭	২৪৬.১০	১০৭.৯৬	৭৬.৩০	১৮৪.২৬	–৪২.৪৩	১০৪.২৭	৬১.৮৪
(শতকরা হার)	(২৬.৬৩)	(৭৩.৩৭)	(১০০)	(৫৮.৫৯)	(৪১.৪১)	(১০০)	(–৬৮.৬১)	(+১৬৮.৬১)	(১০০)
১৯৬০–৬১	১০১.৪৫	২১৭.৩২	৩১৮.৭৭	১২৫.৯২	৫৪.০১	১৭৯.৯৩	–২৪.৪৭	৬৩.৩১	১৩৮.৮৪
(শতকরা হার)	(৩১.৮৩)	(৬৮.১৭)	(১০০)	(৬৯.৯৮)	(৩০.০২)	(১০০)	(–১৭.৬২)	(+১১৭.৬২)	(১০০)
১৯৬১–৬২	৮৭.২৯	২২৩.৬২	৩১০.৯১	১৩০.০৬	৫৪.২৮	১৮৮.৩৪	–৪২.৭৭	১৬৫.৩৪	২২.৫৭
(শতকরা হার)	(২৮.০৮)	(৭১.৯২)	(১০০)	(৬৯.০৫)	(৩০.৯৪)	(১০০)	(–৩৪.৮৯)	(+৩৪.৮৯)	(১০০)
মোট	৩০৯.৬৫	৭২৩.৯৭	১০৩৩.৬২	৪৫২.০৪	২৩৩.০৩	৬৮৫.০৭	–১৪২.৩৯	৪৯০.৯৪	৩৪৮.৫৫
	(২৯.৯৬)	(৭০.০৫)	(১০০)	(৬৫.৯৮)	(৩৪.০২)	(১০০)	(–৪০.৮৫)	(+১৪০.৮৫)	(১০০)

Source: National Assembly Procedings Debate, 10 April 1963, Vol.1. No.16, p.1544.

পাকিস্তান উক্ত চার বছরে মোট ৬৮৫ কোটি ৭ লক্ষ টাকা মূল্যের পণ্য রপ্তানি করলেও আমদানি করেছে তার চেয়েও ৩৪৮ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা মূল্যের বেশী পণ্য; অর্থাৎ এসময়ে পাকিস্তানের আমদানীকৃত পণ্যের মোট মূল্য হচ্ছে ১০৩৩ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা। রপ্তানির ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান শতকরা ৬৬ ভাগ অবদান রাখলেও আমদানীর ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান পেয়েছে মাত্র শতকরা ৩০ ভাগ; অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান মোট রপ্তানির ক্ষেত্রে এ সময় মাত্র শতকরা ৩৪ ভাগ আবদান রাখলেও সেখানেই আমদানি হয়েছে পাকিস্তানের মোট আমদানিকৃত পণ্যের শতকরা ৭০ ভাগ। সারণি ৭.২ এর তথ্য থেকে তাই দেখা যায়, ১৯৫৮ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত চার বছরে পূর্ব পাকিস্তান তার মোট রপ্তানি আয় থেকে মোট ১৪২ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা হারিয়েছে; পক্ষান্তরে, পশ্চিম পাকিস্তান তার মোট রপ্তানি আয়ের একটি টাকাও হারায়নি; উপরন্তু মোট ৪৯০ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত অর্থের বৈদেশিক পণ্য অর্জন করেছে। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তান আমলের গোড়া থেকেই যে বঞ্চিত হয়ে একটি পশ্চাদপদ প্রদেশে পরিণত হয়েছে তা আইয়ুবের সামরিক শাসনের প্রথম চার বছরে আরো তীব্র আকার ধারণ করে।

সারণি ৭.৩
১৯৫৯/৬০–১৯৮৬/৬৯ কালপর্বে পূর্ব পাকিস্তানের আমদানি–রপ্তানি বাণিজ্যের চিত্র
(কোটি টাকার হিসাব)

সাল	মোট রপ্তানী			মোট আমদানি			বাণিজ্যিক ভারসাম্য		
	পশ্চিম পাকিস্তান	অন্যান্য বিশ্ব	মোট	পশ্চিম–পাকিস্তান থেকে	অন্যান্য বিশ্ব থেকে	মোট	পশ্চিম পাকিস্তান	অন্যান্য বিশ্ব থেকে	মোট
১৯৫৯–৬০	৩৬.২	১০৭.৯	১৪৪.১	৫৬.৩	৬৫.৫	১২১.৮	–০.১	+৪২.৪	+২২.৩
১৯৬০–৬১	৩৬.৪	১২৫.৯	১৬২.৩	৮১.৭	১০১.৪	১৮৩.১	–৪৫.৩	+২৪.৫	–২২.৮
১৯৬১–৬২	৪০.২	১৩০.১	১৭০.৩	৮৫.৫	৮৭.৩	১৭২.৮	–৪৫.৩	+৪২.৮	২.৫
১৯৬২–৬৩	৪২.৫	১২৪.৯	১৬৭.৪	৮৬.৫	১০১.৯	১৮৮.৪	–৪৪.০	+২৩.০	–২১.০
১৯৬৩–৬৪	৫১.১	১২২.৪	১৭৩.৫	৮৯.৫	১৪৪.৯	২৩৪.৪	–৩৮.৪	–২২.৫	–৬০.৯
১৯৬৪–৬৫	৫৩.৭	১২৬.৮	১৮০.৫	৮৭.৫	১৭০.২	২৫৭.৭	–৩৩.৮	–৪৩.৪	–৭৭.২
১৯৬৫–৬৬	৬৫.২	১৫১.৪	২১৬.৬	১২০.৯	১৩২.৮	২৫৩.৭	–৫৫.৭	+১৮.৬	–৩৭.১
১৯৬৬–৬৭	৭৩.৯	১৫৭.৫	২৩১.৪	১৩২.৫	১৫৬.৭	২৮৯.২	–৫৮.৫	+০.৮	–৫৭.৭
১৯৬৭–৬৮	৭৮.৫	১৪৮.৪	২২৬.৯	১২৩.৩	১৩২.৭	২৫৬.১	–৪৪.৮	+১৫.৭	–২৯.২
১৯৬৮–৬৯	৮৭.০	১৫৪.৩	২৪১.৩	১৩৮.৫	১৮৫.০	৩২৩.৫	–৫১.৫	–৩০.৭	–৮২.২
জুলাই–ডিসেম্বর–১৯৬৮	৪৬.৪	৮০.১	১২৬.৫	৬৫.৪	৯২.৫	১৫৭.৯	–১৯.০০	–১২.৪	–৩১.৪
জানুয়ারী–জুন– ১৯৬৯	৪০.৬	৭৪.২	১১৪.৮	৭৩.১	৯২.৫	১৬৫.৬	–৩২.৫	–১৮.৩	–৫০.৮
মোট (১৯৫৯/৬০–১৯৬৮/৬৯)	৫৬৪.৭	১৩৪৯.৬	১৯১৪.৩	১০০২.২	১২৭৪.৪	২২৮০.৬	–৪৩৭.৪	+৭১.২	–৩৬৬.৩

Source: Planning Department, Government of Pakistan (1970): Economic Survey of East Pakistan 1969-70., Dacca: East Pakistan Govt. Press. Compiled from Table No. 7 and 8, pp.109-110.

পূর্ব পাকিস্তানের এরূপ বঞ্চনা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের এরূপ বাড়তি লাভ অব্যাহত থাকার কারণে পরবর্তীকালে যখন বিদেশে রপ্তানির তুলনায় আমদানির পরিমাণ কিছুটা বেড়েছে তখনও পূর্ব পাকিস্তানের নীট ক্ষতির পরিমাণ একটুও হ্রাস পায়নি। সারণি–৭.৩ থেকে দেখা যায়, পূর্ব পাকিস্তান ১৯৫৯–৬০ থেকে ১৯৬৮–৬৯ এই ১০ বছরে মোট ২ হাজার ২৮০ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার পণ্য আমদানী করেছে এবং ১ হাজার ৯১৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার পণ্য রপ্তানি করেছে। অর্থাৎ এ সময়ে তার রপ্তানির চেয়ে আমদানির পরিমাণ ৩৬৬ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা বেশী। ১৯৬২–৬৩ অর্থবছরের পর বিদেশ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের আমদানির পরিমাণ রপ্তানির তুলনায় কিছুটা বেড়েছে, কিন্তু বিদেশ থেকে আমদানির পরিমাণ যতটা তার থেকে অনেক বেশি হারে বেড়েছে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে তার আমদানির পরিমাণ। ১৯৫৯–৬০ অর্থবছরে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানের আমদানির পরিমাণ ছিল মোট ৫৬ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার পণ্য এবং তা অব্যাহতভাবে বেড়ে ১৯৬৪–৬৫ অর্থবছরের পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার পণ্যে। এর পরের বছরই তা হঠাৎ করে বেড়ে গিয়ে ১২০ কোটি ৯০ লক্ষ টাকায় পৌঁছায়। পরবর্তীকালে তা আরো বেড়ে গিয়ে ১৯৬৮–৬৯ অর্থবছরে গিয়ে ১৩৮ কোটি ৬০ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৫৯/৬০ থেকে ১৯৬৮/৬৯ অর্থবছর এই ১০ বছরে সব কিছু মিলিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

বর্হিবিশ্বে পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণ পণ্য রপ্তানি করেছে তার থেকে ৭১ কোটি ২০ লক্ষ টাকার পণ্য কম আমদানী করেছে। অবশ্য ১৯৬৩-৬৪ সালের পর থেকে তার বিদেশে রপ্তানির পরিমাণ আমদানির তুলনায় বেশি নয়, বরং অনেক কম। এবছরগুলিতে আমদানির পরিমাণ রপ্তানির চেয়ে মোট ৯২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বেশী। অন্যদিকে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানের রপ্তানির চেয়ে আমদানির পরিমাণ ৪৩৭ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা বেশী।

সারণি ৭.৪

১৯৫৪/৫৫-১৯৬৯/৭০ কালপর্বে পাকিস্তান ও অন্যান্য দেশ থেকে বিভিন্ন ধরনের পণ্য আমদানির খতিয়ান

(১৯৫৯/৬০ সালের মূল্যকে স্থায়ী মূল্য হিসাবে ধরে কোটি টাকার হিসাব)

কাল পর্ব	ভোগ্য পণ্য			কাঁচা মাল		
	বিদেশ	পশ্চিম পাকিস্তান	মোট	বিদেশ	পশ্চিম পাকিস্তান	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৯৫৪/৫৫-১৯৫৭/৫৮	৭৯.৯৮	৯১.৪১	১৭১.৩৯	৫৮.০৭	১০২.৮০	১৬০.৮৭
শতকরা হার (%)	(৪৬.৬৭	(৫৩.৩৩)	(১০০.০০)	(৩৬.১০)	(৬৩.৮০)	(১০০.০০)
১৯৫৮/১৯৬১/৬২	৭৯.৫৪	১২৫.২৬	২০৪.৮০	১০২.৮৭	১৪৯.৫৮	২৫২.৪৫
শতকরা হার(%)	(৩৭.৮৪)	(৬১.১৬)	(১০০.০০)	(৪০.৭৫)	(৫৯.২৫)	(১০০.০০)
১৯৬২/৬৩-১৯৬৫/৬৬	১০৬.১১	১৭৮.৫৩	২৮৪.৬৪	১৫৯.৩৫	১৫২.৬২	৩১১.৯৭
শতকরা হার(%)	(৩৭.৮৪)	(৬২.৭২)	(১০০.০০)	(৫১.৫০)	(৫৯.২৫)	(১০০.০০)
১৯৬৬/৬৭-১৯৬৯/৭০	১৫৮.১৪	১৯৮.৫৪	৩৫৬.৭২	১৬৫.৮৯	২০১.৫৪	৩৬৭.৪৩
শতকরা হার (%)	(৪৪.৩৩)	(৫৫.৬৭)	(১০০.০০)	(৪৫.১৫)	(৫৪.৮৫)	(৩৬৭.৪৩)
১৯৫৪/৫৫-১৯৬৯/৭০	৪২৩.৭৭	৫৯৩.৭৪	১০১৭.৫১	৪৮৬.১৮	৬০৫.৫৪	১০৯২.৭২
শতকরা হার (%)	(৪১.৬৫)	(৫৮.৬৫)	(১০০.০০)	(৪৪.৪৯)	(৫৫.৫১)	(১০০.০০)

সারণি ৭.৪ (ক্রমশ)ঃ

কাল পর্ব	পুঁজি পণ্য			মোট আমদানী		
	বিদেশ	পশ্চিম পাকিস্তান	মোট	বিদেশ	পশ্চিম পাকিস্তান	মোট
১	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১৯৫৪/৫৫-১৯৫৭/৫৮	৫৬.৮৬	৫.৮৫	৬২.৭১	১৯৪.৯১	২০০.০৬	৩৯৪.৯৭
শতকরা হার (%)	(৯০.৬৭)	(৯.৩৩)	(১০০.০০)	(৪৯.৩৫)	(৫০.৬৫)	(১০০.০০
১৯৫৮/১৯৬১/৬২	১০৫.৩৪	১৭.০৩	১২২.৩৭	২৮৭.৭৫	২৯১.৮৭	৫৭৯.৬২
শতকরা হার(%)	(৮৬.০৮)	(১৩.৯২)	(১০০.০০)	(৪৯.৬৪)	(৫০.৩৬)	(১০০.০০)
১৯৬২/৬৩-১৯৬৫/৬৬	২৩২.১০	২৯.২৮	২৬১.৩৮	৪৯৭.৫৬	৩৬০.৪৩	৮৫৭.৯৯
শতকরা হার(%)	(৮৮.৮০)	(১১.২০)	(১০০.০০)	(৫৭.৯৯)	(৪২.০১)	(১০০.০০)
১৯৬৬/৬৭-১৯৬৯/৭০	৪৬৫.৫৬	৩৩.২৯	৪৯৮.৮৫	৭৮৯.৫৯	৪৩৩.৩৭	১২২২.৯৬
শতকরা হার(%)	(৯৩.৩২)	(৬.৬৭)	(১০০.০০)	(৬৪.৫৬)	(৩৫.৪৪)	(১০০.০০)
১৯৫৪/৫৫-১৯৬৯/৭০	৮৫৯.৮৬	৮৫.৪৫	৯৪৫.৩১	১৭৬৯.৮১	১২৮৫.৭৩	৩০৫৫.৫৪
শতকরা হার (%)	(৯০.৯৬)	(৯.০৪)	(১০০.০০)	(৫৭.৯২)	(৪২.০৮)	(১০০.০০)

Source: Mohiuddin Alamgir & Lodewijk J.I.B. Berlage (1979): Bangladesh National Income and Expenditure 1949/50-1969/70. Dacca: BIDS, compiled from Table No. 26,pp.223-226.

রপ্তানির তুলনায় আমদানির পরিমাণ বেশী বা কম কোন অঞ্চলের ভাল কি মন্দকে নির্দেশ করে না। এটা বোঝার ক্ষেত্রে মাপকাঠি হচ্ছে কি ধরনের পণ্য আমদানি করা হচ্ছে বা রপ্তানি করা হচ্ছে। যদি কাঁচামাল রপ্তানি করে অধিক হারে পাকামাল, বিশেষতঃ ভোগ্যপণ্য আমদানি করা হয়, তা কোন অঞ্চলের জন্যই লাভজনক কিছু নয়, কেননা এ আমদানির মাধ্যমে অঞ্চলটির নৈমিত্তিক প্রয়োজন মিটানো হয় বটে, কিন্তু তা থেকে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে কোন অগ্রগতি ঘটে না। অন্যদিকে, কাঁচামাল বা পাকামাল রপ্তানি করে যদি পুঁজিপণ্য তথা বাড়তি উৎপাদনে সহায়ক কোন পণ্য আমদানি করা যায় তাহলে অবশ্যই অঞ্চলটির জন্য লাভজনক হয়। কারণ এ আমদানি তাকে অনেক বেশী পরিমাণে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সক্ষম করবে যা তার অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মিটাতে কিংবা রপ্তানি বাণিজ্যের সহায়ক হবে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের বাণিজ্যে তেমন কোন লাভ হয়নি, বরং পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ক্রমাগত অধিক হারে ভোগ্যপণ্য আমদানি করেছে। অবশ্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে কাঁচামালও প্রচুর পরিমাণে আমদানি হয়েছে। ১৯৬৬/৬৭ অর্থবছরের পূর্ব পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানথেকে কাঁচামাল আমদানির আনুপাতিক হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকলেও শেষ বছরগুলিতে আবার বাড়তে থাকে। তবে যে সকল শিল্পের জন্য উক্ত কাঁচামাল আমদানি করা হত তার প্রধান অংশের মালিকানা কাদের ছিল সে সম্পর্কে যখন আলোচনা করা হবে তখন বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়ে উঠবে। যাহোক, সারণি ৭.৪ থেকে দেখা যায়, পূর্ব পাকিস্তান ১৯৫৪/৫৫ সন থেকে ১৯৬৯/৭০ সন পর্যন্ত মোট ৩ হাজার ৫৫ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকার পণ্য আমদানি করেছে; এর মধ্যে শতকরা ৫৭·৯২ ভাগ মূল্যের পণ্য বর্হিবিশ্ব থেকে আমদানি করেছে এবং বাকি শতকরা ৪২·০৮ ভাগ মূল্যের পণ্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমদানি করা হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান বিদেশ থেকে এ কালপর্বে মোট যে১২৮৫ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকার পণ্য আমদানি করেছে তার শতকরা ৪৮.৫৮ ভাগ পণ্যের প্রকৃতি হচ্ছে পুঁজি পণ্য (Capital goods), শতকরা ২৭.৪৭ ভাগ পণ্যের প্রকৃতি হচ্ছে কাঁচামাল এবং শতকরা ২৩.৯৪ ভাগ পণ্যের প্রকৃতি হচ্ছে ভোগ্যপণ্য। ১৯৫৪/৫৫ থেকে ১৯৫৭/৫৮ কালপর্বে পূর্ব পাকিস্তানের বর্হিবিশ্ব থেকে আমদানি করা পণ্যের শতকরা ২৯.১৭ ভাগ ছিল পুঁজি পণ্য. শতকরা ২৯.৭৯ ভাগ ছিল কাঁচামাল এবং শতকরা ৪১.০৩ ভাগ ছিল ভোগ্যপণ্য। এর পর থেকে বর্হিবিশ্ব থেকে পুজি পণ্য আমদানির হার বাড়তে থাকে এবং ১৯৬৬/৬৭-১৯৬৯/৭০ কালপর্বে বহির্বিশ্ব থেকে মোট আমদানির শতকরা ৫৮.৯৬ ভাগই ছিল পুজি পণ্য এবং ভোগপণ্যের আমদানি ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে। আর এর ফলে এখাতটি ক্রমাগত পশ্চিম পাকিস্তানে করায়ত্ত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কাঁচামাল আমদানির আনুপাতিক হার ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে। ১৯৫৪/৫৫-১৯৫৭/৫৮ কালপর্বে পূর্ব পাকিস্তানের মোট আমদানিকৃত ভোগ্যপণ্যের শতকরা ৫৩.৩৩ ভাগ এবং কাঁচামালের শতকরা ৬৩.৮০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমদানি করা হত। কিন্তু পরবর্তী চার বছরে পূর্ব পাকিস্তানের আমদানিকৃত ভোগ্যপণ্যের

Dhaka University Institutional Repository

শতকরা ৬১.১৬ ভাগ এবং কাঁচামালের শতকরা ৫৯.২৫ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমদানি করা হয়েছে। অর্থাৎ আগের চার বছরের তুলনায় উক্ত চার বছরে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ভোগ্যপণ্য আমদানির পরিমাণ বিপুলভাবে বেড়েছে এবং কাঁচামাল আমদানি বেশ কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। এর পরবর্তী চার বছরে অর্থাৎ ১৯৬২/৬৩-১৯৬৫/৬৬ কালপর্বে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমদানিকৃত ভোগ্যপণ্যের আনুপাতিক হার আরো বেড়ে গেছে। অন্যদিকে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানের আমদানিকৃত কাঁচামালের পরিমাণ আগের চেয়েব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়ে শতকরা ৪৮.৯২ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য এর পরের বছরগুলিতে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানের ভোগ্যপণ্য আমদানির হার যেমন কিছুটা হ্রাস পেয়েছে তেমনই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কাঁচামাল আমদানির পরিমাণ কিছুটা বেড়েছে। অর্থাৎ ১৯৬৬ সালের পর থেকে ভোগ্যপণ্য ও কাঁচামাল আমদানীর ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষে একটি ইতিবাচক অবস্থা সৃষ্টি হয়। সারণি ৭.৪ থেকে দেখা যায়,১৯৫৪/৫৫-১৯৫৭/৫৮ কালপর্বে পূর্ব পাকিস্তান তার সমুদয় আমদানির শতকরা ৪৩.৩৯ ভাগ ভোগ্যপণ্য, শতকরা ৪০.৭৩ ভাগ কাঁচামাল এবং শতকরা মাত্র ১৫.৮৮ ভাগ পুঁজি পণ্য আমদানি করতো। কিন্তু ১৯৬৬/৬৭-১৯৬৯/৭০ কালপর্বে এঅবস্থাটি পরিবর্তিত হয়ে যায়। এসময়কালে পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র আমদানির শতকরা ২৯.১৭ ভাগ ভোগ্যপণ্য, শতকরা ৩০.০৪ ভাগ কাঁচামাল এবং শতকরা ৪০.৭৯ ভাগ পুঁজিপণ্য ছিল। অবশ্য শেষের বছরগুলিতে এ ধরনের পরিবর্তন হলেও আইয়ুবের সামরিক শাসনের প্রথম চার বছর কিংবা পরবর্তী চার বছরে এরূপ পরিবর্তন হয়নি। ১৯৬২/৬৩-১৯৬৫/৬৬ কালপর্বেও পূর্ব পাকিস্তানের মোট আমদানির শতকরা ৩০.৪৬ ভাগ ছিল পুঁজিপণ্য; এর আগের চার বছরে পুঁজিপণ্য আমদানির শতকরা হার ছিল মাত্র ২১.১১ ভাগ। অর্থাৎ উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় ১৯৬৫ সাল নাগাদ পূর্ব পাকিস্তান ভোগ্যপণ্যের ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর ভীষণভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আগে থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানে এ সকল পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রচুর পরিমাণে শিল্প গড়ে উঠেছিল। আর এসব শিল্প পণ্যের একটি বড় বাজার ছিল পূর্ব পাকিস্তান। ধারাবাহিকভাবে প্রচলিত এরূপ অসম বাণিজ্য মূলত ঔপনিবেশিক চরিত্রের রূপ ধারণ করে। কেননা একই দেশের একাংশের রপ্তানি করা অর্থ নিয়ে যখন অপরাংশের শিল্প ও কৃষির সমৃদ্ধি ঘটানো হয় এবং প্রধান রপ্তানিকারক অঞ্চলকে বৈজ্ঞানিক চাষাবাদও শিল্পোন্নয়নের দিক থেকে নিম্ন স্তরে রেখে উক্ত শিল্পোন্নত অঞ্চলের উৎপাদিত ভোগ্যপণ্য ও কাঁচামালকে অনুন্নত অঞ্চলে বিক্রি করার ব্যবস্থা করা হয়, তখন ঔপনিবেশিক শোষণের প্রকৃতির সাথেই এটি সমান্তরাল হয়ে ওঠে। পূর্ব পাকিস্তানের রপ্তানি বাণিজ্যের দিকে দৃষ্টি দিলেও অভিন্ন চিত্র ফুটে ওঠে।

সমগ্র পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানের রপ্তানিপণ্য বলতে পাট, চা ও চামড়াসহ অন্যান্য কৃষিপণ্য ছাড়া তেমন কিছুই ছিল না। অর্থাৎ অত্যন্ত পশ্চাদপদ কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে পণ্য রপ্তানির প্রধান অংশই যে কাঁচামাল হবে তা বলাই বাহুল্য। আর এ কাচামাল ক্রমাগত পশ্চিম পাকিস্তানে অধিক হারে রপ্তানি হতে থকে।

সারণি ৭.৫

১৯৫৪/৫৫-১৯৬৯/৭০ কালপর্বে পাকিস্তান ও অন্যান্য দেশে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন ধরণের পণ্য রপ্তানির খতিয়ান (১৯৫৯/৬০ সালের মূল্যকে স্থায়ী ধরে কোটি টাকা)

	কাল পর্ব মোট	বিদেশ	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৫৪/৫৫-১৯৫৭/৫৮	৩৭৪.৫ ১১৯.৩	৪৯৩.৮	
শতকরা হার (%)	(৭৫.৮৪)	(২৪.১৬)	(১০০.০০)
১৯৫৮/৫৯-১৯৬১/৬২	৩৬১.৬ ১৩৯.৭	৫০১.৩	
শতকরা হার(%)	(৭২.১৩)	(২৭.৮৭)	(১০০.০০)
১৯৬২/৬৩-১৯৬৫/৬৬	৪১৪.৯ ১৯৫.৭	৬১০.৬	
শতকরা হার(%)	(৬৭.৯৫)	(৩২.০৫)	(১০০.০০)
১৯৬৬/৬৭-১৯৬৯/৭০	৪৪৩.২ ২৩৭.৭	৬৮০.৯	
শতকরা হার (%)	(৬৫.০৯)	(৩৪.০৯)	(১০০.০০)
১৯৫৪/৫৫-১৯৬৯/৭০	১৫৯৪.২	৬৯২.৪	২২৮৬.৬
শতকরা হার (%)	(৬৯.৭২)	(৩০.২৮)	(১০০.০০)

Source: Mohiuddin Alamgir & LodewijK J.J.B. Berlage (1974): Bangladesh National Income and Expenditure 1949/50-1969/70. Dacca: BIDS, Table 28,p.231.

সারণি-৭.৫ থেকে দেখা যায়, ১৯৫৪/৫৫-১৯৬৯/৭০ কালপর্বে পূর্ব পাকিস্তান থেকে মোট ২ হাজার ২৮৬ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে। এর মধ্যে শতকরা ৬৯.৭২ ভাগ রপ্তানি হয়েছে বহির্বিশ্বে এবং শতকরা ৩০.২৮ ভাগ রপ্তানি হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে। পশ্চিম পাকিস্তানে রপ্তানির এ হার ছিল ১৯৫৪/৫৫-১৯৫৭/৫৮ কালপর্বে শতকরা ২৪.১৬ ভাগ, ১৯৫৮/৫৯-১৯৬১/৬২ কালপর্বে শতকরা ২৭.৮৭ ভাগ,১৯৬২/৬৩-১৯৬৫/৬৬ কালপর্বে শতকরা ৩২.০৫ ভাগ এবং ১৯৬৬/৬৭-১৯৬৯/৭০ কালপর্বে শতকরা ৩৪.০৯ ভাগ। ১৯৫৯/৬০ সালের মূল্যকে স্থায়ী মূল্য হিসাবে ধরে ১৯৫৪/৫৫-১৯৫৭/৫৮ এই চার বছরের তুলনায় ১৯৬৬/৬৭-১৯৬৯/৭০ এই চার বছরে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ঠিক দ্বিগুণ মূল্যের পণ্য পশ্চিম পাকিস্তানে রপ্তানি হয়েছে। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান থেকে ক্রমাগত বেশী হারে কাঁচামাল পশ্চিম পাকিস্তানে রপ্তানি হয়েছে, আর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ক্রমাগত বেশী হারে পাকামাল পূর্ব পাকিস্তানে আমদানি হয়েছে। এভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের মত একটি বড় ও অগ্রসর অর্থনীতির সাথে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষুদ্র ও পশ্চাদপদ অর্থনীতি যুক্ত হওয়ার কারণে পূর্ব পাকিস্তান স্থায়ীভাবে প্রতিকূল বাণিজ্যিক ভারসাম্যের নিগড়ে আবদ্ধ হয়। ফলে পাকিস্তান আমলের শেষ বছরগুলিতে পূর্ব পাকিস্তান শিল্প ও কৃষি উৎপাদনে কিংবা সরকারী বিনিয়োগের দিক থেকে কিছুটা ভাল অবস্থায় আসলেও বাণিজ্যিক ভারসাম্যের দিক থেকে সে ক্রমেই পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানসহ সমগ্র পাকিস্তান যেমন এক সময় বহির্বিশ্বের সাথে খুবই প্রতিকূল বাণিজ্যিক ভারসাম্যেরমধ্যে বিরাজ করতো, পাকিস্তানের শেষ বছরগুলিতে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের সে প্রতিকূল ভারসাম্যমূলক অবস্থা শুরু হয়। অন্যদিকে, বহির্বিশ্বের সাথে তার বাণিজ্যিক ভারসাম্যের ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক অবস্থা সৃষ্টি হতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ৭.৬

১৯৫৯/৬০–১৯৬৮/৬৯ কালপর্বে পূর্ব পাকিস্তান ও অন্যান্য দেশে বিভিন্ন ধরণের পণ্য রপ্তানীর বতিয়ান (প.পাকিস্তান থেকে আয় বাদে)(কোটি টাকার হিসাব)

বছর	কাঁচা পাট	পাটজাত পণ্য	অন্যান্য	মোট রপ্তানি
১৯৫৯–৬০	৭২.৯	২২.৭	১২.৩	১০৭.৯
১৯৬০–৬১	৮৪.৯	৩১.১	৯.৯	১২৫.৯
১৯৬১–৬২	৮৫.০	৩১.৯	১৩.২	১৩০.১
১৯৬২–৬৩	৭৯.৩	৩০.৬	১৫.০	১২৪.৯
১৯৬৩–৬৪	৭৫.৩	৩১.৪	১৫.৭	১২২.৭
১৯৬৪–৬৫	৮৪.৫	২৯.৩	১৩.০	১২৬.৮
১৯৬৫–৬৬	৮৬.৩	৫৬.৫	৮.৬	১৫১.৪
১৯৬৬–৬৭	৮৭.০	৫৬.৮	১৩.৭	১৫৭.৫
১৯৬৭–৬৮	৭৫.৯	৬০.৫	১২.০	১৪৮.৪
১৯৬৮–৬৯	৭৩.১	৬৫.৬	১৫.৬	১৫৪.৩
মোট (১৯৫৯/৬০–১৯৬৮/৬৯)	৮০৪.২	৪১৬.৪	১২৯.০	১৩৪৯.৬
শতকরা হার (%	(৫৯.৫৯)(৩০.৮৫)	(৯.৫৬)	(১০০.০০)	

Source: Planning Department Government of Pakistan (1970): Economic Survey of East Pakistan 1969-70. Dacca: East Pakistan Govt. Press. Table No.9, p. 111.

সারণি–৭.৬ থেকে দেখা যায়, ১৯৫৯/৬০ অর্থবছরেও পাকিস্তানের বাইরে তথা বহির্বিশ্বে পূর্ব পাকিস্তানের মোট রপ্তানির পরিমাণ হচ্ছে ১০৭ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা, তার মধ্যে মাত্র ২২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা বা শতকরা মাত্র ২১.০৩ ভাগ হচ্ছে পাটজাত শিল্পপণ্য আর শতকরা ৬৭.৫৬ ভাগ হচ্ছে কাঁচাপাট। পরবর্তী বছরগুলিতে, বিশেষ করে ১৯৬৫–৬৬ অর্থবছর থেকে দ্রুত এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে এবং ১৯৬৮–৬৯ অর্থবছরে বিদেশে কাঁচাপাট রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়ায় মোট রপ্তানির শতকরা ৪৭.৩৮ ভাগে। অন্যদিকে, প্রায় সমপরিমাণ অর্থের পাটজাত শিল্পপণ্য এবছর বিদেশে রপ্তানি হয় এবং পাটজাত শিল্পপণ্যের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় পূর্ব পাকিস্তানের মোট বহির্বিশ্বে রপ্তানির শতকরা ৪২.৫ ভাগ। ১৯৫৯–৬০ অর্থবছরে যে পরিমাণ পাটজাত শিল্পপণ্য বহির্বিশ্বে রপ্তানি করা হয়েছিল ১০ বছর পর অর্থাৎ ১৯৬৮/৬৯ অর্থবছরে তার পরিমাণ প্রায় তিন গুণ বেড়ে যায়। এভাবে পূর্ব পাকিস্তানের সাথে বহির্বিশ্বের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ক্রমে ভারসাম্যমূলক অবস্থার দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু আরো যে সকল ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান বহির্বিশ্বের ওপর নির্ভরশীল ছিল, যে সকল ক্ষেত্র ক্রমে পশ্চিম পাকিস্তান দখল করে নেয়। ফলে পূর্ব পাকিস্তান ক্রমে বহির্বিশ্বের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে থাকে।

শুধু মাত্র রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই যে পূর্ব পাকিস্তান প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয় তাই নয়, রাজস্ব আয়েরও একটি বৃহৎ অংশ কেন্দ্রীয় খাতের নামে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যাবার ধারা আইয়ুবের প্রত্যক্ষ সামরিক শাসনের পরও অব্যাহত থাকে এবং কখনও কখনও মোট রাজস্ব আয়ের অর্ধেক অর্থই পূর্ব পাকিস্তানের হাত ছাড়া হয়ে যায়।

সারণি ৭.৭

১৯৫৯/৬০–১৯৬৮/৬৯ কালপর্বে পূর্ব পাকিস্তানের রাজস্ব আয়

খাতের নাম	১৯৫৭–৫৮	১৯৫৮–৫৯	১৯৫৯–৬০	১৯৬০–৬১	১৯৬১–৬২	১৯৬২– ৬৩	১৯৬৩–৬৪
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ক. প্রাদেশিক খাত							
১. ভূমি রাজস্ব	৬.৭৫	১৩.০৫	৯.৩৫	১০.৮৩	১৪.৫৫	৭.৬৬	১৩.০০
২. স্ট্যাম্প ডিউটি ও কোর্ট ফি	২.৭৭	৪.০২	৪.৩৫	৪.৬০	৪.৫৮	৪.৩৬	৪.৫০
৩. রেজিস্ট্রেশন	১.০২	১.৩৪	১.২০	১.১৮	১.১৮	১.০৯	১.১৫
৪. প্রাদেশিক আবগারি শুল্ক	১.০১	১.৩৩	০.৯৭	১.০৭	১.২৬	১.৩৭	১.৩৫
৫. কৃষিজাত আয়কর	১.৪৫	১.৯২	১.২৫	১.৫০	১.০৪	১.০৮	১.৬৪
৬. অন্যান্য কর	৯.৫৩	১৭.৮৪	১২.২৯	১৩.৮৩	৩১.৭৭	২৪.৭৮	৩০.১৭
মোট(ক)=৬৩১.৯৩(৫৯.৪৪)	২২.৫৩	৩৯.৫০	২৯.৪১	৩৩.০১	৫৪.৩৮	৪০.৩৮	৫১.৮১
খ. কেন্দ্রীয় খাত							
১.বহিঃশুল্ক	৪.৩৩	৫.১৭	৪.৭৫	৩.৫৫	৬.৬২	৪.৫৮	৪.৫৯
২. কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্ক	১.৮৪	২.৫১	২.১৬	২.৭৭	৩.১৫	৫.২৮	১৪.৭৩
৩. আয়কর	২.০৭	৩.৭৮	২.৪৪	২.৭০	৩.৫২	১১.৩২	১৮.৬৮
৪. বিক্রয় কর	২.৫৯	৩.৬২	৩.৩৭	৫.৫০	৬.২১	১৩.৯৭	৬.০৫
৫. এস্টেট ডিউটি	–	–	–	–	–	–	০.০২
৬. সম্পদ কর	–	–	–	–	–	–	–
মোট (খ)=৪৩১.২১ (৪০.৫৬)	১০.৮৩	১৫.০৮	১২.৭২	১৪.৫২	১৯.৫০	৩৬.১৫	৪৪.০৭
মোট (ক+খ)= ১০৬৩.১৪(১০০)	৩৩.৩৪	৫৪.৫৮	৪২.১৩	৪৭.৫৩	৭৩.৮৮	৭৬.৪৯	৯৫.৮৮
মোট রাজস্বের মধ্যে প্রাদেশিক খাতের অংশ (% = ক X ১০০ / ক+খ	৬৭.৫৮	৭২.৩৭	৬৯.৮১	৬৯.৪৫	৭৩.৬১	৫২.৭৪	৫৪.০৪

Source: Planning Department, Government of Pakistan (1970): Economic Survey of East Pakistan 1969-70. Dacca: East Pakistan Govt. Press. Table No. 10, p. 112.

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ৭.৭ (ক্রমশ)ঃ

খাতের নাম	১৯৬৪-৬৫	১৯৬৫-৬৬	১৯৬৬-৬৭	১৯৬৭-৬৮	১৯৬৮-৬৯
ক. প্রাদেশিক খাত					
১. ভূমি রাজস্ব	১২.১৫	১৩.৪৩	১৪.৬৯	১৪.৯১	১৩.৭৩
২. স্ট্যাম্প ডিউটি ও কোর্ট ফি	৪.৫৫	৫.৭৮	৬.৮২	৭.৪০	৮.৩৪
৩. রেজিস্ট্রেশন	১.১৯	১.৪৬	১.৭৫	১.৮২	২.১০
৪. প্রাদেশিক আবগারি শুল্ক	১.৬৪	১.৭১	১.৮১	১.৮৪	১.৮৮
৫. কৃষিজাত আয়কর	১.৪৬	১.৫৮	১.৮১	১.৭৭	১.৯৬
৬. অন্যান্য কর	৪৩.৭৭	৩৮.৫৯	৩৬.৯৬	৫৬.৪৯	৫৭.৫৮
মোট(ক)=৬৩১.৯৩(৫৯.৪৪)	৬৪.৭৬	৬২.৫৫	৬৩.৮৪	৮৪.২৩	৮৫.৫৯
খ. কেন্দ্রীয় খাত					
১.বহিঃশুল্ক					
২. কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্ক	২.৬৭	১.৪৩	১.৩৩	১.৩৬	-
৩. আয়কর	৬.০৩	৮.৯০	১২.০৫	১৩.২৩	১৩.৭৬
৪. বিক্রয় করা	২৪.৯৯	২৪.৭৮	২৭.৩৯	২৮.৭৯	
৫. এস্টেট ডিউটি	২০.০১	২৪.৮৯	১৫.৭৫	১৪.৫৬	
৬. সম্পদ কর	০০.০৬	০০.০৩	০.০২	-	
মোট (খ)=৪৩১.২১ (৪০.৫৬)	৪৫.৩৮	৫৫.৩৯	৬৩.১১	৫৭.২৯	৫৭.১৭
মোট (ক+খ)= ১০৬৩.১৪(১০০)	১১০.১৪	১১৭.৯৪	১২৬.৯৫	১৪১.৫২	১৪২.৭৬
মোট রাজস্বের মধ্যে প্রাদেশিক খাতের অংশ (%= ক X ১০০ / ক+খ	৫৮.৭০	৫৩.০৪	৫০.২৯	৫৯.৫২	৫৯.৯৫

সারণি-৭.৭ থেকে দেখা যায়, ১৯৫৭/৫৮ থেকে ১৯৬৮/৬৯ কালপর্বে পূর্ব পাকিস্তানের মোট রাজস্ব আয়ের পরিমাণ ১ হাজার ৬৩ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা, তার মধ্যে শতকরা ৪০.৫৬ ভাগ আয় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় খাতের জন্য এবং অবশিষ্ট শতকরা ৫৯.৪৪ ভাগ আয় পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক খাতে যায়। ১৯৫৭/৫৮ অর্থবছরে পূর্ব পাকিস্তান থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের মধ্যে প্রাদেশিক খাতের অংশ ছিল শতকরা ৬৭.৫৮ ভাগ। পূর্ব পাকিস্তান থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের একটা বড় অংশ বহুদিন পর্যন্ত প্রাদেশিক খাত থেকেই অর্জিত হত এবং ১৯৬১/৬২ অর্থবছরে গিয়ে তার পরিমাণ দাঁড়ায় মোট রাজস্ব আয়ের শতকরা ৭৩.৬১ ভাগ। কিন্তু তার পর থেকেই প্রাদেশিক খাত থেকে রাজস্ব আয়ের পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে এবং তা ১৯৬৬/৬৭ অর্থবছরে গিয়ে মাত্র শতকরা ৫০.২৯ ভাগে গিয়ে উপনীত হয়। আর বাকি শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ কেন্দ্রীয় খাত থেকে আসে। আভ্যন্তরীণ রাজস্ব আয়ের মধ্যে রয়েছে বহিঃশুল্ক, কেন্দ্রীয় আবগারীশুল্ক, আয়কর, বিক্রয় কর, এষ্টেট ডিউটি ও সম্পদ কর। সাধারণতাবে শহরের বিত্তবান ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরাই এসকল কর ও শুল্কের আওতায় পড়ে। অন্যদিকে, প্রাদেশিক খাতের মধ্যে রয়েছে ভূমি রাজস্ব, স্ট্যাম্প ডিউটি ও কোর্ট ফি, রেজিষ্ট্রেশন, প্রাদেশিক আবগারী শুল্ক, কৃষিজাত আয়কর ও অন্যান্য। এধরনের রাজস্ব প্রধানত গ্রামের অধিবাসীদের ওপরই বর্তায়। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, অত্যন্ত পশ্চাদপদ কৃষিখাত থেকে যে কোন পরিমান রাজস্বই কৃষকদের ওপর একটি বোঝাস্বরূপ কিন্তু শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি মানুষ তখন গ্রামে বাস করতো। বাকি যারা শহরে বাস করতো তাদেরও অধিকাংশের তখন গ্রামে বাসগৃহ ছিল এবং সেখানে থেকেও তারা রাজস্ব প্রদান করতো। এরা তুলনামূলকতাবে বিত্তবান বলে গ্রামেও এদের বেশী হারে রাজস্ব প্রদান করতে হত। অন্যদিকে, শহরে থেকেও এদেরকে বিভিন্ন ধরনের কর ও শুল্ক প্রদান করতে হত। শহরের শ্রমিক ও দরিদ্রতর লোকেরা করের আওতায় আসতো না। ফলে শহরের মধ্যবিত্ত ও অন্যান্য পেশার লোকদেরকে সমগ্র রাজস্ব আয়ের বৃহৎ অংশের বোঝা বহন করতে হত। উপরন্তু, এদের কাছ থেকে যে প্রত্যক্ষ কর নেওয়া হত তা ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য, যা তাদের কাছে ঔপনিবেশিক শোষণের এক বিশেষ রূপ হিসাবে মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। অবশ্য ১৯৬৬/৬৭ সালের পর কেন্দ্রীয় খাতের জন্য রাজস্ব আয়ের পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পেয়েছে এবং প্রাদেশিক খাতের জন্য রাজস্ব আয় আবার প্রচন্ডভাবে বেড়েছে। ১৯৬৬/৬৭ সালে যেখানে প্রাদেশিক খাতে রাজস্ব ৬৩ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা, সেখানে তার পরের বছরই এখাতে রাজস্বের পরিমাণ শতকরা প্রায় ৩২ ভাগ বেড়ে ৮৪ কোটি ২৯ লক্ষ টাকায় উপনীত হয়। এর পরের বছর প্রাদেশিক খাতে রাজস্বের পরিমাণ মোটেই হ্রাস পায়নি বরং আরো ১ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা বাড়ানো হয়েছে। অন্যদিকে, প্রধানত শহরের মানুষের কাছ থেকে সংগৃহীত কেন্দ্রীয় খাতের অধীনস্থ রাজস্বের পরিমাণ আগের বছরের তুলনায় শতকরা ৯.২৪ ভাগ হ্রাস পেয়ে ১৯৬৭/৬৮ সালে এসে ৫৭ কোটি ২৯ লক্ষ টাকাতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এর পরের বছর এ রাজস্বের পরিমাণ আরো হ্রাস পায়।

সারণি-৭.৭ কে যদি আড়াআড়িভাবে লক্ষ্য করা যায় তাহলে দেখা যাবে, আইয়ুব সরকার ক্ষমতাসীন হয়েই পূর্ব পাকিস্তানে রাজস্বের পরিমাণ বিশেষভাবে বাড়িয়ে দেয়। তার শাসনামলের প্রথম বছরই সামরিক সরকার আগের বছরের তুলনায় শতকরা ৬৩.৭১ ভাগ বেশি রাজস্ব সংগ্রহ করেছে। প্রাদেশিক খাত এবং কেন্দ্রীয় খাত উভয় ক্ষেত্রেই রাজস্বের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে কিন্তু কেন্দ্রীয় খাতের তুলনায় প্রাদেশিক খাতে রাজস্ব বৃদ্ধির হার ছিল অনেক বেশি (শতকরা ৭৫.৩২ ভাগ)। আর কেন্দ্রীয় খাতে বাড়ানো হয়েছে ৩৯.২৪ ভাগ। প্রথম দিকে কেন্দ্রীয় খাতের অধীনস্থ রাজস্ব আয় বৃদ্ধির পরিমাণ কম থাকলেও অচিরেই তা প্রচন্ডভাবে বেড়ে যায় এবং ১৯৬৬/৬৭ সালে এসে তা ১৯৫৭/৫৮ সালের তুলনায় প্রায় ছয়গুণ বৃদ্ধি পায়। কেন্দ্রীয় খাতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১৯৫৭-৫৮ অর্থবছরে ১০ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা। এর থেকে শতকরা ৪৮২.৭৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬৬/৬৭ সালে তা' ৬৩ কোটি ১১ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। অন্যদিকে, এ সময়ে প্রাদেশিক খাতের রাজস্বের পরিমাণও প্রচন্ডভাবে বাড়ানো হয়। মাত্র ১০ বছরের ব্যবধানে প্রাদেশিক খাতে রাজস্ব বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় শতকরা ২৭৯.৮৯ ভাগ। এখাতে ১৯৫৭/৫৮ সালে রাজস্বের পরিমাণ যেখানে ছিল মাত্র ২২ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা, সেখানে ১৯৬৮/৬৯ সালে এখাতে রাজস্বের পরিমাণ ৮৫ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকায় পৌঁছায়। অর্থাৎ আইয়ুব আমলে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় খাতের উভয় ক্ষেত্রে কর ও রাজস্বের পরিমাণ ভীষণভাবে বেড়ে যায়। ১৯৫৭/৫৮ সালে যেখানে পূর্ব পাকিস্তান থেকে রাজস্ব ও কর সংগ্রহ করা হয়েছিল মোট ৩৩ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা, সেখানে ১৯৬৮/৬৯ সালে মোট করও রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ ১৪২ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। অর্থাৎ মাত্র ১০ বছরের ব্যবধানে কর ও রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ শতকরা ৩২৮.১৯ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব পাকিস্তান থেকে রাজস্ব আয় এভাবে বিপুল পরিমাণে বাড়ানো হয়েছে সত্য, কিন্তু ১৯৬৮/৬৯ অর্থবছরের আগ পর্যন্ত এ অর্থ পরিপূর্ণভাবে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় করা হয়নি। পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিপুল পরিমাণের রপ্তানি থেকে প্রাপ্ত আয়ের কোন অংশ তো দূরের কথা, ১৯৫৫/৫৬ থেকে ১৯৬৭/৬৮ পর্যন্ত এই এক যুগে সময়ে রাজস্ব আয়ের তুলনায় তার ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় ৫৩ কোটি টাকা কম।

সারণি ৭.৮

১৯৫৫/৫৬–১৯৬৮/৬৯ কাল পর্বে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের খাতওয়ারী বিবরণ

(কোটি টাকার হিসেবে)

খাতের নাম	১৯৫৫–৫৬	১৯৫৯–৬০	পরিবর্তনের হার(%	১৯৬০–৬১	১৯৬৪–৬৫	পরিবর্তনের হার (%	১৯৬৫–৬৬	১৯৬৬–৬৭	১৯৬৭–৬৮	১৯৬৮–৬৯
ক. মোট রাজস্ব আয় (১+২+৩)	৩১.৯৫	৪২.১৩	৩১.৮৬	৪৭.৫৩	১১০.৩৯	১৩২.২৫	১১৭.৯৪	১২৬.৯৫	১৪১.৫২	১৪২.৭৬
(১) প্রাদেশিক খাত থেকে আয়	১১.৬৮	১৭.১২	৪৬.৫৭	১৯.১৮	২০.৮৪	৮.৬৫	২৩.৯৬	৩২.০৯	৩৩.৯৫	৩৪.৬৫
(২) কেন্দ্রীয় উৎস থেকে আয়	১১.২৮	১২.৭২	১২.৭৬	১৪.৫২	৪৫.৩৮	২১২.৫৩	৫৫.৩৯	৬৩.১১	৫৭.২৯	৫৭.১৭
(৩) অন্যান্য উৎস থেকে আয়	৮.৯৯	১২.২৯	৩৬.৭০	১৩.৮৩	৪৪.১৭	২১৯.৩৮	৩৮.৫৯	৩১.৭৫	৫০.২৮	৫০.৯৪
খ. মোট রাজস্ব ব্যয় (১+২+৩+৪+৫+৬+৭+৮)	২৮.৫১	৩৭.৮৯	৩২.৫২	৪৭.০৯	১০৫.৫৯	১২৪.২৩	১১৩.১৩	১১৬.৬১	১৩৬.৩৪	১৬৭.৯৮
(১) রাজস্ব	৩.০১	৫.৭০	৮৯.৩৬	৬.০০	১১.০৮	৮৪.৬৭	১০.৬১	১১.২৬	৯.৭০	৮.২৭
(২) ঋণ দান (Debt service)	২.৯৮	২.৩৬	–২০.৮১	০.৪৬	২০.৬৭	৩৯৩.৪৮	২৬.৫৫	৩২.২৭	৩৯.৮৯	৪৮.১১
(৩) গণপ্রশাসন	২.৩৬	২.৫১	৬.৩৫	২.৭৯	৩.৯৯	৪৩.০১	৪.০৫	৪.১১	৫.০১	৫.১৯
(৪) পুলিস	৫.০৫	৫.৯৫	১৫.৮৪	৫.৩০	৯.২৩	৭৪.১৫	৯.৫৮	৭.৯৯	৮.৫৮	৯.৪৬
(৫) শিক্ষা	২.৬৫	২.৫২	–৪.৯১	৬.২৫	৯.৫৩	৫২.৪৮	১২.১৮	১৩.৮০	১৫.০৯	১৮.২০
(৬) স্বাস্থ্য	০.৯৬	২.০০	১০৮.৩৩	২.৮১	৫.১৬	৮৩.৬৩	৫.০৫	৫.০৫	৬.১৮	৬.৫৯
(৭) উন্নয়ন	৩.৫৬	৭.৪১	১০৮.১৪	১০.৯৮	২৭.৮১	১৫৩.২৮	২২.৬৩	৩৩.১২	৩৭.৩৬	৬৮.২১
(৮) অন্যান্য	৭.৯৪	৯.৫৪	২৬.১৫	১২.৫০	১৮.১২	৪৪.৯৬	২২.৪৮	৯.৭৬	১৪.৬৩	৩.৯৫
ব্যালান্স	৩.৪৪	৪.২৪	–	০.৪৪	৪.৮	—	৪.৮১	১০.৩৪	৫.১৮	–২৫.২২

Source: Planning Department, Government of Pakistan (1970): Economic Survey of East Pakistan 1969-70. Dacca: East Pakistan Govt. Press. Table No. 11, p. 113.

সারণি–৭.৮ থেকে দেখা যায়, ১৯৫৫–৫৬ অর্থবছরে পূর্ব পাকিস্তান থেকে মোট রাজস্ব আয় হয়েছে মোট ৩১ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু সে বছর রাজস্ব ব্যয় হয়েছে মোট ২৮ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ আয়ের তুলনায় ব্যয়ের পরিমাণ ৩ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা কম। ১৯৫৯/৬০ অর্থবছরে রাজস্ব আয়ের তুলনায় ব্যয়ের পরিমাণ আরো কম। এ বছরও আয় থেকে মোট ৪ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা কম খরচ করা হয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তানের রাজস্ব আয়ের উৎস ছিল তিনটি, ১. প্রাদেশিক খাতে সংগৃহীত রাজস্ব, ২.কেন্দ্রীয় খাতের রাজস্ব থেকে প্রাপ্ত অর্থ এবং ৩. বৈদেশিক বা অন্য কোন উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ। অন্যদিকে, রাজস্ব ব্যয়ের মধ্যে খোদ রাজস্ব ব্যয়, ঋণদান, গণপ্রশাসন, পুলিস, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উন্নয়ন ও অন্যান্য অন্তর্ভূক্ত। ১৯৫৯/৬০ অর্থবছরের রাজস্ব আয়–ব্যয়ের হিসাব থেকে দেখা যায় এ বছর রাজস্ব খাতে ব্যয় হয়েছে মোট ৩৭ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা। অথচ এ সময় ব্যয়যোগ্য রাজস্ব আয় ছিল ৪২ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা। পক্ষান্তরে, সারণি ৭.৭ থেকে দেখা যায় পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক খাতেই এবছর মোট ২৯ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা আয় হয়েছে। অথচ সারণি ৭.৮ থেকে দেখা যায়, ব্যয়যোগ্য প্রাদেশিক আয় মাত্র ১৭ কোটি ১২ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান তার নিজস্ব আয়ের মধ্য থেকেও মোট ১২ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা নিজ খরচের জন্য সংরক্ষণ করতে পারেনি। অবশ্য অন্যান্য উৎস থেকে এর সম পরিমাণ অর্থ দিয়ে তা পুষিয়ে দেওয়া হয়েছে। সম্ভবতঃ পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসনের দাবির প্রতি সংশয় সৃষ্টির জন্যই এত বিপুল পরিমাণ অর্থ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ব্যয় বরাদ্ধ দেখানো হয়েছে।

আইয়ুবের সামরিক সরকারের অন্যতম ঘোষিত নীতির মধ্যে প্রাদেশিক বৈষম্য দূর করার কথা থাকলেও বাস্তবে কিন্তু তা প্রতিফলিত হয়নি। ১৯৬০–৬১ ও ১৯৬৪–৬৫ এ দু বছরের রাজস্ব আয়–ব্যয়ের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এ সময়ে রাজস্ব আয় বেড়েছে শতকরা ১৩২.২৫ ভাগ, কিন্তু রাজস্ব ব্যয় বেড়েছে শতকরা ১২৪.২৩ ভাগ। ১৯৬০–৬১ সালে রাজস্ব আয়ের তুলনায় ব্যয়ের পরিমাণ ছিল মাত্র ৪৪ লক্ষ টাকা কম। অথচ ১৯৬৪–৬৫ সালে আয়ের তুলনায় ব্যয়ের পরিমাণ ৪ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা কম হয় এবং পরবর্তী তিন বছরে রাজস্ব আয়ের তুলনায় রাজস্ব ব্যয়ের পরিমাণ মোট ২০ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা কমে যায়। অবশ্য ১৯৬৮–৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানের রাজস্ব আয়ের তুলনায় রাজস্ব ব্যয়ের পরিমাণ মোট ২৫ কোটি ২২ লক্ষ টাকা বেশী ছিল। অথচ এ বছরই ঘটে সেই আইয়ুব বিরোধী ঐতিহাসিক গণঅভ্যুথান।

সারণি ৭.৯

১৯৫৯–৬৪ কালপর্বে পাকিস্তানের দু'অংশে শিল্প উন্নয়নের জন্য সরকারী ও বেসরকারী বিনিয়োগের তুলনামূলক চিত্র

(কোটি টাকার হিসেবে)

সাল	সিমেন্ট	লৌহা ও ইস্পাত	নির্মাণ সামগ্রী	যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা	মোট পূর্ব পাকিস্তান	সিমেন্ট	লৌহা ও ইস্পাত	নির্মাণ সামগ্রী	যন্ত্রপাতি ও কল কব্জা	মোট পঃপাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	পাকিস্তান
১৯৫৯–৬০	৫.১৭	১১.৩৫	৬৫.৪৮	১৫.০০	৯৭.০০	১১.৬২	২৩.৬১	১০৬.৭৭	৬১.৫	২০৩০	৯৭.০	২০৩০	৩০০.০
	(৫.৩৩)	(১১.৭০)	(৬৭.৫১)	(১৫.৪৬)	(১০০.০০)	(৫.৪৮)	(১১.৬৩)	(৫২.৬০)	৩০.৩০)	(১০০.০০)	(৩২.৩৩)	(৬৮.৬৭)	(১০০)
১৯৬০–৬১	৪.১৬	১২.৫৯	৬৩.৭৫	২৩.৫	১০৪.০০	১৪.৬৯	৩০.৮৮	১৩৯.৭৩	৭১.২	২৫৬.৫	০৪.০	২৫৬.৫৩	৬০.৫
	(১২.১১)	(১২.১১)	(৬১.৩০)	(২২.৬০)	(১০০.০০)	(৫.৭৩)	(১২.০৪)	(৫৪.৪৮)	(২৭.৭৬)	(১০০.০০)	(২৮.৮৫)	(৭১.১৫)	(১০০)
১৯৬১–৬২	৭.৯২	২০.৩৪	১১২.২৪	৩৫.০	১৭৫.৫০	১৬.৭১	৩৬.১৫	১৫৯.৯৪	৮৩.৭	২৯৬.৫১	৭৫.৫	২৯৬.৫	৪৭২.০
	(৪.৫১)	(১১.৬৭)	(৬২.৩২)	(২১.৮৫)	(১০০.০০)	(৫.৪৫)	(১১.১৬)	(৫১.৬১)	(৩১.৭৭)	(১০০.০০)	(৩২.৬০)	(৬৭.৪০)	(১০০)
১৯৬২–৬৩	৭.৬৫	২১.৪	১১৪.৬৭	৪০.২	১৮৪.০০	২০.৭৫	৪২.৪৮	১৯৬.৩৭	১২০.৯	৩৮০.৫	১৮৪.০	৩৮০.৫	৫৬৪.৫
	(৪.১৬)	(১১.৬৭)	(৬২.৩২)	(২১.৮৫)	(১০০.০০)	(৫.৪৫)	(১১.১৬)	(৩১.৬১)	(৩১.৭৭)	(১০০.০০)	(৩২.৬০)	(৬৭.৪০)	(১০০)
১৯৬৩–৬৪	১৪.৫৯	২৪.১১	১৬০.৬০	৫১.২	২৫০.৫০	২৬.৮০	৫৫.৫৯	২৫৪.৫১	১১৫.৬	৪৫২.৫	৫০.৫	৪৫২.৫	৭০৩.০
	(৫.৮২)	(৯.৬২)	(৬৪.১১)	(২০.৪৪)	(১০০.০০)	(৫.৯২)	(১২.২৯)	(৫৬.২৫)	(২৫.৫৫)	(১০০.০০)	(৩৫.৬৩)	(৬৪.৩৭)	(১০০)
মোট (১৯৫৯–৬৪)	৩৯.৪৯	৮৯.৮৭	৫১৬.৭৪	২৬৪.৯	৮১১.০০	৯০.০৭	১৮৮.৭১	৮৫৭.২২	৪৫২.৯	১৫৮৮.৯	৮১১.০০	১৫৮৮.৯	২৩৯৯.৯
	(৪.৮৭)	(১১.০৮)	(৬৩.৭২)	(২০.৩৩)	(১০০.০০)	(৫.৬৭)	(১১.৮৮)	(৫৩.৯৫)	(২৮.৫০)	(১০০.০০)	(৩৩.৭৯)	(৬৬.২১)	(১০০)

Source:Government of Pakistan(1965): Growth Model for the Pakistan Economy-Micro-Economic Projections for Pakistans Third 5 year Plan , Karcachi. Planning Department of Pakistan, Compiled from the Tables of 3.13.2, 3.4, 3.5 and p. 3.6.

Dhaka University Institutional Repository

আমদানি–রপ্তানি বাণিজ্য কিংবা বার্ষিক বাজেটে অর্থসংস্থানের দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিকূল অবস্থা অব্যাহত থাকলেও শিল্প ক্ষেত্রে কিন্তু সামরিক সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই বেশ ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচনায় দেখা গেছে, সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠার পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্প উন্নয়নের ত্বরিত ধারা অব্যাহত থাকে এবং পূর্ব পাকিস্তানেও বেশ উল্লেখযোগ্য হারে শিল্পায়ন ঘটতে থাকে।

সারণি ৭.৯ থেকে দেখা যায়, সামরিক সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর শিল্পায়নের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথম বছরই মোট ৯৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। এ খাতে ব্যয়ের পরিমাণ পরবর্তীকালে আরো বেড়ে যায় এবং ১৯৬৩/৬৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানে শিল্পায়নের জন্য ব্যয় করা হয় মোট ২৫০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। সামরিক সরকারের প্রথম পাঁচ বছরে পূর্ব পাকিস্তানে শিল্পায়নের জন্য মোট ৮১১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা হয়। অবশ্য এই একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পায়নে পূর্ব পাকিস্তান অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ অর্থ বিনিয়োজিত হয়। উক্ত পাঁচ বছরে পাকিস্তানের শিল্পায়নের জন্য সরকার নিয়ন্ত্রিত ব্যয় হয়েছিল মোট ২ হাজার ৩৯৯ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা, এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় করা হয় শতকরা ৩৩.৭৯ ভাগ অর্থ, আর পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হয় শতকরা ৬৬.২১ ভাগ অর্থ। যে সকল খাতে এ অর্থ বিনিয়োজিত হয়েছে তারমধ্যে সিমেন্ট, লৌহ ও ইস্পাত, নির্মাণ সামগ্রী যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা অন্যতম। পূর্ব পাকিস্তানে মোট সরকার নিয়ন্ত্রিত বিনিয়োগের শতকরা ৬৩.৭২ ভাগ অর্থ ব্যয় হয় নির্মাণ শিল্পের ক্ষেত্রে, অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে এ'খাতে বিনিয়োগের হার ছিল শতকরা ৫৩.৯৫ ভাগ। পশ্চিম পাকিস্তানে যন্ত্রপাতি ও কলকব্জার ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ পূর্বপাকিস্তান অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে বেশি। পশ্চিম পাকিস্তানে ১৯৫৬/৬০–১৯৬৩/৬৪ কালপূর্বে যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা খাতে বিনিয়োজিত হয় মোট বিনিয়োগের শতকরা ২৮.৫০ ভাগ, অপরদিকে পূর্ব পাকিস্তানে ঐখাতে বিনিয়োগ হয় মোট বিনিয়োগের শতকরা ২০.৩৩ ভাগ। অবশ্য তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে পূর্ব পাকিস্তানে সরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ অনেকখানি বেড়ে যায় এবং তা পশ্চিম পাকিস্তানকেও ছাড়িয়ে যায়। তবে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পণাকালে সরকার বেসরকারী খাতে যে অর্থ প্রদান করে তার প্রধান অংশই পশ্চিম পাকিস্তান পায়।

সারণি ৭.১০

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৬৫–৭০) তে শিল্প উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবিত ব্যয় (কোটি টাকার হিসাব)

খাতের নাম	সরকারী খাত			ব্যক্তিগত বা বেসরকারী খাত			মোট		
	পূর্ব পাক	পশ্চিম পাক	মোট	পূর্ব পাক	পশ্চিম পাক	মোট	পূর্ব পাক	পশ্চিম পাক	মোট
১. খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত কারখানা	১৯.৬	–	১৯.৬	২৯.০	৩০.০	৫৯.০	৪৮.৬	৩০.০	৭৮.৬
২. তাত শিল্প (সূতা ও পাট)	৭.৭	–	৭.৭	১৪০.০	১০০.০	২৪০.০	১৪৭.৭	১০০.০	২৪৭.৭
৩. রাসায়নিক ও পেট্রো–রাসায়নিক কারখানা	৮২.৫	৩৮.২	১২০.৭	৪৩.৬	৬৫.৩	১০৮.৯	১২৬.১	১০৩.৫	২২৯.৬
৪. সিমেন্ট কারখানা	১৬.৯	১৫.২	৩২.১	২৫.০	৪০.৯	৬৫.৯	৪১.৯	৫৬.১	৯৮.০
৫. মৌল ধাতু ও ধাতু–নির্ভর সামগ্রি নির্মাণ কারখানা	২৯.০	১৫.৫	৪৪.৫	৩৬.২	১২০.০	১৫৬.২	৬৫.২	১৩৫.৪	২০০.৬
৬. যন্ত্রপাতি নির্মাণ কারখানা	২৫.৩	৩১.২	৫৬.৫	২৬.৬	৩২.০	৫৮.৬	৫১.৯	৬৩.২	১১৫.১
৭. পরিবহন যন্ত্রপাতি নির্মাণ কারখানা	১৫.৬	২.৫	১৮.১	২৫.০	১১.৯	৩৬.৯	৪০.৬	১৪.৪	৫৫.০
৮. ক্ষুদ্র শিল্প সম্প্রসারণ কর্মসূচী	২৯.৭	১৬.৬৫	৪৬.৩৫	–	–	–	২৯.৭	১৬.৬৫	৪৬.৩৫
৯. কাগজ ও কাগজজাত পণ্য নির্মাণ কারখানা	৪৮.৪	–	৪৮.৪	৫.০	১০.০	১৫.০	৫৩.৪	১০.০	৬৩.৪
১০. অন্যান্য*	৩৫.৩	১৭.৭৫	৫৩.০৫	৪৯.৬	৩৯.৯	৮৯.৫	৮৪.৯	৫৮.৩৫	১৪৩.২৫
মোট	৩১০.০	১৩৭.০	৪৪৭.০	৩৮০.০	৪৫০.০	৮৩০.০	৬৯০.০	৫৮৭.০০	১২৭৭.০
শতকরা হার(%	(৬৯.৩৫)	(৩০.৬৫)	(১০০)	(৪৫.৭৮)	(৫৪.২২)	(১০০)	(৫৪.০৩)	(৪৫.৯৭)	(১০০)

সূত্রঃ Anwar Khan Soofi (1968): 'Evolution of Industrial Policy and Pattern in Pakistan' in Pakista in the Development Decate: Problems and Performance (Proceedings of the Third Economic Development Seminar, Karachi, March 30-April 2, 1968) Edited by Agha M. Ghouse, Lahore: The Economic Development Seminar. pp. 136-37.

*অন্যান্যের মধ্যে রয়েছে, পানীয়, তামাকজাত শিল্প, জুতা, কাঠ ও কাঠজাত দ্রব্য, আসবাবপত্র, প্রকাশনা, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য, রবার, কয়লা–গ্যাস–পেট্রোল, প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও অন্যান্য অনির্ধারিত খাত।

সারণি ৭.১০ থেকে দেখা যায়, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৬৫–৭০) কালে পাকিস্তান সরকার মোট ১২৭৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করে, এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে পড়ে ৬৯০ কোটি টাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তান পায় ৫৮৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ এই বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বন্টনের হার হয় যথাক্রমে শতকরা ৫৪.০৩ ভাগ ও শতকরা ৪৫.৯৭ ভাগ। সরকারী খাতে শিল্পের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হয় তার মোট পরিমাণ ৪৪৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের অংশে পড়ে শতকরা যথাক্রমে ৬৯.৩৫ ভাগ ও ৩০.৬৫ ভাগ। বেসরকারী খাতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৮৩০ কোটি টাকা। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের অংশে পড়ে শতকরা যথাক্রমে ৪৫.৭৮ ভাগ ও ৫৪.২২ ভাগ।

সরাণী ৭.১০–এ প্রদত্ত তথ্য থেকে দুটি স্পষ্ট ঝোঁক (trend) লক্ষণীয়। পূর্ব পাকিস্তানে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তাঁত শিল্প, পরিবহণ যন্ত্রপাতি নির্মাণ, ক্ষুদ্র শিল্প সম্প্রসারণ কর্মসূচী এবং কাগজ ও কাগজজাত পণ্য নির্মাণ কারখানা অগ্রাধিকার পায়। এ'চারটি খাতে মোট ৪১ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়; তার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে বরাদ্দের পরিমাণ হচ্ছে শতকরা ৬৫.৮০ ভাগ। অন্যদিকে, পশ্চিম পাকিস্তানে সিমেন্ট কারখানা, মৌলধাতু ও ধাতুনির্ভর সামগ্রী নির্মাণ কারখানা ও যন্ত্রপাতি নির্মাণ কারখানার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এ তিনটি খাতে উক্ত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মোট ৪১৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ হচ্ছে শতকরা ৬১.৬৬ ভাগ। অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য এ সময়ে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তার প্রধান অংশই মুল ও ভারী শিল্পে, অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তার প্রধান অংশ ছিল ক্ষুদ্র ও হালকা শিল্পে। বলাবাহুল্য, পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপিত পাটকলগুলি মোটেই ক্ষুদ্র ছিল না এবং এগুলির কোন কোনটিতে হাজার হাজার শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এসকল কারখানার প্রধান উৎপাদন ছিল পাটজাত শিল্পপণ্য তথা চট। তার অর্থ হল এই যে, পশ্চিম পাকিস্তানে এমন সব শিল্প গড়ে তোলা হয় যাতে, পূর্ব পাকিস্তান নির্মাণ ও অন্যান্য শিল্পবিকাশের ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচনা থেকে দেখা গেছে তৃতীয় পঞ্চবর্ষিক পরিকল্পনাকালে

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বপাকিস্তানে বিপুল পরিমাণে বিনিয়োগ করা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তান অপেক্ষা পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পপণ্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল অনেক বেশী। শুধু শিল্পপণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেই নয়, কৃষিপণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেও পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ূব আমলে কি পরিমাণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল তার একটি স্পষ্ট চিত্র সারণি ৭.১১তে পাওয়া যায়।

সারণি ৭.১১
পাকিস্তান কৃষি পণ্য উৎপাদনের প্রদেশওয়ারি পরিসংখ্যান ১৯৪৭-৬৭)
(লক্ষ টনের হিসাবে)

ফসলের ধরন	১৯৪৭/৪৮ – ১৯৫০/৫১		১৯৫১/৫২–১৯৫৪/৫৫		১৯৫৫/৫৬–১৯৫৮/৫৯		১৯৫৯/৬০–১৯৬২/৬৩		১৯৬৩/৬৪–১৯৬৬/৬৭		১৯৪৭/৪৮–১৯৬৬/৬৭		মোট
	পূর্ব বাংলা	প. পাকিস্তান	পূ. পাকিস্তান	প. পাকিস্তান	পূ.বাংলা*	প.পাকিস্তান	পূ.পাকিস্তান	প. পাকিস্তান	পূ.পাকিস্তান	প. পাকিস্তান	পূ. পাকিস্তান	প. পাকিস্তান	
শর্করা জাতীয় খাদ্য	২৯২.৮৪	২২৫.৯৮	৩০৩.৭৫	১৯৬.৬৯	২৯২.৪৭	২২২.৪৮	৩৬৪.৩৩	২৪৫.৪৬	৪০৭.৭৮	২৭০.০৫	১৬৬১.১৭	১১৬০.৬৬	২৮২১.৮৩
	(৬১.৫৫)	(৪৩.৩৪)	(৫৯.৯৭)	(৩৬.৫৩)	(৫৮.৮০)	(৩৩.০৭)	(৬২.৩৭)	(২৯.৩৫)	(৫৫.৫৮)	(২৪.৫৭)	(৫৯.৪৭)	(৩১.৬৪)	(৪৩.৬৫)
ডাউল জাতীয় খাদ্য	১০.৫৯	২৯.১৯	১২.২৯	২৬.৭৭	৯.৩২	৩৩.৬	৮.৭২	৩৩.৩৯	৮.৫৭	৩০.০৩	৪৯.৪৯	১৫২.৯৮	২০২.৪৭
	(২.২৩)	(৫.৬০)	(২.৪৩)	(৪.৯৭)	(১.৮৭)	(৫.০০)	(১.৪৯)	(৩.৯৯)	(১.১৭)	(২.৭৩)	(১.৭৭)	(৪.১৭)	(৩.১৩)
অর্থকরী ফসল	১৭২.২৯	২৬৬.২৮	১৯০.৪৮	৩১৪.৯৬	১৯৫.৬৬	৪১৬.৬১	২১১.০৭	৫৫৭.৫	৩১৭.৩২	৭৯৮.৯১	১০৮২.৮২	২৩৫৪.২৬	৩৪৪১.০৮
	(৩৬.২২)	(৫১.০৬)	(৩৭.৬০)	(৫৮.৫০)	(৩৯.৩৩)	(৬১.৯৩)	(৩৬.১৪)	(৬৬.৬৬)	(৪৩.২৫)	(৭২.৭০)	(৩৮.৭৬)	(৬৪.১৯)	(৫৩.২২)
মোট	৪৭৫.৭২	৫২১.৪৫	৫০৬.৫২	৫৩৮.৪২	৪৯৭.৪৫	৬৭২.৬৯	৫৮৪.১২	৮৩৬.৩৫	৭৩৩.৬৭	১০৯৮.৯৯	২৭৯৩.৪৮	৩৬৬৭.৯	৬৪৬৫.৩৮
	(১০০.০০)	(১০০.০০)	(১০০.০০)	(১০০.০০)	(১০০.০০)	(১০০.০০)	(১০০.০০)	(১০০.০০)	(১০০.০০)	(১০০.০০)	(১০০.০০)	(১০০.০০)	(১০০.০০)

Source: S.M. Ikhtiar Ul Mulk (1968): 20 Years of Pakistan in Statistics 1947-1967, Karachi: Central Statistical office, Pakistan, compiled from pp. 42-59.

*১৯৫৬ সালের পর থেকে পূর্ব বাংলা পূর্ব পাকিস্তান হিসাবে পরিচিত হয়।

সারণি ৭.১১ থেকে দেখা যায়, পাকিস্তানের গোড়ার দিনগুলিতে তার উভয় অঞ্চল মোটামুটি সমমাত্রার ব্যবধান নিয়ে কৃষি উৎপাদন করে আসছিল। তবে শুরু থেকেই শর্করা জাতীয় ফসল পূর্ব পাকিস্তানে অধিক হারে উৎপাদিত হত; অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে তুলনামূলকভাবে বেশী হারে উৎপাদিত হত অর্থকরী ফসল। ১৯৪৭/৪৮–১৯৫০/৫১ কালপর্বে পূর্ব পাকিস্তানে মোট ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ ৭২ হাজার টন কৃষিপণ্য উৎপাদিত হয়, এর মধ্যে শতকরা ৬১.৫৫ ভাগ শর্করা জাতীয় ফসল, শতকরা ২.২৩ ভাগ ডাউল জাতীয় ফসল এবং বাকি শতকরা ৩৬.২২ ভাগ অর্থকরী ফসল উৎপাদিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানে শর্করা জাতীয় ফসল উৎপাদনের তুলনায় অর্থকরী ফসলের উৎপাদন আইয়ুবের সামরিক শাসন আসার পূর্ব পর্যন্ত বাড়তে থাকে এবং ১৯৫৫/৫৬–১৯৫৮/৫৯ কালপর্বে পূর্ব পাকিস্তানে মোট উৎপাদিত ফসলের শতকরা ৩৯.৩৩ ভাগ ছিল অর্থকরী ফসল এবং শতকরা ৫৮.৮০ ভাগ ছিল শর্করা জাতীয় ফসল। মাঝখান থেকে ডাউলের উৎপাদন সাংঘাতিকভাবে হ্রাস পায়। আইয়ুবের সামরিক সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর থেকে পাকিস্তানের দু.অংশেই কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বড় ধরনের অগ্রগতি ঘটে। ১৯৫৯/৬০–১৯৬২/৬৩ কালপর্বে পূর্ব পাকিস্তানে মোট ৫ কোটি ৮৪ লক্ষ ১২ হাজার টন ফসল উৎপাদন হয়। ফসল উৎপাদনের এ পরিমাণ আগের চার বছরের চেয়ে শতকরা ১৭.৪২ ভাগ বেশী। তবে সামগ্রীকভাবে ফসল উৎপাদন এসময় যতটা বেড়েছে শর্করা জাতীয় ফসল বেড়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী (শতকরা ২৪.৫৭ ভাগ)। এই একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে উৎপাদিত হয় মোট ৮ কোটি ৩৬ লক্ষ ৩৫ হাজার টন ফসল এবং এ পরিমাণ আগের চার বছরের তুলনায় শতকরা ২৪.৩৩ ভাগ বেশি। সামগ্রিক উৎপাদন এখানে যে হারে বেড়েছে অর্থকরী ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির হার তার থেকে অনেক বেশি। অর্থাৎ অর্থকরী ফসল আগের চার বছর তথা ১৯৫৫/৫৬–১৯৫৮/৫৯ কালপর্ব অপেক্ষা শতকরা ৩৩.৮২ ভাগ বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীকালে অর্থকরী ফসলের এ অগ্রগতির হার আরো বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৩/৬৪–১৯৬৬/৬৭ কালপর্বে পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থকরী ফসল উৎপাদনের পরিমাণ আগের চার বছরের তুলনায় শতকরা ৪৩.৩০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৭ কোটি ৯৮ লক্ষ ৯১ হাজার টনে গিয়ে উপনীত হয়। অবশ্য পূর্ব পাকিস্তানেও এ সময়ে সামগ্রিকভাবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। আগের চার বছরের তুলনায় এ সময় উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ২৫.৬০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে মোট উৎপাদন ৭ কোটি ৩৩ লক্ষ ৬৭ হাজার টনে দাঁড়ায়। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানে এই প্রথম অর্থকরী ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির হার এত উচ্চমাত্রায় পৌঁছায়। ১৯৫৯/৬০–১৯৬২/৬৩ কালপর্বের অর্থকরী ফসলের তুলনায় শতকরা ৫০.৩৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩ কোটি ১৭ লক্ষ ৩২ হাজার টনে দাঁড়ায়। বলা বাহুল্য, এসময় পূর্ব পাকিস্তানের অর্থকরী ফসল উৎপাদনের হার দ্রুত বৃদ্ধি পেলেও তার মোট পরিমাণ পশ্চিম পাকিস্তানে উৎপাদিত অর্থকরী ফসলের মাত্র শতকরা ৪০ ভাগ।

সামগ্রিকভাবে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৬৭ সালের জুন পর্যন্ত পাকিস্তানে মোট ৩৪ কোটি ৪১ লক্ষ ৮ হাজার টন অর্থকরী ফসল উৎপাদিত হয়। তার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে উৎপাদিত হয় মাত্র শতকরা ৩১.৪৭ ভাগ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে শতকরা ৬৮.৫৩ ভাগ। অর্থকরী ফসল উৎপাদনের খাতওয়ারী বিভাজন করলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

সারণি ৭.১২
১৯৪৭/৪৮–১৯৬৩/৬৭ কালপর্বে পাকিস্তানের দুই অংশে অর্থকরী ফসল উৎপাদনের খতিয়ান
(লক্ষ টনের হিসাব)

ফসলের ধরন	১৯৪৭/৪৮ – ১৯৫০/৫১		১৯৫১/৫২–১৯৫৪/৫৫		১৯৫৫/৫৬–১৯৫৮/৫৯		১৯৫৯/৬০–১৯৬২/৬৩		১৯৬৩/৬৪–১৯৬৬/৬৭		১৯৪৭/৪৮–১৯৬৬/৬৭		মোট
	পূঃ পাক	পঃ পাক	পূঃ পাক	পঃ পাক	পূঃ পাক	পঃ পাক	পূঃ পাক	পঃ পাক	পূঃ পাক	পঃ পাক	পূঃ পাক	পঃ পাক	
আখ	১৩১.১৩	২৫৭.১৬	১৪৭.৬৩	৩০২.৪২	১৪৯.৮৫	৪০২.৮৪	১৬৭.৩৩	৫৪২.২৯	২৭২.১৪	৭৭৮.৫০	৮৬৮.০৮	২২৮৩.২১	৩১৫১.২৯
পাট	৩৮.৬৮	–	৩৯.৮৫	–	৪৩.২৪	–	৪১.৫৭	–	৪২.৭৯	–	২০৬.১৩	–	২০৬.১৩
চা	০.৬২	–	০.৯২	–	০.৯১	–	০.৯৩	–	১.০৯	–	৪.৪৭	–	৪.৪৭
তুলা	০.১১	৮.২৬	০.১২	১০.৮৩	০.১০	১১.৭০	০.১২	০১২.৬২	.১১	১৬.৪০	০.৫৬	৫৯.৮১	৬০.৩৭
তামাক	১.৭৫	০.৮৬	১.৯৬	১.৭১	১.৫৬	২.০৭	১.১২	২.৫৯	১.১৯	৪.০১	৭.৫৮	১১.২৪	১৮.৮২
মোট অর্থকরী ফসল	**১৭২.২৯**	**২৬৬.২৮**	**১৯০.৪৮**	**৩১৪.৯৬**	**১৯৫.৬৬**	**৪১৬.৬১**	**২১১.০৭**	**৫৫৭.৫**	**৩১৭.৩২**	**৭৯৮.৯১**	**১০৮২.৮২**	**২৩৫৪.২৬**	**৩৪৪১.০৮**

Source: S.M. Ikhtiar Ul Mulk (1968): 20 Years of Pakistan in Statistics 1947-1967, Karachi: Central Statistical office Pakistan, pp. 49-53.

*১৯৫৬ সালের পর থেকে পূর্ব বাংলা পূর্ব পাকিস্তান হিসাবে পরিচিত হয়।

সারণি ৭.১২ থেকে দেখা যায়, ১৯৪৭/৪৮ –১৯৫০/৫১ কালপর্বে পূর্ব পাকিস্তানে আখ উৎপাদন হয় মোট ১ কোটি ৩১ লক্ষ ১৩ হাজার টন, আর পশ্চিম পাকিস্তানে উৎপাদন হয় ২ কোটি ৫৭ লক্ষ ১৬ হাজার টন। মাত্র এক যুগের ব্যবধানে অর্থাৎ ১৯৬৩/৬৪–১৯৬৬/৬৭ কালপর্বে পশ্চিম পাকিস্তানের আখ উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ২০২.৭৩ ভাগ বেড়ে গিয়ে ৭ কোটি ৭৮ লক্ষ ৫০ হাজার টনে

Dhaka University Institutional Repository

গিয়ে পৌঁছায়। অন্যদিকে, এসময়ে পূর্ব পাকিস্তানে আখ উৎপাদন শতকরা মাত্র ১০৭.৫৩ ভাগ বেড়ে ২ কোটি ৭২ লক্ষ ১৪ হাজার টনে গিয়ে উপনীত হয়। পাট উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি, শতকরা মাত্র ১০.৬৩ ভাগ বেড়ে ৪২ লক্ষ ৭৯ হাজার টনে দাঁড়ায়। অবশ্য এসময়ে পূর্ব পাকিস্তানের চা উৎপাদনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে, উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ৭৫.৮১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬৩/৬৪-১৯৬৬/৬৭ কালপর্বে মোট ১ লক্ষ ৯ হাজর টনে পৌঁছায়। তুলা উৎপাদনের ক্ষেত্রেও কোন অগ্রগতি হয়নি, পাকিস্তানের প্রথম চার বছরে যে মোট ১১ হাজার টন তুলা উৎপাদিত হয়েছিল ১৯৬৩/৬৪-১৯৬৬/৬৭ সালেও ঠিক একই পরিমাণ তুলা উৎপাদিত হয়। অথচ এসময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে তুলা উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা প্রায় ১০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬৩/৬৪-১৯৬৬/৬৭-কালপর্বে ১৬ লক্ষ ৪০ হাজার টন হয়, যা পূর্ব পাকিস্তানের এ সময়ে মোট তুলা উৎপাদনের ১৪৯ গুণ বেশি। তামাক উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ঠিক একই চিত্র লক্ষণীয়। পাকিস্তানের প্রথম চার বছরে পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তান অপেক্ষা শতকরা ১০৩.৫ ভাগ বেশি তামাক উৎপাদন হয় এবং তার পরিমাণ হচ্ছে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টন। কিন্তু উল্লিখিত এক যুগের ব্যবধানে এখানে তামাক উৎপাদন মোটেও বাড়েনি। বরং ১৯৬৩/৬৪-১৯৬৬/৬৭ কালপর্বে তামাক উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ৩২ ভাগ হ্রাস পেয়ে ১ লক্ষ ১৯ হাজার টনে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, পশ্চিম পাকিস্তানে প্রথম চার বছরে মাত্র ৮৬ হাজার টন তামাক উৎপাদিত হয়েছিল, কিন্তু ১৯৬৩/৬৪-১৯৬৬/৬৭ কালপর্বে এসে তামাক উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ৩৬৬৬.২৮ ভাগ বেড়ে ৪ লক্ষ ১ হাজার টনে পৌঁছায়। তাই এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, উক্ত উৎপাদন বৃদ্ধি হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ ও ভূমিসংস্কারের প্রত্যক্ষ ফল। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের এসবের কিছুই ঘটেনি।

শিল্প ও কৃষি ক্ষেত্রে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের মধ্যে এই ব্যাপক বৈষম্যের কারণ শুধুমাত্র সরকারী বৈষম্যমূলক নীতিই নয়, এমন অনেক বরাদ্দ বহির্ভূত খাতের সন্ধান পাওয়া যায় যে-সবের হিসাব সাধারণত জনসমক্ষে প্রকাশিত হত না। সে সকল খাতের হিসাব নিলে দেখা যায়, এ সকল ক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তানের ওপর মারাত্মক বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে। যেমন, ব্যাংক ও বীমা এবং আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল নামক এদুটি বরাদ্দ বহির্ভূত খাতে পাকিস্তানের শুরু থেকে ১৯৬৮/৬৯ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৬০৬ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে, কিন্তু এ সকল খাতে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কখনই ২৫ ভাগের বেশি অর্থ ব্যয় করা হয়নি।[৭৮] পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে এতসব বৈষম্য সত্বেও পূর্ব পাকিস্তানে ষাট দশকে এক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সূচীত হয়। এ সময়ে ক্রমবর্ধমান হারে মোট জাতীয় উৎপাদন, বিনিয়োগের পরিমাণ ও জাতীয় সঞ্চয় উল্লেখযোগ্য হারে বাড়তে থাকে; বৈদেশিক পুঁজিও এ'সময়ে এসে উল্লেখযোগ্য হারে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করতে থাকে। মোট কথা, জাতীয় উৎপাদন ও সঞ্চয়ের দিকে লক্ষ্য করলে ষাট দশক ছিল প্রকৃত অর্থেই পূর্ব পাকিস্তানের জন্য উন্নয়ন দশক।

সারণি ৭.১৩

১৯৫৭/৬০ থেকে ১৯৬৯/৭০ কালপর্বে পূর্ব বাংলার মোট জাতীয় সঞ্চয় (পরোক্ষ হিসেবে)

(১৯৫৯/৬০ সালের মূল্যকে স্থায়ী মল্য হিসেবে ধরে, কোটি টাকার হিসাব)

সাল	মোট জাতীয় উৎপাদন	মোট স্থায়ী বিনিয়োগ	মূলধন বিনিয়োগ	মোট পুঁজি বিনিয়োগ	পুঁজি অন্তঃপ্রবাহের নিট পরিমাণ	মোট আঞ্চলিক সঞ্চয়ঃ ৫-৬	সঞ্চয়ের শতকরা হারঃ(৭+২)X ১০০
১৯৫৯-৬০	১৪৪৯.০০	৮৯.০০	১৭.০০	৯৮.০০	৪.২০	৯৩.৮০	৮.৩৮
১৯৬০-৬১	১৫২৪.৩০	৮৫.৬০	৬.৬০	৯২.২০	৪২.৪০	৪৯.৮০	৩.২৬
১৯৬১/৬২	১৬৪৪.৫০	১০৩.৮০	৮.৩০	১১২.১০	১৯.৯০	৯২.২০	৫.৬১
১৯৬২/৬৩	১৬৭০.৯০	১২৮.৫০	৯.০০	১৩৭.৫০	২৮.১০	১০৯.৪০	৬.৫৫
১৯৬৩/৬৪	১৮২৬.৮০	১৫৬.৭০	৬.৬০	১৬৩.৩০	৩৩.১০	১৩০.২০	৭.১৩
১৯৬৪/৬৫	১৮৬৫.১০	১৫৫.৭০	১২.৮০	১৬৮.৫০	৪৯.৮০	১১৮.৭০	৬.৩৬
১৯৬৫/৬৬	১৯৪৯.৬০	১৩৮.৮০	১২.০০	১৫০.৮০	৩১.১০	১১৯.৭০	৬.১৪
১৯৬৬/৬৭	১৯৫৪.৮০	১৬৪.৬০	২৬.৩০	১৯০.৯০	৪৭.৮০	১৪৩.১০	৭.৩২
১৯৬৭/৬৮	২১৩২.৩০	২১৯.৭০	১৩.৮০	২৩৩.৫০	৪৫.৫০	১৮৮.০০	৮.৮২
১৯৬৮/৬৯	২১৯৫.০০	২১১.৩০	২৩.৩০	২৩৪.৬০	৩৯.৪০	১৯৫.২০	৮.৮৯
১৯৬৯/৭০	২২৩৯.৪০	২৫৬.৮০	২৬.৫০	২৮৩.৩০	৫৬.৮০	২২৬.৫০	১০.১১
১৯৫৯-৭০ (মোট)	২০৪৫১.৭০	১৭০২.৫	১৬২.২	১৮৬৪.৭	৩৯৮.১০	১৪৬৬.৬	৭.১৭
	(১০০.০০)	(৮.৩২		(০.৭৯)	(৯.১১)	(১.৯৫)	(৭.১৭)

Source: Mohiuddin Alamgir and Atiqur Rahman (1974): Saving in Bangladesh 1959/60-1969/70, BIDS Research Monograph-2, Dacca: BIDS, p. 22, Table -2.1.

সারণি ৭.১৩ থেকে দেখা যায়, ১৯৫৯/৬০-১৯৬৯/৭০ এই দশ বছরে স্থায়ী মুল্যে পূর্ব পাকিস্তানের মোট জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২০ হাজার ৪৫১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা এবং এ সময় মোট পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৮৬৪ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ মোট পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৯.১১ ভাগ। মোট পুঁজি বিনিয়োগের মধ্যে স্থায়ী মূলধনই বিনিয়োজিত হয়েছে শতকরা ৯১.৩০ ভাগ। আর পুঁজি বিনিয়োগের প্রধান খাত ছিল ভারী শিল্প। এ সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে পুজির আন্তঃপ্রবাহের নিট পরিমাণ ছিল মোট ৩৯৮ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। ফলে মোট জাতীয় সঞ্চয় হয়েছে এ সময়ে ১ হাজার ৪৬৬ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এ'সময়ে জাতীয় উৎপাদনের মোট পরিমানের শতকরা ৭.১৭ ভাগ অর্থ সঞ্চিত হয়েছে। সঞ্চয়ের এ হার নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হার (growth rate) কে নির্দেশ করে।

বছরওয়ারী বিবেচনা করলে দেখা যাবে ১৯৫৯-৬০ থেকে পরবর্তী প্রতিবছর অগ্রগতির এ হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫৯-৬০ সালে যেখানে মোট জাতীয় উৎপাদন ১ হাজার ৪৪৯ কোটি টাকা ছিল, সেখানে ১৯৬৯-৭০ সালে এ উৎপাদনের পরিমাণ ২ হাজার ২৩৯ কোটি ৪০ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। অর্থাৎ এ'সময়ে মোট জাতীয় উৎপাদনে অগ্রগতির হার ছিল শতকরা ৫৪.৫৫ ভাগ। ১৯৫৯-৬০ সালে সামরিক সরকার হঠাৎ করে বেশী পরিমানে পুঁজি বিনিয়োগ করে। কিন্তু পরবর্তী বছর আবার তা তীষণভাবে হ্রাস পায়। তা সত্ত্বেও ১৯৫৯-৬০ সালের সাথে ১৯৬৯-৭০ সালের পুঁজি বিনিয়োগের তুলনা করলে দেখা যায় এ'সময়ে পুঁজিবিনিয়োগের পরিমাণ শতকরা ১৮৯.০৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। পুঁজির আন্তঃপ্রবাহের নিট পরিমাণও এ সময় বিশেষভাবে বেড়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫৯-৬০

[৭৮] Alamgir, Mohiuddin & Lodewik J.J. Berlage (1974): Bangladesh: National Income and Expenditure 1949/50-1969/70. Research Monograph no. 1, Dacca: BIDS. Table no. 14. pp. 196-98.

Dhaka University Institutional Repository

অর্থবছরে যেখানে মাত্র ৪ কোটি ২০ লক্ষ টাকার নিট পুঁজি বাহির থেকে এসেছিল, সেখানে ১৯৬৯-৭০ সালে বাহিরের থেকে নিট পুঁজির পরিমাণ মোট ৫৬ কোটি ৮০ লক্ষ টাকায় পৌঁছায় অর্থাৎ ১৯৫৯-৬০ অর্থবছরের চেয়ে পুঁজির নিট আন্তঃপ্রবাহের পরিমাণ সাড়ে তেরগুণের চেয়েও বেশী। কিন্তু তা সত্বেও এ সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক সঞ্চয়ের পরিমাণ মোটেও হ্রাস পায়নি, বরং এ সময় শতকরা ১৪১.৪৭ ভাগ বেড়েছে। মোট জাতীয় উৎপাদনের তুলনায় সঞ্চয়ের হারও কমেনি, বরং ক্রমাগত তা বাড়তে বাড়তে ১৯৬৯-৭০ সালে শতকরা ১০.১১ ভাগে এসে দাঁড়ায় পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প উন্নয়নও শুধুমাত্র বৈদেশিক পুঁজি নির্ভর হয়ে পড়েছিল তা নয়, এক্ষেত্রে দেশীয় পুঁজির প্রাধান্যও কম ছিল না।

সারণি ৭.১৪

১৯৫৯/৬০ থেকে ১৯৬৯/৭০ কালপর্বে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক সঞ্চয় ও বৈদেশিক পুঁজির নিট আন্তঃপ্রবাহের মধ্যে তারতম্য

(কোটি টাকার হিসাব)

সাল	সঞ্চয়	বৈদেশিক পুঁজির নিট অন্তঃপ্রবাহের পরিমাণ	বিনিয়োগ যোগ্য পুঁজির পরিমাণ	বিনিয়োগযোগ্য পুঁজির মধ্যে বৈদেশিক পুঁজির হার (%)	বিনিয়োগযোগ্য পুঁজির মধ্যে প্রাদেশিক সঞ্চয়ের হার (%)
১৯৫৯-৬০	৮৯.৭৯	৪.২০	৯৩.৯৯	৪.৪৭	৯৫.৫৩
১৯৬০-৬১	১০১.০৮	৪২.৪০	১৪৩.৪৮	২৯.৫৫	৭০.৪৫
১৯৬১/৬২	১১২.৮২	১৯.৯০	১৩২.৭২	১৪.৯৯	৮৫.০১
১৯৬২/৬৩	১০১.৯৬	২৮.১০	১৩০.০৬	২১.৬১	৭৮.৩৯
১৯৬৩/৬৪	১৫২.৫২	৩৩.১০	১৮৫.৬২	১৭.৮৩	৮২.১৭
১৯৬৪/৬৫	১৫৯.৯৩	৪৯.৮০	২০৯.৭৩	২৩.৭৪	৭৬.২৬
১৯৬৫/৬৬	১৭৪.২৯	৩১.১০	২০৫.৩৯	১৫.১৪	৮৪.৮৬
১৯৬৬/৬৭	১৫৪.৫৬	৪৭.৮০	২০২.৩৬	২৩.৬২	৭৬.৩৮
১৯৬৭/৬৮	১৮০.৪০	৪৫.৫০	২২৫.৯০	২০.১৪	৭৯.৮৬
১৯৬৮/৬৯	১৭৮.১২	৩৯.৪০	২১৭.৫২	১৮.১১	৮১.৮৯
১৯৬৯/৭০	২০১.৮৬	৫৬.৮০	২৫৮.৬৬	২১.৯৬	৭৮.০৪
১৯৫৯/৬০-১৯৬৯/৭০	১৬০৭.৩৩	৩৯৮.১	২০০৫.৪৩	১৯.৮৫	৮০.১৫

Source: Mohiuddin Alamgir and Atiqur Rahman (1974): op.cit., pp.22-27.

সারণি-৭.১৪ থেকে দেখা যায়, ১৯৫৯/৬০-১৯৬৯/৭০ কালপর্বে পূর্ব পাকিস্তানে মোট বিনিয়োগযোগ্য পুঁজির পরিমাণ ছিল ২ হাজার ৫ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা; এর মধ্যে মাত্র শতকরা ১৯.৮৫ ভাগ অর্থ বৈদেশিক পুঁজির নিট আন্তঃপ্রবাহ থেকে, বাকি শতকরা ৮০.১৫ ভাগ প্রাদেশিক সঞ্চয় থেকে আসে। অর্থাৎ এ সময়ে বিনিয়োগযোগ্য পুঁজির মধ্যে প্রাদেশিক সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল বৈদেশিক পুঁজি অপেক্ষা চার গুণের অধিক। তাই পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প বিকাশকে কোনভাবেই বলা যায়না যে, তা ছিল প্রধানতঃ বিদেশী পুঁজি নির্ভর। কেননা সামগ্রিকভাবে বিদেশী পুঁজির পরিমাণ সঞ্চয়ের তুলনায় যে কম ছিল তাই নয়, একক কোন অর্থবছরেও বিদেশী পুঁজির পরিমাণ শতকরা ৩০ ভাগ পর্যন্ত পৌঁছেনি। বরং ১৯৫৯-৬০ অর্থবছর ছাড়াও কোন কোন বছর বিদেশী পুঁজির পরিমাণ শতকরা ১৫ ভাগে নেমে এসেছে। আর বিদেশী পুঁজিকে বাদ দিয়েও প্রাদেশিক সঞ্চয় এত ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পেয়েছে যে, এই দশ বছরে জাতীয় সঞ্চয়ের বৃদ্ধির বার্ষিক গড় হার ছিল শতকরা ১১.৩৫ ভাগ। ফলে বৈদেশিক পুঁজি পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে সত্য, কিন্তু নিজস্ব বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের তুলনায় এর পরিমাণ এত কম ছিল যে, তার পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প উন্নয়নের গতিধারাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ছিল না। আর তাইতো দেখা যায় সমগ্র পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির গড় হার খুবই নিম্ন মাত্রার হলেও আইয়ুব আমলে অতীতের নেতিবাচক প্রবণতার পরিবর্তে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধির হারে উন্নীত হয়। সারণি ৭.১৫ থেকে সে ব্যপারে একটি স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়।

সারণি ৭.১৫

১৯৪৯/৫০ থেকে ১৯৬৯/৭০ কালপর্বে পূর্ব বাংলার জাতীয় উৎপাদন

(১৯৫৯/৬০ সালের মূল্যকে স্থায়ী মূল্য হিসেবে ধরে কোটি টাকার হিসাব)

	১৯৪৯/৫০ - ১৯৫৩/৫৪	১৯৫৪/৫৫- ১৯৫৮/৫৯	১৯৫৯/৬০- ১৯৬৩/৬৪	১৯৬৪/৬৫- ১৯৬৮/৬৯	১৯৪৯/৫০- ১৯৬৮/৬৯
১. মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন	৬১৪৩.৮০	৬৫২৮.৭০	৭৯০৭.৬০	৯৭৩০.৩	৩০৩১০.৪
২. বিদেশ থেকে নিট আয়	-৮.৩০	-৪.৮০	-১২.৩০	২.৫০	-২২.৯০
৩. মোট জাতীয় উৎপাদন	৬১৩৫.৫০	৬৫২৩.৯০	৭৮৯৫.৩০	৯৭৩২.৮০	৩০২৮৭.৫
৪. প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর বাবদ প্রাপ্ত ভর্তুকী	১৪০.৪০	৪৬.৭০	১২৮.১০	২৪৩.৩০	৮০১.৮০
৫. নিট জাতীয় আয়	৬২৭৫.৯০	৬৫৭০.৬০	৮০২৩.৪০	৯৯৭৬.১০	৩১০৮৯.৩
৬. গড় জনসংখ্যা (কোটি)	৪.৪৪	৫.০১	৫.৭৩	৬.৬৫	৫.৪৬
৭. মাথা পিছু গড়বার্ষিক আয়	২৮২.৭০	২৬২.৩০	২৮০.০৫	৩০০.০৩	২৮৪.৭০
৮. প্রবৃদ্ধির হার	৩.৪	-৭.২২	৬.৭৭	৭.১৩	+০.৭০

Source: Alamgir and Berlage (1974): op.cit,.pp.161-163, Table-2.

সারণি ৭.১৫ থেকে দেখা যায় ১৯৪৯/৫০-১৯৬৮/৬৯ পর্যন্ত এই ২০ বছরে স্থায়ী মূল্যে পূর্ব পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের মোট পরিমাণ ৩০ হাজার ৩১০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকায় পৌঁছায়। এ সময়ে বিদেশ থেকে যা এসেছে তার চেয়ে ২২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা বেশী বিদেশে পাচার হয়েছে। ফলে উক্ত কালপর্বে মোট জাতীয় উৎপাদন ৩০ হাজার ২৮৭ কোটি ৭০ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। অবশ্য এর সাথে যুক্ত হয়েছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর বাবদ প্রাপ্ত ভর্তুকী ৮০১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। ফলে নিট আয় মোট ৩০ হাজার ৮৯ কোটি ৩০ লক্ষ টাকায় পৌঁছায়। তখন পূর্ব পাকিস্তানের লোকসংখ্যা ছিল ৫ কোটি ৪৬ লক্ষ। এর অর্থ, এ সময়ে গড় মাথাপিছু আয় ছিল ২৮৪ টাকা ৭০ পয়সা। আর বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ছিল গড়ে মাত্র শতকরা ০.৭০ ভাগ। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সত্যিই এটি একটি করুণ চিত্র।

সারণি-৭.১৫ থেকে আরো দেখা যায়, ১৯৬৩/৬৪ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে বিদেশ থেকে যা এসেছে তার থেকে অনেক বেশী পরিমাণ পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিদেশে গিয়েছে। ১৯৪৯/৫০-১৯৫৩/৫৪ -এপাঁচ বছরে সেখানে গড় মাথাপিছু আয় ছিল স্থায়ী মূল্যে ২৮২

Dhaka University Institutional Repository

টাকা ৭০ পয়সা, সেখানে আইয়ুবের উন্নয়ন দশক শুরুর প্রথম পাঁচ বছরেও গড় মাথাপিছু আয় ছিল ২৮০ টাকা ২০ পয়সা। ১৯৫৪/৫৫–১৯৫৮/৫৯ কালপর্বে পূর্ব পাকিস্তানের প্রবৃদ্ধির হার ছিল মারাত্মক রকমের নেতিবাচক। অর্থাৎ আগের পাঁচ বছরের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তান শতকরা ৭.২২ ভাগ পিছিয়ে পড়ে। মাথা পিছু আয়ের পরিমাণ ২৬২ টাকা ৩০ পয়সায়নেমে যায়। তবে এক্ষেত্রে আইয়ুব আমলে আবার ইতিবাচক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন, ১৯৬৪/৬৫–১৯৬৮/৬৯ এই পাঁচ বছরে প্রবৃদ্ধির হার গড়ে বার্ষিক ৭.১৩ ভাগে গিয়ে পৌঁছে এবং মাথাপিছু আয়ের পরিমাণও বেড়ে গিয়ে ৩০০ টাকা ৩ পয়সায় দাঁড়ায়। অর্থাৎ আইয়ুব আমলে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। তবে এ আমলের উক্ত প্রবৃদ্ধি থেকে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ কতটুকু উপকৃত হয়েছিল তা বিশেষভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। কেননা ইতিপূর্বের আলোচনা থেকে এটা খুবই পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় কৃষি উৎপাদনে যে অগ্রগতি ঘটেছে তা মোটেই সন্তোষজনক নয়। তার অর্থ হচ্ছে এই যে, আইয়ুব আমলে সামগ্রিকভাবে প্রবৃদ্ধির হার বেড়ে গেলেও তাতে দেশের কৃষক জনতার বার্ষিক মাথাপিছু আয় মোটেই বাড়েনি। এবং আইয়ুব আমলে খাজনা–ট্যাক্সের পরিমাণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে কৃষকের অবস্থার আরো অবনতি হয়েছে। আর সে জন্য গ্রামের মানুষ ক্রমাগত শহরের দিকে ধাবিত হয়েছে। কারণ পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য যে ব্যাপক অর্থ ব্যয় করা হয়েছে তার প্রধান অংশই ব্যয় হয়েছে শহরাঞ্চলে। গ্রামাঞ্চলে টেস্ট রিলিফের কিছু অর্থ ছাড়া প্রায় কোন অর্থই ব্যয় করা হয়নি। উল্লেখ্য, এ টেস্ট রিলিফের টাকাও সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছেনি, এ অর্থের প্রধান অংশই মৌলিক গণতন্ত্রী ও আমলাতন্ত্র এবং তাদের সহযোগী টাউট প্রকৃতির লোকদের হাতে চলে যায়। ফলে টেস্ট রিলিফের আকর্ষন পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামীণ জনসাধাণের সকলকে সেখানে আটকে রাখতে পারেনি।

সারণি ৭.১৬

১৯৪৯/৫০ থেকে ১৯৬৯/৭০ কালপর্বে বিভিন্ন সময়ে পূর্ব বাংলার জনসংখ্যার খতিয়ান

(লক্ষ লোকের হিসেবে)

	১৯৪৯/৫০ – ১৯৫৩/৫৪	১৯৫৪/৫৫– ১৯৫৮/৫৯	১৫৯/৬০ – ১৯৬৩/৬৪	১৯৬৪/৬৫ – ১৯৬৮/৬৯
গ্রামীণ জনসংখ্যা (%	৯৫.৫৬	৯৫.১৩	৯৪.৩৯	৯২.০৭
বৃদ্ধির হার	(–)	(২.৪৭)	(২.৭০)	(২.৬৩)
কৃষিজীবী জনসংখ্যা (%	৮৪.১৭	৮৪.৯৪	৮৪.৯২	৮২.৯৫
বার্ষিক বৃদ্ধির হার	(–)	(২.৮০)	(২.৮৮)	(২.৬৬)
অকৃষিজীবী জনসংখ্যা (%	১১.৩৯	১০.২২	৯.৪৭	৯.১২
বার্ষিক বৃদ্ধির হার	(–)	(০.২৭)	(১.২১)	(২.৩৪)
শহরে জনসংখ্যা (%	৪.৪৪	৪.৮৩	৫.৬১	৭.৯৩
বার্ষিক বৃদ্ধির হার	(–)	(৪.৫৯)	(৬.৫৭)	(১২.৭৯)
মোট জনসংখ্যা (লক্ষ জন)	৪৪৩.৮৪	৫০১.৩২	৫৭৩.৬	৬৬৫.৪০
শতকরা হার	১০০	১০০	১০০	১০০
বার্ষিক বৃদ্ধির হার	(–)	(২.৫৯)	(২.৮৮)	(৩.২০)

*শতকরা হার

**বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার

Source: Alamgir and Berlage (1974): op.cit,.pp.172-74, Table-6.

সারণি–৭.১৬ থেকে দেখা যায়, ১৯৫৪/৫৫–১৯৫৮/৫৯ এই পাঁচ বছরে পূর্ব পাকিস্তানে গড়ে বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ২.৫৯ ভাগ, কিন্তু গ্রামীণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল বার্ষিক শতকরা ২.৪৭ ভাগ। অন্যদিকে, শহরে এ'সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল শতকরা ৪.৫৯ ভাগ। পরবর্তী পাঁচ বছরে শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার দাঁড়ায় শতকরা ৬.৫৭ ভাগে এবং তার পরবর্তী পাঁচ বছরে শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার শতকরা ১২.৭৯ ভাগে পৌঁছায়। শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই দ্রুত হার থেকে বোঝা যায়, আইয়ুব আমলের শেষ পাঁচ বছরে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের প্রায় একমাত্র ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায় শহরাঞ্চল।

শহরাঞ্চলে যে সকল লোকের বাস, বিশেষতঃ যাদের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের মূল ভূমিকা পালিত হয়েছিল সেই শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও সামরিক বেসামরিক আমলাদের প্রধান অংশ কারা ছিল এবং তাদের পরিবার ও সম্পত্তির কেন্দ্র স্থল কোথায় তা জানা গেলেই এ কথা পরিষ্কার হয়ে উঠবে যে, মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ বেড়ে গেলেও তাতে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের আয় কতটুকু বেড়েছিল।

৭.৫ পাকিস্তান রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে পূর্ব পাকিস্তানে বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে বাঙালীদের অবস্থান

পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচনায় এটা দেখা গেছে যে, মূলতঃ সরকারী সাহায্যের ওপর নির্ভর করেই এঅঞ্চলের বুর্জোয়ারা একটি শ্রেণী হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এ অঞ্চলের বিত্তবানদের মধ্যে যারা গ্রামে বাস করতো তাদের মধ্যে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতি তেমন কোন আগ্রহ ছিল না। তারা উৎপাদন কর্মে অংশ না নিয়েই উদ্বৃত্ত শোষণ করতে চাইতো। অর্থাৎ গ্রামের বড় খামার মালিকগণ যতটা না পুঁজি বিনিয়োগ করে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে আগ্রহী ছিল, তার চেয়ে জমি কিংবা গবাদি পশু বর্গা দিয়ে কিংবা সুদে টাকা খাটিয়ে মুনাফা অর্জন করতে অনেক বেশী আগ্রহী ছিল। সাধারণতঃ তারা মৌসুমের সময় খুব নিম্নমূল্যে দরিদ্র জনসাধারণের কাছ থেকে ফসল কিনে মজুদ করে রাখতো, আর দাম বাড়লে তা বিক্রী করে বিপুল মুনাফা অর্জন করতো। স্থানীয় ব্যবসা বাণিজ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেও তারা তাদের উদ্বৃত্তের পরিমাণকে বৃদ্ধি করতো।[৭৯]

এর পর সরকার থেকে ধীরে ধীরে যখন ঋণ, সার বা সেচ সুবিধা প্রদান করা শুরু হল কিংবা ওয়ার্কস প্রোগ্রামের জন্য অর্থ আসতেও থাকলো, তখন গ্রামের এই বিত্তবানদের জন্য সম্পত্তি বৃদ্ধির জন্য নতুন ক্ষেত্র উন্মোচিত হল। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এ বাড়তি সম্পদ আহরণের ফলে এবং মৌলিক গণতন্ত্রী ব্যবস্থা চালু হওয়ার সুবাদে গ্রামীণ দরিদ্রদের ওপর বিত্তশালীদের নানাবিধ কায়দায় শোষণ করার ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পেলো।[৮০] পরবর্তীকালে বাঙালীদের মধ্যে যে গোষ্ঠীটি বুর্জোয়া শ্রেণী হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এটিই সে

৭৯. Sobhan, Rehman and Muzaffar Ahmed (1980): Public Enterprise in an Intermediate Regime- A Study in the Political Economy of Bangladesh, Dacca: BIDS, p. 56.

৮০. Ibid, p. 56.

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেণীর বিকাশের সাধারণ পটভূমি।[৮১] ফলে উক্ত বিকাশমান বাঙালী বুর্জোয়াদের পক্ষে পাকিস্তান আমলের শেষ দিন পর্যন্তও শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব হয়নি। যাহোক, পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প, আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যেকার ব্যবসা ব্যাংক ও বীমাসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ওপর কাদের নিয়ন্ত্রণ ছিল সে সব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। সে কারণে এ সকল ব্যাপারে এখানে বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে ইতিপূর্বে সম্পাদিত সকল গবেষণার ফলাফলকে নীচে সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।[৮২]

ষাট দশকের শেষের দিকে অবাঙ্গালী শিল্পপতিগণ পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পখাতের শতকরা ৪৭ ভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। অথচ এ সময়ে বাঙালীরা এখাতের মাত্র শতকরা ২৩ ভাগকে নিয়ন্ত্রণ করতো আর পূর্বপাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (EPIDC) নিয়ন্ত্রণ করতো বাকি শতকরা ৩৪ ভাগ। শিল্পের বেসরকারী খাতের ওপর অবাঙালীদের নিয়ন্ত্রণ ছিল আরো বেশি। তারা শতকরা ৭২ ভাগ শিল্প সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। শুধু তাই নয়, শতকরা ১৯ ভাগ চা বাগানও অবাঙ্গালী মালিকদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

পূর্ব পাকিস্তানের বৈদেশিক বাণিজ্য পরিপূর্ণ অর্থেই অবাঙ্গালীদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। আমদানি বাণিজ্যের শতকরা ৯৩ ভাগকে নিয়ন্ত্রণ করতো অবাঙ্গালীরা; একমাত্র মেমন সম্প্রদায়ই এবাণিজ্যের শতকরা ৫৭ ভাগকে নিয়ন্ত্রণ করতো। পাকিস্তানের দু'অংশের মধ্যেকার আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যেও অবাঙ্গালীদের নিরংকুশ প্রাধান্য ছিল। আমদানি বাণিজ্যের জন্য যে সামান্যসংখ্যক লাইসেন্স বাঙ্গালীরা পেয়েছিল এর অধিকাংশই বিত্তবান অবাঙ্গালীদের কাছে বিক্রি হয়ে যেত। কেননা এই বাঙ্গালী লাইসেন্সধারীদের শতকরা ৯৫ ভাগই ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্র লাইসেন্স এর মালিক। পূর্ব পাকিস্তানের রপ্তানি বাণিজ্যেও অবাঙ্গালীদের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। পূর্ব পাকিস্তান থেকে শিল্পপণ্য যা কিছু পশ্চিম পাকিস্তানে রপ্তানি হত সেখানে অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য ছিল একচেটিয়া। অবশ্য পাট রপ্তানি বাণিজ্যে বাঙ্গালীদের একটি অবস্থান ছিল, তারা এবাণিজ্যের শতকরা ৩৩ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করতো; অন্যদিকে অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা নিয়ন্ত্রণ করতো এ বাণিজ্যের শতকরা ২৩ ভাগ। অবশিষ্ট অংশ সরকারী সংস্থা বা বিদেশীদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। শুধু তাই নয়, পূর্ব পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ পাইকারী ব্যবসার ওপর অবাঙ্গালীদের নিয়ন্ত্রণ ছিল প্রায় একচেটিয়া। এমনকি, শহরাঞ্চলের বড় বড় খুচরা ক্রয়-বিক্রয়ের কেন্দ্রগুলিতেও তাদের উল্লেখযোগ্য পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাংকসমূহে যে অর্থ এ সময়ে জমা হয়েছিল তার শতকরা ৭০ ভাগ অর্থ অবাঙ্গালী ব্যাংকসমূহে সঞ্চিত ছিল। অবাঙ্গালীরা বীমা ব্যবসায়ের প্রধান অংশকে নিয়ন্ত্রণ করতো। এমনকি, অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণের ক্ষেত্রে যে তিনজন বৃহৎ জাহাজ মালিকের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল তাদের মধ্যে দু'জনই ছিল অবাঙ্গালী।[৮৩]

শুধু পূর্ব পাকিস্তানে নয়, গোটা পাকিস্তানের সমুদয় সম্পত্তি ও অর্থনীতির ওপর কয়েকটি ব্যবসায়ী পরিবারের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এনিয়ন্ত্রণের মূলে ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা। ১৯৬২ সালের এক হিসাব থেকে দেখা যায়, মাত্র ৪৩টি পরিবার সে সময় পাকিস্তানের সকল শিল্প ও ব্যবসায়িক সম্পত্তির শতকরা ৭২.৮ ভাগের মালিক হয়ে বসেছিল। ষাট দশকের পুরো সময়ই এ পরিবারসমূহের আধিপত্য অব্যাহতভাবে বেড়ে চলেছিল। ১৯৬৩ সালে শিল্প ও ব্যবসায়িক সম্পত্তির শতকরা ৭৩.৭ ভাগের ওপর এপরিবারগুলির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। শিল্প ক্ষেত্রে এ কেন্দ্রীভবনের অনুপাত ছিল আরো বেশি। উক্ত ৪৩টি পরিবার এ সময় শতকরা ৭৭.৩ ভাগ শিল্প সম্পত্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল। ঐ ৪৩টি পরিবার পূর্ব পাকিস্তানের ওপরও তাদের বিশেষ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। ষাট দশকে এপরিবারগুলি পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা ৪৫.১ ভাগ ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অধীনস্থ সম্পত্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। উক্ত ৪৩টি পরিবারের মধ্যে শুধুমাত্র একটি পরিবার ছিল বাঙ্গালী। মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আগত এ.কে.খানের এ বাঙালী পরিবারটি তখন মোট ৭ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকার মালিক ছিল এবং সম্পত্তির মূল্যের দিক থেকে তিনি উক্ত ৪৩ জনের মধ্যে ২৯ তম ব্যক্তি ছিলেন। সমগ্র পাকিস্তানে ৪৩ জনের যে মোট সম্পত্তি ছিল তার শতকরা ১.২ ভাগের মালিক ছিল এ.কে খান। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে মোট যে শিল্প সম্পদ ছিল তার মধ্যে এ.কে. খানের অংশ ছিল শতকরা ৪.৩ ভাগ। অর্থাৎ বাকি ৪২ জন অবাঙ্গালী শিল্পপতিই সে সময় পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা ৪০.৮ ভাগ শিল্প সম্পত্তির মালিকানা অর্জন করে। বৃহত্তর শিল্পসমূহের ওপর এই অবাঙ্গালী শিল্পপতিদের নিয়ন্ত্রণ আরো বেশি ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের আধুনিক শিল্পকারখানার মোট স্থায়ী সম্পত্তির শতকরা ৭২ ভাগের ওপর এ অবাঙ্গালী শিল্পপতিদের নিয়ন্ত্রণ ছিল। শুধু শিল্প কারখানার ওপর যে এ পরিবারগুলির একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ছিল তা নয়, ব্যাংক ও বীমার ওপরও এদের নিয়ন্ত্রণ ছিল একচেটিয়া। পূর্ব পাকিস্তানে যে পাকিস্তানী ব্যাংক ও বীমা কোম্পানিগুলি সে সময় কার্যকর ছিল তাদের মোট সম্পত্তির শতকরা ৭৫.৬ ভাগের মালিক ছিল উক্ত ৪৩ জনের মধ্যে ১৪ জন। উক্ত ১৪ জন ব্যক্তির ব্যাংক ও বীমার অধীনস্থ মোট সম্পত্তির মাত্র শতকরা ২ ভাগের মালিক ছিল বাঙ্গালী এ.কে খান পরিবার।[৮৪]

উপরোক্ত বিবরণ থেকে একথা খুবই পরিষ্কার যে, যদিও ষাট দশকের শেষ দিকে পূর্ব পাকিস্তানে বেশ দ্রুত গতিতে শিল্পায়ন হয়েছে এবং তার ফলাফল হিসাবে মাথা পিছু আয়ের পরিমাণ বেশ বেড়ে গেছে তবু এসকল শিল্প সম্পদের মালিক কিংবা বাড়তি আয়ের অংশীদার খুব কম অল্পসংখ্যক বাঙ্গালী হতে পেরেছে। অন্যদিকে অবাঙ্গালী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা পূর্ব পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে বসবাস না করে পশ্চিম পাকিস্তানকে তারা তাদের স্থায়ী বাসস্থান হিসাবে গড়ে তোলে। এদের মধ্যে কেউ কেউ পাকিস্তানের বাইরেও আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্যের সাথেও যুক্ত ছিল।[৮৫] এ সকল অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের অধিকাংশের স্থায়ী বাসস্থানই শুধু পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল না, তারা মূলত ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে বাড়তি মুনাফা অর্জনের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিল।[৮৬] তবে

---

৮১. Ibid,p. 57.

৮২. এ আলোচনার জন্য নিম্নোক্ত তথ্য উৎসসমূহকে ব্যবহার করা হয়েছে। Rehman Sobhan (1990): 'The Economic Basis of Nationalism' memio, Dhaka: BIDS, pp. 45-64; to Rehman Sobhan and Muzaffar Ahmed (1980): op.cit., Chapter. 5. pp. 54-76. Hauna Papanek (1969): 'Entreprencurs in East Pakistan' South Asian Series Research Paper No. 16. Published by Asian Studies Centre, Mechigan State University.

৮৩. Sobhan, Rehman (1990): 'The Economic basis of bangali Nationalism' memio, Dhaka: BIDS, pp. 53-54.

৮৪ Sobhan, Rahman and Ahmed, Mazaffar (1980): of.cit., pp.53-54.

৮৫. ডঃ আব্দুল গফুর, গবেষণা পরিচালক, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস), লেখকের সাথে এক সাক্ষাতকারে বোরহা সম্প্রদায় সম্পর্কে তাদের ব্যবসার আন্তর্জাতিক চরিত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। সাক্ষাতকারটি গ্রহণ করা হয় ২১শে অক্টোবর, ১৯৯১।

৮৬. Sobhan, Rehman and Muzaffar Ahmad (1980): op.cit., p. Annexure 1.5, pp. 74-75.

Dhaka University Institutional Repository

এদের মধ্যে দু'চারজন অবাঙ্গালী শিল্পপতি বাড়ি-ঘর নির্মাণ করে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে এখানে বসবাস করেন। অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানেই তাদের মূল বাড়ি-ঘর ছিল এবং তাদের পরিবার পরিজনও সেখানেই থাকত।[৮৭] ফলে তাদের বিনিয়োজিত পুঁজি থেকে অর্জিত মুনাফার পরিপূর্ণ অংশ কখনই পূর্ব পাকিস্তানে বিনিয়োজিত হত না। পূর্ব পাকিস্তান থেকে এদের মুনাফার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়মিতভাবে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করা হত। অবশ্য এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম হল ইস্পাহানী পরিবার যারা অবাঙ্গালী হয়েও পূর্ব পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে বসবাস করে।[৮৮] কিন্তু শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মূল কেন্দ্রস্থল পশ্চিম পাকিস্তানে থাকায় ঐ পরিবারের অর্জিত মুনাফারও একটি বড় অংশ পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হয়।

সে যা হোক, ষাট দশকে পূর্ব পাকিস্তানের যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির চিত্র উপরে তুলে ধরা হয়েছে তা সেখানকার বাঙ্গালী জনসাধারণের কাছে ছিল একটি নির্মম তামাসার সামিল। কারণ এতে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের তেমন কোন উন্নতি হয়নি। কেননা সাধারণতঃ উন্নতির সাথে সাথে মানুষের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন ধরনের সেবামূলক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পায়। পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের জীবনে অবশ্য এ সকল সুযোগ-সুবিধা সামান্যই বাড়ে। পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের জীবনে এ সকল সুযোগ সুবিধা কি পরিমাণ বেড়েছিল সে সম্পর্কে শুধু মাত্র একটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠবে। আর এক্ষেত্রে পাকিস্তানের দু'অংশের মধ্যে বৈষম্যের পরিমাণ কত ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল তাও স্পষ্ট হবে।

প্রত্যেক সমাজেই শিক্ষাকে উন্নয়নের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসাবে গণ্য করা হয়। পাকিস্তানের জন্ম লগ্নে পূর্ব পাকিস্তান একটি পশ্চাদপদ অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও এখানে শিক্ষার ক্ষেত্রে যতটুকু সুযোগ-সুবিধা ছিল পরবর্তীকালে সেটাও থাকেনি। শিক্ষক ও জনসংখ্যার অনুপাতকে মানদন্ড হিসাবে ধরলে দেখা যায়,পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরুতে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছিল, তার শেষ বছরগুলিতে এর চেয়ে সুযোগ-সুবিধার পরিমাণ একটুও বাড়েনিবরং তখনও অনেক নীচেই ছিল।[৮৯] প্রতি শিক্ষক পিছু যত কমসংখ্যক লোক থাকে ততই জনসাধারণের শিক্ষা-সুবিধা বৃদ্ধি পায় বলে ধরে নেওয়া হয়। দু'টি দিক থেকে এটা গুরুত্বপূর্ণঃ প্রথমত, জনসংখ্যার অনুপাতে শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে শিক্ষা ক্ষেত্রে জনসাধারণের সুযোগ-সুবিধা বাড়ে, অন্যদিকে শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থই হচ্ছে কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে দু'দিক থেকেই মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। সারণি ৭.১৭ থেকে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে জনসাধারণের সুযোগ সুবিধার একটি স্পষ্ট চিত্র ফুটে ওঠে।

সারণি ৭.১৭
পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন সময় প্রাথমিক শিক্ষকদের গড় সংখ্যা

শিক্ষা বর্ষ	পূর্ব পাকিস্তান			পশ্চিম পাকিস্তান			প্রতি ১০ হাজার লোকের জন্য শিক্ষক সংখ্যা			মোট জনসংখ্যা (কোটি)		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পূঃ পাকিস্তান	প. পাকিস্তান	পাকিস্তান	পূঃ পাকিস্তান	প. পাকিস্তান	পাকিস্তান
১৯৪৭-৫১	৬৬,৮৯৪ (১০০)	২৫২২ (১০০)	৬৯,৪১৬ (১০০)	১৭,০৩৫ (১০০)	২৫৬১ (১০০)	১৯,৫৯৬ (১০০)	১৭.১০ -	৬.১৪ -	১২.২৮ -	৪.০৬ -	৩.১৯ -	৭.২৫ -
১৯৫১-৫৫	৬৬,২৩৪ (৯৯.০১)	১,৮৬৮ (৭৪.০৭)	৬৮,১০২ (৯৮.১০)	২৬,৪৬৫ (১৫৫.৩৫)	৪৬৯০ (১৮৩.৯৩)	৩১,১৫৫ (১৫৮.৯৮)	১৫.৩৭ -১০.১২)	৮.৯৫ (৪৫.৭৭)	১২.৫৫ (২.২০)	৪.৪৩ (৯.১১)	৩৪৮ (৯.০৯)	৭.৯১ (৯.১০)
১৯৫৫-৫৯	৭১,৯৯৮ (১০৭.৬২)	১,৭৬৭ (৭০.০৬)	৭৩,৭৬৫ (১০৬.২৬)	৩৩,৭০৭ (১৯৭.৮৭)	৬৩০৯ (২৪৬.৩৫)	৪০,০১৬ (২০৪.২০)	১৪.৭২ (-৪.২৩)	১০.১৬ (+১৩.৫)২	১২.৭১ (১.২৭)	৫.০১ (১৩.০৯)	৩.৯৪ (১৩.২২)	৮.৯৫ (১৩.১৬)
১৯৫৯-৬৩	৮০৩২২ (১২০.০৭)	১৬৯৭ (৬৭.২৯)	৮২০১৯ (১১৮.১৫)	৪২৬৩৮ (২৫০.২৯)	১০৬৭৫ (৪১৬.৮৩)	৫৩৩১৩ (২৭২.০৬)	১৪.২৯ (-২.৯২)	১১.৮২ (+১৬.৩৪)	১৩.২০ (৩.৮৬)	৫.৭৪ (১৪.৫৭)	৪.৫১ (১৪.৪৭)	১০.২৫ (১৪.৫২)
১৯৬৩-৬৬	৯২৪৬৩ (১৩৮.২৯)	২০৭৪ (৮২.২৪)	৯৪৫৩৭ (১৩৬.১৯)	৫৯৬১০ (৩৪৯.৯২)	১২৬০৪ (৪৯২.১৫)	৭২২১৪ (৩৬৮.৫১)	১৪.২২ (-০.৪৯)	১৩.৮১ (১৬.৮৪)	১৪.০৪ (৬.৩৬)	৬.৬৫ (১৫.৮৫)	৫.২৩ (১৫.৯৬)	১১.২৮৮ (১৫.৯১)
১৯৪৭-৬৬ কালপর্বে বৃদ্ধির হার	৩৮.১২	-১৭.৭৬	৩৬.১৯	২৪৯.৯২	৩৯২.১৫	২৬৮.৫১	-১৬.৮৪	+১২৪.৯২	+১৪.৩৩	৬৩.৭৯	৬৩.৯৫	৬৩.৮৬

Source: S.M. Ikhtiar Ul Mulk (1968): 20 Years of Pakistan in Statistics 1947-1967, Karachi: Central Statistical office, Karachi. p-174, Table No.9.3.

সারণি-৭.১৭ থেকে দেখা যায়, ১৯৪৭/৪৮-১৯৫০/৫১ কালপর্বে পূর্ব পাকিস্তানে মোট প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক সংখ্যা ছিল ৬৯ হাজার ৪১৬ জন। এদের মধ্যে শতকরা ৯৬.৩৭ ভাগ ছিল পুরুষ, আর শতকরা ৩.৬৩ ভাগ ছিল মহিলা। অথচ তার পরবর্তী চার বছরের গড় শিক্ষক সংখ্যা একটুও বাড়েনি, বরং শতকরা প্রায় ২ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাকালে পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে অনেক পিছিয়ে ছিল। সেখানে মোট প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক সংখ্যা ছিল ১৯ হাজার ৫৯৬ জন, যার ভিতর শতকরা ৮৬.৯৩ জন ছিল পুরুষ আর শতকরা ১৩.০৭ জন ছিল মহিলা। পরবর্তী চার বছরে এ সংখ্যা মোটেও হ্রাস পায়নি বরং শতকরা ৫৮.৯৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক মোট সংখ্যা ৩১ হাজার ১৫৫ জনে দাঁড়িয়েছে। এখানে পুরুষ শিক্ষক সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেছে শতকরা ৫৫.৩৫ ভাগ, আর মহিলা শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ৮৩.১৩ ভাগ। সমগ্র পাকিস্তান আমলে এ অবস্থা বিদ্যমান থাকে। সারণি ৭.১৭ থেকে দেখা যায়, পূর্ব পাকিস্তানে পরবর্তীকালে কিছু পরিমাণ প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক সংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু পরিপূর্ণভাবেই পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পাকিস্তানের শুরু থেকে ১৯৬৫/৬৬ সাল নাগাদ পূর্ব পাকিস্তানে প্রাথমিক

৮৭. অধ্যাপক রেহমান সোবহান লেখকের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে সব মুসলমান ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি পাকিস্তানে আসে তারা সবাই পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়েই নতুন করে বাসস্থান তৈরি করেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানেই তারা ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ পূর্ব বাংলায় এসে বাসস্থান তৈরি করে ঠিকই, কিন্তু তা ছিল খুবই অস্থায়ী। এদের সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মূল অংশ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে, পরিবার-পরিজনের অধিকাংশ এবং প্রায় সকলআত্মীয়-স্বজন পশ্চিম পাকিস্তানে বাস করতো। ফলে পূর্ববাংলায় এদের অবস্থান কোন ক্রমেই এখানকার নাগরিক হিসাবে নয়, তারা সাময়িকভাবে অবস্থান করতো এখানে। সাক্ষাতকারের তারিখ ২১শে অক্টোবর, ১৯৯১।

৮৮. Sobhan, Rehman and Muzaffar Ahmad (1980): op.cit, p. 74.

৮৯. Mulk, S.M. Ikhtiar Ul (1968): 20 Years of Pakistan in Statistics 1947-1967, Karachi: Central Statistical Office, p. 174.

Dhaka University Institutional Repository

স্কুলের শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি পায় শতকরা ৩৬.১৯ ভাগ। এ সময় মহিলা শিক্ষক সংখ্যা একজনও বাড়েনি বরং শুরুতে যতজন ছিলেন তার থেকে শতকরা ১৭.৭৬ ভাগ হ্রাস পায়। অবশ্য পুরুষ শিক্ষকের সংখ্যা শতকরা ৩৮.২০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানে যে হারে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি পায় সে বৃদ্ধির সাথে পূর্ব পাকিস্তানে বৃদ্ধির কোন তুলনাই হয় না। পশ্চিম পাকিস্তানে এ সময় মোট শতকরা ২৬৮.৫১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে পুরুষ শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ২৪৯.৯২ ভাগ, আর মহিলা শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ৩৯২.১৫ ভাগ।

পূর্ব পাকিস্তানে মোট শিক্ষক সংখ্যা বেড়ে গেলেও জনসাধারণের শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা মোটেই বাড়েনি; বরং অব্যাহতভাবে হ্রাস পেতে থাকে। সারণি ৭.১৭ থেকে দেখা যায়, ১৯৪৭/৪৮-১৯৫০/৫১ কালপর্বে পূর্ব পাকিস্তানে প্রতি ১০ হাজার লোকের জন্য ১৭.১০ জন শিক্ষক নিয়োজিত ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে শিক্ষক ও লোকসংখ্যার উক্ত আনুপাতিক হার বহাল থাকেনি, বরং ক্রমশঃ হ্রাস পেয়েছে। এমনকি, আইয়ুবের উন্নয়ন দশকেও শিক্ষার সুযোগ না বেড়ে সংকুচিত হওয়ার সকল প্রবণতা অব্যাহত থেকেছে। ১৯৬৩/৬৪-১৯৬৫/৬৬ কালপর্বে এসে দেখা গেছে গোড়ার দিকে যতটুকু সুযোগ-সুবিধা ছিল তার চেয়ে শতকরা ১৬.৮৪ ভাগ কমে গেছে। শুরুতে যেখানে প্রতি ১০ হাজার লোকের জন্য ১৭.১০ জন শিক্ষক নিয়োজিত ছিল, সেখানে শেষের দিকে সমসংখ্যক লোকের জন্য নিয়োজিত শিক্ষক সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ১৪.১২ জন। পশ্চিম পাকিস্তানের পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। শুরুতে সেখানে প্রতি ১০ হাজার লোকের জন্য মাত্র ৬.১৪ জন শিক্ষক নিয়োজিত ছিল যা শেষদিকে এসে ১৩.৮১ জনে পৌঁছায়। পশ্চিম পাকিস্তানেমাত্র ১৮/১৯ বছরে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সুবিধা শতকরা ১২৪.৯২ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন উঠতে পারে, শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া একটি অঞ্চলকে অগ্রসর করে নেওয়ার দায়িত্ব তো সরকারেরই; পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সুবিধা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের সুযোগ-সুবিধার সমতুল্য করাতো মোটেই দূষণীয় নয়। এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য আরো আলোচনা করা যেতে পারে, তবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের যে এ ধরনের কোন সৎ উদ্দেশ্য ছিল না তা শিক্ষা ক্ষেত্রের অন্য একটি তথ্য থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সে তথ্য থেকে দেখা যাবে পাকিস্তানের শুরু থেকেই পূর্ব পাকিস্তান অপেক্ষা পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক বেশী সুযোগ-সুবিধা পেয়ে আসছিল; কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের এ সুযোগ-সুবিধা মোটেই সংকুচিত হয়নি। বরং খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। অপর দিকে পাকিস্তানের গোড়ার দিকে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানে যতটুকু সুযোগ-সুবিধা পেয়েছিল সেটাও শেষের দিকে সর্বাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়নি। অর্থাৎ শেষের দিকে এ সুযোগ-সুবিধা খানিকটা বাড়লেও তা শুরুর বছরগুলির তুলনায় অনেক কমে গিয়েছিল। সারণি ৭.১৮ থেকে এ ব্যাপারে একটি স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যাবে।

সারণি ৭.১৮

পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন সময় প্রাথমিক শিক্ষকদের গড় সংখ্যা

শিক্ষা বর্ষ	পূর্ব পাকিস্তান			পশ্চিম পাকিস্তান			প্রতি ১০ হাজার লোকের জন্য শিক্ষক সংখ্যা		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পূর্ব বাংলা	প. পাকিস্তান	পাকিস্তান
১৯৪৭/৪৮-	২৩,১৭১	১০০৩	২৪৭৪	১৭৪৭৬	১৯৪২	১৯৪১৮	৫.৯৫	৬.০৯	৬.০১
৫০/৫১	(১০০)	(১০০)	(১০০)	(১০০)	(১০০)	(১০০)	-	-	-
১৯৫১/৫২-	২১৩১১	৯২৬	২২২৩৭	১৮৬২৪	৩৩৯১	২২০১২৫	৫.০২	৬.৩৩	৫.৫৯
৫৩/৫৫	(৯১.৯৭)	(৯২.৩২)	(৯১.৯৯)	(১০৬.৫৭)	(১৭৪.৬১)	(১১৩.৩৭)	(--১৫.৬৩)	(+৩.৯৪)	(-৬.৯৯)
১৯৫৫/৫৬-	২১৬৮৮	১০৪০	২২৯০৮	২৫৪২৩	৪৬৫৭	৩০০৮০	৪.৫৭	৭.৬৩	৫.৯২
৫৮/৫৯	(৯৪.৩৮)	(১০৩.৩৯)	(৯৪.৭৬)	(১৪৫.৪৭)	(২৩৯.৮)	(১৫৪.৯১)	(-৮.৯৬)	(২০.৫৪)	(৫.৯০)
১৯৫৯/৬০-	২৩৭৬৩	১৪৫০	২৫২১৩	২৯৭৯৩	৬৬০৯	৩৬৪০২	৪.৩৯	৮.০৭	৬.০১
৬২/৬৩	(১০২.৫৫)	(১৪৪.৫৭)	১০৪.৩০)	(১৭০.৪৮)	(৩৪০.৩২)	(১৮৭.৪৬)	(-৩.৯৪)	(৫.৭৭)	(১.৫২)
১৯৬৩/৬৪-	৩১৮২৯	২১৩৯	৩৩৯৬৮	৩৮৯৮৮	১১১০৯	৫০০৯৭	৫.১১	৯.৫৮	৭.০৮
৬৫/৬৬	(১৩৭.৩৬)	(২১৩.২৬)	১৪০.৫১)	(২২৩.০৯)	(৫৭২.০৪)	(২৫৭.৯৯)	(১৬.৪০)	(১৮.৭১)	(১৭.৮০)
১৯৪৭-৬৬ কালপর্বে বৃদ্ধির হার	৩৭.৩৭	১১৩.২৬	৪০.৫১	১২৩.০৯	৪৭২.০৪	১৫৭.৯৯	(-১৪.১২)	(+৫৭.৩১)	-

Source: S.M. Ikhtiar Ul Mulk (1968): 20 Years of Pakistan in Statistics 1947-1967, Karachi: Central Statistical office, Karachi. p-175, Table no. 9.3.

সারণি-৭.১৮ থেকে দেখা যায়, ১৯৪৭/৪৮ সনথেকে ১৯৬৫/৬৬ এই ১৮ বছরে পূর্ব পাকিস্তানে মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধির হারমোট শতকরা ৪০.৫১ ভাগ। অথচ এই একই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ। পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার প্রায় একই থাকলেও এ সময়ে সেখানে মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকের সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ১৫৭.৯৯ ভাগ। শুরুতেই পূর্ব পাকিস্তান অপেক্ষা পশ্চিম পাকিস্তানীরা মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ক্ষেত্রে বেশি সুযোগ সুবিধা পেতো। ১৯৪৭/৪৮-১৯৫০/৫১ কালপর্বে পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীরা যেখানে প্রতি ১০ হাজার জনে ৫.৯৫ জন মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষকের সুবিধা পেতো সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানীরা পেতো ৬.০৯ জন শিক্ষকের সুবিধা। পরবর্তীকালে পূর্বপাকিস্তানে এ ক্ষেত্রের সুবিধা ক্রমে হ্রাস পেয়েছে কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে গেছে। শুধু মাত্র ১৯৬৩/৬৪-১৯৬৫/৬৬ এই তিন বছরেই কেবলমাত্র পূর্ব পাকিস্তানে কিছু পরিমাণে এ সুবিধা বেড়েছে। তা সত্ত্বেও এ সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে প্রতি ১০ হাজার জন লোকের জন্য মাত্র ৫.১১ জন মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষক নিয়োজিত ছিল, অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে এই সমসংখ্যক মানুষের জন্য নিয়োজিত ছিল ৯.৫৮ জন মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষক। উক্ত কালপর্বে, পূর্ব পাকিস্তানে মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ যেখানে শতকরা ১৪.১২ ভাগ সংকুচিত হয়েছে সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানে এ সুযোগ বর্ধিত হয়েছে শতকরা ৫৭.৩১ ভাগ।

উপরের তুলনামূলক আলোচনা থেকে দেখা যায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সমগ্র পাকিস্তান আমলে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ থেকে অনেক বেশি সুযোগ সুবিধা পেয়েছে। এমনকি, আইয়ুব খানের উন্নয়ন দশকেও এ বৈষম্যের হার হ্রাস পায়নি, বরং অনেক বেশি হারে বেড়ে গেছে। শিল্প কারখানার বিকাশের দিক থেকে আইয়ুব আমলে পূর্ব পাকিস্তানে যে বিশেষ প্রবৃদ্ধির হার দেখা যায় তার প্রভাব খুব সামান্যই জনসাধারণের জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে। এছাড়া,

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রীয় সহযোগিতার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে যে বৃহৎ শিল্প কারখানার বিকাশ ঘটেছে তার দ্বারাও পূর্ব পাকিস্তানের স্থায়ী অধিবাসীদের তেমন কোন উন্নতি হয়নি। অবশ্য পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচনায় দেখা গেছে ষাটের দশকের শেষে রাষ্ট্রীয় সহায়তা ও বিদেশী পুঁজির অনুপ্রবেশের কারণে পূর্ব পাকিস্তানে শিল্পের যে বৃহৎ খাতটি গড়ে উঠেছিল তার বিকাশের গতি শেষ দিকে খুবই মন্থর হয়ে যায়। সে তুলনায় মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশের মাত্রা অনেক বৃদ্ধি পায়। উপরের আলোচনা থেকে এটাও দেখা গেছে, পূর্ব পাকিস্তানের ভারী ও বৃহৎ শিল্পখাতটির মালিকানা ছিল প্রধানত অবাঙালীদের হাতে, যা মূলতঃ রাষ্ট্রীয় সহায়তার ওপর নির্ভরশীল ছিল। অন্যদিকে, ছোট ও মাঝারি শিল্পগুলির কোন কোনটি সামান্য সরকারী ও প্রতিষ্ঠানিক সুবিধা গেলেও প্রায় সকল ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানের ওপর অবাঙ্গালীদের এক চেটিয়া নিয়ন্ত্রণ থাকায় উক্ত সরকারী ও প্রতিষ্ঠানিক সুবিধাপ্রাপ্ত ছোট ও মাঝারি শিল্পগুলি অধিকাংশের মালিকানা অবাঙ্গালীদের কাছে ন্যস্ত ছিল। সে যা হোক, এসব সরকারী ও প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্যপ্রাপ্ত শিল্প সংগঠনকে বাদ দিলেও দেখা যায় পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষুদে শিল্পগুলির মাধ্যমে ষাট দশকের শেষে বেশ দ্রুতগতিতে অবাঙ্গালী শিল্পপতিদের বিপরীতে একটি বাঙ্গালী শিল্পপতি শ্রেণীর বিকাশের সম্ভাবনা দেখা দেয়। আর এটাই পূর্ব পাকিস্তানে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী চেতনার অর্থনৈতিক ভিত্তি প্রস্তুত করে।

৭.৬ সামরিক অধ্যাদেশ সমূহের প্রয়োগ ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিয়ন্ত্রণের কাজে তা ব্যবহার

সামরিক শাসন জারির পর থেকেই পাকিস্তানের উভয় অংশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের ওপর নিপীড়ন নেমে আসে। সামরিক শাসন জারির সপ্তাহখানেকের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও শেখ মুজিব সহ শত শত রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়।[৯০] ব্যাপক হারে রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করার কারণ হিসাবে তাদের বিরুদ্ধে প্রধানতঃ দুই ধরনের অভিযোগ উথাপন করা হয়। যে সকল রাজনৈতিক নেতা ইতিপূর্বে ক্ষমতাসীন ছিলেন তাদের বিরুদ্ধে আনা হয় দুর্নীতির অভিযোগ, আর যে সকল রাজনীতিবিদের বিরুদ্ধে এ ধরনের বিশ্বাসযোগ্য কোন অভিযোগ আনা সম্ভবপর ছিল না তাদেরকে পাকিস্তানের নিরাপত্তা ও আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার জন্য হুমকিস্বরূপ বলে ঘোষণা করা হয়। সামরিক শাসন জারির পর যেসব নেতা কর্মীকে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় তাদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজনের নাম ১৯৫৮ সালের ১৩ অক্টোবর তারিখের পাকিস্তান অবজারভারে প্রকাশিত হয়। এদের মধ্যে ছিলেন ৪ জন প্রাক্তন মন্ত্রী, ৩ জন প্রাক্তন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য এবং ৩ জন উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী কর্মকর্তা। একমাত্র মওলানা ভাসানী ছাড়া অন্যান্যদের দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। যে চারজন মন্ত্রীকে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় তারা হলেন সর্বজনাব আবুল মনসুর আহমেদ, আবদুল খালেক, শেখ মুজিবুর রহমান ও হামিদুল হক চৌধুরী।[৯১] অন্যদিকে, মওলানা ভাসানীর বেলা বলা হয়, তিনি এমন সব কর্মকান্ডের সাথে জড়িত যার ফলে পাকিস্তানের নিরাপত্তাব্যবস্থা হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। তার বিভিন্ন বক্তৃতা ও অন্যান্য কার্যকলাপের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে এমন ধারনা সৃষ্টি হয়েছে যে, পাকিস্তান বুঝি তাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। শুধু তাই নয়, ভাসানীর বিভিন্ন কার্যকলাপের কারণে দেশের বিভিন্ন স্তরের জনগোষ্ঠীর মধ্যে এমন ধরনের হিংসার ভাব জন্ম নিয়েছে যা পাকিস্তানের জাতীয় ঐক্য ও সামাজিক শান্তির জন্য খুবই অনিষ্টকর। আটকের কারণ জানিয়ে ভাসানীকে লেখা এক সরকারী চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, তার এ কার্যকলাপ পাকিস্তান নিরাপত্তা আইন, ১৯৫২ অনুযায়ী দন্ডনীয় অপরাধ হিসাবে বিবেচিত এবং সেই হিসাবে তাকে নিরাপত্তা বন্দী হিসাবে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[৯২] উক্ত চিঠি প্রদানের দু'দিন পর অর্থাৎ ১৯৫৮ সালের ১২ অক্টোবর মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি দীর্ঘ এক বছর কারগারে জীবন যাপন করেন। এরপর ১৯৫৯ সালের ৬ই অক্টোবর থেকে ১৯৬২ সালের ৩রা নভেম্বর পর্যন্ত তিনি এক সরকারী গৃহে অন্তরীণ থাকতে বাধ্য হন।[৯৩]

দুর্নীতির দায়ে যাদের গ্রেফতার করা হয় তাদের অনেকের নামে অচিরেই নিরাপত্তাজনিত অভিযোগ উথাপন করা হয় এবং বিনা বিচারে দীর্ঘদিন আটক করে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ ধরনের বন্দীর মধ্যে শেখ মুজিব ছিলেন অন্যতম, যাকে ১৯৫৮ সালের ২০শে অক্টোবর বিশেষ ক্ষমতা অধ্যাদেশ বলে নিরাপত্তা বন্দী হিসাবে গণ্য করা হয়। শেখ মুজিবের বিরূদ্ধে আনীত ৯টি মামলার মধ্যে ৮টিই নিম্ন আদালতে বাতিল হয়ে যায় এবং সে সুবাদে তিনি ১৯৫৯ সালের ৭ ডিসেম্বর মুক্তি লাভ করেন।[৯৪] অবশ্য, এর ৯ মাস পর এক আদালতের রায়ে শেখ মুজিব দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হন এবং ২ বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত হন। সেই সাথে তার ৫ হাজার টাকা জরিমানা হয়, অনাদায়ে আরো ৬ মাস অতিরিক্ত কারাদন্ড প্রদান করা হয়।[৯৫]

কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীদের ওপর নেমে আসে চরম নির্যাতন। বিশেষ ক্ষমতা অধ্যাদেশ বলে পূর্ব পাকিস্তানের গ্রাম- গ্রামান্তরে তাদেরকে গ্রেফতার করার জন্য অনুসন্ধান চালানো হয়। কোন রকম গ্রেফতারী পরোয়ানা ছাড়াই যে কোন বাস গৃহে হামলা চালানো হতে থাকে, বাম রাজনীতির সাথে সম্পর্ক আছে এমন কোন গ্রন্থ কিংবা দলিলপত্র উদ্ধার করতে পারলেই গৃহস্বামীকে গ্রেফতার করা হয়। সকল কমিউনিস্ট নেতা-কর্মীর ওপর হুলিয়া জারি করা হয় এবং সামরিক শাসনের কয়েক মাসের মধ্যে কমিউনিস্ট নেতা-কর্মীদের দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জেলগুলি ভর্তি করা হয়। জেলখানায় কমিউনিস্ট নেতা-কর্মীদের এমন মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য করা হয় যে, অচিরেই অধিকাংশ বন্দী কমিউনিষ্ট অসুস্থ হয়ে পড়েন।[৯৬] কমিউনিস্ট তথা বাম পন্থীদের ওপর এ ধরণের নির্যাতন শুধু পূর্ব পাকিস্তানে সীমাবদ্ধ থাকেন, সমগ্র পাকিস্তানেই এরূপ নিপীড়ন চালানো হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের বামপন্থী কবি-সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবীরাও এ নিপীড়ন থেকে রেহাই পাননি। পাকিস্তানের প্রখ্যাত বামপন্থী নেতা ও সংবাদপত্র প্রকাশক মিয়া ইফতেখার উদ্দীনের ওপর এক চরম নির্যাতন

---

৯০. আহ্মদ, অলি (--)ঃ জাতীয় রাজনীতিঃ ১৯৪৫-৭৫ ঢাকাঃ বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ (২য় সংস্করণ), পৃ. ২৫৫.

৯১. The Pakistan Observer, Dacca, October 13, 1958.

৯২. Letter to Abdul Hamid Khan Bhashani, Letteur No. 967/57-DS(P), Karachi, the 10th October, 1958. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৮২)ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ২.

৯৩. আহ্মদ, অলি; প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫।

৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫।

৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫।

৯৬. কমিউনিস্ট নেতা শরদিন্দু দস্তিদার, অজয় রায় এবং নজরুল ইসলাম- এই তিনজনের সাথে সাক্ষাৎ থেকে ঠিক একই ধরনের তথ্য জানা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

নেমে আসে। তার Progressive Papers Limited থেকে প্রকাশিত 'টাইমস' এবং 'ইমরোজ' ছিল সে সময়ের পাকিস্তানের সর্বাধিক প্রচারিত ইংরেজি ও উর্দু সংবাদপত্র। সংবাদপত্র দুটি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের বামপন্থী নেতা-কর্মী ও বুদ্ধিজীবীদের মুখপত্র। ১৯৫৯ সালের ১৬ এপ্রিল এক অধ্যাদেশ জারি করে সামরিক সরকার এ প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা নিজ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।[৯৭] এর কারণ হিসাবে বলা হয় প্রতিষ্ঠানটি পাকিস্তানের বৈদেশিক সম্পর্ক, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে খুবই ক্ষতিকর ভূমিকা পালন করে চলেছে। এ প্রসঙ্গে সরকারের এক প্রেসনোটে বলা হয়।

The Central government were satisfied on the basis of information from very reliable sources that the previous management of the Progressive Papers Limited was in the hands of persons some of whom had contact with certain foreign sources from whom they recieved guidance aud financial assistance directly or by indircet methods .....There was on objectionable innuendo in their writings which, even if it was not discerrible in any single article, was, in its cumulative influence on the mind of its readers, meant to engender subversion.[৯৮]

এ ধরনের একটি প্রেসনোট প্রদান করে সামরিক সরকার ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাকে জোর করে শুধু দখলই করেনি;, এ প্রশ্নে মিয়া ইফতেখার উদ্দীন আদালতের শরণাপন্ন হতে চাইলে তাকে সে অধিকার থেকেও বঞ্চিত করা হয়। সামরিক সরকার তার নিজের তৈরী আইনের ওপরও এ'পর্যায়ে আস্থা রাখতে পারেনি।[৯৯]

অর্থাৎ সামরিক সরকার ক্ষমতাসীন হয়ে এমন একটি ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে যে, রাজনৈতিক কর্মীতো বটেই, এমনকি বুদ্ধিজীবী বা সাংবাদিকের পক্ষেও সামরিক সরকারকে প্রশংসা করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। এ ত্রাসের রাজত্ব সম্পর্কে প্রাক্তণ ন্যাপ নেতা নূরুল হুদা মির্জা বলেনঃ আইয়ুবের সামরিক শাসন ছিল এক কঠিন সামরিক শাসন। পরবর্তীকালের সামরিক শাসনগুলিকে দেখে সে সম্পর্কে কোন ধারনাই করা যাবে না। সে সামরিক শাসনের আমলে জনজীবনে আতংক এমন তরংকরভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে, দিনাজপুরের মত একটি জেলা শহরেও সন্ধ্যার পর মানুষ ঘরের বাইরে বের হতে ভয় পেতেন।[১০০] কৃষকনেতা নূরুর রহমান জানানঃ "সামরিক শাসন জনজীবনে এমন এক তরংকর রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে যে, আমার মত একজন ১০ম শ্রেণীর ছাত্রও গ্রেফতার এড়াতে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছিল। মিলিটারী আসছে এ কথা শুনলেই রাস্তা ফাঁকা হয়ে যেত। যদি কেউ তাদের সামনে পড়ে যেত তাহলে কোন-না-কোন হয়রানির হাত থেকে তার রেহাই ছিল না। আইন শৃঙ্খলা শিক্ষাদানের সোল এজেন্সি নিয়ে তারা পথচারীকে কোন-না-কোন ভুল ধরবেই, আর সে ভুলের মাসুল হিসাবে কান ধরে উঠ বস করা, নিল ডাউন হয়ে থাকা, বেত্রাঘাত বা নিদেন পক্ষে বাবা মা তুলে গালিগালাজ শোনার অভিজ্ঞতা প্রতিটি পথচারী কে পেতে হত। আর এতূল ত্রুটিগুলি ছিল খুবই হাস্যকর ধরনের। হাতগুটিয়ে চলার একমাত্র অধিকার ছিল সেনাবাহিনী সদস্যদের, সাধারণ মানুষ একাজটি করলেই তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হত, রাস্তার ডান দিক দিয়ে না চলে বাম দিক দিয়ে চললে শাস্তি পেতে হত; কারো চুল আঁচড়ানো আছে কিনা, কাপড়-চোপড় ময়লা কিনা, জামার বোতাম খোলা কিনা, এ ধরনের অসংখ্য অভিযোগে পথচারীকে শাস্তি পেতে হত। আইয়ুবের সামরিক শাসন ছিল এক কঠিন সামরিক শাসন।"[১০১] এভাবে অত্যন্ত তুচ্ছ ঘটনা নিয়েও সাধারণ মানুষকে সামরিক বাহিনীর হাতে অহরহ নির্যাতন ভোগ করতে হয়। শুধু সামরিক বাহিনীই নয়, সিভিল প্রশাসনও যে এ সময় কিরূপ স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রেরিত এক গোয়েন্দা রিপোর্টি থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। উক্ত রিপোর্ট থেকে জানা যায়, বরিশালের তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জেলা শহরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান অশ্বিনী কুমার হলকে আইয়ুব হল নামকরণ করেন। এ ঘটনায় জনৈক ব্যক্তি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে দেখা করে বলেন যে, অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠানের নামকে এ'ভাবে পরিবর্তন করলে কিংবা নতুন কোন প্রতিষ্ঠান তৈরি করে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের নামে যুক্ত করলে তিনি তার বন্ধুবান্ধব সহ খুব সানন্দে সেটি গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। কিন্তু এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের নামটা যেনো পরিবর্তন করা না হয়। এ অনুরোধে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রচন্ডভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন এবং উক্ত ব্যক্তিকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করেন। এ তথ্য প্রাদেশিক সরকারকে জানানো সত্ত্বেও উক্ত ব্যক্তি বিনা দোষে বন্দী জীবন যাপনে বাধ্য হন।[১০২]

এবৃডো ঘোষণার ফলে রাজনীতিবিদদের ওপর আরেক দফা আঘাত আসে। প্রাথমিকভাবে পূর্ব পাকিস্তানের ৪৩ জন প্রাক্তন মন্ত্রী, স্পীকার ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যের ওপর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করার পর কিভাবে তা কার্যকরী করা হবে এবং আরো কতক রাজনীতিবিদকে এ অধ্যাদেশের আওতায় এনে তাদের নাগরিক অধিকারকে ক্ষুন্ন করা যাবে সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পূর্ব পাকিস্তান দুর্নীতি বিভাগের এক গোপন নির্দেশমালার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, প্রথমত, প্রধান প্রধান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে বেছে নেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ আরো যে সকল সম্ভাব্য ব্যক্তিকে এ অধ্যাদেশের আওতায় আনা সম্ভব তাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে বলা হয়েছেঃ এবং তৃতীয়তঃ হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দীসহ যে পাঁচজন পূর্বপাকিস্তানী রাজনীতিবিদের বিষয়কে কেন্দ্রীয় সরকার নিজে দেখাশোনা করছিল তাদের ব্যাপারে যদি কোন রকম তথ্য পাওয়া যায় তাহলে তা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এগোপন নির্দেশের বলে পূর্ব পাকিস্তানের পুলিস বিভাগ যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে ৩০ দিন পর্যন্ত আটক করে রাখতে পারবে। উক্ত গোপন নির্দেশের কয়েকটি অংশ নীচে উদ্ধৃত করা হলঃ

---

৯৭. Ali, Tariq (1970): Pakistan: Military Rule or Peoples Power, Delhi: Vikas Publications, p. 101.

৯৮. The Pakistan Times, Quoted in Ali, Tariq. (1970): Ibid, pp. 101-102.

৯৯. Ali, Tariq, Ibid, p. 102.

১০০. নূরুল হুদা মির্জার সাথে একান্ত সাক্ষাৎকার,

১০১. নূরুর রহমানের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকার।

১০২. One Local Hindu is reported to have told the district Magistrate that it was a wrong thing to do and suggested to the D.M. to do something else them rename an old Institution if he was really keen to have the Presidents name associated with any public institution and offered to work and raise funds for such a new institutions. It is stated that the District Magistrate got angry with the gentleman and with the support of allegedly concocted police reports of subversive activities arrested him under the Safety Act. Complaints were allegedly made right upto the Provincial Government but the gentleman is still languishing in security detention: A Secret report from Minister for the Interior, Gop. D.O No. 325-59(1)/59, Karachi, 21st May. 1959. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৮২)ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

2. It was dicided that action under the E.B.D.o will proceed against the `big fries' having substantial materials of Misconduct against them, and who are likely to be `big enough nuisance' in the political life of the province...the list submitted by us was not exhaustive; it contained the names of those persons against whom materials were readily available. We shall, therefore, have to prepare a list of other important persons against whom there are good instances of misconduct.....

5. The following persons of East Pakistan will be dealt with by the tribunal to be established by the central Government. Materials against them will be processed and submitted by the S.P.E. If you have got any materials against them, kindly pass them on to the Inspector-Genral of Police...

6(b) ...East pakistan police have powers of arrest under the East Pakistan Public Safety Act and Government orders for detention are passed within 30 days of arrest.[১০৩]

উল্লেখ্য, এ সকল নির্দেশ একক কোন ব্যক্তির সিদ্ধান্তের ফল নয়, নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত সমগ্র প্রশাসনের উচ্চস্তরের কর্মকর্তাই এর সাথে যুক্ত। অর্থাৎ রাজনীতিবিদদেরকে নির্যাতন করার কাজে একক কোন ব্যক্তি যে জড়িত হয়েছিল তা নয়, পাকিস্তান রাষ্ট্রের পুরো প্রশাসন ও নিরাপত্তা বিভাগই এর সাথে জড়িত হয়ে পড়েছিল। আর তাই, উপরোক্ত ধরনের সব নির্দেশই বিভিন্ন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের স্বতন্ত্র অথবা যৌথ সভার সিদ্ধান্তের আকারে প্রদান করা হত। সামরিক সরকার প্রশাসনের বিভিন্ন অংশকে কিভাবে নানা নির্যাতনমূলক কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত করে ফেলে তার একটি নির্ভরযোগ্য বিবরণ সামরিক শাসন জারির আগের পূর্ব বাংলার মুখ্য মন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান রচিত 'স্বৈরাচারের দশ বছর' নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়। তাঁর উক্ত বিবরণীতে রয়েছে কিভাবে সামরিক শাসন জারির পর পরই ব্যবসায়ীদের বিদেশী পণ্য পনের দিনের মধ্যে নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এর ফলে ব্যবসায়ীদের ক্রয়মূল্যেরও অর্ধেক দামে সকল পণ্য বিক্রি করে দিতে হয়েছিল। দাম বেধে দেওয়ার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের কোন সম্পর্ক অধিকাংশ সময় থাকত না। নিম্নস্তরের একজন সামরিক কর্মকর্তাই অনেক সময় যে কোন পণ্যের মূল্য নির্ধারণের জন্য যথেষ্ট ছিল। আদালতগুলিকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল মামলা মোকদ্দমার বিচার কাজ সম্পন্ন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এজন্য স্বল্প স্বাক্ষ্য প্রমাণের মাধ্যমেই কোর্টে বিচারাধীন হাজার হাজার মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ঘরবাড়ি পরিষ্কার করা বা নাগরিক কর প্রদান করা ইত্যাদি ধরনের নির্দেশ এমনভাবে আসতে লাগলো যে, এসব পালন করতে গিয়ে অনেকেরই অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার উপক্রম হল। সামরিক শাসনের ফলে দেশে যে কি অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল সে সম্পর্কে আতাউর রহমান খানের নিম্নোক্ত বাক্যগুলি থেকে কিছুটা আঁচ করা যাবে ঃ

"দেশে জঙ্গী আইন ঘোষণা করেছে- মার্শাল ল রেগুলেশন। রেগুলেশনের নির্দেশে সবকিছু ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। হুকুম অমান্য করলে মার্শাল ল রেগুলেশনের অপরাধ ও বিচার। রোজই দু'চার পাঁচটা রেগুলেশন জারি হচ্ছে। এটা করলে তিনসাল, ওটা না করলে পাঁচ সাল, দশ সাল। শুধু সালই নয়, বেত্রাঘাতও সাথে সাথে। চরম দন্ডও দেওয়ার অধিকার আছে রেগুলেশনের - মৃত্যুদন্ড।

"হুকুম জারি হল, দ্রব্যমূল্য কমাও। হু-হু করে কমতে লাগল। না কমিয়ে উপায় নেই। তিরিশ টাকা গজের কাপড় পনর টাকা!

"এমনি হিসাব। একজন ব্যাপারী টেলিফোন করে দুরবস্থার বর্ণনা দিল। দু'দিনে আশি হাজার নেমে গেছে। কাল নাগাদ মালখালাস। লাখের উপর লোকসান দিয়ে দোকানে তালা লাগবে।

"চিনা মাটির দোকানে মানুষের মাথা - লাইন লেগে গেছে। তিন'শ টাকার ডিনার সেট দেড়'শ টাকায়, পঞ্চাশ টাকার টি সেট কুড়ি টাকায়। অন্যান্য জিনিষও ঐ দরে। দোকানদার তার মাল খরিদের রশিদপত্র দেখায় অন্তত কেনা দামে বিক্রি করার অনুমতি দেবার জন্য মিনতি করেছে। কোন ফল হয় নাই............

"কিন্তু যাদের সুবিধার জন্য সস্তা দরে বিক্রি করার হুকুম জারি হল - গরীব জনগণ, তারা এর আশে পাশেও না; অর্থাৎ তারা বাইরে থেকে দেখেই খুশী। এসব কেনার ক্ষমতা তাদের নাই.........

"অফিস-আদালতেও দারুন তাড়াহুড়া। কাজ হোক না হোক হাত পা নাড়াচাড়া খুব চলছে। সবাই শশব্যস্ত।

"কাছারিতে হাকিমের ক্ষিপ্র গতি। কচু কাটার মত মোকদ্দমা ধরছেন আর শেষ করছেন। মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এরই মধ্যে সব মকদ্দমা শেষ করতে হবে। গুদামখালাস করার মত।

"এক রসিক হাকিমের সাথে দেখা। বললাম, খুব চালাচ্ছেন বুঝি! হেসে বললেন, খুব চালাচ্ছি। ইনসাফ হোক না হোক সাফ করে ফেলছি সব। মামলা মোকদ্দমার আবর্জনা রাখব না।

" সেক্রেটারিয়েটে বড় বড় আমলাদের ঘাঁটি। হঠাৎ একদিন সব দরজা বন্ধ। বাইরে সিপাই সান্ত্রী পাহারা। ব্যাপার কি? বড় বড় কর্মচারী বিলম্বে অফিসে আসেন। তাদের ধরার জন্য এই ব্যবস্থা।

"বাড়ি ঘর পরিষ্কার করার নির্দেশ হল। সবাই লেগে গেল ঘষামাজার কাজে। চারদিকের গাছ পালা কেটে পয়মাল। ফলবান বৃক্ষ। সবই আবর্জনা। অনেক পুরাতন বাড়ি নতুন পোষাক পরল। মেরামত চুনকাম হল বহু কাল পরে। টাকা ধার করে বৌ-এর গয়না বিক্রি করে বা বাঁধা দিয়ে এসব করলো।

"মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স কয়েক বছর অনাদায়। লাখ দশেক কি তারও বেশি হবে। হুকুম হল পনর দিনের ভেতর সব আদায় করতে হবে। হয়ে গেল আদায়। হাঁড়ি পাতিল, ঘটি বাটি, তামা কাঁসা বেচে ট্যাক্স আদায় করল।

"ওমরাও খাঁ (প্রাদেশিক সামরিক আইন প্রশাসক - লেখক) একদিন বললেন, দেখলেন কেমন করে টাকা আদায় হয়? আপনারা ফেলে রেখেছিলেন দশ বছর।

আমাদের লাগল পনের দিন। কৃষককে ঋণ দিয়েছেন, ফেরৎ দেবার নামও করে নাই। হুকুম দিয়েছি, সুদসহ শোধ করেছে।"[১০৪]

রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি জনসাধারণের ওপর সামরিক সরকার কি ধরনের দমননীতি পরিচালনা করতে শুরু করে তা উপরোক্ত বিবরণ থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সামরিক শাসনের প্রথম কয় বছরে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলে রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের

---

১০৩. Top secret Latter D.O No. 4 A. B(E), Dacca, the 5th September, ১৯৫৯, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪-২৫।

১০৪. খান, আতাউর রহমান (১৯৭০)ঃ স্বৈরাচারের দশ বছর, ঢাকা। নওরোজ কিতাবিস্তান, পৃ. ১৭-১৯।

Dhaka University Institutional Repository

ওপর কি ধরনের নির্যাতন চালানো হয় সে সম্পর্কে জনাব অলি আহাদের একটি বিবরণ খুবই প্রণিধানযোগ্য। পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন নেতা-কর্মীদের ওপর অকথ্য নির্যাতনের বিবরণ দেওয়ার পর তিনি বলেছেনঃ -

"সামরিক শাসন জারি হওয়ার সাথে সাথে (পূর্ব পাকিস্তানের-লেখক) কয়েক হাজার রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী কারাগারে নীত হইয়াছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানে গ্রেফতারকৃত রাজবন্দীদের উপর চালান হয় অকথ্য নির্যাতন। পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির দফতর সম্পাদক জনাব হাসান নাসিরকে ১৯৬০ সালের ৮ই আগষ্ট করাচী কারাগারে আটক করা হয়। নির্মমতম দৈহিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হইয়া কারারুদ্ধ অবস্থায় লাহোর দূর্গে ১৯৬০ সালের ১৩ই নভেম্বর তিনি মৃত্যু বরণ করেন।
সীমান্ত প্রদেশে প্রায় তিন হাজার রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী কারাবরণ করেন এবং রাজবন্দীদের কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হয়। কোয়েটা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে ৪'শ জন বেলুচীকে অর্ধনগ্ন অবস্থায় গায়ে দড়ি বাঁধিয়া টাংগাইয়া রাখা হয় ও মাঝে মাঝে তাহাদের তড়িতাঘাত করা হয়। সিন্ধু প্রদেশের হায়দারাবাদ কারাগারে ৭ জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়।"[১০৫] সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি দমনের নামে এই ব্যাপক নির্যাতন চালানো হয়। পাকিস্তানের সকল অঞ্চলের রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের মধ্যে সমাজতন্ত্র বিরোধী মনোভাব ও কার্যকলাপ প্রতিফলিত হতে থাকে।[১০৬] জনসাধারণ যাতে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে কোন জ্ঞানার্জন না করতে পারে কিংবা সমাজতন্ত্র সম্পর্কিত বই-পুস্তক যাতে জনসাধারনের নাগালের বাইরে রাখা যায় সে জন্য এ ধরনের বই-পুস্তক সংগ্রহ বা পড়াশুনার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। উক্ত নিষেধাজ্ঞা শিক্ষা বিভাগের পরিচালকের দপ্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পাঠানো হয়। এধরনের একটি গোপন নির্দেশনামা পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছে পাঠানো হয়। এতে বলা হয় কমিউনিষ্টভাবাপন্ন গ্রন্থাদি যেন দেশের মধ্যে ঢুকতে না পারে; এবং যে সকল গ্রন্থ ইতিমধ্যেই প্রবেশ করেছে সেগুলি প্রকাশ কিংবা প্রচার না করার নির্দেশ দেওয়া হয়। নিম্নে নির্দেশনামার কিছু নমুনা প্রদান করা হল ঃ

.......after discussing the issue, come to the conclusion that it has become essential at this atage to take stringent measures possible to

(a) stop the infiltration of communist literature in to the country; and

(b) Prohibit its publication and circulation within the country.

In this connection this department has been directed to undertake a survey of books etc in university and college/school libraries to ensure the.... objectionable meterials already with these institutions are to withdrawn and substituted with good litarature,

It is, therefore, requested that statistics showing the extent of undesirable literature particularly that relating to communist trends and themes that has found its way into colleges and libraries and needs replacement in the matter may please be supplied along with your comments, in triplicate, to this Directorate immedeately."[১০৭]

উপরোক্ত নির্দেশনামা থেকেই এটা খুবই স্পষ্ট যে, আইয়ুব খানের সামরিক সরকার কমিউনিষ্ট ভাবধারার বই-পুস্তকের ব্যাপারে কি কঠোর নীতি গ্রহণ করেছিল।

শুধু কমিউনিষ্টদের ব্যাপারেই নয়, সামরিক শাসনের বিরোধিতা করতে পারে এমন সকল ধরনের রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের ওপর সমগ্র সামরিক শাসন জুড়েই নির্যাতন চলতে থাকে। এমনকি, ১৯৬২ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে প্রত্যক্ষভাবে সামরিক শাসন আর না থাকলেও আইয়ুব আমলের প্রায় শেষদিন পর্যন্ত এ ধরনের নির্যাতন অব্যাহত ছিল। তবে পার্থক্য হল এই যে, সামরিক শাসন উঠে যাওয়ার পর এসব নির্যাতন-নিপীড়নের কথা প্রকাশ হয়ে পড়তো। পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠা হওয়ার কারণে দু'চারজন সাহসী সদস্য এসব নিপীড়নের খবর পার্লামেন্টে তুলে ধরতেন এবং বিচার দাবি করতেন। এগুলি করতে গিয়ে অবশ্য অনেককেই নিগৃহীত হতে হয়েছে। আর পার্লামেন্টের পুরো ব্যাপারটাই ছিল প্রহসন। একমাত্র প্রাদেশিক পরিষদের ওপরই চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল ৩০ জন পরিষদ সচিব, যারা পরিষদ সদস্যদের চেয়ে অনেক বেশী মর্যাদা ও বৈষয়িক সুযোগ সুবিধা ভোগ করতো। অথচ এদের নিয়োগের কোন গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ছিল না। কর্তৃপক্ষ যাকে খুশি এপদে নিয়োগ করতে পারতো। আসলে এদের কোন কাজ ছিল না। কিছু লোককে রাজনৈতিকভাবে পুনর্বাসিত করে সরকারী দলকে ভারী করাই ছিল এর মূল লক্ষ্য। বিরোধী দলীয় প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য ময়মনসিংহের আবদুল হামিদ এদের সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করে পরিষদ বক্তৃতায় বলেনঃ "আমরা কখনও ধারণাও করি নাই যে, ৯ জন মন্ত্রী যেখানে সেখানে ৩০ জন পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী হবেন।.....এই ৩০ জন ঠিক আমাদেরই মতন, যারা ওকালতি করছেন, মোক্তারী করছেন, ব্যবসা করছেন। আমরা পাই ৪০০ টাকা, আর তারা ১ হাজার টাকা করে পাচ্ছেন।"[১০৮] ৯ জন মন্ত্রীর পরামর্শের জন্য এদের নিয়োগ করা হলেও এরা বিরোধী দলীয় সদস্যদের হুমকি প্রদান করা কিংবা সরকারের নীতির পক্ষে আনার জন্য লোভ লালসা দেখাবার কাজে নিয়োজিত থাকত। সরকারী দলের সদস্যরাও এ কাজে লিপ্ত হত এবং পরিষদের মর্যাদাকে খর্ব করতো। সরকারী হুমকি সম্পর্কে নির্দেশ করতে গিয়ে মোল্লা আবুল কালাম আজাদ নামক একজন পরিষদ সদস্য তার বক্তৃতায় বলেনঃ এবার আমি ঢাকায় আসার পর থেকে কতকগুলি Parliamentary secretary এবং Government party র M.P. A.এর মুখে শুনছি আমরা যারা Government party-তে থাকবো না তাদের constituency কে desert বানানো হবে এবং ঐসব মেম্বরদের কোন কাজ করা হবে না।"[১০৯]

পরিষদ সভার কার্যবিবরণীতে শুধু এধরনের সরকারী হুমকির কথাই জানা যায় তা নয়, এ কার্যবিবরণীর মধ্যে বিরোধী দলীয় সদস্যদের বক্তৃতার প্রতি ছত্রে ছত্রে রয়েছে সরকারী নিপীড়নের অসংখ্য কাহিনী। উপরোক্ত সদস্য মোল্লা আজাদই গ্রামাঞ্চলে ১০/১৫ গুণ ট্যাক্স বেড়ে যাওয়ার সংবাদ দিয়েছেন। খাজনা বাকি পড়ার নামে সার্টিফিকেট প্রথার মাধ্যমে কি নির্মমভাবে কৃষক জনগোষ্ঠীকে

---

১০৫. আহাদ, অলি (--)ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭-৫৮।

১০৬. Ali, Tariq (1970): op.cit., p. 100.

১০৭. Copy of Memo No. 25988-9., dated 10.8.1957 sent by the Derector of Education. See Ali, Tariq (1970): Ibid, p. 88.

১০৮. East Pakistan Provincial Assembly (1963): Assembly Proceedings (Official report), Dacca: East Pakistan Government Press. Vol. XXII, First session, 1963, p. 26.

১০৯. Ibid,p. 43.

Dhaka University Institutional Repository

হয়রাণি করা হত মোল্লা আজাদের বক্তৃতায় তারও খবর পাওয়া যায়। তিনি তার নিজের অভিজ্ঞতার বিবরণ দিতে গিয়ে পরিষদকে জানানঃ "এই প্রসঙ্গে আমি কয়েকখানা certificate দেখানোর জন্য এই হাউসে নিয়ে এসেছি। এর একটা হল আমার নিজের নামের Certificate. খোঁজ নিয়ে দেখলাম ১৩৬৮ সাল পর্যন্ত আমার ঐ জমার খাজনা শোধ করে দেওয়া সত্ত্বেও আমার নামে এই Certificate issue হয়েছে। এসব Certificate-এ মৌজার নাম, জমার উল্লেখ বা Plot নম্বর নাই। যার নামে Certificate সে কি করে জানবে তার কোন্ জমার উপরে Certificate হয়েছে। এসব Certificate পাবার পর এই লোকগুলি T.D.R Office-এ যায়, কিন্তু T.D.R বলে C.I.office- এ যান এবং C.I. এর অফিসে গেলে Subdivisional Manager এর অফিসে যেতে বলা হয়। সেখানে গেলে কেরানী বাবুরা টাকা চান। টাকা না দিলে তার জমি নিলাম হয়ে যাবে।"[১১০] উপরোক্ত বিবরণ থেকে এটা খুবই স্পষ্ট যে, পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলে সামরিক শাসন আমলে সার্টিফিকেট প্রথার নামে কৃষকরা নির্মম হয়রাণি ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছিল।

সরকারী প্রশাসন যে সে সময় কিভাবে সামাজিক অপরাধকে প্রশ্রয় দিতো সে সম্পর্কে এক প্রাঞ্জল বিবরণ ফুটে উঠেছে পাবনার পরিষদ সদস্য জনাব আবদুস সোবহানের বিবরণেঃ "আমি যখন আমার Constituency-তে গিয়ে জনগণের অবস্থা দেখছিলাম তখন তাঁরা আমাকে বলেছিল যে, পুলিস এবং চোরের দৌরাত্ম্য এত বেড়ে গেছে যে, মানসম্মান নিয়ে নিরাপদে বাস করা কষ্টকর। একজন বলল, 'আমার বাড়িতে রাত্রে চোর এসেছিল। আমি চোরকে ধরবার জন্য তার পিছু পিছু ধাওয়া করলাম, কিন্তু তাকে ধরতে পারলাম না....। আমি চোরকে ধরতে না পারলেও তাকে চিনতে পারলাম। পরদিন সকালে আমি থানায় এজাহার দিতে গিয়ে দেখি যে, চোর সাহেব এবং দারোগা সাহেব থানায় একই টেবিলে দুই পার্শে চেয়ারে বসে সিগারেট খাচ্ছেন।....... আমি যেখানে গিয়েছি সব জায়গায় এই Police Department-এর ব্যবহার সম্পর্কে কোন ব্যক্তি সুনাম করে নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই বিষয়ে গভর্ণমেন্ট কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই।"[১১১]

এ সকল ন্যায্য কথা যারা বলতেন তারা পরিষদ সদস্য হয়েও যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের রোষানল থেকে রেহাই পেতেন তা নয়। সরকারী নীতির কঠোর সমালোচনা করার দায়ে এরকম এক পরিষদ সদস্য জনাব আবদুল হামিদকে গ্রেফতার করা হয়। এ ঘটনার প্রতিবাদ করতে গিয়ে নোয়াখালির প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য মুহাম্মদ আবদুর রশিদ নিপীড়নের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন। তিনি তার পরিষদ বক্তৃতায় বলেনঃ "গত ১৩ই সেপ্টেম্বর আমরা যখন আমাদের এই House এর একজন বিশিষ্ট সদস্য জনাব আবদুল হামিদ সাহেবের arrest এর কথা শুনলাম তাতে বাস্তবিকই স্তম্ভিত না হয়ে পারি নাই। আমরা দেখেছি আমাদের দেশে যে সরকার রয়েছে এই সরকার দেশের ছাত্র, জনতা, শিক্ষক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, দেশপ্রেমিক যারা দেশের জনসাধারণের দাবি নিয়ে যখনই কথা উঠিয়েছে, দেশের জনসাধারণের স্বার্থের জন্য কাজ করতে চেষ্টা করেছে তখনই তাদেরকে Public Safety Act এর বদৌলতে আটক করে তাদের মুখবন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এবং সর্বশেষে আমরা ১৩ই সেপ্টেম্বর দেখলাম, আমাদের এখানকার একজন সদস্য, যাঁর জীবনে প্রথম থেকে সেদিন পর্যন্ত আমরা জানি, যিনি এই দেশের স্বাধীনতার জন্য, এই দেশের মানুষের জন্য, দেশের জনসাধারণের অর্থনৈতিক আজাদীর জন্য, এই দেশের ছাত্র-জনতার উন্নতির জন্য, বিশেষ করে, যিনি পাকিস্তান হাসিলের পূর্বে আজাদীর জন্য এবং পাকিস্তান হাসিলের পরে পাকিস্তানের মর্যাদা রক্ষার জন্য সর্ব শক্তি নিয়োগ করে সর্ববিধ চেষ্টা করে এসেছিলেন সেদিন তিনি জনসাধারণের দাবির কথা নিয়ে যখন উঠেছিলেন, সরকারের কর্ণগোচর করছিলেন তখন তাকে কালা-কানুন Public Safety Act- এর বলে গ্রেপ্তার করে [সরকার] সারা দেশে বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিলেন। ....

"কেবল আবদুল হামিদ সাহেব নন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, এই পাকিস্তানের ছাত্র-জনতা, শিক্ষক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, জননেতা অনেকের উপরই এই কালা-কানুন বা Public Safety Act -এর জুলুম ও অত্যাচার হয়েছে। .... দেশের ছাত্রদের ও জনসাধারণের দাবি-দাওয়া নিয়ে আবদুল হামিদ যখন দাবি-দাওয়া ওঠালেন ঠিক তখনই তাকে কালা-কানুন দ্বারা গ্রেপ্তার করলেন। ছাত্র-জনতা যখনই ভাল শিক্ষক বা ভাল পড়াশুনার ব্যবস্থা বা ভাল University বা ভাল Hostel দাবি করেছে তখনই তাদের Public Safety Act দ্বারা গ্রেপ্তার করা হয়েছে।"[১১২]

পরিষদ সভায় দাঁড়িয়ে সরকার বিরোধী সদস্যগণ অনেক সত্য কথা বলতেন বটে, কিন্তু তাদের কথার ওপর কোন গুরুত্ব দেওয়া হত না। ১৯৬২ সালে যে জাতীয় ও প্রাদেশিক সংসদ নির্বাচন হয় তাতে বিরোধী দলসমূহ অংশ নেয়নি।[১১৩] কিন্তু '৬৫ সালের নির্বাচনে তারা অংশ নিয়েছে এবং সংখ্যালঘু হলেও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সিটে জয়লাভ করেছে। অথচ এ'পর্বেও জাতীয় কিংবা প্রাদেশিক পরিষদের ওপর সরকারী দল থেকে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হত। বিরোধী দল তীব্র প্রতিবাদ করলেও কিংবা ওয়াক আউট করলেও সরকারী দল তাতে ভ্রুক্ষেপ করতো না। এমনকি, বিরোধী দল থেকে যত ভাল বিলই উত্থাপন করা হোত না কেন তা বাতিল করে দেওয়া হত। এ ধরনের কিছু ঘটনাকে ধারাবাহিকভাবে নীচে উল্লেখ করা হল।

১৯৬৫ সালের ১৩ আগস্ট পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে অত্যন্ত অমানবিক ও অগণতান্ত্রিক শ্রমিক নিয়োগ বিল উত্থাপিত হয়। বিরোধী দলের কোন সংশোধনীই গ্রহণ করা হয়নি। ফলে বিরোধী দল ওয়াক আউট করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এ বিলটি সম্পূর্ণ অপরিবর্তিতভাবে গৃহীত হয়। এর কয়েক দিন আগেও আরো গুরুত্বপূর্ণ একই ধরনের অন্য একটি বিল সরকারী দল উত্থাপন করে, কিন্তু তখনও বিরোধী দল উত্থাপিত সংশোধনী গ্রহণ করা হয়নি। এ বিলটি ছিল ট্রেড ইউনিয়ন বিষয়ক এবং তাতে খুবই অগণতান্ত্রিক বেশ কিছু ধারা জুড়ে দেওয়া হয়। বিরোধী দল ওয়াক আউটের ঘোষণা দিলেও সরকারী দলের মনোভাবের কোন পরিবর্তন হয় নি। ইতিপূর্বে ১ আগস্ট বিরোধী দল থেকে মাদারীপুরের কলেরা-মহামারীকে প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিরোধী দল একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে, কিন্তু এ ধরনের একটি মানবিক ব্যাপারেও সরকারী দল কোন সহানুভূতি দেখায়নি, বরং এ প্রস্তাবকে কোন আলোচনা ছাড়াই বাতিল করে দেওয়া হয়। অথচ এ প্রস্তাবটি অনেক আগে উত্থাপন করা হয়েছিল।

---

১১০. Ibid, p. 42.
১১১. Ibid, p. 56.
১১২. Ibid, p.119.
১১৩. খান, আতাউর রহমান (১৯৭০)ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১।

Dhaka University Institutional Repository

এর মধ্যে পাক–ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান যে অরক্ষিত অবস্থায় ছিল এবং খানিকটা ভারতের করুণার ওপরই সে টিকে ছিল তা সরকারী পর্যায়েরও কেউ কেউ প্রকাশ করে ফেলেছিলেন। এ ধরনের একটি পর্যায়েও যখন বিরোধী দল থেকে পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষা সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব ওঠে তখন তা বাতিল হয়ে যায়। সরকারী দলের পক্ষ থেকে এ প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা হয়। ফলে ১৯৬৫ সালের ১২ ডিসেম্বর বিরোধীদল ওয়াক আউট করে। শুধু তাই নয়, ২৪ নভেম্বর ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত বিরোধী দল থেকে মোট যে ৬টি প্রস্তাব উথাপন করা হয় তার সবই অগ্রাহ্য হয়, উপরন্ত, বাষট্টি সালের সংবিধানের মধ্যে ন্যূনতম যে কিছু গণতান্ত্রিক ধারা ছিল সেগুলি ছেটে ফেলে গ্রহণ করা হয় ৫ম সংশোধনী। বিরোধী দলের শত চেষ্টাও কোন কাজে আসেনি। উপরোক্ত ধরনের নীতিগত ব্যাপারেই যে বিরোধী দলের প্রস্তাবসমূহকে অগ্রাহ্য করা হত শুধু তাই নয়, এমনকি ছাত্র কিংবা সাংবাদিকদের ওপর এ সময়ে যে দৈহিক নিপীড়ন নেমে আসে সেগুলি সম্পর্কিত মুলতবী প্রস্তাবকেও অগ্রাহ্য করা হয়। ঢাকায় ছাত্র মিছিলের ওপর পুলিসের লাঠিচার্জ সম্পর্কিত মুলতবী প্রস্তাব যেমন ২৪ জুলাই ১৯৬৫ সালে বাতিল হয়ে যায়, তেমনই প্রেসক্লাবে কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ সংক্রান্ত মুলতবী প্রস্তাব এর মাত্র ৫ দিন পর অগ্রাহ্য হয়।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৬৫ সালের পাক–ভারত যুদ্ধের পূর্বেপ্রাদেশিক পরিষদে যেভাবে সরকারী দলের একক আধিপত্য ও অগণতান্ত্রিক মনোভাবের প্রকাশ ঘটতে থাকে, যুদ্ধের পরও তার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। শুধু প্রাদেশিক পরিষদেই নয়, জাতীয় পরিষদের অধিবেশনগুলিতেও একই ধরণের ঘটনা ঘটতে থাকে। ১৯৬৬ সালের ৭ মার্চ জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনে যখন বিরোধী দলীয় সদস্যগণ শত শত রাজবন্দী সম্পর্কিত সরকারী নীতির পরিবর্তন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুলিসী নির্যাতন সম্পর্কিত ঘটনাবলীর তদন্তের দাবি সম্বলিত মুলতবী প্রস্তাব উথাপন করেন, তখন তা অত্যন্ত অমর্যাদাকরভাবে নাকচ করা হয়। উক্ত অধিবেশনে বিরোধী দল ওয়াক আউট করলেও সরকারী দলের এ ধরণের আচরণের কোন পরিবর্তন হয়নি।

বিরোধী দলের পক্ষ থেকে জাতীয় পরিষদে ঐসময় শাসনতন্ত্র নিয়েও আলোচনার সূত্রপাত করা হয়। শাসনতন্ত্রের অগণতান্ত্রিক ধারা সংবলিত চারটি বিল উথাপন করা হয়। কিন্তু এ বিলগুলি গৃহীত হয়নি। ১৯৬৬ সালের ৬ই জুন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে যে ঘটনা ঘটে প্রায় অনুরূপ ধরনের ঘটনা পশ্চিম পাকিস্তান পরিষদে এর মাত্র দু'দিন পরে ঘটে। ফলে সেখানে বিরোধী সদস্যরা ওয়াকআউট করতে বাধ্য হন। এ সময় জাতীয় পরিষদে অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ যে কি উৎকট রূপ ধারন করে তা মিজানুর রহমান চৌধুরীর গ্রেপ্তারকে কেন্দ্র করে প্রকাশ পায়। ১৯৬৬ সালের ২৮ জুন যখন জাতীয় পরিষদে ন্যাপ দলীয় সদস্য মাহমুদ আলী আওয়ামী লীগ নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরীর আটকাদেশের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তখন সরকারী দল কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়। মাহমুদ আলী এর সমালোচনা করে যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর দাবি করেন। এ কারণে স্পিকার তাকে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন থেকে বহিষ্কার করেন। বিরোধী দলের প্রায় সকল সদস্য এ ঘটনার প্রতিবাদে দু'দুবার ওয়াকআউট করেন, কিন্তু তাতেও কোন ফল হয়নি। শুধু তাই নয়, এ ঘটনার পর সরকারী দলের সদস্য ও সংসদ সচিবদের হুমকি প্রদানের প্রবণতা বেড়ে যায়। যেমন, একদিন জনৈক সংসদ সচিব কর্তৃক একজন বিরোধীদল সদস্য মারাত্মকভাবে লাঞ্ছিত হন; এর প্রতিবাদে বিচার দাবি করা হলে সরকারী দল তা অগ্রাহ্য করে। এ প্রশ্ন নিয়ে ১৯৬৫ সালের ৩ ডিসেম্বর যখন একটি মুলতবী প্রস্তাব উথাপন করা হয় তখনও তা বাতিল করে দেওয়া হয়। শুধু এ প্রস্তাবকেই বাতিল করা হয়নি, বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে কোন ধরনের প্রস্তাব উথাপনেই বিরোধিতা করা হতে থাকে। বিরোধী সদস্যগণ যাতে বেশি কথাবার্তা বলতে না পারেন সে লক্ষ্যে পরিষদ সদস্যদের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত ধারাসমূহকে সীমাবদ্ধ করে নিতান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে ১৯৬৬ সালের ৯ ডিসেম্বর পরিষদ কার্যবিধি বিল গ্রহণ করা হয়। এর পর সরকারের সকল অগণতান্ত্রিক অধ্যাদেশকে অনুমোদন করে আইনে পরিণত করা হয়। বিরোধী দলের কোন সমালোচনাই এ সবকে বাঁধা দিতে পারেনি। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে ১৯৬৬ সালের ৯ ডিসেম্বর ও ১৯৬৭ সালের ১৯ জুলাই যথাক্রমে রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ গৃহীত হয়। আর ২৫ জানুয়ারি গৃহীত হয় শ্রম আইন অধ্যাদেশ। জাতীয় পরিষদে ২ জুন গৃহীত হয় মৌলিক গণতন্ত্র সংশোধনী বিল। ১৯৬৭ সালের ২৬ মে দৈনিক 'আজাদের' এক রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে, উক্ত পরিষদ কার্যবিধি বিল গৃহীত হওয়ার পর থেকে বিরোধী দল উথাপিত কোন প্রস্তাবই আলোচনার জন্য গৃহীত হয়নি। এমনকি, তাদের প্রশ্ন করার অধিকারকেও কেড়ে নেওয়া হয়। ১৯৬৫ সালের ১৬ জুলাই বিরোধী দলের পক্ষ থেকে রাজবন্দীর সংখ্যা সম্পর্কিত একটি প্রশ্ন উথাপনের দাবি করা হলে, তাকেও প্রত্যাখ্যান করা হয়। এ ধরনের ন্যূনতম অধিকারকেও খর্ব করা হলে সকল বিরোধী দলীয় ও স্বতন্ত্র দলীয় সদস্য একযোগে ওয়াক আউট করেন। কিন্তু এতেও কোন কাজ হয়নি। এর পরবর্তী সময়ের সংসদীয় কার্যাবলির ইতিহাস আরো দুঃখজনক। জাতীয় কিংবা প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধী দল বা স্বতন্ত্র সদস্যদের সকল কথাবার্তাই অরণ্যে রোদন হিসাবে পরিগণিত হয়। এ ধরনের অগণতান্ত্রিক পরিবেশে ১৯৬৭–৬৮ সালের বাজেট ১৯৬৭ সালের ২৯ জুন কোন সংশোধনী ছাড়াই গৃহীত হয়। ১৯৬৮ সালের ১৭ জানুয়ারি গ্রহণ করা হল বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ, ২৩ জানুয়ারি গৃহীত হল পূর্ববঙ্গ ভূমিদখল ও প্রজাস্বত্ব অধ্যাদেশ, ১৫ মে গৃহীত হল ফৌজদারী কার্যবিধি বিল, ৩ জুলাই গৃহীত হল কোম্পানী বিল এবং ৩০ ডিসেম্বর '৬৮তে গৃহীত হল বাড়ি–ভাড়া নিয়ন্ত্রণ বিল। উক্ত বিলগুলি গৃহীত হয় কোন রকম সংশোধনী ছাড়াই,অথচ এ সবগুলি বিল সম্পর্কেই বিরোধী দলের খুবই গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী ছিল। ১৯৬৮ সালেও এ ধারার কোন পরিবর্তন হয়নি। এ সময় যে সকল প্রস্তাবকে বাতিল করা হয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হলঃ ১৯৬৮ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি রেল কর্মচারীদের হয়রানি বন্ধের লক্ষ্যে উথাপন করা হয় রেল কর্মচারীদের বদলী সংক্রান্ত মুলতবী প্রস্তাব, যাকে নাকচ করে দেওয়া হয়। ২৩ মে বিরোধী দল জরুরী আইনের মেয়াদ ৬ মাসের মধ্যে সীমিত করার প্রস্তাব করলে তা আলোচনার জন্যই গৃহীত হয়নি। সংসদের একটি বেসরকারী দিবসে শাসনতন্ত্র সংশোধনের জন্য বিরোধীদল একটি বিল উথাপনের প্রার্থনা করলে তা অগ্রাহ্য করা হয়। তাছাড়া, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর চিকিৎসা–ভাতা এবং পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর তদন্ত করার প্রস্তাব দুটিও বাতিল করে দেওয়া হয়। ১৯৬৮ সালের শেষ দিকে যখন আইয়ুব সরকার দেশের জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, সর্বত্র আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে তখনও পরিষদের অভ্যন্তরে সেই অগণতান্ত্রিক ধারাই অব্যাহত থাকে। ১৯৬৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর যখন প্রাদেশিক পরিষদে গুলীবর্ষণ ও নাগরিক হত্যা সম্পর্কিত মুলতবী প্রস্তাব উথাপন করা হয় তখন তাও বাতিল হয়ে যায়।

উপরের আলোচনায় জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে গণতন্ত্র অনুশীলনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা থেকে এটা খুবই স্পষ্ট যে, মূলতঃ প্রত্যক্ষ সামরিক শাসনের অবসানের পর সেই সামরিক শাসন আমলের কালা–কানুনগুলিকে আইনে পরিণত করায় ও সে অনুযায়ী দেশের ওপর পরোক্ষভাবে সামরিক শাসনকে বলবৎ রাখার স্বার্থেই এ পরিষদগুলি গঠন করা হয়েছিল। যতদিন পর্যন্ত সরকার বিরোধী

Dhaka University Institutional Repository

সদস্যদের সমালোচনা বা প্রস্তাব উত্থাপন সরকারের জন্য তেমন কোন ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি ততদিন পর্যন্ত তাদের কথা বলতে দেওয়া হয়েছে, তাদের প্রস্তাবসমূহ আলোচিত হয়েছে, এমনকি দু'চারটি অনুমোদিতও হয়েছে। কিন্তু যখন থেকে বিরোধীদলের বক্তব্য সরকারের অব্যাহত গণনিপীড়নমূলক নীতির মূল বিষয়গুলিকে তুলে ধরতে শুরু করলো, প্রতিটি অগণতান্ত্রিক কর্মকান্ডের প্রতিবাদ হতে থাকল তখন থেকে তাদের মুখ বন্ধ করে দেওয়ার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। সরকার যা করবে সে সম্পর্কে ক্ষীণ প্রতিবাদকে অনুমোদন করা যায়, কিন্তু কোনক্রমেই সরকারের নীতিসমূহ হুমকির সম্মুখীন হতে পারে এমন কোন অধিকার জাতীয় বা প্রাদেশিক পরিষদকে দেওয়া যায়না- এই ছিল ষাট দশকে পাকিস্তান সরকারের গৃহীত নীতি। অর্থাৎ ষাট দশকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের আইন বিভাগ বলতে যা ছিল তার নিজস্ব কোন অধিকার ছিল না, তা শাসন বিভাগ কর্তৃক গঠিত এবং সে বিভাগ দ্বারা পরিচালিত ও তার অনুগত। পাকিস্তান রাষ্ট্রে শাসন বিভাগ কতখানি অধিপত্যকারী ছিল তা ষাট দশকের শাসনতান্ত্রিক শাসনামলে পাকিস্তান রাষ্ট্র জনসাধারণের ওপর যে নির্মম নির্যাতন ও দমননীতি পরিচালনা করেছে সে সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করলেই পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

৭.৫ আইয়ুব আমলে গণনির্যাতন ও দমননীতি[১১৪]

প্রত্যক্ষ সামরিক শাসন আমলের দমন-পীড়নের কিছু পরিচয় ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছে। সামরিক আইনের প্রত্যক্ষ শাসন তুলে নেওয়ার পর দমন-পীড়নের প্রকৃতির মাঝে নতুন একটি মাত্রা যোগ হয়। আর সেটা হল গুন্ডামি। ১৯৬২ সালের মধ্যভাগে সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর গুন্ডামির মাধ্যমে বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মতৎপরতাকে কিভাবে বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছিল সে সম্পর্কে দু'একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন চীফ মিনিস্টার জনাব আতাউর রহমান খান গুন্ডামি সম্পর্কে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন। ১৯৬২ সালের আগষ্ট মাসে হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার কিছু দিন পর নিজের সহকর্মীদের নিয়ে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রচার করতে পশ্চিম পাকিস্তান সফরে গিয়েছিলেন। এই প্রচার-সফরের অভিজ্ঞতা জানিয়ে আতাউর রহমান খান লিখেছেনঃ "লাহোরে জনসভার আয়োজন করা হল মোচি-গেটে। রাত্রিকালে মিটিং শুরু হওয়ার সাথে সাথেই কতকগুলি গুন্ডা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল মিটিং-এ। ইট-পাটকেল ছুড়লো। লাঠিধারী পুলিস রাস্তায় ও মন্ডপের চারদিকে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখতে লাগল। এটা সরকারী ব্যবস্থা বোঝা গেল। পশ্চিম পাকিস্তানে জনসভার আয়োজন করা নিরাপদ হবে না, এটাও বুঝতে পারলাম।

"লায়ালপুরেও একই অবস্থা। গুন্ডাদের হামলা। চরম হামলা হল গুজরানওয়ালায়। গাড়ি থেকে সোহরাওয়ার্দী নামার সাথে সাথেই গুন্ডার দল হামলা করল। একজন গুলী না পট্‌কা নিক্ষেপ করল নেতাকে লক্ষ্য করে। একজন কর্মীর গায়ে লেগে জখম করল তাকে। ....

"সেখান থেকে করাচী যাই। সেখানেও রেল ষ্টেশনে সোহরাওয়ার্দীর উপর গুন্ডার হামলা চলে। আমাদের অনেকেই লাঠির আঘাত পাই।......... করাচী আয়োজিত জনসভা বাতিল করে দেওয়া হল। "[১১৫]

শুধু পশ্চিম পাকিস্তানে যে সরকার সমর্থক গুন্ডাদের এদোর্দন্ড প্রতাপ ছিল তা নয়, পূর্ব পাকিস্তানেও তাদের কারণে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। সুযোগ পেলেই তারা ছাত্র, শ্রমিক, রাজনৈতিক কর্মী ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। পূর্ব পাকিস্তানে গুন্ডামির প্রকৃতি সম্পর্কে একটি ঘটনার উল্লেখ করলেই পরিস্থিতি সম্পর্কে আঁচ করা যাবে।

১৯৬৪ সনের ২৯শে সেপ্টেম্বর ছিল বিরোধী দল সমূহের আহবানে জুলুম প্রতিরোধ দিবস। এ উপলক্ষে চট্টগ্রামে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। শ্রমিক-জনতা স্বতস্ফুর্তভাবে মিছিল করে, আর এ মিছিলের ওপর সরকার-সমর্থিত গুন্ডাবাহিনী মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সহকারে আক্রমণ চালায় এবং এর ফলে মোট ২৫০ জন শ্রমিক ও তরুণ আহত হয়। এআক্রমণের হাত থেকে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, এমনকি মহকুমা হাকিমও রক্ষা পাননি।[১১৬] একটি পত্রিকার এরিপোর্টে বলা হয়, "গতকল্য পূর্ণ হরতাল পালনকালে স্বতঃস্ফূর্ত শ্রমিক-জনতার মিছিল খাতুনগঞ্জের বাহাদুর শাহ মাজারে পৌঁছিলে বিশেষ স্বার্থবাদী মহল কর্তৃক লেলাইয়া দেওয়া গুন্ডাদল মারাত্মক অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তাহাদের ওপর আকস্মিক হামলা চালায়। নেতৃবৃন্দও রক্ষা পায়নি, পুলিস সুপার ও মহকুমা হাকিম নেতৃবৃন্দকে রক্ষা করতে উপস্থিত হলে তারাও আক্রান্ত হয় এবং মহকুমা হাকিম সহ্য করিতে না পারিয়া অচৈতন্য হইয়া পড়ে।"[১১৭]

চট্টগ্রাম ঘটনার দ্বিতীয় দিনেও শ্রমিক-জনতার ওপর আরও মারাত্মক হামলা চলে। এ প্রসঙ্গে দৈনিক 'সংবাদের এক রিপোর্টে বলা হয়, "চট্টগ্রামে ২য় দিবসেও গুন্ডাদের হামলা অব্যাহত; ১৬ জন আহত শ্রমিক গ্রেফতার, শিল্পাঞ্চলে পুলিস মোতায়েন...... দুষ্কৃতকারীদের আক্রমণে ৪০ জন শ্রমিক আহতঃ ১ জন মরণাপন্ন।.......

"কায়েমী স্বার্থবাদী মহলের প্ররোচণায় হীন স্বার্থ উদ্ধারের কাজে নিয়োজিত ঘৃণ্য গুন্ডাবাহিনী গতকল্য (বুধবার) আবার চট্টগ্রামের বীর শ্রমিকদের উপর উন্মত্ত হামলা চালাইয়াছে। ফলে ৩০ হইতে ৪০ জন শ্রমিক আহত হইয়াছেন এবং আহতদের একজনকে গুরুতর অবস্থায় বর্তমানে অক্সিজেন দিয়া রাখা হইয়াছে। প্রকাশ, ১৬ জনকে হাসপাতাল হইতে গ্রেফতার করা হইয়াছে।"[১১৮]

এ হামলা ও গ্রেফতার করেই সরকারী মদতপুষ্ট গুন্ডাবাহিনীও তার পুলিসবাহিনী ক্ষান্ত হয়নি; এর পর থেকে গুন্ডারা পুলিসবাহিনীর সহায়তায় শ্রমিকদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখে এবং একতরফা শ্রমিক বস্তিগুলির ওপর হামলা চালায়ও লুটপাট করে। এ প্রসঙ্গে সংবাদের এক রিপোর্টে বলা হয়, "কালুরঘাটের ৭ হাজার শ্রমিক ৩০শে সেপ্টেম্বর হইতে পুলিস ও গুন্ডাবাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ রহিয়াছেন। কালুরঘাট ব্রীজ হইতে উসমানিয়া গ্লাসশীট ফ্যাক্টরী পর্যন্ত যত শ্রমিক বস্তি রহিয়াছে উহার প্রত্যেকটির উপর দুষ্কৃতিকারীরা পুলিশের উপস্থিতিতে ও প্রকাশ্য দিবালোকে হামলা চালায় ও লুঠতরাজ করে। আনুমানিক ৩ হাজার শ্রমিক নিঃসম্বল অবস্থায় মিল ব্যারাকে আশ্রয়

---

১১৪ এ ধরনের ঘটনাবলির মূল তথ্য উৎস হচ্ছে 'দৈনিক আজাদ' এ প্রকাশিত বিভিন্ন রিপোর্ট। প্রতি পাতায় সূত্র নির্দেশ করতে গেলে জটিলতা বৃদ্ধি পেতে পারে বিধায় এটা পরিহার করা হয়েছে। তবে যে সকল রিপোর্ট থেকে তথ্যরাজি সংগ্রহ করা হয়েছে সেগুলি প্রকাশের সাল তারিখসহ সকল শিরোনাম পরিশিষ্ট-১-এ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রয়োজনে পরিশিষ্ট-১ দেখা যেতে পারে। অন্যান্য উৎসের সূত্র সাথে সাথেই উল্লেখ করা হয়েছে।

১১৫. খান, আতাউর রহমান (১৯৭০)ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১।

১১৬. সাপ্তাহিক জনতা, ৩০ সেপ্টেম্বর, ঢাকা, ১৯৬৪।

১১৭. প্রাগুক্ত,

১১৮. সংবাদ, ১লা অক্টোবর, ঢাকা, ১৯৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। সেই ৩০শে সেপ্টেম্বর থেকে উক্ত স্থানে সর্বমোট ৭ হাজার শ্রমিক পুলিস ও গুন্ডাবাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ অবস্থায় নিদারুণ কষ্টে দিন কাটাইতেছে।"[১১৯]

চট্টগ্রামের শ্রমিকদের ওপর যখন এই বর্বর অত্যাচার ও জুলুম চলছে, ঠিক সে সময় খুলনার শ্রমিক-জনতার ওপর চলছে সরকারী ও মালিক পক্ষীয় গুন্ডাদের ত্রাসের রাজত্ব। চট্টগ্রামের ২৯ ও ৩০ সেপ্টেম্বরের ঘটনার মাত্র ১২ দিনের মাথায় অর্থাৎ ১৯৬৪ সালের ১৩ অক্টোবর খুলনায় নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ শ্রমিকদের উপর ভাড়াটিয়া বাহিনীর নির্মম হত্যাযজ্ঞ সংগটিত হয়। প্রদেশব্যাপী চটকল শ্রমিক ধর্মঘটের প্রথম দিন থেকেই খুলনার পিপলস জুটমিলে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়। শ্রমিকদের ওপর গুন্ডাবাহিনী লেলিয়ে দিয়ে বলপূর্বক কারখানা চালু করার চেষ্টা করা হয়। ফলে খুলনার ইতিহাসে ঘটে যায় এক জঘন্যতম ঘটনা। পুলিস গ্রহরাধীনে ভাড়াটিয়া গুন্ডাবাহিনী শ্রমিকদের ওপর হামলা চালালে শ্রমিকদের সংগঠিত প্রতিরোধের সামনে গুন্ডারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। এতে সরকারী মদতপুষ্ট মালিকগণ মরিয়া হয়ে ওঠে। পুলিসের সহায়তায় ভাড়াটিয়া গুন্ডারা শ্রমিক বস্তিগুলিতে নির্বিচার লুটপাট চালায় এবং নির্মম অত্যাচার করতে থাকে। এ অত্যাচার ও নির্যাতনকে প্রতিহত করতে যখন সাধারণ শ্রমিকেরা এগিয়ে এল তখন শ্রমিকদের ওপর গুন্ডাবাহিনী চরম আঘাত হানলো। শ্রমিকদের ওপর এ হামলা চললো কয়েক দিন ধরে। গুন্ডাদের এ নারকীয় হামলায় অসংখ্য শ্রমিকের (মতান্তরে শতাধিক) জীবনাবসান ঘটলো। এটা ছিল আসলে একটি গণহত্যা। অবশ্য খুলনার শ্রমিকদের ওপর গুন্ডাদের হামলা ও হত্যাকান্ডের ঘটনা এই প্রথম নয়, এ বছরেরই ২৩ জুন এই পিপলস্ জুট মিলেই শ্রমিকদের ওপর গুন্ডাদের সশস্ত্র হামলার ফলে একজন শ্রমিক নিহত হয় এবং কায়েকজন শ্রমিক সাংঘাতিকভাবে আহত হয়।[১২০]

শুধু চট্টগ্রাম ও খুলনার শ্রমিকদের ওপরই শুধু গুন্ডাদের হামলা চলেছে তা নয়, সারা পূর্ব পাকিস্তানের শহরাঞ্চলেই সরকার সমর্থিত গুন্ডাদের দৌরাত্ম্য চলতে থাকে। ফলে ছাত্র, শিক্ষক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক কর্মীসহ সকল স্তরের জনসাধারণের মনে এক প্রচন্ড আতংক সৃষ্টি হয়।

গুন্ডাদের এ ধরনের আচরণের বাইরেও সরকারী প্রশাসনের মাধ্যমে যে বিভিন্ন ধরনের নিপীড়নমূলক কর্মকান্ড চালানো হয়েছিল সেগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহের কালানুক্রমিক বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হল।

প্রত্যক্ষ সামরিক শাসন অবসানের পর থেকে গণনিপীড়ন পরিচালনার জন্য নানাবিধ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। প্রথমেই প্রকাশনা শিল্পের ওপর আঘাত হানা হয়। সরকারের কোন নীতির ব্যাখ্যায় সমালোচনা করে কিছু প্রকাশিত হলেই তা দন্ডনীয় অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হয়। এমনকি, কোন প্রেসেও যদি সরকারকে সমালোচনা করা হয়েছে এমন কিছু ছাপা হয় তাহলেও দন্ডনীয় অপরাধ হিসাবে গণ্য হয়। শুধু তাই নয়, সরকারী বিধান অনুযায়ী কোনরূপ পূর্ব অনুমতি ছাড়া যে সকল গ্রন্থ প্রকাশ করার সুযোগ ছিল সে ধরনের কোন গ্রন্থের মধ্যেও যদি সরকারের সমালোচনা করা হয় তাহলেও তা দন্ডনীয় অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হতে থাকে। এ ধরনের অসংখ্য ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনা ঘটেছিল ১৯৬৪ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ১৭ সেপ্টেম্বর (শিক্ষা দিবস) উপলক্ষে 'সূর্যজ্বালা' নামক একটি স্বরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। 'বিশ্বমুদ্রনালয়' ও 'মোনালিসা প্রেস' নামক দুটি প্রতিষ্ঠানের ওপর এর প্রকাশনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠান দুটি স্বরণিকাটি ছাপার উদ্যোগ নেওয়ার অপরাধে প্রেসের মালিকদ্বয়কে গ্রেফতার করা হয় এবং স্বরণিকার সকল ছাপানো ও কম্পোজ করা ফর্মাগুলিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়।[১২১] এর পর থেকে ক্রমাগত প্রকাশনা শিল্পের সাথে জড়িত সাংবাদিক, রাজনৈতিক কর্মী, প্রেস মালিক ইত্যাদির ওপর নির্মম হামলা নেমে আসে। ১৯৬৪ সালের ১৫ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর এই ছয়দিনের মধ্যে প্রদেশের সংবাদপত্র ও প্রকাশনার ওপর সরকার নতুন আইন জারি করার মাধ্যেমে অসংখ্য ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। অথচ তাদের অধিকাংশকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়। শুধুমাত্র ১৫ সেপ্টেম্বরেই গ্রেফতার করা হয় 'মাসিক পৃথিবীর' সম্পাদক মোজাম্মেল ইসলামকে, গ্রেফতার করা হয় প্রেস মালিক হারুনুর রশিদকে, যশোরের ন্যাপ নেতা আবদুস শহীদকে এবং ইকবাল হলের ছাত্র ছাত্রনেতা রেজা আলীকে। পরদিন তথা ১৬ সেপ্টেম্বর গ্রেফতার করা হয় সাপ্তাহিক জনতার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ও সাংবাদিক সমিতির কোষাধ্যক্ষ আনোয়ার জাহিদকে। ঐ দিনই রংপুর থেকে ছাত্র ইউনিয়ন নেতা ও ডাকসুর সাধারণ সম্পাদিকা মতিয়া চৌধুরীকে ও ছাত্র ইউনিয়নের অপর নেতা কামরুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়। আর নিলফামারী থেকে ছাত্র ইউনিয়নের অপর নেতা পংকজ ভট্টাচার্যকে গ্রেফতার করা হয়। ১৮সেপ্টেম্বর নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয় আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মোস্তাক আহমদকে। ২০ সেপ্টেম্বর উক্ত আইনে গ্রেফতার করা হয় পাকিস্তান ন্যাপের কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্য ও সাপ্তাহিক জনতার সম্পাদক সওকত আলী খানকে এবং আওয়ামীলিগ নেতা মোশারফ হোসেনকে।[১২২] এসব ঘটনার ফলে ঢাকা শহরের চারিদিকে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ঢাকা শহরের বেশ কিছু এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। ঢাকা সদর মহকুমা হাকিম ২০ সেপ্টেম্বর থেকে ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় যে ১৪৪ ধারা জারির নির্দেশ দেন তাতে ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় পাঁচ অথবা ততধিক ব্যক্তির সমাবেশ, শোভাযাত্রা, শ্লোগান, লাঠি, ফ্লাগ, যে কোন দাহ্য পদার্থ, যে কোন অস্ত্র, পোস্টার এবং প্লেকার্ড বহন, মাইক অথবা লাউড স্পীকার ব্যবহার বেআইনী ঘোষণা করা হয়। ঢাকা শহরের লালবাগ, রমনা ও কোতোয়ালী থানার বিভিন্ন এলাকা তথা ঢাকা শহরের মূল এলাকাগুলির ওপর অনির্দিষ্টকালের জন্য এ ঘোষণা বলবৎ করা হয়।[১২৩]

১৯৬৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিতব্য ঐতিহাসিক শিক্ষা দিবসকে উপলক্ষ করে পাকিস্তান রাষ্ট্র যে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে সাংবাদিক, ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতার ওপর নতুন করে আটকাদেশ প্রদান করতে থাকে তার পূর্বেই দেশে কি ধরনের রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন চলছিল সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় ১৭ সেপ্টেম্বর উপলক্ষে লেখা একটি সম্পাদকীয়তে। এ সম্পাদকীয়তে মত প্রকাশ করা হয়, ছাত্ররা যেমন বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত গনতান্ত্রিক অধিকারের লড়াইয়ে এগিয়ে এসেছে, তেমনই ছাত্রদের এ উচ্চকিত কণ্ঠকে স্তব্ধ করার জন্য সরকারী পক্ষও প্রস্তুত। বিদ্যমান পরিস্থিতির বিবরণ দিয়ে বলা হয়ঃ "পাকিস্তানে বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানে আজ এ অনন্য নিষ্ঠুরতা সংঘটিত

---

১১৯. সংবাদ, ৭ অক্টোবর, ঢাকা, ১৯৬৪।

১২০. আহমদ, জাফর (১৯৬৫)ঃ 'খুলনার শ্রমিক আন্দোলন ও সরকারী নীতি,' সাপ্তাহিক জনতা, ঢাকা, ৫ই মে, ১৯৬৫, শ্রমিকের মৃত্যু সংখ্যা নিয়ে মতান্তর আছে, তবে অসংখ্য লাশ যে গুম করে ফেলা হয় সে প্রমাণ পাওয়া যায়।

১২১. সাপ্তাহিক জনতা, ঢাকা, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪।

১২২. সাপ্তাহিক জনতা, ঢাকা, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪।

১২৩. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

হইতেছে। বিশ্বের কোন দেশে ইতিপূর্বে এইরূপ হীন পন্থার ছাত্র সমাজকে দমন করার কোন নজির আছে কি-না আমাদের অন্তত জানা নাই। সরকার আবার তাহাদের পুরাতন কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ছাত্রদের কোন কথা, ছাত্রদের কোন কান্নাও যেন তাহাদের পিতামাতা না জানিতে পারেন, তজ্জন্য সংবাদপত্রের কণ্ঠ টিপিয়া ধরিয়াছে।

"বর্তমান ছাত্র সমাজের উপর যে প্রশাসনিক হামলা পরিচালিত হইতেছে, তাহাকে সরকারী উদ্যোগে সুপরিকল্পিত গুন্ডামি ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় আখ্যায়িত করা যায় কি-না সন্দেহ। উৎসবমুখর ছাত্র মিছিলের উপর তস্করের মত পুলিস হামলা চালাইতেছে। আজ গ্রামে প্রবেশ করিয়া নয় দশ বৎসরের মাসুম বাচ্চাকে পিটাইয়া হাজতে আটক করিতেছে। মাসের পর মাস ধরিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিয়া রাখা হইতেছে। দলে দলে ছাত্রদের পাইকারীভাবে বহিষ্কার করা হইতেছে।

"শহরে ১৪৪ ধারা নাই। কিন্তু ছাত্ররা মিছিল করিতে পারিবে না। দেশে কোন জরুরী পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নাই; কিন্তু ছাত্রদের উপর পরিচালিত অকথ্য দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপণের জন্য জনসভা করা যাইবেনা। দেশের ছাত্রসমাজের ২২ দফা দাবির মধ্যে এমন কোন ধারা নাই যাহাকে কোন অতি উৎসাহী ব্যক্তিত্ব 'অন্তর্ঘাতীমূলক' বলিয়া অভিহিত করিতে পারে, তবু তাহার সমর্থনে কোন বিবৃতি দিলে জাতীয় সংবাদপত্র তাহা প্রকাশ করিতে পারিবে না।"[১২৪]

'জনতা পত্রিকায়' এ ধরনের সম্পাদকীয় প্রকাশের দিনই গ্রেফতার হন তার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক এবং এর চারদিন পর গ্রেপ্তার হন তার সম্পাদক। সম্পাদকদ্বয়কে গ্রেফতার করেই পাকিস্তান রাষ্ট্র ক্ষান্ত হয়নি, 'জনতা'র এ সংখ্যাকে বাজেয়াপ্ত করা হয়। শুধু তাই নয়, সাপ্তাহিক জনতার ওপর 'প্রিসেন্সরশীপ' আরোপ করা হয়। এ নির্দেশে বলা হয় যে, জনতায় প্রকাশিতব্য সকল ম্যাটার পত্রিকায় ছাপা হওয়ার পূর্বে পূর্বপাকিস্তান সরকারের অনুমোদিত কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমোদনের জন্য দাখিল করতে হবে। এ নির্দেশ শুধু সম্পাদকের কাছে দেওয়া হয়না, মুদ্রাকর ও প্রশাসকের কাছেও পাঠানো হয়। ১৯৬৪ সালের ৫ অক্টোবর পাঠানো উক্ত নির্দেশে বলা হয়ঃ

......"The Governor is pleased, for the purpose of securing the public safety and the maintanance of public order, to order that all matters, before being published in the `Janata' a weekly news paper published from Dacca, shall be submitted for scrutiny to Mr. A. Rashid Khan, Bengaly Translator to the Government of East Pakistan in his office"[১২৫]

শুধু জনতা পত্রিকার ওপরই যে এ ধরনের নিপীড়নমূলক নির্দেশ জারি করা হয়েছিল তা নয়, অন্যান্য সংবাদপত্রের ওপরও নানা ধরনের নিপীড়নমূলক নির্দেশ জারি করা হয়। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার সময় দৈনিক ইত্তেফাকের ১৭ই জানুয়ারি সংখ্যায় দুর্বৃত্তদের দৌরাত্মে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে বিভিষিকা অব্যাহতঃ 'মুসলিম দরদীদের আক্রমণে তৃতীয় দিনেও বহু মুসলমান হতাহতঃ পশুশক্তি রুখিয়া দাঁড়াইবার জন্য সাধারণ নাগরিকের দৃঢ় মনোভাব' শীর্ষক সংবাদ এবং 'প্রতিরোধ বাহিনী গড়িয়া তুলুন' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করা হয়। শুধুমাত্র এ কারণে প্রাদেশিক সরকার প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স অধ্যাদেশ (১৯৬০) বিধান বলে নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেসের পরিচালক ও দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক জনাব তোফাজ্জল হোসেনকে, কেন তার কাছ থেকে ২৫ হাজার টাকা জামানত তলব করা হবেনা তার কারণ দর্শানোর জন্য ২৮শে মার্চ এক নোটিশ জারি করে। সে সময় শুধুমাত্র কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদানের মধ্যে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু তার মাত্র ৬ মাস পর অর্থাৎ ১২ই অক্টোবর কোন রকম কারণ দর্শানোর সুযোগ না দিয়ে সরাসরি ২৫ হাজার টাকা অথবা অনুরূপ মূল্যের জামানত দাখিল করার জন্য ইত্তেফাক ও নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস কর্তৃপক্ষের কাছে নোটিশ প্রদান করা হয়।[১২৬]

সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনসাধারণের ওপর উপরোক্ত বিভিন্ন উপায়ে নিপীড়ন ছিল সে সময়ের একটি সাধারণ ঘটনা। অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা তখন জেলে ছিল। সরকারের প্রতি যারা খানিকটা নমনীয় মনোভাব পোষণ করতেন এবং যে কোন সময় মন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করতে পারেন বলে যাদের নামে প্রচার ছিল এমন নেতৃবৃন্দও যদি সরকারকে সামান্যতম সমালোচনা করতেন তাহলেও তাদের বিনা বিচারে আটক করে রাখা হত। এরকম একজন নেতা ছিলেন ফরিদ আহমদ, যিনি তখন একজন জাতীয় পরিষদ সদস্য এবং নেজামে ইসলাম পার্টির সম্পাদক। ফরিদ আহমদ লাহোর ও লায়ালপুরে সরকারের সমালোচনা করে বক্তৃতা করেছিলেন - শুধুমাত্র এই কারণে তাকে ১৯৬৪ সালের ১২ সেপ্টেম্বর গ্রেফতার করা হয় এবং বিনা বিচারে দু'মাসের জন্য কারাগারে প্রেরণ করা হয়।[১২৭] এ ধরনের গ্রেপ্তার ও বিনা বিচারে আটক রাখা ছাড়াও আরো বিভিন্ন কৌশলে রাজনীতিবিদদের ওপর নির্যাতন চলত। তার মধ্যে একটি পদ্ধতি হচ্ছে কোর্ট থেকে আটকাদেশ অবৈধ বলে ঘোষিত হওয়ার পর যখন কোন রাজবন্দী মুক্তির নির্দেশ পেতেন তখন রাষ্ট্রীয় প্রশাসন তাঁকে ফের জেল গেট থেকে গ্রেফতার করে তার ওপর এক বা একাধিক মিথ্যা মামলা প্রদান করে আবার অনির্দিষ্টকালের জন্য জেলে পাঠিয়ে দিত। এ বিষয়টি প্রমাণ করার জন্য নিম্নোক্ত একটি উদাহরণই যথেষ্ট।

১৯৬৪ সালের ১ অক্টোবর পূর্বপাকিস্তান জননিরাপত্তা অধ্যাদেশের ৪১ ধারাকে আদালত শাসনতন্ত্রের ২(৫) ধারার পরিপন্থী বলে ঘোষণা করায়, প্রথমে 'জনতা' সম্পাদক শওকত আলীকে মুক্তি দেওয়া হয়। পরবর্তী কয়েকদিনের মধ্যে আরো ১১জন বিশিষ্ট রাজবন্দীর আটকাদেশ অবৈধ বলে আদালত ঘোষণা করে এবং মুক্তির নির্দেশ দেয়। এই ১২ জনের সবাইকে আদালতের নির্দেশ মোতাবেক মুক্তিপ্রদান করা হয়, কিন্তু তাদের নামে অন্য অভিযোগ এনে জেল গেট থেকেই তাদের সকলকে গ্রেফতার করে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কারাগারে পাঠানো হয়। এই বিশিষ্ট রাজবন্দীদের মধ্যে শওকত আলী ছাড়া আরো যাঁরা ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন ময়মনসিংহের ন্যাপ নেতা জনাব আলতাফ আলী, পাবনার শ্রমিক নেতা জসিমউদ্দিন, চট্টগ্রাম ন্যাপ নেতা মওলানা আহমদুর রহমান আজমী, খুলনার জনাব নজরুল ইসলাম, কাজী জাফর আহমদ, মহিউদ্দিন আহমদ, শেখ ফজলুল হক, সওগাতুল আলম, বদিউজ্জামান বড় লস্কর, আসমত আলী শিকদার, খোন্দকার মোশতাক আহমদ ও জনাব আনোয়ার জাহিদ।[১২৮]

---

১২৪. সাপ্তাহিক জনতা, ঢাকা, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪।

১২৫. প্রাগুক্ত, ৯ই অক্টোবর, ১৯৬৪।

১২৬. প্রাগুক্ত।

১২৭. প্রাগুক্ত, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪।

১২৮. প্রাগুক্ত, ৯ই অক্টোবর.১৯৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

এ ছাড়া রাষ্ট্র নিপীড়নের অন্য যে সব পদ্ধতি ব্যবহার করতো, সেগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যখন-তখন বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া, যাতে ছাত্রদের আশু কোন প্রতিবাদ আন্দোলনকে বন্ধ করে দেওয়া যায়। যেমন ১৯৬৪ সালে পূর্ব নির্ধারিত সূচী অনুসারে ৫ অক্টোবর থেকে সরকারী ছুটি হবার কথা ছিল, কিন্তু আকস্মিকভাবে ১৮ সেপ্টেম্বর থেকেই এক মাসের জন্য প্রদেশের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়েই ছুটি ঘোষণা করা হয়।[১২৯] ১৭ সেপ্টেম্বর উপলক্ষে ছাত্রদের নেতৃত্বে গড়ে-ওঠা তীব্র আন্দোলনকে দমন করার জন্য এ ঘোষণা দেওয়া হয়। শুধু ছাত্র আন্দোলনকে দমন করার জন্যই যে এ ধরনের পদ্ধতি গ্রহণ করা হত তা নয়, শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া নিয়ে গড়ে-ওঠা যে কোন আন্দোলনও বন্ধ করে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের অপকৌশল অবলম্বন করা হয়। যেমন, কালুরঘাটের শ্রমিকরা যখন গুন্ডা ও পুলিসবাহিনী কর্তৃক ঘেরাও হয়েছিল ও চরমভাবে নির্যাতন ভোগ করছিল তখন পূর্ব পাকিস্তানের রেল শ্রমিকরা এ নিপীড়ন বন্ধের দাবিতে কারখানা বা রেল চালু রেখেই প্রতিদিন ২ ঘন্টা সময় ধরে ধর্মঘট করবে বলে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। রেল শ্রমিকদের এ কর্মসূচী যখন ব্যাপকভাবে পালিত হতে থাকে তখন এ আন্দোলনকে নস্যাৎ করার লক্ষ্যে রেল শ্রমিক ও কর্মচারীদের ধর্মঘট করার অধিকারকে তিন মাসের জন্য কেড়ে নেওয়া হয় অর্থাৎ রেল শ্রমিক কর্মচারীদের যে কোন ধরনের ধর্মঘটকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়।[১৩০]

উপরে আলোচিত বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় দমন-পীড়ন চলা ছাড়াও সামান্য কারণে গুলী বর্ষণ ও হত্যাসহ আরো নানাবিধ নির্যাতন জনসাধারণের ওপর চালানো হয়। উপরোক্ত ঘটনাবলীর পর থেকে ১৯৬৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত জনসাধারণের ওপর যে বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন চালানো হয়েছিল সে সব নিপীড়নমূলক কয়েকটি ঘটনার খুবই সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল।[১৩১] তবে এক্ষেত্রে সময় অতিক্রান্ত হওয়ার ক্রম অনুযায়ী ঘটনার বিবরণ প্রদান করা হল।

১৯৬৪ সালের ৭ অক্টোবর ওয়াপদা কর্মচারীদের আন্দোলন করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয় এবং যে কোন ধরনের ধর্মঘটকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়। ৮ অক্টোবর বেশ কয়েকজন বন্দীকে মুক্তি দিয়ে আবার গেট থেকেই অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্দী করা হয়। ১০ অক্টোবর খবর পাওয়া যায় ধর্মঘটী স্কুল শিক্ষকদেরকে সরকার ব্যাপকহারে বরখাস্ত করতে শুরু করেছেন। ১৩ অক্টোবর খুলনায় সাধারণ শ্রমিকদের ওপর গুন্ডা লেলিয়ে দেওয়ার পর সাধারণ শ্রমিকরা যখন গুন্ডাদেরকে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসে তখন সেখানে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। পরদিন প্রতিবাদী শ্রমিকদের ওপর গুলি চালানো হয়, এতে ১ জন নিহত হয় এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়। এদিন বহু শ্রমিককে গ্রেফতার করা হয়। উক্ত গুলি চালনা, হত্যা ও গ্রেফতারের ঘটনায় যখন শ্রমিকরা আরো বেশি প্রতিবাদী হয়ে ওঠে তখন মিল মালিক ও সরকারী দল যৌথভাবে বেশ কিছুসংখ্যক ভাড়া করা গুন্ডাকে শ্রমিকদের ওপর লেলিয়ে দেয় এবং পুলিশ এদের সমর্থন যোগায়। গুন্ডা ও পুলিসদের নির্মম নির্যাতনের ফলে খুলনার শ্রমিকরা শিল্প এলাকা থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু লুকিয়ে থাকা শ্রমিকদের ওপরও চলতে থাকে গুন্ডাদের আক্রমণ। এসব আক্রমণের ফলে আরও ১৩ জন আহত হয়। এর পর শুরু হয় শ্রমিক নেতাদের গ্রেফতার করার অভিযান।

ইতিমধ্যে মৌলিক গণতন্ত্রীদের নির্বাচন এসে যায়। শুরু হয় সরকার বিরোধী প্রার্থীদের ওপর পুলিসের হয়রানী। এ ধরনের একটি ঘটনা ঘটে ২৮ অক্টোবর। অবশ্য সরকার প্রেসনোট দিয়ে এ ঘটনার বিরোধিতা করে। ২ নভেম্বর সরকার বিরোধী প্রচার অভিযানে অংশগ্রহণের দায়ে একজন সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে গ্রেফতারের সংবাদ পাওয়া যায়। এই দিনই সংবাদ পাওয়া যায় যশোরের মাইকেল মধুসূদন কলেজের অধ্যক্ষ জনাব আবদুল হাই, একজন সুস্থ-সবল মানুষ থাকা সত্ত্বেও তার স্বাস্থ্য পরীক্ষার নির্দেশ প্রদান করার। এর পিছনে কারণ হচ্ছে এই যে, তার এক জন নিকট আত্মীয় সরকারী প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। অধ্যক্ষকে চাপ দেওয়া হয় তিনি যেনো তার আত্মীয়কে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াবার ব্যবস্থা করেন। এ অন্যায় দাবি অধ্যক্ষ সাহেব মেনে নেননি; আর এ কারণেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসাবে গভর্ণর মোনায়েম খানের নির্দেশে যশোরের সিভিল সার্জনের পক্ষ থেকে এ চাপ প্রদান করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে খারাপ রিপোর্ট দিয়ে তাকে অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ চালানোর অনুপযুক্ত বলে ঘোষণা করা।[১৩২] ৪ নভেম্বর দিনাজপুরের সরকার-বিরোধী প্রার্থীদের সমর্থনে শোভাযাত্রা বের করা হলে সরকারী দলের গুন্ডাবাহিনী তার ওপর বর্বর হামলা চালায়। ৬ নভেম্বর সংবাদ পাওয়া যায় করাচীতে একজন আওয়ামী লীগ কর্মী বিনা কারণে গ্রেফতার হয়েছেন। ৭ নভেম্বর জানা যায়, সারাদেশে সরকারী গুন্ডাদল কর্তৃক মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচনে ভোট জালিয়াতী ও ব্যালট বাক্স ভাঙ্গার মত ঘটনা অব্যাহতভাবে চলছে। ৮ নভেম্বর করাচীর নির্বাচনে সরকারী দলের প্রার্থীদের পরাজয়ের কথা বুঝতে পেরে সরকারী দলের পক্ষ থেকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উস্কানি দেওয়া হয়, দাঙ্গায় ২০ জন ব্যক্তি নিহত হয় এবং বিভিন্ন এলাকায় অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটে। ৯ নভেম্বর নারায়ণগঞ্জে বিরোধী দলের ওপর সরকারী গুন্ডাদের নির্মম হামলা সংঘটিত হয়। শুধু নারায়ণগঞ্জেই নয়, সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে সরকারী গুন্ডাদের হামলা চলতে থাকে। এসব হামলা ও গুন্ডামির পাশাপাশি সরকারী দলের গুন্ডারা এক বিরোধী দলীয় প্রার্থীকে গুম করার অপচেষ্টা চালায়। ১৩ নভেম্বর সরকারী দলের গুন্ডাদের হাতে প্রিজাইডিং অফিসারের আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া যায়। ১৪ নভেম্বর ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও দিনাজপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় সরকারী দলের গুন্ডাদের চরম দৌরাত্মের সংবাদ প্রকাশিত হয়। এসব গুন্ডামির ফলে ১ ব্যক্তি নিহত ও অসংখ্য ব্যক্তির আহত হন। ১৫ ও ১৬ নভেম্বরও সারাদেশে সরকারী মদদপুষ্ট গুন্ডাদের অপতৎপরতার খবর প্রকাশিত হয়। আসলে উক্ত নির্বাচনে সরকার বিরোধী প্রার্থীদের বিপুল সংখ্যায় বিজয়ের ফলে সরকারের গুন্ডারা মরিয়া হয়ে ওঠে।

সারা দেশে যখন মৌলিক গণতন্ত্রীদের নির্বাচনের ডামাডোল চলছে ঠিক তখনই খুলনা ও চট্টগ্রামের শ্রমিকদের ওপর নারকীয় হত্যাযজ্ঞ ও নিপীড়ন চলে। সরকারী দলের গুন্ডারা সাধারণ শ্রমিকদের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, তারা খুলনার খালিশপুর শিল্পাঞ্চলের শতকরা ৫০ ভাগ শ্রমিক বস্তি ধ্বংস করে ফেলে এবং প্রাণ নিয়ে যারা পালিয়ে গিয়েছিল, যারা আশে পাশের এলাকায় লুকিয়ে ছিল তাদেরকে খুঁজে বের করে হয়রানি করা হয়। শ্রমিকদের সমর্থক রাজনৈতিক নেতার ওপরও হামলা চলে। শুধু তাই নয়, দালাল

---

১২৯. প্রাগুক্ত, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪।

১৩০ সাপ্তাহিক জনতা, ঢাকা, ৯ই অক্টোবর, ১৯৬৪।

১৩১. উক্ত বিবরণের জন্য মূল উৎস অবলম্বন করা হবে দৈনিক আজাদে প্রকাশিত বিভিন্ন খবরসমূহের ওপর। যে সকল রিপোর্ট থেকে এ তথ্যগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে সেগুলি প্রকাশের সাল ও তারিখ সহ শিরোনামসমূহ প্রকাশ করা হয়েছে পরিশিষ্ট ১-এ। আজাদে প্রকাশিত সংবাদগুলির বাইরে থেকে যে তথ্যগুলি নেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র সেগুলিরই তথ্য-নির্দেশ সাথে সাথে উল্লেখ করে যাওয়া হবে।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রমিক নেতাদের সাহায্যে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকদেরকে চিহ্নিত করে কয়েকটি কারখানার মোট দেড় হাজার শ্রমিককে বরখাস্ত করা হয়। তাছাড়াও বহু শ্রমিক গুন্ডাদের ভয়ে কাজে যোগদানের নির্দিষ্ট দিনে কারখানায় উপস্থিত হতে পারেনি– এ অজুহাতেও বহুসংখ্যক শ্রমিক চাকুরী হারিয়েছে।[১৩৩]

১৯৬৪ সালের মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে গেলে বিরোধী দলের ওপর আবার নতুন পর্যায়ের নির্যাতন শুরু হয়। যেহেতু মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচনে সরকার-বিরোধী জোটের সমর্থক প্রার্থিগণ বিপুল সংখ্যায় জয়যুক্ত হয়েছে সেহেতু বিরোধী মৌলিক গণতন্ত্রীদেরকে ছলে বলে কিংবা কৌশলে সরকারের পক্ষে নিয়ে আসাই ছিল নূতন পর্যায়ের নির্বাচনের উপলক্ষ। মৌলিক গণতন্ত্রীদের বিভিন্ন ধরনের লোভ দেখানো ও হুমকি প্রদর্শণ করা হয়। সে যা হোক, নির্বাচনকালীন সময়ের ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টির প্রতিবাদে জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিশেষতঃ ছাত্রদের ভিতর তীব্র ক্ষোভ সঞ্চারিত হয়। এসব প্রতিরোধের জন্য সরকার আবার নানা নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ২৩ নভেম্বর প্রথমেই নবাব জাহিদ আলী খানের গ্রেফতারের সংবাদ জানা যায়। এর দু'দিন আগে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি এলাকায় সরকারী দলের একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী জনাব মফিজ উদ্দীন ও সরকারী দলের বেশ কিছু প্রভাবশালী নেতা উপস্থিত ছিলেন। এ সময় উক্ত এলাকার ছাত্র জনতা সরকারী দমননীতির প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী ছাত্র-জনতার ওপর পুলিস বাহিনী গুলি চালায়। গুলীতে ২৫ বছর বয়স্ক একজন যুবক এবং ৬০ বছর বয়স্ক একজন বৃদ্ধা নিহত হন,আর আহত হয় অসংখ্য লোক। পুলিসের বেয়নেট চার্জে চারজন স্কুল ছাত্র মারাত্মকভাবে আহত হয়।[১৩৪] সরকারের বিভিন্ন অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উস্কানী দেওয়ার প্রতিবাদে করাচীর ধর্মঘটী ছাত্রদের ওপর ২রা ডিসেম্বর পুলিস লাঠিচার্জ করে। এর একদিন পর বিক্ষোভকারী ছাত্রদের ওপর হামলা করার লক্ষ্যে পুলিস করাচীর এক কলেজ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে ছাত্রদের ওপর নির্মমভাবে লাঠিচার্জ করে ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। ধর্মঘটের চতুর্থ দিবসেও করাচীর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিক্ষোভরত ছাত্রদের ওপর পুলিস বর্বোচিত হামলা চালায় এবং কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। ৯ ডিসেম্বর ১৪৪ ধারা জারি করে এবং করাচীতে কায়েদে আজমের মাজারে সভানুষ্ঠানের পর প্রত্যাবর্তনরত ছাত্রদের ওপর পুলিস গুলীবর্ষণ করে, ফলে ১ জন ছাত্র নিহত হয়। একই দিন খুলনার বাগেরহাটে বিক্ষোভরত ছাত্রদের ওপর পুলিস গুলীবর্ষণ করে। করাচীর ছাত্রবিক্ষোভ ও পুলিসী নির্যাতনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে ছাত্র বিক্ষোভ সারা পাকিস্তানব্যাপী ছড়িয়ে পড়লে সরকার সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করে। ছাত্রসহ বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারণের বিক্ষোভকে দমন করার লক্ষ্যে "পিটুনীকর" নামে এক নতুন কর ধার্য করা হয়। সমগ্র পাকিস্তানে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের দমন করার লক্ষ্যে সরকার নতুনভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করে। বিক্ষোভ দমনের এ হিংস্র পদ্ধতি চরমরূপ ধারণ করে। ১০ ডিসেম্বর ঢাকাতেও ছাত্র বিক্ষোভের ঝড় ওঠে, করাচীর ঘটনার প্রতিবাদে তারা শপথ গ্রহণ করে। পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় ছাত্র বিক্ষোভ মারাত্মক আকার ধারণ করে। ছাত্র বিক্ষোভ দমনের লক্ষ্যে পেশোয়ারে ১১ ডিসেম্বর ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলে ছাত্রদের ওপর পুলিসী নির্যাতনের এ ধারা ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এরপর ছাত্রদের দমন করার জন্য গুন্ডাবাহিনীকে মাঠে নামানো হয়। ১৫ ডিসেম্বর খুলনার ছাত্রদের ওপর গুন্ডাবাহিনী নৃশংস হামলা চালায়।

ঐ দিন পূর্ব পাকিস্তানে ওয়াপদা কর্মচারীদের আন্দোলন দমনের লক্ষ্যে সরকার চরম পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ফলে বহু ওয়াপদা কর্মচারীর ছাঁটায় এর আশংকা দেখা দেয়। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর মোনয়েম খান কোন রকম বিশৃংখলা সহ্য করা হবে না বলে স্বদর্পে ঘোষণা দেন। বিক্ষুব্ধ চটকল শ্রমিকদের প্রতি হুশিয়ারি উচ্চারণ করা হয় 'গোলযোগ সৃষ্টির যে কোন ধরনের অপচেষ্টাকে কঠোর হস্তে দমন করা হবে বলে। অন্যদিকে, আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে উপলক্ষ করে সম্মিলিত বিরোধী দলের কুমিল্লার সদস্যগণ প্রচার অভিযানে অংশ নিতে গেলে তাদের ওপর গুন্ডাদের হামলা চালানো হয়। এ নিয়ে প্রচন্ড উত্তেজনা দেখা দেয়। সরকার কুমিল্লার শহরাঞ্চলে ১৪৪ ধারা জারি করে। ১৮ ডিসেম্বর উক্ত বিরোধী জোটের অন্যতম নেতা মনোরঞ্জন ধরকে গ্রেপ্তার করা হয়।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব নির্বাচনী প্রচারে উত্তরবঙ্গে গেলে ২২ ডিসেম্বর সেখানে প্রচন্ড ছাত্র বিক্ষোভ সংঘটিত হয়। পুলিসবাহিনী বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের ওপর নির্মম হামলা চালায়। ২৩ ডিসেম্বর রাজশাহীতে আইয়ুবের প্রচার সভার প্রাককালে প্রচন্ড গণবিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। বিক্ষোভকারীদের ওপর সরকারী গুন্ডাবাহিনী ও পুলিসবাহিনী নৃশংস হামলা চালায় ফলে ১০৩ জন আহত হয়। ২৫ ডিসেম্বর আইয়ুব খানের নির্বাচনী সভায় সমালোচনাসূচক গুঞ্জন উঠলে সমবেত জনতার ওপর পুলিস অমানুষিক হামলা চালায়। এপুলিসী হামলার হাত থেকে সাংবাদিকগণও রেহাই পায়নি। একই দিনে আইয়ুবের অপর এক সভা অনুষ্ঠানের আগে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। শত শত পুলিস প্রহরার মধ্যেও সরকারী গুন্ডারা রিভলবার হাতে সভাপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করে, কিন্তু এব্যাপারে কর্তৃপক্ষ আশ্চর্যরকম উদাসীন ভাব প্রকাশ করে।

অন্যদিকে,সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি চট্টগ্রামে যে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিল তা পুরো ডিসেম্বর পর্যন্ত বলবৎ থাকে এবং ২৭ ডিসেম্বর চট্টগ্রামের এ১৪৪ ধারার মেয়াদ আরো এক সপ্তাহ বৃদ্ধি করা হয়। খুলনা শহরেও ১৪৪ ধারার মেয়াদকাল ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। ৩১ ডিসেম্বর ঢাকা শহরেরও বিভিন্ন এলাকাতে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাক্কালে আবার নতুন করে সারা দেশে, বিশেষ করে ঢাকা শহরে বিরোধীদলীয় কর্মীদের ব্যাপক ধর-পাকড় শুরু হয়। এর ফলে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক আতংক সৃষ্টি হয়। ৩০ ডিসেম্বর শহরের বিভিন্ন এলাকার ছাত্রদের ওপর পুলিসী হামলা পরিচালিত হয়। এ ধরণের পুলিসী হামলা ও গুন্ডাদের সন্ত্রাসের মধ্য দিয়েই ১৯৬৪ সাল অতিক্রান্ত হয়। নতুন বছরের তৃতীয় দিনেই আবার বিরোধী দলের বেশ কিছু কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়।

ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হয়। সমগ্র পাকিস্তানের জনসাধারণ বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করেন কি দক্ষতার সাথে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব মৌলিক গণতন্ত্রীদের সমর্থন লাভ করেন। নির্বাচনে জয়যুক্ত হয়েই জেনারেল আইয়ুবের সরকার বিরোধী দলীয় নেতা ও কর্মীদের ওপর নতুন করে হামলা চালায়। সারা দেশে বিরোধী দলীয় কর্মীদের আটক ও হয়রানি শুরু হয়। বিরোধীদলের দুর্গ হিসাবে

---

১৩২. সাপ্তাহিক জনতা, ঢাকা, ১৮ই নভেম্বর, ১৯৬৪।

১৩৩. 'নির্যাতন আর বরখাস্ত, গ্রেফতার ও হাজতবাস-- এই তো খুলনায় শ্রমিকদের জীবন'-- একটি প্রতিবেদন, সাপ্তাহিক জনতা, ঢাকা, ১৭ই মার্চ, ১৯৬৫, পৃ.৬।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচিত করাচীতে ৫ জানুয়ারি ব্যাপক দাঙ্গা সংগঠিত হয়,যা আইয়ুব সরকারের প্রতি করাচীর নাগরিকদেরকে বিশেষভাবে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। আর সে বিক্ষোভ দমন করে রাখার জন্য করাচীতে ১২ জানুয়ারি থেকে পুনরায় ২ মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।

দেশের একটি এলাকায় যখন এধরনের ভয়াবহ দাঙ্গা চলছে তখন দেশের অপরাপর অংশে প্রচন্ডভাবে চলছিল পুলিসী সন্ত্রাস। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে যারা বিরোধী দলের সপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, তাদেরকে বেছে বেছে গ্রেফতার করা হয়। ৬ ডিসেম্বরই একজন বিরোধী দলীয় সমর্থককে গ্রেফতার করা হয়। এই দিনই বিরোধী দলীয় অন্যতম নেতা মওলানা আতাহার আলী গ্রেফতার হন। ১৯৬৫ সালের ৮ জানুয়ারি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ১১ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। এদিন রাওয়ালপিন্ডিতে এক ছাত্র সমাবেশ থেকে ১৫ জন ছাত্রকে আটক করা হয়। ৯ জানুয়ারি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে আওয়ামী লীগের বেশ কয়েকজন নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। জানুয়ারি মাসের ৬ থেকে ৯ তারিখ পর্যন্ত মাত্র ৪ দিনে সম্মিলিত বিরোধী জোটের মোট ৫১ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

১২ জানুয়ারি আবারও করাচীর ছাত্রদের ওপর লাঠিচার্জ করা হয় এবং ৭ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬৫ সালের ৮ জানুয়ারি পিন্ডি এবং ১২ জানুয়ারি করাচীতে ছাত্রদের ওপর পুলিসী নির্যাতনকে কেন্দ্র করে সারা পশ্চিম পাকিস্তানে ছাত্র অসন্তোষ দেখা দেয়। ১৩ জানুয়ারি করাচীর সমস্ত স্কুল কলেজে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। পুলিসবাহিনী ছাত্রদের ওপর পুনরায় হামলা চালায়। করাচীর অধিকাংশ স্কুল-কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়। বিক্ষোভের তীব্রতাকে মোকাবিলা করতে সান্ধ্যআইন জারি করা হয় এবং অসংখ্য ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। এ ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে খয়েরপুরে প্রচন্ড ছাত্র বিক্ষোভ হয় এবং সেখানে পুলিসবাহিনী ছাত্রদের ওপর হামলা চালায় ও ১৫ জন ছাত্র নেতাকে গ্রেফতার করে। পেশোয়ারেও পুলিসের সাথে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের মারাত্মক সংঘর্ষ হয় এবং তাতে ৬ জন ছাত্র ভীষণভাবে আহত হয়। ১৩ জানুয়ারি থেকে পিন্ডিতেও ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। সারা পশ্চিম পাকিস্তানে ছাত্রদের ওপর এ ধরনের পুলিসী নির্যাতন চলতে থাকায় রাজনৈতিক নেতারাও এর প্রতিবাদ করে। ফলে রানৈতিক নেতৃবৃন্দের ওপরও পুলিসী নিপীড়ন নেমে আসে। ১৬ জানুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার দায়ে কাউন্সিল মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক সরদার শওকত হায়াত খানসহ ৬ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। ১৮ জানুয়ারি একই অভিযোগে লাহোর থেকে আরো ৭ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। বন্দীমুক্তির দাবিতে সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানে ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত হয়। এসব কারণে রাওয়ালপিন্ডিসহ সারা পশ্চিম পাকিস্তানে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার অভিযোগে ব্যাপকভাবে ধরপাকড় শুরু হয়। ২১ তারিখে পিন্ডিতে ৮ জন ছাত্র ও জননেতাকে গ্রেফতার করার মধ্য দিয়ে ২ সপ্তাহব্যাপী ব্যাপক ছাত্র বিক্ষোভের আপাত পরিসমাপ্তি ঘটে। এর পর পুলিসবাহিনী আত্মগোপনকারী ছাত্রনেতাদের গ্রেফতার করতে থাকে।

জানুয়ারির প্রথম দিকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে ব্যাপক ধর-পাকড়ের পর রাজনৈতিক দলগুলিও যেমন কিছুটা নিস্তেজ হয়ে পড়ে তেমনি গণনিপীড়নের খবরও বেশ কিছুদিন পাওয়া যায়নি। তবে খুলনায় চারজন ছাত্রের বহিষ্কার এবং ঢাকা হলে (ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়) ছাত্র নির্যাতনের মত দু'একটি খবর মানুষকে সচকিত করে তোলে। কিন্তু১৯৬৫ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে ছাত্র-পুলিস সংঘর্ষ ও পুলিস কর্তৃক কতিপয় ছাত্রকে গ্রেফতারের সংবাদ উক্ত সাময়িক নিঃস্তব্ধতা ভেঙ্গে দেয়। ছাত্র সমাজ, রাজনৈতিক দল ও জনসাধারণের মধ্যে সক্রিয়তা লক্ষ্য করে সরকার দেশের বিভিন্ন এলাকায় একের পর এক ১৪৪ ধারা জারি করতে থাকে। ১৯ মার্চ ঢাকা সদর মহকুমায় ৪টি থানায় এবং ২০ মার্চ মাদারীপুরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। এভাবে সাময়িককাল অতিবাহিত হওয়ার পর বিশেষতঃ ছাত্র সমাজের মাঝে পরিস্থিতি আবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কুষ্টিয়া কলেজে ছাত্রদের মধ্যে প্রচন্ড উত্তেজনার পরিপ্রেক্ষিতে ৫ মে সেখানে ১৪৪ধারা জারি করা হয়। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে ঢাকায় কিছু রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হলে সেখানে ৬ মে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।

পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যাপক ছাত্র বিক্ষোভকে দমন-পীড়নের মাধ্যমে সাময়িকভাবে স্তব্ধ করা গেলেও সেখানকার পরিস্থিতি বেশি দিন শান্ত থাকেনি। ডাক কর্মচারীদের মধ্যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির কথা জানতে পেয়েই সরকার এদের ধর্মঘট নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। হায়দারাবাদ শহরে ২৩ ফেব্রুয়ারী ৫জন ডাককর্মচারীকে গ্রেফতার করা হয়। এদিনই যোগাযোগ মন্ত্রী ধর্মঘটী ডাক কর্মচারীদের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে সত্তর কাজে যোগদানের নির্দেশ দেন। কিন্তু ডাক কর্মচারিগণ কাজে যোগ না দিয়ে ধর্মঘট চালিয়ে যেতে থাকলে ১৫ শ ডাক কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ডাক কর্মচারীদের ওপর সরকারের এই নির্দয় আচরণের প্রতিবাদে বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহ এগিয়ে আসে, তাদের সমর্থনে নানা ধরনের ইস্তেহার প্রকাশ ও বিবৃতি প্রদান করে। সরকার এটাকে বন্ধ করার জন্য ৭ শত ছাপাখানা ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি ২৭ ফেব্রুয়ারি এ ধরনের কার্যকলাপে অংশ নেওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য কড়া নির্দেশ প্রদান করে। করাচীতে বিরোধীদলীয় প্রচারের ওপর প্রি-সেন্সরশীপ আরোপ করা হয়। এত কিছুর পরও ডাক কর্মচারীদের ধর্মঘট অব্যাহত থাকে, ডাক ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য গড়ে তোলা বিকল্প ব্যবস্থা প্রহসনে পরিণত হয়। ধর্মঘটের পঞ্চম দিনে ডাক কর্মচারীদের পাঁচজন শীর্ষস্থানীয় নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। ১ মার্চ ডাক কর্মচারীদের ধর্মঘট সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব কথা বলতে বাধ্য হন। তাদের দাবি পরোক্ষভাবে মেনে নিলেও হুমকি প্রদান করে বলেন, বেতন বৃদ্ধি করতে হলে কর বৃদ্ধির জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে। ডাক কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সকল কর্মচারীর বেতন প্রদান করা হলেও নেতৃস্থানীয় চারহাজার ডাক কর্মচারীর বেতন বন্ধ করা হয়। এর বিরুদ্ধে উত্তেজনা দেখা দিলে খয়েরপুরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।

১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর পরিস্থিতি এমন হয়ে উঠেছিল যে, ভিতরে ভিতরে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ছিল। কিন্তু তখন প্রায় সকল ছাত্র নেতারা জেলে কিংবা হুলিয়া মাথায় নিয়ে ঘুরে ফিরছে, বামপন্থী নেতা বলতে যে কয়জন বাইরে ছিলেন তাদের ওপর হুলিয়া জারি করা হয়েছিল। ফলে এদের কারো পক্ষে স্বাধীনভাবে চলা-ফেরা সম্ভব হচ্ছিল না। যদিও আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের অধিকাংশ নেতা তখন জেলের বাইরে ছিলেন তবু সদ্য সমাপ্ত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের অনাকাংখিত ফলাফলে তারা বিস্মিত হয়ে পড়ে। উপরন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্বের ওপর ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করায় সম্ভবতঃ সবাই স্তম্ভিত হয়ে যান। সে সময় যে সকল নেতা কারাগারে বন্দী ছিলেন তাদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা পাওয়া যায় 'সাপ্তাহিক জনতা'র ৭ এপ্রিল সংখ্যায়। এ তালিকা থেকে যে ১৩ জন ছাত্রনেতার নাম জানা যায়, তারাই ছিলেন সে সময়ের প্রধান ছাত্র নেতা। কারাগারে বন্দী উক্ত১৩ জন ছাত্র নেতা হলেন কাজী জাফর আহমদ, রাশেদ খান মেনন, হায়দার আকবর খান রনো, আব্দুর রাজ্জাক, সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক মনি, আল মোজাহেদী, ওবায়েদুর রহমান, রেজা আলি, বদরুল হক, আলি হায়দার খান,মহিউদ্দিন ও আইয়ুব রেজা চৌধুরী। এরা সবাই ছিলেন বিনা বিচারে আটক। এসব ছাত্র নেতা ছাড়াও সে সময়ের ২২ জন বিশিষ্ট বামপন্থী নেতাও কারাগারে আটক ছিলেন। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন ময়মনসিংহ জেলার বাসিন্দা। এরা হচ্ছেন জ্যোতিষ বোস, অজয় রায়, আলতাব আলী, নগেন সরকার, সম্মথ নাথ দে, নরেন দাস ও সুকুমার ভাওয়াল। এই ৭ জনের মধ্যে মাত্র নরেশ দাসই ছিলেন সাজাপ্রাপ্ত এবং বাকি ছয়জনই ছিলেন বিনা বিচারে আটক। বিনা

Dhaka University Institutional Repository

বিচারে আটক ছিলেন ফরিদপুরের সন্তোষ ব্যানার্জী ও আশুতোষ ভরদ্বাজ, সিলেটের অজয় ভট্টাচার্য, প্রসুন কান্তি রায় (বরুণ রায়), লালা শরদিন্দু দে ও মফিজ আলি, চট্টগ্রামের মওলানা আহমদুর রহমান আজমী ও ধীরেন দাস, বগুড়ায় মোখলেছুর রহমান ও সুবোধ লাহিড়ী, খুলনার নজরুল ইসলাম, যশোরের অমল সেন (বাসু সেন), পাবনার আবদুল মতিন ও রণেশ মৈত্র এবং ঢাকায় ননী চৌধুরী।[১৩৫]

এসকল বিশিষ্ট বামপন্থী নেতা ও বিশেষত প্রধান কাতারের ছাত্র নেতৃত্বের প্রায় সবাই তখনজেলে থাকার কারণে একদিকে যেমন আন্দোলন গড়ে তোলা কঠিন ছিল,তেমনি বিনা বিচারে এভাবে আটক রাখার কারণে স্বাভাবিকভাবেই জনসাধারণের মধ্যে সরকার-বিরোধী ক্ষোভ আরো ঘনীভূত হচ্ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য কোন নির্যাতন করা সরকারের জন্য বেশ কিছুদিন প্রয়োজন পড়েনি। অবশ্য এ সময় সরকার ভারতের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারটিকে এমন একটি জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকে যে জনসাধারণের দৃষ্টি সেদিকে ফিরে থাকে (এটা অবশ্য ভিন্ন আলোচনা, পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হবে)। সে যা হোক, এ সময়ে সরকার কিংবা তার প্রশাসনের সহায়তায় শ্রমজীবী মানুষের ওপর অন্যায় অবিচার মোটেই বন্ধ হয়নি। যেমন, দেশের অন্যতম বৃহৎ কারখানা খুলনার প্লাটিনাম জুবিলী চটকলে শ্রমিক ইউনিয়ন নির্বাচনে সরকার সমর্থক ও মালিক পক্ষের জনৈক নেতার বিপক্ষে একজন সাধারণ শ্রমিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। বিপুল সংখ্যায় শ্রমিকরা সাধারণ শ্রমিক প্রার্থীকে ভোট প্রদানের ফলে মালিক পক্ষের প্রার্থীর পরাজয় নিশ্চিত হয়ে পড়লে আকস্মিকভাবে কর্তৃপক্ষ এ নির্বাচনকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন। শ্রমিকদের দাবি সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ কিংবা সরকার এব্যাপারে মোটেই কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।[১৩৬] অন্যদিকে, এধরনের একটি চরম অগণতান্ত্রিক ঘটনা সত্ত্বেও পরবর্তী বেশ কিছু দিন এব্যাপারটি নিয়ে জাতীয় বা স্থানীয় পর্যায়ে এমন কিছুই ঘটেনি যার জন্য রাষ্ট্রকে নতুন করে কোন নিপীড়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল। এক্ষেত্রে ছাত্র কিংবা রাজনৈতিক দলসমূহের প্রকাশ্য তেমন কোন ভূমিকা ছিলনা। কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে যথাক্রমে রেলশ্রমিক ও ডাক বিভাগের কর্মচারগণ উদ্যোগী ভূমিকা পালন করে। রেল কর্মচারীরা মার্চ মাসের শেষ দিকেই ২৭ মে রেল ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল এবং সে অনুযায়ী তাদের প্রচার অগ্রসর হতে থাকে। পরিস্থিতি বুঝে সরকার ২৬ মে ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। আর ২৭ মে গভর্ণর মোনায়েম খান কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, সরকার রেল ধর্মঘট বরদাশত করবেনা। এ হুমকি সত্ত্বেও রেল শ্রমিকদের নিজস্ব দাবি দাওয়া নিয়ে ধর্মঘট অব্যাহত থাকে। ২৯ মে চট্টগ্রামে ধর্মঘটরত রেলশ্রমিকদের ওপর গুলীবর্ষণ করা হয়। ফলে ১ জন শ্রমিক নিহত ও ৬ জন মারাত্মকভাবে আহত হয়। এর পরদিন আরো ১ জনের মৃত্যু ঘটে। রেল শ্রমিকদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে বন্দর শ্রমিকরা প্রতিবাদ ধর্মঘট করলে তাদের ওপরও নির্যাতন নেমে আসে। ১ জুন একমাত্র চট্টগ্রাম থেকেই ২৯ জন বন্দর ও রেল শ্রমিককে গ্রেফতার করা হয়। এর পর সমগ্র পূর্ব পাকিস্থানের বিভিন্ন জায়গা থেকে পায়কারী হারে রেল শ্রমিককে গ্রেফতার করা হয়। চরম নির্যাতন চালিয়ে রেল ধর্মঘটকে বানচাল করার লক্ষ্যে সহস্রাধিক রেল শ্রমিক ও কর্মচারীকে আটক রাখা হয়। এই শ্রমিক কর্মচারীদেরকে সামরিক আদালত ও নিয়মিত আদালতে বিচার করা হয় এবং ২৮ দিন থেকে ৬ মাস পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদে সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়। এদের মধ্যে কয়েকজনকে আবার জরিমানাও করা হয়। ২২ জুনের মধ্যে একমাত্র চট্টগ্রামেই মোট ৪০০ জন রেল শ্রমিক ও কর্মচারীকে সাজা প্রদান করা হয়, বগুড়ায় ৮ জন রেল শ্রমিককে ৩ মাস করে সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয় এবং অপর দু'জন মহিলা শ্রমিককে যথাক্রমে ৩৫০ টাকা ও ২০১ টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়া, ঈশ্বরদী ও পাকশীতে আটক ১৩২ জনের মধ্যে অধিকাংশের নামে মামলা দায়ের করা হয় এবং ২২ জুনের মধ্যে তাদের কয়েকজনকে সাজা প্রদান করা হয়। আখাউড়া, পার্বতীপুর, লালমনিরহাট, বোনাপাড়া, সিরাজগঞ্জসহ বিভিন্ন স্থানে কয়েক'শ আটক রেল শ্রমিকের বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা হয়।[১৩৭]

রেল শ্রমিকদের ওপর এই ধরনের অবর্ণনীয় ও বর্বরোচিত নির্যাতন চললেও ছাত্র কিংবা রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে এমন কোন প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। যার ফলে তাদেরকেও আবার নতুন করে নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়। এ সময়কালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের দমনমূলক চরিত্রটি মূলতঃ শ্রমিক সমাজকে কেন্দ্র করেই পরিলক্ষিত হতে থাকে। সকল মিল কারখানার অভ্যন্তরেই চলতে থাকে ভয়ানক নিপীড়ন ও নির্যাতন। জুন মাসের ২০ থেকে ২৯-এই ১০ দিনে টঙ্গীর একমাত্র অলিম্পিয়া টেক্সটাইল মিলের তাঁত বিভাগ থেকেই কমপক্ষে ৫০ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়। অথচ এভাবে ছাঁটাই করার কোন কারণ ছিল না। অলিম্পিয়া কর্তৃপক্ষ অবশিষ্ট শ্রমিকদের ওপরে নানা ধরনের হুমকি প্রদর্শন করতো।[১৩৮] অন্য দিকে, রেল ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রামে রেল শ্রমিক ও কর্মচারীদের ওপর যে পৈশাচিক নির্যাতন শুরু হয়েছিল পরবর্তীকালে তা শুধু রেলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, অন্যান্য ক্ষেত্রের শ্রমিকরাও এর শিকার হয়। সরকারী পুলিস ও সরকার সমর্থক রাজনৈতিক দলের অনুগত গুন্ডারা তার পর থেকে রেল সহ অন্যান্য শিল্প শ্রমিকদের ওপর অকথ্য নির্যাতন শুরু করে। চট্টগ্রামের এ. কে. খান ম্যাচ ফ্যাক্টরি ও আমিন জুট মিলসহ বিভিন্ন কারখানায় শ্রমিকদের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকার তথা ট্রেডইউনিয়ন করার অধিকারের বিরুদ্ধেও নানা ধরনের ষড়যন্ত্র চলে। সামান্য কোন দাবিদাওয়া উত্থাপন করার আগেই শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয় এবং বিনা কারণে অসংখ্য শ্রমিককে ছাঁটাই করা হতে থাকে। একদিকে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়, অন্যদিকে গুন্ডাবাহিনী লেলিয়ে দিয়ে কোন অপকর্ম করিয়ে তার দায়-দায়িত্ব শ্রমিকদের ওপর চাপানো হয়।[১৩৯] শ্রমিকদের বিরুদ্ধে সরকারের চরম নির্যাতনমূলক কার্যক্রমের প্রতিবাদ ও নিজেদের পেশাগত দাবি নিয়ে জুন মাসের প্রথম দিকে পূর্ব পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন সংস্থার আওতাভুক্ত শ্রমিক কর্মচারীগণ যখন ধর্মঘট করে তখনও দেখা যায় সরকার কোনরকম আলোচনায় না গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে ভীষণ দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

এ সময় বড় ধরনের যতটি নির্যাতন সংঘটিত হয়েছে সেসবের মধ্যে সেটেলমেন্ট বিভাগের কর্মচারীদের ওপর নির্যাতন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফরিদপুর ডিভিশনে প্রায় ১৪০০ নিম্ন স্তরের কর্মচারী কর্মরত ছিল। এদের মধ্যে অনেকে ১৯৪৮ সাল থেকে এখানে কাজ করে আসছিল, কিন্তু তাদের সকলই ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে নিয়োজিত ছিল। এদের বেতন সর্বসাকুল্যে মাত্র ৯০ টাকা থেকে

---

[১৩৪]. সাপ্তাহিক জনতা, ঢাকা, ২৫ নবেম্বর, ১৯৬৪।

[১৩৫]. সাপ্তাহিক জনতা, ঢাকা, ৭ই এপ্রিল, ১৯৬৫।

[১৩৬]. সাপ্তাহিক জনতা, ঢাকা, ১৭ই মার্চ, ১৯৬৫।

[১৩৭]. সাপ্তাহিক জনতা, ঢাকা, ২৩শে জুন, ১৯৬৫

[১৩৮]. সাপ্তাহিক জনতা, ঢাকা, ৩০শে জুন, ১৯৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

১১০ টাকার মধ্যে সীমিত ছিল। যে কোন অভিযোগেই এদেরকে ছাঁটাই করা হত। কিন্তু ১৯৬৫ সালের মধ্যভাগে একসাথে এদের ১৪০ জনকে ছাঁটাই করা হয়। সেটেলমেন্ট কর্তৃপক্ষ এবার শুধু তাদের ছাঁটাই করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরখাস্তের পরে এদের ১০ দিন নজরবন্দী করে রাখা হয়। আর যন্ত্রপাতির ক্ষতিপুরণ হিসাবে নজরবন্দী কর্মচারীদের প্রাপ্য বেতন থেকে টাকা কের্তন করা হয়।[১৪০]

যে সময় কর্মচারী ও শ্রমিকদের ওপর এধরনের নিপীড়ন চলছে, অধিকাংশ ছাত্র নেতা বন্দী, পূর্ব পাকিস্তানের কৃষক সমাজের অধিকাংশ নেতা কারাগারে সেরকম একটি সময়ে জাতীয় রাজনৈতিক দলসমূহ নির্যাতন বিরোধী তেমন কোন সংগ্রাম গড়ে তুলতে পারেনি; ফলে পূর্ব পাকিস্তানের কৃষক সমাজের ওপর যুগ যুগ ধরে যে নির্যাতন নিপীড়ন চলে আসছিল তা অব্যাহত থাকে। একদিকে, সনাতন কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা টিকে থাকা এবং প্রাকৃতিক দূর্যোগে ফসলহানির কারণে কৃষকগণ জমির খাজনা পরিশোধ করার মত নগদ অর্থ সংগ্রহে অপারগ, অন্যদিকে সে সময় জমির খাজনা হঠাৎই বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এসব কারণে অধিকাংশ কৃষকের পক্ষেই সময়মত খাজনা প্রদান করা সম্ভব ছিলনা। খাজনা প্রদানে ব্যর্থ হলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আসত হুমকি; মাল ক্রোক করা হত, আর তাদের ভাগ্যে জুটত দফাদারও পুলিসের পিটুনীসহ আগে পূর্ব পাকিস্তানের কৃষক সমাজ তাদের অস্তিত্ব নিয়ে নানা ধরনের নির্যাতন। ১৯৬৫ সালের পাকভারত যুদ্ধের কতটুকু শংকিত ছিল তার অকাট্য প্রমাণ হল সে সময় সারা কৃষকদের ওপর দেশে জারি ছিল বিপুলসংখ্যক সার্টিফিকেট মামলা করা হয়েছিল। শুধু রাজশাহী জেলায় ১ লক্ষাধিক সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করা হয়। সে সময় সারা দেশে কৃষক সমাজের ওপর যে নিপীড়ন চলছিল সেগুলির মূল কারণ ছিল এই সার্টিফিকেট মামলা। কৃষক আন্দোলনের সাথে যারা যুক্ত ছিলেন তাদের কাছেও এ বিষয়টি বিশেষ গুরত্ব পায়। সার্টিফিকেট মামলাসহ বিভিন্ন নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন কৃষক সমিতি বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক সম্মেলন ও সমাবেশের আয়োজন করে। এরকম এক সম্মেলন থেকে বরিশালের ১১ জন কৃষক নেতাকে গ্রেফতার করা হয়।[১৪১]

এর পর থেকে দু'একটি ছাত্র গ্রেফতারের ঘটনা ছাড়া তেমন কোন নির্যাতনমূলক খবর ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের আগ পর্যন্ত জানা যায়নি। তবে পাকভারত যুদ্ধের প্রাক্কালে কিংবা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সরকার বিরোধী রাজনীতির সাথে যুক্ত হিন্দু ব্যাক্তিদের ওপর চরম নির্যাতন নেমে আসে। উক্ত ধর্মীয় সংখ্যালঘু রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের অধিকাংশের বাড়িতে খানা তল্লাসী চলে এবং তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। যারা গ্রেফতার এড়াতে সক্ষম হয় তারা বহুদিন আত্মগোপন করে থাকে বাধ্য হয়। এমনকি, যারা বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত কিন্তু ধর্মীয় কর্মকান্ডে তেমন যুক্ত নন এরমকম হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণকারি অনেক নেতাকেও নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়।[১৪২]

১৯৬৫ সালের জানুয়ারি অভ্যুত্থানের পর পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্রসমাজও আর সেভাবে অনেকদিন জেগে ওঠেনি বহুদিন পর্যন্ত। শ্রমিক ও কর্মচারীরাও ছিল নীরব। বেশীর ভাগ রাজনৈতিক দল সে সময় ভারত-বিরোধী প্রচরণায় লিপ্ত। শুধু মাত্র মে মাসের প্রথম সপ্তাহে করাচীর ছাত্ররা একবার রাজ পথে নেমে ছিল। তবে কয়েকজন ছাত্রনেতার গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে এঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটে।

পাক-ভারত যুদ্ধের সময় সারা পাকিস্তানে যে জরুরী আইন জারী করা হয়েছিল, বলতে গেলে জেনারেল আইয়ুব ক্ষমতায় থাকা পর্যন্ত সে আইন বাতিল হয়নি। এর আগে যতটুকু গণতান্ত্রিক অধিকার পাকিস্তানের জনসাধারণ ভোগ করছিল তাও কেড়ে নেওয়া হল। পাক-ভারত যুদ্ধের সময় সরকার বিরোধী কর্মকান্ডে ভাটা পড়ে, কিন্তু রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বিভিন্ন স্তরের মানুষের ওপর দমন-পীড়ন একইভাবে চলতে থাকে। তবে এসকল দমন-পীড়নের কাহিনী তখন তেমন গুরুত্ব পায়নি। আবুল বাশারসহ চট্টগ্রামের কয়েকজন শ্রমিক নেতার বিবৃতি থেকে এ ধরনের দমন-পীড়নের কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯৬৬ সালের ১লা জুলাই প্রকাশিত এ বিবৃতিতে বলা হয়, যগত এক বছর ধরে পাকিস্তান রেল কর্তৃপক্ষ শ্রমিক কর্মচারীদের ওপর বিভিন্ন ধরণের নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। চলতি মাসেই পাহাড়তলী ওয়ার্কশপ থেকে ২০ জন ও ট্রাফিক একাউন্টস থেকে দু'জন ইউনিয়ন কর্মীকে সৈয়দপুর ও অন্যান্য স্থানে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বদলী করা হয়। তাছাড়া, পাহাড়তলীর ডিজেল ষ্টিম শেডের ১০ জন চাকুরী থেকে বরখাস্ত হন।"[১৪৩] আইয়ুব সরকারের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ ও গণনির্যাতনের প্রতিবাদে যখন খোদ রাজধানী শহর রাওয়ালপিন্ডিতে বিরোধীদলীয় রাজনীতিকদের তৎপরতা শুরু হয় তখনই সেখানে অনির্দিষ্টকালের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। কিন্তু শুধু রাজধানীতে ১৪৪ ধারা জারি করে যখন পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করা যাবেনা বলে মনে হল তখন একে একে প্রায় সমগ্র পাকিস্তানের বড় বড় শহরাঞ্চলে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। ১৯৬৬ সালের ১২ জানুয়ারি রাওয়ালপিন্ডিতে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়, ১৭ তারিখে পুরো রাওয়ালপিন্ডি জেলায়, ১৮ তারিখে লায়ালপুর, ২৪ তারিখে লাহোর এবং তার পর একে একে অন্যান্য শহর এ আইনের আওতাভুক্ত হয়। তবে করাচীতে এসময় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়নি। সম্ভবতঃ তখনও করাচীবাসীদের মনে ভারতীয় আক্রমণের আশংকা প্রবলভাবেই বিদ্যমান ছিল। ১৪৪ ধারা জারি করা সত্ত্বেও, রাজনৈতিক দলগুলি একেবারে চুপ করে থাকেনি। বিভিন্ন শহরে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হয়েছে। ২৬ জানুয়ারি লাহোরে ৫ জন রাজনৈতিক কর্মীর গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে এ পর্যায়ের নির্যাতনের অবসান ঘটে। অবশ্য ১৭ ফেব্রুয়ারীও লাহোর থেকে ৫ জন বিশিষ্ট বিরোধী দলীয় নেতাকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়।

রাজনৈতিক নির্যাতনের পাশাপাশি পূর্ব পাকিস্তানে এসময় সরকারী মদতঃপুষ্ট ছাত্র সংগঠন ন্যাশনাল ষ্টুডেন্টস ফেডারেশন (এন.এস.এফ) এর দৌরাত্ম্য মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রেণীর দৌরাত্ম্য মাত্রাতিরিক্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। জনৈক জাকী আহমদ ও আহমদ ফারুকের রীট আবেদনক্রমে ঢাকা হাইকোর্ট যখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ছাত্র বহিষ্কারাদেশ নাকচ করে দেয়, তখন থেকে এন.এস.এফ-এর দৌরাত্ম্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কলঙ্কিত করে। হাইকোর্টের রায় প্রকাশের পরপরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আবু নসর মাহমুদকে এরা নির্মমভাবে প্রহার করে। দিনটি ছিল ১৯৬৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি। সবার চোখের সামনে যখন এ ঘটনা ঘটছে তখন পুলিস ছিল সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। এন.এস.এফ-এর সদস্যরা এধরনের কুখ্যাত ঘটনাই শুধু ঘটায়নি, তারা এসময় সংবাদ সংগ্রহের জন্য এলে সংবাদিকদের ওপরও হামলা চালায়। এঘটনার অভিযোগে ২০ ফেব্রুয়ারী

---

১৩৯. সাপ্তাহিক জনতা, ঢাকা, ৩০শে জুন, ১৯৬৫।

১৪১. প্রাগুক্ত, ৭ই এপ্রিল, ১৯৬৫।

১৪২. সে সময়ে নিরাপত্তা বন্দী হিসাবে আটক বামপন্থী নেতা অজয় রায়-এর সাথে সাক্ষাৎকারে এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ জানা যায়। আর বামপন্থী নেতা শরদিন্দু দস্তিদারও তার সাক্ষাৎকারে এসব বিষয় উল্লেখ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

দু'জনকে গ্রেফতার করা হয় বটে, কিন্তু সরকারী পক্ষ থেকে প্রশ্রয় পেয়ে এন. এস. এফ. এর গুন্ডামি আরো বেড়ে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলিতে ক্রমবর্ধমান হারে তাদের দৌরাত্ম্য অব্যাহত থাকে। ৩ মার্চ ফজলুল হক হল ও ইকবাল হলে (বর্তমান জহুরুল হক হল) এন. এস. এফ সদস্যরা অন্যান্য সংগঠনের ছাত্রদের ওপর হামলা চালায় এবং এতে ১০ জন ছাত্র গুরুতর রূপে আহত হয়। এ ঘটনাকে বাঁধা দিতে এলে এরা ইকবাল হলের তৎকালীন প্রভাষক ডক্টর আবদুল মতিন চৌধুরীকেও ভীতি প্রদর্শন করে। এর প্রতিবাদে ছাত্ররা ধর্মঘট পালন করে। এ ধরনের কলঙ্কজনক ঘটনা যখন ঘটছে তখন সরকারীভাবে এর কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, বরং ধর্মঘটী ছাত্রসমাজের বিরুদ্ধে স্বয়ং গভর্ণর মোনায়েম খান কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

মোনয়েম খান ছাত্রদের লক্ষ্য করে বলেন, 'ধর্মঘটকারী ছাত্রদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ে এন.এস.এফ গুন্ডাদের দৌরাত্ম্য চরম আকার ধারণ করলেও তখন পর্যন্ত পুলিসবাহিনীর পক্ষ থেকে জনসাধারণের ওপর নতুন কোন নির্যাতনের খবর পাওয়া যায় নি। ১মার্চ বেবীট্যাক্সী চালকদের ধর্মঘট উপলক্ষে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ধর্মঘটী ব্যবী ট্যাক্সীচালকদের ওপর পুলিসবাহিনী হামলা চালায় এবং ৪৩ জন বেবী ট্যাক্সীচালককে গ্রেফতার করে। পুলিসের এ নির্যাতন শুধুমাত্র ধর্মঘট বা কোন আন্দোলনের সময়ই চলত তা নয়, সামান্য কারণেও তারা জনসাধারণ ও ছাত্রদের ওপর ঝাপিয়ে পড়ত। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সামান্য একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিসবাহিনী ছাত্রদের প্রতি গুলীবর্ষণ করে। এতে ১ জন নিহত ও ৯ জন মারাত্মকভাবে গুলীবিদ্ধ হয়। এ সকল ঘটনার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের উত্তর অঞ্চলের রাজনৈতিক পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকে। দেশের সর্বত্রই রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের ওপর পুলিসী নির্যাতন ক্রমাগত বাড়তে থাকে। মার্চ মাসের শেষদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের বেশ কয়েকজন বিরোধী দলনেতা ও কর্মী গ্রেফতার হন। ইতিমধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় বন্দী মুক্তির দাবিটি জোরালো হয়ে ওঠে। এ রকম একটি পর্যায়েই ১৯৬৬ সালের ১ এপ্রিল চট্টগ্রামে কথিত জেল আক্রমণকারী বিক্ষুব্ধ জনতার ওপর পুলিস গুলীবর্ষণ করে; এতে ১ জন নিহত ও শতাধিক আহত হন। এরপর সেখানে ব্যাপক হারে গ্রেফতারী অভিযান চালানো হয়। পুরো একমাস ধরে এ পুলিসী নির্যাতন চলে। এক পর্যায়ে চট্টগ্রামের অবস্থা শান্ত হয়ে এলেও উক্ত গ্রেফতার অভিযান অব্যাহত থাকে। ১ এপ্রিল থেকে ৩ মের মধ্যে পুলিস উক্ত ঘটনার জের হিসাবে ১০৯ জনকে গ্রেফতার করে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী দাবি নিয়ে শ্রমজীবী জনতার বিভিন্ন অংশ আন্দোলন মুখর হয়ে ওঠে। বিভিন্ন দাবিতে ছাত্র সংগঠন ও বিভিন্ন স্তরের জনসাধারণ ধর্মঘটের কর্মসূচী গ্রহণ করে। গভর্ণর মোনয়েম খান বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে একের পর এক হুমকি ও নির্দেশ প্রদান করতে থাকেন। পশ্চিম পাকিস্তানেও এ সময় বেশ উত্তেজনা চলছে। ৩০ এপ্রিল ও ৫ মে যথাক্রমে পেশোয়ারে ও হায়দারাবাদে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। এ সব জায়গায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার অভিযোগে ২৭ মে পর্যন্ত ২২ জন রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়।

ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ৬ দফার সমর্থনে বেশ কিছু গণসংযোগ ও প্রচারকর্ম শুরু করেছে। এ রকম একটি পর্যায়ে ১৯৬৬ সালের ২১ এপ্রিল পূর্বপাকিস্তানের গভর্ণর মোনয়েম খান আওয়ামী লীগকে লক্ষ্য করে হুশিয়ারি দিয়ে বলেনঃ দেশের সংহতি বিনষ্টকারী শক্তিকে ধ্বংস করা হইবে। এর পর থেকে ৬ দফা প্রচার আন্দোলনকে বিভিন্ন উপায়ে বাধা দেওয়া হয়। সিলেটে ৬ দফার পক্ষে বক্তৃতা প্রদানের অভিযোগে ২১ এপ্রিল শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয় এবং সিলেট জেলে পাঠানো হয়। ২৩ এপ্রিল সিলেট জেল থেকে জামিনে মুক্তিলাভের পরই শেখ মুজিবকে একই ধরনের অভিযোগে পুনরায় গ্রেফতার করে ময়মনসিংহ জেলে পাঠানো হয়। সেখান থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ঢাকায় ফিরে এলে ৯ মে শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগের অপর ৭জন বিশিষ্ট নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। এর প্রতিবাদে সারাদেশে আওয়ামী লীগ সমর্থক জনসাধারণ ও ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক বিক্ষোভ দানা বেধে ওঠে। নির্মম পুলিসী নির্যাতন ও গ্রেফতারের মাধ্যমে এ বিক্ষোভকে দমন করা হয়। ২১ মে চট্টগ্রাম থেকে গ্রেফতার হন আওয়ামী লীগের একজন বিশিষ্ট নেতা। ২ জুন আরো ৮ জন বিশিষ্ট নেতা ও কর্মী গ্রেফতার হন। আওয়ামী লীগ এ ধরনের পুলিসী নির্যাতনের প্রতিবাদে ও ৬ দফা দাবির সমর্থনে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ৭ জুন (মঙ্গলবার) সাধারণ হরতালের ডাক দেন। এ হরতালের আহবানে গভর্ণর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং আওয়ামী লীগের প্রতি কঠোর হুশিয়ারী প্রদান করে বলেনঃ অশুভ প্রচেষ্টার মোকাবেলার জন্য সরকার সম্পূর্ণ প্রস্তুত রহিয়াছেন। পরদিন গভর্ণর আওয়ামী লীগের প্রতি হুমকি প্রদর্শণ করে বলেনঃ আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গের চেষ্টা কঠোর হস্তে দমন করা হইবে। ৭ জুন সকাল থেকে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। কিন্তু তার আগেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাহাদুরশাহ পার্ক ও কাউরান বাজারসহ ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক লাঠিচার্জ, কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ ও গ্রেপতার অভিযান চলতে থাকে। সকাল ৮টার দিকে পুলিস তেজগাঁও শিল্প এলাকায় চা-পানরত শ্রমিক জনতার ওপর বেদম লাঠিচার্জ করে। এঘটনায় উত্তেজিত হয়ে শ্রমিকরা প্রতিরোধ করতে আসলে পুলিসের রিভলবারের গুলীতে তিনজন শ্রমিক মারাত্মকভাবে আহত হয়। গুলীবিদ্ধ তিন জনের মধ্যে বেঙ্গল বেভারেজ ইন্ডাষ্ট্রিজের 'মনুমিয়া' নামক এক জন শ্রমিক কিছুক্ষণ পর মারা যান। এতে শ্রমিকরা মারাত্মকভাবে উত্তেজিত হয়ে ট্রেনচালনায় বাঁধা দিতে গেলে ই. পি. আর-এর সশস্ত্র বাহিনী তাদের ওপর গুলীবর্ষণ করে। তাতে আজাদ এনামেল এন্ড এলোমিনিয়াম কারখানার ছাটাইকৃত আবুল হোসেন নামক শ্রমিকের পায়ে গুলি লাগে। আবুল হোসেন উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ইপিআর বাহিনীর দিকে ফিরে তার বুকে গুলি করার আহবান জানান। বিষ্ময়কর ব্যাপার হল, সত্যি সত্যিই সে সময় একটি গুলী এসে আবুল হোসেনের বক্ষ ভেদ করে, ফলে সাথে সাথেই আবুল হোসেনের মৃত্যু ঘটে।[১৪৪] ঠিক এখানেই পরবর্তী গুলিতে ৫ জন শ্রমিক আহত হয়। এতে আরো উত্তেজিত হয়ে শ্রমিকরা তেজগাঁ অঞ্চল থেকে বেরিয়ে পড়তে থাকলে পুলিস ও ইপিআর বাহিনী ব্যাপক কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠি চার্জের মাধ্যমে তাদের গতিরোধের চেষ্টা করে। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা প্রতিরোধ ভেঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ শহরের বিভিন্ন এলাকায় মিছিল করে। সন্ধ্যায় আহত শ্রমিকদের আরো দুজন মারা যায়। পুলিস এক মিথ্যা প্রেস নোট প্রকাশ করে। শ্রমিক জনতা কর্তৃক ঘেরাও হয়ে যাবার কারণে সম্পূর্ণ আত্মরক্ষার স্বার্থে পুলিস নাকি গুলী করতে বাধ্য হয়েছিল। সে যা হোক, ঐদিন ঢাকা শহরে যেমন নির্মম পুলিসী নির্যাতন চলে, তেমনি, নারায়ণগঞ্জের বিভিন এলাকায়ও পুলিশী হামলা চলে। নারায়ণগঞ্জে যারা গুলিবিদ্ধ হন তাঁদের মধ্যে ১৩জন মারাত্মকভাবে আহত হয় এবং ৬ ব্যক্তি ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করে। আদমজী, সিদ্ধিরগঞ্জ, ডেমরা ও টঙ্গীর শ্রমিকদের ওপরও নির্মমভাবে লাঠিচার্জ করা হয় এবং বিপুল পরিমাণ কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করা হয়। গ্যান্ডারিয়া অঞ্চলেও ব্যাপক পুলিশী নির্যাতন চলে। এ ঘটনায় ১৫০ জন শ্রমিকসহ অসংখ্য ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। অর্থ্যাৎ ঐদিন

---

১৪৩. সাপ্তাহিক জনতা, ঢাকা, ৭ই জুলাই, ১৯৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

সমগ্র ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়। এদিনের ঘটনা যাতে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে না পারে সে জন্য কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পরদিন আহতদের মধ্যে আরো ১ জনের মৃত্যু ঘটে।

১৫ই জুন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এ হত্যা ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দিবস পালনের আহবান জানালে সরকারের পক্ষ থেকে গমির উদ্দীন প্রধান প্রতিবাদকারীদের প্রতিহত করার প্রস্তাব দেন। ১৬ জুন ইত্তেফাক সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়। এবং এর পরদিন ইত্তেফাকের প্রকাশনালয় নিউনেশন প্রেসকে বাজেয়াপ্ত করা হয়। ২২ জুন আওয়ামী লীগ নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরীকে দেশ রক্ষা আইনে গ্রেফতার করা হয়। মিজানুর রহমান ছিলেন তখন অন্যতম আওয়ামী লীগ নেতা যিনি ২২ জুনের আগ পর্যন্ত গ্রেফতার এড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। এঅবস্থায় সরকারের পক্ষে অন্ততঃ দু'মাসের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়।

প্রায় দুই মাস পর পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ একটি জনসভা করার অনুমতি চায় কিন্তু ১৫ আগষ্ট সরকার থেকে জনসভার অনুমতি প্রার্থনাকে নামঞ্জুর করেন। ঐদিন গভর্ণর মোনায়েম খান তার বেতার ভাষণে আবারো আওয়ামী লীগকে হুমকি প্রদর্শণ করেন এবং দেশবাসীর প্রতি আহবান জানানঃ 'দেশের সংহতি বিনষ্টকারীদের মূলোৎপাদন করুণ"।

সরকারের এ ধরনের দমনমূলক নীতির কারণে রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনেকটা শান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু সরকার তার নীতি অব্যাহত রাখে। রাজশাহীর নাটোরে এক সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশ গুলি চালায়। আওয়ামী লীগের গাঁ ঢাকা দেওয়া নেতাদেরকে খুঁজে খুঁজে গ্রেফতার করতে থাকে। ইত্তেফাক সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেনের জেলখানার মধ্যে বিচার শুরু হয়। এ ধরণের আতঙ্কজনক পরিস্থিতিতেও পূর্ব পাকিস্তানের শ্রমিক শ্রেণী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। সেখানকার পাট কল শ্রমিকরা তাদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট আহবান করে। ধর্মঘট মোকাবেলায় পুলিস নির্যাতনের পথ বেছে নেয়। সরকারী গুন্ডাদের দৌরাত্ম্য বেড়ে যায়। এদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের প্রথম শিকার হয় খুলনার শ্রমিকজনতা। মালিক পক্ষের দালাল নেতারা গুন্ডাদের সহযোগে ২৭ আগষ্ট শ্রমিকদের ওপর নির্মম হামলা চালায়। এতে অসংখ্য শ্রমিক আহত হয়। ফলে শ্রমিকদের মধ্যে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এ অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখার জন্য খুলনা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। সারা শহর ও শিল্পাঞ্চলে পুলিস আর ই.পি.আর- টহল দিতে থাকে।

অন্যদিকে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীদের ওপর পুলিস ও গুন্ডাদের হামলা অব্যাহত থাকে। আওয়ামী লীগের চট্টগ্রাম অফিসের ওপর ১৯ অক্টোবর বড় ধরনের হামলা হয়। সরকার বিরোধী ব্যক্তিবর্গের সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে সিলেট সরকারী কলেজের অধ্যক্ষের ওপর হুশিয়ারিমূলক রুল জারি করা হয়। সরকারী মনোভাব এমন নিষ্ঠুর রূপ ধারণ করে যে, কারাগারের প্রকষ্ঠে ইত্তেফাক সম্পাদক তোফাজ্জেল হোসেন ও ন্যাপ নেতা আবদুল হালিমসহ বেশ কয়েকজন রাজবন্দীর স্বাস্থ্যের মারাত্মক অবনতি ঘটে। শেখ মুজিবের পাঁ ফুলে যায়, নিতু তাকে সামান্য চিকিৎসার সুবিধা দেওয়া হয়না। এক উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বিশিষ্ট রাজবন্দীর তৃতীয় শ্রেণীর মর্যাদা দিয়ে সাধারণ কয়েদীদের সাথে জেলে রাখা হয়। এদের মধ্যে অনেককেই ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬৯ সন পর্যন্ত বিনা বিচারে আটক থাকতে হয়। অমল সেন, ননী চৌধুরী ও সন্তোষ ব্যানার্জীসহ বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট বামপন্থী নেতা ১৯৫৮ সন থেকে উনসত্তর সাল পর্যন্ত কারাগারে ছিলেন। এসময়ে যে দু'চারজন বামপন্থী নেতা ও কর্মী মুক্তি পেয়েছিলেন তাদেরকে অন্তরীণ অবস্থায় কাল কাটাতে হয়। ফলে তাঁদের রুটি রোজগারের পথটুকুও বন্ধ হয়ে যায়।[১৪৫] এসময় সরকার বিরোধী রাজনীতি করার অভিযোগে রাজনৈতিক কর্মীদের অভিভাবক বা আত্মীয়স্বজনের ওপর নির্মম নির্যাতন নেমে আসে। ১৯৬৬ সালের ৭ জুনের ঘটনার পর যখন আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দকে একের পর এক গ্রেফতার করা শুরু হল, আওয়ামী নেতাদের প্রকাশ্যে কর্মকান্ড পরিচালনা করার সুযোগ থাকলো না, অধিকাংশ নেতাই যখন জেলে তখন অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব আমেনা বেগমের ওপর পড়লো। সরকার বিরোধী রাজনীতির সাথে আমেনা বেগমের সম্পর্ক থাকার কারণে ইতিপূর্বেই তার স্বামীকে চাকুরী ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করতে হয়। কিন্তু আমেনা বেগম অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণের পর তাকে চাকুরী থেকে সরাসরি বরখাস্ত করা হয়।[১৪৬] এধরনের অসংখ্য ঘটনা সে সময় ঘটেছিল।

এ ধরনের সামাজিক নিপীড়নের পাশাপাশি পাকিস্তান রাষ্ট্র তার দমনমূলক কর্মকান্ডকে একটুও স্থগিত রাখেনি। যেখানেই সরকারের বিরুদ্ধে সামান্য প্রতিবাদ বা শোভাযাত্রা হয়েছে সেখানেই প্রতিবাদকারীদের ওপর পুলিস ও গুন্ডাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছে। যশোর এম, এম, কলেজের ছাত্রগণ একটি ঘরোয়া বৈঠকে সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে আটক ছাত্রদের মুক্তি দাবি করার অভিযোগে তাদের ওপর প্রচন্ড পুলিসী হামলা চালানো হয়। ১৯৬৬ সালের ২৬ নভেম্বর, ছাত্ররা প্রতিবাদ করলে বিপুলসংখ্যক টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ ও বেপরোয়া লাঠিচার্য করা হয়। এ ঘটনায় গুরুতর আহত ৭ জন ছাত্রসহ ৪২ জনকে গ্রেফতার করা হয়। যশোর শহরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। ১০ ডিসেম্বর টঙ্গীর শ্রমিকরা শান্তিপূর্ণভাবে শোভাযাত্রা করছিল। শুধুমাত্র এ অভিযোগে শ্রমিক শোভাযাত্রাকারীদের ওপর পুলিস গুলীবর্ষণ করে। পুলিস ও গুন্ডাদের হামলায় বহুশ্রমিক মারাত্মকভাবে আহত হয় এবং তাদের সম্পত্তি বিনষ্ট হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের যখন এ ধরনের নির্যাতন ও নিপীড়ন চলছে তখন পশ্চিম পাকিসতানেও ক্রমবর্ধমান হারে দমনপীড়ন চলতে থাকে। এ দমনপীড়নের বিরোধিতা শুরু হলে ৩রা ডিসেম্বর করাচীতে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে করাচীতে ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে ৩০ জন রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়।

একদিকে পাকিস্তানের উভয় অংশে তখন এ ধরনের দমন-পীড়ন চলছে। অন্যদিকে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য স্বায়ত্বশাসনবাদীদেরকে দায়ী করে স্বয়ং কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী জনাব জাফর আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবিদারদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, তারা স্বায়ত্বশানের দাবির আড়ালে রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা বিনষ্টের ষড়যন্ত্র করছে। এপ্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন, 'দেশদ্রোহীদের সমূলে ধ্বংস করা হবে।"[১৪৭]

পাকিস্তানের দু'অংশেই চলছিল চরম উত্তেজনা। ১৯৬৭ সালের ২১ জানুয়ারি জননিরাপত্তা আইনে পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যতম বিরোধী নেতা রসুল বখশ তালুককে গ্রেফতারে করা হল। ২৯শে জানুয়ারি একটি প্রতিবাদ কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে জামাতে ইসলামীর মূল

---

১৪৪. আহাদ, অলি (--)ঃ জাতীয় রাজনীতিরঃ ১৯৪৫-৭৫. পৃ.৩২২।

১৪৫. 'কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে রাজবন্দীদের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে' সাপ্তাহিক জনতা, ঢাকা, ২৬শে অক্টোবর, ১৯৬৬।

১৪৬. সাপ্তাহিক জনতা, ঢাকা, ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

নেতা মওলানা মওদুদীসহ জামাতের ৫জন নেতৃস্থানীয় কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। যখন রাজনৈতিক পরিবেশ ক্রমে উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল ঠিক তখনই পশ্চিম পাকিস্তানের রেল শ্রমিকদের ওপর বেপরোয়া হামলা চালানো হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের রেল শ্রমিকদের ডাকে ১লা ফেব্রুয়ারি থেকে অনির্দিষ্টকাল রেল ধর্মঘট চলছিল। সেখানকার সমগ্র রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা বিকল হয়ে পড়ে। রেল শ্রমিকদের দমনের জন্য পুলিশের সাথে সেনাবাহিনী যোগ দেয়। ৩ ফেব্রুয়ারি পুলিস ও সেনাবাহিনী রেল শ্রমিকদের ওপর গুলীবর্ষণ করে। এতে ৬ জন শ্রমিক গুলীবিদ্ধ হয়, তাদের মধ্যে ১ জন গুরুতর রূপে আহত হয়। গুলি বর্ষনের পূর্বেই অবশ্য রেল শ্রমিকদের হুমকি দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্ণর বলেন, ধর্মঘট পরিস্থিতি মোকাবেলার ব্যাপারে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষই শ্রেষ্ঠ বিচারক, প্রয়োজন হলে গুলীবর্ষণ করা হবে। গভর্ণরের এঘোষণার পর পরই রেল শ্রমিকদের ওপর নির্মম নির্যাতন নেমে আসে। তাদের ওপর বেপরোয়া লাঠিচার্য করা হয়, শ্রমিকদের বলপূর্বক ধরে নিয়ে কাজ করতে বাধ্য করা হয়, পুলিসও মিলিটারীর সশস্ত্র প্রহরায় ট্রেন চালানো হয়, কেউ অস্বীকার করলে তার ওপর নির্মম নির্যাতন চলে। সেই দিনই করাচীতে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়, এবং সমগ্রপশ্চিম পাকিস্তানে অসংখ্য রেল শ্রমিককে গ্রেফতার করা হয়। ৮ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তান রেলওয়ে ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাককে গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে নির্যাতনের এ পর্যায়ের সাময়িক বিরতি ঘটে। তবে এর পরও নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার অব্যাহত থাকে। লায়ালপুরের ৫ জন ছাত্র নেতাকে ১০ মার্চ গ্রেফতার করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন হল সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তানে সরকারী নির্যাতন আবার শুরু হয়। উক্ত নির্বাচনে হেরে গিয়ে সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠনের (এন.এস.এফ.) সদস্যারা হলগুলিতে ব্যাপক সন্ত্রাস শুরু করে। সাধারণ ছাত্রদের ওপর তারা বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। বিভিন্ন হলে সরকার বিরোধী ছাত্রসংগঠনের অসংখ্য নেতা-কর্মীর কক্ষ তছনছ করা হয় এবং কয়েকটি কক্ষে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। কয়েকজন ছাত্রকে ছুরিকাঘাতও করা হয়। সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এরা এমন ত্রাস সৃষ্টি করে যে, ছাত্ররা আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। ফজলুল হক হল আর ঢাকা হল একেবারে খালি হয়ে পড়ে। এপর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়।এর পরেও এন. এস.এফ.-এর সদস্যরা ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালাতে থাকে, অধিকাংশ বিরোধী পক্ষীয় ছাত্রের কক্ষের দরজা-জানালা ভেঙ্গে বিছানাপত্র ও বই পুস্তক বাইরে ফেলে দেওয়া হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে আগুনও লাগিয়ে দেওয়া হয়। এই বর্বরোচিত ঘটনার প্রতিবাদে সারা পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র বিক্ষোভ সংঘটিত হয়। উত্তর বঙ্গের গাইবান্ধায় ছাত্রদের ওপর পুলিস গুলীবর্ষণ করে। এতে একজন ছাত্র নিহত হয় এবং আরো ছয়জন গুলীবিদ্ধ হয়ে মারাত্মকভাবে আহত হয়। ১৫ই ফেব্রুয়ারী ছাত্রলীগের সভাপতি ফেরদৌস আহমেদ কোরেশীকে গ্রেফতার করা হয়। ইতিমধ্যে শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। সরকার ১৩ ফেব্রুয়ারি ওয়াপদা কর্মচারীদের ধর্মঘট নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ঢাকার সিদ্দিরগঞ্জ ও ধানমন্ডী এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়, যাতে শ্রমিকও ছাত্রদের বিক্ষোভকে প্রশমিত করা যায়। এর আগে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করে সরকার বিরোধী সংবাদ প্রকাশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। ধর্মঘট করার অধিকারহরণ কিংবা ১৪৪ ধারা জারি করেই শ্রমিক-জনতার বিক্ষোভকে সম্পূর্ণ চাপা দেওয়া সম্ভব হয়নি, শুরু হয় চরম দমন নির্যাতন। ধর্মঘট নিষিদ্ধ ঘোষণার পর যদিও ওয়াপদার কর্মচারীরা তাদের প্রস্তাবিত ধর্মঘট স্থগিত করে তথাপি তাদের ওপর প্রচন্ড নির্যাতন অব্যাহত থাকে। প্রস্তাবিত এ ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে ঢাকা, তেজগাও, সিদ্ধিরগঞ্জ, কাপ্তাই গোয়ালপাড়াসহ বিভিন্ন এলাকায় শ্রমিক নেতৃবৃন্দকে ব্যাপকভাবে গ্রেফতার করা হয় এবং ওয়াপদা কর্মচারী ইউনিয়নের অফিস তালাবদ্ধ করা হয়।[১৪৮]

বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে অনুষ্ঠান করার প্রশ্নেও যে সরকারী প্রশাসনের অনুগতরা কি ধরনের স্বেচ্ছাচারিতা প্রদর্শন করতে পারে তার প্রমাণ বহন করে ইডেন কলেজ। ঐ কলেজের ছাত্রীরা যাতে শহীদ দিবসের শোভাযাত্রায় অংশ নিতে না পারে সে জন্য ছাত্রী নিবাসের সামনে পুলিশ মোতায়েন করা হয়, ফটকগুলিতে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয় এবং এ দিবসে যাতে ছাত্রীরা কালো পতাকা উত্তলন না করতে পারে তার জন্য কড়া নির্দেশ জারি করা হয়। শুধু তাই নয়, কলেজ কর্তৃপক্ষ এটিও জানিয়ে দেন যে, যদি এ নির্দেশ পালন করতে কেউ ব্যর্থ হয় তাহলে তাকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হবে। সে যা হোক, ছাত্রীরা স্বহস্তে কলেজ প্রাঙ্গণে শহীদ মিনার নির্মাণ করার মধ্যেই তাদের কর্মসূচীকে সীমাবদ্ধ রাখে, কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ রাতের অন্ধকারে সে মিনারটি ভেঙ্গে দেন।

রাজনৈতিক কর্মী, শ্রমিক-কর্মচারী ও ছাত্ররাই শুধু সরকারী নির্যাতনের শিকার হয়নি, এপর্যায়ে কৃষক সমাজের ওপরও নির্যাতন নেমে আসে। প্রথম বড় ধরনের ঘটনা ঘটে খুলনায়। ১৯৬৭ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ্য দিবালোকে সরকারি সমর্থক ও গুন্ডারা কৃষক সমিতির জেলা অফিসের ওপর অতর্কিতে হামলা চালায়। কৃষকদের জেলা সম্মেলন উপলক্ষে সংগৃহীত চাউল ও লিখিত পোষ্টার, প্রচারপত্র, ফেষ্টুন, ব্যানার, রশিদ বইসহ বিভিন্ন জিনিষপত্র লুট করে নেয় এবং অন্যান্য জিনিবপত্র নষ্ট করে। অফিসে অবস্থানরত কর্মীদেরকে বেদম প্রহার করে। একজন কর্মকর্তাকে ছুরিকাঘাত করে এবং তার কাছ থেকে বেশ কিছু অর্থ ছিনিয়ে নেয়, কৃষক সমিতির সমর্থক বেশ কয়েক জন ছাত্রের ওপরও হামলা চালায়। এ ঘটনার পরের দিনও বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে গুন্ডারা বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত কৃষকদের আক্রমণ করে। এ ঘটনা যারা মিটমাট করতে আসে তাদের ওপরও গুন্ডারা হামলা চালায় এবং তাদের সর্বস্ব ছিনতাই করে নেয়।[১৪৯]

৪ মার্চ ঢাকা জেলা কৃষক সমিতি কর্তৃক আহুত কৃষক সমাবেশে যোগদান উপলক্ষে রায়পুরা থেকে প্রায় দশ হাজার কৃষক পায়ে হেঁটে যাত্রা শুরু করে। তখন ঢাকার কোথাও ১৪৪ ধারা জারি করা ছিলনা। মিছিলটি বাবুর হাট নামক স্থানে পৌঁছলে পুলিসবাহিনী বাঁধা প্রদান করে এবং বেপরোয়া লাঠিচার্জ করে। পুলিসের বেপরোয়া লাঠিচার্জে অসংখ্য কৃষক মারাত্মকভাবে আহত হয়। মিছিল থেকে পুলিস ১৫৩ জন কৃষককে গ্রেফতার করে। ঐদিন কৃষকদের আরেকটি মিছিল ডেমরা থেকে ঢাকা আসার পথে পুলিসবাহিনী কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং বেশ কিছুসংখ্যক কৃষক ও সংগঠনের কর্মীকে গ্রেফতার করে। অন্যান্য এলাকার কৃষকরাও যাতে সম্মেলন উপলক্ষে ঢাকা আসতে না করতে পারে তার জন্য বিভিন্ন এলাকার গতিপথে কড়া পুলিস প্রহরা বসানো হয়। শুধু তাই নয়, গোপীবাগস্থ সম্মেলন কেন্দ্রেও সম্মেলনের

[১৪৭]. সাপ্তাহিক জনতা, ঢাকা, ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৬৬।

[১৪৮]. সাপ্তাহিক জনতা, ঢাকা,২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

আগের দিন গভীর রাতে পুলিসবাহিনী অতর্কিত হামলা চালায় এবং সম্মেলন কেন্দ্রে অবস্থানরত চারজন কৃষক-কর্মী ও চারজন বাবুর্চীসহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করে। এমনকি, পুলিস রান্নার সরঞ্জাম, চাউল-ডাল এবং কলাপাতা পর্যন্ত ছিনিয়ে নেয়।[১৫০]

সাধারণ মানুষও পুলিশী নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পায়নি। পাবনা তার প্রমাণ। ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে রেশনে বিষাক্ত ভুট্টা সরবরাহ করলে সারা দেশব্যাপী ভুট্টা ভক্ষণকারীদের শরীরে বিষক্রিয়া শুরু হয়। এতে কয়েকদিনের মধ্যে ৫ ব্যক্তির মৃত্যু হয় এবং ১৭০ ব্যক্তি মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। নিহতদের মধ্যে ৩ জনই ছিল পাবনার এবং সেখানে অসুস্থদের সংখ্যাও ছিল বেশী। ফলে জনসাধারণের মধ্যে চরম প্রতিক্রিয়া হয়। সাধারণ মানুষ ১৫ মার্চ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পথে নেমে পড়ে এবং ১৫ হাজার লোকের এ বিরাট জনতা বিক্ষোভ প্রদর্শণ করতে থাকলে পুলিসবাহিনী এই ভুট্টো বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী জনতার ওপর হামলা চালায়। ব্যাপকভাবে কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ ও গুলীবর্ষণ করে; ফলে একজন নিহত ও ১২ জন গুলীবিদ্ধ হয়। এরপর সারা পাবনা শহরে সান্ধ্য আইন জারি করা হয়, পার্শবর্তী বড় শহর সিরাজগঞ্জেও বিক্ষোভের আশংকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। এরপর পুলিসরা সাধারণ মানুষকে পাইকারী হারে গ্রেফতার করতে থাকে এবং ২ দিনের মধ্যে তিন শতাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। সান্ধ্য আইনকে আরো বর্ধিত করা হয়। বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন স্তরের মানুষকেও বেছে বেছে গ্রেফতার করা হয়। সরকার প্রেসনোটের মাধ্যমে মিছিলে ইন্ধনকারীদের দুষ্ট প্রকৃতির লোক বলে আখ্যায়িত করে।[১৫১] শুধু পাবনার নয়, গুলীবর্ষণের ঘটনা অন্যস্থানেও ঘটতে থাকে। ১১ এপ্রিল ঝিনাইদহের পরীক্ষা কেন্দ্রেও ছাত্র-জনতার উপর গুলীবর্ষণ করা হয়।

এ ধরনের একটি শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে দেশের শ্রমিক জনগণ আবারো এগিয়ে আসে। পাটকল শ্রমিকরা সারা প্রদেশব্যাপী জীবন বাজি রেখে ১৪ মার্চ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু করে। ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিন থেকেই আদমজী ও ঢাকাসহ বিভিন্ন এলাকায় শ্রমিকদের রেশন প্রদান বন্ধ করে দেয়া হয়। শ্রমিকদের ওপর গুন্ডা বাহিনী লেলিয়ে দেওয়া হয়। এদের আক্রমনে২৪শে মার্চ দু'জন শ্রমিক নিহত হয় এবং অসংখ্য শ্রমিক আহত হয়। সেই সাথে চলে শ্রমিক নেতৃবৃন্দের নির্বিচার গ্রেফতার। একমাত্র ২৪ তারিখেই ৩২ জন শ্রমিক নেতা গ্রেফতার হন। এর পরও বেপরোয়া ধরপাকড় ও পুলিসের হামলা চলতে থাকে। ৩০ মার্চ নিশাত জুট মিলের শ্রমিকদের ওপর জঘন্য হামলা পরিচালিত হয়। এদিনও অসংখ্য শ্রমিক আহত ও ১ জন নিহত হয়। এঘটনার ফলে সমগ্র টঙ্গী এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। টেক্সটাইল মিলগুলিতেও ধর্মঘট ও প্রতিরোধ শুরু হয়ে যায়। গুন্ডারাই এবার পুলিসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তারা নিশাত জুট মিলে বেপরোয়া গুলী চালায়। কাদেরিয়া টেক্সটাইলসহ অন্যান্য স্থানেও একই অবস্থা ঘটে। ক্রমে খুলনার নিউজপ্রিন্ট মিলসহ অসংখ্য কারখানায় ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে, গ্রেফতারী অভিযানও জোরদার হয়। চট্টগ্রাম ও খুলনার বিভিন্ন কারখানায় ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়। খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিল থেকেও ৮ জন শ্রমিক নেতা গ্রেফতার হয়। ১২ এপ্রিল ধর্মঘটী শ্রমিকদের ওপর নির্মম নির্যাতনের সংবাদ প্রকাশিত হয়। টঙ্গীতে শ্রমিকদের ওপর যে অত্যাচার চলে তাতে এক লোমহর্ষক অবস্থার সৃষ্টি হয়। শ্রমিকদের ওপর এ চরম নির্যাতনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে অন্যান্য পেশার লোকদের মধ্যেও চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। সরকারও এসব দমনের জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। গোপালগঞ্জে সাংবাদিকসহ ৫ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। মিটফোর্ড হাসপাতাল কর্মচারীরা এ সময় ধর্মঘট শুরু করলে তাদের সে ধর্মঘটকেও স্বৈরাচারী কায়দায় দমন করা হয়। রাজনৈতিক দলসমূহ জনসভা করতে চাইলে অনুমতি দেওয়া হয় না। ২৮ মার্চ দেশরক্ষা আইন বলে ৫ জন বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। এরকম পরিস্থিতিতে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট আইয়ুব যশোরের এক জনসভায় বিরোধী দলসমূহকে হুশিয়ার করে দিয়ে বলেন, নাশকতামূলক কার্যকলাপকে কঠোর হস্তে দমন করা হবে। মাসমধ্য বক্তৃতায় গবর্ণর মোনয়েম খান ঘোষণা করেনঃ সুযোগ-সন্ধানী ব্যক্তিগণ পূনরায় তৎপর হয়ে উঠেছে। তাদের সে অপতৎপরতাকে ব্যর্থ করে দেওয়া হবে এবং যে কোন নাশকতামূলক কার্যকলাপকে কঠোর হস্তে দমন করা হবে। মোনয়েম ও আইয়ুবের এ ঘোষণার পর থেকেই রাজনৈতিক দলগুলির ওপর হামলা চলে। পুলিসী হামলার প্রথম শিকার হয় ন্যাপ। শ্রমিক আন্দোলনে তাদের হাত রয়েছে মনে করে তাদের দপ্তরে পুলিস হামলা চালায়। ন্যাপের শ্রমিক ও কৃষক ফ্রন্টের নেতাসহ চার জন বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা গ্রেফতার হন। এঁরা হচ্ছেন হাজি দানেশ, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, হাতেম আলী খান এবং সিরাজুল হোসেন খান। ন্যাপ অফিসে হামলা চালিয়ে বহু প্রচারপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়। এটা ছিল ২ এপ্রিলের প্রতিবাদ দিবস উপলক্ষে তৈরি ইস্তেহার। শুধু তাই নয়, দেশরক্ষা বিধির ধারা অনুযায়ী নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল।[১৫২]

পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের ওপরও এ সময় চরম নিপীড়ন শুর হয়। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার সমর্থকদের হামলায় ৩০ মার্চ বহু ছাত্র আহতহয়। সরকার বিরোধী ছাত্ররাও প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে কর্তৃপক্ষ ৩৩ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এ ঘটনায় প্রতিবাদে ছাত্ররা রাজপথে নামে। হায়দারাবাদে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। একটি সাধারণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে জববলপুরে ২৫ মে সেনাবাহিনী তলব করা হয়। জনতার ওপর সেনাবাহিনী গুলীবর্ষণ করে। এতে ঘটনাস্থলেই দুই ব্যক্তি নিহত হয়। এর ফলে তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। সরকার তা বন্ধ করার জন্য সান্ধ্যআইন জারি করে। জুলাই মাসের শুরু থেকেই আবার পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক পলিশী নির্যাতন চলতে থাকে। করাচীর ছাত্রদের ওপর পুলিসবাহিনী ব্যাপক গ্রেফতার অভিযান শুরু করে। জুলাই মাসের ১০ ও ১১ তারিখে ১৭৮ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়।

অন্যদিকে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠতে শুরু করলে ২৭শে মে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও জয়দেবপুরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। এইভাবে ১৪৪ ধারা জারি করার মাধ্যমে বাহ্যিকভাবে পরিস্থিতিকে শান্ত রাখা সম্ভব হয়। তবে এ সময় শ্রমিকদের ওপর দমনমূলক ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির গণতান্ত্রিক অধিকারও খর্ব করা হয়। জুলাই মাসের মধ্যভাগে পল্টন ময়দানে জনসভা করতে চাইলে তার অনুমতি দেওয়া হয়নি। বরং মিথ্যা বিবৃতি দিয়ে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়। এ ধরনের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ আর কথায় কথায় ১৪৪ ধারা জারি করে মানুষের মুখ বন্ধ করে দেওয়ায় বিশেষ করে ছাত্ররা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে, ছাত্রদের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত থাকাটা পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাছে ছিল শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সে যুক্তিতেই সম্ভবত পুলিসবাহিনী শান্তিপূর্ণ ছাত্র মিছিলের ওপর বেপরোয়া লাঠিচার্য করে। এতে ছাত্রদের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। এটা লক্ষ্য করেই

---

১৪৯. সাপ্তাহিক জনতা, ঢাকা, ৫ই মার্চ, ১৯৬৭।
১৫০. সাপ্তাহিক জনতা, ঢাকা, ১২ই মার্চ, ১৯৬৭।
১৫১. সাপ্তাহিক জনতা, ঢাকা, ২২শে মার্চ, ১৯৬৭।
১৫২. প্রাগুক্ত, ২ এপ্রিল, ১৯৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

সরকার আবারও ৩০শে জুলাই থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে১৪৪ ধারা জারি করে। ছাত্ররা নির্যাতনের প্রতিবাদে ২রা আগষ্ট প্রতিবাদ দিবসের ডাক দেয়। এদিন ছাত্রদের ঐ কর্মসূচীকে বানচাল করতে পুলিসবাহিনী ও গুন্ডারা ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ২ আগষ্ট পুলিসবাহিনী ছাত্র-জনতার ওপর ব্যাপকভাবে লাঠিচার্জ ও অসংখ্য কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। ঐ দিন পুলিসী নির্যাতনে অসংখ্য ছাত্র আহত ও গ্রেফতার হয়। ছাত্রদের তাড়া করে পুলিশ বাহিনী ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মধ্যে ঢুকে পড়ে। তারা শুধু হাসপাতালের মধ্যে ঢুকেই ক্ষান্ত হয়নি; ডাক্তার ও নার্সদেরও প্রহার করে। হাসপাতালের ওপর পুলিশী হামলার প্রতিবাদে ডাক্তার ও নার্সরা ২৪ ঘন্টা ধর্মঘট আহবান করায় তাদের ওপর বিভিন্ন ধরনের হুমকি ও হুশিয়ারী চলতে থাকে। মেডিক্যাল কলেজ সংলগ্ন শহীদ মিনারে পুলিস মোতায়েন করা হয়।

উল্লেখ্য উক্ত ব্যাপক পুলিসী নির্যাতন মূলতঃ গবর্ণর মোনয়েম খানের প্রত্যক্ষ মদদেই পরিচালিত হয়েছিল। গবর্ণর মোনয়েম খান প্রকাশ্যে সরকারি দলের পক্ষ অবলম্বন করতেন এবং তিনি নিজেই পূর্ব পাকিস্তান কনভেনশন মুসলিম লীগের মূল নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যে কোন নির্বাচনের সময় গবর্ণর সরাসরি গবর্ণরের হস্তক্ষেপ করতেন এবং গোটা প্রশাসনকে সরকারী দলের পক্ষে লাগাতেন।[১৫৩] এছাড়া অন্যান্য কারণে তিনি খুব দ্রুতই একদিন ঘৃণিত ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। ৬ আগষ্ট ঢাকাতে মোনয়েম খানের ওপর ইস্টক বর্ষণের মধ্য দিয়ে এ ধরনের ঘৃণারই প্রকাশ ঘটে। এ ঘটনায় ৮৯ জন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। এর পরদিন ছিল ছাত্রদের 'বন্দী মুক্তি দিবস'। সে দিবস পালনকালে কুষ্টিয়াতে ৬ জন ছাত্রকে গেফতার করা হয়। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, কুষ্টিয়ায় বিভিন্ন এলাকায় যখন ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে, সে পর্যায়ে ছোট ছোট মহকুমা শহরেও ছাত্রদের প্রতিবাদ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। মৌলবী বাজারেও ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। এরকম পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক দলকে জনসভা করার অনুমতি প্রদান প্রায় বন্ধ করে দেওয়া হয়। ২২ জানুয়ারি সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ফলে ছাত্রদের ভেতর প্রচন্ড উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এ উত্তেজনাকে দমন করার জন্য ঢাকায় ১ মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। ছাত্ররা ১৪৪ ধারা বাতিল ও বন্দী মুক্তির দাবী তোলে। গবর্ণর মোনয়েম খান রাওয়ালপিন্ডিতে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেনঃ রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হবেনা। এর ১৫ দিন পর গবর্ণর বিরোধী রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করেন এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

এ সময় আবার শুরু হয় ছাত্র ও শ্রমিকদের ওপর গুন্ডাবাহিনীর হামলা। চট্টগ্রামে তো সরকার সমর্থন শ্রমিক নেতাদের লেলিয়ে দেওয়া গুন্ডারা সাধারণ শ্রমিকদের ওপর হামলা চালায়। ফলে দু'জন শ্রমিক নিহত হয়। ঢাকার কৃষি কলেজে সরকারি দলের গুন্ডাবাহিনীর হামলায় বহু ছাত্র আহত হয়। চট্টগ্রাম ও ঢাকায় সংঘটিত এ'দুটি ঘটনার পর ঢাকার ছাত্র মহলে ও চট্টগ্রাম শহরে প্রচন্ড উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। ঢাকা থেকে দু'জন বিশিষ্ট ছাত্রনেতাকে গ্রেফতার করা হয়, আর চট্টগ্রামে আবারও ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।

অন্যদিকে, ১১ আগষ্ট থেকে করাচীতে দু'মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। এর পর পরই সেখানে আবার প্রকাশ্যে দমন নির্যাতন শুরু হয়। ১২ই অক্টোবর করাচীতে যেদিন ১৪৪ ধারার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, সেদিনই আবার ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। সেপ্টেম্বর মাসে লাহোরেও ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।

এ পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র ও শ্রমিকদের ওপর নির্যাতনের পাশাপাশি সরকার খুব প্রকাশ্যে সমগ্র প্রশাসনকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করতে থাকে। খুব সাধারণ ঘটনায় পুলিসবাহিনী গুলী চালাতে থাকে। একটি বিবাহের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রংপুরের গ্রামাঞ্চলে পুলিস জনগণের ওপর গুলীবর্ষণ করে, বহুলোক গুলীবিদ্ধ হয়, তাদের মধ্যে ৩ ব্যক্তি নিহত হয়। এ সময় খুলনা, রংপুর, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোরসহ সারা দেশে ভাড়াটিয়া গুন্ডাদের দৌরাত্ম্যের সংবাদ পাওয়া যায়। গুন্ডারা প্রধানত শ্রমিক ও ছাত্রদের ওপর হামলা চালাতে থাকে। ১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসের ৮ থেকে ১১ তারিখ পর্যন্ত এই তিন দিন ছাত্রদের ওপর চারটি মারাত্মক হামলা সংঘটিত হয়। তার দু'দিন পর সরকারী গুন্ডাবাহিনী বেবী ট্যাক্সি চালকদের ওপর বর্বর হামলা চালায়। গুন্ডাবহিনীর বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বললেই তাকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়; আর প্রতিবাদ করতে গেলে ১৪৪ ধারা জারি করে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এভাবেই চলে যায় ১৯৬৭ সাল। ইতি মধ্যে ৯ই নভেম্বর আত্মগোপন অবস্থায় কমিউনিস্ট নেতা মনি সিং গ্রেফতার হন।

খুলনায় বিশিষ্ট শ্রমিক নেতাকে দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে ১৯৬৮ সালের পাকিস্তান রাষ্ট্রের নির্যাতনমূলক অভিযান শুরু হয়। এবছর শুরু থেকেই সরকার সমর্থক গুন্ডাবাহিনীর হামলার প্রকৃতি পাল্টে যায়; তারা আগের চেয়ে অনেক বেশী হিংস্র হয়ে ওঠে। সারা বছর ধরে অসংখ্য ছোট খাট গ্রেফতারের ঘটনা ঘটে। এতে এখানে শুধু বড় ঘটনাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হবে।

১৮ জানুয়ারি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে সরকারী গুন্ডাবাহিনীর হামলায় ২ জন ডাক্তারসহ ১০ ব্যক্তি আহত হন। সাতক্ষীরা শহরে গুন্ডামির বিরুদ্ধে প্রচন্ড উত্তেজনাকে দমনের জন্য ২৮শে জানুয়ারি ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। ৭ ফেব্রুয়ারি আরও ৬জন ছাত্রের ওপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ফেব্রুয়ারি মাস শেষ হতে না হতেই ছাত্রদের ওপর গুন্ডা ও পুলিসের প্রচন্ড হামলা শুরু হয়। জগন্নাথ কলেজের ছাত্ররা এর প্রথম শিকার হয়। কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়। আর্ট কলেজের ছাত্রদের ধর্মঘট উপলক্ষে কর্তৃপক্ষের দমনমূলক চরিত্রটির চরম রূপ ধরা পড়ে। প্রথমে কলেজ বন্ধ রাখার হুমকি দেওয়া হয়। তার পর ৯ জন ছাত্রের ওপর শোকজ নোটিশ প্রদান করা হয়। তাতেও কাজ না হলে ধর্মঘটের ত্রয়োদশ দিবসে আর্ট কলেজের ছাত্রদের ওপর গুন্ডাবাহিনীকে লেলিয়ে দেয়া হয়। তার পর ২৭ মে ধর্মঘটের পঞ্চদশ দিবসে আবারো ছাত্রদের ওপর গুন্ডাবাহিনীর নির্মম হামলা চলে।

এসময় বিনা নোটিশে শত শত শ্রমিক ছাঁটাইসহ আরো বিভিন্ন ধরনের গণনির্যাতন চলতে থাকে। কিন্তু এসব সংবাদের তেমন কোন গুরুত্ব ছিল না। সংবাদপত্রে ১৪৪ ধারা জারির খবরও গ্রেফতারের সংবাদ প্রাধান্য পায়। ৮ মে নারায়ণগঞ্জে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে ৫ ব্যক্তির গ্রেফতারের সংবাদ পাওয়া যায়। এর পরদিনই পুলিসের গুলীবর্ষণ ও ছাত্র হত্যার খবর আসে। ছাত্র নেতাদের ওপর গ্রেফতার অভিযান অব্যাহত থাকে। ৩০ মে ও ২রা জুন যথাক্রমে ঢাকা ও চট্টগ্রামে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। এর পরদিনই খুলনাও এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসে।

এদিকে ঘোড়াশাল শিল্প এলাকায় যে ঘটনা ঘটে তাতে সবাই স্তম্ভিত হয়। সরকারী দলের অতর্কিত হামলায় ২৬ জুন ৬ জন সাধারণ শ্রমিকের মৃত্যু ঘটে এবং শতাধিক আহত হন। ২৮ জুন প্রায় বিনা কারণে ঢাকার প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়। খুলনায় আবারও ৫ই জুলাই থেকে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। এবারও ছাত্ররা নির্ভয়ে তাদের কর্মসূচী পালন করে। ১০ আগষ্ট প্রদেশব্যাপী ধর্মঘটী

---

১৫৩. খান, আতাউর রহমান (১৯৭০)ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫-৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্রদের ওপর চরম পুলিসী নির্যাতন নেমে আসে। ময়মনসিংহে ঘটে মর্মান্তিক ঘটনা; ছাত্রদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষে প্রথমে পুলিস পিছিয়ে যায় এবং পরে তারা আরও লোকজন সমবেত হয়ে ছাত্রদের ঘেরাও করে তীব্র নির্যাতন চালায়। ৪ সেপ্টেম্বর যশোহরের কেশবপুর পুলিস গুলীবর্ষণ করে, এতে ৮ ব্যক্তি আহত হয়। ঐ দিন ময়মনসিংহের গ্রামাঞ্চলেও পুলিস জনসাধারণের ওপর গুলীবর্ষণ করে। ফলে এক ব্যক্তি নিহত ও বহু ব্যক্তি আহত হয়। ১৮ সেপ্টেম্বর সরকারী গুন্ডাবাহিনীর হামলায় চট্টগ্রামের একটি এলাকায় ১ জন শ্রমিক নিহত হয় এবং একাধিক আহত হয়। তাছাড়া ৪৫ জন সাধারণ শ্রমিককে গ্রেফতার করা হয়। খুলনার শিল্প এলাকায় ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে আবারও ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিক থেকে ধর্মঘটী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ক্রমেই দমন-পীড়ন বাড়তে থাকে। অক্টোবর মাসের ১১ তারিখ সাধারণ শ্রমিকদের ওপর গুন্ডাবাহিনীর হামলায় আরও একজন শ্রমিক নিহত হয়।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠনের (এন,এস,এফ) নেতা ও কর্মীর দৌরাত্ম্য প্রচন্ডভাবে বেড়ে যায়। সলিমুল্লাহ হলে কয়েকজন ছাত্র নেতার ওপর এরা ১৫ অক্টোবর হামলা চালায় এবং তাদের আহত করে। ২৪ অক্টোবর রাজশাহীতে আবারও ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। ছাত্র নেতা পংকজ ভট্টাচার্য ২৯ অক্টোবর নিরাপত্তা আইনে আবারও গ্রেফতার হন। উপরোক্ত বিবরণ থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, ১৯৬৮ সালের গোড়ায় একজন শ্রমিক নেতা নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হয়েছিলেন, তার পর ঠিক ১০ মাস পর নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হলেন একজন ছাত্র নেতা। ১৯৬৭ সালের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়ের পর কি কারণে পরবর্তী বছর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ওপর আর কোন আক্রমণ, হয়রানি বা গ্রেফতারের খবর পাওয়া যায়না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। আসলে বছরের গোড়াতেই এমন একটি ঘটনা ঘটে যা সমগ্র রাজনৈতিক মহলকে স্তম্ভিত করে দেয়। ফলে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন।

১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবখান পূর্ব পাকিস্তানে সফর করে যাবার পর পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে বিভিন্ন ধরনের গুজব ছড়িয়ে পড়ে।১৯৬৮ সালের ৭ জানুয়ারি রাওয়ালপিন্ডি থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর যখন পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাসহ ২৮ ব্যক্তিকে গ্রেফতারের একটি ঘটনা বর্ণনা করে তখন এ গুজবের যেমন অবসান হয়, তেমনই সমগ্র রাজনৈতিক মহল হতবাক হয়ে যায়। জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে বিবৃতি প্রদান করেন তা নিম্নরূপঃ

" পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য ২৮ ব্যক্তি একযোগে প্রচেষ্টা চালাইতেছিলেন। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন ঢাকাস্থ একটি কুটনৈতিক মিশনের ফার্ষ্ট সেক্রেটারী মিঃ ওঝার সহিত যোগাযোগ রাখিতেন। তাহাদের কেহ কেহ আগরতলা গমন করেন ও তাহাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে লেঃ কঃ মিশ্র, মেজর মেনন ও অন্যান্যের সহিত আলাপ আলোচনা চালান। তাহাদের চক্রান্তের বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থসংগ্রহ করাই ছিল তাঁহাদের উদ্দেশ্য। চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ মিঃ ভূপতি ভূষণ চৌধুরী ওরফে মানিক চৌধুরীসহ গ্রেফতারকৃত আরও কতিপয় ব্যক্তির মাধ্যমে এই সকল ব্যক্তির প্রচুর অর্থ লাভ করার প্রমাণাদিও পাওয়া গিয়াছে।

"তদন্ত চালানোকালে আটককৃত অধিকাংশ ব্যক্তি উপরোক্ত চক্রান্তে তাহাদের স্বীয় ভূমিকার কথা স্বীকার করিয়াছেন। অস্ত্রশস্ত্রের একটি তালিকাসহ বহু দলিলপত্র উদ্ধার করা হইয়াছে। আগরতলার সহিত আলোচনা সাপেক্ষে যে সকল অস্ত্র পাওয়া যাইতে পারে উক্ত তালিকায় সেই সকল অস্ত্রের বিবরণ লিপিবদ্ধ ছিল।"

"বিশৃংখলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পরিচালিত এই প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র সম্পর্কে দেশের উভয় অংশের জনসাধারণ যে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছে, সরকার সে সম্পর্কে সজাগ রহিয়াছে। এ ব্যাপারে যে তদন্ত চালানো হইয়াছে, সরকার সে সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত রাখিবেন। এই তদন্ত প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।"[১৫৪] এটাই ঐতিহাসিক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা; পরবর্তীকালে এ মামলার অন্যতম আসামী হিসাবে শেখ মুজিবুর রহমানের নাম যুক্ত করা হয় এবং জেলগেট থেকে তাকে গ্রেফতার করে সেনানিবাসে নিয়ে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়। এধরনের একটি বিস্ময়কর ঘটনায় পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক মহলে শুধু নিস্তব্ধতা নেমে আসে তাই নয়, পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক মহলেও নিস্তব্ধতা নেমে আসে। রাজনৈতিক মহলের এসীমাহীন নিস্তব্দতাকে ভেঙে দেয় করাচী তথা পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ। তারা হঠাৎ করেই যে ব্যাপক বিদ্রোহের সূচনা করে সে আলোচনায় না গিয়ে তাদের ওপর যে নির্মম জুলুম নেমে আসে তারই একটি সংক্ষিপ্ত সার এখানে তুলে ধরা হল।

একটি ক্ষুদ্র ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাওয়ালপিন্ডির একটি অভিজাত কলেজের ৭০ জন ছাত্রকে গ্রেফতার হয়। এ ঘটনা রাওয়ালপিন্ডির ছাত্র সমাজকে বিক্ষুব্ধ করে। বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে ৭ নভেম্বর পুলিস ছাত্রদের ওপর লাঠিচার্জ করে। এতে বিক্ষোভ দমিত না হয়ে বিদ্যুৎ গতিতে ঐ শহর এবং দেশের অন্যান্য শহরে ছড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে পুলিসের গুলীতে একজন ছাত্র নিহত হয়। এ ঘটনা যেন ছাত্রদের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। সরকার শহরে সান্ধ্য আইন জারি করে এবং সেনাবাহিনী তলব করে। এ দিনই করাচীতে বিক্ষুব্ধ ছাত্রসহ ৬০ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। পরদিন পেশোয়ার, লাহোর, করাচী, লায়ালপুর ও মুলতানসহ বিভিন্ন শহরে প্রচন্ড ছাত্র বিক্ষোভ হয়। পুলিশের গুলীতে এদিন রাওয়ালপিন্ডিতে আরও দুই ব্যক্তি নিহত হন। রাওয়ালপিন্ডিতে সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকায় পিন্ডির ছাত্ররা সেভাবে বের হতে পারেনি বটে, কিন্তু অন্যান্য শহরে বিক্ষোভের ব্যাপকতা আরো বেড়ে যায়। বিক্ষোভের ব্যাপকতার কারণে লাহোরের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ১ সপ্তাহের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ৯ নবভম্বর পেশোয়ারে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। ১২ নভেম্বর জুলফিকার আলী ভূট্টো ও ওয়ালী খানসহ ১৫জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি গ্রেফতার হন। এদিন লাহোরেও ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। পরদিন বিশিষ্ট ন্যাপ নেতা মাহমুদুল হক ওসমানীসহ ৫৫ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। এর পরও সারা পশ্চিম পাকিস্তানে বিরোধীদলীয় রাজনীতিবিদদের ওপর পুলিশের গ্রেপ্তার অভিযান অব্যাহত থাকে। ১৬ নভেম্বর গুজরাটে ও ১৮ নভেম্বর শিয়ালকোটে ১৪৪ ধারা জারি হয়। রাওয়ালপিন্ডিতে সান্ধ্যআইন তুলে নেওয়ার পর ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। ২৭শে নভেম্বর লাহোর শহরের ছাত্রদের বিশাল বিক্ষোভ মিছিলের ওপর পুলিসবাহিনী বেপরোয়া লাঠিচার্জ করে এবং বেশ কিছু ছাত্রকে গ্রেফতার করে। ১৪৪ ধারা থাকা সত্ত্বেও ২৮ নভেম্বর ছাত্রজনতা বিরাট বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হলে তাদের ওপর পুলিসবাহিনী নির্মমভাবে হামলা চালায়, ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় সৈন্য মোতায়েন করা হয়। ২৯ তারিখে পিন্ডি থেকে ১৪৪ ধারা তুলে নেওয়া হয় বটে, কিন্তু ছাত্র জনতার ওপর হামলা অব্যাহত থাকে। এর পর ১ ডিসেম্বর আবার সেখানে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। ধরপাকড় আর পুলিসী নির্যাতন ২ ডিসেম্বর নাগাদ গুজরান ওয়ালা শহরেও ব্যাপকভাবে শুরু হয়। পিন্ডিতে লাঠিচার্জ, কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপসহ বিভিন্ন ধরনের পুলিসী নির্যাতন ডিসেম্বর মাসেও অব্যাহত থাকে।

---

১৫৪. সাপ্তাহিক জনতা, ঢাকা, ১৪ই জানুয়ারি, ১৯৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্র জনতার ওপর এ নির্মম দমন-পীড়নের প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক ছাত্র বিক্ষোভ শুরু হয়। এ বিক্ষোভকে দমনের জন্য পুলিসবাহিনী ছাত্রদের ওপর মরিয়া হয়ে আক্রমণ করে, নির্মম নির্যাতন ছাড়াও ব্যাপকহারে গ্রেফতার শুরু করে। এসকল সংবাদ প্রকাশের অপরাধে নিউনেশন প্রিন্টিং প্রেসকে ১৭ নভেম্বর আবার বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হয়। রাজনৈতিক দলসমূহের জনসভা নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বিক্ষুব্ধ পূর্ব পাকিস্তানীদের আর দমন করা যায়নি। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে পাকিস্তানের দুই অংশের জনতার সংগ্রাম এক সূত্রে প্রবাহিত হতে থাকে। বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতার ওপর পুলিসের গুলীবর্ষণের ফলে ৭ই ডিসেম্বর ৩ ব্যক্তি নিহত হন, আহত ও গ্রেফতার হন অসংখ্য। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। এপুলিসী অত্যাচার সারা পূর্ব পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। এরকম একটি পর্যায়ে ১২ ডিসেম্বর গভর্ণরদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যাতে পাকিস্তানের উভয় অংশের রাজনৈতিক আন্দোলন অভিন্নভাবে দমন করার কলাকৌশল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানী বিশিষ্ট নেতাদেরকে গ্রেফতার করা অব্যাহত থাকে এবং তাদেরকে দৈহিকভাবেও নির্যাতন করা হয়। অন্যদিকে, ডিসেম্বরের ১২ ও ১৩ তারিখে ঢাকা শহরের নিরীহ লোকদেরকেও পাইকারী হারে গ্রেফতার করা হয়। এদু'দিনে গ্রেফতারের সংখ্যা দাঁড়ায় এক হাজারেরও উর্ধে। ১৩ তারিখে চট্টগ্রাম, ফৌজদারহাট ও কাটালীতে পুলিস গুলীবর্ষণ করে। একমাত্র চট্টগ্রামেই ২৬ ব্যক্তি গুলীবিদ্ধ হন এবং ১৫৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এদিনই মওলানা ভাসানীসহ ১০ জন বিরোধী দলীয় বিশিষ্ট নেতার বিরুদ্ধে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়। ১৪ ডিসেম্বর চট্টগ্রামে গুলীবিদ্ধ একজনের মৃত্যু হয়। সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানে এসময় ছাত্রজনতার বিক্ষোভ মিছিলের ওপর সরাকরী পুলিসী নির্যাতন অব্যাহত থাকে। রাওয়ালপিন্ডিতে কালোব্যাজ ধারণ করে মানুষ ২২ ডিসেম্বর ঈদের নামাজ পড়তে গেলে জনতার ওপর পুলিসী হামলা চালানো হয় এবং ২ জন আলেমসহ ২৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়। ২৭ ডিসেম্বর পেশোয়ারে ২৫ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। ২১ ডিসেম্বর গভর্ণর ছাত্র সমাজকে হুমকি দিয়ে বলেন, 'রাষ্ট্র বিরোধী তৎপরতা দমনে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এর ১ সপ্তাহ পর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব স্বয়ং বিরোধী দলগুলিকে লক্ষ্য করে বলেনঃ মিছিল দেশবাসীর পক্ষে উপদ্রপস্বরূপ। তবে তিনি এ মন্তব্যের মধ্য দিয়ে ব্যাপক গণমিছিলের অস্তিত্বকেও স্বীকার করে নেন। অথচ এর পর দিনই যখন মওলানা ভাসানীর ডাকে সাড়া দিয়ে কৃষকজনতা গ্রামাঞ্চলে হরতাল করতে যান, তখন পুলিসবাহিনী বিভিন্ন জায়গায় গুলীবর্ষণ করে। নড়াইলে বেশ কয়েকজন আহত হয়। মনোহরদীর হাতির দিয়া বাজারে জনতার ওপর গুলীবর্ষণের ফলে ৩ ব্যক্তি নিহত হন। এটিই ছিল ১৯৬৮ সালের রাজনৈতিক আন্দোলন ও তার বিরুদ্ধে সরকারী দমনপীড়নের প্রকৃত রূপ।

উপরোক্ত দীর্ঘ আলোচনার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের উভয়াংশের জনসাধারণের ওপর দমন-নিপীড়নের যে নির্মম ও করুণ চিত্র ফুটে ওঠেছে তা থেকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের আসল স্বরূপ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা জন্মে। জেনারেল আইয়ুবের সামরিক ও সাংবিধানিক সরকারের আমলে যে আইনগত ও প্রশাসনিক সংস্কার সাধিত হয়, সে সরকার যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে ও তা কার্যকরী করে এবং তার আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনাকে জনগণের ওপর যেভাবে প্রয়োগ করে এ'তিন দিকের আন্তঃসম্পর্ক নির্দেশ করতে পারলেই আইয়ুব আমলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বরূপটি সুচিহ্নিত হবে। আর এপটভূমিতে ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থানের একটি বিশেষ দিক উন্মোচিত হবে। এবং এখানেই ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের স্বরূপ উপলব্ধির মুল সূত্র নিহিত রয়েছে।

৭.৮ আইয়ুব আমলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্র ও তার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের স্বরূপঃ

এখানে নতুন কোন আলোচনার সূত্রপাত হয়নি বরং ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও বর্তমান অধ্যায়ের উপরোক্ত আলোচনার সারসংকলণ করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে দেখা গেছে পশ্চিম পাকিস্তানের সামন্ততান্ত্রিক কৃষিকাঠামোকে ষাট দশকে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। অন্যদিকে, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে ও পরিচালনায় গড়ে তোলা হয়েছে একটি শিল্পপতি ও নব্য ব্যবসায়ী শ্রেণী। সেখানকার গ্রামাঞ্চলের সামন্ত স্বার্থসমূহের অর্থনৈতিক ভিত্তির বিপরীতে বিকশিত হয়েছে ধনবাদী খামারমালিক বা কৃষিবুর্জোয়া শ্রেণী। পাকিস্তানের মত উপনিবেশোত্তর একটি দেশে এধরনের একটি পরিবর্তন কিভাবে সূচিত হতে পারলো তা সত্যিই চিন্তা করার মত বিষয় হতে পারে। এ ধরনের একটি পরিবর্তনকে বুঝতে হলে যে পরিস্থিতিতে পাকিস্তানে সামরিক সরকার কায়েম করাকে খানিকটা অনিবার্য করে তুলেছিল সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা আবশ্যক। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে যে, ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের রাজনীতি ও রাষ্ট্রের কেন্দ্রবিন্দু ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। সেখানে আরো দেখা গেছে যে, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় ভারতবর্ষের তিনটি এলাকার তিনটি সামাজিক শ্রেণী-গোষ্ঠীর যৌথ প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে পাকিস্তান। এগুলি হচ্ছে অবিভক্ত ভারতের মুসলিম মধ্যবিত্ত ও শরণার্থী বুর্জোয়া শ্রেণী, পাঞ্জাব-সিন্ধু-উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সামন্তবাদী শ্রেণী ও পূর্ব পাকিস্তানের কৃষক জনগোষ্ঠী। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এ সকল শ্রেণী গোষ্ঠীর বাইরে নতুন যে উপাদানটি এই নয়া রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত হল তা হচ্ছে একটি আমলাতন্ত্র ও একটি সেনাবাহিনী। উপনিবেশোত্তর পাকিস্তান রাষ্ট্রের শিল্পায়নসহ সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার দায়িত্ব মূলতঃ আমলাতন্ত্রের হাতে ন্যস্ত হয়। অন্যদিকে, বৃহৎ ও অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী সামরিক শক্তির অধিকারী পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের পক্ষ থেকে কথিত আগ্রাসনের কথা বলে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীকে অত্যন্ত শক্তিশালী একটি বাহিনী হিসাবে গড়ে তোলা হয়। পাকিস্তানের অর্থনীতি যাকে ধারণ করতে সক্ষম নয় এমন এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী প্রধানতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতার ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। সামরিক বাহিনী ও বেসাররিক আমলাতন্ত্রের উচ্চ পদগুলিতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের একক প্রাধান্য থাকার কারণে শক্তিশালী কেন্দ্র গঠনের নামে রাজধানী ও সেনাসদর দপ্তরসহ পাকিস্তানের প্রথম দশকে যা কিছু গড়ে ওঠে তার প্রায় সব কিছুই স্থাপিত হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। আর এ জন্য পাকিস্তানের উত্তর অঞ্চলের সমুদয় কৃষি উদ্বৃত্তকে ব্যয় করা হয়। উক্ত উন্নয়ন ধারার পুরোটাই নাগরিক আমলাতন্ত্র ও সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বে পরিচালিত হয়। সংবিধানবিহীন প্রথম দশকের গভর্ণরের শাসনামলে এ কর্তৃত্ব নির্বিঘ্ন হতে পেরেছিল। গভর্ণরের শাসন অবসানের যখন সময় আসলো তখন সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্র অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। আমলাতন্ত্রের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বে একটি শিল্পপতি ও নতুন ব্যবসায়ী শ্রেণী গড়ে উঠতে শুরু করেছে। সামরিকবাহিনী ও আমলাতন্ত্রের কর্তৃত্বের ব্যাপকতাকে নিশ্চিত করার জন্য যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক কর্তৃত্বের বিপরীতে সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানকে একটি মাত্র কেন্দ্রের অধীনে আনার প্রয়োজন ছিল, তেমনই রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য প্রাপ্ত শিল্পপতি ও নব্য ব্যবসায়ীদের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের অধীনে নিয়ন্ত্রণহীন একটি একক বাজার ব্যবস্থা প্রয়োজন ছিল। অথচ এই বিষয়টি পশ্চিম পাকিস্তানের সামন্ততান্ত্রিক আঞ্চলিক প্রধানদের ক্ষমতা সংরক্ষণের জন্য অন্যতম বাঁধা স্বরূপ ছিল। পুরোনো প্রদেশগুলিকে ভেঙ্গে দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে যখন এক ইউনিট গঠন করা হয়, তখন বৃহৎ সামন্তদের দল রিপাবলিকান পার্টির পক্ষ থেকে বাঁধা আসে, কিন্তু তার পরও যখন এক ইউনিট সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত হয়ে গেল তখন

Dhaka University Institutional Repository

থেকে ধীরে ধীরে সকল রাজনৈতিক দলের কাছেই পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, শক্তিশালী কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রের কাছে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আঞ্চলিক প্রাধান্যের গুরুত্ব ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে যার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে, আমলাতন্ত্রের একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা। আমলাতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান শক্তি বৃদ্ধি এবং উহার স্বেচ্ছাচারিতা যখন সংবিধানকেও বার বার লংঘন করে চলেছিল তখন বলা চলে রাষ্ট্র থেকে সকল রাজনৈতিক শক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ পর্যায়ে রাষ্ট্রের মূল এবং প্রায় একমাত্র উপাদানে পরিণত হয় আমলাতন্ত্র, এআমলাতন্ত্রের সম্ভাব্য প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহৎ সামন্তগোষ্ঠী। কেননা সংখ্যাসাম্যের ভিত্তিতে পাকিস্তানের দু'অংশ থেকে সমসংখ্যক সদস্যদের নিয়ে যে গণপরিষদ গঠিত হওয়ার কথা ছিল, সে নির্বাচন ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হলে এটা খুবই স্পষ্ট যে, এক ইউনিট প্রথা আর টিকতনা। কেননা পশ্চিম পাকিস্তানের সবগুলি রাজনৈতিক দল এক ইউনিট ভেঙ্গে দেওয়ার দাবিতে জোরালো আন্দোলন শুরু করে দিয়েছিল। সমগ্র পাকিস্তানে একমাত্র আওয়ামীলীগ ছাড়া এমন কোন রাজনৈতিক দল ছিল না যে, পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিটকে সমর্থন করতো। আর আওয়ামীলীগ মূলতঃ যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানকেন্দ্রীক দল ছিল, সেহেতু জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে তার পক্ষে সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করা সম্ভব ছিল না। উপরন্তু,আমেরিকার সাথে বিভিন্ন সামরিক চুক্তিকে আওয়ামী লীগের সমর্থন করা এবং যুগপৎ পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ব শাসনের দাবি থেকে কিছুটা সরে দাঁড়ানোর কারণে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে আওয়ামী লীগের প্রতি সমর্থন বিশেষভাবে হ্রাস পায়। এছাড়া, পশ্চিম পাকিস্তানে আমলাতন্ত্রের সাথে সামন্ত শ্রেণীর দ্বন্দ্ব এমন তীব্রভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল যে, সে সময় যদি আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হয়ে ইচ্ছাও করতো আমলাতন্ত্র, শিল্পপতি–ব্যবসায়ী ও এদের সমর্থক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থকে সে রক্ষা করবে, তাহলেও একটি সাংবিধানিক সরকার দিয়ে তার পক্ষে তা করা সম্ভব ছিল না। ফলে এ পর্যায়ে সামরিক শাসন ছাড়া আমলাতন্ত্রসহ অন্যান্য কায়েমী গোষ্ঠীর স্বার্থকে সংরক্ষণ করার আর কোন পথ খোলা ছিলনা।

সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার পর নব্য শাসকদের কাছে সবচেয়ে প্রধান প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল কিভাবে তারা তাদের সামাজিক ভিত্তি গড়ে তুলবে। একটি শিল্পপতি শ্রেণী গড়ে তোলার পরিকল্পনা ছিল যা, আমলাতন্ত্র–সর্বস্ব–রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। এই শিল্পপতি শ্রেণী ছাড়া আর যেসব শ্রেণীর সেদিন অস্তিত্ব ছিল তাদের মধ্যে এমন কোন গোষ্ঠী ছিল না যা এই নব্য রাষ্ট্রব্যবস্থার সামাজিক ভিত্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারে। কেননা, পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহৎ ভূস্বামীবর্গ শক্তিশালী আমলাতন্ত্রের বিরোধী, পশ্চিমপাকিস্তানের কৃষক জনগোষ্ঠী ভূস্বামীদের করতলগত, এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও ক্ষুদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণী গণতন্ত্রহীনতাকে সমর্থন করতে পারেনা। অন্যদিকে, পূর্ব পাকিস্তানের কৃষক, মধ্যবিত্তসহ সকল শ্রেণীই আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের বলিষ্ঠ সমর্থক, যা কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রের শক্তিশালী অস্তিত্বের বিরোধী। সে কারণেই বিভিন্ন ধরনের সংস্কারের মাধ্যমে নতুনতর সামাজিকবর্গ বা শ্রেণী সৃষ্টির প্রয়োজন পড়লো। আর সেই সাথে গণতন্ত্রের নতুন বাখ্যা দানেরও আবশ্যকতা দেখা দেয়।

পশ্চিম পাকিস্তান থেকেই শুরু হল রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পায়ন প্রক্রিয়া, ষাট দশকের শেষ পাঁচ বছরে পূর্ব পাকিস্তানেও যার গতি ত্বরান্বিত হল। পূর্ব পাকিস্তানে পঞ্চাষের দশকে অবাঙ্গালী পুঁজিপতিদের উদ্যোগে যে শিল্প বিকাশ হয়েছিল ষাট দশকের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা শিল্পসমূহের অধিকাংশই ছিল এই অবাঙ্গালী গোষ্ঠীর অংশীদারিত্ব। এসব শিল্প যখন লাভজনক পর্যায়ে পৌছাঁয় তখন সরকার তার পুঁজি প্রত্যাহার করে নিলে উক্ত অবাঙ্গালী পুঁজিপতিরা বৃহৎ শিল্পের মালিক হয়ে যায়। উক্ত শিল্পপতিদের মধ্যে এমন অনেকেই ছিলেন যাদের কাছে জাতি বা ধর্মের বিষয়টি তেমন গুরুত্ব পেতো না, কিন্তু এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিল্পপতি ছিলেন যাদের স্থায়ী বাসস্থান ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে এবং কিছু কিছু শিল্প সুযোগমত পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করলেও তাদের সম্পদ বিনিয়োগের মূল কেন্দ্র ছিল পশ্চিম পাকিস্তান। এসব শিল্পপতির ভিতর গুটি কয়েক পরিবারই যারা ষাট দশকের শেষদিকে সমগ্র পাকিস্তানের মোট শিল্প প্রতিষ্ঠানের সিংহভাগের মালিক হয়ে যায়। নিঃসন্দেহে এসব শিল্পপতি তৎকালীন সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক শক্তি হিসাবে বিকশিত হয়েছিল। কিন্তু এই শ্রেণীটিই পূর্ব পাকিস্তানের সমাজে দু'ধরনের দ্বন্দ্বের জন্ম দিয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের শ্রমিক শ্রেণীর সাথে এদের যে দ্বন্দ্ব ছিল, সেটি পাকিস্তানের উভয় অংশের জন্যই সত্য ছিল, তবে দ্বিতীয় যে দ্বন্দ্ব তারা সৃষ্টি করেছিল তা পূর্ব পাকিস্তানের নিজস্ব, যদি পশ্চিম পাকিস্তানকে একক প্রদেশে হিসাবে ধরা যায়। আর সেটা ছিল জাতীয় দ্বন্দ্ব, যা উপনিবেশিক শোষণের নামান্তর মাত্র। কেননা পূর্ব পাকিস্তানের সকল মূল ও ভারী শিল্প যদি অবাঙ্গালী মালিকানাধীন হয় এবং ঐ অবাঙ্গালী শিল্পপতিদের ব্যবসার মূল কেন্দ্র যদি পশ্চিম পাকিস্তান হয় তাহলে তাদের মুনাফার প্রধান অংশ যে পশ্চিম পাকিস্তানেই স্থানান্তরিত হবে তাতে আর সন্দেহের কি আছে। পাকিস্তানের উভয় অংশে উক্ত শিল্পপতিদের শ্রমশোষণ প্রক্রিয়াকে প্রতিষ্ঠিত করতে পাকিস্তান রাষ্ট্র কি চরম নিপীড়নের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল সে বিষয়টি ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে উক্ত শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে যারা জাতীয় প্রশ্ন তুলে ছিল তারাও নির্মমভাবে নির্যাতিত হয়েছিল। আরও একটি দ্বন্দ্ব পূর্বোক্ত শিল্পপতি শ্রেণীর মধ্যে জন্ম নেয়; সেটি অবশ্য পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রেই বেশী সত্য। পাকিস্তানের বৃহৎ শিল্পপতিগণ তাদের আধিপত্যকে একচেটিয়া করার পথ হিসাবে পুরোনো প্রযুক্তির পরিবর্তে ক্রমশঃ উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর ও পুজিঘন শিল্পের দিকে মনোযোগী হয়। ফলে বেশ কিছু ধোপদুরস্ত শিক্ষিত শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয় বটে, কিন্তু এই পুঁজিঘন ও উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পের প্রভাবে অসংখ্য ছোট ও মাঝারি শিল্পের অপমৃত্যু ঘটে। ফলে একদিকে যেমন অসংখ্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের মালিক পথে বসে, তেমনি হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে যায়। এতে পাকিস্তানের শ্রমিক শ্রেণীর অস্তিত্বের সংকট যেমন তীব্র হয় তেমনি মাঝারি ও ক্ষুদ্র পুজির মালিকদের সাথেও বৃহৎ পুঁজিপতিদের একটি সরাসরি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।

ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানের সামন্ত অভিজাতদের শক্তির মূল উৎসকে ভেঙ্গে ফেলা হয়। এর বিপরীতে পুঁজিপতি খামার মালিক ও ধনি কৃষক শ্রেণীর বিকাশ ঘটে। সামন্ততান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ থেকে সকল পর্যায়ের কৃষক মুক্তি পায়। ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে উদ্ধারকৃত জমির একটি ক্ষুদ্র অংশ ভূমিহীনদের ভিতরে বন্টন করা হলেও এর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভূস্বামীদের আত্মীয়স্বজনের মধ্যেই বিলি বন্টন করা হয়। তথাপি আত্মীয় স্বজনগণ জমি পেয়ে যে শ্রেণী অবস্থানটি গ্রহণ করে তা প্রাক্তন ভূস্বামী শ্রেণী অবস্থান থেকে পৃথক।

ভূমি সংস্কার করলেও পশ্চিম পাকিস্তানের পূর্বেকার গোষ্ঠীগত প্রাধান্যকে ভাঙ্গা যায়নি। কিন্তু বৃহৎ ভূস্বামীর অধীন থেকে দু'একশো বিঘা জমির যেসব মালিক মুক্তি পায় তারাই পশ্চিম পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলে আইয়ুব সরকারের সামাজিক ভিত্তি গড়ে তোলে। [illegible] বিদ্যুৎ, সেচ ও কৃষি উপকরণ ব্যাপকভাবে সরবরাহ করার কারণে এদের মধ্য থেকে পুঁজিপতি খামার মালিক হওয়ার ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত এই পুঁজিপতি খামার মালিকরা সম্পদ আহরণের এমন একটি ক্ষেত্র পেয়ে যায়, যা প্রাক্তন বৃহৎ ভূস্বামী শ্রেণীর আভিজাত্যকে মোকাবেলার পর্যাপ্ত শক্তি যোগায়।

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চিম পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলে এধরনের একটি ভূমিসংস্কার আইয়ুব সরকারের সামাজিক ভিত্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যে ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়েছিল, পূর্ব পাকিস্তানে সে ধরনের কোন সুযোগ ছিলনা। কেননা এখানে আইয়ুবের সামরিক সরকার আসার আগেই ভূমি সংস্কার কার্যকরী হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখানেও উক্ত সরকারের একটি সামাজিক ভিত্তি গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুব সরকার দু'চারশ বিঘা জমির মালিক সৃষ্টির জন্য যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল, পূর্ব পাকিস্তানে সে কাজটি করার জন্যই সরকার সম্পূর্ণ একটি বিপরীত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এখানে জমি মালিকানার সিলিং ১০০ বিঘা থেকে বাড়িয়ে ৩৭৫ বিঘা করা হল, যাতে জোতদারী শোষণের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলেও সরকারের সপক্ষে ভিন্ন একটি শ্রেণীর উত্থান ঘটতে পারে। কিন্তু কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণের কোন ব্যবস্থা না থাকায় এসব খামার মালিকগণ সম্পদ সৃষ্টির জন্য তেমন কোন প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ লাভ করতে সক্ষম হয় না। ফলে তৎকালীন সরকার উক্ত ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলে তার সমর্থক শক্তিশালী কোন শ্রেণী সৃষ্টি করতে পারেনি।

পাকিস্তানের উভয় অংশেই ধনী কৃষক বা পুঁজিবাদী খামার মালিকের পাশাপাশি আর যে সকল কৃষক জনগোষ্ঠী ছিল তাদেরকে সপক্ষে আনার জন্য আইয়ুব সরকারের কোন কর্মসূচী ছিলনা, বরং খাজনা ও করের পরিমাণ কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়ে উক্ত সরকার উভয় অঞ্চলের ছোট ও মাঝারি কৃষক পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নই হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণের ফলে উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ফলে তাদের পক্ষে বাড়তি খাজনা ও কর পরিশোধ করা সম্ভবপর হয়। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের সে অবস্থাটি ছিলনা, বরং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে অনেক সময়ই তাদের পাকা ফসল নষ্ট হত কিংবা চাষাবাদের ক্ষেত্রে মারাত্মক ধরনের বিঘ্ন সৃষ্টি হত। অন্যদিকে, ফসল ফলুক কিংবা না ফলুক প্রতিটি কৃষককে খাজনা ও করের দাবি নিয়মমত শোধ করতে হত; ফলে খাজনা দিতে ব্যর্থ লক্ষ লক্ষ কৃষকের জমির নামে সার্টিফিকেট মামলা জারি হত। আর এভাবে খাজনা ও কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কৃষকদের ওপর নির্মম আক্রমণ পরিচালনা করেছে।

আইয়ুব খানের শাসনামলে গণতন্ত্রের নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে দেশে ৮০ হাজার সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচক মন্ডলীর জন্ম দেওয়া হয়েছে এবং এদেরকে যাতে সন্তুষ্ট রাখা যায় তার জন্য ব্যাপক ওয়ার্কস কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। ওয়ার্কস কর্মসূচীর নামে যে শতশত কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে, তা ব্যয় করার দায়িত্ব উক্ত নির্বাচক মন্ডলীর হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। স্থানীয় আমলাদের সহযোগিতা ও দেখাশোনার দায়িত্ব থাকলেও এঅর্থ যথাযথভাবে খরচ করা হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ছিলনা। ফলে এঅর্থের এক বিরাট অংশই উক্তমৌলিক গণতন্ত্রী ও স্থানীয় আমলারা আত্মসাৎ করে। অন্যদিকে, মৌলিকগণতন্ত্রীদের সদস্যপদ থাকবে কি থাকবেনা সে ব্যাপারে জনসাধারণের কোন মতামতকে গ্রাহ্য না করে আমলাতন্ত্রের হাতে সমস্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়। আর তাই সরকারের পক্ষে আমলাতন্ত্রের দ্বারা খুব সফলভাবেই মৌলিক গণতন্ত্রীদের সমর্থনলাভের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। এজন্য,১৯৬৪ সালের মৌলিকগণতন্ত্রীদের নির্বাচনে বিরোধী দলসমূহ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে শতকরা ৮৫ জন আর পশ্চিম পাকিস্তানে শতকরা ৭০ জন সদস্য পাস করেও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এর বিশেষ কোন প্রতিফলন ঘটেনি। একদিকে, অধিক ক্ষমতা লাভের আশা এবং অন্যদিকে, আমলাতন্ত্র কর্তৃক যে কোন সময় পদচ্যুত হওয়ার আশংকা এই দুই অস্ত্র কাজে লাগিয়ে ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আমলাতন্ত্র আইয়ুব খানকে বিজয়ী করতে সক্ষম হয়। পরবর্তীকালে এই মৌলিক গণতন্ত্রীরা সরকারের স্থানীয় প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য হতে থাকে। একথা সত্য যে, এরা বিভিন্ন শ্রেণী থেকে এসেছিল, কিন্তু সরকারী সম্পদ আত্মসাতের সুযোগ ও স্থানীয় প্রশাসনের ক্ষমতা হাতে থাকায় এরা প্রায় প্রত্যেকেই খুব দ্রুত স্থানীয় ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সম্পদশালী ব্যক্তিতে পরিণত হয়। এদের মধ্যে যে কিছু ব্যতিক্রম ছিলনা তা নয়, কিন্তু এদের অধিকাংশই নিজেদের ক্ষমতাকে স্থায়ী করার লক্ষ্যে দুষ্ট প্রকৃতির লোকজনকে সংগ্রহ করে। এদের চারপাশে টাউট প্রকৃতির লোকজন জড় হয়। শুধু তাই নয়, চোর-ডাকাতসহ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অপরাধীরাও এদের কাছে ভীড় জমায়। এদের অনেকে আবার চোর-ডাকাতদের লালন করার ব্যাপারে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। ষাটদশকে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় এরা এই সুযোগ লাভ করে। ফলে সামাজিক অপরাধীরা তখন প্রবল পরাক্রমশালী হয়ে ওঠে। মৌলিকগণতন্ত্রীরা যেমন কোন নির্দিষ্ট সামাজিক শ্রেণীকে প্রতিনিধিত্ব করতো না, বরং সরকারের স্থানীয় প্রতিনিধি হিসাবে একটি বিশেষ সামাজিক বর্গ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, তেমনি তাদের অধীনস্থ উপরোক্ত দুষ্ট প্রকৃতির লোকদেরকেও নির্দিষ্ট কোন শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত করার উপায় ছিলনা। এরা মৌলিক গণতন্ত্রীদের নির্দেশে কিংবা সহযোগিতায় এমন কাজ করতো যার সাথে মৌলিক গণতন্ত্রী বা উক্তসামাজিক অপরাধীদের পারিবারিক শ্রেণী স্বার্থের কদাচিৎ সংগতি থাকত। এরা সবাই মিলে রাষ্ট্রের সমর্থক একটি বিশেষ সামাজিক বর্গের (catego ry) জন্ম দিয়েছিল। আর সে কারণেই এদের আনুকুল্য প্রাপ্ত চোর-ডাকাতদের দমন করার ক্ষেত্রে কোন কার্যকরী ব্যবস্থাই গ্রহণ করা যায়নি। ফলে সাধারণ মানুষের কাছে এদের অবস্থান হয়ে উঠেছে ভীতিকর ও আক্রমণাত্মক। কে ডাকাতি করেছে তা জেনেও কাউকে কিছু বলা সম্ভব ছিলনা। সে কারণে পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিরোধ বেশ কিছু পরিমাণে থাকলেও আমলাতন্ত্র ও সরকারের সহযোগী উক্ত বিশেষ অপরাধী সামাজিক গোষ্ঠীটি হয়ে ওঠে গ্রামীণ জনসাধারণের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। সে সময় অবশ্যই গ্রামাঞ্চলে জোতদারী শোষণ অব্যাহত ছিল, কিন্তু এই জোতদারীর সাথে যখন যুক্ত হয়েছে উক্ত নির্বাচক মন্ডলীর সদস্যপদ ও বিপুল পরিমাণ প্রশাসনিক ক্ষমতা তখন এরা নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠেছে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন যেসব শিল্প কিংবা বিভিন্ন সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা আমলাতন্ত্রের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠেছিল, সেসব প্রতিষ্ঠানে কিছু আত্মবিরোধ সৃষ্টি হয়। প্রধানতঃ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প-শ্রমিকদের সাথে আমলাতন্ত্রের বিরোধ মুখোমুখি পর্যায়ে উপনীত হয়, জীবন-জীবিকার সমস্যার কারণে শিল্পে নিয়োজিত নিম্নপদস্থ কর্মচারী, যথা সুপারভাইজর, টেকনিসিয়ান, কেরানী ইত্যাদির সাথেও আমলাতন্ত্রের বিরোধ স্পষ্ট হয়ে উঠে। সরকারী সংস্থা, যেমন রেল, ডাক ও তার জাতীয় সংগঠনে, যেসবে শ্রমিক বলতে যা বুঝায় সেরকম খুব বেশী লোক পাওয়া যাবেনা, কিন্তু জীবন-জীবিকার মানের দিক থেকে এ সকল সংগঠনের কর্মচারীর প্রধান অংশ প্রায় শ্রমিক শ্রেণীরই অনুরূপ।

উপরোক্তসকল সংস্থা ও সরকারী দপ্তরের নিম্নকর্মচারীগণ, যারা আমলাতন্ত্রের অধীনে থেকেও জীবন-জীবিকার মানের দিক থেকে প্রান্তিক অবস্থানে ছিল- এদের সাথে সৃষ্টি হয় আমলাতন্ত্রের একটি স্পষ্ট বিরোধ। এসব সরকারী-আধাসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত ও ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা, যারা নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়ায় মধ্যবিত্তের পর্যায় থেকে নেমে শ্রমজীবীর মত জীবনযাপনে বাধ্য, তারা উৎপাদনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে ঠিকই জড়িত থাকেনা, কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক পদমর্যাদার ক্ষেত্রে নিম্ন স্তরে থেকে নিগৃহীত হয়

Dhaka University Institutional Repository

এবং শ্রমের প্রকৃতিও বুদ্ধিমত্তার তুলনায় অধিক পরিমাণে দৈহিক। এরাই পাকিস্তানের সমাজ কাঠামোয় নব্য মধ্যবিত্ত হিসেবে তখন আবির্ভূত হচ্ছিল।।

সরকারী আমলাতন্ত্রের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিল্প বিকাশ শুরু হলেও এক পর্যায়ে একটি বিরাট ব্যক্তিগতখাত গড়ে ওঠে, যা আমলাতন্ত্রের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ব্যক্তিগতখাতে ছোট-বড় অসংখ্য অর্থযোগানদারী প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তারা আমলাতন্ত্রের সাথে দরকষাকষির কিছু ক্ষমতা অর্জন করে। তবে এদের সুষ্ঠু বিকাশের ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্র হয়ে ওঠে প্রধান বাঁধাস্বরূপ। তাই এক্ষেত্রে একটি বিরোধের বিকাশ ঘটে। শিল্পপতিদের আত্মবিকাশের এক পর্যায়ে কোন কোন ক্ষেত্রে তারা আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। এর ফলে আমলাতন্ত্র সৃষ্ট শিল্প ব্যবস্থায় একটি আত্মবিরোধের জন্ম হয়।

১৯৫৮ সালে সামরিকবাহিনী ক্ষমতা দখল করার পর আমলাতন্ত্রই সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা প্রয়োগের প্রধান বাহনে পরিণত হয়। সামরিক শাসকবর্গ একের পর এক যে দমনমূলক অধ্যাদেশ জারি করে তা বাস্তবায়নেরও দায়িত্ব আমলাতন্ত্রের ওপর বর্তায়। এসব অধ্যাদেশ জনসাধারণের ওপর রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে জারি করা হয়। ১৯৬২ সালের সংবিধানটি ছিল আসলে এসব অধ্যাদেশের একটি সমন্বিতরূপ। এসব অধ্যাদেশকে আইনে পরিণত করাই ছিল পার্লামেন্টের প্রধান কাজ। এক্ষেত্রে সামান্য বিরোধিতাও সহ্য করা হয়নি। সংবিধানে প্রেসিডেন্ট এবং গভর্ণরের পদকে এমনভাবে নিরাপদ করা হয়েছে যে, কখনও যদি শতকরা ১০০ ভাগ জাতীয় পরিষদ সদস্যও প্রেসিডেন্টের বিপক্ষে চলে যায় তাহলেও তার বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট নোটিশ প্রদানের কথা জানতে পারলেই তিনি জাতীয় পরিষদকে ভেঙ্গে দিতে পারতেন। প্রাদেশিক পরিষদকে ভেঙ্গে দেওয়ার জন্যও গভর্ণরের হাতে অনুরূপ ক্ষমতা সংরক্ষিত ছিল। এ ধরনের চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের হাতে থাকার কারণে তার মতের বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত জাতীয় পরিষদে গৃহীত হতে পারতো না, এমনকি তার জন্য কোন সাংবিধানিক সুযোগও ছিল না। নিরাপত্তা আইন বলে যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতারের ক্ষমতা পুলিসবাহিনীর ছিল। যেমন, যদিকোন পরিষদ সদস্যের বক্তব্যে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা সম্পর্কে জনমনে সন্দেহ দেখা দিত তাহলে তাকে নির্দ্বিধায় গ্রেফতার করা হত। ফলে সামরিক আইন সংক্রান্ত অগণতান্ত্রিক অধ্যাদেশগুলি যখন জাতীয় পরিষদে গৃহীত বিরোধীদলের সংখ্যালঘু সদস্যের মৃদু প্রতিবাদ করা ছাড়া আর কিছুই সম্ভব ছিলনা। সামরিক-বেসামরিক আমলা এবং সরকারের বশংবদ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত প্রায় অর্ধশত কমিশনে যৎসামান্য গণতান্ত্রিক বিধিবিধান ছিল, সেগুলিও কাট-ছাট করে এসব কমিশন রিপোর্ট জাতীয় পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়। একই পর্যায়ে দেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সাথে রাষ্ট্রের একটি প্রচন্ড দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং সাংবাদিকদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সামরিক শাসনের অধ্যাদেশগুলিকেও আইনে পরিণত করা হয়। এসব অগণতান্ত্রিক আইন-কানুন প্রায় সকল শিক্ষিত আইনজীবী গোষ্ঠীর বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দেয়। সত্য প্রকাশের চেয়ে সরকারের পক্ষে সাফাই গাওয়াই তখন সাংবাদিকদের মুখ্য কাজ হয়ে দাঁড়ায়। আর একারণে তাদের সৃজনশীল বিকাশের পথ বন্ধ হয়ে যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর গবেষণা, ডিপ্লোমা প্রদান ও কারিগরি শিক্ষাসহ সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। ফলে শিক্ষক ও ছাত্রের সাথে আমলাতন্ত্রের একটি মৌলিক বিরোধের জন্ম হয়। দেশের সমগ্র শিক্ষিত জনসমষ্টি এ দ্বন্দ্বের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। উক্ত শিক্ষিত জনসমষ্টির প্রধান অংশ তুরুণ ছাত্র সমাজ। ছাত্র সমাজের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, এমনকি রাজনৈতিক মতামত প্রকাশকে অধ্যাদেশ জারি করে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। ছাত্রদের ন্যায়-অন্যায়ের চেতনা প্রখর থাকা এবং সহজাত প্রতিবাদী প্রবণতার মূল কারণ হল-ছাত্র অবস্থায় এরা কোন উৎপাদন সম্পর্কে যুক্ত নয়, তারা সাধারণতঃ অর্থ উপার্জনের কাজেও নিয়োজিত থাকে না। সত্য নিষ্ঠা আর বিদ্যাঅর্জনই তাদের প্রধান কর্তব্য। সে কারণে তারা বিবেক দিয়ে নিরপেক্ষভাবে যেকোন বিষয়ে চিন্তা করতে পারে। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত ও দুঃখ বেদনা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ এই শিক্ষিত জনসমষ্টি স্বভাবতই খুব স্পর্শকাতর। শতকরা ৮০ ভাগ নিরক্ষর লোকের এই দেশে ছাত্ররাই প্রধান শিক্ষিত জনগোষ্ঠী। মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে অধ্যাদেশজারি করে ছিনিয়ে নেওয়ার ফলে শিক্ষিত তরুণ জনগোষ্ঠীর সাথে রাষ্ট্রের একটি বড় ধরনের বিরোধ দেখা দেয়। এ বিরোধ আরো তীব্রতর হয় যখন ছাত্র সমাজের একটি অংশকে নানারকম সুযোগ-সুবিধা ও আর্থিক আনুকূল্য প্রদান করে সাধারণ ছাত্রদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া হয়। রাষ্ট্র যে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ছাত্রদের মুখ বন্ধ করে দিতে চায় একথাটি যখন ছাত্র সমাজের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে তখনই রাষ্ট্রের সাথে তাদের বিরোধটি প্রকট রূপ ধারণ করে।

১৯৫৮ সালে সামরিকবাহিনী ক্ষমতা দখল করলেও সামরিক শাসন প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর সামরিকবাহিনী কার্যত সেনানিবাসে চলে যায়। সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরে যাবার পর জনসাধারণের সঙ্গে তার বিরোধের রূপগুলি পরোক্ষ হয়ে পড়ে। তখন আইয়ুব খান সামরিক বাহিনীর একমাত্র প্রতিনিধিতে পরিণত হন। অন্যদিকে, আইয়ুবের অগণতান্ত্রিক নীতিসমূহ কার্যকরী করতে আমলাতন্ত্র যে গণনির্যাতনের পথ বেছে নিয়েছিল, সামরিকবাহিনী সে গণনির্যাতনের দায় ভাগ কাঁধে নিতে চায়নি। এছাড়া, রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে আমলাতন্ত্র দুর্নীতির মাধ্যমে সরকারের পক্ষে সামাজিক শক্তি সৃষ্টির যে উদ্যোগ গ্রহণ করে তার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করাও সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তির জন্য সহায়ক ছিল না। মাঝখানে ছিলেন আইয়ুব খান, শাসনতান্ত্রিক প্রধান হিসাবে তিনি সবকিছুর মূল ব্যক্তিত্ব এবং সে অর্থে তিনি আমলাতন্ত্রেরও শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত। ফলে আমলাতন্ত্রের সাথে সেনাবাহিনীর বিরোধই আইয়ুবের সাথে সেনাবাহিনীর বিরোধে পরিণত হয়। এবিরোধের কারণেই সামরিকবাহিনী আইয়ুবের দমন-পীড়নের বিরোধিতা না করলেও জনসাধারণের রুদ্ররোষ থেকে তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিলনা।

এভাবে ষাট দশকের শেষ পর্যায়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র যে অবস্থায় উপনীত হয় তার সংক্ষিপ্ত রূপ নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

১. বৃহৎ শিল্পপতি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিবাদী ও জোতদারী খামার মালিকরাই ছিল আইয়ুব সরকারের মূল শ্রেণীভিত্তি। পূর্ব পাকিস্তানের বাংগালী জনগোষ্ঠীর মধ্যে তার কখনও কোন শ্রেণীভিত্তি গড়ে ওঠেনি। পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলের অবাঙ্গালী শিল্পপতি শ্রেণীই তার প্রধান ভিত্তি হলেও তা ক্রমাগত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে সরে আসা তথা আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হওয়ার ফলে রাষ্ট্রের সাথে এদের বন্ধন শিথিল হয়ে যায়।

২. আমলাতন্ত্রই ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার একমাত্র মাধ্যম। সামরিক শাসন জারি করার পর যেমন রাষ্ট্রের একমাত্র উপাদন হয়ে ওঠে সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্র , তেমনি প্রত্যক্ষ সামরিক শাসন প্রত্যাহারের পর প্রতিষ্ঠিত নামমাত্র আইন পরিষদের কোন ক্ষমতা ছিল না। অধিকন্তু, সামরিকশাসনামলে অধ্যাদেশ প্রদানসহ সকল ক্ষেত্রে সামরিকবাহিনী ছিল মূল নীতি নির্ধারক। কিন্তু সামরিক শাসন অবসানের পর প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের ওপর নীতিনির্ধারণের সকল দায়িত্ব এসে পড়ে, যা আমলাতন্ত্রের

Dhaka University Institutional Repository

দ্বারা কার্যকরী করা হয়। ফলে পকিস্তান রাষ্ট্র ক্রমাগত একটি আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। কিন্তু যেহেতু এরাষ্ট্রের অস্তিত্বের একমাত্র শর্ত সামরিক বাহিনীই সৃষ্টি করেছিল সেহেতু এ রাষ্ট্রকে 'আমলাতান্ত্রিক' না বলে 'সামরিক আমলাতান্ত্রিক' বলাই অধিকতর যুক্তিসংগত। তবে সশস্ত্রবাহিনী এ রাষ্ট্রের বর্ম হলেও আমলাতন্ত্র কর্তৃক দীর্ঘ দমনমূলক শাসনের পর দেশের ব্যাপক জনসাধারণের কাছ থেকে রাষ্ট্র যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং তার অস্তিত্বের আর কোনই অর্থ থাকেনা, তখন রাষ্ট্রের শাসন বিভাগের সাথে সামরিক বাহিনীরও দূরত্ব সৃষ্টি হয়। ফলে বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখে আইয়ুব খানের নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রের শাসন বিভাগের পক্ষে সেনা বাহিনীকে কাজে লাগানো কঠিন হয়ে পড়ে। এ প্রেক্ষাপটে বাঙ্গালীর জাতীয় প্রশ্ন পাকিস্তানী আমলাতন্ত্রের শক্তিকে দুর্বল করে দেয়।

৩. আইয়ুব শাসনের শেষ দিকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের পক্ষে যে সামাজিক শক্তি বিন্যাসটি বিদ্যমান ছিল তা হচ্ছেঃ রাষ্ট্রের মূল শক্তি সামরিকবাহিনী ও বেসামরিক আমলাতন্ত্র; তার শ্রেণী ভিত্তি হচ্ছে দেশের উভয় অঞ্চলের বৃহৎবুর্জোয়া এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহৎ পুঁজিবাদী খামার মালিক। এছাড়া ছিল বৃহৎ পুঁজিপতি শ্রেণীর ওপর নির্ভরশীল গণবিচ্ছিন্ন সরকার দলীয় কতিপয় নেতা, তাদের আশ্রিত বাহিনী, মৌলিকগণতন্ত্রীগণ এবং তাদের অধীনস্থ স্বার্থান্বেষী মহল ও তবযুরে লোক। পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অপরাধীরাও মৌলিক গণতন্ত্রীদের পরোক্ষ সহযোগী হিসাবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সহায়ক শক্তিতে পরিণত হয়।

৪. আইয়ুব আমলের শেষদিকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিপক্ষে যে শ্রেণী কাঠমোটি বিকাশ লাভ করে তার প্রধান অংশ ছিল মধ্যবিত্তশ্রেণী। তরুণ ছাত্রদের পাশে নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুগপৎ অবস্থান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রাধান্যকে নিশ্চিত করেছিল। শিক্ষক ও সাংবাদিকসহ সমগ্র বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর সমাবেশ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শক্তির ভারসাম্যকে আরো গভীরতা দান করে। এর পরেই যে শ্রেণীটি তৎকালীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল তারা হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণী। যদিও পশ্চিম পাকিস্তানে অভিজাত শ্রমিকদের উত্থান যেমন শ্রমিকদের শ্রেণী ঐক্যকে দুর্বল করে, তেমনই পূর্ব পাকিস্তানের শ্রমিকদের মধ্যে বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী বিরোধ ও তাদের শ্রেণী ঐক্যকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। তা সত্বেও রাষ্ট্র বিরোধী শক্তি হিসাবে এদের যুগ্ম অবস্থান ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া বৃহৎ পুঁজির প্রভাব বলয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বিকাশমুখী ছোট ও মাঝারি পুঁজির মালিকরাও তৎকালীন রাষ্ট্রের বিপক্ষে চলে যায়। তবে পশ্চিম পাকিস্তানে বড় পুঁজির সাথে ছোট ও মাঝারি পুঁজির দ্বন্দ্ব শ্রেণী বিরোধ হিসাবে বিদ্যমান, পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে তা জাতীয় বিরোধে পরিণত হয়। আমলাতন্ত্রের কাছে পদানত পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাক্তন বৃহৎ ভূস্বামী শ্রেণীও রাষ্ট্রের বিপক্ষে চলে যায়। পূর্ব পাকিস্তানের পশ্চাৎপদ কৃষি ব্যবস্থার সাথে যুক্ত আমলাতন্ত্রের দ্বারা নিগৃহীত প্রায় সমগ্র কৃষক জনগোষ্ঠী রাষ্ট্রের বিরোধী শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। অন্যদিকে রাষ্ট্রের প্রচলিত নিয়ম-কানুন পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামীণ জোতদার শ্রেণীর আধিপত্যমূলক অবস্থানকে অনুমোদন করলেও এটি রাষ্ট্রের সম্ভাব্য সামাজিক শক্তি হিসাবে পুরোপরি আবির্ভূত হতে পারেনি কিংবা রাষ্ট্র বিরোধী একটি অখন্ড শ্রেণী হিসাবেও দাঁড়াতে সক্ষম হয়নি। এরা বরং নিরপেক্ষ থেকে গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর রাষ্ট্র বিরোধী অপরাপর শ্রেণীর সুস্পষ্ট অবস্থানকে দুর্বল করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৫. পাকিস্তান রাষ্ট্রটি আপেক্ষিকভাবে শ্রেণী নিয়ন্ত্রণমুক্ত ছিল। আসলে সেখানে এমন কোন শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না, যা রাষ্ট্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। বৃহৎ শিল্পপতি ও পুঁজিপতি খামার মালিক নামক যে শ্রেণী দুটির উদ্ভব ঘটেছিল তাদের বিকাশ রাষ্ট্রের সহযোগিতার উপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিল। ফলে রাষ্ট্র এ'দুটি শ্রেণীর ওপর মোটেই নির্ভরশীল ছিল না; বরং তারা রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় বিকশিত হয়।

সে যা হোক, পাকিস্তান রাষ্ট্র তার অস্তিত্বের কারণেই তার পক্ষের শ্রেণীসমূহকে সহযোগিতা করতো এবং তার সাথে বিরোধের প্রকৃতি অনুযায়ী অন্যান্য শ্রেণীসমূহের বিপক্ষে দাঁড়াতো।

সেনাবাহিনীর শক্তির ওপর নির্ভরশীল পাকিস্তান রাষ্ট্রের সংবিধান মোতাবেক যে জাতীয় পরিষদ বা প্রাদেশিক পরিষদ গড়ে উঠেছিল সেসবের নিজস্ব কোন ক্ষমতা ছিল না। ফলে রাষ্ট্র পরিচালনায় পার্লামেন্টের যে ভূমিকা থাকে তা এক ব্যক্তি তথা আইয়ুব খানের একক ভূমিকায় পর্যবসিত হয়। আর যেহেতু আইয়ুব খানের শক্তির মূল উৎস ছিল সেনাবাহিনী সেহেতু পাকিস্তান রাষ্ট্র পরিপূর্ণভাবেই সামরিক আমলাতান্ত্রিক চরিত্র অর্জন করে, যেখানে জনসাধারণের কোন অবস্থানই ছিলনা।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, ষাট দশকের শেষে পাকিস্তান রাষ্ট্রের শ্রেণী ভিত্তির মূলে ছিল গ্রাম ও শহরের ধনবাদী শ্রেণী, যা সমাজতান্ত্রিক চেতনা বিকাশের সহায়ক বলে মনে হতে পারে। এরূপ একটি সামরিক-আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অধীনে যে ধরণের রাজনীতির বিকাশ ঘটা সম্ভব ছিল এবং যেরকম সামাজিক আন্দোলনের জন্ম হতে পারে তার সাথে বিভিন্ন শ্রেণীর বাস্তব আন্দোলনের কতখানি সংগতি ছিল তা পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তবে যে পটভূমিতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছিল তা স্পষ্ট করার জন্য পূর্বোক্ত আলোচনার পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে পাকিস্তানী রাজনীতির উত্থান-পতনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বাস্তব আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিক বিশ্লেষণ অপরিহার্য।

Dhaka University Institutional Repository

৮. ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানঃ রাজনৈতিক আন্দোলনের বিকাশ ধারা পর্যালোচনা

আগের দু'টি অধ্যায়ে এ কথা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে যে, জন্মলগ্ন থেকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রটি আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে আত্ম প্রকাশ করে এবং শেষ পর্যায়ে এসে তা স্পষ্ট সামরিক আমলাতান্ত্রিক চরিত্র অর্জন করে। আধুনিক ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক উপাদানসমূহের আর প্রায় কোন অবশেষ থাকে না। রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে গড়ে তোলা হয় রাষ্ট্রের অধীনস্থ ও নিয়ন্ত্রিত কয়েকটি শ্রেণী কিন্তু এ শ্রেণীগুলির মধ্যে যাদের কিছুটা অর্থনৈতিক ভিত্তি তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল তাদের সবারই কেন্দ্র ছিল পশ্চিম পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তানে রাষ্ট্রের অনুগত যে গোষ্ঠীগুলির জন্ম হয়েছিল তাদের কারো তেমন কোন অর্থনৈতিক অবস্থা শক্তিশালী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি - রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সহযোগীতার মাধ্যমে শুধু তারা কিছু বাড়তি অর্থ ও ক্ষমতা হস্তগত করে।

উক্ত অধ্যায় দু'টিতে এ কথা আরো পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে, গোড়া থেকেই পাকিস্তান ছিল একটি গণনির্যাতনকারী রাষ্ট্র এবং ক্রমে তার এ চরিত্র প্রবল রূপ লাভ করতে থাকে। এক পর্যায়ে সমস্ত আবরণকে ঝেড়ে ফেলে রাষ্ট্র তার শক্তি প্রয়োগের মূল উপাদানকে তথা সেনা বাহিনীকেই সামনে এনে ফেলে। রাষ্ট্রের ওপর গণতান্ত্রিক খোলস প্রদানের জন্যও কোন চেষ্টা করা হয়নি, বরং উপর থেকে সেনাবাহিনীর ক্ষমতাকে প্রয়োগ করে কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষমতাকে ভাগাভাগি করে ভোগ করার জন্যই বেসামরিক আমলা ও গণবিচ্ছিন্ন কিছু রাজনেতিক ব্যক্তিত্বকে টেনে আনা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে এমন সব ব্যক্তিত্বকেই টেনে আনা হয়েছে যাদের দ্বারা জনগণের ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা আরো গভীরতর হতে পারে। ফলে পুরো পাকিস্তান আমল জুড়েই রাজনৈতিক বিকাশ ধারা বলতে যা ছিল তার চেয়ে আরো গভীরতরভাবে বিদ্যমান ছিল রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান হারে শক্তি অর্জনের প্রক্রিয়া। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঊনসত্তরের মত একটি ব্যাপক গণঅভ্যুত্থান আপনা-আপনি ঘটেনি: তার পিছনে ছিল একটি রাজনীতি ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্রমবর্ধ্যমান বিকাশধারা।

৮.১ রাজনৈতিক সংকটের পটভূমি

একথা খুবই সুবিদিত যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যবদ্ধ জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশী অবদান রেখেছিল তাদের মধ্যে বাংলার মুসলমানরা ছিল অন্যতম এবং পাকিস্তান আন্দোলন যদি কোথাও গণদাবীতে পরিণত হয়ে থাকে তাহলে একমাত্র বাংলায়তা হয়েছিল। তবে পাকিস্তান দাবী গণদাবীতে পরিণত হওয়ার প্রশ্নে যে সকল কারণ বিশেষভাবে ভূমিকা পালন করেছিল সেসবের মধ্যে পূর্ব বাংলায় ইসলাম ধর্মের ভূমিকা ছিল সামান্যই; বরং এর চেয়ে অনেক বড় ভূমিকা পালন করেছিল পূর্ব বাংলার কৃষক সমাজ ও বিকাশমান মুসলিম মধ্যবিত্তের শ্রেণীগত আকাংখা। কেননা, তাদের মধ্যে এসময় শক্তিশালী হিন্দু জমিদার শ্রেণী ও অগ্রসর হিন্দু মধ্যবিত্তদের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হওয়ার এক প্রবল প্রত্যাশার জন্ম হয়।[১] মুসলিম লীগের দ্বিজাতিতত্ত্ব ভারতবর্ষকে দ্বিখন্ডিত করার দাবীকে ন্যায্যতা দিয়েছিল সত্য, কিন্তু সে 'তত্ত্বের' আবেদন বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের কাছে যতটা 'জাতিগত' দাবী হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছিল তার চেয়ে জোরালো ভাবে উথাপিত হয়েছিল আধিপত্যকারী জমিদার শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হওয়ারশ্রেণীগত আকাংখা। এখানেই ছিল সর্বভারতীয় মুসলমান সমাজের পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ থেকে বাঙালী মুসলমানদের পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণের মধ্যে মূল পার্থক্য। এ বিষয়টি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কিংবা আবুল হাসিমের মত জনপ্রিয় নেতাদের পক্ষেও উপলব্ধি করা সম্ভব হয়নি। আর তাইতো তাঁরা অখন্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার দাবী এমন ভাবে তুলেছিলেন যা, পাকিস্তান দাবীর যৌক্তিকতাকে প্রশ্নের সম্মুখীন করেছিল। এ কারণেই হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাসিমের প্রচন্ড জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও তাঁদের সে দাবী জনসাধারনের মধ্যে বিশেষ কোন সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়নি।[২] উপরোক্ত ইসলামী জাতীয়তাবাদকে যাঁরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূল অস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন সেই সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্র অনুগত দুর্বল ব্যক্তিত্ব মওলানা আকরম খাঁ ও খাজা নাজিমুদ্দীনের হাতে বাংলা মুসলিম লীগের নেতৃত্ব কুক্ষিগত হল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কিছু আগে থেকেই সর্বভারতীয় মুসলিমলীগ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে বাংলা মুসলিম লীগে রক্ষণশীল ইসলামী জাতীয়তাবাদীদের প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা চালানো হয় এবং ১৯৪৬ সালের গণভোটের পর খাজা নাজিমুদ্দীনকে নেতা নির্বাচনের মাধ্যমে তা' সমাপ্ত হয়।[৩] ইতিপূর্বে মওলানা আকরম খাঁনের বাংলা মুসলিম লীগের সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ ও এ পদ নিয়ে বাংলার তিন জনপ্রিয় নেতা, যথাক্রমে ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাসিমের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং মওলানা আকরম খাঁনের পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের মধ্যদিয়ে উপরোক্ত তিন নেতার মধ্যে মনোমালিন্য চূড়ান্তরূপ নেয়।[৪] এ ঘটনাগুলিই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাংলার নেতৃবৃন্দের পক্ষে সরকার ও মুসলিম লীগ দলের নেতৃত্বকে কুক্ষিগত করতে বিশেষভাবে সহায়তা করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিম পাকিস্তানের শক্তিশালী ভূমি অভিজাত শ্রেণী এবং ভারত প্রত্যাগত মুসলমান মধ্যবিত্ত ও শিল্পপতি-ব্যবসায়ী শ্রেণীর হাতে মুসলিম লীগের নেতৃত্ব কুক্ষিগত হয়। অন্যদিকে, আগের আলোচনাতেই দেখা গেছে, ঔপনিবেশিক আমলের অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী আমলাতন্ত্র সদ্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে। যতদিন জিন্নাহ্ কিংবা লিয়াকত আলী খান বেঁচে ছিলেন ততদিন আমলাতন্ত্র ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে একটি ভারসাম্যমূলক অবস্থা বজায় ছিল, কিন্তু তারপর থেকে পাকিস্তান রাষ্ট্র ক্রমাগত আমলাতন্ত্রের করতলগত হতে থাকে। ফলে দৈনন্দিন জনজীবনের ওপর গণনির্যাতন তীব্রতর হতে থাকে। অপরদিকে, কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ নেতৃত্বের সমর্থনে পূর্ব বাংলার রক্ষণশীল মুসলিম লীগ নেতৃত্ব ভিন্ন মতাবলম্বীদের জন্য মুসলিম লীগের দরজা বন্ধ করে দেয়। ভিন্ন মতাবলম্বীদের সায়েস্তা করার জন্য গুন্ডাবাহিনী গড়ে তোলা হয়। সেই সাথে কমিউনিস্ট রাজনীতিবিদদের হঠকারী রাজনৈতিক কৌশলের সুযোগে পাকিস্তান রাষ্ট্র সকল বামপন্থী কর্মীদের ওপর চরম নির্যাতন শুরু করে। সংবিধান বিষয়েও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে ক্ষুন্ন করা হয়, পূর্ব বাংলার ওপর অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয় উর্দু-ভাষা।[৫] এভাবে বিভিন্ন উপায়ে পাকিস্তান

---

[১] রহমান, আতিউর ও লেনিন আজাদ (১৯৯০): <u>ভাষা-আন্দোলনঃ অর্থনৈতিক পটভূমি</u> ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউ,পি,এল), পৃ.৮৬-৮৯।

[২] প্রাগুক্ত, পৃ-৮৯।

[৩] Sen, Rangalal (1986): <u>Political Elites in Bangladesh</u> Dhaka: UPL, p.65.

[৪] আকাশ, এম,এম (১৯৯০): <u>ভাষা আন্দোলনঃ শ্রেণীভিত্তি ও রাজনৈতিক প্রবণতাসমূহ</u> ঢাকাঃ ইউ,পি,এল, পৃ.৩২।

[৫] উমর, বদরুদ্দীন (১৯৮৫): <u>পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি</u> তৃতীয় খন্ড, ঢাকা: বইঘর, পৃ.৪৮৬-৪৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাপালনকারী পূর্ব বাংলার জনগণের আত্মমর্যাদাকে আহত করা হয়। আর এভাবেই বাঙালী তার আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মাইল ফলক হিসাবে খ্যাত ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে শরিক হয়। এ আন্দোলনের সফল পরিসমাপ্তির মধ্য দিয়ে বাঙালী জাতি তার স্বাধিকারের প্রশ্নটিকে একটি রাজনৈতিক দাবী হিসাবে উপস্থাপণ করতে সক্ষম হয়। আর সেই সাথে গড়ে উঠে এক দুর্ভেদ্য জাতীয় ঐক্য। জাতীয় ঐক্যের প্রতীক হিসাবে উথাপিত হয় ঐতিহাসিক একুশ দফা, যাকে সামনে রেখে তৎকালীন মুসলিম লীগ বিরোধী প্রায় সকল দল ঐক্যবদ্ধ হয়।[৬] উক্ত একুশ দফা কর্মসূচীতে কৃষক ও মধ্যবিত্তের বিভিন্ন শ্রেণীগত দাবী যেমন ছিল তেমনই ছিল কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দাবী। একুশ দফার মধ্যে বাঙালী জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সহায়ক যেসব দাবী সন্নিবশিত হয়েছিল সেসব হচ্ছে:

-- বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে হবে এবং বাঙালীদের মাতৃভাষা বাংলাকে তা পূর্ববঙ্গের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে (১ ও ১০ নং দফা)।

-- প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নীতি এবং মুদ্রা- এই তিনটি বিষয় থাকবে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। অবশিষ্ট সকল ক্ষমতা ও বিষয় থাকবে পূর্ব বাংলা সরকারের হাতে। (১৯ নং দফা)।

-- পূর্ব পাকিস্তানে নৌ-বাহিনীর হেডকোয়ার্টার স্থাপন এবং অস্ত্র তৈরির কারখানা নির্মাণ করতে হবে, আনসার বাহিনীকে সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা হবে; এইভাবে পূর্ব বাংলাকে আত্মরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা হবে (১৯ নং দফা)।[৭]

-- এছাড়া, উক্ত ২১ দফার অন্তত: ৫টি দফার মধ্যে বিভিন্ন রকম গণনির্যাতনমূলক অধ্যাদেশ ও আইনসমূহকে বাতিল করার কথা বলা হয়। এভাবেই তৎকালীন অত্যাচারী মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্য গড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় একটি কর্মসূচী তৈরি হয়। যার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে ঐতিহাসিক যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ব্যাপক ঐক্য। এর ফলেই ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ দলের ভরাডুবি হয়। ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে মাত্র ৯টি আসন লাভ করতে সক্ষম হয় মুসলিম লীগ, বাকি আসনগুলির মধ্যে ২১৫টি আসন লাভ করে যুক্তফ্রন্ট, খিলাফতে রব্বানী দল পায় ১টি আসন এবং ১২টি আসন লাভ করে স্বতন্ত্র সদস্যরা।স্বতন্ত্র সদস্যদের মধ্যে ৮ জন নির্বাচনের পর যুক্তফ্রন্টে যোগদান করে। এছাড়া, ৭২ জন সংখ্যালঘু সদস্যের মধ্যে ৬৮ জন যুক্তফ্রন্টকে সমর্থন করে।[৮] সব মিলিয়ে যুক্তফ্রন্ট ৩০৯টি আসনের মধ্যে ২৯১টি আসনের সমর্থন লাভ করে। আর ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ দল মাত্র ১০টি আসনের সমর্থন পায়। পূর্ব বাংলার সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের এ ধরনের আশাতীত ফল লাভ করার পিছনে ২১ দফা কর্মসূচীর অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু এ দফার মধ্যে ছিল কিছু দুর্বলতা, যার কারণে পরবর্তীকালে বেশ কিছু অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে। এ দুর্বলতাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, এ কর্মসূচীতে সমাজব্যবস্থার কোন সুনির্দিষ্ট রূপ নির্দেশিত হয়নি। সরকার ব্যবস্থা তথা সংবিধান বিষয়েও কোন সুনিদিষ্ট কথা বলা হয়নি। পার্লামেন্টারী সরকার হবে, না প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার হবে, সে সর্ম্পকে কিছু বলা হয়নি। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হবে না ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র হবে সে সর্ম্পকে এখানে তেমন কিছু বলা হয়নি। কোরান ও সুন্নার মৌলিক নীতিকে সরকারী নীতির ভিত্তি হিসাবে এখানে গণ্য করা হয়। এ কর্মসূচীর সবচেয়ে বড় যে দুর্বলতাটি ছিল তা হচ্ছে বৈদেশিক নীতি সর্ম্পকে এখানে কিছুই বলা হয়নি। বিশেষত: যে সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধংদেহী মনোভাবের কারণে সারা বিশ্বে উত্তেজনা শুরু হয়েছিল, নতুন নতুন সামরিক চুক্তি করে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলকে মার্কিন তার যুদ্ধ পরিকল্পনার অংশে পরিণত করে চলেছিল। এসব সামরিক জোটে পাকিস্তানের যোগদানের সম্ভাবনা সর্ম্পকে পূর্ববঙ্গে ও পশ্চিম পাকিস্তানে এবং এমনকি খোদ আমেরিকার একাধিক সংবাদপত্রে খবরা-খবর প্রকাশিত হয়েছিল। সে সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকজন উচ্চপদস্থ নেতাও ঘন ঘন পাকিস্তান সফরে এসেছিলেন।[৯] কিন্তু তা সত্ত্বেও উক্ত ২১ দফাতে সে সর্ম্পকে কোন কিছু উল্লেখ করা হয়নি।

উপরোক্ত দুর্বলতাসমূহের মূলে ছিল তৎকালীন আওয়ামী মুসলীগের নিজস্ব কর্মসূচী। আওয়ামী মুসলিম লীগের ৪২ দফা কর্মসূচী প্রণেতা আবুল মনসুর আহমদ নিজেই প্রস্তাবিত কর্মসূচী প্রণয়ন করেন এবং উক্ত ৪২ দফা দাবীসমূহকে ২১ দফার মধ্যে সংযোজিত করেন।[১০] এ ব্যাপারে তৎকালীন কমিউনিস্টপার্টির দায়িত্বও কম ছিলনা, কেননা ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ বিরোধী সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা কমিউনিস্টপার্টিই প্রথম অনুভব করে এবং ব্যাপক ভিত্তিক গণঐক্যের আহবান তাঁরাই প্রথম জানায়।[১১] কিন্তু সেখানেও তাঁরা ধর্মনিরপেক্ষতা, নির্বাচন পদ্ধতি, সরকার পদ্ধতি কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যবাদ বিরোধী কোন আওয়াজ তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। এ সব বিষয়ে কোন বিতর্ক ছাড়াই ২১ দফা রচিত হয়। ফলে নিজাম-ই-ইসলামীর মত একটি প্রগতি বিরোধী দলও যুক্তফ্রন্টের অর্ন্তভুক্ত হয়। নিজাম-ই-ইসলাম ফজলুল হকের কৃষক-শ্রমিক পার্টির সাথেও এমন একটি সমঝোতায় আসতে সক্ষম হয় যে, এরা ফ্রন্টে আসার ফলে কমিউনিস্ট পার্টির সেখানে থাকা অসম্ভব হয়ে ওঠে। কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও নেজাম-ই-ইসলাম পার্টি ১৯৫৩ সালের ২৮ ডিসেম্বর ১০ দফা নামে একটি প্রগতি বিরোধী চুক্তি সম্পাদন করে। এ ১০ দফার মূল কথাগুলি হচ্ছে: পাকিস্তানের ঐক্য, নিরাপত্তা ও সংহতির মূল ভিত্তি ও আদর্শ হিসাবে দ্বিজাতি তত্ত্ব হবে সকল তৎপরতার প্রধান লক্ষ্য, ফলে এই মূল আদর্শের পরিপন্থী কোন মত ও পথকে কোনক্রমেই সমর্থন করা হবেনা; ওলামা কনভেনশনের প্রস্তাব ও সুপারিশের আলোকে এবং পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর নির্দেশের ভিত্তিতে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনার প্রচেষ্টাগ্রহণ; শরীয়ত বিরোধী প্রচলিত সকল আইন বাতিল এবং কোরআন ও সুন্নাহভিত্তিক আইন প্রণয়ন; চুক্তিবদ্ধ কোনো দলের পূর্বে-গৃহীত কোনো প্রস্তাব, ঘোষণা রা বিবৃতিতে যদি ওপরে বর্ণিত শর্ত-বিরোধী কোনো বক্তব্য থেকে থাকে, তাহলে সংশ্লিষ্ট দলটিকে আট দিনের মধ্যেই তা বাতিল করতে হবে এবং

---

৬ সে সময় পূর্ব বাংলায় সরকারী বিরোধী রাজনৈতিক দল ছিল মোট ৭টি। সেগুলি হচ্ছে: আওয়ামী লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি, গণতন্ত্রী দল, নেজাম-ই-ইসলাম, কংগ্রেস এবং তফসীলী ফেডারেশন। (খোকা রায় (১৯৮৬): সংগ্রামের তিন দশক ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, পৃ-১২২)। এছাড়াও ছিল আবুল হাসিমের নেতৃত্বাধীন খেলাফতে রব্বানী পার্টি নামের একটি ইসলামী দল। এ দলগুলি মধ্যে যুক্তফ্রন্টভূক্ত রাজনৈতিক দলগুলি হচ্ছে: আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি নিজাম-ই-ইসলাম পার্টি ও গণতন্ত্রী দল। অবশ্য যুবলীগ পরিপূর্ণ একটি রাজনৈতিক দল না হলেও যুক্তফ্রন্টের অংশীদার রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। (Sen, op.cit., p.125)

৭ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৮২): বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: প্রথম খন্ড, ঢাকা: তথ্য মন্ত্রনালয়, পৃ-৩৭৩-৭৪।

৮ Sen, Rangalal, op.cit., p.124.

৯ রায়, খোকা (১৯৮৬): পাগুক্ত, পৃ-১২৬

১০ আহমদ, আবুল মনসুর (১৯৬৮): আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, পৃ-২৫৪-৫৫।

১১ রায়, খোকা, প্রাগুক্ত, পৃ-১২২-২৩।

Dhaka University Institutional Repository

এখানে স্বাক্ষরিত চুক্তির প্রতি আনুগত্য স্থাগন করে দলীয় বক্তব্য সংশোধন এবং সেই আলোকে নির্বাচনী ঘোষণা প্রকাশ করতে হবে, ইত্যাদি।[১২] অর্থাৎ মাত্র ৩ সপ্তাহ আগে ফজলুল হক আওয়ামী মুসলিম লীগের সাথে যে ২১দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার জন্য চুক্তিবদ্ধ হন, নেজাম-ই-ইসলামের সাথে এ ধরনের একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার মধ্যদিয়ে সে চুক্তিকে মূল্যহীন করে তোলেন। আর তাইতো, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পর পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনসহ বিভিন্ন প্রশ্নে নেজাম-ই-ইসলাম যখন পূর্ব বাংলার স্বার্থবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা উত্তর দিতো, ২১-দফার ব্যাপারে তাদের কোন অংগীকার নেই, তারা কেবল ১০-দফা বাস্তবায়নেই চুক্তিবদ্ধ।[১৩] নিজাম-ই-ইসলাম ফ্রন্টে যোগদানের পূর্বশর্ত হিসাবে দাবী করে যে, যুক্তফ্রন্টে কমিউনিস্ট পার্টিকে রাখা চলবে না।[১৪] যুক্তফ্রন্টের সাথে কমিউনিস্ট পার্টি না থাকলেও গণতন্ত্রী পার্টি, যুবলীগ ও আওয়ামী মুসলিম লীগে বিপুল সংখ্যক কমিউনিস্ট সভ্য কাজ করতেন। ফলে যুক্তফ্রন্টের সাথে দলগতভাবে না থাকলেও কমিউনিস্ট পার্টি যুক্তফ্রন্টেরই অংশ হিসাবে কাজ করতে থাকে। আওয়ামী মুসলিমলীগ, কমিউনিস্ট পার্টি, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ণের হাজার হাজার কর্মী এবং অগনিত সাধারণ যুবক যুক্তফ্রন্টের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারে নেমে পড়ে। সেই সাথে বাংলার তিন জনপ্রিয় নেতা ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানীর নির্বাচনী প্রচারে যুগপদৎ অংশগ্রহণের ফলে গ্রাম ও শহরের শ্রমজীবী মানুষসহ সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে গণজাগরণ সৃষ্টি হয়। যুক্তফ্রন্টের আহবানে শহর ও গ্রামের দরিদ্র মহিলাদের মধ্যেও অভূতপূর্ব সাড়া জেগেছিল। ১৫/১৬ মাইল পথ স্বতর্স্ফূতভাবে হেঁটে এসে তাঁরা ভোট কেন্দ্রের দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করেছিল।[১৫] আদমজী, বাওয়ানী, দাউদ ইত্যাদি বৃহৎ পুঁজিপতিগণ মুসলিম লীগের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগীতা করে। তাদের কাছ থেকে পাওয়া হাজার হাজার টাকা যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে খরচ করা হয়। নানা ধরনের অপপ্রচার ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ চালানো হয়। কিন্তু গণজোয়ার এসব কিছুকেই ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এরকম একটি পর্যায়ে মুসলিম লীগ সরকার দিশেহারা হয়ে নির্বাচনের সপ্তাহ খানেক আগে সকল বিরোধী দলের কর্মীদের ওপর পুলিশী হামলা চালায় এবং সহস্রাধিক কর্মীকে নির্বাচন পর্যন্ত আটক করে রাখে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসলিম লীগ শেষ রক্ষা করতে পারেনি; যুক্তফ্রন্ট শুধু শতকরা ৯৮তাগ আসনই দখল করেনি, প্রায় শতকরা ৯৭ ভাগ ভোটও লাভ করে।

যুক্তফ্রন্টের এ ব্যাপক বিজয় সত্ত্বেও, তা বেশী দিন ধরে রাখা যায়নি। এর পিছনে মূল কারণ ছিল ফ্রন্টভুক্ত দলসমূহের লক্ষ্যাদর্শের মধ্যে ব্যাপকতর অনৈক্য। যে কয়টি জায়গায় ফ্রন্টভুক্ত প্রার্থী ও তাদের সমর্থকদের পরাজয় ঘটেছিল তার পিছনেও কারণ ছিল এ অনৈক্য। কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষতঃ কমিউনিস্ট প্রার্থীদের বিপক্ষে ফ্রন্টভুক্ত দলগুলিই নামে বেনামে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে দেয়।[১৬] অনৈক্যের প্রকৃতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আবু জাফর শামসুদ্দীন তাঁর আত্মস্মৃতিতে লেখেনঃ

"মুসলিম লীগকে মোকাবেলা করা ছাড়া যুক্তফ্রন্টে কোন লক্ষ্যাদর্শগত ঐক্য ছিল না। পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠন, প্রার্থী মনোনয়ন, নির্বাচনী ম্যানিফেষ্টো প্রণয়ন প্রভৃতি ব্যাপারে প্রবল মত বিরোধ দেখা দেয়। এই অনৈক্য কখনও কখনও ফ্রন্ট ভেঙ্গে যাওয়ার অবস্থায় দাঁড়ায়। একুশ দফা নির্বাচনী ম্যানিফেষ্টোতে কোনক্রমে ঐকমত্য হলেও কোন্ দল কতজন প্রার্থী পাবে, তাতে ঐকমত্য স্থাপিত হতে রাতের পর রাত কেটে গেল। সাংগঠনিক দিক থেকে বিচার করলে প্রকৃতপক্ষে আওয়ামী লীগই ছিল দেশের একমাত্র শক্তিশালী বিরোধী দল। ফজলুল হক সাহেবের প্রতি কিছু লোকের ব্যক্তিগত আনুগত্য ছিল, কিন্তু কৃষক-প্রজা পার্টির সাইন বোর্ড ব্যতীত অন্য কোন অস্তিত্ব ছিল না। আওয়ামী লীগ দলে যারা ছিলেন না, যারা রাজনীতি করতেন সমাজে নামধাম কামানের জন্যে তারাই প্রধানতঃ কৃষক-প্রজা দলের মাধ্যমে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়ন প্রার্থী হন। গণতন্ত্রীদল ছিল প্রকৃতপক্ষে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসীদের যুক্তফ্রন্টও বটে। অবশ্য এ দলেও কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধাবাদী ছিলেন। ...নেজামে ইসলাম দল মুসলিম লীগের বেনামিতে যুক্তফ্রন্টে প্রবেশ করেছিল বললে বোধ হয় অসত্য বলা হয় না। পরবর্তীকালে তাদের আচরণের মধ্যে তার প্রমাণ ছিল।"[১৭]

আবু জাফর শামসুদ্দীন যথার্থই ফ্রন্টভুক্ত দলগুলির মাঝে লক্ষ্যাদর্শের দিক থেকে কোন মিল খুঁজে পাননি কিন্তু তা সত্ত্বেও যুক্তফ্রন্টের নিজস্ব একটি রাজনীতি ছিল। ফ্রন্ট গঠনের জন্য প্রাথমিক আগ্রহ কমিউনিস্টগণ দেখালেও কিংবা অপেক্ষাকৃত অসাম্প্রদায়িক দল আওয়ামী মুসলিম লীগ ফ্রন্ট গঠনের জন্য সক্রিয়ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করলেও যুক্তফ্রন্ট যে রাজনীতি গ্রহণ করে তা কোন ক্রমেই মুসলিম লীগের রাজনীতির বাইরের কোন রাজনীতি নয়, বরং যে রাজনীতিকে সামনে আনা হয়েছিল তাতে যুক্তফ্রন্টই যে মুসলিম লীগের প্রকৃত রাজনীতিকে ধারণ করতে পারে সে কথাই খুব জোরালোভাবে বলা হয়েছিল। ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে যুক্তফ্রন্টের পক্ষ থেকে যে দীর্ঘ প্রচারপত্র বিলি করা হয় তা থেকেই এর প্রমাণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। 'জালেম-শাহীর ছয় বৎসর' শিরোনামের এ প্রচার পত্রের প্রথমেই বলা হয়ঃ

"কায়েদে আজম চাহিয়াছিলেন সরকারকে মুসলিম লীগের আজ্ঞাবহ করিতে। সর্বময় কর্তৃত্ব সম্পন্ন সে মুসলিম লীগ মরিয়া গিয়াছে, এখন গোলাম লীগের সৃষ্টি হইয়াছে।"[১৮]

অর্থাৎ মুসলিম লীগের আদর্শ প্রকৃত অর্থেই ভাল ছিল কিন্তু মুসলিম লীগের বর্তমান নেতৃবৃন্দই তাকে কার্যকরী করছে না। এ প্রচারপত্রে আরো বলা হয় ঃ

"কায়েদে আজমের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সংগ্রাম করিয়া ভারতের দশ কোটি মুসলমান পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। বিরাট ঐতিহ্যসম্পন্ন একটি মহান জাতির ধর্ম ও সংস্কৃতির হেফাজতের জন্য একটি আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য ছিল। কাজেই অতি স্বাভাবিকভাবেই নতুন রাষ্ট্রের মাধ্যমে সেই মহান জাতি পূর্ণআজাদী লাভ করিবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু আফসোসের বিষয়, জাতির পিতা কায়েদে

---

[১২] আক্তার, আবদুর রহিম ও শাহ আহমদ রেজা (১৯৮৭): বাংলাদেশের রাজনীতি: প্রকৃতি ও প্রবণতা - ২১ থেকে ৫ দফা ঢাকা: সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, পৃ-১৩০-৩১।

[১৩] প্রাগুক্ত, পৃ-১৩০।

[১৪] রায়, খোকা (১৯৮৬): প্রাগুক্ত, পৃ-১২৫।

[১৫] প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা শরদিন্দু দস্তিদার ও আবুল বাশার গবেষকের সাথে পৃথক দুই সাক্ষাৎকারে এ তথ্য জানিয়েছেন। আবুল বাশার জানান, "এখন যে এলাকা নিয়ে একটি ভোট কেন্দ্র হয়, তখন এমন ১৫/২০টি এলাকা নিয়ে একটি ভোট কেন্দ্র ছিল। ১৯৪৬ সালের ন্যায় ১৯৫৪ সালের নির্বাচনেও গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে ঘোমটামুড়ি দিয়ে বা বোরকা পরে ১০/১৫ মাইল হেঁটে মহিলারা ভোট দিতে এসেছে। তাদের অনেককে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য রাত ১১টা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে আমি নিজে দেখেছি।"

[১৬] রায়, খোকা, প্রাগুক্ত, পৃ-১২৯।

[১৭] শামসুদ্দীন, আবু জাফর (১৯৮৯): আত্মস্মৃতি ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, পৃ-২৬৭।

[১৮] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৮২): প্রাগুক্ত, পৃ-৩৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

আজমের এন্তেকালের পর দেশের নেতৃত্বতার এমন ব্যক্তিদের হাতে চলিয়া গেল, যাহারা নেতা হওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য। পাকিস্তান অর্জনের সংগ্রামে যাহারা অগ্রনায়ক ছিলেন, কায়েমী স্বার্থবাদীদের চক্রান্তে তাঁহারা রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইলেন অথবা নানা প্রকার অত্যাচার ও নির্যাতন ভোগ করিয়া তাহাদের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল ....”[১৯]

অর্থাৎ দ্বিজাতি তত্ত্ব সত্যিকার অর্থেই একটি যথার্থ তত্ত্ব এবং তার ভিত্তিতে সংগতভাবেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু যাদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছিল তারা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছেন বলেই পাকিস্তানের এ দুর্গতি দেখা দিয়েছে।

উক্ত প্রচারপত্রে আরো বলা হয়ঃ

“মুসলিম লীগ পাকিস্তান আনয়ন করিয়াছে কিন্তু সেই মুসলিম লীগ আর বর্তমান মুসলিম লীগ সম্পূর্ণ পৃথক দু'টি প্রতিষ্ঠান। পাকিস্তান অর্জন করিয়াছিল নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কিন্তু পাকিস্তান অর্জনের পর সে মুসলিম লীগের অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু লীগের নাম ভাঙ্গাইয়া যাহাতে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করা চলে এবং পাকিস্তানকে শাসন ও শোষণ করিবার কায়েমী স্বার্থ বজায় থাকে তজ্জন্য একদল স্বার্থপর, ক্ষমতালিপ্সু ও দূর্নীতিবাজ লোকের চেষ্টায় পাকিস্তান মুসলিম লীগের পত্তন হয়। ইহারা মুসলিম লীগের পুরাতন গৌরবের উত্তরাধিকারী সাজিয়া নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের কাজে নির্লজ্জের মতো প্রচার করিয়াছে যে, মুসলিম লীগ কায়েদে আজমের আমানত স্বরূপ এবং কায়েদে আজম ইহাদের হাতেই লীগকে আমানতরাখিয়া গিয়াছেন।”[২০]

এভাবে আরো বিবরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয় যে, যুক্তফ্রন্টের নেতারাই হচ্ছেন প্রকৃত মুসলিম লীগ তথা জিন্নাহর সত্যিকার প্রতিনিধি। আর তারাই শুধুমাত্র পাকিস্তানের আদর্শকে ভালভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম। অর্থাৎ যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচী ২১দফা হলেও, ২১দফাকে গণমানুষের মাঝে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে রাজনীতিকে সামনে আনা হয় তা মোটেই মুসলিম লীগ রাজনীতি অপেক্ষা ভিন্ন কোন রাজনীতি নয়। ফলে ছাত্র লীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, গণতন্ত্রী দল, যুবলীগ এবং আওয়ামী মুসলিম লীগের মধ্যে যে অসংখ্য অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির অনুসারী রাজনৈতিক কর্মী যুক্তফ্রন্টের পক্ষে লাগাতার প্রচার আন্দোলনে শরিক হয় -- সে প্রচার আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের বিরোধিতা। কিন্তু যে রাজনীতিকে সামনে রেখে তারা এ প্রচার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল সে রাজনীতি মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির চেয়ে কদাচিৎ ভিন্ন বলে মনে হয়। কেননা, যুক্তফ্রন্টের উক্ত প্রচার পত্রের আরো ব্যাপক অংশ জুড়ে বিবরণ দেওয়া হয়েছিল কোথায় কোথায় অনৈসলামিক কর্মকান্ড পরিচালনা করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, যুক্তফ্রন্ট যে, একমাত্র কোরান ও সুন্নাহর অনুসারী তার প্রমাণ হিসাবে পাকিস্তান জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম নেতা মওলানা আতাহার আলীর নেতৃত্বে নেজাম-ই-ইসলাম দলের যুক্তফ্রন্টে যোগাদানের কথাও উদাহরণ হিসাবে বলা হয়।[২১]

এসব সত্ত্বেও যুক্তফ্রন্ট মূল কাজটি ঠিকই সম্পন্ন করেছিল। সেদিন প্রয়োজন ছিল মুসলিম লীগের একচেটিয়া শাসন-শোষণের অবসান। কেননা, যে প্রচন্ড প্রতাপ নিয়ে সেদিন মুসলিম লীগ সরকার পরিচালনা করছিল তাতে এভাবে তাকে বিচ্ছিন্ন করা না গেলে এদেশে গণতান্ত্রিক রাজনীতির সূত্রপাত ঘটাই কঠিনতর হত। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রবীণ বামপন্থী নেতা অজয় রায় বলেনঃ

“যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্বে '৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে ব্যাপকতর বিজয়ের পর অনেক অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটেছে সত্য, কিন্তু এসব পর্যায়ে আসারই কোন সুযোগ থাকতো না, যদি যুক্তফ্রন্ট না হত। যে আত্মম্ভরী মানসিকতা ও দমনমূলক প্রবণতা মুসলিম লীগ দল ও তার সরকারের মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছিল, যুক্তফ্রন্ট না হলে তাকে কোনভাবেই অপসারণ করা সম্ভবপর হত না। বিজয়ের পর কি কারণে তা ধরে রাখা সম্ভব হয়নি তা ভিন্ন বিতর্ক, কিন্তু এ কথা কোনভাবেই ভুলে গেলে চলবেনা যে, যুক্তফ্রন্টের সেই ব্যাপকতর বিজয় আর মুসলিম লীগের পরাজয় --'This was the starting point of politics' এ বিজয়ের আগ পর্যন্ত কার্যত কোন রাজনীতিই এখানে ছিল না।”[২২]

চুয়ান্ন সালের যুক্তফ্রন্টের ব্যাপারটি যে সত্যিই একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ ছিল তা অবাঙ্গালী বৃহৎ শিল্পপতি ব্যবসায়ী ও আমলাতন্ত্রের মরিয়া হয়ে যুক্তফ্রন্টকে বিরোধিতা থেকে উপলব্ধি করা যায়। কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ২১ দফা কর্মসূচী এমন সব দাবী সমূহকে সামনে এনেছিল যে এর বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ কিংবা তার সরকারের পক্ষে ন্যায্যত কোন কিছু বলারই সুযোগ ছিল না। আর সে কারণেই মুসলিম লীগ যুক্তফ্রন্টকে হিন্দু ও কমিউনিস্টদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জোট বলে আখ্যায়িত করতে থাকে। তারিক আলী ২১ দফা ও যুক্তফ্রন্ট প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন :

It was a radical progamme in any context. For the bureaucracy and the ruling clique at the centre it amounted to a virtual revolution. The Muslim League was unable to counter it politically, so with the co-operation of the government at the centre they sent mullahs and other religious fanatics round the countryside to propagate rumours that the united front was controlled by Hindus and Communists.[২৩]

১৯৫৪ সালের এ নির্বাচনের ফলাফলকে মুসলিম লীগ দল ও তার পৃষ্ঠপোষক কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার মেনে নেয় বটে, কিন্তু তারা যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে চক্রান্ত থেকে বিরত হয় নি। পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্টের এ বিজয়ে মুসলিম লীগের অর্থ জোগানদাতা অবাঙালী শিল্পপতি ও ব্যবসায়িগণ শংকিত হয়ে পড়ে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তাদেরকে আশ্বস্ত করে এবং যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্তের সাথে তাদের যুক্ত করে। আমলাতন্ত্রও এ চক্রান্তের শরিক হয়। রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্র ও অবাঙ্গালী মালিকদের পরিচালিত মিল-কারখানাগুলিতে বাঙ্গালী-অবাঙ্গালীদের মধ্যেকার বিরোধ কিংবা হিন্দু-মুসলমান বিরোধকে উস্কানি দেওয়া হয়। এর পিছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব বাংলায় অরাজকতা সৃষ্টি করা - যাতে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব বাংলার শাসন ব্যবস্থার ওপর হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পায়। ১৯৫৪ সালের ১২ই মার্চ নির্বাচন শেষ হওয়ার মাত্র ১০দিন পর তথা ২৩শে মার্চ চন্দ্রঘোনা কর্ণফুলী পেপার মিলে বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী

---

[১৯] প্রাগুক্ত, পৃ-৩৭৬।
[২০] প্রাগুক্ত, পৃ-৩৭৭।
[২১] প্রাগুক্ত, পৃ-৩৭৭।
[২২] অজয় রায়, গবেষকের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে এ মন্তব্য করেন।
[২৩] Ali, Tariq (1970): Pakistan: Military Rule or People's Power London: Janathan Cape, p.62.

Dhaka University Institutional Repository

শ্রমিকদের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী দাংগা সংঘটিত হয়।[২৪] এর কয়েকদিনের মধ্যেই ইসপাহানী ম্যাচ ওয়ার্কসের শ্রমিকদের মধ্যে ঘটে একই ধরনের আর একটি রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা।[২৫]

নির্বাচনে নির্মমভাবে পরাজিত হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্ররোচনায় যখন এ ধরনের ঘটনা ঘটে চলেছে, তখন কার্যত শেখ মুজিবের মন্ত্রী হওয়ার জন্য পিড়াপিড়ি[২৬] ফ্রন্টের অভ্যন্তরে বিদ্যমান অনৈক্যকে আরো প্রশারিত করে। কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও নিজাম-ই-ইসলাম এ পর্যায়ে আওয়ামী লীগের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগি করতে অস্বীকার করে।[২৭] শেষ পর্যন্ত যুক্তফ্রন্টের পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা হিসাবে ফজলুল হক আওয়ামী লীগ বা গণতন্ত্রী পার্টির সদস্যদের বাদ দিয়ে মন্ত্রী হিসাবে শুধুমাত্র কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও নিজাম-ই-ইসলাম পার্টির ৩ জন সদস্যের নাম ঘোষণা করতে বাধ্য হন।

মন্ত্রীসভার নাম ঘোষণা করার পরদিন ফজলুল হক কলিকাতা সফরে যান। ৪ঠা মে তিনি কলকাতায় প্রদত্ত এক ভাবাবেগ তাড়িত বিবৃতিতে বলেনঃ

It is important that the people of two Bengals should realise the fundamental fact that in order to live happily they must render mutual assistance to each other. Politicians have partitioned territories, but the common mass should ensure, that everybody lived peacefully. Language proved to be the most important unifying factor in history and the people of two Bengals, bound together in common language, should forget political divisions and feel themselves to be one"[২৮]

দু'টি দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে এ ধরনের বক্তব্য মোটেই দূষণীয় কিছু নয়, বরং প্রতিবেশী দু'টি দেশের জনগণের মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের ক্ষেত্রে তা সহায়ক হতে পারে। কিন্তু দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ তা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না, বিশেষতঃ যদি বিবৃতিদাতাকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়োজন পড়ে। তাইতো দেখা যায়, এধরনের একটি সংবাদকে পুরো একমাস চেপে রাখা হয়েছিল। যতদিন পর্যন্ত পূর্ব বাংলার জনসাধারণের প্রধান প্রতিনিধি আওয়ামী মুসলিম লীগকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে রেখে যুক্তফ্রন্টের অভ্যন্তরীণ বিরোধের প্রমাণ রেখে চলেছিল ততদিন পর্যন্ত এ তথ্য সেভাবে প্রকাশ করা হয়নি কিন্তু যে পর্যায়ে আওয়ামী লীগের সঙ্গে কৃষক-শ্রমিক পার্টির বিরোধ মীমাংসা হতে থাকে তখনই ফজলুল হককে বিচ্ছিন্ন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার তৎপর হয়ে ওঠে।

অন্যদিকে, পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক নির্বাচনের আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতসহ কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন ব্যক্তি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ শুরু করে। এক পর্যায়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিলড্রেথ সকল রকমের কূটনৈতিক শালীনতা বিসর্জন দিয়ে মন্তব্য করেন পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের পক্ষের শতকরা ৮০ জন প্রার্থী বিজয়ী হবেন।[২৯] নির্বাচন পরবর্তীকালে তিনি মন্তব্য করেন, পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক নির্বাচন দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারের কোন রদ-বদল হবেনা কিংবা কেন্দ্রীয় সরকার প্রভাবিত হবে না।[৩০] এসব নিয়ে পূর্ব বাংলায় মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্র সম্পর্কে খুবই বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হয়। উপরন্তু, নির্বাচনের পর পরই প্রতিনিধিত্ববিহীন কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির প্রচেষ্টা পূর্ব বাংলায় ব্যপক প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানী উক্ত পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে জোরালো বিবৃতি দেন। গণতন্ত্রী দল ও পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি এ চুক্তির বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির জন্য ব্যাপকভাবে প্রচার আন্দোলন শুরু করে। ১৬ই এপ্রিল গণতন্ত্রী দলের উদ্যোগে সারা পূর্ববঙ্গে পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বিরোধী দিবস পালিত হয়। এ উপলক্ষে নানাস্থানে জনসভা করে ঘোষণা করা হয়, এ চুক্তি বাতিল করা না হলে দেশব্যাপী প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করা হবে। চট্টগ্রামে এ আন্দোলন বেশ জোরালো রূপ নেয়। আসাবুদ্দিন চৌধুরী নামের জনৈক এম,এল,এ ঘোষণা করেন, ইতিমধ্যে পূর্ববঙ্গের ১৮২ জন আইন সভা সদস্য পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিলের দাবীতে স্বাক্ষর করেছেন।[৩১]

অন্য দিকে, নিজাম-ই-ইসলামী দল নির্বাচনের পরেই তাদের স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে। গণতন্ত্রী দলের পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বিরোধী ভূমিকাকে সে ভাল চোঁখে দেখতে পারেনি। প্রাদেশিক মন্ত্রী সভার সদস্য নির্বাচিত হয়ে নেজাম ইসলামী নেতা আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী করাচী গমন করেই গণতন্ত্রী পার্টির বিরুদ্ধে বিষোদগার শুরু করেন। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন গণতন্ত্রী দল যুক্তফ্রন্টের কেউ নয়। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পদক শেখ মুজিব এক বিবৃতিতে অবশ্য এ বক্তব্যের তীব্র নিন্দা করেন এবং যুক্তফ্রন্টের কাঠামো সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ চিত্র তুলে ধরেন।[৩২] এ ঘটনার ফলে কৃষক-শ্রমিক পার্টির কাছেও নিজাম-ই-ইসলাম সমালোচিত হয়, কেননা তাদের মধ্যেকার পারস্পরিক চুক্তি যে সকল দফার ওপর ভিত্তি করে সম্পন্ন হয়েছিল সেগুলির সাথে নিজাম-ই-ইসলামীর উক্ত ভূমিকা সংগতিপূর্ণ ছিল না। এ পর্যায়ে আওয়ামী লীগের সাথে কৃষক-শ্রমিক পার্টির মধ্যেকার ভুল বোঝা-বুঝি হ্রাস পেতে থাকে। এ রকমই একটি পর্যায়ে ফজলুল হক কলকাতায় সফরে গিয়ে উক্ত বিবৃতিটি প্রদান করেন। এতে ফজলুল হকের জোট সঙ্গী নিজাম-ই-ইসলামের সাথে তার সম্পর্কে আরো চিড় ধরে। এতে ফজলুল হক পিছপা না হয়ে আওয়ামী লীগের সাথে বিরোধ মীমাংসার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১০ই মে আওয়ামী লীগ আহুত এক জনসভায় উপস্থিত হয়ে তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে, আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানীর নির্দেশেই তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করবেন।[৩৩] এর পর পরই তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে কয়েক জনকে মন্ত্রী সভায় অন্তর্ভুক্ত করেন। আর এটাই ছিল ফজলুল হক মন্ত্রীসভার জন্য কাল। কেন্দ্রীয় সরকার হক-ভাসানীর এ পুনর্মিলনকে মোটেই পছন্দ করেনি। কেন্দ্রীয় সরকার ষড়যন্ত্র আঁটিতে থাকে। এ রকম সময়ই ঘটে আদমজী পাটকলের শ্রমিকদের মধ্যে এক নারকীয় ঘটনা।

---

[২৪] আহাদ, অলি (-১): জাতীয় রাজনীতি ১৯৫৪-৭৫, ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি, ২য় সংস্করণ, পৃ-১৮২।
[২৫] Ahmad, Kamruddin (1978): Labour Movement in Bangladesh, Dacca: Inside Library, p.87.
[২৬] হোসেন, তোফাজ্জল (১৯৮১): পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর ঢাকা: মানিক মিয়া ফাউন্ডেশন, পৃ-৫৬-৫৭।
[২৭] শামসুদ্দীন, আবুজাফর (১৯৮৯): প্রাগুক্ত, পৃ-২৭৩।
[২৮] The Morning News, May 5, 1954.
[২৯] হোসেন, তোফাজ্জল (১৯৮১): প্রাগুক্ত, পৃ-৫৯।
[৩০] প্রাগুক্ত, পৃ-৫৯।
[৩১] সেন, সরলানন্দ (১৯৭৬): ঢাকার চিঠি দ্বিতীয় খন্ড, ঢাকা: মুক্তধারা, পৃ-১০।
[৩২] প্রাগুক্ত, পৃ-১২-১৩।
[৩৩] আহাদ, অলি (-১): প্রাগুক্ত, পৃ-১৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

একটি অপ্রীতিকর ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাঙালী-অবাঙ্গালী শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষের জের হিসাবে একজন অবাঙ্গালী দারোয়ানের মৃত্যু হয়। আর এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মিলের অবাঙ্গালী পদস্থ কর্মকর্তাগণ সরকারী আমলাদের সহায়তায় বাঙালী শ্রমিক নিধনের ষড়যন্ত্র করে। এ সংক্রান্ত এক রিপোর্টে বলা হয়ঃ

"তার পর ঠিক হল অবাঙ্গালী শ্রমিক ও আমলারা কালো ব্যাজ পরবে, তাদের ঘরে ঘরে কালো ঝান্ডা উড়বে। অতঃপর বাঙ্গালী শ্রমিকদের জানিয়ে দেয়া হলো যে, তাদের সেই দিন মজুরি দেয়া হবে। এভাবে প্রায় চার পাঁচশ মজুরকে একটি গুদামে সারিবদ্ধ করে দাঁড় করান হয়। অতঃপর গুদামটির সব দিককার ফটক বন্ধ করে দিয়ে বাইরে পেট্রল ঢেলে তাতে আগুন লাগিয়ে দেয় হয়। "ইতিমধ্যে প্রচুর মারাত্মক অস্ত্র, ছোরা, তলোয়ার, ডাঙ্গা, বন্দুক জোগাড় করা হয়েছিল। অবাঙ্গালী শ্রমিক ও আমলার দল কোটীপতি তোহার সঙ্গে হাত মিলিয়ে শুরু করল বাঙ্গালী মুসলমান খুনের অভিযান। এই অভিযান পার্শবর্তী গ্রামগুলোতেও ছড়িয়ে পড়েছিল।"[৩৪] এ দাংগায় দেড় হাজার শ্রমিক নিহত হয়।[৩৫]

এ ধরণের একটি সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে যাওয়ার ফলে ফজলুল হক সরকার সাময়িকভাবে হলেও হতবাক হয়ে পড়ে। কেননা, যেদিন যুক্তফ্রন্টের পূর্নাঙ্গ মন্ত্রী পরিষদ শপথ গ্রহণ করে সেদিনই ঘটে এ ঘটনা। আর অন্য দিকে, কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারকে বাতিল করার জন্য একটি অজুহাত পেয়ে যায়।

ইতিমধ্যে ১৯ শে মে পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে যায়। এতে পূর্ববাংলায় প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ২৩শে মে কালাহান নামক এক মার্কিন সাংবাদিক পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত ফজলুল হকের এক বিবৃতিকে বিকৃতভাবে পত্রিকায় প্রকাশ করে। New York Times -এর এক সাংবাদিকের সাথে ফজলুল হক একান্ত সাক্ষাৎকারে পূর্ব বাংলা 'Wished to become an Independent State' -এ ধরনের কথা বলেছেন বলে দাবী করা হয়। এছাড়া পূর্ব বাংলা পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক কিভাবে শোষিত ও নির্যাতিত হচ্ছিল তার পরিপূর্ণ বিবরণসহ একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন টাইমস পত্রিকার প্রথম পাতায় বড় বড় অক্ষরের শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এই সংবাদটি ২৫ শে মে পাকিস্তান অবজার্ভারে প্রকাশিত হওয়ার পর ফজলুল হক আলোচনার পরিপূর্ণ পরিপ্রেক্ষিত তুলে ধরে স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতার কথা বলেছিলেন বলে পত্রিকায় বিবৃতি প্রদান করেন ২৬ শে মে।[৩৬] নির্বাচনী সংবাদ সংগ্রহের জন্য বগুড়ার মোহম্মদ আলীর আহবানে আগত এ সাংবাদিক যখন ফজলুল হকের আপত্তি সত্ত্বেও প্রধান মন্ত্রীর কাছে জোরালো স্বাক্ষ্য প্রদান করে- তখন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ফজলুল হক প্রকৃতই দেশদ্রোহী বলে চিহ্নিত হন।[৩৭] এভাবেই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ৯২-ক ধারা জারি করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। তবে ফজলুল হক এ ধরনের মিথ্যা অভিযোগে পূর্ব বাংলার জনপ্রিয় সরকারকে অপসারণের কারসাজির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং পূর্ব বাংলার সাড়ে চারকোটি মানুষের আস্থাভাজন মন্ত্রীদের দেশপ্রেমে সন্দেহ করার প্রতিবাদে 'আলোচনা নিরর্থক' বলে ঘোষণা করেন।[৩৮] এর পর দিনই পূর্ব বাংলায় ৯২-ক ধারা জারি হয় এবং পূর্ব বাংলা সরকারকে বাতিল করে কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য কেন্দ্রের আস্থাভাজন মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জাকে গভর্ণর করে পাঠানো হয়। ইস্কান্দার মীর্জা গভর্নর হয়েই পূর্ব বাংলার জনপ্রিয় নেতৃত্বের প্রতি অশালীন উক্তি করেন এবং নানাবিধ হুমকি প্রদর্শন করেন। তার আক্রোশের প্রধান লক্ষ্য ছিল মওলানা ভাসানী, কিন্তু এসময় মওলানা ভাসানী বিশ্বশান্তি সম্মেলন উপলক্ষে বার্লিন ছিলেন। বার্লিন থেকে তিনি যাতে দেশে ফিরতে না পারেন সেজন্য ইস্কান্দার মীর্জা দম্ভোক্তি প্রকাশ করে মওলানাকে রাষ্ট্রদ্রোহী বলে ঘোষণা করেন এবং দেশে ফিরলে তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হবে বলে মন্তব্য করেন।[৩৯]

মওলানা ভাসানীর প্রতি এ ধরনের মনোভাব প্রকাশ করার মূল কারণ ছিলঃ ভাসানীই ছিলেন একমাত্র আপোসহীন জাতীয় নেতা, যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পাকিস্তানের সামরিক চুক্তিকে ভালভাবে দেখতে পারেননি। তিনি খুব কঠিন ভাষায় এ চুক্তির সমালোচনা করেন এবং পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বিরোধী আন্দোলনসমূহকে সমর্থন করেন। দ্বিতীয়তঃ মওলানা ভাসানী সে সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের সভাপতি হয়েও কোন ক্ষমতার প্রতি আগ্রহ দেখান নি, অথচ আওয়ামী মুসলিম লীগের সাথে কৃষক-প্রজা পার্টির বিরোধ মীমাংসার পর রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য তিনিই হয়ে ওঠেন মূল উপদেষ্টা। তৃতীয়তঃ চুয়ান্ন সালের নির্বাচনের পর পরই মওলানা ভাসানী ব্যক্তিগতভাবে ১৫ দফা কর্মসূচী সম্বলিত এমন একটি লিফলেট সারা দেশের আওয়ামী মুসলিম লীগ কর্মীদেয় কাছে পাঠান, যাতে একেবারে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারী দফতরের দূর্নীতি, কৃষকদের ওপর জমিদারী ও সরকারী জুলুমের প্রকৃতি, ডিলার ও পাইকারদের কালোবাজারী, সীমান্তের কালোবাজারী, পার্লামেন্ট সদস্যদের দায়িত্ব পালনের প্রকৃতি, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ও বিক্রয়যোগ্য কৃষিপণ্যের মূল্যের ওঠানামা, কর্মচারীদের অন্যায়ভাবে ছাঁটাই কিংবা জুলুম, রাস্তাঘাটের অবস্থা, জনসাধারণের ওপর পুলিশী জুলুমের প্রকৃতি, শিক্ষার সুযোগ-সুবিধাসহ বিভিন্ন ধরনের তথ্য জানতে চাওয়া হয়।[৪০] যে বিষয়গুলি এ ইস্তেহারে জানতে চাওয়া হয়, সেগুলি প্রকাশিত হলে পাকিস্তানের আমলাতন্ত্র ও তাদের সহযোগীদের গণনিপীড়ন ও নির্যাতনের প্রকৃতি প্রকাশ হয়ে পড়তো। ফলে পূর্ব বাংলায় কর্মরত আমলারা ও তাদের সহযোগীরা মওলানা ভাসানীর প্রতি ব্যক্তিগতভাবেই বিরূপ হয়ে পড়েন।[৪১] চতুর্থতঃ ১৯৫৪ সালের ৮ই মে পাকিস্তানের গণপরিষদের সভায় মূলনীতি কমিটির রিপোর্টে ভাষা সংক্রান্ত যে নীতিকে অনুমোদন করা হয়, তাকে ভাসানী তীব্র ভাষায় বিরোধিতা করেন। এ রিপোর্টে উর্দু ও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও তা ২০ বছর পর থেকে কার্যকরী করার কথা বলা হয়।[৪২] এ সিদ্ধান্তকে যুক্তফ্রন্টের দু'জন মন্ত্রী সমর্থন করেন। কিন্তু মওলানা ভাসানী এ রিপোর্টকে অত্যন্ত

---

৩৪ সেন, সরলানন্দ; প্রাগুক্ত, পৃ-২৩।

৩৫ আহাদ, অলি; প্রাগুক্ত, পৃ-১৮৫। অবশ্য, মতান্তরে ৫০০ বা ৪০০ জনের কথাও বলা হয়েছে।

৩৬ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৮২): প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ-৪০৪-৪০৫ এবং পৃ-৪০২-৪০৩।

৩৭ হোসেন, তোফাজ্জল, প্রাগুক্ত, পৃ-৫৯।

৩৮ প্রাগুক্ত, পৃ-৫৯।

৩৯ আহাদ, অলি; প্রাগুক্ত, পৃ-১৮৬।

৪০ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৮২): প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ-৩৯০-৯১।

৪১ প্রবীণ বামপন্থী নেতা, বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা এবং মওলানা ভাসানীর দীর্ঘদিনের সহযোগী আবদুল মতিন লেখকের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে এ তথ্য প্রকাশ করেন।

৪২ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৮২): প্রাগুক্ত, প্রথম খন্ড, পৃ-৩৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

জোরালোভাবে বিরোধিতা করেন এবং অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার কাজকে এভাবে অযথা বিলম্ব করার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করার জন্য দেশবাসীকে আহবান জানান।[৪৩]

শুধু মওলানা ভাসানীর প্রতিই নয়, স্বয়ং এ কে ফজলুল হককেও 'দেশদ্রোহী' ও 'বিশ্বাসঘাতক' বলে আখ্যায়িত করা হয়। সমগ্র পূর্ব বাংলায় সেনাবাহিনী নামানো হয়। হাজার হাজার যুক্তফ্রন্ট কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়। আর সংবাদপত্রের ওপর কড়া সেন্সরব্যবস্থা চালু করা হয়।[৪৪] এ পর্যায়ে মুসলিম লীগ সমর্থক 'মর্নিং নিউজ' ও 'আজাদ' যুক্তফ্রন্টকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করতে শুরু করে। 'আজাদ' তো খুবই অশালীন ভাষায় হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার করতে থাকে এবং পূর্ব বাংলার সর্বত্র হিন্দু ও কমিউনিস্টদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে অপপ্রচার চালাতে থাকে। এমনকি, ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লেগেছে বলেও উত্তেজনাপূর্ণ শিরোনাম দিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে থাকে।[৪৫] অন্যদিকে, যুক্তফ্রন্টের অন্যতম মুখপাত্র দৈনিক মিল্লাত ৩১শে মে সম্পাদকীয় স্তম্ভে বড় বড় হরফে লেখে, 'কিছুই লেখা সম্ভব হইল না। পরের দিনও প্রি-সেন্সরশীপের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে প্রথম পৃষ্ঠায় এ কাগজ পুরো তিন কলাম একেবারে খালি ফেলে রেখে সম্পাদকীয় স্তম্ভে মোটা মোটা হরফে লিখে "অদ্যও কিছুই লেখা সম্ভব হইল না।"[৪৬]

এরকম একটি সংকটজনক পরিস্থিতিতে প্রদেশের নেতৃবৃন্দ ও রাজনৈতিক দলগুলি অসীম ধৈর্যের পরিচয় দেয়। শাসকদের শত উস্কানী সত্ত্বেও নেতৃবৃন্দ জনসাধারণের সংযম ও শৃঙ্খলা রক্ষার আহবান জানান। ফলে নেতৃবৃন্দসহ সহস্রাধিক কর্মীকে গ্রেফতার করা হলেও এর বিরুদ্ধে কোন বিক্ষোভ যাতে অনুষ্ঠিত না হয়, সে ব্যাপারে নেতৃবৃন্দ সতর্ক থাকেন। এ ঘটনাকে আবার যুক্তফ্রন্টের দুর্বলতা হিসাবে আখ্যায়িত করে চরম অপপ্রচার চালানো হয়। এর প্রতিবাদ করে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে সর্বপ্রথম বিবৃতি দান করেন আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট নেতা আবুল মনসুর আহমদ। ৯ই জুন প্রকাশিত এ বিবৃতিতে তিনি জানানঃ

'বিরোধী পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে, পূর্ব পাকিস্তানবাসী ৯২(ক) ধারা প্রবর্তন সমর্থন করছে। প্রমাণ এই যে, দেশবাসী ৯২(ক) ধারা প্রবর্তনে সম্পূর্ণ শান্ত আছে। যদি আমাদের মধ্যে কেউ বিরোধীপক্ষের এই দাবীর অসত্যতা প্রমাণের উদ্দেশে শান্তিভঙ্গ রোধ না করেন, তবে তিনি বিরোধী দলের ফাঁদেই পা দিবেন। দেশে পূর্ণ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করে আমরা দুনিয়ার কাছে এবং কর্তৃপক্ষের কাছে প্রমাণ করতে চাই যে, ৯২(ক) ধারা প্রবর্তন অনাবশ্যক ছিল। অতএব, যে কোন ত্যাগ স্বীকারে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আমি দেশবাসীকে অনুরোধ করছি।"[৪৭]

আওয়ামী লীগের অন্যতম সহসভাপতি আতাউর রহমান খানও অনুরূপ এক বিবৃতিতে জানান, 'আমাদের ইতিহাসের এই গুরুতর মুহূর্তে আমি জনসাধারণ ও বিশেষভাবে আওয়ামী লীগের কর্মীদিগকে তাদের নীতিতে সুদৃঢ় থাকতে এবং সারা দেশে শান্তি বজায় রাখতে অনুরোধ জানাচ্ছি।"[৪৮] আওয়ামী লীগের সভাপতি বিদেশে আর সাধারণ সম্পাদক কারাগারে - এ অবস্থায় উপরোক্ত দু'জন নেতাই ছিলেন দলের মূল মুখপাত্র। আওয়ামী লীগের এ ধরনের ভূমিকার কারণেই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সে সময়ই শাসকদের পক্ষে স্তব্ধ করে দেওয়া সম্ভব হয়নি প্রদেশের শাসনভার কিছুটা দেরী করে হলেও জনপ্রতিনিধিদের হাতে ফেরৎ দিতে বাধ্য হয়েছিল। ৯২(ক) ধারা জারি করে পূর্ব বাংলার জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বশীল সরকারকে অপসারণ করেও যখন দেখা গেলো পূর্ব বাংলায় স্থায়ীভাবে কেন্দ্রীয় শাসন বলবৎ রাখার কোন অজুহাত পাওয়া যাচ্ছেনা, তখন যুক্তফ্রন্টের মধ্যে ফাটল ধরানো এবং শক্তির ভারসাম্যের দিক থেকে দুর্বল অংশকে পক্ষে আনার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। সেই সাথে পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিকে নির্মূল করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ৯২-ক ধারা জারি করে ফজলুল হকের মন্ত্রী সভাকে বাতিল, ফজলুল হকের প্রতি অশালীন ভাষায় হুমকি প্রদর্শন ও তাকে নজরবন্দী করে রাখা হলেও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার অচিরেই অনুভব করে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির স্থায়ীত্বের জন্য ফজলুল হক কিংবা তার রাজনৈতিক দলের ভূমিকা মুখ্য নয়। এ দু'টি প্রশ্নে মুখ্য ভূমিকা হচ্ছে আওয়ামী লীগ ও তার নেতা মওলানা ভাসানীর। পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃত্বের আগ্রাসী আচরণের জোর সমালোচক আওয়ামী লীগ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান ভয়ের কারণ। সে কারণে আওয়ামী লীগের বাইরে থেকে কেন্দ্রীয় সরকার তার মিত্র খোঁজের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। অপর দিকে, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার সে সময় যে বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করে তার সাথে আওয়ামী লীগ দলের সাংঘাতিক দ্বিমত থাকলেও পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি ও যুক্তফ্রন্টের প্রধান তিন নেতার অন্যতম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর তার সাথে কোন দ্বিমত ছিল না। এ অবস্থার বিবরণ দিয়ে ফয়েজ আহমদ বলেনঃ

".....২০ ডিসেম্বর গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদের আশ্বাসে আওয়ামী লীগ নেতা জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী তারই এককালের জুনিয়র সহকর্মী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেছেন। পাঞ্জাবের দৌলতানা, প্রাক্তন ঝানু সিভিল সার্ভিস (একাউন্টস) অফিসার চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ও গোলাম মোহাম্মদ জুরিখে অবসর যাপনরত জনাব সৌহরাওয়ার্দীকে ডেকে ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী করার আশ্বাস প্রদানের ফলেই তিনি এই অসম্মানজনক মন্ত্রীত্ব গ্রহণে প্রলুব্ধ হয়েছিলেন। অপরদিকে, যুক্তফ্রন্টে ভাঙ্গন সৃষ্টির জন্যে কেন্দ্রীয় নেতৃবর্গ কে,এস, পি'র নেতা জনাব ফজলুল হককে আশ্বাস দেন যে, তার মনোনীত নেতা আবু হোসেন সরকারকে প্রাদেশিক মুখ্য মন্ত্রীরূপে গ্রহণ করা হবে।'[৪৯]

অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের এ প্রচেষ্টার ফলে একদিকে যেমন যুক্তফ্রন্টের মধ্যেকার ঐক্য সাংঘাতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়, ঠিক তেমনই আওয়ামী লীগের মধ্যেও অভ্যন্তরীণ ঐক্যে ফাটল ধরে। কেননা, পূর্ব বাংলায় ৯২(ক) ধারা জারি করার কারণে কেন্দ্রীয় সরকার ভীষণভাবে অপ্রিয় হয়ে পড়ে। উপরন্তু, পাকিস্তানের উভয় অংশে পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তিকে একটি কালো চুক্তি হিসাবে শুরু হয়। কেননা, এ চুক্তির প্রায় সব কিছুই ছিল আমেরিকার বিশ্বব্যাপী সামরিক পরিকল্পনার অনুকূলে।[৫০] এছাড়া ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে

---

৪৩ প্রাগুক্ত, পৃ-৪০১।
৪৪ সেন, সরদানন্দ; প্রাগুক্ত, পৃ-২১-২২।
৪৫ প্রাগুক্ত, পৃ-২২।
৪৬ প্রাগুক্ত, পৃ-২২।
৪৭ প্রাগুক্ত, পৃ-২৪-২৫।
৪৮ প্রাগুক্ত, পৃ-২৫।
৪৯ আহমদ, ফয়েজ (১৯৮৮): 'সংগ্রামী ঐতিহ্যের জাগ্রত চেতনা মওলানা ভাসানী' মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ-৭১।
৫০ Ali, Tariq (1970), op.cit, p.74.

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান, থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়া– এ তিনটি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশকে নিয়ে গড়ে তোলা হয় অন্য একটি সামরিক চুক্তি। বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র, নিউজিল্যান্ড, ও ফ্রান্স কোন এশিয়া দেশ না হলেও সিয়াটো নামক উক্ত সামরিক চুক্তির সাথে এসব দেশ যুক্ত থাকে। খুব সহজেই প্রতিভাত হতে থাকে যে, এসব দেশের আসন্ন গণআন্দোলনকে প্রতিরোধ, চীনকে ঘেরাও করে ফেলা এবং রাশিয়ার সাথে আমেরিকার ঠান্ডা লড়াইয়ে একটি শক্তিশালী অবস্থান গ্রহণ ছিল এ পরিকল্পনার লক্ষ্য।[৫১]

এ ঘটনাগুলি এমন সময় ঘটছিল যখন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাজনীতিতেও চলছিল চরম অস্থিরতা। এ অস্থিরতা শুরু হয় খাজা নাজিমুদ্দিন গভর্নর জেনারেলের পদ ছেড়ে দিয়ে প্রধান মন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই। গোলাম মোহাম্মদ গভর্নর জেনারেল হয়েই বিভিন্নভাবে প্রধান মন্ত্রীর কাজে হস্তক্ষেপ করতে থাকেন। আর নাজিমুদ্দীন গোলাম মোহাম্মদের এ আচরণকে ভালভাবে গ্রহণ করতেন না। ১৯৫৩ সালের গোড়া থেকে আবার পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশে দেখা দেয় খাদ্য সংকট। এ খাদ্য সংকটের অজুহাতে ১৯৫৩ সালের ১৭ই এপ্রিল নাজিমুদ্দীনকে অযোগ্য ঘোষণা করে তার মন্ত্রী পরিষদ বাতিল করে দেওয়া হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আলী বগুড়াকে এনে নতুন মন্ত্রী পরিষদ গঠনের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এ ঘটনাকে উল্লেখ করে তৎকালীন পাকিস্তান গণপরিষদের স্পীকার জনাব তমিজউদ্দীন খান এটাকে পাকিস্তানের গণতন্ত্র হত্যার সূচনা পর্ব হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। গোলাম মোহাম্মদ গভর্নর জেনারেল হয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে যে অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার জন্ম দিয়েছিলেন তার পরিপূর্ণ সুযোগ কিভাবে সামরিক ও বেসামরিক আমলারা গ্রহণ করেছিল সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তমিজউদ্দীন খান বলেন :

"There was a great uncertainty in the political arena. And as democracy was yet to take its roots, the civil and military services joined hands and took full advantage of the situation in collusion with some unscrupulous political leaders. The first action of this unholy alliance was to dismiss the Nazimuddin cabinet in 1953 when the budget had just been passed and the cabinet had a big majority to the USA was brought in and appointed Prime Minister. The Muslim League party did not have the guts to oppose this politically and in their shout-sightedness most political leaders were not unhappy that Nazimudding Cabinet had been dismissed. This was the beginning of the death of democracy in Pakistan.[৫২]

এটা সত্যি যে একটি সামরিক–বেসামরিক আমলাতন্ত্রের কারসাজি ছিল তা অনেক বিজ্ঞ রাজনীতিবিদও বুঝতে সক্ষম হননি, তাঁদের অনেকেই বুঝতে সক্ষম হননি এ ঘটনার ভিতর দিয়ে কিভাবে পাকিস্তানে গণতন্ত্রের মৃত্যু ঘন্টা বেজে উঠেছে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মত জাতীয় নেতাও এ ঘটনাকে যথা সময়ে উপলব্ধি করতে পারেন। ঘটনাক্রমে সে দিন পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগের জনসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বক্তৃতা দানকালে এ সংবাদ মিটিং–এ এসে পৌছায়; সোহরাওয়ার্দী ঘটনা শুনে গোলাম মোহাম্মদের এ পদক্ষেপকে অকুণ্ঠভাবে সর্মথন জানান।[৫৩] সভায় হাসির রোল ওঠে। কিন্তু ঘটনাটি যে কতটা অগণতান্ত্রিক তা সোহরাওয়ার্দী টের না পেলেও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বুঝতে পেরেছিলেন। ফলে তিনি জনসভার এ অবস্থা দেখে চুপ করে বসে থাকতে পারেন নি। ভাসানী সভাপতির আসন থেকে ত্বরিৎ উঠে এসে তেজোদীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেনঃ

"আধা মরহুম গোলাম মোহাম্মদের এ কাজ অগণতান্ত্রিক। আমি কঠোর ভাষায় এ কাজের নিন্দা করছি ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব নুরুল আমিনের আজ করাচি যাবার কথা, তাঁর কাছে আমি আবেদন করছি, যাত্রার কর্মসূচী বাতিল করে আপনি এই স্বৈরাচারী কাজের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। আমি আমার আওয়ামী লীগের সকল সাংগঠনিক কাজ বন্ধ রেখে আপনার সাথে স্বৈরতন্ত্র খতমের আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ব।"[৫৪]

জনাব নূরুল আমিন কিংবা অন্য লীগ নেতারা মওলানা ভাসানীর এ আহবানে সাড়া দেন নি। তবে এ ছোট ঘটনার মধ্য দিয়েই বোঝা যায় কি বিপরীত ধর্মী মানুষদের নিয়ে সে সময় আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব গড়ে উঠেছিল। রাষ্ট্রপ্রধানের এধরনের একটি অগণতান্ত্রিক কাজকে একই জনসভায় একজন সমর্থন জানাচ্ছেন এবং অন্যজন তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। কিন্তু এ ঘটনার কার্যকরী কোন প্রতিবাদ পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে কোথাও গড়ে না ওঠার কারণেই উক্ত ঘটনারই সিঁড়ি বেয়ে একের পর এক অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ চলতে থাকে। গভর্নর জেনারেল যাতে ইচ্ছা করলেই গণপরিষদের মতামতকে উপেক্ষা করে কোন কিছু না করতে পারে তার জন্য নতুন প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলীও সুযোগ খুঁজতে থাকেন, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হয়েও তিনি সামরিক–বেসামরিক আমলাদের দ্বারা এমনভাবে আবৃত হয়ে থাকতেন যে, গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদকে না জানিয়ে গণপরিষদের সভা ডেকে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিলনা। এ ধরনের সুযোগ আসে ১৯৫৪ সালের ২০–২২শে সেপ্টেম্বর গণপরিষদের বৈঠক উপলক্ষে। সে সময় গভর্নর দেশের বাইরে ছিলেন। এ বৈঠকে পাকিস্তান গণপরিষদ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ১০নং ধারা বিলুপ্ত করে গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা হ্রাস করে এবং ১৯৪৯ সালের পাবলিক এন্ড রিপ্রেজেনটেটিভ অফিস ডিসকোয়ালিফিকেশন অধ্যাদেশ বাতিল করে সংবিধানের মূলনীতি কমিটি রিপোর্ট গ্রহণ করে। কিন্তু এ পরিবর্তনকে গোলাম মোহাম্মদ কিংবা তার ক্ষমতার মূল খুঁটি সামরিক–বেসামরিক আমলাগণ সমর্থন করতে পারেনি। প্রধান মন্ত্রী এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর সরকারী কাজে যখন বিদেশ সফরে যান, সে সময় গোলাম মোহাম্মদ দেশে ফিরে এ ঘটনা জানতে পেরে গণপরিষদের স্পীকার তমিজউদ্দিন খানসহ মুসলিম লীগের অন্যান্য উর্ধতন নেতৃত্বকে সাংঘাতিকভাবে দোষারোপ করতে থাকেন।৫৪ গভর্নর জেনারেল শুধু দোষারোপ করেই ক্ষান্ত হন নি, তিনি প্রধান মন্ত্রীকে গণপরিষদ ভেঙ্গে দিতে বাধ্য করেন এবং সামরিক–বেসামরিক আমলাসহ বিভিন্ন জনকে নিয়ে একটি নতুন মন্ত্রীপরিষদ গঠনের জন্য চাপ দেন। এ অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে তৎকালীন গণপরিষদের স্পীকার ও সংবিধান সভার সভাপতি তমিজউদ্দীন খান লিখেছেন :

"During the Prime Minister's absence, Governor General Gholam Mohammad finalised his plans to strike in collusion with top civil and military officers. On his return (October, 23, 1954), the Prime Minister was dramatically taken to the Governor General's house, and the decision to dissolve the Constituent Assembly

---

৫১ Ali, Tariq (1970), ibid, p.74.

৫২ Khan, Tamizuddin (1989): <u>The Test of Time - my life and days,</u> Dhaka: UPL, p.150.

৫৩ আহাদ, অলি, প্রাগুক্ত, পৃ–১৬৪।

৫৪ খাঁ, ফজলুর রহমান (১৯৮৮): 'মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী: শতাব্দীর নায়ক' <u>মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী,</u> ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ–৮৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

appears to have been forced on him. The Prime Minister agreed and formed a new cabinet that included General Iskander Mirza, General Ayub Khan and industrialist Ispahani".[৫৫]

এ ঘটনা এমন একটি সময় ঘটল যখন সংবিধান খসড়া কমিটি সংবিধান তৈরির কাজ শেষ করে ফেলেছে এবং এমনকি, উক্ত কমিটি সংবিধানের খসড়ায় স্বাক্ষরদানও করে ফেলেছেন, অক্টোবরের ২৬ তারিখে গণপরিষদে এটাকে অনুমোদন করা হবে বলে বৈঠকের দিন ধার্যও করা হয়েছে, অথচ তার মাত্র তিন দিন আগে এ ধরনের একটি অগণতান্ত্রিক কাজ করে বসলেন গোলাম মোহাম্মদ। এ পরিস্থিতিতে স্পীকার তমিজ উদ্দীন খান স্থির থাকতে পারেন নি। তিনি এর প্রতিবাদ করলেন এবং সামরিক-বেসামরিক আমলাদের থেকে সাংঘাতিক রকমের হুমকি ও বাধা প্রদান সত্ত্বেও এর সুরাহার জন্য আদালতের আশ্রয় নিলেন।[৫৬] আদালতের শরনাপন্ন হতে গিয়ে মৌলভী তমিজউদ্দীন খান কি ধরনের চাপ, হুমকি ও গুন্ডামির সম্মুখীন হয়েছিলেন সে অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে বলেন :

"The case was filed in the morning of the 7th of November, 1954, by Advocate Manzar-e-Alam, and Maulvi Khan spent the whole day in the Court library for fear of being picked up on the way. Before the filing of the case, the Administration did all it could to persuade and threaten Maulvi Khan - the persuaders included such powerful personalities as Minister General Iskander Mirza, Commissioner Nagvi of Karachi, Secretary M.B. Ahmad of the constituent Assembly and so on, in addition to the leaders from West and East Pakistan who joined the new Ministry."[৫৭]

মৌলভী তমিজউদ্দিন খানের এ মামলা সে সময় সাংঘাতিকভাবে পাকিস্তানের উভয় অংশে সাড়া জাগিয়েছিল। সকল স্তরের মানুষ এ মামলার সমর্থনে এগিয়ে আসেন। শুধু রাজনীতি সচেতন বা শিক্ষিত মানুষই যে শুধু এগিয়ে এসেছিল তা নয়, অশিক্ষিত, অসচেতন, রাজনীতি থেকে বহু দূরে অবস্থান করে এমন অসংখ্য সাধারণ মানুষও এ মামলার সমর্থনে পথে নামেন। এই সাধারণ মানুষ হয়তঃ আইনের মারপ্যাচ বুঝতো না, গণপরিষদের গুরুত্ব কিংবা গণপরিষদ বাতিল ও স্বৈরাচারী সরকারের মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন ধারণা ছিলনা কিন্তু সাধারণ মানুষের একথা বুঝতে মোটেই ভুল হয়নি যে, স্বৈরাচারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এটা ছিল মৌলবী খানের একটি ন্যায্য সংগ্রাম।[৫৮]

সিন্ধু কোর্টে অনুষ্ঠিত এ মামলায় তমিজুদ্দীন খান জিতে ছিলেন সত্য, কিন্তু ভারত শাসন আইন ১৯৩৫ অনুসারে গণপরিষদের যে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল তার ওপর গভর্নর জেনারেলের হস্তক্ষেপের ক্ষমতা সীমিত থাকলেও ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা আইন অনুসারে গভর্নর জেনারেলের হাতে যে চুড়ান্ত ক্ষমতা এসে যায়, তাতে করে এ ধরনের ঘটনায় গভর্নর জেনারেলের বিরুদ্ধে স্পীকারের জয়লাভ করার কোন বাস্তব ভিত্তি ছিল না। আর তাইতো, সিন্ধু কোর্টের রায় সম্পর্কে যখন পাকিস্তান ফেডারেল কোর্টে আপিল করা হয় তখন আর উক্ত রায় বলবৎ থাকতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত আদালতের বিচারে তমিজুদ্দীন খানের হার হয়েছিল সত্য, কিন্তু জনগণের বিচারে গোলাম মোহাম্মদের অধীনস্থ তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার যৌক্তিক হয়ে ওঠেনি। আর এ ধরনের একটি সরকারের আইন মন্ত্রী হিসাবে হোসেনশহীদ সোহরাওয়ার্দী যখন শপথ গ্রহণ করেন তখন তার অত্যন্ত প্রিয়পাত্রগণও এ ঘটনাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি।[৫৯] কিন্তু খুব অল্প দিনের মধ্যে সংবিধান রচনা, সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠা, অচিরেই সোহরাওয়ার্দীকে প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ, শেখ মুজিবের মুক্তি এবং মওলানা ভাসানীর দেশে ফেরৎ আনার আশ্বাসের প্রেক্ষিতে অগত্যা সবাই এ ব্যাপারটি মেনে নেন।

এ সময় সংবিধান প্রস্তুতি পরিষদ গঠনকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু অগণতান্ত্রিক অধ্যাদেশ পূর্ব বাংলায় খুবই অসন্তোষ সৃষ্টি করে। বিশেষত: পাকিস্তানের উভয় অঞ্চল থেকে সমসংখ্যক সদস্য গ্রহণের বিষয়টি পূর্ব বাংলার কোন রাজনৈতিক দলই মেনে নেয় নি। অন্যদিকে, পাকিস্তান ফেডারেল কোর্ট এ অধ্যাদেশের বিপক্ষে রায় দেয়। কোর্টের রায়ে বলা হয় প্রাদেশিক পরিষদ শুধুমাত্র জাতীয় পরিষদ সদস্য নির্বাচিত করতে পারে। ফলে কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী তার দল আওয়ামী লীগসহ খুবই সমালোচনার সম্মুখীন হন।[৬০]

পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদে মুসলিম লীগের নাজুক অবস্থার কারণে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার এটা খুব ভাল করেই উপলব্ধি করে যে, যুক্তফ্রন্ট যদি ঐক্যবদ্ধ থাকে তাহলে তাদের ভোটে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় গণপরিষদের অধিকাংশই হবে আওয়ামী লীগ সদস্য। ফলে কেন্দ্রে মুসলিম লীগ সরকার টিকে থাকার আর কোন বাস্তবতা থাকবেনা। গভর্নর জেনারেল স্বয়ং এবং প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী উভয়ই ব্যক্তিগতভাবে যুক্তফ্রন্টের মধ্যে ভাঙ্গন ধারাবার চেষ্টা করেন। যেহেতু, মোহাম্মদ আলী বগুড়া পূর্ব বাংলার মানুষ, সেহেতু যুক্তফ্রন্টে ভাঙ্গন না ঘটানো পর্যন্ত তার নিজের সদস্য পদটি পর্যন্ত অনিশ্চিত থেকে যায়। শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হককে বহু প্রলোভন দেখানো হলেও অন্ততঃ এ সময়ের জন্য তিনি সংগ্রামের পথই বেছে নেন। অবশ্য, রাজনৈতিক অঙ্গনে ফজলুল হক সম্পর্কে নানা রকম অপপ্রচার চলতে থাকে। এ ফাঁদে পা দেন সদ্য মুক্তি প্রাপ্ত আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিব। তিনি যুক্ত ফ্রন্টের নেতা হিসাবে ফজলুল হকের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন। এর ফলে যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গনের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। আবুল মনসুর আহমদ ও তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিঞার শত চেষ্টা সত্ত্বেও, এমনকি, কলকাতা থেকে মওলানা ভাসানীর সংবাদপত্রে ফ্রন্ট না ভাঙ্গার জন্য বিবৃতি দেবার পরও শেখ মুজিবকে এ প্রচেষ্টা থেকে বিরত করা যায়নি।[৬১] শেখ মুজিবের কিছু কৌশলের অভাব এবং কিছু একগুয়েমী মানসিকতা যুক্তফ্রন্টকে শুধু ভাঙ্গনের মুখে ঠেলে দেয়নি, আওয়ামী লীগকেই ভাঙ্গনের মুখোমুখি এনে দাড় করায়। আওয়ামী লীগের ৩৮ জন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য দল থেকে বেরিয়ে যান। ফলে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ হয়ে পড়ে সংখ্যালঘু। পূর্ব বাংলা থেকে ৩১ জন জাতীয় পরিষদ সদস্যের মধ্যে মাত্র ১২ জন আওয়ামী লীগ সদস্য নির্বাচিত হন ।[৬২] এভাবে প্রাদেশিক রাজনীতিতে আওয়ামী লীগের বিপর্যয় ঘটে এবং যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে কেন্দ্রীয় রাজনীতিতেও আওয়ামী লীগ নাজুক অবস্থায় পড়ে। ফলে

---

৫৫ Khan, Tamizuddin, op.,cit., p.1-51.
৫৬ Ibid, p.151.
৫৭ Ibid, p.151.
৫৮ Ibid, p.152.
৫৯ আহমদ, আবুল মনসুর (১৯৮৮): প্রাগুক্ত, পৃ-২৭৬-৭৮।
৬০ প্রাগুক্ত, পৃ-২৮১-৮২।
৬১ হোসেন, তফাজ্জল (১৯৮১): প্রাগুক্ত, পৃ-৬৮-৬৯।
৬২ আহমদ, আবুল মনসুর (১৯৮৮): প্রাগুক্ত, পৃ-২৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৫ সালের ১০ই আগষ্ট কেন্দ্রে মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও অন্যান্য দলের কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী হন প্রধান মন্ত্রী এবং তার অধীনে এ.কে. ফজলুল হক পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে সপথ গ্রহণ করেন।[৬৩]

চৌধুরী মোহাম্মদ আলী মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হওয়ার পর পরই পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট প্রথা কার্যকরী হয়। পাঞ্জাবের অধিবাসী ও একজন জাঁদরেল প্রাক্তন আমলা হিসাবে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীই ছিলেন পাঞ্জাবের শিল্পপতি শ্রেণী ও কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রের প্রকৃত প্রতিনিধি। এক ইউনিট প্রথা চালু করার প্রশ্নে অন্যান্য প্রদেশ থেকে বিরোধীতা আসতে পারে বিবেচনায় আপোষ ফর্মূলা হিসাবে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রাক্তন গভর্নর ও একজন প্রভাবশালী জমিদার খান সাহেবকে নবগঠিত পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়।[৬৪] ইতিমধ্যে ১৯৫৬ সালের ২০শে জানুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ দল নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর উদ্দেশ্য ছিল, নব নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের মধ্য থেকে পাঞ্জাব কেন্দ্রিক সদস্যদের নিয়ে একটি শক্তিশালী প্রাদেশিক সরকার গঠন করা, কিন্তু প্রাদেশিক গভর্নরের হস্তক্ষেপের কারণে তা সম্ভব হয়নি। বরং খান সাহেব নব নিযুক্ত গভর্নর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জার অভয় পেয়ে আরো শক্ত হয়ে বসেন। খান সাহেবের মন্ত্রীপরিষদ থেকে কিছু মুসলিম লীগ দলীয় সদস্য পদত্যাগ করলে অন্যদের নিয়ে মন্ত্রীদের শূন্যপদগুলিই শুধু পুরন করা হয়নি, উল্লিখিত বছরের এপ্রিল মাসে মুসলিম লীগের দলত্যাগী সদস্যদের নিয়ে রিপাবলিকান পার্টি নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দলও গঠন করা হয়।[৬৫] এভাবে আবারও রাষ্ট্র প্রধানের সাথে পার্লামেন্ট নেতার দ্বন্দ্ব প্রকাশ হয়ে পড়ে। গভর্নর জেনারেল নামক রাষ্ট্রের শীর্ষ পদাধিকারীর কাছে খাজা নাজিমুদ্দীন থেকে যে জনগণের পার্লামেন্টের পরাজয় সূচীত হয়েছিল, বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর সময় এসে তা শুধু অব্যাহতই থাকেনি, উপরোক্ত ক্ষমতাধর চৌধুরী মোহাম্মদ আলী সরকারের পতনও আসন্ন হয়ে ওঠে। এরপর রিপাবলিকান পার্টির সমর্থন নিয়ে গঠিত হয় সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভা। সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী হয়েই এক ইউনিট প্রথা এবং পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির প্রধান সমর্থক হয়ে ওঠেন।[৬৬] কিন্তু যে দলকে তিনি তাঁর ক্ষমতারোহনের মূল ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন, সামন্ত অধিপতিদের সেই রিপাবলিকান দল অচিরেই এক ইউনিটের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে উপলব্ধি করতে শুরু করে এবং এক ইউনিট বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে। এভাবে এক পর্যায়ে সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভারও পতন ঘটে। ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসে মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও কয়েকজন হিন্দু সদস্যের সমর্থন নিয়ে চুন্দ্রিগড় মন্ত্রীসভা গঠিত হয় এবং এর মাত্র ৫৯ দিন পর মুসলিম লীগ ও রিপাবলিকান পার্টির সমন্বয়ে গঠিত হয় ফিরোজ খান নুন মন্ত্রী পরিষদ। বলাবাহুল্য, এ দু'টি দলই এ পর্যায়ে ঘোর এক ইউনিট ও সামরিক চুক্তি বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেছিল। আর এ ফিরোজ খান নুন মন্ত্রী সভার আমলেই সাধারণ নির্বাচনের সামান্য কয়েকমাস আগে সামরিক বাহিনী সাংবিধানিক সরকারকে বরখাস্ত করে নিজের হাতে ক্ষমতা তুলে নেয়।

১৯৫৫ সালে পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে যাওয়ার পর থেকে পাকিস্তানী রাজনীতি, বিশেষতঃ পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে এমন ঘটনা সংঘটিত হয় যে, পাকিস্তানী রাজনীতির চরিত্রেও আমূল পরিবর্তন সূচিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। জাতীয় স্বাধীনতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং গণতন্ত্র সম্পর্কে গতানুগতিক ধারণার মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। আর এ পরিবর্তনের নেতৃত্ব দেন মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী।

জন্মলগ্ন থেকে আওয়ামী মুসলিম লীগের মধ্যে একাধিক রাজনৈতিক প্রবণতার অস্তিত্ব থাকলেও অভ্যন্তরীণ বিরোধগুলি অনেকদিন পর্যন্ত প্রকাশ্যে দেখা দেয়নি। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের পর এ বিরোধগুলি স্পষ্টতর হয়ে উঠতে থাকে। প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা প্রতিষ্ঠার সময়ও মন্ত্রী মনোনীত হওয়ার জন্য শেখ মুজিবের আচরণের জন্য আওয়ামী মুসলিম লীগ তার রাজনৈতিক ভাবমূর্তি হারিয়েছিল সত্য, কিন্তু শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বে তথা মওলানা ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে তেমন কোন বিরোধের প্রতিফলন সে সময় ঘটেনি। তবে এ দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে যে কিছু পার্থক্য ছিল তার পূর্বাভাস ১৯৫৪ সালের প্রথম দিকেই পাওয়া গিয়েছিল। যুক্তফ্রন্টের জয়ের পর ১৯৫৬ সালের ১৪ই এপ্রিল ফ্রন্টের কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে মওলানা ভাসানী নানা বিষয়ে আলোচনা ছাড়াও স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হানিকর সামরিক চুক্তির তীব্র বিরোধিতা করেন। কিন্তু প্রধান অতিথির ভাষনদানকালে সোহরাওয়ার্দীর কাছে সামরিক চুক্তি সম্পর্কে তার মতামত জানতে চাওয়া হলে তিনি খানিকটা এ চুক্তির সপক্ষেই মতামত প্রকাশ করেন।[৬৭] এমন একটি সময়ে সোহরাওয়ার্দী পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেন, যখন তিনি একজন বিরোধী দলের নেতা। তখন এ চুক্তির বিপক্ষে বললে কার কোন ক্ষতি হত না। পরবর্তীকালেও সোহরাওয়ার্দী সামরিক চুক্তিসহ পাকিস্তানের বিভিন্ন সামরিক চুক্তিকে বলিষ্ঠভাবে সমর্থন করেন। সামরিক চুক্তির পক্ষে যে শক্তিশালী যুক্তি ছিল তা হচ্ছে; সামরিক দিক থেকে প্রতিবেশী ভারতের তুলনায় পাকিস্তান খুবই দুর্বল, আর ভারতের রয়েছে আগ্রাসী প্রবণতা; তাই ভারতের আগ্রাসনের হাত থেকে কার্যকরীভাবে রক্ষা পাওয়ার জন্যই এ ধরনের নিশ্চয়তামূলক চুক্তির প্রয়োজন রয়েছে।কেননা মার্কিন ছাড়া অন্য কোন দেশ এ নিশ্চয়তা দিতে পারেনা। অন্যদিকে, এর বিপক্ষের যুক্তি ছিলঃ পাক-মার্কিন চুক্তিসহ পাকিস্তানের বিভিন্ন সামরিক চুক্তির উদ্দেশ্য পাকিস্তানের জন্য যাই থাকুক না কেন, তা বিশেষভাবে রাশিয়া ও চীনসহ বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশকে ঘেরাও করার মার্কিনী পরিকল্পনার অংশ। পাকিস্তানের নিরাপত্তার প্রয়োজন হলে মধ্যপ্রাচ্যসহ অন্যান্য দেশের সাথে এ ধরনের চুক্তি করা যেতে পারে। এপ্রশ্নগুলি নিয়ে আওয়ামী লীগের মধ্যে ঘোরতর বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। আওয়ামী লীগের মধ্যে উপরোক্ত দু'টি চুক্তির সপক্ষে কর্মী ও নেতারা দ্রুত বিভক্ত হয়ে পড়েন। উক্ত দু'টি চুক্তিকে বিশ্লেষণ করলে তার কয়েকটি দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠেঃ

(১) ভারত যে একটি আগ্রাসী দেশ সে ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত ছিল না;
(২) পাকিস্তানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার ব্যাপারেও কোন ভিন্নমত ছিলনা;
(৩) মার্কিনের সাথে কিংবা তার কর্তৃত্বাধীন সামরিক জোটের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার সপক্ষে কয়েকটি শক্তিশালী যুক্তি ছিলঃ

---

৬৩ প্রাগুক্ত, পৃ-৩১১।
৬৪ খান, মুহাম্মদ আইয়ুব (১৯৬৮): প্রভু নয় বন্ধু ঢাকা: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস। পৃ-৭১।
৬৫ প্রাগুক্ত, পৃ-৭১।
৬৬ সোহরাওয়ার্দী, হোসেন শহীদ (১৯৮৮): নির্বাচিত বক্তৃতা ও পত্রাবলী সম্পাদনা: শামসুজ্জামান, ঢাকা: অক্ষর, পৃ-৩৩-৪৪, পৃ-৫৩-৬৫।
৬৭ আহাদ, অলি, প্রাগুক্ত, পৃ-১৮০-৮১।

Dhaka University Institutional Repository

(ক) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গণতান্ত্রিক পৃথিবীর একমাত্র শক্তিশালী দেশ যার সাথে সামরিক চুক্তি করলে নিরাপত্তার দিক থেকে সত্যিকার নিশ্চয়তা আসতে পারে। কেননা মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ বা আর যে সকল সম্ভাব্য বন্ধু দেশ রয়েছে - তারা সামরিক দিক থেকে এতটা দুর্বল যে, নিজেদের নিরাপত্তাকেই নিশ্চিত করতে সক্ষম নয়। ফলে পাকিস্তানের নিরাপত্তার প্রয়োজন হলে এরা কোনই ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবেনা। তাই এসব দেশের সাথে সামরিক চুক্তি করা একেবারেই মূল্যহীন।

(খ) মার্কিনের সাথে সামরিক চুক্তি করাতে চীন বা রাশিয়ার কোন স্বার্থের বিঘ্ন ঘটবে বলে তো পাকিস্তান তার নিজের নিরাপত্তার প্রশ্নকে স্থগিত রাখতে পারেনা। উপরন্তু, মার্কিন বা তার সমর্থকদের সাথে চুক্তি না করে যদি কোন শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক দেশের সাথে চুক্তি করা হয় তাহলে তো একইভাবে মার্কিন স্বার্থও ক্ষুন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে;

(গ) পাকিস্তান একটি দরিদ্র দেশ এবং সেই হিসাবে নিরাপত্তার প্রশ্ন ছাড়াও বহুবিধ আর্থিক বা প্রযুক্তিগত সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে – তা একমাত্র মার্কিন বা তার জোটভুক্ত দেশগুলির কাছ থেকেই পাওয়া সম্ভব। ইত্যাদি;

(৪) সামরিক চুক্তিসমূহের বিপক্ষের যুক্তিগুলি হচ্ছেঃ

(ক) মার্কিন সাহায্য নিয়ে কোন দেশ নিজেদের আর্থিক বা সামাজিক অবস্থার উন্নতি করেছে এরকম কোন উদাহরণ পৃথিবীতে নেই;

(খ) মার্কিনের সকল সাহায্যই শর্তাধীন, আর এসব চুক্তিতে এমন শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়, যাতে সাহায্যপ্রাপ্ত দেশের আর্থিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়;

(গ) পৃথিবীর শ্রমজীবি ও মেহনতী মানুষের যারা বন্ধু সেই সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সাথে অযথা শত্রুতামূলক সম্পর্ক জড়িয়ে যেতে হয়;

(ঘ) সর্বোপরি, এ ধরনের চুক্তিকে সমর্থন করা আওয়ামী লীগের নীতি ও আদর্শগত শৃংখলা ভঙ্গের সামিল।[৬৮]

উপরোক্ত যুক্তিগুলি থেকে দেখা যায় যে শৃঙ্খলা ভঙ্গের প্রশ্নটিকে বাদ দিলে পার্থক্যের মূল বিষয়টি হচ্ছে, আওয়ামী লীগ আমেরিকা তথা ধনতান্ত্রিক বিশ্বের পক্ষে থাকবে, না রুশ-চীন তথা সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের পক্ষে থাকবে। এ মৌলিক বিষয়টি ছাড়া অন্য যেসব যুক্তি আছে সেসব পরস্পর খন্ডনযোগ্য। ফলে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের পর থেকে সোহরাওয়ার্দী ও ভাসানীর মধ্যে বিরোধের যে পূর্বাভাস পাওয়া গিয়েছিল তার মূলে ছিল ধনতন্ত্র কিংবা সমাজতন্ত্র সমর্থন করার বিষয়টি। মওলানা ভাসানী স্পষ্টতই ধনতন্ত্রের বিপক্ষে অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের সপক্ষে, আর সোহরাওয়ার্দীর স্পষ্টত অবস্থান ছিল ধনতন্ত্রের পক্ষে। আর তাই মওলানা ভাসানী দীর্ঘদিন প্রবাস জীবনযাপন শেষে দেশে ফিরে যখন সামরিক চুক্তিসমূহ সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় বিরোধিতা শুরু করেন তখন থেকেই ধনতন্ত্রের সমর্থক তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার সম্পদনায় পরিচালিত দৈনিক ইত্তেফাকে মওলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ ও কড়া সমালোচনা প্রকাশিত হতে থাকে।[৬৯] উল্লেখ্য, যে সময় ইত্তেফাক মওলানা ভাসানীকে কড়া সমালোচনা করছে সে সময়ও এ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালকরূপে মওলানা ভাসানীর নাম প্রকাশিত হত।

ভাসানী--সোহরাওয়ার্দীর মধ্যেকার এ বিরোধের অন্তঃর্নিহিত তাৎপর্য সম্ভবতঃ আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নি; আর তাই তোফাজ্জল হোসেনের কাছে ইত্তেফাকের মালিকানা পরিপূর্ণভাবে চলে যাওয়ার পর দলীয় মুখপাত্র হিসাবে দৈনিক ইত্তেহাদ প্রকাশ করার ব্যাপারে শেখ মুজিব জোর প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন।[৭০] আর ইত্তেহাদ অচিরেই ইত্তেফাক বিরোধী একটি পত্রিকায় পরিণত হয়। ১৯৫৫ সালের কাগমারীতে সাংস্কৃতিক সম্মেলন উপলক্ষে ইত্তেফাক ভাসানীর বিরুদ্ধে সরাসরি সমালোচনায় অবতীর্ণ হয়, এর সাথে যুক্ত হয় দৈনিক আজাদ। এভাবেই মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক অবস্থানটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে তার বিরোধের মূল বিষয়টিও প্রতিভাত হয়। তবে সাংগঠনিকভাবে এ দুই নেতার মতানৈক্য প্রকাশ্য বিরোধের রূপ নিতে আরো সময় লেগেছিল। এর সূত্রপাত ঘটে ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, যখন বাগদাদ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির মূল কথা ছিল, চুক্তিবদ্ধ যে কোন দেশ প্রয়োজন বোধ করলে তাঁর সেনাবাহিনীর জন্য অপর যে কোন সদস্য দেশের ভূমি ব্যবহারের সুযোগ পাবে।[৭১] সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠার কারণে ইরাক এ জোট থেকে বেরিয়ে যাওয়ায় উক্ত বাগদাদ চুক্তিই সেন্টো (Central Treaty Organization) চুক্তি নামে পরিচিতি লাভ করে। পাকিস্তান ছাড়া এ চুক্তির সাথে যুক্ত অপর তিনটি দেশ হচ্ছে ইরান, তুরস্ক ও বৃটেন। মওলানা ভাসানী এ চুক্তিসহ অন্যান্য সামরিক চুক্তির বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় বিবৃতি দেন। ভাসানী এ বিবৃতিটি ঢাকার বাইরে থেকে পাঠিয়েছিলেন। ততদিনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের মধ্যে সামরিক চুক্তির ব্যাপারটি এতটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এ বিবৃতিটি প্রকাশের আগে সামারিক চুক্তির ঘোর সমর্থক শেখ মুজিব ও আবুল মনসুর আহমদ যাতে ঘুর্ণাক্ষরেও না জানতে পারেন তার জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়।[৭২] এ বিবৃতিটি প্রকাশের পর থেকেই ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দী- এই দুই নেতাকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের মধ্যে স্পষ্টমেরুকরণ শুরু হয়ে যায়।

ধনতন্ত্র আর সমাজতন্ত্র -- এই দু'য়ের প্রতি সমর্থনের ওপর ভিত্তি করেই আওয়ামী লীগের মধ্যে আরো কয়েকটি প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। মওলানা ভাসানী ও তার সমর্থকগণ ব্যাপকভাবে সমাজের শ্রমজীবী মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির সপক্ষে বক্তব্য প্রচার করতে থাকেন। মওলানা ভাসানী তার সকল রাজনৈতিক কর্মকান্ডে কৃষক, শ্রমিক আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দৈনন্দিন সমস্যার প্রশ্নকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে থাকেন এবং এদের স্বার্থরক্ষার প্রশ্নে আওয়ামী লীগের যে সকল নেতা তেমন গুরুত্ব দিতেন না তাদের প্রতি তীব্র সমালোচনা শুরু করেন।[৭৩] এদের প্রতি মওলানার প্রধান অভিযোগ ছিল, তারা দলের সিদ্ধান্তকে অমান্য করছেন। শুধু সামরিক চুক্তি কিংবা শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থের প্রশ্নই নয়, পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনসহ বহুবিধ প্রশ্নে সোহরাওয়ার্দী ও তার সমর্থকদের প্রতি মওলানার এ অভিযোগ ছিল। ভাসানী দেশে ফেরার আগে থেকেই সোহরাওয়ার্দীর সাথে তার সমর্থকদের বিরোধ বেশ প্রকট হতে

---

৬৮ রেজা, শাহ আহমদ (১৯৮৬): ভাসানীর কাগমারী সম্মেলন ও স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম, ঢাকা: গণপ্রকাশনী, পৃ-৯৪-৯৫।

৬৯ খাঁ, ফজলুর রহমান (১৯৮৮): প্রাগুক্ত, পৃ-৫১২।

৭০ প্রাগুক্ত, পৃ-৫১৩।

৭১. Ali, Tariq (1970): op.cit., p.74.

৭২. খাঁ, ফজলুর রহমান (১৯৮৬): প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৪।

৭৩. রেজা, শাহ আহমদ (১৯৬৮): প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১-৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

দেখা যায়। অবশ্য, এ বিরোধ প্রকট হওয়ার ক্ষেত্রে দেশের সংবিধান প্রশ্নে সোহরাওয়ার্দীর মতামত বিশেষ ভূমিকা রাখে। কৃষক-শ্রমিক পার্টি সোহরাওয়ার্দীর এ ধরনের ভূমিকাকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করে। অপর দিকে আওয়ামী লীগের কর্মীরা সরকারের সকল অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপকে নীরবে মেনে নিতে বাধ্য হয়। এ সময় দলগতভাবে আওয়ামী লীগ কী ধরনের বিব্রতকর অবস্থায় পতিত হয়েছিল তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে আবুল মনসুর আহমদের নিম্নোক্ত বিবরণ থেকেঃ

"আওয়ামী লীগের নেতা শহীদ সাহেব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থাকার দরুণ আওয়ামী লীগের কোনও সুবিধাতো হইলই না, বরঞ্চ প্রতিপদে বেকায়দা হইতে লাগিল। গভর্নর-জেনারেল এই সময়ে কতকগুলি বেআইনী ও অগণতান্ত্রিক অর্ডিন্যান্স জারি করিলেন। কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও তার নেতা হক সাহেব জনসভা করিয়া এবং বিবৃতি দিয়া তার প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। এবং তাদের দলের প্রতিনিধি মিঃ আবু হোসেন সরকার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও এই সব অগণতান্ত্রিক কাজের জন্য শুধু শহীদ সাহেবকেই দোষী করিতে লাগিলেন। আওয়ামী লীগ আত্মপক্ষ সমর্থনে কোন সাফাই দিতে পারিল না। কারণ শহীদ সাহেবের মুখ চাহিয়া ঐসব অগণতান্ত্রিক অর্ডিন্যান্সের প্রতিবাদও তারা করিলেন না। আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানীকে দেশে ফিরাইয়া আনিবার আন্দোলনও জনসভা আওয়ামী লীগের বদলে কৃষক-প্রজা পার্টি করিতে লাগিল। এতে আওয়ামী লীগের মর্যাদা দ্রুত হ্রাস পাইতে লাগিল। এই সময় গভর্নর-জেনারেল একটি গণ-পরিষদের বদলে একটি শাসনতন্ত্র কনভেনশন গঠনের জন্য এক অর্ডিন্যান্স জারি করিলেন। এটা স্পষ্টতই অগণতান্ত্রিক হইল। কৃষক-প্রজা পার্টি এই অগণতান্ত্রিক পন্থার তীব্র প্রতিবাদ করিল। তাছাড়া, এই কনভেনশনের সদস্য সংখ্যায় দুই পাকিস্তানের প্যারিটি-প্রবর্তন করায় পূর্ব-বাংলায় সর্বত্র ইহার প্রতিবাদ উঠিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ শহীদ সাহেবের খাতিরে এ সব অন্যায়েরও প্রতিবাদ করিতে বিরত রহিল। আমরা আওয়ামী লীগের কর্মীরা শরমে মরমে মরিতে লাগিলাম। মওলানা ভাসানী কলিকাতা হইতে কনভেনশনের প্রতিবাদে বিবৃতি দিয়া আওয়ামী লীগের মুখ রক্ষা করিলেন। এই সময় কনভেনশনের পক্ষে ক্যানভাস করিবার জন্য শহীদ সাহেব ও ইসকান্দার মির্জা ঢাকায় আসিলেন।"[৭৪]

এরকম একটি পরিস্থিতিতে সোহরাওয়ার্দীর প্রতি ঢাকার রাজনৈতিক মহলে তীব্র অসন্তোষ দানা বেঁধে ওঠে। উক্ত অগণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র কনভেনশনের পক্ষে প্রচার চালানোর জন্য সোহরাওয়ার্দী পূর্ব বাংলায় আসছেন এ খবরে সচেতন রাজনৈতিক মহল আরো ক্ষুব্ধ হন। উপরন্তু ইস্কান্দার মির্জার সফর সঙ্গী হয়ে একই লক্ষ্যে দু'জন পূর্ববাংলায় পদার্পন করছেন এ সংবাদে সোহরাওয়ার্দীর ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি সাংঘাতিকভাবে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। ক্ষমতার প্রতি সোহরাওয়ার্দীর বিশেষ আকর্ষণ যে তার রাজনৈতিক মতামতকেও অতিক্রম করে যেতে পারে এটাই সবার কাছে প্রতিভাত হতে থাকে। এরকম এক পর্যায়ে 'ঢাকার রাজনৈতিক কর্মীবৃন্দ' পরিচয়ে 'ভাসানীকে দেশে প্রবেশ করতে দেওয়ার দাবী' শিরোনামে একটি ইস্তেহার প্রচার করা হয়। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আগমন উপলক্ষে প্রচারিত এ ইস্তেহারে বলা হয়ঃ

"দীর্ঘদিন পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঢাকায় আগমন করিতেছেন। রোগমুক্তি এবং কেন্দ্রীয় সরকারে যোগদানের পর শহীদ সাহেবের এই আগমনী সংবাদ নিঃসন্দেহে আনন্দদায়ক হইত যদি না এই তথাকথিত কনভেনশনে পূর্ববঙ্গ হইতে প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য তিনি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পুলিশ মন্ত্রী মিঃ ইস্কান্দার মির্জাসহ ঢাকায় আগমন করিতেন। তিনি যে তথাকথিত কনভেনশনের সদস্য মনোনয়নের জন্য পূর্ববঙ্গে আগমন করিতেছেন তাহাকে ইতিমধ্যেই বেআইনী ও গণতন্ত্র বিরোধী বলিয়া বিভিন্ন দায়িত্বশীল মহল হইতে অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে। বিশেষভাবে এই কনভেনশনে গণতন্ত্র-বিরোধী সংখ্যা সাম্যের ব্যবস্থা করিয়া পূর্ববঙ্গের ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে পদদলিত করা হইয়াছে। এবং ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা আইনে জনসংখ্যার অনুপাতে গণপরিষদের আসন বন্টনের যে মূলনীতি ঘোষণা করা হইয়াছিল, সংখ্যাসাম্যের ব্যবস্থা করিয়া সেই নীতিকেই হত্যা করা হইয়াছে।"[৭৫]

এ ইস্তেহারে আরো বলা হয়ঃ

".........পূর্ববঙ্গের সাড়ে চার কোটি নির্যাতিত মানুষ আকুল আগ্রহে মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর দেশে প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা করিতেছে। জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় যোগদানের পূর্বে এবং পরে বার বার ঘোষণা করিয়াছেন যে, মওলানা সাহেবকে সঙ্গে লইয়া তিনি পূর্ববঙ্গে আগমন করিবেন; কিন্তু কার্যত আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, যে ব্যক্তি মওলানা সাহেবকে কমিউনিস্ট, দেশদ্রোহী এবং এদেশের সমগ্র মানুষের বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে নানারূপ জঘন্য উক্তি করিয়াছেন, সেই ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়াই পূর্ববঙ্গে আগমন করিতেছেন। ....এই অবস্থায় আমরা মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদিগকে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতেছি যে, মওলানা ভাসানীকে জাতির মহাসংকটক্ষণে দূরে সরাইয়া রাখিয়া যদি কোনরূপ অবৈধ কার্যকলাপ দেশবাসীর উপর চাপাইয়া দেওয়া হয়। তবে দেশবাসী তাহা কখনও বরদাস্ত করিবে না।"[৭৬]

ছদ্ম নামে ইস্তেহারটি প্রকাশিত হলেও, তা যে আওয়ামী লীগের কর্মীদেরই কাজ ছিল তা ইস্তেহারের ভাষা থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। এরকম একটি অবস্থায় সোহরাওয়ার্দী পূর্ববঙ্গে এসে তেমন সুবিধা করতে পারেননি এবং কর্মী ও জনগণের কাছ থেকে তীব্র চাপের সম্মুখীন হন। আর সে কারণেই আহূত কনভেনশনের ব্যাপারে আওয়ামী লীগের কি ধরনের মতামত হবে তা মওলানা ভাসানীর দেশে প্রত্যাবর্তন ও তার অনুমোদনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। ফলে শহীদ সোহরাওয়ার্দী পরে যখন পূর্ববঙ্গে আসেন তখন কলকাতা থেকে মওলানা ভাসানীকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে বাধ্য হন।[৭৭] মওলানা দেশে ফিরে উক্ত নীতির তীব্র বিরোধিতা করলেও সোহরাওয়ার্দীর কৌশলী বক্তৃতা ও চাপের মুখে তাঁর অবস্থানে তিনি দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন নি। কিন্তু ততদিনে বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহ সুনির্দিষ্ট একটি অবস্থান গ্রহণ করে ফেলেছে। এ পরিস্থিতির বিবরণ দিতে গিয়ে আবুল মনসুর আহমদ বলেনঃ

"ইস্কান্দার মির্জা কৃষক-শ্রমিক পার্টিকে যা বুঝাইলেন, তার ফল হইল এই যে, পরদিনই হক সাহেবের বাড়িতে কৃষক-শ্রমিক পার্টির আনুষ্ঠানিক সভা ডাকিয়া 'কনভেনশন' ও প্যারিটির তীব্র প্রতিবাদ করিলেন এবং সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন গণ-পরিষদ দাবী

৭৪. আহমদ, আবুল মনসুর (১৯৬৮): প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১-৮২।
৭৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৮২): প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৬।
৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৬-১৭।
৭৭. আহমদ, আবুল মনসুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২-৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

করিলেন। ঐ সংগে প্রস্তাবিত কনভেনশন বয়কট করার প্রস্তাবও গৃহীত হইল। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগও বয়কট প্রস্তাব করিল। আর সব পার্টিই গণতন্ত্র ও পূর্ব বাংলার স্বার্থে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইল। শুধু আওয়ামী লীগ চুপ করিয়া রহিল।"[৭৮]

পরবর্তীকালে শাসনতন্ত্র কনভেনশনের ঘোষণা অবৈধ বলে ফেডারেল কোর্ট রায় প্রদান করলে পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ভাবমূর্তি আরও ব্যাপকভাবে বিনষ্ট হয়।[৭৯] এরকম একটি অবস্থায় মওলানা ভাসানী পূর্ববঙ্গ আওয়ামী লীগের এক কর্মী সম্মেলনের আয়োজন করেন। কর্মিসভার দিন নির্ধারিত হয় ২৬শে নভেম্বর। এই কর্মিসভা ও পরদিন জনসভাকে সামনে রেখে ৬ মাস আগে থেকেই প্রচার কাজ শুরু হয়। ১৯৫৫ সালের মে মাসে উক্ত কর্মী সম্মেলন ও জনসভা সফল করার জন্য মওলানা ভাসানী ২৪ দফা দাবী সংবলিত একটি ইস্তেহার প্রকাশ করেন। এ ইস্তেহারে আওয়ামী লীগের কোন নেতার নাম উল্লেখ করা না হলেও যে সকল কথা বলা হয় তাতে সোহরাওয়ার্দী ও তার সমর্থকদেরই যে আঘাত করা হয়েছিল তা অনেকটা স্পষ্ট। ইস্তেহারের প্রথমেই বলা হয়, "আগামী ১ মাসের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের সভা আহবান করিতে হইবে। বর্তমান সরকার ২১ দফা পালন করিতে ধর্মতঃ ও আইনতঃ বাধ্য। বিশ্বাসঘাতকতা করিলে সমস্ত পূর্ব পাকিস্তান জুড়িয়া গণআন্দোলনের ঝড় বহিয়া যাইবে।"[৮০] এ ২৪ দফা দাবীতে বাংলাভাষা ও স্বায়ত্তশাসনের দাবীসহ ২১ দফার প্রায় সকল দাবীই আরো স্পষ্টভাবে সংযুক্ত করা হয়। উপরন্তু শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিভিন্ন অংশের দাবী অত্যন্ত জোরালোভাবে এখানে উপস্থাপন করা হয়। নতুন যেসব দাবী অর্ন্তভুক্ত হয় সেসবের মধ্যে সামরিক চুক্তি সংক্রান্ত দাবীটি অন্যতম। এ দাবীতে বলা হয়ঃ

"পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি, সিয়াটো চুক্তি, পাক-বাগদাদ চুক্তি প্রভৃতি জাতীয় সংহতির পরিপন্থী সাম্রাজ্যবাদী চুক্তি বাতিল করিতে হইবে। গত সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত অধিকাংশ পরিষদ সদস্য ওয়াদাবদ্ধ হইয়া সামরিক চুক্তি বাতিলের জন্য যে মর্মে দস্তখত দিয়াছিলেন সেই মর্মে আইন পরিষদে প্রস্তাব পাশ করিতে হইবে।"[৮১]

এ ধরনের নতুন নতুন দাবী সংযোজিত হলেও সংখ্যা সাম্যের ব্যাপারটিকে মেনে নেওয়ার কারণে পাকিস্তানের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ মানুষের আবাসস্থল পূর্ব বাংলা স্থায়ীভাবে গণপরিষদের ওপর তার প্রাধান্য থেকে বঞ্চিত হয়। নতুন মনোনীত গণপরিষদে ৮০ জন সদস্যের মধ্যে পূর্ব বাংলা পায় মাত্র ৪০ জন, অথচ এর আগের গণপরিষদে মোট ৭৪ জন সদস্যের মধ্যে পূর্ববঙ্গীয় সদস্য সংখ্যা ছিল মোট ৪৪ জন।[৮২] অর্থাৎ এ পরিবর্তনের ফলে গণপরিষদে তার পূর্বের গুরুত্বের শতকরা ৪৭ ভাগ হ্রাস পায়। অথচ এ ধরনের পরিবর্তনের জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে কোন সম্মতি নেওয়া হয়নি। গণপরিষদে এভাবে পূর্ব বাংলার গুরুত্বহ্রাসের পর পরবর্তী দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কে পূর্ব বাংলার সদস্যদের পক্ষে আর মোটেই শক্তিশালী অবস্থান গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। গণপরিষদে যে বিষয়গুলি বিশেষ গুরুত্ব পায় সেগুলির মধ্যে অন্যতম দু'টি বিষয় হচ্ছেঃ পশ্চিম পাকিস্তানকে এক ইউনিটের অর্ন্তভুক্ত করা এবং পৃথক অথবা যুক্ত নির্বাচন। আগের একটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে, পশ্চিম পাকিস্তানকে এক ইউনিটের অর্ন্তভুক্ত করার অর্থ হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানের অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট রাজ্যকে পাঞ্জাবের একক কর্তৃত্বের আওতাভুক্ত করা। অন্যদিকে, পৃথক নির্বাচনের পদ্ধতিটি বলবৎ রাখলে পূর্ব বাংলার প্রায় এক চতুর্থাংশ সদস্যকে অমুসলিম জনগোষ্ঠী থেকে নির্বাচিত হতে দেওয়া যা' দেশীয় রাজনীতিকে স্থায়ীভাবে সাম্প্রদায়িক দিক দিয়ে বিভক্ত করে রাখা। এর অর্থ এমন একটি শক্তির অস্তিত্বকে মেনে নেওয়া যে, দেশের বিশেষ একটি জনগোষ্ঠীর ভোটে নির্বাচিত হয়েও বৃহত্তর অংশ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন থাকবেন, যা উক্ত বিশেষ জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তার জন্যই হুমকি হয়ে উঠতে পারে। উপরন্তু, একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অঞ্চল পূর্ব বাংলার গণপরিষদ সদস্যগণ যদি সাম্প্রদায়িকভাবে বিভক্ত থাকেন তাহলে যে কোন সময় এ বিভাজনকে কাজে লাগিয়ে পূর্ব বাংলার স্বার্থবিরোধী কোন বিলের পক্ষে গণপরিষদকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। এ সব উপলব্ধি থেকেই আওয়ামী লীগের সদস্যগণ উক্ত দু'টি বিষয়ে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকারের বিপক্ষে দাঁড়ান। শেখ মুজিব প্রকাশ্যে সাংবাদিক সম্মেলন করে ১৯৫৫ সালের আগস্টের শেষ দিকে বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণ এক ইউনিট প্রস্তাব সমর্থন করলে আওয়ামী লীগ এক ইউনিট প্রস্তাব সমর্থন করবে।[৮৩] লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, এ বক্তব্যের মধ্যে ততটা জোর নেই। সরকার গঠন সম্পর্কেও সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শেখ মুজিব এমনভাবে কিছু শর্তারোপ করেন যে, যাকে সহজেই পাশ কাটিয়ে মুসলিম লীগের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠন করা যায়। কেননা, একমাত্র যুক্ত নির্বাচনের প্রশ্নটি ছাড়া সেখানে এমন কোনই শর্তারোপ করা হয়নি যা দেখে মুসলিম লীগের প্রয়োজন পড়লে আওয়ামী লীগকে নিয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠন থেকে পিছিয়ে যেতে হতে পারে।[৮৪] আবুল মনসুর আহমদ, শেখ মুজিব, এমনকি শহীদ সোহরাওয়ার্দীও এ দু'টি বিষয়ে আওয়ামী লীগের গৃহীত বক্তব্য অনুযায়ী গণপরিষদে বক্তব্য রাখেন, কিন্তু নতুন সংবিধান প্রশ্নে এ সকল নেতা যে ভূমিকা পালন করেন তার সাথে আওয়ামী লীগের গৃহীত রাজনীতির কোন সম্পর্ক ছিল না। ঐতিহাসিক মারি অধিবেশনে আওয়ামী লীগের মুখপাত্রগণ যে ভূমিকা পালন করেন তা আরো দুঃখজনক। কেননা, সংখ্যাসাম্য সম্পর্কে আওয়ামী লীগের গৃহীত নীতি ছিল পাকিস্তানের উভয় অংশের সমসংখ্যক সদস্য নিয়ে গণপরিষদ গঠিত হবে কিনা তা গণভোটের মাধ্যমে ফয়সালা করতে হবে, কিন্তু গণপরিষদের নীতি নির্ধারণী বৈঠকে সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সদস্যগণ এ ব্যাপারে মোটেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে না, বরং বিতর্কের এক পর্যায়ে সোহরাওয়ার্দী গণভোট সংক্রান্ত প্রস্তাবটি তুলে নেন এবং নিম্নোক্ত ৫টি মূল নীতির ভিত্তিতে পাকিস্তানের সংবিধান রচিত হবে বলে একমত হনঃ

১. পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল একটি মাত্র প্রদেশের অর্ন্তভুক্ত হবে;

২. দুই অঞ্চলের মধ্যে সংখ্যাসাম্য;

৩. পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন;

৪. যুক্ত নির্বাচন:

---

৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২-৮৩।

৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩।

৮০. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৮২): প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৬।

৮১. প্রাগুক্ত, দাবি নং ৪, পৃ. ৪১৮।

৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৩।

৮৩. সেন, সরলানন্দ (১৯৭৬): ঢাকার চিঠি, ঢাকা: মুক্তধারা, পৃ. ১১৯।

৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯।

Dhaka University Institutional Repository

৫. রাষ্টভাষা হিসাবে বাংলা ও উর্দুর স্বীকৃতি।[৮৫]

যে কোন সময় যাতে গণতন্ত্র বিঘ্নিত না হতে পারে সে ধরনের কোন শর্ত মূলনীতির অর্ন্তভুক্ত করার যে প্রচেষ্টা একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে নেওয়া হয় তাও আওয়ামী লীগ সদস্যগণ সমর্থন করেন না। এমনকি ৯২-ক ধারা বলবৎ করা যাবে না- এ ধরনের বক্তব্য উপস্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও সমর্থনের অভাবে তা অনুমোদিত হয় না। গণপরিষদে আওয়ামী লীগের সদস্যদের এ ধরনের ভূমিকা দেখে মওলানা ভাসানী সাংঘাতিকভাবে ক্ষুব্ধ হন এবং আওয়ামী লীগ সদস্যদেরকে উদ্দেশ্য করে সংবাদপত্রে প্রকাশার্থে বিবৃতি প্রদান করেন কিন্তু সেগুলির কোনটিই যাতে সংবাদপত্র অফিসে না যেতে পারে তার জন্য এক অদৃশ্য শক্তি কাজ করতে থাকে। তার বিবৃতিগুলি প্রকাশিত হচ্ছে না দেখে মওলানা ভাসানী তার আগের বিবৃতিগুলির অনুলিপিসহ নতুন একটি বিবৃতি প্রদান করেন। সে বিবৃতিতে মওলানা ভাসানী বলেন, "দেশের রাজনৈতিক ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে কিছুকাল আমি যে সমস্ত বিবৃতি দিয়েছি, কোন সংবাদপত্রেই তা প্রকাশিত হয়নি জানতে পেরে মর্মাহত হয়েছি। অনুসন্ধান করে আমি জানতে পারলাম, বিবৃতিগুলো সংবাদপত্র অফিসে পাঠানো হয়নি। কোন অদৃশ্য হাত আমার চিঠিপত্র ও বিবৃতি নিয়ে খেলছে তা আমি জানি না....।"[৮৬] যে সকল বিবৃতি গায়েব করে দেওয়া হয়েছিল সেগুলিতে মওলানা ভাসানী পাক গণপরিষদের নারি অধিবেশনে আওয়ামী লীগের ভূমিকার তীব্র ভাষায় নিন্দা করে বলেনঃ

"মারিতে গণপরিষদের অধিবেশন চলতে থাকাকালে আমাদের প্রতিনিধিদের কার্যকলাপে আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি।..... যেভাবে উপজাতি এলাকার সদস্য মনোনয়ন ও পাকিস্তানের একজন বিশিষ্ট নেতা কর্তৃক গণভোটের দাবী বানচাল করে দেওয়া হয়, তা এবং রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্র ট্রাইবুনাল ও ৯২(ক) ধারা পুনঃবৈধকরণ এবং ২২৩(ক) ধারা অবৈধ করার প্রচেষ্টা চলেছে, এমন অগণতান্ত্রিক প্রথায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা জানি না। তবে, গণতন্ত্রের ইতিহাসে তেমন কোন নজির নেই।"

মওলানা ভাসানী আরও বলেনঃ

"অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, ৯২(ক) ধারার মতো একটি অভিশপ্ত আইন বাতিল করার বেলায়ও পূর্ব পাকিস্তানের সদস্যরা একমত হতে পারেননি। আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনা যে, পূর্ব পাকিস্তানের কোন সদস্য ৯২(ক) ধারা পুনর্বৈধ করার পক্ষে ভোট দিতে পারেন।"[৮৭]

আওয়ামী লীগ সদস্যদের দুর্বল ভূমিকার কারণে যখন একটি খসড়া শাসনতন্ত্র রচিত হল তখন দেখা গেল তার বিভিন্ন ধারাগুলি এমনভাবে রচিত হয়েছে যে, পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবীসহ অধিকাংশ দাবীই সেখানে সংযুক্ত হয়নি। মওলানা ভাসানী এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। ১৯৫৬ সালের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের ওপর আওয়ামী লীগের দৃষ্টিভঙ্গীকে পরিষ্কার করার লক্ষ্যে ১৬ই জানুয়ারি আহূত এক জনসভায় মওলানা ভাসানী তাঁর সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে বলেনঃ

"প্রস্তাবিত খসড়া শাসনতন্ত্র পাকিস্তানের সাত কোটি নির্যাতিত জনসাধারণকে চির-শৃংখলাবদ্ধ করার এক মহাষড়যন্ত্র। কিন্তু সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী জাগ্রত পূর্ব বাংলার জনসাধারণ গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে শাসকগোষ্ঠীর এ হীন চক্রান্ত বরদাশত করিবে না। আমরা জীবনের বিনিময়েও কায়েমী স্বার্থবাদীদের রচিত এই গণবিরোধী শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ প্রাচীর গড়িয়া তুলিতে বদ্ধপরিকর।"[৮৮] মওলানা ভাসানী গত ৮ বছরে পূর্ব বাংলার ওপর পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকদের নির্যাতন ও লুণ্ঠনের মর্মস্পর্শী বিবরণ দেন এবং পরিশেষে মন্তব্য করেন, "আমি আশংকা করিতেছি, পূর্ব বাংলার উপর যদি নির্যাতন ও শোষন অব্যাহত থাকে তবে হয়ত দূর ভবিষ্যতে এই প্রদেশের জনসাধারণের ভবিষ্যৎ বংশধর নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে চিন্তা করিবে।"[৮৯] এ জনসভায় বক্তৃতা দানকালে তৎকালীন পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের বিরোধী দলীয় নেতা আতাউর রহমান খান এই খসড়া শাসনতন্ত্রকে কেন্দ্রীয় শাসকচক্রের চাপের মুখে রচিত পূর্ব বাংলার মৃত্যু পরোয়ানা বলে অভিহিত করেন।[৯০] অবশ্য, এ জনসভাতে সংখ্যাসাম্যের বিরুদ্ধে কিছু বলা হয়নি, বরং এক প্রস্তাবে দাবী করা হয় "সংখ্যাসাম্যের ভিত্তিতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ব্যাপারে সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে।"[৯১]

সংখ্যাসাম্যের বিরোধিতা না করলেও সমগ্র পূর্ব বাংলা এ খসড়া সংবিধানকে সামনে রেখে এমন প্রতিবাদী হয়ে ওঠে যে, শহীদ সোহরাওয়ার্দীও শংকিত হয়ে পড়েন। তিনি ১৯৫৬ সালের ৩১শে জানুয়ারি খসড়া সংবিধানের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে বিক্ষুব্ধ পূর্ব বাংলার অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেনঃ

"ওখানকার জনগণ এক উদ্বেগজনক অবস্থায় আছে-- তারা বিচলিত হয়েছে। অবস্থা আসলে এর চাইতেও গুরুতর। সেখানে একটা বিরাট ঝড় আসন্ন এবং এতে আমি শংকিত হয়েছি। কেন্দ্র ও তাদের রচিত শাসনতন্ত্র বিলের প্রতি তাদের আস্থা নেই। তারা চায় তাদের কল্যাণ ও উন্নয়নের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য শাসনতন্ত্রে অবশ্যই যথার্থ রক্ষাকবচ ও বিধি ব্যবস্থা সংযোজিত হতে হবে এবং এ বিষয়ের দায়িত্ব কিছুতেই বর্তমান প্রশাসনের আওতায় দেওয়া যাবে না। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এত ক্ষুব্ধ যে, তার তীব্র চাপের মুখে সেখানকার মন্ত্রীসভা টিকবে কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ আছে।"[৯২] সোহরাওয়ার্দী মওলানা ভাসানী কথিত স্বাতন্ত্র্য চিন্তাকে সমালোচনা করে পাকিস্তানের দুইঅংশের ঐক্যের বাস্তবতাকে ঐতিহাসিকভাবে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন,"আসলে ভারত বিভাগের প্রয়োজনে আমাদের যুক্তিকে জোরদার করার জন্য আমরা দাবী করেছিলামঃ আমরা একজাতি-- আর বাকিরা সবাই আরেক জাতি- এটা ছিল পুরো অযৌক্তিক।..... ইসলামই দুই অংশের মধ্যে প্রধান সেতু বন্ধন বলে সদস্যগণ প্রায়ই বলেন। কিন্তু আমার মতে এ তেমন জোরালো বন্ধন নয়। শুধুমাত্র ইসলামের ভিত্তিতে দুই অংশ এক থাকতে পারে না। ... আপনারা যদি বলেন ইসলামই দুই অংশের যোগসূত্রের মাধ্যম তাহলে আপনারা ভুল করবেন। .... আমাদের দেশের দুই অংশকে সাধারণ একটি সংগ্রামের নিছক স্মৃতিই কেবল ঐক্যবদ্ধ করে রাখছে না। বস্তুত আমাদের ঐক্যবদ্ধতা ও নিরবচ্ছিন্নতার পেছনে আছে দুর্মর অনুভূতি। আর সে অনুভূতিটি হচ্ছেঃ পাকিস্তানের কোন অংশই তার অন্য অংশ ছাড়া বাঁচতে পারে না। সহস্রাধিক দিক থেকে আমরা একে অপরের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং এই অবস্থায় যদি

---

৮৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৮২): প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩০।
৮৬. সেন, সত্যানন্দ (১৯৭৬): প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫।
৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।
৮৮. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৮২): প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৫।
৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৬।
৯০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৫।
৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৫।
৯২. সোহরাওয়ার্দী, হোসেন শহীদ (১৯৮৮): প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০-১১।

Dhaka University Institutional Repository

কেউ বলে, আমরা অন্য অংশের সাহায্য ও সহযোগীতা ছাড়া অন্যত্র আমাদের ভাগ্যের সন্ধান করবো, তবে সেটা তার পক্ষে বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়।"[৯৩]

এভাবে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অযৌক্তিক দাবীকে সমালোচনা করে পাকিস্তানের দুই অংশের ঐক্যের নির্দিষ্ট ভিত্তির কথা উল্লেখ করলেও সোহরাওয়ার্দী বিচ্ছিন্নতার কিছু চিন্তা জাগরিত হওয়ার জন্য পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পক্ষপাতমূলক আচরণকেই দায়ী করেন এবং এই সামান্য কিছু বিচ্ছিন্নতার চিন্তাকে ভাবপ্রবণ অভিব্যক্তি বলে আখ্যায়িত করেন। সোহরাওয়ার্দী বলেন, "দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আমি বলতে চাই এবং এটা আমাদের দাবী যে, পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব রক্ষার ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানবাসীর চেয়ে পূর্ব পাকিস্তানবাসীরা খুব বেশী আগ্রহশীল। .... হঠাৎ আমরা বিচ্ছিন্নতার কথা শুনতে পাই। এটা ভাবপ্রবণ অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। এ হচ্ছে ঘটনার এক যৌক্তিক দিক। অথবা বলা যায়, এ হচ্ছে নিছক যুক্তিবাদী মনের এক বিশ্লেষণাত্মক বহিঃপ্রকাশ মাত্র-- আর এ থেকে আপনাদের এটাই বোঝানো হয় যে, আপনারা যদি দেশের এক অংশের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত না করেন তাহলে হয়তো এই অনুভূতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে।"[৯৪]

এভাবে সোহরাওয়ার্দী তার সমগ্র বক্তৃতায় কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন যার পরিণতি হিসাবে অচিরেই হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী হওয়ার দুয়ারটি খুলে যায়। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে ফয়েজ আহমদ বলেনঃ

"... প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে মোহাম্মদ আলী মন্ত্রী পরিষদে যোগদান করার পর যখন সোহরাওয়ার্দী দেখলেন, প্রতিশ্রুতি মোতাবেক তাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হচ্ছে না, এমনকি মোহাম্মদ আলীর পরিবর্তে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়েছে, তখন সোহরাওয়ার্দী সাংঘাতিকভাবে হতাশ হয়ে পড়েন। মওলানা ভাসানীর সমালোচনার সম্মুখীন হনসোহরাওয়ার্দী। গণপরিষদের মারী অধিবেশনেও পূর্ব বাংলার স্বার্থ রক্ষাসহ বিভিন্ন প্রশ্নে তিনি ইতিবাচক ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হন। এরকম একটি পর্যায়ে খসড়া সংবিধান প্রচারিত হওয়ার পর পূর্ব বাংলায় প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। এসব প্রতিবাদের কথা সোহরাওয়ার্দী তাঁর গণপরিষদ আলোচনাসহ বিভিন্ন আলোচনায় বিশেষভাবে বলতে থাকেন, কিন্তু এভাবে কথা বলার পিছনে তার পূর্ব বাংলার স্বার্থরক্ষা করার ইচ্ছাটি যতটা আন্তরিক ছিল তার চেয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি চাপ সৃষ্টি করে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ইচ্ছাটি ছিল অনেক বেশী প্রবল।"[৯৫] পাকিস্তান পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ ফয়েজ আহমদের উক্ত মন্তব্যকেই যথার্থ প্রমাণ করে। কেননা, পরবর্তীকালে যখন সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিয়োজিত হন তখন এ সকল কথা আর মনে রাখেননি, বরং আওয়ামী লীগের গৃহীত নীতিকে অমান্য করে পাকিস্তানের বিদ্যমান বৈদেশিক নীতির জোর সমর্থক হয়ে ওঠেন। শুধু তাই নয়, পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবীকেও অগ্রাহ্য করতে থাকেন। পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও বৈদেশিক নীতির প্রশ্নে সোহরাওয়ার্দী সরকারের নীতি নিয়ে আওয়ামী লীগের মধ্যে প্রচন্ড মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী হয়েও সোহরাওয়ার্দী পূর্ব বাংলার স্বায়ত্বশাসনসহ আওয়ামী লীগের গৃহীত নীতিকে অনুসরণ করতে পারছেন না কেন এ প্রশ্নে সোহরাওয়ার্দীর পক্ষের যুক্তি ছিলঃ

(১) মাত্র ১২ জন দলীয় সদস্যকে নিয়ে মূলতঃ পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যদের সমর্থনের ওপর ভিত্তি করে প্রধান মন্ত্রীত্ব করতে হচ্ছে, তাই এমন কোন নীতিই প্রকাশ্যে এবং সরাসরি কার্যকরী করা যাবেনা, যাতে পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যগণ বিরূপ হতে পারেন;[৯৬]

(২) সরাসরি পূর্ব বাংলার পক্ষে কোন নীতি গ্রহণ না করা গেলেও সরকার প্রধানের ক্ষমতার মাধ্যমে পূর্ব বাংলার জন্য এমন অনেক কিছুই করা যাবে, যা ক্ষমতা থেকে সরে গিয়ে বহু আন্দোলন করেও আদায় করা যাবেনা।[৯৭]

(৩) দেশের স্থিতিশীলতা রক্ষা করে কিভাবে সাধারণ নির্বাচনটা সম্পন্ন করা যায় সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কেননা প্রতিমূহুর্তে সামরিক শাসন আসার ভয় রয়েছে। অযথা রাজনৈতিক অঙ্গনে বিশৃংখলা হলে সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের সেই সুযোগটিই করে দেওয়া হবে।[৯৮]

(৪) কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে পাক-ভারত বিরোধ একটি স্থায়ী বিরোধে পরিণত হয়েছে। প্রতিমূহুর্তে ভারত পাকিস্তানের ওপর হামলা চালানোর পাঁয়তারা করছে, যতদিন পর্যন্ত কাশ্মীর সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান না হবে ততদিন পর্যন্ত পাকিস্তানের জন্য একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। আর সে কারণেই পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তিসহ বিভিন্ন সামরিক চুক্তির গুরুত্ব এত বেশী করে অনুভূত হবে।[৯৯]

(৫) মওলানা ভাসানী ইস্কান্দার মির্জা প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন। ইস্কান্দার মির্জা একদিকে সোহরাওয়ার্দীর কাছে মওলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনছেন, অন্যদিকে, নানাবিধ সাহায্য-সহযোগীতার আশ্বাস দিয়ে মওলানা ভাসানীর কানভারী করছে । এ কারণে ভাসানী সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে অগ্নিমূর্তি হয়ে তার সকল কর্মকান্ডকেই বিরোধিতা করছেন।[১০০]

অন্যদিকে, তার বিপক্ষের যুক্তি ছিলঃ

(১) আওয়ামী লীগের ১২ জন সদস্য থাকলেও পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগ বিরোধী সদস্য মাত্র ১২ জন নয়, মোট ৩৯ জন। ফলে রিপাবলিকান দলের সাথে জোট করে মন্ত্রী পরিষদ গঠন করা হলেও এমনভাবে সরকার পরিচালনা করা উচিৎ যাতে ক্রমে পূর্ব বাংলার সদস্যদের সমর্থন অর্জন করা সম্ভব হয়। কেননা একথা সব সময় আমাদের মনে রাখা দরকার

৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২-১১৫।
৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩।
৯৫. প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন সংগঠক ফয়েজ আহমদ লেখকের সাথে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে একথাগুলি বলেন।
৯৬. রেজা, শাহ আহমদ (১৯৮৬): প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭।
৯৭. আহমদ, আবুল মনসুর (১৯৬৮): প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১।
৯৮. শামসুদ্দীন, আবু জাফর (১৯৮৯): প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১।
৯৯. আব্দুল্লাহ, কাজী আবু মোহাম্মদ (১৯৭০): শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঢাকা: সোসাইটি ফর পাকিস্তান ষ্টাডিজ, পৃ. ৭৭-৭৮।
১০০. আহমদ, আবুল মনসুর (১৯৬৮): প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১।

Dhaka University Institutional Repository

২১ দফা ভিত্তিক যুক্তফ্রন্টের তারা আমাদের শরিক ছিল, ফলে ২১ দফাকে কার্যকরী করার চেষ্টা করা হলে যুক্তফ্রন্টের অন্যান্য শরিকদের সমর্থন পাওয়া অসম্ভব হবে না।[১০১]

(২) লুকোচুরির কোন ব্যাপার নেই, পুরো পাকিস্তান জানে, সমগ্র বিশ্ব জানে পূর্ব বাংলার মানুষ যুক্তফ্রন্ট এবং তার ২১ দফাকে সমর্থন দিয়েছে। ফলে ২১ দফার অর্ন্তভূক্ত দাবীসমূহকে কার্যকরী করার জন্য লুকোচুরির আশ্রয় নেওয়াটা অপরাধের শামিল। উপরন্তু, আওয়ামী লীগের মূল নীতিকে অবলম্বন করলে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রগতিশীল সদস্য ও পাঞ্জাব ছাড়া প্রাক্তন অন্যান্য প্রদেশের সদস্যদের সমর্থন লাভ করা অসম্ভব নয়।[১০২]

(৩) সামরিক শাসন এসে যেতে পারে বলে সোহরাওয়ার্দী ব্যক্তিগত আলোচনাতে বসে যে কথাগুলি বলছেন তা আদৌও তিনি বিশ্বাস করেন না। কেননা বিভিন্ন সামরিক চুক্তির মাধ্যমেই পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে উত্তরোত্তর শক্তিশালী করা হয় এবং এ সকল সামরিক চুক্তির মাধ্যমে সেনাবাহিনী তার সামর্থ ও কলেবর বৃদ্ধির ফলেই সে আজ নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির জন্য হুমকি হয়ে উঠেছে। অথচ সেই সামরিক চুক্তির পক্ষেই সোহরাওয়ার্দী বিশেষভাবে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। সামরিক বাহিনীর হুমকির ব্যাপারটিকে যদি তিনি সত্যি সত্যিই হুমকি হিসাবে দেখতেন তাহলে সে ব্যাপারটি জনসাধারণের কাছে খোলাখুলি প্রকাশ করতেন এবং এর বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সজাগ করে তোলার জন্য প্রচার আন্দোলন শুরু করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলতেন। কিন্তু তিনি এসব কিছুই বলছেন না।[১০৩]

(৪) আসলে সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করার সুযোগ পেয়ে এমনভাবে বিভোর হয়ে পড়েছেন যে, যে অঞ্চলটি তার শক্তির উৎস সেই পূর্ব বাংলার স্বার্থের কথা তিনি একেবারেই ভূলে গেছেন। তিনি পূর্ব বাংলাসহ পাকিস্তানের অন্যান্য জাতিসত্তার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জাও ক্ষমতাধর সামরিক-বেসামরিক আমলা গোষ্ঠীসহ পাঞ্জাবকেন্দ্রিক রাজনৈতিক নেতৃত্বের মনোরঞ্জনের জন্যই সকল কাজ করে চলেছেন। তাদের যুক্তিগুলিকেই আরো জোরালোভাবে প্রচার করছেন। কেননা যে সামরিক বাহিনীর হুমকির কথা তিনি ঘরোয়া বৈঠকে বলছেন, সেই সামরিক বাহিনীর শক্তিকে বৃদ্ধি করার জন্যই তিনি আবার কাশ্মীর সমস্যাকে টেনে আনছেন। আসলে এগুলি সোহরাওয়ার্দীর একেকটি বাহানা; কেননা, ২১ দফা কিংবা আওয়ামী লীগের গৃহীত সিদ্ধান্তকে ধারণ করেও উপরোক্ত সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। সামরিক জোটে অংশগ্রহণ করে পাকিস্তানই ভারতকে গণভোটের অংগীকার থেকে সরে যাওয়ার অজুহাত করে দিয়েছে।[১০৪]

এরকম একটি রাজনৈতিক পরিবেশেই ১৯৫৭ সালের ৭ ও ৮ই ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইলের কাগমারীতে আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের আগেই ১৯৫৭ সালের ১৩ই জানুয়ারি মওলানা ভাসানীর নামে একটি রাজনৈতিক বক্তব্য ভিত্তিক প্রচারপত্র প্রচারিত হয়। এ প্রচারপত্রে কেন্দ্র ও প্রদেশের আওয়ামী লীগ মন্ত্রীবৃন্দকে নির্দেশ করে বলা হয়ঃ

"এদেশ শুধু মন্ত্রী, মেম্বর, সরকারী কর্মচারীদের নহে-- এদেশ অগনিত জনগণের দেশ। যাহারা এদেশ পরিচালিত করেন, তাহারা শতকরা ৯৫ জন গরীব চাষী, মজুর, কামার-কুমার প্রভৃতি সকল শ্রেণীর জনসাধারণের টাকা দিয়াই চলেন। এ দেশের সরকার জনগণেরই সরকার। তাই জনগণের স্বার্থ রক্ষাকল্পে দুনীর্তি, স্বজনপ্রীতি, চোরাকারবারী প্রভৃতি সকল রকম সমাজবিরোধী কার্য্যকলাপ বন্ধ করার জন্য তরতীতি ত্যাগ করিয়া ঐক্যবদ্ধ হউন। পূর্ব বাংলার বাঁচার দাবী পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আদায়ের দাবী এবং মহান ২১-দফার বাকী ১৪ দফা দাবী পূরণের জন্য বিচ্ছিন্ন জনশক্তিকে আওয়ামী লীগের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করিয়া তুমুল আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে।"[১০৫]

কেন্দ্র ও প্রদেশে আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও উপরোক্ত বক্তব্য প্রকাশের মধ্য দিয়ে সরকারের প্রতি মওলানার অসন্তোষটাই প্রকাশ পায়। যে দাবীসমূহ তখনও অর্জিত হয়নি তা আদায়ের জন্য আন্দোলন করার সংকল্প ঘোষণা করাতে কার্যতঃ সরকারের সাথে সম্পর্কিত নেতৃত্বের প্রতি এক ধরনের হুমকি প্রদান করা হয়। ১৯৫৭ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি প্রচারিত 'কাগমারীর ডাক' শিরোনামের প্রচারপত্রে যে ৬টি শ্লোগান ও বক্তব্য উপস্থাপণ করা হয় তাতেও তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে মতামত সংগঠনের প্রতিই নির্দেশ করা হয়। এ শ্লোগান ও বক্তব্যগুলিতে বলা হয়ঃ

"কাগমারীর ডাক-

(১) সাড়ে চার কোটি বাঙ্গালীর বাঁচার দাবী আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আদায়ের ডাক।

(২) ঐতিহাসিক মহান ২১-দফা আদায়ের ডাক।

(৩) চাষী, মজুর, কামার, কুমার, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী ও শিল্পী সকল শ্রেণীর মিলনের ডাক।

(৪) সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে এশিয়া আফ্রিকার সংগঠিত করার ডাক।

(৫) পূর্ব বাংলায় ৬০ হাজার গ্রামে আওয়ামী লীগকে সংগঠনের ডাক।"

এর পর মওলানা ভাসানীর একটি বক্তব্যকে উদ্ধৃত করা হয়ঃ "২১-দফার পূর্ণ রূপায়ণের জন্য আমাদের নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন চালাইয়া যাইতে হইবে। ইহা সারা পাকিস্তানের সামাজিক ও আর্থিক পরাধীনতার হাত হইতে মুক্তির মহান শপথ, ইহা যেন আমরা কখনও বিস্মৃত না হই।"[১০৬]

তৎকালীন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ও পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকারের সাথে যে সকল আওয়ামী লীগ নেতা জড়িত ছিলেন এ দাবীগুলি তুলে তাদের গৃহীত নীতিকেই যে পরোক্ষভাবে আঘাত করা হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই; কেননা একমাত্র ৫ নং দফা ছাড়া বাকি সকল দফা এমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছিল যে, বিদ্যমান আওয়ামী লীগ সরকার উক্ত দাবীগুলি পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

---

১০১. নূরুল হুদা মির্জার সাথে সাক্ষাৎকার থেকে এ তথ্য পাওয়া যায়।

১০২. ফয়েজ আহমদের সাথে লেখকের সাক্ষাৎকার থেকে এ তথ্য সংগৃহীত।

১০৩. ডঃ আবদুল গফুরের সাথে লেখকের সাক্ষাৎকার থেকে এ তথ্য সংগৃহীত।

১০৪. রেজা, শাহ আহমদ (১৯৮৬): প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।

১০৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৮২)ঃ প্রাগুক্ত, প্রথম খন্ড, পৃ. ৫৯১।

১০৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯২।

১০৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

উপরন্তু, ৪ নং দফাতে সোহরাওয়ার্দী সরকারের গৃহীত বৈদেশিক নীতিকেই প্রত্যক্ষভাবে সমালোচনা করা হয়েছে। স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, তৎকালীন সরকার বুঝি এ দাবীগুলিকে সমর্থন করে না। ৬ই জানুয়ারি মওলানা ভাসানী সমর্থক সংবাদপত্র দৈনিক সংবাদে যখন বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে ভাসানীর বক্তব্য প্রচারিত হল তখন কেন্দ্র ও পূর্ব পাকিস্তানের সরকারের সাথে যুক্ত মন্ত্রীদের সাথে মওলানা ভাসানীর বিরোধটি আরো সুস্পষ্ট রূপ নিল। সংবাদে বড় বড় হরফে শিরোনাম প্রকাশিত হলঃ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি পাকিস্তানের জনগণের প্রকৃত মুক্তি ও শান্তির প্রস্তাব করিবে। বিশ্বশান্তির পরিপন্থী যেকোন প্রকার যুদ্ধজোট পরিত্যাগ ও যুদ্ধচুক্তি বাতিলের দাবী। এ শিরোনামে যখন সংবাদ পরিবেশিত হল তখন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী উক্ত দাবীর পরিপূর্ণ বিরোধী বৈদেশিক নীতিই কার্যকরী করে চলেছেন এবং তার সপক্ষে ব্যাপকতর প্রচার আন্দোলনে নেমেছেন। উক্ত সংবাদের বিবরণীতে বলা হয়ঃ

"মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী অদ্য সন্ধ্যায় এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, "আমি কোন প্রকার যুদ্ধজোট বিশ্বাস করি না। বিশ্ব শান্তি পরিপন্থী যে-কোন প্রকার যুদ্ধজোট মানব সভ্যতা ও মুক্তির পথে বাধাস্বরূপ। ... যত কঠিন বাধাই আসুক না কেন আমি পাকিস্তানের জনগণের ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির জন্য সংগ্রাম করে যাব। কারণ আমি বিশ্বাস করি, এই শক্তিই পাকিস্তানের জনগণের প্রকৃত মুক্তি ও শান্তির পথ প্রশস্ত করিবে।"[১০৭]

এ ঘোষণা করে অবশ্য মওলানা ভাসানী সংগঠনের শৃংখলা বিরোধী কিছু করেননি, কেননা ১৯৫৩, ১৯৫৫ এবং ১৯৫৬ সালে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে গৃহীত প্রস্তাবে সামরিক চুক্তির প্রবল বিরোধিতা করা হয়।[১০৮] কিন্তু কাউন্সিলের প্রাক্কালে সংগঠনের সভাপতির পক্ষ থেকে এভাবে আওয়ামী লীগ দলীয় সরকারকে বিরোধিতা করে প্রকাশ্যে বক্তব্য প্রচার এবং ইত্তেফাক পত্রিকায় এ সকল বক্তব্যের জবাব দান ও মওলানা ভাসানীর তীব্র সমালোচনা[১০৯] আওয়ামী লীগকে রাজনৈতিকভাবে দু'টি স্পষ্ট শিবিরে বিভক্ত করে ফেলে। উভয় পক্ষের কর্মীগণ সিদ্ধান্ত নিয়েই সম্মেলনে আসে। সম্মেলনের প্রাক্কালে ৬ই ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় কাগমারীতে সমবেত প্রায় চার হাজার আওয়ামী লীগ কর্মির সামনে এক ভাষণে মওলানা ভাসানী আরো তীব্রভাবে পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতি ও সামরিক চুক্তিসমূহের বিরোধিতা করেন। মওলানা ভাসানী বলেনঃ 'আমাকে যদি কেহ সামরিক চুক্তি সমর্থন করিতে বলেন, তাহা হইলে কবর হইতেও আমি বলিব না, না, না।"[১১০]

এ নিয়ে তীব্র বাক-বিতন্ডার পর ৮ই ফেব্রুয়ারি রাতে কাউন্সিল সভা কিছু সময়ের জন্য স্থগিত হলে সোহরাওয়ার্দী তার সমর্থকদের নিয়ে ঢাকায় চলে আসেন।[১১১] কাউন্সিল সভা পুনরায় শুরু হলে সোহরাওয়ার্দী সমর্থকদের অনুপস্থিতি আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাদের অনুপস্থিতিতেই পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার চুক্তি সংস্থার সদস্যপদ প্রত্যাহারের দাবীতে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।[১১২] এতে কিন্তু সমস্যার কোন সুরাহা হয়নি। সোহরাওয়ার্দীও তার সমর্থকগণ এ ধরনের প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করে এবং তারা মওলানা ভাসানী বিরোধী তুমুল অপপ্রচারে লিপ্ত হয়। এর পরিণতি স্বরূপ মওলানা ভাসানী ১৯৫৭ সালের ১৮ই মার্চ আওয়ামী লীগের সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে সাধারণ সম্পাদককে তা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করে একটি পত্র লেখেন। এর কয়েকদিন পর মওলানা ভাসানী স্ব নামে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের সমালোচনার জবাবে একটি প্রচারপত্র প্রচার করেন। এ প্রকাশ পত্রে তিনি লেখেনঃ

"গদীর মোহে মুসলিম লীগের সহিত হাত মিলাইয়া যাহারা সাড়ে চার কোটি বাঙ্গালীকে চিরকালের জন্য ক্রীতদাস বানাইতে, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী বিসর্জন দিয়া পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র পাস করিয়াছিল, তাহারাই পুনরায় সাম্রাজ্যবাদীর ও কোটিপতি শোষকদের সহিত হাত মিলাইয়া বর্তমানে আমার ও আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে বিবৃতি, পোস্টার, বিজ্ঞাপন ছড়াইয়া সারা দেশময় মিথ্যা প্রচার শুরু করিয়াছে। এই সব কুচক্রীদের দেশবাসী ভাল করিয়াই চিনে। তাহারাই গত নয় বৎসর ধরিয়া পূর্বপাক তথা পাকিস্তানের অর্থনৈতিক কাঠামোকে চরম বিপর্যয়ের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে।"[১১৩] এর পর উক্ত প্রচার পত্রে তিনি একটি ন্যায্য অথচ সস্তা শ্লোগান এ প্রচারপত্রে জুড়ে দেনঃ 'পাকিস্তানে রাজধানী করাচী হইতে স্থানান্তরিত করা হইলে, পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ জন অধিবাসীর দাবী পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত করিতে হইবে।"

যা'হোক, এরপর বিবৃতি, পাল্টা বিবৃতি, বহিষ্কার, পদত্যাগ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ ভাঙ্গনের দিকে এগিয়ে গেল এবং পরবর্তী জুন মাসে যখন বিষয়টি নিয়ে ভোটাভুটি হল তখন দেখা গেল সোহরাওয়ার্দীর বৈদেশিক নীতির পক্ষেই অধিকাংশ প্রতিনিধি ভোট দান করল।[১১৪] অবশ্য, এ নিয়ে সোহরাওয়ার্দী পন্থীদের সম্পর্কে মারাত্মক সব অভিযোগ রয়েছে; ভাসানী পন্থীদের বড় একটি অংশ ভোটাধীকার প্রয়োগ করার সুযোগই পায়নি বলে মনে করা হয়।[১১৫]

আসলে সে সময় আওয়ামী লীগ রাজনৈতিকভাবেই দু'টি সুস্পষ্ট শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এক দিকে ছিল আন্তর্জাতিক আধিপত্যবাদী শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সামরিক জোট বিরোধী এক শিবির– এ শিবিরকে নেতৃত্ব দেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, তাঁর সাথে যুক্ত হয় মার্কিন বিরোধী পাকিস্তানের উভয় অংশের কমিউনিস্ট মতাদর্শের অনুসারী ও অন্যান্য বাম রাজনৈতিক নেতৃত্ব; অন্যদিকে, ছিল প্রচন্ডভাবে কমিউনিস্ট বিরোধী সামরিক জোটের সমর্থক ও বুর্জোয়া মতাদর্শের অনুসারী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, তাঁর সাথে ছিলেন আওয়ামী লীগের মূল নেতৃত্বের অধিকাংশ। একমাত্র মাহমুদ আলী ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক

---

১০৮. শামসুদ্দীন, আবু জাফর (১৯৮৯): প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩।
১০৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩ আহাদ, অলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১, হোসেন, তোফাজ্জল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩
১১০. রেজা, শাহ আহমদ (১৯৮৬): প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।
১১১. নূরুল হুদা মির্জা ও ফয়েজ আহমদের সাথে সাক্ষাৎকার।
১১২. ফয়েজ আহমদের সাথে সাক্ষাৎকার।
১১৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০২।
১১৪. হোসেন, তোফাজ্জল (১৯৮১): প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।
১১৫ নূরুল হুদা মির্জা গবেষকের কাছে এক সাক্ষাৎকার এ বিষয়ে সোহরাওয়ার্দী পন্থীদের অসদুপায় অবলম্বনের বিস্তারিত বিবরণ দেন।

Dhaka University Institutional Repository

মন্ত্রীসভার সবাই ছিলেন সোহরাওয়ার্দীর সমর্থক। আওয়ামী লীগের দু'টি গোষ্ঠীই পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে একমত ছিল, পার্থক্য ছিল প্রকাশভঙ্গীর ক্ষেত্রে। ভাসানীপন্থীদের যুক্তি ছিলঃ যে পশ্চিম পকিস্তানী নেতৃত্ব দীর্ঘ দশ বছর ধরে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করে এসেছে, পূর্ব পাকিস্তানের ওপর অবিচার করে চলেছে, এমনকি এখনও পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলির ওপর পাঞ্জাবের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে চলেছে তাদের সাথে আপোসের কোন স্থান নেই, বরং সকল অধিকারহীন জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করেই পাঞ্জাবকেন্দ্রিক শাসন-শোষণের অবসান ঘটাতে হবে। অন্যদিকে, সোহরাওয়ার্দীপন্থীদের যুক্তি ছিল আপোসের মাধ্যমে কৌশলে স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। দু'টি গোষ্ঠীর মধ্যে তৃতীয় যে পার্থক্যটি ছিল তাও মতাদর্শগত ভিন্নতা থেকে উদ্ভুত হয়েছিল। মওলানা ভাসানী ইসলামিক সাম্যবাদী আদর্শের দিক থেকে দরিদ্র ও মেহনতী মানুষের ওপর ধনিক সমাজের শোষণ নির্যাতনের বিপক্ষে সোচ্চার ছিলেন; তার সাথে যুক্ত হয়েছিল কমিউনিষ্ট মতাদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ দরিদ্র ও মেহনতী মানুষের প্রতি সংবেদনশীল বিশাল তরুণ রাজনৈতিক কর্মিদল। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রতি এদের কোন আস্থা ছিল না, ফলে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মাধ্যমে যে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনসহ মেহনতী মানুষের মুক্তি আসবে কিংবা ২১ দফা প্রতিষ্ঠিত হবে তাতে এদের বিশ্বাস ছিল অতি সামান্য। অন্যদিকে, সোহরাওয়ার্দী নিজে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সমর্থক হিসাবে কৃষক শ্রমিক মেহনতী মানুষের স্বার্থের চেয়ে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির স্থায়িত্বের প্রতি তার আগ্রহ ছিল অনেক বেশী। সে কারণে একমাত্র শেখ মুজিব ছাড়া সোহরাওয়ার্দীর সমর্থক সকল নেতাই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান তথা পার্লামেন্টের স্থায়িত্বের প্রশ্নে সব সময়ই যত্নবান থাকতেন। পার্লামেন্ট অকার্যকর হয়ে যেতে পারে এরকম কোন পদক্ষেপই তারা নেননি কিংবা তাকে সমর্থন করেননি। অবশ্য শেখ মুজিব যতটুকু করেছেন এতটুকু ব্যক্তিগত কারণেই করেছেন, তবে কমিউনিষ্টবিরোধিতাও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রশ্নে তার সোহরাওয়ার্দীরই সাথে ছিল অধীকতর ঐক্য। ফলে দু'টি গোষ্ঠীর এক সাথে চলার আর কোন ভিত্তিই থাকলো না। ১৯৪৯ সালে যে সাধারণ লক্ষ্যকে সামনে রেখে আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম হয়েছিল তা হচ্ছে মুসলিম লীগ বিরোধিতা, বিশেষতঃ মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক নেতৃত্বের একাধিপত্যের বিরোধিতা। কিন্তু ১৯৫৭ সালে বিরোধিতার মূল লক্ষ্য তথা মুসলিম লীগের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়েছে। সে সময় পাঞ্জাবকেন্দ্রিক একটি সামরিক-আমলাতান্ত্রিক এবং বিকাশমান মুৎসুদ্দী বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে শাসন পূর্ব পাকিস্তানের বিকাশের পথই শুধু রুদ্ধ করে দেয়নি, সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্থানসহ সকল দুর্বল জাতিসত্তার বিকাশের পথেও অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৫৭ সালে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের অস্তিত্বের বাস্তবতা নিয়ে তরুণ সমাজের মধ্যে নতুন করে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে সত্য, কিন্তু আওয়ামী লীগের মধ্যে মূল নেতৃত্বের মাঝে কারো মনেই এ প্রশ্নগুলি উদিত হয়নি।[১১৬] এমনকি মওলানা ভাসানী যে কাগমারীর সম্মেলনে পশ্চিম পাকিস্তানকে 'আসসালামু আলাইকুম' বলেছিলেন তাও তিনি এটাকে কতটুকু বোঝাতে চেয়েছিলেন সে ব্যাপারেও প্রশ্ন করা চলে। কেননা, তিনি পাকিস্তানের এক ইউনিটের যেভাবে বিরোধিতা করেছিলেন এবং পাঞ্জাব ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সপক্ষে যেরকম জোরালো ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাতে কোন ভাবেই চিন্তা করা যায় না যে তিনি একক পাকিস্তানের বিপক্ষে ছিলেন। তিনি যদি কমিউনিষ্ট আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হতেন তাহলেও কথা থাকতো, লেনিনের জাতি বিষয়ক তত্ত্ব দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছেন এবং একটি দেশের মধ্যে থেকেই তিনি বিভিন্ন জাতির মধ্যেকার আভ্যন্তরীণ বিরোধকে মীমাংসার কথা ভেবেছেন, কিন্তু তিনি তা ছিলেন না। ফলে ইসলামী জাতীয়তাবাদ কিংবা দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রভাবই ছিল একক পাকিস্তানের সপক্ষে কথা বলার প্রধানতম কারণ। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠনের পরে একক পাকিস্তানের অস্তিত্ব বজায় রেখে জাতিসমূহের সমস্যার সমাধান করার চিন্তা ভাসানী অনুসারীদের মধ্যে আরো মজবুত ভিত্তি পেলো। কেননা ভাসানীর আহবানে যে ভাবে ন্যাপ গঠিত হল তাতে শুধু পূর্ব পাকিস্তানের ভাসানী সমর্থক আওয়ামী লীগের কর্মীও বিভিন্ন বাম রাজনৈতিক দলসমূহ ছিল না, এ দলের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছিল পাকিস্তান ন্যাশনাল পার্টির সভাপতি সিন্ধুর বিশাল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের বিরোধী দলীয় নেতা জি.এম. সৈয়দ, সীমান্ত গান্ধী, আবদুল গাফফার খান, পশ্চিম পাকিস্তানের প্রগতিশীল তথা বাম আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা পাঞ্জাবের জননেতা মিঞা ইফতেখার উদ্দিন, বেলুচিস্তানের ইংরেজ শাসকদের ত্রাস খান আবদুস সামাদ আচাকজাই, পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হক ওসমানীসহ পশ্চিম পাকিস্তানের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ।[১১৭] মুসলিম লীগের পর এই প্রথম সর্বপাকিস্তানভিত্তিক একটি রাজনৈতিক দলের জন্ম হল। সে সময় কার্যত ন্যাপই একমাত্র সর্বপাকিস্তানী রাজনৈতিক দলে পরিণত হল। কেননা আওয়ামী লীগ রিপাবলিকান দলের সাথে মিলে ক্ষমতায় যেতে সক্ষম হলেও কখনও সেটি সর্বপাকিস্তান ভিত্তিক দলে পরিণত হতে পারেনি। রিপাবলিকান দল ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের একটি আঞ্চলিক দল; কৃষক-শ্রমিক পার্টিও রিপাবলিকান পার্টির মত পূর্ব পাকিস্তানের একটি আঞ্চলিক দল ছিল। সর্বপাকিস্তান ভিত্তিক কমিউনিষ্ট পার্টিরও তখন কোন অস্তিত্ব ছিল না।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ক্ষেত্র সর্বপাকিস্তানব্যাপী হয়ে উঠলেও আওয়ামী লীগের কিন্তু তখন পর্যন্ত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্নে এ ব্যাপারটি মীমাংসা হয়নি। একমাত্র সোহরাওয়ার্দী ছাড়া আওয়ামী লীগ ভাঙ্গনের পর দ্বিতীয় কোন নেতা ছিলেন না যিনি পাকিস্তানের উভয় অংশকে কিংবা এমন কি, পশ্চিম পাকিস্তানকে রাজনীতির ক্ষেত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। পাকিস্তানের উভয় অংশের ঐক্যের গুরুত্বকে উভয় অংশের স্বার্থেই খুবই প্রয়োজনীয় বলে সোহরাওয়ার্দী যেভাবে বলতেন আর কেউই সেভাবে বলতেন না। শেখ মুজিব তো বটেই, আবুল মনসুর আহমদসহ সকল আওয়ামী লীগ নেতাই পার্লামেন্ট বক্তৃতাসহ সকল ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে যত জোরালোভাবে বক্তব্য পেশ করতেন, তার সামান্য পরিমাণে জোর দিয়েও এক ইউনিটের বিপক্ষে কিংবা পাকিস্তানের উভয় অংশের গুরুত্বের পক্ষে কোন কথা বলতেন না। বরং তারা পশ্চিম পাকিস্তানীদের যে কোন সমস্যাকে নিতান্তই পশ্চিম পাকিস্তানীদের সমস্যা হিসাবে দেখতেন।[১১৮] কিন্তু তা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের মধ্যে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অনুসারী এবং একই সাথে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের ঘোরসমর্থক একটি গোষ্ঠী ছিল, যারা ব্যক্তিগতভাবে না হলেও চিন্তা-চেতনাগতভাবে ছিল সোহরাওয়ার্দীর ধ্যান-ধারণার সমর্থক। পূর্ব

---

১১৬ ডঃ আবদুল গফুর সে সময় একজন ছাত্র নেতা ছিলেন, গবেষকের সাথে সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে তিনি তরুণ সমাজের মধ্যেকার এ ধরনের কথা আলোচিত হত বলে জানান। ইনি নিজে ছাত্র ইউনিয়ন করতেন। '৫৭ সালে যখন আওয়ামী লীগ ভেঙ্গে যাচ্ছিল তখন ছাত্রলীগের সোহরাওয়ার্দীপন্থীদের পক্ষ থেকে তাদেরকে ভারতের দালাল, পাকিস্তান ভাঙ্গতে চায়, কমিউনিষ্ট ইত্যাদি বলে সমালোচনা করা হত বলে তিনি জানান।

১১৭ শামসুদ্দীন, আবু জাফর (১৯৮৯): প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১।

১১৮. আহমদ, আবুল মনসুর (১৯৬৮): প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান ছিলেন এদের প্রধান প্রতিনিধি। আবুল মনসুর আহমদও ছিলেন এ গোষ্ঠীরই একজন। অন্যদিকে, এদের ভেতর একক পাকিস্তানের প্রতি তেমন কোন বিশেষ আগ্রহ ছিল না, বরং পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থটাই তাঁরা বেশী করে বিবেচনা করতেন। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রতি আনুগত্যের বিপরীতে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠাও পার্টি প্রাধান্যে বিশ্বাসী অন্য একটি গোষ্ঠীও এদের মধ্যে ছিল। এ গোষ্ঠীর সাথে বয়স্ক পার্টি নেতারা তেমন কেউ ছিলেন না। তরুণ কর্মীরাই ছিল এ গোষ্ঠীর মূল শক্তি; শেখ মুজিব ছিলেন এদের নেতা।[১১৯] এরা পার্টিগত ও সরকারী পদলাভের ন্যূনতম সুযোগও নষ্ট করত না। আদর্শের প্রতি নিষ্ঠার চেয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রশ্নটিই এদের কাছে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ফলে এরা একান্ত ব্যক্তিগত স্বার্থে পার্টির মর্যাদাকে জলাঞ্জলি দিয়ে পার্টি সিদ্ধান্ত অমান্য করে মন্ত্রীত্ব গ্রহণে তৎপর হয়ে ওঠেন। এদিক থেকে সোহরাওয়ার্দীর সাথে এদের ছিল অপূর্ব ঐক্য।[১২০] সব কিছু মিলে মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ থেকে চলে যাওয়ার পর আওয়ামী লীগের যে রাজনীতিটা দাঁড়ালো তাতে কৃষক-শ্রমিক পার্টির সাথে এর পার্থক্য করার আর কোন ভিত্তি থাকলো না। তবে এটা ঠিক, কিছু ব্যক্তিগত বিরোধ এবং কারো কারো মধ্যে ইসলামী মতাদর্শের প্রতি বিশেষ ধরনের দুর্বলতা দু'টি পার্টিকে কখনই এক হতে দেয়নি। কিন্তু মওলানা ভাসানী তার বাম সমর্থকদের নিয়ে চলে যাওয়ার পর আওয়ামী লীগের ইতিপূর্বে দলত্যাগীদের অধিকাংশই আবার আওয়ামী লীগে ফিরে আসে। ন্যাপ সর্বপাকিস্তানব্যাপী একটি রাজনৈতিক দল হওয়া সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হতে লাগলো যে এটি ভারতের দালাল; এরা পাকিস্তানকে ভাংতে চায়। এছাড়া, কমিউনিস্ট আখ্যা দিয়ে এদের বিরুদ্ধে নাস্তিকতার অভিযোগ আনয়ন করতে সক্ষম হয় আওয়ামী লীগ।[১২১]

অন্যদিকে, ফজলুল হকের ব্যক্তিগত প্রভাব এবং প্রাদেশিক পরিষদে গণপরিষদে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সদস্যকে নিয়ে কৃষক-শ্রমিক পার্টি টিকে থাকলো বটে, কিন্তু তার এমন কোন সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্মসূচী কিংবা সাংগঠনিক উদ্যোগ ছিল না, যা দিয়ে সেটি আওয়ামী লীগের বিপরীতে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ধারা হিসাবে টিকে থাকতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইউসুফ আলী চৌধুরী ও হামিদুল হক চৌধুরীর নেতৃত্বে এ পার্টির মধ্যে এমন একটি ধারা ছিল, যা মুসলিম লীগের দ্বিজাতি তত্ত্বভিত্তিক রাজনীতি বিরোধী নয় বরং তারা রাজনীতিতে ইসলামকে ব্যবহার করার ব্যাপারে খুবই উৎসাহী। এরা তৎকালীন নেজামী-ই-ইসলামী পার্টির সাথে রাজনৈতিক আদর্শে ও চিন্তা-চেতনায় ছিল অনেক কাছাকাছি। ফলে তাদের মধ্যে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকেও এক ধরনের আদর্শবাদ কাজ করতো।[১২২]

পাকিস্তানের উভয় অংশের বিশিষ্ট নেতৃত্ব নিয়ে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) নামে যে নতুন দলটি গঠিত হয় তার মূল ৭টি দাবী ছিল দাবীগুলি হচ্ছেঃ

(১) পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিটের অবসান ও সকল প্রদেশের পরিপূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন;

(২) স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি এবং সাম্রাজ্যবাদের সাথে বিদ্যমান সকল সামরিক চুক্তি বাতিল;

(৩) দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান;

(৪) দেশকে শিল্পায়িতকরণ এবং শ্রমজীবী জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন;

(৫) সামন্তবাদের অবসান ও বিপ্লবী কৃষিসংস্কার;

(৬) পাকিস্তানের সকল প্রগতিশীল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধকরণ এবং এশিয়া-আফ্রিকার মুক্তিকামী মানুষের সাথে সংহতি প্রকাশ ও তাদের ন্যায্য সংগ্রামকে সমর্থন দান;

(৭) পাকিস্তানকে সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত করে একটি পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তর করা।[১২৩]

ন্যাপ এ ধরনের রাজনীতি গ্রহণ করে পাকিস্তানে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দানে সক্ষম একটি সর্বপাকিস্তানভিত্তিক দলে পরিণত হয়। স্বাভাবিকভাবেই আওয়ামী লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, নিজাম-ই-ইসলামী পার্টিসহ অন্যান্য কোন দলই এটাকে ভাল চোখে দেখে নি। কিন্তু দু'টি ভিন্ন পারিবারিক পটভূমি থেকে আগত নেতৃত্বকে নিয়ে ন্যাপের জন্ম হয়ঃ পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকাংশ নেতাই ছিলেন সামন্ততান্ত্রিক পরিবারভুক্ত, অন্যদিকে, পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ নেতাই শিক্ষকতা, আইন ব্যবসা, কৃষি কিংবা ট্রেড ইউনিয়ন করার পটভূমি থেকে এসেছিলেন।[১২৪] দেশের দুই অংশের ভিন্নতর সামাজিক কাঠামোর কারণে এ ধরনের পার্থক্য থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। এ পার্থক্য সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃত্বের চেয়ে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃত্ব গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যে কোন কর্মসূচীতে অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে একটুও পিছ-পা হয়নি, কিংবা তাদের শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতা তাদের সামনে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়নি।[১২৫] ফলে ন্যাপ গঠনের পর পাকিস্তানের জাতীয় রাজনীতিতে বিদ্যমান ধারার বাইরে একটি স্বতন্ত্র ধারার বিকাশ ঘটে, যা' একই সাথে জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণ, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা এবং জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী করে। এ ধরনের রাজনীতি গ্রহণ করার কারণেই সমগ্র পাকিস্তানের রাজনীতিতে আরো একটি নতুন প্রক্রিয়া সূচিত হওয়া অনিবার্য হয়ে ওঠে, যার পরিণতি হিসাবে পাকিস্তানের রাজনীতি উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বৃত্ত থেকে বের হয়ে কৃষক-শ্রমিকসহ অন্যান্য মেহনতী মানুষের কাছে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। আওয়ামী লীগের সাথে থাকার সময় থেকেই ভাসানীপন্থীরা শ্রমিক-কৃষকসহ সাধারণ শ্রমজীবী মানুষকে সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে কিন্তু সোহরাওয়ার্দীপন্থীদের বিরোধিতার মুখে তাদের পক্ষে জাতীয় বা প্রাদেশিক ভিত্তিতে তাকে সংগঠিত রূপ দেওয়া সম্ভব হয়নি। ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, চট্টগ্রামসহ সারাদেশে শ্রমিক শ্রেণীকে সংগঠিত করার কাজ আগে থেকেই চলছিল। ৪০ হাজার রেল শ্রমিকের মধ্যে প্রগতিশীল কর্মীরা কাজ করে চলেছিলেন। কিন্তু আওয়ামী লীগের সোহরাওয়ার্দীপন্থীদের হস্তক্ষেপের কারণে সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। কিন্তু ন্যাপ গঠিত হওয়ার পর পরই পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলার শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং সে আন্দোলনকে জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মূল ধারার সাথে সম্পৃক্ত করে পরিচালনার উদ্দেশ্যে মোহাম্মদ তোয়াহা ও হারুন-অর-রশীদের নেতৃত্বে গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান মজদুর ফেডারেশন।[১২৬] অন্যদিকে, কৃষক সমিতি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে মওলানা ভাসানী

---

১১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬২-৬৪।
১২০. প্রাগুক্ত, দেখুন, পৃ. ৪৬৮-৭০।
১২১. আহমদ, মহি, প্রাগুক্ত, পৃ-২৪৪।
১২২. আহমদ, আবুল মনসুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২।
১২৩. Sen, Ranglalal (1986) Political Elites in Bangladesh, Dhaka: UPL, p. 157.
১২৪. Ibid. pp. 157-58.
১২৫. আহমদ, মহি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪।
১২৬. রায়, খোকা (১৯৮৬): সংগ্রামের তিন দশক, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, পৃ. ১৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৫ সালেই সন্তোষে কৃষক-মজদুরদের এক কর্মী সম্মেলন আহবান করেন। কিন্তু শেখ মুজিবের বিরোধিতার কারণে সে উদ্যোগ ব্যর্থ হয়।[১২৭] শ্রমিক ফেডারেশন গঠনের বছরই তথা ১৯৫৮ সালের ৩রা জানুয়ারি ফুলছড়ি ঘাটের বিন্নাফৈর নামক স্থানে এক বিশাল কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের মাধ্যমেই মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি।[১২৮] বলাবাহুল্য, শ্রমিক ফেডারেশন ও কৃষক সমিতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি ও তার সাথে যুক্ত কর্মীদের ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।[১২৯]

ন্যাপ গঠনের মধ্য দিয়ে এভাবে একটি ভিন্ন ধারার রাজনৈতিক দল গড়ে উঠলেও পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে মাওলানা ভাসানী যে কর্মীদের ওপর বিশেষভাবে নির্ভর করতেন তাদের অধিকাংশই ছিলেন এদেশের কমিউনিস্টপার্টির সাথে সম্পর্কিত। ফলে কমিউনিস্ট পার্টির গৃহীত কর্মকৌশলের প্রভাব আওয়ামী লীগ কিংবা পরবর্তীকালে ন্যাপের কর্মকৌশলের ওপর বিশেষভাবেই প্রতিফলিত হত।[১৩০] সে কারণে কমিউনিস্টপার্টির কর্মনীতির ওপর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে খুবই প্রাসঙ্গিক।

৮.২. পঞ্চাশ দশকে কমিউনিস্ট রাজনীতির প্রভাব ও তার ফলাফল

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হওয়ার পর কতকঅনিবার্য কারণে সেটি তার কর্মকান্ড অব্যাহত রাখতে পারেনি। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক কমিটির নেতৃত্বেই পূর্ব পাকিস্তানে পার্টির নীতি, কৌশল নির্ধারণসহ সমুদয় কাজ-কর্ম পরিচালিত হত। ১৯৫১ সালে প্রাদেশিক কমিটির দ্বিতীয় সম্মেলনে পার্টির কর্মকৌশল নিয়ে কয়েকটি প্রশ্নে তীব্র বিতর্ক হয়। তার মধ্যে প্রকাশ্যে কাজ করার প্রশ্নটি হচ্ছে অন্যতম। প্রকাশ্য কর্মীরা আওয়ামী মুসলিম লীগের মধ্যে থেকে কাজ করবেন বলে সিদ্ধান্ত হলেও এ প্রশ্নে অনেক প্রতিনিধি ও সদস্যের তীব্র আপত্তি ছিল।[১৩১] এছাড়া পার্টির কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য এ কর্মকৌশলগত নীতির প্রতি একটি নেতিবাচক মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন।[১৩২] সে কারণে উক্ত সিদ্ধান্ত তখন যথার্থভাবে কার্যকরী হয়নি, বরং কমিউনিস্ট প্রভাবিত রাজনৈতিক কর্মীদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল গণতন্ত্রী পার্টি।[১৩৩] তবে পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টির অনেক সদস্যই আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে নাম পাল্টিয়ে আওয়ামী লীগ রাখাতে নামের ব্যাপারে আর তেমন বিরোধিতা থাকেনি। কিন্তু ১৯৫৬ সালের পার্টি কংগ্রেসে আওয়ামী লীগের মধ্যে থেকে কাজ করা নিয়ে আবার বির্তক শুরু হয়। ঐ সময় দেশে একটি সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠিত এবং আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, বিশেষ করে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ও পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতিকে সমর্থন করছেন- যে রকম একটি পর্যায়ে কমিউনিস্ট পার্টির এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনেও আওয়ামী লীগের মধ্যে থেকে কাজ করা নিয়ে বাদানুবাদ হয়। উক্ত সম্মেলনে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসে গৃহীত থিসিস নিয়েও আলোচনা হয়। সোভিয়েত পার্টির উক্ত থিসিসে বিপ্লবের পথ পরিহার করে শান্তিপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কথা বলা হয়।[১৩৪] আওয়ামী লীগের মধ্যে থেকে কাজ করা এবং শান্তিপূর্ণ পথে সামাজতন্ত্রে উত্তরণের পথ- এ দু'টি প্রশ্নেই মোহাম্মদ তোয়াহা ও সুখেন্দু দস্তিদার বিরোধিতা করেন। কিন্তু প্রথমটিতে মণি সিংহের নেতৃত্বাধীন অংশটি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং তা সিদ্ধান্ত আকারে গৃহীত হয়। কিন্তু শান্তিপূর্ণ পথে সামাজতন্ত্রে উত্তরণের লাইনটি অধিকাংশ প্রতিনিধি কর্তৃক সমালোচিত হলেও মণি সিংহসহ অন্যান্য প্রবীণ নেতার হস্তক্ষেপের কারণে এ বিষয়ে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় নি।[১৩৫] শ্রেণীসংগঠন সম্পর্কেও এ সম্মেলনে বিতর্ক হয়। মণি সিংহ ও তার সমর্থকদের যুক্তি ছিল যে, শ্রমজীবী মেহনতী মানুষকে সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তা আছে বটে, কিন্তু এর জন্য স্বতন্ত্র কোন সংগঠন করতে গেলে আওয়ামী লীগের মধ্যেকার বুর্জোয়া নেতৃত্ব তাতে অখুশি হবেন এবং প্রকাশ্যে কর্মরত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ও সমর্থকগণকে তারা বিচ্ছিন্ন করতে তৎপর হবেন। তাছাড়া, এ মুহূর্তে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানের জন্য আওয়ামী লীগের মত একটি গণতান্ত্রিক সংগঠনকে সর্বাত্মক সহযোগীতা করা প্রয়োজন। কিন্তু শ্রেণী সংগঠন গড়তে গেলে সে সহযোগীতায় বিঘ্ন ঘটবে এবং তাতে গণতান্ত্রিক রাজনীতিই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অন্যদিকে, সুখেন্দু দস্তিদার ও তার সমর্থকদের বক্তব্য ছিলঃ শ্রমজীবী জনতার সংগঠন ও আন্দোলনই গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের নিশ্চয়তা বিধান করতে পারে। বিপ্লবী শক্তির বিকাশের জন্য সংগঠিত শ্রমজীবী জনতার কোন বিকল্প নেই। আর গণতন্ত্র বলতে আমরা সমগ্র জনতার গণতন্ত্রকে বুঝি, গুটিকয়েক উচ্চবিত্তের গণতন্ত্র বুঝি না। তাছাড়া, শ্রমজীবী জনগণের সংগঠিত আন্দোলনই গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সকল ধরনের প্রাসাদ ষড়যন্ত্রকে প্রতিরোধ করতে পারে। সেজন্য শ্রমজীবী জনসাধারণকে সংগঠিত করা প্রয়োজন এবং তাদেরকে শ্রেণী আন্দোলনে সম্পৃক্ত করতে পারলে শুধু তা' অর্জিত হতে পারে।[১৩৬] এ নিয়ে প্রচন্ড বিতর্কের পর সিদ্ধান্ত হয় যে, শ্রমজীবী মানুষের মাঝে কাজ করতে হবে কিন্তু এখনই তাদেরকে নিয়ে কেন্দ্রীয় কোন শ্রেণী সংগঠন করা উচিত হবে না।[১৩৭]

প্রসংগত বলা যায়, কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সম্পর্কিত বা তার সদস্যদের মধ্যে যারা প্রকাশ্য রাজনীতি করতেন তাদের মধ্যেকার এক উল্লেখযোগ্য অংশ সুখেন্দু দস্তিদারের বক্তব্যের সমর্থক ছিলেন এবং এ অংশের অন্যতম প্রধান প্রকাশ্য নেতা মোহাম্মদ তোয়াহা নিজেই ছিলেন ১৯৫৬ সালে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য।[১৩৮] ফলে প্রকাশ্য কাজ-কর্মের ক্ষেত্রে সুখেন্দু দস্তিদারের বক্তব্যের সমর্থকদের প্রাধান্য বেশী ছিল। এ কারণেই উক্ত সম্মেলনের পর পার্টির প্রকাশ্য গণসংগঠনগুলি, বিশেষতঃ ছাত্র

---

১২৭. আহমদ, আলাউদ্দীন (১৯৮৮): 'মওলানা ভাসানী ও শাহপুর কৃষক সম্মেলন' মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ. ৫৪৯।
১২৮. শামসুদ্দীন, আবু জাফর (১৯৮৯): প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩।
১২৯. কমিউনিস্ট নেতা শরদিন্দু দস্তিদার লেখকের সাথে সাক্ষাৎকার প্রদানের সময় এ বিষয়ে সবিস্তারে বর্ণনা দেন।
১৩০. প্রাগুক্ত।
১৩১. প্রাগুক্ত।
১৩২. রায়, খোকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩।
১৩৩. অজয় রায় লেখকের সাথে এক সাক্ষাৎকারে একথা বলেন।
১৩৪. রায়, খোকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪।
১৩৫. শরদিন্দু দস্তিদারের সাথে লেখকের সাক্ষাৎকার।
১৩৬. প্রাগুক্ত।
১৩৭. প্রাগুক্ত।
১৩৮. রায়, খোকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইউনিয়ন, যুবলীগ ও কৃষক-শ্রমিকদের সংগঠনের কাজ খুবই দ্রুতগতি লাভ করে। ফলে কমিউনিস্ট পার্টিরকেন্দ্রীয় কমিটি তার সকল সদস্য ও সমর্থকদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। এমনকি, আওয়ামী লীগের ১৯৫৭ সালের কাগমারী সম্মেলন সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টি যে নীতি গ্রহণ করেছিল তাও কার্যকরী হয়নি; বরং সে সময় কমিউনিস্ট পার্টি এক বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হয়। এ প্রশ্নে মন্তব্য করতে গিয়ে খোকা রায় বলেছেনঃ "আওয়ামী লীগের এ কাউন্সিল বৈঠককে কেন্দ্র করে কমিউনিস্ট পার্টির সামনে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলিও দেখা গিয়েছিলঃ

-- যদি আওয়ামী লীগের ঐ কাউন্সিল বৈঠক সোহরাওয়ার্দীর বিদেশ নীতির বিরুদ্ধে কোন প্রস্তাব গ্রহণ করে, তাহলে সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীত্ব ত্যাগ করতে হবে।

-- অন্যদিকে, যদি ঐ কাউন্সিল বৈঠক প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী সাহেবের প্রতিক্রিয়াশীল বিদেশ নীতি অনুমোদন করে, তাহলে পূর্ব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিশেষ ক্ষতি হবে।

কিন্তু দেশের তৎকালীন পরিস্থিতিতে উপরোক্ত দু'টি অবস্থার কোনটাই কমিউনিস্ট পার্টি কাম্য বলে মনে করে নাই।"[১৩৯]

উপরোক্ত উপলব্ধি থেকে কমিউনিস্ট পার্টি মাঝামাঝি একটি সমাধানের পক্ষে মতামত দিয়েছিল। কিন্তু কাগমারী সম্মেলনে কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক ও সদস্যগণ সে সিদ্ধান্ত কার্যকরী করেননি, বরং তারা বৈদেশিক নীতিসহ সোহরাওয়ার্দী সরকারের আরও কয়েকটি পদক্ষেপের সমালোচনা করেছেন। পার্টির এ সিদ্ধান্তের বাইরে কাগমারী সম্মেলনে যা ঘটেছিল তা ছিল মূলতঃ কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেকার দুই লাইনের বিতর্কেরই প্রতিফলন। তৎকালীন কেন্দ্রীয় কমিটির অধিকাংশ সদস্যই শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য বুর্জোয়া শ্রেণীর সাথে সহাবস্থানের চিন্তা থেকেই আওয়ামী লীগের পাশ্চাত্য অনুসারী বুর্জোয়া প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর প্রতি এ ধরনের প্রীতি অনুভব করেছিলেন। কিন্তু যে সকল সদস্য ও সমর্থকগণ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিকে সমর্থন করতেন না তাদের মধ্যে আওয়ামী লীগের পাশ্চাত্য পন্থী নেতাদের প্রতি কোন প্রীতির ভাব ছিল না। প্রকাশ্যে কর্মরত বামপন্থী এধরনের কর্মীরা তাই মনে প্রাণে সোহরাওয়ার্দীর বিদেশ নীতির বিরোধিতা করেছিলেন। এভাবে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠিত হওয়ার ফলে বামপন্থীদের জন্য শ্রমজীবী জনসাধারণকে সংগঠিত করার কাজ খুবই দ্রুতগতি লাভ করলো বটে, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের সামনে জাতীয় ঐক্যের প্রতীক বলতে আর কোন কিছুর অস্তিত্ব রইল না। যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে যাওয়ার পরও ফজলুল হককে বাদ দিয়ে সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানীর যৌথ নেতৃত্ব পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের কাছে একটি বিকল্প হিসাবে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ ভেঙ্গে যাওয়ার পর ন্যাপকে কেন্দ্র করে শ্রমজীবী জনতার সংগঠিত হওয়ার একটি রাজনৈতিক মঞ্চ তৈরী হলেও জাতীয় তিন নেতা তিন জায়গায় অবস্থান গ্রহণের ফলে সমগ্র মধ্যবিত্ত সমাজসহ ব্যাপক জনতা নেতৃত্ব শূণ্য হয়ে পড়ল। জনসাধারণ ব্যাপকভাবে হতাশাগ্রস্ত হয়ে উঠল এবং তারা আবার মুসলিম লীগের প্রতি কিছুটা অনুরাগী হতে শুরু করল। মুসলিম লীগকে যে আবেগ নিয়ে জনসাধারণ প্রত্যাখ্যান করেছিল যুক্তফ্রন্টের মূল নেতৃত্বের মাঝে এই দ্বন্দ্ব সে আবেগের অবসান ঘটায়।[১৪০] পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের কাছে যুক্তফ্রন্টের সেই ব্যাপক বিজয় যে একটি হুমকি হিসাবে দেখা দিয়েছিল, ন্যাপ গঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে সে অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটলো। তবে সমগ্র পাকিস্তানের প্রেক্ষিতে ন্যাপ ও সামাজিক শক্তি হিসাবে সামরিক-আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আধিপত্যের বিরুদ্ধে আবির্ভূত হতে পারতো। কিন্তু ন্যাপ তার জন্মলগ্ন থেকেই অমীমাংসিত কিছু বিরোধ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। কেন না, ন্যাপ যে রাজনীতিকে সামনে রেখে জন্মলাভ করে, সে রাজনীতি হচ্ছে মূলতঃ জাতীয়তাবাদী রাজনীতি; বৈদেশিক নীতি ও স্বায়ত্তশাসন এ দু'টি প্রশ্ন নিয়ে আওয়ামী লীগের মধ্যে যে বিতর্ক কেন্দ্রীভূত হয়েছিল তা ছিল মূলতঃ জাতীয়তাবাদী রাজনীতিরই বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু এ রাজনীতিকে সামনে রেখে ন্যাপে যেসব শক্তির সমাবেশ ঘটেছিল তাদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশই ছিল কমিউনিস্ট মতাদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত। ফলে স্বাভাবিকভাবেই জাতীয়তাবাদীদের সাথে কমিউনিস্টদের এক সাথে কাজ করতে গেলে প্রকাশভঙ্গীতে পার্থক্য হবে। জাতীয়তাবাদীরা জাতীয় প্রশ্নকে যেমন গুরুত্ব দিতে চায়, কমিউনিস্ট সমর্থকগণ জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তাদের সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর কারণেই সে প্রশ্নে তেমন মনোযোগী হয় না। অপর দিকে, তাদের কাছে শ্রমিক-কৃষকসহ অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণের সংগঠনই প্রাধান্য লাভ করে। কেননা তাদের কাছে স্বায়ত্তশাসন কিংবা গণতন্ত্রের চেয়েও সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন তথা বিপ্লবের প্রশ্নটা অনেক বেশী। আর তাই যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রমজীবী মানুষের সংগঠন ও আন্দোলন একটি দৃঢ় ভিত্তি নিয়ে দাঁড়াতে না পারে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা জাতীয় কোন কর্মসূচী নিয়ে আন্দোলনে অগ্রসর হতে সাহসী হয়নি। আর সেজন্য ন্যাপ গঠিত হওয়ার পর তার জাতীয় কমিটির সভায় যখন সীমান্তগান্ধী খান আবদুল গাফফার খান পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিটকে বিলুপ্ত করে সাবেক চারটি প্রদেশ (পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ) বেলুচিস্তান ও সিন্ধু প্রদেশ অবিলম্বে পুনর্বহালের দাবীতে আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তাব করেন তখন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য বা কমিউনিস্ট রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত নেতারা তার বিরোধিতা করেন। এ প্রস্তাব বিরোধিতাকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন মিঞা ইফতেখার উদ্দীন, মোজাফফর আহমদ ও মোহাম্মদ তোয়াহা।[১৪১] বলাবাহুল্য, এ তিন নেতাই ছিলেন তখন কমিউনিস্ট মতাদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত। অন্যদিকে, ন্যাপের মধ্যে কমিউনিস্ট এবং অকমিউনিস্টদের মধ্যে নেতৃত্বের লড়াই দেখা দেয়। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এ'লড়াই-এ হেরে গিয়ে ঢাকার তৎকালীন বিখ্যাত জননেতা ইয়ার মোহমদ খান ন্যাপ থেকে পদত্যাগ করে আওয়ামী লীগে ফিরে যান। ন্যাপের ময়মনসিংহ জেলা কমিটির বিশিষ্ট নেতারা ন্যাপ থেকে পদত্যাগ করেন। আবু জাফর শামসুদ্দীন ও অলি আহাদের মত নেতারাও এ বিরোধের ফলে হতাশ হয়ে পড়েন। এমনকি, খান আবদুল গাফফার খান বা জি,এম সৈয়দের মত পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা ন্যাপ থেকে চলে যাচ্ছেন বলে প্রচার হয়।[১৪২]

এদিকে, ন্যাপ রাজনৈতিক দল হিসাবে যখন সর্বপাকিস্তান ভিত্তিক একটি দলে পরিণত হয় তখন থেকে শুধু পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের কথা না বলে পাকিস্তানের প্রাক্তন সবগুলি প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন দাবী করতে থাকে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটিকে ভাসানীপন্থীরা সোহরাওয়ার্দীর বিপক্ষে যেভাবে ঘোরতর অভিযোগ হিসাবে উত্থাপন করেছিল, ন্যাপ প্রতিষ্ঠার পর সে সুযোগটিও আর ন্যাপের জন্য থাকলো না; বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতাই ন্যাপের প্রধান শ্লোগানে পরিণত হল। অন্যদিকে,

---

১৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২-৬৩।
১৪০. শামসুদ্দীন, আবু জাফর (১৯৮৯): প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৭-২৯।
১৪১. আহাদ, অলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪।
১৪২. শামসুদ্দীন, আবু জাফর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৭।

Dhaka University Institutional Repository

এক ইউনিটের পক্ষে দাঁড়ানোকে সোহরাওয়ার্দী একটি নীতি হিসাবে গ্রহণ করার ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের রিপাবলিকান দল সোহরাওয়ার্দীর প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে। এরই এক পর্যায়ে সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভার পতন ঘটে। সোহরাওয়ার্দী ব্যক্তিগতভাবেও পশ্চিম পাকিস্তানে জনপ্রিয়তা হারান। এর পরিণতি হিসাবে সোহরাওয়ার্দী একমাত্র পূর্ব পাকিস্তানকেই তার রাজনীতির প্রধান ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নেন। ফলে সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে একটি সংহতি সাধনকারী ভূমিকা পালনে অপারগ হয়ে পড়েন। আওয়ামী লীগ ক্রমেই পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বার্থের কথা জোরে জোরে বলতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা স্বয়ং আতাউর রহমান খান ১৯৫৮ সালের ৪ঠা জুন করাচীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ, কেন্দ্রীয় সামরিক-বেসামরিক চাকুরিতে পূর্ব পাকিস্তানীদের ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চনার ঘোরতর ও গভীর অভিযোগ প্রকাশ্যে আনয়ন করেন।[১৪৩] এভাবেও পূর্ব পাকিস্তানে ন্যাপের আঞ্চলিক গুরুত্ব হ্রাস পায়। অন্যদিকে, আওয়ামী লীগ এবং কৃষক-শ্রমিক পার্টি উভয় দলই তাদের প্রাদেশিক মন্ত্রী সভার আমলে দূর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া, ন্যাপসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্যের বার বার পক্ষপরিবর্তনের ফলে জনসাধারণের কাছে সকল রাজনৈতিক দলই আস্থা হারায়।[১৪৪] এরকম একটি বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের সামরিক-আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নিরংকুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাঁধা প্রদানের আর কেউ কার্যত থাকলো না। সে কারণেই কয়েকদিনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রী পরিষদের কয়েকবার পতন ঘটনোর পর ১৯৫৮ সালের ২৫শে জুন পুনরায় যখন প্রেসিডেন্টের শাসন প্রবর্তিত হল তখন তার প্রতিবাদ করার মত কাউকে পাওয়া যায় নি।[১৪৫]

পূর্ব পাকিস্তানে যখন এরকম একটি বিশৃঙ্খল অবস্থা তখন পশ্চিম পকিস্তানের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় সকল রাজনৈতিক দল তখন ঐক্যবদ্ধ। সেখানকার প্রধান দাবী এক ইউনিটের বিলুপ্তি। এর সাথে পাকিস্তান মুসলিম লীগ নেতা খান আবদুল কাইয়ুম খান তখন হঠাৎ করে মার্কিন বিরোধী হয়ে উঠেন। এমনকি, কাইয়ুম খানের নেতৃত্বে এক ইউনিটের বিলুপ্তি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রতিরোধের দাবীতে ৬০ হাজার লোকের মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ড নামক একটি সংগঠন গড়ে উঠলো।[১৪৬] অন্যদিকে, রিপাব্লিকান দল ক্ষমতাসীন হওয়া সত্ত্বেও এক ইউনিট প্রথা বিলুপ্তির পক্ষে সিদ্ধান্ত নিল এবং ইস্কান্দার মির্জার প্রচেষ্টায় এ দলের জন্ম হওয়া সত্ত্বেও ঘোরতরভাবে প্রেসিডেন্ট মির্জার বিরোধী অবস্থান নিল। ইস্কান্দার মির্জা তার বিশ্বস্ত ডঃ খান সাহেবকে দিয়ে এপর্যায়ে রিপাবলিকান পার্টিতে ভাঙ্গন ধরাবার চেষ্টায় ব্যর্থ হন। অর্থাৎ পাকিস্তান সামরিক--আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মুখপাত্র মির্জার সপক্ষে কার্যতঃ আর কোন দলের অস্তিত্বই পশ্চিম পাকিস্তানে থাকলোনা। তবে রিপাবলিকান পার্টি এক ইউনিট বিলুপ্ত করার পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সামরিক চুক্তিসমূহের বিরোধী ছিল না, কিন্তু ক্ষমতাসীন থাকার কারণে ক্রমে এদল জনবিচ্ছিন্ন হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে, অন্য দুই প্রধান রাজনৈতিক দল তথামুসলিম লীগ ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এক ইউনিট বিলুপ্তি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা --এ দু'টি প্রশ্নে ঐকমত্য পোষণ করার মধ্য দিয়ে নির্বাচনী সমঝোতা গড়ে তোলে।[১৪৭] এদিকে, ইস্কান্দার মির্জার সাথে সোহরাওয়ার্দীর সমঝোতা ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে আওয়ামী লীগ এক ইউনিট এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে থাকা সত্ত্বেও বেশী মাত্রায় পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসন দাবী করতে থাকে। এ কারণে এ দলের উপর নির্ভর করার মত আর অবস্থা থাকলো না। ফলে ইস্কান্দার মির্জার নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র কার্যত রাজনৈতিকভাবে সমর্থনহীন হয়ে পড়লো। এরকম একটি অবস্থায় পাকিস্তান রাষ্ট্র শুধুমাত্র সুযোগের অপেক্ষায় ছিল, যে সুযোগ করে দিয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলীর হত্যা ও নূন মন্ত্রীসভা থেকে আওয়ামী লীগ দলীয় মন্ত্রীদের পদত্যাগ। এভাবেই পরিসমাপ্তি ঘটল পাকিস্তানে আইনের শাসনের।

৮.৩ সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখল ও তার প্রতিক্রিয়া

আগের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে যে, ইস্কান্দার মির্জা সামরিক আইন জারি করার এক সপ্তাহের মধ্যে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের সকল রাজনৈতিক নেতাকেই বিভিন্ন কারণে গ্রেফতার, সকল রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ এবং এ আইন সামান্য পরিমাণেও যাতে লংঘিত না হয় তার জন্য সব রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর সামরিক আইন বলবৎ করার পর রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে একমাত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীই বাইরে থাকতে সক্ষম হন; কেননা সামরিক সরকারের বৈদেশিক নীতি ও পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তিসহ সকল ধরনের সামরিক চুক্তির একমাত্র প্রকাশ্য সমর্থক তিনিই ছিলেন এবং এর সাথে একমাত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীই পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিটকেও সমর্থন করেছিলেন। সোহরাওয়ার্দী সামরিক সরকারের রক্তচক্ষু থেকে রক্ষা পেলেও তার দলের অন্য নেতারাতা পান নি, বরং আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতাই গ্রেফতার হয়ে যান। আতাউর রহমানের মতো দু' একজন অসুস্থ নেতা গ্রেফতার এড়াতে পারলেও তাদের সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়মিত হাজিরা দিতে হত। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীসহ ন্যাপের অধিকাংশ কেন্দ্রীয় নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। হামিদুল হক চৌধুরীসহ কৃষক-শ্রমিক পার্টিরও অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ নেতা গ্রেফতার হন। এধরনের ব্যাপক ধরপাকড় আর সামরিক শাসনের বাধা নিষেধের কারণে প্রকাশ্য

---

১৪৩. আহাদ, অলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭।

১৪৪. কৃষক নেতা নুরুর রহমান লেখকের কাছে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানান, এ সময়ে তিনি ১০ম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। কিন্তু তখনও শ্রদ্ধেয় রাজনৈতিক নেতৃত্বেরএ ধরনের কার্যকলাপে তারা সাংঘাতিকভাবে ব্যথিত হয়েছিলেন এবং অন্যদের সাথে তিনিও ভাবছিলেন এর একটা পরিবর্তন দরকার। এমন কি তিনি এ কথাও ভাবছিলেন, পরবর্তী বছরের নির্বাচনের মাধ্যমে এর কোন সুরাহা হবে না, কেননা, এমন কোন রাজনৈতিক দল তখন পূর্ববাংলায় ছিলনা যে, এককভাবে পূর্ববাংলার সংখ্যাগরিষ্ট আসন দখল করতে পারবে। শুধু নুরুর রহমান নয়, এ ধরনের ধারণা অন্যান্য সাক্ষাৎকার দানকারীরাও পোষণ করতেন।

১৪৫. নুরুল হুদা মির্জার সাক্ষাৎকার।

১৪৬. খান, মুহাম্মদ আইয়ুব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।

১৪৭. আহাদ, অলি, প্রাগুক্ত, পৃ-২৫১।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক দলসমূহের তৎপরতা কার্যত প্রায় চার বছর বন্ধ থাকে।[১৪৮] তবে এক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সামরিক শাসনের আগেই দেশের জটিল রাজনৈতিক হালচাল দেখে প্রকাশ্যে কর্মরত অধিকাংশ কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য আত্মগোপন করেন। ফলে সামরিক শাসনের প্রথম আঘাতে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃস্থানীয় কর্মীদের মধ্যে গ্রেফতারের হার ছিল খুবই কম। কেন্দ্রীয় কমিটির ১৩ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র দু'জন এ সময় ধরা পড়েন।[১৪৯] এই দু'জনই প্রকাশ্যে কাজ করতেন। ফলে গোপন পার্টি হিসাবে তার মূল কাঠামোর কোন ক্ষতি হয়নি। তাছাড়া, ৫ সদস্য বিশিষ্ট সম্পাদক মন্ডলীও বহাল ছিল। প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ থাকলেও কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি গোপন প্রক্রিয়ায়ই বেশ সক্রিয়ভাবে কাজ চালাতে থাকে। শুধু কেন্দ্রীয় কমিটিই নয় ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, রংপুর ও বরিশাল জেলা কমিটিগণও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে, পার্টির সাংগঠনিক অবস্থাও নিতান্ত নড়বড়ে ছিল না, ১৯৫২ সাল কিংবা ১৯৫৪ সালে সরকারী দমননীতি শুরু হলে পার্টি যতটুকু শক্তি নিয়ে কাজ করতে পেরেছিল, ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনামলে তার চেয়ে অনেক বেশী সক্রিয় থাকতে সক্ষম হয়।[১৫০] পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে মূল্যায়ন ও কাজের নতুন কৌশল নির্ধারণের জন্য কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় সামরিক শাসনের কারণ ও নতুন পরিস্থিতির মুল্যায়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গোপন ধারায় কৃষক-শ্রমিকসহ শ্রমজীবী জনগণকে সংগঠিত করার কাজ চালিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য ঘোষিত হয় এবং সেই সাথে গুরুত্বপূর্ণ আরো দু'টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়:

(১) সামরিক শাসনের অবসান, দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, রাজবন্দীদের মুক্তি, শ্রমজীবী জনগণের আশু ও জরুরী দাবী পূরণ এবং সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন ইস্যুর ভিত্তিক সামরিক শাসন-বিরোধী সকল দল ও শক্তিকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠন ও যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

(২) পার্টির সভ্য ও কর্মীদের রাজনৈতিক শিক্ষার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে এবং সে লক্ষ্যে পার্টির বেআইনী মুখপত্রটিকে নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ করতে হবে।[১৫১]

উপরোক্ত দু'টি লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের সাথে যোগাযোগের কাজ চলতে থাকে এবং পার্টির বেআইনী মুখপত্র 'মার্কসপন্থী'র নাম পরিবর্তন করে 'শিখা' নামে প্রকাশ করে তা পার্টির মধ্যে প্রচার করা হয়। সে সময় পার্টির ক্যাডারদের রাজনৈতিক শিক্ষা ও পার্টি সংগঠনকে সংহত করার ক্ষেত্রে 'শিখা' বিশেষ অবদান রাখে। পার্টির সদস্য ও কর্মীদের রাজনৈতিক শিক্ষাকে সরকারী করার স্বার্থেই সে সময় রচিত হয় 'সাম্যবাদের ভূমিকা' নামক একখানা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এটিও গোপন প্রক্রিয়ায় পার্টির কাজকে সম্প্রসারিত করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।[১৫২] পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা শচীন বোসের সহযোগী নজরুল ইসলাম বলেন:

"প্রকৃতপক্ষে দেশ বিভাগের পর আইয়ুবের কড়া সামরিক শাসনের চার বছরই ছিল পূর্বপাকিস্তানের কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিকাশ পর্ব। নেতাদের অনেকেই বাইরে থাকলেও তাদের প্রায় সবাই ব্যক্তিগত জীবনে জড়িয়ে পড়েন, কর্মীদের সাথে কোন রকম যোগাযোগ পর্যন্ত তারা রাখতেন না। কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ছিল ভিন্ন ধরনের। যে সকল কমিউনিস্ট কর্মী বাইরে ছিলেন, তারা দৈনন্দিন কাজ হিসাবে পার্টির সাথে যুক্ত ছাত্র, শ্রমিক, কৃষকসহ বিভিন্ন স্তরের মানুষের মাঝে কমিউনিস্ট মতাদর্শকে নিয়ে যান এবং পার্টির গণসংগঠনের কর্মীদেরকে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন। এদের অনেক কর্মীই পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।"[১৫৩]

নজরুল ইসলাম আরো বলেন, "১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রী সভাকে বাতিল করে ৯২-ক ধারা জারি করার অব্যবহিত পর কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলেও প্রকাশ্যে কাজ করার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠন ছিল। পরবর্তী ৩/৪ বছরে কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বেড়েছিল সত্য, কিন্তু এ বিপুল সংখ্যক কমিউনিস্ট প্রভাবিত কর্মীকে কমিউনিস্ট রাজনীতির আদর্শে গড়ে তোলা যায়নি। আউয়ুবের সামরিক শাসনের আমলটিই কমিউনিস্ট পার্টির জন্য সে সুযোগটি করে দেয়।"

ছাত্র ও তরুণদের ভিতর কাজের প্রসার ঘটাবার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির আর একটি পদ্ধতি ছিল এবং তা হচ্ছে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা। কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সম্পর্কিত ছাত্র ও তরুণদের মধ্যে সে সময় যে যেখানে ছিল তারা লেখক সংঘ, নাট্যগোষ্ঠী, গান-বাজনা, এমনকি দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে ছাত্র ও তরুণদের সংগঠিত করে। এ ধরনের কার্যক্রমের প্রভাব ১৯৬২ সালের বৈপ্লবিক ছাত্র আন্দোলনের সময় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঢাকা কলেজের তৎকালীন উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্র শামসুজ্জোহা মানিকের উপলব্ধি থেকে বিষয়টি বেশ পরিষ্কার হয়ে ওঠে।তিনি তার সাক্ষাৎকারে বলেনঃ

"১৯৬০ সালের মাঝামাঝি ঢাকা কলেজে এসে ভর্তি হলাম। নিজের সহপাঠীরাই ছিল একমাত্র পরিচয়ের গন্ডি। সবাই নতুন সাংঘাতিক শূণ্যতা। আমার সহপাঠী কাজী ফারুকের সাথে পরিচয় হওয়ার পর সে শূণ্যতা কেটে গেল। কাজী ফারুক বামপন্থী রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন, এ তথ্যটি অবশ্য অনেক পরে জেনেছি। কাজী ফারুকের সাথে পরিচয় হওয়ায় আগে অনেকের সাথে যোগাযোগ হলেও সমাজ, রাজনীতি ও মার্কসবাদ নিয়ে আলোচনা করার মত কেউ ছিলেন না। দেশে সামরিক শাসন চলছে। সামান্য রাজনৈতিক কথাবার্তাও আইনের চোখে অপরাধ। তাই আমরা ঠিক করলাম আমাদের চিন্তা-ভাবনা প্রকাশের জন্য 'শিখা' নামে একটি দেওয়াল পত্রিকা বের করা হবে। কাজী ফারুক আর আমার যৌথ সম্পাদনায় প্রতি সপ্তাহে একটি করে পত্রিকা বের হয়। এ কাজের মধ্য দিয়ে আরো দুইচারজন আমাদের সাথে এসে মিশলো। সারা জীবনের সঞ্চিত সমস্ত অভিজ্ঞতাছোট ছোট প্রবন্ধে প্রকাশ হতে লাগলো। কোনটার প্রচন্ড প্রশংসা আবার কোনটার মৃদু সমালোচনা - এভাবে চলতে থাকে জ্ঞানের চর্চা। এসব সত্ত্বেও ঢাকা কলেজের মেধাবী ছাত্ররা আমাদের সাথে খুব একটা মিশতো না, বরং এড়িয়ে চলতো কিন্তু তার মধ্যেও যে কিভাবে আমাদের একটি স্বতন্ত্র অবস্থান হয়ে

---

১৪৮. আহমদ, আবুল মনসুর, প্রাগুক্ত, পৃ-৪৮৭।
১৪৯. রায়, খোকা, প্রাগুক্ত, পৃ-১৭৪।
১৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪।
১৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫-৭৬।
১৫২. প্রাগুক্ত পৃ. ১৭৬।
১৫৩. নজরুল ইসলামের সাথে গবেষকের সাক্ষাৎকার

Dhaka University Institutional Repository

যায় তা আমরা নিজেরাও টের পায়নি। '৬২ সালে ছাত্র আন্দোলন যখন শুরু হল তখনই দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশের ফলাফল প্রকাশ হতে শুরু করে, আমাদের নিজের অজান্তেই অনেক সিনিয়র ছাত্র থাকতেও আমরা ঢাকা কলেজেরদেওয়াল পত্রিকা প্রকাশক কয়েকজন ছাত্র নেতা হয়ে গেলাম। আমরা ছাত্র ইউনিয়নে যোগ দিলাম, আমাদের দেখাদেখি ঢাকা কলেজের অনেক ছাত্র উক্ত সংগঠনে যোগ দেয়। বলাবাহুল্য, ছাত্রলীগ তখন ঢাকা কলেজে কোন প্রভাব ফেলতেই সক্ষম হল না।"[১৫৪]

এই ছিল সে সময় কমিউনিস্ট পার্টির কাজের ধরন। আর এ ধারায় কাজ করার কারণে ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টি সমর্থিত গণসংগঠনগুলির ওপর, বিশেষ করে ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠনের ওপর কমিউনিস্ট পার্টির প্রায় একচেটিয়া প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সম্পর্কিত নয় এমন ন্যাপ নেতারা সে সময় হয় গ্রেফতার হয়ে জেলে অবস্থান করছেন, নয়তো রাজনৈতিক কর্মকান্ডকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কাজে নিয়োজিত ছিলেন। ফলে ছাত্র ইউনিয়ন এবং শ্রমিক ফেডারেশনের কাজের ওপর সে সময় যতটুকু রাজনৈতিক প্রভাব পড়েছিল তার প্রায় সবটুকুই কমিউনিস্ট পার্টির।[১৫৫] ন্যাপ সে সময় ছাত্র সংগঠন কিংবা শ্রমিক সংগঠনের ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, বরং ন্যাপের ওপরই কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব ছিল প্রবল।

অন্যদিকে, সামরিক শাসনের পর ১৯৬২ সালের পূর্ব পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গ্রেফতার হননি। এ সুযোগটিকে তিনি বিভিন্নভাবে ব্যবহার করতে থাকেন। প্রথমত: দুর্নীতির অভিযোগে যাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছিল তাদের জামিনের জন্য তিনি সক্রিয় প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। সাংঘাতিক সব দুর্নীতি মামলা থাকা সত্ত্বেও সোহরাওয়ার্দী আবুল মনসুর আহমদকে সামরিক আইন জারির কয়েক মাসের মধ্যে মুক্ত করে আনেন।[১৫৬] শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে ৮টি মামলা থাকা সত্ত্বেও সোহরাওয়ার্দীর চৌকস সওয়াল-জওয়াবের মুখে আদালত প্রায় কোন কেসেই শেখ মুজিবকে দায়ী করতে পারেনি। সোহরাওয়ার্দীর অক্লান্ত চেষ্টায় একে একে প্রায় সকল অভিযোগ থেকে মুক্তি পেয়ে শেখ মুজিব জামিন লাভে সক্ষম হন।[১৫৭] শুধু শেখ মুজিব কিংবা আবুল মনসুর আহমদকে মুক্ত করার ব্যাপারেই নয়, সোহরাওয়ার্দী সরকার বিরোধী অনেক রাজনৈতিক নেতার ব্যাপারেই এ সময় খুবই বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। এ সকল মোকদ্দমার সুবাদে সোহরাওয়ার্দী সামরিক শাসন জারির পর থেকেই পাকিস্তানের দুই অংশে বেশ ঘন ঘন যাওয়া-আসা করতে থাকেন। নিতান্ত মোকদ্দমার কারণে সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে যাওয়া-আসা করতেন এরূপ ভাবার কোন যুক্তি নেই। এসবের পিছনে সোহরাওয়ার্দীর ছিল সুনির্দিষ্ট কতকগুলি রাজনৈতিক লক্ষ্য। সোহরাওয়ার্দী সে সময় কি নিষ্ঠার সাথে এবং কি সচেতন উদ্দেশ্য নিয়ে এ কাজগুলি করেছিলেন তা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে আবুল মনসুর আহমদের নিম্নোক্ত বিবরণ থেকে:

"... অত অসুখ, গায়ে ১০৩ ডিগ্রী জ্বর ও পায়ের বুড়া আঙ্গুলের প্রদাহ হেতু পা ফুলিয়া যাওয়ায় জুতা-ছাড়া পর পর কয়টা দিন হাইকোর্টে বক্তৃতা করিয়া সোহরাওয়ার্দী আমাকে খালাস করিলেন। জেলখানা হইতে বাড়ি ফেরামাত্র অসুখ শরীরেই তিনি আমাকে দেখিতে আসিলেন। ঐ শরীর নিয়া আমার জন্য অত কঠোর পরিশ্রম করায় আমার স্ত্রী ও আমি লিডারের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাইলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন: শুধু মৌখিক কৃতজ্ঞতায় তিনি সন্তুষ্ট হইবেন না। তিনি আমার কাছে একটা বড় ফিস্ চান। সে ফিস্ হইতেছে গণ-আন্দোলনের একটা স্কিম।"[১৫৮]

এর পর আবুল মনসুর আহমদ আরো বলেন:

"লিডারের চোখে-মুখে প্রবল আগ্রহ ও দৃঢ় সংকল্প দেখিলাম। কিন্তু আমি যখন বুঝাইলাম বিনা-প্রস্তুতি ও বিনা-ট্রেনিং এ গণআন্দোলন শুরু করিলে পরিনামে তাকে অহিংস রাখা যাইবেনা এবং তাতে রাষ্ট্রের ও খোদ গণআন্দোলনের ক্ষতি হইবে, তখন চট করিয়া লিডার বুঝিয়া ফেলিলেন। গণঐক্য গণআন্দোলনের জন্য অপরিহার্য এবং সে গণঐক্য আসিতে পারে শুধু নেতা-কর্মীদের ঐক্যের মারফত। অত:পর লিডার সেই দিকেই মনোনিবেশ করেন।"[১৫৯]

উপরোক্ত বিবরণ থেকেই পরিষ্কার হয়ে ওঠে সোহরাওয়ার্দী আইয়ুবের কঠিন সামরিক শাসনের আমলেও সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে কত নিষ্ঠার সাথে নীরবে সংগ্রাম করে চলেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অকৃত্রিম বন্ধু হওয়ার কারণে যদিও সোহরাওয়ার্দীকে দুর্নীতি মামলায় কিংবা নিরাপত্তা বন্দী হিসাবে গ্রেফতার করা হয়নি, তবু সোহরাওয়ার্দীর চালচলনের ওপর সামরিক সরকার সর্বক্ষণ সতর্ক দৃষ্টি রাখছিল। অন্যদিকে, প্রথমেই যখন দুর্নীতির অভিযোগ এনে তাকে গ্রেফতার করা হয়নি, তখন পরবর্তীকালে তাকে নিরাপত্তা আইনেই গ্রেফতার করতে হয়। কিন্তু ১৯৫৪ সালের পর থেকে পাকিস্তানের নিরাপত্তার প্রশ্নকে সামনে তুলে ধরে সোহরাওয়ার্দী পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তিসহ বিভিন্ন সামরিক চুক্তিকে এত প্রবলভাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন যে, তাকে নিরাপত্তার আইনে গ্রেফতার করা সহজসাধ্য ছিলনা। সামরিক শাসকগোষ্ঠী ক্রমেই সোহরাওয়ার্দীর গতিবিধিকে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে।

ইতিমধ্যে এবডো জারি করা হয়েছে। দুর্নীতির অভিযোগ কিংবা অন্যকোন কারণে যাদের গ্রেফতার করা যায়নি তাদেরসহ প্রায় সকল রাজনৈতিক নেতার বিরুদ্ধে এবডো আইনে অভিযোগ আনা হয়। বিভিন্ন স্তরের চারটি লিস্টে প্রথমেই ৪৩ জন রাজনৈতিক নেতার নামে অভিযোগ আনা হয়।[১৬০] যাদের নামে প্রথমেই অনেক অভিযোগ এনে গ্রেফতার করা হয়েছিল কিন্তু প্রমাণ ছিল না এরকম দু'একজন ছাড়া প্রায় সকল রাজনৈতিক নেতার বিরুদ্ধে ভিন্ন করে অভিযোগ আনা হয়। আর এ সকল অভিযোগের প্রায় সবই একেবারে হাস্যকর বিধায় প্রহসনমূলক 'বিচার' করে প্রায় সকলেরই অন্ততঃ ৭ বছরের জন্য সাধারণ নাগরিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধেও এবডো আইনে অভিযোগ আনা হয়। আওয়ামী লীগের যে সকল নেতা গ্রেফতার হননি বা হলেও নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন তাদের পরামর্শে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী একটি প্রতীকী লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। এ আইনে আসামীর কোনরকম আইনগত পরামর্শ গ্রহণের অধিকার ছিল না। সোহরাওয়ার্দী নিজেই তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগসমূহকে খন্ডন করার জন্য বিচারালয়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেন। তার বিরুদ্ধে যে সব হাস্যকর অভিযোগ আনা হয়েছিল সেসব অভিযোগ সোহরাওয়ার্দী তার বাগ্মিতা দিয়ে অযৌক্তিক বলে প্রমাণ করেন কিন্তু তাতেও কোন লাভ হয়নি। বিশেষ আদালতের রায়ে

---

১৫৪. শামসুজ্জোহা মানিকের সাথে গবেষকের সাক্ষাৎকার।
১৫৫. অজয় রায়ের সাথে গবেষকের সাক্ষাৎকার।
১৫৬. আহমদ, আবুল মনসুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৩।
১৫৭. খান, আতাউর রহমান (১৯৭০)ঃ স্বৈরাচারের দশ বছর ঢাকা; নওরোজ কিতাবিস্তান, পৃ. ৬৮।
১৫৮. আহমদ, আবুল মনসুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৮।
১৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৮।
১৬০ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৮২)ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দ্বিতীয় খন্ড,পৃ. ২০,২৩।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁরও প্রায় ৭ বছরের জন্য সাধারণ নাগরিক অধিকার হরণ করে নেওয়া হয়।[১৬১] এছাড়া আরও কয়েকজনের এভাবে নাগরিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। কিন্তু সোহরাওয়ার্দীর বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেননা, তিনি একমাত্র বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যিনি সামরিক শাসন আসার পর গ্রেফতার হননি এবং সেই কঠোর সামরিক শাসনের মধ্যেও তিনি বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলিকে খন্ডন করার জন্য আদালত থেকে আদালতে কিংবা পাকিস্তানের এ অংশ থেকে অপর অংশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি বিজয়ী হয়েছেন। পেশাগতভাবে সোহরাওয়ার্দী একজন আইনজীবী হলেও তিনি ছিলেন দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী; শুধু প্রধানমন্ত্রীই তিনি ছিলেন না, পাকিস্তান আন্দোলনেও তার ছিল বিশিষ্ট নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা। সব কিছু মিলে সে সময় জীবিত রাজনৈতিক নেতৃবর্গের মধ্যে তাঁর অবস্থান ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যখন সামরিক আইনের মধ্যেও সরকারের বিরুদ্ধে খানিকটা অবাধে রাজনৈতিক মামলাগুলি পরিচালনা করে চলেছেন তখন তিনিই হয়ে ওঠেন সরকার বিরোধিতার একমাত্র প্রতিনিধি। কেননা, রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয় সে সবের অধিকাংশই ছিল রাজনৈতিক চরিত্রের; কারণ যখন কোন প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আসে সেটার সাথেও থাকে জনসাধারণের সম্পর্ক। দেশের সম্পদ তথা সাধারণ মানুষের সম্পদ নিয়েই মন্ত্রীদের দুর্নীতির সুযোগ থাকে। ফলে এ বিষয় নিয়ে যখন আদালতে সওয়াল-জওয়াব হতে থাকে তখন তা জানার জন্য সাধারণ মানুষের বিশেষ আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। আর সোহরাওয়ার্দী একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা হিসাবে আদালতে দাঁড়িয়ে যখন কথা বলেন তখন তাঁর বক্তব্য গুরুত্ব বহন না করে পারে না। এ সকল কাজের এক পর্যায়ে সোহরাওয়ার্দীর নামে যখন এবডো আইনে অভিযোগ আনা হয় তখন সোহরাওয়ার্দী নিজের কথাগুলিকে আদালতের মাধ্যমে মন খুলে জনসাধারণের কাছে বলার সুযোগ পান। এ সওয়াল-জওয়াবের মাধ্যমে সোহরাওয়ার্দী শুধু নিজের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সমূহেরই উত্তর দেননি, বরং যে সময় মানুষ কোন রকম কথা বলার সুযোগই পাচ্ছে না, ঠিক সে সময় জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে সরকার ঘোষিত আইনগুলিকেই তিনি বিরোধিতা করে চলেছিলেন। সম্ভবত: এ কারণে আইয়ুবের কড়া সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সোহরাওয়ার্দীই একমাত্র প্রতিবাদী কণ্ঠে পরিণত হন। আর সোহরাওয়ার্দী ও অন্যদের চেষ্টায় যখন রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে আনা অধিকাংশ অভিযোগ আদালতের মাধ্যমে মিথ্যা বলে প্রমাণিত হতে লাগলো তখন জেনারেল আইয়ুবের দুর্নীতি দমন ও বিশৃংখলা প্রশমনের নামে গৃহীত পদক্ষেপগুলির আর ন্যায্যতা থাকেনি। অন্তত রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ যে সত্য নয় এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে ওঠে।[১৬২] আর এক্ষেত্রে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ব্যক্তিগত ভূমিকা ছিল অনন্য। সোহরাওয়ার্দী সামরিক শাসনের আমলে এককভাবে যে ভূমিকা রাখেন তা কোন দলীয় ভূমিকা নয়। আর তাইতো সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ব্যক্তি সোহরাওয়ার্দী একক ব্যক্তিত্ব হিসাবে সামনে চলে আসেন। সোহরাওয়ার্দীর সাথে কার কতটা মতপার্থক্য সেটা আর কারো সামনে বড় হয়ে দেখা দেয় নি। তাই সামরিক শাসনের পর প্রথম যখন সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয় তখন দলমত নির্বিশেষে ছাত্র সমাজসহ বিভিন্ন স্তরের মানুষ সামরিক শাসন ভেঙ্গে রাজপথে ব্যাপক ভাবে নেমে পড়ে।[১৬৩] ১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয়। ঢাকার রাস্তায় ছাত্র-জনতা নেমে পড়ল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মঘট হয়ে গেল। অথচ সাড়ে তিন বছর আগে যেদিন মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবসহ দেশের প্রথম সারির নেতাকে গ্রেফতার করে আদালত প্রাঙ্গণে নিয়ে যাওয়া হয়, সেদিন কিন্তু এই ঢাকা শহরের মানুষই সামরিক শাসনের সমর্থনে উল্লাস প্রকাশ করেছিল। এ ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে আতাউর রহমান খান লিখেছেন:

"শেখ মুজিবর রহমান, আবুল মনসুর আহমদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সেদিন গ্রেফতার হয়ে কোর্টে উপস্থিত হলেন, সেদিন হাজার হাজার নাজাতপ্রাপ্ত মানুষ কোর্টের প্রাঙ্গণে জমা হল তামাশা দেখতে। কি উল্লাস তাদের! এঁদের দেখতে পেয়েই হাততালি দিয়ে উঠল। বেশ হয়েছে। উচিত কাজ হয়েছে! মার্শাল ল' জিন্দাবাদ!"[১৬৪]

আতাউর রহমান খান যেভাবে উল্লাস প্রকাশ করার কথা বলেছেন তা যদি সত্যি নাও হয় তাহলেও মানুষ যে এ সকল নেতাকে গ্রেফতার করায় খুশি হয়েছিল এটা ঠিক। আবুল মনসুর আহমদ নিজেই সে কথা স্বীকার করেছেন।[১৬৫] নিঃসন্দেহে এ সকল নেতাকে যখন গ্রেফতার করা হয়েছিল, তার থেকে সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতারের সময়টা সম্পূর্ণ ভিন্ন দিগ। তবে এ কথা খুবই স্পষ্ট যে, জেনারেল আইয়ুব যতদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আস্থা হারাননি, ততদিন সোহরাওয়ার্দী তার জন্য একজন বিপদজনক ব্যক্তি জেনেও তাকে গ্রেফতার করতে পারেন নি।

কমিউনিস্ট পার্টির অব্যাহত সাংগঠনিক তৎপরতা এবং সোহরাওয়ার্দীর ব্যক্তিগত ভূমিকার বাইরেও সামরিক শাসন-বিরোধী মানসিকতা জন্ম নেওয়ার পিছনে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। আর সেটি হচ্ছে বাষট্টির অগ্নিক্ষরা ছাত্র আন্দোলন।

সামরিক শাসন জারি হওয়ার কারণে প্রকাশ্য রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে দেশের ছাত্র সংগঠনগুলি তাদের কর্মতৎপরতার কৌশল পরিবর্তন করে। ছাত্র সংগঠনগুলি সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলকে তাদের কর্মক্ষেত্র হিসাবে বেছে নেয়। কেবল নানা ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডেই নয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রসংসদ নির্বাচনেও তারা সাংস্কৃতিক নাম ব্যবহার করতে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারা দেশে সরকার বিরোধী ছাত্র প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক সংগঠন বা ক্লাবের নাম নিয়ে নিজেদের কর্মকান্ডকে এগিয়ে নিয়ে যায়।[১৬৬] ইতিমধ্যেই এসে যায় একুশে ফেব্রুয়ারি। সামরিক শাসনের ঘোর তখনও কাটেনি, ব্যক্তিগত মতামত বা ইচ্ছা-আকাংখা প্রকাশের জন্য সামান্যতম কথা বলাও যেখানে নিষিদ্ধ, সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা শহীদ দিবসে কালো পতাকা উত্তোলন করে। তারা নগ্ন পদে শোভাযাত্রা করে আজিমপুর গোরস্তান হয়ে শহীদ মিনারে যায়। এখানে একটি সভাও অনুষ্ঠিত হয়। ভাষা শহীদ স্মরণে কার্জন হলেও একটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। সুদূর ভারত থেকে গোপনে শহীদ জব্বারের মাকে সেখানে উপস্থিত করার মধ্য দিয়ে বোঝা যায় কতটা সচেতন লক্ষ্যকে সামনে রেখে এ আয়োজন করা হয়েছিল।[১৬৭]

---

[১৬১] খান, আতাউর রহমান (১৯৭০): প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।
[১৬২] অজয় রায়ের সাথে গবেষকের সাক্ষাৎকার।
[১৬৩] আহমদ, আবুল মনসুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৮।
[১৬৪] খান আতাউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।
[১৬৫] আহমদ, আবুল মনসুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৭।
[১৬৬] হাননান, মোহাম্মদ (১৯৮৭): বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, ঢাকা: ওয়ার্সী প্রকাশনী, পৃ. ৪৫-৪৬।
[১৬৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

সামরিক আইনকে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ প্রথমে স্বাগত জানালেও শ্রমিক সমাজের অবস্থান ছিল ভিন্ন। কেননা, আগের অধ্যায়েই বলা হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানে দেশ বিভাগের পর যে শিল্পায়ন শুরু হয় তাতে বাঙালী উদ্যোক্তাদের কোন প্রায় স্থানই ছিল না। অবাঙালী উদ্যোক্তাগণ রাষ্ট্রের সহায়তায় যে শিল্পায়ন শুরু করে তাতে অভিজ্ঞ ও পেশানিষ্ঠ শ্রমিকদের সবাই ছিল মুহাজির। এ মুহাজিররা ছিল বাঙালী ও অবাঙালীদের নিয়ে গঠিত একটি মিশ্রিত জনগোষ্ঠী। তবে এর মধ্যে অবাঙালী শ্রমিকদের সংখ্যাই ছিল বেশী।[১৬৮] এ কারণে প্রথম দিকে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে স্পষ্ট কোন ভেদাভেদ ছিল না। তবে শ্রমিকদের ওপর যখন নির্বিচার শোষণ-নির্যাতন শুরু হয় তখন থেকে তারা কিছুটা সংগঠিত হতে আরম্ভ করে। আর তাদের ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে যখন প্রতিবাদ করতে শুরু করলো তখনই মালিক শ্রেণী সংগঠিত শ্রমিক-সমাজের বিরুদ্ধে নানারকম চক্রান্তে লিপ্ত হয়। আর এ ষড়যন্ত্রের প্রধান রূপ ছিল সাম্প্রদায়িক উস্‌কানি বা বাঙালী-অবাঙালীদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা। তবে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের পর যখন মুসলিম লীগ ক্ষমতাচ্যুত হল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নানা রকম ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও এক পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনপ্রতিনিধিরা ক্ষমতা পেলেন তখন শ্রমিক-সমাজের ওপর মালিকের বা পুলিশ প্রশাসনের শোষণ-নির্যাতনের মাত্রা একেবারে না সাম্প্রদায়িকতাবে বা জাতিগততাবে শ্রমিক-সমাজকে বিভক্ত করার জন্য ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ খানিকটা হ্রাস পায়।[১৬৯] ফলে শ্রমিক-সমাজ জোটবদ্ধভাবে তাদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া আদায়ের কিছুটা অনুকূল পরিবেশ পায়। কিন্তু সামরিক শাসন জারির কারণে শ্রমিকসমাজের ন্যূনতম মৌলিক অধিকারই শুধু কেড়ে নেওয়া হয়নি। যে সকল দাবী ইতিপূর্বেই অর্জিত হয়েছিল কিংবা প্রতিশ্রুত ছিল সেগুলিও বাতিল করা হয়। সামরিক শাসন ঘোষণার সংবাদ প্রচারিত হওয়ার দিনই চট্টগ্রামের শ্রমিকরা এ অবস্থা আঁচ করতে পারে। আর তাই তারা সে দিনই সামরিক শাসন জারির প্রতিবাদে ব্যাপকভাবে বিক্ষোভ প্রকাশ করে।[১৭০] চট্টগ্রামের তৎকালীন শ্রমিকনেতা আবুল বাসার এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন:

"সামরিক শাসন জারি হওয়াতে সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীসহ বিভিন্ন স্তরের মানুষ বেশ খুশিই হয়েছিল। এমনকি রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীগণও সামরিক শাসনের যৌক্তিকতার পক্ষে মতামত প্রকাশ করতে থাকেন। সামরিক শাসনের বিরোধিতা তো দূরের কথা, রাজনীতির সাথে কোন রকম সম্পর্ক ছিল এমন কথা স্বীকার করতে সবাই দ্বিধাবোধ করতো। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থাটা ছিল সর্ম্পূণ ভিন্ন। তারা ইতিমধ্যেই উপলব্ধি করেছিল শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন ও তার আন্দোলন তাদের অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত। সে সময় শ্রমিকশ্রেণীর ওপর যে ব্যাপক নির্যাতন হত তাতে তাদের সংগঠন ও আন্দোলনকে বাদ দিয়ে কোন শ্রমিকই ভিন্ন চিন্তা করতে পারতো না। মালিক পক্ষ শ্রমিক নির্যাতনে আদিম কৌশল অবলম্বন করে। যুক্তফ্রন্ট আমলেও এ ধরনের নির্যাতনমূলক কৌশল ব্যবহার করা হত; কিন্তু সে আমলে শ্রমিকদের দু:খ-বেদনার কথা শোনার কিংবা তার প্রতিবাদের পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছিল। বিনা প্রতিবাদে কোন শ্রমিক নির্যাতনকে মেনে নেওয়া হতোনা। সামরিক শাসন জারির ফলে শ্রমিকশ্রেণীর এ অধিকারই হরণ করে নেওয়া হয়। তাই চট্টগ্রামের শ্রমিকরা তাদের অস্তিত্বের স্বার্থে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামরিক আইন মানি না- স্লোগান দিয়ে রাজপথে নেমে আসে।"[১৭১]

পরবর্তী সাড়ে তিন বছর শ্রমিকরা সেরূপ কোথাও সংগঠিতভাবে ব্যাপক শোভাযাত্রা করেনি ঠিক, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে যে শ্রমিকশ্রেণী অধিকার হারানোর বঞ্চনা ভোগ করেছিল তা ওপরের কথাগুলি থেকেই বোঝা যায়। তবে একমাত্র চট্টগ্রাম ছাড়া ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ কিংবা খুলনাসহ অন্য কোথাও শ্রমিকশ্রেণী সেদিন প্রতিবাদ করতে মাঠে নামেনি।[১৭২] এ ঘটনা থেকে এটাই প্রতিভাত হয় যে, এ সকল জায়গার শ্রমিকশ্রেণী সেভাবে সংগঠিত ছিলনা। কেননা যে শ্রেণীর কাছে গণতন্ত্রের বিষয়টি তার শ্রেণীগত অস্তিত্বের সাথে যুক্ত সামরিক আইন জারি করে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে নিলে সেই শ্রেণী প্রতিবাদ না করে ঘরে বসে থাকতে পারেনা। শ্রমিকশ্রেণী এ সময় সংগঠিত হতে না পাবার মূল কারণ হচ্ছে এই যে, চল্লিশের দশকের শেষে কমিউনিস্টদের মহাবিপর্যয়ের পর শ্রমজীবী জনসাধারণের মধ্যে তাদের কাজকে কার্যত স্থগিত রাখা হয়। কারণ সে সময় কমিউনিষ্ট পার্টি পাকিস্তানের বুর্জোয়া শ্রেণীকে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ-বিরোধী গোষ্ঠী হিসাবে গণ্য করতো এবং তাদেরকে গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর মিত্র মনে করতো। ১৯৫১ সালে পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টির পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক কমিটির প্লেনামে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল যে, "যেহেতু আমাদের দেশের বিপ্লবের স্তর এখনও সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ-বিরোধী সেহেতু ব্যক্তি বিশেষ ছাড়া শ্রেণী হিসাবে সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণীরই সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে ভূমিকা রহিয়াছে।"[১৭৩] তত্ত্বগত বিষয়ের আলোচনাতে দেখা গেছে বিদেশী পুঁজির ওপর নির্ভরশীল বুর্জোয়াশ্রেণী কখনও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শ্রমিক-শ্রেণীতো দূরের কথা, মধ্যবিত্ত জনসাধারণের গণতান্ত্রিক সংগ্রামেরও মিত্র হতে পারে না। অথচ কমিউনিষ্ট পার্টি এই বুর্জোয়া শ্রেণীকে শ্রমিক শ্রেণীর মিত্র হিসাবে গণ্য করেছিল। আর তাই শ্রমিকশ্রেণীকে বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগঠিত করার কাজকে সেভাবে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করতে পারেনি। ১৯৫৬ সালের সম্মেলনে অবশ্য বুর্জোয়াশ্রেণী সম্পর্কে যে ভ্রান্তির অবসান ঘটে। এ সম্মেলনের এক সিদ্ধান্তে বলা হয়: "রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী বড় বুর্জোয়া; তাহারা প্রতিক্রিয়াশীল; বিপ্লবের শত্রু; তাহাদের সহিত ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠন ও সহযোগীতার নীতি গ্রহণ করা যায় না; তাহাদের উচ্ছেদ করাই বিপ্লবের কর্তব্য।"[১৭৪] রাষ্ট্র ক্ষমতার সাথে যুক্ত বিদেশী পুঁজির ওপর নির্ভরশীল এই বড় বুর্জোয়াদের সম্পর্কে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ফলে শ্রমজীবী জনসাধারণকে সংগঠিত করার কাজ ত্বরান্বিত হয় বটে, কিন্তু রাষ্ট্র সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না গড়ে ওঠা এবং ক্ষমতা বর্হিভূত বুর্জোয়াদের সম্পর্ক ভ্রান্ত ধারণার কারণে শ্রমজীবী জনতাকে সংগঠিত করার কাজে বাঞ্ছিত মনোযোগ প্রদান করা কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষে সম্ভব হয়নি। কেননা এ সম্মেলনে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার জন্য শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ওপর ভিত্তি করে মধ্যবিত্ত ও দোদুল্যমান জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে যুক্তফ্রন্ট গঠন করার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু কি উপায়ে উক্ত ফ্রন্টে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে সে সম্পর্কে কোন কিছুই বলা হয়নি। এছাড়া, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিসমূহের ঐক্যবদ্ধ মোর্চা গঠনের জন্য আওয়ামী লীগকেই প্রায় একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বেছে নেওয়া হয়।[১৭৫] এ সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, "পূর্ব

---

১৬৮ শ্রমিক নেতা আবুল বাসারের সাথে লেখকের সাক্ষাৎকার ।
১৬৯ সরদিন্দু দস্তিদারের সাথে লেখকের সাক্ষাৎকার ।
১৭০ শ্রমিক নেতা আবুল বাসারের সাথে লেখকের সাক্ষাৎকার ।
১৭১ প্রাগুক্ত
১৭২ নজরুল ইসলাম, অজয় রায়, নূরুর রহমান ও সরদিন্দু দস্তিদারের সাথে লেখকের সাক্ষাৎকার ।
১৭৩ সিপিইপি (এম.এল) '৬৭ সালের পার্টি-কংগ্রেসের রাজনৈতিক রিপোর্ট, ঢাকাঃ প্রকাশনা বিভাগ, ইউ.সি.এল, পৃ. ২৫-২৬।
১৭৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।
১৭৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানে সর্ববৃহৎ সরকার-বিরোধী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের মাধ্যমেই প্রধানত: আমাদের কর্মীরা কাজ করিবেন এবং উহাকে প্রধান ভিত্তি করিয়া গণতন্ত্রী দল ও অন্যান্য সরকার-বিরোধী দলগুলিকে লইয়া ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠন করা হইবে।"[১৭৬] ফলে কমিউনিস্ট পার্টি তার মূল শক্তি শ্রমজীবী মানুষকে সংগঠিত করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত না করে আওয়ামী লীগ গড়ার কাজে বেশী মনোনিবেশ করে।

শ্রমিকসমাজকে সংগঠিত করার গুরুত্বকে অবহেলা করার পিছনে আর যে কারণটি কাজ করে তা হচ্ছে এই যে, তৎকালীন পাকিস্তান রাষ্ট্র সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা। কেননা উক্ত সম্মেলনে বলা হয় যে, "রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী বড় বুর্জোয়া-সামন্ত গোষ্ঠী।"[১৭৭] অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টির মতে, বড় বুর্জোয়া ও সামন্ত শ্রেণীর জোটই সেদিন পাকিস্তানের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। অথচ তৎকালীন রাষ্ট্রের চরিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলে এটা স্পষ্টই বোঝা যায়, রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আমলাতন্ত্র ও সামরিক বাহিনীর আধিপত্য কতটুকু আগ্রাসী চরিত্রের। সামন্ততান্ত্রিক আঞ্চলিক ক্ষমতার সাথে আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রীয় ক্ষমতার সমান্তরাল অবস্থান সেদিন সম্ভব ছিল না। আগের দু'টি অধ্যায়ে দেখা গেছে, পাকিস্তানের সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্র সমাজ ব্যবস্থার বিদ্যমান স্তরের তুলনায় তখন অনেক বেশী অগ্রসর অবস্থানে বিরাজ করছিল এবং সামন্ততান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ থেকে এসব প্রতিষ্ঠান অনেক আগেই বের হয়ে এসেছিল। উপরন্তু, সামন্ত শ্রেণীর আঞ্চলিক ক্ষমতার মধ্যেও প্রাদেশিক প্রশাসনের বৈধ অবস্থান সামন্ত প্রশাসনকে হুমকির সম্মুখীন করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাদেশিক প্রশাসনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হতে হয়। তখন আমলাতন্ত্রের পক্ষ থেকেই সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানকে একটি মাত্র প্রশাসনের অর্ন্তভুক্ত করার জন্য চাপ আসে। প্রথমে এ কেন্দ্রীয়করণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে তেমন কোন বাধা না আসলেও কালক্রমে যখন দেখা গেল যে, কেন্দ্রীয় প্রশাসন স্থানীয় ক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে তখন সকল সামন্তগোষ্ঠী এক ইউনিট ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। অর্থাৎ সামন্ততন্ত্রের সাথে আমলাতন্ত্রের সম্পর্কটি সে সময় সহযোগীতামূলক ছিল না, বরং বিরোধাত্মক ছিল। অপরদিকে, উক্ত অধ্যায়ের আলোচনায় আরো দেখা গেছে, যে বৃহৎ শিল্প বুর্জোয়া শ্রেণীটি সে সময় পাকিস্তানে বিকশিত হয়েছিল তারা রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সহযোগীতা ও অভিভাবকত্বেই গড়ে উঠেছিল। যে বিদেশী অর্থ এই শিল্পপতিদের বড় হয়ে উঠতে বিশেষভাবে সহায়তা করেছিল, সে অর্থ আসতো মূলত: রাষ্ট্র তথা আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে। ফলে আমলাতন্ত্রের সাথে বুর্জোয়া শ্রেণীর সম্পর্ক বিরোধাত্মক ছিল না, কিন্তু তারা আমলাতন্ত্রের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল। এ বিষয়টি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি মোটেও বুঝতে পারেনি। কমিউনিস্টরা সে সময় মার্কসের চিরায়ত ধারনা অনুসারে উৎপাদন পদ্ধতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে বিচার করতে চেয়েছিলেন বলেই এ ভ্রান্তিটা তাদের হয়েছিল। সে সময় তারা ভাবেননি যে, পাকিস্তান একটি উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্র, আর তাই মার্কসীয় ধ্রুপদী তত্ত্বমতে রাষ্ট্র যে সকল উপাদানের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে, পাকিস্তানে সে সবের অস্তিত্বনাও থাকতে পারে। সোহরাওয়ার্দী অবশ্য এ ভুলটা করেননি। তিনি স্পষ্ট: বুঝেছিলেন যে, পাকিস্তানের আমলাতন্ত্র ও সামরিক বাহিনীকে অসন্তুষ্ট করে কোন কিছু করা যাবে না। আর তাই তিনি মূলতঃ আমলাতন্ত্রের উদ্যোগে গৃহীত বিভিন্ন সামরিক চুক্তিকে সমর্থন করেছিলেন কিংবা পশ্চিম পাকিস্তানের সমগ্র জনগণের বিরোধিতার কথা জেনেও তিনি এক ইউনিটের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৭ সালের মধ্যে তিনি বিভিন্ন সময় সামরিক বাহিনীর অভ্যুত্থান সম্পর্কে সহকর্মীদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন, যদিও এ সতর্কবাণীকে তিনি রাজনৈতিক চাপ হিসাবেই দলের মধ্যেকার প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিলেন, তথাপি তিনি যে বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন পরবর্তী ঘটনাবলীই তার প্রমান দেয়। তবে তাদের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করলেই কিংবা তাদের নীতির জোর সমর্থক হলেই যে ক্ষমতার প্রকৃত নিয়ন্ত্রণকে এ আমলারা জনপ্রতিনিধিদের হাতে ছেড়ে দিতে চায় না তা সোহরাওয়ার্দী প্রথম কিছুটা বুঝেছিলেন ১৯৫৭ সালে প্রধানমন্ত্রীত্ব থেকে পদত্যাগে বাধ্য হওয়ার পর; কিন্তু তার পরও এ সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র সম্পর্কে তার মোহ ছিল। আর সে কারণেই তিনি অসাংবিধানিক উপায়ে ক্ষমতা দখলের বিপক্ষে জনমত সৃষ্টির চেষ্টা না করে ১৯৫৯ সালের অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। আকষ্মিকভাবে সামরিক শাসন আসার ফলেই শুধুমাত্র সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর মোহভঙ্গ ঘটে। সে কারণেই তিনি সেই বৃদ্ধকালে ব্যক্তিগতভাবে ছোটাছুটি করে সামরিক শাসন-বিরোধী ইমেজ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি এক বিরাট কর্মী বাহিনী নিয়ে সাড়ে তিন বছর কাজ করেও সে ধরনের ভাবমূর্তি সৃষ্টি করতে পারেনি। সামরিক-আমলাতান্ত্রিক চরিত্রের উক্ত নির্দিষ্ট রূপকে কমিউনিস্ট পার্টি চিহ্নিত করতে পারেনি বলেই সামরিক শাসন-বিরোধী তথা উক্ত রাষ্ট্র-বিরোধী সামাজিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজটির গতি ছিল অত্যন্ত মন্থর। অবশ্য সামরিক শাসন আসার পর কমিউনিস্ট পার্টি সামরিক শাসন-বিরোধী সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। কিন্তু তাদের এ প্রচেষ্টা রাষ্ট্র সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থেকে প্রসূত ছিল না, বরং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ফ্রন্ট সম্পর্কে প্রাগুক্ত ভ্রান্ত ধারণা থেকে তা গৃহীত হয়েছে।

৮.৪. সামরিক শাসন বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত

১৯৫৮ সালের অক্টোবরে সামরিক শাসন জারি হওয়ার পর প্রাথমিকভাবে জনসাধারণ একে স্বাগত জানিয়েছিলেন ঠিক, কিন্তু এ ঘটনাটি সচেতন জনগোষ্ঠীর কাছে একটি বিষয় খুব স্পষ্ট করে তুলে ধরে যে, জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার সংরক্ষণ করে পাকিস্তান একটি ফেডারেল রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করুক সেনাবাহিনী ও বেসামরিক আমলাতন্ত্র তা মোটেই চায় না। কেননা এমন একটি সময়ে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা করায়ত্ত করে যখন পাকিস্তানে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম খুব জোরদার হয়ে উঠেছেঃ নির্বাচন হলে যে রাজনৈতিক দলগুলির মনোনীত প্রার্থীরা নির্বাচিত হতেন তাদের প্রধান অংশই পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট-বিরোধী তথা আঞ্চলিক

---

[১৭৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪-৩৫।
[১৭৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে এবং পাক-মার্কিন চুক্তিসহ বিভিন্ন সামরিক চুক্তির বিপক্ষের হতেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। গণপরিষদে সংখ্যা সাম্যের সুবাদে পশ্চিম পাকিস্তানের যে শতকরা ৫০ ভাগ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার কথা ছিল তারা সবাই এক ইউনিট বাতিলের পক্ষে থাকতেন এবং সামরিক চুক্তিসমূহেরও বিরোধিতা করতেন। ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে উপরোক্ত দুটি প্রশ্নে পশ্চিম পাকিস্তানের সকল রাজনৈতিক দলই অভিন্ন মত পোষন করত এবং একটি বড় অংশ উক্ত দুটি প্রশ্নে গণআন্দোলনের সূচনা করেছিল। পূর্ব পাকিস্তানে একমাত্র আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক দল পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় নীতির সপক্ষে ছিল না। সামরিক শাসন জারীর কিছুকাল আগে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে যদিও আওয়ামী লীগ ৬টি আসনের মধ্যে ৫টিতেই বিজয়ী হয়েছিল,[১৭৮] তবু আওয়ামী লীগের মার্কিন প্রীতির নীতি ও পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে তাঁর অস্পষ্ট ভূমিকা সম্পর্কে ন্যাপ ও কমিউনিষ্ট পার্টি এবং এদের গণসংগঠণগুলি এমন প্রচন্ড প্রচারণা শুরু করে যে এখানকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীসহ বিভিন্ন স্তরের শ্রমজীবী মানুষ আওয়ামী লীগের বিপক্ষে চলে যায়। সে সময় জনসাধারণের বিভিন্ন অংশের সংগঠিত বহিঃপ্রকাশ যা কিছুই ঘটতো তার প্রায় সব কিছুই ন্যাপ ও কমিউনিষ্ট পার্টি বা তাদের সাথে সম্পর্কিত গণসংগঠনগুলিই ঘটাতো। কেননা সবচেয়ে বড় ছাত্র সংগঠন ছিল তখন ছাত্র ইউনিয়ন, যুবকদের একমাত্র শক্তিশালী সংগঠন যুবলীগ ছিল এদের সাথে, শ্রমিকশ্রেণীর মাঝে যে ফেডারেশনটি গড়ে উঠেছিল তার ওপর কমিউনিষ্ট পার্টির কর্তৃত্ব ছিল একচেটিয়া, একমাত্র কৃষক সংগঠনও গড়ে উঠেছিল এদেরই নেতৃত্বে। শুধু তাই নয়, সাংস্কৃতিক সংগঠন বলতে যেগুলি সমাজে মর্যাদা নিয়ে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতো তার সবই ন্যাপ ও কমিউনিষ্ট পার্টির সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত ছিল।[১৭৯] তাছাড়া, পূর্ব পাকিস্তান সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রেও আওয়ামী লীগ দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেনি। অন্যদিকে, আওয়ামী লীগ থেকে সমাজতন্ত্রী মনোভাবাপন্ন নেতারা ন্যাপ গঠন করার ফলে আওয়ামী লীগে বেশ নতুন নতুন লোকের সমাবেশ ঘটে। ফলে ১৯৫৮ সালেই বুর্জোয়াদের উদারনৈতিক দল হিসাবে আওয়ামী লীগ আত্মপ্রতিষ্ঠা করে। কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও অন্যান্য দল থেকে দলে দলে লোকজন আওয়ামী লীগে যোগদান করতে থাকে। সে সময় সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ থেকে দেখা যায় ১৯৫৮ সালের প্রথম তিন মাসে প্রায় চার হাজার ব্যক্তি আওয়ামী লীগে যোগদান করেছিল।[১৮০] অনেকের মতে আওয়ামী লীগ থেকে সমাজতন্ত্রীরা বেরিয়ে যাওয়ার পর যে অসংখ্য ব্যক্তি উক্ত দলে যোগদান করেছিল, তার প্রধান কারণ মোটেই সে দলের তৎকালীন রাজনীতির প্রতি আর্কষণ নয়, বরং সমাজতন্ত্র ও প্রগতি বিরোধীদের পক্ষে তৎকালীন সরকারী দল আওয়ামী লীগে যোগদানই ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার।[১৮১] ফলে পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচনে এ ধরনের নতুন যোগ-দেওয়া হতাশ কর্মীদের নিয়ে সংখ্যা গরিষ্ঠ আসনে পাস করে আসা খুবই কঠিন ছিল। অলি আহাদের অভিমত হলো, "পূর্ব পাকিস্তানে শহীদ সোহরাওয়ার্দী পরিচালিত আওয়ামী লীগের নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল।"[১৮২] আওয়ামী লীগ পাস করুক অথবা না করুক, পূর্ব পাকিস্তানের সচেতন নাগরিক বলতে যাদের বোঝায় তাদের সবার কাছে ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন জারি হওয়ার ফলে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রার্থীরা শান্তিপূর্ণভাবে সরকার পরিচালনা করুক এটা পাকিস্তানের আমলাতন্ত্র ও সামরিক বাহিনী চায় না।[১৮৩] কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল আইয়ুব খানের প্রতিশ্রুতি ও কিছু বক্তব্যে বিভ্রান্ত হন। অনেকে আশা করেছিলেন সামরিক বাহিনী বুঝি অল্প সময়ের জন্যই এসেছে, কিছু ভাল পদক্ষেপ নিয়ে দেশে একটি শান্তিপূর্ণ অবস্থা ফিরিয়ে নিয়ে তারা ক্ষমতা থেকে সরে যাবে। আয়ুব খান যেসব কথাবার্তা পূর্ব পাকিস্তানে এসে প্রথম বলেছিলেন সেসব বেশ চমকপ্রদ। ১৯৫৮ সালের ২২শে অক্টোবর আইয়ুব খান যখন পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক সভায় বক্তৃতা দেন তখন লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ হয়। অথচ এজন্য কোন প্রস্তুতিগ্রহণ করা হয়নি। উক্ত সমাবেশে আয়ুব খান যা' বলেছিলেন তার মর্মকথা আবু জাফর শামসুদ্দীনের নিম্নোক্ত বক্তব্যে পাওয়া যায় :

"পাকিস্তানে বিভিন্ন ন্যাশনালিটি বাস করে। পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান দুটি ভিন্ন ইউনিট: ভাষা, সংস্কৃতি, নৃতত্ত্ব, প্রতিভা (জিনিয়াস) প্রভৃতির বিচারে দু'টি আলাদা জাত। কিন্তু এক অংশ অন্য অংশ হতে আলাদা হয়ে বাঁচতে পারেনা। সকলের উপরে এক পাকিস্তানী জাতীয়তাবোধ - ঐটুকুই cementing factor, তবে উভয় অংশকে তার নিজস্ব প্রতিভা, বৈচিত্র্য, সংস্কৃতি এবং প্রয়োজন অনুযায়ী উন্নতির পূর্ণ সুযোগ পেতে হবে। এ সুবিধা তিনি দেবেন, কোনো বাধা সৃষ্টি করা হবে না। এখানেও সব ফেরেস্তা নয়: পাঞ্জাবেও নয়। অতীত তিক্ততার জন্য সকলেই দোষী। বৈদেশিক নীতির ব্যাপারে তিনি কাশ্মীর ও খালের পানি ব্যাপারে ন্যায়সঙ্গত আপোস প্রার্থী- ভারত বড় ও শক্তিশালী দেশ, তার সঙ্গে অনর্থক সংগ্রামে অবতীর্ন হওয়া ঠিক নয়। সামরিক শাসনের কারণ রাজনীতিকদের চরম ব্যর্থতা। অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের চেষ্টা হচ্ছে, স্বাবলম্বী হতে হবে। যা আয় ঠিক তার ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে হবে। এ জন্যে যদি অনেক জিনিস বাদ দিতে হয়, তবে তাই করতে হবে।"[১৮৪]

অর্থাৎ আইয়ুব খানের বক্তব্যের মূল কথা ছিল চারটি:

---

[১৭৮] Ghosh, Shyamali (1990): The Awami League: 1947-1971. Dhaka: Academic Publishers, p.40.

[১৭৯] নূরুল হুদা মির্জা ও ফয়েজ আহমদের সাথে গবেষকের সাক্ষাৎকার।

[১৮০] Ghosh, Shyamali (1990): op.cit., p.39.

[১৮১] নূরুল হুদা মির্জা আরো জোর দিয়ে বলেছেন যে,১৯৫৭ সালে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠিত হওয়ার পর আওয়ামী লীগ একটি এম.পি প্রধান কিংবানতা সর্বস্ব দলে পরিনত হয়। গনতান্ত্রিক আন্দোলনে ত্যাগী কর্মীদের প্রায় কেউ আর আওয়ামী লীগে থাকলো না। তিনি আরো বলেছেন, এসময় কে.এস.পিও আওয়ামী লীগে যোগদান করতে থাকলে তথা সামরিক শাসনর জারীর পর দেখা গেল এরা সবাই আওয়ামী লীগ ছেড়ে সামরিক শাসনের সমর্থক হয়ে উঠেছে।

[১৮২] আহাদ, অলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১।

[১৮৩] ফয়েজ আহমেদ লেখকের কাছে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন ১৯৫৮ সালে সামরিক বাহিনী যখন ক্ষমতা স্বহস্তে তোলে নেয় তখন প্রতিটি চিন্তাশীল ব্যক্তি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। সেনাবাহিনী যে সংবিধানকে অস্বীকার করতে পারে এটা আমাদের কল্পনাতেও ছিলনা।

[১৮৪] শামসুদ্দীন, আবু জাফর (১৯৮৯): প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪-৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

(১) স্বতন্ত্র একক হিসাবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় আকাঙ্ক্ষাকে স্বীকৃতি প্রদান;
(২) পাকিস্তানের উভয় অংশের প্রতি সমপরিমাণে গুরুত্ব প্রদান;
(৩) ভারতের সাথে তিক্ততার অবসান; এবং
(৪) আত্মনির্ভর জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

এ বক্তব্য স্বাভাবিকভাবে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের কাছে অগ্রহণযোগ্য হওয়ার কথা নয়। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে আইয়ুবের এ বক্তব্যের সাথে তৎকালীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির বেশ কিছুটা মিল লক্ষ্য করা যায়। এ বক্তৃতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সামরিক জোট সম্পর্কে কোন কথা না থাকলেও ভারতের সাথে সহমর্মিতা ও স্বাধীন জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তোলার প্রতি বেশ আগ্রহ ব্যক্ত হয়। আইয়ুব খান বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নেতা সম্পর্কে বেশ কিছু খারাপ মন্তব্য করলেও ন্যাপ-প্রধান মওলানা ভাসানী সম্পর্কে তিনি কোন বিরূপ মন্তব্য করেননি। তিনি উক্ত সভার পর সাংবাদিক সম্মেলনে মওলানা ভাসানী সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যান এবং বলেন যে, যদি মওলানা কোন অপরাধ করেন তাহলে তার বিচার করবে প্রাদেশিক সরকার। আইয়ূবের এ বক্তব্যে মওলানা ভাসানীর ঘনিষ্ট জনের মধ্যেও কিছু সংশয় সৃষ্টি হয়।[১৮৫]

আইয়ুব খান উক্ত এ সভায় সব ভাল কথাবার্তা বললেও যেসব প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক পদক্ষেপ তিনি গ্রহণ করেন তাতে তার উপরোক্ত কথাগুলি প্রতিফলিত হয় না। আগের অধ্যায়ের আলোচনাতেই দেখা গেছে আইয়ুব প্রশাসনিক পদক্ষেপ গুলি ছিল অতি মাত্রায় নির্যাতনমূলক। যেসব অর্থনৈতিক পদক্ষেপ তিনি গ্রহণ করেন তাতে পূর্ব পাকিস্তানে কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিলেও সরকারী সহযোগীতায় যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয় অবাঙালীরা অচিরেই সেসবের মূল মালিক হয়ে বসে। বিকাশমান বাঙ্গালী উদ্যোক্তাগণ এ থেকে পুরোপুরি বঞ্চিতই থেকে যায়। পূর্ব পাকিস্তানে যেসব ব্যবসা-বাণিজ্য বিদ্যমান ছিল সেসবের ওপর চরম আঘাত আসলো। সামরিক শাসনের প্রবল চাপের মুখে সেগুলি প্রায় বন্ধ হয়ে গেলো। এ অবস্থা দেখে সে সময়ের পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন সংস্থার (PIDC) এক বড় কর্মকর্তা (ড: এস,এ, মোমিন) একজন প্রখ্যাত সাংবাদিকের সাথে একমত্য পোষন করে ১৯৫৮ সালের নভেম্বর মাসেই বলেছিলেন যে, এতে অল্প পুঁজি নিয়ে যারা ব্যবসা করছে তারা বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং বড় পূঁজির মালিক আরো বড় হবে।[১৮৬] উক্ত কর্মকর্তা বাস্তব অবস্থা তুলে ধরে উল্লেখ করেন যে, "সামরিক বাহিনীর উচ্চ পদস্থ অফিসাররা পাঞ্জাবী, ওদের ভাষা ও চালচলন আলাদা, বাঙালী তাদের ধারে-কাছেও যেতে পারে না। অথচ নানা রকম কন্ট্রোলের দিনে কোন না কোন পর্যায়ে বড় অফিসারের শরণার্থী না হয়ে উপায় নেই। সামরিক বাহিনীর লোকেরাও স্বজনপ্রীতি, পক্ষপাতিত্ব, রেসওয়াত (ঘুষ) ইত্যাদির উর্ধ্বে নয়"।[১৮৭] উক্ত কর্মকর্তার এ মতামতের বেশ গুরুত্ব ছিল; কারণ তিনি জেনারেল আইয়ুবকে ব্যক্তিগতভাবে জানতেন এবং আইয়ুব খানের বাংলোর সম্মুখে তাঁর নিজের বাংলো থাকায় অনেক সামরিক কর্মকর্তার সাথেই তার পরিচয় ছিল।[১৮৮]

এরকম অবস্থা দেখেও যে সেদিন পূর্ব পাকিস্তানের কোন রাজনৈতিক দল প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসেনি এটাই বিস্ময়কর। আওয়ামী লীগ কেন এগিয়ে আসেনি তা বোঝা যায়; কেননা একদিকে তার প্রায় সব নেতাই প্রথমে গ্রেফতার হয়ে যান। অন্যদিকে, তার সংগঠনও ছিল নড়বড়ে। ফলে, এ ধরনের একটি রাজনৈতিক দল কোন প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তুলতে এগিয়ে না আসলেও আশ্চর্যের কিছু থাকে না। কিন্তু এখানকার কমিউনিস্ট পার্টিও তার গণসংগঠনসমূহ এবং ন্যাপ কেন প্রতিবাদ সংগ্রামে এগিয়ে আসেনি তা ব্যাখ্যা করা খুব কঠিন। যেহেতু কমিউনিস্ট পার্টির মূল শক্তিকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল সেহেতু সাংগঠনিক কারণে তারা যে প্রতিবাদ সংগ্রামে এগিয়ে আসতে পারেনি তা মেনে নেওয়া যায় না। এর একটিই মাত্র সংগত কারণ হতে পারে। আর তা হচ্ছে আইয়ুব খানের ঘোষণার সাথে কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপের বক্তব্যের এক ধরনের অভিন্নতা। কিন্তু খুব শীঘ্রই আইয়ুব খানের গৃহীত নীতি সম্পর্কে কমিউনিস্টদের মোহভঙ্গ ঘটে। এর কারণঃ প্রথমত: ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর সামরিক আইন জারির পিছনে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাত আছে তা প্রকাশ হয়ে পড়ে।[১৮৯] দ্বিতীয়ত: আইয়ুব সরকার স্পষ্টভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি অনুগত ও সহযোগী পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করে। এ সম্পর্ক যে সহযোগীতার সীমা অতিক্রম করে আনুগত্যে পর্যবসিত হয়েছিল তা আইয়ুবের একজন মন্ত্রীর মন্তব্য থেকেই বোঝা যায়। বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে মন্ত্রী পরিষদের মিটিংএ আয়ুব যে মনোভাব স্পষ্ট ব্যক্ত করেছিলেন তার উল্লেখ করে উক্ত মন্ত্রী বলেন, "There is only one embassy as far as I am concerned and that is the American Embassy".[১৯০] শুধু মার্কিনের অনুগত থেকেই আইয়ুব খান সহযোগী সম্পর্ক বজায় রাখেননি, তিনি মার্কিনের আন্তর্জাতিক সমর পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে প্রতিজ্ঞা করেন। প্রথমেই তিনি কমিউনিস্ট বিরোধী মার্কিন সমরসজ্জার পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। এ সমরসজ্জাকে আরো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে তিনি ভারতের কাছে যৌথ-প্রতিরক্ষার প্রস্তাব দেন। হঠাৎ কি কারণে যৌথ-প্রতিরক্ষার প্রয়োজন পড়লো এ সংক্রান্ত তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর এক প্রশ্নের উত্তরে আইয়ুব খান বলেছিলেন, "যদি কোন বহিঃস্থ আক্রমণ হয় তা হলে ভারত ও পাকিস্তান একত্র হয়ে এ উপমহাদেশ রক্ষা করা উচিত।"[১৯১] এ উপমহাদেশের বাইরে এমন কোন্ দেশ আছে যার আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আইয়ুব খান ভারতের সাথে যৌথ-প্রতিরক্ষার প্রস্তাব দিচ্ছেন - এ-কথা ভেবে পন্ডিত নেহেরু বিস্মিত হন। আইয়ুব খান পন্ডিত নেহেরুর এ বিস্ময় দূর করার মত কোন গ্রহণযোগ্য উত্তর দিতে পারেননি সত্য, কিন্তু একজন বৃটিশ সাংবাদিক যখন প্রশ্ন করেন যে কার বিরুদ্ধে এ যৌথ-প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করতে চান তখন আইয়ুব খান সরাসরি উত্তর না দিয়ে বলেন, "A Russian-Chinese drive to the Indian Ocean is a major aim in the Communist drive for

---

[১৮৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৫।
[১৮৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭।
[১৮৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭।
[১৮৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭।
[১৮৯] Ghosh, Shyamali (1990): op.cit., p.44.
[১৯০] Ali, Tariq (1970): op.cit., pp.112-113.
[১৯১] খান, মুহম্মদ আইয়ুব (১৯৬৮): প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

world domination."[১৯২] অর্থাৎ ভারত মহাসাগরের ওপর রুশ-চীনের নিয়ন্ত্রণমূলক অভিযানকে প্রতিরোধ করার জন্যই এ প্রতিরক্ষা চুক্তি। এভাবে আর্ন্তজাতিক শক্তি ভারসাম্যের ক্ষেত্রে ভারতকে একটি নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে মার্কিনের পক্ষে নিয়ে যাওয়ার জন্য আইয়ুব খান বিশেষভাবে প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলেন। এ পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার পর আইয়ুব একটি কমিউনিস্ট বিরোধী শক্তি হিসাবে পাকিস্তানকে আমেরিকার সামরিক ঘাটি রূপে ব্যবহৃত হতে দেয়। আর সে কারণেই ১৯৬০ সালের ১লা মে পাকিস্তান ভূমি থেকে উড়ে যাওয়া একটি মার্কিন গোয়েন্দা বিমান সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আকাশ পথে গুপ্তচরবৃত্তি চালানোর সময় সোভিয়েতের ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে ভূপাতিত হয়। পাকিস্তান থেকে বিমানটি উড়ে গেছে এ তথ্য প্রকাশিত হলে ব্যাপক কেলেঙ্কারি ঘটে যায়।[১৯৩] সোভিয়েত ইউনিয়ন আইয়ুব সরকারকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয় যে, পাকিস্তানের মাটি থেকে অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে বিশ্বমানচিত্র থেকে পাকিস্তানকে মুছে ফেলা হবে।[১৯৪] এ কেলেঙ্কারির কথা দুনিয়া জোড়া প্রচারিত হওয়ার পরও মার্কিনের সাথে আইয়ুবের ঘনিষ্ঠতার অবসান হয়নি। কারণ আইয়ুব খান মার্কিন প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে ১৯৬১ সালের জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়ে বলেছিলেন, "এশিয়ার অন্যকোন দেশে যদি আপনাদের স্থান না হয় পাকিস্তানে আপনাদের স্থান হবে।"[১৯৫] মার্কিনের সাথে পাকিস্তানের এ সম্পর্ক ১৯৬২ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে সংঘটিত চীন-ভারত যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল।

মার্কিনের সাথে উপরোক্ত ধরনের আনুগত্য সূচক বৈদেশিক নীতির পাশাপাশি আইয়ুব সরকার পাকিস্তানে বেশ দ্রুতগতিতে শিল্পোন্নয়ন ঘটাতে উদ্যোগী হয় । এ নীতির ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পশ্চিমা দেশ থেকে আইয়ুব সরকার বিপুল পরিমাণে আর্থিক ও প্রযুক্তি সহায়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানেও শিল্প বিকাশ দ্রুততর হয়। ১৯৬২ সালের ২২শে জানুয়ারি প্রকাশিত এক সংবাদ থেকে জানা যায়, এই সময়ের মধ্যেই পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন সংস্থা পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের ১২টি পাটকলসহ মোট ২০টি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজ সম্পন্ন করে ফেলেছে। এছাড়া আরও ১০টি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজ শেষ হওয়ার পথে। এই একই সংবাদে জানা যায় যে, আরও ৯টি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজ পি,আই,ডি,সি অচিরেই শুরু করতে যাচ্ছে।[১৯৬] বলা বাহুল্য, যে সকল ব্যক্তি অংশীদার হিসাবে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে যুক্ত থাকতে পেরেছিল তাদের কেউই বাঙালী নয়। অবশ্য বাঙ্গালীদের একটি গোষ্ঠীকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য ঋণ প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সে সময় শুধুমাত্র প্রাক্তন জমিদাররাই এ সুযোগ লাভে সক্ষম হয়েছিল।[১৯৭] এ সব কারণে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক শক্তির প্রধান দু'টি ধারা তথা আওয়ামী লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টি (ন্যাপসহ) কারো কাছে সামরিক সরকার গ্রহণযোগ্য থাকতে পারেনি।

আইয়ুবের সামরিক সরকার দ্রুত অপ্রিয় হলেও সে সময় সেটি এত মারাত্মক দমননীতি অনুসরণ করে চলেছিল যে তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কিছুই করা সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে, আইয়ুব তার এ সকল কার্যকলাপকে 'যুক্তিসিদ্ধ' করার জন্য প্রথম পর্যায়ে একটি আস্থা ভোটের ব্যবস্থা করেন। এ নির্বাচনের ভোটার সংখ্যা নির্ধারণ করা হয় মোট আশি হাজার এবং এরা ছিল পাকিস্তানের দুই অংশের জনগণের ভোটে নির্বাচিত তৎকালীন ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্য। ১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের দিকে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে- এ ঘোষণার পর এটি খুব সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, আইয়ুব খানের ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার কোন ইচ্ছা নেই, বরং আরো পাকাপোক্তভাবে বসার জন্য এ ধরনের নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি উদ্যোগ নেওয়া সত্ত্বেও তেমন কোন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে খুঁজে পায় নি, যাদের সাথে আলোচনা করে উক্ত নির্বাচনের বিষয়টিযথার্থভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। ফলে কমিউনিস্ট পার্টি এ নির্বাচনে ভোট না দেওয়ার জন্য ভোটারদেরকে রাজী করাতে একক উদ্যোগ গ্রহণ করে।[১৯৮]১৯৬০ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত উক্ত নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় যে, প্রাপ্ত প্রায় আশি হাজার ভোটের মধ্যে শতকরা ৯৫.৬ ভাগ ভোট 'হ্যা' বাক্সে পড়েছে।[১৯৯] পূর্ব পাকিস্তানে ভোট বিপুলভাবে 'হ্যা' বাক্সে পড়ে। যে দেড় শতাধিক ভোট এখানে 'না' বাক্সে পড়েছিল তা প্রধানত: কমিউনিস্ট পার্টির প্রচেষ্টাতেই সম্ভব হয়েছিল।[২০০] এই ন্যূনতম বিজয় সত্ত্বেও এ প্রচেষ্টার গুরুত্ব এখানেই যে, এটিই ছিল আইয়ুবের সামরিক সরকার বিরোধী সর্বপ্রথম সংগঠিত একটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ।

এ ধরণের পদক্ষেপ সেভাবে তেমন গড়ে না উঠলেও আইয়ুব সরকারের গৃহীত অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নীতির কারণে সমাজের অভ্যন্তরে বেশ অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। বিশেষতঃ বাংলা ভাষার সংস্কার এবং বাংলা ও উর্দুকে মিলিয়ে একটি সাধারণ ভাষা তৈরীর চেষ্টা শহরের মধ্যবিত্ত সমাজকে মারাত্মকভাবে বিক্ষুব্ধ করে। সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলি মধ্যবিত্তদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহে বিপুল জনসমাবেশ ঘটতে লাগলো। এসব অনুষ্ঠানে বাঙালীর ঐতিহ্য ও গৌরবগাঁথা দেশাত্মবোধক গান, কবিতা, নাটক ও আলোচনা সভা হতে থাকলো।বাঙালীদের আত্মপরিচয়ের প্রতি অনুসন্ধিৎসু করে তুলতে এসব অনুষ্ঠান বিশেষ ভূমিকা পালন করে।[২০১] ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের রেহমান সোবহানসহ কয়েকজন শিক্ষকের নেতৃত্বে দুই অর্থনীতির

---

১৯২ Quoted in Ali, Tariq (1970): op.cit., p.113.

১৯৩ রায়, খোকা (১৯৮৬)ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯।

১৯৪ আহাদ, অলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২।

১৯৫ রায়, খোকা (১৯৮৬)ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০।

১৯৬ The Pakistan Observer, Dacca, January 22, 1962.

১৯৭ The Pakistan Observer, Dacca, January, 28, 1962.

১৯৮ অজয় রায়ের সাথে লেখকের সাক্ষাৎকার ।

১৯৯ খান, মুহম্মদ আইয়ুব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬।

২০০ লেখকের কাছে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে অজয় রায় একথা বলেন। তিনি আরো দাবী করেন যে, এটাই ছিল আইয়ুব আমলে সর্ব প্রথম একটি রাজনৈতিক উদ্যোগ। একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া আর সকল দলের কাছে বিষয়টি এমন ছিল যে, সামরিক-শাসন এসেছে, যতদিন তা চলে চলুক। তারপর দেখা যাবে। তবে আস্থা ভোটের প্রস্তাবটি আসার ফলে সহজে যে আইয়ুব ক্ষমতা থেকে সরে দাড়াচ্ছেনা এটা প্রায় সবার কাছেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

২০১ ফয়েজ আহমেদের সাথে সাক্ষাৎকার ।

Dhaka University Institutional Repository

ধারনাটি শিক্ষিত বাঙালী সমাজে ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি করেছে। এরকম একটি পর্যায়েই এসে যায় ১৯৬১ সাল। এ বছরের শুরুতেই পৃথিবীব্যাপী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশত বার্ষিকী পালন উপলক্ষে বেশ তোড়জোড় আরম্ভ হয়। পূর্ব পাকিস্তানেও এর ঢেউ এসে লাগে। এটি সকল সাংস্কৃতিক কর্মী ও সচেতন জনগোষ্ঠীকে সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে সংগঠিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়। বিশ্বব্যাপী যে অনুষ্ঠান হচ্ছিল তাকে বাঁধা দেওয়ার মত শক্তি সামরিক সরকারের ছিলনা, তবে সরকারের নীতির সপক্ষে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্য কতিপয় বুদ্ধিজীবী ক্ষতিকর ভূমিকা পালন করেন। এসব সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা শহরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলি তাদের নিজস্ব অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে ১৯৬১ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে একটানা চার দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কর্মসূচী ঘোষণা করে। উক্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি মেলার রূপ ধারণ করে এবং তা সংস্কৃতিসেবী ও রাজনৈতিক কর্মীদের সাথে সাধারণ মানুষের এক মহা সমাবেশে পরিণত হয়।[২০২]

এসময় আইয়ুব সরকার তার বুনিয়াদী গণতন্ত্রের ধারণাটিও প্রচার করছে। এর ভিত্তিতে একটি সংবিধান রচনার কথাও বলা হয়েছে। সামরিক আইন প্রত্যাহারের জন্যও কথাবার্তা চলছে। সে কারণে জনসাধারণের ওপর বিশেষতঃ রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর প্রত্যক্ষ নির্যাতনের পরিমাণও তুলনামূলকভাবে হ্রাস পেয়েছে। এরকম অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা একুশে ফেব্রুয়ারি বা এ ধরনের ইস্যুকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হচ্ছে। ছাত্র ইউনিয়ন ১৯৬২ সালের আগে তাদের সাংগঠনিক কাঠামো নিয়ে আত্মপ্রকাশ না করলেও ঐক্যবদ্ধভাবে বিভিন্ন কার্যকলাপ শুরু করে দেয়। সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষে কাজ করার জন্য আসলে তেমন কোন ফোরাম ছিল না, ছাত্রদের মধ্যে আহমদ হুমায়ুন সহ কয়েকজনকে নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির একটি ইউনিট ছিল। এরা ছাত্র ইউনিয়নকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ সে সময় ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতির অনুসারী সচেতন ২৫/৩০ জন ছাত্রের শক্তিশালী একটি গ্রুপ গড়ে ওঠে। কমিউনিস্ট পার্টির দিক থেকেই হোক কিংবা অন্য যে কোন অর্থেই এদের মূল নেতা ছিলেন মোহাম্মদ ফরহাদ। কাজী জাফর আহমদেরও একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল; তবে মোহাম্মদ ফরহাদ এবং হায়দার আকবর খান রনোর নেতৃত্বেই ছাত্র ইউনিয়ন পুনর্গঠিত হওয়ার আগেই তা একটি শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয়।[২০৩] এদের সাথে যোগ দেয় নূরুর রহমানের নেতৃত্বে জগন্নাথ কলেজের একটি শক্তিশালী দল। সব মিলিয়ে ১৯৬১ সালের মধ্যে ছাত্র ইউনিয়ন স্বনামে আত্মপ্রকাশ না করলেও ঢাকার ছাত্র সমাজের মধ্যে ছাত্র ইউনিয়নের অনুসারী ধারাটি একটি বিশিষ্ট পরিচিতি লাভ করে। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ইউনিয়নের এ প্রাধান্য নতুন নয়, ১৯৫৯ সালের ডাকসু নির্বাচনে ৫টি হল সংসদের মধ্যে ৪টিতেই ছাত্র ইউনিয়ন বিজয়ী হয়, অথচ ছাত্রলীগ, এন.এস.এফ ও ছাত্রশক্তি এই তিনটি সংগঠন যুক্তভাবে দাঁড়িয়েও একমাত্র সলিমুল্লাহ হলে বিজয়ী হতে সক্ষম হয়।[২০৪] এর পর সংগঠনটি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ছাত্র ইউনিয়নের তৎকালীন নেতৃত্বের আর তেমন কোন ভূমিকা ছিল না।[২০৫] পক্ষান্তরে ১৯৬০ সালের শেষের দিকে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনকে সভাপতি ও শেখ ফজলুল হক মনিকে সাধারণ সম্পাদক করে পুনর্গঠিত হয়।[২০৬] এভাবে পূর্ব পাকিস্তানের সমাজে যখন দুটি প্রধান ছাত্র সংগঠন তথা ছাত্র লীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন কর্মতৎপর হয়ে উঠেছে সে সময় পর পর কতকগুলি ঘটনা ঘটে। ১৯৬১ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে পালন করা হয়। রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে সাড়া জাগানো ধারাবাহিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সংগঠিত হল এবং এর উদ্যোক্তাগণ দুই অর্থনীতির প্রচার জোরেসোরে করে চলল। এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে বাঙালীর মধ্যে একটি স্বতন্ত্র জাতীয় চেতনা জাগরিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এসময়ে দু'জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এক সময়ে দুই অর্থনীতি সম্পর্কে তাদের নানাবিধ প্রশ্ন করে। তাদের প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে কোন সদুত্তর না দিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেনারেল কে.এম. শেখ ও জুলফিকার আলী ভূট্টো দ্রুত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করেন। উক্ত সভায় অংশগ্রহণকারী জগন্নাথ কলেজের তৎকালীন ছাত্রনেতা নূরুর রহমান জানানঃ "এটা একটা সামান্য ঘটনা বই কিছু নয়, কিন্তু মন্ত্রীদেরকে এভাবে বিরূপাত্মক পরিস্থিতির মধ্যে ফেলতে সক্ষম হয়ে ছাত্ররা যে সেদিন কি বিজয়ের আনন্দ অনুভব করেছিল সে দৃশ্য নিজ চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবেনা।"[২০৭] এই প্রতীকী আন্দোলনে ছাত্রসমাজের মধ্যে যেমন সাড়া জাগে তেমনই রাজনৈতিক দলসমূহও বেশ উৎসাহিত হয়। ১৯৬১ সালের শেষার্ধে নিষিদ্ধ ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে বেশ কয়েক দফা বৈঠক হয়। এসব বৈঠক শেষে সিদ্ধান্ত হয়, আইয়ুবের শাসনতন্ত্র জারী হওয়ার সাথে সাথে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে ছাত্রদের দিয়ে প্রথম আন্দোলনের সূত্রপাত হবে এবং পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগ ও বামপন্থীরা সম্মিলিতভাবে তা সারা দেশে ছড়িয়ে দেবে।"[২০৮] এ সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতি হিসাবেই ছাত্র ইউনিয়ন নেতা মোহাম্মদ ফরহাদের উদ্যোগে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এক গোপন বৈঠকে সমবেত হন। আন্দোলন গড়ে তোলার প্রশ্নে দুটি সংগঠনের মধ্যে কিছু দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য ফুটে ওঠে। ছাত্রলীগ সংসদীয় গণতন্ত্রকে প্রধান দাবী হিসাবে গ্রহণ করে সারা পাকিস্তানব্যাপী সামরিক শাসন-বিরোধী আন্দোলন শুরু করার পক্ষে মত দেয়। উপস্থিত ছাত্রলীগের অধিকাংশ নেতা আইয়ুব খানের পরিবর্তে সোহরাওয়ার্দীকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টরূপে কল্পনা করছিল। অন্যদিকে, ছাত্র ইউনিয়ন গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবীর সঙ্গে জাতিগত নিপীড়ন ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে অগ্রাধিকার দেয়। এসব বিতর্ক সত্ত্বেও সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং '৬২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি থেকে আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত হয়।[২০৯] আন্দোলনের প্রস্তুতি হিসাবে ছাত্রলীগ ১৯৬২ সালের ৪ঠা জানুয়ারি তাদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী বেশ গুরুত্ব সহকারে উদ্‌যাপন করে। সামরিক শাসনের পর এটাই ছিল একটি ছাত্র সংগঠনের সর্বপ্রথম একক প্রকাশ্য সমাবেশ।[২১০] ছাত্রলীগের প্রকাশ্য প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালনকে সামরিক সরকার সুনজরে দেখেনি। সোহরাওয়ার্দী সামরিক শাসন-বিরোধী সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্যোগ ইতিপূর্বেই গ্রহণ করেন। মন্ত্রীসভার মধ্যে দ্বিমত থাকা সত্ত্বেও সামরিক সরকার সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করার

---

২০২ ফয়েজ আহমেদের সাথে সাক্ষাৎকার।

২০৩ হায়দার আকবর খান রনোর সাথে সাক্ষাৎকার।

২০৪ হাননান, মোহাম্মদ (১৯৮৭)ঃ বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস ঢাকাঃ ওয়ার্সী প্রকাশনী, পৃ. ৪৯।

২০৫ হায়দার আকবর খান রনোর সাথে সাক্ষাৎকার।

২০৬ আরিফ, কাজী (১৯৮৯)ঃ 'তিন দশকের ছাত্র রাজনীতি ও ছাত্রলীগের ইতিহাস' তারকালোক, ১-১৮ই জানুয়ারি সংখ্যা, পৃ.৬।

২০৭ নূরুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎকার।

২০৮ হাননান, মোহাম্মদ (১৯৮৭)ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।

২০৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।

২১০ আরিফ, কাজী (১৯৮৯)ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্ধান্ত নেয় এবং ৩০শে জানুয়ারি '৬২ তা কার্যকর করে।[২১১] এ গ্রেফতারে মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। প্রথম দু'দিনের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলতে গিয়ে তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতা লিখেছেন: "৩১ জানুয়ারি ঢাকার সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট ডাকা হয়। সে দিন বিরাট ছাত্র জনতার মিছিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়। সামরিক শাসন-বিরোধী এই মিছিল সামরিক আইন অমান্য করে ঢাকার রাজপথ প্রদক্ষিণ করে। পরদিন ১ ফেব্রুয়ারি সারা দেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট ডাকা হয়। ঐদিন পুলিশের সাথে কয়েক দফা সংঘর্ষ ঘটে। এর পরই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়। হলগুলি থেকে ছাত্রদের অপসারণ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প স্থাপন করা হয়।"[২১২]

আইয়ুব খান নিজেও সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে কি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল সে সম্পর্কে আবু জাফর শামসুদ্দীন ১লা ফেব্রুয়ারি তার দিনলিপিতে লেখেন: "গতকাল আইয়ুব খাঁর মুখমন্ডলে দুশ্চিন্তার ছাপ স্পষ্ট দেখেছি। তাকে অভ্যর্থনা বা দর্শন করার জন্যেও পূর্বের মতো লোকজন কোথাও জমায়েত হয়নি। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতার সম্বন্ধে তার উজিরসভার অন্যতম সদস্য আখতার হোসেন কোনো মন্তব্য করতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। বোঝা যায় মন্ত্রীসভা এ ব্যাপারে একমত ছিল না।"[২১৩] তবু সামরিক সরকারসোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদকে কঠোর হস্তে দমন করার পদক্ষেপ নেয়। সংবাদপত্রের ওপর কড়া সেন্সরশিপ আরোপ করে ধর্মঘট সংক্রান্ত যে কোন ধরনের সংবাদ প্রকাশকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর প্রতিবাদে ২রা ফেব্রুয়ারি সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা প্রেস ক্লাবের সামনে ঢাকার সকল সংবাদপত্র পুড়িয়ে দেয়। ৩রা ফেব্রুয়ারি পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঞ্জুর কাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। ছাত্ররা তাকে জিজ্ঞাসা করে, তাদের বক্তব্য সংবাদপত্রে ছাপা হবে কিনা। ছাত্ররা বলে, এ প্রশ্নের সদুত্তর দিলেই শুধু তাকে বক্তৃতা দিতে দেওয়া হবে। মঞ্জুর কাদের জবাবদানে অপারগতা প্রকাশ করলে ছাত্ররা মারমুখি হয়ে বলতে থাকে, 'জানিস না ব্যাটা তবে এখানে এসেছিস কেন?' তারপর ছাত্ররা 'শেম শেম' এবং নানা প্রকার ধ্বনি দিয়ে তাকে মারধর করতে উদ্যত হয়। তার গাড়ি ভাঙচুর করে। মঞ্জুর কাদেরকে তার গাড়িসহ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বলতে গেলে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হয়।[২১৪]

এদিকে সচিবালয়ের দেওয়ালে দেওয়ালে আইয়ুব-বিরোধী নানা প্রকার শ্লোগান সংবলিত পোস্টার পড়ে। অন্যত্রও এধরনের পোস্টার সাঁটা হয়। সংবাদপত্রের ওপর কড়া সেন্সরশিপ আরোপ করা এবং বিদেশী পত্র-পত্রিকা নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ায় শহরে নানা রকম গুজব ছড়িয়ে পড়ে।[২১৫]

৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা মধুর ক্যান্টিন থেকে সরকারি গোয়েন্দা বাহিনীর একজন লোককে বেদম মারপিট করে তার আইডেন্টিটি কার্ড ছিনিয়ে নেয় এবং তাকে রাস্তায় ফেলে আসে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আইয়ুব খানকে সম্মানজনক উপাধি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সেখানে ছাত্রজনতা এত উত্তেজিত ছিল যে, আইয়ুব খানকে রাজশাহী যাওয়ার কর্মসূচী বাতিল করতে হয়। ৬ই ফেব্রুয়ারী ঘটেছিল আরো মারাত্মক ঘটনা। এ সম্পর্কে আবু জাফর শামসুদ্দীন তার দিনলিপিতে লিখেছিলেন:

"আজও ছাত্র-জনতার মিছিল বেরিয়েছিল। পুরনো শহরে পূর্ণ হরতাল প্রতিপালিত হয়েছে। ছাত্র ও জনতা মিলে আইয়ুব এভিনিউ হতে তেজগাঁ পর্যন্ত যে সব আইয়ুব গেট আছে সব পুড়িয়ে দিয়েছে। এ আন্দোলনের প্রতি দেশীয় পুলিশ বাহিনীর লোকের সহানুভূতি আছে বলে মনে হয়। কারণ মিছিলের সমুখ থেকে পুলিশ সরে গেছে বারে বারে।"[২১৬]

এসব আন্দোলনের সময় অসংখ্য ছাত্র-জনতা এবং আবুল মনসুর আহমদ, শেখ মুজিব, তাজউদ্দীন ও মানিক মিয়া সহ ঢাকা ও মফস্বলের প্রায় সকল নেতাকে গ্রেফতার করার পরও যখন দেখা গেল আন্দোলনকে দমন করা যাচ্ছে না তখন সরকার দমনের পথ বন্ধ করতে বাধ্য হল এবং সরকারের অবস্থানকে নমনীয় করে তোলার জন্য ১০ই ফেব্রুয়ারি থেকে প্রতিদিন একটি করে প্রেসনোট প্রকাশিত হতে থাকলো।[২১৭] এভাবে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের কার্যকারিতা ভেঙ্গে পড়লো। অঘোষিতভাবে হলেও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ তাদের নিজস্ব শ্রেণী ও পেশার দাবী নিয়ে রাজপথে নেমে আসে এবং এসুযোগে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও প্রকাশ্যে কাজ শুরু করতে থাকেন।

৮.৫ আইয়ুব বিরোধী গণআন্দোলনের বহুধা বিস্তৃতি

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এমন এক সময় গ্রেফতার হন যখন পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সব রাজনৈতিক দলকে তিনি ঐক্যবদ্ধ করে মাত্র এক সপ্তাহের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের সাথে পরামর্শ করতে করাচী গমন করেছেন।[২১৮] আর সম্ভবত:সে কারনেই তার গ্রেফতারের বিরুদ্ধে সমাজের সর্ব স্তর থেকে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। উক্ত প্রতিবাদের কাছে সরকারী প্রশাসন খানিকটা নমনীয় হলেও তাৎক্ষণিকভাবে সোহরাওয়ার্দী কিংবা অন্যান্য নেতাকে মুক্তি দেওয়া হয়নি। বরং এ সকল নেতা বন্দী থাকা অবস্থায় আইয়ুব খান জনগণের ওপর তার গঠনতন্ত্র চাপিয়ে দেন। ১৯৬২ সালের ১লা মার্চ এ সংবিধান ঘোষণা করা হয়। এটা ছিল এমন একটি সময় যখন অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতা বন্দী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, সংবাদপত্রগুলির ওপর প্রিসেন্সরশিপ ব্যবস্থা অব্যাহত রয়েছে এবং প্রথম সারির ছাত্র নেতাদের অনেকে বন্দী ও অন্যদের ওপর হুলিয়া জারি করা হয়েছে। এ পর্যায়ে সংবিধান ঘোষণা কেউ মেনে নিতে না পারলেও এর বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে কোন প্রতিবাদ ওঠেনি। প্রায় দেড় মাস চুপচাপ থাকার পর এপ্রিলের মাঝামাঝি ছাত্র ইউনিয়নের ডাকে দেশব্যাপী শপথ দিবস পালনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাসে ঐ কর্মসূচী

---

[২১১] প্রাগুক্ত।

[২১২] প্রাগুক্ত।

[২১৩] শামসুদ্দীন, আবু জাফর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৯।

[২১৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০।

[২১৫] প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬০।

[২১৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬১।

[২১৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬১।

[২১৮] খান, আতাউর রহমান (১৯৭০): স্বৈরাচারের দশ বছর, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, পৃ. ১৬২-৬৩।পৃ. ৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

পালিত হয়। কেন্দ্রীয় সমাবেশ হয় মধুর ক্যান্টিনে। উক্ত কর্মসূচী প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও পালিত হয়। ছাত্র ইউনিয়ন জনগণের মৌলিক অধিকার-বিরোধী শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে এ ধরনের কর্মদিবস পালন করলেও ছাত্রলীগ এতে যোগদান করেনি; বরং তারা আওয়ামী লীগের মূল নেতা সোহরাওয়ার্দীর মতই মনে করতো এ সংবিধান যত খারাপই হোক না কেন তাকে মেনে নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা উচিত এবং এভাবে আইন পরিষদের ভিতরে-বাইরে আন্দোলন করা উচিত।[২১৯]

ছাত্র ইউনিয়ন এমন এক সময়ে শপথ দিবস পালন করে যখন সরকার ছাত্র রাজনীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক অপপ্রচার শুরু করেছে। ছাত্র রাজনীতির সাথে যারা যুক্ত তাদেরকে আয়ুব খান বিপথে পরিচালিত অসৎ রাজনীতিবিদদের ক্রীড়নক বলে অভিযোগ করেন। আইয়ুব সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের উদাহরণ টেনে তাদের সম্পর্কে আরো বলেন, "...they were instigated, misguided misled by old politicians who have always an axe to grind"[২২০] সরকারী প্রশাসনের সর্বোচ্চ ব্যক্তিবর্গই যে শুধুএভাবে ছাত্র রাজনীতির নিন্দাবাদ করছিল তাই নয়, ছাত্র রাজনীতিকে নিরুৎসাহিত করার জন্য কিছু ফরমায়েসী গবেষণারও ব্যবস্থা করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ওপর একটি নমুনা জরিপ চালিয়ে এ গবেষকগণ দেখান শতকরা ৭১ ভাগ ছাত্র মনে করে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে রাজনীতি শিক্ষার পরিবেশকে সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। শতকরা ৩৫ জন উত্তরদাতা এ মত দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে বলে প্রকাশ করা হয়েছিল। দর্শন ও মনোবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ গোলাম জিলানীর পরিচালিত এ জরিপ প্রতিবেদনে আরো বলা হয়:

More than 77 percent of students are quite clear in their view that the students were exploited by the politicians to serve their self interests."[২২১]

এধরনের অপপ্রচার সত্ত্বেও আইয়ুব সরকারের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ক্রমশঃ অসন্তোষ বাড়তে থাকে। ইতিমধ্যে ৭জন বিরোধী দলীয় নেতা (সর্বজনাব আতাউর রহমান খান, নুরুল আমিন, হামিদুল হক চৌধুরী, পীর মোহসীন উদ্দীন, সৈয়দ আজিজুল হক, মাহমুদ আলী ও আবু হোসেন সরকার) দেশের সংকটময় রাজনৈতিক অবস্থা তুলে ধরে ছাত্র ও রাজবন্দীদের মুক্তির দাবী করে সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রদান করেন। ১৯৬২ সালের ১৮ই এপ্রিল এ বিবৃতিটি এক সাথে সকল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[২২২] এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক সাড়া পড়ে। সামরিক শাসন জারি বিরুদ্ধে এটাই ছিল বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রথম বিবৃতি। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এভাবে প্রকাশ্যে বিবৃতি দেওয়ার ফলে বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর মানুষও এগিয়ে আসতে শুরু করে। ২৪শে এপ্রিল বন্দী ও হুলিয়াপ্রাপ্ত ছাত্রনেতাদের সপক্ষে প্রদেশের বিশিষ্ট ১১জন ভদ্রমহিলার যুক্ত বিবৃতি সংবাদপত্রে বেশ গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়। এ বিবৃতিতে বন্দী ছাত্রদের মুক্তি দিয়ে, ওয়ারেন্ট ও হুলিয়াপ্রাপ্ত ছাত্রদের ওপর থেকে তা তুলে নিয়ে তাদের শিক্ষা জীবন অব্যাহত রাখা ও পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ দানের জন্য সরকারের কাছে দাবী জানানো হয়। তাদের দাবী যে ন্যায়সংগত তা দেখানোর জন্য এ বিবৃতিতে বিভিন্ন ধরনের যুক্তি প্রদর্শন করা হয়।[২২৩]

এ সময় শ্রমিকশ্রেণীও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য সুযোগের আপেক্ষায় ছিল। সামনেই ছিল মে দিবস। এ দিবসটি ঐক্যবদ্ধভাবে পালনের জন্য শ্রমিক নেতারাও এক বৈঠকে মিলিত হন এবং তারা মে দিবস যথাযথ মর্যাদার সাথে পালনের আহবান জানিয়ে সংবাদপত্রে বিবৃতি দেন। এ সংবাদ ২৫ এপ্রিল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।[২২৪] এতে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিপুল সাড়া জাগে। ইতিমধ্যেই শ্রমিকশ্রেণীর কোন কোন অংশ গোপনে সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করছিল। ২৫শে এপ্রিল চট্টগ্রামের ৩০টি অনুমোদনপ্রাপ্ত ট্রেড ইউনিয়নের প্রায় ২০০ নেতা ও কর্মী চট্টগ্রামের জালালুদ্দীন ইন্সটিটিউটে এক সম্মেলনে সমবেত হন এবং 'বাণিজ্য শ্রমিক কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন' নামে একটি শক্তিশালী ফেডারেশন গড়ে তোলেন। এ সম্মেলনে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ঐক্য, পারস্পরিক সহযোগীতার এবং দাবী আদায়ের সংগ্রামে অটল থাকার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পরিশেষে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে মে দিবস পালন করার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি আহবান জানানো হয়।[২২৫]

অন্যদিকে, ১লা মার্চ নয়া শাসনতন্ত্র ঘোষণার পর সংবাদপত্রগুলিতে ফলাও করে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে যাতে কোন সমালোচনা প্রকাশিত না হতে পারে তার জন্য কঠোর প্রিসেন্সরশিপ আরোপ করা হয়। পাকিস্তান অবজার্ভারসহ পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকটি দৈনিক সংবাদপত্র এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকে। কত কঠোরভাবে প্রি-সেন্সরশিপ আরোপ করা হয়েছিল তা একটি দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদকের বক্তব্য থেকেবোঝা যায় । কেন এ বিষয়ের সমালোচনা থেকে বিরত রয়েছেন এ প্রশ্নের উত্তরে অবজার্ভারের তৎকালীন সম্পাদক উত্তর দিয়েছিলেনঃ "If I cannot report unfavourable reaction, I shall not report anything"[২২৬]

কোন রকম প্রতিবাদের কথা না ভেবে বুনিয়াদী গণতন্ত্রীদের ভোটার করে ২৮শে এপ্রিল পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের দিন ধার্য করা হয়। এ নির্বাচনের বিপক্ষে ছাত্ররা তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলে। আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে। নির্দলীয় ভিত্তিতে ২৮শে এপ্রিল নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে যায়। নবনির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্যগণ যাতে আইয়ুবের পক্ষে যোগ দিতে না পারে সে জন্য আবার আন্দোলন গড়ে তোলা হয়। ছাত্রদের এ আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয় বন্দী ছাত্রনেতাদের মুক্তি ও হুলিয়া

---

[২১৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১, হান্নান, মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত,
[২২০] Pakistan Observer, Dacca, April, 17, 1962.
[২২১] Pakistan Observer, Dacca, April, 19, 1962.
[২২২] খান, আতাউর রহমান (১৯৭০)ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬।
[২২৩] Pakistan Observer, Dacca, April, 24, 1962.
[২২৪] Pakistan Observer, Dacca, April, 25, 1962.
[২২৫] Ibid, April 30, 1962.
[২২৬] Quoted in Vorys, Karl Von (1965): Political Development in Pakistan Princeton: Princeton University Press,p.232.

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যাহার, রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তি, বাকস্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদি দাবী।[২২৭] কিন্তু প্রিসেন্সরশিপ চালু থাকায় কোন সংবাদপত্রে এ খবর প্রকাশিত হতে পারেনি। এসব সত্ত্বেও ছাত্রদের আন্দোলন ক্রমাগত জঙ্গী রূপ ধারণ করে। ৮ই জুন নবনির্বাচিত জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন আহবান করা হয়। জাতীয় পরিষদের প্রথম সভাকে উপলক্ষ করে ছাত্রদের সংগ্রাম গণআন্দোলনে রূপ নিতে পারে এটা ভেবেই ৩১শে মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়কে আবার বন্ধ করে দেওয়া হয়।[২২৮] এভাবে ১৯৬২ সালের ৮ই জুন নির্বিঘ্নে জাতীয় পরিষদের সভা রাওয়ালপিন্ডিতে অনুষ্ঠিত হল এবং ঐ দিন দেশে প্রত্যক্ষ সামরিক শাসনের অবসান ঘটল।[২২৯] আর এর পর থেকেই শুরু হয়ে গেল শ্রমিক, ছাত্র, কর্মচারী, পেশাজীবী ও রাজনৈতিক দলসমূহের ব্যাপকতর আন্দোলন। এ আন্দোলন ক্রমাগত এমন ব্যাপকতর রূপ পরিগ্রহ করে যা আইয়ুব সরকারের ক্ষমতার মূল ভিত্তিকে নড়বড়ে করে দেয়। গণআন্দোলনের এ পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার জন্য সরকার সাম্প্রদায়িক উসকানি দিয়ে মারাত্মক দাঙ্গা বাধায়। তাতেও যখন পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করা সম্ভব হল না তখন জন সাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্য আইয়ুব সরকার কাশ্মীর ইস্যুকে জোরালোভাবে তুলে ধরে ভারতের সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটাবার অপপ্রয়াস চালায়। এদ্বারা জনরোষের হাত থেকে আইয়ুব সরকার সাময়িকভাবে আত্মরক্ষা করতে পারলেও পাক-ভারত যুদ্ধ এড়াতে পারেনি। পাক-ভারত যুদ্ধ সাময়িকভাবে জনসাধারণকে মোহাবিষ্ট করে রাখতে সক্ষম হলেও এ দিয়ে আইয়ুব খান শেষ রক্ষা করতে পারেনি। তবে পাক-ভারত যুদ্ধের অজুহাতে একবার যখন জরুরী আইন ঘোষণা করা হল, তখন আইয়ুব সরকারের পতন পর্যন্ত তা' অব্যাহত থাকলো। জরুরী আইনের কারণে রাজপথের আন্দোলন যতটা ব্যাপ্তি লাভ করেছিল সে তুলনায় জনসাধারণের বিভিন্ন অংশের ভিতর ক্ষোভের পরিমাণ অনেক বেশী পরিমানে বেড়ে গিয়েছিল। আর তাই জনসাধারণ একবার যখন দৃঢ়সংকল্প হয়ে উঠলো তখন আইয়ুব সরকারের পতন না ঘটিয়ে তারা আর রাজপথ ত্যাগ করলো না।

১৯৬২ সালের ৮ই জুন যে আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল তাকে ৪টি প্রধান পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায় হচ্ছে নির্ভেজাল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারা, যখন বৈদেশিক নীতি কিংবা আর্ন্তজাতিক আদর্শগত বিতর্ক নিয়ে এদেশের বামপন্থীদের মধ্যে কিছু মতপার্থক্য ঘটতে থাকলেও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তার কোন প্রভাব পড়ে নি। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে সংঘটিত কলংকজনক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিরোধী সংগ্রাম এবং আইয়ুবের বৈদেশিক নীতিতে সুস্পষ্ট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এ পর্যায়ের অবসান ঘটে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে ক্রমাগত বাঙালীর জাতীয় দাবী অগ্রাধিকার পায় এবং এভাবে আন্দোলন দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করে। বৈদেশিক নীতির পরিবর্তনের ফলে ও কমিউনিস্টদের আন্তর্জাতিক আদর্শগত বিতর্কের প্রতিক্রিয়া হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানের বামপন্থীরা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ায় জাতীয় আন্দোলন-সংগ্রামে কোন বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করা তাদের পক্ষে আর সম্ভব হয় নি। ক্রমাগত জাতীয় আন্দোলনের তীব্রতা বাড়তে থাকে যা ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন এক চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। এভাবে আইয়ুব সরকার বিরোধী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের সফল পরিসমাপ্তি ঘটে। তৃতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক দলগুলি প্রকৃতপক্ষে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে; আন্দোলন অগ্রসর করার ক্ষেত্রে তখন শ্রমিক শ্রেণী বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এদের সাথে যুক্ত হয় ছাত্র, অফিস কর্মচারী এবং কৃষকরাও। এভাবে আইয়ুব সরকারের মূল ভিত্তি একে একে ভেঙ্গে পড়ে। রাজনৈতিক দলগুলি আবারও সংগঠিত হয়। তারা আন্দোলনের কর্মসূচী দেয়; কিন্তু পিছিয়ে পড়ে। এভাবে আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায়ের অবসান ঘটে। শুরু হয় আন্দোলনের চতুর্থ ও চূড়ান্ত পর্যায়। এ পর্যায়ে গণতান্ত্রিক ও জাতীয় রাজনীতির ধারা দু'টির সমন্বয় ঘটে। এভাবে রচিত হয় জনসাধারণের অভ্যুত্থান। উপরোক্ত চারটি স্তরের আন্দোলনের যে কোন একটিকে বাদ দিয়ে ঊনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানকে বিবেচনা করা যায় না। তবে এ সময় পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে এত সব ঘটনা ঘটেছে সেসবের প্রতিটি ঘটনার বিবরণ দেওয়া অসম্ভব না হলেও বর্তমান গবেষণার সীমাবদ্ধ পরিসরে তা সম্ভব নয়। তবে এসবের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের স্বার্থে শুধু গোড়ার দিকের কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হবে এবং অবশিষ্ট ঘটনার পরিসংখ্যান প্রদান করা হবে। সে যা হোক, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানকে বিশ্লেষণ করার স্বার্থে প্রেক্ষাপটসহ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর বিবরণ ও ব্যাখ্যা প্রদান অবশ্যই অনস্বীকার্য।

৮.৬ আইয়ুব–বিরোধী গণআন্দোলনের প্রথম পর্যায়

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের যে ছাত্র-সমাজ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতারের প্রতিবাদ ও ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র-বিরোধী সংগ্রামের সূত্রপাত করেছিল সে ছাত্র-সমাজই এর ধারাবাহিকতা হিসাবে নতুন পর্যায়ের সংগ্রাম শুরু করে। ১৯৬২ সালের ৮ই জুন জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনকে উপলক্ষ করে উহার সদস্যদের আইয়ুব খানের সমর্থক বানাবার জন্য হুমকি ও প্রলোভনসহ নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করা হয়। এ অপচেষ্টাকে প্রতিরোধ করার জন্য ছাত্র-সমাজ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকা অবস্থায় আবার আন্দোলন সংগঠিত করে। প্রথম অধিবেশনে যোগদানকল্পে মৌলভী তমিজ উদ্দীন খান, মোহাম্মদ আলী এবং ফরিদ আহমেদ তখন রাওয়ালপিন্ডিতে অবস্থান করছিলেন। ৫ই জুন তিনজন মহিলা সদস্যসহ মোট ৫৯ জন সদস্যের একটি দলকে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি বিশেষ বিমানের ব্যবস্থা করা হয়। সদস্যগণ তাদের আত্মীয়-স্বজন নিয়ে বিমান বন্দরে উপস্থিত হয়েছেন। এমন সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ'খানেক ছাত্র জাতীয় পরিষদের সদস্যদেরকে ঘেরাও করে এবং সদস্যগণ যাতে আইয়ুব খানকে সমর্থন না করে তার প্রতিশ্রুতি দিতে তাদের বাধ্য করে।[২৩০] ছাত্ররা তখন বিভিন্ন শ্লোগান এত তীব্রভাবে দিতে থাকে যে, সকল বিমান বন্দরের লোকজন সেখানে সমবেত হয়ে পড়ে। এদিনের ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে অবজার্ভারের এক রিপোর্টে বলা হয়ঃ

---

২২৭ হাননান, মোহাম্মদ (১৯৮৭)ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

২২৮ নুরুর রহমানের সাথে গবেষকের সাক্ষাৎকার।

২২৯ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৮২)ঃ প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ১৫০।

২৩০ . Pakistan observer, Dacca, June 6,1962

Dhaka University Institutional Repository

"They gathered around the National Assembly Members, demonstrated the their sentiments on such issues as release of Political Prisoners, restoration of Democracy, amendment of constititution, abolition of a common language, removal of economic disparity and the like. They also pressed for specific commitments from the members with regard to their role in the parliament.....They also lustily cleared some members for the open endorsement of their views. Most other members, it appeared, also held out assurance to the students that thier sentiments would be respected by them and they would play their part honestly."[২৩১]

৭ই জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ উহার বিভিন্ন হল সংসদ ও ঢাকার কয়েকটি কলেজের ছাত্র সংসদের নির্বাচিত সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ১০ জন বিশিষ্ট ছাত্র নেতা পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের উদ্দেশ্যে ১৫ দফা দাবী সংবলিত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি প্রদান করেন। এ বিবৃতি দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে খুবই গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত হয়। উক্ত ১০ জন ছাত্র নেতার মধ্যে ডাকসু ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫টি হল সংসদের ৭ জন এবং কায়েদে আজম কলেজ, ঢাকা কলেজ ও ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র সংসদসমূহের ৩জন সহ-সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ১৫ দফার মধ্যে মূল দাবীগুলি ছিলঃ ছাত্র ও রাজবন্দীদের অনতিবিলম্বে শর্তহীন মুক্তি; গ্রেফতারী পরোয়ানা তুলে নেওয়া; সামরিক আইনে সাজাপ্রাপ্তদের শাস্তি মওকুফ; রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তির অবসান ও বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তি ফেরৎ প্রদান, প্রাক্তন নেতৃবৃন্দের ওপর থেকে এফডো ও প্রোডো প্রত্যাহার; বাকস্বাধীনতা; সংগঠন করার স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা; রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ আইনের অবসান; রাজনৈতিক দল বিধি প্রত্যাহার, পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন; কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর থেকে সরকারী নিয়ন্ত্রণ বিধির অবসান; শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠাসহ শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি; পূর্ব পাকিস্তানে মূল ও ভারী শিল্পের প্রতিষ্ঠা, ছাত্রদের যাতায়াত সুবিধাসহ বিভিন্ন দাবী। পূর্ব পাকিস্তানের কোন সদস্য যেন সরকারী কোন পদ বা মন্ত্রীত্ব গ্রহণে রাজী না হন এটিও ১৫ দফা দাবীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ সকল দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় পরিষদে সংসদ সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালনের আহবান জানানো হয়।[২৩২] এর পরদিনই আইয়ুব খান এক অধ্যাদেশ জারি করে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করে দেন এবং ছাত্রদেরকে রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত করার যে কোন চেষ্টাকে কঠোর ধরনের শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করেন।[২৩৩] কিন্তু ছাত্ররা এতেএকটুও দমে নি বরং তারা ১৫ই জুন আবার উক্ত ১৫ দফা দাবী পুনর্ব্যক্ত করে সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রদান করে।[২৩৪] ১৮ই জুন জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে ছাত্রদের এ আন্দোলনের প্রথম সাফল্য আসে। সেখানে মোহাম্মদ ফরহাদ ও বদরুল হকসহ ৫ জন ছাত্র নেতার ওপর থেকে হুলিয়া প্রত্যাহার করে নেওয়ার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[২৩৫] একই দিন শেখ মুজিবসহ কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা মুক্তি পান।[২৩৬]

এর এক সপ্তাহ পর অর্থাৎ ২৫শে জুন প্রকাশিত হয় বিখ্যাত নয় নেতার বিবৃতি। এ বিবৃতিতে ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা পুংখানুপুংখভাবে তুলে ধরে জনগণের সার্বভৌমত্ব যাতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এমন ধরনের একটি শাসনতন্ত্র ছয় মাসের মধ্যে প্রণয়ন করার আহবান জানানো হয়। এ বিবৃতিতে পাকিস্তানের ঐক্য, আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মুক্তি, মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, দমননীতির অবসানসহ বিভিন্ন আশু দাবী অন্তর্ভুক্ত হয়। এসব দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন অগ্রসর করে নেওয়ার জন্য বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি প্রতিও আহবান জানানো হয়। এ নয় জন নেতা হচ্ছেন সর্বজনাব হামিদুল হক চৌধুরী, নূরুল আমিন, আবু হোসেন সরকার, আতাউর রহমান খান, মাহমুদ আলী, শেখ মুজিবুর রহমান, ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া), সৈয়দ আজিজুল হক ও পীর মোহসিন উদ্দীন আহমদ (দুদু মিয়া)।[২৩৭] রাজনৈতিক অঙ্গনে নয় নেতার উক্ত দীর্ঘ যুক্ত বিবৃতির অপরিসীম প্রভাব পড়ে। সমাজের সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষ এ বিবৃতির প্রতি সমর্থন জানান।[২৩৮] ঐ বিবৃতির সমর্থনে প্রথম জনসভা ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ ঘটে। এর পর চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেট, টাঙ্গাইল ও ব্রাহ্মণবাড়িয়াসহ বিভিন্ন জায়গায় পর পর জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক জনসভায় বিপুল জনসমাবেশ ঘটে। জেল থেকে সোহরাওয়ার্দী এ উদ্যোগকে সমর্থন করলে এ আন্দোলনের গতিবেগ আরো বেড়ে যায়। সকল বিরোধী দলের এক মঞ্চে দাঁড়ানোর ফলে এ গণজোয়ার যেন গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হতে থাকে। অবস্থার এ বিস্ময়কর পরিবর্তন দেখে আইয়ুব খান সত্যি ঘাবড়ে যান এবং বিরোধী দলগুলির ওপর দমননীতির নতুন কৌশল হিসাবে একটি রাজনৈতিক দলবিধি ঘোষণা করেন। এ অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া মন্তব্য করেন,

"...In order to stop this mass uprising the Government, on 30 June 1962, placed before the National Assmembly a bil to be known as the Political Parties bill, 1962..."[২৩৯] এ বিলে ঘোষণা করা হয় যে, ইসলামের নীতি-বিরুদ্ধ ও পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্ট করতে পারে এমন কোন দলকে সংগঠিত হতে দেওয়া যাবে না। এ বিলের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের উভয় অংশে ব্যাপক প্রতিবাদ ওঠে। ঢাকার পল্টন ময়দানে নূরুল আমিনের সভাপতিত্বে বিরোধী দলসমূহের এক যৌথ জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিব এ জনসভায় সরকারের সমালোচনা করে খুবই জোরালো বক্তব্য রাখেন। তিনি দাবী করেন এবডোসহ সকল রকমের কালো আইনের অবসান করতে হবে এবং সোহরাওয়ার্দী, ভাসানী ও আবদুল গাফফার খানসহ সকল রাজবন্দীকে মুক্তি দিতে হবে।[২৪০] এর কিছু দিন পর ১৯শে আগস্ট হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী জেল থেকে মুক্তি লাভ করে ঢাকায় আসেন। সোহরাওয়ার্দী তখন পাকিস্তানে সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের ঐক্যের প্রতীকে পরিণত হন। তাঁর সম্বর্ধনা উপলক্ষে ৮ই সেপ্টেম্বর ঢাকা বিমান বন্দরে যে জনসমাবেশ ঘটে তা ছিল অভূতপূর্ব।

---

২৩১. Ibid, June 8, 1962.
২৩২. Ibid.
২৩৩. Ibid, June 9, 1962.
২৩৪. Ibid, June 16, 1962.
২৩৫. Ibid, June 19,1962.
২৩৬. Ibid, June 19,1962.
২৩৭. Ibid, June 25,1962.
২৩৮. খান, আতাউর রহমান (১৯৭৪); প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩।
২৩৯. Bhuiyan, Md. Abdul Wadud (1982) Emergence of Bangladesh and Role of Awami Leageee., Newdelhi: Vikas Publishing House Ptvt. Ltd. pp.64-65.
২৪০. Ibid, p.65

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত নয় জন রাজনৈতিক নেতা স্বনামে দল পুনরুজ্জীবনের বিরোধিতা করেদাবীসমূহ পূরণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দলবিহীন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহবান জানিয়েছিলো। কিন্তু তাদের সে আহ্বানকে অনেকেই অনুসরণ করেননি। পশ্চিম পাকিস্তানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল স্বনামে কার্যক্রম শুরু করে দেয়। তবে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কারা মুক্তির পর এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। পূর্ব পাকিস্তানকে বিরোধী দলগুলির ঐক্যকে সংহত করে তিনি জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (NDF) গঠন করেন। শুধু পূর্ব পাকিস্তানে নয়, পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় সকল বিরোধী দলীয় নেতা উক্ত ফ্রন্টে যোগদানের আশ্বাস দেন। এভাবে সমগ্র পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী গণআন্দোলন একটি দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়ায়।[২৪১]

অন্যদিকে, শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনগুলির মধ্যে তখন ব্যাপক ভাঙ্গন ও অনৈক্য সত্ত্বেও তারা তাদের শ্রেণীগত দাবী, গণতান্ত্রিক ও অন্যান্য মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সামরিক শাসন উঠে যাওয়ার পর থেকে ব্যাপকতর আন্দোলন শুরু করে। ইতিমধ্যে প্রধান যে দু'টি শ্রমিক ফেডারেশন ছিল সে দু'টিই বিভক্ত হয়ে পড়ে। সরকারের প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টায় বিদেশী পুঁজিনির্ভর বৃহৎ শিল্পকারখানাগুলি গড়ে ওঠার সাথে সাথে ১৯৬০ সাল থেকে খুব দ্রুতগতিতে পূর্ব পাকিস্তানে শ্রমিক সংখ্যা বাড়তে থাকে। এ পর্যায়ে শ্রমিক নেতাদের মধ্যে ক্ষতিকর সুবিধাবাদী চরিত্রের প্রকাশ ঘটে।[২৪২] প্রশাসনের আনুকূল্য লাভের প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে 'পূর্ব পাকিস্তান ফেডারেশন অব লেবার'এর নেতৃবৃন্দ তাকে তিন ভাগে বিভক্ত করে ফেলেন এবং প্রত্যেকেই দাবী করেন তার সাথে সকল ইউনিয়ন যুক্ত রয়েছে। এদের একাংশের নেতা ডাঃ এ, এম, মালিক পরবর্তীকালে শ্রমমন্ত্রী নিয়োজিত হয়েছিলেন।[২৪৩] আর মোহাম্মদ তোয়াহার নেতৃত্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান মজদুর ফেডারেশন থেকে জনৈক ছন্নাবাদ বেরিয়ে গিয়ে দাবী করতে থাকেন সকল ইউনিয়ন তার সাথে আছে। ছন্নাবাদের মতে যেহেতু সামরিক শাসন অব্যাহত সেহেতু শ্রমিকশ্রেণীর দাবী-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করা বেআইনী। এভাবে উক্ত তথাকথিত শ্রমিক নেতা সরকার ও প্রশাসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হয়ে পড়ে। বামপন্থীরা সামরিক শাসন আমলেও শ্রমিকদের মধ্যে তাদের কাজকে সুসংহত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। এ সম্পর্কে কামরুদ্দীন আহমদ মন্তব্য করেনঃ

"Leftists in the meantime, were not sitting idle. They began to concentrate their activities in plantation, Cement Factory, Fenchuganj Fertilizer and Jute Mills in Chittagong Division, Cotton Textiles specially in Tongi, Cigaratte Factories, Soap factories, Sugar Mills, Biscuit Factories, Railway and Biri Sramiks in North Bengal."[২৪৪]

অন্যদিকে, ১৯৬২ সাল নাগাদ প্রদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মচারিগণও বেশ শক্তিশালী সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলে। সে সময় কর্মচারীদের United Council of Associations of the Civil Employees of Pakistan (UCACEP) একটি শক্তিশালী ও জঙ্গী সংগঠনরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ২৭টি সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত এ প্রতিষ্ঠানের সদস্য সংখ্যা ছিল মোট ৩৭,০৭৩ জন।[২৪৫] উল্লেখ্য, সামরিক শাসনের অব্যবহিত পর শ্রমিক -কর্মচারীদের যে আন্দোলন গড়ে ওঠে তার নেতৃত্বে ছিল বামপন্থী কর্মীরা।

সামরিক শাসনের পর থেকেই বিভিন্ন হাসপাতালের আবাসিক কর্মচারিগণ তাদের পেশাগত দাবী-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন শুরু করেন। এদের সাথে মেডিকেল কলেজ ও স্কুলসমূহের ছাত্ররাও যোগ দেয়। তখন ময়মনসিংহ ও সিলেট হাসপাতালের কর্মচারিগণও এ দু'টি হাসপাতালের সাথে যুক্ত মেডিকেল স্কুলের ছাত্ররা লাগাতার ধর্মঘট শুরু করে। ১৯৬২ সালের ১৪ই জুলাই ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালের আবাসিক ডাক্তার ও সার্জনরা ১৬ই জুলাই পর্যন্ত ঐ দু'টি হাসপাতালের কর্মচারীদের ধর্মঘটের সমর্থনে অবিরাম ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করে। হাসপাতালের আবাসিক কর্মচারীদের মূল দাবী ছিল সীমাহীন অর্থনৈতিক দৈন্যের অবসান, কেননা তাদের কারো কোন বেতন ছিল না, শুধু মাত্র কয়েকজন সিনিয়র চিকিৎসক সামান্য কিছু ভাতা পেতেন। আর ছাত্রদের ওপর প্রি-এক্সামিনেশনের ব্যবস্থা আরোপ করা হয়েছিল । এ পরীক্ষায় পাস না করলে এম,বি,বি,এস কোর্সে ভর্তি হওয়া যেতো না। এছাড়াও ছিল তাদের অন্যান্য পেশাগত দাবী।[২৪৬] ১৭ই জুলাই মিটফোর্ড হাসপাতালের আবাসিক ডাক্তারদের ধর্মঘটের ফলে চিকিৎসা ব্যবস্থা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করে সরকার এক প্রেস নোট জারি করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ধর্মঘট অব্যাহত থাকে। সে সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নার্সদেরও ধর্মঘট চলছিল।[২৪৭] অর্থাৎ সারা পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী চিকিৎসা ব্যবস্থাই সে সময় ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু চিকিৎসকদের দাবীর প্রতি সরকার মোটেই নমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করে নি, বরং ধর্মঘটী আবাসিক চিকিৎসকদের চাকরিচ্যুত করে। এতে একমাত্র মিটফোর্ড হাসপাতালেরই ৫৩ জন চিকিৎসকের চাকরি যায়। প্রশাসন শুধু ডাক্তারদের চাকরিচ্যুত করেই ক্ষান্ত হয়নি, হাসপাতাল এলাকায় অবস্থিত ব্যচেলরস কোয়ার্টার্স থেকে বলপূর্বক চিকিৎসকদের বহিষ্কারও করে। এ ঘটনার বিরুদ্ধে চিকিৎসকগণ তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং এক সভায় সমবেত হয়ে এ ধরনের অবৈধ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য প্রশাসনের প্রতি আহবান জানান। সেই সাথে আবাসিক চিকিৎসক ও ছাত্রদের দাবী না পূরণ হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট অব্যাহত রাখার পক্ষে তারা দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন।[২৪৮]

এদিকে বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীরা সামরিক শাসন আমলের অগণতান্ত্রিক Servants Act সংশোধন করার দাবী উত্থাপন করতে থাকে এবং অনতিবিলম্বে পে- কমিশন রিপোর্ট কার্যকরী করার দাবী জানাতে শুরু করে। এ ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করে পাকিস্তান ডাক ও তার বিভাগের কর্মচারিগণ। তারা তাদের সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় এ দাবী জানায়।[২৪৯] ২০শে জুলাই ডাক ও তার বিভাগের বৈদেশিক শাখা অফিসে ডাক ও তার সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভাতে United Council of Associations of the Civil Employees of Pakistan (UCACEP)-এর সভাপতি গোলাম মোর্তজা সভাপতির ভাষণে পে-কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়নে

---

২৪১. Ibid, pp.65-66.
২৪২. Ahmad, Kamruddin (1974): Labour Movement in Bangladesh. Dacca: Inside Library, p.45.
২৪৩. Ibid, p. 45.
২৪৪. Ibid, p.46.
২৪৫. Ibid, p. 47.
২৪৬. Pakistan Observer, Dacca, July, 14,1962.
২৪৭. Ibid, July, 1,1962.
২৪৮. Pakistan Observer, Dacca. July 25,1962.
২৪৯. Ibid, July 16,1962.

Dhaka University Institutional Repository

সরকারী টালবাহানার তীব্র নিন্দা করেন।[২৫০] সেটেলমেন্ট বিভাগের প্রাদেশিক কানুনগো সম্মেলনেও এ দাবী তীব্রভাবে তুলে ধরা হয়।[২৫১] এভাবে প্রদেশে পে-কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়নের দাবী ক্রমাগত ব্যাপকতর আন্দোলনে রূপলাভ করতে থাকে।

এসময় শ্রমিকরাও বসে থাকে নি। কিন্তু শ্রমিকরাই প্রথম প্রকাশ্য আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়। সিরাজগঞ্জের ২ হাজার বেকার বিড়ি শ্রমিক তাদের কাজের দাবীতে বিভিন্ন সরকারী অফিসে সংগঠিতভাবে ধর্ণা দেয়, বিভিন্ন কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তির সাথে প্রতিনিধি পাঠিয়ে বার বার আলাপ-আলোচনা করে, কিন্তু কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণে অসম্মতি জানায়। দিনে ১৫/১৬ ঘন্টা কাজ করেও যাদের অন্নসংস্থান হয় না, তাদের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করে কর্তৃপক্ষ একতরফাভাবে বিড়ির পাতা আমদানী নিষিদ্ধ করার ফলে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়।[২৫২]

১১ জন শ্রমিকের চাকরিচ্যুতির প্রতিবাদে নারায়ণগঞ্জের পূর্ব পাকিস্তান টেক্সটাইল মিলস্-এর শ্রমিকগণ ২৫শে জুলাই থেকে একটানা ১৬ ঘন্টা ধর্মঘট পালন করে। এ বিষয়টির সন্তোষজনক মীমাংসার পরই শ্রমিকরা কাজে যোগদান করে।[২৫৩] ২৬শে জুলাই খুলনার ব্যক্তি-মালিকানাধীন মালিক ছিলেন অবাঙালী বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলের ৫৫০ জন শ্রমিক ১০ই আগস্ট থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটে যাওয়ার কথা ঘোষণা করে। ধর্মঘটে যাওয়ার ঘোষণার আগে তারা তাদের নিজস্ব দাবী-দাওয়া সংবলিত ১০ দফা দাবী প্রশাসনের কাছে পেশ করে। কিন্তু প্রশাসন এ দাবীনামার ব্যাপারে কোন মতামত প্রদান না করে শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে থাকে। শ্রমিকদের ১০ দফার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ছিল ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠায় স্বীকৃতি, চাকরিচ্যুতদের পুনর্নিয়োগ, বেতন গ্রেড প্রদান ও বৃদ্ধি। উল্লেখ্য, এ প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ শ্রমিক নেতাকে চাকুরিচ্যুত করা হয়েছিল এবং এদের সংখ্যা ছিল অনেক।[২৫৪]

২৮শে জুলাই করাচীতে সমগ্র পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্বশীল ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী ও নেতৃবৃন্দের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে পাকিস্তানের সকল শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতা এক সাধারণ সভার আহবান জানানো হয়। শ্রমিকশ্রেণীর দাবীসমূহ প্রণয়নও সরকারের কাছে সেসব উপস্থাপনের কৌশল নির্ধারণই ছিল উক্ত সাধারণ সভার মূল লক্ষ্য। এ সভায় শর্তহীনভাবে মৌলিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ধর্মঘটের অধিকার প্রদান, আই,এল,ও কনভেনশন অনুযায়ী শ্রমিকশ্রেণীর সকল ধরনের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী জানানো হয়।[২৫৫]

৩০শে জুলাই 'পূর্ব পাকিস্তান চতুর্থ শ্রেণী সরকারী কর্মচারী সমিতির কার্যকরী কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় দাবী করা হয় যে, যতদিন পর্যন্ত সরকারের সদ্য ঘোষিত পে-কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়িত না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত জনপ্রতি মাসিক ২৫ টাকা করে রিলিফ প্রদান করা হোক।[২৫৬] 'পূর্ব পাকিস্তান লিপটন আউটডোর ইমপ্লয়িজ ইউনিয়ন' নামক একটি শ্রমিক সংগঠনের কার্যকরী কমিটি মূল বেতনে সংগতিসাধন, মহার্ঘভাতা, চিকিৎসা সুবিধা, প্রভিডেন্ট ফান্ডের পরিপূর্ণ সুবিধা এবং বেতন বৃদ্ধির দাবী নিয়ে শিল্প আদালতে মামলা দায়ের করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[২৫৭] একই দিনে টি এন্ডটির ওয়ারলেস ইউনিয়ন তাদের বিভিন্ন পেশাগত দাবী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে একটি মেমোরেন্ডাম আকারে পেশ করেছে বলে জানা যায়। সারা পাকিস্তান ডাক ও তার ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান ডাক ও তার বিভাগের বিভিন্ন ইউনিয়নের প্রতিনিধিগণ কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রীর সাথে দেখা করেন এবং পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বিদ্যমান সীমাহীন বৈষম্যের অবসান ও উভয় অঞ্চলের বিভাগীয় কর্মচারীদের সুযোগ সুবিধার মধ্যে সমতা আনার জন্য জোর দাবী তুলে ধরেন।[২৫৮] ১লা আগস্টের অবজারভার পত্রিকায় আরো বেসরকারী কলেজ শিক্ষক সমিতির একটি প্রতিবাদের খবর জানা যায়। সমিতির কার্যকরী কমিটির এক সভায় শিক্ষকরা মাত্র ৫ টাকা মহার্ঘভাতাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেন এবং বস্ত্র ও মহার্ঘভাতাসহ তাদের অন্যান্য দাবী আদায়ের জন্য শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্দোলন অব্যাহত রাখার সংকল্প ঘোষণা করেন। ৩১শে জুলাই পূর্ব পাকিস্তান আভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ইউনিয়নের পক্ষ থেকে প্রতাপউদ্দীন আহমদ এক সংবাদ সম্মেলনে নৌপরিবহন শ্রমিকদের করুণ অবস্থার বিবরণ তুলে ধরেন। সে সময় ইংল্যান্ড ও ভারতের তিনটি কোম্পানীর যৌথ পরিচালনার অধীনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সমগ্র নৌ পরিবহন ব্যাবস্থাটি নিয়ন্ত্রিত হত। উক্ত যৌথ পরিচালনাধীন কোম্পানীর অধীনে ১০ হাজার পূর্ব পাকিস্তানী শ্রমিক নিয়োজিত ছিল। কিন্তু তাদের চাকরীর কোন নিশ্চয়তা ছিলনা, ছুটি কিংবা অন্য কোন সুযোগ-সুবিধা তাদের ছিলনা বললেই চলে, কেউ একবার ছুটি নিলে আবার যোগদান করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম্ভব হয়ে উঠতো; অথচ ভারতীয় নাগরিক কর্মচারীদের অনেক বেশী সুযোগ-সুবিধা ছিল, তাদেরকে সবেতন এক মাসের ছুটি প্রদান করা হত। অবকাশ যাপন শেষে কর্মক্ষেত্রে যোগদান করতে তাদের কোনরকম বাধা নিষেধ ছিল না। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বিষয়টি বার বার জানানো সত্ত্বেও সরকার এর বিরুদ্ধে কোনরূপ ব্যবস্থাগ্রহণ করছেন না বলে উক্ত সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়। পরিশেষে, নৌপরিবহন শ্রমিকদের এ সংকট থেকে পরিত্রাণের জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানানো হয়।[২৫৯] ১লা আগস্ট থেকে জামালপুরের বিড়ি শ্রমিকরা অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু করে। চট্টগ্রামের নবগঠিত ভিক্টরি জুট প্রোডাক্টস্-এর শ্রমিকরাও কয়েকজন শ্রমিকের চাকরিচ্যুতির প্রতিবাদে ৩১শে জুলাই থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু করে।[২৬০] ছাত্রদের শিক্ষা আন্দোলনের ব্যাপকতা ও বিজয় শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে আরও উৎসাহিত করে। পুরো ১৯৬৩ সাল শ্রমিকদের ব্যাপকতর আন্দোলন চলতে থাকে। শ্রমিকশ্রেণীর এ আন্দোলনকে মোকাবেলা করতে সরকার ও অবাঙ্গালী মালিকরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উস্কানী দিতে থাকে, যা ১৯৬৪ সালে বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী দাঙ্গায় পরিণত করে। প্রকৃতপক্ষে, এ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের শ্রমিকশ্রেণী এ অঞ্চলের স্বাধিকার আন্দোলনে অত্যন্ত গৌরবোজ্জল ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়।

---

২৫০. Ibid, July 21,1962.
২৫১. Ibid, July 22,1962.
২৫২. Ibid, July 18,1962.
২৫৩. Ibid, July 27,1962.
২৫৪. Ibid, July 27,1962.
২৫৫. Ibid, July 29,1962.
২৫৬. Ibid, July 31,1962.
২৫৭. Ibid, August 1,1962.
২৫৮. Ibid.
২৫৯. Ibid, August 2,1962.
২৬০. Ibid, August 9,1962.

Dhaka University Institutional Repository

যা'হোক, প্রত্যক্ষ সামরিক শাসন অবসানের পর যখন রাজনৈতিক দল, শ্রমিক, কর্মচারী, পেশাজীবী ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের সাধারণ মানুষ তাদের স্ব স্ব দাবী নিয়ে মাঠে নামতে শুরু করে, তখনই পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজের কাছে এক ঐতিহাসিক দায়ীত্ব এসে পড়ে। ছাত্রদের সাহসী ও গৌরবোজ্জল ভূমিকার কারণেই ১৯৬২ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে একটি মাইল ফলক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা সচিব ডঃ এস,এম, শরিফের সভাপতিত্বে গঠিত 'Commission on National Educaton'-এর রিপোর্ট ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হওয়ার পরই এ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। যদিও উক্ত শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবেবাংলা ভাষার পরিপূর্ণ স্বীকৃতি প্রদান করা হয়, তবু ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে ইংরেজী শিক্ষার ওপর খুব বেশী রকম গুরুত্ব দেওয়া হয়। অবশ্য, ভাষা শিক্ষার এ নতুন নীতি পূর্বতন শিক্ষানীতি অপেক্ষা খুব বেশী আপত্তিকর ছিলনা বরং ৩৬০ পৃষ্ঠার এ বৃহৎ রিপোর্টে অসংখ্য আধুনিক ও গ্রহণযোগ্য বিষয়ের সংযোজন ঘটে। এতে কিছু ভাল বিষয়ের উল্লেখ থাকলেও এ শিক্ষানীতি পূর্ব পাকিস্তানে কোন ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে নি, বরং এর কয়েকটি দিকের আশু বাস্তবায়নের পদক্ষেপের কারণে পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র ছাত্রসমাজের মধ্যে এক ব্যাপকতর বিদ্রোহের সূচনা হয়। রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার আগেই শিক্ষানীতির কিছু অংশ কার্যকরী হওয়ার ফলে ছাত্রসমাজের মধ্যে বিশেষতঃ কলেজ ছাত্রদের মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে। কিন্তু যে পর্যায়ে প্রত্যক্ষ সামরিক শাসনের অবসান ঘটে এবং বেশ কিছু রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করা হয় সে পর্যায়েও ছাত্রসমাজকে তাদের রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়। ছাত্রসমাজের সব রকম রাজনৈতিক কার্যকলাপ কিংবা রাজনৈতিক সম্পর্ককে নিষিদ্ধ করা হয় এবং এটাকে গুরুতর শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়। এ পর্যায়ে আসলে সচেতন ছাত্রসমাজ এমন একটা ইস্যুর অপেক্ষায় ছিল যাকে কেন্দ্র করে শিক্ষাঙ্গনগুলির বিদ্যমান শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির একটি আমূল পরিবর্তন ঘটানো যায়। উক্ত শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের কয়েকটি ধারা সে সুযোগটিই এনে দেয়। এ ধারাগুলি অধিকাংশই উচ্চ শিক্ষা সংক্রান্ত এবং বিশেষ করে সেসব ডিগ্রী স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থহীনকর উক্ত রিপোর্টের কয়েকটি ধারার বিশেষ বিশেষ অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলঃ

"31. In order to improve the standards at University level, we recommed most strongly that the bachelor's degree course should be extended from two to three years............

"34..... There should be public examinations at the end of each session, or at least at the end of each year, to encourage steady application and to dicide the students fitness to continue the course..... At the end of the first year there must be a firm assessment of the students progress with privision for transfer from the pass to the honours course or from the honours to the pass........

"36. The holder of a pass degree shall be also eligible provided he has attained at least second division in the subject in which he intends to specialize, and provided he successfully studies at least two honours papers of the bachelor's course in his chosen subject.........

"51. It is suggested that the pass marks befixed at 40% in each subject with 50% in the aggregate and that a student must achieve an average of 60% for a Second Division, and 70% for a First Division. The student who fails should have one more chance only."....[২৬১]

অর্থাৎ (১) ব্যাচেলার ডিগ্রী কোর্স ২ বছরের পরিবর্তে তিন বছরে বর্ধিত করা উচিৎ;

(২) প্রতি সেসন বা বছর সমাপ্তির পর কেন্দ্রীয়ভাবে একটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা উচিৎ। এ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচাই করা যাবে একজন ছাত্র তার কোর্স চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যোগ্য কি না ;

(৩) প্রথম বর্ষের পরীক্ষার ফলাফলের ওপর নির্ভর করবে সম্মান কোর্সের ছাত্রটি সম্মান কোর্স চালিয়ে যাবে, না পাস কোর্সে স্থানান্তরিত হবে। একইভাবে পাস কোর্সের কোন ছাত্রের প্রথম বর্ষ পরীক্ষায় সাফল্যজনক ফলাফলের ওপর নির্ভর করবে সে পাস কোর্স থেকে অনার্স কোর্সে যেতে পারবে কিনা;

(৪) কোন ব্যাচেলর ডিগ্রী অধিকারী মাষ্টারস কোর্সে ভর্তি হতে পারবে কিনা তা নির্ভর করবে নিম্নোক্ত দু'টি শর্তের ওপরঃ

(ক) যে বিষয়ে তিনি ভর্তি হতে চান তাতে অবশ্যই দ্বিতীয় বিভাগের নম্বর পেতে হবে;

(খ) ব্যাচেলর ডিগ্রীতে অন্যূন দু'টি সম্মান বিষয়ে সাফল্যজনকভাবে উত্তীর্ণ হতে হবে;

(৫) ডিগ্রী বিষয়ে পাস করতে হলে প্রতিটি পত্রে অন্যূন শতকরা ৪০ নম্বর পেতে হবে এবং প্রাপ্ত নম্বর পরীক্ষাধীন বিষয়সমূহের মোট নম্বরের শতকরা ৫০ ভাগের নিচে হলে চলবে না। দ্বিতীয় বিভাগ পেতে হলে মোট নম্বরের শতকরা ৬০ ভাগ অর্জন করতে হবে এবং প্রথম বিভাগের জন্য শতকরা ৭০ নম্বর লাগবে।

এই ছিল শরীফ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে বর্ণিত শিক্ষানীতির স্বরূপ। প্রথমে কলেজসমূহের ডিগ্রী স্তরের ছাত্রগণই এর শিকার হল। শুরুতেই দেখা গেলো ডিগ্রী প্রথম বর্ষ থেকে শতকরা ৫০ ভাগ নম্বর এবং প্রতি বিষয়ে কমপক্ষে শতকরা ৪০ ভাগ নম্বর অর্জন করে খুব সামান্যসংখ্যক ছাত্রই কৃতকার্য হতে পেরেছিল।[২৬২] যারা কৃতকার্য হতে পারেনি শুধু তারাই নয়, এমনকি যারা উক্ত কঠিন শর্ত মেনেও কৃতকার্য হতে সক্ষম হয়েছিল তাদের জন্যও পরে অসুবিধা হয়েছিল। কেননা যে কোন ছাত্র যে কোন বর্ষে অকৃতকার্য হলে শুধু মাত্র একবার পরীক্ষা দেওয়ার বিধান ছিল। ফলে উক্ত কঠিন শর্ত মেনে দ্বিতীয়বার অকৃতকার্য হলে তার উচ্চ শিক্ষার সুযোগ চিরতরে বন্ধ হয়ে যেত। বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মান শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যেও পাস কোর্সে স্থানান্তরিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। তবে দেশের ভাল ছাত্রদের মধ্যে এ আশংকা প্রথমে লক্ষ্য করা যায় নি। কলেজসমূহের ছাত্রদের মধ্যে এ আশংকা আরও প্রকটরূপ নেয়। যেমন, উক্ত কঠিন শর্ত মেনে যদি কারো পক্ষে ডিগ্রী পাস করা সম্ভব হত তাহলেও তা তৃতীয় বিভাগের ওপর কোন বিভাগ পাওয়ার সৌভাগ্য খুব অল্পসংখ্যক ছাত্রের ভাগ্যেই জুটত। অন্যদিকে, মাষ্টার্স শ্রেণীতে ভর্তির জন্য যে শর্ত আরোপ করা হয় তাতে ডিগ্রী পাস কোর্সের কোন ছাত্র কদাচিৎ মাষ্টার্স কোর্সে ভর্তি হতে পারত।

---

২৬১. Government of Pakistan (1960): Report of the Commission on National Education, Karachi: Publication Department of Pak. Govt. pp. 20-25

২৬২. তৎকালীন ছাত্রনেতা নূরুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎকার।

Dhaka University Institutional Repository

এ রিপোর্ট সামান্য সংশোধন করে ১৯৬১ সালে বৃহৎ কলেবরে পুনঃপ্রকাশ করা হয়। তীব্র সমালোচনার কারণে কিছু পরিবর্তন করা হলেও রিপোর্টের উল্লিখিত মূল বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে যায় এবং সত্বর এসব কার্যকরী করা হয়। ফলে স্কুল-কলেজে অস্বাভাবিকভাবে ছাত্রবেতন বৃদ্ধি পায় এবং উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে আটখানা ইংরেজী পাঠ্য পুস্তক প্রবর্তন করা হয়।[২৬৩] এ সংশোধিত শিক্ষা কমিশন রিপোর্টটিই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিতর্কিত বিচারপতি হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট নামে কুখ্যাতি অর্জন করে।

এ শিক্ষানীতি কার্যকরী হওয়ার পর পরই ছাত্রসমাজের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জগন্নাথ কলেজে দেশের বিভিন্ন কলেজের ছাত্ররা এসে যোগাযোগ স্থাপন করতে থাকে। তবে বিশিষ্ট ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী মতিয়া চৌধুরীরনেতৃত্বে ইডেন কলেজের ছাত্রীরাই সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।[২৬৪] অবশ্যই ঢাকা কলেজের ছাত্ররাই প্রতিবাদের সর্বপ্রথম সাংগঠনিক কাঠামো দাঁড় করায়। সেখানে ডিগ্রী ক্লাসের ছাত্রদের উদ্যোগে গড়ে ওঠে ডিগ্রী ফোরাম। কয়েক দিনের মধ্যে জগন্নাথ কলেজের কাজী আরিফ ও নূরুর রহমানসহ কতিপয় ছাত্রের মুখ্য ভূমিকায় বিভিন্ন কলেজ প্রতিনিধিদের নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং এ সভাতেই 'ইন্টার ডিগ্রী ফোরাম' নামে আন্দোলনের একটি সংগঠন সৃষ্টি করা হয়। এই সংগঠনের আহবানেই ১৯৬২ সালের পুরো জুলাই মাস বিভিন্ন কলেজে লাগাতার ধর্মঘট ও ক্লাস বর্জনসহ বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী পালিত হয়। সে কারণে এ আন্দোলন একান্তই কলেজ ছাত্রদের নিজস্ব সমস্যাভিত্তিক আন্দোলন হিসাবেই চিহ্নিত হয়ে আসছিল। তাই এটি তখন তেমন কোন ব্যাপকতা লাভ করতে সক্ষম হয়নি। তবে ১৯৬২ সালের ১০ই আগস্ট আন্দোলনের গুণগত পরিবর্তন ঘটে। এদিন বিকালে ঢাকা কলেজ ক্যান্টিনে স্নাতক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ছাত্ররা এক সমাবেশে মিলিত হয়। ঢাকা কলেজ সংসদের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক কাজী ফারুক আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় শিক্ষানীতি বিরোধী আন্দোলনের তাৎপর্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। কাজী ফারুক আহমদ তার বক্তৃতায় উপস্থিত ছাত্রদের একথা বোঝাতে সক্ষম হন যে, শিক্ষার আন্দোলন ও গণতন্ত্রের আন্দোলন একসূত্রে গাঁথা।[২৬৫] কাজী ফারুক আহমদের তৎকালীন সহপাঠী এবং ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সাথী শামসুজ্জোহা মানিক এ প্রসঙ্গে মবলেনঃ

"বাইরের কলেজগুলির ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষানীতি বিষয়ে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হলেও ঢাকা কলেজের ছাত্রদেরকে তা আকৃষ্ট করতে পারেনি। কেননা, ঢাকা কলেজের ভাল ছাত্রদের কাছে তা মোটেই কোন সমস্যা হিসাবে দেখা দেয়নি। কিন্তু কাজী ফারুক ও আমি নিয়মিত সাপ্তাহিক দেয়াল পত্রিকা বের করতে গিয়ে অনুভব করি সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে একটি আন্দোলন হওয়া দরকার। কিন্তু সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সফলকোন আন্দোলন করতে হলে তেমন একটি ইস্যুর প্রয়োজন। হামুদুর রহমানের শিক্ষানীতিটি সে ইস্যুটিরই জন্ম দেয়। আমাদের ধারণা ছিল উক্ত শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে যে ছাত্ররা প্রতিবাদ করছে তা তাদের অভিভাবকসহ সকল স্তরের মানুষের সমর্থন পাবে। অন্যদিকে, আমরা অনুভব করলাম শিক্ষানীতি বিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠার অর্থই হল ছাত্রসমাজের রাজনীতির ওপর যে বিধি-নিষেধ জারি করা হয়েছিল তা অমান্য করা যাবে। ঐ ইস্যুতে আইয়ূব সরকার-বিরোধী একটি সফল গণআন্দোলন গড়ে ওঠার সম্ভাবনা আমাদের সামনে ফুটে উঠেছিল। সর্বোপরি, শিক্ষানীতি বিরোধী আন্দোলন যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে একই সূত্রে গাঁথা এ কথাটিই আমাদের কাছে মনে হয়েছিল।"[২৬৬]

যাহোক, এভাবেই কলেজ ছাত্ররা এ আন্দোলনের রাজনৈতিক তাৎপর্য উপলব্ধি করে কিন্তু এ ধরনের একটি আন্দোলনকে সফল পরিসমাপ্তির দিকে নিয়ে যেতে হলে শুধু কলেজসমূহকে কেন্দ্র করে তা গড়ে তোলা যাবে না সে কথাও পরিষ্কার হয়ে ওঠে। ততদিনে কলেজগুলি থেকে বেশ কিছু ছাত্র পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। এরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতাদেরকে আন্দোলনের তাৎপর্য অনুধাবনে বিশেষ সহায়তা করেন।[২৬৭] এভাবেই দেশব্যাপী শিক্ষানীতি বিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ আন্দোলনের নেতৃত্বে চলে আসে। ছাত্র সমাজের আন্দোলন সরকারের তীব্র দমননীতির মধ্যেও ক্রমাগত বিকশিত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ১০ সেপ্টেম্বর সচিবালয়ে অবস্থান ধর্মঘটের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে ছাত্রদের সতর্ক করে এক প্রেসনোট প্রদান করে। এর ফলে ছাত্রসমাজ এ দিনের কর্মসূচী প্রত্যাহার করে নেয়, কিন্তু ১৭ই সেপ্টেম্বর এর চেয়েও বড় ধরনের কর্মসূচী তথা দেশব্যাপী হরতাল আহবান করা হয়। হরতাল সফল করার জন্য একদিকে যেমন পথসভা, খন্ড মিছিল ও বিভিন্ন রকম কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় তেমনই ব্যবসায়ী সমিতি, কর্মচারী সমিতি, রিকশা ইউনিয়ন, শ্রমিক ইউনিয়নসহ বিভিন্ন ধরনের সংগঠনের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। এই প্রচারাভিযান ও যোগাযোগের ফলে কয়েক দিনের মধ্যেই ঢাকার শ্রমজীবী জনসাধারণসহ সমগ্র সাধারণ মানুষের ভেতর ব্যাপক জাগরণ সৃষ্টি হয়। ১৬ই সেপ্টেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ঢাকা আগমন করেন। এ উপলক্ষে লক্ষাধিক ছাত্র-জনতা সোহরাওয়ার্দীকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে সমবেত হয়। আর এই বিপুলসংখ্যক মানুষের সমাবেশের মধ্য দিয়ে উক্ত হরতালের সাফল্য অনিবার্য হয়ে ওঠে। ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন যৌথভাবে সোহরাওয়ার্দীকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে যায় এবং শিক্ষানীতি বাতিল ও গণতন্ত্রের দাবীতে মুহর্মুহঃ শ্লোগানে সমবেত জনতা উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। সমাবেশের এক পর্যায়ে আগামীকাল হরতাল-- এ শ্লোগানে বিমানবন্দর মুখরিত হয়ে উঠে। ছাত্র ইউনিয়ন যে কোন ধরনের আপোসের বিরুদ্ধে বারংবার শ্লোগান তুলতে থাকে। এভাবে পরের দিন পরিপূর্ণ হরতালের মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেই জনসাধারণ বিমান বন্দর থেকে ঘরে ফেরে।[২৬৮] হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী উক্ত হরতালে বামপন্থীদের বিশিষ্ট অবস্থানের কথা চিন্তা করে ছাত্রলীগ কর্মীদের ওপর প্রভাব খাটিয়ে তাদেরকে নিরস্ত করার প্রয়াস পান। এতে কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হলেও ১৬ তারিখেই পরিস্থিতি এত উত্তেজনাকর হয়ে ওঠে যে, পরদিনের ঘটনাকে কারো পক্ষেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ছিল না। পাকিস্তান সরকারের ব্যাপক প্রস্তুতি সত্ত্বেও সব রকমের নির্যাতনমূলক ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে ১৭ই সেপ্টেম্বর ছাত্র-জনতা হরতালের কর্মসূচী সফল করতে রাজপথে নেমে আসে। এদিন শ্রমজীবী জনতার অংশগ্রহণের ব্যাপারটি ছিল অভূতপূর্ব। শ্রমিক, ছোট কর্মচারী, গৃহভৃত্য এমনকি বুড়িগঙ্গার নৌকার মাঝিরা পর্যন্ত এ হরতালে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে। সকালেই হরতালকারীদের কাছে মন্ত্রী ও পুলিশের কয়েকটি গাড়ি আক্রান্ত হয়।

---

২৬৩. সাঈদ, কাজী (১৯৮৯)ঃ তিন দশকের ছাত্র রাজনীতি ও ছাত্রলীগের ইতিহাস। তারকালোক, জানুয়ারী ১,১৪, পৃ.৭।
২৬৪. নূরুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎকার।
২৬৫. হান্নান, মোহাম্মদ (১৯৮৭)ঃ বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, ঢাকাঃ ওয়ার্সী প্রকাশনী, পৃ. ৭০।
২৬৬. শামসুজ্জোহা মানিকের সাথে সাক্ষাৎকার।
২৬৭. নূরুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎকার।
২৬৮. হায়দার আকবর খান রনোর সাথে সাক্ষাৎকার।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয়ের চারিদিকে পুলিশের শক্তিশালী বেরিকেত থাকা সত্ত্বেও সকাল নয়টার মধ্যেই সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়ে। চারিদিকে মিছিলকারীদের সঙ্গে পুলিশের খন্ড যুদ্ধ চলতে থাকে। এক পর্যায়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনী গুলিবর্ষণ করে এবং তাতে কয়েকজনের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ে। এ খবর জানার সাথে সাথে জনতা মারমুখি হয়ে ওঠে। বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা পুলিশ ও সেনাবাহিনীর শক্তিশালী বেরিকেড ভেঙ্গে দেয়। এ পর্যায়ে পুলিশের গুলীতে বাবুল ও মোস্তফা শহীদ হন। এতে পরিস্থিতি আরো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ছাত্র-জনতার আক্রমণে পুলিশও সেনাবাহিনীর যৌথ শক্তিশালী বেরিকেটও ভেঙ্গে পড়ে। তখন পুলিশ ও সেনাবাহিনী ছাত্র-জনতার ওপর এলোপাতাড়ি গুলি বর্ষণ শুরু করে। এতে শত শত ব্যক্তি মারাত্মকভাবে আহত হন এবং এ ধরনের নৃশংস আক্রমণের ফলে ছাত্র-জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে বাধ্য হয়। সে সময়ে সোহরাওয়ার্দীর প্রভাবে ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ ছাত্র ইউনিয়নের ওপর দোষারোপ করতে থাকে। এর পর সপ্তাহকাল বিচ্ছিন্নভাবে উক্ত আন্দোলনের ধারাবাহিকতা রক্ষার কর্মসূচী দেশব্যাপী পালিত হতে থাকে। তবে ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগের বিরোধের কারণে এটি আর বেশী দুর অগ্রসর হতে পারেনি।[২৬৯] এভাবে বাষট্টির গৌরবোজ্জ্বল ছাত্র আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটলেও সমগ্র ছাত্রসমাজ, শ্রমজীবী মানুষ ও রাজনৈতিক কর্মীসহ সকল স্তরের মানুষের কাছে এ কথা খুবই পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল যে, লৌহমানব আইয়ুব খানের সরকার যত শক্তিই ধারন করুন না কেন, তার বিরুদ্ধে সফল গণআন্দোলন গড়ে তোলা মোটেই অসম্ভব নয়।

যাহোক, পরবর্তীকালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর দেন-দরবারের ফলে তাৎক্ষণিকভাবে সরকার উক্ত শিক্ষানীতি কার্যকরী করা থেকে বিরত থাকার ঘোষণা দেয়। কিন্তু সোহরাওয়ার্দীর এ ভূমিকার কারণে ছাত্রলীগ তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়। ছাত্র ইউনিয়ন তার ইতিবাচক ও সার্বিক ভূমিকার কারণে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। অন্যদিকে, গোপন কমিউনিস্ট পার্টির বিশেষ চেষ্টার ফলে ব্যাপক শ্রমজীবী জনতা এ আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হয়। আর এভাবেই উক্ত ছাত্র আন্দোলনটি জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকতা লাভ করে। ছাত্রসমাজসহ সমগ্র রাজনৈতিক অংগনে এ সময় বাম রাজনীতি ও প্রগতিশীলতার প্রভাব পড়তে থাকে। পরবর্তী দু'বছর এই প্রগতিশীলতার বিকাশ ধারা অব্যাহত থাকে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত ছাত্র ইউনিয়নের শাখা গঠিত হয়। এ পর্যায়ে ছাত্র ইউনিয়ন একটি শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয়।[২৭০] কিন্তু বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের আদর্শগত বিতর্ক আর আইয়ুবের বৈদেশিক নীতির পরিবর্তনের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের বাম আন্দোলনের এ অগ্রগতিতে ভাটা পড়ে। সমগ্র বাম আন্দোলন এক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।

৮.৭. বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে আদর্শগত বিরোধ ও পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে তার প্রভাবঃ

পঞ্চাশের দশকের শেষ দিক থেকেই কমিউনিস্টদের মধ্যে বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে জোরালো বিতর্কের সূত্রপাত হয়। তবে ১৯৬৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে তা প্রকাশ্য রূপ নেয়। যেসব বিষয় নিয়ে সে সময় বিতর্ক সৃষ্টি হয় সেসবের অন্যতম কয়েকটি নিম্নরূপঃ

(১) চলমান বিশ্বের প্রধান দ্বন্দ্ব;
(২) বিশ্ব বিপ্লবের সাধারণ লাইন;
(৩) শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান সম্পর্কে উপলব্ধি;
(৪) সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতন্ত্র ও কমিউনিস্ট পার্টির বিদ্যমান স্তর এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ।[২৭১]

উপরোক্ত বিষয়গুলির প্রত্যেকটি পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত অথচ প্রত্যেকটিরই রয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে, এসব বিতর্ক এতই বিরাট যে প্রত্যেকটি সম্পর্কে এখানে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। তাই যেসব বিষয় ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিকে প্রভাবিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল কেবলমাত্র সেসবই এখানে আলোচনা করা হবে।

একঃ সে সময়ের চীন ও সোভিয়েত পার্টিসহ সকল কমিউনিস্ট পার্টিই একমত ছিল যে, সমসাময়িক বিশ্বের মৌলিক দ্বন্দ্বসমূহ প্রধানতঃ চারটিঃ

(১) সমাজতান্ত্রিক শিবির ও সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব;
(২) পুঁজিবাদী দেশসমূহে সর্বহারাশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব;
(৩) নিপীড়িত জাতিসমূহ ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব; এবং
(৪) সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের মধ্যেকার ও একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীগুলির মধ্যেকার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব।[২৭২]

উপরোক্ত চারটি মৌলিক দ্বন্দ্ব সম্পর্কে কারো কোন দ্বিমত না থাকলেও প্রধান দ্বন্দ্ব নির্বাচন নিয়ে দ্বিমত দেখা দেয়। সোভিয়েত পার্টি ১ নং দ্বন্দ্বকে প্রধান দ্বন্দ্ব হিসাবে বিবেচনা করে, অন্যদিকে, চীনা পার্টি ৩ নং দ্বন্দ্বকে প্রধান দ্বন্দ্ব হিসাবে বিবেচনা করে। অথচ উভয় পার্টিই তাদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ১৯৫৭ সালের সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কাস পার্টিগুলির 'ঘোষণা' ও ১৯৬০ সালে মস্কোয় অনুষ্ঠিত ৮১টি কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কাস পার্টির মহাসম্মেলনের বিবৃতিকে মূল ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে। সোভিয়েত পার্টির যুক্তি ছিলঃ সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার অস্তিত্বই সাম্রাজ্যবাদের সকল শিরপীড়ার মূল কারণ। কেননা অক্টোবর বিপ্লব এবং পরবর্তীকালে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার উদ্ভব সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিমূলে আঘাত হেনেছে। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার বিশাল ঔপনিবেশিক ক্ষমতাকে ক্রমাগত হীনবল করে দিচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব পুঁজিবাদের সাথে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় বিজয় অর্জন করে চলেছে। সমাজতান্ত্রিক বিনির্মাণে সকল বাঁধা বিপত্তি অতিক্রম করে নজির সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এভাবে আন্তর্জাতিক বিপ্লবী আন্দোলনের বিস্তার সম্ভবপর হয়ে উঠেছে। আর সে কারণে সাম্রাজ্যবাদের সাথে ঔপনিবেশিক ও নয়া ঔপনিবেশিক দেশসমূহের যত

২৬৯. হায়দার আকবর খান রণো, নূরুর রহমান ও শামসুজ্জোহা মানিকের সাথে সাক্ষাৎকার এবং মোহাম্মদ হাননানের প্রাগুক্ত পুস্তক (পৃ.৭২-৭৫) থেকে উপরোক্ত তথ্যগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে।

২৭০. হায়দার আকবর খান রণোর সাথে সাক্ষাৎকার।

২৭১. আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত মহাবিতর্ক (১৯৯০)ঃ সোভিয়েত ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শগত মহাবিতর্কের দলিল সংকলন ১৯৬৩ প্রথম খন্ড, কলকাতাঃ পিপলস্ বুক সোসাইটি।

২৭২. আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাধারণ লাইন সম্পর্কে একটি প্রস্তাব (১৯৮৭)ঃ সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ১৯৬৩ সালের ৩০শে মার্চের চিঠির জবাবে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠি (১৪ই জুন, ১৯৬৩), ঢাকাঃ গণপ্রকাশন, পৃ.৫।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বন্দ্বই থাকুক না কেন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মূল শক্তি হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার অধীনস্ত দেশসমূহ।[২৭৩] আর সে কারণেই মার্কসবাদী- লেনিনবাদীরা সব সময়ই বিশ্বাস করেন যে, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের "অব্যাহত অগ্রগতির অন্যতম মূল শর্ত হলো সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মূল শক্তি সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার দেশসমূহের সাথে পুঁজিবাদী দেশসমূহের শ্রমিক আন্দোলনের দৃঢ় মৈত্রী ও সহযোগীতা।"[২৭৪]

সোভিয়েত পার্টি এভাবে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের সাথে সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্বকে প্রধান দ্বন্দ্ব হিসাবে চিহ্নিত করে এবং এই সহজ ব্যাপারটিকে না বোঝার জন্য চীনা পার্টিকে সমালোচনা করে। চীনা পার্টির অবস্থানকে অতিসঙ্কীর্ণমূলক আখ্যায়িত করে বলা হয় চীনা পার্টির এ নতুন তত্ত্ব তথা "সমাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব আমাদের সময়ের প্রধান দ্বন্দ্ব নয়, বরং তা হলো জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব...........স্পষ্টতঃ চীনা কমরেডরা এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার জনগণের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জনের সহজতম পথ হিসাবে এটাকে ব্যবহার করতে চাচ্ছেন। ....এর আসল উদ্দেশ্য হলো জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী ও তার সৃষ্ট সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করা।"[২৭৫]

সোভিয়েত পার্টি উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করে যে, "বাস্তবিক অর্থে, যদি অক্টোবর বিপ্লব এবং পরবর্তীকালে, সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার উদ্ভব সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিমূলে নাড়া না দিত এবং ঔপনিবেশিক ক্ষমতাকে হীনবল না করতো তাহলে বহু এশীয় জাতি কি তাদের সকল বীরত্ব ও আত্মবলিদান সত্ত্বেও বিজয় অর্জন করতে পারতো?"[২৭৬]

চীনা পার্টি সোভিয়েত পার্টির উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গীকে সমালোচনা করতে গিয়ে মত প্রকাশ করেঃ সোভিয়েত পার্টি মার্কসবাদের একটি মৌল প্রত্যয়কেই অস্বীকার করেছে। যে কোন দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কিংবা অন্য কোন সামাজিক বিপ্লব হবে কিনা তা সে দেশের বিদ্যমান দ্বন্দ্বসমূহের প্রকৃতি ও সে সম্পর্কে সে দেশের জনসাধারণের মনোভাবের ওপর মৌলিকভাবে নির্ভর করে। বাইরের কোন শক্তির সহযোগীতা কখনই মুখ্য হয়ে উঠতে পারে না-- সেটি সব সময়ই সহযোগীতার ভূমিকা। নিঃসন্দেহে, সহযোগীতার এ ভূমিকা অনেক সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সে সহযোগীতা ছাড়া কোন দেশের সামাজিক বিপ্লব সফল করা অবশ্যই কষ্টকর, কিন্তু তা মোটেই অসম্ভব নয়। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব তা প্রমাণ করে দিয়েছে।[২৭৭]

বিদ্যমান বিশ্বের প্রধান দ্বন্দ্ব নিরূপণ করতে গিয়ে চীনাপার্টি মত প্রকাশ করেছেঃ সাম্রাজ্যবাদী শিবির এবং সমাজতান্ত্রিক শিবিরের মধ্যে দ্বন্দ্ব হল দুই সমাজব্যবস্থার মধ্যেকার দ্বন্দ্ব-- যা বিশ্বের একটি মৌলিক দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব নিঃসন্দেহে তীব্র। এ দ্বন্দ্বকে দু'টি সমাজব্যবস্থার মধ্যেকার দ্বন্দ্ব হিসাবে বিবেচনা না করে দু'টি সামরিক জোটের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব হিসাবে বিবেচনা করা উচিৎ নয়। কেননা সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব একটি উল্লেখযোগ্য সামরিক শক্তি অর্জন করলেও কোন দিক থেকেই সে কারো সাথে সামরিক আধিপত্য বিস্তারের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত নয়। কেননা প্রকৃতিগতভাবেই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি অন্য দেশে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। উপরন্তু, সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের নিজেরই রয়েছে এক বিশাল একটি অভ্যন্তরীণ বাজার, যার চাহিদা পুরণ করতেই তার বহুদিন লেগে যাবে। একই সাথে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি সমানাধিকার ও পারস্পরিক সুবিধার নীতির ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নিয়োজিত, ফলে বাজার ও প্রভাবাধীন এলাকা নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করার কোন প্রয়োজন তাদের নেই। এ ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে সংঘর্ষের, বিশেষ করে সশস্ত্র সংঘর্ষের প্রয়োজন তাদের একেবারেই নেই।[২৭৮] ফলে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের সাথে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বের বর্তমান বিরোধ কার্যত আদর্শগত বিরোধে পরিণত হয়েছে।

অন্যদিকে, পুঁজিবাদী বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির ব্যাপারটি বর্তমানে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার নির্যাতিত জাতিসমূহের মুক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। কেননা, 'সাম্রাজ্যবাদীরা সব সময় স্বদেশে নিজেদের জনগণের ওপর শোষণ ও নিপীড়ন চালায় এবং চিরদিনই অন্যান্য জাতি ও দেশগুলির বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালিয়ে তাদের শোষণ ও নিপীড়ন করে। বরাবরই তারা উপনিবেশ, আধা-উপনিবেশ ও প্রভাবাধীন অঞ্চলগুলিকে নিজেদের সম্পদ আহরণের উৎস বলে মনে করে।'[২৭৯] অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের সম্পত্তি সঞ্চয়ের মূল উৎস হচ্ছে উক্ত ঔপনিবেশিক ও নয়া ঔপনিবেশিক জাতিসমূহ। প্রচন্ড নির্মমতা সহকারে তারা অনবরত উপনিবেশগুলির ও প্রভাবাধীন অঞ্চলগুলির জনগণের সংগ্রাম ও অভ্যুত্থানকে দমন করে আসছে। নতুন অথবা পুরোনো যে নীতিই অনুসরণ করুক না কেন এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার ঔপনিবেশিক এবং নয়া ঔপনিবেশিক দেশসমূহই সাম্রাজ্যবাদীদের বাড়তি শক্তি সঞ্চয়ের মূল ক্ষেত্র। এ সকল অঞ্চল থেকে শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ থাকার কারণেই তারা নিজেদের দেশের শ্রমিকশ্রেণীর ওপর একাধিপত্য ও শোষণ-নির্যাতনকে অব্যাহত রাখতে পারছে। আর তাই "যদি নিপীড়িত জাতিসমূহের সাথে নিজেকে ঐক্যবদ্ধ করতে না পারে ও যদি ঐসব জাতি মুক্তি অর্জন না করে তাহলে ইউরোপ ও আমেরিকার পুঁজিবাদী দেশসমূহের শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে নিজেদের মুক্তি অর্জন অসম্ভব।"[২৮০] ফলে সাম্রাজ্যবাদী একাধিপত্যের আওতা থেকে বের হয়ে আসার সংগ্রামের সামনের সারিতে রয়েছে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনসমূহ। অপর পক্ষে, সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের নিজস্ব বিকাশের সামনে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বের প্রত্যক্ষভাবে কোন বাধা সৃষ্টি করার কোন সুযোগ নেই, সে কারো প্রত্যক্ষ বাধা ছাড়াই নিজের মত করে বিকশিত হতে পারে, কিন্তু ঔপনিবেশিক ও নয়া ঔপনিবেশিক দেশসমূহের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হিসাবে সাম্রাজ্যবাদই দীর্ঘ দিন ধরে অস্তিত্বমান রয়েছে। এমনকি যদি এমনও হয় যে, সাম্রাজ্যবাদের সাথে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব খুবই শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান করছে, সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের ওপর সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সকল রকম হুমকির পরিসমাপ্তি ঘটেছে তাহলেও

---

২৭৩. সি.পি. এস.ইউ কেন্দ্রীয় কমিটির খোলা চিঠি (১৯৮৬)ঃ সকল পার্টি সংগঠনের প্রতিঃ সোভিয়েত ইউনিয়নের সকল কমিউনিস্টদের প্রতিঃ সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির খোলা চিঠি (১৪ই জুলাই, ১৯৬৩), ঢাকাঃ গণপ্রকাশন, পৃ. ৪৩,৪৮-৪৯।

২৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

২৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।

২৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৪৯।

২৭৭. আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত মহাবিতর্ক (১৯৯১)ঃ লেনিনবাদের সমকালীন সমস্যাবলীঃ তোগলিয়াত্তি সম্পর্কে আরো বক্তব্য চতুর্থ খন্ড, কলিকাতাঃ পিপলস্ বুক সোসাইটি; পৃ. ১৫-১৬।

২৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

২৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ.২১।

২৮০. আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাধারণ লাইন সম্পর্কে একটি প্রস্তাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

Dhaka University Institutional Repository

সত্যিকার কোন বিরোধের পরিসমাপ্তি ঘটে না। শুধু এটুকু হতে পারে যে, সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব আন্তর্জাতিক কোন হুমকি থেকে সাময়িকভাবে পরিত্রাণ পেতে পারে, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের জন্য যেমন সাম্রাজ্যবাদের জন্যও তেমনই প্রাপ্তিযোগ ঘটে। কেননা এ ধরনের ফয়সালার মধ্য দিয়ে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার জাতিসমূহের ওপর সে নির্বিঘ্নে শোষণ নিপীড়ন চালাতে পারে। চীনা পার্টির মতে দ্বন্দ্ব তত্ত্বের সাধারণ রীতি অনুযায়ীও সোভিয়েত পার্টির দৃষ্টিভঙ্গী ভ্রান্ত, কেননা প্রধান দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি কিংবা কোন আশু মিটমাটের প্রভাব সাংঘাতিকভাবে অন্যান্য দ্বন্দ্বের ওপর পড়ার কথা। সমাজতন্ত্রের সাথে সাম্রাজ্যবাদের মিটমাটের কারণে সমাজতন্ত্র যদিও নিজেকে গঠন করার জন্য কিছুটা সময় পায়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের তাতে কোন ক্ষতি না হয়ে বরং অনেক বেশী লাভ হয়। কেননা তাহলে আন্তর্জাতিকভাবে কোনরকম চাপের সম্মুখীন না হয়েই সাম্রাজ্যবাদ এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার জাতিসমূহের ওপর নির্মম শোষণ চালিয়ে যেতে পারে এবং এভাবে ক্রমাগত তার শক্তি আরো বৃদ্ধি পেতে পারে। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার জাতিসমূহের ওপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে। কেননা এর ফলে এসব অঞ্চলের মুক্তিকামী জনতা হয়ে পড়ে বন্ধুহীন, চরমভাবে নিপীড়িত হলেও আন্তর্জাতিকভাবে তাদেরকে সমর্থন করার মত কেউ থাকে না। তাই সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের উচিত বিশ্বের নিপীড়িত জাতিসমূহের মুক্তি আন্দোলনকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করা এবং সে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে বিপ্লবী আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে সহায়তা করা। এভাবেই ক্রমাগত সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের সাথে নতুন নতুন শক্তির সংযোজন ঘটবে এবং সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ঐক্য ক্রমাগত দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়াবে। "সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির শক্তি যতই বাড়বে, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ঐক্য যত দৃঢ়তর হবে, নিপীড়িত জাতিগুলির মুক্তি আন্দোলন যতই প্রসারিত হবে এবং পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণী ও নিপীড়িত জনগণের সংগ্রাম যতই শক্তিশালী হয়ে উঠবে ততই সাম্রাজ্যবাদীদের এমনভাবে শৃঙ্খলিত করে ফেলার সম্ভাবনা বাড়বে যে তারা জনগণের সর্বজনীন ইচ্ছাশক্তিকে উপেক্ষা করতে সাহস করবে না, আর ততই বাড়বে একটি নতুন বিশ্বযুদ্ধকে রোধ করার সম্ভাবনা এবং বিশ্বশান্তি রক্ষা করার সম্ভাবনা।"[২৮১]

দুইঃ

বিশ্ববিপ্লবের সাধারণ লাইন নিয়ে সোভিয়েত পার্টি ও চীনা পার্টির মধ্যে সুস্পষ্ট দ্বিমত দেখা দেয়। দু'টি পার্টিই একমত ছিল যে, সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন বিপ্লবী পরিস্থিতি। বিপ্লবী পরিস্থিতি যদি না থাকে তাহলে সশস্ত্রকোন কর্মকান্ড শ্রমজীবী জনসাধারণ থেকে বিপ্লবীদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। তবে সোভিয়েত পার্টির মতে, বিপ্লবী পরিস্থিতি আসলে যাতে তাকে কাজে লাগানো যায়, সে জন্য জনসাধারণকে সংগঠিত করার সকল রূপকে কাজে লাগানো প্রয়োজন। কমিউনিস্ট পার্টিকে জনসাধারণের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের সাথে শোষিত শ্রেণীসমূহের সংগ্রামের সুদক্ষ মিলন ঘটিয়ে জনসাধারণের বিপ্লবী আকাংখাকে পরিপক্ক করে তোলার দায়ীত্ব নিতে হবে। এভাবে একটি সাচ্চা পার্টি গড়ে তুলতে হবে এবং জনসাধারণের ওপর পার্টির নেতৃত্বকে আরোপ না করে প্রকৃত অর্থেই পার্টিকে জনগণের নেতায় পরিণত হয়ে উঠতে হবে।[২৮২] সোভিয়েত পার্টি আরো মত প্রকাশ করে যে, "নিজের চারদিকে শ্রমজীবী কৃষক-জনতা, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, দেশপ্রেমিক শক্তিসমূহকে সমাবেশ করে, এবং যেসব সুবিধাবাদী ব্যক্তি পুঁজিপতি ও ভূস্বামীদের সাথে আপোসের কর্মনীতি পরিত্যাগ করতে অক্ষম তাদের দৃঢ়তার সাথে হটিয়ে দিয়ে, জনস্বার্থ বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহকে পরাজিত করা, পার্লামেন্টে এক স্থায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠতা হাসিল করা, আর শেষোক্তটিকে (পার্লামেন্টকে) বুর্জোয়া গণতন্ত্রের একটি অঙ্গ থেকে জনগণের আশা-আকাংখার একটি সাচ্চা হাতিয়ারে রূপান্তরিত করার মত অবস্থায় শ্রমিকশ্রেণী উপস্থিত হয়েছে।"[২৮৩] এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ক্রুশ্চভ আরো বলেন যে, "দেশে শক্তিশালী বৈপ্লবিক আন্দোলন বজায় থাকলে, পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন এবং সেটাকে জনগণের ক্ষমতার এক হাতিয়ারে রূপান্তরিত করার অর্থ হল বুর্জোয়াশ্রেণীর সামরিক আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রের ধ্বংস সাধন এবং পার্লামেন্টারী রূপে (form) এক নতুন, সর্বহারা জনগণের রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাকরণ।"[২৮৪] সিপিএসইউ-এর ২২তম কংগ্রেসে বিষয়টিকে আরো স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়, শুধু পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পরই নয়, এমনকি তার পূর্বেও সাধারণ সংস্কারের চেয়েও অগ্রসর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বুর্জোয়াশ্রেণীকে বাধ্য করতে পারে এবং পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়েও পৌছানো সম্ভব যে, 'উৎপাদনের মৌলিক উপায়গুলিকে তার কাছ থেকে খরিদ করে নেয়ায় সম্মত হওয়াটা.....বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে সুবিধাজনকই হবে।"[২৮৫] এভাবে সোভিয়েত পার্টি মতপ্রকাশ করে যে, সমাজতন্ত্র যে শুধু হিংসাত্মক বিপ্লবের মাধ্যমেই অর্জিত হবে এমন কোন কথা নেই, শান্তিপূর্ণ পথেও তা অর্জিত হতে পারে। অর্থাৎ "সমাজতন্ত্রে শান্তিপূর্ণ ও অ-শান্তিপূর্ণ উত্তরণ উভয়টিই সম্ভব।"[২৮৬]

চীনা পার্টি এসব বিষয়ে সোভিয়েত পার্টি থেকে ভিন্নতর অবস্থান গ্রহণ করে। তাদের মতে যদিও ইচ্ছা করলেই বিপ্লব করা যায় না, আর বিপ্লবী পরিস্থিতি যদি বস্তুগতভাবে বিরাজ না করে তাহলে বিপ্লব অসম্ভব কিন্তু বিপ্লব সংঘটন ও বিজয় অর্জন কেবলমাত্র বিপ্লবী পরিস্থিতির অস্তিত্বের উপরই নির্ভর করে না, বরং বিষয়গত বৈপ্লবিক শক্তির প্রস্তুতি ও প্রচেষ্টার ওপরও নির্ভর করে।"[২৮৭] আসলে উপরোক্ত বিষয়ে দু'টি পার্টির প্রকাশভঙ্গীতে কিছু পার্থক্য থাকলেও সারমর্মে কোন পার্থক্য ছিল না। তবে গণআন্দোলন গড়ে তোলার পথ ও প্রকৃতি নিয়ে যখন আলোচনা করা হয়েছে সেখানে পার্থক্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চীনা পার্টির কাছে সমস্ত গণসংগ্রামের মূল লক্ষ্যই থাকবে বিপ্লবের জন্য শক্তি সঞ্চয় করা। আর এ বিপ্লবী শক্তিকে বলিষ্ঠ করে তুলতে জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের সংগ্রামের যত রকম রূপ থাকা সম্ভব তার সবগুলিকেই বিপ্লবীদের কাজে লাগানো উচিৎ। "সর্বহারাশ্রেণী ও ব্যাপক জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতাকে উন্নীত করার জন্য, নিজেদের শ্রেণী-শক্তিসমূহকে শিক্ষিত করে তোলার জন্যে, তাদের সংগ্রামী ক্ষমতাকে পোড় খাইয়ে তোলার জন্য এবং আদর্শগত রাজনৈতিক, সাংগঠনিক ও সামরিক দিক দিয়ে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করে তোলার জন্য দৈনন্দিন সংগ্রামের সকল রূপকেই

২৮১. আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত মহাবিতর্ক (১৯৯১) চতুর্থ খন্ড, পৃ. ২৬।

২৮২ . সি.পি.এস.ইউ কেন্দ্রীয় কমিটির খোলা চিঠি, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬।

২৮৩. সর্বহারা বিপ্লব ও ক্রুশ্চভের সংশোধনবাদ (১৯৮৬)ঃ ২০তম কংগ্রেস রিপোর্ট, সি.পি.এস.ইউ উদ্বৃত, সিপিএস ইউ'র খোলা চিঠির ওপর সিপিসির অষ্টম মন্তব্য (৩১শে মার্চ, ১৯৬৪) ঢাকাঃ গণপ্রকাশন, পৃ. ৬।

২৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-৭।

২৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

২৮৬. সি.পি.এস.ইউ. কেন্দ্রীয় কমিটির খোলা চিঠি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

২৮৭. সর্বহারা বিপ্লব ও ক্রুশ্চভের সংশোধনবাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহার করা সর্বহারাশ্রেণীর পার্টির কর্তব্য।"[২৮৮] চীনাপার্টি আরো মত প্রকাশ করে, "আশু সংগ্রামসমূহ সক্রিয়ভাবে এগিয়ে নেবার সাথে সাথে, কমিউনিস্টদের উচিৎ সেসব সংগ্রামকে দীর্ঘস্থায়ী ও সাধারণ স্বার্থের সংগ্রামের সাথে যুক্ত করা, সর্বহারা বিপ্লবী মানসিকতায় জনতাকে শিক্ষিত করে তোলা, জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা বোধকে বিরামহীনভাবে উন্নীত করা, আর সময় যখন সুবিধাজনক হয়ে উঠবে তখন বিপ্লবের বিজয় ছিনিয়ে আনার উদ্দেশ্যে বিপ্লবী শক্তি সঞ্চয় করা।"[২৮৯] চীনা পার্টি অভিমত প্রকাশ করে, "শ্রমিকশ্রেণী ও ব্যাপক জনগণের বিপ্লবে নেতৃত্ব দানের উদ্দেশ্যে সর্বহারাশ্রেণীর পার্টিকে সকল রূপের সংগ্রামে অবশ্যই দক্ষতা অর্জন করতে হবে এবং সংগ্রামের অবস্থা বদলের সাথে সাথে দ্রুত এক রূপকে অন্যরূপে স্থলাভিষিক্ত করে বিভিন্ন রূপের সমন্বয় সাধনে সমর্থ হতে হবে। শান্তিপূর্ণ ও সশস্ত্র, গোপন ও প্রকাশ্য, আইনী ও বেআইনী, পার্লামেন্টারী সংগ্রাম ও গণসংগ্রাম, সাথে সাথে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংগ্রামে-- এরূপ সকল রূপের সংগ্রামে যদি সে দক্ষতা অর্জন করতে পারে, তাহলেই কেবল সে সকল পরিস্থিতিতে অপরাজেয় হয়ে উঠবে।"[২৯০]

পার্লামেন্টারী সংগ্রামের প্রশ্নে চীনা পার্টির অভিমত ছিল বিপ্লবী পরিস্থিতির অনুপস্থিতিহেতু জনগণের দৈনন্দিন সংগ্রামের একটি পথ হিসাবে পার্লামেন্টকে ব্যবহার করা, কোনক্রমেই তাকে বিপ্লবের বিকল্প হিসাবে বিবেচনা না করা। কেননা, বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রধান উপাদান হচ্ছে সশস্ত্র বাহিনী। ফলে যদি কখনও এমন সময় আসে যখন পার্লামেন্ট বুর্জোয়াদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করতে পারছে না তখন সে পার্লামেন্টের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে বাধ্য। আর যেহেতু বুর্জোয়া রাষ্ট্রের অধীনে পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেহেতু নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট লাভ করার সম্ভাবনা দেখা দিলে বুর্জোয়া রাষ্ট্র স্থূলভাবে তাতে হস্তক্ষেপ করে এবং নির্বাচন-বিধি সংশোধন করে কিংবা অন্যবিধ পন্থায় পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভকে বানচাল করে দিতে সে এতটুকুও দ্বিধাবোধ করে না।[২৯১] চীনা পার্টি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অভিমত প্রকাশ করে যে, "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ের ঘটনাবলী পুনরায় এটা প্রদর্শন করেছে যে, পার্লামেন্ট নয়, সশস্ত্র বাহিনীই হলো বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রধান উপাদান। পার্লামেন্ট হলো বুর্জোয়া শাসনের এক অলঙ্কার, একটা পর্দা মাত্র। পার্লামেন্টারী ব্যবস্থাকে গ্রহণ কিংবা বর্জন, পার্লামেন্টকে বেশী বা কম ক্ষমতা দেয়া, এক বা অন্য ধরনের নির্বাচন-বিধি গ্রহণ- এসব বিকল্পের মধ্যে পছন্দ-অপছন্দ সব সময় বুর্জোয়া শাসনের চাহিদা ও স্বার্থের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। বুর্জোয়াশ্রেণী যে পর্যন্ত সামরিক-আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে সে পর্যন্ত নির্বাচনের মাধ্যমে সর্বহারাশ্রেণী কর্তৃক "পার্লামেন্টে স্থায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন" যেমন অসম্ভব, তেমনি এই "স্থায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠতা" অনির্ভরযোগ্যও বটে।"[২৯২]

তিনঃ

শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান সম্পর্কে দুই পার্টির মধ্যে তীব্র মতবিরোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সোভিয়েত পার্টির মতে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থার এমনই উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটেছে যে, পৃথিবীর শক্তি ভারসাম্যের এক রূপগত পরিবর্তন ঘটে গেছে। অন্যদিকে, তাপ-পারমাণবিক অস্ত্রের আবিষ্কারের ফলে বিশ্বের সমগ্র মানবতার কাছে যুদ্ধ একটি ভয়ংকর আত্মবিনাসী প্রক্রিয়া হিসাবে দেখা দিয়েছে। যেহেতু তাপ-পারমানবিক অস্ত্র বেশ কয়েকটি শক্তির হাতে ছড়িয়ে পড়েছে, সেহেতু তৃতীয়বার যদি বিশ্বযুদ্ধের আশংকা দেখা দেয় তাহলে সমগ্র মানবতাই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি হবে। সে কারণেই আবার যাতে মানব জাতিকে বিশ্বযুদ্ধের মুখোমুখি হতে না হয় সে দিকে লক্ষ্য রেখেই কমিউনিস্টদের শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের নীতিকে সজ্জিত করতে হবে। এ মূহূর্তে কমিউনিস্টদের ঐতিহাসিক দায়ীত্ব হলো একটি বিশ্ব তাপ-পারমাণবিক যুদ্ধ প্রতিহত করার জন্য জনগণের সংগ্রামকে সংগঠিত ও পরিচালিত করা।"[২৯৩] কমিউনিস্টদের এমন কিছুই করা উচিৎ নয় যাতে তাপ-পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে। কেননা এরূপ যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার প্রথম মুহূর্তেই যুদ্ধের সাথে জড়িত অধিকাংশ দেশ পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যাবে। সে কারণেই কমিউনিস্টদের উচিত শান্তির জন্য, তাপ-পারমাণবিক অস্ত্রহীন পৃথিবীর জন্য সংগ্রাম শুরু করা। কেননা "যুদ্ধকে প্রতিহত করার সংগ্রাম সকল শান্তিকামী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে। শ্রেণীগত গঠনের দিক দিয়ে এবং শ্রেণীগত স্বার্থের দিক থেকে তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু যুদ্ধকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে, শান্তির জন্যে সংগ্রামের দ্বারা তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করা যেতে পারে, কারণ আণবিক বোমা শ্রেণী পার্থক্য বিচার করে না-- তার ধ্বংসকারী ক্ষমতার আওতার মধ্যে প্রত্যেককেই সে ধ্বংস করে দেয়।"[২৯৪] সোভিয়েত পার্টি মত প্রকাশ করে যে, পুঁজিবাদী বিশ্বের সবাই যে সাম্রাজ্যবাদী কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত তা নয়, কিংবা সকল পুঁজিবাদী দেশের কাছেই যে তাপ-পারমাণবিক অস্ত্র আছে তা নয়। ফলে অনেক পুঁজিবাদী দেশ ও তাদের সরকারও তাপ-পারমাণবিক যুদ্ধের আশংকায় সন্ত্রস্ত। তাদের মধ্যে রয়েছে বিশ্বযুদ্ধ বিরোধী এক সচেতন অভিমত। উপরন্তু, এমনও ভাবার কোন অবকাশ নেই যে, বিশ্বের 'সকল বুর্জোয়া সরকারই তাদের সমস্ত কর্মকান্ডে যুক্তিহীনভাবে কাজ করে।'[২৯৫] ফলে এ সকল দেশের সাথে বিশ্বযুদ্ধ বিরোধী ফ্রন্ট গঠনের এক চমৎকার সুযোগ আজ বিদ্যমান রয়েছে। কমিউনিস্টরা কোনভাবেই এ সুযোগগুলিকে অবহেলা করতে পারেনা।

এ প্রসঙ্গে চীনা পার্টির বক্তব্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাদের মতে পুঁজিবাদী বিশেষতঃ সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের সরকারের সাথে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের আহবান সম্পূর্ণ নিরর্থক। কেননা পুঁজিবাদী দুনিয়া এবং তাদের নিয়ন্ত্রিত দেশসমূহে সর্বহারাশ্রেণী তথা শ্রমিক-কৃষকসহ সমগ্র মেহনতী মানুষ ও নিপীড়িত জাতিসমূহ তাদের মুক্তির জন্য অব্যাহত লড়াইয়ে লিপ্ত রয়েছে। তাদের সে লড়াইয়ের প্রতি সমর্থন জানানো আন্তর্জাতিক সর্বহারাশ্রেণী তথা সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের এক অপরিহার্য কর্তব্য। নির্যাতিত ও নিপীড়িত শ্রেণী ও জাতিসমূহের লড়াইয়ের প্রতি সমর্থনকে অব্যাহত রেখে সরকারসমূহের সাথে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের আহবান হয়ে দাঁড়ায় একেবারেই অর্থহীন। কেননা এ কথা সাম্রাজ্যবাদীদের কাছেও খুবই স্পষ্ট যে, পুঁজিবাদী বিশ্বে শ্রমিকশ্রেণী এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার জনগণের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও জনগণের বিপ্লবী আন্দোলন, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে প্রচন্ড সমর্থন জোগায়।

---

২৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।
২৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ.৪০।
২৯০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।
২৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।
২৯২. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩-৩৪।
২৯৩. সিপিএসইউ কেন্দ্রীয় কমিটির খোলা চিঠি, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬।
২৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ.১৭।
২৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের হাত থেকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে রক্ষা করার ব্যাপারে তারা একটি অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। আর সে কারণেই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি যে কোন বিপ্লবী আন্দোলন কিংবা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে উষ্ণ সহানুভূতি ও সক্রিয় সমর্থন জানায়।[২৯৬] আর সে কারণেই গণনিপীড়নকারী সরকারগুলির কাছে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের পক্ষ থেকে শান্তি আহবান জানানো বৃথা। কেননা চীনা পার্টির মতে, যুদ্ধ হচ্ছে রাজনীতির অন্য উপায়ে ধারাবাহিকতা। আর তাই যতই শান্তির আহবান জানানো হোক না কেন বিভিন্ন দেশের সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীলেরা কখনও স্বেচ্ছায় তাদের অস্ত্রসজ্জা ত্যাগ করবে না, কখনই তারা নিপীড়িত জাতি ও জনগণকে দমন করা বন্ধ করবে না বা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে তাদের আগ্রাসনমূলক ও অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ ত্যাগ করবে না।[২৯৭] এরকম একটি বাস্তবতার পরও যদি সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বের সাথে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের প্রশ্ন আসে তাহলে তা শুধুমাত্র ভিন্ন সমাজব্যবস্থা সম্পন্ন দেশসমূহ, যেগুলি সাম্রাজ্যবাদী ক্রিয়াকলাপের অংশীদার নয়, তাদের সাথেই আসতে পারে। চীনা পার্টি লেনিনের শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান নীতি বলতে বোঝে ভিন্ন সমাজব্যবস্থা সম্পন্ন দেশসমূহের সাথে পঞ্চশীলা নীতির ভিত্তিতে সহমর্মিতামূলক সম্পর্ক বজায় রাখা, কিন্তু যে সকল দেশ সাম্রাজ্যবাদী ক্রিয়াকলাপের সাথে যুক্ত কিংবা তাদের বিশ্বব্যাপী আগ্রাসন ও চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রের অংশীদার তাদের সাথে সুসম্পর্ককে বোঝে না। কেননা তাদের মতে, এ রকম দেশসমূহের সাথে বন্ধুত্ব করতে হলে সে সকল দেশের যে শ্রমজীবী জনসাধারণ নিপীড়ণকারী সরকারের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে সেই সংগ্রামীদের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে নিতে হয়। এসব সরকার শুধু নিজের দেশের জনসাধারণের ওপর নিপীড়ন চালায় না, সমগ্র বিশ্বব্যাপী যে ঔপনিবেশিক ও নয়া ঔপনিবেশিক শোষণ-শাসন চলছে এরা তারই অংশীদার। এদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের অর্থই হোল সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের শ্রমিকশ্রেণী এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার নিপীড়িত জাতিসমূহের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করা; এ সকল দেশে সংগ্রামরত জনসাধারণকে পরামর্শ দেওয়া তারা যেন তাদের পীড়নকারী সরকার কিংবা ঔপনিবেশিক প্রভুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয়। চীনা পার্টির মতে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের ব্যাপারটিকে ভিন্ন সমাজ ব্যবস্থাভিত্তিক দেশগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিৎ। "নিপীড়িত ও নিপীড়ক জাতিসমূহের মধ্যেকার, নিপীড়িত ও নিপীড়ক দেশসমূহের মধ্যেকার কিংবা নিপীড়িত ও নিপীড়ক শ্রেণীসমূহের মধ্যেকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ কখনই সম্প্রসারণ করা উচিৎ নয়, এবং পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের মূল সর্মবস্তু হিসাবেও তাকে কখনই বর্ণনা করা সমীচীন নয়।"[২৯৮] কেননা শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের সামনে যে বাধা তা সবসময়ই সৃষ্টি হয় সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব ও তার অনুগত শক্তিগুলির পক্ষ থেকে। ফলে বিশ্বব্যাপী শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হলে নিম্নোক্ত তিনটি কাজ সম্পাদন করার মধ্য দিয়েই তা অর্জিত হতে পারেঃ

(১) সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অব্যাহত সংগ্রাম গড়ে তুলে, এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার নিপীড়িত জাতিসমূহ এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শ্রমজীবী জনসাধারণ থেকে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা প্রয়োজন;

(২) শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানকে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের পররাষ্ট্র নীতির সাধারণ লাইন হিসাবে না দেখে শুধু মাত্র ভিন্ন সমাজ ব্যবস্থাসম্পন্ন ও সাম্রাজ্যবাদের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত দেশসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত; এবং

(৩) সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান নীতিকে শুধুমাত্র ঐসব দেশের পররাষ্ট্র নীতির অংশ হিসাবেই দেখা উচিত; কখনও তা সমস্ত কমিউনিষ্ট পার্টি কিংবা আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সাধারণ নীতি হিসাবে দেখা উচিত নয়। সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সাথে নির্দিষ্ট কোন দেশের সরকারের সুসম্পর্কের অর্থ মোটেই এই নয় যে, সে দেশের জনসাধারণের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, গণতান্ত্রিক বা বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার।[২৯৯]

চীনা পার্টি মত প্রকাশ করে যে, তাপ-পারমাণবিক অস্ত্রের উদ্ভবের কারণে সমাজ বিকাশের ঐতিহাসিক নিয়মের কোন পরিবর্তন ঘটেনা, বরং সমাজ বিকাশের পক্ষে দাড়ালেই সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী ও অপরাপর যুদ্ধ বিরোধী শক্তির পক্ষ থেকে সাম্রাজ্যবাদের ওপর শক্তিশালী চাপ আসতে পারে। ফলে সাম্রাজ্যবাদ এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার মুক্তিকামী জাতিসমূহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উঠতে পারে এবং এভাবেই সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধংদেহী মানসিকতার পরিবর্তন ঘটা সম্ভব। কেননা তাপ-পারমাণবিক অস্ত্রের প্রয়োগে শুধু যে সমাজতন্ত্রিক বিশ্বই ধ্বংস হবে তা নয়, বরং সাম্রাজ্যবাদীদের ধ্বংসও অনিবার্য হয়ে ওঠে। আর তাপ-পারমাণবিক অস্ত্র সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের হাতে থাকার কারণে এটাই হয়ে উঠেছে কোন যুদ্ধে তাপ-পারমাণবিক অস্ত্র না ব্যবহারের গ্যারান্টি। যেহেতু সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব কোন অন্যায় ক্রিয়াকলাপের সাথে যুক্ত নয়, সেহেতু সে কখনও অন্যায় যুদ্ধের সাথে জড়িয়ে পড়ে না। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতিসমূহের কাছ থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার কোন কারণ নেই।[৩০০]

চারঃ

সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজ সম্পর্কে সোভিয়েত পার্টির মূল্যায়ন ছিল দীর্ঘ ৪০ বছরের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। কারণ এ সময়ে সমাজতান্ত্রিক গঠন কর্ম পরিচালনার ফলে সোভিয়েত সমাজ সমাজতন্ত্রে উপনীত হয়েছে। ফলে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার হুমকি থেকে সে সমাজকে রক্ষা করার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব চালু রাখার আর কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। কেননা সোভিয়েত সমাজে এমন কোন শ্রেণীরই অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না, যার ওপর শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রয়োগ করা যেতে পারে। অন্যদিকে, শ্রমিকশ্রেণী কিংবা কৃষক সমাজ সোভিয়েত সমাজের এই প্রধান দুই শ্রেণী অস্তিত্বের দিক থেকে এমনভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে যে, তাদের নিজেদের মধ্যে কিংবা অপরাপর শ্রেণীসমূহ থেকে তাদের পার্থক্য মুছে যেতে বসেছে। ফলে স্বতন্ত্র এমন কোন শ্রেণীরই অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, যার ওপর অথবা যার নেতৃত্বে সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রয়োগ করা যেতে পারে।[৩০১] ছোটখাটো যে সকল অপরাধ সোভিয়েত সমাজে এখনও সংঘঠিত হচ্ছে, সেই অপরাধীরা মিলে ভিন্ন কোন শ্রেণী সোভিয়েত সমাজে জন্ম লাভ করেনি। কেননা এদের পেশা ও কর্মকান্ডের প্রকৃতি এতই ভিন্নতর যে, তাদেরকে স্বতন্ত্র কোন শ্রেণী হিসাবে বিবেচনা করার কোন কারণ নেই। এ অপরাধীদের

---

২৯৬. আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত মহা বিতর্ক, চতুর্থ খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।
২৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।
২৯৮. আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট সম্মেলনের সাধারণ লাইন সম্পর্কে একটি প্রস্তাব (১৪ই জুনের চিঠি, ১৯৬৩), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।
২৯৯. আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত মহাবিতর্ক, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ১৪৫-৫৯।
৩০০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪-১১৭।
৩০১. সি.পি.এস.ইউ কেন্দ্রীয় কমিটির খোলা চিঠি, পৃ. ৩৮-৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সোভিয়েত সমাজের প্রচলিত আইনই যথেষ্ট। অপর দিকে, পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন ও জনগণের অন্যান্য সংস্থাসমূহের শিক্ষামূলক কাজকর্ম যত উত্তম হবে, জনসাধারণের ভূমিকা যত উন্নত হবে, সোভিয়েত মিলিশিয়ার কাজকর্ম যত উন্নততর হবে, অপরাধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ততই অধিকতর কার্যকরী হবে। এজন্য শ্রেণীসংগ্রামের কোন প্রয়োজন নেই। কেননা সোভিয়েত সমাজের জন্য তা বর্তমানে এক বিমূর্ত লড়াইয়ে রূপান্তরিত হবে।[৩০২]

চীনা পার্টি সোভিয়েত পার্টির এ মতামতের ঘোরতর সমালোচনা করে অভিমত প্রকাশ করে যে, এটা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে সুনির্দিষ্টভাবে সরে দাঁড়ানো। চীনা পার্টি সোভিয়েতের পত্র-পত্রিকা থেকে অসংখ্য অপরাধ, দুর্নীতি, গোপন কারখানা ও গোপন শ্রেণীশোষণের চিত্র তুলে ধরে এবং এসবের সাথে অসংখ্য পার্টি নেতা ও বড় বড় আমলা ব্যক্তির সরাসরি সম্পর্কের কথা প্রকাশ করে। এসব চিত্রের বর্ণনা দিয়ে চীনা পার্টি মত প্রকাশ করে যে, সোভিয়েত সমাজে সমাজতান্ত্রিক গঠন কর্মের সাফল্যহীনতার কারণে যে এসব কিছু ঘটছে তা নয়। বরং বিশ্বের দুইতৃতীয়াংশ জনগণ পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের আধিপত্যের অধীনস্ত সমাজসমূহে বসবাস করছে। আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী বিশ্বের রয়েছে বিশিষ্ট ভূমিকা। সাম্রাজ্যবাদ সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের বিরুদ্ধে নানা রকম চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। এ সবের প্রভাব সমাজতান্ত্রিক সমাজের ওপর না পড়ে পারেনা। অপরদিকে, সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব বলতে দৈহিকভাবে সর্বহারাদের একনায়কত্ব বোঝায় না, বরং সমাজতন্ত্রের বিপক্ষে নয় এমন সকল শ্রেণীর পরিপূর্ণ গণতন্ত্রকেই বোঝায়। উপরন্তু, সমাজতান্ত্রিক কোন দেশে সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব বলতে সর্বহারাশ্রেণীর সংস্কৃতির একনায়কত্বকে বোঝায়। অব্যাহতভাবে বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়া সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সর্বহারা সংস্কৃতির সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গোটা জনসাধারণ ব্যক্তিগত স্বার্থ চেতনাকে জয় করে। আর তখনই রচিত হয় বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের জমিন, কিন্তু যতদিন পৃথিবীর অধিকাংশ এলাকা বুর্জোয়া অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ততদিন অব্যাহতভাবে সর্বহারাশ্রেণীর সংস্কৃতির সপক্ষে দৃঢ় সংগ্রাম পরিচালনা না করলে সমাজের অভ্যন্তরে তো বটেই, এমনকি পার্টির মধ্যেও বুর্জোয়া-পেটিবুর্জোয়া সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটার আশংকা ভীষণভাবেই থেকে যায়, যা গোটা সমাজকেই পুঁজিবাদে অধঃপতিত করতে পারে।[৩০৩] চীনা পার্টি আরো অভিমত প্রকাশ করে যে, সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র হওয়ার অর্থ পার্টিও হয়ে দাঁড়ায় সমগ্র জনগণের। ফলে কোন বিশেষ শ্রেণী কিংবা তার সংস্কৃতির পক্ষে পার্টি পরিচালিত হওয়ার নৈতিক ভিত্তির অবসান ঘটে। পার্টি এবং রাষ্ট্র হয়ে ওঠে শ্রেণী-নিরপেক্ষ। ফলে প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং স্বীকৃত ডিগ্রীই হয়ে ওঠে যোগ্যতার মাপকাঠি। এতে রাষ্ট্র এবং পার্টি উভয়টিতেই এমন সব ব্যক্তির অনুপ্রবেশ অবাধ হয়ে উঠবে যারা কোন দিনই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেনি। সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র এবং সমগ্র জনগণের পার্টি বলে স্বীকার করা হলে সেই সমস্ত ব্যক্তি-বিশেষকে পার্টি ও রাষ্ট্রে অনুপ্রবেশের পথকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, যারা এতদিন ঘাপটি মেরে বসেছিল। শুধু যে বুর্জোয়ারা ঘাপটি মেরে বসেছিল তাই নয়, সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যেই থাকে অনেক বুর্জোয়া উপাদান। কেননা উৎপাদনের মূল উপাদানসমূহ সামাজিক মালিকানায় থাকলেও শ্রমশক্তির মূল্যের মালিক থাকে ব্যক্তি নিজেই, উপরন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তিরও বিশেষ রকমের স্বীকৃতি থাকে। ফলে মতাদর্শগত সংগ্রাম তথা সর্বহারা সংস্কৃতির সপক্ষে সংগ্রামে যে কোন দুর্বলতাই বুর্জোয়া উপাদানের ধারকদেরকে বুর্জোয়াতে রূপান্তরিত করতে পারে। তাই পুরোনো বুর্জোয়া এবং এই অধঃপতিত নতুন বুর্জোয়া গোষ্ঠী মিলে সংশোধনবাদের সামাজিক ভিত্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং তারা কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে তাদের এজেন্ট যোগাড় করার জন্য সব রকম সম্ভাব্য পন্থাকে কাজে লাগায়।[৩০৪] এবং এ কারণে সোভিয়েত পার্টি সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের পুরানো ও নতুন বুর্জোয়াশ্রেণীর সপক্ষেই কাজ করেছে। এসব কর্মকান্ড, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সংশোধনবাদী পার্টিতে রূপান্তরিত হওয়ারই বহিঃপ্রকাশ।

বিশ্ব কমিউনিস্ট মতাদর্শ সংক্রান্ত উল্লিখিত চারটি প্রশ্ন নিয়ে যে আলোচনা করা হয়েছে ষাট দশকে পূর্ব পাকিস্তানের বাম রাজনীতিতে এসব বিষয় প্রচন্ড বিতর্কের অবতারনা করে। তবে চতুর্থ বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হলেও তার প্রভাব প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে তেমন একটা পড়েনি। কিন্তু অন্য তিনটি বাম রাজনীতিকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। যে প্রশ্নটি এখানে সবচেয়ে বেশী বিতর্কের সৃষ্টি করে তাহল সশস্ত্র না শান্তিপূর্ণ পথে এদেশে বিপ্লব অনুষ্ঠিত হবে না।[৩০৫] কার্যত এ প্রশ্নেই পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে; একটি পিকিংপন্থী এবং অন্যটি মস্কোপন্থী নামে পরিচিত হয়। এ বিভক্তির আগে থেকেই গণসংগঠনগুলিতে ভাঙ্গন শুরু হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে পার্টি না ভাঙ্গলেও ভিতরে ভিতরে ১৯৬৪ সাল থেকে পার্টি সুস্পষ্ট দু'টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মূলতঃ সে কারণেই ছাত্র ইউনিয়ন ১৯৬৫ সালের এপ্রিল মাসে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। অন্যদিকে, চীনা লাইনের মর্মবস্তু শ্রেণীসংগ্রাম ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা থাকায় তার অনুসারী পক্ষ শ্রেণী রাজনীতির প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দেয় এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার প্রশ্নে যে সকল রাজনৈতিক দল সোচ্চার ছিল না তাদের সাথে কার্যত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলে। কোন রাজনৈতিক দলের সাথে ঐক্যের প্রশ্নে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা তাদের কাছে মূল বিবেচনা হয়ে দাড়ায়। এদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা এমন তীব্র রূপ ধারণ যে, দেশের স্বৈরাচার বিরোধী গণতান্ত্রিক সংগাম কিংবা জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামের চেয়েও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শ্লোগান অধিক গুরুত্ব পায়। এ সময় মার্কিনের আন্তর্জাতিক নীতি কার্যকরী করতে গিয়ে যখন দেখা গেলো পাকিস্তানের 'জাতীয় স্বার্থের' সাথে তা অসংগতিপূর্ণ হয়ে উঠেছে তখন পাকিস্তান সরকার মার্কিনের সাথে বিভিন্ন সামরিক চুক্তিতে চুক্তিবদ্ধ হয়েও বিকল্প শক্তির আশ্রয় গ্রহণের জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। মার্কিনের পরিকল্পনা অনুযায়ী কমিউনিস্ট চীনকে ঘেরাও করার জন্য পাকিস্তান ও ভারতকে এক মঞ্চে দাঁড়াবার চাপ অব্যাহত ছিল। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধের সময় আইয়ুব সরকারের প্রতি মার্কিনের চাপ থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তান তার নিজস্ব স্বার্থের কারণেই ভারতের পক্ষ অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকে। উপরোন্তু, এশিয়ার একমাত্র সাম্রাজ্যবাদীজোটভুক্ত দেশ পাকিস্তানের সাথে সম্পর্কের স্থলে ভারতের সাথে অধিক সহযোগীতামূলক সম্পর্ক স্থাপন করছে বলে আইয়ুব সরকার আমেরিকাকে অভিযুক্ত করে। এভাবে পাকিস্তানের সাথে, বিশেষতঃ আইয়ুব সরকারের সাথে চীনের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে।[৩০৬] আইয়ুব খানের বৈদেশিক নীতিন পরিবর্তন

৩০২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।

৩০৩. ক্রুশ্চেভের ভূয়া সাম্যবাদ ও বিশ্বের জন্যে তার ঐতিহাসিক শিক্ষা (১৯৯১)ঃ সিপিএসইউ'র কেন্দ্রীয় কমিটির 'খোলা চিঠির' উপর নবম মন্তব্য (১৪ই জুলাই, ১৯৬৪), ঢাকাঃ ইন্টারন্যাশনাল পাবলিসার্স, পৃ. ১৩-১৪।

৩০৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

৩০৫. অজয় রায়, শরদিন্দু দস্তিদার, শামসুদ্দোহা মানিক, নজরুল ইসলামসহ যাদের সাথে কথা বলা হয়েছে তাদের সবাই এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

৩০৬. খান, মুহম্মদ আইয়ুব (১৯৬৭)ঃ প্রভু নয় বন্ধু, ঢাকাঃ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, পৃ. ১৪৭-২২৫।

Dhaka University Institutional Repository

তথা চীনের সাথে সুসম্পর্ককে পূর্ব পাকিস্তানের পিকিংপন্থী রাজনীতিবিদরা আইয়ুবের মার্কিন বিরোধী অবস্থান বলে বিবেচনা করে। ফলে তাঁরা পাকিস্তান সরকারের প্রতি কিছুটা নমনীয় মনোভাব পোষণ করতে থাকেন। দেশের ওপর আইয়ুব সরকারের নির্মম স্বেচ্ছাচারী শাসন বলবৎ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা আইয়ুব-বিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রাম গড়ে না তুলে শ্রেণীসংগ্রামের প্রতি তাঁদের প্রায় সমগ্র শক্তিকে নিয়োজিত করেন। অন্যদিকে, মস্কোপন্থী উক্ত দলটি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অবস্থান বজায় রাখলেও ঐক্যের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতাকে ঐক্যের পূর্বশর্ত হিসাবে গণ্য করেনি। বরং শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের নীতিকে দেশীয় ক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রশ্নে অন্যান্য বুর্জোয়া দলের সাথে ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রম পরিচালনার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। যেহেতু তাঁরা পার্লামেন্টারী সংগ্রামকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য সম্ভাব্য পথ হিসাবে গ্রহণ করেন সেহেতু দৈনন্দিন শ্রেণীসংগ্রামের তুলনায় গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রতি তারা অধিক গুরুত্ব দেন। অপরদিকে, পিকিংপন্থীদের মাত্রাতিরিক্ত আইয়ুব প্রীতির কারণে মস্কোপন্থীরা বেশী পরিমাণে আইয়ুব-বিরোধী হয়ে ওঠেন। এ পর্যায়ে পিকিংপন্থীদের পাকিস্তান সরকার প্রীতি এতটা উগ্র রূপ ধারন করে যে, তাদের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদকীয়তে আইয়ুব খান ও মওলানা ভাসানীকে পাকিস্তানের দুই জাতীয় বীর বা দুই কণ্ঠস্বর হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়।[৩০৭] 'দুই কণ্ঠ' শিরোনামের এ সম্পাদকীয়তে বলা হয়, পাকিস্তানের এ দুর্দিনে তার জাতীয় সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করতে হলে দু'টি কণ্ঠস্বরকে এক হয়ে কাজ করতে হবে; একটি কণ্ঠস্বর হচ্ছেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং অন্য কণ্ঠস্বরটি হচ্ছেন প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ আইয়ুব খান। যদিও এ সম্পাদকীয়টি প্রকাশিত হয় পাক-ভারত যুদ্ধের ঠিক শেষ মুহূর্তে তবু যুদ্ধের মত জরুরী অবস্থা তখনও বিরাজ করছিল। কিন্তু একজন সামরিক একনায়ককে এভাবে 'বীর' বলে আখ্যায়িত করার কারণে সচেতন মহলে খুবই বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। সে যা হোক, আইয়ুবের শাসনকাল যখন দশ বছর পূর্ণ হতে চলেছে, ঠিক সে সময়ও পিকিংপন্থী উপদলটি আইয়ুবের প্রতি কতটুকু দুর্বল ছিল পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল) এর '৬৭ সালের পার্টি-কংগ্রেসের রাজনৈতিক রিপোর্টেও তা প্রত্যক্ষ করা যায়। উক্ত রাজনৈতিক রিপোর্টে আওয়ামী লীগের সমালোচনা করে বলা হয় যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে আইয়ুব সরকারের বিরোধকে তারা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেনা, বরং এ বিরোধকে কাজে লাগিয়ে আইয়ুব সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে তারা মার্কিনের সহায়তায় নিজেরাই ক্ষমতায় যেতে চায়। রিপোর্টের ভাষায়, "আইয়ুব সরকার-বিরোধী উদীয়মান বাঙ্গালী বুর্জোয়ারা এই বিরোধকে নিজেদের স্বার্থে লাগাইতে চেষ্টা করিতেছে। তাঁহারা আইয়ুব সরকারের পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা স্বীকারই করিতে চান না এবং ইহার সুযোগ লইয়া তাঁহারা মার্কিনের সহযোগীতায় ক্ষমতায় আরোহণের ষড়যন্ত্র চালাইতেছেন। মার্কিনীরাও ইহার সুযোগ নিতেছে এবং পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালী বুর্জোয়া, আমলা ও পুলিশদের ইহাতে সমর্থন ও প্ররোচনা দিতেছে।"[৩০৮] একথার ভিতর দিয়ে প্রমাণ হয় যে, উদীয়মান বাঙ্গালী বুর্জোয়ারা যে অবাঙ্গালী পুঁজিপতিদের বিরোধিতা করতে উদ্যত হয়েছিল তাকে উক্ত কমিউনিস্ট পার্টি ভালো চোখে দেখেনি। অপরদিকে, একটি উঠতি বুর্জোয়া শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদের সাথে সহযোগীতা করছে তা দূষনীয় হতে পারে, কিন্তু একটি স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটানোর জন্য যখন প্রচেষ্টা গ্রহণ করছে তখন তা দূষনীয় হতে পারে না। অপরদিকে, জাতীয় স্বার্থের সাথে যা কিছুই বিরোধাত্মক তাকে একটি জাতীয়তাবাদী শক্তি স্বাভাবিকভাবেই বিরোধিতা করবে। আর সেটি তার শ্রেণীস্বার্থের সাথে জাতীয় স্বার্থের সংগতি প্রতিষ্ঠা করেই যে কোন বৈদেশিক শক্তির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে এতে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কি আছে। এই সহজ বিষয়টিকে উপলব্ধি না করে বিকাশমান বাঙ্গালী বুর্জোয়াদের আইয়ুব-বিরোধী ভূমিকাকে নেতিবাচকভাবে দেখেছেন। উপরোন্তু, আইয়ুব সরকারের বৈদেশিক নীতির পরিবর্তনকে বাঙ্গালী বুর্জোয়ারা উপলব্ধি করতে পারছেনা বলে তাদের দোষারোপ করা হয়েছে।

পিকিংপন্থীরা মস্কোপন্থীদেরকেও এ প্রশ্নে চরম সমালোচনা করে। উল্লিখিত রিপোর্টে মস্কোপন্থীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে:

"তাঁহারা মার্কিনের গণচীন-বিরোধী বিশ্বযুদ্ধ পরিকল্পনাকে আমলই দিতে চান না। এবং এই ক্ষেত্রে আইয়ুব সরকারের ভূমিকাকে বিচারেই আনেন না। তাহাদের বক্তব্য হইল: আইয়ুব সরকারই মার্কিনের খুঁটি এবং আইয়ুব সরকারকে উচ্ছেদ করিতে পারিলেই মার্কিনসহ সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করা সম্ভব হইবে। এই যুক্তিতে তাহারা শাসকগোষ্ঠীর তথা সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী বড় মুৎসুদ্দী বুর্জোয়া, আমলা বুর্জোয়া ও শিল্প বুর্জোয়াদের মধ্যেও যে দ্বন্দ্ব আছে এবং তন্মধ্যে একান্তভাবে মার্কিনের উপর নির্ভরশীল থাকিতে চায় এইরূপ ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল অংশও আছে তাহার প্রতি নজর দেন না। তাঁহারা মার্কিনের উপর নির্ভরশীল আইয়ুব সরকারের বিরোধী বুর্জোয়াদের সহিত ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট করিয়া এবং তাহাদের নেতৃত্বে আইয়ুবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার শ্লোগান দিতেছেন। বর্তমানে প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে অক্ষুন্ন রাখিয়া মার্কিনের স্বার্থে এক সরকারের পরিবর্তে অপর সরকারকে ক্ষমতায় বসানো এবং বর্তমান সরকারের ভিতরে ও বাহিরে আইয়ুব-বিরোধী শক্তিসমূহের মধ্যে মার্কিন ষড়যন্ত্রের প্রতি তাঁহারা নজর দিতে চান না। অপরপক্ষে, আইয়ুব সরকারের সহিত বর্তমানে মার্কিনের বিরোধ এবং পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে যতটুকু পরিবর্তন হইয়াছে উহাকেও তাঁহারা গুরুত্ব দেন না। তাঁহারা বলেন যে, ইহার মূলে হইল আইয়ুব সরকারের ভারত-বিরোধী নীতি।"[৩০৯]

উপরের দীর্ঘ উদ্ধৃত থেকে এটা খুবই পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে যে, তৎকালীন ইপিসিপি (এম-এল) আইয়ুব সরকারকে একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তি হিসাবে বিবেচনা করতো। তারা আইয়ুব সরকার ও বড় মুৎসুদ্দী বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্বের অস্তিত্বকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিত এবং আইয়ুব সরকারকে এ দু'য়ের মধ্যেকার ইতিবাচক শক্তি হিসাবে বিবেচনা করতো। শুধু তাই নয়, আইয়ুব সরকারকে উৎখাতের জন্য আইয়ুব সরকার বিরোধী বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলের সাথে ঐক্যফ্রন্ট গঠনকে খুব অসমর্থনযোগ্য কাজ হিসাবে বিবেচনা করত। এমনকি, আইয়ুবের ভারত-বিরোধিতার বাইরেও আরো কিছু ইতিবাচক চরিত্র রয়েছে বলে তারা দাবী করত। অর্থাৎ সেনাবাহিনীর শক্তির ওপর দাঁড়িয়ে এবং জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে যে শক্তির উত্থান ঘটেছে, সেই শক্তির সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার কি শ্রেণী ভিত্তি সে সময় বিদ্যমান ছিল তার ব্যাখ্যা না দিয়েই তাকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বলা কিভাবে সম্ভব হয়েছিল তা বোধগম্য নয়। তবে '৬৭ সালে অনুষ্ঠিত উক্ত কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে পিকিংপন্থীরা সরকারকে স্থূলভাবে সমর্থনের পরিবর্তে আইয়ুব সরকারের ভাল কাজের সমর্থন আর খারাপ কাজের সমালোচনা (responsive cooperation) এর নীতি গ্রহণ করে। তাদের এ অবস্থান '৬৭ সালের কংগ্রেসের আগের অবস্থান থেকে সামান্য কিছুটা আইয়ুব-বিরোধী বলে মনে হয়। এ কংগ্রেসের আগে তাদের কোন কোন অংশের মধ্যে কি ধরনের চিন্তা কাজ করত তা এ রিপোর্টের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। এ রিপোর্টে বলা হয়েছে,

৩০৭. দুই কণ্ঠ, (সম্পাদকীয়), সাপ্তাহিক জনতা, অক্টোবর ১১, ১৯৬৫।
৩০৮ সি.পি.ই.পি (এম-এল)-এর '৬৭ কংগ্রেস রিপোর্ট, প্রাগুক্ত, পৃ-৫১।
৩০৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

"আমরা সংগঠিত হইবার পূর্বে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের কোন কোন অংশের মধ্যে আইয়ুব সরকারের সহিত মার্কিনের বিরোধকে বিচার এবং স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি ও ভুল ঝোঁক প্রকাশ পায়।... বিশ্ব জনগণের এক নম্বর শত্রু এবং আমাদের দেশেরও অন্যতম প্রধান শত্রু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সহিত শাসক গোষ্ঠীর বিরোধের গতি-প্রকৃতি অনুধাবন করিতে তাহারা ভুল করেন। তাঁহাদের মধ্যে এইরূপ একটি চিন্তাধারা প্রকাশ পায় যে, আমাদের দেশের সর্বপ্রধান শত্রু হইল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ; উহার সহিত বিরোধই আমাদের সমাজে সর্বপ্রধান বিরোধ এবং আজ যখন শাসকগোষ্ঠীও সেই বিরোধে লিপ্ত তখন সর্বপ্রধান শত্রুকে খতম করিবার জন্য বর্তমান মুহূর্তে আইয়ুব সরকারকে উচ্ছেদের আওয়াজ তোলা ঠিক হইবে না; আইয়ুব সরকারকে উচ্ছেদ করিয়া যখন একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম করা সম্ভব নয় তখন মার্কিনের উপর নির্ভরশীল সরকার-বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্বে সরকার গঠনের আওয়াজ তোলা কি সঠিক? এইরূপ চিন্তাধারার অভিব্যক্তি কাহারও কাহারও মধ্যে প্রকাশ পাইতে থাকে।"[৩১০] ১৯৬৭ সালের কংগ্রেসে উপরোক্ত নীতিকে সমালোচনা করা হয় এবং সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, উহার সহযোগী বড় বুর্জোয়া এবং সামন্তবাদকে দেশের প্রধান তিন শত্রু হিসাবে বিবেচনা করা হয়। উপরন্তু সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী বড় বুর্জোয়া পরিচালিত ধনবাদী-সামন্তবাদী রাষ্ট্রই যে এই তিন শত্রুর স্বার্থরক্ষক এবং সে সময়ে স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারই যে সেই তিন শত্রুর প্রতিভূ তাও বেশ গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করা হয়।[৩১১] আইয়ুব সরকারকে রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিভূ হিসাবে বিবেচনা করা হয় সত্য, কিন্তু জাতীয় স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে সাম্রাজ্যবাদকেই একমাত্র হুমকি হিসাবে বিবেচনা করার ফলে পাকিস্তানী কাঠামোর মধ্যে কোন জাতি, বিশেষত বাঙ্গালী জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে কোন কোন শ্রেণী বা গোষ্ঠী কতটুকু দায়ী তা মোটেও বিবেচনা করা হয় না। ফলে তারা বাঙ্গালী বুর্জোয়াদের 'আইয়ুবশাহী ধ্বংস হউক' এ শ্লোগানকে মার্কিনী চক্রান্তের অংশ হিসাবে বিবেচনা করে। এমনকি, বাঙ্গালী জাতির স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রামকে মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি সমর্থন করে বিধায় তাদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াশ্রেণীর লেজুড় বৃত্তির অভিযোগ আনা হয়। সে সময় মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি তাদের কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ব্যাপক ঐক্যমোর্চা গঠনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যদিও তারা সোভিয়েত পার্টির প্রভাবে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের লক্ষ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অধনবাদী বিকাশের পথে অগ্রসর হওয়ার কথা বলে তবু জনসাধারণের মুক্তির জন্য তারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের নয়া ঔপনিবেশিক শোষণ এবং একচেটিয়া পুঁজিপতি ও সামন্তগোষ্ঠীর শোষণ-শাসন খতম করা, সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎ পুঁজিপতি বিরোধী স্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করাকে পার্টির মূল লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করে।[৩১২] এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তারা "মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, দেশের বৃহৎ পুঁজিপতি ও সামন্তবাদী ভূস্বামী এবং তাদের স্বার্থরক্ষক কেন্দ্রীয় প্রতিক্রিয়াশীল শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী ও দেশের উন্নতিতে আগ্রহশীল জাতীয় বুর্জোয়াদের একটি ব্যাপক ঐক্যমোর্চা" গঠন করার কর্মসূচী ঘোষণা করে।[৩১৩] কিন্তু যাদেরকে মস্কোপন্থীরা জাতীয় বুর্জোয়া হিসাবে বিবেচনা করেছিল তাদেরকে পিকিংপন্থীরা উগ্রজাতীয়তাবাদী বলে আখ্যায়িত করে এবং তাদের দাবীর যৌক্তিকতা মেনে নেওয়াকে বুর্জোয়াশ্রেণীর লেজুড় বৃত্তি বলে দাবী করে। পিকিংপন্থী পার্টির ১৯৬৭ সালের কংগ্রেস রিপোর্টে লেখা হয়ঃ "সংশোধনবাদীরাও মুখে সাম্রাজ্যবাদও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে কথা বলিলেও বুর্জোয়াশ্রেণীর লেজুড় বৃত্তি করিতে গিয়া, "আইয়ুব শাহী ধ্বংস হউক" শ্লোগানের মাধ্যমে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পতাকাকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরে এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মোহে সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল, সামন্তবাদের সহযোগী এবং শ্রমিকশ্রেণীর শোষক বাঙ্গালী বুর্জোয়ার সহিত ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনকে মুখ্য স্থান দিয়া সাম্রাজ্যবাদী, সামন্তবাদী ও পুঁজিবাদী শোষকের বিরুদ্ধে শ্রমিক, কৃষক, মেহনতী জনতার সংগ্রাম ও ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টকে এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর দোদুল্য চিত্ততা, আপোসমুখীনতাও উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে গৌণ স্থান দেয়।"[৩১৪]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায়, দেশের বামপন্থী রাজনৈতিক মহলের ওপর আন্তর্জাতিক আদর্শগত বিতর্ক যে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে তার ফলশ্রুতি হিসাবে তার মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিভ্রান্তির জন্ম হয়।

(১) পাকিস্তানের মত একটি নয়া-ঔপনিবেশিক দেশের জনগণের জাতীয় মুক্তির সামনে প্রায় একমাত্র বাধা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ। দেশের অভ্যন্তরের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে কিছু বৈষম্য থাকতে পারে, কিন্তু এসকল অঞ্চলের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার আদায়ের জন্য প্রধানত: সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই লড়াই করতে হবে। বিদ্যমান বিশ্বের মূল চারটি দ্বন্দ্বের মধ্যে একটি হচ্ছে: সাম্রাজ্যবাদের সাথে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার জাতিসমূহের দ্বন্দ্ব। চীন ও সোভিয়েত পার্টিসহ প্রায় সকল কমিউনিস্ট পার্টি এ দ্বন্দ্বকে অন্যতম মূল দ্বন্দ্ব হিসাবে নির্ধারণ করার ফলে কমিউনিস্টরা সে সময় সকল রকম জাতীয় নিপীড়নের মূল শক্তি হিসাবে সাম্রাজ্যবাদীদেরকেই চিহ্নিত করে। ফলে, পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ তথা বাঙ্গালী জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নকে তাদের কারো পক্ষেই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই থেকে পৃথক করে কখনও দেখা সম্ভব হয় নি।

(২) শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান ও শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের মস্কো লাইনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানে বুর্জোয়া শ্রেণীর সাথে মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি ঐক্যজোট গঠনের লাইন গ্রহণ করে। কিন্তু এখানকার বাঙ্গালী বুর্জোয়াদের মধ্যে ছিল মার্কিন প্রীতি এবং এ বুর্জোয়া শ্রেণী ছিল ঘোরতর অবাঙ্গালী বৃহৎ পুঁজিপতি বিরোধী। এ দু'টি ক্ষেত্রে মস্কোপন্থীদের আপত্তি থাকলেও শান্তিপূর্ণ পথে উত্তরণের নীতিকে কার্যকরী করতে তারা বিপরীত শ্রেণীর সাথে আপোস মীমাংসায় যায়। অন্যদিকে, আইয়ুব সরকারের সাথে সোভিয়েতসহ বিভিন্ন পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠার ফলে তারা আইয়ুব সরকারের প্রতি নমনীয় মনোভাবই পোষণ করে। কিন্তু বাঙ্গালী বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক দলের সাথে মোর্চা গঠন করতে গিয়ে তারা বাঙ্গালীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে শামিল হয়ে পড়ে। কিন্তু বাঙ্গালীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের রাজনীতির সাথে তারা কখনও একাত্ম হতে পারে নি। আর সে কারণেই বাঙ্গালীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বের অংশীদার হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তারা জাতীয় কিংবা শ্রেণী প্রশ্নের

---

৩১০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২-৫৩।

৩১১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।

৩১২ রায়, খোকা (১৯৮৬)ঃ <u>সংগ্রামের তিন দশক ঢাকাঃ</u> জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, পৃ. ২০৫-২০৬।

৩১৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬।

৩১৪ '৬৭ সালে পার্টি-কংগ্রেসের রাজনৈতিক রিপোর্ট, পৃ. ৫৩-৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

কোনটাকেই সুষ্ঠুভাবে তুলে ধরতে পারেনি। ফলে তাদের ভূমিকা একদিকে যেমন শ্রেণী-রাজনীতিকে অগ্রসর করেনি, তেমনই অন্যদিকে বাঙ্গালী বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক দলের সাথে জাতীয় রাজনীতিকেও পদে পদে বাধা দিয়েছে।

(৩) চীনা পার্টির বক্তব্য অনুযায়ী এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার নিপীড়িত জাতিসমূহের মুক্তির জন্য আক্রমণের কেন্দ্র হবে সাম্রাজ্যবাদ কিংবা তার সহযোগী শ্রেণীসমূহ। অপরদিকে, অভ্যন্তরীণ শোষক শ্রেণীসমূহ হল বিপ্লবের শত্রু। যেহেতু আইয়ুব খান তাদের মতে তখন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা পালন করছিল সেহেতু তাকে জাতীয় মুক্তির লড়াইয়ে শত্রু হিসাবে বিবেচনা করার উপায় ছিল না। অপর দিকে, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে মূল শোষকশ্রেণী হিসাবে সামন্তপ্রভু ও বুর্জোয়াদেরকে দেখা হয়েছিল। ফলে আইয়ুব সরকারের স্বার্থ সম্পর্কের প্রকৃতিকে সহযোগীতা কিংবা বিরোধিতা ভালভাবে বিবেচনা না করেই পিকিংপন্থীরা গ্রামাঞ্চলের সকল শ্রেণীশোষককে এক কাতারে ফেলে তাদের বিরুদ্ধে কৃষক-জনতাকে ঐক্যবদ্ধ করার কর্মনীতি গ্রহণ করে। ঠিক একইভাবে, বাঙ্গালী কিংবা অবাঙ্গালী বৃহৎ বুর্জোয়াদের সহযোগী কিংবা বিরোধী তা মোটেই বিবেচনা না করে সমগ্র বুর্জোয়াশ্রেণীকেই শ্রেণীশোষক হিসাবে গণ্য করা হয় এবং শ্রমিকশ্রেণীকে সমগ্র বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগঠিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ফলে বাঙ্গালী জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটি একেবারেই উপেক্ষিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান ভিত্তিক পার্টি হওয়া সত্ত্বেও বাঙ্গালীর জাতিগত নিপীড়নের কথা উল্লেখ না করে পাকিস্তানের বিভিন্ন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীর সাথে বাঙ্গালীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীকে একাকার করে ফেলা হয়। এমনকি, যে পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণাঙ্গ আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী করা হয় তখনও বাচ-বিচার না করে সমগ্র ভূস্বামী ও বুর্জোয়াশ্রেণীকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হিসাবে বিবেচনা করা হয়।[৩১৫]

(৪) চীনা পার্টির বক্তব্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এবং দেশে যথার্থ রাজনৈতিক লাইন গ্রহণে ব্যর্থ হয়ে পিকিংপন্থীদের সকল অংশই গণআন্দোলন ও গণসংগ্রাম পরিত্যাগ করে এবং চীন বিপ্লবের অনুকরণে গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাওয়ের কর্মসূচী গ্রহণ করে গোপন ও বেআইনী কার্যকলাপকে সংগ্রামের একমাত্র রূপ হিসাবে গ্রহণ করে।[৩১৬] এ প্রক্রিয়া শেষ হতে সময় লেগেছিল, তবে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের আগেই সে প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে, সোভিয়েত পার্টির প্রভাবে মস্কোপন্থীরা ক্রমেই সমস্ত রাজনৈতিক কর্মকান্ডে বাঙ্গালী বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আবার, আইয়ুব সরকারের সাথে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠার কারণে আইয়ুব সরকারকে উৎখাতের জন্য স্পষ্ট কোন কর্মসূচী মস্কোপন্থী কমিউনিস্টরা গ্রহণ করেনি; বরং আশু নির্বাচনকে সামনে রেখে সরকারের বিরুদ্ধে একটি গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনের আহবান জানান। যদিও তাঁরা আশংকা প্রকাশ করেন যে বিদ্যমান অগণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র ও পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইয়ুব সরকারের পরিবর্তন ঘটানো যাবে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা উক্ত কোয়ালিশনের প্রতি বিশেষভাবে জোর দেন।[৩১৭] এমনকি, তাদের কংগ্রেস সম্পন্ন হওয়ার পরপরই যে ৬৮-৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান সূচিত হয়েছিল সে সম্পর্কে তারা কংগ্রেস অনুষ্ঠানের সময় একটুও আঁচ করতে পারে নি। সে কারণেই উক্ত পার্টি কংগ্রেসেই তারা মৌলিক গণতন্ত্রের মত একটি অগণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল।[৩১৮] শুধু তাই নয়, আন্দোলন যখন মোটামুটিভাবে শুরু হয়ে গিয়েছিল তখনও তারা জামাতে ইসলামসহ অন্যান পাঁচটি সাম্প্রদায়িক দল সহযোগে ৮-দফা কর্মসূচীভিত্তিক এমন একটি জোট গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে যে জোটের কর্মসূচীতে কোন রকম আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন কিংবা স্বাধীন বৈদেশিক নীতি সম্পর্কিত একটি ন্যূনতম দাবীও সংযোজিত হয় নি।[৩১৯] এটা স্পষ্টতই সোভিয়েত পার্টির অহিংস পন্থা ও পার্লামেন্টারী পথে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লাইন অনুসরণের ফলাফল ।

(৫) পার্টির ঐক্যের ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক আদর্শগত বিতর্কের সবচেয়ে ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছিল কেননা, বিতর্কটি এমনভাবে উপস্থাপিত হয় যে, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিভক্তি আসার সাথে সাথে এখানকার পার্টিও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। কমিউনিস্ট আন্দোলনে এ ভাঙ্গণের ফলে এমন একটি বিপর্যয়কর অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, পিকিংপন্থীদের পক্ষেও এখানে আর একজোট হয়ে থাকা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীকালে তারা আরো কয়েকটি উপ ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে।

যে ধারাগুলি সে সময় পূর্ব পাকিস্তানে বাম রাজনীতিকে ধারণ করতো তাদের মধ্যে কারো পক্ষেই কার্যত পূর্ব পাকিস্তানের গণমানুষের শ্রেণীগত আকাংখ্যার সাথে জাতীয় আকাংখ্যার সমন্বয় ঘটানো সম্ভব হয়নি। উপরোক্ত, চীনাপন্থীদের কারো কারো মাঝে বাঙ্গালীর জাতীয় প্রশ্নকে ভালোভাবে উপলব্ধি করার প্রবণতা থাকলেও সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে অপরিপক্ক দৃষ্টিভঙ্গী থাকার কারণে বাম রাজনৈতিক ধারার মধ্যে তা শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারেনি। সিরাজ শিকদার তেমনই একটি ধারাকে প্রতিনিধিত্ব করতেন। তিনি সাংগঠনিক প্রশ্নে সশস্ত্র পথকেই একমাত্র পথ হিসাবে গ্রহণ করতেন কিন্তু রাজনৈতিক প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানের সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে বিদ্যমান দ্বন্দ্বকে যথাযথভাবে ধরতে পেরেছিলেন। শ্রমজীবী মানুষের শ্রেণী প্রশ্নের মীমাংসা যে জাতীয় দ্বন্দ্ব নিরসনের সাথে সেদিন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্তছিল এ কথাটি সিরাজ শিকদারের নেতৃত্বাধীন ধারাটিই প্রথম উপলব্ধি করে। সেই সাথে জাতীয় নিপীড়ন, শ্রেণী নিপীড়ন এবং গণনির্যাতনের মূল প্রতিনিধি যে ছিল আইয়ুব সরকার সে কথাটিও সিরাজ শিকদার খুব ভালভাবে বলেছিলেন। আর তাই তখন তার নেতৃত্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষ থেকে ১১ দফার একটি বিস্তারিত কর্মসূচী প্রদান করা সম্ভব হয়েছিল।[৩২০] তবে সে সময় সিরাজ শিকদারের এ ধারাটি এত ক্ষুদ্র ছিল যে, উক্ত কর্মসূচীর আবেদন পূর্ব পাকিস্তানের গণমানুষের কাছে খুবই সামান্য ছিল।[৩২১] সে যাহোক, ততদিনে বাঙালী বুর্জোয়াদের জাতীয়তাবাদী ধারাটি অনেক দূর যদিও এগিয়ে গেছে, বাম রাজনৈতিক ধারাসমূহের নেতৃত্বে এক দীর্ঘ শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস সে সময় রচিত হয়েছিল। কিন্তু উক্ত জাতীয়তাবাদী ধারাটি ইতিমধ্যেই এমন

---

৩১৫ পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী লেনিন বাদী)র কর্মসূচীঃ জনগণতান্ত্রিক পূর্ব পাকিস্তান (১৯৬৭), সাবেক সিপিইপি(এম-এল)-এর দুইটি দলিল, ঢাকাঃ প্রকাশনা বিভাগ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট লীগ, পৃ. ১১।

৩১৬ পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী লেনিন বাদী) ফিচারঃ (১৯৭৩) প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

৩১৭ বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, দ্বিতীয় কংগ্রেসে সংগ্রহিত দলিলসমূহ, ৪ঠা থেকে ৯ই ডিসেম্বর, ঢাকা ১৯৭৬। পৃ. ৬৭।

৩১৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।

৩১৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।

৩২০ পূর্ব পাকিস্তানের শ্রমিক আন্দোলনের থিসিস (১লা ডিসেম্বর, ১৯৬৮), আজাদ, আবদুর রহিম ও শাহ আহমাদ রেজা (১৯৮৭)ঃ ২১-দফা থেকে ৫-দফা, ঢাকাঃ সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, পৃ. ১৫৭-৮৩।

৩২১ সিরাজ সিকদার বিষয়ে গবেষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক নূরুল আমিন বেপারী সাক্ষাৎদান প্রসঙ্গে এ অভিমত ব্যক্ত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেছিল যার ফলে এই ধারাটিকেই আইয়ুব সরকার তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সামনে প্রধানতম হুমকি হিসাবে গণ্য করে।

৮.৮ বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক উত্থানঃ মেরুকরণের নতুন পর্যায়

আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র ভিত্তিক নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের সূচনা হওয়ার পর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে যে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এন.ডি.এফ) গড়ে উঠেছিল, সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর উক্ত ফ্রন্টের মূল ধারাসমূহের মধ্যে ফ্রন্ট সম্পর্কে উৎসাহে ভাটা পড়ে। কেননা এমন রাজনৈতিক ধারাসমূহকে নিয়ে এন.ডি.এফ গঠিত হয়েছিল যে, একমাত্র আইয়ুব সরকারের বিরোধিতা করা ছাড়া সুনির্দিষ্ট কোন রাজনৈতিক বক্তব্য প্রকাশ করা এর পক্ষে সম্ভব ছিলনা। বিশেষত: সে সময় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি মনে করছিল ব্যাপক মেহনতী মানুষ তথা কৃষক-শ্রমিকের কথা না বলে এবং তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ না করে, আইয়ুব সরকার-বিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করা যাবেনা। উপরন্তু, তাদের ধারণা ছিল আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদ বিশেষত: মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামকে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের সাথে সমন্বিত না করতে পারলে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা অসম্ভব।[৩২২] অন্যদিকে, আওয়ামী লীগের একাংশের মধ্যে ধারণা ছিল, আওয়ামী লীগের কর্মীদের ওপর নির্ভর করে এন.ডি.এফ এর কর্মকান্ড চলবে আর কিছু অথর্ব ব্যক্তি এর নেতৃত্ব দিবেন এ ভাবে আর চলতে পারে না। উপরন্তু, তারা মনে করত আইয়ুব সরকার-বিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে জোরদার করতে হলে কর্মীরা যাতে সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে সে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। স্বৈরাচার বিরোধী সংগ্রামকে কার্যকরীভাবে এগিয়ে নিতে হলে সুনির্দিষ্ট রাজনীতির আলোকে কর্মী ও জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলা প্রয়োজন। কিন্তু বিভিন্নমুখী প্রবণতা সম্পন্ন রাজনৈতিক ধারাসমূহকে নিয়ে গড়ে ওঠা এন.ডি.এফ এর মধ্যে থেকে এসব লক্ষ্যের কোন কিছুই অর্জন করা সম্ভব নয়।[৩২৩] অন্যদিকে, আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের কয়েকজন নেতাসহ অন্যান্য দলের যে সকল নেতা এন.ডি.এফ থেকে বেরিয়ে গিয়ে রাজনৈতিক দলকে পুনরুজ্জীবনের বিরোধিতা করেছিলেন তাদের অধিকাংশই এবডো আইনের আওতায় নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন। সোহরাওয়ার্দী স্বয়ং ছিলেন এদের পক্ষে। আওয়ামী লীগের ওপর তার ব্যাপক রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে পুনরুজ্জীবরের পক্ষে অধিকাংশ নেতা-কর্মী থাকা সত্ত্বেও সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কেউ দলকে পুনরুজ্জীবিত করার সাহস পায় নি। তবে রাজনৈতিক দল নির্বিশেষে যদি এন.ডি.এফ নেতৃত্বকেপুনরুজ্জীবনের পক্ষে-বিপক্ষে ভাগ করা যায় তাহলে দেখ যাবে যারা গ্রামীণ বৃহৎ ভূমি মালিকানা বা শহরে উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করছিলেন তারা সবাই পুনরুজ্জীবনের বিপক্ষে ছিলেন এবং এদের কাছে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারই আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল; অন্যদিকে, যারা মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, শ্রমিক ও গ্রামের কৃষকসমাজকে প্রতিনিধিত্ব করছিলেন তারা সবাই পুনরুজ্জীবনের পক্ষপাতী। আওয়ামী লীগের সোহরাওয়ার্দী, আতাউর রহমান খান ও আবুল মনসুর আহমদ এবং ন্যাপের মাহমুদ আলীসহ কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও মুসলিম লীগের (নূরুল আমিন) সকল নেতৃবৃন্দই পুনরুজ্জীবনের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে রংগলাল সেন বলেন:

"The NDF leaders, whose supprt base was in the urban upper middle class and rural big landowning stratum, and who wanted to limit their movement only to the democratization of the 1962 constitution, were opposed to the revival of popular democratic parties. But the leadership of the revivalist sections who represented the urban middle and lower classes, and workers and the rural peasantry, wanted to reorganize their parties as early as possible in order to carry forward the popular movement".[৩২৪]

পার্টি পুনরুজ্জীবনের প্রশ্নে ন্যাপের মধ্যে প্রবল কোন বিরোধী ধারা না থাকলেও আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতাদের অধিকাংশই তার বিপক্ষে ছিলেন। সোহরাওয়ার্দীর অব্যাহত বিরোধিতার কারণে পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টা প্রথমেই ব্যর্থ হয়। এ রকম একটি পর্যায়ে সোহরাওয়ার্দী আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর ফলে আওয়ামী লীগের মধ্যে সাময়িক নেতৃত্বের শূন্যতা সৃষ্টি হল বটে, কিন্তু এতে আওয়ামী লীগের অধিকাংশ কর্মী যা চেয়েছিল অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট রাজনীতির ভিত্তিতে আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলা, তার পথ সুগম হল। ১৯৬৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর থেকে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ধারা হিসাবে আওয়ামী লীগ কর্মকান্ড পরিচালনা করতে থাকে। উক্ত কর্মকান্ডের সাথে খাপ খাওয়াতে না পেরে আওয়ামী লীগের বয়ো-বৃদ্ধ ও এবডো প্রাপ্ত নেতারা ক্রমাগত দলীয় কর্মীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। অন্যদিকে, ন্যাপ অনেক আগে থেকেই নিজস্ব কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছিল। এছাড়া, পুরো ১৯৬৩ সাল ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলন অব্যাহত ছিল, যা অবাঙ্গালী বৃহৎ পুঁজিপতিদের অস্থির করে তুলেছিল। উল্লেখ্য যে, এই অব্যাহত শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। এরকম একটি সময়ে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের বিশ্বস্ত পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খানের সরকার শ্রমিক আন্দোলনসহ সকল শ্রেণী-পেশার সংগ্রামকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য গুন্ডাবাহিনী লেলিয়ে দেয়। এ সময় গুন্ডামির রূপ কি চরম আকার ধারণ করেছিল তা আগের অধ্যায়েই আলোচিত হয়েছে। এসময় ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত হয় । এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে খুলনায় সবুর খানের প্ররোচনায় এক মারাত্মক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়।[৩২৫] গণতান্ত্রিক শক্তির বিশেষ চেষ্টার ফলে সেখানকার দাঙ্গাকে রোধ করা সম্ভব হয়। কিন্তু ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে সরকারী দলের প্রত্যক্ষ মদদে এক মারাত্মক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত হয়; যা অচিরেই বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী দাঙ্গায় রূপান্তরিত হয়। সরকারী প্রশাসনের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা এবং অবাঙ্গালী মালিকদের প্রত্যক্ষ প্রশ্রয়ে গড়ে ওঠা অবাঙ্গালী গুন্ডাবাহিনীর নেতৃত্বে হিন্দুসম্প্রদায়ের ওপর নির্মম আক্রমণের সময়ে প্রথমে কিছু বাঙ্গালী মাঠে নামলেও দেশের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তি ও বুদ্ধিজীবীদের বিভিন্ন অংশের সক্রিয় প্রচেষ্টায় "দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি" গড়ে ওঠার পর উক্ত দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক গণপ্রতিরোধ গড়ে ওঠে। এ প্রতিরোধ আন্দোলনে বাম রাজনৈতিক কর্মীদের এক বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল।[৩২৬] সে যাহোক, এভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিস্তার ও তা প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে দুধরনের প্রতিক্রিয়া পড়ে: প্রথম প্রতিক্রিয়াটি 'বাঙালী রুখিয়া দাঁড়াও "দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটির

---

৩২২ আইয়ুব খানের জবাবে হাজী মোহাম্মদ দানিশ (সাধারণ সম্পাদক, ন্যাপ), সাপ্তাহিক 'জনতা' নভেম্বর ১৮, ১৯৬৪।

৩২৩ ইত্তেফাক, ১০ই জানুয়ারি ১৯৬৪।

৩২৪ Sen, Rangalal (1986): Political Elites in Bangladesh, pp. 185-86.

৩২৫ বামপন্থী নেতা নজরুল ইসলামের সাথে সাক্ষাৎকার।

৩২৬ খান, আতাউর রহমান (১৯৭০)ঃ স্বৈরাচারের দশ বছর, পৃ. ২৯০।

Dhaka University Institutional Repository

এ ঘোষণার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। সমগ্র সচেতন মহলের মধ্যে এ দাঙ্গাটি বাঙালীর বিরুদ্ধে অবাঙ্গালী শিল্পমালিক ও সরকারের চক্রান্ত হিসাবে প্রতিভাত হয়। অন্যদিকে, বামপন্থীদের কাছে তা সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের অংশ বলেও প্রতীয়মান হয়। তারা ধারণা করে যে, সাম্রাজ্যবাদের দালাল বৃহৎ পুঁজিপতিরা এভাবে দাঙ্গা লাগিয়ে জনসাধারণকে সাম্প্রদায়িকভাবে এবং জাতিগতভাবে বিভক্ত করার চক্রান্ত করেছিল।[৩২৭] এ পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানের বিরোধী রাজনীতি প্রধান তিনটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পরও যে সকল নেতা ও দল এন.ডি.এফকে টিকিয়ে রেখেছিলেন তাঁরা শুধু আইয়ুবের '৬২ সালের সংবিধান ভিত্তিক নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের অবসানই চেয়েছিলেন। তাঁরা মূলত মুসলিমলীগের রাজনীতিকে অনুসরণ করে চলেছিলেন। যদিও জামাত-ই-ইসলাম এবং নেজাম-ই-ইসলাম স্বনামে বেশ আগে থেকেই আত্মপ্রকাশ করেছিল, তবু এন.ডি.এফ থেকে ভিন্ন কোন রাজনীতি তারা জাতির সামনে তুলে ধরতে পারেনি। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাপকে কেন্দ্র করে দ্বিতীয় ধারাটি সৃষ্টি হয়েছিল। গোপন কমিউনিস্ট পার্টি এবং তাদের প্রভাবিত ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠনসহ অন্যান্য কতিপয় গণসংগঠন উক্ত ধারার সাথে যুক্ত হয়। আর শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগকে কেন্দ্র করে তৃতীয় ধারাটির জন্ম হয়েছিল। সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর পাকিস্তানী রাজনীতির শেষ দুই অনুসারী আতাউর রহমান খান ও আবুল মনসুর আহমদ এন.ডি.এফ-এ থেকে যাওয়ার কারণে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে এক বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। অন্যদিকে, আইয়ুব সরকারের বৈদেশিক নীতিতে পরিবর্তনের ফলে ন্যাপের রাজনীতিতেও বিশেষ ধরনের পরিবর্তন সূচিত হয়। ন্যাপ ও আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পর এ দু'টি রাজনৈতিক দল যে দুই স্বতন্ত্র রাজনীতি নিয়ে মাঠে নামে তা আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের দুই সাধারণ সম্পাদকের পরপর প্রকাশিত দীর্ঘ দু'টি বিবৃতির মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আওয়ামী সম্পাদক শেখ মুজিবের বিবৃতিটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালের ৭ই নভেম্বর এবং ন্যাপ সম্পাদক হাজী দানেশের বক্তব্যের প্রথমাংশ প্রকাশিত হয় ১৮ই নভেম্বর এবং দ্বিতীয় অংশ ২৫শে নভেম্বর। শেখ মুজিবের বিবৃতির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রকাশিত হয় দৈনিক ইত্তেফাকে এবং হাজী দানেশের পূর্ণাঙ্গ বক্তব্য সাপ্তাহিক জনতায় প্রকাশিত হয়। উক্ত দুই নেতার দু'টি বক্তব্য থেকে সে সময়ের দু'টি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ধারার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

হাজী দানেশ "আইয়ুব খানের জবাবে " শীর্ষক উক্ত লেখায় নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়কে স্পষ্ট করেনঃ

(১) আইয়ুব খান ব্যক্তিগতভাবেই ঔপনিবেশিক আমলের সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত, চিন্তা-ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গীতেও তিনি ঔপনিবেশিক চরিত্রের। আর সে কারণেই তিনি ওপরওয়ালাকে তোয়াজ করতে করতে সাধারণ একজন সামরিক কর্মকর্তা থেকে পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতিরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কোন রকম গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ তার কখনও ছিল না। তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং বিভিন্ন সময়ে গোলাম মোহাম্মদ ও ইস্কান্দার মির্জার সকল প্রকার প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের তিনিই ছিলেন অন্যতম প্রধান সহযোগী। পরিশেষে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ধারাকে নস্যাৎ করার ক্ষেত্রে তিনি সামরিক বাহিনীকে প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার করেন। আর এ সব কিছুর পিছনে আইয়ুব খানের আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাংখাই বিশেষভাবে কাজ করেছিল।

(২) আইয়ুব খান সামরিক শক্তির বলে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে গণতান্ত্রিক রাজনীতির ধারাবাহিকতাকে তীব্র নির্যাতনমূলক পদ্ধতিতে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তিনি নীতিহীন ও স্বার্থপর রাজনৈতিক ব্যক্তিদের তার চার পাশে টেনে এনেছেন। যে কোন প্রতিবাদকে যাতে শুরুতেই ধ্বংস করে দেওয়া যায় তার জন্য পুলিশ বাহিনীর পাশাপাশি একটি শক্তিশালী গুন্ডাবাহিনীরও জন্ম দেওয়া হয়েছে।

(৩) জনসাধারণের ওপর আইয়ুব সরকারের যে তীব্র নির্যাতন এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রতি আইয়ুব খানের যে নির্লজ্জ সমর্থন -- এ দুই এর বিরুদ্ধে পাকিস্তানের উভয় অংশের জনগণের প্রতিবাদের মুখে আইয়ুব খান সাম্রাজ্যবাদকে প্রকাশ্যে সমর্থন করার সাহস কিছুটা হারিয়ে ফেললেও তিনি এখনও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থকে সংরক্ষণ করে চলেছেন এবং সিয়াটো- সেন্টোসহ মার্কিনের সাথে সকল সামরিক চুক্তিকে অব্যাহত রাখতে প্রয়াসী। তবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চীন ঘেরাও নীতিকে কার্যকরী করতে হলে ভারতকে মার্কিন নেতৃত্বের বাইরে রাখা চলে না; মার্কিন যখন ভারতের প্রতি সহযোগীতার হাত প্রসারিত করে তখনই আইয়ুব সরকারের বৈদেশিক নীতিতে কিছু পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায়। আইয়ুবের বৈদেশিক নীতিতে এ পরিবর্তন মোটেও মার্কিনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের কারণে ঘটেনি এবং তা মোটেও প্রকৃত পরিবর্তন নয়, শুধুমাত্র ভারতের প্রতি শত্রুতার মনোভাব থেকেই আপাতত: মার্কিনের প্রতি এক ধরনের বৈরী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।[৩২৮]

(৪) আইয়ুব খানের সরকার কৃষক জনতাকে নিষ্ঠুরভাবে শোষণ করে যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে সে মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের উন্নতির জন্য ব্যয় না করে তা আদমজী, দাউদ, সায়গল, গান্ধারা প্রমুখ মুষ্টিমেয় বড় ধনীদের স্বার্থে ব্যবহার করছে। পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সেখানকার সরকারের হাতে রাখা হয়নি, কেন্দ্রের হাতে সমস্ত পরিকল্পনার দায়ীত্ব রাখা হয়েছে। এর ফলে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য ব্যাপকতর হচ্ছে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শুধু পূর্ব পাকিস্তানই বৈষম্যের শিকার হচ্ছে তাই নয়, বেলুচিস্তানসহ পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য ক্ষুদ্রতর জাতিসমূহও বঞ্চিত হচ্ছে। বৃহৎ বুর্জোয়াদের মুনাফার হার এখন শতকরা ২০০ ভাগ থেকে ৩০০ ভাগে দাঁড়িয়েছে। তাদের এধরনের মুনাফার শিকার হয়ে পূর্ব পাকিস্তান, বেলুচিস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত এলাকাসহ বিভিন্ন জাতি নিঃস্বতর হয়ে পড়ছে।

(৫) ওয়াকার্স প্রোগ্রামের বদৌলতে গ্রামাঞ্চলে গড়ে তোলা হয়েছে একটি শক্তিশালী টাউট-বাটপার গোষ্ঠী। এরাই আইয়ুবের প্রধান সমর্থক। তারা পি.এল.৪৮০ এর অধীনে প্রাপ্ত মার্কিনী গম বিক্রি করে বিপুল বিত্তশালী হয়েছে। নগদ অর্থের মালিক হয়ে এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে গ্রামাঞ্চলে সর্বাধিক ক্ষমতার অধিকারী এই দুর্নীতিবাজ টাউটদের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। সামন্তভূস্বামী শ্রেণী উক্ত টাউট-বাটপারদের মূল পৃষ্ঠপোষক।[৩২৯]

---

৩২৭ শরদিন্দু দস্তিদার গবেষকের সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে এ অভিমত ব্যক্তকরণ।

৩২৮ জনতা, ১৮ই নভেম্বর, ১৯৬৪।

৩২৯ জনতা, ২৫শে নভেম্বর, ১৯৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

হাজী দানেশের উপরোক্ত বক্তব্য থেকে যা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা হল এই যে,আইয়ুব সরকার একটি স্বৈরাচারী সরকার, আইয়ুব ব্যক্তিগতভাবেও ষড়যন্ত্রকারী এবং প্রচন্ডভাবে গণনিপীড়নকারী। দ্বিতীয়ত:, আইয়ুবের ক্ষমতার মূল ভিত্তি হল বৃহৎ বুর্জোয়া ও গ্রামীণ ভূস্বামী শ্রেণী। বৃহৎ বুর্জোয়াদের শোষণের কবলে পূর্ব পাকিস্তান যেমন শোষিত ও নির্যাতিত হচ্ছে তেমনই পাকিস্তানের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীও নির্যাতিত ও শোষিত হচ্ছে। হাজী দানেশের বক্তব্য অনুসারে তথা, ন্যাপের দৃষ্টিতে আইয়ুব সরকারের শ্রেণীভিত্তি হচ্ছে দু'টি:

১. বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী (এখানে বাঙ্গালীকিংবা অবাঙ্গালী -- এভাবে বুর্জোয়াদেরকে বিভক্ত করা হয়নি)।
২. সরকারী প্রশাসনের সাথে যুক্ত ও সরকারী সাহায্যপুষ্ট টাউট-বাটপারগোষ্ঠী যারা সামন্ত ভূস্বামী শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে।

যে দল পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসনের দাবীকে মুখ্য গণ্য করে ১৯৫৭ সনে আওয়ামী লীগ থেকে বের হয়ে এসেছিল সে দল ষাটের দশকে উপরোক্ত প্রশ্নে পূর্বের অবস্থানে থাকতে পারেনি, বরং এটি পাকিস্তানের অন্যান্য জাতিগত সমস্যার সাথে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত শাসনের প্রশ্নকে মিশিয়ে ফেলেছে। তবে মার্কিনের ব্যাপারে ন্যাপের অবস্থান আগের মতই ছিল। এ থেকে মনে হতে পারে, এ ধারাটি ১৯৫৭ সালেও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতাকে রাজনীতির মূল কেন্দ্র বিন্দু হিসাবে বিবেচনা করত; আঞ্চলিক বৈষম্যের প্রশ্নটিকে এটি ততটা গুরুত্ব দেয়নি। আসলে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা ও আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসনের দাবী পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

শুধু যে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মধ্যেই এ ব্যাপারে পরিবর্তন ঘটেছিল তা নয়, আওয়ামী লীগের মধ্যেও এক ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। আওয়ামী লীগ তার বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে পূর্বেকার অবস্থান বজায় রেখে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে জোরালো মত প্রকাশ করে। কি পরিকল্পিতভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করে গুটিকয়েক অবাঙ্গালী পুঁজিপতির জন্য দেওয়া হচ্ছে এবং পূর্ব পাকিস্তানকে বিদেশের কাছে বন্ধক রাখা হচ্ছে তা' শেখ মুজিবের বক্তব্যে খুব নিখুঁতভাবে ফুটে ওঠে। শেখ মুজিবের উক্ত বিবৃতির মাধ্যমে তৎকালীন রাজনীতি সম্পর্কে আওয়ামী লীগের অবস্থানটি সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। উক্ত বিবৃতিতে শেখ মুজিব বলেন আইয়ুব সরকার এই প্রথম পাকিস্তানের দুইঅংশের মধ্যকার বিস্তর বৈষম্যকে স্বীকার করলো, কিন্তু এ সরকারের সততা শুধুমাত্র এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে -- পূর্ব পাকিস্তান কিভাবে উন্নত হতে পারে সে ব্যাপারে কার্যকরী কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। "এই বৈষম্য দূরীকরণের ব্যাপারে তাহাদের বহু ঘোষিত প্রচারের মারফত পূর্ব পাকিস্তানকে ও তার অর্থনীতিকে অধিকতর পঙ্গু করা এবং দেশের দ্রুত বিকাশমান শিল্পোন্নয়নের বাজার হিসাবে ইহার অবস্থা অপরিবর্তিত ও দৃঢ় রাখিবার জন্যই ধূম্রজাল সৃষ্টি করা হইয়াছে।"

শেখ মুজিব তাঁর উক্ত বিবৃতিতে আরোও বলেন: "এই সকল ভদ্রলোক প্রায়শঃই প্রেসনোট ও বিবৃতির মারফত পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নকল্পে জোরালো কর্মসূচী, পরিকল্পনা ও কারখানার জন্য অনুমোদন দানের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেলেও এই সম্পর্কে আর কিছুই শোনা যায় না। বিগত ছয় বৎসর যাবত এই ধরনের ঘোষণা দ্বারা আমাদের আপ্যায়িত করা হইয়াছে। এই ধরনের কাগুজে পরিকল্পনার, এমনকি শতকরা ২৫ ভাগও যদি বাস্তবে পরিণত হইত, তবে পূর্ব পাকিস্তান অনায়াসে ইহার অর্থনৈতিক লক্ষের দিকে অগ্রসর হইত এবং আমাদের জীবনযাত্রার মান সুইডেন অথবা আমেরিকাকে ছাড়াইয়া যাইত।"[৩৩০]

শেখ মুজিবের মতে বর্তমান (পাকিস্তান) সরকার শিল্পখাতে অধিক পরিমাণে পুঁজি বিনিয়োগ করছে সত্য, কিন্তু এ পুঁজি সংগ্রহ করা হচ্ছে বিদেশের সঙ্গে এক দামসুলভ শর্তে। এমন সব কঠিন শর্তে এ সরকার বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করছে তা কোন গণতান্ত্রিক সরকার কোনভাবেই মানত না। কেননা এই কঠিন শর্তে যে ঋণ ইতিমধ্যেই গ্রহণ করা হয়েছে ১৯৭০ সাল থেকে শুধুমাত্র এ জন্য বছরে ৫০ কোটি টাকার সুদ প্রদান করতে হবে। আর এ ঋণ পরিশোধের ৮০ ভাগ বোঝা পূর্ব পাকিস্তানকে বহণ করতে হবে। কারণ পূর্ব পাকিস্তানই শতকরা ৭৫ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানই অর্জন করে। অথচ প্রাদেশিক অর্থ সাহায্যের ২০ ভাগও পূর্ব পাকিস্তান পাচ্ছে না। ফলে প্রকৃতপক্ষে পূর্ব পাকিস্তানকে বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহণ করা হচ্ছে,অথচ প্রায় ৮০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হচ্ছে।

এর পর শেখ মুজিব আরো বলেন:"প্রকৃত পক্ষে সমগ্র ব্যাপারটাই পূর্ব পাকিস্তানে শিল্পায়ন ব্যহত করার জন্য একটি সুচতুর-ত্রিমুখী পরিকল্পনার শামিল। এই পরিকল্পনার সঙ্গে ৩টি পক্ষ- যথা, ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের সরকার, পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পপতিদের একটি ক্ষুদ্র চক্র এবং বৈদেশিক ঋণদান সংস্থাসমূহ ও তাহাদের বিশেষজ্ঞগণ জড়িত রহিয়াছেন।"[৩৩১]

এর পর শেখ মুজিব তার উক্ত বিবৃতিতে কিভাবে সমগ্র শিল্পোন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে পূর্ব পাকিস্তানী শিল্পোদ্যোক্তাদের অপসারণ করে সে সকল স্থানে পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পপতিদেরকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তার অসংখ্য উদাহরণ তুলে ধরেন। এ বিবরণ থেকে দেখা যায়, সরকারী উদ্যোগে গড়ে ওঠা বড় বড় প্রকল্পসমূহ নামমাত্র মূল্যে পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পপতিদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, জনগণের চাপে স্থানীয় ক্ষুদে উদ্যোক্তাদের বিকাশের জন্য যে দু'চারটি প্রকল্প গ্রহণ করতে সরকার বাধ্য হয়েছিল সেগুলিও বাস্তবায়িত হয়নি, বরং এ সকল প্রকল্পের প্রায় সবগুলি উক্ত পশ্চিম পাকিস্তানী বড় শিল্পপতিদের চক্রান্তের সাথে সরকার যোগ দিয়ে স্থগিত কিংবা বাতিল করে দিয়েছে। এসকল পশ্চিম পাকিস্তানী বৃহৎ শিল্পপতিগণ এত বেশী ক্ষমতাধর ছিল যে, তারা দাতাসংস্থাগুলিকেও প্রভাবিত করতে সক্ষম ছিল। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের স্থানীয় ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তাদেরকে সাহায্যের জন্য যে সকল প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল, যেগুলির জন্য দাতাসংস্থার কাছ থেকে ঋণও মঞ্জুর হয়ে গিয়েছিল, সে প্রকল্পগুলিও দাতাসংস্থার শর্তারোপের কারণে বাতিল হয়ে যায় এবং শুধুমাত্র বৃহৎ উদ্যোক্তাদেরকে ঋণ প্রদান করা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। আর এ বৃহৎ উদ্যোক্তাদের মধ্যে কার্যতঃ কোন পূর্ব পাকিস্তানী ছিল না, ফলে পূর্ব পাকিস্তানভিত্তিক এ বৃহৎ প্রকল্পের ওপরও পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পপতিরা একচেটিয়া আধিপত্য করে। শেখ মুজিব তার বিবৃতিতে আরো বলেন, কর্ণফুলী কাগজ কলের মত বৃহত্তর সরকারী প্রকল্পকেও নাম মাত্র মূল্যে পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পপতির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, একজন পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পপতির কাছে তেল শোধনাগারের মত একটি লাভজনক ও অত্যাবশ্যকীয় প্রকল্পের সার্বিক মালিকানা প্রদান করা হয়েছে , বৃহৎ বৃহৎ বনভূমিকেও এ সকল শিল্পপতির কাছে ইজারা প্রদান করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, বিদেশী গবেষকদের অভিমতকে উপেক্ষা করেও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলি পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন না করে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। অর্থাৎ শেখ মুজিবের বিবৃতি অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তান সে সময় দু'টি প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল:

---

৩৩০ শেখ মুজিবের বিবৃতি; দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ই নভেম্বর, ১৯৬৪।
৩৩১ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

১. পূর্ব পাকিস্তানের আয় থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে গুরুত্বপূর্ণ সব শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হচ্ছিল ;
২. পূর্ব পাকিস্তানে যতটুকু শিল্পোন্নয়নের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছিল তার সবটুকুই পশ্চিম পাকিস্তানী বৃহৎ শিল্পপতিগণ গ্রহণ করতে পেরেছিল।

ফলে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পপতিদের বাজারে পরিণত হয়; আর এ অবস্থাকে শুধুমাত্র 'আভ্যন্তরীণ কলোনীর' সাথেই তুলনা করা যায়। পরিশেষে, শেখ মুজিব বলেন, "আমি পূর্ব পাকিস্তানের মতো পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে সমভাবে আগ্রহী। আমি একথাও জানি যে, পশ্চিম পাকিস্তানে যে সকল অর্থনৈতিক উন্নয়ন হইয়াছে, তাহার সুফল গুটি কয়েক পরিবারই ভোগ করিতেছে এবং প্রকৃতপক্ষে উহার সুফল জনসাধারণ পর্যন্ত পৌছায় নাই।"[৩৩২]

ন্যাপ ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকদ্বয়ের উপরোক্ত দু'টি বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কয়েকটি পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠে। উভয় নেতাই আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী নীতি সমালোচনা করেন, তবে শেখ মুজিব আইয়ুব সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির তীব্র সমালোচনা করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পায়নেও যে পশ্চিম পাকিস্তানীদের একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাও স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। উপরন্তু, পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের বড় শিল্পপতিদের বাজার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছিল বলেও দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করেন। অন্যদিকে, হাজী দানেশ বৈষম্যের কথা সাধারণভাবে উল্লেখ করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনেরও দাবী করেন; তবে এ তিনি বৈষম্যের সমস্যা শুধু পূর্ব পাকিস্তানীদের সমস্যা বলে চিহ্নিত করেন নি, বরং এটা পশ্চিম পাকিস্তানের আরো কয়েকটি অঞ্চলের বা জাতিসমূহের সমস্যা বলে উল্লেখ করেছেন। হাজী দানেশ পূর্ব পাকিস্তান বনাম পশ্চিম পাকিস্তান বিষয়টিকে এভাবে দেখেন নি, তিনি তীব্র শ্রেণীশোষণের জন্য বৃহৎশিল্পপতিদেরকে দায়ী করেছেন। কিন্তু তাদেরকে পূর্ব পাকিস্তানী কিংবা পশ্চিম পাকিস্তানী হিসাবে বিভক্ত করেননি। ন্যাপ সাধারণ সম্পাদক পূর্ব পাকিস্তানের নিজস্ব সমস্যা হিসাবে কোন কিছুকেই বিচার করেননি। বরং তিনি এসব সমস্যাকে শ্রেণীগত সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করেছেন। অন্যদিকে, আইয়ুব সরকারের উন্নয়ন নীতি সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শেখ মুজিব একবারও গ্রামীণ শ্রেণী বিভাজনের কথা বলেননি কিংবা আইয়ুব সরকারের সামাজিক ভিত্তি হিসাবে সে সময় গ্রামে কোন শ্রেণী-গোষ্ঠী কাজ্জ করছিল কিনা সে সম্পর্কেও শেখ মুজিব কোন কিছু বলেন নি। তার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল মূলতঃ পূর্ব পাকিস্তানী তথা বাঙ্গালী ভিত্তিক। শেখ মুজিবের বিবেচনায় প্রত্যেক পূর্ব পাকিস্তানীই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিম পাকিস্তানী বৃহৎ শিল্পপতি কর্তৃক শোষিত হচ্ছে। অন্যদিকে, হাজী দানেশের বক্তব্য অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানী মাত্রেই শোষিত হচ্ছে একথা ঠিক নয়, বরং পূর্ব পাকিস্তানী বৃহৎ বুর্জোয়া ও গ্রামীণ ভূস্বামী শ্রেণী আইয়ুবী শোষণ-নিপীড়নের সাথে যুক্ত । ফলে শুধু স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রামটা এখানে মুখ্য নয়, বরং আইয়ুব সরকার যে সকল শ্রেণীর ওপর নির্ভর করে শোষণ-নিপীড়ন চালাচ্ছে সে সকল শ্রেণীর বিরুদ্ধেও সংগ্রাম গড়ে তোলা প্রয়োজন। পরবর্তীকালে ন্যাপের ১৪ দফা এবং আওয়ামী লীগের ছয় দফার মধ্যে দুই নেতার উপরোক্ত দুই দৃষ্টিভঙ্গীরই প্রতিফলন ঘটে।

আওয়ামী লীগের ৬ দফা এবং ন্যাপের ১৪ দফা-- এ দু'টি কর্মসূচীকে তুলনামূলক পর্যালোচনা করার সমস্যা হচ্ছেঃ ৬ দফাতে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের গঠন প্রকৃতি ও ক্ষমতার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে; অপরদিকে, সমগ্র পাকিস্তানের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাকে সমাধানের লক্ষ্যে ১৪-দফা প্রস্তুত করা হয়েছে। ফলে একটি পুর্ণাঙ্গ কর্মসূচীর সাথে একটি নির্দিষ্ট ইস্যুভিত্তিক কর্মসূচীকে তুলনা করতে গেলে কিছু পক্ষপাতের সমস্যা দেখা দিতে পারে। ৬ দফাতে যেসব সমস্যাকে উপস্থাপন করা হয়েছে শুধুমাত্র সে সব বিষয়ে ১৪ দফায় যা বলা হয়েছে এখানে তারই তুলনামূলক আলোচনা করা হবে। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে আওয়ামী লীগের ৬-দফা রচিত হয়েছিল ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, অপরদিকে, ন্যাপের ১৪ দফা ১৯৬৬ সালের জুন মাসের ৪ থেকে ৭ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় রচিত হয়েছিল। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই ১৪ দফা রচনা করার সময় আওয়ামী লীগের ৬-দফাটি সামনে ছিল। এর ফলে ৬-দফায় যে সকল প্রশ্ন আলোচনা করা হয়েছিল তার প্রায় সকল প্রশ্নই ন্যাপের ১৪-দফায় আলোচিত হয়েছে।

৬-দফার ১ নং দফায় বলা হয়েছে: "ঐতিহাসিক লাহোর-প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করতঃ পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশনরূপে গড়িতে হইবে। তাতে পার্লামেন্ট পদ্ধতির সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্ত-বয়স্কের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইনসভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে।"[৩৩৩]

১৪-দফার ১নং দফায় একমাত্র লাহোর প্রস্তাবের প্রসঙ্গ ছাড়া উপরোক্ত সকল দাবীই অর্ন্তভুক্ত হয়। উপরন্তু, আইনসভাসমূহের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে বলা হয়: "(গ) পরিষদগুলিকে আইনও বাজেট পাশের পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করিতে হইবে এবং প্রেসিডেন্ট ও গভর্ণরের আইন প্রনণনের ক্ষমতা রহিত করিতে হইবে।

(ঘ) জনগণকে মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা দিতে হইবে এবং ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ কর্তক গৃহীত মানবাধিকার সনদে স্বীকৃত সকল অধিকার ভোগ করিতে দিতে হইবে।"[৩৩৪]

৬-দফার ২নং দফায় প্রস্তাব করা হয়: "ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে কেবলমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার এই দুইটি বিষয় থাকিবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় স্টেট সমূহের (বর্তমান ব্যবস্থায় যাহাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকিবে।"

উপরোক্ত বিষয়ে ১৪ দফার ১ নম্বরের 'ক' ও 'খ' উপধারায় বক্তব্য রাখা হয়। এখানেও ফেডারেশন সরকারের দাবী করা হয় এবং পাকিস্তানের উভয় অংশের পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব করা হয়। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে কোন্‌কোন্ বিষয় থাকবে সে ব্যাপারে ৬ দফার সাথে একটি মৌলিক পার্থক্য দেখা যায়। ১৪ দফায় দেশ রক্ষাও বৈদেশিক সম্পর্কসহ মুদ্রাকেও কেন্দ্রীয় সরকারের আওতায় রাখার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু ৬ দফার ৩নং এ মুদ্রার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট দু'টি প্রস্তাব করা হয়েছে। সে প্রস্তাব দু'টির একটি হচ্ছে দেশের উভয় অঞ্চলে দু'টি স্বতন্ত্র স্টেট ব্যাংক গড়ে তোলা ও তার ওপর আঞ্চলিক সরকারের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রদান করা এবং দেশের দুই অংশে সহজে বিনিময়যোগ্য আলাদা আলাদা মুদ্রার প্রচলন করা। আর ন্যাপের ১৪ দফায় যদিও মুদ্রাকে কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাধীন রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে তবু সেখানে খুব জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকতে হবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের

---

৩৩২ প্রাগুক্ত।

৩৩৩ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৮২)ঃস্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, ২য় খন্ড, পৃ. ২৬০। ৬-দফা সংক্রান্ত অন্যান্য যে সকল তথ্য এ উৎস থেকে নেওয়া হবে তার আর সূত্র নির্দেশ করা হবে না।

৩৩৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

মুদ্রা কোনভাবেই পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে না পারে। এ প্রস্তাবে কেন্দ্রে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক ও দুই প্রদেশে দু'টি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক রাখার কথা বলা হয়েছে। ৬-দফায় মুদ্রাকে যেরূপ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ১৪ দফায় সেটি সেরুপ গুরুত্ব পায় নি। শুধুমাত্র ১৪-দফার ৬নং এ পূর্ব পাকিস্তান থেকে পুঁজি পাচার বন্ধ করার কথা বলা হয়েছে। তবে সেখানেও মুষ্টিমেয় বৃহৎ শিল্পপতি ব্যবসায়ীদের শোষণমূলক কর্মকান্ডের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৬-দফায় ৪নং এ বলা হয়: "সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা-কর ধার্য্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেশন সরকারের হাতে সে ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউ এর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিক্যালী জমা হইয়া যাইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকিবে। এইভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হইবে।"

৬-দফার উপরোক্ত প্রস্তাবটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ ব্যাপারে ১৪ দফায় কিছুই বলা হয়নি। তবে ১৪ দফার ১ নম্বরের 'ক' উপধারায় যেহেতু দেশ রক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক ও মুদ্রা ছাড়া বাকি সকল বিষয় প্রাদেশিক সরকারের হাতে রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে, সেহেতু এখানে খাজনা-ট্যাক্স ধার্য্য ও আদায়ের ক্ষমতাকেও প্রদেশের অধিকারভুক্ত বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তবে সুনির্দিষ্ট ভাবে প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে তা স্বতন্ত্র একটি দফা হিসাবে আনার ফলে ৬-দফায় এটি অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কেননা, বিষয়টি এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে, যে কোন সরকারের আয়ের প্রধান উৎস এই খাজনা-ট্যাক্স। অথচ ৬-দফায় এ অধিকারের ওপর থেকেই কেন্দ্রকে বঞ্চিত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৬-দফার ৫নং এ বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে পাঁচটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবগুলি নিম্নরূপঃ

"(১) দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে;

(২) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকিবে:

(৩) ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা দুই অঞ্চল হইতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হইবে;

(৪) দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানী-রফতানী চলিবে;

(৫) ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনে বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানী-রফতানী করিবার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে"

বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করে আঞ্চলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার যে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব ৬-দফায় করা হয়েছে, যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা এবং ভাসানীর ১৯৫৫ সালের ২৪ দফাতে এ দাবী করা হলেও ১৪ দফাতে সে সম্পর্কে মূলত কিছুই বলা হয়নি। ৬-দফার ৫নং এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়েও বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে যে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ এবং বিশেষ করে কৃষক-জনতা সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তারও বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা হয়। ফলে ৫ম দফাটিও একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ একটি প্রস্তাব হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছিল।

৬-দফার ৬নং এ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার কথাকে বিবেচনা করে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারী বা রক্ষীবাহিনী গঠনের সুপারিশ করা হয়। ১৪ দফায়ও অবশ্য এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব করা হয়। ১৪ দফার ৫নং এ বলা হয় "পাকিস্তান প্রতিরক্ষা কাঠামোকে পূর্ণগঠন করিতে হইবে। প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিতে হইবে। নৌবাহিনীর সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তর করিতে হইবে।"[৩৩৫] এভাবে পূর্ব পাকিস্তানের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের প্রশ্নে কিছু কিছু কথা বলা হয়েছে সত্য, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষুদ্র জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যটি ১৪ দফায় বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। ১৪ দফার আরো একটি বিশেষ দিক হচ্ছে এই যে, পাকিস্তানের ওপর সাম্রাজ্যবাদী লগ্নি পুঁজির শোষণের অবসান, মূল ও ভারী শিল্পকে জাতীয়করণ, আয় বৈষম্য হ্রাস, বাক-স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার নিশ্চয়তা, গণতান্ত্রিক ভূমি সংস্কার, সামন্তবাদী শোষণের অবসান, বন্যা প্রতিরোধ, বন্দী মুক্তি এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথেসহ সকল ধরনের সামরিক চুক্তির অবসান ইত্যাদি। লক্ষনীয় যে, ১৯৫৭ সালে যে প্রশ্ন দু'টি আওয়ামী লীগ থেকে ন্যাপকে প্রতিষ্ঠা করে তন্মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি ছিল মুখ্য, কিন্তু ১৯৬৬ সালে ন্যাপ আর এ ব্যাপারে তার পূর্বতন দৃষ্টিভঙ্গীকে ধরে রাখতে পারেনি। এটা সত্য যে, ন্যাপ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তা আর একটি আঞ্চলিক দল থাকেনি, তা সত্ত্বেও পাঞ্জাব কেন্দ্রিক বৃহৎ শিল্পপতি ও সামরিক আমলাতান্ত্রিক পাকিস্তান রাষ্ট্রই যে তার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন জাতির বিকাশকে পরিকল্পিতভাবে বাঁধাগ্রস্ত করে চলেছিল সে বাস্তবতা তো আর সে সময় শেষ হয়ে যায়নি।

যদিও ৬-দফায় কোথাও বাঙ্গালী বা অবাঙ্গালীর প্রশ্ন একবারও তোলা হয়নি তবু সামগ্রিকভাবে ৬ দফার মধ্য দিয়ে যে রাজনীতি প্রকাশ পায় তা' পাকিস্তানের গতানুগতিক রাজনীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। তখন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের মূল কথাই ছিল শক্তিশালী কেন্দ্র গঠন। আর এ শক্তিশালী কেন্দ্র গঠন করতে গিয়ে পূর্ব পাকিস্তানসহ পাকিস্তানের অপরাপর অংশকে কিভাবে নিঃস্ব করে পাঞ্জাবকে গড়ে তোলা হয়েছিল তা পূর্বেকার অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে জানা গেছে। ৬-দফার প্রণেতাগণ বা তার সমালোচকগণ যেভাবেই চিন্তা করুন না কেন- ৬-দফা বাস্তবায়িত হলে পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার কোন আশংকা ছিল না, যা ছিল তা হচ্ছে পাকিস্তান রাষ্ট্রের শক্তিশালী কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অবসান। মুদ্রা, রাজস্ব ও কর এবং বৈদেশিক বাণিজ্য প্রদেশের হাতে চলে গেলে প্রদেশ এবং কেন্দ্রের ভিতর একটি ভারসাম্যের অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। অন্যদিকে, আধাসামরিক বাহিনী ধরনের একটি রক্ষীবাহিনীও যদি প্রদেশের হাতে থাকে তাহলে কেন্দ্র ইচ্ছা করলেও সংবিধানকে লংঘন করতে পারেনা। দ্বিতীয়ত: পাকিস্তান কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের যেসব উপাদান সে সময় খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল, সেসবের মধ্যে সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্র ছিল প্রধান। আর গোটা দেশের ওপর সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের নিরংকুশ কর্তৃত্ব ছিল বলেই তাদের ওপর ভর করে পাকিস্তানের অর্থনীতিকে গুটিকয়েক শিল্পপাতি কুক্ষিগত করতে পেরেছিল। সেদিন এ বিষয়টি ন্যাপের বামপন্থী নেতৃবৃন্দ মোটেও উপলব্ধি করতে পারেননি। তাই পাকিস্তান রাষ্ট্রের ওপর কিভাবে আঘাত হানা যেতে পারে সে প্রশ্নটি নিয়ে ঐ সময় ন্যাপ নেতৃত্ব মাথা ঘামাননি বলে মনে হয়। যদিও ৬-দফার মুখবন্ধে পাকিস্তানের সামরিক-আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রীয় শক্তিশালী রাষ্ট্রের আগ্রাসী চরিত্র সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি, বরং কেন্দ্রীয় সরকার কিভাবে মোটেই দুর্বল

৩৩৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

হবেনা সে কথাই ৬-দফার ব্যাখ্যায় বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। কিন্তু এতে যেসব প্রস্তাব করা হয়েছে সেসব কার্যকরী হলে পাকিস্তানের শক্তিশালী কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের বিপরীতে সমান্তরাল দু'টি প্রাদেশিক রাষ্ট্রের পত্তন হত। আর স্বাভাবিকভাবেই প্রাদেশিক রাষ্ট্রের শক্তি অর্জনের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ত- যা পাকিস্তানের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ভারসাম্য সৃষ্টি করতে পারত।

পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশের বিকাশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা যে বিদ্যমান কেন্দ্রীয় শক্তিশালী রাষ্ট্র এ কথা আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিল, কিন্তু যেসব শক্তির সমাবেশ ঘটলে সেদিন উক্ত শক্তিশালী রাষ্ট্রযন্ত্রকে কার্যকরভাবে আঘাত করা সম্ভব ছিল সেসব শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় কোন কর্মসূচী সেদিনের আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব প্রদান করতে সক্ষম হয়নি। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারই যে পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশ তথা পাকিস্তানের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে বড় বাধা- এ কথাটিও ৬-দফার কিংবা অন্য কোন আলোচনাতে আওয়ামী লীগ পরিষ্কার করতে পারেনি। আর তাইতো ৬-দফা কর্মসূচী নিয়ে বড় ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে ৬-দফাপন্থীদেরকে পাকিস্তানভিত্তিক অবস্থান থেকে ক্রমাগত পূর্ব পাকিস্তান ভিত্তিক অবস্থানে চলে যেতে হয়েছে।

অন্যদিক, সেদিনের বামপন্থী রাজনৈতিক মহলও ৬-দফার মর্মবস্তুকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি। তাই তারা ৬-দফাকে একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী পদক্ষেপ বলে সমালোচনা করেছে। স্বয়ং মওলানা ভাসানী ৬-দফাকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছেন এবং তিনি এটাকে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত বলে অভিমত প্রকাশ করেন।[৩৩৬] এভাবে বামপন্থীদের দ্বারা ৬-দফা সমালোচিত হলেও অচিরেই তা পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের একটি বলিষ্ঠ কর্মসূচী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং এ কর্মসূচী উত্থাপিত হওয়ার পর পরই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের এক উল্লেখযোগ্য অংশ, তথা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, উঠতি বাঙ্গালী ধনী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিকদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব উৎসাহ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।[৩৩৭] ৬-দফাকে অব্যাহতভাবে সমালোচনা করা সত্ত্বেও যখন দেখা গেল এ কর্মসূচী ক্রমাগত অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করে চলেছে তখন বামপন্থী মহল ৬-দফাকে সরাসরি গ্রহণ করে না নিলেও তারা যেভাবে ৬-দফার মর্মবস্তুকে বুঝেছিল সে অনুযায়ী তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে পরিবর্তন করে নেয়। চীনপন্থী ও মস্কোপন্থী কমিউনিস্টদের দুটি ধারাই তাদের কংগ্রেসে পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের জাতীয় মুক্তির প্রশ্নটিকে জোরালোভাবে তুলে ধরে। দু'টি ধারাই ৬-দফার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায়নি। ফলে উভয় ধারাই ৬-দফায় সরাসরি যা বলা হয়নি সেই বক্তব্য অর্থাৎ স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার রাজনীতি তুলে ধরে।[৩৩৮] উক্ত পার্টি সে সময় সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলা পুঁজিবাদ এই তিন শক্তিকে অখন্ড শক্তি হিসাবে বিবেচনা করে। বাঙ্গালীর ওপর জাতিগত নিপীড়ন চলছে তা স্বীকার করেও এ দু'টি দলই অভিযোগ করে যে, বাঙ্গালী বুর্জোয়া নেতৃরা নিজস্ব শ্রেণী স্বার্থে শুধুমাত্র অবাঙ্গালী-পুঁজিপতি কর্তৃক বাঙ্গালীর ওপর জাতিগত নিপীড়নের দিকটিই তুলে ধরছে। বাঙ্গালী-বুর্জোয়া নেতৃত্বের বিরুদ্ধে উক্ত অভিযোগ উত্থাপন করা সত্ত্বেও তাঁরা মোটেও একথা উপলব্ধি করেননি যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রই উক্ত শক্তিসমূহকে প্রতিনিধিত্ব করছে। আর সে কারণেই ৬-দফায় যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বকে দুর্বল করার কর্মসূচী তুলে ধরা হয়েছিল তাকে তারা সমর্থন করতে পারেনি। চীনপন্থীদের যে অংশ বুর্জোয়া নেতৃত্বের থেকেও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে ঘোষণা করেছিলঃ 'অবাঙ্গালী বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানকে যে হারে শোষণ করিয়াছে উহা বৃটিশ ঔপনিবেশিক শোষণকেও হার মানাইয়াছে। নিশ্চিতভাবেই ইহা ঔপনিবেশিক চরিত্রের শোষণ।[৩৩৯] তারাও ৬-দফাকে সমর্থন করেনি। বরং ৬-দফাকে পূর্ব পাকিস্তানের উঠতি পুঁজিপতি, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবীসহ পূর্ব পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণের বিকাশের ক্ষেত্রে কোন কাজেই আসবেনা বলে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়ঃ "যদি কেহ প্রশ্ন তোলেন যে, ৬-দফা কায়েমের পর অবাঙ্গালী বৃহৎ ধনীরা আর পশ্চিম পাকিস্তানে টাকা পাচার করিতে পারিবেন না, তবে তাহার জবাবে বলিতে হয় যে, আয়কর ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের সাম্রাজ্যবাদী শিল্প ও ব্যবসা- প্রতিষ্ঠানের মুনাফার যে অংশের প্রকাশ্য রেকর্ড রাখা হয়না, উহা আন্তর্জাতিক চোরা-কারবারীরপন্থায় স্বর্ণ বা বৈদেশিক মুদ্রায় বিদেশে পাচার হয়। একইভাবে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থ ৬-দফা কায়েমের পরও বাহিরে যাইতেই থাকিবে।"[৩৪০] উপরোক্ত বক্তব্য থেকে দেখা যায়, যে ধারার প্রতিনিধি হিসাবে বামপন্থী শ্রমিক নেতা আবুল বাশার উক্ত বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন সে ধারাটিও ৬-দফার মর্মবস্তুকে উপলব্ধি করতে পারেনি। আওয়ামী লীগ যে চিন্তা থেকেই ৬-দফা উপস্থাপন করুক না কেন ৬-দফা বাস্তবায়ন করতে গেলে পাকিস্তানের বিদ্যমান সেই রাষ্ট্রযন্ত্রকে আর অক্ষত রাখা চলতন; এর বিপরীতে আরো দু'টি রাষ্ট্রযন্ত্র প্রায় সমান্তরাল শক্তি নিয়ে তার দু'পাশে এসে দাঁড়াত। জেনারেল আইয়ুব খানসহ সেদিনের সামরিক আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের সাথে সম্পর্কিত সকলে এতেই ভয় পেয়েছিল। সেদিন সম্ভবতঃ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বও ভয় পেয়েছিল কারণ যে রাষ্ট্রযন্ত্রটি সেদিন বৈদেশিক পুঁজি, দেশীয় বৃহৎ পুঁজিপতি ও অন্যান্য শোষক শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করছিল সে রাষ্ট্রযন্ত্রকে দুর্বল করে তার সমান্তরাল দু'টি রাষ্ট্রযন্ত্র বিকশিত হতে পারে এমন একটি কর্মসূচী তারা উপস্থাপন করলেও সে লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে শ্রেণীসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োজন ছিল তাদেরকে সংগঠিত করার জন্য আওয়ামী লীগের কোন পরিপূরক কর্মসূচী ছিল না। একমাত্র ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে সে ধরনের একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচী উপস্থাপন করা হয়, যা ছাত্রদের ঐতিহাসিক ১১-দফা হিসাবে সবিশেষ খ্যাতিলাভ করে। তবে সে সময় বামপন্থীরা ৬-দফার তাৎপর্য উপলব্ধি না করতে পারলেও তারা যে কর্মনীতি গ্রহণ করে সেটাই ৬-দফার পরিপূরক কর্মসূচী হিসাবে কাজ করে। বিশেষত, ১৯৬৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ন্যাপ পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পর থেকেই কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তারা জোর প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। ন্যাপের সহযোগীতাকারী গোপন রাজনৈতিকদল অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি নিজের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের তাত্ত্বিক বিতর্কে লিপ্ত থাকলেও তাদের প্রায় সবাই কোন না কোন শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর মধ্যে কাজ

---

৩৩৬ দৈনিক আজাদ, ১৯শে জুলাই, ১৯৬৬।

৩৩৭ বাশার, আবুল (১৯৭০)ঃ ৬-দফা বনাম পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয়মুক্তি আন্দোলন, পাবনাঃ মোফাকখার চৌধুরী, পৃ. ২।

৩৩৮ সাবেক সিপিইপি (এম.এল)-এর দুইটি দলিল(-)ঃ পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র কর্মসূচী জনগণতান্ত্রিক পূর্ব পাকিস্তান (১৯৬৭), ঢাকাঃ প্রকাশনা বিভাগ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট লীগ, পৃ. ১১-১৩। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (১৯৭৩)ঃ দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত দলিলসমূহ, পৃ. ৬৬।

৩৩৯ বাশার, আবুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

৩৪০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-১৫।

Dhaka University Institutional Repository

করতেন। আইয়ুব সরকারের প্রতি একটি দুর্বল মনোভাব পোষণ করা সত্ত্বেও মওলানা ভাসানী পুরো ষাট দশক ধরে যুগপৎ পূর্ব পাকিস্তানের গ্রাম-গ্রামান্তর ঘুরে ঘুরে কৃষক-জনতাকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। যদিও এ কৃষক-জনতাকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে গ্রামীণ জোতদার মহাজন, এবং মৌলিক গণতন্ত্রী ও টাউটদেরকে শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, তবু এভাবে সচেতন হয়ে ওঠা গ্রামের কৃষক ষাট দশকের শেষে এসে আর শুধুমাত্র শ্রেণী দাবীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। শ্রেণী দাবীর ভিত্তিতে সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী কিংবা পেশাগত দাবীর ভিত্তিতে সংগঠিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী শেষপর্যন্ত তাদের শ্রেণী ও পেশার দাবীর মধ্যে আটকে থাকেনি।

এ সময় বিরোধী রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনটি ধারা থাকলেও দু'টিই ছিল প্রধান ধারা। পি.ডি.এম সরকারের দমননীতির সমালোচনা করলেও সেটি এমন কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়নি যে, তার কর্মসূচী জনসাধারণকে আকৃষ্ট করতে পারে। এ ধারাটি ছিল মূলতঃ নেতা সর্বস্ব। ৬-দফার প্রশ্নে দ্বিমত পোষন করে আওয়ামী লীগের একাংশ বেরিয়ে এসে পি.ডি.এম গঠন করে। তবে এ সময় এরা সকলেই স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, ন্যাপ ও বামপন্থীরা তাদের বিভক্তির পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানের জাতিগত সমস্যাকে যথাযথভাবে গুরুত্ব দিতে পারেনি। উপরন্তু, সাম্রাজ্যবাদ, আমলা মুৎসুদ্দী পুঁজিবাদ বা অন্যান্য শোষকদের স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রই যে মূল শক্তি একথা তারা উপলব্ধি করতে পারেনি। ফলে পাকিস্তান রাষ্ট্রকে আঘাত করা যেতে পারে এমন কোন কর্মসূচী তারা সুনির্দিষ্টভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। তবে ৬-দফা উপস্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে জাগরণের ভাব পরিলক্ষিত হয় তারা সে জাগরণের Populist দিকটিকেই শুধু গ্রহণ করে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন বা আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীর দিকটিকে গ্রহণ করে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে কিভাবে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকে দুর্বল করে পূর্ব পাকিস্তানসহ অন্যান্য নিপীড়িত জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে নিশ্চিত করা যায় সে বিষয়টি তাদের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়নি। তা সত্ত্বেও ১৯৬৪ সাল থেকে তাদের নেতৃত্বে সংগঠিত কৃষক, শ্রমিক ও পেশাজীবীদের আন্দোলন ছাড়া শুধুমাত্র ৬-দফা দিয়ে বাঙ্গালীর জাতীয় জাগরণ ঘটানো যেত কিনা তা মূল্যায়ণের অপেক্ষা রাখে। অন্যদিকে, শুধু কৃষক, শ্রমিক ও অন্যান্য পেশাজীবীদের আন্দোলন দিয়ে ঊনসত্তরের মত বিশাল একটি অভ্যুত্থান ঘটানো যেত কিনা তাও বিবেচনার দাবী রাখে। তবে ৬-দফাপন্থী আওয়ামী লীগ যে একাই একটি স্বতন্ত্র ধারার জন্ম দিয়েছিল এবং তার ৬-দফার অন্তর্ভূক্ত কর্মসূচী যে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির মধ্যে বাঙ্গালী-জাতীয়তাবাদী চেতনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছিল তা বলাই বাহুল্য। তবে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের বিকাশ কিংবা ঊনসত্তরের মতো একটি বিশাল রাষ্ট্র বিরোধী অভ্যুত্থান গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে জনগণের যেসব আন্দোলনপটভূমি প্রস্তুত করেছিল সেসবের কতক পরিচয় না দিলে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের কার্যকারণকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যাবে না।

৮.৯ পূর্ব পাকিস্তানে জনগণের আন্দোলনঃ ১৯৬৪-৬৮

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান পটভূমি হিসাবে যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল সে সম্পর্কে একটি পরিচয় ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে। তবে যেহেতু ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান একটি আন্দোলন সেহেতু সেটাও একটি ধারাবাহিকতার ফল। তাই সে ধারাবাহিকতাকে উল্লেখ করা এখানে খুবই প্রাসঙ্গিক। অবশ্য এক্ষেত্রে শুধু ঘটনাবলীর বিবরণের মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে না, ঘটনাবলীর সাথে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের কার্যকারণ সম্পর্কের দিকে দৃষ্টি রেখেই সে বিবরণ দেওয়া হবে। আর সে কারণেই সমগ্র আন্দোলনের বিবরণ না দিয়ে শুধুমাত্র প্রতিনিধিত্বশীল ঘটনাবলীর মধ্যে তাকে সীমিত রাখা হবে।

প্রথমেই এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, পাকিস্তান সরকার-বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে দু'টি প্রধান ধারা বিশিষ্ট ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়েছিল সে দু'টির মধ্যে বামপন্থী ধারাটি অন্যতম। গোপন কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা প্রধানতঃ ন্যাপ ও তার সাথে সম্পর্কিত গণ ও শ্রেণী সংগঠনের তৎপরতার মধ্য দিয়েই প্রতিফলিত হত। আর সে সময় গোপন কমিউনিস্ট পার্টি তার কাজের ক্ষেত্রে শ্রেণী সংগঠন ও শ্রেণী আন্দোলনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতো বলেই যে সকল শ্রেণী ও পেশাজীবী সে সময় সরকার-বিরোধী কিংবা তাদের নিজস্ব সমস্যার সমাধানকল্পে সরকারী প্রশাসন বা মালিক-বিরোধী আন্দোলনে শরিক হত এ সকল আন্দোলনের পিছনে বামপন্থীদের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। শুধু শহরে শ্রমজীবী মানুষ নয়, গ্রামের কৃষক, শহরের ছাত্র ও বিভিন্ন পেশাজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেও তাদের স্ব স্ব পেশাগত দাবী নিয়ে আন্দোলনে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা ছিল অনন্য। এছাড়া, দৈনন্দিন নাগরিক সমস্যা নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যও তারা প্রায় সব সময়ই তৎপর থাকতো।[৩৪১]

প্রত্যক্ষ সামরিক শাসনের অবসানের পর দেশের শ্রমজীবী জনতা এবং সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের নিম্ন কর্মচারিগণ পুরো ১৯৬৩ সাল ধরে তাদের শ্রেণী ও পেশাগত আন্দোলনে শরিক হন। এক পর্যায়ে এ আন্দোলন ব্যক্তি মালিকানাধীন কারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে মারাত্মক হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যখন বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী সংঘর্ষে রূপ নেয় তখন ব্যক্তি মালিকানাধীন কারখানাসমূহের শ্রমিকরাও দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটির ডাকে সাড়া দেয় এবং দাঙ্গা বিস্তারের বিরুদ্ধে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে।[৩৪২] এই ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর প্রধানতঃ দু'টি কারণে সাময়িকভাবে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনে ভাটা পড়ে ঃ

(১) প্রায় সকল মালিক অবাঙ্গালী হওয়াতে শিল্প-কারখানার অবাঙ্গালী শ্রমিকদের সাথে মালিকের শ্রেণী-বিরোধের তুলনায় বাঙ্গালীর প্রতি বিদ্বেষের প্রশ্নে তারা মালিকের প্রতি আনুগত্য বেশী অনুভব করে।

(২) অবাঙ্গালী মালিকের বিরুদ্ধে অবাঙ্গালী শ্রমিকদের অমতে আন্দোলন গড়ে তুলতে গেলে তা সাম্প্রদায়িক সংঘাতে রূপ নিতে পারে এ আশংকা বিশেষভাবে দেখা দেয়।[৩৪৩]

কিন্তু বছর শেষ না হতেই সারা দেশব্যাপী শ্রমিকশ্রেণী ও পেশাজীবীদের এক তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। প্রথমে যে সকল এলাকায় বামপন্থীদের বিশেষ অবস্থান ছিল সে সকল স্থান থেকেই শুরু হয়। ইষ্টার্ন রেলওয়ের শ্রমিক-কর্মচারী ও চট্টগ্রামের শ্রমিকরা নতুন করে এ আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়। তবে আগস্ট সেপ্টেম্বর নাগাদ তা ছোট খাটো কারখানাগুলিতেও ছড়িয়ে পড়ে। সিরাজগঞ্জের মত স্বল্প

---

৩৪১ শরদিন্দু দস্তিদার, নজরুল ইসলাম ও অজয় রায়ের সাথে লেখকের বিস্তারিত সাক্ষাৎকারের সময় উক্ত তিনজন বামপন্থী নেতা একইভাবে উক্ত অভিমত প্রকাশ করেন।

৩৪২ নূরুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎকার।

৩৪৩ শ্রমিক নেতা, বর্তমান ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা নাসিম আলী লেখকের সাথে সাক্ষাৎকার প্রদানকালে একথা বলেন।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পোন্নত শহরে প্রতিষ্ঠিত কওমী জুট মিলের শ্রমিকরা আগস্ট মাসে মালিকের বিরুদ্ধে এক জঙ্গী আন্দোলন গড়ে তোলে। যদিও তাদের দেওয়া ১০-দফা দাবীর মধ্যে অধিকাংশই তাদের শ্রেণীগত সমস্যা ছিল। তবু এ দাবীর মধ্যেও ১২(ক) ধারা বাতিলসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবী জানানো হয়।[৩৪৪]

শ্রমিকশ্রেণী শুধু যে তাদের শ্রেণীগত দাবীতেই আন্দোলন করছিল তাই নয়, ২রা সেপ্টেম্বরের সংবাদপত্রে বন্দীমুক্তির জন্য ৩৬ জন শ্রমিক নেতার এক কড়া বিবৃতি প্রচারিত হয়। এ ভাবে ধীরে ধীরে শ্রমিকশ্রেণী তাদের শ্রেণীগত ও গণতান্ত্রিক দাবী নিয়ে মাঠে নামতে থাকে। এরকম একটি পর্যায়ে ২৯শে সেপ্টেম্বর দাবী দিবসকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রামে এক সফল হরতাল পালিত হয়। আন্দোলনরত পাটকল শ্রমিকরা তাতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। সরকারের লেলিয়ে দেওয়া গুন্ডাবাহিনীকে শ্রমিক-জনতা প্রতিহিত করে।[৩৪৫] এ দিনের কর্মসূচীর আশাতীত সাফল্যে পাট শ্রমিকরা তাদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিয়ে কর্তৃপক্ষ যাতে সত্বর দাবী পূরণ করে তার জন্য চাপ দিতে থাকে। তারা ঘোষণা করে যে, সত্বর দাবী পূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলন শুরু করা হবে। পাটকল শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া পূরণের দাবীতে চট্টগ্রামের সকল শ্রমিক ৬ই অক্টোবর থেকে প্রতিদিন দু'ঘন্টা করে প্রতীক ধর্মঘট করতে শুরু করে। রেল শ্রমিকরাও এতে অংশ নেয়। এধরনের প্রতীক ধর্মঘটে ফল না হওয়ায় ১২ই অক্টোবর থেকে সমগ্র প্রদেশের চটকল শ্রমিকরা লাগাতার ধর্মঘট শুরু করে।[৩৪৬] শুধু শ্রমিকরাই নয়, সারা প্রদেশের মাধ্যমিক শিক্ষকগণ অক্টোবরের গোড়া থেকে ধর্মঘটে যান। উক্ত ধর্মঘটের সমর্থনে ৬ই অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদে সম্মিলিত বিরোধী দল কর্তৃক জোর দাবী ওঠে। তাতেও সরকার অনমনীয় থাকলে অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে শিক্ষকগণ লাগাতার অবস্থান ধর্মঘট শুরু করেন।

১২ই অক্টোবর 'বাজারে আগুন' শিরোনামে ঢাকা ও চট্টগ্রামের দু'টি সংবাদ প্রকাশিত হয়। এ ইস্যুকে কেন্দ্র করে সেপ্টেম্বরের গোড়া থেকেই ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) আন্দোলন করে আসছিল। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম কমানোর দাবীতে ন্যাপ ৬ই সেপ্টেম্বর পল্টন ময়দানে একটি জনসভা করে। এ দাবী নিয়ে মহিলারাই প্রথম আন্দোলন শুরু করেন। এরই ধারাবাহিকতা হিসাবে এ আন্দোলন করা হচ্ছে বলে জনসভায় বক্তব্য রাখা হয়।

অন্যদিকে, বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের সম্মিলিত ফ্রন্ট আইয়ুব সরকারের নির্যাতনমূলক নীতি ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বেশ জোরেসোরে আন্দোলন শুরু করে। সরকারী গণনির্যাতনের বিরুদ্ধে সকল বিরোধী দল একমঞ্চে সমবেত হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে অতিশয় উৎসাহ-উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয়। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সকল মহলের মধ্যে আন্দোলন গড়ে তোলার আগ্রহ দেখা যায়। ২৯শে সেপ্টেম্বর জুলুম প্রতিরোধ দিবস পালন উপলক্ষে হরতাল ডাকা হয়। এ হরতাল এত সফল হয় যে, সরকারকে সমর্থন জানানোর জন্য কাউকে পাওয়া যায় নি। সংবাদপত্রের শিরোনাম ছিল ঃ সমুদ্র উত্তাল জনতা তরঙ্গ কে রোখে--২৯শে সেপ্টেম্বর পল্টন ময়দানে ঐতিহাসিক গণসমাবেশ, মিছিলে মিছিলে গণবিক্ষোভের ঢেউ। এ দিনের কর্মসূচী কিভাবে পালিত হয়েছিল তা বোঝা যায় হরতালের পর পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভা সম্পর্কে রিপোর্টারের বক্তব্য থেকে। --প্রতিবেদক জনসভার বিবরণ দিয়ে লিখেছেনঃ

"এই দিন পল্টন ময়দানের বিপুল জনসমুদ্রের দিকে তাকাইয়া সত্যই এ কথা মনে করিবার উপায় ছিল না যে, ১৭ বৎসর পূর্বে পাকিস্তান অর্জনের জন্য জনগণের মধ্যে যে অভূতপূর্ব উন্মাদনা সৃষ্টি হইয়াছিল আজ এক সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতিতে আর এক মহান লক্ষ্য সাধনের জন্য জনগণের মধ্যে সেই উন্মাদনায় যেন আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।.... মিটিং শুরু হইবার অনেক আগেই আউটার স্টেডিয়াম লোকে ভরিয়া যায়, এর পর ঢাকেশ্বরী ও ডেমরা হইতে দশ হাজার শ্রমিক পায়ে হাঁটিয়া আসিয়া সভাতে যোগদান করাতে সমস্ত এলাকাতে দাঁড়ানোর জন্যও কোন জায়গা থাকেনা। ফলে হাজার হাজার দর্শক স্টেডিয়ামের একতলা ও দোতালায় দাঁড়াইয়া জনসভায় বক্তৃতা শোনে।"[৩৪৭]

এ সভার অভূতপূর্ব সাফল্যের মূলে ছিল সেদিন সরকার-বিরোধী সকল মত ও পথের লোকের মধ্যে ঐক্য। হরতাল ও জনসভার অচিন্তনীয় সাফল্যের মধ্য দিয়ে এটা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আইয়ুব সরকার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। কিন্তু সাথে সাথে এ কথাও পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, সেদিন লক্ষকোটি সাধারণ মানুষ সুনির্দিষ্ট কোন রাজনীতির সপক্ষে দাঁড়ায়নি। তবে এই কর্মসূচীর অভূতপূর্ব সাফল্যের দলে শ্রমিক-কর্মচারীসহ সকল স্তরের মানুষের মধ্যে আন্দোলনের তীব্র আগ্রহ জন্মে।

শিক্ষকরা যে ধর্মঘট করে আসছিলেন তা এক পর্যায়ে তা লাগাতার অবস্থান ধর্মঘটে রূপ নেয়। এর পর ১৪ই অক্টোবর রাত বারোটা থেকে ১ জন মহিলা শিক্ষকসহ মোট ৯ জন শিক্ষক অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। ৩ দিন পর,[৩৪৮] দু'জনকে হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয় এবং ২০শে অক্টোবর আরো দু'জনের অবস্থা আশংকাজনক পর্যায়ে পৌঁছায় এবং ২৪ তারিখে সকল অনশনকারীর অবস্থার মারাত্মক অবনতি ঘটে। তবু তাঁরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেননি। তার ২৮শে অক্টোবর সরকারের পক্ষ থেকে দাবী মেনে নেওয়ার সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর শিক্ষকগণ অনশন ভঙ্গ করে কাজে যোগ দেন।

১৯৬৪ সালের ১২ অক্টোবর সারা দেশের শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে ঢাকায় এক বিরাট শ্রমিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তার পরদিন থেকেই দেশের ৯০ হাজার পাট কল শ্রমিক তাদের নিজস্ব দাবী-দাওয়া নিয়ে লাগাতার ধর্মঘট শুরু করে। পাটকল শ্রমিকদের দাবী মেনে নেওয়ার জন্য শ্রমিক নেতারা বার বার বিবৃতি প্রদান করেন, মৌন ও সরব মিছিল করা হয়। কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে সরকার শ্রমিকদের ওপর পুলিশ ও গুন্ডাবাহিনী লেলিয়ে দেয়। এতে খুলনাতে এক মর্মান্তিক হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয়। একটানা ১২ দিন ধর্মঘট করার পরও যখন দাবী মেনে নেওয়া হয়নি তখন ব্যাপকতর আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২৫শে অক্টোবর শ্রমিকরা আবার একটি প্রতিনিধি সম্মেলন করেন। ইতিমধ্যে সারা দেশ মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচনে মেতে ওঠে। ৯০ হাজার শ্রমিকের ধর্মঘটের কথা কারো মনে ছিল না। সরকার ও বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে দোষারোপ করা শুরু হয়। কিন্তু চটকল শ্রমিকরা

---

৩৪৪ সাপ্তাহিক জনতা, ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪।

৩৪৫ সংবাদ, অক্টোবর, ১৯৬৪।

৩৪৬ উপরোক্ত তথ্যগুলি দৈনিক আজাদের বিভিন্ন সংখ্যা থেকে নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন অধ্যায়ে ব্যবহারে সুবিধার্থে উক্ত সংবাদসমূহের শিরোনাম সংযোজনী-১ এ উপস্থাপন করা হয়েছে। এর পর দৈনিক আজাদ থেকে এ ধরনের যে সকল সংবাদকে তথ্য হিসেবে ব্যবহার করা হবে সেগুলির তথ্য নির্দেশ প্রদান করা হবেনা। শুধু অন্যান্য তথ্য উৎসকেই তথ্য নির্দেশ আকারে প্রদান করা হবে।

৩৪৭ সাপ্তাহিক জনতা, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪।

৩৪৮ বামপন্থী নেতা অজয় রায় লেখকের সাথে সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে এ মতামত জানিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

ছিল অনড়। অনু কষ্টে থেকেও তারা ধর্মঘট চালিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ধর্মঘটের ৫৫ দিন অতিবাহিত হবার পর অর্থাৎ ৭ই ডিসেম্বর সরকার শ্রমিকদের সাথে সন্তোষজনক মীমাংসা করতেবাধ্য হয়। এটা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের শ্রমিক শ্রেণীর এক অভূতপূর্ব বিজয়। ঐ দিন ময়মনসিংহে অবস্থিত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধাসহ অন্যান্য দাবী দাওয়া মেনে নেওয়ায় ১৭২ দিনব্যাপী ধর্মঘটের অবসান ঘটে। উক্ত দু'টি সুদীর্ঘ ধর্মঘটে বিজয়ের ফলে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের মধ্যে উৎসাহ আরো বৃদ্ধি পায়। ৮ই ডিসেম্বর থেকে শিল্পোন্নয়ন ব্যাংকের প্রকৌশলীগণ তাদের বিভিন্ন পেশাগত দাবী-দাওয়া নিয়ে ধর্মঘট শুরু করেন। একজন ছাত্রের নিহত হওয়াকে কেন্দ্র করে ৯ই ডিসেম্বর ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়; এবং ধর্মঘট শেষে ১৪ই ডিসেম্বর সমগ্র প্রদেশে ছাত্র ধর্মঘটের আহবান জানানো হয়। ছাত্র নির্যাতনের প্রতিবাদে সকল মহল থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়। ১৪ই ডিসেম্বর সাফল্যজনকভাবে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। ১৫ই ডিসেম্বর ইপিআরটিসির কর্মচারিগণ তাদের দাবী-দাওয়া নিয়ে ধর্মঘট শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এভাবে ছাত্র, শ্রমিক-কর্মচারীসহ সারা প্রদেশব্যাপী প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট শুরু হয়ে যায়।

ঐ সময় সরকারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেওয়ার কারণে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবকে তিন মাসের মধ্যে দু'বার আটক করে মুক্তি দেওয়া হয়। তার বিরুদ্ধে কয়েকটি মামলাও দায়ের করা হয়। ইতিমধ্যে হাইকোর্ট একটি অভিযোগ নাকচ করে দেয়।

অন্যদিকে, বিপুল উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বিরোধী দলের সমর্থক মৌলিক গণতন্ত্রী প্রার্থীদেরকে জনসাধারণ নির্বাচিত করে চলেছে। প্রাথমিক হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানে শতকরা ৯০ জন এবং পশ্চিম পাকিস্তানে শতকরা ৮০ জন বিরোধী দল সমর্থক মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছে বলে খবর প্রকাশিত হয়। বিরোধী দলের মৌলিক গণতন্ত্রী সম্মেলনেও প্রায় সকল মৌলিক গণতন্ত্রীর উপস্থিতি লক্ষ্য করে স্বয়ং আইয়ুব খান ঘাবড়ে যান এবং আবার বিপ্লব ঘটে যেতে পারে বলে হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন। শুধু তাই নয়, তিনি বিরোধী দলসমূহের নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে খুবই বিরূপ মন্তব্য করতে থাকেন। শেখ মুজিব আয়ুবের সকল মন্তব্যের কড়া জবাব দেন। ৯ নভেম্বর আইয়ুবের বিপ্লব ঘটে যাওয়ার হুমকির জবাবে শেখ মুজিব বলেনঃ "দেশে পুনরায় বিপ্লব ঘটলে আইয়ুব খানই দায়ী হইবেন"।

বিপুল সংখ্যাধিক্যে বিরোধী দলীয় প্রার্থিগণ মৌলিক গণতন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার পরও দেখা যায় ১৯৬৫ সালের ২রা জানুয়ারি অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জেনারেল আইয়ুব খান সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। তখন সকলের মনেই এ উপলব্ধি হল যে, আইয়ুব খানের সংবিধান বহাল থাকলে তাকে কোনভাবেই কখনও নির্বাচনের মাধ্যমে পরাজিত করা যাবে না।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের এ ফলাফল বিরোধী দলের কারো পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। বরং দেশব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় ওঠে, যাকে আইয়ুব সরকার নির্মমভাবে দমন করতে থাকে। জনসাধারণের বিভিন্ন অংশ আবারও আন্দোলনের সূত্রপাত করে।

পশ্চিম পাকিস্তানের হায়দ্রাবাদের ছাত্ররা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। তাঁরা ১১ই জানুয়ারী থেকে সরকারী দমননীতির বিরুদ্ধে লাগাতার ধর্মঘট শুরু করে। ২০ তারিখ পর্যন্ত ধর্মঘট করেও যখন অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নি তখন তারা ৩০শে জানুয়ারি থেকে অনশন ধর্মঘট শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ কর্মসূচী পালন উপলক্ষে সারা পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্ররা ২৬শে জানুয়ারি কালো দিবস পালন করে। ৩০শে জানুয়ারি থেকে ছাত্রদের অনশন ধর্মঘট দু'দিন চলার পর করাচীর কয়েকজন ছাত্রের অবস্থা আশংকাজনক বলে খবর প্রচারিত হয়।

পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্রদের আন্দোলন চলাকালেই পূর্ব পাকিস্তানের মেডিক্যাল ছাত্ররা তাদের দাবী দাওয়া নিয়ে ধর্মঘট শুরু করে। জানুয়ারি মাসের ২৪ তারিখ চতুর্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীরা সরকারের কাছে এক বিরাট দাবীনামা পেশ করে। ২৮শে জানুয়ারি পাকিস্তান অবজার্ভারের কর্মচারীরা তাদের দাবী-দওয়া পূরণের লক্ষ্যে ধর্মঘট শুরু করেন। এ সময় বড় ধর্মঘটটি শুরু হয় ১৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে। ১৬ তারিখে তারা ধর্মঘট শুরু করার পর তার বিভাগের কর্মচারিগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে ২২শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে দাবী পূরণ করা না হলে ২৩ শে ফেব্রুয়ারি থেকে তারাও লাগাতার ধর্মঘট শুরু করবে। তার বিভাগেয় কর্মচারীরা ২১শে ফেব্রুয়ারি এক দিনের প্রতীক ধর্মঘট পালন করে। ডাক বিভাগের কর্মচারীদের ধর্মঘটের অষ্টম দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও সরকার দাবী মেনে নেয় নি কিংবা আলোচনায় বসে নি। বরং তাদেরকে কাজে যোগদানের নির্দেশ দেয় এবং এ নির্দেশ অমান্য করলে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হবে বলে হুমকি প্রদর্শন করে। এতেও ডাক কর্মচারীরা ধর্মঘট অব্যাহত রাখে; ফলে ডাক বিলির জন্য সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করতে হয়। ২৫শে ফেব্রুয়ারি থেকে পাকিস্তানের উভয় অংশের তার কর্মচারীরাই ধর্মঘট শুরু করে। ডাক বিভাগের কাছে সেনাবাহিনী নিয়োগের কারণে জরুরী যে সকল কাজ এতদিন কর্মচারীরা করে চলেছিল তাও বন্ধ হয়ে যায়। এতে সকল প্রদেশের ডাক ব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। ২৬শে ফেব্রুয়ারি প্রদেশের বৃহত্তম শ্রমিক সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক পরিষদ ডাক বিভাগের কর্মচারীদের ধর্মঘটকে সমর্থন করে বিবৃতি দেয়। পূর্ব পাকিস্তানে ডাক ও তার বিভাগীয় কর্মচারীদের ধর্মঘট অব্যাহত থাকলেও পশ্চিম পাকিস্তানের তার বিভাগীয় কেরানীরা ২৫শে ফেব্রুয়ারী ধর্মঘট প্রত্যাহার করার ঘোষণা দেয়। তবে তারা ধর্মঘট প্রত্যাহার করার ঘোষনা দিলে ১লা মার্চ পর্যন্ত সেখানেও ধর্মঘট অব্যাহত থাকে। অপর দিকে, পূর্ব পাকিস্তানী ডাক ও তার বিভাগীয় কর্মচারিগণ ১লা মার্চ ঘোষণা করেন দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট চলবে। শেষ পর্যন্ত বহু ধরনের হুমকি ও চাপ উপেক্ষা করে তারা তাদের ধর্মঘট অব্যাহত রাখে। তবে কিছু কিছু দাবী মেনে নিলে ৪ঠা মার্চ তার বিভাগীয় কর্মচারিগণ তাদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করে। এ পর্যায়ে ৬ই মার্চ ডাক বিভাগীয় কর্মচারিগণ তাদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। পূর্ব পাকিস্তানের তার বিভাগীয় কর্মচারীদের কিছু দাবী মেনে নেওয়ায় পশ্চিম পাকিস্তানের তার বিভাগীয় কর্মচারীরা তাদের দাবী মানার জন্য আহবান জানায় এবং একই সাথে দাবী না মানলে ধর্মঘট শুরু করার নোটিশ প্রদান করে। পূর্ব পাকিস্তানের ডাক কর্মচারীরাও ১১ই মার্চ ঘোষণা করে যে, তাদের দাবী-দাওয়া না মানলে ২৮শে মে থেকে আবারও ধর্মঘট শুরু করা হবে। ১৭ই মার্চ পশ্চিম পাকিস্তানের তার বিভাগীয় কর্মচারীদের কিছু দাবী মেনে নিলে তারা তাদের ধর্মঘটের নোটিশ প্রত্যাহার করে নেয়।

মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের চালনা ও চট্টগ্রামের সমুদ্র বন্দর শ্রমিকরা তাদের দাবী-দাওয়া নিয়ে ধর্মঘট শুরু করে। ফলে দু'টি বন্দরের কাজকর্মের ব্যবস্থাপনা ভেঙ্গে পড়ে। তাদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েও যখন সমস্যার কোন সুরাহা হয়নি তখন আলাপ -আলোচনার মাধ্যমে তাদের কিছু দাবী মেনে নেওয়া হলে ১৬ই মার্চ ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত ক্ষেত্রেই নয়, ঢাকা জুট মিল, ঢাকেশ্বরী কটন মিলসহ অসংখ্য মিল-কারখানায় এসময় ধর্মঘট শুরু হয়ে যায়। সারা দেশের ধর্মঘট পরিস্থিতির ওপর ৩০শে মে দৈনিক আজাদের এক রিপোর্টে যে চিত্র তুলে ধরা হয় তাতে দেখা যায়, সারা প্রদেশের শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থা একেবারে বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়ে পড়েছে।

ডাক ও তার বিভাগের কর্মচারীদের ধর্মঘটের পর যে ধর্মঘটটি সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা হচ্ছে রেল কর্মচারী ধর্মঘট। এরা ১৯৬৫ সালের প্রথম দিক থেকেই মাঝে মাঝে প্রতিবাদসভা, প্রতীক ধর্মঘট, বিবৃতি ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের দাবী-দাওয়া পেশ করতে থাকে। অন্যদের থেকে রেল কর্মচারীদের আন্দোলনের একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, তারা দাবী আদায়ের জন্য ধর্মঘট শুরুর একমাস আগে থেকেই ছোট ছোট কর্মসূচী পালন করতে থাকে। ২৪শে এপ্রিল দাবি আদায়ের জন্য সংগ্রাম দিবস পালন করে। ঐদিন তারা ১১ দফা দাবী উত্থাপন করে ব্যাপক প্রচারে নামে এবং এর সমর্থনে তারা বিভিন্ন স্থানে সভা ও শোভাযাত্রা করে। ২৯শে এপ্রিল দেশের বিশিষ্ট ৩৩ জন শ্রমিক নেতা তাদের দাবীকে সমর্থন করে সংবাদপত্রে বিবৃতি দেন। ৭ই মে তারা সর্বপ্রথম ঘোষণা করে দাবী দাওয়া মেনে না নিলে ২৭শে মে থেকে ধর্মঘট শুরু করা হবে। সরকার রেল কর্মচারীদের সাথে কোন আলোচনায় না বসে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়াস পায়। তা সত্ত্বেও ২৭শে মে থেকে রেল কর্মচারীদের লাগাতার ধর্মঘট শুরু হয়ে যায়। হাজী দানেশ ও শেখ মুজিবের মত রাজনৈতিক নেতারাও রেল শ্রমিকদের সমর্থনে এগিয়ে আসেন এবং তাদের ন্যায্য দাবী মেনে নিয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা নিরসনের আহবান জানান। রেল শ্রমিকরা নির্যাতন ভোগ করা সত্ত্বেও আপোস করেনি এবং শেষ পর্যন্ত তাদের সাথে আলোচনায় বসতে সরকার বাধ্য হয়। কিন্তু ১৯৬৫ সনের সেপ্টেম্বরে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হওয়ায় রেল কর্মচারীদের দাবী আদায়ের সংগ্রাম দীর্ঘ দিন স্থগিত থাকে।

সে যাহোক, পাক-ভারত যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ বিভিন্ন দাবীতে অনবরত ধর্মঘট ও আন্দোলন করতে থাকে। তাদের মধ্যে পরিবহন শ্রমিক, কারখানা শ্রমিক, অফিস-আদালতের কর্মচারী ইত্যাদিই প্রধান। ৭ই মে দেশের তিনটি হাসপাতালের ৮০ জন স্টাফ নার্স দাবী পুরণ না হলে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এভাবে বিভিন্ন স্তরের মানুষ ধর্মঘট ও প্রতিবাদ সংগ্রামে সামিল হয়। অন্যদিকে, বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহ বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের এ আন্দোলনের সাথে সংহতি প্রকাশ করে বিবৃতি দেয়। আর সরকারী দল এসবকে ষড়যন্ত্রমূলক কাজ বলে অভিহিত করতে থাকে। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় পরিষদে বিরোধী দলীয় সদস্যগণ এসব আন্দোলনের সপক্ষে জোরালো সমর্থন ব্যক্ত করেন। সংবাদপত্রসমূহও এ সময় সরকারের অব্যাহত চাপ ও হুমকি প্রদর্শনকে অগ্রাহ্য করে স্বাধীনভাবে সংবাদ পরিবেশন অব্যাহত রাখে। সরকারী দল এতে এতটা অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে যে, ১৯৬৫ সালের ১৮ই জানুয়ারি তারা প্রকাশ্যে চারটি দৈনিক সংবাদপত্র ও 'অবাধ্য' সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে দাবী জানায়। সরকারী দল এরূপ গণবিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করলে তার মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। ২০শে জানুয়ারি একজন পার্লামেন্টারী সেক্রেটারীসহ ৮জন সরকার দলীয় সদস্য বিরোধী দলের পক্ষে ভোট দেয়। এসব মিলে সরকারী দলের অভ্যন্তরে ব্যাপক কোন্দল সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন স্তর থেকে প্রতিবাদী কর্মীদের বহিষ্কার করা শুরু হয়। ১৯৬৫ সালের ১লা মার্চ এক সাথে ২১ জন সদস্যকে বহিষ্কার করা হয়। তার পর দিন আরো ১৫ জনকে বহিষ্কারের সংবাদ কাগজে প্রকাশিত হয়। এ পর্যায়ে সরকারী দলে শুদ্ধি অভিযান শুরু করা হয়। ৪ঠা মে তারিখে শৃংখলা ভঙ্গের অভিযোগে কনভেনশন মুসলিম লীগ থেকে এক সাথে ৯৯ জনকে বহিষ্কার করার সংবাদ প্রচারিত হয়।

এদিকে শ্রমিক-কর্মচারী সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনারও ব্যাপক প্রসার ঘটতে থাকে। মে দিবস উপলক্ষে ৩রা মে পল্টন ময়দানে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এসভায় শ্রমিক-কর্মচারীরা ঘোষণা করে যে, দাবী আদায় না হলে প্রতিটি দিনই মে দিবসে পরিণত হবে।

ইতিমধ্যে, ১৩ই জুন ন্যাপ ছাড়া সকল বিরোধী দলীয় পরিষদ সদস্য মিলে 'ইউনাইটেড পার্লামেন্টারী পার্টি' গঠন করে। ন্যাপ তাদের আলাদা অস্তিত্ব বজায় রাখে। জাতীয় পরিষদে সরকারের অগণতান্ত্রিক কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে সকল বিরোধী দলীয় সদস্যগণ খুবই গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেন। তবে কাশ্মীর ও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যখন তীব্র বাক যুদ্ধ শুরু হয় তখন দেশে এমন একটা অস্থিরতার জন্ম হয় যে, সমস্ত মনোযোগের কেন্দ্র বিন্দু হয়ে পড়ে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যেকার সম্পর্ক।

পাক-ভারত যুদ্ধ যে ইস্যু নিয়ে সংঘটিত হোক না কেন, পাকিস্তানের উভয় অংশের মানুষ, বিশেষত মুসলমান জনসাধারণের কাছে এটা ছিল একটি ন্যায়-যুদ্ধ। এ যুদ্ধের সময় এমন এক জনজাগরণ লক্ষ্য করা যায়, যা অজয় রায়ের ভাষায় ছিল এক এধরনের অভ্যুত্থান।[৩৪৮] ভারতের বৃহৎ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যে সেদিন পাকিস্তানীরা টিকে ছিল তার মূলে ছিল জনসাধারণের স্বতস্ফূর্ত ও সক্রিয় সমর্থন। সাধারণ মানুষের মধ্যে সেদিন সৃষ্টি হয়েছিল এক অভূতপূর্ব ঐক্যবোধ। সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সেদিন গোটা পাকিস্তানবাসী ভারতের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। সে এক বিস্ময়কর ঘটনা। যদিও সে সময় ভারত পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করেনি, তবু ভারতের আক্রমণের আশংকায় যেভাবে হাজার হাজার মানুষ আনসার-মুজাহিদ বাহিনীতে নাম লেখাতে শুরু করে তা সত্যিই আশ্চর্যের বিষয়। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ২০ লক্ষ স্বেচ্ছাকর্মী বেসামরিক দেশ রক্ষা ট্রেনিং লাভের জন্যে ভর্তি হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে এ সংখ্যা ছিল ৩৫ লক্ষ।[৩৪৯]

কিন্তু এ যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর যখন দেখা গেল পূর্ব পাকিস্তান ভারতের করুণার ওপরই রক্ষা পেয়েছে; পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করার ব্যাপারে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের কোন প্রস্তুতিই ছিল না, তখন খুব দ্রুততার সাথেই আইয়ুব সরকারের দেশপ্রেমের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের সমস্ত আবেগ নিঃশেষ হয়ে যায়। আর সে কারণেই দেখা যায় সকল রাজনৈতিক দলের কিংবা জোটের ১৯৬৫ সালের যুদ্ধ পরবর্তী কর্মসূচীগুলির মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা, নৌবাহিনীর সদরদপ্তর স্থানান্তর, অস্ত্র কারখানা নির্মাণ ইত্যাদি দাবী অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। তবে পাক-ভারত যুদ্ধের বেশ কিছুদিন আগে থেকেই দেশে তীব্র ভারত-বিরোধী প্রচারণা শুরু হয়। দুঃখের বিষয় এই যে, সে প্রচারণার সাথে ন্যাপের মত একটি বাম রাজনৈতিক দলও শামিল হয়ে পড়ে। যুদ্ধের সময় তো বটেই, এমন কি তার পরও ন্যাপের মূল নেতৃত্ব আইয়ুব সরকারের প্রতি এক ধরনের কৃতজ্ঞতাসূচক মনোভাব প্রদর্শন করতে থাকে। এ যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বিশ্বে নতুন মেরুকরণের আভাস পাওয়া যায়, তার প্রতিফলন হিসাবেই সম্ভবত দেশে এমনটা ঘটে। যখন পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে মাঝে মাঝে সীমান্ত সংঘর্ষ ও প্রচন্ড বাক যুদ্ধ চলছে সে রকম একটি সময় তথা ৩০শে মে রাশিয়া স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে পাক-ভারত

৩৪৯ দেহলবী, শাহেদ আহমদ (১৯৬৬)ঃ পাক ভারত যুদ্ধ- কয়েকটি বিশিষ্ট দিক, ঢাকাঃ পাকিস্তান পাবলিকেশনস, পৃ. ৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধে রাশিয়া কখনও ভারতের পক্ষ অবলম্বন করবে না। অন্যদিকে, চীন তো বরাবরই পাকিস্তানকে সমর্থন করতে থাকে। আর বড় রকমের সীমান্ত সংঘর্ষ আরম্ভ হলে পাকিস্তান বাহিনী যখন প্রবলভাবে ভারতীয় বাহিনীর ওপর হামলা চালায় তখন তথা ৫ই সেপ্টেম্বর চীন সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের ভূমিকা চীন সমর্থন করে। সুকর্ণের নেতৃত্বে ইন্দোনেশিয়ার তৎকালীন সরকারও আরো কড়া ভাষায় ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের ভূমিকাকে সমর্থন করে। ফলে আন্তর্জাতিকভাবে সমীকরণটা দাঁড়ায়ঃ ভারতের পক্ষে আমেরিকা ও পুঁজিবাদী দুনিয়া, আর পাকিস্তানের পক্ষে সমগ্র সমাজতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল বিশ্ব। আন্তর্জাতিকভাবে এ মেরুকরণের ফলে সরকার, সমগ্র জনসাধারণ, পাকিস্তানবাদী সকল রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীর সাথে বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীরাও যখন ভারত ও মার্কিন বিরোধী প্রচন্ড প্রতিবাদমুখর সে রকম একটি সময়ে আওয়ামী লীগ ছিল একেবারে নীরব। উপরন্তু, যুদ্ধ শেষ হওয়ার মাত্র ২ সপ্তাহের মধ্যে তারা তাদের কার্যকরী কমিটির সভায় প্রস্তাব উত্থাপন করে যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দৃঢ়তর করতে হবে। তারা এ প্রস্তাবে আরো উল্লেখ করে যে, নেহাত ভারত পূর্ব পাকিস্তানকে আক্রমণ করেনি বলেই পূর্ব পাকিস্তান রক্ষা পেয়েছে।

যে সময় সারা পাকিস্তানে ভারত ও মার্কিন বিরোধিতার জোয়ার বইছে সে রকম একটা সময়ে আওয়ামী লীগের এ প্রস্তাব যেন হঠাৎ করেই সচেতন জনগোষ্ঠীর মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। জনসাধারণ নতুন করে ভাবতে শুরু করে। মাওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের এ ঘোষণা সম্পর্কে প্রথম প্রকাশ্য প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তিনি পাক-ভারত যুদ্ধের পর পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করে এসে এক প্রকাশ্য জনসভায় তার অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে ঐ যুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও জনগণের বীরত্বপূর্ণভূমিকার বিবরণ দেন। সেই সাথে তিনি জাতীয় ঐক্যের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দেন এবং এ প্রশ্নে যারা দ্বিমত পোষণ করেন তাদেরকে তিনি তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন। যদিও তিনি কোন ব্যক্তি বা দলের নাম উচ্চারণ করেননি তবু তার ভাষা থেকে এটা খুবই পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, এ সকল কথা আওয়ামী লীগকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে। উক্ত জনসভায় মার্কিনের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করা হয় এবং প্রকাশ্যে ভারতের পক্ষ অবলম্বন করায় মার্কিনের প্রতি প্রচন্ড ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। এর তিন সপ্তাহ পর অর্থাৎ নভেম্বর মাসের ১০ তারিখে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। সভার বক্তারা সাধারণভাবে ভারতের সমালোচনা করেন এবং পূর্ব পাকিস্তান কিভাবে যুদ্ধের সময় একেবারে প্রতিরক্ষাহীন অবস্থায় ছিল তার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেন। এ জন্য বক্তারা কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করেন এবং তীব্র ভাষায় তার সমালোচনা করেন। সেই সাথে তারা মওলানা ভাসানীর নাম উল্লেখ না করলেও জাতীয় ঐক্যের শ্লোগানকে ভুয়া শ্লোগান হিসাবে আখ্যায়িত করেন। ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে চীনা সাংবাদিকদের এক প্রতিনিধি দল পাকিস্তানে শুভেচ্ছা সফরে আসেন। চীনা কর্মকর্তা ও সাংবাদিকরা এ উপলক্ষে ১লা ডিসেম্বর থেকে পরবর্তী সপ্তাহের প্রতিদিন যে কোন সংকটের সময় চীন পাকিস্তানের পাশে সব সময়ই থাকবে বলে অভিমত প্রকাশ করেন এবং তা বড় বড় শিরোনামে সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশ পায়। সব মিলিয়ে দেশে চীনের প্রতি এক ধরনের অন্ধ আনুগত্যের ভাব প্রকাশিত হতে থাকে। তবে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যে সত্যিই দুর্বল এ কথাটি সাধারণ জনগণতো বটেই, এমনকি পাকিস্তানবাদী অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের কাছেও পরিষ্কার হয়ে ওঠে। ফলে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান স্বয়ং ১৯৬৫ সালের ২৫ শে ডিসেম্বর ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ়তর করার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। আইয়ুবের মুখ থেকে এ ঘোষণার ফলে একদিকে যেমন আওয়ামী লীগের বক্তব্যের স্বীকৃতি মিললো, অন্যদিকে, তেমনই ন্যাপের প্রথম একটি রাজনৈতিক পরাজয় ঘটলো।

১৯৬৬ সালের ১৩ই জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর শত্রু সম্পত্তি সংক্রান্ত এক নির্দেশনামা জারী করেন। এর ফলে প্রদেশের হিন্দুরা বটেই, সচেতন রাজনৈতিক মহল ও ছাত্র সমাজের মধ্যে আরেক দফা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এ সময় সরকার সমর্থিত গুন্ডাদের প্রতাপ প্রচন্ড আকারে বৃদ্ধি পায়। এরকম একটি পর্যায়েই শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন দাবী করে এবং তার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে এক দীর্ঘ বিবৃতি প্রদান করেন। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি উক্ত বিবৃতি প্রদান করার পর দিন শেখ মুজিব অপর একটি বিবৃতিতে দেশের সমস্যাকে পাশ কাটাবার লক্ষ্যে জনসাধারণের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ফেরানোর অপচেষ্টা চলছে বলে সরকারকে অভিযুক্ত করেন। তিনি এ বিবৃতিতে শান্তির বিরুদ্ধে যে কোন চক্রান্ত সম্পর্কে জনসাধারণকে সতর্ক থাকার আহবান জানান। ১০ই ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব লাহোরে গিয়ে সাংবাদিকদের সাথে এক সাক্ষাৎকারে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। পর দিন অনুষ্ঠিত হয় ঐতিহাসিক লাহোর সম্মেলন যেখানে শেখ মুজিব তার ৬ দফা দাবী আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপন করেন এবং আইয়ুব সরকার ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে কোটারী সৃষ্টির অভিযোগ উত্থাপন করেন।

৬-দফা উপস্থাপনের পর থেকেই সরকারী দলসহ বিভিন্ন মহল থেকে সমালোচনার ঝড় ওঠে। স্বায়ত্তশাসনের দাবী করেছিল এমন একটি দল তথা কাউন্সিল মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দও ৬-দফাকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করে এবং এ কর্মসূচী পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেন।

ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের মার্কসবাদী অধ্যাপক ডঃ আবু মাহমুদ সরকার সমর্থক এন,এস,এফ-এর গুন্ডাবাহিনী কর্তৃক প্রহৃত হওয়ায় ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহলে তীব্র প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ছাত্ররা প্রচন্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ ওসমান গনির পদ ত্যাগ দাবী করে। ১৬ই ফেব্রুয়ারি ছাত্র সমাজের বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয় এবং ২২শে ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী ধর্মঘটের আহবান জানানো হয়। সকল মহল থেকে এ ধরনের ন্যক্কারজনক ঘটনার নিন্দা জ্ঞাপন করা হয় এবং অপরাধীদের সমুচিত শাস্তি দাবী করা হয়। ডঃ মাহমুদের উপর হামলাকারীদের গ্রেফতার করা যায়নি বলে খবর প্রকাশিত হলে শেখ মুজিব বিবৃতি দিয়ে অভিযোগ করেন যে, সরকার ইচ্ছা করেই এসব অপরাধীদের গ্রেফতার করছে না, অথচ বলা হচ্ছে তাদের গ্রেফতার করা যায়নি। তিনি আরো বলেন, ডঃ মাহমুদকে প্রহারকারী গুন্ডাদল সম্ভবতঃ লাট ভবনে আশ্রয় নিয়েছে। যেদিন শেখ মুজিব ডঃ মাহমুদের উপর হামলার বিষয়ে উক্ত বক্তব্য রাখের ঠিক ঐ দিনই তিনি ৬-দফা সংক্রান্ত বিভিন্ন মহলের সমালোচনার জবাবে এক দীর্ঘ বিবৃতি প্রদান করেন। এভাবে শেখ মুজির সকল রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে ৬-দফাকে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগী হন। আসলে ৬-দফা কর্মসূচী উত্থাপনের পর শেখ মুজিব নিজেই এক বহুল আলোচিত ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। সংবাদপত্রসমূহও বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে শেখ মুজিব সম্পর্কিত খবরাখবর প্রকাশ করতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে, এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত শিক্ষক প্রহারকে কেন্দ্র করে প্রতিদিন প্রচন্ড ধরনের ছাত্র বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ১৮ই ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬৩ জন শিক্ষক প্রেসিডেন্টের নিকট তারবার্তা প্রেরণের মাধ্যমে শিক্ষক প্রহারের ব্যাপারটি তদন্তের জন্য বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠনের দাবী জানান। অথচ এর উত্তরে সরকার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে, বর্তমান অবস্থায় তদন্ত কমিশন গঠন আইনসঙ্গত নয়। এ সকল সংবাদ নির্ভয়ে পরিবেশন করার দায়ে দৈনিক আজাদের জামানত তলব করা হলে বিভিন্ন মহল থেকে এর তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। আওয়ামী লীগ এজন্য সরকারের প্রতি তীব্র নিন্দাজ্ঞাপন করে। প্রাদেশিক পরিষদের বিরোধী দলীয় নেতাও এর প্রতিবাদ জানান। এঘটনাটি ছোট হলেও এটি শিক্ষক প্রহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনকে আরো জোরদার করে তোলে। ২২শে ফেব্রুয়ারি সারা প্রদেশব্যাপী শিক্ষক প্রহারের প্রতিবাদে পূর্ণ ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। সরকারের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করার ফলে ১লা মার্চ আবারও ঢাকায় পূর্ণ ছাত্র ধর্মঘট পালন করা হয়। এ পর্যায়ে রাজনৈতিক অঙ্গন অত্যন্ত গরম হয়ে ওঠে। এসময় জাতীয় পরিষদের বিরোধী দলীয় একজন সদস্য ৬-দফার অনুকরণে ফেডারেল রাষ্ট্র ও পার্লামেন্টারী সরকার গঠনের জন্য নোটিশ প্রদান করেন। এমন একটি সময়ে জাতীয় পরিষদে এ নোটিশ প্রদান করা হয়, যখন ছাত্র-শিক্ষকদের প্রবল বিক্ষোভ ছাড়া আরো কিছু ঘটনা ঘটে। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের ১২ হাজার অটোরিক্শা চালক তাদের ২১ দফা দাবীর ভিত্তিতে ১৫ই ফেব্রুয়ারি থেকে লাগাতার উধর্মঘট শুরু করে। উক্ত ধর্মঘট চারদিন পালন করার পর কতক প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। কিন্তু সরকার তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করায় ১লা মার্চ থেকে তারা আবারও ধর্মঘট শুরু করে। রিক্শাচালকরাও তাদের সাথে যোগ দেয়। এদিকে শিক্ষক প্রহারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আন্দোলন ভাইস চ্যান্সেলর বিরোধী আন্দোলনে রূপলাভ করে। ১লা মার্চ ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ ওসমান গনীর অপসারণের দাবীতে ঢাকা শহরের ছাত্ররা পূর্ণ ধর্মঘট পালন করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আশংকাজনক পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি নাগরিক কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু এতেও পরিস্থিতি মোটেই শান্ত হয় নি, বরং ৭ই মার্চ ঢাকায় আবারও পূর্ণ ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। এরকম একটি উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ৬-দফা সম্পর্কে তার প্রথম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। ১৯৬৬ সালের ৮ই মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করেন যে, পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার কায়েম হলে দেশে পুনরায় রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেখা দেবে। সেই সাথে তিনি ৬-দফার সরাসরি উল্লেখ না করে সুকৌশলে তার সমালোচনা করেন। কিন্তু এর ১০ দিন পর আইয়ুব খান সরাসরি ৬-দফাকে আক্রমণ করেন। তিনি ৬-দফাপন্থীদেরকে দেশের সংহতি বিনষ্টকারী বলে উল্লেখ করেন এবং এদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার জন্য জনগণের কাছে আহবান জানান এবং সদর্পে ঘোষণা করেন, ৬-দফা প্রস্তাব কোনক্রমেই বাস্তবায়িত হতে দেওয়া হবে না।

এ সময় সরকারী দলের পূর্ব পাকিস্তানী নেতাদের মধ্যে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। ফজলুল কাদের চৌধুরী ও খান এ সবুরের মধ্যে এ বিরোধ প্রকট রূপ ধারণ করে । এ দ্বন্দ্ব ১২ই মার্চ সংবাদপত্রসমূহেও প্রকাশিত হয়। এর ৭ দিন পর ফজলুল কাদের চৌধুরীকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। বহিষ্কৃত হয়ে ফজলুল কাদের চৌধুরী বিবৃতি দিয়ে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, যে দেশে বাক স্বাধীনতা ও ভোটদানের অধিকার নেই সে দেশে সবই সম্ভব।

এ দিকে শেখ মুজিবের ৬-দফার প্রতি বিভিন্ন মহল থেকে সমর্থনের খবর ঘন ঘন প্রকাশ হতে থাকে। শুধু পূর্ব পাকিস্তানে নয়, পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতাও পৃথক পৃথক বিবৃতির মাধ্যমে ৬-দফার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। ১৭ই মার্চ অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে ৬-দফা কর্মসূচী বিপুলভাবে সমর্থিত হয় এবং আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসাবে শেখ মুজিব বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

ইতিমধ্যে ৬-দফায় বিরুদ্ধে সরকারের মন্ত্রীরা ব্যাপক অপপ্রচার শুরু করেন। তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো শেখ মুজিবের ৬-দফার প্রতি চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। মার্চ মাসের পর থেকে তিনি বিভিন্ন জনসভা ও আলোচনায় এ চ্যালেঞ্জ বার বার ঘোষণা করেন। শুধু ভুট্টো নন, পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভনর মোনয়েম খান সহ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার সদস্য সরকারী দলের যে নেতাই তখন বক্তৃতা দিতেন তাদের সবাই শেখ মুজিব এবং তার ৬-দফার কঠোর সমালোচনা করতেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সুরে সুর মিলিয়ে তাঁরা বলতেন ৬-দফা বাস্তবায়িত হলে দেশে গৃহযুদ্ধ শুরু হবে। সরকারী দলের এই ধরনের উৎকট প্রচার দেখে পিডিএম-এর দুই শীর্ষ নেতা আতাউর রহমান খান এবং ফরিদ আহমদ বিরক্ত হয়ে ২৩শে মার্চ সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে বলেনযে, সরকার আসল সমস্যা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য গৃহযুদ্ধ ও বৃহত্তর বঙ্গের ধুয়া তুলছে। এর উত্তর দিতে গিয়ে ১০ই এপ্রিল পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় সবুর খান ঘোষণা করেন: গৃহযুদ্ধের হুমকি সকল বিরোধী দলের জন্য প্রযোজ্য নয়।

আওয়ামী লীগ ২২শে মার্চ সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে ভুট্টোর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে। শেখ মুজিব সারা দেশব্যাপী ৬-দফা কর্মসূচীকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য ব্যাপক সফর শুরু করেন। ৬ই এপ্রিল প্রকাশিত এক সংবাদে শেখ মুজিবের দেড় মাসব্যাপী এক দীর্ঘ সফরসূচীর সংবাদ জানা যায়। এ সফরসূচীতে বের হয়ে শেখ মুজিব কয়েকবার বন্দী হন এবং প্রতিবারই ছাড়া পান। পর পর খুব দ্রুত ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি খুব আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়। ছাত্র, শ্রমিক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবীসহ সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে শেখ মুজিবের প্রতি এ ধরনের আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয় । ১৫ই এপ্রিল শেখ মুজিব ঘোষণা করেন,' আমাদের নৈতিক বিজয় সূচিত হয়েছে। সারা প্রদেশব্যাপী সফরসূচী সমাপ্ত করে এসে ২৪শে এপ্রিল ঢাকার পল্টন ময়দানে শেখ মুজিব নীতি নির্ধারণীমূলক এক দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। এ জনসভায় বিপুল জনসমাবেশ ঘটে। জনসভায় উপস্থিত জনতা ৬-দফার দাবীতে মুহুর্মুহুঃ শ্লোগান তোলে। এর পর শেখ মুজিব আর একবার প্রদেশব্যাপী সফরেবের হন। ২৯শে এপ্রিল কুমিল্লার এক বিশাল জনসভায় শেখ মুজিব আরো স্পষ্ট করে ঘোষণা করেন ৬-দফাই দেশবাসীর মুক্তি সনদ। ৭ই মে শেখ মুজিব সিলেটের এক জনসভায় ভাষণ দেন। ১০ই মে ময়মনসিংহে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ দুই জায়গায় ভাষণ দেওয়ার পরই তাকে গ্রেফতার করা হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা এর তীব্র নিন্দা করেন এবং দেশরক্ষা আইনের অপব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন। আদালত শেখ মুজিবের হেবিয়াস করপাসের পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ নেতাদের গ্রেফতার প্রসঙ্গে সরকারের ওপর কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করে। এ ঘটনাও দেশব্যাপী একটি আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ২০শে মে ৬-দফা দাবী আদায় ও প্রদেশব্যাপী গ্রেপ্তার ও দমননীতির প্রতিবাদে ৭ই জুন সাধারণ হরতালের ডাক দেওয়া হয়। ৭ই জুনের হরতালকে সফল করার জন্য সারাদেশব্যাপী ব্যাপক প্রচার অভিযান শুরু হয়। প্রচুর প্রচারপত্র প্রকাশ করা হয়। ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরের নানাস্থানে পথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সকল সভায় হরতাল পালনের আহবান ছাড়াও

Dhaka University Institutional Repository

নেতৃবৃন্দের গ্রেফতার, আওয়ামী লীগ কর্মীদের নির্যাতন ও উহার প্রচারপত্র আটকসহ সরকারের দমনমূলক কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা জানানো হয়।।

যে সময় সারা দেশব্যাপী শেখ মুজিবের ৬-দফা সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে, সে সময়ে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও তাদের সহযোগী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিল। তাদের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে টু-শব্দটি পর্যন্ত করা হয় না, বরং নিজেরা তীব্র বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে।[৩৫০] সর্বপ্রথম ২৬শে মার্চ সংবাদপত্রের খবর থেকে জানা যায় এই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে পর্যালোচনার জন্য ন্যাপ ৬-সদস্য বিশিষ্ট একটি সাব কমিটি গঠন করেছে এবং আওয়ামী লীগের ৬-দফা আন্দোলনের জোয়ারের বিপরীতে কার্যত মাঠে থাকার জন্য ৪ঠা মে থেকে দ্রব্যমূল্য প্রতিরোধ সপ্তাহ পালনের কর্মসূচী গ্রহণ করে। তবে ন্যাপের দ্রব্যমূল্য প্রতিরোধ সপ্তাহ পালন বিভিন্ন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সপ্তাহব্যাপী এ কর্মসূচী উপলক্ষে ন্যাপ ও তার সহযোগী সংগঠনগুলি ব্যাপক বিক্ষোভ কর্মসূচী প্রণয়ন করে এবং অসংখ্য পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। দ্রব্যমূল্য প্রতিরোধ সপ্তাহের তৃতীয় দিনেই সরকার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে বাধ্য হয় এবং সংরক্ষিত খাদ্যদ্রব্য দ্রুতই বাজারে ছাড়া হবে বলে ঘোষণা দেয়। এর পরও দ্রব্যমূল্য নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা চলতে থাকে, এমনকি কনভেনশন মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনেও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। যে সময় আওয়ামী লীগ ৬-দফা নিয়ে তুমুল আন্দোলন গড়ে তুলেছিল সে সময়ও তারা দ্রব্যমূল্যের বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। দ্রব্যমূল্যের ইস্যু নিয়ে ন্যাপ দেশে সাময়িক একটি ঢেউ তুললেও দ্রুতই তা স্তিমিত হয়ে যায় এবং ৬-দফার ইস্যুটিই আবার সামনে চলে আসে। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ও গভর্নর মোনয়েমের বিভিন্ন বক্তব্যে আওয়ামী লীগকে তাদের মূল প্রতিদন্দ্বী বলে গণ্য করা হয়। অবশ্য ৬-দফা দাবীর পাশাপাশি আওয়ামী লীগ খাজনা- ট্যাক্স হ্রাস, ব্যাংক ঋণের কিস্তি আদায় বন্ধের দাবীসহ বিভিন্ন বিষয়ে তারা কার্যকরী কমিটির মিটিংএ প্রস্তাব উত্থাপন করে এবং ২২শে মে খাদ্য দাবী দিবস পালনের জন্য দেশবাসীর প্রতি আহবান জানায়। কিন্তু ন্যাপ দ্রব্যমূল্য প্রতিরোধ সপ্তাহ পালন করলেও এ কর্মসূচী সমাপ্তির পর তাদের আর আন্দোলনে দেখা যায় নি। তবে ১৯৬৬ সালের জুন মাসের ৪ থেকে ৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ন্যাপের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় ৬-দফা ও স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৬ই জুন অনুষ্ঠিত ন্যাপের এক জনসভায় পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে জোর দাবী জানানো হয়। ৭ই জুন হরতালের একদিন আগে হলেও ন্যাপের এ ঘোষণা পরিস্থিতির ওপর খুবই ইতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং তা পরদিনের হরতালকে সমর্থন করা হয়েছে বলেই প্রতিভাত হয়।

এ সময়ে পিডিএম তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়নি। আওয়ামী লীগ কিংবা ন্যাপের উদ্যোগে সংগঠিত কোন আন্দোলনে সমর্থন প্রদানের মধ্যে তাদের ভূমিকা সীমাবদ্ধ থাকে। তবে আতাউর রহমান খান ঘন ঘন বিভিন্ন বিষয়ে বিবৃতি দিতে থাকলে তার মতামত প্রকাশের ওপর ২২শে মে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। ফলে ৬-দফা প্রশ্নে ৭ই জুনের কর্মসূচীর ক্ষেত্রে তার ভূমিকা প্রায় অস্পষ্ট থেকে যায়।

সে যাহোক, আওয়ামী লীগের ব্যাপক উদ্যোগ-আয়োজন ও ন্যাপের সমর্থন সত্ত্বেও সরকারের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে খুব বেশী সংখ্যক কর্মী হরতালকে সফল করার জন্য সেদিন রাজপথে নামেনি। তা সত্ত্বেও এক অভূতপূর্ব হরতাল পালিত হয়। তেজগা ও নারায়ণগঞ্জের শ্রমিকরা পরিস্থিতির মোড় ঘুরিয়ে দেয়। তারা সংগঠিতভাবে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গতে গেলে পুলিশ তাদের ওপর গুলীবর্ষণ করে এবং মনু মিয়াসহ ১০ ব্যক্তি নিহত হয়। এ সংবাদ জানার সাথে সাথে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ শহরে যেন আগুন জ্বলে যায়। তবে এ পর্যায়ে জনতার এ বিক্ষোভের নেতৃত্ব আর আওয়ামী লীগের কাছে থাকে নি। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে এর পর যা কিছু ঘটে তার সব কিছু ঘটায় মূলতঃ শ্রমিকশ্রেণী। ছাত্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা এদিন কার্যত শ্রমিকদের সেই জঙ্গী ভূমিকায় বিস্মিত হয়ে পড়ে এবং সে জঙ্গী মনোভাবকে খানিকটা ঠান্ডা করার জন্যই তারা ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যখন পুলিশের সকল বেষ্টনী ভেঙ্গে তেঁজগার হাজার হাজার শ্রমিক ঢাকার মূল শহরে ঢুকে পড়ে তখন বিকালে জনসভা আছে বলে ভ্রান্ত তথ্য প্রকাশ করে ছাত্ররা তাদেরকে শান্ত করার চেষ্টা করে এবং গোটা মিছিলকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলের মধ্যে নিয়ে যায়।[৩৫১] লক্ষনীয় বিষয় যে, এই হাজার হাজার শ্রমিকের প্রায় প্রত্যেকের হাতে ছিল সেদিন একটি করে লাঠি। কিন্তু যেহেতু নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এ আন্দোলনকে স্পষ্টভাবে পরিচালিত করা হয়নি, এমনকি পরবর্তী ঘোষণা দেওয়ার জন্য বিকালে জনসভা পর্যন্ত করা হয়নি, সেহেতু বিক্ষুব্ধ শ্রমিক সমাজ সাংঘাতিকভাবে হতাশ হয়।

৬-দফা কর্মসূচীকে প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর্মসূচী হিসাবে সে সময় গণ্য করা হত। কিন্তু সে কর্মসূচীর পক্ষে ঘোষিত হরতালে শ্রমজীবী মানুষের এই বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে সে ধারণাটি অনেকের মধ্য থেকেই দূর হয়। বিশেষতঃ, অবাঙ্গালী মালিক ও তাদের অনুগত অবাঙ্গালী মাস্তান শ্রমিকদের অত্যাচার যারা প্রতিনিয়ত ভোগ করতো, দেশের আর কোন শ্রেণী সেভাবে প্রত্যক্ষভাবে নির্যাতিত হত না। এটাই মূলতঃ ৭ই জুনের হরতালে বাঙ্গালী শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপকতম অংশগ্রহণের মূল কারণ। রংগলাল সেন এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে যথার্থই বলেছেন যে, "It was indeed a movement of the petty bourgeois, by the petty bourgeois, and for the petty bourgeois. But, infact, this was the first political movement in East Pakistan which resulted in the killing of industrial workers and urban poor people, numbering about 40. More than seven hundred agitators were arrested. The participation of workers demonstrated a radical departure from the traditional tactics. This movement witnessed raids on police stations, looting of arms and violent clashes with the police. The large-scale mobilization of workers and poor people, along with students and other sections of the urban society of Dacca in connection with the general strike on 7 June, 1966, demonstrated the fact that the autonomy movement had wide popular support...."[৩৫২]

কিন্তু ৭ই জুনের উক্ত হরতালে এত জনসমর্থন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের কাছে কল্পনাতীত ব্যাপার ছিল। আর তাই এর ফলে তেমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটলে তা কিভাবে মোকাবেলা করা হবে সে সম্পর্কেও তাদের কোন পরিকল্পনা ছিলনা। সরকারের একটি প্রেস

---

৩৫০ নূরুল হহাসান, নূরুর রহমান, সামসুজ্জোহা মানিক, অজয় রায় ও নূরুল হুদা মির্জার সাথে কথা বললে তাঁরা সবাই এ ব্যাপারে একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

৩৫১ আহমদ, মহি, জাতীয় রাজনীতি, পৃ. ৩২২।

৩৫২ Sen, Rangalal, Political Elites in Bangladesh, p. 214.

Dhaka University Institutional Repository

নোট ছাড়া হরতাল সম্পর্কে সংবাদপত্রে কোন খবর প্রকাশিত হয় নি। আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা ঐদিন গ্রেফতার হওয়ায় পরবর্তী কোন কর্মসূচী তাদের পক্ষে ঘোষণা করা সম্ভব হয় নি। অলি আহাদের মতে জনসাধারণের এ বিক্ষোভ কোনসংগঠিত রূপ পরিগ্রহ করেনি। তাঁর মতে, "পাকিস্তানের জন্মলগ্ন হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের গণতন্ত্র বিরোধী, প্রভুত্বব্যঞ্জক ও বাঙ্গালী বিদ্বেষী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পদক্ষেপগুলির বিরুদ্ধে বাংলা ভাষাভাষী পূর্ব পাকিস্তানীদের মনের দিগন্তে পুঞ্জীভূত রোষ ধীরে ধীরে শাসকচক্রের অজান্তে ও অগোচরে প্রলয়ঙ্করী রূপ ধারণ করিতেছিল। ইহারই অসংগঠিত ও স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে ৭ই জুন।"৩৫৩ সে যাহোক, আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব এ আন্দোলনের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে দীর্ঘ দিন নতুন কোন কর্মসূচী ঘোষণা করতে পারেননি। এমনকি, তাদের অনেকের মধ্যে এক ধরনের হতাশা বিরাজ করতে থাকে। এদের অনেকেই আবার নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন।

ঘটনাক্রমে ৭ই জুন ছিল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির চার দিনব্যাপী কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিংএর শেষ দিন। অর্থাৎ ঐদিন ন্যাপের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের প্রায় সবাই ঢাকায় ছিলেন। ৬-দফার প্রশ্নে এ বিস্ময়কর গণজাগরণকে লক্ষ্য করে এ কর্মসূচীর গুরুত্ব সম্পর্কে এদের অনেকেই নতুনভাবে মূল্যায়ন করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং জনসাধারণের ওপর, বিশেষতঃ শ্রমজীবী জনসাধারণের ওপর সরকারের এই বর্বর আক্রমণকে লক্ষ্য করে ন্যাপের ১১ জন বিশিষ্ট নেতা দস্তখত এ ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এবং ৮ই জুন 'দমননীতি, গণহত্যার প্রতিবাদে ও স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে দলমত নির্বিশেষে সকল দেশবাসী ঐক্যবদ্ধ হউন' শিরোনামে একটি প্রচারপত্র বিলি করেন। যাদের নামে এ প্রচারপত্রটি প্রকাশ করা হয় তারা হলেন সর্বজনাব হাজী মোহাম্মদ দানেশ, মহিউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, দেওয়ান মাহাবুব আলী, পীর হাবিবুর রহমান, মোজাফফর আহমদ, হাতেম আলী খান, ওসমান গনি, গোলাম মর্তুজা, নূরুল ইসলাম ও ডাঃ এম,এ ওয়াদুদ। একমাত্র শেষোক্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য সবাই ছিলেন তৎকালীন পাকিস্তান ন্যাপ, পূর্ব পাকিস্তান ন্যাপ ও ঢাকা শহর ন্যাপের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ। লক্ষনীয় যে, মওলানা ভাসানীসহ পিকিংপন্থীদের কোন নেতার নাম এ প্রচারপত্রে স্থান পায়নি। সে যাহোক, পুলিশের গুলিবর্ষণ ও অন্যান্য নির্যাতনে কতজন হতাহত ও গ্রেফতার বরণ করেছে তার বিবরণ উক্ত প্রচারপত্রের প্রথমে দেওয়া হয়। উক্ত হরতালের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার দমননীতি চালিয়ে সারা প্রদেশব্যাপী কি ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল তারও বিবরণ এতে দেওয়া হয়। এর পর উক্ত প্রচারপত্রে বলা হয়ঃ

"রাজবন্দীদের মুক্তি ও পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে আওয়ামী লীগের আহবানে গত ৭ই জুন তারিখে প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে শান্তিপূর্ণ হরতাল পালিত হয়। হরতালের সাফল্য শাসকচক্রকে হতচকিত করিয়া তোলে এবং ইহাকে বানচাল করার জন্য সরকার নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর পুলিশবাহিনী লেলাইয়া দেয় ও পুলিশ নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে।"৩৫৪

এর পর গত ১৯ বছরের দমন-পীড়নের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরে বলা হয়ঃ

"৭ই জুনের দমননীতি এই নির্মম দমননীতিরই অন্যতম বীভৎস নজির। গত ১৯ বৎসর যাবৎ পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর চরিত্রের স্বরূপ সাময়িক ব্যতিক্রম বাদে মোটামুটি একই রূপ হইলেও নৃশংসতায় বর্তমান সরকার তার পূর্বসূরিদের অনেক পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে। যদি রক্ষার তাগিদে ঈদের জামাত অথবা রাজপথের শান্তিপূর্ণ জনতার উপর পাশবিক হত্যালীলা চালাইতেও এই সরকার বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে নাই।"

৭ই জুনের হরতাল যে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর কত গভীরে আঘাত করেছিল তার বিবরণ দিতে গিয়ে এ প্রচারপত্রে বলা হয়ঃ

"একদিকে যখন একচেটিয়া পুঁজিবাদ ও সামন্ত স্বার্থের রক্ষক সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী আমলাতান্ত্রিক স্বৈরশাহীর শাসন, শোষণ ও অত্যাচার আজ চরমে পৌঁছিয়াছে, অপর দিকে তখন নিপীড়িত, অত্যাচারিত জনতার বুকের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ আজ শান্তিপূর্ণ হরতালের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পাকিস্তানের ইতিহাসে এমন হরতাল আর দেখা যায় নাই। পিকেটিং-এর প্রয়োজন হয় নাই, স্বেচ্ছাসেবকের কথা কেউ চিন্তাও করে নাই-- তবুও ৭ই জুন ভোরবেলা দেখা গেল লক্ষ-কোটি জনতা নিজেরাই স্বেচ্ছাসেবক, চোখেমুখে তাঁদের দৃপ্ত শপথ, আত্মশক্তিতে গভীর আস্থা --কোন ভ্রূকুটি, কোন চন্ডনীতিই তাঁহাদিগকে টলাইতে পারিবে না-- প্রত্যেককেই সৈনিক মঞ্জিলে পৌঁছাইতে হইবে। কাঁপিয়া উঠিল জালিমশাহীর বুক, টলিয়া উঠিল এতদিনের পাকাপোক্ত আসন-- আর গর্জিয়া উঠিল পুলিশের বুলেট। শহীদানের রক্তে বিভিন্ন রাজপথ লাল হইয়া উঠিল। শোকের ছায়া নামিয়া আসিল সমস্ত শহরে, পথে প্রান্তরে। তবে মাতম নয়- বজ্র কন্ঠের শপথ- শহীদানের রক্তের ডাক এদেশের জনতার রক্তেও আগুন ধরাইয়া দিল। শহীদানের রক্তপাত বৃথা যায় নাই।"

-এর পর এ প্রচারপত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের দৈনন্দিন সমস্যা, বিভিন্ন জাতীয়, আঞ্চলিক ও শ্রেণীগত শোষনসহ জনসাধারণের ওপর আরোপিত শোষণ নির্যাতনের আনুপূর্বিক বিবরণ প্রদান করা হয়। এবং পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের ঐক্যের স্বার্থেই যে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা প্রয়োজন তার সপক্ষেও বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করা হয়। ৭ই জুনের হরতালের গুরুত্ব ও তার দাবীসমূহের যৌক্তিকতাকে তুলে ধরে অভিমত পোষণ করা হয় যে, স্বায়ত্বশাসনের লড়াইয়ের সাথে সাধারণ মানুষের রুটি ও রুজির সংগ্রামকে যুক্ত করতে না পারলে ৭ই জুনের মত জনসাধারণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। পরিশেষে, নিম্নোক্ত বক্তব্যটি তুলে ধরে তারা ন্যাপের ১৪-দফার অনুকরণে ১০ দফা দাবীনামা পেশ করেন। উক্ত বক্তব্যটি ছিল নিম্নরূপঃ

"৭ই জুনের নির্মম হত্যাকান্ড জালিমশাহীকে জনগণ হইতে আরও বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। প্রতিটি লোক আজ শাসকচক্রের গণবিরোধী চরিত্র সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ও অধিকতর সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। ৭ই জুন আরো প্রমাণিত করিয়াছে যে, জনগণ আজ জালিমশাহীর মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পথে পা দিয়াছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক শিবিরের নেতৃত্বে আজও অনৈক্য বিরাজিত। জনতার এই ঐক্য গণতান্ত্রিক শিবিরের নেতৃত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। তাই আমরা আশা করি রাজনৈতিক দলসমূহ জনতার এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণপূর্বক তাহাদের ভিতরকার অনৈক্যকে দূর করিয়া ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠন পূর্বক জনতার সংগ্রামকে সফল পরিণতির দিকে আগাইয়া নিবেন। জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন স্বৈরতন্ত্রী সরকারের এই নির্মম হামলার মোকাবেলায় গণতান্ত্রিক দল ও দেশপ্রেমিক ব্যক্তিদের উপর এক ঐতিহাসিক দায়ীত্ব বর্তাইয়াছে। গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ ঐক্যবদ্ধ না হইলে গণআন্দোলনের সফল পরিণতি সুদূরপরাহত। বিরোধী

৩৫৩ আহাদ, অলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪।
৩৫৪ স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, ২য় খন্ড, পৃ. ২৭১।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক দলসমূহের বর্তমান অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা ক্ষমতাসীনদের পক্ষেই সহায়ক হইবে। কোন দলের একক প্রচেষ্টায় সর্বাত্মক আন্দোলন গড়িয়া তোলা সম্ভবপর নয়। সুতরাং বর্তমান মুহূর্তের ঐতিহাসিক কর্তব্য হইতেছে এক- গণতান্ত্রিক শিবিরের ঐক্য।"[৩৫৫]

৮ই জুন রাওয়ালপিন্ডিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে বিরোধী দলীয় সদস্যগণ ৭ই জুনের ঘটনা সংক্রান্ত তিনটি মুলতবী প্রস্তাব উথাপনের চেষ্টা করেন কিন্তু স্পীকার জব্বার খান প্রস্তাব তিনটি বাতিল করে দেন। এর প্রতিবাদে কয়েকজন স্বতন্ত্র সদস্যসহ সকল বিরোধী দলীয় সদস্য পরিষদ কক্ষ বর্জন করেন। পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের বিরোধী দলের সদস্যগণ পুলিশের গুলীবর্ষণ সম্পর্কে একটি মুলতবী প্রস্তাব উথাপন করতে চান। কিন্তু সে দাবী স্পীকার প্রত্যাখান করলে তার প্রতিবাদে বিরোধী দল ও স্বতন্ত্র গ্রুপের সকল সদস্য পরিষদ কক্ষ বর্জন করেন।[৩৫৬] ৯ই জুন প্রকাশিত 'সংবাদে' এ 'আমাদের নীরব প্রতিবাদ' শিরোনামে আরো একটি খবর প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়, "যে মর্মান্তিক বেদনাকে ভাষা দেওয়া যায়না সেখানে নীরবতাই একমাত্র ভাষা। তাই গতকল্য "সংবাদ" প্রকাশিত হইতে পারে নাই। আমাদের এই নীরব প্রতিবাদ একক হইলেও ইহাতে আমাদের পাঠকরাও শরীক হইলেন, ইহা আমরা ধরিয়া লইতেছি। --কর্মাধ্যক্ষ, "সংবাদ"।

সে সময় ৬-দফা কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক গণজাগরণের সূচনা হয় সে সময় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির পিকিংপন্থী অংশ ৬-দফার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অপপ্রচারে লিপ্ত ছিল। পিকিংপন্থীদের কর্তৃত্বে পরিচালিত সাপ্তাহিক 'জনতার প্রতিটি সংখ্যায় তখন ৬-দফার বিরুদ্ধে সমালোচনা প্রকাশিত হত। এমনকি, ৭ই জুনের প্রাক্কালে 'জনতা'র এক প্রবন্ধে ৬-দফার কথা উল্লেখ না করে ৬-দফার রাজনীতিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করা হয় এবং এ আন্দোলনকে 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের হীন কার্যকলাপকে ঢাকিবার জন্য বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ ও রাজনৈতিক দলের প্রচেষ্টা হিসাবে বর্ণনা করা হয়।[৩৫৭] এছাড়া, ৭ই জুনের প্রাক্কালে খুলনায় অনুষ্ঠিত ন্যাপের এক জনসভায় কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ৬- দফাকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন এবং মন্তব্য করেনঃ "আমরা টাটা বিড়লার শোষণ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আদমজী ইস্পাহানীকে সৃষ্টি করিয়াছি; আজ আবার আদমজী ইস্পাহানীদের শোষণ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য নূতন করিয়া কোন বাঙ্গালী আদমজী ইস্পাহানী সৃষ্টি করিতে চাইনা।"[৩৫৮] শুধু তাই নয়,৭ই জুনের হরতাল সফল করার জন্য শ্রমিকশ্রেণী যাতে অংশগ্রহণ না করে সে লক্ষ্যে মোহাম্মদ তোয়াহাসহচীনপন্থী কয়েক জন নেতা বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলেন বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।[৩৫৯] এসব ঘটনা নিয়ে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মধ্যে মত বিরোধ আরো তীব্র হয়ে ওঠে। ন্যাপ ঐক্যবদ্ধভাবে ১৪-দফা কর্মসূচী প্রদান করলেও একটি রাজনৈতিক দল হিসাবে কর্মকান্ড পরিচালনার শক্তি তার প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়। তবে ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বরে কমিউনিস্ট পার্টি আনুষ্ঠানিকভাবে বিভক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ন্যাপের আভ্যন্তরীণ বিরোধ প্রকাশ্য রূপ লাভ করেনি। ফলে ৪ জুন থেকে ৭ জুন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ন্যাপ বিভিন্ন গণতন্ত্রমনা রাজনৈতিক দলের সাথে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন পরিচালনার জন্য কিছু প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। ১লা জুলাই মওলানা ভাসানী ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী গ্রহণের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতি আহবান জানান। কিন্তু ন্যাপ সংগঠনগতভাবে ৬-দফাকে সমর্থন না করায় আওয়ামী লীগ তার সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে আগ্রহী হয় নি, অন্যান্য দল থেকেও তেমন কোন সাড়া মিলেনি। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সূচনা করা না গেলেও ন্যাপ অবশ্য বসে থাকে নি। সংগঠনের মধ্যে তীব্র মত-বিরোধ নিয়েও ন্যাপ নেতারা শ্রমজীবী মানুষ বিশেষতঃ কৃষক-জনতাকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য দেশব্যাপী জনসভা অনুষ্ঠান করতে থাকেন এবং অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্য হ্রাস, পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ ও বন্যা প্রতিরোধের দাবীতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার গুরুত্বকে ব্যাখ্যা করতে থাকেন। ন্যাপের সমর্থক দৈনিক 'সংবাদ' ও সাপ্তাহিক 'জনতা' ধারাবাহিকভাবে জন জীবনের দুর্বিষহ অবস্থার কথা সবিস্তারে প্রকাশ করতে থাকে।

অন্যদিকে,আওয়ামী লীগের সকল প্রধান নেতা বন্দী থাকার কারণে উহা তেমন কোন কর্মকান্ড জোরালোভাবে পরিচালনা করতে সমর্থ হয় নি। এসময় আমেনা বেগম আওয়ামী লীগের হাল ধরেন এবং তিনি দেশব্যাপী ঘুরে ঘুরে আওয়ামী লীগ কর্মীদের মনোবল রক্ষা করার কাজেই বিশেষভাবে সচেষ্ট হন। ৭ই জুনের পর বহুদিন পর্যন্ত আওয়ামী লীগ দেশের বিভিন্ন স্থানে দু'একটি জনসভা করা ছাড়া তেমন কিছুই করতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু আওয়ামী লীগের প্রতি সরকারের অন্যায় আচরণের কথা আদালতের রায়ের মধ্য দিয়ে যখন প্রকাশিত হয়, হেবিয়াস কর্পাসের জবাব দানে সরকার যখন ব্যর্থ হতে থাকে তখন আবার আওয়ামী লীগের কর্মকান্ড নতুন গতিবেগ নিয়ে শুরু হয়।

ইতিমধ্যে সরকারের অভ্যন্তরীণ বিরোধ আরো তীব্রতর হয়। আইয়ুব সরকারের প্রভাবশালী পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো ১৯৬৬ সালের জুন মাসেই মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন এবং এরই এক পর্যায়ে কনভেনশন মুসলিম লীগ ছেড়ে দেন। ফলে সরকারের ভাবমূর্তি আরো ম্লান হয়। পক্ষান্তরে, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব, তার গভর্নরদ্বয় এবং কেন্দ্র ও প্রদেশের মন্ত্রীবর্গের বক্তব্য ক্রমেই হুমকি বা চাপ সৃষ্টি সূচক হয়ে উঠতে থাকে। একারণে আইয়ুব সরকার ক্রমেই গণবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এসময় ছাত্রদের কিছু প্রতিবাদ সভা, বিক্ষোভ ও ধর্মঘট ছাড়া তেমন কোন আন্দোলন ছিলনা। তখনকার আন্দোলনের মধ্যে,পি,আর,টি,সির কর্মচারীদের ধর্মঘট ছিল উল্লেখযোগ্য। তবে ১৫ই জুলাই থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু করার কথা থাকলেও সরকারী গুন্ডা ও পুলিশী নির্যাতনের ভয়ে শংকিত হয়ে তাদের ধর্মঘট এক দিনের বেশী স্থায়ী হয়নি। ১৯৬৬ সালের ২৫শে আগস্ট থেকে পাটকল শ্রমিকরা ধর্মঘট শুরু করে। কিন্তু একমাত্র খুলনা ছাড়া আর কোথাও তা সফল হয়নি, ফলে কয়েকদিনের মধ্যে সে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। তবে এ সময় পশ্চিম পাকিস্তানের কর্মচারীদের মধ্যে বেশ প্রবল আন্দোলন গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে তার বিভাগের কর্মচারীদের আন্দোলন ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এরা আন্দোলন শুরু করলে সরকার তাদের দাবী অচিরেই মেনে নিতে বাধ্য হয়। এরপর ১০ অক্টোবর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের রেল কর্মচারীরা বিভিন্ন দাবীতে ধর্মঘটের নোটিশ প্রদান করে এবং সরকারী আপোস-রফার মধ্য দিয়ে রেল কর্মচারীদের সে আন্দোলনও আংশিক সাফল্য লাভ করে। বস্তুতঃ টঙ্গীস্থ বাটা শ্রমিকদের ধর্মঘটের মাধ্যমেই তখন পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। এরা ২৫শে অক্টোবর থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু করে। বাটা শ্রমিকদের ধর্মঘট ২রা নভেম্বর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ৯ই নভেম্বর

---

৩৫৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪।

৩৫৬ দৈনিক সংবাদ, ৯ই জুন, ১৯৬৬।

৩৫৭ সাপ্তাহিক জনতা, ২রা জুন, ১৯৬৬।

৩৫৮ সাপ্তাহিক জনতা, ২রা জুন, ১৯৬৬।

৩৫৯ আহমদ, মর্দি, জাতীয় রাজনীতি, পৃ. ৩২২।

Dhaka University Institutional Repository

নারায়ণগঞ্জের শ্রমিকরা বিভিন্ন দাবীতে এক সফল ধর্মঘট পালন করে। সে ধর্মঘট এত সফল হয় যে ১০ই নভেম্বরের দৈনিক আজাদে প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম কলামে তা প্রকাশিত হয়। এরপর আই.ডি.বি.পি. ওয়াপদা ও ন্যাশনাল ব্যাংকের কর্মচারীদের ধর্মঘটের খবর জানা যায়। এর মধ্যে ন্যাশনাল ব্যাংক কর্মচারীদের ধর্মঘট ছিল খুবই উল্লখযোগ্য। এরা ১লা ডিসেম্বর থেকে ১৪ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ধর্মঘট অব্যাহত রাখে। ১৩ই ডিসেম্বর পশ্চিম পাকিস্তানের ন্যাশনাল ব্যাংক কর্মচারীদের পক্ষ থেকে ধর্মঘট অবসানের পরই কেবল পূর্ব পাকিস্তানের কর্মচারীরা তা প্রত্যাহার করে নেয়। এসময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারিগণ সমর্থনসূচক প্রতীক ধর্মঘট পালন করে। এছাড়া, ১৯৬৬ সালের শেষ দিকে বেবী ট্যাক্সীচালক ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক কর্মচারীদের ধর্মঘট পালিত হয়। কিন্তু এগুলির কোনটিই তেমন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মঘট হিসাবে পরিগণিত হয়নি।

এরকম একটি পর্যায়ে ন্যাপ প্রধান মওলানা ভাসানী বন্যা সমস্যা ও খাদ্য সরবরাহ ইত্যাদি গণদাবী আদায়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহবান জানান। ১৯৬৬ সালে বন্যাপরবর্তী দুর্ভিক্ষ বেশ প্রকট আকার ধারণ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্যান্য বিরোধী দল কিংবা সংবাদপত্রসমূহ এতে মোটেই গুরুত্ব দেয় নি। দৈনিক 'আজাদ' মওলানা ভাসানীর বিবৃতিগুলি হয় প্রকাশই করে না অথবা প্রকাশ করলেও খুব সংক্ষিপ্তভাবে বা বিকৃতভাবে প্রকাশ করে। উপরন্তু, অনেকে মওলানা ভাসানীর এ আন্দোলনের আহবানকে ৬-দফা আন্দোলনের প্রতি জনসাধারণের সহানুভূতিশীল দৃষ্টিকে অন্যদিকে নিবদ্ধ করার প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করে। 'সংবাদ' আর সাপ্তাহিক 'জনতা'ই ছিল ভাসানীর বক্তব্য প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম। ১৯৬৬ সালের ১৬ই আগষ্ট মওলানা ভাসানী বন্যা ও খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে খুব উল্লেখযোগ্য একটি বিবৃতি প্রদান করেন, যাতে তিনি এই ইস্যুতে সকল দল ও গণসংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তোলার আহবান জানান। মওলানা ভাসানীর ডাকে অন্য কোন দল সাড়া না দিলে ন্যাপ এককভাবে তার সহযোগী গণসংগঠনগুলিকে নিয়ে 'সংযুক্ত দুর্ভিক্ষ ও জুলুম প্রতিরোধ কমিটি' নাম দিয়ে একটি প্রতিরোধ কমিটি গড়ে তোলে। এ সংগঠনের পক্ষ থেকে ৪ঠা সেপ্টেম্বর সারা পূর্ব পাকিস্তানে একটি দাবী দিবস পালনের আহবান জানানো হয়। ন্যাপ, কৃষক সমিতি ও 'শ্রমিক ফেডারেশনের' নেতা ও কর্মীরা এ কর্মসূচী সফল করার জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। ছাত্র ইউনিয়নের উভয় অংশের কর্মীরাতাদের সাথে যোগ দেয়। এ কর্মসূচী পালনের ক্ষেত্রে শহরের তুলনায় গ্রামের প্রতি অধীক গুরুত্ব দেওয়া হয়। আন্দোলনকারীদের প্রধান যুক্তি ছিল গ্রামের মানুষই এ সমস্যার দ্বারা বেশী মাত্রায় আক্রান্ত। গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত প্রতিরোধ কমিটি খুব সফলভাবে এ কর্মসূচী পালন করেন। চারটি বিভাগীয় শহরতো বটেই, প্রতিটি জেলা শহর, মহকুমা শহর এমনকি অনেক থানা শহর বা তার আসে পাশেও এদিন জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে জনসভা ছাড়াও এদিনের অন্যান্য কর্মসূচীর মধ্যে শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন অন্তর্ভূক্ত ছিল। এ সকল জনসভায় দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের দাবীর পাশাপাশি বড় ধনিক গোষ্ঠীর শোষণ ও সরকারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখা হয়। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কায়েম, ইত্তেফাকসহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং বন্দীমুক্তির দাবী করা হয়।[৩৬০] যখন এ দাবী দিবস পালনের আহবান জানানো হয়, তখন প্রায় সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান বন্যার পানিতে থৈ থৈ করছে। তাই দাবী দিবসের এ কর্মসূচীতে গ্রামের মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ ছিল এ আন্দোলনের এক উল্লেখযোগ্য দিক। কিন্তু অন্য কোন রাজনৈতিক দল বিবৃতি দিয়েও একে সমর্থন জানায়নি।

বন্যা পরিস্থিতির যখন আরো অবনতি ঘটে এবং প্রদেশের ১২ হাজার বর্গমাইল এলাকার ৭ হাজার ইউনিয়ন ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতির সম্মুখীন হয় তখন মওলানা ভাসানী 'খাদ্য সরবরাহ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ' অন্তত: এই দু'টি দাবীতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি আবার আকুল আহবান জানান। কিন্তু কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে তেমন কোন সাড়া পাওয়া যায় নি। ন্যাপ শেষ পর্যন্ত এককভাবে তার গণসংগঠনগুলিকে নিয়ে 'নিরন্ন মানুষকে বাঁচাও' এ শ্লোগান দিয়ে নতুন করে রাস্তায় নামে। লক্ষনীয় যে, এসময় সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী শ্লোগানের চেয়ে ন্যাপের উক্ত সরকার-বিরোধী শ্লোগান জনগণকে বেশী আকৃষ্ট করে। স্থায়ীভাবে বন্যা সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে না বলে সরকারকে তীব্রভাবে সমালোচনা করা হয়। সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধান, গণনিপীড়ন বন্ধ, রাজবন্দীদের মুক্তি ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে এক দাবী সপ্তাহ পালন করা হয়। দাবী সপ্তাহ পালন শেষে ঢাকায় দুর্ভিক্ষ ও জুলুম প্রতিরোধ কমিটির আহবানে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত কমিটির আহবায়ক ও কৃষক সমিতির যুগ্ম সম্পাদক জনাব আবদুল হক সকল গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান। এ সভায় হাজী দানেশসহ ন্যাপের অন্যান্য নেতা দুর্ভিক্ষ ও জুলুম প্রতিরোধ আন্দোলনকে আইয়ূবের স্বৈরাচারী শাসন উৎখাতের আন্দোলনে রূপান্তরীত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং বিভিন্ন গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্য কামনা করেন। উল্লেখ্য যে, 'দুর্ভিক্ষ ও জুলুম প্রতিরোধ কমিটির' আহবানে এ সভা অনুষ্ঠিত হলেও অনেকটা অপ্রাসঙ্গিকভাবে এ সভার প্রস্তাবে এমন একটি রাজনৈতিক প্রশ্নকে উর্ধ্বে তুলে ধরা হয় যা সে সময়ের চীনপন্থী রাজনীতিবীদরাই ধারণ করতেন এবং সভার মধ্য দিয়ে একথা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, দুর্ভিক্ষ ও জুলুম প্রতিরোধ কমিটির ঐ বিশেষ কাঠামোটি আসলে গোপন কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের প্রতিফলন মাত্র। সে যা'হোক, এ আন্দোলন সাময়িকভাবে পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলে একটি সাড়া জাগালেও তা বেশী দুর অগ্রসর হতে পারেনি। তবে এর পরও উক্ত কমিটির উদ্যোগে দেশব্যাপী জনসভা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন অব্যাহত থাকে।

আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের আটকাদেশ যে অবৈধ তা ১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাস থেকে একে একে প্রমাণ হতে থাকে। শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আনীত রাষ্ট্রদোহিতার অভিযোগ আদালতে প্রমাণিত হয়নি এবং এটাকে একটি সাজানো মামলা হিসাবে উল্লেখ করে শেখ মুজিবকে বেকসুর মুক্তি দেওয়া হয়। ইত্তেফাক সম্পাদক মানিক মিয়ার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগও প্রমাণিত হয় নি। ফলে তিনিও বেকসুর খালাস পান। তবে প্রকৃতপক্ষে মানিক মিয়া কিংবা শেখ মুজিব কেউই মুক্তি পান নি। অন্যান্য অভিযোগে তাদেরকে আটকে রাখা হয়। তবে এটা ছিল শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের জন্য আর একটি নৈতিক বিজয়। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের বিশাল জনসভায় নেতৃবৃন্দ তাদের নৈতিক বিজয়ের এ দিকটিই বিশেষভাবে তুলে ধরেন।

অন্যদিকে, কেন্দ্রীয়ভাবে 'দুর্ভিক্ষ ও জুলুম প্রতিরোধ কমিটি'র নেতৃত্বে নতুন করে কোন আন্দোলন গড়ে না উঠলেও বিচ্ছিন্নভাবে বিশেষ করে, বন্যা কবলিত এলাকায় আন্দোলন অব্যাহত থাকে। সামদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের পর খাদ্য সরবরাহে অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রতিবাদে ন্যাপ ও কৃষক সমিতির উদ্যোগে অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে ফেনীতে ২০ হাজার লোকের একটি মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ২০ টাকা মণে চাউল, ১০ টাকা মণে আটা, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য হ্রাস, বন্যার স্থায়ী সমাধান, রাজবন্দীদের মুক্তি, আঞ্চলিক

৩৬০ সাপ্তাহিক জনতা, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

স্বায়ত্তশাসন ও পূর্ণগণতান্ত্রিক অধিকারের দাবীতে বিক্ষোভ মিছিলটি ফেনী শহর প্রদক্ষিণ করে এবং নেতৃবৃন্দ মহকুমা হাকিমের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন।[৩৬১] এ ধরনের আন্দোলন সিরাজগঞ্জ, কুষ্টিয়া, টাঙ্গাইল, বরিশালসহ বিভিন্ন এলাকায় গড়ে ওঠে।

এ সকল আন্দোলন যখন চলছিল তখন একমাত্র প্রথম দিককার কিছু ঘটনা ছাড়া সরকার আর কোথাও তেমন কোন বাধা প্রদান করেনি। কিন্তু তখনও দেশে জরুরী আইন বলবৎ ছিল। এ পরিস্থিতিতে এ রকম বিশাল বিক্ষোভ মিছিল কিভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারছে সেটাও ছিল অনেকের মনে প্রশ্ন। ন্যাপ বিশেষ করে, মওলানা ভাসানীকে তখন আইয়ুব সরকারের সহযোগী বলে সন্দেহ করা হয়। ন্যাপ কেন্দ্রীয়ভাবে কোন আন্দোলনের ডাক না দিয়ে গ্রামাঞ্চলের সমস্যা নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে আন্দোলন করার উপর গুরুত্ব দেওয়ায় এ সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয়। মওলানা ভাসানীর নাম সরাসরি উল্লেখ না করলেও জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, দমননীতির প্রতিরোধ ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য কোন আন্দোলন গড়ে তোলা হচ্ছে না-- এসব বিষয় নিয়ে বিভিন্ন সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকায় সে সময় বেশ কয়েকটি নিবন্ধ ও সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়।[৩৬২] কিন্তু এ সময় একমাত্র ন্যাপ ও তার গণসংগঠনসমূহের পক্ষ থেকে কিছু ইস্তেহার প্রচার ও মাঝে মাঝে জনসভা ছাড়া আর কোন রাজনৈতিক কার্যক্রমও চোখে পড়ে নি।

প্রদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে যখন এরকম একটি হতাশাব্যঞ্জক অবস্থা ঠিক সে সময় জেনারেল আইয়ুব খানের একটি বক্তব্য পরিস্থিতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনে। ১৯৬৬ সালের ২২শে নভেম্বর ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টারে এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, "এক শ্রেণীর লোক স্বায়ত্তশাসনের যে শ্লোগান তুলিতেছে তাহার অর্থ হইতেছে বিচ্ছিন্নতা"। পূর্ব পাকিস্তান স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে জনৈক সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "পূর্ব পাকিস্তানের জন্য অধিকতর আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন যারা চান তাদের মধ্যে তিন শ্রেণীর লোকের সমন্বয় ঘটিয়াছে যথাঃ বৃহত্তর বাংলার উদ্যোক্তা কমিউনিস্ট ও সংকীর্ণতাবাদী ব্যক্তিবর্গ।"[৩৬৩]

আইয়ুব খান যখন প্রথম ক্ষমতাসীন হন তখন কমিউনিস্টদের সম্পর্কে খুবই আক্রমণাত্মক মন্তব্য প্রকাশ করতেন কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের সাথে সুসম্পর্ক, বিশেষতঃ চীনের সাথে সাংস্কৃতিক চুক্তির পর অনেকের ধারণা জন্মেছিল যে, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব বুঝি কমিউনিস্ট বিরোধী নন।[৩৬৪] কিন্তু যখন একটি আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমে এভাবে কমিউনিস্টদের হেয় প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে তিনি উক্ত মন্তব্য প্রকাশ করেন তখন এ বিষয়টি কমিউনিস্ট মতাদর্শীদের কাছে খুবই খারাপ বলে গণ্য হয়। কারণ কমিউনিস্টরা শুধু পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবী করছেনা, তারা পাকিস্তানের উভয় অংশের বিভিন্ন অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে মতামত প্রকাশ করছে; এমনকি ৬-দফার মধ্যে একটি বিচ্ছিন্নতাসূলভ বৈশিষ্ট্য আছে বিধায় কমিউনিস্টরা তাকে সমর্থন করছে না - সে রকম একটি পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান প্রধানতঃ কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতার অভিযোগ আনছেন। সে সময় কমিউনিস্ট পার্টির গুরুত্বপূর্ণ নেতারা কারাগারে আটক। তখন কারো কারো ধারণা যেহেতু কমিউনিস্টরা হিন্দু,সেহেতু তাদের ভারতীয় চর হিসাবে গ্রেফতার করে রাখা হয়েছে।[৩৬৫] কিন্তু আইয়ুব খানের উক্ত ঘোষণা সব রকমের ভ্রম ও সংশয়ের পরিসমাপ্তি ঘটায়। এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম ন্যাপের কেন্দ্রীয় নেতা জাতীয় পরিষদ সদস্য গাউস বক্স বেজেঞ্জো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তিনি প্রেসিডেন্টের সাম্প্রতিক বক্তব্যে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, "একমাত্র আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনই সর্বক্ষেত্রে বিরাজমান বৈষম্য দূর করিয়া পাকিস্তানের জাতীয় সমস্যার সমাধান করিতে পারে।" তার মতে "শাসকগোষ্ঠী স্বীয় স্বার্থে যে সংখ্যাসাম্যের নীতি আমদানী করিয়াছে তাহা বাস্তবে পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও বিদ্বেষভাবের সৃষ্টি করিয়াছে। এহেন পরিস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তানীরা মনে করিতেছেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানীরা তাহাদের শোষণ করিতেছেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের 'সংখ্যালঘু' প্রদেশের জনগণ মনে করিতেছেন যে, পাঞ্জাবীরা তাঁহাদের শোষণ করিতেছেন।" তিনি স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসাবে চিত্রিত করার প্রেসিডেন্টের সাম্প্রতিক প্রয়াসকে নিন্দা করে মত প্রকাশ করেন "বিচ্ছিন্নতার পথ হইতে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র পথ হইতেছে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা।"[৩৬৬] জাতীয় পরিষদের এ অধিবেশনেই পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যেকার তীব্র বৈষম্যের বিষয় নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের বৈষম্য যে কত গভীর তার স্পষ্ট চিত্র এ আলোচনার মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে। মাহাতাব উদ্দীন সরকার নামক জনৈক সরকার দলীয় সদস্যও এ অধিবেশনে পূর্ব-পশ্চিমের বৈষম্যের ওপর এক দীর্ঘ আলোচনা করেন এবং তিনি পরিসংখ্যান দিয়ে দেখান সরকারী চাকুরী ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রকট রূপ পরিগ্রহ করেছে।[৩৬৭] ১৯৬৬ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় আইয়ুব খানের উক্ত মন্তব্যের প্রথম প্রকাশ্য প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়। এ সভায় মওলানা ভাসানীর অনুপস্থিতিতেও যেমন ব্যাপক জনসমাগম ঘটে তেমনই সমস্ত জনসভা আইয়ুব সরকার-বিরোধী জোরালো শ্লোগানে বার বার মুখরিত হয়ে উঠতে থাকে। নেতৃবৃন্দও তাদের বক্তৃতায় শুধু সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধীতার পরিবর্তে আইয়ুব সরকারের দমনমূলক স্বৈরাচারী নীতির বিরুদ্ধে অধিকতর স্পষ্ট বক্তব্য তুলে ধরেন। উক্ত জনসভায় পাকিস্তান ন্যাপের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দের প্রায় সবাই উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট প্রথা বাতিল, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, রাজবন্দীদের মুক্তি ও পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধানসহ বিভিন্ন দাবীতে খুবই জোরালো বক্তব্য রাখেন এবং জনসভা শেষে তাঁরা আইয়ুব সরকার-বিরোধী বিভিন্ন শ্লোগান সহযোগে কমপক্ষে ১৫ হাজার জনতার এক জঙ্গী শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেন।[৩৬৮]

---

৩৬১ সাপ্তাহিক জনতা, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬।
৩৬২ সাপ্তাহিক জনতা, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬।
৩৬৩ সাপ্তাহিক জনতা, ২৭শে নভেম্বর, ১৯৬৬।
৩৬৪ শরদিন্দু দস্তিদারের সাথে সাক্ষাৎকার।
৩৬৫ অজয় রায়ের সাথে সাক্ষাৎকার।
৩৬৬ সাপ্তাহিক জনতা, ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৬৬।
৩৬৭ সাপ্তাহিক জনতা, ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৬৬।
৩৬৮ সাপ্তাহিক জনতা, ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুতঃ ন্যাপের দৃষ্টিভঙ্গীতে আইয়ুব সরকার সম্পর্কিত মূল্যায়নের যে একটি বিশেষ পরিবর্তন ঘটেছিল তা সেদিনের নেতৃবৃন্দের বক্তব্য, অংশগ্রহণকারী কর্মিবাহিনীর আচরণ, মিছিলের জঙ্গীত্ব ও স্লোগানের ধরনসহ সব কিছুতেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। লক্ষনীয় ব্যাপার যে, ১৯৬৬ সালের শুরু থেকেই ন্যাপের কোন কেন্দ্রীয় কর্মকান্ডে মওলানা ভাসানীর উপস্থিতি ছিল না। কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং, কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক কমিটি আয়োজিত জনসভা বা এ ধরনের সকল কেন্দ্রীয় কার্যকলাপ থেকেই তিনি অসুস্থতার কথা বলে অনুপস্থিত থাকতেন। অথচ ন্যাপের কেন্দ্রীয় কমিটি যখন ঢাকায় কোন কর্মসূচী পালন করছে তখন মওলানা ভাসানীকে উত্তরবঙ্গ বা অন্য কোথাও কৃষক সমাবেশ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখা যেতো। সারা ৬৬ সাল মওলানা ভাসানী ভীষণভাবে সক্রিয় ছিলেন, কিন্তু তার সক্রিয়তার ক্ষেত্র ছিল একমাত্র গ্রামাঞ্চল।

১৯৬৬ সালের ডিসেম্বরে জাতীয় পরিষদে আইনমন্ত্রীর একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে এক উত্তপ্ত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এ অধিবেশনে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় সকল বিরোধী দলীয় সদস্য পাকিস্তানের উভয় অংশের বিভিন্ন অঞ্চল বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তানেরপূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের সপক্ষে জোরালো মতামত প্রকাশ করেন। এসকল বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আইনমন্ত্রী জনাব জাফর তার ভাষণে বলেন, "যাহারা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অজুহাতে ও আড়ালে বিবৃতি প্রদান করিতেছেন, তাহাদের এখন আমরা চিহ্নিত ও সনাক্ত করিতে পারি। যাহারা উক্ত মর্মে বিবৃতি প্রদান করিতেছেন, প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা আণয়নের চেষ্টা করিতেছেন। .....আমরা উহাদের সনাক্ত করিব, দাবড়াইয়া ধরিব, পশ্চাদ্ধাবন করিব ও নির্মূল করিয়া ছাড়িব। আমরা উহাদের ছাড়িব না। অতঃপর উহারা মুখোশ পরিয়া বক্তৃতা করিতে পারিবে না। তাহাদের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা আনয়নের উদ্দেশ্যকে আমরা জাতির সম্মুখে তুলিয়া ধরিব এবং এটা দেখাইতে সক্ষম হইব যে, উহারাই হইতেছে জাতির দুশমন।"[৩৬৯]

জাতীয় পরিষদে আইনমন্ত্রীর এ ধরনের বক্তব্য উপস্থিত বিরোধী সকল সদস্যের গায়ে যেন আগুন ধরিয়ে দেয়। ন্যাপ পার্লামেন্টারী দলের নেতা মশিয়ুর রহমান, সম্মিলিত বিরোধী দলের নেতা নুরুল আমিন, পশ্চিম পাকিস্তানী বিরোধী দলীয় সদস্য এবং উভয় অঞ্চলের স্বতন্ত্র সদস্যরা একযোগে এ বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন। এ নিয়ে তিক্ত বাক-বিতন্ডা হয় এবং সকল বিরোধী সদস্য এতে আরো বেশী স্বায়ত্তশাসনের অনুসারী হয়ে ওঠেন। সম্মিলিত বিরোধী দলের নেতা নূরুল আমিন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি নাগরিকই স্বায়ত্তশাসন চায়, ফলে আইনমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে দুশমন নির্মূল করতে হলে সেখানকার প্রতিটি নাগরিককেই নির্মূল করতে হবে। ন্যাপ নেতা মশিয়ূর রহমান তো আইনমন্ত্রীর সাথে সরাসরি বাক যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং তাকে ডিক্টেটরের দালাল বলে আখ্যায়িত করেন। অর্থাৎ সরকারী দল সে সময় স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে এত অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে যে, পার্লামেন্টের যে সকল সদস্য স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে তত আগ্রহী ছিলেন না তাদেরকেও স্বায়ত্তশাসনের দাবীর সপক্ষে ঠেলে দেয়। রাজনীতিতে এর প্রতিক্রিয়া সাংঘাতিকভাবে পড়ে। এ ঘটনার পর ন্যাপের পক্ষ থেকে আইনমন্ত্রীর বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করা হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানসহ পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় তুলে ধরা হয়। ন্যাপ দলীয় জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব আরিফ ইফতেখার একজন পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী হয়েও ক্ষমতাসীনদের উদ্দেশ্যে বলেন, "যদি পাকিস্তানের স্থায়িত্ব ও সংহতিই আপনাদের কাম্য হইয়া থাকে তাহা হইলে জনগণের সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দিয়া ১০ কোটি নাগরিকের ভোটাধিকার ও মৌলিক অধিকার ফিরাইয়া দিন।" তিনি আরো বলেন, "পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বাস পূর্ব পাকিস্তানকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের মধ্য দিয়াই কেবল দেশের সংহতি ও ঐক্য দৃঢ়তর হইতে পারে।"[৩৭০] এভাবে ন্যাপ নেতৃত্বের কাছে বিমূর্ত মার্কিন-বিরোধী সংগ্রামের পরিবর্তে জনগণের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনই সংগ্রামের মূল বিষয় হিসাবে বিবেচিত হতে থাকে।

আইয়ুব খানের উপরোক্ত বক্তব্য এবং তার মন্ত্রীদের ভূমিকা পরিস্থিতিকে কি পরিমাণে পরিবর্তন করে তা বোঝা যায় যখন সকল বিরোধী দলীয় সদস্য শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তির জন্য যুক্ত বিবৃতি প্রদান করেন। এ পর্যায়ে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, ও এনডিএফ সহ সকল বিরোধী দল খুব কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়।[৩৭১] উল্লেখ্য যে এ সময় মওলানা ভাসানীর বক্তৃতায়ও একটি বিশেষ পরিবর্তন আসে। ১৯৬৬ সালের ১৮ই ডিসেম্বরে জামালপুরের মাদারগঞ্জে ২৫ হাজার কৃষক-জনতার উপস্থিতিতে তিনি আইয়ুব সরকার-বিরোধী এক দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানান। বহুদিন পর তিনি এই প্রথম মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে একমাত্র আক্রমণের বিষয়বস্তুর পরিবর্তে স্বৈরতন্ত্র ও পুঁজিবাদ-বিরোধী আন্দোলনের আহবান জানান।[৩৭২] ন্যাপের পিকিংপন্থী নেতৃত্বের মধ্যেও এক বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ১৮ই ডিসেম্বর পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক শ্রমিক সমাবেশে ১ মাসের মধ্যে খাদ্য সমস্যার সমাধান করা না হলে সরকারের বিরুদ্ধে এক দুর্বার শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। মূলতঃ পিকিংপন্থী নেতৃবৃন্দ এ সমাবেশের উদ্যোক্তা ছিলেন। তৎকালীন প্রখ্যাত চীনপন্থী নেতা আব্দুল হক এই প্রথম এত খোলাখুলি স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে বক্তব্য রাখেন এবং সাম্রাজ্যবাদ, আমলা মুৎসুদ্দী পুঁজিবাদসহ শোষকগোষ্ঠীর সকল অংশের প্রধানতম প্রতিনিধি যে আইয়ুব সরকার তাও তিনি খোলাখুলি এ জনসভাতেই প্রথম বলেন: প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের বক্তব্য এবং তার মন্ত্রীর অভিযোগকে কেন্দ্র করে ছাত্র ও শ্রমিক সমাজের মধ্যেও প্রচন্ড প্রতিক্রিয়া হয়। বিভিন্ন শ্রমিক ও ছাত্র সংগঠন বিবৃতি দিয়ে এ বক্তব্যের তীব্র নিন্দা করে এবং অনতিবিলম্বে তা প্রত্যাহার করে নিতে বলে। ছাত্রসমাজ জঙ্গী মিছিল করে এ বক্তব্যের বিরোধিতা করে এবং কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবী জানায়।[৩৭৩]

সে যা'হোক, ন্যাপের ভাঙ্গন নিঃসন্দেহে আইয়ুব সরকার-বিরোধী আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। কিন্তু আইয়ুব সরকারের চরিত্র সম্পর্কে সমগ্র বিরোধী রাজনৈতিক মহলের পরিষ্কার একটি ধারণা সৃষ্টি হওয়ার ফলে আইয়ুব সরকার বিরোধী আন্দোলন কখনও বন্ধ হয়ে যায়নি। মাঝে মাঝে কিছুটা ধীর গতিতে চললেও ক্রমাগতই সে আন্দোলন শক্তি অর্জন করে।

১৯৬৭ সালের শেষের দিকে পাকিস্তানের রাজনীতিতে একটি নতুন মেরুকরণ আসন্ন হয়ে ওঠে। প্রথমতঃ এবডোপ্রাপ্ত নেতারা পুনরায় নাগরিক অধিকার ফিরে পান। পূর্ব পাকিস্তানের আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমদ, হামিদুল হক চৌধুরী এদের মধ্যে

---

৩৬৯ সাপ্তাহিক জনতা, ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৬৬।

৩৭০ প্রাগুক্ত।

৩৭১ সাপ্তাহিক জনতা, ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৬৬।

৩৭২ প্রাগুক্ত।

৩৭৩ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যতম। কিন্তু ইতিমধ্যেই এ সকল নেতা রাজনীতির মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তবে পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রে অবস্থা ছিল কিছুটা ভিন্ন। মুসলিম লীগের প্রাক্তন সকল নেতা এ সময় আবার রাজনীতি করার অধিকার ফিরে পান। এদের মধ্যে আব্দুল কাইয়ম খান ও মমতাজ দৌলতানা ছিলেন অন্যতম। তারা হৃত অধিকার ফিরেপেয়েই সকল বিরোধী দলকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। কাইয়ুম খান কেবল প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দাবীতে আইয়ুব সরকার-বিরোধী সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান। এতে পূর্ব পাকিস্তানে খুব বেশী সাড়া না মিললেও পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপক সাড়া পড়ে। তবে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে সে সময় আরো দু'টি প্রশ্ন খুবই প্রবল হয়ে দেখা দেয়। প্রথমটি হল পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন, এতে এখানকার জননির্বিশেষে সকল দলই তখন ঐক্যমত্য পোষণ করে। অনেকেই আওয়ামী লীগের ৬-দফাকে সমর্থন করতো না, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি তখন গণদাবীতে পরিণত হয়েছিল।[৩৭৪] ফলে জামাত-ই-ইসলামী কিংবা মুসলিম লীগ পর্যন্ত এ দাবীতে ঐকমত্য পোষণ করছিল। অন্য দিকে, সে সময় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি ঘটে এবং দেশব্যাপী খাদ্য সংকট দেখা দেয়। আগের বছরের ব্যাপক বন্যা এবং ধানের মৌসুমে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের কারণে খাদ্য সংকট তীব্রতর রূপলাভ করে। ফলে এ প্রশ্নটি এড়িয়ে অন্য কোন প্রশ্ন নিয়ে সরকার-বিরোধী কোন আন্দোলন হতে পারে বলে তখন কারো পক্ষে ভাবা সম্ভব হয়নি। এ পর্যায়ে শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাত্রার মান সাংঘাতিকভাবে নেমে যায়। শ্রমিকদের শ্রেণীগত দাবী নিয়ে ১৯৬৪ সালের শেষ দিক থেকে যে ব্যাপকতর আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৯৬৫ সালের পাক ভারত যুদ্ধের সময়তা বন্ধ হয়ে যায়। যে মজুরী পেয়ে ১৯৬৪ সালেই শ্রমিকশ্রেণীর জীবনযাপন কঠিন হয়ে উঠেছিল, ১৯৬৬ সালে সে একই মজুরীতে জীবন ধারণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু ১৯৬৫ সালের যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে ব্যাপক অনৈক্য এবং আইয়ুব সরকারের প্রতি বামপন্থীদের একাংশের মধ্যে এক ধরণের বিভ্রান্তিকর সহানুভূতি শ্রমিক আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করে। তবে আইয়ুব খানের সাম্প্রতিক বক্তব্য এবং তার আইনমন্ত্রীর মন্তব্য নিয়ে পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে যে সমালোচনার ঝড় ওঠে তার ফলে উক্ত বামপন্থী মহলের মধ্য থেকেও আইয়ুব সরকারের প্রতি দুর্বলতা অনেকাংশে কেটে যায়। তখন শ্রমিকশ্রেণীসহ সমগ্র মেহনতি ও নিম্নবিত্ত মানুষের দাবী আদায়ের সংগ্রাম অগ্রসর করে নেওয়ার মত একটি বাস্তবতা তৈরী হয়।

একটানা ৫৫ দিন ধর্মঘট করেও যে শ্রমিকরা তাদের শ্রেণী দাবী আদায় করতে পারেনি শ্রমিক সমাজের সেই বৃহত্তর গোষ্ঠী তথা পাটকল শ্রমিকরা আন্দোলন সংগঠিত করতে এবার প্রথম উদ্যোগটি গ্রহণ করেন। তাঁরা তাদের বিভিন্ন দাবী দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে ১৯৬৭ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম থেকেই অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট আহবান করে। মোহাম্মদ তোয়াহা ও আবুল বাসারের নেতৃত্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান চটকল শ্রমিক ফেডারেশন এ ধর্মঘটকে জোরালোভাবে সমর্থন করে। উক্ত দু'জন নেতা এক যুক্ত বিবৃতিতে বিভিন্ন ধরনের চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র ও লোভ-লালসার সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে মত প্রকাশ করেন যে, যেহেতু ধর্মঘট শুরু করা হয়েছে সেহেতু সম্মানজনক একটি মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট বন্ধ করা যাবেনা এবং কোন ট্রেড ইউনিয়নই যাতে শ্রমিকদের স্বার্থ ক্ষুন্ন করে এককভাবে মালিকের সাথে আপোস না করে সে জন্য আহবান জানানো হয়। উপরন্তু, সকল ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে ধর্মঘট পরিচালনার জন্য একটি সংগ্রাম কমিটি গড়ে তোলা হয়, যাতে কেউ এককভাবে মালিকপক্ষের সাথে চুক্তি করতে না পারে।[৩৭৫]

মওলানা সায়দুর রহমান ও আব্দুল মান্নানের নেতৃত্বাধীন চটকল ফেডারেশন চটকল শ্রমিকদের এ ধর্মঘট আহবান করে। উক্ত সংগঠন ধর্মঘটের দাবীসমূহের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে ১১ই জানুয়ারি সংবাদপত্রসমূহে একটি বিশাল বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে। এ বিজ্ঞাপনে যে তিন দফা দাবী প্রকাশ করা হয় সংক্ষিপ্তভাবে সেগুলি হচ্ছেঃ (১) এডিশনাল বেনিফিট প্রদান, (২) পিস রেট শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী প্রদান এবং (৩) ২০ টাকা মণ দরে চাউল ও ১০ টাকা মণ দরে গম প্রদান।[৩৭৬] এ ধর্মঘটের প্রস্তুতি এত জোড়েসোড়ে গ্রহণ করা হয় যে, সরকার ও মালিক পক্ষ এতে ঘাবড়ে যায় এবং এই প্রথম আন্দোলন শুরুর আগেই সরকার আপোসের প্রস্তাব নিয়ে চটকল শ্রমিক প্রতিনিধিদের সাথে আলাপ-আলোচনায় বসে। এ আলোচনায় সরকার ও মালিক পক্ষ দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করে এবং ২ মাসের মধ্যে দাবী মেনে নেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। উপরন্তু, শ্রমিক, মালিক ও সরকার এই তিন পক্ষের আলোচনা শেষ হওয়ার অন্তর্বর্তীকালে পিস রেট শ্রমিকদের মজুরী সম্পর্কে এ মর্মে সমঝোতাহয় যে, এডিশনাল বেনিফিট হিসাবে নিয়মিত শ্রমিকরা যথাক্রমে ৫০ টাকা ও ২৫ টাকা অগ্রিম পাবে।[৩৭৭]

এদিকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অধঃস্তন কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের ওপর সরকারী বিধি নিষেধকে কেন্দ্র করে কর্মচারীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ই.পি.আই.ডি.সি, ওয়াপদা, ওয়াসা, তিতাস, ডি.আই.টি, ইপসিক, বিদ্যুৎসহ মোট ১০টি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের ১৭ জন কর্মকর্তা সরকারের এ ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ করে ১১ই জানুয়ারি সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি প্রদান করেন। তাঁরা বিবৃতিতে উল্লেখ করেন যে, সত্তর উক্ত ঘোষণা প্রত্যাহার করা না হলে নিতান্ত অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে তাঁরা সর্বশক্তি নিয়োগ করে উক্ত বেআইনী আদেশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে।[৩৭৮]

উপরোক্ত ঘটনার ১০ দিনের মধ্যেই ঢাকা শহরে পরিবহন শ্রমিকরা তাদের শ্রেণীগত দাবী-দাওয়া নিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু করে। ফলে ঢাকা শহরের সমগ্র যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় ভেঙ্গে পড়ে। ২৩ শে জানুয়ারি ধর্মঘটের তৃতীয় দিনে ঢাকা শহরের পরিবহন শ্রমিকদের দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে সারা প্রদেশের পরিবহন শ্রমিকরা প্রতীক ধর্মঘট পালন করে। এর ফলে শ্রমিকদের দাবীর প্রতি মালিক পক্ষ গুরুত্ব দিতে বাধ্য হয় এবং সমঝোতার মধ্য দিয়ে ধর্মঘটের অবসান ঘটে। এ সময় ন্যাশনাল ব্যাংক ও ওয়াপদা কর্মচারীরাও ধর্মঘটের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

১৯৬৭ সালের ২৭শে জানুয়ারি টাঙ্গাইলে অনুষ্ঠিতব্য পাট চাষী সম্মেলনকে সামনে রেখে মওলানা ভাসানী ও তার কৃষক সংগঠন বছরের শুরু থেকেই বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। মওলানা ভাসানী প্রথম সপ্তাহেই ৭টি বিশাল কৃষক-জনসভায় ভাষণ দেন। উক্ত

---

[৩৭৪] সাপ্তাহিক জনতা, ১লা জানুয়ারি, ১৯৬৭।

[৩৭৫] সাপ্তাহিক জনতা, ২২শে জানুয়ারি, ১৯৬৭।

[৩৭৬] সাপ্তাহিক জনতা, ২২শে জানুয়ারি, ১৯৬৭।

[৩৭৭] সাপ্তাহিক জনতা, ২২ই জানুয়ারি, ১৯৬৭।

[৩৭৮] সাপ্তাহিক জনতা, ১১ই জানুয়ারি, ১৯৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

পাট চাষীর মহাসমাবেশ উপলক্ষ্যে সারা প্রদেশব্যাপী কৃষক সমিতির জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে থাকে এবং জেলা সম্মেলন সফলের জন্য অসংখ্য জনসভার আয়োজন হয়। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন জেলার সম্মেলনগুলিতে যোগদান করেন কিংবা এসব জনসভায় বক্তৃতা করেন। ১৯৬৭ সালের ২৭শে জানুয়ারি অনুষ্ঠিত উক্ত পাট চাষী সম্মেলনে মাওলানা ভাসানী বলেন, আইয়ুব সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী পাটনীতি, খাদ্যনীতি এবং শিল্প ও বাণিজ্যনীতি সমগ্র জাতির জীবনে এক ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে এনেছে। আর সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ এ বিপর্যয়ের আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তিনি পাকিস্তানের অর্থনীতিতে পাটের গুরুত্বকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে চাষীদের করুন অবস্থা জনসমক্ষে তুলে ধরেন। মওলানা ভাসানী তাঁর বক্তৃতায় বলেনঃ "পাকিস্তান একটি ধনবাদী সামন্তবাদী রাষ্ট্র। আর এ রাষ্ট্রের পরিচালক শক্তি হল এদেশীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিরা। এই একচেটিয়া পুঁজিপতিরাএকদিকে বিভিন্ন জাতির বিকাশের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের প্রতিটি জাতির স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করছে। আর অন্যদিকে, এরা শিল্প বিকাশের প্রয়োজনীয় আদিমপুঁজি সংগ্রহের জন্য ঔপনিবেশিক শাসকদের মতই নিষ্ঠুর ও নগ্নভাবে এদেশের শ্রমিক-কৃষক আপামর জনসাধারণকে বর্বরভাবে লুন্ঠন করে চলেছে।[৩৭৯] মওলানা ভাসানী ব্যাখ্যা করে আরো বলেন, মিল মালিক, ব্যবসায়ী ও ধনিক-বণিকরা এই 'স্বর্ণসূত্র' অসহায় চাষীদের হাত থেকে নামমাত্র মূল্যে লুন্ঠন করে নিয়ে যায় এবং তারপর ১০/১৫ গুণ বেশী দামে বিদেশে বিক্রয় করে মুনাফার পাহাড় গড়ে তোলে। এ অবস্থাকে কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এর পর, 'পাটের সর্বনিম্ন মূল্য ৫০ টাকা', সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানকে দুর্ভিক্ষ এলাকা ঘোষণা, বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ, খাজনা ট্যাক্স হ্রাস ও লাঙ্গল যার জমি তার সহ বিভিন্ন দাবী উথাপন করা হয়। পরিশেষে সংগঠন ও সংগ্রাম ছাড়া পাট চাষীদের বাঁচার কোন পথ নেই বলে মন্তব্য করে উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি একচেটিয়া পুঁজিপতি, সরকারী কর্তৃপক্ষ, পাট ব্যবসায়ী ও ফড়িয়াদের বিরুদ্ধে দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আহবান জানানো হয়।

এ সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এবড়ো মুক্ত নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে সকল বিরোধী দলের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। এ ব্যাপারে ১৯৬৭ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে ঢাকা বার লাইব্রেরী হলে নূরুল আমিনের সভাপতিত্বে বিরোধী দলের ঐক্য সংক্রান্ত একটি সেমিনার' অনুষ্ঠিত হয়। এ সেমিনারে উদ্যোক্তাগণ সর্বজনীন ভোটাধিকারের দাবীর ভিত্তিতে সকল বিরোধী দলের ঐক্য কামনা করেন। আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি ঐক্যের ভিত্তি হিসাবে ৬-দফা এবং ন্যাপের প্রতিনিধি মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারের পাশাপাশি কৃষক-শ্রমিকের মূল দাবী-দাওয়াকে সন্নিবেশিত করার আহবান জানান।[৩৭৯ক] ফলে এ সেমিনারে সামগ্রিকভাবে কোন ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি হয় নি। বিরোধী দলগুলি ঐক্যবদ্ধ না হলেও জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সরকার বিরোধী সদস্যগণ বেশ ঐক্যবদ্ধভাবে সরকারের বিভিন্ন দমনমূলক কার্যকলাপকে বিরোধিতা করতে থাকেন। বিশেষতঃ শিক্ষাঙ্গনে গুন্ডামি ও ১৯৬১ সালের অগণতান্ত্রিক বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্সের ব্যাপারে বিরোধী দল অত্যন্ত বলিষ্ট ভূমিকা পালন করে। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরসহ কয়েককজন শিক্ষককে অন্যায়ভাবে পদচ্যুত করা ও প্রমোশন বন্ধ করে দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিরোধী দলসমূহ সমবেতভাবে আইয়ুব সরকারের সমালোচনা করে এবং ছাত্র ও শিক্ষকদের ওপর অন্যায়-অত্যাচারের মর্মস্পর্শী বিবরণ প্রকাশ করে। অন্যদিকে, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব এসবের প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ না করে ইসলামী জাতীয়তাবাদ আর শক্তিশালী কেন্দ্র গঠনের পক্ষে জোর প্রচার চালাতে থাকেন। ১৯৬৭ সালের ১৫ই জানুয়ারি তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, ইসলামী জাতীয়তাবাদ আর শক্তিশালী কেন্দ্র পাকিস্তানের পক্ষে অত্যাবশ্যক। এ বক্তৃতায় তিনি কোন দলের নাম উল্লেখ না করলেও পরোক্ষভাবে আওয়ামী লীগের ৬-দফার প্রতি তীব্র আক্রমণ করেন এবং তাদেরকে বিদেশী শক্তির ক্রীড়নক ও পাকিস্তান ভাঙ্গার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। সেই সাথে সরকারী দল কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধী দলের প্রতি অতিশয় অগণতান্ত্রিক ও অসহিষ্ণু আচরণ আরম্ভ করে। এ সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদসহ বিভিন্ন হল সংসদের নির্বাচনে সরকারী ছাত্র সংগঠন(এন,এস,এফ) চরম পরাজয়ের সম্মুখীন হলে তারা ন্যাক্কারজনক গুন্ডামি ও সন্ত্রাসের আশ্রয় নেয়। এ রকম একটি ঘটনা সম্পর্কে প্রাদেশিক পরিষদে মুলতবী প্রস্তাব উথাপন করতে গেলে নীতিবোধ উপেক্ষা করে স্পীকার ও সরকারী দল সে প্রস্তাব উথাপন করতে বাধা প্রদান করেন। ফলে বিরোধী দল ওয়াক আউট করতে বাধ্য হয়। সে সময় আইয়ুব সরকার এমন একটি নির্যাতনমূলক নীতি গ্রহণ করে যে, স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত যেকোন সংবাদ প্রকাশ এবং জাতীয় পরিষদে তা নিয়ে আলোচনা করা কিংবা প্রশ্ন তোলাও নিষিদ্ধ করা হয়।

এরকম একটি শাসরুদ্ধকর পরিবেশে পশ্চিম পাকিস্তানের রেলওয়ে শ্রমিকরা ১লা ফেব্রুয়ারি থেকে তাদের বিভিন্ন দাবী দাওয়া নিয়ে লাগাতার ধর্মঘট শুরু করে এবং প্রদেশের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে যায়। ৩রা ফেব্রুয়ারি পুলিশ ও সেনাবাহিনী রেল শ্রমিকদের ওপর গুলি বর্ষণ করে। এতে শ্রমিকরা আরো বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ইতিপূর্বে তারা তাদের সংগঠনের দালাল নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে নিজেরাই আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। এ পর্যায়ে পুলিশের গুলিবর্ষণে ও বহু শ্রমিক আহত হলে তাঁরা মারমুখী হয়ে ওঠে এবং সরকারি সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। লাহোর সহ বিভিন্ন বড় বড় শহরে ব্যাপক সংখ্যক সৈন্য নামিয়ে পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।

পাকিস্তানের উভয় অংশে যখন সরকারী নির্যাতন ও দমনমূলক কার্যকলাপ এত তীব্র রূপ ধারণ করে ঠিক তখনও দেখা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানের চীনপন্থী নেতৃত্বের কেউ কেউ আইয়ুব সরকারের প্রতি মোহাবিষ্ট। পূর্বোক্ত পাট চাষীদের জনসভার বক্তৃতায় একজন বিখ্যাত চীনপন্থী নেতা আব্দুল হক আয়ুব সরকারকে মার্কিন ধরনের গণশত্রু হিসাবে চিত্রিত করেন এবং সরকারকে সমালোচনারচেয়ে সাম্রাজ্যবাদকে মূল শত্রু হিসাবে বিবেচনা করেন। তিনি রাষ্ট্রের প্রতি কোন অভিযোগ না এনে সরকারী ক্ষমতার মূল উৎস হিসাবে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার জন্য পাট চাষীদের আহবান জানান।[৩৮০] কিন্তু যে সরকার জনসাধারণের দাবী দাওয়া উথাপনের মৌলিক অধিকারকে নির্মমভাবে স্তব্ধ করে চলেছিল তার বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সচেতন করে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রতি তেমন জোর দেওয়া হয় নি। কিন্তু ঐ সময়ে মস্কোপন্থী নেতৃবৃন্দ জোরালোভাবে আইয়ুব সরকারের সমালোচনা করেন। স্বেচ্ছাচারী শাসন স্থায়ী করার লক্ষ্যেই যে বিভিন্ন নির্যাতনমূলক আইন পাস করা হচ্ছে এবং জরুরী আইনকে এজন্য স্থায়ীভাবে বহাল রাখা হচ্ছে-

৩৭৯ সাপ্তাহিক জনতা, ২২মে জানুয়ারী, ১৯৬৭।
৩৭৯ক সাপ্তাহিক জনতা, ১১ই জানুয়ারী, ১৯৬৭।
৩৮০ সাপ্তাহিক জনতা, ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

মস্কোপন্থী ন্যাপ নেতা আহমেদুল কবীর প্রাদেশিক পরিষদে তাঁর বক্তৃতায় এ সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করেন। এভাবে ন্যাপের মধ্যে অবস্থানরত দু'টি অংশের মধ্যে পার্থক্য প্রকাশ্যরূপ লাভ করতে থাকে।

১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে ৬ থেকে ৮ বছরের জন্য চা বাগানের কৃষি আয়কর মওকুফ করার সুপারিশ করা হয়। ন্যাপ ও আওয়ামী লীগের পরিষদ সদস্যরা এ সুপারিশকে যৌথভাবে সমালোচনা করেন। আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য আবদুল মালেক বলেন, "বন্যা, বাত্যা, জলোচ্ছ্বাস ও ভাঙ্গনে সর্বস্বান্ত কৃষকদেরকে খাজনা মওকুফ করার পরিবর্তে সরকার পুঁজিপতিদের বিভিন্ন অংশের কর মওকুফ করে চলেছেন। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের যুক্তিকে খন্ডন করে তিনি বলেন পুঁজিপতি চা বাগান মালিকদেরকে যদি কর মওকুফ করা যায় তাহলে পাট চাষীও মৎস্যজীবীদের ওপর থেকেও কর মওকুফ করা যাবে না কেন? তিনি পুঁজিপতিদের প্রতি সরকারের পক্ষপাতিত্বের সমালোচনা করে বলেন, একদিকে ধনিকদের কর মওকুফ করা হচ্ছে আর অন্যদিকে সাধারণ মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য যেমন, কেরোসিন, লবণ, মোটা কাপড়ের সূতা ইত্যাদির ওপর ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হয়েছে, জলকর ও উন্নয়ন লেভী ধার্য করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ন্যাপ দলীয় সদস্য ডাঃ আহাদ আলী খান সরকার উত্থাপিত উক্ত বিলের তীব্র সমালোচনা করে বলেন "জনসাধারণের চর্তুদিকে আইনের বেড়া রচনা করা হচ্ছে। এ বেড়াজালে জনগণের দম যেদিন বন্ধ হবে সেদিন তাঁরা আইনের বেড়া ভাঙ্গতে অগ্রসর হবে। তাঁরা আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করবে আর দেশীয় জালেমরা সেই জনজোয়ারের প্লাবনে ভেসে গিয়ে তাঁদের বিদেশী মুরুব্বীদের কেল্লায় গিয়ে ঠাঁই নিবে।"[৩৮১] মোসলেম উদ্দীন খান বলেন, সরকার একদিকে ধনী মালিকদের সুবিধার্থে বিলটি পেশ করেছে, অন্যদিকে অন্যান্য শ্রমিকদের ন্যায় চা শ্রমিকদের সংগঠন গড়ার অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করে চলেছে। বর্তমান সরকারের মূল ভিত্তি হচ্ছে সেনাবাহিনী, আমলাতন্ত্র, পুঁজিপতি শ্রেণী ও মৌলিক গণতন্ত্রী।[৩৮২] এভাবে ন্যাপ ও আওয়ামী লীগের অন্যান্য সদস্যও সরকারী নীতির তীব্রসমালোচনা করেন এবং ধনী পুঁজিপতিদের পক্ষে সরকারের এ ধরণের প্রত্যক্ষ পক্ষপাতিত্বকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেন। এসব সমালোচনার প্রতি সরকার মোটেই কর্ণপাত করে নি এবং একের পর এক বিল উত্থাপন করে মধ্য ও নিম্নবিত্তদের ওপর বিপুল পরিমাণ ট্যাক্স আরোপের করে।

এ কারণে শুধু সংসদের ভেতরেই নয়, তার বাইরেও সরকারের জুলুম ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। সরকারের অগণতান্ত্রিক ও নিপীড়নমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী যেসকল জনসভা অনুষ্ঠিত হয় সে সবের অধিকাংশই ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির দ্বারা সংগঠিত হয়। ন্যাপ সমর্থিত কৃষক সমিতি দারিদ্র দূরীকরণ ও দ্রব্যমূল্য হ্রাস, পাটের দাম বৃদ্ধি ও বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবীতে ব্যাপক প্রচার আন্দোলন শুরু করে। সরকারী নিপীড়ন ও গুন্ডামীর বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারা দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আরম্ভ হয়ে যায় ছাত্র ধর্মঘট। এভাবে পরিস্থিতি ক্রমশঃ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এ পর্যায়ে শ্রমিক-কর্মচারীরাও তাদের দাবী দাওয়া নিয়ে আবার ব্যাপকভাবে আন্দোলনের সূত্রপাত করে। সারা ১৯৬৭ সাল ব্যাপকতর শ্রমিক-কর্মচারী আন্দোলন সংগঠিত হয়।

ওয়াপদার শ্রমিক-কর্মচারীরা এ সময় প্রথম আন্দোলনের সূত্রপাত করে। তারা তাঁদের ১১-দফা দাবী নিয়ে সরকারের সকল বিধি-নিষেধ অমান্য করে এক জঙ্গী আন্দোলন শুরু করে। তাঁরা ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে ধর্মঘট শুরু করার ডাক দেয়। ধর্মঘটের প্রস্তুতি হিসাবে তারা বিশাল বিশাল জনসভা, প্রতিবাদ সভা ও জঙ্গী বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। এ অবস্থাতেই সরকার তাদের ওপর তীব্র দমননীতি প্রয়োগ করে এবং বিভিন্ন ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করতে শুরু করে। উক্ত প্রস্তাবিত ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে ঢাকা, তেজগাঁও, সিদ্ধিরগঞ্জ, কাপ্তাই, গোয়ালপাড়া ও অন্যান্য স্থানের শ্রমিক-কর্মচারীদের নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করার পর দেখা যায়, এ আন্দোলন-ধর্মঘট আরম্ভ হওয়ার আগেই তা' জঙ্গী ও আপোসহীন আকার ধারণ করে। ওয়াপদার শ্রমিক-কর্মচারী নেতৃবৃন্দের পাইকারী গ্রেফতার এবং সকলেরওপর গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করার ফলে তাঁরা তাদের ধর্মঘট সাময়িক স্থগিত রাখে। তারপরও গ্রেফতারী পরোওয়ানা জারি ও নিরাপত্তা আইনে শ্রমিক নেতাদের গ্রেফতার চলতে থাকলে ৯টি প্রধান স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ইউনিয়ন কর্মকর্তা ও পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ এক যুক্ত বিবৃতিতে উক্ত অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ এবং ওয়াপদা শ্রমিক-কর্মচারীদের ১১ দফা দাবী মেনে নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান।

ওয়াপদার শ্রমিক কর্মচারীদের এ আন্দোলনের অব্যবহিত পরেই সরকারী নিম্ন কর্মচারীরা তাদের বেতন বৃদ্ধির দাবীতে এক ব্যাপক আন্দোলনের সূচনাপর্বে ১৫-দফা দাবী সম্বলিত এক স্মারকলিপি সরকারের কাছে পেশ করেন। মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে তারা এক বিশাল সমাবেশের আয়োজন করে এবং সত্বর ১৫-দফা মেনে না নিলে চরমপন্থা অবলম্বন করা হবে বলে তারা ঘোষণা দেয়। এর পর সারা দেশে শ্রমিক ধর্মঘট শুরু হয়ে যায়। চটকল শ্রমিকরা মার্চ মাসের প্রথম থেকে একটানা ৫৫ দিন ধর্মঘট পালন করে। শ্রমিক নেতৃবৃন্দের কোন কোন অংশের আপোসকামিতা সত্ত্বেও লক্ষাধিক শ্রমিকের এ ধর্মঘট ছিল অবিস্মরণীয়। চটকল শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া মেনে নেওয়ার শর্তে দুইমাস আগে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল মালিকপক্ষ ও সরকার সে চুক্তি বাস্তাবায়ন না করার ফলে এ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। অন্য শ্রমিকরাও এ ধর্মঘটকেব্যাপকভাবে সমর্থন করে এবং এদের দাবী-দাওয়া মেনে নেওয়ার জন্য বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকরা প্রতীক ধর্মঘট পালন করে। এ সময় এত অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকরা তাদের দাবী-দাওয়া নিয়ে ধর্মঘটে অবতীর্ণ হয় যে, তার বিস্তৃত বিবরণ এখানেদেওয়া বাস্তবিকই অসম্ভব। এ সকল ধর্মঘট এমন সফল হয় যে, সরকারের বা মালিক পক্ষের কিছুই করা সম্ভব হয় নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে সরকার বা মালিকপক্ষ শ্রমিকদের প্রায় অধিকাংশ দাবী মেনে নেওয়া সত্ত্বেও ধর্মঘট অব্যাহত থাকে। শ্রমিকরা তাদের সকল দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত কোন আপোষ করবে না বলে ঘোষণা দেয়।

এ সময় ন্যাপ ও কৃষক সমিতির নেতৃত্বে সমগ্র প্রদেশব্যাপী কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। হাট, ঘাট, জলা, মহাজনী প্রথা, খাদ্য, খাজনা-ট্যাক্স ইত্যাদি কৃষকদের সমস্যা নিয়ে এ সকল আন্দোলন অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ১৯৬৭ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানের ৮০ লক্ষ মৎসজীবীকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে জামালপুরের নান্দিনাতে তাদের এক প্রতিনিধি সম্মলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রদেশের সকল জেলা ও মহকুমার প্রতিনিধি ছাড়াও এ সম্মেলনে বিপুল সংখ্যক মৎস্যজীবী ও অন্যান্য পেশার লোকের সমাবেশ ঘটে। এ সমাবেশে

৩৮১ সাপ্তাহিক জনতা, ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭।

৩৮২ প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

আগত মৎস্যজীবীদের মূল শ্লোগান ছিল "জাল যার জলা তার", স্বল্প মূল্যে খাদ্য চাই, ইজারাদারের শোষণ থেকে মুক্তি চাই, ১২ বছরের জন্য জলার ইজারা চাই, মৎস্যজীবীদের বাঁচার অধিকার দিতে হবে, ইত্যাদি। এ সম্মেলনে জলার ওপর প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অধিকার প্রতিষ্টা, মধ্য স্বত্বভোগীর বিলোপ সাধন, প্রতিটি থানায় মৎস্যজিবী সমবায় সমিতি গঠন ও তাদের কাছে জলাগুলীকে ১২ বছরের গড় মূল্যে ইজারা প্রদান, বিনা সুদে ঋণ প্রদান, তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনেরমোকদ্দমা ও সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার, উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের জীবনের নিরাপত্তা বিধান, জলাসমূহের সংস্কার এবং সরকারী দপ্তরও শিল্পে চাকরি প্রদানসহ বিভিন্ন দাবী জানানো হয়।[৩৮৩] এ সময় সারা দেশে খাদ্যের দাবীতে কৃষকদের বিশাল বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। শুধু প্রদেশের বিভিন্ন জেলা ও মহকুমাতেই নয় ঢাকা জেলায়ও কৃষকদের এ আন্দোলন তীব্ররূপ ধারণ করে। ঢাকায় ১৯৬৭ সালের ৫ই মার্চ ঢাকা জেলা কৃষক সমিতি আয়োজিত এক সমাবেশে যোগদান উপলক্ষে ঢাকার রায়পুরা থানা থেকে প্রায় দশ হাজার কৃষক-জনতা পায়ে হেটে যাত্রা করে। শুধু রায়পুর নয় ঢাকার বিভিন্ন এলাকা থেকে ব্যাপক কৃষক-জনতা এ সমাবেশে যোগ দেয়। তৎকালীন সরকার এ ধরনের ব্যাপক কৃষক-জনতার সমাবেশ পছন্দ করেনি। আর তাই বিভিন্ন এলাকার কৃষকরা যাতে শহরে ঢুকতে না পারে সে জন্য সরকার ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করে কৃষকদের মিছিলগুলীকেছত্রভঙ্গ করে দেয় এবং শতাধিক কৃষককে গ্রেফতার করে। তারপরও ঢাকায় কৃষক-জনতার এ মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তবে বন্দীমুক্তি, জরুরী আইন প্রত্যাহার ও খাদ্যের দাবীতে যে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শনের কথা ছিল তা সেরূপ হতে পারেনি। উক্ত মহাসমাবেশের ১০ দিন পর কৃষকদের এক শান্তিপূর্ণ মিছিলের ওপর পুলিশের আক্রমণ ও গ্রেফতারের প্রতিবাদে রায়পুরায় এক বিশাল প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে অন্যুন ১০ হাজার কৃষকের সমাবেশ ঘটে। এ ঘটনা থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, সারা দেশব্যাপী কৃষক সমিতি যেসব কৃষক সমাবেশ করে চলেছিল তা মোটেই উপেক্ষনীয় নয়।

এ সময় ছাত্র, সংস্কৃতিকর্মী ও পেশাজীবীদের আন্দোলন সেভাবে ব্যাপকতা লাভ না করলেও সারা দেশের শ্রমিক-কর্মচারী ও কৃষক সমাজের বিশাল বিশাল সমাবেশ ও বিক্ষোভ আন্দোলন তাদের ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলে। তখন রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি ছাত্রদের মনে এক ধরনের অসন্তোষের জন্ম হয়। ২১শে ফেরুয়ারি উপলক্ষে আয়োজিত পল্টন ময়দানের জনসমাবেশে ছাত্রদের এ অসন্তোষ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। এ সমাবেশে ছাত্র, শ্রমিক, সংস্কৃতি কর্মীসহ বিভিন্ন স্তরের মানুষ যোগদান করে। ছাত্র নেতারা ঐকাবদ্ধ আন্দোলনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বক্তৃতা দেয়। এরকম একটি দমনমূলক ব্যবস্থার অধীনে থেকেও কেন রাজনৈতিক দলগুলির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সম্ভব হচ্ছে না- সে প্রশ্ন তুলে ছাত্র নেতৃবৃন্দ বিস্ময় প্রকাশ করে। তাঁরা আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান।[৩৮৪] শুধু ছাত্র নেতৃবৃন্দই নয়, সরকারের দমনমূলক নীতির মোকাবিলা করতে গিয়ে বিভিন্ন জেলায় সকল বিরোধী দল ইতিমধ্যেই ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী পালন করতে শুরু করে। বিভিন্ন জেলায় সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয় এবং তারা সকলই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আহবান জানান। তবে এসব ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচীতে স্বায়ত্তশাসনের তুলনায় দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ, পুলিশী নির্যাতন ও সরকারের অগণতান্ত্রিক আচরণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।[৩৮৫]

এ সময় কেন্দ্রীয়ভাবে কোন ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী দেওয়া সম্ভব হয়নি, তবে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সে কর্মসূচী গ্রহণের জন্য বেশ উদ্যোগ-আয়োজন চলতে থাকে। দেশের দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলিও সরকারের দমন- নীতির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করতে থাকে এবং এসব বিষয়ে সম্পাদকীয়-উপসম্পাদকীয় প্রকাশ করতে থাকে। এ সকল উপ-সম্পাদকীয়তে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী গ্রহণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ পর্যায়ে পূর্ব পকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের (মেনন) এক বিশেষ কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত তিন দিন ব্যাপী এ কর্মী সম্মেলনে ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং সে লক্ষ্যে ৫ দফা কর্মসূচী গৃহীত হয়। এসবের মধ্যে ছিলঃ (১) ছাত্রবেতন হ্রাস ও হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিল, (২) খাদ্য সমস্যার সমাধান, (৩) দমননীতি বন্ধ, (৪) স্বায়ত্তশাসন প্রদান এবং (৫) সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষতঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত প্রতিরোধ। এ সম্মেলনে এ মর্মে অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের স্বার্থে প্রয়োজনবোধে প্রথম তিনটি দাবীকে ঐক্যের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।[৩৮৬] অন্যদিকে, সদ্য এবডো মুক্ত নেতারা বিরোধী দলগুলির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য খুবই তৎপর হয়ে ওঠেন। কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের সভাপতি মোমতাজ দৌলতানা, পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান ও নেজামে ইসলাম নেতা চৌধুরী মোহাম্মদ আলী এ লক্ষ্যে ঢাকায় আসেন এবং মওলানা ভাসানীসহ পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের সাথে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা শুরু করেন। এ সকল কেন্দ্রীয় নেতা দেশব্যাপী সফর করেন। কিন্তু ৬-দফার ব্যাপারে আওয়ামী লীগের অনমনীয় মনোভাব এবং এক ইউনিট ব্যাবস্থা ও বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে ন্যাপের অনড় দৃষ্টিভঙ্গী নেতৃবৃন্দের উক্ত ঐক্য প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে।এ সত্ত্বেও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, পাকিস্তান মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান, আওয়ামী লীগ ও পাকিস্তান নেজামে ইসলাম পার্টি মিলে পাকিস্তান ডেমোক্রাটিক মুভমেন্ট (পিডিএম) নামে একটি ঐক্য ফ্রন্ট গঠিত হয়। এ নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের মধ্যে ব্যাপক দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ এ ফ্রন্টে যোগ না দিলেও মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশের নেতৃত্বে তার একটি শক্তিশালী অংশ পি.ডি.এম.-এর সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য সংগঠনের ওপর চাপ দিতে থাকে। কিন্তু শেখ মুজিব বা তাজউদ্দীনের অনুপস্থিতিতে আওয়ামী লীগের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত নেতৃবৃন্দ এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করেন। এমনকি, জাতীয় পরিষদের অধিকাংশ সদস্যও শুধুমাত্র সর্বজনীন ভোটাধিকারের প্রশ্নকে ভিত্তি হিসাবে ধরে পিডিএম এ যোগদান করাকে পছন্দ করেন নি। ফলে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের একটি বড় অংশ সংগঠন থেকে বেরিয়ে গিয়ে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের একটি ভিন্ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে। এভাবে আওয়ামী লীগ ৬-দফাপন্থী ও পিডিএম পন্থী- এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। অবশ্য এ বিভক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘটতে আরো চার মাস সময় অতিবাহিত হয়েছিল। সে যা'হোক, পিডিএম গঠিত হওয়ার পর এটি ৮-দফা কর্মসূচী প্রদান করে। পার্লামেন্ট পদ্ধতির সরকার, ১৯৫৬ সালের সংবিধান অনুযায়ী সর্বজনীন ভোটাধিকার ও পাকিস্তানের দুইঅংশের

[৩৮৩] সাপ্তাহিক জনতা, ৫ই মার্চ, ১৯৬৭।

[৩৮৪] প্রাগুক্ত।

[৩৮৫] সাপ্তাহিক জনতা, ৯ই এপ্রিল, ১৯৬৭।

[৩৮৬] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে বৈষম্য দুরীকরণসহ বেশ কিছু দাবী এতে অন্তর্ভূক্ত হয়। এ কর্মসূচীতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে বেশ কথা বলা হয়, কিন্তু প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বাণিজ্য, মুদ্রা ও কেন্দ্রীয় অর্থ ব্যবস্থা, আন্তঃ প্রাদেশিক যোগাযোগ ও বাণিজ্যসহ মৌলিক বিষয়সমূহকে কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে রাখার সুপারিশ এমনভাবে করা হয় যে, প্রকৃত পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি বিমূর্ত থেকে যায়। এভাবে যখন দেশের নামকরা প্রায় সকল নেতা একটি ফ্রন্টে সংগঠিত হতে যাচ্ছেন এবং যারা পাকিস্তান রাষ্ট্র ও তার আর্থসামাজিক রাজনৈতিক কাঠামোয় আঘাত না করে শুধুমাত্র আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে কর্মসূচী গ্রহণে উদ্যোগী হয়েছেন ঠিক তখন আইয়ুব খান ও তার সরকার এসকল নেতা ও তাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে কোন কথা না বলে বরং আওয়ামী লীগকে উদ্দেশ্য করেই প্রায় সকল বক্তব্য প্রকাশ করতে থাকে। আইয়ুব খান ১৯৬৭ সালের ৩১শে মার্চ ময়মনসিংহের এক জনসভায় ঘোষনা করেনঃ "যাহারা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে চেঁচামেচি করিতেছে তাহারা প্রকৃত পক্ষে দেশের দু'টি অংশের বিচ্ছিন্নতা কামনা করে। কিন্তু প্রকাশ্যে এই কুমতলব স্বীকার করার মতো সৎসাহস তাহাদের নাই। এই জন্যই তাহারা জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করিতেছে।[৩৮৭]

যে সময় আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ কারাগারে, রাজনৈতিক দল হিসাবে তেমন কোন সক্রিয় ভূমিকা পালন করা যখন আওয়ামী লীগের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে সে সময় সরকার বিরোধী আন্দোলনের জন্য যারা তৎপর তাদের প্রতি কোন মন্তব্য প্রকাশ না করে সরকার আওয়ামী লীগের রাজনীতিকেই প্রধানতঃ আঘাত করতে থাকে। শুধু স্বায়ত্ত শাসনের প্রশ্ন নয়, বাঙ্গালীর সাহিত্য ও সংস্কৃতির ওপরও এ সময় আঘাত আসতে থাকে। ১৯৬৭ সালের ২৩শে জুন স্থানীয় একটি দৈনিক পত্রিকায় খবর বের হয় যে, সরকার রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রচার হ্রাস ও বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ সংবাদ প্রকাশের পর পরই পূর্ব পাকিস্তানের ১৯ জন বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক,শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী ও সংস্কৃতিকর্মী এ সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করে বিবৃতি দান করেন। এ বিবৃতিতে তাঁরা বলেনঃ এ সিদ্ধান্ত আমরা অত্যন্ত দুঃখজনক বলে মনে করি। রবীন্দ্র নাথের সাহিত্য বাংলা ভাষাকে যে ঐশ্বর্য দান করেছে, তাঁর সঙ্গীত আমাদের অনুভূতিকে যে গভীরতা ও তীক্ষ্ণতা দান করেছে তা রবীন্দ্রনাথকে বাংলা ভাষাভাষী পাকিস্তানীদের সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেছে। সরকারী নীতি নির্ধারণের সময় এই সত্যের গুরুত্বকে মর্যাদা দান করা অপরিহার্য।[৩৮৮] মওলানা ভাসানী ২৮শে জুন পত্রিকায় এক বিবৃতি দিয়ে বলেনঃ

"তথ্যমন্ত্রী জনাব শাহাবুদ্দীন ঘোষণা করেছেন যে, রবীন্দ্র সংগীত ইসলাম ও পাকিস্তানের ঐতিহ্য পরিপন্থী বিধায় আর বেতার ও টেলিভিশন মারফত এটি পরিবেশিত হইবে না। কিছুদিন পূর্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জনাব সবুর খানও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনুরূপ বক্তব্য পেশ করেছিলেন। ... রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্য, সাহিত্য, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, নাটক ও উপন্যাস ও সংগীতের মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে নতুন গৌরবে অভিষিক্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের অবদান সর্বজনীন।

"ইসলাম সত্য ও সুন্দরের জন্য ঘোষণা করেছে। এই সত্য ও সুন্দরের পতাকা তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ।

"তাই, যারা ইসলামের নামে রবীন্দ্রনাথের উপর আক্রমণ চালাচ্ছেন তাঁরা আসলে ইসলামের সত্য ও সুন্দরের নীতিতে বিশ্বাসী নন।

"তাই আমি এই দেশের সাধারণ মানুষের প্রতি সরকারের এই প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করার জন্য আহবান জানাচ্ছি।"[৩৮৯]

শুধু বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী মহল ও মওলানা ভাসানী সরকারের রবীন্দ্র সংগীত নিষিদ্ধকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন তাই নয়, প্রদেশের সকল স্তরের মানুষের পক্ষ থেকেও সরকারী সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অনুসারী কতিপয় ব্যক্তি ছাড়া সাধারণভাবে সমগ্র বাঙ্গালী জনতার মধ্যেই এ ঘটনায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। আরবী হরফ সম্পর্কে যে বিতর্ক প্রায় দেড় যুগ আগে শেষ হয়ে গিয়েছিল, সেটি আবারও উত্থাপন করা হয়। এ বিতর্ক শুরু করেন বিচারপতি হামুদুর রহমান, যার শিক্ষানীতি নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজের মধ্যে ইতিমধ্যে ব্যাপক বিক্ষোভ ও আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল। হামুদুর রহমান ১৯৬৭ সালের ১৩ই আগস্ট "পাকিস্তানে বাংলা সাহিত্যের ২০ বছর" শীর্ষক এক আলোচনা সভায় মন্তব্য করেনঃ "দুটো জাতীয় ভাষার জন্যই আরবী হরফ চালু করা হলে তা জাতীয় সংহতি জোরদার করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।"[৩৯০] হামুদুর রহমানের এ ধরনের বক্তব্য প্রকাশের পর পরই পূর্ব পাকিস্তানের জনতার সকল স্তর থেকে তীব্র প্রতিবাদ উঠে এবং ঐ বিতর্কিত ব্যক্তিকে তার উক্ত বক্তব্যকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার দাবী জানানো হয়।

উল্লেখ্য, সর্ব-পাকিস্তান-ভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে একমাত্র ন্যাপ ছাড়া সকল দল যখন উক্ত ৮-দফা কর্মসূচী নিয়ে সরকার-বিরোধী আন্দোলনে শরিক হয়েছে তখন আইয়ুব সরকার ও তার অনুগ্রহপ্রাপ্ত কিছু ব্যক্তি পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন, তার ভাষা ও সংস্কৃতি ইত্যাদি প্রশ্নকে নতুনভাবে উপস্থাপন করে। আসলে আইয়ুব খান সে সময় ভাল করেই বুঝতে পারেন যে, ইসলামী জাতীয়তাবাদকে সামনে না এনে কেন্দ্রীভূত পাকিস্তান রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে ধরে রাখা যাবে না। ফলে সর্বপাকিস্তান ভিত্তিক জাতীয়তাবাদকে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগই ছিল তার সামনে প্রধান বাধা। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিই ছিল তখন সেখানকার প্রধান রাজনৈতিক ধারা। ফলে এন.ডি.এফ. নামক যে ফ্রন্টের জন্ম হয়েছিল তা একটি নিষ্ক্রিয় ফ্রন্টে পরিণত হয়। তাদের কোন কর্মসূচী সফল করে তোলার মত কর্মী ছিল না, কিংবা পূর্ব পাকিস্তানে উক্ত ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের এমন কোন জনপ্রিয়তা ছিল না যা দিয়ে তারা সহজে জনসাধারণকে আন্দোলিত করতে পারতেন।

অল্পদিনের মধ্যেই এন.ডি.এফ. তাই একটি অকার্যকর শক্তিতে পরিণত হয়। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি জাতি হিসাবে বাঙ্গালীর প্রশ্নকে বড় করে দেখলেও বৈদেশিক নীতির প্রশ্নে আইয়ুবের অবস্থানকে উহার কয়েকজন নেতা যথাযথ বলে মনে করার কারণে তখন তাঁরা আইয়ুব সরকারের পতনের জন্য তেমন কোন আন্দোলনে উদ্যোগী হননি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই আইয়ুব সরকার-বিরোধী মূল শক্তি হিসাবে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগই আবির্ভূত হয়। আওয়ামী লীগ সে সময় সাংগঠনিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়লেও পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন তথা ৬-দফার প্রশ্নে ছিল আপোসহীন। এ সময় বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকে নীরবে

---

[৩৮৭] বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র ২য় খন্ড, পৃ. ২৭৯।

[৩৮৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১।

[৩৮৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২।

[৩৯০] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

সমর্থন করে। তাই আইয়ুব সরকার তার পূর্বসূরিদের মতই বাঙ্গালীর সাহিত্য-সংস্কৃতির ওপর পুনরায় আঘাত হানতে প্রয়াসী হয়। কিন্তু তার এ প্রয়াস সফল হয়নি। কারণ স্বয়ং মওলানা ভাসানীর পক্ষ থেকে রবীন্দ্র সঙ্গীতকে বাতিল করার বিরুদ্ধে সবচেয়ে যুক্তিসংগত সমালোচনা উত্থাপিত হয়। আর এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে সামান্য হলেও নতুন করে মেরুকরণের একটি ধারা সূচিত হয়।

১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসের শেষ দিকে যখনপি.ডি.এম. গঠিত হয়, তখন ন্যাপের পক্ষ থেকে তাদের আট দফা কর্মসূচীর তীব্র সমালোচনা করা হয়। ন্যাপের মতে, দু'টি কারণে এ আট দফা কর্মসূচী সীমাবদ্ধ। প্রথমতঃ, সেখানে স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত যে সকল কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে তা খুবই অনির্ভরযাগ্য। বৈদেশিক বাণিজ্য, অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ও খাজনা-ট্যাক্সসহ অধিকাংশ বিষয়কে কেন্দ্রের অধীনে রাখায় স্বায়ত্তশাসনের সারবত্তাই থাকেনা। দ্বিতীয়তঃ, সাম্রাজ্যবাদী পুজি-নির্ভর পুঁজিপতি শ্রেণী, সামাজ্যবাদী চক্রান্ত ও শোষণ-পীড়নে জর্জরিত সাধারণ কৃষক-শ্রমিকের স্বার্থ সংক্রান্ত মৌলিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। উপরন্তু, পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধান ও দুর্ভিক্ষের প্রশ্নেও কোন কথা বলা হয়নি। ন্যাপের প্রাদেশিক কমিটির সভার সিদ্ধান্তে বলা হয়, জনজীবনের দৈনন্দিন সমস্যার কথা না বলে শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে কোন ফ্রন্ট গঠিত হলে তাতে জনসাধারণ মোটেই উৎসাহিত হবে না। ফলে খুব দ্রুতই উক্ত ফ্রন্ট জনসাধারণের সাথে সম্পর্কহীন একটি নেতা ও কর্মীসর্বস্ব ফ্রন্টে পরিণত হবে। তাই ন্যাপের পক্ষ থেকে বলা হয়, বর্তমানে জনসাধারণের ওপর সরকারী প্রশাসন ও তার সমর্থক শ্রেণীসমূহের যে জুলুম চলছে এবং দেশব্যাপী যে দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছে - এ দু'টি সমস্যাকে সামনে রেখে আইয়ুব সরকার-বিরোধী আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে হবে। প্রাদেশিক ন্যাপের কার্যকরী সংসদের উক্ত সভায় তীব্র খাদ্য সংকট ও সরকারের চরম দমননীতির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রবল গণআন্দোলন গড়ে তোলার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে সকল বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র সংগঠনগুলিসহ বিভিন্ন গণসংগঠনকে একত্রিত করে আইয়ুব সরকার বিরোধী তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ন্যূনতম কর্মসূচী হিসাবে ৭-দফা প্রদান করা হয়। উক্ত ৭-দফা কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হচ্ছেঃ

(১) সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে কেন্দ্রে ফেডারেল পার্লামেন্টারী সরকার প্রতিষ্ঠা;

(২) কেবলমাত্র পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা ও মুদ্রা ব্যতিরেকে বৈদেশিক বাণিজ্যসহ সকল বিষয়কে প্রাদেশিক সরকারের হাতে অর্পণ। দেশরক্ষার ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা। পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন জাতিসমূহের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার মেনে নিয়ে এক ইউনিট বিলোপ।

(৩) জরুরী অবস্থা ও নিরাপত্তা আইনসহ সকল গণনিপীড়নমূলক কালাকানুন বাতিল, সকল রাজবন্দীর মুক্তি, সকল প্রকার হুলিয়া ও গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা এবং সভা-সমিতি, সমাবেশ ও ধর্মঘটের অধিকার কায়েম।

(৪) দেশের মাটি থেকে সকল বৈদেশিক সামরিক ঘাটির বিলোপ, সকল সামরিক চুক্তি বাতিল এবং সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকল সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য গ্রহণে অস্বীকৃতি। সিয়াটো ও সেন্টো ত্যাগ এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ।

(৫) জনসাধারণের জন্য খাদ্য ও শ্রমিকদের জন্য বাঁচার মত মজুরীর ব্যবস্থা, কৃষকদের খাজনা, কর ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্য হ্রাস, পাটসহ কৃষকের অর্থকরী ফসলের ন্যায্যমূল্য এবং সর্বসাধারণের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা।

(৬) জম্মু ও কাশ্মীরের ৫০ লক্ষ অধিবাসীর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রতি পূর্ণ সমর্থন।

(৭) যাবতীয় বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি বাজেয়াপ্ত করা এবং ব্যাংক, বীমা আমদানী-রফতানী বাণিজ্য ও পাট ব্যবাসায়ের জাতীয়করণ।[৩৯১]

ন্যাপ উক্ত কর্মসূচী গ্রহণ করার ফলে তার সাথে আওয়ামী লীগের কর্মসূচী-ভিত্তিক ঐক্য গড়ে ওঠার একটি সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ পর্যায়ে বিভিন্ন প্রশ্নে ন্যাপের মধ্যেই দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে সকল প্রকার সামরিক সাহায্য বন্ধ করার ঘোষণা দেয়। ফলে আইয়ুব সরকার মার্কিনের বিরুদ্ধে বেশ সমালোচনামুখর হয়ে ওঠে। যদিও তখনও মার্কিনের সাথে পাকিস্তানের গোপন সামরিক চুক্তিসহ সকল ধরনের চুক্তিই বলবৎ ছিল। তবু ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কোন কোন নেতার মধ্যে আইয়ুব সরকারের প্রতি কিছুটা দুর্বলতা আবার লক্ষ্য করা যায়। অনেককে বিবৃতি দিয়ে আইয়ুব সরকারকে পরামর্শ দিতে দেখা যায়। এ সকল বিবৃতি ও বক্তৃতায় বলা হয় 'আইয়ুব সরকারের এ মূহুর্তে মোটেই ভয় পাওয়া উচিত নয়, বরং চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত। এ নিয়ে ন্যাপ নেতৃবৃন্দের ভিতর আগে থেকেই মতবিরোধ ছিল। সরকার-বিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য যে ৭-দফা কর্মসূচী প্রদান করা হয় তাতে আওয়ামী লীগ যাতে যোগ না দিতে পারে সে জন্য সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বক্তব্য এত প্রবলভাবে তোলে ধরা হয়েছে বলে ন্যাপের একাংশ মনে করতে থাকে। এদের দাবী অনুযায়ী ৬-দফার প্রতি নমনীয় মনোভাব পোষণ করে তার সাথে সংগতিপূর্ণ কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন। তা ছাড়া, ইতিমধ্যে গোপন কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিখন্ডিত হয়ে যাওয়ায় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মধ্যেও বিভক্তির ভাব দেখা যায়। মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি আওয়ামী লীগের সাথে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক রক্ষা করে চলার নীতিগ্রহণ করার ফলে ন্যাপের মধ্যে কর্মরত তাদের প্রকাশ্য সদস্যরা আওয়ামী লীগের প্রতি সহানুভূতিশীল সম্পর্ক রক্ষা করার প্রতি বিশেষ তৎপর ছিলেন। এ সময় প্রাদেশিক ন্যাপের তিনজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা কারাগারে বন্দী ছিলেন। এদের মধ্যে প্রাদেশিক কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে সৈয়দ আলতাফ হোসেন ও আবদুল হালিম ছিলেন মস্কোপন্থী। অন্যদিকে, অপর কারাবন্দী ন্যাপ নেতা হাজী মোঃ দানেশ ছিলেন সিনিয়র সহ-সভাপতি এবং ইনিই মওলানা ভাসানীর অনুপস্থিতিতে প্রাদেশিক ন্যাপের দায়িত্ব পালন করতেন। হাজী দানেশ চীনপন্থীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও মস্কোপন্থীদের আইয়ুব-বিরোধী মনোভাবকে সমর্থন করতেন এবং তাঁর অবস্থানটি ছিল অনেকটা নিরপেক্ষ। ফলে এ তিনজন নেতার অনুপস্থিতিতে প্রাদেশিক ন্যাপের নেতৃত্ব চীনপন্থীদের করায়ত্ত হয়ে পড়ে। অন্য দু'জন যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে মোহাম্মদ সুলতান এবং নূরুল হুদা কাদের বক্স; যারা ছিলেন কট্টর চীনপন্থী। এরকম একটি পর্যায়ে প্রাদেশিক কমিটির সদস্য আলতাফ আলীসহ ময়মনসিংহ জেলা কমিটির ৬জন সদস্যকে শৃংখলা ভঙ্গের অভিযোগে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। এ বহিষ্কারকে মস্কোপন্থীরা অবৈধ মনে করায় তাঁদের দু'জন নেতা সেখানে গিয়ে

---

৩৯১ সাপ্তাহিক জনতা, ১৪ই মে, ১৯৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত ৬জনসহ একটি পাল্টা কমিটি গঠন করে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বির্তকের এক পর্যায়ে শুধু আলতাফ আলীকেই বহিষ্কার করা হয়নি, যে দু'জন নেতা ময়মনসিংহে গিয়ে পাল্টা কমিটি করেছিলেন তাদের প্রতিও কেন বহিষ্কার করা হবে না' - এ মর্মে 'শো কচ' করা হয়। এটা ছিল পিকিংপন্থীদের নিতান্তই অগণতান্ত্রিক আচরণ। কেননা সে সভায় উপস্থিত ৩০জন সদস্যের মধ্যে ১৩জন ছিলেন চীনপন্থী, ১১জন ছিলেন মস্কোপন্থী এবং অন্যরা নিরপেক্ষ।[৩৯২] উক্ত সভা প্রায় সমান দু'টি অংশে বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় এ ধরনের একটি সাধারণ সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখার অনুরোধ জানালে চীনপন্থীরা তা'অগ্রাহ্য করেন। এর প্রতিবাদে মস্কোপন্থী গ্রুপটি ওয়াকআউট করে। এজন্য পূর্বোক্ত দু'জন নেতাকেও বহিষ্কারের প্রস্তাব আনা হয় এবং তাদেরকে চরমপত্র প্রদান করা হয়। এ সকল সমস্যা সমাধানের জন্য মস্কোপন্থী গ্রুপটি ১১৩ জন কউন্সিলরের স্বাক্ষর নিয়ে রিকুইজিশন সভা দাবী করে।[৩৯৩] দলের গঠনতন্ত্রের বিধি অনুযায়ী ১০০ জন কাউন্সিলরের স্বাক্ষরযুক্ত রিকুইজিশন সভার আবেদন করলে নোটিস পাওয়ার ১ মাসের মধ্যে বৈঠক আহবান করতে সভাপতি ও সাধারণ-সম্পাদক বাধ্য। সে অনুযায়ী দলের সভাপতি মওলানা ভাসানী ১৯৬৭ সালের ৩০শে নভেম্বর রংপুর শহরে বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন আহবান করেন। উক্ত বিশেষ কাউন্সিলের দিন ও স্থান সম্পর্কে তলবীদের খুবই আপত্তি ছিল। তাদের মতে, তলবীসভার নোটিস প্রদানের দিন থেকে ধরলে ৩০শে নভেম্বর অনেক দূরবর্তী সময়, যা গঠনতন্ত্র সম্মত নয় এবং সুদুর রংপুরে বিশেষ কাউন্সিল অনুষ্ঠানের এ সিদ্ধান্ত খুবই অবিবেচনাপ্রসূত। কারণ প্রদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ অংশ থেকে রংপুরের দূরত্ব খুবই বেশী। এসব যুক্তিদেখিয়ে মহিউদ্দীন আহমদ, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, পীর হাবিবুর রহমান ও দেওয়ান মাহবুব আলীসহ ১৩জন ন্যাপ নেতা এক বিবৃতিতে ১৯শে নভেম্বরের মধ্যে ঢাকায় বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠানের জন্য দলের সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ-সম্পাদকের কাছে আহবান জানান। কিন্তু সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক তাদের নির্ধারিত দিনের ব্যাপারে অটল থাকেন। এভাবেই দেশের অন্যতম প্রধান প্রগতিশীল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ন্যাপ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। শুধু ন্যাপই যে এ ধরনের সাংগঠনিক কারনে দ্বিধা বিভক্ত হয় তা নয়, আওয়ামী লীগ এবং এন.ডি.এফও একই ধরনের সাংগঠনিক কারণে ভেঙ্গে পড়ে। তবে এ তিনটি তাঙ্গনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষভাবে কাজ করেছিল। ন্যাপ যে রাজনৈতিক কারণে দ্বিধাবিভক্ত হয় তা পাকিস্তান ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হক ওসমানী ও সভাপতি মওলানা ভাসানীর পৃথক দু'টি বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে।

পাকিস্তান ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক ১৯৬৭ সালের অক্টোবরের মধ্যে ভাগে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ন্যাপের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রচারণা সম্পর্কে বলেনঃ

"বস্তুতঃ ন্যাপের অভ্যন্তরে বর্তমানে যে মতপার্থক্য বিরাজ করছে, তা স্পষ্টতঃ ক্ষমতাসীন সরকার ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল সম্পর্কে ন্যাপের ভিন্ন তিন্ন সদস্যের ভিন্নতর মনোভাবের কারণে। ন্যাপ একটি সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিবাদ বিরোধী রাজনৈতিক দল। একচেটিয়া পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসান ঘটিয়ে দেশে সমাজতন্ত্র কায়েম করাই ন্যাপের চূড়ান্ত লক্ষ্য। কিন্তু ন্যাপ মনে করে যে, এই বিবিধ শোষণের সর্বাধিক কার্যকরী বাহন হচ্ছে ডিক্টেটরশীপ। আর ডিক্টেটরশীপের অবসান ও পার্লামেন্টারী গনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ভিন্ন জণগণ কখনই উক্ত ত্রিবিধ শোষণের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে না। ন্যাপ পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র, পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন এবং জণগণের সার্বভৌমত্ব ও ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ...পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলেই যে সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে তা নয়, তবে তাকে জণগণের স্বার্থে সংগ্রামের একটি স্তর পর্যন্ত ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। এ পর্যায়ে ন্যাপ পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র কায়েমের আন্দোলনে সকল বিরোধী দলকে ঐক্যবদ্ধ করার পক্ষপাতী। ইতিমধ্যে এক ইউনিট বাতিল ও জোট নিরপেক্ষ পররাষ্টনীতির সপক্ষে আওয়ামী লীগ প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। ফলে ন্যাপ ও আওয়ামী লীগের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার অপেক্ষাকৃত অনুকুল পরিবেশ তৈরী হয়েছে।"[৩৯৪]

ওসমানী আরো বলেন কিছু কিছু অগ্রসর চিন্তা-ভাবনার লোক ন্যাপে থাকতে পারে কিন্তু কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সমস্যা কিংবা সে নীতি অনুযায়ী কর্মকৌশল গ্রহণের সংগঠন এটি নয়। ন্যাপে বিভিন্ন চিন্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব রয়েছে; ফলে জনগণতন্ত্র বা এ ধরণের কোন অগ্রসর কর্মসূচী নিয়ে ন্যাপের পক্ষে চলা সম্ভব নয়।

অন্যদিকে, ১৯৬৭ সালের ৩০শে নভেম্বর রংপুরে অনুষ্ঠিত বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশনে ন্যাপ সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নীতি-নির্ধারণী বক্তৃতায় এ ব্যাপারে স্পষ্ট অভিমত প্রকাশিত হয়। ভাসানী প্রথমে দেশে বিদ্যমান সর্বগ্রাসী এক গভীর সংকটের বিবরণ দেন। তারপর কৃষক, শ্রমিক মেহনতী মানুষের ওপর শোষণ-লুন্ঠন ও দমনপীড়নের এক মর্মস্পর্শী চিত্র তোলে ধরেন এবং সর্বশেষে আইয়ুব সরকারের চরিত্র, ন্যাপের দৃষ্টিভঙ্গী, স্বায়ত্তশাসনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃত্ব সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করেন। আইয়ুব সরকার সম্পর্কে তিনি বলেনঃ "ন্যাপের দৃষ্টিতে আইয়ুব সরকার হচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যপুষ্ট বড় বুর্জোয়া ও সামন্তবাদ এই ত্রিশক্তির শ্রেণী স্বার্থের প্রতিরক্ষক। এই তিনশক্তির শাসনের অবসানের মধ্য দিয়েই কেবল দেশের জণগণ তাঁদের সত্যিকারের গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম করতে পারে। ফলে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম এক এবং অবিভাজ্য। কেননা দেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ এবং দেশী বড় পুঁজি ও সামন্তবাদী স্বার্থ একই সূত্রে গ্রথিত। দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির আতাঁতকে যেমন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না, তেমনি এ আঁতাতের বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রামকেও দুই অংশে ভাগ করা যায় না। এদের একটির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গেলে সে সংগ্রামে অপরটিও জড়িত হয়ে পড়তে বাধ্য। অতএব গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম আর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম এক এবং অবিভাজ্য।"[৩৯৫]

স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে ভাসানী বলেনঃ পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জণগণের স্বাধিকারসহ পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী পররাষ্ট্র নীতির দাবীতে ন্যাপের জন্ম হয়েছে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবীর বিরোধিতার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তবে আওয়ামী লীগের ৬-দফাকে যেভাবে জাতীয় মুক্তি সনদ' বলে চিত্রিত করা হচ্ছে তার সাথে ন্যাপ একমত নয়। কেননা এখানে শুধু উদীয়মান বাঙ্গালী বুর্জোয়াদের শ্রেণীস্বার্থেরই প্রতিফলন ঘটেছে। কিন্তু বৃহত্তর

---

৩৯২ সাপ্তাহিক জনতা, ১৫ই মে, ১৯৬৭।

৩৯৩ সাপ্তাহিক জনতা, ২২ শে অক্টোবর, ১৯৬৭।

৩৯৪ সাপ্তাহিক জনতা, ২২ শে অক্টোবর, ১৯৬৭।

৩৯৫ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র, ২য় খন্ড, পৃ. ২৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

জনগনের স্বার্থের কোন প্রতিফলন সেখানে ঘটেনি। স্বায়ত্তশাসন বলতে ন্যাপ দেশের কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত তথা শতকরা ৯৮ জন মেহনতী মানুষের স্বায়ত্তশাসন বুঝে থাকে। কয়েকজন অবাঙ্গালী আদমজী দাউদের স্থলে কয়েকজন বাঙ্গালী আদমজী দাউদ সৃষ্টি যে ৬-দফার মর্মবস্তু সে স্বায়ত্তশাসনের জন্য পাকিস্তানের কৃষক-শ্রমিক মেহনতী মানুষ কোন দিনই তার বুকের রক্ত ঢেলে দিতে পারে না। যেহেতু ৬-দফা কর্মসূচীতে পাকিস্তানের কৃষক-শ্রমিক তথা মেহনতি মানুষের অধিকারের কোন স্বীকৃতি নেই, সেহেতু স্বায়ত্তশাসনের নামে এ ৬-দফা ভিত্তিক তথাকথিত স্বায়ত্তশাসনের অধিকার অনিবার্যভাবেই উদীয়মান বাঙ্গালী পুঁজিপতি গোষ্ঠীর হাতে পাকিস্তানের কৃষক-শ্রমিক তথা সমগ্র মেহণতি মানুষের ওপর শোষণ-পীড়ন চালাবার অধিকারে পর্যবসিত হতে বাধ্য।[৩৯৬]

গণতন্ত্র স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রামের বিজয় অর্জন করতেমওলানা ভাসানী নেতৃত্বের প্রশ্নটিকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত বলে অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে,আইয়ুব সরকারের পরিবর্তে একটি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই কেবল সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বড় পুঁজি কবলিত অবস্থা থেকে দেশকে মুক্ত করা সম্ভব। আর শুধু সেভাবেই পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণের স্বায়ত্তশাসন তথা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং তাদের জীবনযাত্রার গণতান্ত্রিক বিকাশের পথকে উন্মুক্ত করা সম্ভব। কিন্তু এজন্য যে কঠিন সংগ্রামের প্রয়োজন তা কোনভাবেই বুর্জোয়া, পেটিবুর্জোয়া ও সামন্তবাদী শ্রেণী থেকে আগত দোদুল্যমান ও দুর্বল নেতৃত্ব দিয়ে সম্ভব নয়। অতীতের সকল অভিজ্ঞতা সে কথাটিই প্রমান করে। আজকের যুগে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামের নেতৃত্ব দিতে পারে একমাত্র সর্বহারাশ্রেণী, অন্য কোন শ্রেণী নয়। ন্যাপই একমাত্র রাজনৈতিক দল যা কৃষক-শ্রমিক তথা সর্বহারা মেহনতি মানুষের মুক্তির কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। আর তাই ন্যাপ তার নিজস্ব কর্মসূচী বাতিল করে অপর কোন শ্রেণীর কর্মসূচী গ্রহণ করে লেজুড়বৃত্তি করতে পারে না।[৩৯৭]

উপরোক্ত দু'টি বক্তব্য থেকে এটা খুবই স্পষ্ট যে, ন্যাপের দু'নেতা তাদের দলকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দু'টি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন। একজন দেখেন ন্যাপ হচ্ছে একটি বহু শ্রেণীর দল এবং পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র হচ্ছে তার দলের রাজনীতির মূল কথা। অন্যজন তার দলকে মনে করেন এটা একটি সর্বহারা মেহনতি মানুষের দল। ফলে স্বাভাবিকভাবে দু'জনের কাছে গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের ধারণা দু'রকম দাঁড়ায়। ফ্রন্ট গঠনের প্রক্রিয়া ও দু'রকম হবে। তবে ৬-দফা নিয়ে মওলানা ভাসানী যেকথা বলেছেন তার প্রকৃত অর্থ হলো তিনি ৬-দফার মর্মবস্তুকে অনেকাংশেই উপলব্ধি করতে পারেননি। নিঃসন্দেহ ৬-দফা বাস্তবায়িত হলে শুধুমাত্র উদীয়মান বাঙ্গালী বুর্জোয়া শ্রেণীই প্রত্যক্ষভাবে লাভবান হত, এটাও সত্য যে, তা পাকিস্তান রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ক্ষমতাকে বহুলাংশে দুর্বল করতো। আগের অধ্যায়গুলির আলোচনায় এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, পাকিস্তান রাষ্ট্র দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বা শ্রেণীর তুলনায় এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে, তাকে নিয়ন্ত্রণ করাব ক্ষমতা কারো ছিল না, বরং তার সহযোগীতার ওপর নির্ভর করেই বিভিন্ন শ্রেণী বিকশিত হয়েছিল। ফলে সে কর্মসূচী রাষ্ট্রের এই কেন্দ্রীয় ক্ষমতাকে দুর্বল করে দিত, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের সহযোগীতা পেয়ে যেসব শ্রেণী প্রভুত্বকারী গোষ্ঠী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল সেটি তাদেরও দুর্বল করে দিত। তবে নিঃসন্দেহে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র দুর্বল হলে শ্রমজীবী মানুষের তাতে প্রত্যক্ষভাবে কোন লাভ হত না; বরং শক্তিশালী প্রাদেশিক রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচারিতাই তাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হত। অন্যদিকে, কর্মসূচী বাস্তবায়িত হলে শক্তিশালী প্রাদেশিক রাষ্ট্রের সহযোগীতায় উদীয়মান বাঙ্গালী বুর্জোয়াশ্রেণীর বিকাশ ত্বরান্বিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল,তাতে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের হাতে গড়া প্রভুত্বকারী শ্রেণীসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হত- এ কথাটি মওলানা ভাসানী কখনও ভাবেননি। তিনি যদি বিষয়টি ভাবতেন তাহলে তার গৃহীত কর্মসূচীকে ৬-দফার সাথে যুক্ত করে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র ও তার শ্রেণী ভিত্তিসমূহের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারতেন। যদি তিনি ও তার সমর্থকরা পাকিস্তান রাষ্ট্রের এই বিশেষ চরিত্রকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করতেন তাহলে ৬-দফাকে মওলানা ভাসানীও সমর্থন করে এর সাথে প্রভূত্বকারী শ্রেণীসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তোলার কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারতেন। সে সময় রাষ্ট্রের সহযোগীতার ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা শ্রেণীসমূহ আর সমাজের প্রভুত্বকারী গোষ্ঠীসমূহ সমান্তরাল রূপ ধারণ করেছিল। ফলে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে যে কর্মসূচী দুর্বল করে দিতে পারতো সে কর্মসূচীর সাথে উক্ত শ্রেণীসমূহ বিরোধী কর্মসূচীর কোন দ্বন্দ্ব ছিলনা। ফলে সুকৌশলে ৬-দফাকে সমর্থন করে সাম্রাজ্যবাদী সাহায্যপুষ্ট রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল বড় বুর্জোয়া শ্রেণী ও গ্রামের জোতদার- মহাজন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কর্মসূচী নেওয়া যেতো। হয়ত, সেক্ষেত্রে সরকার-বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের সমর্থক জোতদার বা মৌলিক গণতন্ত্রীদের কিছু ছাড় দিতে হত, কিন্তু যে সকল ব্যক্তি জোতদার হয়েও সরকার-বরোধী দলের সাথে সে সময় যুক্ত ছিল, সে সকল ব্যক্তির পক্ষে প্রকাশ্যে গণবিরোধী ভূমিকা গ্রহণের সুবিধা থকত না। ফলে সরকারের অনুগত শ্রেণীসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তোলার কর্মসূচী গ্রহণ করলেই তা মূলতঃ সকল বড় বুর্জোয়া ও বড় জোতদার-মহাজন-বিরোধী সংগ্রামের রূপ নিত, মোটেই স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম কিংবা ৬-দফা-ভিত্তিক আন্দোলনের সাথে অসংগতিপূর্ণ হত না, বরং তা ৬-দফা কর্মসূচী-ভিত্তিক আন্দোলনের পরিপূরক হতে পারতো। অন্যদিকে, এ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এমন একটি সংগঠিত শ্রেণীশক্তির রাজনৈতিক উত্থান ঘটতে পারতো যা শুধু পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় স্বৈরাচারী রাষ্ট্রযন্ত্রের মুখোমুখি দাঁড়াতেই সক্ষম হত না পরবর্তীকালের স্বৈরাচারী প্রাদেশিক রাষ্ট্র কিংবা স্বাধীন বাংলাদেশের স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে পারতো। কিন্তু মওলানা ভাসানী এবং তার সমর্থকদের মধ্যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের চরিত্র সম্পর্কে সার্বিক উপলব্ধি না থাকার কারণে তারা শ্রেণীসমূহকে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেছে কিংবা রাষ্ট্রকে শ্রেণীসমূহের অধীন করে দেখেছেন। ফলে উক্ত শ্রেণীসমূহের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন, বিশেষতঃ গ্রামের কৃষক আন্দোলন মোটেই পাকিস্তান রাষ্ট্রকে আঘাত করতে পারেনি। অপরদিকে, রাষ্ট্রের প্রশ্ন থেকে বিচ্ছিন্নভাবে গ্রামের সকল জোতদার-মহাজনকে শত্রু হিসাবে গণ্য করার কারণে রাষ্ট্রের সমর্থক ও সহযোগী গোষ্ঠীর সাথে রাষ্ট্র বিরোধী বা নিরপেক্ষ জোতদার-মহাজন-গোষ্ঠীকে এক করে ফেলা হয়েছে। ফলে রাষ্ট্রের সমর্থক জোতদার-মহাজন ও টাউট গোষ্ঠীটি বিশেষ সুবিধা পেয়েছে। এতে গ্রামাঞ্চলে ঘটেছে বিরাট বিভ্রান্তি। স্বভাবতই পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন আর শ্রেণী প্রশ্ন মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে একটি সাধারণ সমস্যা, কিন্তু শ্রেণী প্রশ্নটি ছিল শ্রমজীবী মানুষের একটি সুনির্দিষ্ট সমস্যা। তাই সাধারণ প্রশ্নকে যে রাজনৈতিক শক্তি একমাত্র সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করতে চায়, তার বিরোধিতা করে শ্রেণী প্রশ্নকে প্রধান্য দিতে চাইলে সাধারণ প্রশ্নের প্রতি তাদেরআন্তরিকতার ব্যাপারেই প্রশ্ন জাগে। মওলানা ভাসানী ও তাঁর সমর্থকদের সম্পর্কে তার সকল বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির এ রকমটিই ঘটেছিল, যা' খুব দ্রুতই সাধারণ মানুষের মধ্যেও ছড়িয়ে

৩৯৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬-৯৭।
৩৯৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬-১৭

Dhaka University Institutional Repository

পড়ে। তবে ভাসানীর বিপক্ষ গ্রুপটি যে রাষ্ট্রের প্রশ্নকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছিলেন তাও নয়। তারা বরং রাষ্ট্র ভাঙ্গার সংগ্রামে জয়যুক্ত হওয়ার জন্য শ্রমজীবী মানুষের শ্রেণীঘৃণাকে জাগিয়ে তুলে তাদেরকে একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে বিকশিত করতে হবে - এই নীতিরই বিরুদ্ধে ছিলেন। অর্থাৎ তারা পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রকেই ন্যাপের তখনকার লক্ষ্য হিসাবে মনে করতো। আর সে কারণেই ইস্যুভিত্তিক ঐক্যের জন্য ৬-দফাকে সমর্থন করতেও তাদের আপত্তি ছিল না। ফলে তারা কেন্দ্রীয় পাকিস্তান রাষ্ট্রকে দুর্বল করার সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার পক্ষে থাকলেও পরবর্তীকালের সম্ভাব্য শক্তিশালী প্রাদেশিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে শ্রমজীবী জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করতে চাননি। তারা এ সময় উপলব্ধি করতে পারেননি যে, আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে কার্যকর কোন সংগ্রাম গড়ে তুলতে হলে শ্রমজীবী মানুষকে তাদের শ্রেণী দাবীতে ঐক্যবদ্ধ করা প্রয়োজন। বরং তারা সাধারণ প্রশ্ন তথা জাতীয় প্রশ্নকেই প্রধানতম কিংবা একমাত্র প্রশ্ন হিসাবে গণ্য করে জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস পায়। তাদের কর্মসূচীতে শ্রমজীবী মানুষের কিছু কথা থাকলেও জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করার পথ হিসাবে তারা যে রাজনীতি গ্রহণ করে তা আওয়ামী লীগের রাজনীতি থেকে কদাচিৎ পৃথক ছিল। ফলে ব্যাপক সমর্থন নিয়ে রিকুইজিশন ন্যাপ নামে যে রাজনৈতিক দলটির জন্ম হয় তা রাজনীতি ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র কোন ধারা সৃষ্টি করতে পারেনি। তাঁরা জাতীয় প্রশ্নের গুরুত্বকে যথাযথভাবে বুঝলেও নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির প্রতি অধিকতর বিশ্বস্ত থাকার কারণে গণতান্ত্রিক রাজনীতিতেও জাতীয়তাবাদী ধারার চেয়েও পশ্চাৎপদ রাজনৈতিক কৌশল গ্রহণ করে। তারই অভিব্যক্তি হিসাবে ন্যাপের অনুপ্রেরণা দাতা গোপন পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি আইয়ুব সরকার ঘোষিত ১৯৬৯ সালের মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়।[৩৯৮] অথচ ১৯৬৪ সালের মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচনে সমগ্র পাকিস্তানে আইয়ুব সরকার-বিরোধী যে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, যার ফলে আইয়ুব খান-বিরোধী শতকরা ৮০জন প্রার্থী বিজয়ী হয়েছিল। কিন্তু তার পরও যখন দেখা গেল আইয়ুব খান পাকিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানেই নয় পূর্ব পাকিস্তানেও সংখ্যাগরিষ্ঠ মৌলিক গণতন্ত্রীর সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলো তখন মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচনের আর কোন গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। কারণ সে সময় আইয়ুব-বিরোধী গণজোয়ার যে পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলো তাতে আইয়ুব সরকারের সমর্থক প্রার্থীরা কিংবা নির্বাচনে বিজয়ী মৌলিক গণতন্ত্রীরাও বহুদিন পর্যন্ত আইয়ুব সরকারের প্রতি তাদের সমর্থনের কথা কখনও ব্যক্ত করত না। অথচ যখন কোন জনজোয়ার নেই সে পর্যায়েও কমিউনিস্ট পার্টি ও তার প্রকাশ্য রাজনৈতিক দল ন্যাপ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল।

সে যা' হোক, ১৯৬৭ সালের শেষে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে সমগ্র রাজনীতি ক্ষেত্রে এক গভীর হতাশার সৃষ্টি হয়। এ সময় পূর্বপাকিস্তান-ভিত্তিক পাঁচটি দলের ঐক্যফ্রন্ট পি.ডি.এম কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে না পেরে অকার্যকর হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় এন.ডি.এফ--এর মধ্য থেকে কয়েক জন আওয়ামী লীগ নেতা বিশেষতঃ আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমদ, আবদুর রব সেরনিয়াবাতসহ অসংখ্য কর্মীবৃন্দ এন.ডি.এফ. থেকে বের হয়ে ৬-দফাপন্থী আওয়ামী লীগে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু এন.ডি.এফ থেকে বের হলেও পুনরায় এদের আওয়ামী লীগে যোগ দেওয়া সম্ভব হয় নি। ইতিপূর্বেই আওয়ামী লীগের একটি শক্তিশালী অংশ মূল দল থেকে বের হয়ে পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অনুসারী হিসাবে একটি নতুন রাজনৈতিক দলের জন্ম দিয়েছে। ফলে পি.ডি.এম কার্যতঃ ভেঙ্গে পড়ে। ছাত্র ইউনিয়ন অনেক আগে থেকেই দ্বিধাবিভক্ত। ন্যাপের সমর্থক অন্য গণসংগঠনগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিধাবিভক্ত না হলেও ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে পারেনি। বিরোধী দলসমূহের সংগ্রামী নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই তখন জেলে আটক। শ্রমিকশ্রেণীসহ বিভিন্ন পেশাজীবীদের আন্দোলন প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে একের পর এক অনুষ্ঠিত হতে থাকলেও সরকারের চরম দমননীতি আর রাজনৈতিক দলসমূহের সমর্থনের অভাবে সেসবের অধিকাংশই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এমতাবস্থায় সমগ্র রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রচণ্ড হতাশা নেমে আসে। সে সময় একদিকে প্রচুর রাজনৈতিক হতাশা আর অন্যদিকে প্রত্যেকটি দলের নেতৃত্বের মাধ্যে বহু বিষয় নিয়ে বিতর্ক ও অনৈক্য রাজনৈতিক দলগুলিকে কিভাবে নিষ্ক্রিয় করে তুলেছিল তা সাপ্তাহিক জনতায় প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয় প্রতিবেদনেস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। অবস্থাটি বোঝার জন্য প্রতিবেদনটির প্রসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হলঃ

"দেশের রাজনৈতিক দলগুলির কার্যকলাপ দেখে জনসাধারণের মধ্যে হতাশা যে আরও বাড়ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাম, দক্ষিণ, সামন্তবাদী, পুঁজিবাদী, সমাজবাদী, জাতীয়তাবাদী, আন্তর্জাতিকতাবাদী নির্বিশেষে সব মতের দলগুলো যেন একটা অনির্দ্ধারিত নীতি মেনে চলছে এবং সেটা হচ্ছে কিছু না করে চুপচাপ বসে থাকা। তবে একেবারে চুপচাপ বসে থাকাটা রাজনীতিকদের ধাতে সয় না বলে তারা সবাই করণীয় বিষয় হিসাবে একটা কাজ বেছে নিয়েছে - নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ ঘটিয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হওয়া। তারা এমন একটা কর্মপন্থা বেছে নিয়েছেন যা' তাদেরকে আরও খণ্ডবিখণ্ড, আরও দুর্বল করে ফেলেছে। আন্দোলনবিমুখ রাজনীতির এটাই হচ্ছে অনিবার্য পরিণতি। ..বিরাট বিরাট কর্মসূচী এবং বড় বড় বুলি সামনে তুলে ধরে যারা এক একটি রাজনৈতিক দল সাজিয়ে বসে আছেন, সেই সব কর্মসূচী বা বুলি বাস্তবায়নের জন্য তারা কেউ কিছু করছেন কিনা তা দেখতে হলে অণুবীক্ষণ যন্ত্র চোখে লাগিয়ে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বর্তমানে দেশের সকল ক্ষেত্রেই শুধু একটি দল বা গোষ্ঠীর তৎপরতা লোকের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে এবং সেটা হচ্ছে সরকারী দল বা শাসকগোষ্ঠী। কিন্তু এই শাসক গোষ্ঠীকে ক্ষমতাচ্যুত করে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, সমাজতন্ত্র কিংবা জনগণতন্ত্র প্রভৃতি লক্ষ্য হাসিলের কথা ঘোষণা করে যে সব বিরোধী রাজনৈতিক দল গঠিত হয়েছে, তারা তাদের এই সব বহু কথিত ও বহু উচ্চারিত লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নের জন্য কাজের কাজ কিছু করছেন বলে তো বিশ্বাস করা কঠিন। ... অবশ্য রাজনৈতিক দলগুলো তাদের সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য বর্তমানে একটা 'মহৎ' কাজ শুরু করে দিয়েছেন। এটাকে 'মহৎ' কাজ না বলে ক্ষেত্র বিশেষে 'বিপ্লবী' তৎপরতাও বলা চলে। ... বাইরে অগণতান্ত্রিক, সামন্তবাদী, পুঁজিবাদী বা একনায়কত্ববাদী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কিছু করার মুরোদ দেখাতে না পেরে তারা এখন অ্যাত্যা... নিজের দলের মধ্যে কিলাকিলি করার 'বিপ্লবী' তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন। অন্যান্য দলগুলোর কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু এদেশের সরকার-বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে দুটো দলের কিছুটা গণভিত্তিক সংগঠন রয়েছে সেই আওয়ামী লীগ এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিও অধুনা এই ঘরোয়া বিবাদের শিকারে পরিণত হওয়ায় জনসাধারণের হতাশা যে কতদূর বেড়েছে তা এই সব পলিটিশিয়ানরা ছাড়া আর সবাই বুঝতে পারছে। তবে এতে শোষিত ও নির্যাতিত জনগণের হতাশা বাড়লেও সরকার পক্ষ কিন্তু আনন্দে কুটোকুটি হচ্ছেন। কেননা, এই সব ঘরোয়া চুলোচুলির নাটক যেভাবে

৩৯৮। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (১৯৭৩): দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত দলিল সমূহ, পৃ. ৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

জমে উঠেছে তাতে সত্যিকারভাবে যারা লাভবান হবেন তারা হচ্ছেন সরকার পক্ষ আর কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী। একথাটা পলিটিশিয়ানরা বা 'বিপ্লবী' নেতারা বুঝতে না পারলেও নির্যাতিত জনসাধারণ কিন্তু তা হাড়ে হাড়েই উপলব্ধি করছেন।"[৩৯৯]

রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ব্যাপক অনৈক্য ও ভাঙ্গনের ফলে রাজনৈতিক অঙ্গনে যে স্থবিরতা নেমে এসেছিল তা ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তবে মওলানা ভাসানী ও তার সমর্থকগণ স্বায়ত্তশাসন বিরোধী-- এ অভিযোগে অভিযুক্ত করে ন্যাপের মস্কোপন্থী অংশটি স্বতন্ত্র দল করার পর থেকেই ভাসানী ন্যাপের মধ্যে কিছু পরিবর্তন আসে। তারা ক্রমাগত পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে বেশী করে বলতে থাকেন।

দেশের রাজনৈতিক অবস্থা যখন এরকম তখন পাকিস্তান রাষ্ট্রকে দুর্বল করতে পারে এমন প্রচেষ্টায় লিপ্ত একটি রাজনৈতিক শক্তিকে নির্মূল করবার জন্য আগরতলা ষড়যন্ত্র নামে সরকারের পক্ষ থেকে একটি মামলা দায়ের করা হয় এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী এবং রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট মোট ২৮ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। এ সংবাদটি আকস্মিকভাবে পরিবেশিত হওয়ার সাথে সাথে সমগ্র রাজনৈতিক অঙ্গনের অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যায়। উক্ত সংবাদে বলা হয়, পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার একটি ভারত সমর্থিত ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে উক্ত ২৮ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ১৯৬৮ সালের ৭ই জানুয়ারি প্রকাশিত দৈনিক পাকিস্তান ৬ই জানুয়ারি পরিবেশিত এক সরকারী প্রেস নোটের বরাত দিয়ে এ সংবাদ পরিবেশন করে। উক্ত সংবাদের শিরোনামে ছাপা হয়ঃ পূর্ব পাকিস্তাকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রঃ ভারতীয় কূটনীতিক বহিষ্কারঃ অস্ত্র সংগ্রহের জন্য আগরতলায় সামরিক অফিসারদের সঙ্গে গোপন বৈঠকঃ মোটা অংকের অর্থলাভ, হীন চক্রান্ত সম্পর্কে দেশের উভয় অংশে জনমনে ক্ষোভের সঞ্চার। এ সংবাদে বলা হয়ঃ ধৃত ব্যক্তিদের অধিকাংশই পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার এই ষড়যন্ত্রে তাদের নিজ নিজ ভূমিকার কথা স্বীকার করেছে। এদের কেউ কেউ কমপক্ষে একজন ভারতীয় কূটনীতিক মিঃ ওঝার সাথে যোগাযোগ রেখেছিলেন। এরা আগর তলাস্থ ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল মিশ্র এবং মেজর মেননের সাথে দেখা করেছিলেন। ভারতের কাছ থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহই এই সাক্ষাতের উদ্দেশ্য ছিল।"[৪০০]

প্রেসনোট থেকে প্রাপ্ত খবরে আরো বলা হয়ঃ ষড়যন্ত্র সফল করার জন্য প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ এবং অর্থ সংগ্রহ করাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। এরা প্রচুর পরিমাণ অর্থ পেয়েছিল তেমন সাক্ষাৎ প্রমাণও পাওয়া গেছে। চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ মিঃ ভূপতি ভূষণ চৌধুরী ওরফে মানিক চৌধুরীসহ ধৃত আরো কতিপয় ব্যক্তির মারফত তারা টাকা পেয়েছে।"

প্রেসনোটে বলা হয়ঃ বিশৃংখলা সৃষ্টির এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেওয়া হয়েছে। এই ঘৃণা ষড়যন্ত্রে স্বাভাবিকভাবে দেশের উভয় অংশের জনসাধারণের মধ্যে যে ঘৃণার সৃষ্টি করেছে সরকার সে ব্যাপারে সচেতন। তাই সরকার তদন্তের ফলাফল, অগ্রগতি এবং এদের বিচার সম্পর্কিত সব তথ্য জনসাধারণকে জানাবে।

এ ষড়যন্ত্র মামলা উপলক্ষে ভারতীয় হাই কমিশনারকে পররাষ্ট্র দফতরে ডেকে আনা হয় এবং ঢাকাস্থ হাই কমিশনের প্রথম সচিব মিঃ ওঝাকে অবিলম্বে প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য বলা হয়।"[৪০১]

উপরোক্ত সংবাদ থেকে দেখা যায়, এ মামলাকে পাকিস্তান সরকার তার অবস্থানকে শক্তিশালী করার একটি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে চায়, কেননা যেখানে রাজবন্দীদের বিচার সংক্রান্ত খবরাখবর গোপন রাখা হয় সেখানে এ মামলা সংক্রান্ত সকল খবরাখবর তথা তার দৈনন্দিন অগ্রগতি, তদন্ত রিপোর্ট কিংবা সওয়াল-জবাবের সব কিছুকে প্রকাশ্যে প্রচার করার ব্যবস্থা করা হয়। উপরন্তু, এ মামলার সাথে আওয়ামী লীগকেও জড়িত করার একটি প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। তবুও আওয়ামী লীগের মত একটি রাজনৈতিক দলকে সামগ্রিকভাবে জড়িত করা হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় ছিল। কিন্তু ১৯৬৮ সালের ১৮ই জানুয়ারি যখন এ ষড়যন্ত্রের মূল উদ্যোক্তা শেখ মুজিবের নাম ঘোষণা করা হয় এবং তাকে এক নম্বর আসামী হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয় তখন অনেকেরই সংশয় থাকেনি যে, আওয়ামী লীগ এবং তার নেতা শেখ মুজিবকে জসসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যই এ মামলা সাজানো হয়েছে। কেননা শেখ মুজিব ১৯৬৬ সালের মে মাস থেকেই কারাবন্দী ছিলেন। অথচ এ অবস্থায়ই তাকে উক্ত ষড়যন্ত্রের মূল নায়ক হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ১৮ই জানুয়ারি গভীর রাতে যখন প্রদেশের প্রতিরক্ষা আইনে আটক শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়ে জেল গেট থেকেই ষড়যন্ত্র মামলায় পুনরায় গ্রেফতার করা হয় - তখন সমগ্র ষড়যন্ত্র মামলা ও তার মূল পরিকল্পনাকারী হিসাবে শেখ মুজিবের যুক্ত থাকার ব্যাপারটি জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি।

আকস্মিকভাবে এবং অত্যন্ত দ্রুত ঘটে যাওয়া এসব ঘটনায় সাথে রাজনৈতিক মহল তাল রাখতে পারে না। তারা কিছু দিনের জন্য হলেও হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। বিরাট বিরাট শিরোনামে ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কিত নতুন নতুন সংবাদ এমনভাবে প্রকাশিত হতে থাকে যে আওয়ামী লীগ তো বটেই, এমনকি অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মধ্যেও আতংক ছড়িয়ে পড়ে। এহেন পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগের অধিকাংশ উর্ধতন নেতা পিডিএম এ যোগদান করার পক্ষে মতামত দেন। পরিস্থিতি এমন ভয়াবহ হয়ে ওঠে যে, আওয়ামী লীগের অসংখ্য কর্মী আত্মগোপন করে। সমর্থকরা সবাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।[৪০২] আওয়ামী লীগের সমর্থক বা কর্মীরা আওয়ামী লীগের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক আছে এ কথাও অস্বীকার করতে থাকে। আওয়ামী লীগের তৎকালীন অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদিকা আমেনা বেগমও অন্যান্য অধিকাংশ নেতার মত ভাবতেন সরকার এবার আওয়ামী লীগ ও তার নেতা শেখ মুজিবের ওপর এক চরম আঘাত হানবে।[৪০৩] এ সময়ে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের ভাবনা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে শ্যামলী ঘোষ লিখেছেনঃ

The EP Awami Leaguers were unnerved. They realised that conviction of Sheikh Mujib would not only remove him from the political scene, it would lead to the virtual demise of the party as well as eroding all the ground work already laid for the achievement of its long-term objective, East Pakistan's autonomy".[৪০৪]

---

[৩৯৯] সাপ্তাহিক জনতা, ঢাকা, ২২ শে অক্টোবর, ১৯৬৭।
[৪০০] বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিল পত্র, ২য় খন্ড, পৃ. ২৯৮।
[৪০১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯।
[৪০২] Ghosh, Shyamali (1990): The Awami League: 1949-1971, p.144.
[৪০৩] Ibid, pp.144.
[৪০৪] Ibid, pp.144-45

Dhaka University Institutional Repository

এ উপলব্ধির কারণে আওয়ামী লীগ তার সকল কর্মকান্ডের কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে গ্রহণ করে শেখ মুজিবের মুক্তি। যখন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব এপ্রিল মাসে এক অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করে তখন আওয়ামী লীগ এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। আওয়ামী নেতারা প্রচলিত আইন অনুযায়ী শেখ মুজিবের প্রকাশ্য বিচার দাবী করেন, যা ২২শে জানুয়ারি শেখ মুজিবের পুনরায় জেল গেট থেকে গ্রেফতারের পর পরই তাদের ওয়ার্কিং কমিটির জরুরী সভায় প্রস্তাবাকারে গৃহীত হয়।[৪০৫] উক্ত ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে এটি ছিল একটি রাজনৈতিক দলের প্রথম প্রতিক্রিয়া। ইতিপূর্বে অন্য কোন রাজনৈতিক দল প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে সাহস পায়নি। পক্ষান্তরে, ন্যাপের এক সম্মেলনে ষড়যন্ত্র মামলার কথা সরাসরি উল্লেখ না করে মওলানা ভাসানী মন্তব্য করেন যুক্ত বাংলা প্রতিষ্ঠিত হলে তা সামাজ্যবাদীদের উপনিবেশে পরিণত হবে। আর পিডিএম সরকার-বিরোধী সংগ্রামের পরিবর্তে ২১শে মার্চ আসন্ন নির্বাচনে সক্রিয় অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। তবে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কাজ শুরু করার আগে জুন মাস থেকে ছাত্র, শ্রমিক ও অন্যান্য পেশাজীবীরা তাদের নিজ নিজ সমস্যা নিয়ে আন্দোলনে অংশ নিতে থাকে। এসব আন্দোলন এপ্রিল মাসে প্রবল আকার ধারণ করে। জগন্নাথ কলেজকে সরকারীকরণের প্রতিবাদে ছাত্রদের ব্যাপক আন্দোলন সূচীত হয় এবং তাতে ঢাকা শহরের বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ, বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব সমর্থন জানায়। ঢাকা আর্ট কলেজের ছাত্ররা দীর্ঘ দু'মাসব্যাপী এমন আন্দোলন পরিচালনা করে, যা সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক মহলের সপ্রশংস দৃষ্টি আর্কষণ করে। অন্যদিকে, বাওয়ানী জুট মিলের সাড়ে পাঁচ হাজার শ্রমিক এমন জঙ্গী সংগ্রাম ৮ই এপ্রিল থেকে শুরু করে যে, সংবাদপত্রে তা' বিশেষ গুরুত্ব পায়। আন্দোলনের অভিযোগে দেড় শত শ্রমিকের পদচ্যুতি ঘটলে তা আরোও জঙ্গী রূপ ধারণ করে। ৫জন শ্রমিক নেতাকে গ্রেফতার করেও এ ধর্মঘট-আন্দোলন থামানো যায়নি বরং তা আরো মারমুখি হয়ে ওঠে। এ মাসেই বাসভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। বাস ভাড়া বাড়লেও শ্রমিকের বেতন বাড়েনি বলে বাস শ্রমিকরা লাগাতার ধর্মঘট শুরু করে। ৭দিন পূর্ব পাকিস্তানের বাস পরিবহন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। এর পর পরই পুলিশের অত্যাচারের প্রতিবাদে শুরু হয় অটোরিক্সা চালকদের লাগাতার ধর্মঘট। ফলে সমগ্র ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের পরিবহন ব্যবস্থা বিশেষভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এছাড়া আরো অনেক ধর্মঘট, বিক্ষোভ ও শোভাযাত্রা এ সময় অনুষ্ঠিত হয়। এহেন পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগের ভূমিকা সম্পর্কে এমন বিভ্রান্তি বিরাজ করছিল যে, রিকুইজিশনপন্থী ন্যাপ যখন আওয়ামী লীগের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে ৭ই জুন পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করে তখন তা মোটেও সফল করা যায়নি। কারণ ৭ই জুন উপলক্ষে পল্টন ময়দানে জনসভা করার অনুমতি মিলেনি। বিকল্প কোন স্থানে জনসভা অনুষ্ঠান করতেও ন্যাপ-আওয়ামী লীগ সক্ষম হয় নি। এ পর্যায়ে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনা হয় এবং তা সকল দৈনিক পত্রিকায় ফলাও করে প্রচারিত হয়। অভিযোগে বলা হয় যে, নৌবাহিনীর লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ও অন্যান্য সামরিক বাহিনীর সদস্যরা ভারতের সামরিক ও আর্থিক সাহায্যে কমান্ডো কায়দায় পূর্ব পাকিস্তান দখল করে তাকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা করেছিল, এবং এ সমগ্র পরিকল্পনার সাথে শেখ মুজিবের ছিল সুসম্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। এ প্রসঙ্গে আরো বলা হয়, ১৯৬৪ সালের ১৫ থেকে ২১শে সেপ্টেম্বর করাচী সফরের সময় লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের আহবানে অনুষ্ঠিত এক গোপন বৈঠকে শেখ মুজিব যোগদান করেন এবং তাদের সে পরিকল্পনাকে সাহায্য-সহযোগীতা করার পরিপূর্ণ আশ্বাস দেন। এর পর আবারও শেখ মুজিব ১৯৬৫ সালে ১৫-২১শে জানুয়ারি করাচী সফর করেন এবং এর মধ্যে একদিন লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের সাথে এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন। এ সভায় শেখ মুজিব নাকি মত প্রকাশ করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানীদের যদি সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে হয় তাহলে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে কোন উপায় নেই। তিনি পরিপূর্ণরূপে সমর্থন ও অর্থনৈতিক সহযোগীতা প্রদানের জন্য প্রতিজ্ঞা করেন এবং এ পরিকল্পনার সদর দপ্তর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করার জন্য পরামর্শ দেন। এর পর পূর্ব পাকিস্তানে এ পরিকল্পনার কাজ অগ্রসর করে নেওয়ার জন্য এদের কয়েকজন ঢাকায় স্থায়ীভাবে অবস্থান করেন। শেখ মুজিবুর রহমানের ধানমন্ডির ৩২নং রোডের বাসায়১৯৬৫ সালের আগস্ট মাসে এদের আর একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সে বৈঠকে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন যাতে উপস্থিত হতে পারেন সেজন্য যাতায়াত খরচ বাবদ দু'টি সূত্রে দুই হাজার টাকাও পাঠানো হয়। এ মিটিং আগস্টের ২৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় এবং লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন এ মিটিংএ যোগদানের পরদিনই করাচী রওনা হয়ে যান। এ মিটিংএ লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন দাবী করেন যে, তিনি শেখ মুজিবের পরামর্শে ও নির্দেশনায় সামরিক বাহিনীর এক বিরাট সংখ্যক বর্তমান ও প্রাক্তন সদস্যকে তালিকাভূক্ত করেছেন এবং এদের সকল সদস্যই একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানকে প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছেন। এ সংবাদে সকল সদস্যই সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন প্রচুর অর্থ, অস্ত্র ও গোলাবারুদের প্রয়োজনীয়তার কথা জানালে ভারত থেকে সকল সহযোগীতাই পাওয়া যাবে বলে শেখ মুজিব নিশ্চয়তা দেন। ১৯৬৪ সালের ১লা সেপ্টেম্বর শেখ মুজিব এ লক্ষ্যে ৭০০ টাকা প্রদান করেন। ৯ই সেপ্টেম্বর তিনি আরো ৪০০০ টাকা দেন। এর পর ১৯৬৬ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবকে সামরিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি ম্যাপ এবং অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের পৃথক দু'টি তালিকা প্রদান করা হয়। কথিত আগরতলা ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত গোষ্ঠীর সদস্য সামাদকে লেখা ২৫শে ফেব্রুয়ারির এক পত্রে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন জানান যে, এ পরিকল্পনার জন্য তিনি যা কিছু করছেন তার সবকিছুই শেখ মুজিবের সাথে পরামর্শক্রমে করছেন। আওয়ামী লীগ মহাসচিব তাজউদ্দীনের ঢাকার বাসায় ১৯৬৬ সালের ১২ই মার্চ আরও একটি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিবের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে এ মিটিংও অনুষ্ঠিত হয়। সূদুর করাচী থেকে এসে লেঃ মোয়াজ্জম এসভায় যোগদান করেন। উক্ত সভায় আক্রমণ করার সময় নিয়ে আলোচনা হয় এবং জনসাধারণকে সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[৪০৬] এভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য এক সুগভীর ষড়যন্ত্র কিভাবে করা হয়েছিল এবং তার সাথে শেখ মুজিব কত ঘনিষ্ঠভাবে ও নেতৃত্ব দানকারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন তার এক বিস্তারিত বিবরণ সরকারী মহল থেকে দেওয়া হয়। আসামীদের বিরুদ্ধে এত নিখুঁতভাবে অভিযোগ ও তার প্রমাণসমূহ উপস্থাপন করা হয় যে, জনসাধারণের একটি বড় অংশ তাতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তবে আত্মপক্ষ সমর্থন করে শেখ মুজিব ১৯৬৮ সালের জুন মাসে আদালতে দাঁড়িয়ে যে জবানবন্দি দেন তা পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হওয়ার পর সে বিভ্রান্তি কিছুটা কাটতে শুরু করে। শেখ মুজিব তার জবানবন্দিতে পাকিস্তানের ইতিহাস,

---

৪০৫ স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্রঃ দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.৩০১।

৪০৬ The state versus Sheikh Mujibur Rahman and others - Accused specially in the statement of 6, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 23, 24, 28, 32, 37, and 42. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিল পত্র; দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৩০৩-৩১৪।

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামী লীগের সংগ্রামের ইতিহাস এবং ব্যক্তিগতভাবে তার ওপর সরকারী নির্যাতনের ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরেন। এসব ইতিহাস বলার মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে কিভাবে একটি কার্যকরী শক্তি হিসাবে বিকশিত হয়েছিল তারও একটি নাতিদীর্ঘ পর্যালোচনা করেন। এর পর তিনি ৬-দফার প্রতি ব্যাপক জনসমর্থনের কথা উল্লেখ করেনএবং আওয়ামী লীগ ও তার নিজের ওপর সরকারের এক দীর্ঘ নির্যাতনের ইতিহাস তুলে ধরেন। এ পর্যায়ে শেখ মুজিব মত প্রকাশ করেন যে, দীর্ঘ নির্যাতনের পরও যখন আওয়ামী লীগের অগ্রগতিকে বাধা দেওয়া যাচ্ছে না তখন আইয়ুব সরকার এভাবে আওয়ামী লীগ ও তার সভাপতি হিসাবে তাঁকে রাষ্ট্রদোহী রূপে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যেই এই জঘন্য পথে পা বাড়িয়েছে।

এর পর শেখ মুজিব উক্ত মামলার আসামীদের মধ্যে তিনজন প্রাক্তন আমলা এবং দু'জন আওয়ামী লীগ সদস্যের কথা বাদ দিয়ে লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেনসহ সকল সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তির সাথে তার কোন পরিচয় নেই বলে সুনির্দিষ্ট ঘোষণা দেন এবং এভাবে তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগকে খন্ডন করেন।[৪০৭]

শেখ মুজিবের উক্ত জবানবন্দিকে পুস্তিকা হিসাবে প্রকাশ করে আওয়ামী লীগ কর্মীরা আবার জনসাধারণের কাছে আস্তে আস্তে যেতে শুরু করে এবং মামলা পরিচালনার লক্ষ্যে 'শেখ মুজিব তহবিল' নামে একটি তহবিল গড়ে তোলার জন্য হাজার হাজার কূপন প্রকাশ করে। শেখ মুজিবের জবানবন্দি আর এ কূপনই হয়ে দাঁড়ায় আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থকদের কাছে এক মহাঅস্ত্র। অন্যদিকে, প্রায় প্রত্যেকদিন খবরের কাগজে বড় বড় শিরোনামে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সংবাদ প্রকাশিত হতে থাকে। আসামীদের জবানবন্দী ও সওয়াল-জবাবের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এভাবে প্রকাশ পায়। ফলে সমগ্র ১৯৬৮ সাল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সংবাদই জনসাধারণের মুখে মুখে আলোচিত হতে থাকে। এ ব্যাপক আলোচনার মধ্য দিয়েই দেশের জনগণ শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের পক্ষে ও বিপক্ষে মেরুভূত হতে থাকে। এ সময় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সংবাদ প্রচার মাধ্যমে কতখানি স্থান দখল করেছিল তার খানিকটা প্রমাণ ৮.১ সারণী থেকে পাওয়া যায়। এ সময় প্রকাশিত দৈনিক আজাদের প্রথম পাতায় উক্ত মামলা সংক্রান্ত যত সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল তার ওপর ভিত্তি করেই এ সারণিটি তৈরী করা হয়েছে।

সারণী ৮.১ থেকে দেখা যায়, ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কিত মোট ১৬৩টি সংবাদ ছাপা হয়। এ সংবাদগুলির মধ্যে শতকরা ৬.৭৫ ভাগ জবানবন্দী বিষয়ক, শতকরা ৫৮.২৮ ভাগ মূল মামলা বিষয়ক এবং অবশিষ্ট শতকরা ৩৪.৯৭ ভাগ ছিল উক্ত মামলা বিষয়ক অন্যান্য খবরাখবর।

সারণি ৮.১
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

	১৯৬৮ (জা-মে)	১৯৬৮ জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	১৯৬৯ জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মোট
জবানবন্দী	-	১	২	১	-	৩	৪	-	-	-	১১(৬.৭৫)
মামলা বিষয়ক মূল সংবাদ	৪	৭	২	২০	৩	১০	২৫	৪	১০	১০	৯৫(৫৮.২৮)
মামলা বিষয়ক অন্যান্য সংবাদ	-	৩	২	১৩	১০	৮	১৮	৩	-	-	৫৭(৩৪.৯৭)
মোট	৪	১১	৬	৩৪	১৩	২১	৪৭	৭	১০	১০	১৬৩(১০০.০০)

সারণি ৮.১ থেকে দেখা যায় ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে সরকারী প্রেসনোটের মাধ্যমে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিবরণ প্রকাশের পর পরবর্তী পাঁচ মাস এ সম্পর্কে প্রায় কোন সংবাদই আজাদের প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয়নি। এ সময়ে মাত্র চারটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। আর বিচারকমন্ডলী গঠন এবং তদন্ত কিংবা নতুন কাউকে উক্ত মামলার অন্তর্ভুক্ত করাই ছিল এসব সংবাদের মূল উপজীব্য। মারাত্মক ভীতিপ্রদ প্রেসনোটটি প্রকাশিত হওয়ার পর এ সংক্রান্ত কোন সংবাদ প্রকাশিত না হওয়ার কারণে সমগ্র রাজনৈতিক অঙ্গনে উৎকণ্ঠা আর উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। তবে এ মুহূর্তে কার কি করা উচিৎ সে কথাও যেন সবাই ভুলে বসেছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই যে, আমেনা বেগমের নামে শেখ মুজিবের ন্যায়-বিচারের দাবী করে একটি বিবৃতি প্রকাশের পর আর কিছু প্রকাশিত হয়নি। আরো বিস্ময়ের ব্যাপার হল এই যে, জুন মাসে শেখ মুজিব যেদিন তার জবানবন্দি দেন তার দু'দিন আগেও তার পক্ষে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব কোন আইনজীবী নির্বাচন করতেও সমর্থ হয়নি। এভাবে প্রথম পাঁচ মাস চলে যাওয়ার পর জুন মাস থেকে মামলা সংক্রান্ত খবরা-খবর প্রচার হতে থাকে। জুন মাসে মোট ১১টি শিরোনামে এ মামলা সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশিত হয়। জুলাই মাসে প্রকাশিত হয় মাত্র ৬টি। কিন্তু আগষ্ট মাসে এর সংখ্যা ৩৪-এ উপনীত হয়। সেপ্টেম্বর মাসে ১৩টি শিরোনামে, অক্টোবর মাসে ২১টি শিরোনামে এবং নভেম্বরে ৪৭টি শিরোনামে এমামলার সংবাদ প্রকাশিত হয়। এর পর হঠাৎ করেই সংবাদ সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে এবং কি সিদ্ধান্ত আদালত গ্রহণ করে তা নিয়েই সংবাদপত্রে কেবল জল্পনা-কল্পনা করা হয়। তবে নভেম্বরের সংবাদগুলি থেকে এটা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, শেখ মুজিব ও মামলার অন্যান্য আসামীরা গুরুতর শাস্তির সম্মুখীন হচ্ছেন। আর এ সময় সাধারণ মানুষ মনে মনে এত উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে যে, প্রায় সমগ্র বাঙ্গালী জাতি নিজের অজান্তেই শেখ মুজিবের সপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। আদালতের সংবাদ ও সরকারী প্রচারমাধ্যমও যে আন্দোলনের কত বড় হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে তার জ্বলন্ত প্রমাণ হচ্ছে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। আওয়ামী লীগের 'তহবিল গঠন' ও শেখ মুজিবের জবানবন্দি নিয়ে একটি সংগঠিত প্রচার চললেও সরকারী প্রচারমাধ্যম শেখ মুজিবকে জনপ্রিয় করে তুলতে যে ভূমিকা পালন করেছিল সে তুলনায় উক্ত সংগঠিত প্রচার কোন ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না।

রাজনৈতিক মহল যখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে শংকিতভাবে পর্যবেক্ষণ করছে, ইচ্ছা থাকলেও এর পক্ষে-বিপক্ষে কোন মতামত প্রকাশ করতে দ্বিধা করছে, আর অপেক্ষা করছে দেখা যাক কি হয়, সে রকম একটি মুহূর্তে পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতিসেবী ও সাহিত্যিকরা কিছুটা হলেও সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। পাকিস্তান লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখার উদ্যোগে ১৯৬৮ সালের ৬ই জুলাই থেকে পাঁচ দিনব্যাপী মহাকবি স্মরণোৎসব নামে এক উৎসবমালা শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন উক্ত পাঁচজন বিশিষ্ট কবির

[৪০৭] শেখ মুজিবের জবান বন্দী, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিল পত্র; দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৩৫৯-৩৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

স্মরণোৎসবের প্রথম দিনের আলোচ্য ব্যক্তিত্ব। চতুর্থ ও পঞ্চম দিনে মাইকেল মধুসুধন দত্ত ও নজরুল ইসলাম নিয়ে আলোচনায় । এ স্মরণোৎসবে বিপুল সংখ্যক দর্শকের সমাবেশ ঘটে এবং এটা পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যিক, সংস্কৃতিসেবী ও রাজনীতিবিদদের মিলন কেন্দ্রে পরিণত হয়। যদিও এ সম্মেলনে সকল স্তরের সাহিত্যিকদের আন্তরিক অংশগ্রহণ ছিল না, তথাপি বাংলা সাহিত্য ও তার ঐতিহ্য সম্পর্কে দর্শকদের মধ্যে এতে পুনর্বার এক বিরাট সাড়া জাগে। অথচ এ ঘটনার কয়েকদিন পরই বাংলা ভাষা ও তার ঐতিহ্য নিয়ে এক নতুন বিভ্রান্তিকর সংবাদ প্রকাশিত হয়দুঃখের বিষয় এই যে,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ বিভ্রান্তির কাজে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ে। যেমন, বাংলা বর্ণমালা ও বানান সংস্কার প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিল ১০ সদস্য বিশিষ্ট যে কমিটি গঠন করে তাতে অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক এম. আবদুল হাই ও ডঃ এনামুল হক ছাড়া অন্যরা বাংলা বর্ণমালা ও বানান-রীতির ঐতিহ্য রক্ষার-বিরোধী ছিলেন। উক্ত কমিটি তিন-জনের আপত্তি সত্ত্বেও বাংলা বর্ণমালা ব্যবহার ও বানান-রীতির জন্য সুপারিশ করেন এবং বাংলা বর্ণমালার মধ্য থেকে ৭টি বিশেষ বর্ণ বর্জন করার সুপারিশ করেন।[৪০৮] এতে দেশের বুদ্ধিজীবী মহলে এক প্রচন্ড প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সকল স্তরে এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা হয়। এ পর্যায়ে ঢাকার ৪২ জন সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ, শিল্পী ও সাংবাদিক এক যুক্ত বিবৃতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলে গৃহীত বাংলা বর্ণমালা লিখনরীতি ও বানান সংস্কার সংক্রান্ত উক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন। তারা উক্ত বিবৃতিতে নিম্নোক্ত অভিমতব্যক্ত করেন ঃ

প্রস্তাবিত পরিবর্তন গ্রহণ করা হলে হাজার বছরের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সাথে আমাদের স্বাভাবিক সম্পর্ক বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়বে, শব্দ তার পূর্বতন ব্যবহার ও ব্যুৎপত্তিগত ভাবার্থের অনুষঙ্গ হারিয়ে ফেলবে, কবিতার ছন্দ প্রকরণের নিয়মাদি বিপর্যস্ত হবে এবং ভাষাকে ব্যাকরণের সূত্র ধারায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য হবে। এছাড়াও সৃজনশীল সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক নিদারুণ বন্ধ্যাত্ব দেখা দেবে এবং ভাষা ও সাহিত্য পঙ্গু হয়ে পড়বে।[৪০৯]

বিবৃতিদাতারা এর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিলের গৃহীত সংস্কারের পক্ষের যুক্তিগুলিকে একে একে খন্ডন করেন এবং বলে মন্তব্য করেন বাংলা ভাষা ও তার সাহিত্যের হাজার বছরের ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার লক্ষ্যেই এ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। পরিশেষে তারা এ উদ্যোগকে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে এক গভীর ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করে সকল বাংলা ভাষাভাষীকে এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে এগিয়ে আসার জন্য আহবান জানান। এ বিবৃতিতে যারা স্বাক্ষর করেন তাদের উল্লেখযোগ্য হচ্ছেনঃ ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, মোঃ নাসিরুদ্দিন, বেগম সুফিয়া কামাল, সিকান্দার আবু জাফর, শহীদুল্লাহ কায়সার, জহির রায়হান, হাসান হাফিজুর রহমান, শামসুর রাহমান, সাঈদ আতিকুল্লাহ, আবদুল গাফফার চৌধুরীসহ মোট ৪২ জন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী।[৪১০]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের বাংলা বানানরীতির ও সংস্কার ও বর্ণমালা বিলোপের উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদ ১৯৬৮ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর এক ছাত্র সমাবেশের আয়োজন করে এবং সে উপলক্ষে উক্ত প্রচেষ্টাকে তীব্রভাবে নিন্দা করা হয় যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর বার বার যে আঘাত এসেছে, আজকের এ হীন প্রচেষ্টা তা থেকে বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়।[৪১১]

"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিল সমীপে একটি খোলা চিঠি" এ শিরোনামে হাসান হাফিজুর রহমান উক্ত সংস্কার প্রচেষ্টাকে যুক্তি গ্রাহ্যভাবে সমালোচনা ও তাদের মতামতকে খন্ডন করেন। এ চিঠি সংবাদপত্রসমূহে ফলাও করে প্রচার করা হয়।[৪১২] পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদেরও বিরোধী সদস্যরা এ প্রচেষ্টার তীব্র সমালোচনা করে বলেন বাংলা ভাষার উন্নতির পরিবর্তে বিকৃত করার ষড়যন্ত্র চলছে।

এদিকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ প্রচন্ডভাবে আলোড়িত হতে থাকে। তার ওপর বাংলা ভাষাকে নিয়ে নতুন ষড়যন্ত্রের সংবাদ তাদেরকে আরো ক্ষিপ্ত ও হতাশ করে তোলে। এর প্রকাশ হিসাবেই দেখা যায় সে সময়ের একটি প্রভাবশালী পাকিস্তানবাদী দৈনিক পত্রিকা 'আজাদ' এ প্রায় প্রতিদিন পাকিস্তানের দু'অংশের মধ্যেকার ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের করুণ চিত্র তুলে ধরা হতে থাকে। ফলে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে বাঙ্গালী জনসাধারনেব দূরত্ব ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। অন্যদিকে, আইয়ুব খান আবারও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন বলে সংবাদ প্রকাশিত হলে অসন্তোষ আরো বৃদ্ধি পায়। কেননা, ততদিনে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের কাছে আইয়ুব খান ব্যক্তিগতভাবেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। উপরন্তু, এ সময় প্রেসিডেন্ট আইয়ুব সকল বিরোধী রাজনৈতিক দলকে ঢালাওভাবে সমালোচনা করতে থাকেন। শুধু তাই নয়, ২৪শে সেপ্টেম্বর আইয়ুব আবারও ঘোষণা করেন, 'পাকিস্তানে ভবিষ্যতে একটি মাত্র ভাষা থাকবে।' ১লা অক্টোবর আইয়ুব তার মাস পয়লা ভাষণে আবারও আঞ্চলিক তমদ্দুনে বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন। ইতিপূর্বে তিনি প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে ক্রুসেডের আহবান জানান।

এ বছর জুলাই মাসের প্রথম দিক থেকেই সারা প্রদেশব্যাপী বন্যা দেখা দেয়। তার ওপর প্রবল বর্ষণের ফলে সে সময়ের ১৭টি জেলার মধ্যে ১২টির অধিকাংশ এলাকা প্লাবিত হয় । ১০ লক্ষ একর জমির ফসল বিনষ্ট হয় এবং ২৫ লক্ষ লোক সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৪ই জুলাই পর্যন্ত এ বর্ষণ অব্যাহত থাকার ফলে সারা প্রদেশের স্থল যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। ১৫ই জুলাই বন্যার স্রোতে ১৮০ ব্যক্তির ভেসে যাওয়ার সংবাদ প্রকাশিথ হয় । এ বন্যায় অসংখ্য গবাদিপশু মারা যায় এবং ঘরবাড়ী ধ্বংস হয়, যার কোন হিসাব নেওয়ার চেষ্টা করা হয় নি। পরিস্থিতি এত ভয়াবহ রূপ নেয় যে, আওয়ামী লীগ ও ন্যাপসহ সকল রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠন সে সময় রিলিফের কাজকে প্রাথমিক কর্তব্য বলে মনে করে। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এ ধরনের জরুরী রিলিফ কাজের সুবিধার জন্য ছাত্ররা ১৪৪ ধারা প্রত্যাহারের আবেদন করলে সরকার তা প্রত্যাখ্যান করে। এমনকি, এ দাবীতে ছাত্ররা শোভাযাত্রা অনুষ্ঠান করতে গেলে উক্ত শোভাযাত্রার ওপর পুলিশ বাহিনী নির্মমভাবে লাঠিচার্জ করে।

বন্যার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া কেটে যাওয়ার পর ২৭শে জুলাই মওলানা ভাসানী এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন এবং তাতে তিনি সকল বিরোধী দলের প্রতি বন্যা নিয়ন্ত্রণ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করার জন্য আহবান জানান। তিনি তার বক্তব্যে

---

৪০৮. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলঃ দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.৩৬৮।

৪০৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭০।

৪১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭১।

৪১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭২।

৪১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৩-৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বন্যা এমন একটি নিয়মিত সমস্যায় পরিণত হয়েছে যে, যাকে নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য নেওয়া এখানকার কোন কর্মসূচীই বাস্তাবায়িত হবে না। আর এর সাথে জড়িত রয়েছে লক্ষ লক্ষ কৃষক-জনতার ভাগ্য। ফলে এ সমস্যাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা প্রয়োজন। এ সাংবাদিক সম্মেলনের পর থেকে ন্যাপ (ভাসানী) বন্যা সমস্যা সমাধান ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য সারা প্রদেশব্যাপী জনসভা, বিক্ষোভ মিছিল ও খাদ্যের দাবীতে সরকারী দফতর ঘেরাও এর ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে। এ কমূসূচী শুরুর আগে সারা প্রদেশ ঘুরে এসে ন্যাপ (ভাসানী)এর প্রাদেশিক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ তোয়াহা পূর্ব পাকিস্তানকে দুর্ভিক্ষ এলাকা ঘোষণা করার দাবী জানান। এভাবে ন্যাপ বন্যা সমস্যার সমাধান ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের দাবীতে ১৯৬৮ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাস এককভাবে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করে। এ সময়ের সাপ্তাহিক জনতার প্রতিটি সংখ্যায় ন্যাপ (ভাসানী) ও কৃষক সমিতির নেতৃত্বে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন ও সভাসমিতির সংবাদ প্রকাশিত হয়। এর পর অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রাদেশিক ন্যাপের কার্যকরী কমিটির এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় ন্যাপ আইয়ুব সরকার বিরোধী ব্যাপক ও ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং ৫ই অক্টোবর দেশের রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনার জন্য ২৫ জন বিশিষ্ট বিরোধী দলীয় নেতাকে বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। উক্ত সভায় বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের দাবী নিয়ে ব্যাপক বিক্ষোভ, ধর্মঘট ও ঘেরাও কর্মসূচী পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ৩রা নভেম্বর দাবী দিবস পালনেরও আহবান জানানো হয়। এর পর থেকে গোটা অক্টোবর মাসে ন্যাপ ভাসানীর নেতৃত্বে তুমুল বিক্ষোভ, প্রতিবাদ ও ঘেরাও আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয়। এক্ষেত্রে ন্যাপের মূল দাবী ছিল বন্যা সমস্যার সমাধান ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ।[৪১৩] প্রতিটি জনসভায় ন্যাপ (ভাসানী) নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ওপর গুরুত্ব প্রদান করেন।

ইতিমধ্যে পাকিস্তানে একমাত্র ভাষা প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত আইয়ুব খানের বক্তব্য নিয়ে ছাত্র, বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এ সময় জগন্নাথ কলেজকে সরকারীকরণের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সেখানে অব্যাহতভাবে ধর্মঘট, বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ আন্দোলন চলছিল। ১৭ই সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবসকে কেন্দ্র করে এ প্রতিবাদ আরও তীব্ররূপ পরিগ্রহ করে। এ আন্দোলনকে নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকার অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা বেশ উত্তেজিত ছিল, ফলে ভাষা প্রশ্নটি আবার নতুন করে উপস্থাপিত হওয়ার কারণে ছাত্ররা ঐক্যবদ্ধভাবে এক তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলে। চারটি ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে এক যুক্ত বিবৃতিতে আইয়ুবের বক্তব্যকে একটি দুরভিসন্ধিমূলক প্রচেষ্টা হিসাবে আখায়িত রা হয় এবং বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর যে কোন ধরনের হামলাকে প্রতিহত করা হবে বলে দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করা হয়।[৪১৪] মওলানা ভাসানী ও আইয়ুবের এ বক্তব্যকে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করেন। আওয়ামী লীগের প্রাক্তণ সভাপতি আবদুর রশীদ তর্কবাগীশও এ প্রচেষ্টার সমালোচনা করে একটি দীর্ঘ বিবৃতি প্রদান করেন। এছাড়া, আওয়ামী লীগ, ন্যাপের উভয় অংশ, সংস্কৃতি সংসদসহ বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আইয়ুব খানের উক্ত বক্তব্যকে সমালোচনা করে সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রদান করে।

এ সময় শ্রমিকদের বিভিন্ন অংশ তাদের নিজস্ব কর্মসূচী ও খাদ্যসহ বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য হ্রাসের দাবীতে ঘেরাও অভিযান শুরু করে। রেল ও বন্দর শ্রমিকদের আন্দোলন এ সময় বেশ তীব্র রূপ ধারণ করে।[৪১৫]

এরকম একটি পরিস্থিতিতে সরকার মহাসমারোহে আইয়ুবের উন্নয়ন দশক পালন শুরু করে। সারা দেশব্যাপী সরকারী দল ও সরকারী প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে যখন এ অনুষ্ঠান শুরু হয় তখন দেশে কার্যত দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছে। তাই এমন হাঁক-ডাক করে উন্নয়ন দশক পালন করার বিষয়টি ছিল খুবই দৃষ্টিকটু। সরকারের সকল মাধ্যম উন্নয়ন দশকের প্রচারে প্রায় সার্বক্ষণিক ব্যাপৃত থাকতো। সে সময় সরকার সমর্থিত প্রচারমাধ্যম ও সংবাদপত্রগুলি বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। জনসাধারণ কিভাবে উন্নয়ন দশকের এসব অনুষ্ঠান বর্জন করেছিল তা সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট উদ্বৃত করলেই পরিষ্কার হয়ে যাবেঃ

"মাইক আছে বক্তা নাই – চেয়ার আছে শ্রোতা নাইঃ

চাপাইনবাবগঞ্জ (রাজশাহী), ১লা নভেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা) সম্প্রতি স্থানীয় পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উদ্যোগে উন্নয়ন দশক উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী এক কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়। এ কার্যসূচী অনুযায়ী প্রদর্শনী, সেমিনার, পুরষ্কার বিতরণ ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। সেমিনার দিবসে মাইকযোগে প্রচারকার্য্য চালাইবার পর দেখা গেল সেমিনারে মাইক আছে, বক্তা নাই। চেয়ার সাজানো আছে কিন্তু শ্রোতা বলিয়া কেহ সেখানে উপস্থিত হয় নাই। কেবল পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের এই অবস্থা নয়। যত উন্নয়ন দশক পালনের আয়োজন করা হইয়াছে সবখানেই একই অবস্থা। কোনখানেই উৎসুক দর্শকের সমাগম ঘটে নাই। উন্নয়ন দশকের সব কয়টি অনুষ্ঠানই প্রাণহীন অবস্থায় সমাপ্ত হইয়াছে।"[৪১৬]

কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশব্যাপী সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বিস্তর আয়োজন করতো, ঢাকা শহরসহ বড় বড় শহরে ব্যাপকভাবে আলোকসজ্জা করা হয়েছিল, এবং এমনকি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেও জাঁকজমকপূর্ণভাবে 'উন্নয়নের এক দশক' পালন করা হয়েছিল। মানুষের মনে যে কি ঘৃণা ও ক্ষোভ জন্ম নিয়েছিল তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ ও অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের দেওয়া একটি যুক্ত বিবৃতি থেকে জানা যায়। এ বিবৃতির প্রতিটি ছত্রে আইয়ুব দশকের এ অনুষ্ঠান সম্পর্কে তীব্র অসন্তোষ ও ঘৃণার প্রকাশ ঘটেছে।[৪১৭]

উন্নয়ন দশক যে এ সময় একটি প্রহসনে পরিণত হয়েছিল তা সাপ্তাহিক জনতার সম্পাদককে লেখা টাংগাইলের জনৈক শাহ আহমদ রেজার পত্র থেকেও পাওয়া যায়। তিনি সংবাদপত্রে প্রকাশের উদ্দেশ্যে এ চিঠিতে লিখেছেনঃ

"...বর্তমান সরকারের যে লজ্জা-শরম বলতে কিছুই নেই, সেতো আজকে সবারই জানা। ..... উন্নয়ন দশক নিয়ে লাফালাফি, নাচানাচি যতই করুন না কেন, দেশের সত্যিকার উন্নতি যে আসলে কিছুই হয়নি,... তার প্রমাণ এই উন্নয়ন দশক উদ্‌যাপনের সময়ই

---

৪১৩. সাপ্তাহিক জনতা, ১৪,২২ ও ২৯শে অক্টোবর এবং ৫ই নভেম্বর প্রকাশিত চারটি সংখ্যাতেই প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিবাদ, বিক্ষোভ শোভাযাত্রা এবং ঘেরাও সংক্রান্ত অসংখ্য সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

৪১৪. সাপ্তাহিক জনতা, ৬ই অক্টোবর, ১৯৬৮।

৪১৫. সাপ্তাহিক জনতা, ৬ ও ১৪ই অক্টোবরের সংখ্যা, ১৯৬৮।

৪১৬. সংবাদ, ঢাকা, ৩রা নভেম্বর, ১৯৬৮।

৪১৭. সাপ্তাহিক জনতা, ঢাকা, ২০শে অক্টোবর ,১৯৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

বহুবার প্রমাণ হয়ে গেছে। উদাহরণের জন্য বেশী দূর যেতে হবে না, এই আমাদের টাঙ্গাইলেরই একটি ঘটনা তুলে ধরলে পরিষ্কার হয়ে যাবে। ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ যে কত দুঃসাহসী হয়ে উঠতে পারে তারই একটি মহান দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন টাংগাইল চর অঞ্চলের ভুখা-কৃষক সমাজ। তারা অন্য কাউকে নন, প্রথমে স্বয়ং প্রাদেশিক পরিষদের অস্থায়ী স্পীকার সাহেবকে এবং পরে তাদের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গলি প্রদর্শনকারী মহকুমা হাকিমকে ঘেরাও করেছিলেন।

"একদিকে সরকার তথাকথিত উন্নয়ন দশক পালনার্থে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করতে ব্যস্ত; অন্য দিকে সে টাকার প্রকৃত মালিক কৃষক সমাজ দুইমুঠো চাউল নয়, আটার জন্য পাগলের মত বেরিয়ে এসে সরকারী কর্মচারীদের ঘেরাও করেন-- এটা সরকারের উন্নয়ন দশকের উদাহরণ বৈকি।"[৪১৮]

যখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে নিয়ে সমগ্র জনসাধারণ শংকিত ও উৎকন্ঠিত, যখন প্রদেশে কার্যত একটি দূর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছে, ঘেরাও আর ধর্মঘটের মধ্য দিয়েসারাদেশব্যাপী শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্রদের অসন্তোষ ও বিক্ষোভ বার বার প্রকাশিত হয়ে পড়ছে - - ঠিক তখনই আইয়ুব সরকার বাংলা ভাষা ও তার সংস্কৃতি নিয়ে নতুন বিতর্ক শুরু করেছেন ঢাক-ঢোল পিটিয়ে তার উন্নয়ন দশকের মহাকির্তন করছেন। এরকম একটি সময়ে আওয়ামী লীগ তার কাউন্সিল অধিবেশনে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯শে অক্টোবর থেকে অনুষ্ঠিত দুই দিনব্যাপী এ কাউন্সিলে দু'টি বিষয় খুবই গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয় ঃ(১) ৬-দফা কর্মসূচী সম্পর্কিত ভুল বোঝাবুঝি, (২) আসন্ন মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচনে অংশগ্রহণ । প্রথম বিষয়টি সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত হয় তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আওয়ামী লীগের অস্থায়ী সভাপতি বলেনঃ "অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার এই যে, বামপন্থী একটি রাজনৈতিক দলের কতিপয় নেতা ৬-দফার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী ইংগিত আবিষ্কারের গবেষণায় লিপ্ত এবং ৬ দফার দ্বারা কৃষক ও শ্রমিকেরা লাভবান হবে না বলে চিৎকার শুরু করেছেন। ৬--দফা কর্মসূচীর মাধ্যমে আওয়ামী লীগ কৃষক-শ্রমিকের সমস্যা সমাধান দেয় নাই বলে যারা প্রচার করে তাদের জবাবে আমি বলতে চাই যে, ৬-দফা আওয়ামী লীগের পরিপূর্ণ ম্যানিফেস্টো নয়। ইহা ম্যানিফেষ্টোর এক প্রধান অংশ মাত্র। আওয়ামী লীগ তার ম্যানিফেস্টোর মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনকে স্থির করেছে। আওয়ামী লীগের সমাজতন্ত্র বিদেশ থেকে ধার করা কোন সমাজতন্ত্র নয়। এই দেশের মাটিতে এই দেশের মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থনীতি ব্যবস্থা প্রবর্তন করাই আওয়ামী লীগের একমাত্র লক্ষ্য।"[৪১৯]

আওয়ামী লীগ শুধু এ বিষয়ে সিদ্ধান্তই নেয় নি; পরবর্তীকালে জনসভা বা অন্য সকল বক্তব্যে ঐ দলের নেতারা বড় পুঁজিপতিদের প্রতি প্রচন্ড আক্রমণ করে কথা বলতে থাকেন এবং সমাধান হিসাবে সমাজতন্ত্রের কথা প্রচার করেন। দ্বিতীয় বিষয়টি নিয়ে আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে কিছু দ্বিমত ছিল তবে অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ নেতা আসন্ন মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচনে অংশগ্রহণের পক্ষে ছিলেন। এরকম একটি অবস্থায় কয়েক হাজার লিফলেট কে বা কারা কাউন্সিল কক্ষের মাঝে এসে রেখে যায়। উক্ত বেনামী লিফলেটে বিস্তারিতভাবে পয়েন্ট আকারে লেখা হয় আসন্ন নির্বাচনে অংশ নিলে কি হবে, আর অংশ না নিলে কি হবে। আইয়ুব সরকারের অধীনে কোন নির্বাচন যে নিরপেক্ষ হতে পারেনা এবং তার অধীনে যে কোন নির্বাচন যে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্যতা ইতিমধ্যেই হারিয়ে ফেলেছে--সে কথাটি উক্ত লিফলেটে স্পষ্ট করে বলা হয়।[৪২০] এ লিফলেটটি কর্মীদের হাতে পৌঁছার পর তাদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে সমগ্র কাউন্সিলারদের তা পড়ে শোনানো হয়। ফলে নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিপক্ষে ব্যাপক মতামত গড়ে উঠে। তাই নেতৃত্বের পক্ষে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। আওয়ামী লীগের এ সিদ্ধান্তটিও সেই সময়ের সংকটজনক পরিস্থিতিতে তাকে রাজনৈতিকভাবে রক্ষা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আওয়ামী লীগএ কাউন্সিলে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয় এবং সেটি হচ্ছে সংখ্যাসাম্য সম্পর্কিত তাদের আগের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন। এবার তারা জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্র দাবী করে।

ইতিপূর্বে আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিটের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেয়। তারা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতির কথা ঘোষণা করে। এ সময়ে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত দু'টি গ্রহণ করায় ন্যাপের (ভাসানী) সাথে আওয়ামী লীগের ঐক্যের একটি কার্যকরী ভিত্তি তৈরী হয়ে যায়। উল্লেখ্য সে সময় সিপিইপি আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। তখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রচার সর্বোচ্চে। এ সময়ে ন্যাপ (ভাসানী)-এর নেতৃত্বের উপলব্ধির ক্ষেত্রে এক গুণগত পরিবর্তন ঘটে। ১৯৬৮ সালের ৩রা নভেম্বর ছিল ন্যাপ (ভাসানী) এর দাবী দিবস উপলক্ষে পল্টন ময়দানে জনসভা। এ সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে মওলানা ভাসানী সমস্ত প্রশ্নকে বাদ রেখে আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সংগঠিত করার আহবান জানান এবং দেশব্যাপী লাগাতার ঘেরাও আন্দোলন শুরু করার ডাক দেন।[৪২১] মওলানা ভাসানী পূর্ব পাকিস্তানের ওপর বৃহৎ পুঁজিপতি শ্রেণী ও সরকারের শোষণ-নির্যাতনের এক মর্মস্পর্শী বিবরণ দেন এবং বন্যা-খরা আর অজন্মার কারণে স্থায়ী দারিদ্র্যের কথা উল্লেখ করে তিনি মন্তব্য করেন ক্ষমতাসীন সরকারের পূর্ব পাকিস্তানের ওপর সীমাহীন অবহেলার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের কৃষক-শ্রমিকসহ সমগ্র মেহনতী মানুষের ভাগ্য আজ বিড়ম্বিত। মওলানা ভাসানী বন্যা সমস্যাকে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে ছয় কোটি মানুষের বাঁচা মরার সমস্যা বলে অভিহিত করে ক্ষমতাসীন সরকারের উদ্দেশ্য বলেনঃ

> "আপনারা যদি পূর্ব পাকিস্তানের এই হায়াত-মউতের সমস্যা সমাধানে অগ্রসর না হন তাহা হইলে পূর্ব পাকিস্তানকে 'তালাক' দিন, পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে ৬ কোটি মানুষকে বিচ্ছিন্ন হইতে দিনঃ নিজেদের পায়ে দাঁড়াইয়া নিজেদের সমস্যার সমাধান করিতে দিন।"[৪২২]

মওলানা ভাসানী পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের অপরিহার্যতা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেনঃ "পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার ১৩ শত মাইলের ব্যবধানের কথা স্মরণে রাখিয়াই নিজেদেরকে শাষণ করার পূর্ণ অধিকারসমূহসহ দু'টি রাষ্ট্রের

---

৪১৮. প্রাগুক্ত।

৪১৯. প্রাগুক্ত।

৪২০. বদরুদ্দীন উমরের কাছে সংরক্ষিত উল্লেখ্য যে, তৎকালীন সিপিইপির একটি ক্ষুদ্র বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সাথে আলোচনা করে এবং তাদের সহযোগিতা নিয়েই এ প্রচারপত্রটি বদরুদ্দীন উমর নিজেই লিখেছিলেন, ছেপেছিলেন এবং তা প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন। বদরুদ্দীন উমর গবেষকের কাছে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার প্রদানকালে এ বক্তব্য বলেছেন।

৪২১. সাপ্তাহিক জনতা, ১০ই নভেম্বর, ১৯৬৮।

৪২২. সংবাদ, ঢাকা, ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

সমন্বয়ে পাকিস্তান গঠনের উদ্দেশ্যে ১৯৪০ সালের জিন্নাহ সাহেবের সভাপতিত্বে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল।.... পাক-ভারত যুদ্ধের অভিজ্ঞতা পূর্ব পাকিস্তানের অসহায়তাও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীর একান্ত অপরিহার্যতাকে পুনর্বার অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলিয়া ধরিয়াছে।"[৪২৩]

স্মরণযোগ্য যে, ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পর পর শেখ মুজিবুর রহমান ঠিক এ কথাগুলিই বলেছিলেন এবং ভাসানী ও তার সমর্থকগণ এজন্য শেখ মুজিবকে বিভিন্ন ধরনের সমালোচনাও করেছিলেন। কিন্তু মাত্র তিন বছর পর মওলানা ভাসানী নিজেই সে ধরনের বক্তব্য খুব জোরালোভাবে বললেন। ফলে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ন্যাপের (ভাসানীর) সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে।

এদিকে, পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপক ছাত্র আন্দোলনেরকারণে পিপলস্ পার্টি নেতা জুলফিকার আলী ভূট্টো ও ন্যাপ (ওয়ালী) সভাপতি ওয়ালী খানসহ অসংখ্য রাজনৈতিক ও ছাত্র নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে পশ্চিম পাকিস্তানে ছাত্র আন্দোলন আরো জোড়দার হয়। শ্রমিকশ্রেণীসহ শহরে বসবাসকারী বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশাজীবীর প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ ক্রমে পশ্চিম পাকিস্তানের সমগ্র শহরাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এ সংগ্রামের ঢেউ পূর্ব পাকিস্তানেও ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৬৮ সালের ১৫ই অক্টোবর সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠন এন,এস,এফ, এর কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক পাচপাত্তুর ছুরিকাঘাতে আহত হয়ে ২২শে অক্টোবর মৃত্যুবরণ করলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তারপর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের উক্ত আন্দোলন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নীরবতাকে ভেঙ্গে ফেলে। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্ররা পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্রদের ওপর গুলীবর্ষণ ও ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে ব্যাপকতর বিক্ষোভ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহ সরকারী দমন-পীড়নের প্রতিবাদ জানায়। এ সময় ন্যাপ (ওয়ালী) ছাত্র নির্যাতন ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের প্রতিবাদে ১১ই নভেম্বর থেকে প্রতিবাদ সপ্তাহ শুরু করে এবং ১৭ই ডিসেম্বর ঢাকার পল্টন ময়দানে জনসভা অনুষ্ঠান করে। পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে এ সময় পশ্চিম পাকিস্তানের ঘটনাবলীর প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। ১৯শে নভেম্বর প্রধান ছাত্র সংগঠনগুলিসহ ন্যাপ ভাসানী পশ্চিম পাকিস্তানের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবাদ দিবস পালন করে।

পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্র আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার লক্ষ্যে সরকার যে ব্যাপক দমননীতি চালায় তাতে সাময়িকভাবে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসে। তবে প্রদেশব্যাপী চলতে থাকে চরম উত্তেজনা। ফলে কারফিউ উঠিয়ে নেওয়ার পর থেকেই আবারও দমন-পীড়নের প্রতিবাদে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এ সকল বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের এক পর্যায়ে রাওয়ালপিন্ডিতে ঘটে যায় ছোট-খাট একটি ছাত্র অভ্যুত্থান। ২৬শে নভেম্বর সেখানে ২০ হাজার ছাত্র ৭ ঘন্টাব্যাপী বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সরকারী প্রশাসন পরিস্থিতির ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। ২৭শে নভেম্বরও পেশোয়ার ও রাওয়ালপিন্ডিতে ব্যাপক ছাত্র বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয় এবং বহুস্থানে ছাত্রদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ ঘটে। ২৯শে নভেম্বর আবারও ছাত্ররা প্রতিবাদ দিবস পালন করে, তবে পুলিশ বাহিনী ব্যাপক সতর্ক থাকলেও তখন ছাত্রদের ওপর আক্রমণ করে নি। এ সময় ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকা সত্ত্বেও ৩০শে নভেম্বর সরকারী দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে গেলে পুলিশ বাহিনী ছাত্রদের ওপর লাঠিচার্জ করে। এভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্র আন্দোলন ধীরে ধীরে থেমে যায়।

এদিকে, ন্যাপ (ভাসানী) নেতা মওলানা ভাসানী বিরোধী দলের প্রতি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে আলোচনার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের লিখিত আহবান জানান। অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দকে আহ্বান জানালেও ন্যাপ (ওয়ালী)কে দাওয়াত করা হয়নি- এ অভিযোগে আওয়ামী লীগ তাতে অংশগ্রহণ করে নি। কিন্তু ন্যাপের (ভাসানী) কাছে আওয়ামী লীগ ছিল সে সময় ঘনিষ্ঠতর মিত্র। ফলে ভাসানীর ডাকে অনুষ্ঠিত এ সভায় কোন ফল হয়নি। ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগের মধ্যে রাজনৈতিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে যে বেশ পরিবর্তন আসে তার পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দও বেশ তৎপর হয়ে ওঠেন। কিন্তু সে তৎপরতার অংশ হিসাবে আওয়ামী লীগ নিজে কোন বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য বিরোধী দলসমূহের প্রতি আহবান জানায় নি। বরং ন্যাপ (ওয়ালী) বিরোধী দলের ঐক্যজোট গঠনের উদ্দেশ্যে ২৮শে নভেম্বর সর্বদলীয় বৈঠকের আহবান জানায়। আর এ'দিনই ন্যাপ (ভাসানী), কৃষক সমিতি ও শ্রমিক ফেডারেশন যৌথভাবে দমননীতির প্রতিবাদ ও বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে এক গণস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানের কর্মসূচী ঘোষণা করে। অবশ্য এর কিছু আগে থেকেই ন্যাপ (ভাসানী) বিরোধী দলীয় ঐক্যের ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। কেননা যে আওয়ামী লীগের সাথে ঐক্য করাটাকে সে সময় তারা সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিল সেই আওয়ামী লীগই ন্যাপ (ওয়ালী)কে ডাকা হয়নি-- এ অভিযোগে তাদের ডাকা সভায় উপস্থিত হতে অস্বীকার করেছিল, অর্থাৎ এ ঐক্যের মধ্য দিয়ে যে কোন কার্যকরী সংগ্রাম গড়ে তোলা যাবেনা-- এ সম্পর্কে তাদের মধ্যে একটি নিশ্চিত ধারণা জন্মে যায়। উপরন্তু, আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (ওয়ালী) ছাড়া অন্যান্য দলের সাথে আলোচনার মধ্য দিয়ে ইতিমধ্যেই ন্যাপ (ভাসানী) অনুভব করেছিল যে এসকল দল প্রকৃতপক্ষে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে নির্ভরযোগ্য মিত্র নয়। ফলে তারা নিজের উদ্যোগেই গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে থাকে।[৪২৪] প্রদেশের যেখানেই তাদের সংগঠনের কিছুটা শক্তি ছিল সেখানেই তারা প্রতিবাদ ও ঘেরাও আন্দোলন গড়ে তুলে। এ সময় মওলানা ভাসানী সারা উত্তরবঙ্গের গ্রামাঞ্চল সফর করেন এবং প্রতিদিন একাধিক বৃহৎ জনসভায় তার স্বভাবসুলভ জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দেন। ২৩ শে নভেম্বর এক জনসভায় আইয়ুব সরকারের পতন ঘটানোর লক্ষ্যে বৃহৎ গণআন্দোলন শুরু করার জন্য জনসাধারণকে প্রস্তুত থাকার আহবান জানান। জনসভা শেষে একজন সাংবাদিকের সাথে আলাপকালে সুনির্দিষ্টভাবে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে, "ব্যাপক গণআন্দোলন শুরু করার প্রস্তুতি হিসাবেই তিনি এবং তার দল এ সকল কর্মকান্ড পরিচালনা করে চলেছেন। গণআন্দোলনসংগঠনের জন্য প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টির কাজ অব্যাহত রয়েছে। ডিসেম্বরের ১৫ তারিখ পর্যন্ত এ প্রস্তুতির কাজ অব্যাহত থাকবে। এবং তারপর ব্যাপকতর আন্দোলন শুরু করা হবে।"[৪২৫]

এ পর্যায়ে পশ্চিম পাকিস্তানের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে ন্যাপ (ভাসানী) ও কৃষক সমিতির পক্ষ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সরকারী নির্যাতন ও গ্রেফতারের প্রতিবাদে এবং সকল রাজবন্দীর মুক্তির দাবীতে ৬ই ডিসেম্বর দাবী দিবস পালনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। এ উপলক্ষে পল্টন ময়দানে একটি জনসভা অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেওয়া হয়। কিন্তু সেখানে জনসভার অনুমতি মিলেনি। ফলে ৬ তারিখের

---

৪২৩. প্রাগুক্ত।

৪২৪. তৎকালীন ন্যাপ ভাসানীর যুগ্ম সম্পাদক নূরুল হুদা মির্জার সাথে সাক্ষাৎকার।

৪২৫. আজাদ, ঢাকা, ২৯শে নভেম্বর, ১৯৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

জনসভার স্থান স্টেডিয়াম গেটে পুনর্নির্ধারণ করা হয়। এদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার ওপর সরকারী গুন্ডাবাহিনীর নির্মম আক্রমণ ও নির্যাতনের খবর আসতে থাকে। এসব সংবাদ পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের মধ্যেও ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এ সময় শাসনতন্ত্রের ২ ও ৯৮ ধারা সংশোধনের সংবাদ প্রকাশিত হয়, ফলে শাসনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ ন্যূনতম মৌলিক অধিকার অকার্যকর হয়ে পড়ার আশংকা দেখা দেয়। বিভিন্ন স্তরের সচেতন মানুষ এ সংশোধনের প্রতিবাদ জানায়। তখনঅটোরিক্সা চালকদের অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট ঢাকার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিপর্যস্থ করে তুলে। বিভিন্ন এলাকায় ছাত্র বিক্ষোভের ওপর পুলিশের নির্যাতনের সংবাদও পাওয়া যায়। সে সময় সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দাবীতে সাংবাদিকরা প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করেন। এদিকে ১লা ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ, ন্যাপের (ওয়ালী)-এর আহবানে সাড়া দিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার ঘোষণা দেয়। ২রা ডিসেম্বর সংবাদপত্রে খবর বের হয় যে, পি.ডি.এম প্রদেশব্যাপী সরকারের জুলুম-নির্যাতনের প্রতিবাদে ৫ই ডিসেম্বর থেকে ১০ দিনব্যাপী এক কর্মসূচী ঘোষণা করেছে এবং অন্যান্য বিরোধী দলের প্রতি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে শরিক হওয়ার আহবান জানিয়েছে। ১লা ডিসেম্বর পশ্চিম পাকিস্তানের লায়ালপুরে পিপলস পার্টি ও ন্যাপের নেতৃত্বে বিশাল বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বিক্ষোভ মিছিলে পুলিস বেপরোয়া লাঠিচার্জ করে। এ'দিন আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির সভার সিদ্ধান্তহয় যে, ১৩ই ডিসেম্বর তারা জুলুম প্রতিরোধ দিবস পালন করবে। এটাই ছিল আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ১৯৬৬ সালের ৬ই জুনের পর বড় ধরনের প্রথম কর্মসূচী। আওয়ামী লীগের অস্থায়ী সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম জনসাধারণের প্রতি 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস'-এর কর্মসূচী সফল করার আহবান জানিয়ে বলেন, সকল দুর্যোগের মুখেও আওয়ামী লীগ ৬ দফা দাবীর ওপর আস্থাশীল এবং কোন নির্যাতনই তাদের এ দাবী থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না। ২রা ডিসেম্বর দৈনিক আজাদ-এ ঢাকা হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশনের সভাপতি এ,এস,এস মোফাখ্খারের শাসনতন্ত্রের ২ ও ৯৮ ধারা সংশোধন করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রদত্ত এক দীর্ঘ বিবৃতি প্রকাশিত হয়। সে বিবৃতিতে অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, আইয়ুব সরকার জনগণের মৌলিক অধিকারকে নিষ্ঠুর প্রক্রিয়ায় অবদমিত করছে। ফলে সরকারের প্রতি জনসাধারণের ন্যূনতম আস্থাও নেই। দীর্ঘ দশ বছর এ সরকারের দমন-পীড়ন সহ্য করে জনসাধারণ এখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। দিকে দিকে আজ প্রতিবাদ হচ্ছে। নির্মম নির্যাতন চালিয়েও তাদেরকে আর নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছেনা। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। এর পরও মানুষ আন্দোলন করছে।[৪২৬] ২রা ডিসেম্বর সংবাদপত্রে আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে বিমান বাহিনীর প্রাক্তন প্রধান এয়ার মার্শাল আজগর খানের এক জ্বালাময়ী বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ সংশোধন ও ডিগ্রী বাতিলের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলছিল সে সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব তার মাস-পয়লা ভাষণে নরম সুরে কথা বলেন। তিনি এসব বাতিল করে দিবেন বলেঅভিমত ব্যক্ত করেন। ডিসেম্বরের প্রথম থেকে সারা দেশব্যাপী আইয়ুব সরকার-বিরোধী যেসব ঘটনা ঘটে, সংবাদপত্রে সে সবের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ পায়। অপরদিকে, সরকার সমর্থক সংবাদপত্রে বিরোধী দলের নিন্দাবাদ খুব জোরেশোরে হত। এসময় ৬ই ডিসেম্বর ন্যাপ (ভাসানী) দাবী দিবসের আহবান জানায়, আর পল্টনে জনসভা অনুষ্ঠান করে। এ উপলক্ষে ন্যাপ ও কৃষক সমিতির কর্মী ও সমর্থকগণ ব্যাপক প্রচারকার্য শুরু করে। এ সময় ন্যাপ (ওয়ালী) আওয়ামী লীগের ১৩ তারিখের 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' এর কর্মসূচীকে সমর্থন করে এবং তাকে কার্যকরী করে তোলার লক্ষ্যে ভাসানী ন্যাপের সাথে পাল্লা দিয়ে শোভাযাত্রা ও পথ সভা করতে থাকে। এ সময় ফজলুল কাদের চৌধুরী, কাইয়ুম খান ও মমতাজ মৌলতানাসহ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আইয়ুব সরকার-বিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন। আর এয়ার মার্শাল (অবঃ) আজগর খান ও প্রাক্তন বিচারপতি মুর্শেদ দেশব্যাপী আইয়ুব সরকারের চরিত্র বিশ্লেষণ করে বক্তব্য রাখতে থাকেন। এ দু'জনের বক্তব্য সংবাদপত্রগুলিতে বিশেষ গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত হতে থাকে। ৫ই ডিসেম্বর জেল থেকে লেখা জেড, এ,ভুট্টোর একটি চিঠি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়; এতে রাজবন্দীদের ওপর কি ধরনের অন্যায় অত্যাচার করা হচ্ছে তার এক মর্মস্পর্শী বিবরণ ফুটে ওঠে। ৫ই ডিসেম্বরের 'আজাদ' পত্রিকায় পশ্চিম পাকিস্তানের গুজরান ওয়ালা শহরে বন্দীমুক্তির দাবীতে হাজার হাজার শ্রমিক-জনতার বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠানের সংবাদ প্রকাশিত হয়। এদিনের পত্রিকায় রাওয়ালপিন্ডি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের একটি সংবাদ সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এতে বলা হয় আইয়ুব খান ছাত্রদের আংশিক দাবী শুধু মেনে নিয়েছেন কিন্তু ছাত্রদের দাবী হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ নামক কালা-কানুনটির পরিপূর্ণ বাতিল। পূর্ব পাকিস্তানের তিনটি প্রধান ছাত্র সংগঠনও পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীসহ অনুরূপ বিবৃতি প্রদান করে। এ তিনটি ছাত্র সংগঠন হচ্ছে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের উভয় গ্রুপ। এভাবে আইয়ুবের পশ্চাদপসরণের পাশাপাশি আন্দোলনের দাবীসমূহ ক্রমে কিভাবে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

তখন দেশের উভয় অঞ্চলের সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। এরকম একটি সময়ে ভাসানী ন্যাপের ৬ই ডিসেম্বরের 'দাবী দিবস' পালিত হয় এবং তার আয়োজিত জনসভায় বিপুল জনসমাগম হয়।মওলানা ভাসানী পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুভব করে এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন এবং দমন-পীড়ন বন্ধের দাবীতে ১২ই ডিসেম্বর হরতাল পালনের আহবান জানান। এর পর তিনি হঠাৎ গভর্নর হাউস ঘেরাও করার কর্মসূচী ঘোষণা করেন এবং এক বিরাট জনতার মিছিল নিয়ে গভর্নর হাউস ঘেরাও করেন। কৃষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবদুল হকসহ কোন কোন নেতা তাতে অংশ নিতে অস্বীকার করেন। গভর্নর হাউস ঘেরাও করার পরশোভাযাত্রা নিয়ে বায়তুল মোকাররম মসজিদের দিকে ফিরে আসলে সেখানে ধর্মঘটী অটোরিক্শা চালকদের একটি জঙ্গী মিছিল এসে তাতে যোগ দেয়। অটোরিক্শা চালকগণ মওলানা ভাসানীর কাছে, পরদিন অর্থাৎ ৭ই ডিসেম্বর হরতাল পালনের জন্য অনুরোধ জানান। মওলানা ভাসানী তাদের অনুরোধের গুরুত্ব বুঝে ৭ই ডিসেম্বরও হরতালের ডাক দেন। এভাবে সংগঠনের সিদ্ধান্ত ছাড়া পর পর এমন দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সে সময় মওলানা ভাসানী কেন গ্রহণ করেছিলেন, সে সম্পর্কে তাঁর অভিমত হলঃ "জনগণ কখন কি চায় তা যদি তার মুখ দেখে উপলব্ধি করা না যায় তাহলে রাজনীতি করা বৃথা। সেদিন মানুষের চেহারার মধ্যে আমি আগুন দেখেছিলাম। আমি জানতাম হরতাল কেন এর উপরের কোন কর্মসূচী দিলেও তা কার্যকরী হবে।"[৪২৭] এদিনের আকস্মিক হরতালের কর্মসূচীর কথা জেনে বিস্মিত হয়ে তৎকালীন সিপিইপি(এম,এল)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং চিটাগাং ভাসানী ন্যাপের অন্যতম নেতা মিঃ শরদিন্দু দস্তিদার ঢাকাতে টেলিফোন করে মওলানার কাছে হরতালের কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সেদিনের অভিজ্ঞতার বিবরণ দিতে গিয়ে শরদিন্দু দস্তিদার জানানঃ "প্রথম যখন মওলানা হরতাল ডাকলেন, তখন ডিসেম্বর

৪২৬. আজাদ, ঢাকা, ২রা ডিসেম্বর, ১৯৬৮।
৪২৭. নূরুল হুদা মির্জার সাথে সাক্ষাৎকার।

Dhaka University Institutional Repository

মাস। হঠাৎ চট্টগ্রামে ৬ই ডিসেম্বর জানতে পেলাম আগামীকাল হরতাল। আমি মওলানার সাথে কথা বলার জন্য ঢাকার সাইদুল হকের বাসায় টেলিফোন করলাম। মওলানাকে জিজ্ঞাসা করলাম, হঠাৎ হরতাল ডেকেছেন! প্রচার করার কোন সুযোগ দেননি! এভাবে কি হরতাল হয়? মওলানা আমাকে বললেনঃ তোমরা কিছু বোঝ? আমি বললাম এর মধ্যে বোঝাবুঝির কি আছে। মওলানা ধমক দিয়ে বললেনঃ তোমরা মানুষের মনের খবর কিছু রাখো বাপু? যাও, হরতাল কর। হরতাল হবে। এই বলে কোন কথার সুযোগ না দিয়ে রিসিভারটা রেখে দিলেন। কি করা। নিতান্ত হরতালের জন্য প্রস্তুতি নিতে হয়। সামনে শুধু রাতটা বাকি। ....সঙ্গে সঙ্গে কর্মীদের সব ডাকা হল। কর্মীদের ডেকে বলা হল, আগামীকাল হরতাল বলে সারা শহরে মিছিল কর এবং কাল ভোরে বাস স্ট্যান্ডগুলোতে দাঁড়িয়ে যাবে। মিছিল হতে লাগলো। মানুষ সব জিজ্ঞাসা করে কিসের হরতাল। কিসের হরতাল আমারও জানা ছিল না। কে যেন একজন বললো স্বাধীনতার দাবীতে হরতাল। আর সেই সাথে ব্যাপকভাবে শ্লোগান উঠলো, কৃষক-শ্রমিক অস্ত্র ধর, পূর্ব বাংলা স্বাধীন কর। আওয়ামী লীগের চট্টগ্রাম জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আজিজ ভূঁইঞা এসে আমাকে বললেনঃ আপনারা চালিয়ে যান, আমরা আপনাদের সাথে আছি। আমরা প্রকাশ্যে তো কিছু করতে পারবো না, ছেলেদেরকে বলে দিয়েছি, তারা পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে হরতালের সপক্ষে বলবে। আমার কথা শুনে সে বললোঃ হ্যাঁ মওলানা ঠিকই বলেছে। আপনারা কমিউনিস্টরা কিছু বোঝেননা। এখন এক দফার আন্দোলনটাই শুরু করা দরকার। 'ডাক' দিয়ে কিছু হবে না। আমি আপনাদের সাথে আছি। আজিজ সাহেব শেখ মুজিবের এক দফার ঘোর সমর্থক ছিলেন। যাইহোক পরদিন দেখা গেল, অত্যন্ত সফলভাবে হরতাল হয়েছে। কি ইস্যুতে হরতাল ডাকা হয়েছে তা না জেনেই এরকম সফল হরতালের নজির খুব একটা নেই।"[৪২৮]

যা'হোক, ৭ই ডিসেম্বর ঢাকায় অত্যন্ত সফল হরতাল পালিত হয়, অথচ কি আশ্চর্য ৭ তারিখে প্রকাশিত দৈনিক আজাদে সেদিনের হরতাল সম্বন্ধে বা আগের দিনের জনসভা সংক্রান্ত কোন সংবাদই প্রকাশিত হয়নি। সেন্সরশিপ আরোপের কারণেই সম্ভবত তাহয়েছিল। পরদিনের পত্রিকায় এ ব্যাপারে কোন সংবাদ ছিল না। একমাত্র ছোট্ট যে সংবাদটি প্রকাশিত হয় তা হচ্ছে মওলানা ভাসানীর বক্তৃতার কিছু কথা এবং তা উদ্ধৃত করা হয়। অর্থাৎ সরকারের অবস্থা যখন সঙ্গীন অবস্থায় উপনীত হয়েছিল তখনও আইয়ুব সরকার পরিপূর্ণ মাত্রায় দমননীতিঅব্যাহত রাখে। তবে তারপর সংবাদপত্রগুলি আর সে বিধিনিষেধ মানে নি। ৮ই ডিসেম্বর যে হরতাল অনুষ্ঠিত হয় তাও এককভাবে ভাসানী ন্যাপের ডাকেই অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু তাতে ব্যাপকভাবে জনসাধারণ অংশগ্রহণ করে। এদিন পুলিশের গুলিতে ৩জন নিহত হয় এবং বেশ কয়েকজন গুলি বিদ্ধ হয়। শতাধিক আহত হয়ে হাসপাতালে যায়। পুলিশ পাঁচশ'রও বেশী লোককে গ্রেফতার করেছে বলে বিরোধী দল দাবী করে। ৯ তারিখের দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে হরতালের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা থেকে দেখা যায়- এ হরতালে সাধারণ মানুষও ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেছিল এবং এক পর্যায়ে পরিস্থিতি পুলিশ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল। ঢাকার সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পিকেটিং হয়েছিল, পুলিশ যখন যাকে পেয়েছে তাকেই বেদম প্রহার করেছে। সকালে সামান্য কিছু গাড়ী রাস্তায় বের হলেও দ্রুত তা বন্ধ হয়ে যায়। সাইকেলও রাস্তায় বের হয় নি। পুলিশের সাথে ই.পি.আরও নামে, কিন্তু সারা শহর ন্যাপ ও তার সমর্থিত গণসংগঠনগুলির খন্ড খন্ড মিছিলকে প্রতিরোধ করতে তারা একেবারে অস্থির হয়ে ওঠে। অসংখ্য জায়গায় পুলিশ ফাঁকাগুলি চালায় এবং কোন কোন স্থানে মিছিলকারীদের উপর গুলি বর্ষন করে। এদিনের হরতাল অত্যন্ত সফল হলেও এ কথাও সত্য যে, হরতালকারীদের সাথে ব্যাপক জনতার সমাবেশ ঘটে কোন মারাত্মক পরিস্থিতিরসৃষ্টি হয়নি। অসংখ্য মানুষ হতাহত হয়েছে, অর্ধ সহস্র মানুষ গ্রেফতার হয়েছে- এতে জনসাধারণের মধ্যে ক্ষোভ বেড়েছে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সাধারণ মানুষ সেদিন পথে নেমে পড়েছিল-- এমনটি বলা যাবে না। যা'হোক, এদিনের এই ব্যাপক পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য মওলানা ভাসানী আবারও ১০ই ডিসেম্বর দেশব্যাপী হরতাল পালনের আহবান জানান। কিন্তু এ হরতাল হয় নি, এমনকি ১২ তারিখের হরতালও পালনের জন্য ন্যাপের পক্ষ থেকে তেমন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নি। তবে ১৩ই ডিসেম্বর 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' পালনের অংশ হিসাবে যখন আওয়ামী লীগ হরতাল আহবান করে, তখন তা সংগঠিত প্রচার আন্দোলনের মাধ্যমে এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছায় যে, তা ঐ দিনের হরতাল বলেই প্রতিভাত হয়। আর এত ঘন ঘন হরতাল করাকে জনসাধারণ সে সময় পছন্দ করেনি বলেও অনেকের মনে হয়েছে।[৪২৯] তবে ১৩ তারিখের হরতালকে পূর্ব পাকিস্তানের সকল রাজনৈতিক দলসমর্থন করে। এদিন ছিল মূলতঃ আওয়ামী লীগের জুলুম প্রতিরোধদিবস। এ দিবসকে সফল করার জন্য মাসের গোড়া থেকেই ন্যাপ (ওয়ালী)সহ বিভিন্ন দল প্রচার আন্দোলন শুরু করে। ইতিমধ্যে ৭ তারিখের হরতাল উপলক্ষে পুলিশের গুলীবর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ, পিডিএম, ন্যাপ (ওয়ালী) ও পিপলস্ পার্টি এদিন যৌথভাবে দেশব্যাপী হরতাল পালনের আহবান জানায়। ন্যাপ (ভাসানী) ও জাতীয় পরিষদের বিরোধী দলসহ বিভিন্ন ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠনও এ হরতাল কর্মসূচীকে সমর্থন করে। ফলে এ দিনের হরতালের সফলতা সম্পর্কে কারো কোন সংশয় ছিল না। কিন্তু সরকারের পুলিশ বাহিনী ১২ তারিখ বিকাল থেকে শুরু করে রাতের মধ্যে সহস্রাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে এবং হরতালের সমর্থনে অনুষ্ঠিত মিছিলগুলির ওপর বেপরোয়া আক্রমণ চালায়। এতে অসংখ্য ব্যক্তি আহত হয়। সন্ধ্যার মধ্যেই সারা ঢাকা শহরে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়। পুলিশ বাহিনী এমনই ত্রাস সৃষ্টি করে যে, পরদিন হরতালের সময় জনসাধারণ ঘর থেকেই বের হয় নি। সমগ্র রাস্তাঘাট জনশূন্য হয়ে পড়ে। পরিস্থিতি এমন একটি পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয় যে, সরকারী কর্মচারীরা পর্যন্ত ভয়ে সেদিন ঘর থেকে বের হয়নি। ব্যাংকের মত গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিও প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ে। এদিন যে শুধু ঢাকা শহরেই গ্রেফতার ও নির্যাতন অভিযান চালানো হয়েছে তা নয়, সারা দেশেই জনসাধারণের ওপর এরকম তীব্র পুলিশী নির্যাতন নেমে আসে। সরকার নিয়ন্ত্রিত 'দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকায় প্রকাশিত খবর থেকেই জানা যায় যে, এদিন একমাত্র চট্টগ্রাম শহরেই ৬৯৪ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়।

সরকার যে এ ধরনের দমনমূলক ভূমিকা গ্রহণ করবে তা ৭ই ডিসেম্বর প্রেসিডেন্টের ভাষণথেকেই বোঝা যায়। এদিন প্রাদেশিক কনভেনশন মুসলিম লীগের সম্মেলন উপলক্ষে আইয়ুব খান বিরোধী দলগুলিকে তীব্র সমালোচনা করেন এবং ঘোষণা করেনঃ "একের পর এক বিক্ষোভ প্রদর্শন করে সরকারকে টলানো যাবেনা।"[৪৩০] সে যা'হোক, সরকারের এ দমন-নীতির পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক দলগুলি বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। আর অন্যদিকে, মওলানা ভাসানীর মনে হয় শুধু শহরভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তুললে আইয়ুব সরকারকে পতন ঘটানো যাবে না, এর জন্য গ্রামাঞ্চলকে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন হবে। এ উপলব্ধি থেকে

---

৪২৮. শরদিন্দু দস্তিদারের সাথে সাক্ষাৎকার।

৪২৯. অজয় রায়ের সাথে সাক্ষাৎকার।

৪৩০. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র; দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৩৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ১৯৬৮ সলের ২৯ ডিসেম্বর সারা প্রদেশের গ্রামাঞ্চলে হরতাল পালনের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। মওলানা ভাসানী অবশ্য 'গ্রামের সর্বস্তরের নির্যাতিত মানুষের প্রতি সীমাহীন শোষণ-পীড়ণের বিরুদ্ধে 'প্রতিবাদ দিবস' পালনের আহবান জানান এবং মন্তব্য করেন এ প্রতিবাদ দিবস পালনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের সংগ্রাম গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দিতে হবে।[৪৩১]

এ হরতাল সফল করার জন্য মওলানা ভাসানী ও তার কৃষক সমিতি দেশব্যাপী প্রস্তুতি গ্রহণ করে, অসংখ্য জমায়েত, পথসভা, জনসভা ও অসংখ্য বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয় এবং এভাবে গ্রামে গ্রামে হরতাল পালন ও ঘেরাও অভিযান পরিচালনার প্রস্তুতি নেওয়া হয়। সরকারের প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলিকেঘেরাওএর স্থান হিসাবে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ২৯শে ডিসেম্বরের কর্মসূচী সব জায়গায় সফল হয়নি। ন্যাপ ও কৃষক সমিতির ভাল সংগঠন যেখানে ছিল সেসব জায়গায় মিছিল, মিটিং বেশ ভালভাবেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বেশ কিছু এলাকায় ঘেরাও কর্মসূচী সফল করারও চেষ্টা নেওয়া হয়। কিন্তু অধিকাংশ এলাকায় সরকারী প্রশাসনের কড়াকড়ির কারণে শোভাযাত্রাগুলিকে ঘেরাওএর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তবে যে সকল জায়গায় ঘেরাও কর্মসূচী বাস্তবায়িত করতে যাওয়া হয়, সেসকল এলাকার দু'টি স্থানে পুলিশ গুলি চালায়। ঢাকার মনোহরদী থানার হাতির দিয়া বাজারে শোভাযাত্রা করে ঘেরাও কর্মসূচী পালন করতে গেলে কৃষক জনতার ওপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। ফলে ঘটনা স্থলেই ৩ জন কৃষক মারা যায় এবং আরও কয়েকজন আহত হয়। হাতির দিয়ার ঘটনার যে সংবাদ ৩১ শে ডিসেম্বর দৈনিক আজাদ-এ প্রকাশিত হয়েছিল তা থেকে দেখা যায়, সকাল বেলা হাতির দিয়া বাজারে একদল ছাত্র-জনতা শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করতে আসে এবং হরতালের পক্ষে ধ্বনি দেয়। এ অপরাধে পুলিশ উক্ত জনতার ওপর প্রচন্ড লাঠি চার্জ করে এবং ২ জন ছাত্রসহ ৪ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। বাজারে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। দুটার সময় জনসভা অনুষ্ঠিত হয় এবং তার পর মিছিল হয়। এ মিছিলকে পুলিশ বাধা দেয় এবং লাঠিচার্জ করে। ফলে জনসাধারণের সাথে সংঘর্ষ বাধে। এ পর্যায়ে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। অথচ ঢাকার তৎকালীন ডিসি এম, কে, আনোয়ার উক্ত এলাকা পরিদর্শন করে এসে জানান, পুলিশ আত্মরক্ষার্থে গুলিবর্ষণ করে।[৪৩২] আর যে জায়গায় ঘেরাও কর্মসূচী বাস্তবায়িত করতে যাওয়া য় পুলিশ গুলিবর্ষণ করে-- সেটি হচ্ছে নড়াইল। নড়াইলের এ আন্দোলনে নেতৃত্বের ভূমিকা যারা গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন নড়াইল কলেজ ছাত্র সংসদের তৎকালীন সহ-সভাপতি বিমল বিশ্বাস। সে আন্দোলনে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা জানাতে গিয়ে বিমল বিশ্বাস বলেনঃ

"আমরা নড়াইলের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত হরতালের সপক্ষে মিটিং করলাম। হরতালের দিন নড়াইল শহর থেকে তিন-চার মাইল দূরের একটি হাটের ওপর বিশাল এক মিটিং করে কৃষক-জনতার কাছে জানতে চাইলাম তারা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গতে রাজী কিনা। সবাই সমস্বরে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে মতামত দিল। মিছিল বের হল। স্কুল-কলেজের বিপুলসংখ্যক ছাত্র ছাড়াও এ মিছিলে অন্ততঃ ১ হাজার কৃষক অংশ নিল। মিছিল করে এসে ১৪৪ ধারার আওতাভুক্ত এলাকার মুখোমুখি এসে পড়ার আগেই কলেজের শিক্ষকগণ এসে বাধা দিলেন। কিন্তু ছাত্র-জনতা সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে মিছিল এগিয়ে নিয়ে গেল। এ পর্যায়ে এই বিশাল নিরস্ত্র মিছিলের ওপর পুলিশ লাঠি চার্জ করলো। আর আকস্মিকভাবে দেখা গেল ছাত্র ও কৃষক-জনতা স্বতস্ফূর্তভাবে পুলিশের কাছ থেকে লাঠি কেড়ে নিয়ে বেপরোয়াভাবে পুলিশদেরকে পেটাতে শুরু করলো। আর এমন বেধড়ক পিটুনী পুলিশদেরকে কৃষকরা দিল যে মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত পুলিশ বাহিনী যেন মাটির সাথে মিশে গেল।"[৪৩৩]

বিমল বিশ্বাস আরও জানান, এর পর অস্ত্রধারী পুলিশরা ছাত্র-জনতাকে তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলে গুলিবর্ষণ করে। ঘটনাস্থলেই দু'জন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারাত্মকভাবে আহত হয়। মিছিলকারীরা সকলে নদীতে লাফিয়ে পড়ে গ্রেফতারের হাত থেকে রক্ষা পায়। তবে পুলিশ ছাত্রদের সায়েস্তা করার জন্য নড়াইল কলেজ হোষ্টেলে আক্রমণ করে সকল ভাল ছাত্রদের ধরে পিটুনি দেয় ও কয়েকজন গ্রেফতার করে। এর ফলে এলাকার জনসাধারণের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। স্থানীয় জনসাধারণ উক্ত ভাল ছাত্রদের মুক্তি দাবী করে। সরকারী প্রশাসন ঘেরাও আন্দোলনের নেতাদের ধরা দেওয়ার শর্তে উক্ত ছাত্রদের ছেড়ে দিতে রাজী হয়। এরকম একটি নৈতিক প্রশ্ন যখন দেখা দেয় তখন বিমল বিশ্বাসসহ সকল নেতা পুলিশের কাছে ধরা দেয়। বিমল বিশ্বাসের মতে এর পর নেমে আসে হতাশা। দীর্ঘ ২০ দিন ধরে কোন আন্দোলন নেই কর্মসূচী নেই। জেলে গিয়ে অধিকাংশ নেতাই ভীষনভাবে হতাশ হয়ে পড়ে এবং বিমল বিশ্বাসকে দোষ দিতে থাকেন। কারণ তার কারণেই নাকি এরকম একটি কাজে তারা অংশ নিয়েছিলন।

২৯শে ডিসেম্বর মনোহরদী আর নড়াইল শুধু নয়, ১৯৬৯ সালের ৫ই জানুয়ারি 'সাপ্তাহিক জনতা' পত্রিকায় হাট হরতালের অসংখ্য রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। তবে দৈনিক পত্রিকাগুলিতে এ সম্পর্কে প্রায় কোন সংবাদই প্রকাশিত হয়নি। ফলে ন্যাপ নেতৃবৃন্দের মধ্যেও কিছু বিভ্রান্তি দেখা দেয়।পরবর্তী কর্মসূচী গ্রহণ করতে তারা দ্বিধাবোধ করেন। তবে তাদের মধ্যেকার এ দ্বিধা নিজস্ব রাজনীতির কারণে নয়, তার পিছনে ছিল গোপন কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা। ন্যাপ (ওয়ালী) নেতৃবৃন্দের মধ্যেও ১৩ই ডিসেম্বরের হরতালের পর প্রচন্ড হতাশা দেখা দেয়, কিন্তু তার পিছনেও মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির বিশেষ প্রভাব ছিল। তবু ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানে যে গণঅভ্যুত্থান ঘটে তা নিঃস্বন্দেহে ১৯৬৮ সালের আন্দোলনের ধারাবাহিকতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পূর্ব মূহূর্তে যে বাস্তবতাটি বিরাজ করছিল তা তুলে ধরতে না পারলে গণঅভ্যুত্থানের মর্মবস্তুকে উপলব্ধি করা যাবেনা। অবশ্য তার আগে গণঅভ্যুত্থানের যারা জন্মদাতা সেই সাধারণ জনতার চেতনা সেদিন কোন অবস্থায় ছিল তা একটু স্পষ্ট করে নেওয়া প্রয়োজন।

৮.১০ সংবাদ শিরোনাম জরিপের ফলাফলঃ দৈনিক আজাদ পত্রিকা

জনসাধারণের চেতনা ও মতামত গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে সংবাদপত্রের পাঠকরা সবাই শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ফলে সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের স্বরূপ বিচার করলে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর চেতনা ও মতামতের একটি চিত্র পরোক্ষভাবে পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু বিরাট নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর মতামত সেখান থেকে জানা যায় না। তবে সংবাদপত্রে যেসব খবর প্রকাশিত হয় পাঠকদের মুখ থেকেই সেসব বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আর সেভাবে সংবাদপত্র সমগ্র জনসাধারণকে প্রভাবিত করে। এখানে ষাট দশকের সংশ্লিষ্টকাল পর্বে যেসব সংবাদপত্র জুলুম নির্যাতন সত্ত্বেও রাজনৈতিক ধরনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবর প্রকাশ করতে পেরেছিল সেসব সংবাদ শিরোনামগুলিই এখানে বিচার করা হবে। দ্বিতীয়তঃ এ পর্বে রাজনৈতিক দলগুলি পুনরুজ্জীবিত হতে শুরু করলে সংবাদগুলিও সুনির্দিষ্ট রূপ ধারণ করে। অন্যদিকে, উনসত্তরের মার্চ মাসে গণঅভ্যুত্থানের একটি পর্যায়ের পরিসমাপ্তি হয়।

---

৪৩১. সাপ্তাহিক জনতা, ঢাকা, ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৬৮।
৪৩২. আজাদ, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৬৮।
৪৩৩. বিমল বিশ্বাসের সাথে সাক্ষাৎকার।

Dhaka University Institutional Repository

ফলে ১৯৬৯ সালের প্রথম তিন মাস অর্থাৎ এক বছরের এক চতুর্থাংশ হিসাবে ভাগ করা যায়। সে অনুযায়ী বছরের যে কোন এক চতুর্থাংশ সময়কে ধরে সংবাদ শিরোনাম সংগ্রহ শুরু করা হয়েছে। উপরন্তু, সময়ের গুরুত্ব ও উৎসের সহজলভ্যতার কথা বিবেচনা করে প্রধানত ১৯৬৫-৬৮ এই চার বছরের সংবাদ শিরোনাম সংগ্রহ করা হয়েছে। এগুলিকে বিবেচনা করার স্বার্থে এ সময়ের আগে-পরের তিন মাসের সংবাদ শিরোনামগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে সবচেয়ে বড় কথা হল এই যে, ১৯৬৪ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছিল আইয়ুব বিরোধী গণআন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ কালপর্বে প্রথমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মিস ফাতেমা জিন্নাহকে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে সরাসরি সর্বদলীয় বিরোধী প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী করার মাধ্যমে গণজাগরণ সৃষ্টি হয়। সে সময় জনসাধারণের মধ্যে আইয়ুব বিরোধী এমন একটি জাগরণ সৃষ্টি হয় যে, ফাতেমা জিন্নাকে ভোট দেবেনা এরকম বলার মত সাহস কোন মৌলিক গণতন্ত্রীর ছিলনা। তাই একটি জন-জোয়ার থেকে আর একটি জনজোয়ারের মাঝখানে যা ঘটেছিল তারই একটি চিত্র খুঁজে পাওয়ার জন্যই এই সংবাদ শিরোনাম জরিপ। এ সময় কোন্ পত্রিকার সংবাদ শিরোনাম সংগ্রহ করা হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া ছিল জটিল ব্যাপার। তবে গবেষণার নিরপেক্ষতাকে রক্ষা করার স্বার্থে ইত্তেফাক ও সংবাদকে প্রথমেই বাদ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, দৈনিক পাকিস্তান এপ্রকাশিত সংবাদগুলির মধ্যে বিরোধী রাজনৈতিক দলের সংবাদ খুব সামান্যই প্রকাশিত হত। তবে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বিরোধীদলের যে সকল সংবাদ ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হত তার মধ্যে মওলানা ভাসানীর প্রতি এক ধরনের পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য করা যেত। 'দৈনিক আজাদ' সে সময় এন,ডি,এফ এর সমর্থক সংবাদপত্র থাকা সত্ত্বেও বিরোধী রাজনীতির দু'টি প্রধান ধারা তথা আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ সম্পর্কে এর মনোভাব ছিল মোটামুটি নিরপেক্ষ। মূলতঃএ বিবেচনা থেকেই দৈনিক আজাদের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত প্রাসঙ্গিক সংবাদগুলির শিরোনাম সংগ্রহ করা হয়েছে।

এখানে শিরোনাম সংগ্রহে দু'টি নীতি অনুসৃত হয়েছে। প্রথমতঃ,পত্রিকার শীর্ষ শিরোনামগুলির বাম দিক থেকে হিসাব করে প্রথম তিনটি নেওয়া হয়েছে। যে ক্ষেত্রে একটি বা দু'টি শিরোনামেই আট কলাম পুরণ হয়ে গেছে সে ক্ষেত্রে তার দ্বিতীয় বা তৃতীয় শিরোনাম গ্রহণ করা হয়নি। দ্বিতীয়তঃ, শীর্ষের মূল শিরোনাম তিনটি নেওয়ার পর অন্যান্য শিরোনাম থেকে গবেষণার প্রয়োজন অনুযায়ী বেছে বেছে কিছু শিরোনাম সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে যে কোন ধরনের সংবাদই হোক না কেন, তা বিবেচনা না করেই সংগ্রহ করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পুর্বনির্দ্ধারিত ১৮ ধরনের সংবাদ শিরোনাম সংগ্রহ করা হয়েছে। সারণী ৮.২ এ শিরোনামের স্বরূপ সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা পাওয়া যাবে।

সারণি ৮.২

দৈনিক আজাদে প্রকাশিত সংবাদশিরোনামের স্বরুপ (১৯৬৪ সালের ১লা অক্টোবর থেকে ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত)

সংবাদের প্রকৃতি	প্রধান তিনটি শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ (সংখ্যা)	(হার)	অন্যান্য শিরোনামে প্রকাশিত রাজনৈতিক সংবাদ (সংখ্যা)	(হার)	মোট বিবেচনাধীন সংবাদ শিরোনাম (সংখ্যা)	(হার)
১. সাধারণ সংবাদ	৩১১	৭.১১	-	-	৩১১	৩.৪৫
২. প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংক্রান্ত সংবাদ	২২১	৫.০৫	-	-	২২১	২.৪৬
৩. দুর্ঘটনার সংবাদ	৫৭	১.৩০	-	-	৫৭	০.৬৩
৪. জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ বিষয়ক সংবাদ	২১৫	৪.৯২	-	-	২১৫	২.৩৯
৫. পাকিস্তানের সাথে সম্পর্কহীন আন্তর্জাতিক সংবাদ	১১১২	২৫.৪৩	-	-	১১১২	১২.৩৫
৬. পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক (ভারতবাদে) বিষয়ক সংবাদ	৩০২	৬.৯১	-	-	৩০২	৩.৩৬
৭. পাক-ভারত সম্পর্কিত সংবাদ	৩৩১	৭.৫৭	৪০১	৮.৬৬	৭৩২	৮.১৩
৮. প্রেসিডেন্ট আইয়ুব বিষয়ক সংবাদ	২০২	৪.৬২	২৪৯	৫.৩৮	৪৫১	৫.০১
৯. গভর্নর ও মন্ত্রীদের সংবাদ	১১০	২.৫২	৩২৯	৭.১০	৪৩৯	৪.৮৮
১০. প্রশাসনিক আমলাদের সংবাদ	৩৯	০.৪৯	১২০	২.৫৯	১৫৯	১.৭৭
১১. সরকার বিরোধী নেতৃবৃন্দের সংবাদ	৩০৪	৬.৯৫	২৮৯	৬.২৪	৫৯৩	৬.৫৯
১২. সরকারের সমালোচনাসূচক সংবাদ	২৫৭	৫.৮৮	৩৩৫	৭.২২	৫৯২	৬.৫৭
১৩. বিভিন্ন শ্রেণী পেশার সরকার বিরোধী ভূমিকা সম্পর্কিত সংবাদ	-	-	৩০৫	৬.৫৯	৩০৫	৩.৩৯
১৪. গণনির্যাতন ও নিপীড়ন সংক্রান্ত সংবাদ	৩৬৫	৮.৩৫	৬৫৮	১৪.২০	১০২৩	১১.৩৬
১৫. দাবী দাওয়া সংক্রান্ত সংবাদ	৯৪	২.১৫	২১৫	৪.৬৪	৩০৯	৩.৪৩
১৬. আন্দোলন বিষয়ক সংবাদ	২৬৪	৬.০৪	৫৫৭	১২.০২	৮২১	৯.১২
১৭. রাজনৈতিক দল ও জোট বিষয়ক সংবাদ	১৩২	৩.০২	৮৬৯	১৮.৭৬	১০০১	১১.১১
১৮. রাজনৈতিক মামলা সংক্রান্ত সংবাদ	৫৭	১.৩০	৩০৬	৬.৬০	৩৬৩	৪.০৩
মোট	৪৩৭৩	১০০.০০	৪৬৩৩	১০০.০০	৯০০৬	১০০.০০

৮.২ সারণীতে সংবাদ শিরোনামগুলিকে মোট ১৮টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। শীর্ষের প্রথম তিনটি শিরোনামের সবগুলিকে সংগ্রহ করার ফলে তা আর পূর্ব নির্ধারিত বিভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায়নি। ফলে সংবাদ শিরোনামের স্বরূপের দিক থেকে ভাগ করতে গিয়ে সারণি ৮.২ এ অতিরিক্ত ছয় ধরনের নতুন সংবাদ শিরোনাম সংযোজিত হয়েছে। ১ থেকে ৬ পর্যন্ত নির্ধারিত সংবাদ শিরোনামের অতিরিক্ত। এসব হচ্ছেঃ সাধারণ সংবাদ; প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, তার জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ বিষয়ক সংবাদ, পাকিস্তানের সাথে সম্পর্কহীন আন্তর্জাতিক সংবাদ এবং পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক সংবাদ। উল্লেখ্য, যে শেষোক্ত(অর্থাৎ ৬ নং) বিভাগটির মধ্যে ভারতের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্ক বিষয়ক সংবাদগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। উপরন্তু, প্রাথমিক জরিপ (Pilot Survey) থেকে দেখা যায়, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের খবরগুলির অধিকাংশই শীর্ষের তিনটি শিরোনামের মধ্যেই রয়েছে। অন্য যেসব শিরোনাম জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের খবরা-খবরকে কেন্দ্র করে উপস্থাপিত হয়েছে সেসব সরকারী নীতির সমালোচনা বিষয়ক কিংবা পরিষদের সাধারণ খবরা-খবর। ফলে শুধু সরকারের সমালোচনা সূচক সংবাদ শিরোনামগুলি এখানে গ্রহণ করা হয়েছে।

যে ১২টি পূর্ব নির্ধারিত বিভাগকে ভিত্তি করে সাধারণ সংবাদ শিরোনাম সংগ্রহ করা হয়ে সেগুলি সারণি ৮.২ এর ৭ থেকে ১৮ ক্রমিক সংখ্যার মধ্যে বিন্যস্ত হয়েছে। এ সংবাদ বিভাগগুলি হচ্ছেঃ পাক-ভারত সম্পর্ক বিষয়ক, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব সম্পর্কিত, গভর্নর ও মন্ত্রীবৃন্দ বিষয়ক, প্রশাসনিক আমলা বিষয়ক, সরকার-বিরোধী নেতৃবৃন্দ বিষয়ক, সরকারের সমালোচনা বিষয়ক, বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশাজীবীদের সরকার-বিরোধী ভূমিকা বিষয়ক, গণনির্যাতন ও নিপীড়ন বিষয়ক, দাবী দাওয়া বিষয়ক, আন্দোলন বিষয়ক, রাজনৈতিক দল ও জোট বিষয়ক এবং রাজনৈতিক মামলা সংক্রান্ত সংবাদ ইত্যাদি। এসব বিভাগের সংবাদ শিরোনামগুলি সংগ্রহের পিছনে প্রতিটি ক্ষেত্রেই কিছু যুক্তি অনুসরণ করা হয়েছে। পাক-ভারত সম্পর্ক বিষয়ক সংবাদ সংগ্রহের প্রধানতম কারণ হচ্ছে এই যে,

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতিবেশী দু'টি রাষ্ট্র পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে কখনও সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পাকিস্তানের সরকারগুলি বার বার ভারতীয় আক্রমণের ভয় দেখিয়ে কিংবা ভারতের দালাল অভিযোগ দিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহকে কোনঠাসা করার চেষ্টা করেছে। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে উক্ত অস্ত্রটি ব্যবহার করা হয়েছে। যেসকল সংবাদের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র ও তার সরকারের চরিত্র ফুটে ওঠে কিংবা জনগণ সরকার বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে পারে সেরকম ধরনের সংবাদ শিরোনামগুলিই এখানে সংগ্রহ করা হয়েছে।

উপরোক্ত নীতির ভিত্তিতে১৯৬৪ সালের ১লা অক্টোবর থেকে ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ পর্যন্ত প্রকাশিত দৈনিক আজাদ- থেকে সংগৃহীত সংবাদ শিরোনামের মোট সংখ্যা হচ্ছে ৯ হাজার ৬টি। সারণি ৮.২ থেকে দেখা যায় এর মধ্যে ৪ হাজার ৩৭৩টি প্রধান তিনটি শিরোনাম থেকে নেওয়া এবং বাকি ৪ হাজার ৬৩৩টি শিরোনাম সংশ্লিষ্ট পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠাথেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। শিরোনামের মধ্যে পাকিস্তানের সাথে সম্পর্কবিহীন আন্তর্জাতিক সংবাদ হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর পরে যেসব সংবাদ সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল সেসব হচ্ছে জনসাধারণের ওপর সরকারের বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন ও নিপীড়ন বিষয়ক সংবাদ। প্রায় সমসংখ্যক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল বিরোধী রাজনৈতিক দল ও জোটসংক্রান্ত। আন্দোলন বিষয়ক সংবাদও কম গুরুত্ব পায়নি। এর পরে সংখ্যার দিক থেকে যে সংবাদটি সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব পেয়েছিল সেটি হচ্ছে পাক-ভারত সম্পর্ক বিষয়ক সংবাদ। পাক-ভারত সম্পর্ক বিষয়ক সংবাদ বলতে স্বাভাবিকভাবে ভারত-বিরোধী সংবাদকে বুঝায়, কেননা দৈনিক আজাদসহ অধিকাংশ সংবাদপত্রই সে সময় ভারত-বিরোধী শুধু নয়, ভারত বিদ্বেষী সংবাদ প্রচার করতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে সময় এমন একটি পরিস্থিতি বিরাজ করছিল যে, সরকার-বিরোধী সংবাদগুলিকে কোনভাবে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিলনা। সমগ্র সংবাদসংখ্যা বিবেচনা করলে দেখা যায় যে,সে সময় শতকরা প্রায় ৫২ ভাগ খবর ছিল প্রত্যক্ষভাবে সরকার-বিরোধী। রাজনৈতিক মামলা আর প্রশাসনিক আমলা বিষয়ক সংবাদগুলিও মূলতঃ সরকার বিরোধী। কেননা আমলাদের সংবাদ বলতে আসলে তাদের অগণতান্ত্রিক আচরণ আর অপকর্মকেই বুঝাত। আর রাজনৈতিক মামলাগুলি প্রত্যক্ষভাবে আইয়ুব সরকারের নিপীড়নমূলক কার্যকলাপের সাক্ষ্য বহন করতো। এছাড়া, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে সরকারী দলের অগণতান্ত্রিক আচরণ, বিরোধী দলের ওয়াক আউট আর সরকারী নীতির তীব্র সমালোচনা বিষয়ক সংবাদই বেশী থাকত। ফলে সব কিছু মিলে শতকরা ৬০ ভাগ সংবাদই সরকার বিরোধী বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। অবশিষ্ট ৪০ ভাগের মধ্যে আন্তর্জাতিক, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা এবং সাধারণ সংবাদকে বাদ দিলে সরকারের পক্ষে যেসব সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল তার সংখ্যা মোটেই ১২ ভাগের বেশী নয়। অন্যদিকে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের অর্থই ছিল জনসাধারণের জান-মাল রক্ষা করার ক্ষেত্রে সরকারের ব্যর্থতা । ফলে এসব সংবাদ সরকারের বিপক্ষে চলে যায়। অর্থাৎ ৬০ দশকের আলোচ্য কালপর্বে প্রকাশিত সংবাদগুলি জনসাধারণকে সরকার-বিরোধী করেতোলার পক্ষে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। উল্লেখ্য, সে সময় সংবাদপত্রগুলি জামানত তলব ও প্রকাশনা বাতিলের ঝুঁকি নিয়ে এ ধরণের সংবাদ প্রকাশ করত। তার ওপর ছিল কড়া সেন্সরশিপের নিত্যনতুন অধ্যাদেশ। প্রধান তিনটি সংবাদ শিরোনামের স্বরূপ পর্যালোচনা করলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

৮.২ সারণিতে উল্লিখিত ৪ হাজার ৩৭৩টি সংবাদ শিরোনামের মধ্যে শতকরা ২৫.৪৩ ভাগ সংবাদ ছিল আন্তর্জাতিক। অর্থাৎ সংবাদপত্র খুললেই বড় বড় শিরোনামে এ ধরনের কোন সংবাদ পাঠকের চোখে পড়তো। বস্তুত ষাট দশক ছিল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক ঝঞ্জা। বিক্ষুব্ধ দশক। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তখন একদিকে ঔপনিবেশিকতা, সামন্ত জমিদার ও পুঁজিবাদ-বিরোধী তথা এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার মুক্তিকামী মানুষের এক সর্বাত্মক লড়াই আর অন্যদিক রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বব্যাপী আধিপত্য বিস্তারের এক অব্যাহত প্রচেষ্টা। যুক্তরাষ্ট্র সে সময় পুঁজিবাদী বিশ্বের ওপরও একক নেতৃত্ব দাবী করছিল। পুঁজিবাদী দুনিয়াতে তখন দেখা দিয়েছিল ব্যাপক ছাত্র-যুব অসন্তোষ; জাপান ও অষ্ট্রেলিয়ায় তখন সংঘটিত হচ্ছিল এক মারাত্মক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। ফলে বড় বড় শিরোনামে যেসবসংবাদ তখন প্রকাশিত হত তার অধিকাংশই পাঠকের চেতনাকে মার্কিন বিরোধী করে তুলতে বিশেষ ভূমিকা পালন করত, আর প্রদেশের মানুষের মনে জাগাত মানব মুক্তির এক প্রবল আকাঙ্খা। এভাবে প্রায় প্রতিদিন বড় বড় অক্ষরে প্রকাশিত বহির্বিশ্ব সংক্রান্ত সংবাদগুলি পাঠকদের চেতনাকে শানিত করে প্রকারান্তরে আইয়ুব-বিরোধী সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতো।

সে সময় পূর্ব পাকিস্তানের প্রচন্ড প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সংবাদও জনসাধারণকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। কেননা এই কালপর্বে মোট ২২১টি অর্থাৎ মোট মূল শিরোনামের শতকরা ৫ ভাগের বেশী সংখ্যক ছিল এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সংবাদ। অনবরত প্রাকৃতিক বিপর্যয় হচ্ছে অথচ আইয়ুব সরকার এ সমস্যা স্থায়ীভাবে সমাধানের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না-- এই ছিল সে সময়ে আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানী জনসাধারণের অন্যতম অভিযোগ।

সংবাদপত্রের প্রধান শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত যেকোন সাধারণ মানুষের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর সরকারকে সমালোচনা, গণনির্যাতন, আন্দোলন, দাবী-দাওয়া বা রাজনৈতিক মামলা সংক্রান্ত খবর যখন মূল শিরোনামে প্রকাশিতহয় তখন সেসব জনসাধারণের কাছে আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠে। অথচ এক ধরনের সংবাদ উক্ত কালপর্বে দৈনিক আজাদের মত একটি পাকিস্তানবাদী পত্রিকায় প্রধান স্থান দখল করে নিয়েছিল। সারণি ৮.২-এর ক্রমিক সংখ্যা ১১ থেকে ১৮ এর মধ্যে ৮টি সরকার-বিরোধী সংবাদের মধ্যে এটা ছিল শতকরা প্রায় ৩৪ ভাগ।

সারণি ৮.২ থেকে দিখা যায়, ক্রমিক সংখ্যা ৭ থেকে ১৮ এএর মধ্যে যে ১২ প্রকার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যে সরকারের পক্ষে যায় এমন সংবাদ ছিল অতি সামান্য। যে ধরনের সংবাদ আইয়ুব সরকারের বৈদেশিক নীতির মাহাত্ম্য প্রচার করতো, কিংবা আইয়ুব খান ও তার গর্ভনরদ্বয় বা মন্ত্রীবর্গের বক্তৃতার বিবরণ দিত সে সেরূপ খবরা-খবর ছিল বড় জোর শতকরা ১৫ ভাগ। অন্যদিকে, শতকরা ৭৬ ভাগ সংবাদই সরকারের অপকর্ম ও তার বিরুদ্ধে জনগণ ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমালোচনা সংগ্রাম সংক্রান্ত। অবশ্য স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, মূল শিরোনাম কিংবা সাধারণ সংবাদ শিরোনামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল পাক-ভারত সসম্পর্ক সংক্রান্ত। সাধারণ শিরোনামের মধ্যে পাক-ভারত সম্পর্ক বিষয়ক সংবাদ ছিল শতকরা ৮.৮৬ ভাগ প্রকাশিত হয়েছিল। এর অর্থ হচ্ছে এই যে গোটা সময়কালে ভারত যে পাকিস্তানে একটি প্রধান শত্রু দেশ ছিল এ কথাই দৈনিক আজাদে বারবার প্রকাশ করা হত। এর সম্ভাব্য দু'টি প্রতিক্রিয়া লক্ষনীয়ঃ এক, সাধারণ মানুষের মধ্যে ভারত-বিরোধী মনোভাব বদ্ধমূল হয়েছিল, এবং দুই, ভারত-

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধী মনোভাবের যৌক্তিক কারণগুলিও অনেকের কাছে অস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। আর তাই দেখা যাবে, ভারতের কোন আগ্রাসী কার্যকলাপকেও বিরোধিতা করতে অনেক রাজনৈতিক দল দ্বিধাবোধ করছিল।

সারণি ৮.৩
পাক-ভারত সম্পর্ক বিষয়ক সংবাদের মাসিক গড় সংখ্যা

সংবাদের ধরন	মোট শিরোনাম সংখ্যা	মূল শিরোনামের শতকরা হার	১৯৬৪ (অ-ডি)	৬৫ (জা-জুন)	৬৫ (জুলা-ডি)	৬৬ (জা-জুন)	৬৬ (জুলা-ডি)
১. ভারত বিরোধী সংবাদ	৫৯০	৪৭.৬৩	২.৩৩	১৭.১৭	৫৪.০০	১২.১৭	৬.৫
২. পাক-ভারত সুসম্পর্ক সংক্রান্ত সংবাদ	১৩৪	৩৭.৩১	২.০০	১.৮৩	৪.৬৭	১২.৬৭	০.৩৩
৩. পাকিস্তানের প্রতি সমালোচনামূলক সংবাদ	৮	০	-	০.৬৭	০.১৭	০.১৭	০.৩৩
৪. মোট	৭৩২	৪৫.২২	৪.৩৩	১৯.৬৭	৫৮.৮৪	২৫.০১	৭.১৬

সারণি ৮.৩ (ক্রমশঃ)ঃ-

	৬৭ (জা-ডি)	৬৮ (জা-সে)	৬৮ (অ-ডি)	৬৯ (জা-মার্চ)	মোট
১. ভারত বিরোধী সংবাদ	২.০৮	১.৮৯	০.৬৭	০	১৩.৪১
২. পাক-ভারত সুসম্পর্ক সংক্রান্ত সংবাদ	০.২৫	০.৭৮	০.৬৭	০	২.৪৮
৩. পাকিস্তানের প্রতি সমালোচনামূলক সংবাদ	-	-	-	-	০.১৫
৪. মোট	২.৩৩	২.৬৭	১.৩৪	-	১৬.০৪

দৈনিক আজাদে পাক-ভারত সম্পর্ক বিষয়ক যেসব সংবাদ প্রকাশিত হত সেসবই ভারত-বিরোধী ছিল না। তবে তার অধিকাংশই যে ভারতের প্রতি সমালোচনা বা নিন্দাসূচক ছিল তা বলাই বাহুল্য। সারণি ৮.৩-এ বিষয়ে একটি স্পষ্ট চিত্র তোলে ধরে এতে দেখা যায়, এই কালপর্বে পাক-ভারত সম্পর্ক বিষয়ক যে ৭৩২টি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে শতকরা ৪৫.২২ ভাগ তিনটি শিরোনামের অধীন। লক্ষ্যণীয় যে, মোট ৭৩২ শিরোনামের মধ্যে ৫৯০টি তথা শতকরা প্রায় ৮১ ভাগই ভারত-বিরোধী সংবাদ। অধিকন্তু এসব সংবাদের শতকরা ৪৭.৬৩ ভাগ আবার মূল শিরোনামের অধীনে প্রকাশিত হয়েছে । অপর দিকে, ভারতের সাথে সুসম্পর্ক, সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে মোট ১৩৪টি অর্থাৎ সংবাদগুলির মাত্র শতকরা ১৮.৩০ ভাগ। অন্যদিকে, এ সংবাদগুলি গুরুত্বও পেয়েছে কম। কেননা এবর শতকরা ৩৭.৩১ ভাগ সংবাদ মূল শিরোনামে স্থান পেয়েছে। উক্ত সময়ে পাকিস্তানের প্রতি ভারতের সমালোচনা বিষয়ক সংবাদ সংখ্যা হচ্ছে মাত্র ৮টি এবং এগুলির কোনটিই মূল শিরোনাম ছিলনা।

সারণি ৮.৩ থেকে দেখা যায়, সব সময়ই যে, পাক-ভারত সম্পর্ক বিষয়ক সংবাদ বেশী প্রকাশিত হয়েছিল তা কিন্তু ঠিক নয়। ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৬৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত এই দেড় বছরে পাক-ভারত সম্পর্ক বিষয়ক সংবাদ সবচেয়ে বেশী প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত প্রতি মাসে গড়ে ১৯.৬৭টি এ ধরনের সংবাদ প্রকাশিত হয় এবং এরমধ্যে ভারত-বিরোধী সংবাদই প্রকাশিত হয়েছিল মাসে গড়ে ১৭.১৭টি। উল্লেখ্য, যে এ সময় পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের দাবী-দাওয়া ভিত্তিক আন্দোলন খুবই শক্তিশালী রূপ পরিগ্রহ করেছিল। কিন্তু এ সময় পাক-ভারতের মধ্যে উত্তেজনা ক্রমে বাড়তে থাকায় এবং এক পর্যায়ে দু'টি দেশের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাওয়ায় গণমানুষের সংগ্রামে হয়ে যায়। যা'হোক, ১৯৬৫ সালে শেষ ৬ মাস খুব স্বভাবিকভাবেই পাক-ভারত বিষয়ক সংবাদ সবচেয়ে বেশী প্রকাশিত হয়েছিল এবং তখন মাসে গড়ে ৫৮.৮৪টি করে এ বিষয়ক খবর প্রকাশিতহয়। অর্থাৎ উক্ত ৬ মাসে প্রতি দিন গড়ে প্রায় দু'টি করে এ বিষয়ক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। আর এসবের অধিকাংশই ভারত-বিরোধী সংবাদ। এ সময় সরাসরি ভারত-বিরোধী সংবাদ মাসে গড়ে ৫৪টি করে প্রকাশ পায় । অবশ্যউক্ত বছরের শেষদিকে দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান বিরোধের আপোস-মীমাংসার একটি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল এবং তারই প্রতিফলন হিসাবে ভারত-বিরোধী সংবাদ প্রকাশের পাশাপাশি মাসে গড়ে ৪.৬৭টি আপোস-মীমাংসা সূচক সংবাদ প্রকাশিত হয়। তাই ১৯৬৬ সালের প্রথম ছয় মাসে ভারতের প্রতি নিন্দাসূচক সংবাদের চেয়ে তার সাথে আপোসমূলক সংবাদের সংখ্যাই তুলনামূলকভাবে বেশী। এ সময় মাসে গড়ে ১২.১৭টি ভারত-বিরোধী সংবাদ প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে, মাসে গড়ে ১২.৬৭টি ভারতের সাথে আপোসমূলক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু এরকম পরিস্থিতি শুধু এ ছয় মাসেই বিদ্যমান ছিল; অর্থাৎ এর পর থেকে আবার বেশী করে ভারত-বিরোধী সংবাদ প্রকাশিত হতে থাকে। তবে জাতীয় জীবনে এর পর অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ সংঘটিত হওয়ার কারণে পাক-ভারত বিষয়ক খবর সংবাদপত্রের প্রথম প্রষ্ঠায় আর স্থান পায়নি ১৯৬৯ সালের প্রথম তিন মাস এ বিষয়ক সংবাদ একটিও প্রকাশিত হয় নি।

সারণি ৮.৪
পাকিস্তান রাষ্ট্রের ক্ষমতার এলিটবর্গের বক্তব্যের নমুনা

	প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান		গভর্নর ও মন্ত্রীবর্গ		প্রশাসনিক আমলাবৃন্দ		মোট রাষ্ট্রীয় বক্তব্য	
	(সংখ্যা)	শতকরা হার	(সংখ্যা)	শতকরা হার	(সংখ্যা)	শতকরা হার	(সংখ্যা))	শতকরা হার
১. ভারত বিরোধী বক্তব্য	৪১	০.০৯	৫৪	১২.৩০	৪	২.৫২	৯৯	৯.৪৫
২. বিরোধী দলের প্রতি নিন্দাসূচক বক্তব্য	৪২	৯.৩১	৪১	৯.৩৪	৮	৫.০৩	৯১	৮.৬৭
৩. আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবী বিরোধী বক্তব্য	২২	৪.৮৮	২১	৪.৭৯	১১	৬.৯২	৫৪	৫.১৪
৪. বৈষম্য ও অব্যাবস্থার স্বীকৃতি	১১	২.৪৪	২৯	৬.৬১	-	-	৪০	৩.৮১
৫. আত্ম প্রচারমূলক বক্তব্য	৫৪	১১.৯৮	৭৫	১৭.০৮	৫২	৩২.৭১	১৮১	১৭.২৬
৬. পরিকল্পনা ও অর্থনীতি বিষয়ক বক্তব্য	৭৭	১৭.০৭	২৬	৫.৯২	১৪	৮.৮০	১১৭	১১.১৫
৭. উপদেশ ও বাণী	৯১	২০.১৮	১৪	৩.১৯	-	-	১০৫	১০.০১
৮. ধর্মঘট ও আন্দোলন বিরোধী বক্তব্য	২৭	৫.৯৯	৭৭	১৭.৫৪	১৭	১০.৬৯	১২১	১১.৫৪
৯. বিবিধ	৮৬	১৯.০৭	১০২	২৩.২৪	৫৩	৩৩.৩৩	২৪১	২২.৯৭
মোট	৪৫১	১০০.০০	৪৩৯	১০০.০০	১৫৯	১০০.০০	১০৪৯	১০০.০০

শুধু যে সংবাদপত্রের সাধারণ খবরের মধ্যেই বিপুলসংখ্যক ভারত-বিরোধী সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল তা নয়, সে সময় পাকিস্তান রাষ্ট্রের ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে যেসব মন্তব্য প্রকাশ করা হত, সেসবেরও একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মন্তব্য থাকতো ভারত-বিরোধী। সারণি ৮.৪ এ এসম্পর্কে একটি স্পষ্ট চিত্র ফুটে ওঠে। এখানে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গ বলতে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট

Dhaka University Institutional Repository

আইয়ুব খান, তার গভর্নরদ্বয় ও মন্ত্রী পরিষদসমূহের সদস্য এবং প্রশাসনিক আমলাদের বোঝানো হয়েছে। উক্ত কালপর্বে রাষ্ট্রের এসব ব্যক্তিবর্গ মোট ৯৯ বার ভারত-বিরোধী মন্তব্য প্রকাশ করেন, তার মধ্যে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ৪১টি,গভর্নর ও মন্ত্রীরা ৫৪টি, এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তারা ৪টি এ ধরনের মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন।

ভারত-বিরোধী এসব সংবাদ ও মন্তব্যের এত ব্যাপক প্রচার স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষের চেতনাকে প্রভাবিত না করে পারেনা। তবে এ সময়ে যে বিপুলসংখ্যক ভারত-বিরোধী সংবাদ ও মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল তা থেকে মনে করা খুবই স্বাভাবিক যে, উদ্দেশ্যমূলকভাবেই এ সময় ভারত-বিরোধী একটি প্রচারণা চালান হত। কেননা, ভারতকে সমালোচনা করার যতই সংগত কারণ থাকুক না কেন, পার্শ্ববর্তী একটি দেশের বিরুদ্ধে প্রায় প্রতিদিন গড়ে একটি করে বৈরীসুলভ সংবাদ প্রকাশ করা বৈদেশিক নীতি বা সুস্থ মানসিকতার পর্যায়ে পড়ে না। সে যা'হোক, এরকম ব্যাপক ভারত-বিরোধী প্রচারণার কারণে পরিস্থিতি এমন হয়ে ওঠে যে, সরকার বিরোধী যেকোন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গকে ভারতেরদালাল নামে আখ্যায়িত করে তাকে জনবিচ্ছিন্ন করা সহজতর হয়ে পড়ে। দৈনিক আজাদের মত একটি পাকিস্তানীবাদী সংবাদপত্রই শুধু এ ধরনের প্রচারণায় অংশ নিত না, রাষ্ট্রের ক্ষমতাবান এলিটবর্গের মন্তব্যের দিকে লক্ষ্য করলেও দেখা যায় যে, সয়ং পাকিস্তান রাষ্ট্রই যেনএ ধরনের সংবাদ প্রকাশেরর জন্য সকলকে উৎসাহিত করত।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের চরিত্রের যে পরিচয় ইতিপূর্বেকার আলোচনায় পাওয়া যায়, তা থেকে এটুকু নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, শক্তিশালী পাকিস্তান রাষ্ট্রকে যুক্তিসিদ্ধ করতে হলে ভারতই তার সবচেয়ে বড় শত্রু এ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া আর কোন সহজ উপায় ছিলনা। সমগ্র জনসাধারণের ওপর দমনপীড়ন চালানোর বিষয়টিকে যুক্তিসিদ্ধ করতে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এ ধরনের একটি প্রশ্নকেই সামনে আনা হয়। অর্থাৎ বলা যায় পাকিস্তান রাষ্ট্র সুচিন্তিতভাবেই ভারত-বিরোধী প্রচার চালিয়ে ভারতকে বড় শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছিল। আর সে কারণে শুধু সাধারণ মানুষ নয়, মওলানা ভাসানীরমত একজন জনদরদী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ শুধু যে ভারত-বিরোধী প্রচারণায় লিপ্ত ছিলেন তা নয়, তারা বহুবিধ কায়দায় জনসাধারণকে প্রভাবিত করতে প্রয়াস পান। রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিগণ যে ধরনের বক্তব্য প্রকাশ করতেন সেগুলি সারণি ৮.৪ এ দেখানো হয়েছে। উক্ত সারণি থেকে দেখা যায়, ১৯৬৪ সালো ১লা অক্টোবর থেকে ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চের মধ্যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিগণের মোট ১০৪৯টি সংবাদ প্রকাশিত হয়। এর শতকরা প্রায় ২৩ ভাগ হচ্ছে বিবিধ সংবাদ যাতে বিদেশ সফর বা এ জাতীয় টুকিটাকি বিষয় অন্তর্ভূক্ত ছিল। এর পরই যে ধরণের সংবাদ সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব পেয়েছিল তা হচ্ছে ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গের আত্মপ্রচারমূলক বক্তব্য। যার হার ছিল শতকরা ১৭.২৬ ভাগ। তবে প্রশাসনিক আমলাদের পক্ষ থেকে আত্মপ্রচারমূলক মন্তব্য বেশী প্রকাশিত হয়েছিল, যার পরিমাণ শতকরা ৩২.৭১ ভাগ। আর গভর্নর ও মন্ত্রীদের এধরনের বক্তব্যও ছিল শতকরা ১৭.০৬ ভাগ। তবে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের এধরণের বক্তব্য তুলনামূলকভাবে কম, যার পরিমান শতকরা ১১.৯৮ ভাগ।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব সংক্রান্ত সংবাদের প্রধান অংশ ছিল যার উপদেশ ও বাণী। এগুলির অধিকাংশ পদাধিকারবলে নৈমিত্তিক কর্মকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট। এছাড়া আইয়ুব খান বিষয়ক বিবিধ সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রেও তার নিজস্ব ভূমিকা ছিল সামান্য। এ দু'টি বিষয় বাদ দিলে দেখা যায়, আইয়ুব খান পরিকল্পনা ও অর্থনীতি বিষয়ে সবচেয়ে বেশীবক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন। তার পরেই আসে তার আত্মপ্রচারমূলক বক্তব্য সংক্রান্ত সংবাদ। আইয়ুব খান উক্ত সাড়ে চার বছরে যেসব আত্মপ্রচারমূলক বক্তব্য দিয়েছিলেন সেসব থেকে মোট ৫৪টি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। এর পরে তার যে বক্তব্যটি বেশী গুরুত্ব পেয়েছিল তা হলো বিরোধী দলের নিন্দা, ধর্মঘট বা যে কোন আন্দোলনের বিরোধিতা এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন-বিরোধী বক্তব্য। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব সম্পর্কে উক্ত সাড়ে চার বছরে যেসবসংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল সেসবের শতকরা ২০ ভাগেরও বেশী ছিল উপরোক্ত বিষয় সংক্রান্ত। একটি দেশের সর্বোচ্চ পদে সমাসীন থেকেও এ সময়ে তিনি মোট ৯১ বার এ ধরনের বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন। গভর্নর ও মন্ত্রীদের বক্তব্যের মধ্যে এ ধরনের বক্তব্যের হার আরো বেশী, যার পরিমাণ ছিল শতকরা প্রায় ৩২ (৩১.৬৭) ভাগ। অর্থাৎ গর্ভনর ও মন্ত্রীগণ গড়ে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই একবার করে এ ধরনের বক্তব্য খুব গুরুত্বের সাথে বলতেন, আর সে কারণেই সরকার-বিরোধী একটি দৈনিক পত্রিকায় তা প্রকাশিত হত। ফলে বৈষম্যের শিকার পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ, ধর্মঘট ও আন্দোলনের সমর্থক জনসাধারণ এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমর্থক জনসাধারণের কাছে রাষ্ট্র ও তার প্রতিনিধিদের সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব গড়ে ওঠা মোটেই অসম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, শান্তিকামী সাধারণ মানুষের কাছেও রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের এ ধরনের আচরণ মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

পাকিস্তান সরকারের কর্তাব্যক্তিরা একদিকে যেমন আত্মপ্রচার, বিরোধী দলগুলির প্রতি অবহেলা প্রদর্শন, রাষ্ট্রীয় পদে থেকে সমালোচনা, ধর্মঘট ও আন্দোলনের বিরুদ্ধে নানাবিধ অশোভন মন্তব্য করতো এবং জনসাধারণের ন্যায্য দাবীর প্রতি মোটেই মনোযোগ দিতো না, অন্যদিকে তারা জনসাধারণের যে কোন বিক্ষোভ ও অসন্তোষকে দমন করার জন্য নানাবিধ দমনমূলক কৌশল অবলম্বন করত। আজাদের শিরোনাম জরিপের ফলাফল থেকে এ সত্যটি আরো পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে।

সারণি ৮.৫ থেকে দেখা যায়, ১৯৬৪ সালের ১লা অক্টোবর থেকে ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ পর্যন্ত দৈনিক আজাদের প্রথম পৃষ্ঠায় গণনির্যাতন ও নিপীড়নমূলক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল মোট ৮৮২টি। এর মধ্যে শতকরা ১৫.৪০ ভাগ সংবাদ মূল শিরোনামের অন্তর্ভূক্ত। এ সময়ে মোট ৯৫টি ১৪৪ ধারা জারির সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, যার মধ্যে শতকরা ১৫.৭৯ ভাগ মূল শিরোনামে স্থান পেয়েছিল। মূল শিরোনাম হিসাবে সান্ধ্যআইন সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল৩৭ বার, যার শতকরা ৩৭.৮৪। সংবাদ সব চেয়ে বেশী প্রকাশিত হয়েছিল, যার সংখ্যা ছিল ২৮৮। মূল শিরোনামের ভাগই মূল শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রেফতারের অধীনে এগুলির শতকরা ১৪.৫৮ ভাগ প্রকাশিত হয়েছিল। এ সময়ে পুলিশের গুলিতে হত্যার সংবাদ ছিল ১১৩টি, যার শতকরা ৩৭.১৭ ভাগ ছিল মূল শিরোনামে গুলি বর্ষণের সংবাদ ছিল ৮৭টি, যার শতকরা ৪২.৫৩ ভাগ ছিল মূল শিরোনামের অন্তর্ভূক্ত। সরকারী দলের গুন্ডামির সংবাদ সংখ্যা ছিল মোট ৯৭ টি, যারশতকরা ১৯.৫৯ ভাগ মূল শিরোনাম আকারে প্রকাশিত হয়। লাঠি চার্জ, কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ বা এ জাতীয় পুলিশী তৎপরতার সংবাদ ছিল মোট ১০৬টি, যার শতকরা ৪৪.৩৪ ভাগ মূল শিরোনামে স্থান পেয়েছিল। আর পদোন্নতি ও প্রকাশনা বন্ধ, ছাঁটাই, জনসভা নিষিদ্ধ করা, হুমকি প্রদর্শন, বহিষ্কার, ধর্মঘট বেআইনী ঘোষণা ও মিথ্যা মামলার মত হয়রানি বিষয়ক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল মোট ৯৯ বার, যার শতকরা ৩৮.৩৮ ভাগ ছিল মূল শিরোনামের অধীনে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ৮.৫
গণনির্যাতন ও নিপীড়নমূলক খবরের মাসিক গড় সংখ্যা

	মোট শিরোনাম সংখ্যা	মূল শিরোনামের শতকরা হার	১৯৬৪ (অ-ডি)	৬৫ (জা-জুন)	৬৫ (জুলা-ডি)	৬৬ (জা-জুন)	৬৬ (জুলা-ডি)	৬৭ (জা-ডি)	৬৮ (জা-সে)	৬৮ (অ-ডি)	৬৯ (জা-মার্চ)	মোট
১. ১৪৪ ধারা জারি	৯৫	১৫.৭৯	২.০০	১.৩৩	–	১.০০	০.৩৩	১.২৫	১.৬৭	৩.৬৭	১১.৬৭	১.৭৬
২. সান্ধ্য আইন জারি	৩৭	৩৭.৮৪	৫.৬৭	১.০০	–	০.৩৩	–	০.৩৩	–	২.০০	৫.৩৩	০.৬৯
৩. গ্রেফতার	২৮৮	১৪.৫৮	১০.০০	৮.০০	১.৫০	৪.৫	০.৩৩	২.৬৭	৩.২২	৮.০০	৩১.৬৭	৫.৩৩
৪. হত্যা	১১৩	৩৭.১৭	২.৬৭	০.৮৩	–	২.৬৭	০.৩৩	০.৬৭	০.২২	২.৩৩	২১.৬৭	২.০৯
৫. গুলীবর্ষণ	৮৭	৪২.৫৩	১.৬৭	০.৩৩	০.৩৩	১.১৭	১.৩৩	০.৪২	০.৫৫	২.৬৭	১২.০০	১.৬১
৬. সরকারী দলের গুন্ডামি	৯৭	১৯.৫৯	৮.৩৩	–	–	০.৫০	১.০৮	১.০৮	০.৮৯	২.৬৭	৯.৩৩	১.৭৯
৭. লাঠিচার্জ/কাঁদুনে গ্যাস/ অন্যান্য	১০৬	৪৪.৩৪	৮.০০	১.৩৩	০.১৬	০.৮৩	১.০৮	১.০৮	১.০০	৩.৬৭	৯.৬৭	১.৯৬
৮. হয়রানি*	৯৯	৩৮.৩৮	৮.০০	২.৬৭	–	১.৫০	১.৫০	১.৫০	১.৪৪	২.৬৭	০.৬৭	১.৮৩
মোট গড় সংখ্যা	৮৮২	২৫.৪০	৪১.৩৩	১৫.৫	২.১৭	১৪.১৭	৫.১৭	৮.৩৩	৯.২২	২৭.৬৭	১০১.০০	১৬.৩৩

*পদোন্নতি বন্ধ, প্রকাশনা বন্ধ, ছাটাই, জনসভা নিষিদ্ধ করা, হুমকি প্রদর্শন, বহিষ্কার, ধর্মঘট বেআইনী ঘোষণা, মিথ্যা মামলা ইত্যাদি।

সারণি ৮.৫ থেকে দেখা যায়, ১৯৬৪ সালের ১লা অক্টোবর থেকে ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ কালপর্বের শুরুতে এবং শেষ পর্যায়ে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক নির্যাতন ও নিপীড়নমূলক ঘটনার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৬৪ সালের শেষ তিন মাসে এবং ১৯৬৯ সালের প্রথম তিন মাসে গড়ে এ ধরনের সংবাদ যথাক্রমে ৪১.৩৩ ও ১০২ বার প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ এ সময় দৈনিক পত্রিকার প্রথম পাতায় এ ধরনের সংবাদ দৈনিক প্রায় ৪টি করে প্রকাশিত হত। ১৯৬৪ সালের শেষে যখন সকল বিরোধী দল একজোট হয়ে আইয়ুব সরকার-বিরোধী ব্যাপক গণজোয়ার সৃষ্টি করেছিল তখন যেমন নির্যাতনমূলক ঘটনা বেড়ে গিয়েছিল, ঠিক তেমনই ১৯৬৯ এর প্রথম মাসগুলিতে যখন আইয়ুব সরকার-বিরোধী একটি ব্যাপক গণঅভ্যুত্থান শুরু হয় তখনও নির্যাতনের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং তা আগের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে। এ দুই-এর মধ্যে যে পার্থক্য তা শুধু পরিমাণগত নয়, একেবারে গুণগত; অর্থাৎ মাসে ৪১.৩৩টি সংবাদের স্থলে ১০২টি সংবাদ।ঊনসত্তরে সকল রকম নিপীড়নমূলক সংবাদ প্রকাশই দারুণভাবে বেড়ে যায়, কিন্তু গ্রেফতার, হত্যা, গুলিবর্ষণের ঘটনা সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশের পরিবর্তনের ব্যাপারটি নিতান্তই গুণগত। ১৯৬৪ সালের শেষ দিকে মাসে ১০ বার গ্রেফতারের ঘটনা প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তী ৬ মাসেও তা প্রায় অব্যাহত থাকে। এ সময় মাসে গড়ে ৮টি করে গ্রেফতারের ঘটনা প্রকাশিত হয়। এর পর হঠাৎ করেই তা হ্রাস পেয়ে মাসে গড়ে ১.৫০ টিতে উপনীত হয়। কিন্তু ১৯৬৬ সালের প্রথম ৬ মাসে এ সংখ্যা আবার বেড়ে যায়। তখন গড়ে ৪.৫টি করে প্রতি মাসে গ্রেফতারের ঘটনা প্রকাশিত হয়। এর পর গ্রেফতারের ঘটনা একেবারেই কমে যায় এবং আবার তা ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে ১৯৬৮ সালের শেষ দিকে এসে মাসে গড়ে ৮টি করে গ্রেফতারের ঘটনা প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে হঠাৎ করে তা বেড়ে গিয়ে মাসে গড়ে প্রায় ৩২টিতে দাঁড়ায়। হত্যা ও গুলীবর্ষণের ঘটনাও এরূপ উঠানামা করেছে। ১৯৬৪ সালের শেষে এবং ১৯৬৯ সালের প্রথমে হত্যার সংবাদ যথাক্রমে মাসে গড়ে ২.৬৭টি ও ২১.৬৭টি প্রকাশিত হয়েছে। পুলিশের গুলীবর্ষণের ঘটনাও এভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৬৪ সালের শেষ দিকে যেখানে গুলীর্বষণের ঘটনা ঘটেছে মাসে ১.৬৭টি, যেখানে ১৯৬৯ সালের প্রথম দিকে এ ধরনের ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে গড়ে মাসে ১২টি। ১৪৪ ধারা জারির সংবাদও অনুরূপভাবে শুরুতে কিছুটা বেশী ছিল; তারপর এটি ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় বিশেষভাবে হ্রাস পায় এবঙ ১৯৬৬ সালের মাঝামাঝি থেকে ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে ১৯৬৯ সালের প্রথম দিকে ক্রমে ভীষণভাবে বেড়ে যায় এবং এসময় ১৪৪ ধারা জারির খবর মাসে গড়ে প্রায় ১২টি করে প্রকাশিত হতে থাকে। সব ক্ষেত্রেই নির্যাতনের মাত্রার গতি একই, তবে হয়রানির ক্ষেত্রে বিষয়টি একটু ভিন্ন রকম। ১৯৬৪ সালের শেষ দিকে হয়রানির ঘটনা প্রকাশিত হয় মাসে গড়ে ৮টি করে কিন্তু এর পর ক্রমাগত এ ধরনের খবর প্রকাশের হার হ্রাস পেতে থাকে এবং ১৯৬৮ সালের শেষ তিন মাসে কিছুটা বেড়ে আবার কমতে থাকে।

সারণি ৮.৬
গণনিপিড়নও হয়রানি

	১৯৬৪ (অ-ডি)	১৯৬৫	১৯৬৬	১৯৬৭	১৯৬৮	১৯৬৯ (জা-মার্চ)	মোট
১. মিথ্যা মামলা	১০	৭	৬	৪	–	–	২৭
২. ছাটাই ও বহিস্কার	৫	৪	–	২	১১	–	২২
৩. বেতন, পদন্নতি কিংবা প্রকাশনা বন্ধ	৫	১	৪	২	–	–	১২
৪. জনসভা নিষিদ্ধকরণ	–	–	৩	৩	৩	–	৯
৫. ধর্মঘট বেআইনী ঘোষণা	২	৩	২	৭	১	১	১৬
৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা	২	১	৩	–	৬	১	১৩
মোট	২৪	১৬	১৮	১৮	২১	২	৯৯

হয়রানিরও বেশ প্রকার ভেদ ছিল। সারণি ৮.৬ থেকে দেখা যায় হয়রানির ছয় প্রকার। এসব হচ্ছে মিথ্যা মামলা, ছাটাই ও বহিষ্কার, বেতন, পদোন্নতি কিংবা প্রকাশনা বন্ধ, জনসভা নিষিদ্ধকরণ, ধর্মঘট বেআইনী এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা। হয়রানি সংক্রান্ত মোট ৯৯টি সংবাদের মধ্যে ২৭টি ছিল মিথ্যা মামলা সংক্রান্ত, ছাটাই ও বহিষ্কারের খবর ছিল ২২টি, ধর্মঘট বেআইনী ঘোষণা করার সংবাদ সংখ্যা ছিল ১৬টি এবং অন্যান্য হয়রানির সংখ্যা ৯ থেকে ১৩টির মধ্যে ছিল। আগেই বলা হয়েছে ১৯৬৪ সালের শেষ তিন মাসে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক হয়রানির সংবাদ প্রকাশিত হয়। উক্ত তিন মাসে যেখানে এ ধরনের ২৪টি সংবাদ প্রকাশিত হয়, পরবর্তী বছরগুলির কোনটিতে এত সংবাদ প্রকাশিত হয়নি। এ থেকে ধারণা করা চলে যে সরকার হয়রানি করার পদ্ধতিটি প্রথম দিকে চালু রাখলেও তা আর পরবর্তীকালে চালু রাখতে পারেনি। সম্ভবতঃ রাষ্ট্রের জন্য তার কোন প্রয়োজনও ছিলনা। কেননা হয়রানি হচ্ছেনিপীড়নের একটি পরোক্ষ প্রক্রিয়া। পরবর্তীকালে দাবী-দাওয়া, সরকারের সমালোচনা ও আন্দোলনের ঘটনা ক্রমাগত এত বেড়ে যায় যে, সেগুলিকে নিছক হয়রানি করে বন্ধ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে কিংবা হয়রানির মত ঘটনাই নতুন একটি আন্দোলনের জন্ম দিতে

Dhaka University Institutional Repository

পারে বলে অনুভূত হয়। অথবা এমনও হতে পারে, ১৯৬৪ সালের শেষ তিন মাসে এমন আন্দোলন আরম্ভ হয় যে, কেবল মাত্র হয়রানি করে তা বন্ধ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সে সময় বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশাজীবীদের আন্দোলন এত ব্যাপক রূপ লাভ করে যে, তাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য হয়রানি করাটাকে যথেষ্ট কার্যকর মাধ্যম বলে বিবেচিত হয়নি। সারণি ৮.৭ এর দিকে দৃষ্টি দিলে সে সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে।

সারণি ৮.৭
দাবী-দাওয়া বিষয়ক সংবাদের মাসিক গড় সংখ্যা

	মোট শিরো-নাম সংখ্যা	মূল শিরো-নামের শতকরা হার	১৯৬৪ (অ-ডি)	৬৫ (জা-জুন)	৬৫ (জুলা-ডি)	৬৬ (জা-জুন)	৬৬ (জুলা-ডি)	৬৭ (জা-ডি)	৬৮ (জা-সে)	৬৮ (অ-ডি)	৬৯ (জা-মার্চ)	মোট
১. বন্দী মুক্তির দাবী	৬৯	৪.৩৫	১.৩৩	০.৮৩	১.০০	০.১৭	১.০০	২.৫৮	০.২২	০.৬৭	৪.০০	১.২৮
২. গণনিপীড়ন বন্ধের দাবী	৮২	১০.৯৮	১.৩৩	২.১৭	০.১৭	২.৩৩	-	১.২৫	২.২২	-	৫.০০	১.৫২
৩. দুর্ভিক্ষ দূরীকরণের দাবী	২৫	১৬.০০	০	০.৩৩	০.১৭	০.৮৩	০.৫০	০.২৫	০.৮৯	-	১.০০	০.৪৬
৪. ন্যায় বিচারের দাবী	৩৪	৬৭.৬৫	৫.০০	১.০০	০.১৭	০.৮৩	-	০.০৮	০.২২	১.৩৩	০	০.৬৩
৫. শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার দাবী	৪৮	১০.৪২	০.৬৭	১.০০	০.৬৭	০.৮৩	০.৩৩	০.৮৩	১.১১	২.৬৭	০.৩৩	০.৮৯
৬. পেশাজীবীদের দাবী	৩৭	১০০.০০	২.৬৭	১.৮৩	০.১৭	-	-	০.০৮	০.৩৩	-	৪.৩৩	০.৬৯
৭. আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী	৫২	১৯.২৩	০.৬৭	০.৩৩	০.৬৭	১.৮৩	০.৮৩	১.০৮	১.২২	-	১.৩৩	০.৯৬
মোট	৩৪৭	২৬.২২	১১.৬৭	৭.৫	৩.০০	৬.৮৩	২.৬৭	৬.১৭	৬.২২	৪.৬৭	১৬.০০	৬.৪৩

৮.৬ সারণিতে দেখা গেছে ১৯৬৪ সালের শেষ তিন মাসে প্রচুর গণনির্যাতনের ঘটনা ঘটেছিল, যা ১৯৬৯ সনে ব্যাপক আকার করে, সারণি ৮.৭ থেকে কিন্তু তা দেখা যায় না, যদিও ১৯৬৯ এ দাবী-দাওয়া সংক্রান্ত সংবাদ বেশী প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এ বৃদ্ধির হার মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে তার উল্টোটাও ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়,এই গোটা সময়ে ন্যায় বিচারের দাবী উঠেছে মোট ৩৪ বার, তার মধ্যে ১৯৬৪ সালের শেষ তিন মাসেই প্রকাশিত হয়েছে ১৫টি, বাকি ৪ বছর তিন মাসে মোট এ ধরনের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে ১৯ বার। লক্ষনীয় যে, ন্যায় বিচারের দাবী সংক্রান্ত সংবাদের শতকরা ৬৭.৬৫ ভাগই খুব গুরুত্বের সাথে অর্থাৎ মূল শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। এতে ধারণা করা মোটেই অযৌক্তিক হবেনা এত গুরুত্ব দিয়ে সংবাদ পত্রগুলি এসব খবর প্রকাশ করেছে বলে হয়রানিমূলক কাজ কারার ব্যাপারে রাষ্ট্র সতর্ক হয়ে উঠে।

সারণি ৮.৭ এ সংবাদ প্রকাশের যে চিত্র প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন প্রবণতালক্ষ্য করা যায় না। গোটা সাড়ে চার বছর ধরেই বিভিন্ন ধরনের দাবী-দাওয়া উত্থাপিত হয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশী উঠেছে গণনিপীড়ন বন্দের দাবী, এর পর বন্দী মুক্তির দাবী এবং প্রায় সমভাবে যে দুটি দাবী উঠেছে সেদুটি হচ্ছে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার দাবী। মোট ৩৪৭টি দাবী-দাওয়া সংক্রান্ত সংবাদের মধ্যে এ দু'টি দাবীই ছিল শতকরা প্রায় ৩০টি। এছাড়া দুর্ভিক্ষ দূরীকরণের দাবী ও পেশাজীবীদের দাবী বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। দাবীর প্রকৃতির দিক থেকে দাবীগুলিকে প্রধানতঃ দু'ভাবে ভাগ করা যেতে পারে, একটি, জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের দাবী এবং অন্যটি গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবী। গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবী ছিল শতকরা ৭১ ভাগ। তবে সময়ের সাথে সাথে এসব দাবী ক্রমাগত বেশী হারে প্রকাশিত হতে থাকে। বন্দী মুক্তির দাবী বিষয়ক সংবাদ ১৯৬৯ সালের প্রথম দিকে মাসে গড়ে ৪টি করে প্রকাশিত হয়। এসময় গণনিপীড়ন বন্ধের দাবী ওপেশাজীবীদের দাবী প্রকাশের মাসিক গড় হার ছিল যথাক্রমে ৫ ও ৪.৩৩টি।

সারণি ৮.৮
সরকারের সমালোচনামূলক সংবাদের মাসিক গড় সংখ্যা

	মোট শিরোনাম সংখ্যা	মূল শিরোনামের শতকরা হার	১৯৬৪ অ-ডি)	৬৫ (জা-জুন))	৬৫ (জুলা-ডি)	৬৬ (জা-জুন)	৬৬ (জুলা-ডি)	৬৭ (জা-ডি)	৬৮ (জা-সে)	৬৮ (অ-ডি)	৬৯ (জা-মার্চ)	মোট
১. দুর্নীতির সমালোচনা	৩২	৩.১৩	৫.৩৩	১.৬৭	০.৩৩	০.৫০	-	০.০৮	-	-	-	০.৫৯
২. দমননীতির সমালোচনা	৭০	৪১.৪৩	২.০০	৩.১৭	০.১৭	১.৮৩	০.৮৩	০.৫০	১.০০	১.৩৩	৩.০০	১.৩০
৩. পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক নীতির সমালোচনা	৮৫	৩২.৯৪	২.৩৩	৪.০০	১.৩৩	৪.১৭	০.৮৩	০.৪২	০.৮৯	০	১.০০	১.৫৭
৪. রাজনৈতিক সমালোচনা	২০০	৮৫.০০	১৬.৩৩	৪.৫০	০.৬৭	৩.৬৭	২.৮৩	২.৯২	২.১১	৫.০	৪.০০	৩.৩০
৫. আঞ্চলিক বৈষম্যের সমালোচনা	৯৬	৩০.২১	৪.০০	১.৫০	০.৮৩	২.৮৩	২.০০	২.১৭	১.০০	০.৬৭	১.৩৩	১.৭৮
মোট	৪৮৩	৫৩.২১	৩০.০০	১৪.৮৩	৩.৬৭	১৩.০০	৬.৫০	৬.০৮	৫.০০	৭.০০	৯.৩৩	৮.৯৪

সরকারের সমালোচনামূলক সংবাদের ক্ষেত্রেও একই রকম চিত্র ফুটে ওঠে। সময়ের সাথে সাথে সমালোচনার পরিমাণ যে খুব বেড়ে গেছে তা নয়, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে হ্রাসপেয়েছে। সারণি ৮.৮ এ যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা থেকে দেখা যায়, সমালোচনামূলক সংবাদ প্রকাশের যেন কোন অর্থই হয়না, কেননা, সরকারকে যেন সমালোচনা করে কোন লাভ নেই কিংবা ইতিমধ্যেই সরকারের প্রতি জনসাধারণের ক্ষোভ এত পুঞ্জীভূত হয়েছে যে, সমালোচনার সংবাদ পড়ে সচেতন হয়ে ওঠার আর কোন প্রয়োজন নেই। সে কারণেই সম্ভবত: দেখা যায় সমাজে সরকার-বিরোধী আন্দোলনের উত্তাপ ক্রমাগত বেড়ে যেতে থাকলেও তার বিরুদ্ধে সমালোচনাসূচক সংবাদ সেভাবে বাড়েনি, বরং কোথাও কোথাও হ্রাস পেয়েছে।

সারণি ৮.৮ থেকে দেখা যায়, ১৯৬৪ সালের ১লা অক্টোবর থেকে ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ পর্যন্ত সরকারের সমালোচনামূলক সংবাদ মোট ৪৮৩টি প্রকাশিত হয়। এসব সংবাদের মধ্যে শতকরা ৫৩.২১ ভাগই মূল শিরোনাম হিসাবে প্রকাশিত হয়। সমালোচনামূলক সংবাদগুলিকে মোট পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলি হচ্ছে দুর্নীতি, দমননীতি, পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক নীতি, রাজনৈতিক এবং আঞ্চলিক বৈষম্যমূলক নীতি সংক্রান্ত। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এই যে,আইয়ুব সরকারের রাজনীতি বিষয়ক সমালোচনা সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং তার সংখ্যা ২০০। সরকারের প্রতি সমালোচনাসূচক সংবাদের মধ্যে এর সংখ্যা শতকরা ৪১.৪১ ভাগ। এ ধরনের সংবাদ যে শুধু বেশী সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে তাই নয়, অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের প্রতি সমালোচনাসূচক যে ২০০টি সংবাদ এ সময়ে প্রকাশিত হয়েছে তার শতকরা ৮৫ ভাগই মূল শিরোনাম আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এর পরই সরকারের প্রতি যে সমালোচনা বেশী প্রকাশিত হয়েছে তা হচ্ছে স্বায়ত্তশাসন বিষয়ক, যার শতকরা ৩০.২১ ভাগ সংবাদের মূল শিরোনাম হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে। এ ধরনের মোট সংবাদ সংখ্যা ৯৬। পরিকল্পনা ও অর্থনীতি বিষয়ক সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে মোট ৮৫টি এবং এর শতকরা প্রায় ৩৩ ভাগ মূল শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। দমননীতি বিষয়ক ৭০টি সমালোচনাসূচক সংবাদেরও শতকরা ৪১.৪৩ ভাগ প্রকাশিত হয়েছে মূল শিরোনাম আকারে। অর্থাৎ সরকারের সমালোচনামূলক সংবাদের অধিকাংশই বিশেষ গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৬৪ সালের শেষ তিন মাসে আইয়ুব সরকারের রাজনৈতিক সমালোচনা যত অধিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে তা আর পরবর্তীকালে হয়নি। সে সময় মাসে গড়ে ১৬.৩৩টি করে এ বিষয়ক সংবাদ প্রকাশিত হত। অবশ্য এ ধরনের সংবাদ এত বেশী সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়ার কারণ সম্ভবতঃ ছিলসে সময়ের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, সরকার নিয়ন্ত্রিত কয়েকটি সংবাদপত্রসহ প্রায় সকল সংবাদপত্রই তখন সরকার-বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু এর পর তা আর সে হারে প্রকাশিত হয়নি। শুধু রাজনৈতিক সমালোচনাই নয়, ইতিপূর্বে নির্যাতনমূলক সংবাদের প্রচার সংখ্যা যেভাবে বেড়ে গেছে সে হারে তো দূরে থাক, সাধারণভাবেও সমালোচনাসূচক সংবাদ প্রচার সেভাবে বাড়েনি। যেখানে এ ধরনের সংবাদ ১৯৬৪ সালের শেষদিকে মাসে গড়ে ৩০টি করে প্রকাশিত হত, সেখানে ১৯৬৯ সালের প্রথম দিকেও মাসে গড়েমাত্র ৯.৩৩টি প্রকাশিত হয়। এসব সংবাদ খুব গুরুত্বসহকারে প্রকাশিত হলেও এবং সরকারকে সমালোচনার যথেষ্ট কারণ থাকলেও সমালোচনাসূচক সংবাদ তখন সেভাবে না বেড়ে ক্রমে হ্রাস পেয়েছে এবং এর স্থান দখল করে নিয়েছে সরকার-বিরোধী আন্দোলনের সংবাদ। সারণি ৮.৯ এ তার একটি চিত্র পাওয়া যায়।

সারণি ৮.৯

আন্দোলনের কর্মসূচী সংক্রান্ত সংবাদের মাসিক গড় সংখ্যা

বিষয়	মোট শিরোনাম সংখ্যা	মূল শিরোনামের শতকরা হার	১৯৬৪ (অ-ডি)	৬৫ (জা-জুন)	৬৫ (জুলা-ডি)	৬৬ (জা-জুন)	৬৬ (জুলা-ডি)	৬৭ (জা-ডি)	৬৮ (জা-সে)	৬৮ (অ-ডি)	৬৯ (জা-মার্চ)	মোট
১. হরতাল	৪০	৩০.০০	-	-	-	১.০০	-	-	-	৩.৬৭	৭.৬৭	০.৭৪
২. ধর্মঘট	৪২৬	৩৫.৯২	১৮.৩৩	১৩.৬৭	১.৮৩	৩.৮৩	৫.৫০	৭.১৭	৭.৬৭	৬.৩৩	১৬.০০	৭.৮৯
৩. বিক্ষোভ মিছিল	২২৮	৩০.২৬	৪.৩৩	০.৮৩	০.৫০	২.৮৩	০.৬৭	২.০৮	২.১১	২০.৩৩	২৭.০০	৪.২২
৪. ঘেরাও	৩৮	১০.৫৩	৩.৩৩	০.১৭	-	০.৩৩	-	-	০.১১	১.০০	৭.০০	০.৭০
৫. জনসভা/প্রতিবাদ সভা	১১৬	২২.৪১	১.৩৩	১.১৭	০.৫০	১.৮৩	১.৬৭	০.৫৮	২.০০	৫.৬৭	১৩.০০	২.১৫
মোট	৮৪৮	৩১.১৩	২৭.৩২	১৫.৮৪	২.৮৩	৯.৮২	৭.৮৪	৯.৮৩	১১.৮৯	৩৭.০০	৭০.৬৭	১৫.৭০

রাজনৈতিক কর্মসূচীসমূহকে পাঁচটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। এগুলি হচ্ছে হরতাল, ধর্মঘট, বিক্ষোভ, ঘেরাও এবং জনসভা বা প্রতিবাদ সভা ইত্যাদি। এ ছাড়াওঅবশ্য বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক কর্মসূচী পালনের সংবাদ সে সময় প্রকাশিত হয়েছিল; যেমন, সামরিক কর্মবিরতি, প্রচারপত্র প্রকাশ, পোষ্টার প্রদর্শণী, সরকার-বিরোধী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সরকারী নীতিকে সমালোচনা করার লক্ষ্যে সেমিনার, সরকারী নীতির প্রতিবাদে অনুষ্ঠান বর্জন, সরকারী প্রতিনিধিকে শাস্তি প্রদান, সরকারী দলের গুন্ডামির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ প্রভৃতি। তবে যেসব সরকার-বিরোধী কর্মসূচী বিশেষভাবে ভূমিকা রেখেছিল সেসব থেকে শেষোক্তগুলিকে আলাদাভাবে দেখানো হয়েছে। ১৯৬৪ সালের ১লা অক্টোবর থেকে ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ, এপর্যন্ত সাড়ে চার বছরে আন্দোলনের মূল কর্মসূচী সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল মোট ৮৪৮ টি এবং সেগুলির শতকরা ৩১.১৩ ভাগ মূল শিরোনামের অধীন। এ কালপর্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হরতাল, ধর্মঘট, বিক্ষোভ মিছিল, ঘেরাও, এবং জনসভা বা প্রতিবাদ সভার সংবাদ সংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে ৪০,৪২৬, ২২৮, ৩৮ ও ১১৬। সারণি ৮.৯ থেকে দেখা যায়, ১৯৬৪ সালের শেষ দিকে আইয়ুব-বিরোধী গণআন্দোলনের সময় প্রতিমাসে উপরোক্ত ধরনের কর্মসূচীর খবর মাসে গড়ে ২৭.৩২টি করে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৬৫ সালের প্রথম ছয় মাসে এ ধরনের আন্দোলনের সংবাদ প্রকাশের সংখ্যা কিছুটা হ্রাস পেলেও মাসে গড়ে তার হার ছিল ১৫.৮৪টি কিন্তু ১৯৬৫ সালের শেষার্ধের এ ধরনের সংবাদ প্রকাশ বিশেষভাবে হ্রাস পায়, যার মাসিক গড় হার হচ্ছে ২.৮৪টি। তবে এর পরের ছয় মাসে প্রকাশিত এ ধরনের সংবাদ সংখ্যার মাসিক গড় হার হয় ৯.৮২টি। ১৯৬৬ সালের শেষার্ধে আন্দোলন সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশ কিঞ্চিৎ হ্রাস পেলেও ১৯৬৭ সালে তা ক্রমবর্ধমান হারে বাড়তে থাকে। ১৯৬৮ সালের শেষ তিন মাসে এ ধরনের আন্দোলনের সংবাদ মাসে গড়ে ৩৭টি করে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৬৯ সালের শুরু থেকে এ ধরনের সংবাদ প্রকাশের সংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে যায়, যার মাসিক গড় হচেছ ৭০.৬৭। অর্থাৎ ১৯৬৮ সালের শেষ দিকে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, প্রতিদিনই একাধিক আন্দোলনের সংবাদ প্রকাশিত হতে থাকে এবং '৬৯ সালের প্রথম তিন মাসে এ ধরনের খবর প্রতিদিন প্রায় তিনটি করে প্রকাশ পায়। উল্লেখ্য, ১৯৬৯ সালের ১৭ই জানুয়ারির আগে খুব বেশী কিছু ঘটেনি এবং ২৫শে মার্চের পরও তেমন কোন ঘটনার সংবাদ বের হয়নি। অর্থাৎ মাঝখানের ওই ৬৬ দিন ছিল পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসে ঘটনা বহুল সময়। এ সময় হরতালের সংবাদ বের হয়েছে গড়ে প্রতি তিন দিনে একবার, ধর্মঘটের সংবাদ প্রায় প্রতি দিন একবার, বিক্ষোভ মিছিলের সংবাদ প্রতিদিন একাধিকবার, ঘেরাও এর সংবাদও প্রতি তিন দিনে একবার, আর জনসভা বা প্রতিবাদ সভার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে প্রতি দু'দিনে একবার করে। স্মরণযোগ্য যে, দৈনিক আজাদের প্রথম পৃষ্ঠায়ই শুধু এত বিপুল সংখ্যক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। এ সময়ে প্রকাশিত দৈনিক আজাদের ভেতরের পৃষ্ঠাগুলি এ ধরনের সংবাদে ভর্তি থাকত।

জনসভা বা প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠানের সংবাদ ১৯৬৭ সালে এবং ১৯৬৫ সালের দ্বিতীয়াংশে অনেকটা কম প্রকাশিত হয়। উক্ত ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে এ কালপর্বে প্রায় সব সময়ই জনসভা বা প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৬৮ সালের গোড়া থেকেই তা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। বিক্ষোভ মিছিলের সংবাদ ১৯৬৪ সালের শেষ দিকে গড়ে মাসে ৮.৩৩টি প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু তার পর তা বিশেষভাবে হ্রাস পায় এবং '৬৬ সালের প্রথমাংশে একবার বেড়ে গিয়ে আবার কমে যায়। ১৯৬৭ সাল থেকে আবার বাড়তে থাকে এবং ১৯৬৮ সালের শেষ তিন মাসে এ ধরনের সংবাদ প্রকাশিত হয় যথাক্রমে মোট ৬১টি এবং ১৯৬৯ সালের শেষ তিন মাসে এ ধরনের সংবাদ প্রকাশ ৮১টিতে গিয়ে পৌছায়।

হরতালের সংবাদ কিন্তু উক্ত সাড়ে চার বছরে খুব একটা বেশী প্রকাশিত হয়নি। ১৯৬৪ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত একটি হরতালের সংবাদও প্রকাশিত হয়নি। বস্তুত; ১৯৬৬ সালের মে মাস পর্যন্ত হরতাল সংক্রান্ত কোন সংবাদই প্রকাশিত হয়নি। হরতালের ব্যাপারটি সে সময় পর্যন্ত সত্যি একটি সাংঘাতিক সংবাদ হিসাবেই মনে করা হত। হরতাল এমন একটি

Dhaka University Institutional Repository

কর্মসূচী যা দেশের সকল কর্মকান্ড বন্ধ করে দেবে আর ক্ষমতাসীন সরকার এর বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবে না -- আইয়ুব সরকারের কাছে এটা ছিল এক বিস্ময়কর ঘটনা। আর এ কারণেই গণনির্যাতন এত তীব্র হয় যে, পরবর্তী ৩০ মাসে হরতালের কোন সংবাদ আজাদের প্রথম পাতায় স্থান পায়নি। কিন্তু ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর থেকে প্রকাশিত হরতালের সংবাদ ক্রমাগত বাড়তে থাকে, কোন অত্যাচারই আর এ ধরনের কর্মসূচীকে বন্ধ করতে পারেনি। তবে ধর্মঘটের ক্ষেত্রে কিছু উল্টো ব্যাপার ঘটেছে। একমাত্র ১৯৬৫ সালের শেষ ৬ মাস ছাড়া পুরো সময়টাই ছিল ধর্মঘটের সংবাদে পরিপূর্ণ। ১৯৬৪ সালের শেষ তিন মাসে মোট ৫৫ বার ধর্মঘটের সংবাদ প্রকাশিত হয়ে। এর অর্থ এ সময়ে প্রতিমাসে গড়ে ১৬.৩৩ বার ধর্মঘটের সংবাদ আজাদের প্রথম পাতায় স্থান পায়। এ ধর্মঘটগুলি এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, এর শতকরা প্রায় ৩৬ ভাগ সংবাদ মূল শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

সারণি ৮.১০

ধর্মঘট বিষয়ক সংবাদের মাসিক গড় সংখ্যা

বিষয়	মোট শিরোনাম সংখ্যা	মূল শিরোনামের শতকরা হার	১৯৬৪ (অ-ডি)	৬৫ (জা-জুন)	৬৫ (জুলা-ডি)	৬৬ (জা-জুন)	৬৬ (জুলা-ডি)	৬৭ (জা-ডি)	৬৮ (জা-সে)	৬৮ (অ-ডি)	৬৯ (জা-মার্চ)	মোট
১. ছাত্র	১০৬	২৩.৫৮	৩.৬৭	১.১৭	০.৩৩	১.৩৩	০.৬৭	১.২৫	৪.২২	১.০০	৬.০০	১.৯৬
২. কারখানা শ্রমিক	১০৫	৩০.৪৮	৫.৩৩	১.৮৩	০.৮৩	০.৩৩	১.৫০	৩.০০	২.০০	০.৬৭	২.০০	১.৯৪
৩. অন্যান্য শ্রমিক	৪২	৬৯.০৫	–	০.৮৩	০.৫০	০.৬৭	০.৩৩	০.৯২	১.১১	১.০০	২.৬৭	০.৭৮
৪. কর্মচারী	১১৫	৪৬.০৯	০.৬৭	৯.৫০	০.১৭	০.৬৭	২.৮৩	১.৪২	০.২২	২.০০	১.৩৩	২.১৩
৫. মধ্যবিত্ত	৬০	২৬.৬৭	৮.৬৭	০.৩৩	–	০.৮৩	০.৩৩	০.৫৮	০.১১	১.৬৭	৪.৬৭	১.১১
মোট	৪২৬	৩৫.৯২	১৮.৩৩	১৩.৬৭	১.৮৩	৩.৮৩	৫.৫০	৭.১৭	৭.৬৭	৬.৩৩	১৬.০০	৭.৮৯

উক্ত সাড়ে চার বছরে যে বিপুল সংখ্যক ধর্মঘটের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল তা যে সব সময় সকল শ্রেণী বা পেশার মানুষ সমভাবে ঘটিয়েছিল তা কিন্তু নয়। ছাত্রসমাজের ধর্মঘটের কথা সুবিদিত, কিন্তু তারাও যে সে সময় সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হওয়ার মত সবচেয়ে বেশী সংখ্যক ধর্মঘট অনুষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল তা নয়। এ সময় অফিস-আদালতের কর্মচারীদের ধর্মঘট সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল । সে সময় শুধু মাত্র কর্মচারীদের ধর্মঘটের সংবাদই ১১৫ বার প্রকাশিত হয়েছিল। কর্মচারীদের ধর্মঘটের সংবাদের দিকে লক্ষ্য করলে আরো একটি বিশেষ দিকও ফুটে ওঠে। ধর্মঘট বিষয়ক সংবাদের সমবায়ে তৈরি করা সারণি ৮.১০ থেকে দেখা যায়, দেশে যখন গণজোয়ার ওঠে বা রাজনৈতিক দলগুলি যখন আন্দোলনের কর্মসূচী দেয় তখন কিন্তু এর সাথে তাল মিলিয়ে কর্মচারিগণ ধর্মঘট শুরু করতো না, বরং রাজনৈতিক আন্দোলনের ওপর যখন চরম দমন-পীড়ন শুরু হয়েছে ঠিক তখনই তারা তাঁদের দাবী-দাওয়া নিয়ে ধর্মঘট শুরু করেছে। ১৯৬৫ সালের ৩রা জানুয়ারি তারিখে প্রেসিডেন্ট 'নির্বাচন' সমাপ্তির পর যখন বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির ওপর সরকার প্রচন্ড নির্যাতন শুরু করে ঠিক সে সময়ে কর্মচারীরা এক ব্যাপক আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়। ১৯৬৫ সালেরপ্রথমার্ধে মাসে গড়ে ৯.৫০টি করে কর্মচারীদের ধর্মঘটের সংবাদ প্রকাশিত হয়। আবার ১৯৬৬ সালের ৭ই জুনের হরতালের পর যখন আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ওপর প্রচন্ড দমনপীড়ন শুরু হয় তখন তারা লাগাতার ধর্মঘট শুরু করে। এভাবে তারা বার সরকারের দমনপীড়নের মুখে সাময়িক স্তব্ধতাকে তারা ভেঙ্গে দেয়। আর এদের ধর্মঘটগুলি খুবই গুরুত্ব বহন করতো বলেই তাদের ধর্মঘটের শতকরা ৪৬.০৯ ভাগ সংবাদ মূল শিরোনাম আকারেই প্রকাশিত হয়। অবশ্য সব চেয়ে বেশী গুরুত্ব পেয়েছিল কারখানার শ্রমিক নয় এমন বাস, ট্রাক, রিক্সা, কুলি, খালাসি ইত্যাদি ধরনের শ্রমিকদের ধর্মঘটের সংবাদগুলি। যদিও তাদের ধর্মঘট সংখ্যা বেশী প্রকাশিত হয়নি তবু যে ৪২টি ধর্মঘটের সংবাদ সে সময় বের হয়েছিল। তার মধ্যে শতকরা ৬৯.০৫ ভাগ সংবাদই মূল শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল। কারণ এ সকল শ্রমিকদের প্রতিটি ধর্মঘটই জনসাধারণের জীবনযাত্রার ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলত। ছাত্রদের ধর্মঘটেরও একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় এবং তা হল এই যে,যখন সমগ্র রাজনৈতিক অঙ্গন সরকারী সন্ত্রাসের মুখে স্তব্ধ কিংবা কি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে বুঝে উঠতে পারছেনা, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দিয়ে সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগকে প্রায় ছিন্ন ভিন্ন করে দেওয়া হয়েছে, অন্যান্য রাজনৈতিক দলও ভয়ে কোন কর্মসূচী দিতে পারছেনা, ঠিক তখন ছাত্রসমাজ একের পর এক ধর্মঘট করে সেই ভীতিকর রাজনৈতিক স্তব্ধতাকে ভেঙ্গে দিয়েছে। ছাত্রসমাজ ১৯৬৮ সালের প্রথম নয় মাস এমনভাবে তাদের কর্মকান্ড নিয়ে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল যে, এ সময় প্রতি মাসে গড়ে ৪.২২টি ছাত্র ধর্মঘটের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

ধর্মঘটের সংবাদ প্রকাশ সংখ্যার দিক থেকে ছাত্রদের অবস্থান দ্বিতীয় এবং তার পরই কারখানায় কর্মরত শ্রমিক শ্রেণী। উক্ত কালপর্বে ১০৬টি ছাত্র ধর্মঘটের সংবাদ প্রকাশিত হয়, আর কারখানা শ্রমিকদের ধর্মঘটের সংবাদ সংখ্যা ছিল ১০৫টি। অন্যান্য শ্রমিকের ধর্মঘটের সংবাদকে যোগ করলে শ্রমিকশ্রেণীর ধর্মঘটের সংবাদই সবচেয়ে বেশী প্রকাশিত হয়েছে। ফলে উক্ত সাড়ে চার বছরে যদি ধর্মঘটের সংবাদ সমাজের সাধারণ মানুষের মাঝে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকে তাহলে শ্রমিকশ্রেণীর অবদান সেক্ষেত্রে সর্বাধিক। কর্মচারী, শিক্ষক ও সাংবাদিকসহ বিভিন্ন মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তবে তারা রাজনৈতিক পরিস্থিতিকেই অনুসরন করেছে। রাজনৈতিক আন্দোলনের গতি যখন বেড়েছে তখন এ সকল মধ্য বিত্তের আন্দেলনের গতিও বেড়ে গেছে। উক্ত ব্যাপক সংখ্যক ধর্মঘটের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সবাই কিন্তু রাজনৈতিক ঘটনাকে অনুসরণ করেনি। কর্মচারী ও ছাত্রদের মত কারখানার শ্রমিকরাও রাজনৈতিক ঘটনাকে অনুসরণ না করে রাজনৈতিক কর্মকান্ডের উৎস মুখ খুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের ধর্মঘটগুলি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল। বিশেষতঃ ১৯৬৭ সালে যখন রাজনৈতিক অঙ্গণসহসকল ক্ষেত্রে স্তব্ধতা বিরাজ করছিল ঠিক তখন কারখানা শ্রমিকরা এক প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে। এবছর একমাত্র কারখানা শ্রমিকদের ধর্মঘটের সংবাদ ৩৬ বার প্রকাশিত হয়।

শুধু ধর্মঘট নয়, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ যে সে সময় গণদরখাস্ত, স্মারকলিপি প্রদান, প্রচারপত্র প্রকাশ, সরকারী কোন নীতির সমালোচনা করার লক্ষ্যে সেমিনার অনুষ্ঠান বা এ জাতীয় বিভিন্ন ধরনের সরকার-বিরোধী ভূমিকা পালন করেছিল সেগুলি সম্পর্কে প্রকাশিত সংবাদও জনসাধারণের চেতনা ও মনোভাবের ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। কেননা উক্ত সাড়ে চার বছরে এ ধরনের ৩০৫টি সংবাদ আজাদের প্রথম পাতায় প্রকাশিত হয় এবং প্রকাশের হার কখনও কখনও বেশ উঁচুতে উঠে। ১৯৬৭ সালে রাজনৈতিক কর্মকান্ড প্রায় স্তব্ধ; আওয়ামী লীগের প্রায় সকল নেতা জেলে থাকায় তাঁরা তেমন কোন ভূমিকা পালনে সক্ষম হচ্ছেনা, উপরন্তু তারা দ্বিধাবিভক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

পিডিএম কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে না পেরে হতাশ ও নিষ্ক্রিয়। অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে ন্যাপ ঐক্যবদ্ধভাবে কোন কাজই করতে পারছেনা। ফলে ঘটনাহীন এ বছরে দৈনিক আজাদের প্রথম পাতার শিরোনামগুলিতে শুধু বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের কর্মকান্ড সম্পর্কিত সংবাদই প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৬৭ সালে যখন দেশে প্রত্যক্ষ আন্দোলন বলতে তেমন কিছু নেই, সমস্ত রাজনৈতিক অঙ্গণ হতাশা আর আশংকায় নিমজ্জিত সে সময় এ ধরনের ছোট খাট প্রতিবাদের সংবাদ ঘন ঘন প্রকাশিত হতে থাকে। সারণি ৮.১১ থেকে দেখা যায়, ১৯৬৭ সালে ছাত্রদের দ্বারা সংঘটিত এ ধরনের মোট ২৬টি ঘটনার সংবাদ প্রকাশিত হয়। আর এ সময়ে শ্রমিকশ্রেণী সৃষ্ট ঘটনার ২০টি সংবাদ প্রকাশ পায়। উক্ত সাড়ে চার বছরে এই ছোট-খাটো আন্দোলনের যেসব সংবাদপ্রকাশিত হয় সেসবের মধ্যে ছাত্রসমাজ সৃষ্ট ঘটনার সংবাদ ১১৩টি, শ্রমিকশ্রেণীর সৃষ্ট সংবাদের সংখ্যা ৭৪টি এবং সাংবাদিকদের ঘটানো সংবাদ সংখ্যা ৩৬টি। এছাড়া কর্মচারী, শিক্ষক, শিল্পপতি, কৃষক এবং অন্যান্য শ্রেণী ও পেশার মানুষের দ্বারা সংঘটিত ঘটনার সংবাদ সংখ্যা ছিল ৮৩টি। ১৯৬৯ সালের প্রথম তিন মাসেই এ ধরনের সর্বমোট ৬৩টি সংবাদ প্রকাশিত হয় ।

সারণি ৮.১১
বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের সরকার বিরোধী ভূমিকা

বিষয়	১৯৬৪ (অ-ডি)	৬৫ (জা-জুন)	৬৫ (জুলা-ডি)	৬৬ (জা-জুন)	৬৬ (জুলা-ডি)	৬৭ (জা-ডি)	৬৮ (জা-সে)	৬৮ (অ-ডি)	৬৯ (জা-মার্চ)	মোট
১. ছাত্র	১০	১৬	৭	১২	১	২৬	১৪	৭	২০	১১৩
২. শ্রমিক	৫	৬	৪	১৩	৬	২০	১১	৩	৬	৭৪
৩. কর্মচারী	২	-	-	১	৩	৩	১	-	৭	১৭
৪. শিক্ষক	১	১	-	-	১	-	২	-	৪	৯
৫. সাংবাদিক	৩	১	২	২	-	৪	৫	৩	১৬	৩৬
৬. শিল্পপতি	-	১	-	-	-	-	৭	২	৩	১৩
৭. কৃষক	১	-	-	১	-	২	১	২	-	৭
৮. অন্যান্য	২	২	১	২	৫	৫	৮	৪	৭	৩৬
মোট	২৪	২৭	১৪	৩১	১৬	৬০	৪৯	২১	৬৩	৩০৫

উপরোক্ত অসংখ্য ঘটনার সংবাদ প্রকাশের ফলে সাধারণ মানুষ যেমন সচেতন হয়ে উঠেছিল ঠিক তেমনই তারা অনেকটা নিজের অজান্তেই কোন না কোন রাজনীতির পক্ষে মেরুভূত হয়ে যায়। ১৯৬৪ সালের ১লা অক্টোবর থেকে ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চের মধ্যে বেশ কয়েকটি নতুন জোট গঠিত হয়েছে, কয়েকটি দল ভেঙ্গে নতুন দলের জন্ম হয়েছে। রাজনীতি নিয়ে অসংখ্য বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সে সবের মধ্য দিয়েই জনসাধারণের মেরুকরণ প্রক্রিয়াটি অগ্রসর হয়েছে। তবে যে সকল দল ও জোটের সংবাদ সে সময় দৈনিক আজাদ-এ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি জনসাধারণের চেতনার ওপর কি প্রভাব ফেলেছে তা বিবেচনার আগে একটি বিশেষ দিক স্পষ্ট করে নেওয়া প্রয়োজন। আর সে দিকটি হল বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোট সম্পর্কে দৈনিক আজাদ পত্রিকার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দৈনিক আজাদ ছিল ক্ষমতাচ্যুত মুসলিম লীগ দলের প্রায় নিজস্ব মুখপত্র। রাজনৈতিক বিশ্বাষের দিক থেকে ছিল এটি একটি পাকিস্তানবাদী সংবাদপত্র। উপরন্তু, তৎকালীন জাতীয় পরিষদের বিরোধী দলের নেতা নূরুল আমিন ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগের মূল প্রতিনিধি। ১৯৬২ সালে সোহরাওয়ার্দীর প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের ধারণার তিনি ছিলেন অন্যতম মুখপাত্র। আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে একজন শক্তিশালী প্রেসিডেন্ট প্রার্থী দাঁড় করানোর ব্যাপারে যারা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং সম্মিলিত বিরোধী দল গড়ে তুলেছিলেন তাদের মধ্যে নূরুল আমিন ছিলেন অন্যতম। অধিকাংশ দল যখন স্বনামে আত্মপ্রকাশ করে, তখন বিভিন্ন দল থেকে নেতা ও কর্মীসহ পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের নেতৃত্বাধীন যে জোটটি ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিকফ্রন্ট (এন.ডি.এফ) নামে ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ পর্যন্তও টিকে ছিল তার নেতা ছিলেন নূরুল আমিন। এমনকি, ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি যখন কয়েকটি দল ও জোট মিলে পাকিস্তান ডেমোক্রাটিক মুভমেন্ট (পিডিএম) গঠিত হয় তখনও পূর্ব পাকিস্তানে এর প্রধান নেতা ছিলেন নূরুল আমিন। শুধু তাই নয়, ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে যখন একমাত্র ভাসানী ন্যাপ ছাড়া প্রায় অন্যান্য সকল দল নিয়ে ডেমোক্রাটিক অ্যাকশন কমিটি গঠিত তয় তখনও এর সাথে এন.ডি.এফ নেতা নূরুল আমিন জড়িত ছিলেন। তাই তখন নূরুল আমিন সমর্থক দৈনিক আজাদে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলসমূহের প্রভাব সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হলে উপরোক্ত বিষয়গুলি মনে রাখা প্রয়োজন। ইতি পূর্বেকার আলোচনা থেকে এটা খুই স্পষ্ট যে, আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পর এন.ডি.এফ তখন পাকিস্তানের রাজনীতিতে প্রধান ধারা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। এমনকি, যখন পাঁচটি সর্ব পাকিস্তানভিত্তিক দলের সমন্বয়ে পিডিএম গঠিত হয় তখনও এটি অন্যতম প্রধান দু'টি রাজনৈতিক ধারার মধ্যে একটি হয়ে উঠতে পারেনি। অর্থাৎ আওয়ামী লীগ এবং ন্যাপই দু'টি প্রধান ধারা হিসাবে রয়ে যায়। কিন্তু আজাদে প্রকাশিত সংবাদ সংখ্যার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এনডিএফ ছিল একটি অন্যতম ধারা। অন্যদিকে, আজাদ গ্রামীণ এলাকার খবরা-খবর খুব একটা প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করতো না। ফলে কিছুটা গ্রাম ভিত্তিক সংগঠন ন্যাপের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তৎপরতা আজাদের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়নি। তা সত্ত্বেও 'সংবাদ' কিংবা 'ইত্তেফাক' এর মত 'আজাদ' দেশের প্রধান দু'টি রাজনৈতিক ধারার মধ্যে পক্ষপাতিত্ব করতো না। ফলে আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ সম্পর্কে একটি নিরপেক্ষ ধারণা পেতে হলে আজাদের সংবাদগুলি মোটামুটি গ্রহণযোগ্য। তাই উক্ত পত্রিকায় বিভিন্ন দলও জোট বিষয়ক প্রকাশিত সংবাদ কিভাবে সে সময় জনসাধারণের উপর প্রভাব ফেলেছিল তা বিবেচনা করা হবে।

সারণি ৮.১২ থেকে দেখা যায়, ১৯৬৮ সালের ১লা অক্টোবর থেকে ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ পর্যন্ত সাড়ে চার বছরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোট সংক্রান্ত মোট ১০০১টি সংবাদ "আজাদের' প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছিল। এসব সংবাদে শতকরা ১৩.১৯ ভাগ মূল শিরোনামে প্রকাশিত হয় । এই কালপর্বে রাজনৈতিক ধারা হিসাবে আওয়ামী লীগ সম্পর্কে, সর্বাধিক সংখ্যক সংবাদ প্রকাশিত হয় যার সংখ্যা ছিল ২২৪টি। এর পরই এন.ডি.এফ সংক্রান্ত বেশী সংবাদ প্রকাশিত হয়, যার সংখ্যা ২১০টি। এর পর আসে ন্যাপ ((ন্যাপ ভাঙ্গনের পর ন্যাপ ভাসানীকে মূল ধারা হিসাবে গণ্য করা হয়েছে) সংক্রান্ত সংবাদ যার সংখ্যা ১৯৩। এন.ডি.এফ এর ব্যাপারে 'আজাদ' কত পক্ষপাতিত্ব পূর্ণ সংবাদ প্রকাশ করতো তা বোঝা যায়, ১৯৬৬ সালের শেষ তিন মাসে যখন সম্মিলিত বিরোধী দলের নেতৃত্বে দেশে একটি আইয়ুব সরকার-বিরোধী আন্দোলন চলছিল তখনও মাসে গড়ে সর্বাধিক সংখ্যক সংবাদ এন.ডি.এফ সম্পর্কে প্রকাশিত হয়। এ সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোট সম্পর্কে মাসে গড়ে যে ৩৮টি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যে এন.ডি.এফ সংক্রান্ত সংবাদ ছিল ১৯টি। অথচ এ জোটের সবচেয়ে বড় দুই অংশিদার আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিমাসে গড়ে যথাক্রমে ৩টি ও ১.৬৭টি। অবশ্য, প্রতিমাসে গড়ে সম্মিলিত বিরোধী দল সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশিত হয় ১৩.৩৩টি করে। তবে এ পক্ষপাতিত্ব সত্ত্বেও পরবর্তীকালে এন.ডি.এফ এমন ঘটনা খুব বেশী ঘটাতে পারেনি যা সংবাদপত্রে প্রকাশ হতে পারে। ফলে ১৯৬৫ সালের প্রথমাংশে গড়ে প্রতি মাসে ১২.১৭টি করে সংবাদ প্রকাশিত হলেও তা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে এবং তা কমে ১৯৬৬ সালের শেষার্ধে ১.৬৭টিতে দাঁড়ায়। এন.ডি.এফ সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশের সংখ্যা পরবর্তীকালে আর মোটেই বাড়েনি এবং ১৯৬৮ সালের শেষ নাগাদ মাসে গড়ে ০.৬৭টিতে উপনীত হয়। সেরূপ, সম্মিলিত বিরোধী দলের সংবাদ ১৯৬৫ সালের প্রথমার্ধেও মাসে গড়ে ১৩.৩৩টি করে প্রকাশিত হলেও হঠাৎ তা শূন্যের কোঠায় চলে যায়, যদিও সে সময় সম্মিলিত বিরোধী দল হিসাবে জাতীয় পরিষদের মধ্যে তার অস্তিত্ব ছিল। অন্যদিকে, আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের ক্ষেত্রে ঘটনাটি ঘটেছে উল্টো। আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রে কিছু উত্থান-পতন ঘটলেও ১৯৬৬ সালে ৬ দফা উত্থাপণ করার পর এ দল এমনই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যে, যে কোন ধরনের বিষয় নিয়েই আওয়ামী লীগের সংবাদ তখন নিয়মিত প্রকাশিত হত। ১৯৬৬ সালের প্রথমাংশে আওয়ামী লীগ অসংখ্য ঘটনা ঘটায়, আর সে কারণেই এ সময়ে আওয়ামী লীগ সংক্রান্ত সংবাদ মাসে গড়ে ১০টি করে প্রকাশিত হতে থাকে। কিন্তু '৬৬ সালের জুনের পর উহার অধিকাংশ নেতা জেলে বন্দী থাকায় সাংগঠনিক তৎপরতা মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। আমেনা বেগম কোনক্রমে আওয়ামী লীগের কর্মীদের সাথে যোগাযোগটা বজায় রাখেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' রুজু করার পূর্ব পর্যন্ত আওয়ামী লীগের অসংখ্য সংবাদ প্রকাশিত হতে থাকে। ন্যাপের ক্ষেত্রে বিষয়টি অন্য রকম ঘটেছে। ১৯৬৪ সালের পর যত দিন অতিক্রান্ত হয়েছে ততই ধীরে হলেও ন্যাপ বিষয়ক সংবাদ বেশী হারে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৬৪ সালের শেষ তিন মাসে আওয়ামী লীগ সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল যেখানে ৯টি সেখানে ন্যাপ সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল মাত্র পাঁচটি। এর পর থেকে আওয়ামী লীগ সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশের হার ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে এবং ১৯৬৫ সালের শেষাংশে উহার প্রকাশিত সংবাদ সংখ্যা ছিল মাসিক গড়ে মাত্র ১.৩৩টি। কিন্তু (ভাসানী) সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশ সংখ্যা একমাত্র '৬৬ সালের শেষাংশের কথা বাদ দিলে ক্রমাগত বাড়তে থাকে। ১৯৬৭ সালে ন্যাপ সংক্রান্ত সংবাদ গড়ে প্রতিমাসে ৩.৩৩টি করে প্রকাশিত হয়, '৬৮ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই একই হার বলবৎ থাকে এবং এরপর তার সংবাদ প্রকাশ সংখ্যা হঠাৎ করে বেড়ে যায়। ১৯৬৮ সালের শেষ চতুর্থাংশে ন্যাপ (ভাসানী) সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশিত হয় গড়ে প্রতিমাসে ১০.৩৩টি করে এবং ১৯৬৯ সালে ন্যাপ (ভাসানী) সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশ সংখ্যা আরো বেড়ে গিয়ে মাসিক গড়ে ১৩.৩৩তে দাঁড়ায়। উল্লেখ্য, যে ১৯৬৮ সালের প্রথম দিকে ন্যাপ ভেঙ্গে যায়। উপরে তার ১৯৬৮ সালের পর থেকে যে সংবাদ প্রকাশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা শুধুমাত্র ন্যাপ (ভাসানী)-এর কথাই বলা হয়েছে। এ সময় যে ন্যাপের অপর অংশের কোন সংবাদ প্রকাশিত হয়নি তা নয়, বরং অনেক পুরোনো দল বা জোটের চেয়ে অনেক বেশী হারে এর সংবাদ প্রকাশিত হয়। ১৯৬৮ সালের প্রথম নয় মাসে ন্যাপ (ওয়ালী) সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশিত হয় গড়ে প্রতি মাসে ১.১১টি করে, কিন্তু তারপর এর সংবাদ প্রকাশ সংখ্যা হঠাৎ করে বেড়ে যায়। ১৯৬৮ সালের শেষ তিন মাসে এটি ন্যাপ (ভাসানী)র সাথে যেন পাল্লা দিয়ে কাজ করতে থাকে এবং সেজন্য এর কর্মকান্ড সংক্রান্ত সংবাদ এ সময় গড়ে প্রতিমাসে ৫.৬৭টি করে প্রকাশিত হয়। এমনকি, ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে ডেমোক্রাটিক অ্যাকশন কমিটি (ডাক) গঠিত হওয়ার পরও ন্যাপ (ওয়ালী) এককভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে খুবই সক্রিয় ছিল। সম্ভবতঃ এ কারণেই এ সময় আওয়ামী লীগ সংক্রান্ত সংবাদ যেখানে মাসে মাত্র ১.৩৩টি করে প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানে ন্যাপ (ওয়ালী) সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল মাসে গড়ে ৩.৬৭টি করে। ডাক-এর সংবাদও এ তিনমাসে মোট ১২ বার প্রকাশিত হয়েছিল,যার মাসিক প্রকাশের গড় সংখ্যা ছিল ৪। এ ছাড়া, সে সময় কাউন্সিল মুসলিম লীগ, কনভেনশন মুসলিম লীগ ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল সংক্রান্ত বেশ কিছু সংবাদ প্রকাশিত হয়, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে উক্ত দলসমূহের সংবাদ প্রকাশের হারে কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

সারণি ৮.১২
রাজনৈতিক দল ও জোট বিষয়ক সংবাদের মাসিক গড়

রাজনৈতিক দল বা জোটের নাম	মোট শিরোনাম সংখ্যা	মূল শিরোনামের শতকরা হার	১৯৬৪ (অ-ডি)	৬৫ (জা-জুন)	৬৫ (জুলা-ডি)	৬৬ (জা-জুন)	৬৬ (জুলা-ডি)	৬৭ (জা-ডি)	৬৮ (জা-সে)	৬৮ (অ-ডি)	৬৯ (জা-মার্চ)	মোট
১. আওয়ামী লীগ	২২৪	৯.৮২	৩.০০	২.০০	১.৩৩	১০.০০	৬.৫০	৫.২৫	১.৬৭	৪.৬৭	১.৩৩	৪.৯৫
২. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী)	১৯৩	১৩.৪৭	১.৬৭	২.০০	২.১৭	২.১৭	১.৫০	৩.৩৩	৩.৩৩	১০.৩৩	১৩.৩৩	৩.৫৭
৩. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী)	৩৮	০	-	-	-	-	-	-	১.১১	৫.৬৭	৩.৬৭	১.১৩
৪. সম্মিলিত বিরোধী দল (কপ)	১৩৩	২৪.০৬	১৩.৩৩	১৩.৩৩	০.১৭	১.১৭	০.১৭	০.১৭	০.১১	০.৩৩	০	২.৪৬
৫. ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এনডিএফ)	২১০	৮.৫৭	১৯.০০	১২.১৭	২.৫০	৪.৬৭	১.৬৭	১.১৭	১.০০	০.৬৭	০.৬৭	৩.৮৯
৬. পাকিস্তান ডেমোক্রাটিক মুভমেন্ট (পিডিএম)	৬৬	১৬.৬৭	-	-	-	-	-	২.৮৩	১.৮৮	১.০০	৩.০০	২.৪৪
৭. ডেমোক্রাটিক এ্যাকশন কমিটি (ডাক)	১২	৩৩.৩৩	-	-	-	-	-	-	-	-	৪.০০	৪.০০
৮. মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	৩৭	২৪.৩২	০.৩৩	০.৩৩	০.৫০	০.৩৩	১.১৭	১.০৮	০.৩৩	১.৩৩	০.৬৭	০.৬৯
৯. মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	৩৭	১৮.৯২	০.৬৭	২.৫০	০.৬৭	০.৫০	০.৩৩	০.২৫	০.৩৩	০.৬৭	১.০০	০.৬৯
১০. অন্যান্য	৫১	৪.১৭	০	০.৮৩	১.০০	২.০০	১.১৭	০.৬৭	০.৫৬	১.৩৩	১.০০	১.৩৩
মোট	১০০১	১৩.১৯	৩৮.০০	৩৩.১৭	৮.৩৩	২১.০০	১২.৫০	১৪.৭৫	১০.৩৩	২৪.৩৩	৩১.৩৩	১৮.৫৪

উপরোক্ত বিবরণ থেকে দেখা যায়, উনসত্তরের গণঅভ্যুথানের সময় কিংবা তার কিছু আগে থেকে আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ (ভাসানী) ছিল প্রধান দু'টি ধারা। তাই এ দু'টি রাজনৈতিক ধারার কর্মকান্ড সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেলে প্রকাশিত সংবাদে জনসাধারণের চেতনায় কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সে বিষয়েও সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে।

আগেই দেখা গেছে পুরো '৬৬ ও '৬৭ সাল জুড়ে আওয়ামী লীগ সংক্রান্ত সংবাদ বিপুল সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৬৪ সালের ১লা অক্টোবর থেকে ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ পর্যন্ত এদল সম্পর্কে যে ২২৮টি সংবাদ প্রকাশিত হয় তার মধ্যে '৬৬' ও ৬৭ সাল এই দুই বছরেই শতকরা ৭২ ভাগেরও বেশী সংবাদ প্রকাশিত হয়। সারণি ৮.১৩ থেকে দেখা যায়, আওয়ামী লীগ সংক্রান্ত প্রকাশিত সংবাদের মধ্যে সর্বাধিক হচ্ছে সাধারণ সংবাদ, যার সংখ্যা ৫৩। এর পরই আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত বক্তব্য নিয়ে এ দলের সবচেয়ে বেশীসংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, যার মোট সংখ্যা ৩৯। সরকার ও তার কর্মকর্তা সম্পর্কে আওয়ামী লীগের প্রতি সমালোচনাসূচক বক্তব্য

Dhaka University Institutional Repository

নেহায়েৎ কম ছিল না। আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কর্মসূচী তথা আন্দোলন সংক্রান্ত সংবাদ সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। গণনির্যাতনের প্রতিবাদ ও বন্দী-মুক্তির দাবী বিষয়ক সংবাদও প্রচুর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। গণনির্যাতন বন্ধ, বন্দী মুক্তির দাবী ও আন্দোলনের কর্মসূচী সংক্রান্ত মোট সংবাদ সংখ্যা ছিল ৭৯টি। কিন্তু কৃষক-শ্রমিকের দাবীর সপক্ষে কিংবা দ্রব্য-মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ যে বক্তব্য প্রকাশ করেছিল তার সংখ্যা ছিল খুবই সামান্য, মাত্র ৬টি।

সারণি ৮.১৩
আওয়ামী লীগ বিষয়ক সংবাদ

	১৯৬৪ (অ-ডি)	৬৫ (জা-জুন)	৬৫ (জুলা-ডি)	৬৬ (জা-জুন)	৬৬ (জুলা-ডি)	৬৭ (জা-ডি)	৬৮ (জা-সে)	৬৮ (অ-ডি)	৬৯ (জা-মার্চ)	মোট
১. সাধারণ সংবাদ	-	১	৩	৩	৬	২৫	৮	৫	২	৫৩
২. আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন	-	১	৩	১৭	৬	৭	৩	১	১	৩৯
৩. গণনির্যাতন বিরোধী	২	২	-	৭	৩	৫	৩	২	-	২৪
৪. বন্দী মুক্তির দাবী	-	-	-	২	৭	১৫	-	১	১	২৬
৫. সরকার ও তার কর্মকর্তাদের সমালোচনা	৫	৫	-	৯	২	৭	-	৫	-	৩৩
৬. রাজনৈতিক কর্মসূচী	-	১	১	১৫	১০	২	-	-	-	২৯
৭. শ্রমিক-কৃষকের দাবীর সপক্ষে	২	-	-	-	-	-	-	-	-	২
৮. দ্রব্যমূল্য উর্ধগতি বিরোধী	-	-	-	১	৩	-	-	-	-	৪
৯. অন্যান্য*	-	২	১	৬	২	২	১	-	-	১৪
মোট	৯	১২	৮	৬০	৩৯	৬৩	১৫	১৪	৪	২২৪

*ভিন্ন কোন রাজনৈতিক দলের সমালোচনা, শৃংখলা ভঙ্গকারীদের বহিস্কারএবং জোট গঠনের উদ্যোগ সংক্রান্ত সংবাদ।

উপরোক্ত বিবরণ থেকে দেখা যায়, বিপুল সংখ্যক সাধারণ সংবাদ বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের বক্তব্য ও তার কর্মকান্ডভিত্তিক সংবাদের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, তাদের বক্তব্যের ও কর্মকান্ডের শতকরা প্রায় ২৩ ভাগ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবীর সপক্ষে, শতকরা ৪৮.৫৪ ভাগ সরকারের গণনির্যাতনমূলক কর্মকান্ডের প্রতিবাদ এবং সরকারও তার কর্মকর্তাদের কাজের সমালোচনা এবং শতকরা ১৭ ভাগ সংবাদ তাদের আন্দোলন সংক্রান্ত। অবশিষ্ট ১১.৭০ ভাগ হচ্ছে অন্যান্য বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত। অর্থাৎ আওয়ামী লীগের সাধারণ সংবাদ বাদ দিলে দেখা যায় তার কর্মকান্ড সংক্রান্ত প্রকাশিত সংবাদের শতকরা ৮৮ ভাগের বেশী হচ্ছে সরকারের সরাসরি সমালোচনা সংক্রান্ত সংবাদ। সরকারকে প্রধান দু'টি বিষয়ে সমালোচনা করা হয়েছে-- একটি হচ্ছে স্বায়ত্বশাসনের দাবী এবং অপরটি হচ্ছে গণনির্যাতন প্রতিরোধের দাবী -- যার প্রত্যেকটিই সরকারকে সরাসরি আঘাত করে। অপরপক্ষে, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী) সংক্রান্ত সংবাদের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, আওয়ামী লীগ থেকে তার অবস্থান সম্পূর্ণ ভিন্ন।

সারণি ৮.১৪
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী) বিষয়ক সংবাদ

	১৯৬৪ (অ-ডি)	৬৫ (জা-জুন)	৬৫ (জুলা-ডি)	৬৬ (জা-জুন)	৬৬ (জুলা-ডি)	৬৭ (জা-ডি)	৬৮ (জা-সে)	৬৮ (অ-ডি)	৬৯ (জা-মার্চ)	মোট
১. সাধারণ সংবাদ	-	৫	৩	৩	২	৭	৬	-	৩	২৯
২. আপোসকামিতার বিরুদ্ধে	-	-	-	-	২	২	-	৩	৭	১৪
৩. গণনির্যাতন বিরোধী	-	-	১	২	-	১২	৫	৭	৮	৩৫
৪. বন্দী মুক্তির দাবী	-	-	-	-	-	৩	১	২	-	৬
৫. সরকার ও তার কর্মকর্তাদের প্রতি সমালোচনা	৪	১	-	-	১	৩	১	৩	৩	১৬
৬. রাজনৈতিক কর্মসূচী	১	৩	২	২	২	৪	১	৮	৯	৩২
৭. শ্রমিক-কৃষকের দাবীর সপক্ষে	-	৩	-	-	১	৫	৭	৫	৭	২৮
৮. দ্রব্যমূল্য উর্ধগতি বিরোধী ভূমিকা	-	-	-	২	-	৪	৮	৩	২	১৯
৯. অন্যান্য	-	-	৭	৪	১	-	১	-	১	১৪
মোট*	৫	১২	১৩	১৩	৯	৪০	৩০	৩১	৪০	১৯৩

*স্বায়ত্বশাসনের দাবী, বিভিন্ন প্রস্তাব এবং [illegible] সমালোচনা সংক্রান্ত সংবাদ।

সারণি ৮.১৪ থেকে দেখা যায়, ন্যাপ (ভাসানী) সংক্রান্ত মোট প্রকাশিত ১৯৩টি সংবাদের মধ্যে সাধারণ সংবাদ হচ্ছে মাত্র ২৯টি। সাধারণ সংবাদকে বাদ দিলে দেখা যায় মোট ১৬৪টি সংবাদের মধ্যে শতকরা ১৭ভাগ হচ্ছে কৃষক-শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া সংক্রান্ত, যা প্রধানতঃ গ্রামের সামন্তশ্রেণী ও শহরের পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে পরিচালিত। অন্যান্য বিরোধী দলের আপোসকামিতার বিরুদ্ধে ন্যাপ (ভাসানী) এর সমালোচনা সংক্রান্ত সংবাদের হার হচ্ছে শতকরা সাড়ে আটভাগ। বন্দী মুক্তির দাবী সংক্রান্ত হার হচ্ছে শতকরা মাত্র ৩.৬৬ ভাগ। সরকারও তার কর্মকর্তাদের সমালোচনার সংবাদ মাত্র শতকরা ৯.৭৬ ভাগ। তবে ঐ দলের গণনির্যাতনের বিরুদ্ধে শতকরা ২১.৩৪ ভাগ সংবাদ রয়েছে। কিন্তু স্বায়ত্বশাসনের দাবীসম্পর্কে সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি বেশী কিছু না বলার কারণে ভাসানী ন্যাপের অবস্থানটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইয়ুব সরকারের তেমন বিপক্ষে ছিলনা। ফলে এ সকল সংবাদ থেকে সাধারণ জনগণের মনে এরূপ ধারণা বদ্ধমূল হওয়া স্বাভাবিক যে, ভাসানী ন্যাপ বুঝি আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে কার্যকরিভাবে কিছু করতে চায়না। যদিও ন্যাপ (ভাসানী) অসংখ্য আন্দোলনের কর্মসূচীগ্রহণ করেছে তবু প্রকাশিত সংবাদ থেকে দেখা যায় যে,উক্ত দল সরকারকে সরাসরি আঘাত করে এমন কোন ভূমিকা ১৯৬৮ সালের আগে সেভাবে গ্রহণ করেনি । ফলে শ্রমিক-কৃষক মেহনতী মানুষের কথা ন্যাপ (ভাসানী) যতই বলুক না কেন এসব সংবাদ থেকে আইয়ুব সরকার সম্পর্কে ভাসানী ন্যাপের আপোষকামী দৃষ্টিভঙ্গীর ধারণা ফুটে ওঠাই স্বাভাবিক। সারণি ৮.১৪ এর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, ভাসানী ন্যাপের প্রকাশিত ১৯৩টি সংবাদের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কোন সংবাদ

Dhaka University Institutional Repository

নেই। অথচ ন্যাপ প্রতিষ্ঠার পর থেকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা হচ্ছে তার অন্যতম ঘোষিত নীতি। দৈনিক আজাদে উক্ত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কোন সংবাদ না থাকার কারণ হচ্ছে ঐ পত্রিকার সম্পাদকীয় নীতি। কোন বক্তব্য বা জনসভায় যত তীব্রভাবেই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বলা হোক না কেন তা কখনও দৈনিক আজাদের শিরোনামে স্থান পায় নি। এটা সংবাদের ভেতরে প্রকাশিত হলেও আইয়ুব সরকারকে আক্রমনের প্রধান লক্ষ্যবস্তু না করে সেসকল বক্তব্যে প্রধানতঃ সাম্রাজ্যবাদকে সমালোচনা করা হয়েছে তাই সরকার-বিরোধিতার প্রশ্নে তা ভাসানী ন্যাপের অবস্থানকে অস্পষ্ট করে তুলেছে। অন্যদিকে, আগের আলোচনায় দেখা গেছে, কেবলমাত্র ১৯৬৮ সালে এসে ন্যাপ ও তার নেতা মওলানা ভাসানী সর্ব প্রথম সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ হিসাবে আইয়ুব সরকারকে দায়ী করেছেন এবং শেষদিকে আইয়ুব সরকারকে উৎখাতের আওয়াজ তুলেছেন। সরকার বিরোধিতার প্রশ্নে ভাসানী ন্যাপের অবস্থানটি অস্বচ্ছ হয়ে ওঠার পিছনে আরো একটিগুরুত্বপূর্ণ কারণ থাকা সম্ভব। আর সেটা হচ্ছে যে, পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে জোরালোভাবে জনসাধারণের মধ্যে নিয়ে যাওয়ায় তার অনীহা কিংবা তাদের দুর্বলতা। সারণি ৮.১৪ থেকে দেখা যায়; স্বায়ত্তশাসনের দাবীর কথা ভাসানী ন্যাপের পক্ষ থেকে সেভাবে উচ্চারিত হয়নি বলেই উক্ত সারণীতে আলাদাভাবে তাকে দেখানো যায় নি। অথচ অবিভক্ত ন্যাপ মূলতঃ স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নকে নিয়েই আওয়ামী লীগ থেকে আলাদা দল হিসাবে ১৯৫৭ সনে আত্মপ্রকাশ করে। ভাসানী-ন্যাপের কর্মসূচীতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের কথা থাকলেও এ দলটি কৃষক শ্রমিকের দাবীকেইঅগ্রাধিকার দিত। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে এ দল কতটুকু আন্তরিক সে প্রশ্নেই জনসাধারণের মনে সন্দেহ দেখা দেয়। কিন্তু যে পর্যায়ে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সূত্রপাত হয় সে পর্যায়ে ভাসানী-ন্যাপকে পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের রাজনীতিকে প্রধান্য দিয়ে সরাসরি আইয়ুব সরকারকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হিসাবে গ্রহণ করতে হয়েছে। আর এভাবেই পুরো এক দশক পর সংগঠনগতভাবে ভাসানী-ন্যাপ রাজনীতির সামনের সারিতে দাঁড়ায় কিন্তু যে রাজনীতির ওপর নির্ভর করে ভাসানী-ন্যাপ সে সময় দাঁড়িয়েছিল গত ১০ বছরের মধ্যে একবারও সে তা সামনে আনেনি সারণি ৮.১৪ তার প্রমাণ। কেননা যে সময় সরকার আওয়ামী লীগের ওপর চরম আক্রমণ শুরু করেছে, তার প্রায় সকল নেতাকে জেলে দিয়েছে সে পর্যায়ে ভাসানী-ন্যাপ এমন কোন ঘটনা ঘটায়নি, এমনকি একটি বিবৃতিও দেয়নি, যা থেকে বন্দী মুক্তির দাবীর সপক্ষে একটি সংবাদ প্রকাশিত হতে পারে। তবে ঐ সারণি থেকে আরও একটি বিষয় স্পষ্ট যে, ১৯৬৬ সালের শেষ পর্যন্ত ন্যাপ সেভাবে জোরালো কোন কর্মকান্ড শুরু করেনি যার সংবাদ দৈনিক আজাদের মত পত্রিকায় বেশী হারে প্রকাশিত হতে পারে। এ বিষয়টি সারণি ৮.১৫ থেকেও আরো পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

সারণি ৮.১৫
পাকিস্তানের চারজন প্রধান সরকার বিরোধী জাতীয় নেতা সম্পর্কিত সংবাদের মাসিক গড় সংখ্যা

বিষয়	মোট শিরোনাম সংখ্যা	মূল শিরোনামের শতকরা হার	১৯৬৪ (অ-ডি)	৬৫ (জা-জুন)	৬৫ (জুলা-ডি)	৬৬ (জা-জুন)	৬৬ (জুলা-ডি)	৬৭ (জা-ডি)	৬৮ (জা-সে)	৬৮ (অ-ডি)	৬৯ (জা-মার্চ)	মোট
১. মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী	৯৭	৩৮.১৪	০.৬৭	০.১৭	১.৩৩	১.৬৭	১.১৭	০.৩৩	১.৭৮	৩.৩৩	১৩.০০	১.৮০
২. শেখ মুজিবুর রহমান	১২১	৩৪.৭১	৩.৬৭	০.৮৩	০.১৭	৬.৩৩	০.৬৭	০.৫০	১.৬৭	১.০০	১২.৬৭	২.২৪
৩. ফাতেমা জিন্নাহ	১৮২	৫৩.৩০	৫০.৩৩	৩.০০	০.৮৩	০.৩৩	০.১৭	০.৩৩	০.১১	০	০	৩.৩৭
৪. জুলফিকার আলী ভুট্টো	১১৮	৩৯.৮৩	২.৩৩	২.৬৭	৩.৫০	৩.৮৩	০.৮৩	১.৩৩	০.৪৪	৩.০০	৫.৬৭	২.১৯
মোট	৫১৮	৪৩.০৫	৫৭.০০	৬.৬৭	৫.৮৩	১২.১৬	২.৮৪	২.৪৯	৪.০০	৭.৩৩	৩১.৩৪	৯.৬০

উল্লিখিত কালপর্বে দৈনিক আজাদ পত্রিকায় সরকার বিরোধী রাজনৈতিক যে সকল নেতার নাম সংবাদ শিরোনামে বেশী প্রকাশিত হয়েছে পাকিস্তানের এমন চারজন জাতীয় নেতাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এরা মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান, ফাতেমা জিন্নাহ এবং জুলফিকার আলী ভুট্টো। সারণি ৮.১৫ থেকে দেখা যায় যে, উক্ত পত্রিকার মূল শিরোনামের অধীনে ফাতেমা জিন্নার নামই সর্বোচ্চ যার শতকরা হার ৫৩.৩। কিন্তু ১৯৬৪ সালের শেষ দিকেই কেবল এ হার মাসে গড়ে পঞ্চাশকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল, তারপর থেকে কমতে কমতে ১৯৬৮ সালের শেষ দিক শূণ্যের কোঠায় নেমে যায়। একদিকে ফাতেমা জিন্নাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান থেকে দ্রুতই অপ্রধান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হন, অন্যদিকে, মওলানা ভাসানী প্রায় নগন্য অবস্থা থেকে এক বিশাল ব্যক্তিত্বে পরিগনিত হন। উক্ত সাড়ে চার বছরে ভাসানীর নাম ৯৭ বার সংবাদ শিরোনামে প্রকাশিত হলেও ১৯৬৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল মাত্র ৩২ বার, যে সময়ে শখ মুজিবের নাম প্রকাশিত হয়েছিল ৭৫ বার। শুধু তাই নয়, ১৯৬৪ সালের শেষ তিন মাসে শেখ মুজিবের নাম প্রকাশিত হয়েছিল মোট ১১টি শিরোনামে, কিন্তু এ সময়ে ভাসানী সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল মাত্র ২টি। অবশ্য ১৯৬৮ সালের অক্টোবর থেকে মওলানা ভাসানীর নাম সবার উপরে স্থান পায়। তবে গোটা '৬৮ সালের প্রায় প্রতিদিন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার খবর প্রকাশিত হওয়ার কারণে প্রতিদিনই শেখ মুজিবের নামটিও স্মরণযোগ্য হয়ে উঠে। ফলে ব্যক্তি হিসাবে শেখ মুজিব এ সময়ই হয়ে ওঠেন কিংবদন্তীর নায়ক। অবশ্য, ১৯৬৯ সালের প্রথম তিন মাসে মওলানা ভাসানীর নাম সংবাদ শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল মোট ৩৯ বার, যা শেখ মুজিবের চেয়েও একবার বেশী। জুলফিকার আলী ভুট্টোর নামও উক্ত সাড়ে চার বছরে মোট ১১৮ বার সংবাদ শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন আইয়ুব সরকারের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রী। ফলে সে সময়ে তার নাম যতবার সংবাদ শিরোনামে স্থান পেয়েছিল তা যতটা না তার ব্যক্তিগত কারণে তার চেয়ে অনেক বেশী ছিল পররাষ্ট্র মন্ত্রী থাকার কারনে। অবশ্য বিরোধী দলের নেতা হিসাবেও তিনি ১৯৬৮ সালের শেষ দিক থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন।

৮.১১ উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

১৯৬৪ সালের ব্যাপক গণজায়ারের মধ্য দিয়ে মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচনে আইয়ুব বিরোধী প্রার্থীদের ব্যাপক বিজয়ের পরও যখন তাদের ভোটে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানই পুনঃনির্বাচিত হয়েছেন, তখন আর কারো এ বিষয়ে দ্বিধা থাকলো না যে, ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের অধীনে নির্বাচন করে আইয়ুব সরকারকে কখনই সরানো যাবেনা। এই মৌলিক বিষয়টি উপলব্ধি করার ফলে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের মধ্যে আইয়ুব সরকারের শাসনতন্ত্র-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে, পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের মধ্যে এক ব্যাপক আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। সংবাদ শিরোনাম জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায়, ১৯৬৫ সালের প্রথম থেকে সরকারের দমনপীড়ন যেমন তীব্রতর হয় তেমনই জনসাধারণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে, বিশেষত কারখানার শ্রমিকদের ভেতর প্রচুর আন্দোলনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এ সময় থেকে সরকার ভারত-বিরোধী প্রচারণাকে বিশেষভাবে বৃদ্ধি করে। ভারতের বিরুদ্ধে বলার যথেষ্ট কারণ থাকলেও যেভাবে ভারত-বিরোধী প্রচারনা তখন চালানো হয়, তাতে মনে হয়

Dhaka University Institutional Repository

জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্যই সরকার এর সুযোগ গ্রহণ করেছে। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের সময় যে আবস্থাটি সৃষ্টি হয় তা ভারতের বিরুদ্ধে প্রকৃত অর্থেই একটি অভ্যুত্থান। লক্ষ লক্ষ মানুষ স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করে। পূর্ব পাকিস্তান সে সময় একেবারে নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে। যুদ্ধের সময় জনসাধারণের মধ্যে প্রচন্ড আবেগের কারণে তা পরিদৃষ্ট হয়নি, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর থেকেই তা ভিষনভাবে অনুভূত হতে থাকে। তবে উক্ত যুদ্ধের সময় আমেরিকার পাকিস্তান বিরোধী ভূমিকা ওসমাজতান্ত্রিক বিশ্ব বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক চীন পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করায় পূর্ব পাকিস্তানের বাম-রাজনীতির ক্ষেত্রে এক ব্যাপক বিভ্রান্তির সূত্রপাত ঘটে। বামপন্থীদের একাংশ এ সময় সরকার-বিরোধী অবস্থান থেকে বেশ কিছুটা সরে দাঁড়ান। অন্যদিকে, আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তাহীনতার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করে এবং অত্যন্ত জোরালোভাবে উহার আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী তুলে ধরে। এ পর্যায়ে শেখ মুজিব ৬-দফা ঘোষণা করেন। এতে পাকিস্তানকে বিভক্ত করার কোন ইচ্ছার প্রকাশ না ঘটলেও কেন্দ্রীয় সরকার এ কর্মসূচীকে বিচ্ছিন্নতাবাদী পরিকল্পনা বলে আখ্যায়িত করে এবং আওয়ামী লীগের ওপর প্রচন্ড নির্যাতন চালানো হয়। অথচ এ সময় বামপন্থী দল ন্যাপের মূল নেতৃত্ব থেকে কোন মতামতই প্রকাশ করা হয়নি; বরং ৬-দফা সম্পর্কে এক ধরনের অনীহা ব্যক্ত হয়। ১৯৬৬ সালের ৭ই জুনের হরতালকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীসহ শিল্প শ্রমিকরা যখন ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে তখন জনসাধারণের ওপর সরকারী নির্যাতনের মাত্রা তীব্রতর হয়ে উঠে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে ও ন্যাপের মূল নেতৃত্ব কোন বিশেষ উচ্চবাচ্য করেননি, বরং তারা অনেকটা নির্লিপ্ত ভাব প্রদর্শন করেন। যদিও ন্যাপের বেশ কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এ নির্যাতনের তীব্র সমালোচনা করে বিবৃতি দেন তবু এটা সংগঠনগত পদক্ষেপ না হওয়ার কারণে এর মধ্য দিয়ে সরকার-বিরোধী কোন কার্যকর সংগ্রাম গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। ১৯৬৭ সালে শ্রমিক-কর্মচারীরা এক ব্যাপক ভিত্তিক সরকার-বিরোধী আন্দোলন শুরু করেন। তখন পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে, শত নির্যাতন চালিয়েও পরিস্থিতির ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। ফলে সরকার চুক্তির মাধ্যমে শ্রমিক-কর্মচারীদের বেশ কিছু দাবী মেনে নিতে বাধ্য হয়। এ সময় আওয়ামী লীগের মূল নেতৃত্বের অধিকাংশই কারাবন্দী থাকা সত্ত্বেও ৬-দফা কর্মসূচী ও ৭ই জুনের হরতালের এমন প্রভাব জনসাধারণের ওপর পড়ে যে, সরকার-বিরোধী একমাত্র রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে আওয়ামী লীগের অবস্থানটি পাকাপোক্ত হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, ন্যাপ অসংখ্য কর্মকান্ড পরিচালনা করলেও এমনকি,তাদের ১৪ দফায় পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের দাবী অন্তর্ভূক্ত হলেও তার রাজনৈতিক কর্মকান্ডে স্বায়ত্তশাসনের দাবী জোরালোভাবে ফুটে ওঠেনি। ন্যাপ সরকারকে সরাসরি আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকে। ন্যাপ সরকার-বিরোধী আন্দোলনের জন্য শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার পাশাপাশি সরকারের প্রশ্নকে উহ্য রেখে সামন্ত ও বড় বুর্জোয়া শ্রেণী এবং সাম্রাজ্যবাদকে আঘাতের প্রধান লক্ষবস্তু হিসাবে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে থাকেন। এ নিয়ে ন্যাপের ভিতর ব্যাপক মত বিরোধ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং এক পর্যায়ে ন্যাপ ভেঙ্গে যায়। এ ভাঙ্গনের ফলে ন্যাপের উভয় অংশের মধ্যে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ন্যাপের মস্কোপন্থী অংশ যেমন ক্রমাগত শ্রমজীবী মানুষকে সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে থাকে, তেমনই পিকিংপন্থী অংশটিও স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি, বিশেষতঃ সরকারকে সরাসরি আক্রমণ করার গুরুত্ব অনুধাবন করে। এর সাথে সাথে আওয়ামী লীগের মধ্যেও উপলব্ধির কিছু পরিবর্তন ঘটে। আওয়ামী লীগও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পক্ষে মত প্রকাশ করে এবং বৈদেশিক নীতির প্রশ্নেও স্বাধীন অবস্থান নেয়। এমনকি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি তার মধ্যে আগে যে মোহ ছিল এর পরিসমাপ্তি ঘটে। স্বায়ত্তশাসন ও সমাজতন্ত্র সমর্থন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা এ তিনটি বিষয়ে ন্যাপ (উভয় অংশ) ও আওয়ামী লীগ কাছাকাছি চলে আসলেও এসব বিষয়ে উপলব্ধিগত বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান থাকে। মস্কোপন্থীরা শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান ও সামাজিক উত্তরণের রাজনীতির প্রভাবে এসব বিষয় সম্পর্কে উপলব্ধির ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের খুব কাছাকাছি চলে যায়। অন্যদিকে, পিকিংপন্থী অংশ বিষয়গুলিকে একটু ভিন্নভাবে দেখতে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও উপরোক্ত তিনটি প্রশ্নে ও সরকার সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গী যখন কাছাকাছি চলে আসে তখন দল তিনটির মধ্যে আনুষ্ঠানিক কোন ঐক্য গড়ে না উঠলেও সমঝোতা স্থাপনের রাজনৈতিক ভিত্তি প্রস্তুত হয়। এ পর্যায়েই উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়।

১৯৬৮ সালের প্রথম সপ্তাহ থেকে মওলানা ভাসানী আইয়ুব সরকার-বিরোধী যে আন্দোলনের সূত্রপাত করে ছিলেন, এক সপ্তাহের মধ্যেই তা সর্বদলীয় আন্দোলনে পরিণত হয়। ব্যাপকভাবে জনসমর্থিত এ আন্দোলনের ওপর চরমতম সরকারী নির্যাতন নেমে আসার ফলে রাজনৈতিক অঙ্গনে কিছুটটা হতাশার ভাব পরিলক্ষিত হয়, আন্দোলনেও নেমে আসে খানিকটা ভাটার ভাব। এ সময় অধিকাংশ রাজনৈতিক দল একটু সময় নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন শুরু করার চিন্তা করে। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাপ শহর-ভিত্তিক আন্দোলনের ওপর আস্থা হারিয়ে গ্রামসমাজের জনসাধারণকে সংগঠিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। শহরে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে জাগরণ দেখা দিয়েছিল তার সাথে যদি গ্রামের মানুষের সংগ্রামকে সম্পর্কিত করা না যায় তাহলে সরকার-বিরোধী উক্ত আন্দোলনকে যৌক্তিক পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া যাবেনা- এ উপলব্ধিই মওলানা ভাসানীকে ২৯শে ডিসেম্বর গ্রামাঞ্চলের হাট বাজারে হরতাল পালনে উৎসাহিত করে। কিন্তু ডিসেম্বর মাসের শুরুতে আন্দোলন সাময়িকভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার ফলে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে যে হতাশার ভাব পরিলক্ষিত হয়, সে ধরনের হতাশা তৎকালীন ইপিসিপি (এম-এল) এর মধ্যেও দেখা দেয়। তারা উপলব্ধিই করতে পারেনা যে, একটি বিশাল আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে। ফলে তারা ২৯শে ডিসেম্বরের হাট- হরতালের কর্মসূচীকে অসময়োচিত ও অবিবেচনাপ্রসূত বলে মূল্যায়ন করে। তারা সারা দেশের কর্মীদের কাছে নির্দেশ এই মর্মে পাঠায় নিজেদের যে,উদ্যোগে হাট হরতালের কর্মসূচীকে সফল করতে ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না। যদি কোথাও হরতাল হওয়ার মত পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকে এবং বিশাল ন্যাপ ও কৃষক সমিতির কর্মীরা ও হাট-হরতালের কর্মসূচী সফল করার উদ্যোগ গ্রহণ করে তাহলে তাদের সাথে থাকতে হবে।[৪৩৪] এ সিদ্ধান্তের ফলে ন্যাপের মধ্যে কর্মরত ইপিসিপি (এম-এল)-এর অধিকাংশ কর্মী হরতাল পালনের উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। কিন্তু তার পরও পূর্ব পাকিস্তান ন্যাপ প্রভাবিত এলাকায় হাট হরতালের কর্মসূচী সফল হয়। কিন্তু দেশের প্রচার মাধ্যমগুলিতে এর কোন সংবাদ প্রকাশিত না হওয়ার কারণে ন্যাপের শহরাঞ্চলের নেতাকর্মীদের মধ্যে আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আর আরেক বার ও দেখা দেয়।

৪৩৪. বিমল বিশ্বাস ও শরদিন্দু দস্তিদারের সাথে সাক্ষাৎকার

Dhaka University Institutional Repository

ইতিমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্ররা সরকারের দমন-পীড়নের প্রতিবাদে ২৮শে ডিসেম্বর রাওয়ালপিন্ডিতে হরতালের কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং তাদের ওপর ব্যাপক দমন-পীড়ন নেমে আসা সত্ত্বেও এ হরতাল ব্যাপকভাবে সফল হয়। ঐদিন পূর্ব পাকিস্তানের সাত জন বিশিষ্ট ছাত্রনেতা এক দীর্ঘ বিবৃতি প্রদান করেন। এ বিবৃতিতে তারা ছাত্রসমাজের শিক্ষাগত দাবী-দাওয়া আদায় এবং ছাত্রসমাজের ওপর সরকারী নির্যাতন, গুন্ডামি, শিক্ষায়তনে পুলিশ মোতায়েন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা ইত্যাদির মাধ্যমে সরকার যে দমননীতি অনুসরণ করে চলেছে তার বিরুদ্ধে এক ব্যাপকতর ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানান। এতে ছাত্র লীগ, ছাত্র ইউনিয়নের উভয় গ্রুপ এবং ডাকসুর ৭ জন বিশিষ্ট নেতা স্বাক্ষর করেন। এ বিবৃতিতে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কিছু বলা হয়েছে তা নয়, কিন্তু উক্ত ৭ জন নেতার সাথে ডাকসুর সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যুক্ত থাকার কারণে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ সকল অনৈক্য ভুলে একই মঞ্চে সমবেত হয়েছে বলে প্রতিভাত হয়। উল্লেখ্য, ডাকসুর তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক ছিলেন সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠন জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন (এন,এস,এফ)-এর কেন্দ্রীয় নেতা। ফলে ছাত্রসমাজের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির পক্ষে কাজ করার প্রায় কেউ থাকলো না। কেননা এ বিবৃতিতে সরকারের কোন রাজনৈতিক সমালোচনা করা না হলেও তার দমননীতি ও গুন্ডামির বিরুদ্ধে খুব স্পষ্টভাবে বলা হয়। যদিও এন,এস,এফ,নেতা নাজিম কামরান চৌধুরী দলের পক্ষ থেকে নয়, বরং ডাকসুর পক্ষে এ বিবৃতি দিয়েছিলেন তবু তাতে প্রকাশিত বক্তব্যকে এন,এস,এফ-এর পক্ষেও আর বিরোধিতা করা সম্ভব হয়নি। এভাবে পূর্ব পাকিস্তানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি সামাজিক শক্তির মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হয়।

এদিকে ২৯শে ডিসেম্বরের হরতালকে কেন্দ্র করে হাতিরদিয়া বাজার ও নড়াইলে পুলিশের গুলিবর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে ব্যাপক প্রতিবাদ ওঠে। ৬-দফাপন্থী আওয়ামী লীগের অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী এ ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করে এক বিবৃতি প্রদান করেন। নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের আহবায়ক এ,এইচ,এম, কামরুজ্জামানও এ ঘটনার প্রতিবাদে বিবৃতি দেন। আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা আমেনা বেগম ব্যক্তিগতভাবে বিবৃতি দিয়ে এ ঘটনার প্রতিবাদ করেন। পিডিএম থেকে এ ঘটনার প্রতিবাদ করে এক বিবৃতিতে বলা হয়, জনসাধারণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য গুলিবর্ষণ করা বর্তমান সরকারের একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া, খিলাফতে রব্বানী পার্টি, ঢাকা বার সমিতি এবং কৃষক সমিতিসহ বিভিন্ন সংগঠন এ ঘটনার নিন্দা ও বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী করে বিবৃতি দেয়।[৪৩৫]

যে দিন উক্ত গুলীবর্ষণ ও হত্যার বিরোধিতা করে সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে বিবৃতি প্রদান করা হয় সেদিনের পত্রিকায় সারা প্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় পূর্ণ হাট হরতাল, বিশাল জনসভা ও বিক্ষোভ মিছিলের সংবাদ প্রকাশিত হয়। ২৯শে ডিসেম্বরের হরতালের ঘটনা যে এক অসামান্য ঘটনা ছিল তা সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। মওলানা ভাসানী ৩১শে ডিসেম্বর আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বয়কট করা হবে বলে ঘোষণা করেন এবং বর্তমান সংবিধানের আওতায় কোনভাবেই গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না একথা স্পষ্ট করে তুলে ধরেন। জুলফিকার আলী ভুট্টো, এয়ার মার্শাল আজগর খান কিংবা বিচারপতি মাহবুব মোর্শেদসহ যে কোন ব্যক্তিই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হোন না কেন তা অবশ্যই প্রতিহত করা হবে বলে ভাসানী মন্তব্য করেন। তিনি ঐদিন আরো বলেন, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তোলাই এখন একমাত্র কাজ হিসাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। মওলানা গণআন্দোলনের মাধ্যমে বর্তমান শাসনতন্ত্র বাতিল করে এমন একটি সংবিধান প্রতিষ্ঠার কথা বলেন যাতে পূর্ব পাকিস্তানসহ পাকিস্তানের বিভিন্ন জাতির পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের স্বীকৃতি থাকবে, কেন্দ্রের হাতে থাকবে শুধু পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা ও মুদ্রার দায়িত্ব এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার এবং সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের অর্থনীতি-- এই হবে নয়াশাসনতন্ত্রের ভিত্তি। সেদিন পাবনা শহরে তিনি এক বিশাল শোভাযাত্রার নেতৃত্ব দেন এবং জেলা প্রশাসকের বাড়ির সম্মুখে বিভিন্ন দাবীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

১লা জানুয়ারি মস্কোপন্থী ন্যাপ অবশ্য পুলিশের গুলীবর্ষণ ও হত্যার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করেনি। তবে এটি তার প্রাদেশিক কার্যকরী সংসদের সভায় এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। এ সভার এক প্রস্তাবে বর্তমান সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য দেশের সকল বিরোধী রাজনৈতিক দল, মত ও ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী ঐক্যফ্রন্ট গঠনের আহবান জানানো হয়। ঐক্যফ্রন্ট গঠনের ভিত্তি হিসাবে তারা ১৬ দফা কর্মসূচী উপস্থিত করেন। এতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বাতিল; প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার ও পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র; সকল রাজবন্দীর মুক্তি, হুলিয়া ও রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি; বাক, ব্যক্তি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা; সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন; শ্রমিকশ্রেণীর মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা, একচেটিয়া পুঁজিবাদের উচ্ছেদ, স্থানীয় সরকারসমূহকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করাসহ আমলাতান্ত্রিক সরকারের জুলুম ও অত্যাচার-বিরোধী বিভিন্ন কর্মসূচী তুলে ধরা হয়।[৪৩৬]

যেদিন উপরোক্ত খবর প্রকাশিত হয় সেদিনই ছাত্র লীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের উভয় অংশের সমন্বয়ে সর্বদলীয় ছাত্রদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। কড়া পুলিস পাহারাকে অগ্রাহ্য করে সর্বদলীয় ছাত্রদের উক্ত সভায় ১৯৬১ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল করাসহ ছাত্রদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া তুলে ধরা হয়। এ সভায় সরকারের দমননীতির কঠোর সমালোচনা করা হয় এবং পুলিশের সাম্প্রতিক গুলীবর্ষণ ও হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়। ঐ সভায় ছাত্রদের বিভিন্ন ধরনের নিজস্ব দাবী-দাওয়া তুলে ধরে সরকারের গণনির্যাতনমূলক বিভিন্ন কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের উভয় অংশের ছাত্রদের এক সম্মিলিত আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আহবান জানানো হয়।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (মস্কোপন্থী) নেতারা কার্যকরী সংসদের সভার সিদ্ধান্তসমূহ প্রচার করার জন্য সারাদেশব্যাপী সফর করেন এবং কেন্দ্রীয়ভাবে কি করে একটি সরকার বিরোধী জোট গঠন করা যায় তা নিয়ে বিভিন্ন দলের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে থাকেন। মস্কোপন্থী ন্যাপ নেতা আতাউর রহমান রাজশাহী জেলার চারঘাটে এক তাৎপর্যপূর্ণ বক্তৃতা দেন। ঐ বক্তৃতার খবরটি দৈনিক আজাদে খুব গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়। উক্ত বক্তৃতায় বলা হয় যে, বর্তমান সরকার জনগণের ন্যায়সঙ্গত দাবী মেনে না নিলে সারা দেশে মহাবিপ্লব ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।[৪৩৭] আতাউর রহমান তার দীর্ঘ বক্তৃতায় আরো বলেন, বর্তমান সরকারের চরম নির্যাতনে প্রতিটি মানুষ আজ অতিষ্ঠ, তারা জেল -জুলুমের আর তোয়াক্কা করে না। তিনি তাঁদের ঘোষিত ১৬ দফার স্বপক্ষে বিভিন্ন

---

৪৩৫. দৈনিক 'আজাদ' ঢাকা, ১লা জানুয়ারি ১৯৬৯।

৪৩৬. প্রাগুক্ত।

৪৩৭ দৈনিক আজাদ, ৪ঠা জানুয়ারি, ১৯৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

বক্তব্য তুলে ধরে বলেন, বর্তমান সরকার যদি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করে তাহলে জনগণ সকল খাজনা প্রদান বন্ধ করে সরকারকে অচল করে দিতে বাধ্য হবে। এর পর তিনি সকল বিরোধী দলকে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামে শামিল হওয়ার জন্য উদাত্ত আহবান জানান।

জানুয়ারি মাসের ৩ তারিখে নেজামে ইসলামী পার্টির জাতীয় কাউন্সিলের অধিবেশন সমাপ্ত হয় এবং এতে গৃহীত বিভিন্ন প্রস্তাবের মধ্যে ২ ও ৩ নং প্রস্তাবে বলা হয়ঃ

"সরকারের নির্যাতনমূলক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য সকল বিরোধী দলের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া কাউন্সিল দৃঢ় মত প্রকাশ করিতেছে।

"বিরোধী দলগুলির সম্মতিক্রমে ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্য স্থাপন সম্ভবপর বলিয়া কাউন্সিল অভিমত প্রকাশ করিতেছে।"[৪৩৮]

যদিও নেজামে ইসলাম পার্টির এ কাউন্সিলে আসন্ন মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি, তবু পিডিএম- এর নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্তকে স্থগিত রাখার কথা বলা হয়।

যে সময় পূর্ব পাকিস্তানের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিরঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রচেষ্টা বেশ জোরদার হয়, ঠিক সেসময় পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তির দাবীতে এক প্রবল আন্দোলন গড়ে উঠে। পাঁচটি রাজনৈতিক দল সমন্বয়ে গঠিত পিডিএমও তখন পশ্চিম পাকিস্তানে বেশ সক্রিয়ভাবে আন্দোলন -সংগ্রামে অংশগ্রহণ করছে কিন্তু ভুট্টো সমর্থক ছাত্র-যুবকদের অংশগ্রহণ ক্রমশ-জঙ্গীরূপ ধারণ করতে থাকে। উপরন্তু, ১৯৬১ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ বাতিলের প্রশ্নে পশ্চিম পাকিস্তানে যে ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠে তার পরিপ্রেক্ষিতে আইয়ূব সরকার ছাত্রদের উক্ত মূলদাবীকে মেনে নেওয়ায় তাদের আন্দোলন ব্যাপকতর রূপ লাভ করে। ছাত্ররা ক্রমশঃ অধিকতর রাজনৈতিক বক্তব্য নিয়ে রাজপথে নামতে থাকে।

মওলানা ভাসানী ১৯৬৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পাবনায় যে কথা বলেছিলেন সেটাই ৪ঠা জানুয়ারি তারিখে সমাপ্ত তার দলের কার্যনির্বাহী সংসদের সভায় সিদ্ধান্ত আকারে গৃহীত হয়। উক্ত সভায় অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, বর্তমান শাসনতন্ত্রের ব্যবস্থাধীনে কোন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে জনগণের আশা আকাংখ্যার প্রতিষ্ঠা কিছুতেই সম্ভব নয়। কেননা ১৯৬৪-৬৫ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, এ ব্যাপারে জনসাধারণের মধ্যেও কোন মোহ নেই। এ অবস্থায় নির্বাচনের জন্য একাজোট নয়, নির্বাচন বর্জন করে জনগণের মৌলিক রাজনৈতিক, গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়াগুলি আদায়ের জন্য দেশব্যাপী এক আপোসহীন সংগ্রামের সূচনা করতে পারলেই জনতাকে তাদের ইপ্সিত লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করা সম্ভব। আর যদি এ সংগ্রামকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে অগ্রসর করে নিতে হয় তাহলে সে কর্মসূচীর সাথে মেহনতী মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির কর্মসূচীকে যুক্ত করতে হবে এবং অবশ্যই এ কর্মসূচীকে সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, নয়াউপনিবেশবাদ ও তার দোসর একচেটিয়া পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী সংগ্রামের সাথে সমন্বিত করতে হবে।[৪৩৯]

পিকিংপন্থী ন্যাপের কার্যনির্বাহী সংসদের সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে অপরাপর দলগুলির সাথে আইয়ুব সরকার-বিরোধী আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গীর স্পষ্ট পার্থক্য রচিত হয়। ফলে সকল বিরোধী দলের সমন্বয়ে ঐক্যফ্রন্ট গঠনের লক্ষ্যে ৫ই জানুয়ারি ঢাকায় যে বৈঠক ডাকা হয় তাতে পিকিংপন্থী ন্যাপ অংশগ্রহণ করে নি। আহমদুল কবিরের বাসগৃহে অনুষ্ঠিত এ সভায় পিডিএম ভুক্ত পাঁচটি দল তথা, এন,ডি,এফ, জামাতে ইসলামী,নেজামে ইসলাম, পিডিএম পন্থী আওয়ামী লীগ ও কাউন্সিল মুসলিম লীগ এবং মস্কোপন্থী ন্যাপ, ৬-দফাপন্থী আওয়ামী লীগ এবং ওলামায়ে ইসলাম- এই আটটি দল যোগদান করে। এ বৈঠকে আইয়ুব সরকার-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি যুক্তফ্রন্ট গঠনের ব্যাপারে সকল দল একমত হয়, তবে সর্বজনীন ভোটাধিকার অর্জনের সংগ্রামকেই উক্ত ফ্রন্টের মূল ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হয়। কেবল মাত্র ৬-দফাপন্থী আওয়ামী লীগ ও জমিয়াতে ওলামায়ে ইসলামই মৌলিক গণতন্ত্র নির্বাচন কার্যকরভাবে বর্জনের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করে। কিন্তু মস্কোপন্থী ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হক ওসমানীর মতে সর্বাগ্রে সর্বজনীন ভোটাধিকার অর্জনের উদ্দেশ্যে সংগ্রামের জন্য ঐক্য প্রয়োজন। তবে নির্বাচন বর্জন করা হবে কিনা সে সম্পর্কে স্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করতে তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন।[৪৪০]

উক্ত আটটি দল পরদিন অর্থাৎ ৬ই জানুয়ারি এক বৈঠকে মিলিত হয় এবং এতে ন্যূনতম কর্মসূচী হিসাবে সর্বজনীন ভোটাধিকার ও পার্লামেন্ট পদ্ধতির সরকারের ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা হলেও নির্বাচন বর্জনের প্রশ্নে ঐদিন ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। তবে এদিনের বৈঠকে বিভিন্ন দাবী-দাওয়া সংবলিত একটি পত্র প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান বরাবর প্রদান করার জন্য অভিমত ব্যক্ত করা হয়। এতে সিদ্ধান্ত হয় যে, যদি উল্লিখিত দাবীসমূহ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মেনে নেওয়া না হয় তাহলে সক্রিয়ভাবে নির্বাচন বর্জন ও ব্যাপক গণআন্দোলন শুরু করা হবে বলে উক্ত পত্রে উল্লেখ থাকবে। এ পত্রটিকে চরমপত্র হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। তবে এ অভিমতের দ্বিতীয় অংশ তথা নির্বাচন বর্জন সংক্রান্ত প্রশ্নে অনেকেরই দ্বিমত থেকে যায়।

এদিন ছাত্র ইউনিয়নের উভয় অংশ এবং ছাত্র লীগের ৬ জন নেতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশের উদ্যোগ নেন। এ যুক্ত বিবৃতিতে ছাত্রদের শিক্ষাগত দাবী-দাওয়া, পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন; গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাসহ অন্যান্য দাবী-দাওয়া-ভিত্তিক সুস্পষ্ট কর্মসূচী গ্রহণের জন্য বিরোধী সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি আহবান জানানো হয়। পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের ব্যাখ্যা হিসাবে আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচীর অবিকল অনুরূপ একটি ধারণা দেওয়া হয়। এছাড়া অন্যান্য যেসব দাবী তাঁরা বিবৃতিতে অন্তর্ভুক্ত করেন সেগুলি হচ্ছে; পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধুসহ সকল প্রদেশের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদানসহ সাব-ফেডারেশন গঠন; ব্যাংক, বীমা, ইনস্যুরেন্স ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ; কৃষকদের ফসলের ন্যায্য মূল্য প্রদান, শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া আদায়, পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহারের ব্যবস্থাকরণ; জরুরী আইন প্রত্যাহার, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য নিবর্তনমূলক আইন প্রত্যাহার এবং সিয়াটো, সেন্টোসহ পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করে জোট বহির্ভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ।

এদিকে ঐ দিন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা রাওয়ালপিন্ডির, নৌসেনা ও পূর্ব পাকিস্তানে পুলিশের গুলীবর্ষণে নিহত ছাত্রদের স্মরণে এক গায়েবানা জানাজার আয়োজন করলে সরকার সমর্থক একদল সশস্ত্র লোক উক্ত জানাজায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-জনতার ওপর

---

৪৩৮. দৈনিক আজাদ, ৪ঠা জানুয়ারি, ১৯৬৯।
৪৩৯. দৈনিক আজাদ, ৬ই জানুয়ারি, ১৯৬৯।
৪৪০. দৈনিক আজাদ, ৬ই জানুয়ারি, ১৯৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

মারাত্মক হামলা চালায় এবং অসংখ্য ছাত্রকে আহত করে। যে সময় পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের ঘটনা ঘটে সে সময় সারা পশ্চিম পাকিস্তান জুড়ে বিরাট বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হতে থাকে। মুলতানের সকল কলেজের ছাত্ররা তাদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া নিয়ে লাগাতার ধর্মঘট শুরু করে, সকল কলেজের ছাত্ররা মিলে বিক্ষোভ করে দাবী জানায়-- সরকারী সিদ্ধান্তের কারণে পুরো দুই মাস ধরে কলেজ বন্ধ রেখে ছাত্রদের শিক্ষা জীবনের ওপর যে আঘাত হানা হয়েছে তার প্রতিকার, সকল রকম জুলুমের অবসান ও ছাত্র বন্দীদের মুক্তি, সকল কালা-কানুন প্রত্যাহার ও উক্ত দুই মাসের বেতন মওকুফ। এ সময় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দাবীতে এক গণমোর্চা গঠিত হয় এবং এক মাইল দীর্ঘ শোভাযাত্রা বের করে সরকারের দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দাবী জানান হয় এবং গণতন্ত্র পূণঃপ্রতিষ্ঠা, মৌলিক অধিকার অর্জন, ছাত্র ও রাজবন্দীদের মুক্তি ইত্যাদি দাবীতে সরকারের বিরুদ্ধে দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষে বিভিন্ন শ্লোগান দেওয়া হয়। একই দিনে কাউন্সিল মুসলিম লীগের কোন এক জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক সম্মেলন করে 'মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা' ও সরকারের অগণতান্ত্রিক নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের বিরোধী দলের সকল সদস্যকে পদত্যাগ করার অনুরোধ করেন। তিনি সকল বিরোধী দল সমর্থক মৌলিক গণতন্ত্রীদেরকেও পদত্যাগের আহবান জানান। পশ্চিম পাকিস্তানের মর্দান জেলা কমিটির উক্ত নেতা জানান যে, তিনি ঢাকায় অনুষ্ঠিত বিরোধী দলসমূহের বৈঠকে এ মর্মে চিঠি পাঠিয়েছেন যে, বর্তমান ব্যবস্থার অধীনে যে কোন নির্বাচন কার্যকরভাবে বয়কট করার সিদ্ধান্ত যেন গ্রহণ করা হয়।[৪৪১]

উপরে উল্লিখিত বিবরণ এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে গায়েবানা জানাজারত ছাত্র-জনতার ওপর সরকার সমর্থকদের নির্মম হামলার সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ ও বিভিন্ন স্তরের জনসাধারণের মধ্যে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। এ সময় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় সরকার-বিরোধী আন্দোলন ও সরকারী নির্যাতনের বিভিন্ন কাহিনীই শুধু সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নি, গ্রামের জনসাধারণের ওপর সরকারী পুলিশবাহিনীর অকথ্য নির্যাতনের সংবাদও প্রকাশিত হতে থাকে। এ সময়ে প্রকাশিত একটি সংবাদকে উদ্ধৃত করলেই পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। "ঝিনাইদহের পল্লীতে পুলিশী সন্ত্রাস; দরিদ্র ইক্ষুচাষীদের উপর অকথ্য নির্যাতন"- শিরোনামের উক্ত রিপোর্টে বলা হয়ঃ

"ঝিনাইদহ মহকুমার গ্রামাঞ্চলে পুলিশ সম্প্রতি সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করিয়াছে। ইক্ষু হইতে গুড় মাড়াইকে কেন্দ্র করিয়া পুলিশ সম্প্রতি গ্রাম অঞ্চলে হানা দিয়া দরিদ্র কৃষক রমণী, পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে সবার উপর চরম নির্যাতন করিয়াছে বলিয়া জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর অভিযোগে জানা গিয়েছে। অভিযোগে প্রকাশ, উক্ত মহকুমার শৈলকুপা ও হরিণাকুন্ডু থানার ৩০টি গ্রাম হইতে পুলিশ প্রায় ২০টি গুড় মাড়াই কল ও গুড় আটক করে। পুলিশ বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালাইবার সময় গ্রামের প্রতি গৃহে হানা দিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নির্বিশেষে নিরীহ কৃষকদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালাইয়াছে। নির্যাতনের মাধ্যমে পুলিশ উৎকোচ গ্রহণের চেষ্টা করে বলিয়াও অভিযোগ শোনা যাইতেছে।"[৪৪২]

এ ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করে ঝিনাইদহ কৃষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জনাব আলাউদ্দীন আহমদসহ কয়েকজন কৃষক নেতা এক বিবৃতি প্রদান করেন এবং তাতে দাবী করেন যে, আখের উৎপাদন-ব্যয়ের প্রায় অর্ধেক মূল্যে আখ সরবরাহের জন্য কৃষকদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে অথচ তার প্রতিবাদ করলেই সরকার ও মিল মালিক পক্ষ কৃষক-জনতার ওপর পুলিশ লেলিয়ে দিচ্ছে।

পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে সরকারী বাহিনী ও তার সমর্থকদের অত্যাচার-নির্যাতন এবং পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলেও উপরোক্ত ধরনের অসংখ্য নির্যাতন ও তার প্রতিবাদের খবর সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হওয়ার ফলে ঢাকা শহরের ছাত্র-জনতা ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ওপর বিশেষ প্রভাব পড়ে। উহা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রচেষ্টাকে দ্রুততর করে; ছাত্র সংগঠনগুলিও তাদের চিন্তা-ভাবনাগুলিকে সুসংগঠিত একটি কর্মসূচীরমধ্যে আনতে সক্ষম হয়। বুর্জোয়া ও ইসলামী ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত পি.ডি.এম ৭ই জানুয়ারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, 'গণতন্ত্রের পাঁচটি ন্যূনতম দাবী' অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত 'সম্পূর্ণভাবে অগ্রহণযোগ্য শাসনতন্ত্রে'র ভিত্তিতেকোন স্তরের আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা হবে না। নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য যে পাঁচটি পূর্বশর্তের কথা বলা হয় সেগুলি হচ্ছেঃ (ক) সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন; (খ) প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত পার্লামেন্ট ও পরিষদের পূর্ণক্ষমতা; (গ) জরুরী অবস্থা ও সকল কালা-কানুন অবিলম্বে প্রত্যাহার; (ঘ) অবিলম্বে পূর্ণ নাগরিক অধিকার প্রদান; (ঙ) অবিলম্বে সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি এবং সকল মামলা ও ছাঁটাই ব্যবস্থা প্রত্যাহার। ঐদিন পাকিস্তান জমিওতে ওলামায়ে ইসলাম তার দুই দিনব্যাপী সম্মেলন শেষে ঘোষণা করে যে, দেশের বৃহৎ শিল্প ও ভারী কল-কারখানা জাতীয়করণ করতে হবে। এ ঘোষণায় আরো বলা হয় যে, সারা দেশের জনসাধারণের ওপর সরকার যে ব্যাপক নির্যাতন শুরু করেছে তাকে প্রতিরোধের জন্য সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। গ্রামের দরিদ্র কৃষক-জনতা ও শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী-দাওয়া আদায়, জনগণের বাক ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রদান ও মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ সকল প্রকার অগণতান্ত্রিক ও অনৈসলামিক কার্যকলাপ বন্ধের দাবীতে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানান হয়।৭ই জানুয়ারি মস্কোপন্থী ন্যাপ তার কেন্দ্রীয় কমিটির পাঁচ দিন ব্যাপী সভা সমাপ্তি শেষে বিরোধী দলগুলির প্রতি সুস্পষ্ট কর্মসূচী ভিত্তিক ঐক্যফ্রন্ট গঠনের আহবান জানায়। ন্যূনতম কর্মসূচী হিসাবে প্রাদেশিক ন্যাপের ১৬-দফার অনুকরণে ১৩-দফা কর্মসূচী ঘোষণা করে, যাতে বিভিন্ন শ্রেণী-দাবীকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ সময় পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক গভর্নর জেনারেল আজম খান, সাবেক বিমান বাহিনীর প্রধান ইয়ার মার্শাল আজগর খান এবং সাবেক বিচারপতি মাহবুব মোর্শেদ দেশব্যাপী আইয়ুব-বিরোধী প্রচার আন্দোলন শুরু করেন এবং সকল বিরোধী দলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আইয়ুব সরকারের অগণতান্ত্রিক কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানাতে থাকেন। তখন সকল বিরোধী দলও দ্রুত একটি সমঝোতায় পৌঁছার জন্য ঘন ঘন নিজেদের মধ্যে ও বিভিন্ন দলের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চালাতে থাকে। এ রকম এক পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খান বিরোধী দলগুলিকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে এক বক্তৃতা দেন। ৬ই জানুয়ারি গভর্নর হাউসে অনুষ্ঠিত এক সভায় তিন ঘন্টাব্যাপী এক দীর্ঘ বক্তৃতায় তিনি ঘোষণা করেন, প্রদেশে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি আরো বলেনঃ "পরিস্থিতির মোকাবেলার ক্ষেত্রে সরকারের হাত যথেষ্ট সুদূর প্রসারী ও শক্তিশালী এবং যাহারা আইন ভঙ্গ করিতে সচেষ্ট

---

৪৪১. দৈনিক আজাদ, ৭ই জানুয়ারি,১৯৬৯।
৪৪২. সাপ্তাহিক জনতা, ৫ই জানুয়ারি ,১৯৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

হইবে অথবা যাহারা বিশৃংখলা ও গুন্ডামি সৃষ্টি করিবে এবং তাহাদের সমর্থন ও সাহায্য করিবে, তাহাদের দৃঢ় হাতে দমন করিতে সরকার ইতস্ততঃ কিংবা দ্বিধা করিবে না।"৪৪৩

গভর্ণর মোনয়েম খানের এই দম্ভোক্তি প্রকাশের পর দিনই তার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বড় বড় হরফে খবর ওঠেঃ তোয়াহা ও আবদুল হকের প্রতি আত্মসমর্পণের নির্দেশ। মোহাম্মদ তোয়াহা ও আবদুল হক এই দুই জনই ছিলেন পিকিংপন্থী গোপন কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং প্রথম জন ছিলেন ন্যাপ (ভাসানী)-এর সাধারণ সম্পাদক, দ্বিতীয় জন ছিলেন কৃষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক। একটি সরকারী তথ্য বিবরণীতে বলা হয় উক্ত দুই জনকে পাকিস্তান দেশরক্ষা বিধি অনুসারে তাদের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করা হয়েছে।৪৪৪

এদিকে, পিডিএম-ভুক্ত পাঁচ পার্টি, আওয়ামী লীগ (৬-দফাপন্থী), ন্যাপ (মস্কোপন্থী) ও জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের ঐক্য গঠেই। প্রধানতঃ ন্যাপ (মস্কোপন্থী)-এর আসন্ন নির্বাচন বয়কট প্রশ্নে দ্বিমত থাকার কারণে বিলম্বিত হতে থাকে। ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগ (৬-দফাপন্থী) নির্বাচন বয়কটের ব্যাপারে মোটামুটিভাবে ঐকমত্য পোষণ করতে সক্ষম হয় এবং ন্যূনতম কর্মসূচী হিসাবে চারটি প্রধান দফা পেশ করে। এগুলি হচ্ছেঃ সর্বজনীন ভোটাধিকার, ফেডারেল পদ্ধতির পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থা, শেখ মুজিব, ওয়ালী খান ও ভুট্টোসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি, ট্রাইব্যুনালে উত্থাপিত মামলাসহ সকল মামলা ও গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার। এ সকল দাবীর অধিকাংশই প্রস্তাবিত ৮ পার্টির কর্মসূচীতে গ্রহণ করার ব্যাপারে সকল পার্টি ঐকমত্য পোষণ করে। তবে উক্ত ৮ পার্টির প্রতিনিধিদের অধিকাংশই পিকিংপন্থী ন্যাপ প্রস্তাবিত ঐক্যফ্রন্টে যোগদানের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। ৮ই জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত ৮ পার্টির সভায় যোগদানকারী অধিকাংশ সদস্য মত প্রকাশ করেন যে,গণআন্দোলনের সাফল্যের জন্য মওলানা ভাসানীর ঐক্যফ্রন্টে যোগদানের গুরুত্ব অপরিসীম।৪৪৫ কিন্তু একটি দলের প্রচন্ড আপত্তির কারণে সে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নি।

যে সময় পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলি কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে আন্দোলনের কর্মসূচী ও ফ্রন্ট গঠনের বিষয় নিয়ে বিতর্ক করছে সে সময় চলছে পশ্চিম পাকিস্তানে এক প্রবল ছাত্র আন্দোলন। ছাত্র আন্দোলনকে সমর্থন করাতে ঐ প্রদেশের বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিকদেরকেও গ্রেফতার করা হয়। এ গ্রেফতারের পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেশের সরকার-বিরোধী সকল ছাত্র সংগঠন ও ফ্রন্টগুলি তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। কবি-সাহিত্যিকদের ওপর পুলিশী নির্যাতন ও গ্রেফতারের প্রতিবাদে লিয়ারী ছাত্র সংগ্রাম কমিটি, ছাত্র সংগ্রাম কমিটি, বালুচ ছাত্র সংস্থা, সিন্ধি ছাত্র ফেডারেশন ও জিকরী ছাত্র সংস্থার প্রতিনিধিগণ এক যুক্ত বিবৃতি দেয়। উক্ত বিবৃতিতে দেশের বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিকদের আশুমুক্তি দাবী করা হয়। যে সময় দমন-পীড়নের কারণে পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্র আন্দোলন কয়েক দিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায় সে সময় ছাত্ররা এক বিবৃতির মাধ্যমে আবার পথে নামে। অন্যদিকে, এ সময় পশ্চিম পাকিস্তানী ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে ব্যাপক বাম প্রভাব এবং শ্রেণী-চেতনা-ভিত্তিক রাজনীতির প্রসার ঘটে। ছাত্রদের প্রতিটি মিছিলে শ্রমিক-কৃষকসহ সকল শ্রমজীবী মানুষের দাবী-দাওয়া ব্যাপকভাবে উচ্চারিতহতে থাকে। ছাত্রদের ওপর সরকারী চরম দমন-পীড়ন নেমে আসলে উক্ত আন্দোলনের সমর্থনে ছাত্রীরাও রাস্তায় নেমে আসে। ৭ই জানুয়ারি রাওয়ালপিন্ডির দোপাট্টা পরিহিত সহস্রাধিক স্কুল-কলেজের ছাত্রী ছাত্রদের ওপর পুলিশ ও গুন্ডাবাহিনীর হামলা এবং সারা দেশব্যাপী গণনির্যাতনের প্রতিবাদে এক বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। মিছিলটি প্রায় তিন ঘন্টাব্যাপী শহরের বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে। এ মিছিলে কবি ইকবালের কিছু বিশিষ্ট লাইন সংবলিত ও সমাজ পরিবর্তন নির্দেশকঅসংখ্য প্লাকার্ড বহন করা হয়। এসব প্লাকার্ডের কয়েকটিতে লেখা ছিলঃ'অসত্যের কাছে নত নাহি হবে শির, ভয়ে কাপে কাপুরুষ লড়ে যায় বীর', 'পুঁজিবাদীদের ধূর্তচালের হয়েছে আজ জয়, সরলপ্রাণ চাষী-মজুরের ভাগ্য লিপির পরাজয়', 'যে ক্ষেতের ফসল পায় না চাষী, তার প্রতি শস্য কণায় আগুন লাগিয়ে দাও, লাগিয়ে দাও' ইত্যাদি। ছাত্রীদের এ বিশাল মিছিল বের হলে সারা শহরের বিভিন্ন স্তরের মহিলারা তাতে অংশগ্রহণ করে এবং সমাজ বিপ্লবের সপক্ষে ছাত্রীদের তোলা বিভিন্ন আওয়াজ সরকারের নির্যাতন-বিরোধী সকল আওয়াজের সাথে যুক্ত হয়।৪৪৬ এ পর্যায়ে পাকিস্তানের উভয় অংশের মাদ্রাসার ছাত্ররাও আইয়ুব সরকারের অগণতান্ত্রিক শাসন ও গণনির্যাতনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য দেশের সকল বিরোধী দলের প্রতি আহবান জানায়। এভাবে একে একে দেশের সকল বিরোধী রাজনৈতিক দল, ছাত্র ও পেশাজীবী সংগঠন, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন সরকার-বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং বিরোধী দলগুলির প্রতি ঐক্যবদ্ধভাবে আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপকতর আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানায়।

দেশের এ রকম জটিল পরিস্থিতিতে আটটি রাজনৈতিক দল ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি (ডাক) গঠন করে। 'ডাক' আসন্ন নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তবে সক্রিয়ভাবে নির্বাচন বয়কটের প্রশ্নে সবাই একমত হতে পারেনি। ডাকের পক্ষ থেকে ন্যূনতম কর্মসূচী হিসাবে নিম্নোক্ত আট দফা ঘোষণা করা হয়ঃ

(ক) ফেডারেল পদ্ধতির পার্লামেন্টারী সরকার;

(খ) সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন;

(গ) অবিলম্বে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার;

(ঘ) পূর্ণ নাগরিক অধিকার প্রবর্তন এবং ১৯৬১ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স এবং বিনা বিচারে আটক ব্যবস্থাসহ সকল কালা কানুন বাতিল;

(ঙ) শেখ মুজিব, খান ওয়ালী খান ও জেড,এ, ভুট্টোসহ সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি এবং কোর্ট ও ট্রাইবুন্যালে রাজনৈতিক মামলাসহ সকল গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার;

(চ) ১৪৪ ধারা মোতাবেক সকল অগণতান্ত্রিক নির্দেশ প্রত্যাহার;

(ছ) শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার প্রত্যার্পণ; এবং

---

৪৪৩ দৈনিক আজাদ, ৮ই জানুয়ারি, ১৯৬৯।

৪৪৪ দৈনিক আজাদ, ৯ই জানুয়ারি, ১৯৬৯।

৪৪৫. প্রাগুক্ত।

৪৪৬. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

(জ) সংবাদপত্রের ওপর আরোপিত সকল বিধি-নিষেধ ও পত্রিকা প্রকাশের ওপর সকল বাধা প্রত্যাহার এবং 'ইত্তেফাক', 'চাট্টাম,' 'প্রগ্রেসিভ পেপার লিমিটেড' ও সকল প্রেস, পত্রিকা ও সাময়িকীসহ যে সকল প্রতিষ্ঠান বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে সেগুলি মূল মালিকের কাছে প্রত্যর্পণ।[৪৪৭]

এ কর্মসূচী ঘোষণা করার সময় বলা হয়, যেকোন বিরোধী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের জন্য এ ফ্রন্টের দ্বার খোলা থাকবে। এর সাথে একটি আন্দোলনের কর্মসূচীও ঘোষণা করা হয়। প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ১৭ই জানুয়ারি দেশব্যাপী সভা, শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন দিবস পালনের ঘোষনা করা হয়। ডাকের অন্যতম নেতা ন্যাপ (মস্কোপন্থী)-এর সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হক ওসমানী উক্ত দিবসের কথা ঘোষণা করে আরো বলেন যে, আগামী দুই মাসের মধ্যে বর্তমান শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য আর একটি দিবস ঘোষনা করা হবে এবং এদিন দেশব্যাপী হরতাল পালিত হবে।

৮ দলের এ কর্মসূচীতে যে সকল দাবী অন্তর্ভুক্ত হয় সেগুলির অধিকাংশই অনেক আগে বিভিন্ন স্তর থেকে উত্থাপিত হয়ে আসছিল, তবে এসবের মধ্যে নতুন যে দাবীটি সংযোজিত হয় তা হচ্ছে শেখ মুজিবের মুক্তি। এ ছাড়া, এ দাবীর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের কোন দাবী জানানো হয় নি। এটা নিশ্চিতই আওয়ামী লীগ (৬-দফাপন্থী) ও ন্যাপ (মস্কোপন্থী)-এর এক বিরাট রকমের ছাড়। কেননা এ কর্মসূচীতে আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ (মস্কোপন্থী)-এর রাজনীতির কোন প্রতিফলনই ঘটে নি। একমাত্র শেখ মুজিবের মুক্তির প্রশ্ন ছাড়া সকল দাবী পিডিএম অনেক আগে থেকেই করে আসছিল। ফলে ন্যাপ (ভাসানী)-এর সাথে এদের আরো একটি স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য সূচিত হয়। অন্যদিকে, উক্ত বিরোধী দলগুলির বৈঠকে ন্যাপ (পিকিংপন্থী)- এর অংশগ্রহণ না করা এবং মওলানা ভাসানীর ডাকে অন্যান্য বিরোধী দলসমূহের সাড়া না দেওয়া -- এই উভয়বিধ কারণে ন্যাপের (পিকিংপন্থী) সাথে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কোন মত বিনিময়ই হয় নি। যেহেতু, ১৭ তারিখের বিক্ষোভ দিবস ঘোষণা করার পর আট দল পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আরো দু'মাস অপেক্ষা করার কথা বলে সেহেতু ছাত্রসমাজসহ আন্দোলনমুখী অন্যান্য শ্রেণী ও পেশার মানুষের কাছে তা তেমন কোন আবেদন সৃষ্টি করতে পারে নি। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির কাছে ছাত্রসমাজ ইতিপূর্বে যে সকল দাবীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানিয়েছিল সে সকল দাবীর মূল বিষয়গুলি ৮-দফায় অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে ৮-দলের প্রতি অনীহা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ৮ দলের অন্যতম শরীক মস্কোপন্থী ন্যাপের মধ্যেও ব্যাপক সমালোচনা ওঠে। রাওয়ালপিন্ডির উক্ত ন্যাপের জেলা শাখার সভাপতি এর তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং বামপন্থী দল হিসাবে ন্যাপ তার সকল নীতি-আদর্শকে বাদ দিয়ে এ ধরনের দক্ষিণপন্থী দলগুলির সাথে ঐক্যফ্রন্ট গঠন করায় বিস্ময় প্রকাশ করেন। এছাড়া, তিনি এধরনের জগাখিচুড়ি মার্কা ফ্রন্টের স্থায়িত্ব সম্পর্কেও সন্দেহ প্রকাশ করেন।

এদিকে, ন্যাপ (ভাসানী) ৭ই জানুয়ারি থেকে একটি দাবী সপ্তাহ পালনের কর্মসূচী ঘোষণা করলেও তা খুব আন্তরিকতার সাথে পালন করে নি। উপরন্তু মওলানা ভাসানী এ সময় ঢাকা শহরকে প্রায় পরিত্যাগ করে চলতে থাকেন। ভাসানী ন্যাপের অন্যান্য বিশিষ্ট নেতার নামে হুলিয়া থাকার কারণে তাঁরাও আত্মগোপন করেন। দাবী সপ্তাহের পক্ষে হাজী দানেশের নামে মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে দুই-একটা বিবৃতি ছাড়া ভাসানী ন্যাপের তেমন কোন সক্রিয় প্রচেষ্টা তখন চোখে পড়ে নি।

অন্যদিকে, আওয়ামী লীগ (৬-দফাপন্থী) 'ডাক' গঠনের পর থেকেই ব্যাপকভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। 'ডাক' গঠনের পর দিনই আওয়ামী লীগ তার কার্যনির্বাহী কমিটির এক সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বৃহত্তর আন্দোলনের পথ প্রদর্শনের জন্য ডাকের অংগ সংগঠনসমূহের সকল জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের পদত্যাগ করার আহবান জানায়। সেই সাথে আওয়ামী লীগকে সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে ১৯৬৭ সালে বহিষ্কৃত সকল সদস্যের ওপর থেকে বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহার করা হয় এবং তাদের প্রতি পুনরায় দলে যোগদানের আহবান জানানো হয়। এটা ছিল তাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। এছাড়া শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তির দাবী জানিয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। শেখ মুজিবের নামে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' জারি করার পর এটাই ছিল তার মুক্তির জন্য আওয়ামী লীগের প্রথম দাবী। এ সময় আওয়ামী লীগের জনসভাগুলিতেও ব্যাপক জনসমাবেশ ঘটতে থাকে। ১০ই জানুয়ারি নান্দাইলের দশ মাইল দূরবর্তী -মধুপুর নামক একটি গ্রামের জনসভাতেও অন্যূন ৩০ সহস্রাধিক জনতার সমাবেশ ঘটে এবং সে সভায় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেন, 'শুধু নির্বাচন বর্জন নয়, নির্বাচন বর্জনের সাথে সাথে কর্মসূচী-ভিত্তিক এমন একটি প্রচন্ড গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে যাতে বর্তমান সরকার জনগণের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়"।[৪৪৮]

এভাবে আওয়ামী লীগ দেশে ব্যাপক সাড়া জাগাতে শুরু করলে মওলানা ভাসানী ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। ঢাকায় ফিরে তিনি সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, এমন গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে যেন বর্তমান শাসনতন্ত্রের অধীনে কোন নির্বাচন না হয়। তিনি আরো বলেন, একটি কার্যকরী গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হলে দেশের প্রতিটি মানুষকে অধিকার অর্জনের সংগ্রামে সামিল করতে হবে যাতে তারা গণঅভ্যুত্থানের জন্য উদ্বুদ্ধ হতে পারে ।[৪৪৯]

তিনি সাংবাদিকদের কাছে আরো বলেন, গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটির প্রতি কার্যকর সহযোগীতার জন্য তিনি তার সকল কর্মীদের নির্দেশ দেবেন। তবে তিনি সংগ্রাম কমিটির কর্মসূচীকে অসম্পূর্ণ বলে আখ্যায়িত করে বলেন যে, এ কর্মসূচীতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন ও কৃষক জনসাধারণের কথা উল্লেখ করা হয়নি। তিনি আরো বলেন, ঢাকায় অনুষ্ঠিত বিরোধী দলগুলির যুক্ত বৈঠকে যোগদানের জন্য তিনি আনুষ্ঠানিক কোন আমন্ত্রণপত্র পাননি; বরং তিনি এ জাতীয় আমন্ত্রণ প্রত্যাশা করেছিলেন। এমনকি, তখন পর্যন্ত তার সাথে সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে কোন যোগাযোগ করা হয়নি বলে তিনি উল্লেখ করেন।

১৪ই জানুয়ারি তারিখে ডাক-এর দাবী দিবসের পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। এ কর্মসূচীর মধ্যে মাত্র দু'টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়ঃ পল্টন ময়দানে জনসভা ও শোভাযাত্রা। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার কোন কর্মসূচী নেওয়া হয় নি, বরং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ১৪৪ ধারা যদি প্রত্যাহার করা না হয় তাহলে ৩জন করে শোভাযাত্রা বের করতে হবে। এতে জনগণের কাছে ৮-দলীয় নেতাদের এক ভয়ার্ত চেহারাই ফুটে ওঠে। ফলে ডাকের অন্তর্ভুক্ত গণতান্ত্রিক দলগুলির সংগ্রামী কর্মীদের মধ্যে বেশ অসন্তোষ দেখা দিতে থাকে।

---

৪৪৭. প্রাগুক্ত।

৪৪৮ আজাদ, ১১ই জানুয়ারি, ১৯৬৯।

৪৪৯ আজাদ, ১৩ই জানুয়ারী, ১৯৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

এ দিকে মওলানা ভাসানী আগের দিন বেশ গরম গরম কথা বলেন, কিন্তু তিনি আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য কোন কর্মসূচী প্রদান করেন নি। বরং তিনি ১৪ই জানুয়ারি হাতিরদিয়াতে এক বিশাল কৃষক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে পরোক্ষভাবে ডাকের কর্মসূচীকে সমর্থন করেন। তিনি এ জনসভায় বলেন, আজ দেশে বিস্ফোরণমূলক অবস্থা বিরাজ করছে। ১৪৪ ধারা জারি করে জনগণের সভা-সমিতি বন্ধ করা যাবে না। কৃষকের হাতে জমি নেই, কিন্তু তার বিক্ষোভ প্রদর্শন ও হরতাল পালনের ক্ষমতা রয়েছে। তারা যদি হাট-বাজারে তাদের পরিশ্রমের ফসল ও অন্যান্য জিনিস বিক্রী বন্ধ করে তাহলে সরকারের মন্ত্রী ও আমলাসহ থানার দারোগাকে টাকা চিবিয়ে খেতে হবে।

এরকম একটি পরিস্থিতিতে ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদ তার ১১দফা কর্মসূচী আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে। ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফার প্রথম দফায় ১৭টি উপধারাতে শিক্ষা সমস্যার বিভিন্ন দিকের কথা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে তার সমাধানের জন্য সুনির্দিষ্ট দাবী-দাওয়া উপস্থাপন করা হয়। দ্বিতীয় দফায় বাক-ব্যক্তি স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের দাবী জানানো হয়। তৃতীয় দফায় পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবী করা হয় এবং স্বায়ত্তশাসনের ব্যাখ্যা হিসাবে আওয়ামী লীগের ৬-দফাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এছাড়া, ছাত্রসমাজের ১১ দফার মধ্যে নিম্নোক্ত দাবিগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়ঃ

(৪) পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধুসহ সকল প্রদেশের স্বায়ত্ত্বশাসন প্রদান করতঃ সাব-ফেডারেশন গঠন;

(৫) ব্যাংক-বীমা, পাট ব্যবসা ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করিতে হইবে;

(৬) কৃষকের উপর হইতে খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস করিতে হইবে এবং বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ করিতে হইবে। সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল ও তহশিলদারদের অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে। পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মণপ্রতি ৪০ টাকা নির্ধারণ ও আখের ন্যায্য মূল্য দিতে হইবে;

(৭) শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী ও বোনাস দিতে হইবে এবং শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিক স্বার্থ-বিরোধী কালা-কানুন প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রদান করিতে হইবে;

(৮) পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জল সম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে;

(৯) জরুরী আইন প্রত্যাহার, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য নিবর্তনমূলক আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে;

(১০) সিয়াটো, সেন্টো, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করিয়া জোট বহির্ভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি কায়েম করিতে হইবে; এবং

(১১) দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি, গ্রেফতারী পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক কারণে জারিকৃত মামলা প্রত্যাহার করিতে হইবে।"[৪৫০]

ছাত্রদের ১১-দফার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এ কর্মসূচীর মধ্যে আওয়ামী লীগের ৬-দফা, ন্যাপের ১৪ দফা এবং ছাত্রসমাজের ১৭ দফা দাবীর এক চমৎকার সমন্বয় ঘটেছে। এ কর্মসূচীর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় প্রশ্নসহ পাকিস্তানের বিভিন্ন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের বিষয়গুলি যেমন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তেমনই কৃষক শ্রমিক-মধ্যবিত্তসহ সকল নিপীড়িত শ্রেণী-গোষ্ঠীর আশু দাবী-দাওয়া তাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ কর্মসূচীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার দাবী, সেইসাথে দেশের বৃহৎ পুঁজিপতি শ্রেণীর একচেটিয়া শোষন-পীড়নের বিরুদ্ধেও দাবী উত্থাপিত হয়েছে। এ কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ও শিক্ষা ব্যবস্থার একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা। ফলে ১১-দফাকে পূর্ব পাকিস্তানের একজন মাঝারি শিল্পপতি যেমন মেনে নিতে পেরেছে, গ্রামের একজন নির্যাতিত কৃষকও তেমনই সমর্থন করতে পেরেছে। ১১-দফাকে নিয়ে তাই বিভ্রান্তি সৃষ্টির আর কোন সুযোগ থাকেনি। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ১১-দফা কর্মসূচী প্রকাশিত হওয়ায় তা সাধারণ মানুষ কর্তৃক ব্যাপকভাবে সমর্থিত হয়। ১১-দফা কর্মসূচী ঘোষিত হওয়ার পর সর্বদলীয় ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দ ঘনঘন বিবৃতির মাধ্যমে তা প্রচার করার চেষ্টা করেন। ইতিমধ্যে ১৭ই জানুয়ারি দাবী দিবস পালনের কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে ডাক-এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন স্থানে জনসমাবেশ ও বিবৃতি প্রদান করতে থাকে। তবে এ দিনের কর্মসূচীর সফলতা নিয়ে বেশ সংশয় দেখা দেয়।

ইতিমধ্যে সর্বদলীয় সংগ্রামী ছাত্রসমাজ দেশব্যাপী সরকারী নির্যাতন ও গ্রেফতারের প্রতিবাদ এবং তাদের ১১-দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে ১৭ই জানুয়ারি প্রদেশব্যাপী ছাত্রসভা ও বিক্ষোভ মিছিলের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১৫ই জানুয়ারি ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদ এ কর্মসূচী পালনের কথা ঘোষণা করে। এর পর পরই সরকার এক হ্যান্ড আউট-এ ঘোষণা করে কেউ প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে যদি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার চেষ্টা করে তাহলে তাকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।[৪৫১] এছাড়া, উক্ত হ্যান্ডআউটে দুই জনের অধিক ব্যক্তির এক সঙ্গে চলাচল নিষিদ্ধসহ আরো অনেক আপত্তিকর নির্দেশ জারি করা হয়। পর দিন অর্থাৎ ১৬ই জানুয়ারি সংবাদপত্রে ছাত্রদের বিক্ষোভের কর্মসূচী এবং সরকারের হ্যান্ড আউটের বক্তব্য একই সাথে প্রকাশিত হওয়ার কারণে ছাত্রসমাজ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে উত্তেজনা আরো বৃদ্ধি পায়। ছাত্রসমাজের মধ্যেও কর্মসূচী বাস্তবায়িত করার পক্ষে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা দেয়। এই একই দিনে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা সাধারণ ধর্মঘট, কালোব্যাজ ধারণ ও কালো-পতাকা উত্তোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করে। জগন্নাথ কলেজের ছাত্ররাও তাদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছিল। ফলে ঢাকা শহরের সমগ্র ছাত্রসমাজ এ দিনটি পালন উপলক্ষে বেশ সক্রিয় প্রচেষ্টা গ্রহণ করে।

---

৪৫০ স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র: দ্বিতীয় খন্ড: পৃ-৪০৭-৮।
৪৫১ আজাদ, ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

১৭ই জানুয়ারি গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি তাদের পূর্ব ঘোষিত দাবী দিবসের কর্মসূচী পালন উপলক্ষে কর্মীদের নিয়ে বায়তুল মোকাররম মসজিদে সমবেত হয়। সেদিন ছিল জুম্মার দিন। নামাজ শেষে তারা পূর্ব ঘোষিত তিন জনের দলে মিছিল বের করার পরিবর্তে দুই জন করে মিছিল করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ সময় পুলিশ বাধা দিলে সামান্য ধস্তা-ধস্তির পর গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটির নেতৃবৃন্দ কিছু কর্মী নিয়ে দুই জন করে মিছিল বের করতে থাকলে তাতে রায়ট কারথেকে রঙিনপানি ছিটানো হয়। দুই জনের মিছিলগুলি পুলিসের বেরিকেড ভেঙ্গে বের হয়ে আসায় তার ওপর পুলিশ মৃদু লাঠিচার্জ করে। এর পর দুই জনের মিছিলগুলি জিন্নাহ এভিনিউ-এর কাছে একত্রিত হওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের ওপর ব্যাপকভাবে রঙিন পানি বর্ষণ করে। মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা বিচ্ছিন্নভাবে নবাবপুর রোড দিয়ে অগ্রসর হয়ে ঢাকা বার লাইব্রেরী মিলনায়তনে সমবেত হয়। পথিমধ্যে মৃদু লাঠিচার্জে ২৫ জন কর্মী সামান্য আহত হয় এবং ৫০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়। অবশ্য নেতৃবৃন্দ যাতে আক্রান্ত না হন সে ব্যাপারে পুলিশ কর্মকর্তারা সব সময় সতর্ক ছিলেন। এভাবে কোনক্রমে ডাক-এর শোভাযাত্রার কর্মসূচী সফল হলেও তা কখনও বিক্ষোভ মিছিলে পরিণত হয়নি। জনসভা অনুষ্ঠানের যে কর্মসূচী ছিল তাও বাতিল করা হয়। অর্থাৎ ডাকের 'বিক্ষোভ মিছিল' ও 'জনসভা অনুষ্ঠান' ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তারা এদিন নতুন কোন কর্মসূচীও ঘোষণা করে নি। তবে নেতৃবৃন্দ বার লাইব্রেরী হলে একটি সংক্ষিপ্ত সভা অনুষ্ঠান করেন এবং সংগ্রাম অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

অন্যদিকে, সংগ্রামী ছাত্রসমাজের কর্মসূচীকে বানচাল করার লক্ষ্যে সশস্ত্র পুলিশ ও ই.পি.আর. বাহিনী সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ঘিরে ফেলে। ছাত্ররা পুলিশ ও ই,পি,আর-দের ব্যাপক প্রস্তুতিকে উপেক্ষা করে বটতলায় ছাত্রসভা অনুষ্ঠান করে এবং এর পর এক বিরাট মিছিলনিয়ে ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন থেকে রেসকোর্স ময়দানের দিকে অগ্রসর হয়। এ পর্যায়ে পুলিশ ও ই,পি,আর বাহিনী ছাত্রদের ওপর বেপরোয়া লাঠিচার্জ শুরু করে এবং অসংখ্য ছাত্রকে গ্রেফতার করে। রায়ট কার এসে রঙিন পানি ছিটায়। এসব উপেক্ষা করে ছাত্রদের খন্ড খন্ড মিছিল জঙ্গী রূপ নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। পুলিশের লাঠিচার্জের প্রতিবাদে ছাত্ররা পুলিশের ওপর ব্যাপকভাবে ইষ্টক বর্ষণ শুরু করে। এলাকাটি তখন এক যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। পুলিশবাহিনী ছাত্রদের উপর ব্যাপক কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। ফলে ছাত্ররা সাময়িকভাবে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এর পর ঘন্টাখানেকের মধ্যেই ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই বিখ্যাত বটতলায় একত্রিত হয় এবং তীব্র ভাষায় এহেন হামলার প্রতিবাদ জানিয়ে মূহর্মুহ শ্লোগান ও বক্তৃতা দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র অঙ্গনে পুলিশের বেপরোয়া প্রবেশ এবং ছাত্রদের ওপর নির্মম হামলার প্রতিবাদে সর্বদলীয় ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে এসভায় পরদিন অর্থাৎ ১৮ই জানুয়ারি ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘটের আহ্বান জানান হয়। বিক্ষোভ মিছিল বের করার আগেই অবশ্য তারা আরো একটি কর্মসূচী ঘোষণা করে। সে কর্মসূচীটি ছিল ১লা ফেব্রুয়ারি সারা প্রদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারণ ধর্মঘট পালন।

১৮ই জানুয়ারি ঢাকা শহরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে ধর্মঘট উপলক্ষে পরিস্থিতির এক মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। সরকারী উচ্চ মাধ্যমিক মহিলা মহাবিদ্যালয়সহ ঢাকা শহরের প্রায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এদিন ধর্মঘট পালিত হয়। সকাল থেকেই একদিকে যেমন সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাকে পুলিশ বাহিনী ঘিরে ফেলে, অন্যদিকে ঢাকা শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শত শত ধর্মঘটী ছাত্র-ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে সমবেত হয়। দিনের বেলায়ই জ্বলন্ত মশাল হাতে অসংখ্য ছাত্র বিভিন্ন ধরনের শ্লোগানমুখর অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেকার বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করতে থাকে। ঢাকা কলেজ, জগন্নাথ কলেজ, কায়েদে আজম কলেজ, সরকারী মহিলা কলেজসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রবেশ করে আলাদাভাবে মিছিল করতে থাকে। সমগ্র কলা ভবনটি যেন মিছিলে মিছিলে ভরে যায়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এমন সময় সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠন জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের এন,এস,এফ ছাত্ররা আকস্মিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এসে এক সভা করে। ঐ সংগঠনের সভাপতির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় ছাত্রসমাজের ওপর পুলিশী নির্যাতনের তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিলের দাবীও জানানো হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র অঙ্গনে পুলিশ ও ই.পি.আর বাহিনীর প্রবেশ ও ছাত্রদের ওপর বেপরোয়া হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়। উক্ত সভায় এন,এস,এফ-এর কর্মীরা পুলিশী নির্যাতন ও স্বেচ্ছাচারী শাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগান দেয়। বেলা বারোটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় 'আজাদ'-এর ভাষায় 'সাম্প্রতিককালের বৃহত্তম' ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে সর্বদলীয় ছাত্রসমাজের সংগ্রামীনেতৃবৃন্দ আগের দিন বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে পুলিশের বেআইনী অনুপ্রবেশ ও ছাত্রদের ওপর নির্দয় হামলার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং আইনের নামে বেআইনী শাসনব্যবস্থা ছাত্রসমাজ মেনে নেবে না বলে উল্লেখ করেন। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ছাত্র মিছিল বের করা হবে বলেও নেতৃবৃন্দ ঘোষণা দেন।

এর পরই হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন ধরনের শ্লোগান সহকারে রাজপথে বের হয়ে পড়ে। মিছিলের ওপর পুলিশবাহিনী বেপরোয়া লাঠিচার্জ করে ও অসংখ্য কাঁদুনে গ্যাস ছুঁড়ে। ফলে পুলিশের সাথে ছাত্রদের ব্যাপক সংঘর্ষ শুরু হয়। ছাত্ররা পুলিসের ওপর ইষ্টক বর্ষণ করতে থাকে। কাঁদুনে গ্যাসের শেল তুলে নিয়ে ছাত্ররা তা পুলিশের দিকে ছুড়তে থাকে। ফলে পুলিশ আরো মরিয়া হয়ে কাঁদুনে গ্যাসের শেল বর্ষণ করতে থাকে। ফলে সমগ্র কলা ভবন এলাকা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। ছাত্ররা এসব উপেক্ষা করে পুলিশের প্রতি ইষ্টক বর্ষণ অব্যাহত রাখে। ফলে ইটের আঘাত আর গ্যাসের ধোয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পুলিশ রোকেয়া হলে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সেখানেও ছাত্রীরা শ্লোগানমুখর অবস্থায় পুলিসের ওপর ইষ্টক বর্ষণ শুরু করে। এক পর্যায়ে পুলিসের গায়ে ছাত্রীরা গরম পানি ঢেলে দেয়। পুলিশ রোকেয়া হলেও ৭ রাউন্ড কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। তখন ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রদেরবেরিকেড আর ইটের আঘাতের ভয়ে পুলিশ কলা ভবন ছেড়ে চলে যায়। তবে উক্ত পুলিশী হামলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন কার্যত হাসপাতালে পরিণত হয়। ছাত্রদের ওপর পুলিসের এ মারাত্মক হামলার পরিপ্রেক্ষিতে বিশিষ্ট শিক্ষকরা সহানুভূতি জানাতে আসলে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা তাদেরকে পদত্যাগ করার দাবী জানায়। এ সময় ছাত্রদের একটি জঙ্গী মিছিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়ে বিক্ষোভ প্রকাশ করতে করতে শেরে বাংলার মাজারের পাশ দিয়ে আবদুল গনি রোড হয়ে গুলিস্তান পৌছায়। পুলিশ কিছুদূর পর্যন্ত এ মিছিলের পিছ পিছ যায়, কিন্তু কোন বাধা দেয় নি। এভাবে ছাত্রসমাজ সম্পূর্ণভাবে সরকারের জারীকৃত১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে।

১৮ই জানুয়ারি ছাত্রদের ওপর এই ব্যাপক পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদ কল্পে প্রাদেশিক পরিষদের বিরোধী দলীয় ও স্বতন্ত্র সদস্যগণ এ বিষয়ে আলোচনার দাবী করেন। তাদের এ দাবী উপেক্ষিত হলে, তাঁরা পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্রদের ওপর হামলার প্রতিবাদ করে আওয়ামী লীগ (৬-দফাপন্থী) এন.এস.এফ, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, মওলানা ভাসানী ও বিচারপতি মাহবুব মোর্শেদসহ বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রদান করেন। সর্বদলীয় সংগ্রামী ছাত্রসমাজ এ হামলার প্রতিবাদে ২০শে জানুয়ারি সারা প্রদেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটের আহবান জানায়। একই দিন ঢাকার বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের ২৫ জন নেতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও তার বিভিন্ন হলে পুলিসের কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ, শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রার ওপর লাঠিচার্জ এবং বহু ছাত্রকে গ্রেফতার, ইকবাল হল ও জিন্নাহ হলের অভ্যন্তরে ইপিআর বাহিনীর হামলা ও গ্রেফতার ইত্যাদি সরকারী নির্যাতনের প্রতিবাদ করে এক যুক্ত বিবৃতি দেন। ফলে পরিস্থিতি ভীষণ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এ ঘটনার প্রতিবাদ করে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১৯শে জানুয়ারি এক প্রতিবাদ সভা করে। এ সভার পর তারা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল বের করে, যার উপর পুলিশ নির্মমভাবে হামলা চালায়। ছাত্রদের ওপর পুলিশী হামলার খবর সংবাদপত্রে ফলাও করে প্রকাশিত হয়। ছাত্ররা ২০শে জানুয়ারির ধর্মঘটকে বিশেষ গুরুত্ব দেয় এবং এ জন্য তারা ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

২০শে জানুয়ারি সকাল থেকেই ছাত্রদের মধ্যে ধর্মঘট কর্মসূচী বাস্তবায়িত করার জন্য ব্যাপক সক্রিয় প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। ১৮ই জানুয়ারির ধর্মঘটে ঢাকার প্রায় সকল কলেজেই ধর্মঘট পালিত হয়। কিন্তু এদিন ঢাকা শহরের সকল কলেজে শুধু ধর্মঘট পালিত হয় তা নয়, প্রায় সকল স্কুলেও ধর্মঘট পালিত হয়। নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট সফল করে ছাত্র-ছাত্রীরা দলে দলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে থাকে। ১৮ তারিখে যেমন ছাত্রদের হাতে ছিল গুলতি, পুলিশ আক্রমণ করলে তাদের হাতে ওঠে ইষ্টক খন্ড কিন্তু এদিন ছাত্ররা বহন করে মজবুত বাঁশের লাঠি, কাঠের রোলার আর লৌহার রড। এদিন ছাত্ররা যেন পুলিশের সাথে সংঘর্ষ করার প্রস্তুতি নিয়েই এসেছিল। ১৮ তারিখে ছাত্র মিছিলের ওপর পুলিশের নির্মম লাঠিচার্জের ফলে যে শত শত ছাত্র আহত হয়েছিল সেই উপলব্ধি থেকেই ছাত্ররা এদিন এ বিশেষ প্রস্তুতি গ্রহণ করে। বেলা বারোটার মধ্যে সমগ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মিছিলে মিছিলে ছেয়ে যায়। 'আমাদের সংগ্রাম, চলবেই চলবেই' সহ বিভিন্ন শ্লোগানে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস মুখরিত হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে এন,এস,এফ-এর একদল ছাত্র এসে এক সংক্ষিপ্ত সভা করে এবং ১৮ তারিখে পুলিশের বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অবৈধ প্রবেশ এবং ছাত্রদের ওপর নির্দয় আক্রমণের তীব্র প্রতিবাদ জানায়। এর পর স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানিয়ে সভা শেষ করে। বেলা বারটায় অনুষ্ঠিত হয় সর্বদলীয় সংগ্রামী ছাত্র পরিষদের সভা। এ সভায় অন্যূন দশ হাজার ছাত্রের সমাবেশ ঘটে। মুহুর্মূহ শ্লোগান আর তেজদিপ্ত বক্তৃতা থেকে এটা খুব পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, ছাত্ররা এদিন পুলিশের সকল বাধাকে অতিক্রম করবে। উক্ত সভায়, ১১ দফার দাবীতে এবং ছাত্রদের ওপর পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে ২৭শে জানুয়ারি প্রদেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট ও ১লা ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী পুর্ণ হরতাল পালনের আহবান জানানো হয়। ছাত্ররা এর পরই হাজারে হাজারে রজপথে নেমে পড়ে। পুলিশ এ দিন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার মধ্যে সেভাবে বেরিকেড সৃষ্টি করেনি। প্রচন্ডভাবে উত্তেজিত ছাত্র-ছাত্রীগণ লাঠি আর লোহার রড হাতে নিয়ে উচ্চকিত কণ্ঠে শ্লোগান দিতে দিতে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এগুতে থাকে। মিছিলের সকল ছাত্র-ছাত্রীই দৌড়িয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। এভাবে মিছিল দ্রুত এগিয়ে এসে ১২টা ৪২ মিনিটে সর্বপ্রথম বাধা পায় পুরোনো শহরে ঢোকার মুখে রশিদ বিল্ডিং-এর কাছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়ে এসে বাংলা একাডেমী, চার নেতার মাজার ও কার্জন হল পার হয়ে মিছিলের সম্মুখ ভাগটি যখন রশিদ বিল্ডিং-এর নিকট চার রাস্তার মোড়ে এসে পৌছায় তখন ছাত্রদের ওপর পুলিশ হামলা চালায়। একই সাথে অসংখ্য কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করা হয়, রঙিন পানি ছিটানোর জন্য রায়ট কার বিকট শব্দ করে এগিয়ে আসে আর পুলিশ বেপরোয়া লাঠিচার্জ করে। ছাত্ররা এতে মারমুখি হয়ে ওঠে। তারাও লাঠিধারী পুলিশদের ওপর লঠি আর লোহার রডসহ পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। তিন জন পুলিশকে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা বেদম প্রহার করে, ফলে তারা মাটিতে পড়ে যায়। পুলিশের অব্যাহত আক্রমণে ছাত্ররা আরও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। দু'জন আহত পুলিশকে জোর করে ধরে নিয়ে পার্শবর্তি বাড়িগুলির পিছনে রাখলে পুলিশ ছাত্রদেরধাওয়া করে। ছাত্রদের কেউ কেউ মেডিক্যাল হাসপাতালের মধ্যে ঢুকে পড়ে। পুলিশ তাদের ধাওয়া করে নিয়ে ৯০০ বেড বিশিষ্ট ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতালের মধ্যে অন্ততঃ চার রাউন্ড কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। ফলে সমগ্র হাসপাতাল শ্বাসরুদ্ধকর বিষাক্ত ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। এ ঘটনার ফলে ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ হয়ে শহীদ মিনারের নিকট পৌরসভার একটি ট্রাকে আগুন লাগিয়ে দেয়।

ইতিমধ্যে ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিলের একাংশ পুলিশ বাহিনীর সকল ব্যূহ অতিক্রম করে পুরোনো শহরে ঢুকে পড়ে এবং উচ্চকিত শ্লোগান সহকারে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে বাহাদুর শাহ পার্কের নিকট একটি সভায় মিলিত হয়। উচ্চ কণ্ঠ শ্লোগান ও মারমুখি ভাব নিয়ে এ মিছিলটি নির্বিঘ্নে পৌছায়। সশস্ত্র ইপিআর বাহিনী সেখানে নিয়োজিত থাকলেও তারা বাধা দিতে সাহস পায় নি। অন্যদিকে, রশিদ বিল্ডিং-এর চৌরাস্তার মোড়ে ছাত্ররা বাঁধা পেয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এখানে জীপ, ভ্যান ও রায়ট কার নিয়ে কয়েক শত পুলিশের একটি দল অবস্থান করছিল।

ছাত্র মিছিলের মুল অংশের ওপর পুলিশ হামলা চালালে ছাত্ররা পুলিশের সাথে খন্ডযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে ধাওয়া আর পাল্টা ধাওয়ার মধ্যে এক পর্যায়ে পুলিশ বাহিনী উক্ত চৌরাস্তার মাঝখানে এসে উপস্থিত হয়। ইতিমধ্যে ছাত্ররা উক্ত চারটি রাস্তায়ই ব্যারিকেট সৃষ্টি করে। ছাত্রদের ধাওয়া করে রায়ট কারটি ফিরে গেলেই পোষ্ট গ্রাজুয়েট কলেজ অঙ্গনে অবস্থানরত ছাত্র-ছাত্রীগণ একটি বৃহৎ ষ্টীম রোলার ও পুরাতন লোহার গেইট দিয়ে মেডিক্যাল কলেজের সামনের রাস্তাটি বন্ধ করে দেয়। অপর দিকে, বিশ্ববিদ্যালয় মাঠ ও টি.বি. ক্লিনিকের সম্মুখস্থ রাস্তা দু'টিকে ছাত্ররা কংক্রিটের পাইপ, ইট ও বাস দিয়ে বন্ধ করে ফেলে। একই সাথে নাজিমুদ্দিন রোডের লেভেল ক্রসিংটিও ছাত্র-ছাত্রীগণ বন্ধ করে দেয়। ফলে পুলিশবাহিনী তাদের সকল যানবাহন ও রায়ট কার নিয়ে ছাত্রদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে পড়ে। এ পর্যায়ে শুরু হয় পুলিসের ওপর ছাত্রদের প্রবল ইষ্টক বর্ষণ। প্রতিটি ব্যারিকেডকে রক্ষা করার জন্য এত ছাত্র মোতায়েন ছিল যে, উহা ভাঙ্গার জন্য কোন পুলিশ এগিয়ে আসার সাথে সাথেই তার ওপর বৃষ্টির মত ইষ্টক বর্ষণ হতে থাকে। এপর্যায়ে পুলিশ বাহিনী তাদের সকল বাহন ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চৌমাথার নিকট আসলে তাদের ওপর ছাত্রদের আক্রমণ আরো তীব্রতর হয়। চারদিক থেকে ছাত্ররা তাদের ওপর নিক্ষিপ্ত কাঁদুনে গ্যাসের শেল পুলিসের প্রতি ছুড়ে মারতে ও প্রচন্ড ইষ্টক বর্ষণ করতে থাকে। ইতিমধ্যে ছাত্ররা আরো একজন পুলিশকে ধরে ফেলে বেদম প্রহার করে। পুলিশটির ছেঁড়া জামাটিতে ছাত্ররা অগ্নিসংযোগ করে এবং তা নিয়ে ছাত্ররা মিছিল করতে থাকে। পুলিশটিকে অবশ্য হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ছাত্রদের দ্বারা এভাবে ঘেরাও হয়ে পড়লে পুলিশরা অসংখ্য কাঁদুনে গ্যাসের শেল মারতে থাকে। কিন্তু রায়ট কার ও অন্যান্য গাড়ী ব্যবহার করতে না পারায় তাদের পক্ষে ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। বেরিকেড থাকার কারণে বাইরে থেকে পুলিশ এসেও তাদের সাহায্য করতে পারছিলনা। এ পর্যায়ে ছাত্রদের ইষ্টক বর্ষণে বেশ কয়েকজন পুলিশ আহত হয়। এভাবে ২০ মিনিট আটক থাকার পর পুলিশ যে কোন একটি বেরিকেড ভেঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

ফেলার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। পর পর দু'বার পুলিশ ছাত্রদের বেরিকেড ভেঙ্গে ফেলে বের হওয়ার চেষ্টা করলে ছাত্রদের প্রচন্ড ইষ্টক বর্ষণে কাবু হয়ে সে প্রচেষ্টা থেকে বিরত হয়। তৃতীয়বার পুলিসের একাংশ ইষ্টক বর্ষণকে অগ্রাহ্য করে ছাত্রদের ওপর লাঠিচার্জ করতে করতে এগিয়ে আসে এবং তাদের বাহন ও রায়ট কার দিয়ে পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজ সম্মুখস্থ গেট ভেঙ্গে ফেলে। পুলিশ দ্রুত তাদের যানবাহনে ওঠার জন্য দৌড়াতে থাকে। অন্যদিকে, ছাত্ররা পিছন থেকে ইষ্টক বর্ষণ করতে থাকে। সে যা'হোক, ছাত্রদের কাছে পুলিশবাহিনী এভাবে যখন পরাস্থ হয়ে পালিয়ে যেতে থাকে,ঠিক তখনই ঘটে এক আকস্মিক বিপর্যয়। পুলিশ বাহিনীর পিছনে ধাবমান ছাত্রদের ওপর পুলিশ আকস্মিকভাবে গুলিবর্ষণ করে।[৪৫২] ফলে সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) নেতা আসাদুজ্জামানসহ ৪ জন ছাত্র আহত হন। আসাদুজ্জামান ঘটনাস্থলেই নিহত হন এবং বাকি তিন জন মারাত্মকভাবে আহত হন। এঘটনার পর পরই পরিস্থিতি নতুন মোড় নেয়।

ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান নিহত হওয়ার সংবাদ দ্রুতগতিতে সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাসহ রাজধানীর বিভিন্ন স্থানের নাগরিকগণ স্তম্ভিত হয়ে পড়েন। এ প্রসঙ্গে ২১শে জানুয়ারি প্রকাশিত 'আজাদ' এর এক সংবাদে বলা হয়ঃ "অপ্রত্যাশিত এই দারুণ মর্মান্তিক সংবাদ শুনিবার সংগে সংগে বিভিন্ন স্থান হইতে ছাত্র-ছাত্রীগণ মেডিক্যাল কলেজের দিকে ছুটিয়া আসিয়া কলেজ প্রাঙ্গনে সমবেত হইতে থাকে। ....ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে একটি কালো-পতাকা উত্তোলণ করা হয়। তখন উপস্থিত সকল ছাত্র-ছাত্রীর মন তারাক্রান্ত ও চক্ষু অশ্রুশিক্ত ছিল। কাহারও মুখে কোন কথা ছিলনা। এমনিভাবে প্রায় দশ মিনিটকাল অতিবাহিত হইবার পর হঠাৎ বিক্ষুব্ধ ছাত্র-ছাত্রীগণ "শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেবো না", "সংগ্রাম সংগ্রাম চলবে চলবে" শ্লোগানে সমগ্র এলাকা প্রকম্পিত করিয়া তোলেন।"[৪৫৩]

বেলা আড়াইটায় ছাত্র-ছাত্রীরা শোক সভায় মিলিত হয় এবং সবাই হাত তুলে সংগ্রামের শপথ গ্রহণ করে ও দুই মিনিট নীরবতা পালন করে। এর পর ছাত্র-ছাত্রীরা কালো ব্যাজসহ খালি পায়ে এক দীর্ঘ শোক মিছিল বের করে। এ বিশাল শোক মিছিল বার বার ঢাকার মূল শহরের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রতিবারই ইপিআর বাহিনী তাদের বাঁধা দেয়। মিছিলটি নিউমার্কেট, সায়েন্স লেবরেটরী ও শাহবাগ হয়ে শহীদ মিনারে ফিরে আসে। এর পর মহসিন হল, ইকবাল হল, জগন্নাথ হলসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রাবাস থেকে শোক মিছিল বের হয় এবং একইভাবে ইপিআর কর্তৃক বাঁধা পেয়ে শহীদ মিনারে গিয়ে শপথ বাক্য পাঠ করার মধ্য দিয়ে শোক মিছিলের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ঐদিন শুধু ঢাকা নয়, সারা দেশে ছাত্র ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে ১৪৪ ধারা জারি করার ফলে ছাত্রদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ হয় এবং সকল জায়গাতেই ব্যাপক কাঁদুনে গ্যাস ছোড়া হয় এবং ধর্মঘটি ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে আসলে তাদের ওপর ব্যাপক লাঠিচার্জ করা হয়। দেশের অন্যান্য স্থানে ১৪৪ ধারা জারি না থাকার কারণে শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয় এবং ধর্মঘটের কর্মসূচী সফল হয়। কিন্তু ঢাকা শহরে পুলিশের গুলীবর্ষণ ও ছাত্র হত্যার সংবাদ প্রচারিত হলে সর্বত্র ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

অপরাহ্নে সকল শোক মিছিল শহীদ মিনারে ফিরে আসলে সেখানে আবার একটি ছাত্র সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামানের হত্যা ও ছাত্রসমাজের ওপর পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ ২১শে জানুয়ারি রাজধানী ঢাকায় পূর্ণ হরতাল, ২২ থেকে ২৪ তারিখ পর্যন্ত শোক দিবস পালন ও সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট, ২৩ শে জানুয়ারি সন্ধ্যায় মশাল মিছিল এবং ২৪শে জানুয়ারি সারা দেশে হরতাল পালনের আহবান জানান। শোক সভায় ছাত্র নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেন, পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ আজ যে আন্দোলনের সূচনা করল ১১ দফা দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত তা থামবেনা।

উক্ত ছাত্র হত্যার তীব্র প্রতিবাদ করে ডাক ও ভাসানী ন্যাপসহ অসংখ্য রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন বিবৃতি দেয়। এবং এ ন্যাক্কারজনক ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী করে। তবে ২০শে ডিসেম্বরের আসাদুজ্জামানের মৃত্যুর ঘটনাটি সমাজে এমন মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যে, আন্দোলনের কর্মসূচীতে গুণগত পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে ওঠে। যদিও পরদিন হরতাল আহবান করা হয়, তবে এ হরতালের পর কি-- এ প্রশ্নটি সবার কাছে অত্যন্ত বড় হয়ে দেখা দেয়। ছাত্র ইউনিয়নের (মেনন) মধ্যে তা অতিমাত্রায় লক্ষ্য করা যায়। ছাত্র ইউনিয়ন মতিয়া গ্রুপ সে সময় "ডাক" নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল থাকায় তাদের নির্দেশে কাজ করে। ফলে তাদের মধ্যে কোন বিভ্রান্তি ছিলনা। অন্যদিকে, ছাত্রলীগের মূখ্য ছিল 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' বাতিল ও শেখ মুজিবের মুক্তি। তাই সিরাজুল আলম খানের দক্ষ নেতৃত্বে এছাত্রদের এ সংগ্রামশেখ মুজিবের মুক্তি ও ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের ব্যাপক আন্দোলনে রূপান্তরিত করার সুস্পষ্ট লক্ষন দেখা যায়। উপরন্তু, ডাক-এর সাথে আওয়ামী লীগের সম্পর্কিত হওয়াকে ছাত্র লীগ ভাল চোখে না দেখলেও ডাক নেতৃবৃন্দ ২০শে জানুয়ারি ছাত্রদের কর্মসূচীকে সমর্থন জানানোর কারণে ছাত্র লীগের জন্য উহা বাড়তি অনুপ্রেরণার বিষয় হয়ে ওঠে। কিন্তু ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ) গোড়া থেকেই ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার ব্যাপারে ছাত্র লীগের সাথে বিভিন্ন সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও, বিশেষতঃ ১৭ তারিখে মতিয়া গ্রুপ ছাত্র ইউনিয়নের প্রচন্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও ছাত্র সভাকে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার আন্দোলনে রূপান্তরিত করে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখলেও, কিংবা ১৮ই জানুয়ারি ছাত্র-মিছিলের ওপর ব্যাপক পুলিশী হামলাকে উপেক্ষা করে ছাত্র-মিছিলের একাংশকে গুলিস্তান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেও, এমনকি ২০শে জানুয়ারি রশিদ বিল্ডিং-এর নিকটে চার রাস্তার মোড়ে পুলিসের বিরুদ্ধে ব্যারিকেড গড়ে তুলে আন্দোলনকে জঙ্গী রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা গ্রহণ করলেও যখন আসাদুজ্জামান নামকএকজন সক্রিয় নেতা মারা যান তখন উহা একটি মারাত্মক বিভ্রান্তিমূলক পরিস্থিতিতে নিপতিত হয়। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে মেনন গ্রুপ ছাত্র ইউনিয়নের তৎকালীন কার্যকরী সাধারণ সম্পাদিকা দীপাদত্ত বলেনঃ "২০শে জানুয়ারি আসাদ মারা যাওয়ার পর ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃত্ব একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। এর পর কি করবে, কি পদক্ষেপ নেবে, কিভাবে কর্মীদেরকে আন্দোলনে টেনে নিয়ে আসবে, কিভাবে তাদেরকে নেতৃত্ব দেবে এবং কিভাবে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মধ্যে সক্রিয় ভূমিকা রেখে নিজেদের নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করবে তার কোন কিছুই ঠিক করতে পারে নি। ২৪শে জানুয়ারি পর্যন্ত অনেক মারাত্মক ঘটনা ঘটে, কিন্তু ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ) সংগঠিতভাবে এসকল কর্মকান্ডে অংশ নিতে পারেনি। তখন নেতৃত্ব

---

৪৫২. আজাদ, ৩০শে জানুয়ারি, ১৯৬৯।
৪৫৩. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে ঘটনাকে যে একটি নির্দিষ্ট পরিনতির দিকে নিয়ে যাওয়া বা পরিস্থিতির ওপর সংগঠনের রাজনীতির একটি প্রভাব রাখা এসব কিছুই আমরা করতে পারিনি।"

দীপাদত্ত আরো বলেনঃ "ছাত্র লীগের অবস্থা ছিল কিন্তু ভিন্ন। এমনিতে তাদের হাতে ডাকসুর সহসভাপতির পদটি ছিল। অন্য দিকে, সিরাজুল আলম খান এত দক্ষতার সাথে এবং এত সক্রিয়ভাবে পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ছাত্র লীগকে প্রস্তুত করতে থাকেন যে, সহজেই এ আন্দোলনে ছাত্রলীগ নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে সক্ষম হয়। গত কয়েক মাস ধরে ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ) বিভিন্ন প্রশ্নে খুবই সক্রিয় ভূমিকা রেখে আইয়ুবের স্বৈরশাসন-বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী ছাত্র সংগঠন হিসাবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল, এন,এস,এফ-এর গুন্ডামির বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রায় একক ভূমিকা পালন করে সে নেতৃত্বকে আরো শক্তিশালী করেছিল, শেষ পর্যন্ত ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার আন্দোলনে ছাত্রলীগও ছাত্র ইউনিয়নের (মেনন গ্রুপ) ভূমিকাকে গোপনে সমর্থন করে চলেছিল, সেই সংগঠনটি ২০ তারিখের পর থেকে পিছনে পড়ে যেতে থাকে, আর এগিয়ে যায় ছাত্র লীগ।"[৪৫৪]

ছাত্র ইউনিয়নের (মেনন গ্রুপ) এ বিভ্রান্তির কারণও ছিল। বিভিন্ন কেন্দ্রে ভিভক্ত গোপন কমিউনিস্ট পার্টি ও ভাসানী ন্যাপ কারো নিয়ন্ত্রণই এ ছাত্র সংগঠনটির ওপর ছিল না। অন্যদিকে, গোপন কমিউনিস্ট গ্রুপগুলির তো নয়ই, এমনকি ভাসানী ন্যাপেরও এ সময় কোন আন্দোলনের কর্মসূচী ছিল না। অপর দিকে, মাওলানা ভাসানী কয়েক সপ্তাহ আগেওঅত্যন্ত সক্রিয় থাকলেও এ পর্যায়ে তাকেও খুঁজে পাওয়া যায় নি। এরকম অবস্থায় ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ) নেতৃত্ব একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। উপরন্তু, তখনকার ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ) মূল নেতৃত্ব যাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তারা ছিল মূলতঃ ব্যক্তিগতভাবে কাজী জাফর আহমদের সমর্থক। সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল্লাহ-এর ওপর আটকাদেশ জারি থাকার কারণে তিনি চলমান ছাত্র আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। ফলে অন্ততঃ সাময়িকভাবে হলেও ছাত্র ইউনিয়নের (মেনন গ্রুপ) মধ্যে এ সময় চলছিল মারাত্মক রকমের নেতৃত্ব শূণ্যতা। ছাত্র ইউনিয়ন মতিয়া গ্রুপ কিন্তু এ ধরনের নেতৃত্ব শূণ্যতায় ভোগেনি। কেননা তাদের সাথে ছিল গোপন কমিউনিস্ট পার্টির ঘনিষ্ট যোগাযোগ। তবে ২১ শে জানুয়ারি থেকে আন্দোলনে স্বতস্ফূর্ততা প্রধান্য পায়। তবে ঐদিন ঘটে যায় এক সাংঘাতিক ঘটনা। ১৪৪ ধারা জারি থাকলেও কেও তা মানেনি। মিছিলে মিছিলে রাজপথ ভরে ওঠে। পুর্ণ হরতাল পালিত হয়। এই দিনও ইপিআর বাহিনী কয়েক রাউন্ড গুলীবর্ষণ করে। এতে ৬ জন মারাত্মকভাবে আহত হয়। বেয়নেট চার্জেও কয়েকজন আহত হয়। বায়তুল মোকাররমে অনুষ্টিত হয় লক্ষাধিক লোকের গায়েবি জানাজা। এতে ছাত্র-শ্রমিকসহ শহরের সকল স্তরের মানুষই শুধু যোগ দেয় নি, দুর দূরান্ত থেকে হেঁটে এসে যোগ দেয় অসংখ্য কৃষক। আসাদের মৃত্যুর পর সারা ঢাকা শহরের মানুষের মধ্যে কি বিস্ময়কর জাগরণ আর ঘৃণা সৃষ্টি হয় তা ২২ জানুয়ারি প্রকাশিত দৈনিক আজাদের নিম্নোক্ত রিপোর্টটিতে ফুটে উঠেছে।

"মৃত্যুর জানাজা মোরা কিছুতেই করিব না পাঠ, কবরের ঘুম ভাঙ্গে জীবনের দাবী আজ এতই বিরাট

"শহীদ আসাদের মৃত্যুর খবর দাবানলের মত সমগ্র শহরে ছড়িয়ে পড়ার পর সোমবার সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকা হলের সামনে একদল ছাত্রের গুঞ্জরন থেকে উপরের ঐ শব্দগুলি আমার কানে নয়, বুকে এসে বাজল। ছেলেটি আবৃত্তি করছিল না, যেন চোখ-মুখ-কণ্ঠ এক করে অন্তরের অন্তস্থল থেকে উচ্চারণ করছিল। বাকি যে কজন শুনছে তাদের চোখেও যেন আগুন জ্বলছে। কাল বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি শোকাহত থমথমে ভাব দেখিনি, দেখেছি সাথীর মৃত্যুতে সমগ্র ছাত্রসমাজের গত এক দশকের সঞ্চিত বিক্ষোভ যেন ফেটে পড়েছে। জালেমের জিঞ্জির ভাংগবার শপথে তারা অটল।

'একজন ছাত্র আমায় বলল--"আসাদ মরেছে কিন্তু আমরা মরিনি। দেখব ওদের কত বুলেট আছে। সংগ্রাম আমাদের চলবেই"।

'আমি প্রতিটি হলে ঘুরে দেখেছি মুক্তি পাগল ছাত্ররা সাথীর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ক্ষমাহীন দুর্বাশার মতই অটল। সাথীহারার বেদনায় তাদের কাতরাতে দেখিনি। রোকেয়া হলের বিএ (অনার্স) ক্লাসের একজন ছাত্রী বলেছে, কেঁদে কি হবে, আসাদের আরব্ধ কাজ আমাদের শেষ করতে হবে। আসাদ যে পৃথিবী গড়ার স্বপ্নে প্রাণ দিয়েছে, সে পৃথিবী আমরা গড়বো। আমরা কাঁদব না, আমরা কাঁদব না।" সে বলছিল আমরা কাঁদব না কিন্তু তার চোখ থেকে আমি টপ টপ করে পানি পড়তে দেখেছি। আর তার সাথীরা চোখে-মুখে আঁচল চেপে রীতিমত হু হু করে কাঁদছিল। ওরা তখন মঙ্গলবারের কর্মসূচী তৈরীর কাজে ব্যস্ত।

"সোমবার বিকেলে ছেলে-মেয়েদের যে মিছিলটি বের হয়েছিল, সেখানে আমি দেখেছি সবার কণ্ঠে কান্না জমে আছে। অথচ সবাই বুলন্দ কণ্ঠে সংগ্রামের ডাক দিচ্ছে। কলেজের এক শিক্ষক পাশ দিয়ে হেটে যাচ্ছিলেন। তিনি ওদের আওয়াজ শুনতে শুনতে কেঁদে ফেলেছিলেন। রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বিড়বিড় করে বললেন - ওদের কাঁদতে বলো, ওদের কাঁদতে বলো, ওদের বুকে বহু কান্না জমেছে। কান্না চাপা এই ডাক সহ্য হবে না। খোদার আরশ ফেটে যাবে।

"সোমবার দুপুরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ আউট ডোরে এক থুর থুরে বুড়ির সাথে আমার দেখা হয়েছিল। উনি মিরপুর থেকে এসেছিলেন ছোট নাতিটিকে সাথে করে হাসপাতাল থেকে ঔষধ নিতে। তখন হাসপাতালে মর্মান্তিক দৃশ্য। বুড়ি কিছু বোঝে না কিন্তু তাকেও আমি বলতে শুনেছি ইয়ে কেয়া বাত হায় বাবু। ছোট ছোট বাত যে গোলি চালানা, ইয়ে কাহাকা দাস্তর হায়। ইনসান ইনসান কো ইসতারাহ খুন করতা হায়, ইয়ে ক্যায়সা কানুন হ্যায়। মানুষ মানুষকে এমনিভাবে খুন করে, এ কোথাকার কানুন - ৭০ বছরের বুড়ি এর অর্থ খুজে পায় না।

"যেমন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সামনের ফলওয়ালা রহিমুল্লাহ বুঝতে পারে না। তার প্রশ্নঃ "হে তো কিছুই করিবার চাহিয়াছিল না। নিজেরে বাঁচাবার চাহিয়াছিল। হেরে খুন করল কেন?

"মঙ্গলবার গোটা শহরের আনাচে কানাচে আমি অবাধ্যতার ঢেউ দেখেছি। শুধু বিক্ষোভ আর বিক্ষোভ। সবাই শোকাতুর। কিন্তু কারো চোখে আমি হতাশা দেখিনি। ১৩ বছরের তরুণ আমিনউদ্দিন বলুন আর অশীতিপর বৃদ্ধ কছির মিয়াই বলুন। সবার চোখেই দেখেছি সেই বজ্র শপথ, যাতে অনায়াসে স্ফুলিঙ্গের সাথে আলিঙ্গন করা যায়। আমিন উদ্দিনের দলটিতে ১২/১৩ জন কিশোর ছিল। পুলিশের গাড়ীর পেছনে পর্যন্ত তাদের ধাওয়া করতে দেখেছি। তাদের মুখে এক কথা - জ্বালায় ফেলাও হাদায়। হগগল জ্বালায় ফেলাও।"

---

৪৫৪. দত্তের সাথে গবেষকের সাক্ষাৎকার।

Dhaka University Institutional Repository

"কছির মিঞা ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছিলেন হেঁটে হেঁটে, আশি বছরের বুড়ো হেঁটে যাচ্ছিলেন। ভেবেছিলাম তিনি বুঝিবা বিরক্ত হয়ে কিছু বলবেন। কিন্তু দেখলাম নিজের বিপদকে তিনি সব কিছুর উপরে তুলে ধরেননি। তিনি বললেন, "আইজ হাঁটতে আমার কষ্ট হয় নি। ওরা এক যাদুকে মেরে ফেলেছে। ওর বাবা-মায়ের দুঃখের কাছে আমার কষ্ট কিছুই না।" তার চোখে মুখে আমি দেখেছি গভীর প্রত্যাশা। তিনি বলেন- "যারা জান দিচ্ছে, তারা জিতবেই, জয় তাদের হবেই।" বুড়ো এত জোর দিয়ে বললেন, শুনে আমার মনে হল, মরার আগেই নব প্রভাতে সোনালী মুখ তিনি দেখে যেতে চান।

"দেখে মনে হল, সরকারী নির্যাতন আর বেত, বুলেট, বেয়নেট সমগ্র জনতাকে আজ প্রতিবাদমুখর আর বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। মুক্তি পিয়াসী মানুষ আজ আন্দোলনে নামতে কিছু দ্বিধা করছেন না। প্রিয় নওয়াবগঞ্জ এলাকার এক পানওয়ালা বলেছেন, শুধু ছাত্র-তুত্র দিয়া আন্দোলন অইত না। ইবার হক্কলের এক হওন লাইগ ব।"

সাধারণ মেহনতী মানুষ আজ ক্ষুব্ধ। আমি সোম ও মঙ্গলবার তাদের মুখে যে সব কথা শুনেছি, সে উক্তি গুলো তুলে ধরছি:

বেগম বাজার এলাকার এক চায়ের দোকানদার নিজের দোকান বন্ধ করে আজ সবাইকে ধর্মঘট করার আবেদন জানাচ্ছিল। আমায় দেখে সে বলল - "ছাত্রদের এত খুন খাইয়াও পুলিশের তিরপ্তি অইল না। কিন্তু ওরা কটা মাইরব। দ্যাশে কোটি কোটি ছাত্র-মানুষ আছে। আমরা বেবাক একজুট অই রখ্যা দাঁড়াইলে হালারা কুত্তার মত ভাইস্যা যাইব!"

মৌলবী বাজারে দেখা হয়েছিল হামিদ মুন্সির সাথে। বয়স ৬০ বছরের মত। আছরের নামাজ পড়ে বের হয়েছিলেন মসজিদ থেকে। তিনি বললেন, "আমরা ট্যাক্সর পয়সা যোগায়। সেই পয়স্যা দিয়া বুলেট কিইন্যা আমাদের পুলাদের বুকেই মারে। আমরা কিরা কাটতাছি, এইবার থাইক্যা খাজনা-ট্যাক্স বন্দ কইরা দিমু। দেখমু কোন পইসা দিয়া আমাদেব পোলাদের গুলী মারে। বলতে বলতে তার উদগত কান্না থামানোর জন্য তিনি চোখে হাত দিলেন।

র‍্যাংকিং ষ্ট্রীটের একজন মুদির দোকানদার বলেন -- 'একদিনের হরতালে হইব না। হাজার দিন হরতাল করমু। আহেন দোকান পাট বন্দ কইরা রাস্তায় নামি।"

রিক্সাওয়ালা ছালাম বলেন - "কি হইব হালায় রিক্সা চালাইয়া। এমনিতো পোলাপান না খাইয়া থাকে। হক্কল দিন যাতে পোলাপানের মুখে খাওয়া দিতে পারি-- এর লাইগা দশ দিন হরতাল কইরা না খাইয়া থাকুম।" এই ধরনের উক্তি করেছেন হাজারী বাগের এক ট্যানারী শ্রমিক। তার উক্তি ঝাঁপাইয়া পড়ব। যা হওয়ার তা হবে। আমাদের আর কি হবে? এমনিতেই বউ-ছওয়ালদের খাইতে দিতে পারি না, অনাহারে অর্দ্ধাহারে থাকি। আমাদের আছে কি যে হারাবে। আমাদের ঝাঁপাইয়া পড়তে আপত্তি নাই। আর আমরা ঝাঁপাইয়া পড়লে উপায় থাকবে না।

এমন ধরনের অগণিত কথা শুনেছি গত সোমবার ও মঙ্গলবার। চারদিকে বিক্ষোভ আর উত্তাপ। বেদন আর রোদন মুছে গেছে, চোখে অশ্রুকণা নেই, সেখানে যে অগ্নিকনার স্ফুলিঙ্গ। আমাদের মৃত্যু জীবনের মুক্তিপথের দিশা দিয়ে গেছে-- সে পথে চলার গান শুরু হয়েছে। সবার কণ্ঠে এক ধ্বনি, "আমরা বাঁচার মত বাঁচতে চাই।"

উপরের বিবরণ থেকেই এটা স্পষ্ট যে, সেদিন ঢাকা শহরের শ্রমজীবী মানুষসহ সমগ্র জনসাধারণ কি বিপুলভাবে আলোড়িত ও উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। ২১শে জানুয়ারি সফল হরতালের পর বিভিন্ন পন্থায় শোক দিবস পালিত হতে থাকে। সরকারী দল ছাড়া এমন কোন রাজনৈতিক, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক সংগঠন ছিল না যে, এ ঘটনার নিন্দা করেনি। ২২শে জানুয়ারি বিভিন্ন কর্মসূচী ছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীরা তিন মাইল দীর্ঘ এক শোক মিছিল অনুষ্ঠান করে। আনুমানিক পাঁচ হাজার ছাত্র-ছাত্রী এ মিছিলে অংশ নেয়। এতে পাঁচ শতাধিক ছাত্রীও ছিল। মিছিলের অগ্রভাগে কালো কাপড়ের ওপর লাল অক্ষরে বিশ্ব কবি রবীন্দ্র নাথের নিম্নোক্ত কবিতাংশটি লেখা ছিল:

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,
ভয় নাই ওরে ভয় নাই,
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই ওরে ক্ষয় নাই।"

এছাড়া; মিছিলে বিভিন্ন রাজনৈতিক স্লোগান ও বিপ্লবাত্মক কবিতার লাইন দিয়ে লিখিত অসংখ্য ফেস্টুন বহন করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের বুকে আঁটা শোকের চিহ্ন কালো ব্যাজে লেখা ছিল, "রক্তের ডাকে সাড়া দাও"। ২৩ তারিখের কাগজে মওলানা ভাসানীর এক দীর্ঘ বিবৃতি প্রকাশিত হয়। তিনি তাতে ২৪শে জানুয়ারি ছাত্রদের ডাকা দেশব্যাপী হরতালের কর্মসূচীকে সমর্থন করেন এবং তা কার্যকরী করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহবান জানান। সে সাথে ২১ থেকে ২৭শে জানুয়ারি পর্যন্ত তিনি মৌলিক গণতন্ত্র নির্বাচন কার্যকরীভাবে বয়কট করার লক্ষ্যে এবং ছাত্র হত্যা, গুলীবর্ষণ ও নির্যাতনের প্রতিবাদে একটি প্রতিবাদ সপ্তাহ পালন করার আহবান জানান। ভাসানী ন্যাপ সমর্থিত শ্রমিক ফেডারেশন ছাত্রদের ওপর গুলীবর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে এক ব্যাপক গণআন্দোলনে সামিল হওয়া এবং ছাত্রদের কর্মসূচীকে বাস্তাবয়িত করার জন্য শ্রমিক-জনতার কাছে আহবান জানান। এছাড়াও আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মস্কোপন্থী)সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাগত সংগঠনগুলি ব্যাপকভাবে ছাত্রদের কর্মসূচীকে সমর্থন করে। সারা প্রদেশের প্রত্যেকটি জেলা, মহকুমা এমনকি, থানা শহর থেকেও ছাত্র-জনতার প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, ধর্মঘট ও হরতালের সংবাদ প্রকাশিত হতে থাকে। এ পরিস্থিতিতে গণজাগরণের অবস্থা দেখে ছাত্রসমাজ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে মওলানা ভাসানীর মত একজন নেতার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। অথচ ঢাকা শহরে সংঘটিত এত মারাত্মক ঘটনা সত্ত্বেও মওলানা ভাসানীর মাসাধিককাল অনুপস্থিতি সকলের কাছে বিস্ময়কর বলে মনে হয়। ঢাকায় অবস্থানরত ভাসানী ন্যাপের নেতৃবৃন্দ এতে খুবই বিব্রত বোধ করেন। ছাত্র ইউনিয়নের (মেনন গ্রুপ) নেতা-কর্মীদের পক্ষ থেকে ন্যাপ নেতাদের কাছে মওলানা ভাসানীকে উপস্থিত করার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়।[৪৫৫] এ পর্যায়ে ন্যাপ (ভাসানী) সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ তোহায়ার নেতৃত্বে কয়েকজন নেতা মওলানা ভাসানীর খোঁজে ঢাকা থেকে বের হন। যারা ভাসানীকে ঢাকায় আনতে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে একজন সে অভিজ্ঞতা জানাতে গিয়ে বলেন:

"ডিসেম্বর মাসের আন্দোলন যখন কিছুটা রুপ করল তখন এর বিজয় সম্পর্কে সম্ভবতঃ মওলানা ভাসানী চিন্তিত হয়ে পড়েন। একটি ঘটনা থেকে আমার কাছে এ ব্যাপারটি খুব পরিষ্কার হয়ে যায়। ২০শে জানুয়ারি আসাদ মারা গেল। এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হল যে, তা

৪৫৫. নুরুল হুদা মির্জার সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

Dhaka University Institutional Repository

কারো নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকলোনা। সমাজের সকল স্তরে মওলানা ভাসানী প্রয়োজনীয়তা প্রচন্ডভাবে বেড়ে গেল। মোহাম্মদ তোয়াহার নেতৃত্বে আমরা চারজন মওলানা ভাসানীকে খোঁজ করতে ঢাকা থেকে বেরিয়ে পড়লাম। গেলাম মওলানার বাড়ি সুদূর পাঁচবিবিতে। আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম মওলানা বাড়িতে আছেন। কিন্তু জানালা খুলে একজন মেয়েকে দিয়ে আমাদের জানানো হল মওলানা নেই।"

ফলে মোহাম্মদ তোয়াহার নেতৃত্বে উক্ত চার নেতা ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ঢাকায় ফিরে আসলেন। পিকিংপন্থী ন্যাপের অন্যান্য নেতারা কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত দিতে পারেননি। ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ) এ পরিস্থিতিতে স্বতন্ত্র কোন ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু পরিস্থিতি খুব দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকলো। গণভিত্তি সম্পন্ন দু'টি দল পিকিংপন্থী ন্যাপ আর আওয়ামী লীগের দু'জন প্রধান নেতার একজন অনুপস্থিত এবং অপরজন জেলে। আওয়ামী লীগ ও ডাক নেতৃত্বের প্রতি ছাত্র লীগের কোন আস্থা নেই। সুশৃঙ্খল সংগঠন ছাত্র ইউনিয়নের(মতিয়া) স্বতন্ত্র কোন রাজনৈতিক অবস্থান তখন ছিল না। এটি আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক অবস্থানকে সমর্থন করেও সংগঠন হিসাবে আলাদা, ছাত্রলীগের সাথে সমঝোতার অভাব, এবং কৌশলগতভাবে নরমপন্থী। ফলে এ সংগঠনের পক্ষেও পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা অসম্ভব হয়ে উঠে। তবে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কারো মনে কোন সংশয় ছিল না, কিন্তু আন্দোলনের দিক নির্দেশনার ক্ষেত্রে কারো কোন সুস্পষ্ট ধারণার প্রমাণ পাওয়া যায় নি। এ রকম একটি পরিস্থিতিতে ১৯৬৯ সালের ২৩শে মার্চ সন্ধ্যায় এক বিস্ময়কর মশাল মিছিল অনুষ্ঠিত হল। সকাল থেকেই বিভিন্ন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় মিছিল বের হয়। সব মিছিলে হাজার হাজার ছাত্র যোগদান করে। এদিন শুধু ছাত্ররাই যে মিছিল বের করে তা নয়, ডাক-এর পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ (মস্কোপন্থী)-এর নেতৃত্বে একটি দীর্ঘ শোভাযাত্রা বের হয়, এতে কম করে হলেও ২ হাজার ব্যক্তি অংশগ্রহণ করে। শহরে ১৪৪ ধারা জারি ছিল, কিন্তু এসব মিছিল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার সময় পুলিশ কিংবা ই.পি.আর-কোন বাধা দেয়নি। সন্ধ্যার সময় যখন ছাত্র-ছাত্রীদের মশাল মিছিল বের হয় তখন বোঝা যায় গণ জাগরণ কোন পর্যায়ে পৌছেছে। এ মশাল মিছিলের বিবরণ দিতে গিয়ে 'আজাদ' পত্রিকায় যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তার শিরোনামে লেখা হয়, 'ঢাকার বুকে স্মরণকালের বৃহত্তর মশাল মিছিলঃ ত্রিশ সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রীর অংশগ্রহণ

পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী বিকাল চারটা থেকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মহল্লা ও আবাসিক এলাকা থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের মিছিল এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বট তলায় জমায়েত হতে থাকে। সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত কম পক্ষে ২৫টি মিছিল এখানে এসে জমায়েত হয়। ডাকসুর ভিপি তোফায়েল আহমদের সভাপতিত্বে এক সংক্ষিপ্ত বিশাল ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এবং এর পর হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী জ্বলন্ত মশাল হাতে রাজপথে মিছিল নিয়ে বের হয়। আজাদের রিপোর্ট অনুযায়ী শুরুতে এ মশাল মিছিলে ২৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী যোগদান করে। এ মশাল মিছিলে শুধু মশালই বহন করা হয়নি, ছাত্র ছাত্রীদের হাতে ছিল ছাত্র ও নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের দাবী সংবলিত ফেস্টুন ও প্লাকার্ড। আর তারা প্রায় প্রত্যেকে ছিল কালোব্যাজ পরিহিত। উচ্চকিত কণ্ঠে ছাত্ররা শ্লোগান তোলেনঃ 'শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দিব না', 'এগার দফা মানতে হবে', 'রাজবন্দীদের মুক্তি চাই', দিকে দিকে জাগো সংগ্রামী জনতা' ইত্যাদি।

এ বিশাল মশাল মিছিলটি কলাভবন থেকে বের হওয়ার পর থেকেই ছাত্র জনতার অসংখ্য ছোট মিছিল-উক্ত মূল মিছিলের সাথে যুক্ত হতে শুরু করে। এছাড়া, অসংখ্য উৎসাহী নাগরিক, বিশেষতঃ অফিস ও দোকান কর্মচারী,ব্যবসায়ী, রিক্সা ওস্কুটার চালক এবং অসংখ্য পথচারী ছাত্র-ছাত্রীদের শ্লোগান মুখর মিছিলে যোগদান করেন। এ মশাল মিছিলে কবি সুফিয়া কামাল, বেগম জোহরা তাজুদ্দীন, বেগম হাজেরা মাহমুদ, কামরুন নাহার লাইলী, বেগম ইদ্রীস, রেবেকা মহিউদ্দীনসহ গণতান্ত্রিক সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী বহু বিশিষ্ট মহিলাও অংশগ্রহণ করেন। এর ফলে এটি পঁয়তাল্লিশ সহস্রাধিক লোকের এক বিশাল মিছিলে পরিণত হয়। প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় তিন মাইল দীর্ঘ এ মিছিলের দু'পাশে হাজার হাজার মানুষ করতালি দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনন্দন জানান। বাড়ীর ছাদে ও বেলকনিতে দাড়িয়ে শত শত মানুষ কখনও হাততালি আবার কখনও শ্লোগান দিয়ে ছাত্রদের সংগ্রামের প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করে। রাস্তার পাশের বাড়ি থেকে নির্ধারিত মশাল পুনরায় জ্বালানোর জন্য তেল ও পেট্রোল সরবরাহ করা হয়। পেট্রোলপাম্প মালিকরাও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিনামূল্যে মশালের জন্য পেট্রোল প্রদান করে। রিক্সা ও গাড়ীর যাত্রীরা নেমে মিছিলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। পুরো আড়াই ঘন্টা স্থায়ী এ মশাল মিছিলটি প্রকৃত পক্ষে সমগ্র ঢাকা শহরের অধিবাসীদেরই সম্পৃক্ত করে ফেলে। এ মিছিলকে কেন্দ্র করে ছাত্র ও নাগরিকদের মধ্যে ঘটে যায় এক মহামিলন।

ছাত্র জনতার এ মহামিলন যে কি গভীর আন্তরিকতা পূর্ণ ছিল তা বোঝার জন্য ২৫শে জানুয়ারি তারিখে 'আজাদ' এ প্রকাশিত নিম্নোক্ত নিবন্ধটি উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট হবে।

সেদিনের বৃহত্তর মশাল মিছিলে যা দেখেছি (নিজস্ব নিবন্ধকার)

"যাত্রীর মশাল চাই

রাত্রির তিমির হানিবারে-

"যে আলোয় পথযাত্রী মুক্তির সংগ্রামী পথে শুরু করেছে তার যাত্রা, গত বৃহস্পতিবারের মিছিলে তার হাতে মশাল ছিল। সে এক অনন্য বৃহস্পতিবার। বাহান্নর একুশের অনেক চড়াই-উৎরাই ডিঙ্গিয়ে আবার এসেছিল উনসত্তরের জানুয়ারিতে আরেক আলোকদীপ্ত বৃহস্পতিবার।

"ঢাকায় সেদিন মিছিল ছিল। ওরা ডাক দিয়েছিল মশাল মিছিলের। একুশের উত্তর-সুরির ছাত্রসমাজের ডাকে দিকে দিকে বেজে উঠেছে অগ্নিবীণার তার। এমন মিছিল কোথাও দেখেনি কেউ। দিকে দিকে উঠেছে অবাধ্যতার ঢেউ। ছাত্র-ছাত্রী ছাড়া এ মিছিলে শরিক হয়েছে কারখানার শ্রমিক, পথের রিক্সাওয়ালা, গঞ্জের মহাজন, ষ্টেশনের কুলি, ঘরের গৃহিণী, অফিসের কেরাণী, নৌকার মাঝি -- এক কথায় সব স্তরের মানুষ -তাদের বুলন্দ আওয়াজে থর থর করে কেঁপে উঠেছে রাজধানীর গগনচুম্বী ইমারত। তাদের ধ্বনি দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে রাজধানীর লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখে মুখে ফিরেছে। সর্বত্র এখন এক আওয়াজ আসাদ ভাইয়ের রক্ত বৃথা যেতে দেব না"।

"বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে আমি যে দৃশ্য দেখেছি, ভাষা তার বিবরণ দিতে ব্যর্থ, কণ্ঠ তার ভাষা দিতে অপারগ, বুঝিবা চোখও তার সম্যক অবলোকনে পরাস্ত। এমন অভূতপূর্ব ঘটনার শিল্পী এদেশের বীর সেনানী সংগ্রামী ছাত্রসমাজ। এর

Dhaka University Institutional Repository

পিছনে প্রেরণা যুগিয়াছে শহীদ আসাদের রক্ত। আসাদের মৃত্যু দেশকে দশ বছর এগিয়ে দিয়েছে। দলমত নির্বিশেষে সবাই এক কাতারে এসে দাঁড়িয়েছে, বাঁধন টুটবার সংকল্পে তারা অটল।

যাত্রা শুরুর আগে গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গন আলোয় ভরে গিয়েছিল। সূর্য ডোবার সাথে সাথে নগরীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে খন্ড খন্ড মিছিল এসে জমায়েত হতে থাকে নয়া ইতিহাসের সূতিগার বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায়। প্রতিটি মিছিলের এক ডাক--জ্বালো জ্বালো, আগুন জ্বালো। গগনবিদারী শ্লোগান আর মশালের অগ্নিস্ফুলিঙ্গে ঝলমল করে ওঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গন।

বাঁধ ভাঙ্গা স্রোতের মত ছাত্র-জনতার মিছিলটি যাত্রা শুরু করে সন্ধ্যা ছটা বেজে পনের মিনিটে। বেগম সুফিয়া কামাল, বেগম তাজউদ্দিন, বেগম কাজী আজিজা খাতুন, বেগম ফরিদা হাসান, ছাত্রী নেত্রী দীপা দত্ত ও মালেকা বেগমসহ কয়েক শত মা ও মেয়ে মিছিলের পুরো ভাগে ছিল। কয়েকজন ছাত্র যাত্রার শুরুতে দেওয়ালের উপর দাঁড়িয়ে মুখ দিয়ে মশালে কেরোসিন নিক্ষেপ করলে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে এবং এক অপরূপ দৃশ্যের অবতারণা হয়।

মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হতে সময় লাগে ৩২ মিনিট, কিন্তু গত বুধবারের মৌন মিছিলের মত এটি মোটেই মন্থর ছিলনা। মিছিলের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রায় দৌড়াচ্ছিল, প্রতি মিনিটে প্রায় ৮০ জন ছাত্র ছাত্রী অতিক্রম করছিল। যাত্রার সময় তাদের সংখ্যা ছিল ২৫ হাজারেরও বেশী। নিউমার্কেটের মোড়ে এসে মিছিল এক নতুন পথে রওনা দেয়। হাজার হাজার মশাল সহকারে এ্যালিফ্যান্ট রোডে নামলে দুই পার্শ্বের জনতা মিছিলে শরিক হয় এবং যারা যোগ দেননি তারাও মিছিলের কন্ঠে কন্ঠ মেলায়।

"এমন কি বাড়ীর দোতলা ও ছাদ থেকে স্ত্রী-পুত্র পরিজনসহ অনেকে মিছিলের শ্লোগানেরপ্রতিধ্বনি করেন এবং মশাল জ্বালিয়ে মিছিলের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। এ্যালিফেন্ট রোড ও ইস্কাটনের কয়েকটি বাড়ি থেকে মিছিলের ওপর ফুল ও গোলাপ জল ছিটিয়ে দেওয়া হয়।

"মিছিল যতই এগোতে থাকে, লোকের সংখ্যা ততই বাড়তে থাকে। যে মিছিল ৩২ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হোল, রেডিও পাকিস্তান অফিস অতিক্রম করতে লাগলো ৪৩ মিনিট আর শান্তিনগর মোড়ে আসতে সময় নেয় ৫৭ মিনিট। শান্তিনগরে কাছে মিছিল সর্ববৃহৎ আকার ধারণ করে। প্রতি মিনিটে ৮০ জন অতিক্রম করার হিসাবে সে সময় মিছিলে যোগদানকারীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৪৬ হাজার।

"মিছিলের উদ্যোক্তারা আকৃতির এই বিশালতা আশা করেননি। ফলে তারা যে সংখ্যক মশালের আয়োজন করেছিল তার প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র এ্যালিফেন্ট রোড অতিক্রম করতেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু জনতার সক্রিয় সহযোগীতায় মিছিলের মশাল নিভেনি। তারা তিমির বিদারী মশাল চিরদীপ্ত রাখতে বদ্ধপরিকর। তাই দেখা গেছে, বিভিন্ন পেট্রোল পাম্পের লোকজন স্বেচ্ছায় মশালের জন্য পেট্রোল দিয়েছেন। ঘরের মেয়েরা কাপড় চোপড় সরবরাহ করেছেন। এমন কি, আমি মোটর থামিয়ে পেট্রোল দিতেও দেখেছি, দেখেছি বাড়ির জ্বালানী কেরোসিনের টিন বাইরে এনে মিছিলের ছাত্রদের হাতে তুলে দিতে। এমন বিরাট কান্ড আর এমন প্রাণস্পর্শী জনসহযোগীতা কেউ কোন দিন দেখেনি। সবাই এসেছেন মিছিলে, অভিনন্দন জানিয়েছেন সংগ্রামীদের। গাছতলা আর পাঁচতলার লোক এক কন্ঠে আওয়াজ তুলেছে নির্যাতনের বিরুদ্ধে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার গগনবিদারী দৃপ্তকন্ঠে রাজধানীর রাজপথ প্রকম্পিত হয়ে ওঠে।

"মিছিল বিভিন্ন পথ পরিক্রমণ করে চলে গেলে অপেক্ষমান জনতা মিছিলেরশ্লোগান নিজের কন্ঠে তুলে নেয় এবং এক জোটে শ্লোগান দিতে থাকে। এ রকম দৃশ্য দেখেছি নিউমার্কেটের মোড়ে, পাক-মোটরের মোড়ে। মগবাজারের মোড়ে, শান্তিনগরের মোড়ে। মিছিল চলে যাওয়ার পর শ্লোগান শুনে ভাবি মিছিল কি তবে শেষ হয় নি? আবার পিছনে ছুটে যাই। দেখি অপেক্ষমান জনতা নিজেরাই মিছিল করেশ্লোগান দিচ্ছে। তারা এক মশাল থেকে যেমন করে আরেক মশাল জ্বালাচ্ছিল ঠিক তেমনি করে এক মিছিলের শ্লোগানের উত্তাপে আরেক মিছিল তৈরি হচ্ছিল।

বৃহস্পতিবার মিছিল যে পথ পরিক্রমা করেছে এ পথে সাধারণতঃ মিছিল যায় নি। ফলে দু একটি খন্ড মিছিল মূল মিছিলের শরীক হওয়ার জন্যও তাকে খুজে পায় নি। জিন্নাহ এভিনিউ-এর হাজার লোকের একটি খন্ড মিছিল মূল মিছিলে যোগ দিতে না পারলেও শ্লোগানে শ্লোগানে নিজ নিজ এলাকা প্রকম্পিত করে রাখে।

"মেয়ে ও মাদের দু'হাতে বুলন্দ আওয়াজে শ্লোগান দিতে দেখেছি এই মিছিলে। দেখেছি মালেকা বেগমকে, দীপা দত্তকে, বেগম কামরুন নাহার লাইলীকে। রাতের মিছিলে হাজার জনতার ভিড়ে দাঁড়িয়ে তারা শ্লোগান দিয়েছেন। ভাইদের সাথে সমান তালে দৌড়িয়ে তারা পথ পরিক্রমণ করেছেন। কাঁধে করে বড় বড় ব্যানার বহন করেছেন। মশালের অগ্নিস্ফুলিঙ্গে মিছিলে যে সব শ্লোগান উচ্চারিত হয়েছে তা সবের মধ্যে শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না", "আসাদ ভায়ের রক্ত বৃথা যেতে দেব না", "আসাদ ভাইয়ের মন্ত্র, "জনগণতন্ত্র", "জ্বালো জ্বালো, "আগুন জ্বালো, "জাগো জাগো, বাঙ্গালী জাগো!" "পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে", ছাত্র -কৃষক-শ্রমিক-জনতা এক হও",এবং "আমাদের সংগ্রাম চলবে চলবে" প্রভৃতি বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য।

"গত দু দিনের মিছিল (বুধবার ও বৃহস্পতিবার) আরেকটি জিনিস প্রমাণ করে দিয়েছে। তাহচ্ছে উষ্কানীমূলক আচরণ করা না হলে ছাত্রসমাজ কখনই বিশৃংখল বা উচ্ছৃংখল হয় নি। গত দু'দিনে কোথাও পুলিশ বা ইপিআর মিছিলের পথরোধ বা মিছিলকে অনুসরণ করেনি। এত বড় দু'টি মিছিল পরিচালিত হয়েছে --কোথাও কোন দুর্ঘটনা বা গোলযোগ সৃষ্টি হয়নি। এমন কি, বৃহস্পতিবারের জঙ্গী মশাল মিছিলের ৪৫ হাজার মানুষ বুলন্দ কন্ঠে আওয়াজ তুলে চারদিক প্রকম্পিত করেছে। মিছিলে সবার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়েছে, কিন্তু এতবড় পথ পরিক্রমায় কোথাও এতটুকু গোলযোগ বা হটগোল হয়নি। স্মরণাতীতকালের বিশাল মশাল মিছিলের মত এটিও আরেক অনন্য ইতিহাস। আসাদ প্রাণের বিনিময়ে এদেশের সংগ্রামী ছাত্রসমাজকে মুক্তির যে পথ নির্দেশ দিয়েছে তার সংগ্রামী সাথীরা সে পথে সঠিকভাবে চলছে। দুর্জয় সংকল্প তাদের "আসাদ ভাইয়ের রক্ত বৃথা যেতে দেব না।"

অর্থাৎ আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা ছাত্র-জনতার এ মহামিলন এমন একটি পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয়েছিল যে, তাকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কারো ছিল না। এ মশাল মিছিল থেকেই পরিষ্কার হয়ে ওঠে মানুষের মাঝে যে জাগরণ এসেছে তাকে আর স্তব্ধ করা যাবেনা। পরদিনের হরতাল যে কি ব্যাপকতা নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে তা কারো পক্ষেই ধারণা করা সম্ভব ছিল না। অথচ এই ব্যাপক গণজাগরণের ক্ষেত্রে একক কোন ব্যক্তি, রাজনৈতিক দল বা ফ্রন্ট নয়, ছাত্রসমাজই হয়ে ওঠে ঐক্যের প্রতীক; ছাত্রদের ১১-দফা হয়ে ওঠে জনসাধারণের কর্মসূচী। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দেয় হরতালের পর কি। মওলানা ভাসানী অনুপস্থিত। তার দল পিকিংপন্থী ন্যাপের অন্যান্য নেতা দ্বিধাগ্রস্ত। ডাক- নেতৃবৃন্দ গণজাগরণের উত্তাল তরঙ্গের মাঝে খেই হারিয়ে ফেলেছেন। পরবর্তী কর্মসূচী কি হবে সে ব্যাপারে কোন

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্ধান্ত তারা নিতে পারেননি। সর্বদলীয় সংগ্রামী ছাত্র পরিষদ ইতিমধ্যে তার নাম পাল্টিয়ে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ রেখেছে, কিন্তু তারাও ধারণা করতে পারেনি সৃষ্ট গণআন্দোলন কত ব্যাপক রূপ পেতে যাচ্ছে। ফলে তারাও ঠিক করতে পারেনি গণজাগরণ ব্যাপকতর হয়ে উঠলে তাকে কোন্ দিকে ধাবিত করা হবে বা আঘাতের লক্ষ্যবস্তু হিসাবে সরকার, রাষ্ট্র কিংবা তার অনুগত কোন্ শ্রেণীকে নির্ধারণ করা হবে। প্রকৃত পক্ষে নেতৃত্বহীন বা খানিকটা তাদের দোটানা ভাব নিয়েই পরদিন এক ব্যাপক গণহরতাল অনুষ্ঠিত হয়। হরতালের জন্য সাধারণ কর্মসূচী ছাড়া কোন দল বা জোট তো নয়ই, এমনকি, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদও কোন নির্দেশিকা তৈরী করেনি। একেবারে নেতৃত্বহীন অবস্থায় পরদিন ২৪শে জানুয়ারি হরতাল পালিত হয়। ২৪ তারিখ সকাল থেকে একদিকে যেমন অফিস কর্মচারিগণ পায়ে হেঁটে অফিসের দিকে যেতে থাকে, তেমনই হরতালের পক্ষে সারা ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জটলা তৈরী হয়। ছাত্রসমাজই বড় ও কেন্দ্রীয় মিছিলটি প্রথম বের করে। ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের পাঁচ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর এক বিরাট মিছিল অফিস-পাড়ায় ঢুকে পড়ে। ছাত্রদের আহবানে মতিঝিলের সকল কর্মচারী মিছিলে এসে যোগ দেয়। ঢাকা শহরের সকল পাড়া ও মহল্লায় অসংখ্য মিছিল নামে। ঢাকা শহরের আশে পাশের সকল শ্রমিক-জনতা খুব সক্রিয়ভাবে হরতাল পালনের পর মিছিল নিয়ে ছাত্রদের সাথে মিলিত হতে অগ্রসর হয়। ছাত্র ও কর্মচারীদের বিশাল মিছিল প্রাদেশিক সচিবালয়ের দিকে এসে সচিবালয় কর্মচারীদের মিছিলে যোগ দেওয়ার আহবান জানালে শত শত কর্মচারী বের হতে চেষ্টা করে। পুলিশ-জনতা সংঘর্ষ বাঁধে। অসংখ্য কাঁদুনে গ্যাসের জবাবে জনতা পুলিশের মারা গ্যাস শেল আর ইটখন্ড দিয়ে তারা পুলিশের মোকাবিলা করতে থাকে। সকাল ১১টার পর পরই পুলিশ জনতার ওপর প্রথম গুলী চালায়। এ ঘটনার ফলে কয়েকজন মারাত্মকভাবে আহত হয়। সাময়িকভাবে পুলিশের আক্রমণ প্রতিরোধ করা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু পাশাপাশি এ সংবাদ সারা শহরে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং ক্রমেই অধিকসংখ্যক মানুষ পথে নামতে থাকে, আর ছাত্র-জনতার মিছিলে যোগ দিতে থাকে। ১২টার দিকে আবারও গুলী হয়। ফলে দু'জন কিশোর ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। এর পর আবারও গুলী হয় এবং অসংখ্য আহত হওয়া ছাড়াও আরও দু'জন নিহত হয়। এ ঘটনা মানুষের মনের মধ্যে একেবারে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এটি প্রচারিত হওয়ার পর শ্রমিক এলাকার হাজার হাজার শ্রমিক ও ঢাকা শহরের সমগ্র সাধারণ মানুষ ঢাকার রাজপথে নেমে পড়ে। নদীর মাঝিমাল্লা তাদের বৈঠা হাতে নিয়ে রাজপথে নামে। হাজার হাজার কৃষক-জনতা ঢাকা শহরের আশে পাশের এলাকাগুলি থেকে আসতে শুরু করে। মুহূর্তের মধ্যে জনতা ঢাকা শহরে আইয়ুবের নিয়ন্ত্রণ বলতে যা ছিল তা ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলে। সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্রগুলির অফিস জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। সরকার সমর্থক রাজনৈতিক নেতাদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। সরকারী রাজনৈতিক দলের অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়। মারমুখী জনগণের সামনে সমস্ত প্রশাসন ভেঙ্গে পড়ে। বেলা আড়াইটায় নিহতদের লাশ নিয়ে এক বিশালকায় মিছিল আউটার স্টেডিয়ামে এসে প্রবেশ করে। দ্রুতই জনস্রোতে আউটার স্টেডিয়াম পূর্ণ হয়ে যায়। জনতার স্থান সংকুলান না হওয়ায় বায়তুল মোকাররম, জিন্নাহ এভিনিউ, ডি.আই.টি এভিনিউ, নবাবপুর রেলক্রসিংসহ আশেপাশের সমস্ত এলাকা শোকাভিভূত জনতায় ভরে যায়। কোথাও তিল ধারনের স্থান থাকেনি। শুধু মাথা আর মাথা। পাঁচ লক্ষাধিক জনতার এ বিশাল সমাবেশ নিহতদের জানাজায় দাঁড়িয়েও বিক্ষোভে ফেটে পড়ছিল। এ বিক্ষোভ যে কি গভীরতর রূপ ধারণ করেছিল তার একটি আংশিক ধারণা ২৬শে জানুয়ারির 'আজাদ' এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে পাওয়া যাবে।

<u>শুক্রবারের সর্বাত্মক হরতালে সাধারণ মানুষকে যেমন দেখেছি</u>

"নয়া ইতিহাস লিখেছে ধর্মঘট, রক্তে রক্তে আঁকা প্রচ্ছদপট।

শুক্রবার ঢাকা শহর ছিল মিছিলের শহর। ভোরে কাক-ডাকার আগেই প্রতিটি মহল্লায় তরুণ, কিশোর, যুবকবৃন্দ মোড়ে মোড়ে জমায়েত হয়, আর খন্ড খন্ড মিছিলে শরিক হয় -- নিজ নিজ এলাকা পরিক্রমণ করে। সবার চোখে আগুনের হল্কা, মুখে নির্ভীক ভ্রুকুটি, আর কণ্ঠে বুলন্দ আওয়াজ। মহল্লার এ সব খন্ড মিছিলে আমি দেখেছি পানওয়ালা, মজুর, রিক্‌শাওয়ালা আর সাধারণ মেহনতী মানুষ। কিন্তু তাদের মহল্লা ঘোরার বুঝি দরকার ছিল না। কারণ কোন দোকানপাট, যানবাহন চালু ছিল না, এমন কি কাঁচা বাজারগুলো ও জনশূন্য অবস্থায় খা খা করছিল।

"অভিজাত আবাসিক এলাকার অফিসার আর উর্ধ্বতন কর্মচারী, বিভিন্ন অফিস-আদালতের কিছু সংখ্যক সাধারণ কর্মচারী কাক-ডাকা ভোরে চোখে পানি দিয়ে মুখে কিছু গুজে অফিসের দিকে পায়ে হেটে রওনা দেয় এমন কিছু অফিসারের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। তাদের একজন বলেন - কি করব ভাই, ছেলে-মেয়ে নিয়ে সংসার করি, চাকরিটাতো রাখতে হবে। হেঁটে এই সকালে রওনা হয়েছি। তবে আমার কোন দুঃখ নেই, আজকে হেঁটে কষ্ট করছি এই ভরসায় সুদিন আমাদের আসবেই।

"একজন নিম্ন বেতনভুক কর্মচারী বললেনঃ বিশ্বাস করুন, এই মিছিলে শরিক না হতে পেরে ক্ষোভে নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে। ইচ্ছে করছে নিজের চুল দুহাতে ছিড়তে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, যাক শালার চাকুরী। আবার পরক্ষণে সংসারের দায়ের কথামনে পড়ছে, আপনি খবরের কাগজের লোক। বুকে হাত দিয়ে বলছি ভাই ছাত্র ভাইদের সাথে ঝাঁপিয়ে পড়তে আমাদেরও মন চাইছে-- কি করব আমাদের উপায় নেই। তবে ওদের জানাবেন আমাদের বুকেও আগুন জ্বলছে। তুষের আগুনের মত ধিকি ধিকি জ্বলছে।"

"এক বুড়ো বললেন -- জানি আমাদের অফিস যেতে দেখে আপনারা ধিক্কার দিচ্ছেন। কি করব আমরা যে নিরুপায়। সরকারী চাকুরী করি নিয়মের দাস আমরা, তবে আমি দোওয়া করছি যারা মানুষের জন্য প্রাণ দিচ্ছে তারা যেন জয়ী হয়। আমার বয়স ৬০ বছর। আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি। খোদা আমার দোওয়া শুনবে। ওদের ভাল হবে, সবার ভাল হবে। বলতে বলতে বুড়ো কেঁদে ফেললেন।

"সকাল দশটার মধ্যেই সারা শহর অগণিত খন্ড মিছিলের শহরে পরিণত হয়। সব পথে মিছিল, কোথাও শ্রমিকের মিছিল, কোথাও মেহনতী মানুষের মিছিল। মিছিল আর শ্লোগান। যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই মানুষের মিছিল আর যেদিকেই কান যায় সেদিকেই বিক্ষুব্ধ মানুষের শ্লোগান। সূর্যের তাপ যত প্রখর হয়, রাজধানীর পরিবেশ তত প্রতিবাদমুখর হয়। এরই মধ্যে পাঁচ-ছয় হাজার মানুষের একটি মিছিল মতিঝিলের বাণিজ্যিক এলাকায় যেতে থাকে। তারপর তারা শুরু করে এক অভিনব আবেদন। বিভিন্ন আবেদন। বিভিন্ন অফিসের চার দিক ঘিরে হাতজোড় করে আবেদন করতে থাকে তারা -- ভাইসব বেরিয়ে আসুন, ছাত্র হত্যার প্রতিবাদ করুন, আমাদের মিছিলে শরিক হোন। যারা চাকরি রক্ষার দায়ে সকল আবেগ আর অনুভূতিকে চোখ-মুখ, কান বুঁজে রোধ করে অফিসে এসেছিল মিছিলের কান্নাভেজা শ্লোগান তাদের বুকে গিয়ে বাজে। আর নয়, আর নয় বিবেকের সাথে ছলনা (একজন কর্মচারী এ উক্তি করেছেন) এবার তারা দলে দলে ছোটে অফিসের বাইরে। সব কর্মচারী, পিওন-চাপরাশী, বড় সাহেব ছোট সাহেব সবাই মিছিলে

Dhaka University Institutional Repository

নামে। এমনকি ওয়াপদার চেয়ারম্যান জনাব মাদানী, ডিআইটির চেয়ারম্যান জনাব খায়ের, এডিসির চেয়ারম্যান জনাব আহসানও বেরিয়ে আসেন। কর্মচারীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মিছিলে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে ঘোষণা করে শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না। জনাব খায়ের তো মিছিলের সাথে বেশ কিছুক্ষণ এগিয়ে যান। জনাব আহসানের চোখে আমি পানি দেখেছি। এভাবে পাঁচ হাজারের মিছিল পনের হাজারে পরিণত হয়। গোটা শহর বিক্ষোভ-নগরীতে পরিনত হয়। যেদিকেই যাই, দেখি শুধু হাজারো মানুষের বলদৃপ্ত পদভারে থর থর কম্পমান রাজধানীর রাজপথ। তখন আমি ছিলাম এস এম হলের সামনে একটা পাঁচ হাজারী মিছিলের পার্শ্বে। হাজারীবাগের শ্রমিক লালবাগের শ-কয়েক মেহনতী মানুষ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। এমন সময় দেখি, পাঁচ-সাত জন ছাত্র খালি পায়ে পাগলের মত ছুটে আসছে। ওরা এসে কাঁদতে কাঁদতে ঘোষণা করল -- ওরা আবার গুলী করেছে , আবার মানুষ মেরেছে।

"কী? -- সমগ্র মিছিল স্তম্ভিত। বিক্ষুব্ধ মানুষগুলি যেন মৃতপ্রায়। নীরব নিথর হয়ে গেল। মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ল খবর -- আবার মেরেছে, মানুষ মেরেছে।' দশ মিনিট হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাকল মিছিল। হুহু করে কেঁদে ফেলল অনেক ছাত্র। শুরু হল কান্নার শ্লোগান মেরেছে মেরেছে ভাই মেরেছে।" কান্না মাখা শ্লোগান কত মর্মস্পর্শী হতে পারে তা--বুকের কত গভীরে যেয়ে বাজতে পারে তা এখানে যারা ছিলেন না তাদের বোঝানো যাবে না। এমন সময় রোকেয়া হলের ছাত্রী মিছিলটা এল। আবার মৃত্যুর খবর শুনে মেয়েরা শব্দ করে কেঁদে উঠল। সে কি কান্না ! সি কি দৃশ্য ! অকস্মাৎ মিছিলের রূপ পাল্টে গেল। যে মিছিল ছিল প্রতিবাদ, শোক প্রকাশ আর বিক্ষোভের মিছিল, মুহূর্তে তা পরিণত হল জঙ্গী মিছিলে। মুহূর্তে কান্না ভুলে গেল তার ,চোখের জল দুহাতে মুছে বজ্রমুষ্টি আকাশে ছুড়ে তারা ঘোষণা করল "জ্বালো জ্বালো -- আগুন জ্বালো।" দিকে দিকে আগুন জ্বালো", "শহীদের রক্ত বৃথা যাবে না", "আসাদ ভাইয়ের রক্ত বৃথা যাবে না"। কিছু মেয়েরা তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। হঠাৎ দেখলাম একজন ছাত্র মিছিলের পুরোভাগে এসে শাণিত কণ্ঠে ঘোষণা করলো -- "বোনেরা আমার, আমরা কাঁদব না। কেঁদে কেঁদে তাদের দেখানো চলার পথ আমরা পিচ্ছিল করে দেব না, ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান, আসি অলক্ষ্যে দাঁড়িয়েছে তারা দেবে কোন বলিদান?" বোনেরা আজ আসাদ ভাই এসে দাঁড়িয়েছে, আসুন কে দেবেন বলিদান? বুলেটকে আমরা পরোয়া করিনা। আমরা জানি বুলেট শুধু রক্ত ঝরাতে পারে-- প্রাণ অথবা অন্য কিছু নয়। ছেলেটির বক্তৃতার পর পরই দেখলাম মিছিলটা দৌড়াইতে শুরু করল। আমায় ছেড়ে মিছিলটা চলে গেল। শুনলাম, তারা ভাইয়ের লাশ আনতে গেল। তখন মহল্লায় মহল্লায় যেয়ে দেখলাম সেখানকার রূপ পাল্টে গেছে। প্রতিবাদের স্থলে দেখলাম একটা থম থমে ভাব। মুখে মুখে ফিরছে, শুনেছ শহরে আবার গুলী হয়েছে। বাড়ির দরজায় দরজায় বুড়ো গিন্নীদের শুখনো মুখ। তরুণ ও যুবকরা তখন মিছিলে গেছে।

"গেন্ডারিয়া, কমলাপুর আর নওয়াবগঞ্জের আবাসিক এলাকায় আমি দেখেছি এক মর্মান্তিক দৃশ্য। এইসব এলাকার বাড়িতে বাড়িতে মরা-কান্নার বিলাপ শুনেছি। ছোট খোকনকে বুকে চেপে ধরে মাকে বলতে শুনেছি না -- কিছুতেই আর সহ্য করব না। আমার যাদুদের খুন আর নিতে দেব না। নওয়াবগঞ্জের এক পৌঢ় বলেছেন -- নয় বছরের রুস্তমকে কেন মারল ওরা। ওরা আমাদের দেখতে পায় না। আমাদের গুলী করুক। বুড়োদের গুলী করুক, নয় বছরের নিস্পাপ শিশু কি দোষ করেছে? গেন্ডারিয়ার সেই ইমামের ফরিয়াদ, আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না। মসজিদের সেই ইমাম হত্যার খবর শুনে মোড়ের পানের দোকানের সামনে দুই হাত আকাশের দিকে তুলে ফরিয়াদ করল, হে খোদা তুমি দেখ না, জালেমের এই অত্যাচার তুমি কি দেখ না। এই মাসুম বাচ্চাদের খুন করতে তুমি? -- কি দেখ না। হে রহমানের রহিম, তুমি গজব নাজেল কর খোদা, তুমি গজব নাজেল কর। এ আর সহ্য হয় না। সে সময় ইমামের সাথে আর যারা ছিল সবাই মুনাজাতের মত হাত তুলে ফুঁপে ফুঁপে কাঁদছিল। সেখান থেকে প্রেস ক্লাবে আসার পথে একটা কবিতা আমার কানে বাজলঃ

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু
'নিভাইছে তব আলো --
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ
"তুমি কি বেসেছ ভালো।"

প্রেসক্লাবে এসে খবর পেলাম বিক্ষোভ আর মিছিলের। খবর পেলাম বিক্ষুব্ধ জনতা আগুন লাগিয়েছে প্রেস ট্রাস্ট কাগজের অফিসে আর সেক্রেটারিয়েট ভবনের দেওয়ালে। খবর পেলাম সংঘর্ষের। কখন ৪টা হবে। দেখলাম লাশ নিয়ে মিছিল আসছে একটা। দুই-তিনটা লাশ। লক্ষ লক্ষ জনতা সে মিছিলে। কারখানার শ্রমিক দেখলাম। তার হাতে ব্যানার "ছাত্র আসাদ আমাদের ভাই", শ্রমিক ফেডারেশন। "লাঙ্গল আর কোদালবাহী কৃষক দেখলাম তাদের হাতে ব্যানার, "ছাত্র হত্যার বিচার চাই", কৃষক সমিতি, অগণিত জনতা সে মিছিলে। শুধু মানুষ আর মানুষ। আমি হারিয়ে গেলাম সেই মানুষের ভিড়ে, মিছিলের পথে পুলিশ আর ইপিআর ছিল। কিন্তু তারা ছিল একবারে নীরব। মিছিল এসে থামলো অনেক সংগ্রামের সৃতিকাগার ইকবাল হলে। ইকবাল হল ময়দান কালো কালো মাথায় ভরে গেল। শুরু হোল ছাত্রদের সভা। শুরুতেই লাশ ঘাড়ে করে সভার প্রত্যেক প্রান্তেই ঘুরিয়ে নেওয়া হল। সে সময় সৃষ্টি হল আরেক মর্মভেদী দৃশ্য। শহীদের মুখ এক নজর দেখার জন্য সবার সে কি আকুতি। ছাত্ররা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, ভাইসব বসুন। কিন্তু কে শোনে কার কথা। শহীদের লাশ দেখে সবার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। কেউ আবার হু হু করে কেঁদেও উঠলেন।

"ছাত্ররা বলল তাদের বক্তব্য। ঘোষিত হলো তাদের মুক্তি সনদ মহান ১১ দফা। এর পর মতিউর রহমানের শোকাতুর পিতা আজহার মল্লিক এক হাতে কাঁধে ভর দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘোষণা করলেন -- আমার দুঃখ নাই, আমার মতিউর মরেছে আমি হাজার মতিউর পেয়েছি। আমার দুঃখ নাই। সে সময় মনে পড়লো আরও দু'টি ঘটনা। একটি ১৩ বছরের শিশু রুস্তমের নানার। আমার রুস্তম অমর, আপনাদের মধ্যে বেঁচে আছে। আর অপরটি শিবপুর থেকে পাঠানো শহীদ আসাদের মায়ের বাণী। সে বাণীতে বলা হয়েছে-- আমার আসাদের মৃত্যু হয়নি। আমার আসাদ বলত -- মা আগামী দশ বছরের মধ্যে এই মাতৃভূমি নতুন জীবন পাবে। আমার আসাদের এই স্বপ্ন তোমরা সার্থক কর।"

"শহীদ আসাদের পথ ধরে প্রাণ দিল ১৩ বছরের কিশোর রুস্তম, ১৭ বছরের ছাত্র মতিউর, ১৫ বছরের মকবুল আরও নাম না-জানা কতজন কে জানে। আমি ভাবছি পৃথিবী কি উল্টো ঘোরছে? কোথায় কখন কবে কোন্ তারা ঝরে যায় আকাশ কি তার হিসেব রাখে না? পরক্ষণই শুনলাম,আবার শ্লোগান। ভাবলাম, "পৃথিবী আজ উল্টো ঘোরেনি, এগিয়ে গেছে।"

সেদিনের এ নিবন্ধকার শ্লোগান শুনেই বুকে গভীর আশা পোষন করেছিলেন, কিন্তু এই বিক্ষুব্ধ জনতাকে যথার্থ নেতৃত্ব দিতে পারলে যে, পাকিস্তানের সেই স্বৈরাচারী রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ভেঙ্গে ফেলা যেত তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা সেদিনের সেই বিক্ষুব্ধ মানুষ

Dhaka University Institutional Repository

যে রকম মারমুখি হয়ে উঠেছিল, তাতে তাদের পক্ষে যে কোন কিছু করা অসম্ভব ছিল না। অভাব ছিল শুধু নেতৃত্বের, আর যথাসময়ে যথার্থ সিদ্ধান্তের। সে সময়ে জনসাধারণের মধ্যে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে যে আক্রোশ জন্ম নিয়েছিল তা কেবল একটি বিপ্লবী অভ্যুত্থানের অংশগ্রহণকারী জনতার সাথেই তুলনা করা চলে। কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী নেতার নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়ঃ লক্ষাধিক মানুষের মিছিলটি যখন ইকবাল হলে এসে পৌছল তখন জনসাধারণের পক্ষ থেকে বার বার দাবী উঠছে পরবর্তী কর্মসূচী চাই -- তখন কেউ সে চাহিদা পূরণ করতে পারেনি। ঘটনার ব্যাপকতা দেখে ছাত্ররাও আতংকগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। কে একজন বললো -- চল ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও করি আর অমনি হাজার হাজার মানুষ তেজগাঁর দিকে ধাবিত হল। সকল ছাত্র নেতাই শুধু নয়, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও শুধুমাত্র জনসাধারণকে শান্ত করতেই তাদের পুরোটা শক্তি ব্যয় করলেন। মানুষের সেদিন যে মারমুখি চেহারা হয়েছিল তাকে পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করতে পারলে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রব্যবস্থাটাই সেদিন ভেঙ্গে ফেলা সম্ভব হত। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলি বা ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ তার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না। প্রস্তুতি তো দূরের কথা এ কথা কখনও তারা ভাবতেও পারেনি।[৪৫৬] সে যা'হোক, নেতৃত্ব শূন্য সেই বিশাল জনতা সন্ধ্যা পর্যন্ত একের পর এক আইয়ুব সরকারের সমর্থক দল, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও বাড়িসহ বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণ ও অগ্নিসংযোগ করতে থাকে। এ অবস্থাটি ক্রমাগত এত ভয়ংকর রূপ নিতে থাকে যে, রাজনৈতিক ও ছাত্র নেতৃত্ব তাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলে। শেষ পর্যন্ত মাত্র দু'ঘন্টা সময় দিয়ে যখন সন্ধ্যা ছয়টায় কারফিউ ঘোষণা করা হয় তারপর উক্ত ব্যাপক গণবিক্ষোভের আপাত পরিসমাপ্তি ঘটে।

২৪শে জানুয়ারি রাত ৮টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার জন্য সান্ধ্য আইন বলবৎ করা হলেও ঢাকা শহরের তেজগাঁও, আজিমপুর ও পুরোনো ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চলে সকাল থেকেই ছাত্র-জনতা ছোট ছোট মিছিল বের করে সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করে। অন্ততঃ ১৩টি জায়গায় সেনাবাহিনী কয়েকবার গুলীবর্ষণ করে। ফলে শিশুসহ অসংখ্য ব্যক্তি গুলীবিদ্ধ হয়ে মারাত্মকভাবে আহত হয়। সেনাবাহিনী জনসাধারণের বিক্ষোভকে দমন করার জন্য সবরকম চেষ্টা করে, কিন্তু বার বারই সেনাবাহিনীর গুলীবর্ষণকে উপেক্ষা করে ছাত্র-জনতার শ্লোগানমুখর মিছিলগুলি রাজপথের নীরবতাকে ভেঙ্গে দেয়। ফলে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার জন্যও ঢাকা শহরে সান্ধ্য আইন জারি করা হয়, অবশ্য মাঝে তিন ঘন্টা সান্ধ্য আইনকে কিছুটা শিথিল করা হয়।

উক্ত ২৪ ও ২৫ তারিখে শুধু যে ঢাকাতেই এই ব্যাপকতর ঘটনা ঘটে তা নয়, পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন প্রতিটি জেলা এবং মহকুমা শহরে ব্যাপক বিক্ষোভ আন্দোলন সংঘটিত হয়। তাতে অসংখ্য গুলী ও টিয়ার গ্যাস বর্ষণ করা হয় এবং গ্রেফতার করা হয় হাজার হাজার ছাত্র-জনতাকে। নারায়ণগঞ্জ আর চট্টগ্রামে ঘটে মারাত্মক ঘটনা। পুলিশের গুলীবর্ষণে ময়মনসিংহে ঘটনাস্থলেই দু'জনের মৃত্যু হয়।

এই কড়া সান্ধ্য আইনের মধ্যেও সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি প্রদান করেন এবং এ বিবৃতিটি প্রায় সকল পত্রিকায় ছাপা হয়। এ বিবৃতিতে তিন দিনব্যাপী শোক দিবস পালনের আহবান জানান হয় এবং এ তিনদিনের জন্য দোকানপাট, বাসগৃহ, আবাসিক হোটেলসহ বিভিন্ন স্থানে কালো পতাকা উত্তোলন ও ছাত্র-জনতাকে কালো ব্যাজ ধারণের আবেদন জানানো হয়। এ বিবৃতিতে বলা হয়, ছাত্রদের ১১-দফা দাবী সংবলিত জনগণের সকল দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ছাত্রসমাজের সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, অতি শীঘ্রই আন্দোলনের পরবর্তী বৃহত্তর কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে। সে আন্দোলনের প্রস্তুতির জন্য সকল শ্রেণীর মানুষের প্রতি নিম্নোক্ত কর্মসূচীগুলি বাস্তবায়নের জন্য আহবান জানানো হয়ঃ

"(১) প্রদেশের সকল জেলা, মহকুমা, থানা, গ্রাম, মহল্লাসহ প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রত্যেক শ্রমিক অঞ্চলে সর্বদলীয় ছাত্রসমাজের উদ্যোগে সংগ্রাম কমিটি গঠন। উপরোক্ত কমিটি দ্বারা সুশৃঙ্খলা সহকারে ও সুসংগঠিতভাবে আন্দোলন পরিচালনা। এবং স্থানীয় কমিটিগুলি উপরোক্ত কমিটির সাথে যোগাযোগ স্থাপন।

"(২) আন্দোলনের কর্মপন্থা ঘোষণার জন্য এ সকল কমিটির উদ্যোগে প্রচার পত্র ছাপানো, প্রচারপত্র বিলি ও মাইক প্রভৃতির সাহায্যে ব্যাপক গণসংযোগ গড়ে তোলা।

(৩) সকল প্রকার জনমতকে সুসংগঠিত করা।

(৪) গ্রামাঞ্চলে আন্দোলনের বাণী ছড়াইয়া দেওয়া।

(৫) দেশের আনাচে-কানাচে সুশৃংখল ও সুচিন্তিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন।

(৬) আন্দোলকে সফল করে তোলার জন্য ছাত্র-শ্রমিক-কৃষকসহ সকল শ্রেণীর নাগরিককে আগাইয়া আনা।

(৭) সকল সময় শৃংখলা বজায় রাখা এবং সকল প্রকার সরকারী উস্কানীর প্রতি সতর্কতা অবলম্বন।

(৮) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা।

(৯) সব সময় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশাবলী বিনা প্রশ্নে মেনে চলা।"[৪৫৭]

২৬শে জানুয়ারি ঘটে আরো বিরাট ঘটনা। সান্ধ্য আইন যেমন নারায়ণগঞ্জ ও আদমজীনগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, তেমনই সান্ধ্য আইন ভাঙ্গার প্রবণতাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। মূল ঢাকা শহরে যদিও আগের দিনের মত এত বেশী সান্ধ্য আইন ভাঙ্গা হয় নি তবু আদমজীর শ্রমিকরা ব্যাপক আকারে সান্ধ্য আইন ভেঙ্গে ফেলে। ২৬ তারিখ সকাল থেকেই আদমজী নগরে সান্ধ্য আইন ভেঙ্গে বিভিন্ন দিক থেকে ছোট ছোট মিছিল শ্রমিকদের আবাসিক এলাকায় জমায়েত হতে থাকে। এর পর সকাল ১০টার দিকে হাজার-খানেক শ্রমিকের একটি মিছিল মিল এলাকা থেকে মূল রাস্তায় বেরিয়ে আসে। শ্রমিকদের মিছিলটি এর পর উত্তপ্ত শ্লোগানে মুখরিত হয়ে নারায়ণগঞ্জের দিকে ধাবিত হয়। মিছিলের গতিপথে শত শত সাধারণ মানুষ তাতে যোগদান করে। পথিমধ্যে সেনাবাহিনীর আসার পথকে রুদ্ধ করার জন্য এক বিশাল বেরিকেড তৈরী করা হয়। এ নিয়ে সেনাবাহিনীর সাথে শ্রমিকদের তীব্র সংঘর্ষ ঘটে। সেনাবাহিনী নির্বিচারে গুলীবর্ষণ করে। ফলে দু'জন ঘটনাস্থলেই নিহত হয় এবং অসংখ্য ব্যক্তি গুলীবিদ্ধ হয়। গুলীবিদ্ধদের মধ্যে ১১ জনের আঘাত ছিল খুবই মারাত্মক। এদিন ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় সেনাবাহিনী গুলীবর্ষণ করে। ফলে আরো দু'জনের মৃত্যু হয় এবং আরো কয়েকজন মারাত্মকভাবে আহত হয়। সামান্য আহতদের সংখ্যাও অনেক।

---

[৪৫৬] ন্যাপ ভাসানীর তৎকালীন যুগ্ম সম্পাদক নূরুল হুদা মির্জা, তৎকালীন শ্রমিকনেতা হায়দার আকবর খান রণো, কৃষক নেতা নুরুর রহমান, ছাত্রনেত্রী দিপাদত্তসহ প্রত্যক্ষদর্শি যত জনের সাথে কথা হয়েছে তারা সকলেই এই একই ধরনের চিত্রের কথা জানিয়েছে।

[৪৫৭] আজাদ, ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

এ ঘটনায় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রদান করে। তাতে জনসাধারণের প্রতি বিভিন্ন অনুরোধ জানানো হয়। এসবের মধ্যে রয়েছে আহতদের জন্য রক্তদান, মৃত জমায় রিকসা চালকদেরকে রিকসা প্রদান, গরিব জনসাধারকে সাহায্য করা ও তাদের শ্রমের ন্যায্য মজুরী প্রদান; দোকানে ন্যায্য মূল্যে পণ্য বিক্রয় ও সাম্প্রদায়িক সমপ্রীতি রক্ষ করা ইত্যাদি। উক্ত বিবৃতিতে ছাত্র ইউনিয়নের উভয় গ্রুপ, ছাত্র লীগ ও ডাকসু নেতৃবৃন্দ ছাড়া জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের নেতারাও স্বাক্ষর করেন। ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপ এর সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল্লাহ প্রায় আড়াই মাস আত্মগোপন থাকার পর এ ধরনের একটি বিবৃতিতে স্বাক্ষর দেন।

২৭শে জানুয়ারিও সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকে। কিন্তু এদিন তেমন কিছু ঘটে নি। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দ এদিনও একটি বিবৃতি প্রদান করেন। এ বিবৃতিতে শ্রমিকদের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করা হয় এবং তাদের শ্রেণীগত দাবী-দাওয়ার প্রতি সমর্থন জানানো হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ নেতারা শ্রমিকদের নিম্নোক্ত চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সচেতন থাকতে বলেনঃ

(১) যে কোন উস্কানির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে শৃংখলা বজায় রাখুন;

(২) সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে বজায় রেখে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে অগ্রসর হোন;

(৩) শ্রমিক এলাকায় সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করুন ও কালো ব্যাজ ধারণ করুন;

(৪) সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে পোস্টার, লিফলেট ও ব্যাপক আলাপ-আলোচনা এবং আন্দোলনের প্রচার কার্য অব্যাহত রাখুন।

এছাড়া, সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পরবর্তী কর্মসূচীর জন্য তাদেরকে প্রস্তুত থাকা ও সকল কর্মসূচীকে যথাযথ পালন করারও অনুরোধ করা হয়।[৪৫৮]

অর্থাৎ যদিও ২৪শে জানুয়ারি তারিখে আন্দোলনের রাজনৈতিক নেতৃত্ব বলতে আর কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না, তবু কঠোরতম সান্ধ্য আইনের মধ্যেও সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ একের পর এক সংগ্রামের নির্দেশিকা প্রদান করে গেছে। তখন এমন একটি অবস্থার উদ্ভব ঘটে যে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদই রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। এ পর্যায়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ওপর শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের নেতৃত্বও এসে পড়ে। অন্য কোন দল বা জোট এ ব্যাপারে কোন ভূমিকা পালন করতেই সক্ষম হয় নি। যদিও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ প্রধানত জনসাধারণের প্রচন্ড বিক্ষোভকে প্রশমিত করার জন্যই এসব নির্দেশ ঘোষণা করতে থাকে, তবু ছাত্রসমাজ ছাড়া জনসাধারণের পাশে দাঁড়ানোর মত কোন শক্তির অস্তিত্ব তখন ছিল না। গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি (ডাক), উহার অন্তর্ভুক্ত কোন দল কিংবা পিকিংপন্থী ন্যাপ ও অন্যকোন গোপন বা প্রকাশ্য দল জনসাধারণের এই ব্যাপক জাগরনকে পরিচালনার জন্য এগিয়ে আসেনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের স্ত্রীরাই প্রথমে ছাত্র-জনতার ওপর সরকারের নির্মম হামলার সমালোচনা করে সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রদান করেন। ২৮শে জানুয়ারি প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫২ জন শিক্ষকের স্ত্রী ১৭ জানুয়ারী থেকে ছাত্র-সমাজের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের ওপর পুলিশ, ইপিআর ও সেনাবাহিনী যে বর্বরোচিত হামলা চালিয়ে এসেছে তার আনুপূর্বিক বর্ণনা দিয়ে বলেন দমননীতি ও সন্ত্রাস দ্বারা গণতন্ত্র, মৌলিক অধিকার ও মানুষের বাঁচার দাবীকে স্তব্ধ করা যাবে না। তারা বিবৃতিতে একথাও বলেন, ছাত্র-জনতার ন্যায্য দাবী মেনে নিয়ে অবিলম্বে সান্ধ্য আইনসহ সকল প্রকার নির্যাতনমূলক পদক্ষেপ প্রত্যাহার করে আরো রক্তপাতের আশংকা দূর করা হোক। অন্যথায়, এ অন্যায় নীতির ভয়াবহ পরিণামের জন্য সরকারকে দায়ী থাকতে হবে।[৪৫৯]

ইতিমধ্যে গুলীবিদ্ধ আরো দু'জনের মৃত্যু ঘটে। ফলে জনসাধারণের ক্রোধ আরো বাড়তে থাকে। ২৭ তারিখ রাত ৮টা থেকে সান্ধ্য আইন আরো ৩৬ ঘন্টা বৃদ্ধি করা হয়। জাতীয় পরিষদের বিরোধী দলীয় সদস্যরা সান্ধ্য আইনের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে সংবাদপত্রে বিবৃতি দেন। ২৭শে জানুয়ারি জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে ফরিদ আহমদসহ বিরোধী দলীয় সদস্যরা সরকারের ব্যাপক দমননীতির প্রশ্নে মুলতবী প্রস্তাব উত্থাপন করতে চাইলে স্পীকার জব্বার খান তাতে আপত্তি জানান। তারা এ বিষয়ে চাপ সৃষ্টি করলে ফরিদ আহমদসহ ৫ জন বিরোধী দলীয় সদস্যকে পরিষদ কক্ষ থেকে বলপূর্বক বহিষ্কারের নির্দেশ দেওয়া হয়। ফলে পরিষদে তুমুল হট্টগোল শুরু হয়। এদিকে, বরিশাল, গৌরীপুর, চট্টগ্রাম, খুলনাসহ বিভিন্ন স্থানে পুলিশের গুলীবর্ষণের সংবাদ সরকারী প্রেস নোট থেকেই জানা যায়। ২৮শে জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরীকে গ্রেফতার করা হয়। এদিকে সান্ধ্য আইনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে কোর্টে রীট আবেদন করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-জনতার ওপর নির্মম হত্যাযজ্ঞ ও দমননীতির প্রতিবাদে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে ছাত্র-জনতা যে বিক্ষোভ মিছিল করে তার বিবরণ ঐদিনের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এর সাথে প্রকাশিত হয় 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র এক নম্বর আসামী শেখ মুজিবুর রহমানের একটি পূর্ণাঙ্গ জবানবন্দি, যাতে শেখ মুজিব খুব স্পষ্টভাবে তার রাজনীতির কথা তুলে ধরেন, যা আইয়ুব সরকারের গাত্রদাহের মূল কারণ। তিনি অত্যন্ত যুক্তি সহকারে এ কথা তুলে ধরতে সক্ষম হন যে, নিতান্ত উদ্দেশ্যমূলকভাবে এ ধরনের একটি মামলার সাথে তাকে জড়িত করা হয়েছে। ছাত্র-জনতার ওপর তীব্র দমনপীড়নের ফলে যখন পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র জনতা আইয়ুব সরকারের প্রতি তীব্রভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে, তখন শেখ মুজিবের এ জবানবন্দি সকল সংবাদপত্রে বড় বড় শিরোনামে প্রকাশিত হওয়ায় শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের রাজনীতির প্রতি জনসাধারণের একটি প্রচন্ড সহানুভূতি সৃষ্টি হয়। কেননা শেখ মুজিবের অবস্থান এবং আওয়ামী লীগের প্রচারপত্র ও কথাবার্তা সম্পর্কে জনসাধারণের ভিতর সংশয়ের ভাব থাকলেও শেখ মুজিবের পরিপূর্ণ জবানবন্দি পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার ফলে সে সংশয় কেটে যায়। প্রেসিডেন্ট তখন একটু নরম সুরে কথা বলতে শুরু করেন। তার বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে সরকারী মুখপত্র পাকিস্তান টাইমস এর প্রথম পৃষ্ঠায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, যাতে বলা হয়, সরকার শীঘ্রই বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির সাথে গোলটেবিল বৈঠক করবেন, যার আলচ্যসূচী হবে ডাক--এর ৮ দফা।[৪৬০]

অন্যদিকে, পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন, ছাত্রদের ওপর পুলিশবাহিনীর নির্মম হামলা, গুলিবর্ষণ ও হত্যা ইত্যাদির প্রতিবাদে পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্র-সমাজ ১৭ দফাভিত্তিকবেশজোরালো আন্দোলন শুরু করে। এতে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের ১১-দফাকে সমর্থন জানানো হয়। পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনার প্রতিবাদে পেশোয়ারে ৪০ হাজার ছাত্রের শোভাযাত্রা বের হয়। করাচীতে সরকার-বিরোধী আন্দোলন এমন এক তীব্র রূপ ধারণ করে যে, ২৯শে জানুয়ারি থেকে পরবর্তী ৪৮ ঘন্টা বিরতিহীন সান্ধ্য আইন জারি করা হয়।

---

[৪৫৮] আজাদ, ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৬৯।

[৪৫৯] প্রাগুক্ত।

[৪৬০] আজাদ, ৩০শে জানুয়ারি, ১৯৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে এদিকে পাকিস্তানের উভয় অংশে আন্দোলন যেমন ব্যাপকতা লাভ করে, অন্যদিকে, এ সময় একের পর এক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামীদের জবানবন্দী প্রকাশিত হতে থাকে। ফলে অন্ততঃ পূর্ব পাকিস্তানে সরকার-বিরোধী আন্দোলন আর উহার স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম ক্রমাগত অভিন্ন আকার ধারণ করে। ডাক-এর ৮ দফার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের কোন দাবী না থাকায় ডাক-এর পক্ষ থেকে কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার সুযোগ ছিল না। ফলে ডাক নিষ্ক্রিয় একটি রাজনৈতিক জোটে পরিণত হয়। অন্যদিকে, সরকারের পক্ষ থেকে যখন সুর নরম একটু করা হয় তখন থেকে মওলানা ভাসানী তার দলসহ বেশ সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ৩১শে জানুয়ারি মওলানা ভাসানী ঘোষণা করেন যে, ছাত্রদের ১১ দফার জন্য কৃষক জনতা প্রাণ দিবে। ৩০শে জানুয়ারি মওলানা ভাসানী সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিয়ে কারফিউ প্রত্যাহার ও ১১ দফা দাবী মেনে নেওয়ার আহবান জানান। এ বিবৃতিতে তিনি আইয়ুব সরকারকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন এবং ১১ দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে তার দলের সকল শাখার প্রতি এ আন্দোলনকে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি অন্যান্য দল ও জনসাধারণের প্রতিও এ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের আহবান জানান।

এ পর্যায়ে ঢাকা শহরের অবস্থা শান্ত হয়ে এসেছে কিন্তু সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত গণবিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছে। এত অসংখ্য ঘটনা এ সময় জেলাগুলিতে ঘটে যে, সংবাদপত্রের প্রায় সকল পৃষ্ঠা সেসকল বিবরণে ক্রমাগত ভরে উঠতে থাকে। ছাত্র জনতার বিক্ষোভ, প্রতিবাদ আর পুলিশের সাথে তাদের সংঘর্ষের বিবরণ প্রতিদিনই ফলাও করে ছাপা হতে থাকে। এরকম একটি পর্যায়ে আইয়ুব ডাক-এর ৮ দফার ভিত্তিতে আপোস-আলোচনার জন্য গোল টেবিল বৈঠকের আহবান জানান। এতে ডাক নেতৃবৃন্দের মধ্যে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত হয়। কারণ ৮ দফা ঘোষণা করার পর ডাক নেতৃবৃন্দ অধিকতর অগ্রসর কর্মসূচী প্রদান করার প্রশ্নে একমত হতে পারে নি। তাই আইয়ুবের আপোস-আলোচনার প্রস্তাবকে ডাক গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। তবে, আওয়ামী লীগ (৬-দফাপন্থী) নেতৃবৃন্দ সরাসরি আপোস-আলোচনার বিরোধিতা না করলেও দেশব্যাপী ছাত্র-জনতার ওপর নির্মম দমনপীড়নের তীব্র সমালোচনা করেন এবং স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, গণতন্ত্র আদায়ের জন্য জাতি যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। কিন্তু ডাকের অন্তর্ভুক্তপূর্ব পাকিস্তানের কোন নেতাই আইয়ুব প্রস্তাবিত গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান প্রশ্নে কোন মন্তব্য করতে পারে নি। এদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের ১১ জন বিশিষ্ট নেতা ৩০শে জানুয়ারিঘোষণা করেন যে, আইয়ুবের আপোষ-আলোচনার আহবান আসলেই কালক্ষেপন মাত্র। অবশ্য জাতীয় পরিষদের বিরোধী দলীয় নেতা নুরুল আমীন পূর্ব পাকিস্তানে পুলিশ, ইপিআর ও সেনাবাহিনীর অত্যাচারের এক মর্মস্পর্শী বর্ণনা দেন এবং ঘোষণা করেন যে, এ কয়দিন পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন বাহিনীর গুলীতে শতাধিক লোক নিহত হয়েছে। এর পরদিনই সরকার নিহতদের সম্পর্কে তার নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেন এবং তাতেও দেখা যায় যে,উক্ত কয়েক দিনে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে সরকারের বিভিন্ন বাহিনীর গুলীবর্ষণে মোট ৩০ ব্যক্তি নিহত হয়েছে।

মওলানা ভাসানী আপোস-আলোচনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তার সাথে সুর মিলিয়ে পিকিংপন্থী ন্যাপের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, গণদাবীর প্রশ্নে আপোস-আলোচনার কোন অবকাশ নেই। তাঁরা আরো মত প্রকাশ করেন যে, ছাত্র-জনতার আন্দোলনকে অস্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে দমন করতে ব্যর্থ হয়ে সরকার এখন নতুন কৌশল অবলম্বন করছে। ফলে শহীদের রক্তে রাঙ্গা জনগণের দাবী-দাওয়ার প্রশ্নে আপোস-আলোচনার কোন স্থান নেই। এই একই দিন সর্বদলীয় ছাত্র -সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে, ১১ দফা কর্মসূচীর বাস্তবায়ন ব্যতিরেকে কোন প্রকার আপোস-মীমাংসার সুযোগ নেই। ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদের এ ঘোষণার ফলে ডাক-এর সাথে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, পিকিংপন্থী ন্যাপের সাথে ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদের একটি সুস্পষ্ট ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ শুধু আপোস-আলোচনার বিরোধিতাই করেনি,তারা ১১ দফা কর্মসূচীর আন্দোলনকে আরও ব্যাপক, সুসংগঠিত ও জোরদার করে তোলার উদ্দেশ্যে শহর, বন্দর, থানা, মহল্লা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠনের জন্য ছাত্র-জনতার প্রতি উদাত্ত আহবান জানান। ঐ সময় প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান তার মাস পহেলা বেতার ভাষণে স্পষ্টভাবে একটি নরম সুর প্রকাশ করেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব বলেন; শাসনতন্ত্র ঐশী বাণী নয়- তা পরিবর্তন করা যেতে পারে। তিনি আরও ঘোষণা করেন; আলাপ-আলোচনার জন্য শীঘ্রই দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিবর্গকে আমন্ত্রণ জানাবো। আইয়ুবের এ ঘোষণার পর থেকে একে একে দু'চারজন করে রাজবন্দীর মুক্তি দেওয়া হতে থাকে, বিভিন্ন শহর থেকে একে একে সান্ধ্য আইন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়, ১৪৪ ধারার কড়াকড়ি শিথিল করা হয়। ডাক নেতৃবৃন্দের মনোভাবের প্রতিফলন হিসাবে বিচারপতি মাহবুব মোরশেদ এক বিবৃতিতে দাবী করেনঃ গোল টেবিল বৈঠকের পূর্বে মুজিব-ভুট্টো-ওয়ালীসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দিতে হবে। অর্থাৎ এ বিবৃতির মধ্য দিয়ে এটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, ডাক নেতৃবৃন্দ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব প্রস্তাবিত গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করতে রাজী আছেন তবে একটি মাত্র শর্ত পূরণ করতে হবে, আর তা হচ্ছে রাজবন্দীদের মুক্তি। এ নিয়ে ছাত্রসমাজ এবং জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। পিকিংপন্থী ন্যাপ ও তার অনুসারিগণ বলতে থাকেন, গোল টেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে জনসাধারণের মুক্তির দাবী ১১ দফাকে পাশ কাটানো, এমনকি ডাক-এর ৮ দফার প্রশ্নেও আপোস-রফা। এ বক্তব্যের ফলে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মধ্যেও ব্যাপকভাবে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের বিপক্ষে মতামত গড়ে উঠে। তবে শেখ মুজিবের মুক্তির অর্থ যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা মিথ্যা প্রতিপন্ন হওয়ার শামিল এ কথাটি কারো বিবেচনার মধ্যে আসে নি। ডাক- স্পষ্টভাবে আপোসমুখী মনোভাব গ্রহণ করে, অন্যদিকে, পিকিংপন্থী ন্যাপ ও ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদ কোন আলোচনাই নয়-- এ ধরনের এক চরম নীতি গ্রহণ করে।

রাজনৈতিক অঙ্গনে যখন গোল টিবিল বৈঠক নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে, তখন ছাত্রসমাজ নতুনভাবে আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে ধর্মঘট, বিক্ষোভ, প্রতিবাদ ইত্যাদি কর্মসূচী প্রনয়নের কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছে। সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী মহলও তাদের মৌলিক অধিকারসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দাবীনিয়ে ধর্মঘট শুরু করেন। এসময় সরকারী দল কনভেনশন মুসলিম লীগে ব্যাপক বিপর্যয় নেমে আসে। সরকারের পক্ষে কথা বলার মত আর কোন সংগঠন বা ব্যক্তিকেই খুঁজে পাওয়া যায় নি। পূর্ব পাকিস্তানের ২৭ জন কনভেনশন মুসলিমলীগ নেতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের স্বায়ত্তশাসনের দাবীর প্রতি জোরালো সমর্থন জানিয়ে বিবৃতি প্রদান করেন।

ইতিমধ্যেই ছাত্র-জনতার ওপর সরকারী দমন-পীড়নের প্রতিবাদে মৌলিক গণতন্ত্রীদের পদত্যাগ শুরু হয়ে গেছে। ২০শে জানুয়ারি আসাদুজ্জামানের হত্যার প্রতিবাদে ২৩শে জানুয়ারি বরিশালের তিনজন মৌলিক গণতন্ত্রী পদত্যাগ করেন।[৪৬১] একজন

---

৪৬১. সংবাদ, ২৪শে জানুয়ারি, ১৯৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

চেয়ারম্যানসহ উক্ত তিনজন মৌলিক গণতন্ত্রীই তাদের এলাকায় খুবই বিশিষ্ট ব্যক্তি, প্রত্যেকে উচ্চশিক্ষিত, এদের মধ্যে দু'জন এডভোকেট এবং একজন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক। পদত্যাগকারী উক্ত মৌলিক গণতন্ত্রীরা এ কথা খুব স্পষ্টভাবে বুঝে নিয়েছেন যে, আইয়ুব সরকার এবং তার মৌলিক গণতন্ত্র আর টিকছে না।তাদেরকে অনুসরণ করে পরদিন, অর্থাৎ ২৪শে জানুয়ারি নারায়ণগঞ্জের ৫ জন মৌলিক গণতন্ত্রীও পদত্যাগ করেন। ২৬শে জানুয়ারি দিনাজপুরের ২ জন মৌলিক গণতন্ত্রীর পদত্যাগের সংবাদ জানা যায়। ২৯শে জানুয়ারি শেরপুরের ৯ জন মৌলিক গণতন্ত্রী পদত্যাগ করেন। এসকল পদত্যাগী মৌলিক গণতন্ত্রীর মধ্যে সাধারণ একটি ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যে অধিকাংশই এডভোকেট এবং এরা প্রত্যেকে ছাত্র-জনতার ওপর সরকারের নির্মম দমন-পীড়নের প্রতিবাদ করেছেন এবং আসন্ন মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচন কার্যকরভাবে বয়কটের আহবান জানিয়েছেন।[৪৬২] এর পর ৩০শে জানুয়ারির মধ্যেই একে একে কুমিল্লা, মুন্সিগঞ্জ, সিলেট ও টাঙ্গাইলের আরো ৮ জন মৌলিক গণতন্ত্রীর পদত্যাগের সংবাদ প্রকাশিত হয় এবং বিভিন্ন এলাকার গ্রামাঞ্চলের তহসিল অফিস ঘেরাও-এর খবর জানা যায়। অন্যদিকে, প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ছাত্র-জনতার সাথে পুলিশ ও ই.পি.আর-এর সংঘর্ষের সংবাদ প্রকাশিত হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিসহ বিভিন্ন পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবীর পক্ষ থেকে সরকারী দমন-পীড়নের তীব্র সমালোচনা করে বিবৃতি প্রদান অব্যাহত থাকে।

এসময় সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের ভিতর কিছু দৃষ্টিভঙ্গীগত মতপার্থক্য প্রকাশিত হতে থাকে। যেখানে ৩রা ফেব্রুয়ারি তারা ১১ দফার পূর্ণবাস্তবায়নের প্রশ্নে কোন আপোস-আলোচনা চলতে পারে না বলে বিবৃতি দেয়, সেখানে তারা ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করেনঃ নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ রেখে কোন প্রকার আলোচনা অনুষ্ঠিত হতে পারে না। এক দিনের ব্যবধানে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উপরোক্ত অবস্থানটি ডাক-এর দৃষ্টিভঙ্গীর অনেক কাছাকাছি। অবশ্য ৫ই ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত এক বিবৃতিতে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ শর্তহীনভাবে আইয়ুব প্রস্তাবিত গোল টেবিল বৈঠক প্রত্যাখ্যান করেন এবং সংগ্রামের কর্মসূচী হিসাবে ৫ই ফেব্রুয়ারি 'কালো দিবস', এবং ৯ই ফেব্রুয়ারি শপথ দিবস হিসাবে পালনের কথা ঘোষণা করেন। আসলে ৩রা ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রদেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘটের প্রাক্কালে সম্ভবতঃ নেতৃত্ব এর সাফল্য সম্পর্কে কিছুটা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে, কিন্তু যখন দেখা গেল ধর্মঘট অত্যন্ত সফলভাবে পালিত হয়েছে তখন তারা অনেক আশাবাদী হয়ে ওঠে এবং ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হরতাল পালনের কর্মসূচী যখন ব্যাপকভাবে সাফল্য অর্জন করেছে এবং হরতালের পর আপোস বিরোধী বিভিন্ন শ্লোগান সহযোগে হাজার হাজার ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে জমায়েত হচ্ছে, তখন কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের মধ্যেকার আপোসমুখী নেতাদের বক্তব্য আর টিকেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় অনুষ্ঠিত বিশাল ছাত্রসভায় নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আপোসের বিরুদ্ধে সবাইকে সতর্ক করে দেন এবং গোল টেবিল বৈঠক প্রত্যাখ্যানের আহবান জানান। সভা শেষে ১০ সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রীর মিছিল বের হয় এবং ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকা আড়াই ঘন্টাব্যাপী প্রদক্ষিণ করে। এ শোভাযাত্রায় যে দু'টি শ্লোগান বিশেষভাবে প্রাধান্য পায় তা হচ্ছেঃ 'আপোস না সংগ্রাম-সংগ্রাম, সংগ্রাম' এবং গোল টেবিল না রাজপথ- রাজপথ, রাজপথ'। এ দিনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হরতাল এবং এই বিশাল মিছিলের আপোসহীন আওয়াজ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যেও একটি আপোসহীন মনোভাব সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দের প্রতি জনমানুষের এমন একটি আস্থা সৃষ্টি হয় যে, আজাদ-এর একজন নিবন্ধকার 'ছাত্রদের ১১ দফার প্রশ্নে কোন আপোস নাই'-শিরোনামে লিখিত সংগ্রাম পরিষদের ১০জন নেতার পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি তুলে ধরেন এবং উক্ত নিবন্ধের প্রথমেই কাব্যিক ভাষায় বলেনঃ

"রক্ত আখরে আকাশে যাহারা লিখেছে আপন নাম, সেই দশটি নাম-- যারা সংগ্রামের ইতিহাসে নয়া অধ্যায় সূচনা করেছে। জানুয়ারি আন্দোলনের মস্তিষ্ক মহান একুশের উত্তরসূরী, এদেশের ছাত্রসমাজের সেই দশজন প্রতিনিধি, জাতির জাগ্রত প্রহরী মুক্তিপিয়াসী ছাত্রসমাজের দশখানি মুখ।"

এদিন অর্থাৎ ৫ই ফেব্রুয়ারি আজাদ-এ ছাত্রসমাজের ১১ দফা পূর্ণ ব্যাখ্যাসহ পুনরায় প্রকাশ করা হয়, যার ফলে ১১ দফা জনতার মুক্তিসনদ হিসাবে আখ্যায়িত হয়। এ সময় সারা দেশে ছাত্র-জনতার আন্দোলন এত তীব্র রূপলাভ করে যে, সাধারণ আন্দোলনের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশ করার সুযোগ প্রকাশিত কদাচিৎ সারা দেশের স্কুল ছাত্ররাও আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে এবং সুদুর গ্রামাঞ্চলের মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্ররা অব্যাহতভাবে ধর্মঘট আর বিক্ষোভ মিছিল করতে থাকে। স্কুল ও কলেজের ছাত্রীরাও ব্যাপকভাবে আন্দোলনে যোগ দেয় এবং তারা বিভিন্ন এলাকায় স্বতন্ত্রভাবে শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। বিভিন্ন জেলার গৃহিনীরাও ছাত্র-জনতার ওপর সরকারী বাহিনীর নির্দয় দমননীতির বিরুদ্ধে শোভাযাত্রা ও স্মারকলিপি প্রদান করেন। এ সকল তৎপরতায় অংশ নেওয়ার কারণে শত শত স্কুল ছাত্র ও ছাত্রীকে গ্রেফতার করা হয়, 'কালোদিবস' পালন উপলক্ষে ঢাকার বাইরে ছাত্রদের ব্যাপকতর বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। ২৪শে জানুয়ারি ঢাকায় যা' ঘটেছিল সেদিন পূর্ব পাকিস্তানের কোন কোন জেলা শহরেও অনুরূপ তেমন ঘটনা ঘটে। টাঙ্গাইলে যা' ঘটেছিল পুলিশের প্রেসনোটের বিবরণ থেকে সে সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যাবেঃ

"প্রাদেশিক সরকারের এক প্রেসনোটে বলা হয়, আজ বেলা সাড়ে ১২টা ও পৌনে ১টায় টাঙ্গাইলের ছাত্ররা দু'টি মিছিল বাহির করে। ছাত্রদের অপর একটি মিছিল করটিয়া কলেজ হইতে আসে এবং টাঙ্গাইলের ছাত্রদের সহিত মিলিত হয়। এই অবস্থায় তাহারা ইতিপূর্বে গ্রেফতারকৃত কতিপয় ছাত্রের মুক্তিদাবী করে। তাহারা আরো হুমকি দেয় উক্ত ছাত্রদের মুক্তি দেওয়া না হইলে সরকারী অফিস ও বাসভবনসমূহে অগ্নিসংযোগ করা হইবে। ইতিমধ্যে মিছিলটি টাঙ্গাইল জেলা কাউন্সিল রেষ্ট হাউজে প্রতিষ্ঠিত কনট্রোলরুমের নিকটে পৌছুলে উহাতে যোগদানকারীর সংখ্যা ৪ হাজারে পৌছে। তাহারা তখন মারমুখী হইয়া ওঠে এবং কনট্রোলরুমে আক্রমণ করে। এই সময় এডিসি; এস.ডি.পি.ও এবং এস.ডি.ও তথায় উপস্থিত ছিলেন। মিছিলকারিগণ ডিউটিরত পুলিশ পার্টিকে আক্রমণ করে। পুলিশ কাদুনে গ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জের মাধ্যমে তাহাদের ছত্রভঙ্গ করিতে ব্যর্থ হয়। উচ্ছৃংখল জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া যাওয়ার পরিবর্তে পুনরায় চতুর্দিক হইতে কন্ট্রোলরুম আক্রমণ করে। বেলা সোয়া ১টার সময় কর্তৃপক্ষ ১৪৪ ধারা জারি করেন এবং সমাবেশটি বেআইনী ঘোষণা করেন। ই.পি.আর বাহিনী তখন কয়েকদফা হুশিয়ারি প্রদানের পর জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিয়ে দেওয়ার জন্য গুলীবর্ষণ করে। ফলে ৯ ব্যক্তি আহত হয়।"

সরকার প্রদত্ত প্রেসনোট থেকে এটা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ছাত্রসমাজের জাগরণ সে সময় কি ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। ছাত্রসমাজ সরকারের প্রতি কি রকম ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল যে, বার বার হুমকি সত্ত্বেও সরাসরি পুলিশ কন্ট্রোল রুমকে আক্রমণ করতেও

৪৬২ . সংবাদ, ২৪শে জানুয়ারি, ১৯৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিধাবোধ করেনি। অন্যদিকে, এ প্রেসনোট থেকে সরকারী কর্মকর্তাদের মনোভাব সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা মিলে। স্বয়ং এস.ডি.ও যেখানে উপস্থিত, অর্থাৎ মহকুমা প্রশাসক হিসাবে যিনি স্থানীয় কারো মুক্তিদানের অধিকারী, সেখানে মারমুখী এ ছাত্র-জনতার কাছে নতি স্বীকার না করে তিনি গুলীবর্ষণের নির্দেশ দিতেও দ্বিধাবোধ করেননি। যারা গুলীবিদ্ধ হয় তাদের মধ্যে একজন ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করে। এ ধরনের ঘটনা শুধু টাঙ্গাইলেই ঘটে নি, প্রদেশের জেলা ও মহকুমা শহর, এমন কি থানা শহরেও ঘটে। আর এর পরদিন অর্থাৎ ৬ই ফেব্রুয়ারি কালো দিবস উপলক্ষে ঢাকা শহরে ঘটে এক বিরাট ঘটনা। ঢাকা শহরের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়, কালো পতাকা ওড়ানো হয় এবং কালো ব্যাজ ধারণ করে ও কালো পতাকা বহন করে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী শ্লোগানমুখর অবস্থায় মিছিল সহযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অভিমুখে যাত্রা করে। বিভিন্ন দিক থেকে ছোট বড় শত শত মিছিলকে কেউ বাঁধা দেয়নি। এর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০ সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রীদের এক সংক্ষিপ্ত সভার পর গোটা জনতা এক বিশাল মিছিল নিয়ে ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে। এ মিছিল শহরের মধ্যে আসার পর বহু সংখ্যক সাধারণ মানুষ তাতে অংশগ্রহণ করে। অনেক বিদেশী সাংবাদিক এসে এ মিছিলের ছবি তোলে এবং তাদের সংগ্রামের সাথে সংহতি প্রকাশ করে নিজেরাও কালো ব্যাজ ধারণ করে।

৭ই ফেব্রুয়ারি ঢাকায় মহিলা সমাজের আহবানে আড়াই সহস্রাধিক মহিলার সভা ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। কবি বেগম সুফিয়া কামালের সভানেত্রীত্বে বাহাদুর শাহ পার্কে অনুষ্ঠিত এ সভায় ছাত্রসমাজের ১১ দফার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করা হয় এবং ছাত্র-জনতার ওপর গুলীবর্ষণ ও হত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও দোষী ব্যক্তিদের বিচারের দাবী করা হয়। ১১ দফা আন্দোলন সফল করার লক্ষে দেড় ঘন্টাব্যাপী মহিলাদের এক বিরাটশোভাযাত্রা প্রদর্শিত হয়। অবশ্য এ সভায়, গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের সরাসরি বিরোধিতা করা হয় নি, তবে তার আগে দেশে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে সকল রাজবন্দীর মুক্তি দানের আহবান জানানো হয়।

ইতিমধ্যে আইয়ুব খান আরো নরম মনোভাব প্রকাশ করেন। ৬ই ফেব্রুয়ারি তিনি ঢাকা আসেন এবং সাংবাদিকদের জানান যে, জরুরী আইন প্রত্যাহারের চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। এদিনই সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে নিয়ে যাওয়া ও ১৪৪ ধারা প্রত্যাহারের ঘোষণা প্রদান করা হয়। ৭ই ফেব্রুয়ারি দেশরক্ষা আইন ও অধ্যাদেশ প্রয়োগ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত জানানো হয়। এভাবে 'ডাক' নেতৃবৃন্দের সাথে সরকারের আলোচনার একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়।

ডাক নেতৃত্বের অধিকাংশই গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের ব্যাপারে সমত হন। কেননা ইতিপূর্বে তারা আলোচনার জন্য যে পূর্বশর্ত আরোপ করেছিলেন সরকার তারপর সব কিছুই একে একে মেনে নেয়। ৯ তারিখে ইত্তেফাক-এর ছাপাখানা নিউনেশন প্রিন্টিং প্রেসের ওপর থেকে বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হয়। ঐদিন একটি সরকারী মুখপত্রে ঘোষণা করা হয় যে, ২ দিনের মধ্যে জরুরী আইন প্রত্যাহার করা হবে। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট আইয়ুব কনভেনশন লীগ অধিবেশনে ঘোষণা করেন যে, আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের জন্য নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিবেচনা করা হচ্ছে। ১০ই ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভাইস চ্যান্সলরদের সাথে তার আলোচনায় বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ বাতিল করার বিষয়টি প্রাধান্য পায়। অন্যদিকে, ৯ই ফেব্রুয়ারি থেকে ব্যাপক সংখ্যক রাজবন্দীর মুক্তি প্রদান শুরু হয়। এদিন কেবল ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে ১৪৪ জন রাজবন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়। ১০ তারিখে চারজন বিশিষ্ট বিরোধী দলীয় নেতা মুক্তি পান। ১২ই ফেব্রুয়ারি ৬ দফাপন্থী আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদকে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৩ই ফেব্রুয়ারি ছাত্র নেতা রাশেদ খান মেননসহ ৬৫ জন রাজবন্দী মুক্তিলাভ করেন। অন্যদিকে, ডাক-এর পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে, শেখ মুজিব সম্পর্কিত বিষয়টি আলোচনার পূর্বশর্তের অন্তর্ভুক্ত নয়। ফলে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব প্রস্তাবিত গোল টেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে আর কোন বাঁধা রইলনা। তবে শেখ মুজিবের মুক্তির প্রশ্নে ৬-দফাপন্থী আওয়ামী লীগের সাথে ডাকের অন্য দলগুলির তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়। আওয়ামী লীগ ৭ই ফেব্রুয়ারিঘোষণা করে যে, শেখ মুজিবকে ছাড়া গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করবে না। ডাক-এর অন্যান্য দল শেখ মুজিবের মুক্তির প্রশ্নটি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার নিষ্পত্তির সাথে সম্পর্কিত বলে অভিমত ব্যক্ত করে। তাদের মতে যার বিরুদ্ধে দেশের নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশ্নে এমন গুরুতর অভিযোগ রয়েছে সেরকম একজন ব্যক্তির মুক্তির দাবীকে এ ধরনের একটি বৈঠকে অংশগ্রহণের পূর্বশর্ত হিসাবে আরোপ করা ঠিক নয়। এ প্রশ্নে মস্কোপন্থী ন্যাপ অন্যদের থেকে ভিন্ন মত পোষণ করলেও ঐক্যের স্বার্থে সেটি ডাক-এর অধিকাংশ দলের সাথে অভিন্নতা প্রকাশ করে। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানও তখন সুযোগ বুঝে ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে ১১ই ফেব্রুয়ারি বলেন, ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের সাথে দেশের নিরাপত্তার প্রশ্নটি জড়িত।

অন্যদিকে,মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও তার ন্যাপ দল এ সম্পর্কে তখনও স্পষ্ট কোন অবস্থান গ্রহণ করতে পারেনি। সাধারণভাবে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের বিপক্ষে তারা অভিমত প্রকাশ করতে থাকে। তবে এ আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মওলানা ভাসানী খুবই শংকিত হয়ে পড়েন। তিনি ভাবতেন এ উপমহাদেশে ভারত এমন একটি রাষ্ট্র, যার অখন্ড অস্তিত্ব যতদিন বজায় থাকবে ততদিন এ এলাকার কোন দেশের সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত হতে পারে না। কিন্তু পাকিস্তানে মার্কিন পুঁজি নির্ভর বুর্জোয়াশ্রেণী এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, পরিপূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ছাড়া পূর্ব পাকিস্তান, উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ; বেলুচিস্তান ইত্যাদি এলাকার জাতিসমূহ ও জনসাধারণের বিকাশের পথ রুদ্ধ। সে কারণে তিনি একদিকে যেমন চাইতেন পূর্ব পাকিস্তানসহ পাকিস্তানের বিভিন্ন জাতি ও জনগণের পরিপূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, ঠিক তেমনই চাইতেন পাকিস্তানের অখন্ডতা।[৪৬৩] আর তাই তিনি যখন দেখতে পান যে, পূর্ব পাকিস্তানে অব্যাহতভাবে শ্রেণীসংগ্রাম গড়ে তোলার চরম চেষ্টা সত্ত্বেও জনসাধারণ জাতীয়তাবাদী ধারায়মেরুভূত হয়ে যাচ্ছে, যার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতা। একারনেই তিনি আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনকে শ্রেণী-আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে গিয়ে যখন ব্যর্থ হলেন তখন এ ব্যাপারে আর তার তেমন উৎসাহ থাকেনি। কিন্তু তার উৎসাহ ছাড়াই যখন ছাত্র-জনতার আন্দোলন এতদুর অগ্রসর হয়েছে যে, স্বয়ং প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেস-- সে সময় মওলানা ভাসানী এ আন্দোলনে নিজস্ব রাজনীতির একটি ছাপ রাখার জন্য শেষে একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। এ পর্যায়ে মওলানার অনুভূতি কি ধরনের ছিল তা বোঝার জন্য একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। এ ঘটনার সাক্ষী শরদিন্দু দস্তিদার বলেনঃ

"আসাদ মারা গেছে। ২০ থেকে ২৪ তারিখ পর্যন্ত ছাত্রদের ব্যাপক অভ্যুত্থান চট্টগ্রামেও হয়েছে। ২৪ তারিখের অভ্যুত্থানের পর আরো কয়েকদিন ধরে ব্যাপক বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ চলছে। এ পর্যায়ে আইয়ুব গোল টেবিলের আহবান জানালো। আমরা গোল টেবিল বর্জন

---

৪৬৩. মওলানা ভাসানী একান্ত অনুসারী নূরুল হুদা মির্জা মওলানার মূল্যায়ন করতে গিয়ে লেখকের কাছে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা গুলি বলেন।

Dhaka University Institutional Repository

করার কথা বলছি। বিশাল বিশাল মিছিল করছি। পুলিশের সাথে সংঘর্ষ হচ্ছে। কিন্তু এভাবে আর কতদিন চলতে পারে। স্বভাবতঃই প্রশ্ন আসলো ছাত্ররা যা করার করলো, কিন্তু এর পর কি। গোল টেবিল বৈঠকের প্রশ্ন এমন একটি সময়ে এসেছিল যে, সে সময় গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেওয়ার পূর্বশর্ত হিসাবে দু'টি প্রশ্নই আসতে পারতোঃ এক, ১১ দফা মেনে নেওয়া, আর দুই, শেখ মুজিবের মুক্তি। ১১ দফা এমন একটি কর্মসূচী ছিল যার বাস্তবায়ন পুরো আর্থ-সামাজিক কাঠামো বদলানোর সাথে সম্পর্কিত ছিল; আর 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র ব্যাপারটি এমন আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়েছিল যে, শেখ মুজিবের মুক্তি দাবী করা মানেই আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচী ভিত্তিক রাজনীতির পক্ষে দাঁড়ানো। আর আন্দোলন সফল হওয়ার অর্থই শেখ মুজিব এবং তার দেওয়া ৬ দফা কর্মসূচীর সামগ্রিক বিজয়। এসব নিয়ে আমরা উভয় সংকটে রয়েছি। এমন একটি সময়ে মওলানা ভাসানী চট্টগ্রাম গেলেন। গ্রামাঞ্চলে অনুষ্ঠিত দু'টি জনসভায় বক্তৃতা দিয়ে চট্টগ্রাম ফিরে এসে আমাকে ডাকালেন।... মওলানা আমাকে বললেন, 'আমার কাজতো আমি করলাম। তোমরা তো কেন্দ্রীয় কমিটির। তোমরা কি ক্ষমতা দখল সম্পর্কে কিছু ভেবেছ?' আমি চুপ করে আছি। কিছু বলতে পারছি না। মওলানা বললেন, 'চুপ করে আছ কেন। তাহলে কি তোমরা ক্ষমতা দখলের জন্য প্রস্তুত নও?' আমি বললাম, মুভমেন্টতো একটা হল। সামনে মিটিং আছে। বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হবে। মওলানা বললেন, বুঝলাম। ধন্যবাদ।[৪৬৪]

বলা বাহুল্য, শরদিন্দু দস্তিদার ছিলেন তৎকালীন গোপন চীনপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি ইপিসিপি (এম-এল)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। সে যা'হোক, শরদিন্দু দস্তিদারের সাথে এ আলোচনার পরই মওলানার কথাবার্তা আর বক্তৃতার ভাষা পাল্টে গেল। সেদিনই তিনি চট্টগ্রামের লালদীঘির ময়দানের এক বিশাল জনসভায় সরাসরি আইয়ুব সরকারকে উৎখাতের আহবান জানালেন এবং পুলিশের গুলীতে নিহত একজনের লাশ নিয়ে এমন জঙ্গী মিছিল করলেন যে, চট্টগ্রামের সমগ্র প্রশাসনিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়লো। অর্থাৎ শরদিন্দু দস্তিদারের সাথে আলাপ করে মওলানা যখন বুঝলেন যে, কমিউনিস্টরা যতই সশস্ত্র বিপ্লবের কথা বলুক, তাদের ক্ষমতা দখলের কোন পরিকল্পনা নেই, তখন ভাসানী আর বসে থাকেননি। শেখ মুজিবের মুক্তির প্রশ্নকে বিবেচনায় নিয়ে তিনি আপোসহীন সংগ্রামের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন।

যে সময় সমগ্র পাকিস্তানে, বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তানের সকল স্তরের মানুষ এক মরিয়া আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়েছে ঠিক সে সময় পিকিংপন্থী গোপন কমিউনিস্ট পার্টি কি ধরনের কাজে অবতীর্ণ ছিল সে সম্পর্কে এর একজন কেন্দ্রীয় নেতার অভিজ্ঞতা এখানে উদ্ধৃত করা খুবই প্রাসঙ্গিক হবে।

তৎকালীন ইপিসিপি (এম-এল)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির প্রভাবশালী সদস্য এবং পিকিংপন্থী ন্যাপের খুলনা জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম এক সাক্ষাৎকারে বলেনঃ

"দেশে তখন ছাত্ররা তাদের কালো দিবস, শপথ দিবস ইত্যাদি নিয়ে ব্যাপক আন্দোলন করছে। পার্টির ইপিসিপি (এম-এল) জেলা কমিটির মিটিং ছিল সেদিন। আমরা ভোর থেকে বসে সারাদিন মিটিং করলাম। আলোচনার বিষয় ছিল চারু মজুমদারের লাইন গ্রহণ করা হবে কি হবে না। এ নিয়ে সারাদিন আমরা তীব্র বিতর্ক করলাম। গোটা জেলা কমিটির সদস্য সেখানে উপস্থিত। তার অর্থ জেলার সকল নেতাই আমরা মিটিং-এ। সন্ধ্যার সময় মিটিং সেরে যখন আমরা বের হচ্ছি তখন দেখি অন্ততঃ ১০ হাজার শ্রমিক আমাদের সামনে দিয়ে উগ্র শ্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে যাচ্ছে। এত বড় মিছিল যে খুলনার শ্রমিকরা সরকারের বিরুদ্ধে করতে পারে এ ধারণাই আমাদের তখন ছিল না।"

এ দু'টি ঘটনা থেকে একথা খুব পরিষ্কার যে, যখন দেশের সমগ্র জনতা এক মরণপণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে তখনও পিকিংপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন নেতা বিদ্যমান বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিহীন সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থান নিয়ে তৎপরতা চালাচ্ছেন।

এদিকে, ৯ই ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের শপথ দিবস উপলক্ষে ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ জনসভায় দুই লক্ষাধিক ছাত্র-জনতার সমাবেশ ঘটে। ছাত্র-জনতার আশু দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত কোন আপোস-আলোচনা চলতে পারে না বলে ছাত্র নেতৃবৃন্দ সরাসরি ঘোষণা করেন, তারা আরো বলেন, আশু গণদাবী আদায় ও দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত বিরোধী দলীয় নেতৃবর্গকে প্রস্তাবিত গোল টেবিল বৈঠকে উপস্থিত হতে দেওয়া হবে না। ছাত্র নেতৃবৃন্দের আহবানে সাড়া দিয়ে আইয়ুব সরকারের প্রতি অনাস্থাসূচক প্রস্তাবকে জনসভায় উপস্থিত দুই লক্ষাধিক জনতা হাত উঁচু করে সমর্থন জানায়।

ছাত্রদের এ বিশাল জনসভার দৃপ্ত ঘোষণায় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। ৬-দফাপন্থী আওয়ামী লীগ দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে, শেখ মুজিবের মুক্তি দেওয়া না হলে আওয়ামী লীগ কোনক্রমেই গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করবে না। তারা আরো ঘোষণা করে যে, প্রয়োজনে তারা 'ডাক' থেকে বের হয়ে আসতেও দ্বিধাবোধ করবে না। আওয়ামী লীগের এ ঘোষণা ছাত্র-জনতা কর্তৃক ব্যাপকভাবে সমর্থিত হয়। এ পর্যায়ে 'ডাক' কার্যত ভাঙ্গনের মুখোমুখি গিয়ে পৌঁছায়। আওয়ামী লীগ ১০ই জানুয়ারি গণনিপীড়নের প্রতিবাদ ও শেখ মুজিবের মুক্তির দাবীতে আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারি সারা পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল পালনের আহবান জানায়। ভাসানী ন্যাপ আওয়ামীলীগের এ কর্মসূচীকে সমর্থন করে এবং তার সকল শাখাকে এ কর্মসূচী সফল করে তোলার জন্য আহবান জানায়। ইতিপূর্বে মওলানা ভাসানীর আহবানের প্রতিধ্বনি করে ন্যাপ নেতৃবৃন্দ আরো ঘোষণা করেন যে, স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈতিক মুক্তির প্রশ্ন জলাঞ্জলি দিয়ে কোন আপোস-মীমাংসা হতেপারে না। ভাসানী ন্যাপ তার অবস্থানকে স্পষ্ট করার জন্য ১৬ই ফেব্রুয়ারি পল্টন ময়দানে এক জনসভার আয়োজন করে এবং সেদিন থেকে গণদাবী সপ্তাহ নামে একটি আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করে। এদিকে শিল্পী-সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা এক বিশাল মশাল মিছিল বের করে আইয়ুব সরকারের সাথে যে কোন ধরনের আপোস-মীমাংসার বিরোধিতা করে এবং ছাত্রদের ১১ দফার প্রতি দৃঢ়ভাবে একাত্মতা ঘোষণা করে। ১১ দফার প্রতি পরিবহন শ্রমিকরাও সংহতি প্রকাশ করে। পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে আসন্ন গোল টেবিল বৈঠকের বিরোধিতা করে বিশাল বিশাল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ইতিমধ্যে জাতীয় পরিষদের ভাসানী ন্যাপের তিনজন সহ মোট ৭ জন সদস্য গণনির্যাতন ও গণহত্যার প্রতিবাদ এবং ১১ দফার সমর্থনে পদত্যাগ করেন। বিভিন্ন মহল থেকে ১৪ই ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের হরতালের প্রতি সমর্থন আসতে থাকে। চট্টগ্রাম শহরে ১১ই ফেব্রুয়ারি 'শেখ মুজিব দিবস' নাম দিয়ে এক সফল হরতাল পালন করা হয়। ১২ই ফেব্রুয়ারি রিক্সা শ্রমিকরা ঘোষণা করে শেখ মুজিবকে মুক্তি না দিলে ৩০ হাজার রিক্সা শ্রমিক ধর্মঘট পালন করবে। সরকারের দমননীতির প্রতিবাদে করাচী শহরেও মহিলাদের এক বিশাল

৪৬৪. শরদিন্দু দস্তিদার লেখকের সাথে এক সাক্ষাৎকারে এ কথাগুলি বলেন।

Dhaka University Institutional Repository

শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে, পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ক্রমাগত আরো বেশী সংখ্যায় মৌলিক গণতন্ত্রীদের পদত্যাগের সংবাদ আসতে থাকে। ১৩ই ফেব্রুয়ারীতারিখে ঢাকার সংবাদপত্রসমূহে পশ্চিম পাকিস্তানের তিন শতাধিক মৌলিক গণতন্ত্রীর পদত্যাগের সংবাদ প্রকাশিত হয়। সরকারী দমননীতির প্রতিবাদে তারা পদত্যাগ করেছে বলে জানা যায়। এমনি অবস্থায় একথা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, ডাক নেতৃবৃন্দ যদি আপোস-আলোচনায় অংশগ্রহণ করেও তাহলেও পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হবে না, বরং অধিকতর উগ্ররূপ নিয়ে জনসাধারণের আন্দোলন এগিয়ে যাবে। এরকম একটি পরিস্থিতিতে কাউন্সিল মুসলিম লীগ নেতা আবুল কাসেম ঘোষণা করেন যে, শেখ মুজিবের মুক্তি ছাড়া গোল টেবিল বৈঠকের আলোচনা ফলপ্রসূ হবে না। আর এভাবে আওয়ামী লীগ (৬-দফাপন্থী) বর্হিভূত ডাক-নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগের দাবীর কাছে হার মানেন। তারা ডাক-কে বিভক্ত হতে না দিয়ে আওয়ামী লীগ ঘোষিত হরতাল সারা পাকিস্তানে পালনের আহবান জানায়। এটাই ছিল পাকিস্তানের ইতিহাসে সর্ব পাকিস্তানভিত্তিক হরতাল আহবানের প্রথম ঘটনা। অবশ্য 'ডাক'- আওয়ামী লীগের দাবীকে সরাসরি সমর্থন করেনি, তারা ডাক-এর ৮-দফা দাবী ও গণনির্যাতনের প্রতিবাদে এ হরতাল আহবান করে। ১৪ই ফেব্রুয়ারি সমগ্র পাকিস্তানে এক অভূতপূর্ব হরতাল অনুষ্ঠিত হয়। পল্টন ময়দানে ডাকের কেন্দ্রীয় সমাবেশ পালিত হয়। এদিনের জনসভা লোকে লোকারণ্য হয়। পল্টনের আশে-পাশের সমস্ত এলাকা, দালান-কোঠার ছাদ, দেওয়াল ইত্যাদির ওপর শুধু মানুষ আর মানুষ। তিন লক্ষাধিক জনতার এ সভার সকল স্থান থেকে 'আপোস না সংগাম-সংগ্রাম সংগ্রাম,' 'গোল টেবিল না রাজপথ, রাজপথ রাজপথ' ইত্যাদি আপোস-বিরোধী স্লোগান এত ব্যাপকভাবে উঠতে থাকে যে, ডাক-এর পাকিস্তানবাদী অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়েন। ছাত্র-নেতাগণ একের পর এক আপোস বিরোধী বক্তব্য রাখেন এবং গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানেচ্ছু সকল নেতার তীব্র সমালোচনা করেন। তুমুল করতালির মধ্য দিয়ে সদ্য কারা মুক্ত তাজউদ্দীন আহমদ ঘোষণা করেন যে, শেখ মুজিব ব্যতিরেকে কোন ধরনের আপোসমূলক আলোচনায় আওয়ামী লীগের পক্ষে যোগদান করা সম্ভব নয়।[৪৬৫] ঐ সভায় তাজউদ্দীন আহমদ, মোজাফফর আহমদ ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছাড়া আর কোন নেতার ভাষণই ছাত্র-জনতা শুনতে চায়নি। এমনকি, মস্কোপন্থী ন্যাপ নেতা সদ্য কারামুক্ত অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ যখন তার বক্তৃতায় ছাত্র-জনতার সকল আন্দোলনকে শান্তিপূর্ণ রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করে আইয়ুবের গোল টেবিল বৈঠকে আহবানকে জনতার বিজয় হিসাবে আখ্যায়িত করেন, তখন ছাত্র-জনতার বিভিন্ন অংশ থেকে তার তীব্র প্রতিবাদ ওঠে। সেদিনের হরতাল যে কত সফল হয়েছিল তা আংশিকভাবে অনুধাবণের জন্য ১৬ই ফেব্রুয়ারি আজাদে প্রকাশিত নিম্নোক্ত নিবন্ধটি উদ্বৃত করা যেতে পারেঃ

"শুক্রবারে হরতাল আর জনসভায় যা দেখেছি"

(নিজস্ব নিবন্ধকার)

"শুক্রবার গোটা দেশ বিশেষ করে ঢাকা নগরীতে ছিল মানুষের রাজ। সমূদ্রউত্তাল জনতাতরঙ্গ রাজধানীর পিচে ঢাকা কালো রাজপথ পদভারে প্রকম্পিত করে তুলেছিল। দিকে দিকে ধ্বনিত হয়েছে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামী স্লোগান। শুক্রবারের হরতাল অন্যান্য সব হরতালের মত গণঅভ্যুত্থান আর বিক্ষোভের নীরব প্রকাশ ছিল না। অগণিত খন্ডখন্ড মিছিলের মূহর্মূহ স্লোগানে রাজধানীর আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে--মানুষ বজ্রের থেকে ধ্বনি কেড়ে নিয়ে প্রাণের দাবী ঘোষণা করে।

শুক্রবার অফিসের কেরানী কলম-পেন্সিল ধরেনি, গঞ্জের মহাজন পাল্লা মাপেনি, নৌকার মাঝি দাঁড় টানেনি, রিক্শা-স্কুটার চালক প্যাডেল মারেনি, স্কুলের দারোয়ান ঘন্টা বাজায়নি, আদালতের চাপরাশী হাঁক দেয়নি, ট্রাক-বাসের ড্রাইভার ষ্টিয়ারিং ধরেনি, পথের ফেরিওয়ালা ওলিগলিতে ঘোরেনি, ষ্টেশনের ট্রেন ছাড়ার সিটি বাজায়নি, লঞ্চের ভেঁপু কোন আওয়াজ করেনি, এমন কি, বিদেশগামী বিমানও বন্দর ছাড়েনি। কাক ডাকা ভোর থেকে গোধুলীর লগ্ন পর্যন্ত সব চাকা বন্ধ ছিল। অফিস-আদালত, সওদাগরী কর্মাঙ্গনে তালা ছিল আর কারখানার বয়লার নেভানো ছিল। কর্মকোলাহলমুখর মানুষ কর্মের অঙ্গন থেকে রাজপথে নেমে এসেছিল। অফিস-আদালতের দরজায় ছিল খিল আর পথে পথে মিছিল। সেদিন মানুষ হরতালের দিনকে নীরব প্রতিবাদের দিনে সীমিত রাখেনি; অবসর আর অবকাশে পর্য্যবসিত করেনি। সমাজ সংসার আর চাকরির কাজ বাদ দিয়ে একদিনের জন্য হলেও তারা পথে নেমেছে অগণিত মিছিলে শরীক হয়ে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী ঘোষণা করেছে।

মিছিলের মুখ ছিল দুর্জয় সংকল্পে অটল। গঞ্জের ব্যাপারী, দোকানের দোকানী, অফিসের কেরানী, স্কুলের শিক্ষক আদালতের আইনজীবী সবাই নেমেছিল পথে। সবার চোখে-মুখে ছিল শাণিত শপথ-মুক্তি আমরা আনবই।

সেদিন পাখির ডাকে নয় স্লোগানের গর্জনে পাকিস্তানের মানুষের ঘুম ভেঙ্গেছিল। প্রতিটি পাড়া প্রতিটি মহল্লা, প্রতিটি আবাসিক এলাকা পরিণত হয়েছিল মিছিলের অঙ্গনে। পূর্ব পাকিস্তানের বাসন্তী প্রকৃতিতে সূর্যের আলো যত প্রখর হচ্ছিল, মেহনতী মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার বুলন্দ আওয়াজ জোরদার হচ্ছিল। ৭ বছরের অবুঝ শিশু থেকে ৮০ বছরের বৃদ্ধ পর্যন্ত সেদিন স্লোগান দিয়েছিল। হরতাল পালনে যে স্বভাবসুলভ আতংক, গাম্ভীর্য আর নীরবতা থাকে আতংকহীনচিত্তে হরতাল পালন করেছে আর বলিষ্ঠ কণ্ঠে দাবীর সপক্ষে আওয়াজ তুলেছে। দেখে মনে হয়েছে আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে।

যানবাহন ব্যস্ত রাজধানীর প্রধান সড়কের মাঝখানে বসে তরুণ বালক আপন মনে লিখেছে নিজের দাবীর কথা, দেওয়ালে দেওয়ালে ঘোষিত হয়েছে রাজবন্দীর মুক্তির দাবী, মানুষের রাজ কায়েমের দাবী, স্বায়ত্তশাসনের দাবী আর বাঁচার মত বাঁচার দাবী। অগণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে সর্বত্র। সে বিক্ষোভ সংক্রামিত হয়েছে এক মিছিল থেকে অপর মিছিলে, এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। ছাত্র-জনতা সকাল বেলা নিজ নিজ পাড়ায় মিছিল সহকারে একদফা প্রদক্ষিণ করেছিল--যদি কোন দোকানপাট খোলা থাকে? কিন্তু কোথাও কোন দোকানপাট খোলা ছিল না। অনেককে দেখেছি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেক্রেটারিয়েট ও অন্যান্য অফিসের সামনে শুয়ে পড়ে কর্মচারীদের পথ রোধ

---

৪৬৫. দৈনিক ইত্তেফাক, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

করতে। আরেকটি বস্তুর প্রতি সতর্ক লক্ষ্য ছিল সংগঠকদের, বিশেষ করে ছাত্রদের। কোথাও শান্তি ভঙ্গ করার বিন্দু মাত্র চেষ্টা হলেই ছাত্র স্বেচ্ছাসেবকরা যেয়ে তাদের বাধা দিয়েছেন। সেক্রেটারীয়েট, কয়েকটি সংবাদপত্র অফিস ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে তারা সতর্ক প্রহরায় ছিলেন। জনতা এই দিন পুনরায় আইয়ুবনগরী নাম পাল্টিয়ে দ্বিতীয় রাজধানীর নাম দিয়েছেন শেরেবাংলানগরী আর আইয়ুব গেটের নাম দিয়েছেন শহীদ আসাদ গেট। পাকিস্তানের মানুষের প্রিয়তম নেতা শেরে বাংলা আর সাম্প্রতিক আন্দোলনের প্রথম শহীদ ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামানকে স্মরণের আবরণে ঢেকে রাখার জন্যই জনতা এই নামকরণ করেছেন। এই দাবী তাদের প্রাণের দাবী-- হৃদয়ের প্রীতি স্নেহ আর শ্রদ্ধা নিংড়ানো দাবী। এর আবেদন কানে নয়-- প্রাণে।

সকাল থেকে যে মিছিলগুলো মহল্লায় মহল্লায় ঘুরছিল, দুপুরের পরই সেগুলো-চল চল-পল্টনে চল শ্লোগান দিতে দিতে পল্টনের দিকে ছুটতে থাকে। এমন হাজারও মিছিল জমায়েত হয় পল্টন জনসমুদ্রে, শোকের প্রতীক কালো পতাকা আর সংগ্রামের প্রতীক লাল পতাকা হাতে নিয়ে এগিয়ে এসেছে মানুষ। ব্যানার পোষ্টার আর প্লাকার্ডে ছেয়ে গেছে মাঠ। মুহুর্মুহু শ্লোগানে মথিত হয়ে উঠেছে আকাশ-বাতাস। ঈদের নামাজের দিন যেমন কাতারে কাতারে মানুষ ছোটে ঈদগাহ পানে, তেমনি জনতার স্রোতে ছুটছিল পল্টনের ময়দানে। বাবা ও ছেলে একই মিছিলে শরিক হয়ে শ্লোগান দিয়েছে। সবার চোখে সংগ্রামের বজ্রশপথ। সভাতেও দেখেছি সংগ্রামী মানুষের জয়। ছাত্রদের ১১ দফা আর শেখ মুজিবের মুক্তির দাবী ছাড়া কোন বক্তাকেই সভার মঞ্চে উঠতে দেয়নি জনতা। সংগ্রাম অব্যাহত রাখার সংকল্প ঘোষণা না করার আগে কাউকে ছাড়েনি জনতা। মেহনতী মানুষের ১১ দফা বাস্তবায়ন ও পাকিস্তানের সংগ্রামী নেতা শেখ মুজিবের মুক্তি ছাড়া আর কোন কথা শুনতে চায়নি জনতা। তাই 'ডাক' ঘোষিত নেতৃবর্গের বদলে কেবল তারাই বক্তৃতা দিতে পেরেছেন যারা ছিলেন জনতার সাথে। ছাত্রনেতারা কালকের এই জনসমুদ্রকে পরিচালনা করার ক্ষমতা কারও ছিল না। সংগ্রামের বিরুদ্ধে যেই বলেছে বা বলার চেষ্টা করেছেন, তাকেই ধিকৃত হতে হয়েছে। জনসমুদ্রের যে উর্মি জেগেছে তার তোড়েই নেতৃবর্গের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে আমাদের সংগ্রাম চলবেই।"

এদিন যে শুধু ঢাকায় এ ধরনের ব্যাপকতর হরতাল হয়েছিল তা নয়, সেদিন পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র গ্রামাঞ্চলের হাট-বাজারেও ব্যাপকতর হরতাল অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তী কয়েকদিনের কাগজ ভরে ভরে এ সংবাদ প্রকাশিত হতে থাকে। ইতিমধ্যে ১৫ই ফেব্রুয়ারি ঘটে যায় একবিস্ময়কর ঘটনা। সশস্ত্র বাহিনীর গণসংযোগ ডাইরেক্টরটের এক প্রেস রিলিজে বলা হয়, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার দু'জন অভিযুক্ত ব্যক্তি আজ প্রহরীকে আঘাত করে ও তাদের অস্ত্রশস্ত্র দখলের প্রয়াসের মাধ্যমে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক, সার্জেন্ট জহুরুল হক ও সাবেক হাবিলদার ক্লার্ক মজিবর রহমানকে তাদের কোয়ার্টার থেকে প্রায় ৭৫ গজ দূরে অবস্থিত পায়খানায় নিয়ে যাওয়ার সময় অকস্মাৎ প্রথমোক্ত দু'জন প্রহরীদের ওপর হামলা চালায় এবং তাদের রাইফেল কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। এমতাবস্থায় কর্তব্যরত অন্যান্য প্রহরীগণ এই দু'জনের প্রতি লক্ষ্য করে গুলী ছোড়েন। এতে উক্ত দু'জন গুলীবিদ্ধ হয়ে আহত হন। তাদেরকে বাঁচানোর জন্য সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এর পর রাতে অন্য একটি প্রেস রিলিজে জানানো হয় যে, তলপেটে গুলীবিদ্ধ সার্জেন্ট জহুরুল হক রাত ৯.৩০টায় মৃত্যুবরণ করেন। এ মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর সমগ্র রাজনৈতিক অংগনে এক প্রচন্ড বিস্ময় ছড়িয়ে পড়ে। সশস্ত্রবাহিনীর গণসংযোগ ডাইরেক্টরেট প্রদত্ত প্রেস রিলিজের তথ্য কেউ বিশ্বাস করেনি। এ সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরই যে হাজার হাজার মানুষ পথে নেমে প্রতিবাদ করেছিল তা নয়। তবে এ ঘটনার ফলে গোল টেবিল বৈঠক বা আপোস-আলোচনার ব্যাপারে যে সরকারের কোন সুমতলব ছিলনা তাই সকলের কাছে অনুভূত হয়।

১৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে শুরু হয়েছিল পিকিংপন্থী ন্যাপের দাবী সপ্তাহের প্রথম দিন। এ উপলক্ষে এদিন অপরাহ্নে পল্টন ময়দানে উক্ত দলের জনসভার কর্মসূচী ছিল। তবে সরকার-বিরোধী আন্দোলনে তখন পর্যন্ত এ দলটির অবস্থান পরিষ্কার না হওয়ায় এবং মওলানা ভাসানীর দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণে বিশেষতঃ ছাত্রদের নেতৃত্বে গড়ে-ওঠা গণঅভ্যুত্থানের পরও যখন মওলানা ভাসানী বা তার দল খুব শক্তিশালীভাবে এগিয়ে আসেনি-- সে কারণে জনসাধারণের মধ্যে মওলানা ভাসানী ও তার দলের প্রতি সংশয় ছিল। ফলে পিকিংপন্থী ন্যাপের জনসভায় সাধারণ মানুষ সেভাবে আগ্রহ সহকারে যোগদান করেনি। কিন্তু ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, দোকান কর্মচারী, ছোট দোকানদার ইত্যাদি পেশার মানুষের মধ্যে এই দলটির তখন এতই ভাল কাজ ছিল যে, সে জনসভায় বিপুল সংখ্যক সংগঠিত মানুষ যোগদান করে। এ সভায় ঢাকার আশে-পাশের এলাকা থেকে বেশ কয়েকটি বিশাল আয়তনের কৃষক-জনতার মিছিল আসে, তেজগাঁও, টঙ্গী, ডেমরা ও আদমজীসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে বিশাল বিশাল শ্রমিক-জনতার মিছিল আসে। এছাড়া, পুরোনো ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চল, যাত্রাবাড়ি, আজিমপুর, মগবাজার ইত্যাদি এলাকা থেকে আরো বেশ কয়েকটি বড় বড় মিছিল আসে-- এগুলির মধ্যে কয়েকটিতে অন্তত তিন-চার হাজার জনতা অংশ নিয়েছিল। ফলে সাধারণ শ্রোতার সংখ্যা খুব একটা বেশী না হলেও আজাদ-এর রিপোর্ট অনুয়ায়ী এ লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ ঘটেছিল। এ জনসভার প্রায় সমগ্র জনতাই ছিল সংগঠিত, ফলে সমগ্র জনসভার প্রায় সকল মানুষই বিভিন্ন ধরনের শ্লোগানে ছিল মুখরিত। মুহর্মুহু শ্লোগান উঠছিল আপোস না সংগ্রাম--সংগ্রাম, সংগ্রাম, গোল টেবিল না রাজপথ- রাজপথ। এছাড়া, ১১ দফা দাবী আর কৃষক-শ্রমিকসহ বিভিন্ন শ্রমজীবী জনতার নিজস্ব দাবীতে শ্লোগান উথিত হচ্ছিল। আর মাঝে মাঝে শ্লোগান উঠছিল জাগো, জাগো- বাঙ্গালী জাগো' শ্লোগান। যাত্রাবাড়ি এলাকা থেকে বিশাল একটি মিছিলের নেতৃত্ব দিয়ে এ জনসভায় আগত সে সময়ের একজন মাঠ পর্যায়ের কর্মী জনাব ক.খ. জোয়ার্দার জানানঃ 'সেদিনের জনসভা ছিল একেবারে একটি বিস্ফোরিত বারুদের মত। কি যে বিস্ময়কর ক্ষোভ সেদিন সমগ্র জনসভার মানুষের উচ্চকিত কণ্ঠের শ্লোগানের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল তা ভাষা দিয়ে বোঝানো যাবে না।' তিনি আরও বলেনঃ 'আমরা যখন যাত্রাবাড়ি থেকে মিছিল নিয়ে আসছি তখন হয়েছিল আমার এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। আমরা শ্লোগান তুলছিলাম ১১ দফা আর শ্রমজীবী জনতার দাবীর সপক্ষে। হঠাৎ একজন শ্লোগান তুললো-'জাগো, জাগো'- অমনি সমগ্র মিছিলটি 'বাঙ্গালী জাগো' শ্লোগানে একেবারে মাতোয়ারা হয়ে উঠলো। আমাদের শ্লোগান সাময়িক সময়ের জন্য হলেও একেবারে ভেসে গেল। জনসভাতেও আমি একই দৃশ্য দেখেছি।"[৪৬৬]

---

৪৬৬. ক.খ. জোয়ার্দারের সাথে লেখকের সাক্ষাৎকার।

Dhaka University Institutional Repository

যাহোক, মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে এ জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জন সভায় বক্তারা ১১ দফা পূরণ ও বন্দি মুক্তির দাবীর কথা বলেন এবং গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের বিরোধিতা করেন। পিকিংপন্থী ন্যাপের প্রাদেশিক কমিটির যুগ্মসম্পাদক মির্জা নূরুল হুদা কাদের বক্স তার বক্তৃতায় ১৫ই ফেব্রুয়ারি ও তার পূর্বের কয়েক দিনে দেশের বিভিন্ন স্থানে সরকারী নির্যাতনের তালিকা দিয়ে আপোস আলোচনার ক্ষেত্রে সরকারের আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং এর পর সুনির্দিষ্টভাবে বলেন যে,যতদিন শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তিদান ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা না হবে ততদিন সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে এবং ততদিন সরকারের সাথে যে কোন ধরনের আপোস-আলোচনার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। মির্জার এ বক্তৃতার পর সমগ্র জনসভার প্রায় সমস্ত কোন্ থেকে শেখ মুজিবের মুক্তির পক্ষে শ্লোগান উঠতে থাকে। এর পর মওলানা ভাসানী তার স্বভাবমূলক ভাষায় দেশের মানুষের কি নেই তার এক ফিরিস্তি দেন আর এর জন্য সরাসরি দায়ী করেন সরকারকে। এর পর তিনি ১১ দফা কেন গণমানুষের দফা তার ব্যাখ্যা দেন এবং দুই মাসের মধ্যে এদাবী মেনে নেওয়া না হলে খাজনা-ট্যাক্স বন্দ করে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেন। ছাত্র-জনতার ওপর সরকারের দমন-পীড়নের তীব্র সমালোচনা করে এর পর মওলানা ভাসানী বলেনঃ 'আমার এককালের সংগ্রামের সাথী শেখ মুজিবর রহমানসহ সকল দেশ প্রেমিককে যদি অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া না হয় তবে এদেশে ফরাসী বিপ্লবের পুনরাবৃত্তি ঘটবে। কারা প্রাচীর ভেঙ্গে পড়বে।' এর পর তিনি তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলেন, আইয়ুব সরকার যদি আপোসে মুক্তি না দেয় তাহলে শেখ মুজিবকে ক্যান্টনমেন্ট ভেঙ্গে বের করে নিয়ে এস'। এ পর্যায়ে সমগ্র জনসভা ক্যান্টনমেন্ট ভাঙ্গার শ্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে। এরকম একটি পর্যায়ে কয়েকজন শ্রমিক এসে সংবাদ দেয় যে, আবদুল গনি রোডে মিছিলের ওপর পুলিশের গুলীবর্ষণে একজন নিহত হয়েছে। সে সংবাদ জনসভায় প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথেই জনসভার সমগ্র জনতা মিছিল শুরু করার জন্য দাঁড়িয়ে পড়ে। মওলানা ভাসানী তাৎক্ষণিকভাবে মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত সমাপ্ত করেই মিছিল শুরু করেন। মওলানা নিজে এ মিছিলের নেতৃত্ব দেন। সামান্য সময়ের মধ্যেই তীব্র গতি আর জঙ্গী শ্লোগান মিলে মিছিলটি এমন অগ্নিমূর্তি ধারণ করে যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের কোন শক্তির পক্ষেই আর তা দমন করার ক্ষমতা থাকে নি। ইতিমধ্যে সার্জেন্ট জহুরের মৃত দেহ বহন করে নিয়ে যাওয়া বিশালকায় শব মিছিলের ওপর সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবদুল গনি রোডস্থ প্রাদেশিক যোগাযোগ মন্ত্রীর বাস ভবনের সামনে পুলিশ গুলীবর্ষণ করে। এতে তিনজন গুলীবিদ্ধ হন। ঘটনাস্থলেই একজনের মৃত্যু হয়। এতে শব মিছিলের জনতা আরো বিক্ষুব্ধ হয়ে যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব সুলতান আহমদের বাড়িতে অগ্নি সংযোগ করে। অবশ্য দমকল বাহিনীর গাড়ি এসে আগুন নিভিয়ে দিতে সক্ষম হয়। কিন্তু এর পর পরই তথা মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন মিছিলটি আসার পর সমগ্র ঢাকা শহরের সমস্ত এলাকায় আগুন জ্বলে ওঠে। যে সকল পুলিশ বাঁধা দিতে এসেছিল তাদের কাছ থেকে জনতা রাইফেল ছিনিয়ে নেয়। ক্রুদ্ধ জনতা বিশেষ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান ও তার সচিব যেখানে অবস্থান করছিলেন সেই স্টেট গেস্ট হাউসের ওপর প্রচন্ড আক্রমণ করে, বিচারপতি ও তার সচিব সার্ভেন্ট কোয়ার্টারে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করে, রেসকোর্স ময়দানে অবস্থিত ঘোড়া রাখার শেডগুলিতে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়, কনভেনশন মুসলিম লীগের সভাপতি ও ঢাকার নবাব হাসান আসকারীর বাসভবনে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় এবং তা অনেক রাত পর্যন্ত জ্বলতে থাকে। তথ্য ও বেতার মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীনের বাড়িতেও অগ্নিসংযোগ করা হয়। শাহবাগের সামনে নির্মীয়মান প্রাদেশিক কনভেনশন মুসলিম লীগ ভবনে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। সরকারী দলের উর্দ্ধতন নেতার জামাতার মালিকানাধীন আরমানিটোলার আলতাফ প্রেসে আগুন লাগানো হয় এবং প্রেসটি পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। এছাড়া, মন্ত্রীদের বা সরকারী দলের নেতৃবৃন্দকে যেখানে পাওয়া গেছে সেখানে জনতা আক্রমণ করেছে, তাদের গাড়ি পুড়িয়েছে, সরকারী যানবাহন যতগুলি মিছিলকারীদের সামনে পড়েছে তার সব পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ মারমুখী জনতার হাত থেকে সরকারী সম্পত্তি, তার মন্ত্রী, কর্মকর্তা, সরকারী দলের নেতা ও তার কার্যালয় কিংবা ঢাকা শহরে যেখানে যে সরকারী দালান ছিল দেড় ঘন্টার মধ্যে জনতা সেসবের ওপর আক্রমণ করেছে। এ আক্রমণ থেকে এসবকে রক্ষা করার মত সরকারী প্রশাসনের হাতে আর কোন শক্তিই অবশিষ্ট ছিল না। ফলে সরকার সান্ধ্য আইন জারি করে। সাময়িকভাবে জনতা ঘরে ফিরে যায়, তবে জনসাধারণের মধ্যে যে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করে তা লক্ষ্য করে পরদিন সকাল ৭টা পর্যন্ত সান্ধ্য আইন বলবৎ রাখার ঘোষণা দেওয়া হলেও পরে তার মেয়াদ আরো বাড়িয়ে দেওয়া হয়। ১৭ই ফেব্রুয়ারি সান্ধ্য আইন জারি থাকার কারণে ঢাকায় তেমন কিছু ঘটেনি। তবে ঢাকার বাইরে সমগ্র প্রদেশব্যাপী ছাত্র-জনতা তীব্র বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এদিন ছিল প্রদেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট। সার্জেন্ট জহুরের নিহত হওয়ার সংবাদ আর ধর্মঘট মিলে বিক্ষোভের আগুন আবার নতুন মাত্রা নিয়ে দেখা দেয়। এদিন চট্টগ্রামে ঘটে এক প্রচন্ড বিস্ফোরণ। কনভেনশন মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ ও তাদের সম্পদের ওপর জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আক্রমণ করে। বহুসংখ্যক গৃহ ও প্রেক্ষাগৃহসহ বিভিন্ন সরকারী বাসভবনে আগুন জ্বালানো হয়। এ অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ই.পি.আর তলব করতে হয় এবং জারী করতে হয় ১৪৪ ধারা।

১৮ই ফেব্রুয়ারি ঢাকায় কয়েক ঘন্টার জন্য সান্ধ্য আইন শিথিল করা হয় এবং ঘোষণা করা হয় পরদিন তথা ১৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখে ১০ ঘন্টার জন্য সান্ধ্য আইন শিথিল করা হবে। কিন্তু এ দিন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে যায় এক মর্মান্তিক ঘটনা। ১৮ই ফেব্রুয়ারি দুপুরে পুলিশের গুলীতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের রিডার ডঃ শামসুজ্জোহাসহ তিন ব্যক্তি নিহত হন। এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে প্রদেশব্যাপী যে কি ঘটনা ঘটে যায় তা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। ঢাকার হাজার হাজার ছাত্র-জনতা সান্ধ্য আইন ভেঙ্গে রাজপথে বেরিয়ে আসে। জনতার ওপর সেনাবাহিনী ব্রাশ ফায়ার করে। কিন্তু তবুও জনতা পিছ-পা হয়নি। ঢাকা শহরের মানুষ ১৮ই ফেব্রয়ারী দিবাগত রাত্রি রাইফেলের গুলীর শব্দ আর উচ্চকিত কণ্ঠের মিছিলের আওয়াজ শোনে। ব্যাপক গুলী বর্ষণের পরও দেখা যায় ক্রমাগত সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করে মানুষ বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দিতে থাকে। মালিবাগ ও মগবাজার এলাকায় সান্ধ্য আইনের মধ্যেও জনতা মিছিলে নেমে পড়ে। এভাবে জনতা সান্ধ্য আইন ভেঙ্গে ফেললেও সরকারী বাহিনীগুলি এদিন মরিয়া হয়ে জনতার ওপর গুলীবর্ষণ ও বেওনেট চার্জ করতে থাকে। ফলে সরকারী হিসাব অনুযায়ীই এ রাতে ২০ জন নিহত হয় এবং গুলীবিদ্ধ ও বেনেটের আঘাতে শতাধিক ব্যক্তি মারাত্মকভাবে আহত হয়। সরকারী বাহিনীর সাথে ছাত্র-জনতার সংগ্রাম সান্ধ্য আইনের মধ্যেও সারারাত অব্যাহত থাকে। পরদিন সকাল ৭টা থেকে সান্ধ্য আইন শিথিল করার কথা থাকায় সকাল থেকে আরো বিপুল সংখ্যক ছাত্র-জনতা রাজপথে নেমে আসে। এ জনতার ওপর সরকারী বাহিনী নির্দয়ভাবে গুলীবর্ষণ করতে থাকে। ফলে আরো কয়েকজন হতাহত হয়। ক্রমে জনতার সংগ্রাম জঙ্গীরূপ ধারণ করতে থাকে। ফলে অকস্মাৎ বেলা ১১টা থেকে ৪ ঘন্টার জন্য সান্ধ্য আইন শিথিল করা হয়। আর তার পর পরই সমগ্র ঢাকার মানুষ যেন রাজপথে নেমে পড়ে। চারিদিক থেকে আগত জঙ্গী মিছিলের আওয়াজে ঢাকা শহর প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। বেলা দু'টার পর থেকে শুরু হয় রাস্তাগুলিতে বেরিকেড তৈরীর প্রতিযোগিতা। তবে ৩টা থেকে সান্ধ্য আইন আবার শুরু করার পর এসব

Dhaka University Institutional Repository

বেরিকেড সরিয়ে ফেলা হয়। কিন্তু সন্ধ্যার পর থেকে এমন দ্রুততার সাথে বেরিকেড তৈরী করা হতে থাকে যে, সরকারী বাহিনী একেবারে ঘেরাও হয়ে পড়ে। এদিন আর শহরে সান্ধ্য আইন বলতে প্রায় কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকেনি। মূল সড়কে বিরাট বিরাট বেরিকেড দেওয়ায় ছোট ছোট রাস্তাগুলি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে পরিণত হয়। ১৬ থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারী এই চারদিনে বিক্ষোভ মিছিলের ভাষা পরিপূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়। দলমত নির্বিশেষে সমগ্র বাঙ্গালীর কাছে সমস্ত স্লোগান ছাপিয়ে একমাত্র স্লোগান ওঠে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বাতিল কর' আর 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই'। অবশ্য ১১ দফার সপক্ষেও পাশাপাশি বিভিন্ন স্লোগান উঠতে থাকে। এদিন যে ঢাকা শহরেই এরকম অবস্থা হয়েছিল তা নয়, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, নোয়াখালি, বরিশাল, ও কুষ্টিয়াসহ সমগ্র প্রদেশব্যাপী এক ব্যাপক বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে স্বতস্ফুর্তভাবে ছাত্র-জনতা হরতাল পালন করে। সরকারী বাহিনীও সারা দেশে গুলী চালায়। ফলে বহু লোক হতাহত হয়। অবস্থা এমন একটি পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয় যে, সান্ধ্য আইন অকার্যকর হয়ে পড়ে। তাই আকস্মিকভাবেই সান্ধ্য আইন প্রত্যাহার করে নিতে হয়।

ইতিমধ্যে সরকার গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠানের অনেক চেষ্টা করে। মস্কোপন্থী ন্যাপ, আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা, এমনকি, স্বয়ং শেখ মুজিবও প্যারোলে মুক্তি পেয়ে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। কিন্তু পিকিংপন্থী ন্যাপ ও সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের অনমনীয় এবং দৃঢ় ভূমিকার কারণে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়ার আগ পর্যন্ত গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত করা সরকারের পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। পরে অবশ্য শেখ মুজিব প্যারোলে মুক্তি পেয়ে গোল টেবিল বৈঠকে যাওয়ার প্রস্তাবকে নাকচ করে দেন। তবে এক্ষেত্রে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ যেভাবে সান্ধ্য আইনকে অগ্রাহ্য করতে থাকে এবং সরকার-বিরোধী সংগ্রাম ক্রমে প্রতিরোধ আন্দোলনে রূপ নিতে থাকে তখন সরকারের মনোভাবেও পরিবর্তন ঘটে। ২০শে ফেব্রুয়ারি বিকাল তিনটা থেকে সান্ধ্য আইন পুনরায় বলবৎ করার আগে থেকেই যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিকেড তৈরীর ধুম পড়ে যায় এবং রাত্রে সান্ধ্য আইনের মধ্যেও যে ব্যাপক শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় তার ফলে একটানা আরও ২৪ ঘন্টার জন্য সান্ধ্য আইনের মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। আবার এদিন সন্ধ্যায় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের মশাল মিছিলের কর্মসূচী ছিল। এ কর্মসূচী পালনের জন্য প্রস্তুতির কাজ সান্ধ্য আইনের মধ্যেও চলতে থাকে। চারদিক থেকে এ প্রস্তুতি এমনভাবে চলতে থাকে যে, সান্ধ্য আইন বলবৎ রাখলে আগের দিনের চেয়েও যে আরো ব্যাপকভাবে সান্ধ্য আইনকে ভেঙ্গে ফেলা হবে তা বুঝতে সরকারের অসুবিধা হয়নি। তার ওপর সামনেই ছিল একুশে ফেব্রুয়ারির মত একটি স্পর্শকাতর দিন। এসব কিছু মিলে এ দিনের প্রস্তুতি ছিল ব্যাপক। তবে ছাত্র-জনতাকে সান্ধ্য আইন ভাঙ্গতে হয়নি, ২০ তারিখ বিকাল ৫টা থেকে আকস্মিকভাবে সান্ধ্য আইন তুলে নেওয়া হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে সারা ঢাকা শহর যেন নেচে ওঠে। শহরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মিছিলের পর মিছিল নিয়ে ছাত্র-জনতা ইকবাল হলের দিকে আসতে থাকে। প্রায় সবার কাছে মশাল। সন্ধ্যার পর পরই ইকবাল হল প্রাঙ্গন থেকে শুরু হয় মশাল মিছিল। এতবড় মশাল মিছিল পাকিস্তানের ইতিহাসে ইতিপূর্বে আর কখনও অনুষ্ঠিত হয়নি। এ মশাল মিছিলে লক্ষাধিক লোক অংশগ্রহণ করেন।[৪৬৭] ঢাকার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে যখন মিছিলটি শহীদ মিনারে এসে শেষ হয় তখন শহীদ মিনারের চতুর্দিকে আরো কয়েক লক্ষ লোক সমবেত হয়েছে। সবাই জানতে চায় এর পর কি কর্মসূচী। বিক্ষিপ্তভাবে কেউ বক্তৃতা দিচ্ছে, কেউ বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে ইত্যাদি। মশাল মিছিল আসার পর সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দের মুখ থেকে পরবর্তী কর্মসূচীর কথা জানতে সবাই উৎকর্ণ হয়ে থাকে। ছাত্র নেতৃবৃন্দ স্পষ্টভাবে ঘোষণা দেয় 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' প্রত্যাহার, শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি এবং ১১ দফা কর্মসূচীর বাস্তবায়ন ছাড়া আপোস-আলোচনার যে কোন ধরনের প্রচেষ্টাকেই প্রতিরোধ করা হবে। ছাত্র নেতৃবৃন্দ আরো ঘোষণা করেন, সান্ধ্য আইন জারি করে আর জনগণের অভ্যুত্থানকে দাবীয়ে রাখা যাবে না। এখন থেকে সান্ধ্য আইনকেও প্রতিরোধ করা হবে। পরদিন তথা একুশে ফেব্রুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে এদিনের মূল গণ-জমায়েতটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে এত বিপুল সংখ্যক মানুষের সমাবেশ ঘটে যে, আশে-পাশের এলাকায়ও স্থান সংকুলান হয় নি। এদিন, পল্টন ময়দানের এ গণজমায়েতে ২৪শে জানুয়ারির গণঅভ্যুত্থানের দিন শহীদদের লাশ সামনে নিয়ে জানাজা অনুষ্ঠানে যে পরিমাণ মানুষের সমাবেশ ঘটেছিল প্রায় তার কাছাকাছি সংখ্যক লোক উপস্থিত হয়েছিল। এ গণজমায়েতে ছাত্র নেতারা বক্তৃতা দেন এবং তারা আগের দিনের বক্তব্যের পুনরুল্লেখ করেন। এদিন শুধু যে ঢাকায় এরকম গণমজায়েত হয়েছিল তা নয়, দেশব্যাপী গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত বিশাল বিশাল গণজমায়েত হয়েছিল। এদিনই আসলে একথা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, পূর্ব পাকিস্তানের কোথাও আর রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। কার্যত পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রব্যবস্থাটি ভেঙ্গে পড়ে, কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার সেটা দখল করার জন্য সে সময় কেউ প্রস্তুত ছিল না। রাষ্ট্র জনসাধারণের কাছে হার মানে। শেখ মুজিব ছাত্র-জনতার সংগ্রামের প্রতীক হয়ে ওঠেন। সরকার 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' প্রত্যাহার করে নেয় এবং শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীকে মুক্তি দেয়।

আসলে এ পর্যায়েই ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের কাছে পাকিস্তান রাষ্ট্র নতি স্বীকার করে। তার কোন উপায় ছিল না। সান্ধ্য আইন দিয়েও যখন পরিস্থিতির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা যাচ্ছে না, ক্রমেই সান্ধ্য আইনকে প্রতিরোধ করার দিকে মানুষ ঝুঁকে পড়ছে, ব্রাশ ফায়ার করেও কোন কাজ হচ্ছে না, ঢাকা শহরের মানুষের সাথে প্রথমে শ্রমিক জনতা এবং তারপর ঢাকার আশে-পাশের কৃষক-জনতাও অংশগ্রহণ করছে; শুধু ঢাকা শহরেই নয়,জনসাধারণের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য দেশব্যাপী ১৪৪ ধারা জারি করতে হচ্ছে, তাতেও যখন কাজ হচ্ছে না, তখন জনসাধারণের ওপর গুলী চালাতে হচ্ছে, জেলা ও মহকুমা শহরগুলি এমনকি অধিকাংশ ক্ষেত্রে থানাশহরগুলিতে ১৪৪ ধারা জারি বা গুলী চালিয়েও যখন ছাত্র-জনতার আন্দোলনকে স্তব্ধ করা যাচ্ছে না তখন জারি হচ্ছে সান্ধ্য আইন। কিন্তু ঢাকা শহরসহ সারা প্রদেশে যখন সান্ধ্য আইন অন্যান্য করা হচ্ছে, আর সরকারী বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিকেড তৈরী করে সেনাবাহিনীকে একরকম ঘেরাও করে ফেলা হয়েছে। তখনই পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাছে একথা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে, এর পরও যদি পাকিস্তান রাষ্ট্র সামরিক শক্তিকে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর ব্যবহার করতেথাকে তাহলে তার পরিণতি হবে মারাত্মক। কেননা শান্তিপূর্ণ অবস্থায় যতদুর আন্দোলন আগানো সম্ভব তার সবটুকু এগিয়ে নেওয়ার পর যখন দেখা গেল তার পরও সরকার আরও আগ্রাসী প্রক্রিয়ায় জনসাধারণের ওপর আক্রমণ করছে, সান্ধ্য আইন একদিকে দিনের পর দিন অব্যাহত রাখা আর অন্যদিকে জনসাধারণের ওপর নির্মম অত্যাচার চালানো এ দুটি কারনে মানুষঅসহ্য হয়ে সান্ধ্য আইন ভাঙ্গতে শুরু করে এবং এক পর্যায়ে তা প্রতিরোধ করতে শুরু করে। ফলে এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে স্বাভাবিকভাবেই আন্দোলন আর শান্তিপূর্ণ থাকবেনা, এমনকি,

৪৬৭ দৈনিক ইত্তেফাক, ২১শে ফেব্রুয়ারি,১৯৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

তা' বলপ্রয়োগমূলক আন্দোলনে রূপ নিতে পারে। এ অবস্থা বিবেচনা করেই সরকার জনসাধারণের কাছে নতি স্বীকার করেছে। এছাড়া, দেশের নিরাপত্তার সাথে জড়িত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' প্রত্যাহারের পর সরকারের টিকে থাকার আর কোন ন্যায় সংগত ভিত্তি থাকে নি। দোর্দন্ড প্রতাপশালী আইয়ুব সরকার এভাবে জনসাধারণের কাছে নতি স্বীকারে বাধ্য হওয়ার মধ্য দিয়ে এটাই প্রমাণ হয় যে, তার আর কোন উপায় ছিল না। 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' বাতিল ও সকল রাজবন্দীর মুক্তি এ দু'টি দাবী অর্জিত হওয়ার পর সারা পূর্ব পাকিস্তানের গণমানুষের মধ্যে যে কি অপার আনন্দ সৃষ্টি করেছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। শেখ মুজিব যে গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে প্রধান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিগণিত হয়েছিলেন, তার প্রমাণ মিলে তার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ব্যাপক জনসমাবেশ থেকে। সংবর্ধনার স্থান রেসকোর্স ময়দান যার আয়তন প্রায় ৩ বর্গ কিলোমিটার। এই পুরো মাঠটি সেদিন আনন্দ-উচ্ছল মানুষে ভরে গিয়েছিল। আজাদ পত্রিকার মতে সেদিন ১০ লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ ঘটেছিল। এর পর আরো এক মাস জনসাধারণের আন্দোলন অব্যাহত থাকে। শহরের আন্দোলন গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ে এবং ১০ হাজারেরও অধিক মৌলিক গণতন্ত্রী পূর্বপাকিস্তান থেকে পদত্যাগ করেছে, কিন্তু উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ফেব্রুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে যে পরিমাণ শক্তি অর্জন করেছিল সেটাই মূলতঃ আইয়ুব সরকারের পতনকে অত্যাসন্ন করে তোলে।

'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' প্রত্যাহার ও রাজবন্দীদের মুক্তির মধ্য দিয়ে যে রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জিত হয়, তা'হল আওয়ামী লীগের ৬-দফার রাজনীতির বিজয়। কিন্তু শেখ মুজিব তার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেরদীর্ঘ ভাষণে একথা স্বীকার করেছিলেন যে, ছাত্রদের ১১ দফাই জনসাধারণের বিভিন্ন অংশকে, বিশেষতঃ শ্রমিক-কৃষকসহ সকল স্তরের শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল। অর্থাৎ যে রাজনীতিকে সামনে রেখে জনসাধারণের এ ব্যাপকতর অংশগ্রহণ ঘটেছিল তার অংশবিশেষের নেতাই এ পর্যায়ে অবিসংবাদিতরূপে পরিণত হয়েছিলেন। শেখ মুজিব প্রথম দিন ১১ দফাকে জোর সমর্থন করলেও ধীরে ধীরে তার অবস্থান পরিবর্তন করেন। অন্যদিকে, রাজনীতিতে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতায় মওলানা ভাসানী দারুণভাবে পিছিয়ে পড়ে ১১-দফা বাস্তবায়নের দাবী নিয়ে প্রচন্ড ক্ষিপ্রতা নিয়ে মাঠে নামেন। তিনি সরাসরি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আঘাত হানার জন্য একের পর এক কর্মসূচী গ্রহণ করতে থাকেন। দেশব্যাপী শুরু হয়ে যায় শ্রমিক, কর্মচারী ও কৃষক জনতার আন্দোলন। এ পর্যায়ে ক্রমশঃ শ্রেণী-দাবী মুখ্য হতে থাকে। শ্রমিক কর্মচারিগণ মওলানার ডাকে জ্বালাও-পোড়াও আন্দোলনে শামিল হতে থাকেন। আর শেখ মুজিব বার বার এ সময় জনসাধারণের কাছে শান্তি রক্ষার জন্য আহবান জানান। ফলে শহরাঞ্চলে সাময়িক শান্তি বিরাজ করলেও গ্রামাঞ্চলে শুরু হয়ে যায় তীব্র সংগ্রাম। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ায় কৃষক-জনতা ক্রমশঃ মারমুখী হয়ে উঠে। জনসাধারণের ওপর কর্তৃত্বকারী মৌলিক গণতন্ত্রীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। হাজার হাজার কৃষক-জনতার সহায়তায় সামান্য স্কুল ছাত্ররাও শত শত মৌলিক গণতন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে। রাষ্ট্র প্রশাসন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ায় সামাজিক অপরাধীদের প্রতি কৃষক-জনতা মারমুখি হয়ে ওঠে। কৃষক-জনতা সারা প্রদেশব্যাপী হাজার হাজার সামাজিক অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করে। অনেক ক্ষেত্রেই গণপিটুনিতে উক্ত অপরাধীরা মৃত্যুবরণ করে। মৌলিক গণতন্ত্রী ও সামাজিক অপরাধীদের প্রশ্নে কৃষক-জনতার মধ্যে কি ধরনের অভ্যুত্থান উনসত্তর সালের ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসে ঘটেছিল তা স্পষ্ট করার জন্য দু'টি ঘটনার উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবেঃ[৪৬৮]

(এক) পাবনা জেলার জয়নগর থানায় পিকিংপন্থী ন্যাপ ও পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা আবদুল মতিনের নেতৃত্বে মৌলিক গণতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি কর্মসূচী গ্রহণ করে। তাদের যে সাংগঠনিক শক্তি সেখানে ছিল তা দিয়ে ২-৩টি ইউনিয়নের বেশী প্রচার কার্য চালানো সম্ভব ছিল না। তখন ছিল মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ। একটি দিন নির্ধারণ করে ৩-৪ দিন আগে মাইকের মাধ্যমে প্রচার করা হল যে, "অমুক দিন মৌলিক গণতন্ত্রীরা তাদের এতদিনের কুকর্মের জন্য ভুল স্বীকার করবে, জনসাধারণের কাছে ক্ষমা চাইবে এবং পরিশেষে পদত্যাগ করবে। সে অনুষ্ঠানে সকল মৌলিক গণতন্ত্রী ও জনসাধারণের হাজির থাকার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।" মাত্র একটা মাইক নিয়ে প্রচার করা হয়েছিল, কিন্তু মুখে মুখে যেনো সংবাদটি প্রচার হয়ে গেল। থানাতেও সংবাদ গেল। উদ্যোক্তাদের ধারণা ছিল অল্পসংখ্যক সাধারণ মানুষ আসবে, আর ২-১ জন মৌলিক গণতন্ত্রী হাজির হবে। সে অনুযায়ী একটি স্কুলের মাঠে একটি সাধারণ মঞ্চ নির্মাণ করা হল। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল তিনটি ইউনিয়নের ২ জন চেয়ারম্যান সহ মোট ২৪ জন সদস্য মিটিং-এ উপস্থিত হল এবং দূর-দূরান্ত থেকেও মানুষ আসা শুরু করলো। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই স্কুলের মাঠ ভরে গেল এবং এর পর আশে-পাশের কয়েক বিঘা জমিতেও মানুষ দাঁড়ালো। অন্তত ২৫ হাজার জনসাধারণের সমাবেশ হল। জেলা শহরেও এত বড় একটি জমায়েত অন্য সময়ে অনুষ্ঠিত হওয়া খুবই কঠিন। কৃষকদের মধ্যে থেকেই প্রায় এক শত লোক স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করতে লাগলো। সে এক বিস্ময়কর ব্যাপার। সাধারণ মানুষের মধ্যে সে কি আনন্দ। এক একজন মৌলিক গণতন্ত্রী তার কুৎকর্মের জন্য ভুল স্বীকার করছে, আর জনসাধারণের মধ্য থেকে তার ভুলের আরো ফিরিস্তি দেওয়া হচ্ছে। কোন কোন মৌলিক গণতন্ত্রীকে সাধারণ জনতা কান ধরে ওঠা-বসা করার আহবান জানাতে থাকে। এর পর শুরু হয় হাসাহাসি আর হাততালি। এভাবে প্রায় তিন ঘন্টা এ অনুষ্ঠান চলে।

(দুই) এটি এক সাথে ১০১ জন ডাকাত নিহত হওয়ার ঘটনা। মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে টাঙ্গাইল জেলার যমুনার চরাঞ্চলে ঘটনাটি ঘটে। এলাকার কৃষকরা একটি স্কুলের কিছু ছাত্রকে দিয়ে কয়েকজন ডাকাত সরদারের কাছে চিঠি লেখায়। চিঠিতে ছাত্রদের সাথে দেখা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ডাকাত সরদারদের কয়েকজন তাদের সাথে দেখা করতে আসে। কৃষক এবং ছাত্ররা ডাকাতদের কাছ থেকে এলাকার সকল ডাকাতের নাম জেনে নেয়। ইতিমধ্যে শত শত কৃষক-জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে জমায়েত হয় এবং তাদের ওপর আক্রমণ করে। যে সকল ডাকাত প্রথমে উপস্থিত হয়েছিল তাদেরকে মেরে ফেলা হয় এবং তারপর হাজার হাজার কৃষক-জনতা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে আরও প্রায় এক শত ডাকাতকে ধরে আনে। গণপিটুনীতেই এসব ডাকাত নিহত হয়। এ ডাকাত নিধন অভিযানে যারা নেতৃত্ব দেয় তাদেরকে সবাই চিনত, কিন্তু কারো নামে মামলা দায়ের করা হয়নি। অবশ্য কয়েকদিন পর প্রায় একশত পুলিশ খোঁজ-খবর নিতে আসে। তাদের সাথে ছিল ৪টি নৌকা। কৃষকরা পুলিশকে ভাত খাওয়ার কথা বলে কৌশলে তাদের সকল অস্ত্র হস্তগত করে। ইতিমধ্যে নৌকাগুলিও ডুবিয়ে ফেলা হয়। তারপর এলাকায় কোন কিছুর সন্ধান পাওয়া যায়নি বা এধরনের কিছু একটা লিখে দিতে

---

৪৬৮ কৃষক নেতা আবদুল মতিন তার অভিজ্ঞতার কথা জানাতে গিয়ে এ দুইটি ঘটনার কথা জানান।

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশকে বাধ্য করা হয়। পুলিশ এ ব্যাপারে আর কখনও ওই এলাকায় যায়নি। তবে কৃষকরা অবশ্য সকল অস্ত্র ফেরৎ এবং নৌকাগুলি উঠিয়ে দিয়েছিল।

কৃষক-জনতার মধ্যে কি জাগরণ সে সময় ঘটেছিল তা উক্ত দু'টি ঘটনা থেকে সহজে অনুমান করা যায়। এ ঘটনা যে শুধু পাবনা বা টাঙ্গাইল জেলায় ঘটেছিল তা নয়, পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র অঞ্চলেই গোটা মার্চ মাস ধরে এ ধরনের ঘটনা অহরহ ঘটতে থাকে।[৪৬৯] এ সময় আসলে রাজনৈতিক দল হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানে একমাত্র ভাসানী ন্যাপই কৃষক-শ্রমিকের এসব আন্দোলন পরিচালনা এবং দেশব্যাপী সরকারের সাথে যে কোন আপোষ-রফার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করতে থাকে। পরিস্থিতির চাপে মার্চ মাসের ১০ তারিখে জননিরাপত্তামূলক আইনসহ বেশ কয়েকটি নিবর্তনমূলক আইন বাতিল করা হয়। দেশব্যাপী ছাত্র, শ্রমিক, কৃষকদের নিজস্ব দাবী-দাওয়াভিত্তিক আন্দোলন আরো সম্প্রসারিত হয়। দেশের মৌলবাদী শক্তির সাথে পিকিংপন্থী ন্যাপের সম্পর্ক ক্রমশঃ খারাপ হতে থাকে। মৌলবাদ ও রাষ্ট্রবিরোধী সংগ্রাম মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে। জনসাধারণ বিশেষতঃ শ্রমজীবী মানুষ বিক্ষোভ ও শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকে তাদের নৈমিত্তিক ও আবশ্যিক কাজ হিসাবে গণ্য করে। পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র অঞ্চলে ১১ দফা দাবী আদায়ের সংগ্রাম ক্রমশঃ সমাজতন্ত্রের আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। পরিস্থিতি এমন হয় যে, শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের প্রতি শান্ত থাকার জন্য শেখ মুজিব যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তা ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে পুনঃ পুনঃ প্রচারিত হতে থাকে। কিন্তু তাতেও জনসাধারণকে শান্ত করা যায়নি। ইতিমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভূট্টোর নেতৃত্বে আইয়ুব খানের পদত্যাগের দাবীতে বিশাল বিশাল জনসমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত গোল টেবিল ব্যর্থ হয়। শেখ মুজিবের প্রচেষ্টা ডাক-এর অন্যান্য নেতার অসহযোগীতার কারণে সফলকাম হয়নি। ফলে আইয়ুব খানকে ক্ষমতায় রেখে সাংবিধানিকভাবে সমস্যা সমাধানের আর কোন সুযোগ থাকে নি। অন্যদিকে, দেশে বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তানে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন ক্রমশঃ জঙ্গী রূপ লাভ করতে থাকে; মওলানা ভাসানী ও তার দল দেশের উভয় অংশে এক ব্যাপক প্রচারে লিপ্ত হন যে, ১১ দফা দাবী মেনে নেওয়া না হলে আসন্ন নির্বাচন প্রতিহত করা হবে। প্রকৃতপক্ষে এ পর্যায়েই আইয়ুব সরকারের পতন নিশ্চিত হয়ে যায়। তবে বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির পক্ষ থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের এমন কোন রূপরেখা দেওয়া হয়নি, যার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য আইয়ুব সরকারকে চাপ দেওয়া যেতে পারে। ফলে ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানের 'লৌহমানব' ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান সেনাবাহিনীর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হন।

৮.১২ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের মতামত সংক্রান্ত জরিপ

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে যারা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং স্থানীয়ভাবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এমন ১৬২ জন ব্যক্তির ওপর জরিপ চালিয়ে আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মতামত জানার চেষ্টা করা হয়। উক্ত ১৬২ জন উত্তরদাতার মতামতের ওপর আলোকপাত করার আগে তাদের একটি প্রাথমিক পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন (দেখুন, সংযোজনীঃ২)।

যে ১৬২ জন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে তাদের মধ্যে ১৯৬৯ সালে ৯৭ জনের বাসস্থান ছিল গ্রামে এবং ৬৫ জন শহরবাসী। অর্থাৎ উত্তরদাতাদের শতকরা প্রায় ৬০ জন তখন গ্রামে থাকতেন, আর বাকি শতকরা ৪০ জন ছিলেন শহরের অধিবাসী।

সারণি ৮.১৬

উত্তরদাতাদের বাসস্থান ও পিতার কর্মক্ষেত্রের পরিচয়

উত্তরের ধরন	বাসস্থান		পিতার কর্মক্ষেত্র	
	সংখ্যা	হার(%)	সংখ্যা	হার(%)
গ্রাম	৯৭	৫৯.৮৮	৯১	৫৬.১৭
শহর	৬৫	৪০.২২	৬২	৩৮.২৭
নিরুত্তর	-	০	৯	৫.৫৬
মোট	১৬২	১০০.০০	১৬২	১০০.০০

উপরোক্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে গ্রাম ও শহরাঞ্চলে জনবসতিরযে হার ছিল সে তুলনায় অনেক বেশী উত্তরদাতা শহরাঞ্চল থেকে নির্বাচন করা হয়েছে। তবে শহরের বাসিন্দা হিসাবে শতকরা যে ৪০ জন তাদের পরিচয় দিয়েছেন তাদেরও অনেকের বাড়ি গ্রামে তখন ছিল বা জমিজমা ছিল। উক্ত জরিপ থেকে দেখা যায় যে, মোট ১৬২ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১৪০ জন তথা শতকরা ৮৬.৪২ ভাগ উত্তরদাতারই গ্রামের বাড়িতে জমিজমা ছিল। অর্থাৎ উত্তরদাতাদের অধিকাংশেরই তখন গ্রামের সাথে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ যোগাযোগ বিদ্যমান।

উত্তরদাতাদের চিন্তা-চেতনার ধরণকে বুঝতে হলে পিতার কর্মক্ষেত্র কোথায় সেটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সারণি ৮.১৬ থেকে দেখা যায়, মোট ১৬২ জন উত্তরদাতার মধ্যে শতকরা ৫৬.১৭ ভাগের পিতার কর্মক্ষেত্র ছিল গ্রামাঞ্চলে এবং শতকরা ৩৮.২৭ ভাগের শহরাঞ্চলে। অবশিষ্ট শতকরা ৫.৫৬ জন এবিষয়ে নিরুত্তর।

উক্ত জরিপ থেকে দেখা যায়, যে ৯৭ জন উত্তরদাতা তাদের স্থায়ী বাসস্থান শহরাঞ্চলে বলে জানিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ৬৮ জন জেলা শহর কিংবা তার চেয়েও কিছু বড় শহরে থাকতেন। বাকি ২৯ জনের বাসস্থান ছিল ছোট শহরে। অন্যদিকে, বড় শহরে যে ৬৮ জনের বাসস্থান ছিল তার মধ্যে ৪৫ জন থাকতেন চারটি বিভাগীয় শহরে, এদের মধ্যে ২০ জনের বাসস্থান ছিল ঢাকায়, ১৬ জন রাজশাহীতে, ৫ জন চট্টগ্রামে এবং ৪ জনের বাসস্থান ছিল খুলনা শহরে। মোট ২৩ জনের বাসস্থান ছিল অন্যান্য জেলা শহরে।

৪৬৯ মোটামুটি বিস্তারিতভাবে জানার জন্য দেখুনঃ হাসানুজ্জামান (১৯৯১)ঃ বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রের চেতনা ও মতাদর্শিক বিকাশ, ঢাকাঃ ইউ.পি.এল, পৃ. ৭৪-৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ৮.১৭
উত্তরদাতাদের জেলাওয়ারী বিভাজন

জেলার নাম	সংখ্যা	শতকরা হার
ঢাকা	২৮	১৭.২৮
ময়মনসিংহ	৫	৩.০৯
ফরিদপুর	৭	৪.৩২
চট্টগ্রাম	৬	৩.৭০
নোয়াখালি	২২	১৩.৫৮
কুমিল্লা	২৭	১৬.৬৭
পার্বত্য চট্টগ্রাম	০	০
সিলেট	৫	৪.৩২
রাজশাহী	১৮	১১.১১
রংপুর	২	১.২৩
বগুড়া	০	০
দিনাজপুর	১	০.৬২
পাবনা	৫	৩.০৯
খুলনা	৪	২.৪৬
যশোর	৯	৫.৫৬
বরিশাল	১২	৭.৪১
কুষ্টিয়া	১১	৬.৭৯
মোট	১৬২	১০০.০০

উত্তরদাতাদের বাসস্থানকেজেলাওয়ারী ভাগ করলে দেখা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং বগুড়া জেলা ছাড়া তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ১৭টি জেলা থেকেই উত্তরদাতা নির্বাচিত হয়েছেন। তবে ঢাকা, রাজশাহী, কুমিল্লা ও নোয়াখালি এ চারটি জেলার উত্তরদাতা সর্বাধিক। এদের সংখ্যা ৯৫ অর্থাৎ মোট উত্তরদাতার মধ্যে এরা শতকরা ৫৮.৬৪ ভাগ। অবশ্য বিভাগওয়ারীভাবে হিসাব করলে দেখা যায় ঢাকা বিভাগের উত্তরদাতা শতকরা ২৪.৬৯ ভাগ, রাজশাহী বিভাগে শতকরা ১৬.০৫ ভাগ, খুলনা বিভাগে শতকরা ২২.২২ ভাগ এবং চট্টগ্রাম বিভাগে শতকরা ৩৭.০৪ ভাগ। অর্থাৎ প্রদেশের সকল অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বই এ জরিপে বিদ্যমান রয়েছে। তবে চট্টগ্রাম বিভাগের উত্তরদাতাদের প্রতিনিধিত্ব তুলনামূলকভাবে বেশী এবং রাজশাহী বিভাগের উত্তরদাতাদের প্রতিনিধিত্বের পরিমাণ কম।

সারণি ৮.১৭ ক
উত্তরদাতাদের ভূমি মালিকানা ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস

ভূমির বিন্যাস	মোট জমির পরিমান (একরে)	উত্তরদাতা সংখ্যা	শতকরা হার
০০-০০	০	১৪	৮.৬৪
.০১-১.০০	৫.৮৫	১৩	৮.৬৪
১.০১-২.৫০	৪৫.৭৬	২৬	১৬.০৫
২.৫১-৭.৫০	২০২.৯৬	৪৪	২৭.১৬
৭.৫১-১০.০০	১০৪.২৮	১২	৭.৪১
১০.০১-২৫.০০	৫৩২.৮০	৩২	১৯.৭৫
২৫.০০+	১৩৬৪.০০	২১	১২.৯৬
মোট	২২৫৪.৪৩	১৬২	১০০.০০

গ্রামীণ অর্থনীতির সাথে উত্তরদাতাদের কি পরিমাণ সম্পর্ক ছিল সেটাও এ জরিপ থেকে ফুটে উঠেছে। সারণী ৮.১৭ক থেকে দেখা যায় যে সকল উত্তরদাতার গ্রামে কোন জমিই ছিল না তাদের মোট সংখ্যা ১৪ যা মোট উত্তরদাতার শতকরা ৮.৬৪ ভাগ। যাদের ১ একর কিংবা তার কম জমি ছিল তাদের সংখ্যা ১৩ অর্থাৎ শতকরা ৮.০২ ভাগ, এদের গড় জমির পরিমাণ ছিল মাত্র ০.৪৫ একর। যাদের ১ একর থেকে ২.৫০ একর পরিমাণ জমি ছিল তাদের সংখ্যা ২৬ অর্থাৎ শতকরা ১৬.০৫ ভাগ, এদের গড় জমির পরিমাণ ছিল ১.৭৬ একর। যে সকল উত্তরদাতার জমির পরিমাণ ছিল ২.৫০ একর থেকে ৭.৫০ একরের মধ্যে তাদের সংখ্যা ছিল ৪৪ অর্থাৎ মোট উত্তরদাতার শতকরা ২৭.১৬ ভাগ; এদের গড় জমির পরিমাণ ছিল ৪.৫৯ একর। যাদের ৭.৫০ একর থেকে ১০.০০ একর পরিমাণ জমি ছিল তাদের সংখ্যা ছিল ১২ বা শতকরা ৭.৪১ ভাগ এবং এদের গড় জমির পরিমাণ ৮.৬৯ একর। যাদের ১০ একর থেকে ২৫ একর পর্যন্ত জমি ছিল তাদের সংখ্যা ৩২, মোট উত্তরতাতার মধ্যে এদের শতকরা হার ছিল ১৯.৭৫ ভাগ, এবং এদের গড় জমির পরিমাণ ছিল ১৬.৬৫ একর। ২৫ একরের উপরে যাদের জমি ছিল তাদের সংখ্যা ২১ অর্থাৎ শতকরা ১২.৯৬ ভাগ। এদের পরিবার প্রতি গড় জমির পরিমাণ ছিল ৬৪.৯৪ একর।

উপরোক্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, উত্তরদাতাদের সবচেয়ে বড় অংশটির এত অধিক পরিমাণ জমি ছিল যে, তাদেরকে ভূমি-ভিত্তিক শ্রেণী বিভাজন করলে ধনী কৃষক বা জোতদার হিসাবে গণ্য করা যায়। এদের অধিকাংশই সামন্তস্বার্থের সাথে সম্পর্কিত। এরা মোট উত্তরদাতার মধ্যে শতকরা ৩২.৭২ ভাগ (যাদের ১০ একরের চেয়ে বেশী জমি ছিল)। উত্তরদাতাদের মধ্যে যাদের গ্রামীণ অর্থনীতির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তারা হচ্ছে ২.৫০ একর থেকে ১০ একর পর্যন্ত জমির মালিক। যদিও এরা সংখ্যার দিক থেকে সর্বাধিক (শতকরা ৩৪.৫৭ ভাগ) তবু এদের মধ্যে যারা ৭.৫০ একরের বেশী জমির মালিক তাদেরকে অন্যদের সাথে একই নিক্তিতে মাপা যায় নি, কেননা এদের মালিকানায় বেশী পরিমাণ জমি থাকার কারণে তাদের ভিতর মাঝারি কৃষক এবং ধনীকৃষকদের উভয় প্রবণতাই থাকে। ফলে এদেরকে বাদ দিলে মাঝারি খামার মালিক শ্রেণীটিই এ উত্তরদাতাদের মধ্যে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী। ২.৫০ একরের নীচে যাদের জমি ছিল তাদের মধ্যে যারা নেতৃত্ব দিত তাদের পারিবারিক অর্থনীতিতে কৃষির ভূমিকা বেশী থাকার কথা নয়। এদেরকে বাদ দিলেও দেখা যায়, তৎকালীন কৃষি অর্থনীতির উত্থান-পতনের সাথে শতকরা ৬৭.২৮ ভাগ উত্তরদাতার ভাগ্য কমবেশী জড়িত ছিল।

উত্তরদাতাদের পারিবারিক কাঠামোর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, মাঝারি আয়তন তথা ৬ থেকে ১০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত পরিবারই ছিল শতকরা ৫৮ ভাগ। ৫ জন বা তার চেয়ে ছোট আয়তনের পরিবার ছিল শতকরা ২৯টি এবং বাকি শতকরা ১৩টি পরিবার

Dhaka University Institutional Repository

ছিল বড় অর্থাৎ যাদের সদস্য সংখ্যা ছিল ১১ জন কিংবা তার বেশী। এসব পরিবারে আয়তনের সাথে আয়ক্ষম সদস্য সংখ্যা সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। তবে ছোট পরিবারগুলিতে তুলনামূলকভাবে আয়ক্ষম সদস্য সংখ্যা আনুপাতিক হারে বেশী ছিল।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মাঠ পর্যায়ের নেতাদের পারিবারিক আয় কাঠামোর দিকে লক্ষ্য করলে এ আন্দোলনে কোন্ শ্রেণী সবচেয়ে সক্রিয় ছিল তা পরিষ্কার হয়ে ওঠে। সারণি ৮.১৮ থেকে দেখা যায়, মোট ১৬২ জন উত্তরতার মধ্যে মোট ১৩৪ জনের পরিবার অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৮৩ ভাগ পরিবারের আয়ের মুল উৎস ছিল কৃষি এবং তাদের বার্ষিক গড় আয় ছিল ৬ হাজার ৪০৩ টাকা। কৃষিখাতের সাথে সম্পর্কিত উক্ত ১৩৪ জন উত্তদাতার পরিবারের কৃষি আয়ের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, যেসব পরিবারে ২৫ একরের চেয়ে বেশী জমি ছিল শুধু সেসব পরিবারের মোট আয়ের বৃহদাংশ কৃষিখাত থেকে আসতো। পরিবার পিছু এদের গড় জমির পরিমাণ ছিল ৬৫ একর। মোট ২১ জন উত্তরদাতার পরিবারে এ পরিমাণ জমি ছিল, ১টি পরিবার ছাড়া বাকি ২০টি পরিবারে কৃষিখাত থেকে আয়ের পরিমাণ ছিল বছরে গড় ১৮ হাজার ৫৭৫ টাকা এবং এ আয় তাদের মোট পারিবারিক আয়ের শতকরা ৫৭.১৩ ভাগ। উক্ত ২১ জন উত্তরদাতার এক-তৃতীয়াংশ পরিবার আবার বড় ব্যবসার সাথে যুক্ত ছিল এবং এ খাত থেকে তাদের বার্ষিক গড় আয় ছিল ১৩ হাজার টাকা। উক্ত ২১ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১১ জনের পরিবার ছিল বড় চাকরির সাথে যুক্ত এবং এ খাত থেকে উক্ত ১১টি পরিবারের বার্ষিক আয় হত গড়ে ১১ হাজার ৭৩৬ টাকা। এ ছাড়া, এদের মধ্যে ৬টি পরিবারের অন্যান্য উৎস থেকেও প্রচুর আয় হত। অন্যান্য উৎস বলতে বাড়িভাড়া, হাট ও ঘাট ইত্যাদির ইজারাকে বোঝায়, যেসবের বার্ষক গড় আয়ের পরিমাণ ছিল ১৭ হাজার ৫০ টাকা। এসকল পরিবারে সব উৎস থেকে আহরিত বার্ষিক গড় আয় ছিল ৩২ হাজার ৫১৯ টাকা করে। অর্থাৎ গ্রামের সামন্ত স্বার্থের সাথে সম্পর্কিত এসবপরিবারের আয়ের প্রধান উৎস যদিও ছিল কৃষি তবু তাদের চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্যান্য সূত্র থেকে বিপুল পরিমাণ আয় হত। কৃষির ওপর আঘাত আসলেই শুধু এসকল পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হত না, ব্যবসা, চাকরি বা অন্যান্য চরিত্রের ওপর আঘাত আসলেও তারা বিশেষভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হত।

সারণি ৮.১৮
উত্তরদাতাদের আয় কাঠামো (টাকার অংকে বার্ষিক আয়)

ভূমি কাঠামোর বিন্যাস	কৃষি থেকে আয় আসে এমন উত্তরদাতা		ব্যবসা থেকে আয় আসে এমন উত্তরদাতা		চাকরিথেকে আয় আসে এমন উত্তরদাতা		অন্যান্য উৎস থেকে আয় আসে এমন উত্তরদাতা		মোট উত্তরদাতা	
	সংখ্যা	গড় আয়	সংখ্যা	গড় আয়	সংখ্যা	গড় আয়	সংখ্যা	গড় আয়	সংখ্যা	গড় আয়
১.০০ একরের নিচে	৫	৩১৮	১১	১,০০০	২০	৬,৬১৬	৫	৪,৩৪০	২৭	৯,৮৩৭
১.০১ - ২.৫০ একর	২৬	১,৫০৮	৭	৭,৪২৯	২৪	৭,১৯৮	১	২,৪০০	২৬	১০,২৪৪
২.৫১-৭.৫০ একর	৪০	৪,৩৭৫	১৩	১৭,৬০৮	৩৭	৩,৯১৭	৮	২১,৪২৫	৪৪	১৬,৩৬৮
৭.৫১-১০.০০ একর	১২	৩,৭৫৮	৪	১১,১২৫	৮	২,৯৬৫	২	৩,৩০০	১২	৯,৯৯৩
১০.০১ - ২৫.০০ একর	৩১	৭,২৭৯	১৪	১৩,১০৭	২১	৪,৮১২	৭	১১,১৪৩	৩২	১৮,৩৮২
২৫.০০ একরের উপরে	২০	১৮,৫৭৫	৭	১৩,০০০	১১	১১,৭৩৬	৬	১৭,০৫০	২১	৩২,৫১৯
মোট	১৩৪	৬,৪০৩	৫৬	১২,৬৭৭	১২১	৫,৭২৬	২৯	১৩,১৮৬	১৬২	১৬,৩১৬

সারণি ৮.১৮ এর দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, ভূমি-ভিত্তিক সামাজিক স্তর বিন্যাস করার ফলে ২৫ একরের উর্ধ্বে যাদের জমি ছিল তারা ছিল আয় কাঠামোর দিক থেকে সম্পূর্ণ একটি আলাদা শ্রেণী। যাদের জমির পরিমাণ ১০ একর থেকে ২৫ একরের মধ্যে ছিল তাদের মোট গড় আয় থেকে উপরোক্তদের গড় আয় ছিল প্রায় দিগুণ। অন্যদের থেকে তো তাদের আয় কয়েকগুণ বেশী ছিল। ১০ থেকে ২৫ একরের মধ্যে যাদের জমি ছিল সেরকম উত্তরদাতার সংখ্যা ছিল মোট ৩২ জন, তার মধ্যে ৩১ জনের পরিবারই কৃষি থেকে বিপুল পরিমাণ আয় করতো। এদের সর্বসাকুল্যে বার্ষিক পরিবারপ্রতি গড়ে ১৮ হাজার ৩৮২ টাকা আয় হত, তার মধ্যে কৃষি থেকে যারা আয় করতো তাদের পরিবার প্রতি গড়ে কৃষি আয় ছিল মোট আয়ের শতকরা ৩৯.৫৬ ভাগ, অর্থাৎ তাদের আয়ের শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশী ব্যবসা, চাকরি কিংবা অন্যান্য খাত থেকে আসতো। উক্ত ৩২ জন উত্তরদাতার পরিবারের মধ্যে ১৪টি ছিল ব্যবসার সাথে জড়িত যা থেকে তাদের বার্ষিক গড় আয় ছিল ১৩ হাজার ১০৭ টাকা, ২১টি পরিবার ছিল চাকরির সাথে সম্পর্কিত, যা থেকে এসব পরিবারের গড় আয় ছিল ৪ হাজার ৮১২ টাকা। ৭টি পরিবার ছিল অন্যান্য পেশার সাথে যুক্ত, যা থেকে তাদের গড় আয় হত ১১ হাজার ১৪৩ টাকা। অর্থাৎ এ শ্রেণীটিরও কৃষির ওপর আঘাত আসলে যেমন একজোট হয়ে বিরোধিতা করার কথা তেমনই ব্যবসা, চাকরি বা অন্যান্য সূত্রের ওপর আঘাত আসলে তাদের অনেক বেশী বিরোধিতা করা স্বাভাবিক।

যেসব উত্তরদাতার পরিবারে ৭.৫০ থেকে ১০ একর পরিমাণ জমি ছিল তারা কৃষি, ব্যবসা, চাকরি বা অন্য কোন উৎস থেকে খুব বেশী আয় করতে পারেনি। মোটামুটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জমি থাকার কারণে ৭.৫০ থেকে ১০ একর পরিমাণ জমির সাথে যেমন ও সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারেনি, তেমনই ব্যবসা, চাকরি, বা অন্য কোন ক্ষেত্রেও তারা বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। এদের সবারই স্বল্প পরিমাণ কৃষি আয় ছিল, এদের মধ্য থেকে যে কয়জন ব্যবসা শুরু করতে সক্ষম হয়েছেন তারা এ থেকে বার্ষিক গড়ে ১১ হাজার ১২৫ টাকা আয় করছে। এদের অধিকাংশ পরিবার চাকরির সাথে সম্পর্কিত ছিল, কিন্তু এ থেকে তাদের আয়ের পরিমাণ দেখলে বোঝা যায় যে চাকরিগুলি ছিল বেশ নিচু স্তরের। এদের বার্ষিক গড় আয় ছিল পরিবার প্রতি মাত্র ৯ হাজার ৯৯৩ টাকা। উত্তরদাতাদের মধ্যে যাদের প্রায় কোন কৃষি আয়ই ছিল না সেসব পরিবারের বার্ষিক আয়ও এদের চেয়ে কম নয়।

উত্তরদাতাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের পারিবারিক জমির পরিমাণ ছিল ২.৫০ থেকে ৭.৫০ একর। এদের জমির পরিমান কম থাকলেও বার্ষিক গড় আয় ১০ থেকে ২৫ একর জমির মালিক উত্তরদাতাদের প্রায় সমান। এদের পরিবারপ্রতি বার্ষিক গড় আয় ১৬ হাজার ৩৬৮ টাকা। এ শ্রেণীর উত্তরদাতার সংখ্যা ৪৪, যাদের মধ্যে ৪০ জনেরই কৃষি আয় ছিল। এদের কৃষি আয় গড়ে বছরে ৪ হাজার ৩৭৫ টাকা, এদের মধ্যে যে ১৩ জন উত্তরদাতার পরিবার ব্যবসার সাথে যুক্ত ছিল তাদের শুধু এ খাত থেকেই বার্ষিক গড়ে ১৭ হাজার ৬০৮ টাকা আয় হত। এরা চাকরিতেও খারাপ করেনি। এছাড়া, উক্ত ৪৪ জনের মধ্যে যাদের আয়ের অন্যান্য সূত্র ছিল তাদের কয়েকজনের শিল্প ছিল, আর সে কারণেই যে ৮ জনের আয়ের অন্যান্য সূত্র ছিল তাদের মূলত এ খাত থেকে বছরে গড়ে ২১ হাজার ৪২৫ টাকা আয় হত।

ভূমি-ভিত্তিক সামাজিক স্তর বিন্যাসে যাদের অবস্থান প্রান্তিক পর্যায়ে এমন উত্তরদাতার সংখ্যা হচ্ছে ২৬, এদের প্রত্যেকের যৎসামান্য কৃষি আয় ছিল, যারা ব্যবসার সাথে যুক্ত তারা এ খাত থেকে বছরে গড়ে আয় করেছে ৭ হাজার ৪২৯ টাকা। তবে এ শ্রেণীটির প্রধান অংশই ছিল চাকরিজীবী, অর্থাৎ ২৬টি পরিবারের মধ্যে ২৪টি পরিবার। এরা মূলতঃ চাকরি নির্ভর একটি শ্রেণী এবং এদের চাকরি থেকে আয়ের পরিমাণ নেহাত কম নয় তাহার বার্ষিক গড়ে ৭ হাজার ১৯৮ টাকা। এদের চাকরি থেকে আয়ের এই গড় হার শুধুমাত্র ২৫

Dhaka University Institutional Repository

একরের বেশী জমির মালিকদের চাকরি থেকে প্রাপ্ত আয়ের প্রায় কাছাকাছি। কৃষি আয় থেকে প্রায় বঞ্চিত যারা মাঠ পর্যায়ে রাজনৈতিক নেতায় পরিণত হয়েছিলেন তাঁদের সংখ্যা ২৭ এবং এঁরা মূলত চাকরি, ব্যবসা ও অন্যান্য সূত্রের আয়ের দ্বারাই তাঁদের পারিবারিক অস্তিত্বকে বজায় রেখেছিলেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায়, যারা উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময় মাঠ পর্যায়ের নেতা ছিলেন তাদের অধিকাংশই তুলনামূলকভাবে উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান। কেননা সে সময় পূর্ব পাকিস্তানের মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয় ছিল ২০০ টাকার মত; অথচ উক্ত নেতাদের পারিবারিক বার্ষিক গড় আয় দেখা যায় ১৬ হাজার ৩১৬ টাকা। পরিবারের গড় আয়তন যদি ৭ ধরা হয় তাহলে মাথাপিছু আয় দাঁড়ায় পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের মাথাপিছু আয় অপেক্ষা ১১ গুণেরও বেশী। শুধু তাই নয়, যে সকল নেতার পারিবারিক কোন কৃষি জমি ছিল না, এবং যাদের আয় ছিল সবচেয়ে কম তাদেরও বার্ষিক মাথাপিছু আয় ছিল পূর্ব পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় অপেক্ষা ৬ গুণেরও অধিক।

উত্তরদাতারা কি ধরণের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা বোঝার আর একটি উপায় হচ্ছে তাদের পিতার শিক্ষাগত অবস্থা। মোট ১৬২ জন উত্তরদাতার মধ্যে কেবল মাত্র শতকরা ৭.৪১ জনের পিতা ছিলেন নিরক্ষর। পিতাদের মধ্যে স্বাক্ষর ছিলেন শতকরা ৯.২৬ জন, মাদ্রাসায় পড়েছেন শতকরা ৫.৮৯ জন, প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করেছিলেন শতকরা ১৩.০৯ জন, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়েছিলেন শতকরা ১৮.৯৯ জন, মাধ্যমিক কিংবা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করেছিলেন শতকরা ১৪.২০ জন, এবং ডিগ্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন শতকরা ৮.৬৪ জন। অর্থাৎ পিতার শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক থেকেও দেখা যায় যে, নেতারা উন্নত সামাজিক স্তর থেকে এসেছিলেন। কেননা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের যেখানে শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী মানুষ ছিল নিরক্ষর, সেখানে উক্ত উত্তরদাতাদের মাত্র শতকরা ৭ জন পিতা ছিলেন নিরক্ষর। শুধু তাই নয়, শিক্ষিত পিতাদের মধ্যে আবার শতকরা ৪৪ ভাগ ছিলেন মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক কিংবা ডিগ্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বর্তমান গবেষণার পদ্ধতিগত আলোচনার পর্যায়ে বলা হয়েছে যে, তিনটি শিল্প এলাকা, ঢাকা শহরের মতিঝিলের অফিস পাড়া, এবং বরিশাল, খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া এবং রাজশাহী জেলা শহরে গিয়ে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে বিশিষ্ট ভূমিকা রেখেছিলেন এমন যাদের পাওয়া গেছে তাদের সবার কাছ থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এতে অবশ্য শহরভিত্তিক নেতাদের আধিক্য ঘটেছে। তবে যে কোন এলাকায় গিয়েই অন্ততঃ ৪ জনের কাছে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে কে কে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন? সবাই যাদের নাম বলেছেন এমন ব্যক্তিদেরই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কে কোন্ দলে ছিলেন তা মোটেই বিচার করা হয়নি। সাক্ষাৎকার গ্রহণে এ কৌশল অবলম্বন করেও দেখা গেছে যে, আওয়ামী লীগ ও দুই ন্যাপ এবং তাদের সাথে সম্পর্কিত ছাত্র সংগঠন ছাড়া খুব কম সংখ্যক ব্যক্তি রয়েছেন যারা ভিন্ন কোন দল করতেন। আর সে চিত্রটিই সারণী ৮.১৯ এ প্রতিফলিত হয়েছে।

সারণি ৮.১৯
উত্তরদাতাদের রাজনৈতিক আদর্শগত অবস্থান

	উদার গণতন্ত্র	সমাজতন্ত্র	ইসলামিক ব্যবস্থা	ইসলামিক সমাজতন্ত্র	কোন কিছুতে ছিল না	অন্যান্য	মোট
আওয়ামী লীগ	৫৬	৪	০	০	০	০	৬০
ন্যাপ ভাসানী	০	৩৩	০	০	০	০	৩৩
ন্যাপ ওয়ালী/মোজাফফর	০	৮	০	০	০	০	৮
ছাত্র লীগ	১০	১	০	০	০	০	১১
ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)	১	১৮	০	০	০	০	১৯
ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)	০	১৯	০	০	০	০	১৯
অন্যান্য	৩	৮	১	০	০	০	১২
মোট	৭০	৯১	১	০	০	০	১৬২

সারণি ৮.১৯ থেকে দেখা যায়, মোট ১৬২ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৬০ জন আওয়ামী লীগ (৬-দফাপন্থী), ৩৩ জন পিকিংপন্থী ন্যাপ, ৮ জন মস্কোপন্থী ন্যাপ, ছাত্র লীগ ১১ জন, ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) ১৯ জন, ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) ১৯ জন, এবং অন্যান্য সংগঠনের নেতা-কর্মী ১২ জন। সংশ্লিষ্ট ছাত্র সংগঠন ধরলে আওয়ামী লীগের মোট ৭১ জন, পিকিংপন্থী ন্যাপের ৫২ জন, মস্কোপন্থী ন্যাপ ৩০ জন এবং অন্যান্য ১২ জন। অর্থাৎ উত্তরদাতাদের শতকরা ৪৩.৮৩ ভাগ আওয়ামী লীগের অনুসারী, শতকরা ৩২.১০ জন ছিলেন পিকিংপন্থী ন্যাপ, শতকরা ১৮.৫২ জন মস্কোপন্থী ন্যাপ, এবং শতকরা মাত্র ৭.৪১ জন ছিলেন অন্যান্য দল ভুক্ত। রাজনৈতিক আদর্শের দিক থেকে উত্তরদাতাদের শতকরা ৪৩.২১ ভাগ উদার গণতন্ত্রের অনুসারী। আর শতকরা ৫৬.১৭ ভাগ সমাজতন্ত্রে আস্থাশীল এবং শতকরা মাত্র ০.৬২ জন ইসলামিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। ইসলামিক সমাজতন্ত্র কিংবা অন্য কোন আদর্শে বিশ্বাসী ছিলনা। এরকম কেউ উত্তরদাতাদের মধ্যে ছিলেন না। আওয়ামী লীগের শতকরা ৬.৬৭ জন সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন, অন্যরা উদারগণতন্ত্রে বিশ্বাসী। ন্যাপ-এর উভয় গ্রুপের শতকরা ১০০ ভাগ সমাজতন্ত্রে আস্থাবান। ছাত্র ইউনিয়ন(মতিয়া)- এর শতকরা ১০০ ভাগ সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)-এর শতকরা ৫.২৬ জন উদার গণতন্ত্রের অনুসারী, অন্যরা সবাই ছিলেন সমাজতন্ত্রে আস্থাশীল। অন্যান্য দলের শতকরা ২৫ জন উদার গণতন্ত্রের অনুসারী, শতকরা ৬৬.৬৭ জন সমাজতন্ত্রে আস্থাশীল, আর মাত্র ৮.৩৩ জন ছিলেন ইসলামিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী।

উত্তরদাতাগণ কিভাবে এ আস্থা বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন তা জানা বেশ গুরুত্বপুর্ণ কেননা এ ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা সম্পর্কে একটি ধারণা করা সম্ভব। সারণি ৮.২০ থেকে দেখা যায়, আওয়ামী লীগ নেতাদের রাজনৈতিক বিশ্বাস সৃষ্টির ক্ষেত্রে শতকরা ৪১.৬৭ ভাগের বেলা পরিবারের ভূমিকা ছিল, পিকিংপন্থী ন্যাপ নেতাদের শতকরা ৩৯.৩৯ জনের রাজনৈতিক বিশ্বাস জন্মানোর ব্যাপারে পরিবারের প্রভাব ছিল, মস্কোপন্থী ন্যাপ নেতাদের ক্ষেত্রে পরিবারের প্রভাব ছিল শতকরা ৫০ ভাগ। ছাত্র লীগ নেতাদের ক্ষেত্রে এ প্রভাব ছিল সর্বাধিক অর্থাৎ শতকরা ৭২.৭৩ ভাগ। আর মেননপন্থী ও মতিয়াপন্থী ছাত্র ইউনিয়নের নেতাদের ক্ষেত্রে এর হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ৪২.১১ ভাগ ও ২১.০৫ ভাগ। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের শতকরা ৫০ ভাগ ক্ষেত্রে এ প্রভাব কাজ করেছিল। এ থেকে দেখা যায় যে, উদারগণতন্ত্রের প্রতি অধিকতর বিশ্বাস উল্লিখিত এলাকার মানুষের মধ্যে আগেই বিদ্যমান ছিল। আর তাই ছাত্র লীগের নেতারা পারিবারিকভাবেই অধিক সংখ্যায় উদারগণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ৮.২০
উত্তরদাতাদের রাজনৈতিক আদর্শগত বিশ্বাস সৃষ্টির ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা

	হ্যাঁ		না		মোট	
	সংখ্যা	হার (%)	সংখ্যা	হার (%)	সংখ্যা	হার (%)
আওয়ামী লীগ	২৫	৪১.৬৭	৩৫	৫৮.৩৩	৬০	১০০
ন্যাপ (ভাসানী)	১৩	৩৯.৩৯	২০	৬০.৬১	৩৩	১০০
ন্যাপ (মোজাফফর)	৪	৫০	৪	৫০	৮	১০০
ছাত্র লীগ	৮	৭২.৭৩	৩	২৭.২৭	১১	১০০
ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)	৮	৪২.১১	১১	৫৭.৮৯	১৯	১০০
ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)	৪	২১.০৫	১৫	৭৮.৯৫	১৯	১০০
অন্যান্য	৬	৫০.০০	৬	৫০.০০	১২	১০০
মোট	৬৮	৪১.৯৮	৯৪	৫৮.০২	১৬২	১০

উক্ত জরিপ থেকে আরো জানা গেছে যে, যে ৬৮ জন মাঠ পর্যায়ের নেতা তাদের পরিবারের কোনো সদস্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিশেষ কোন রাজনৈতিক আদর্শের অনুসারী হয়ে উঠেছিলেন তাদের শতকরা ৩৫.৯৬ জন পরিবারের কোন সদস্যের সাথে প্রত্যক্ষভাবে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এরূপ রাজনৈতিক আদর্শে আস্থাবান হন, শতকরা ২১.৯৩ জনআলোচনা ছাড়াও সামাজিক-রাজনৈতিক বই-পুস্তক পড়তেন, শতকরা ৩১.৫৮ ভাগ পরিবারের বয়স্ক কোন সদস্যের ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়ে উক্ত রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন এবং অবশিষ্ট শতকরা ১০.৫৩ জন পরিবারের সদস্যদের উদারতা বা প্রশ্রয়ে উক্ত রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠেন। অর্থাৎ উত্তরদাতাদের একটি বড় অংশ এমন সব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যাদের পরিবারে অনেক আগে থেকেই রাজনৈতিক বিশ্বাসের একটি ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল। শুধু তাই নয়, পরিবারের তরুণ সদস্যরা যাতে বয়স্কদের রাজনৈতিক বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হতে পারে তার জন্য একটি সচেতন প্রয়াসও ছিল।

যেহেতু উত্তরদাতারা উনসত্তরের গণঅভ্যুথানে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া যায় যে, এরা সকলই আইয়ুব সরকারের-বিরোধী ছিল। কি কি কারণে তারা আইয়ুব সরকারের বিপক্ষে চলে গিয়েছিল উত্তরদাতাদের কাছে এ প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করা হয়। সারণি ৮.২১-এ মোট ১২টি সম্ভাব্য কারণ উল্লেখ করা হয়। তাদেরকে এ থেকে যে কোন ৫টি কারণকে গুরুত্বের ক্রমানুসারে পছন্দ করতে বলা হয়। প্রশ্নপত্রে প্রদত্ত উত্তরগুলিতে যদি কেউ সন্তুষ্ট না হন তজ্জন্য একটি ঘর শুণ্য রাখা হয়। উত্তরদাতাদের মধ্যে শুধুমাত্র ৮ জন তাদের সবগুলি উত্তর প্রদত্ত উত্তরগুলির মধ্যে খুঁজে পাননি, তবে মাত্র ৩ জন আইয়ুব সরকার-বিরোধী হওয়ার প্রথম কারণ খুঁজে পাননি, দ্বিতীয় কারণ খুঁজে পাননি ২ জন, তৃতীয় কারণ খুঁজে পাননি মাত্র ১ জন এবং পঞ্চম কারণ খুঁজে পাননি ২ জন।

সারণি ৮.২১
কি কি কারণে উত্তরদাতারা আইয়ুব সরকার বিরোধী হয়ে উঠেছিলেন

কারণের প্রকার	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট	অন্যান্য	মোট
১ম কারণ	১০	১৮	২৩	১৬	০	৩৯	১৯	২৫	৩	০	৬	৩	১৬২
২য় কারণ	৯	১২	৮	১৯	৫	৩৯	২৬	২৪	৫	২	১১	২	১৬২
৩য় কারণ	৫	১২	১৫	১৪	৬	২৮	২৫	২৭	৭	৬	১৬	১	১৬২
৪র্থ কারণ	৫	১৯	৭	১৭	৮	৯	২৪	৩১	৫	৬	২৮	০	১৫৯
৫ম কারণ	১১	২২	১১	২০	৬	৭	১০	১৩	৫	১১	৩৯	২	১৫৭
মোট	৪০	৮৩	৬৪	৮৬	২৫	১২২	১০৪	১২০	২৫	২৫	১০০	৮	-

(ক) আইয়ুব সরকার যে কোন রাজনৈতিক সমালোচনাকে কঠোর হস্তে দমন করত।

(খ) মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিতো না।

(গ) সমাজের ধনিক শ্রেণীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করতো।

(ঘ) অবাঙ্গালীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করতো।

(ঙ) দলীয় লোকদের প্রতি প্রত্যক্ষভাবে পক্ষপাতিত্ব করতো।

(চ) পূর্বপাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবীর ঘোরতর বিরোধী ছিল।

(ছ) বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে দমন করত।

(জ) পূর্ব পাকিস্তান অর্থনৈতিকভাবে শোষিত হচ্ছিল।

(ঝ) মৌলিক গণতন্ত্রীদের হাতে অধিকতর ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছিল।

(ঞ) আমলাতন্ত্রের হাতে অধিক ক্ষমতা অর্পিত হয়েছিল।

(ট) বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের চরম নির্যাতন ও হয়রানি করতো।

(ঠ) অন্যান্য।

এখানে যেসব উত্তর প্রদান করা হয়েছে সেসবের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, অনেক কারণই পরস্পরের কাছাকাছি। উক্ত কারণসমূহকে উত্তরদাতারা কত তীব্রভাবে অনুভব করেন তা বোঝার লক্ষ্যেই উত্তরগুলি এভাবে সাজানো হয়েছে। ঘ, চ,ছ, ও জ এই চারটি কারণ মোটামুটি একই ধরনের অর্থাৎ এসব বাঙ্গালীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের সমস্যার সাথে সম্পর্কিত। এ চারটির মধ্যে যে দু'টি কারণ সরাসরি পূর্ব পাকিস্তানের শাসন শোষনের সাথে জড়িত, সে দু'টিকেই সবচেয়ে বেশী সংখ্যক উত্তরদাতা আয়ুব সরকার বিরোধী হওয়ার কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এ দু'টি কারণের কথা উল্লেখ করেছেন শতকরা ৭৪.৬৯ ভাগ উত্তরদাতা। এর পরই যে কারণটি আইয়ুব সরকার-বিরোধী হয়ে ওঠার পিছনে বিশেষভাবে কাজ করেছিল সেটা হচ্ছে 'বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর আধিপত্য করার চেষ্টা করা হচ্ছিল'। আইয়ুব-বিরোধী হয়ে ওঠার পিছনে শতকরা ৬৪ ভাগ উত্তরদাতার কাছে তা অন্যতম কারণ হিসাবে বিবেচিত। এছাড়া, শতকরা ৬১.৭৩ ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন 'রাজনৈতিক কর্মীদের নির্যাতন ও হয়রানি করাই তাদের আইয়ুব সরকার-বিরোধী হয়ে ওঠার প্রধান কারণ। শতকরা ৫৩.০৯ ভাগ উত্তরদাতা তাদের আইয়ুব সরকার-বিরোধী হয়ে ওঠার পিছনে অবাঙ্গালীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করাকে মূখ্য কারণ বলে মনে করেন। শতকরা ৫১.২৩ ভাগ উত্তরদাতা মত প্রকাশের স্বাধীনতা না

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়াকে তাদের আইয়ুব-বিরোধী হয়ে ওঠার পিছনে অন্যতম কারণ হিসাবে গণ্য করেছেন। এছাড়া ১৬২ জন উত্তরদাতার মাত্র শতকরা ১৪.২০ ভাগ তাদের আইয়ুব-বিরোধী হয়ে ওঠার পিছনে অন্যান্য কারণকে প্রথম কারণ হিসাবে বিচেনা করেছেন কিন্তু অধিকাংশ উত্তরদাতা এটাকে আইয়ুব-বিরোধী হয়ে ওঠার পিছনে অন্যতম কারণ হিসাবে মনে করেননি। তবে অনেকের মতে আইয়ুব সরকার যে তার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সমালোচনাকে কঠোর হস্তে দমন করতো, দলীয় লোকদের প্রতি প্রত্যক্ষভাবে পক্ষপাতিত্ব করতো, মৌলিক গণতন্ত্রীদের এবং আমলাবর্গের হাতে অধিক ক্ষমতা অর্পিত হয়েছিল- এসব কারণ তাদেরকে আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে চলে যাওয়ার জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করেনি। অবশ্য খুব সংখ্যক উত্তরদাতা এসবকে প্রথম পাঁচটি কারণের মধ্যে স্থান দেয়ার পক্ষপাতি।

সারণি ৮.২১-এ উপস্থাপিত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময় যারা মাঠ পর্যায়ের নেতা ছিলেন তাদের অধিকাংশের কাছেই পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন না দেওয়া আর বিরোধী মতাবলম্বীদের ওপর দমন-পীড়ন চালানো- এ দু'টি কারণই তাদেরকে আইয়ুব সরকারের বিপক্ষে চলে যেতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। অবশ্য কয়েকজন কমিউনিষ্ট মতাদর্শের অনুসারী উত্তরদাতা বলেছেন তারা মতাদর্শগতভাবেই আইয়ুব সরকার বা এ ধরনের স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে। অর্থাৎ আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে তাদের চলে যাওয়ার নুতনকোন প্রশ্ন তাদের কাছে ছিল না।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে যে সকল জনগোষ্ঠী সক্রিয়ভাবে সমর্থন জানিয়েছিল তা মাঠ পর্যায়ের নেতারা যতটা জানতেন ততটা আর কারো পক্ষে জানা সম্ভব ছিলনা। সারণি ৮.২২ থেকে দেখা যায় যে, উক্ত ১৬২ জন উত্তরদাতার মধ্যে শতকরা ৯০.৭৪ ভাগই মনে করেন ছাত্রসমাজই এ আন্দোলনে সবচেয়ে বেশী ভূমিকা পালন করেছিল, শতকরা ৪.৯৪ জন মনে করেন শ্রমিকদের ভূমিকাই ছিল সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ, শতকরা ৩.০৯ ভাগ মনে করেন বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ছিল বেশী এবং মাত্র শতকরা ১.২৩ জনের মতে বাঙ্গালী ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের ভূমিকা ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

সারণি ৮.২২

যে সকল জনগোষ্ঠী আইয়ুব সরকার বিরোধী আন্দোলনকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন জানিয়েছিল সেরকম পাঁচটি শ্রেণী

শ্রেণীর নাম	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট	ঠ	মোট
১ম শ্রেণী	১৪৭	৫	-	-	-	৮	-	-	-	-	-	২	১৬২
২য় শ্রেণী	১৩	৫৮	৩	৬	২	৭৪	২	-	-	৩	-	১	১৬২
৩য় শ্রেণী	১	৩০	১৯	৯	৮	৪০	২৬	৬	৮	৬	২	৭	১৬২
৪র্থ শ্রেণী	০	২০	১১	১২	৭	১৯	৩৭	১৩	১১	৮	১০	১২	১৬০
৫ম শ্রেণী	১	৯	৮	৫	৭	৫	১৯	১৯	২৯	২৩	১৬	১৫	১৫৬
মোট	১৬২	১২২	৪১	৩২	২৪	১৪৬	৮৪	৩৮	৪৮	৪০	২৮	৩৭	

(ক) ছাত্র সমাজ
(খ) বুদ্ধিজীবী শ্রেণী
(গ) পেশাজীবী গোষ্ঠী
(ঘ) স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী
(ঙ) সরকারী ও আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বাঙ্গালী কর্মকর্তাবৃন্দ
(চ) সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণী
(ছ) রিক্‌শাচালক, কুলি বা এ জাতীয় অসংগঠিত বিত্তহীন জনগোষ্ঠী
(জ) ক্ষুদে দোকানদার বা ছোট ব্যবসায়ী
(ঝ) নিম্ন বেতনভুক সরকারী কর্মচারী
(ঞ) ছোট ও মাঝারি কৃষক
(ট) ক্ষেতমজুর ও গ্রামীণ বিত্তহীন শ্রেণী
(ঠ) অন্যান্য (ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি, ধনী কৃষক, ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ইত্যাদি)

উত্তরদাতাদের শতকরা ৪৫.৬৮ ভাগ মনে করেন উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে দ্বিতীয় গুরুত্বপুর্ণ শ্রেণী হচ্ছে কারখানার সংগঠিত শ্রমিক, শতকরা ৩৫.৮০ জন মনে করেন বুদ্ধিজীবী সমাজ এবং শতকরা ৮.০২ ভাগ মনে করেন ছাত্রসমাজ। অনেকে আবার স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, ছোটও মাঝারি কৃষক, পেশাজীবী গোষ্ঠী কিংবা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত বাঙ্গালী কর্মকর্তাদেরকে উক্ত আন্দোলনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক শক্তি হিসাবে গণ্য করেছেন। তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী হিসাবে কারখানার সংগঠিত শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীদেরকে ওগণ্য করেছেন। তবে উত্তরদাতাদের অধিকাংশ ছাত্র, শ্রমিক এবং বুদ্ধিজীবীদেরকে ঐ আন্দোলনের মূল শক্তি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। সারণি ৮.২২ থেকে দেখা যায়, শতকরা ১০০ ভাগ উত্তরদাতা আইয়ুব সরকার-বিরোধী আন্দোলনে ছাত্রসমাজকে অন্যতম সামাজিক শক্তি হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন। উত্তরদাতাদের শতকরা ৯০.১২ ভাগ মনে করেন কারখানার সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী এ আন্দোলনে খুবই বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিল। উত্তরদাতাদের শতকরা ৭৫.৩১ ভাগের মতে বুদ্ধিজীবীরা এ আন্দোলনে অন্যতম বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিলেন। আর উত্তরদাতাদের শতকরা ৫১.৮৫ ভাগ মনে করেন রিক্‌শাচালক, কুলি বা এ জাতীয় শহরের অসংগঠিত বিত্তহীন জনগোষ্ঠী এ আন্দোলনে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। উত্তরদাতাদের মতামত থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, উপরোক্ত চারটি সামাজিক শক্তিই উক্ত আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল। তবে এ চারটি শ্রেণীকে পছন্দ করার পর অধিকাংশ উত্তরদাতাই কিন্তু গুরুত্বেরদিক থেকে পঞ্চম শ্রেণী নির্বাচনে অভিন্ন মত পোষণ করেননি। শতকরা ২৯.৬৩ জন উত্তরদাতা, অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে নিম্নবেতনভুক সরকারী কর্মচারীদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে পছন্দ করেছেন। শতকরা ২৫.৩১ জন পেশাজীবী শ্রেণীকে নির্বাচন করেছেন, শতকরা ২৪.৬৯ ভাগ ছোট ও মাঝারি কৃষকদের গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী বলেছেন, শতকরা ২৩.৪৬ ভাগ ক্ষুদে দোকানদার ও ছোট ব্যবসায়ীদের বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন, শতকরা ২২.৮৪ ভাগের মতে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি, বড় কৃষক, ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ইত্যাদি সম্মিলিতভাবে মোটামুটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল মনে করেন। শতকরা ১৯.৭৫ ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদেরও একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। শতকরা ১৭.২৮ জন উত্তরদাতা ক্ষেত মজুর ও গ্রামীণ বিত্তহীনদের ভূমিকার কথাও বলেছেন। এমনকি,শতকরা ১৭.২৮ জন উত্তরদাতা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বাঙ্গালী

Dhaka University Institutional Repository

কর্মকর্তাদেরও বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল বলে মত প্রকাশ করেছেন। তবে যেহেতু কোন উত্তরদাতার পাঁচটির বেশী শ্রেণীকে পছন্দ করার সুযোগ ছিল না সেহেতু সমজাতীয় শ্রেণী বা স্তরসমূহকে এক করে দেখলে কিছুটা পরিষ্কার ধারণা পাওয়া সম্ভব। যেমন, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও নিম্ন বেতনভুক সরকারী কর্মচারীকে একই পর্যায়ে ধরা যেতে পারে। অন্যদিকে, ছোট ও মাঝারি কৃষক এবং ক্ষেতমজুর ও গ্রামীণ বিত্তহীনদের প্রায় সমজাতীয় সামাজিক স্তর হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। এদিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, শতকরা ৪৯.৩৮ ভাগ উত্তরদাতার মতে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী এবং নিম্ন বেতনভুক সরকারী কর্মচারীদের অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল। অপরদিকে, শতকরা প্রায় ৪২ জন উত্তরদাতা মনে করেন গ্রামের ক্ষুদে-মাঝারি কৃষক এবং ক্ষেতমজুর ও গ্রামীণ বিত্তহীনরা উক্ত আন্দোলনে খুবই সক্রিয় ছিল। তবে কর্মকর্তা নয় এমন সকল স্তরের চাকরিজীবীর ভূমিকা সম্পর্কে অধিকাংশ উত্তরদাতাই ইতিবাচক অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ শতকরা ৫৪.৩২ জন উত্তরদাতাই জানিয়েছেন যে, ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন সংগঠনের কর্মচারীরা উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতাদের মতে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে সবচেয়ে বেশী বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিল ছাত্রসমাজ; তার পরেই যারা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তারা হচ্ছে শিল্প শ্রমিকশ্রেণী, তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক স্তরটি হচ্ছে বুদ্ধিজীবী শ্রেণী, চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক স্তরটি হচ্ছে বিভিন্ন সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও ব্যক্তি-মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের সাধারণ কর্মচারী এবং পঞ্চম সামাজিক স্তরটি হচ্ছে রিক্শাচালক, কুলি, বা এ জাতীয় অসংগঠিত বিত্তহীন জনগোষ্ঠী। উত্তরদাতাদের মতে গ্রাম ও শহরের ব্যাপক শ্রমজীবী মানুষের অংশগ্রহণ ব্যতীত উনসত্তরের গনঅভ্যুত্থানের কথা ভাবা যায় নি এবং এই ব্যাপক জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে ছাত্রসমাজ উত্থাপিত ১১ দফাই মূখ্য অবদান রাখে।

সারণি ৮.২৩

আইয়ুব সরকার বিরোধী আন্দোলনে যারা অংশগ্রহণ করেনি কিংবা বিরোধীতা করেছিল

আন্দোলনে অসহযোগী-বিরোধী সামাজিক গোষ্ঠী	কৃষক জনগোষ্ঠী	সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ	বেসরকারী ও আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ	বড় ব্যবসায়ী	বুদ্ধিজীবী শ্রেণী	পেশাজীবী গোষ্ঠী	শিল্পপতি শ্রেণী	অন্যান্য	মোট
প্রথম	৮	৬৫	২	৩৮	২	১	৪৬	-	১৬২
দ্বিতীয়	১	১৮	১৪	৭৫	৩	২	৪৬	৩	১৬২
তৃতীয়	১১	৬২	৬	২৫	১	৩	৪৪	১০	১৬২
মোট	২০	১৪৫	২২	১৩৮	৬	৬	১৩৬	১৩	-

আয়ুব সরকার-বিরোধী আন্দোলনে যারা অসহযোগিতা কিংবা বিরোধিতা করেছে তাদের সম্পর্কেও মাঠ পর্যায়ের নেতারা স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সারণি ৮.২৩ থেকে দেখা যায়, শতকরা ৪০.১২ ভাগ উত্তরদাতা জানিয়েছেন সরকারী কর্মকর্তারা সবচেয়ে বেশী অসহযোগীতা করেছেন শতকরা ২৮.৪০ জন বলেছেন, শিল্পপতিদের কথা এবং শতকরা ২৩.৪৬ জন বড় ব্যবসায়ীদের নাম উল্লেখ করেছেন। এছাড়া, কেউ কেউ কৃষক জনগোষ্ঠী, বেসরকারী বা আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ও পেশাজীবী গোষ্ঠীর কথাও বলেছেন। শতকরা ৪৬.৩০ ভাগ উত্তরদাতার মতে, বড় ব্যবসায়ীরা হচ্ছে আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনে অসহযোগীতাকারী দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক শ্রেণী শতকরা ২৮.৩০ ভাগ উত্তরদাতা বলেছেন শিল্পপতিদের কথা। শতকরা ৮০ ভাগ উত্তরদাতা তৃতীয় উল্লেখযোগ্য শ্রেণী হিসাবে সরকারী কর্মকর্তা, বড় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের কথাও উল্লেখ করেছেন। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে অসহযোগীতা করেছিল বলে যে সম্ভাব্য ৮টি শ্রেণীর কথা গবেষণার প্রশ্নমালায় উল্লেখ করা হয়েছিল, তা থেকে উত্তরদাতাদের গুরুত্ব অনুযায়ী তিনটি শ্রেণীকে নির্ধারণ করার কথা বলা হয়েছিল। উত্তরদাতাদের শতকরা ৮৯.৫১ ভাগ মনে করে সরকারী কর্মকর্তারা এ আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল। উত্তরদাতাদের শতকরা ৮৫.১৯ ভাগ মনে করে বড় ব্যবসায়ীরা এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেনি বরং বিরোধিতা করেছে, এবং শতকরা ৮৩.৯৫ ভাগ উত্তরদাতার মতে শিল্পপতিরাও তাতে অসহযোগীতা করেছিল। এছাড়া, শতকরা ১২.৩৫ ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন গ্রামের কৃষক জনগোষ্ঠী তেমন সহযোগীতা করেনি। শতকরা ১৩.৫৮ ভাগ উত্তরদাতার মতে, বেসরকারী বা আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা আশানুরূপ সহযোগীতা করেনি। শতকরা ৩.৭০ ভাগ উত্তরদাতা জানিয়েছেন দেশের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীও তেমন সহযোগীতা করেনি এবং সমসংখ্যক উত্তরদাতা পেশাজীবীদের সম্পর্কে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। পরিশেষে, শতকরা ৮.০২ ভাগ উত্তরদাতার মতে অবাঙ্গালী শ্রমিক, অবাঙ্গালী ছোট ব্যবসায়ীসহ আরো কতক জনগোষ্ঠী এ আন্দোলনে সহযোগীতা করেনি। অর্থাৎ উপরোক্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মতে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে সবচেয়ে বেশী অসহযোগীতা করেছে সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ, তারপরই হচ্ছে বড় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি শ্রেণী।

সারণি ৮.২৪

আইয়ুব সরকার বিরোধী আন্দোলনে শ্রমজীবী জনসাধারণের অংশগ্রহণের কারণ

কারণের শ্রেণী বিভাগ	পুলিশী নির্যাতন	সরকারী দলের মাস্তানদের অত্যাচার	অবাঙ্গালীদের আধিপত্য	ধনিক শ্রেণীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব	বাঙ্গালীদের প্রতি অবিচার	অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি	অন্যান্য	মোট
প্রথম কারণ	২২	৮	৩৭	২০	৪৩	৩১	১	১৬২
দ্বিতীয় কারণ	২০	১১	৩৬	২৪	৪৪	২৬	১	১৬২
তৃতীয় কারণ	২৬	১৩	৩৮	২২	২৯	৩৩	১	১৬২
মোট	৬৮	৩২	১১১	৬৬	১২০	৯০	৩	-

এ কথা সত্য যে, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে শ্রমজীবী জনতা ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেছিল কিন্তু কি কারণেতারা এত ব্যাপক সংখ্যায় অংশগ্রহণ করেছিল সে সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে মাঠ পর্যায়ের ১৬২ জন নেতার অধিকাংশই বাঙ্গালীদের প্রতি অবিচার, শ্রমিক অঞ্চলে অবাঙ্গালীদের আধিপত্য, কিংবা শ্রমজীবীদের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি -- এ তিনটিকে বড় কারণ হিসাবে উল্লেখ করেন। অবশ্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উত্তরদাতা শ্রমজীবীদের ওপর পুলিসী নির্যাতন ও সরকারের ধনিক শ্রেণীর প্রতি পক্ষপাতিত্বকে তাদের সরকার-বিরোধী ভূমিকা পালনের মূল কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। প্রশ্নমালায় মোট ৭টি সম্ভাব্য কারণ উল্লেখ করে একটিকে খোলা রাখা হয়েছিল। এ ৭টি কারণের মধ্যে থেকে উত্তরদাতাদের যে কোন তিনটিকে গুরুত্বের ক্রমানুসারে বেছে নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। সারণি ৮.২৪ থেকে দেখা যায়, উল্লিখিত কারণগুলির মধ্যে কোনটি প্রথম আর কোনটি দ্বিতীয় কারণ তা নির্ধারণ

Dhaka University Institutional Repository

করা যায় নি; উত্তরদাতারা কয়েকটি কারণকে প্রায় সমমাত্রায় গণ্য করেছেন। তবে শতকরা ৭৪.০৭ ভাগ উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, বাঙ্গালীদের প্রতি যে তখন অবিচার চলছিল এ কথাটি শ্রমজীবীরা বুঝতে পারার কারণেই তারা আইয়ুব সরকার-বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। শতকরা ৬৮.৫২ ভাগ উত্তরদাতা বাঙ্গালী শ্রমিক-জনতার ওপর অবাঙ্গালীদের আধিপত্যকে অন্যতম কারণ হিসাবে বিবেচনা করেছেন। শতকরা ৫৫.৫৬ ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন সে সময় শ্রমজীবী জনতার অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটার কারণে তারা আইয়ুব সরকার-বিরোধী আন্দোলনে এত ব্যাপকভাবে অংশ নেয়। আবার শতকরা ৪১.৯৮ ভাগ উত্তরদাতার মতে শ্রমজীবীদের ওপর যে ব্যাপক পুলিসী নির্যাতন চলতো সেটাও তাদের আন্দোলনে অংশ নেওয়ারঅন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ। অবশ্য শতকরা ৪০.৭৪ ভাগ উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে শ্রেণীচেতনা জাগ্রত হওয়ার কারণে অর্থাৎ সরকার ধনিকশ্রেণীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করতো এ উপলব্ধি থেকে তারা এ আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল। শতকরা ১৯.৭৫ ভাগ উত্তরদাতা জনতার ওপর সরকারী দলের মাস্তানদের অত্যাচারকে এ আন্দোলনে তাদের যোগ দেওয়ার একটি বড় কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া, কেউ কেউ বলেছেন ছাত্রদের ১১ দফার প্রতি আকৃষ্ট হয়েও অনেক শ্রমজীবী মানুষ এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে। অর্থাৎ বাঙ্গালীদের প্রতি অবিচার করা হচ্ছিল- এ উপলব্ধিই আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনে শ্রমিকদের অংশ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী কার্যকর ছিল বলে উত্তরদাতাদের ধারণা।

সারণি ৮.২৫

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময় বাংলাদেশের ভবিষ্যত স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ের নেতাদের ভাবনা

উত্তরদাতার রাজনৈতিক সংগঠন	জনসাধারণ স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পারে কিনা			সে সম্ভাবনাকে উত্তরদাতা সমর্থন করতেন কিনা			উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান সে সম্ভাবনাকে বৃদ্ধি করেকনা?		
	হাঁ	না	মোট	হাঁ	না	মোট	হাঁ	না	মোট
আওয়ামী লীগ	৩৬	২৪	৬০	৩৬	-	৩৬	৩৫	১	৩৬
ন্যাপ ভাসানী	২৭	৬	৩৩	২৬	১	২৭	২৬	১	২৭
ন্যাপ মোজাফফর	৭	১	৮	৫	২	৭	৬	১	৭
ছাত্র লীগ	১০	১	১১	১০	-	১০	১০	-	১০
ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)	১২	৭	১৯	১২	-	১২	১২	-	১২
ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)	১১	৮	১৯	১০	১	১১	১০	-	১০
অন্যান্য	৮	৪	১২	৮	-	৮	৮	-	৮
মোট	১১১	৫১	১৬২	১০৭	৪	১১১	১০৭	৩	১১০

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী উক্ত ১৬২ জন মাঠ পর্যায়ের নেতার অধিকাংশই সে সময় ভাবতেন পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ একদিন স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারে। সারণি ৮.২৫ এ প্রদত্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, মোট ১৬২ জনের মধ্যে ১১১ জন অর্থাৎ শতকরা ৬৮.৫২ ভাগ উত্তরদাতাই তখন স্বাধীনতা সংগ্রামে জনসাধারণের অংশগ্রহণের ব্যাপারে আস্থাশীল ছিলেন। তবে ন্যাপ নেতাদের মধ্যে এ ভাবনা সবচেয়ে বেশী ছিল। ন্যাপ (মোজাফফর) নেতাদের শতকরা ৮৭.৫ ভাগ আর ন্যাপ (ভাসানী) নেতাদের শতকরা ৮১.৮২ ভাগ ছিলেন এ মতের সমর্থক। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এই যে,উভয় ন্যাপের ছাত্র সংগঠনের নেতারা স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে তেমন নিশ্চিত ছিলেন না। ছাত্র ইউনিন (মেনন) এর শতকরা ৬৩.১৬ ভাগ আর ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) এর শতকরা ৫৭.৮৯ ভাগ উত্তরদাতা এ মতকে সমর্থন করতেন। ভবিষ্যতে বাংলাদেশের জনসাধারণ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে পারে কিনা এ ব্যাপারে ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের নেতাদের ভাবনার মধ্যে যেমন পার্থক্য লক্ষনীয় তেমনই আওয়ামী লীগ ও ছাত্র লীগ নেতাদের উত্তরের মধ্যেও ব্যাপক পার্থক্য দেখা যায়। সে সময় যারা আওয়ামী লীগের মাঠ পর্যায়ের নেতা ছিলেন এমন উত্তরদাতাদের শতকরা মাত্র ৬০ ভাগ ভাবতেন এখানকার জনসাধারণ ভবিষ্যতে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে পারে; অন্যদিকে, ছাত্র লীগের শতকরা ৯০.৯০ ভাগ উত্তরদাতাই তখন এ ধরনের ধারণা পোষন করতেন। তবে যারা তখন ভাবতেন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ একদিন তাদের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ শুরু করবে তাদের প্রায় সবাই স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণের প্রশ্নকে সমর্থন করতেন। ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের উভয় অংশের মাত্র ৪ জন স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের সম্ভাবনাকে তখন সমর্থন করতেন না। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের সম্ভাবনাকে বৃদ্ধি করেছে কিনা এ প্রশ্নে ১১০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১০৭ জন ইতিবাচক উত্তর দিয়েছেন। তবে ন্যাপ (উভয় গ্রুপ) ও আওয়ামী লীগের মাত্র ৩ জন নেতা সে সম্ভাবনাকে স্বীকার করেননি। কেননা, তাদের মতে উনসত্তর সালের সংগ্রাম ছিল সর্বপাকিস্তান-ভিত্তিক সর্বপ্রথম আন্দোলন। তাছাড়া, এ আন্দোলনে জাতীয় প্রশ্ন যতটা ছিল তার চেয়ে বেশী ছিল বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের দাবী। তারা মনে করেন এ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তৎকালীন পাকিস্তানের ৫টি প্রদেশকে নিয়ে একটি ফেডারেল রাষ্ট্রের ধারণাই গড়ে ওঠে।

সে যাহোক, সারণি ৮.২৫ থেকে আওয়ামী লীগ বনাম ছাত্র লীগ এবং ন্যাপ বনাম ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যে একাত্তরে সংঘটিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রশ্নে তাদের অগ্রিম চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় তা থেকে সে সময়ের রাজনৈতিক প্রবণতা সমূহের চরিত্র সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা মিলে। যেমন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতা কর্মীদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় প্রশ্নটি যতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তার চেয়ে অনেক বেশী হারে তাদের নতুন নেতা তথা ছাত্র লীগ নেতাদের মধ্যে এটি মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। সম্ভবতঃ যে সকল ছাত্র জাতীয় প্রশ্নকে তখন বেশী গুরুত্ব দিত তাদের অধিকাংশই সে সময় ছাত্রলীগে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু এর এক যুগ আগে যারা আওয়ামী লীগের সমর্থক হয়ে ওঠে তাদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় প্রশ্নটি সেভাবে বড় হয়ে দেখা দেয়নি, বরং সে সময়ে যারা ন্যাপের সমর্থক হয়ে উঠেছিলেন তাদের মধ্যেই এ প্রশ্নটি দেখা দেয়। আর এ কারণে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময়ই ন্যাপ নেতারা অধিক সংখ্যায় ভাবতে পেরেছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ অদূর ভবিষ্যতে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে। তবে উনসত্তরের গণআন্দোলনের সময়ে যে সকল ছাত্র শ্রেণী প্রশ্নকে অধিক গুরুত্ব দিত তারাই স্বাভাবিকভাবে ছাত্র ইউনিয়নে যোগ দেয় আর তাই ইউনিয়ন ও ন্যাপ নেতাদের মধ্যে ভবিষ্যত স্বাধীনতা যুদ্ধে জনতার অংশ গ্রহণ প্রশ্নে ব্যাপক পার্থক্য দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ৮.২৬
উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে মাঠ পর্যায়ের নেতাদের আকাংখা

রাজনৈতিক দল	ব্যক্তি আইয়ুবের অবসারন	স্বৈরশাসক আইয়ুবের অবসান ও অবাধ গণতন্ত্র প্রবর্তন	বাঙ্গালীর আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থার পরিবর্তন	আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সমাজ পরিবর্তন	সমগ্র পাকিস্তানের সমাজ ব্যবস্থার	অন্যান্য	মোট
আওয়ামী লীগ	৩	১২	২৩	১৯	২	১	৬০
ন্যাপ (ভাসানী)	০	৬	৬	১৭	৪	০	৩৩
ন্যাপ (মোজাফফর)	০	১	১	৪	২	০	৮
ছাত্র লীগ	০	১	৪	৬	০	০	১১
ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)	০	১	১	১২	৪	১	১৯
ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)	০	০	২	১৩	৪	০	১৯
অন্যান্য	০	৩	১	৫	২	১	১২
মোট	৩	২৪	৩৮	৭৬	১৮	৩	১৬২

উক্ত জরীপে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মাঠ পর্যায়ের নেতারা যে আকাংখা নিয়ে এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। সারণি ৮.২৬ থেকে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশী সংখ্যক উত্তরদাতা অর্থ্যাৎ মোট ১৬২ জনের মধ্যে ৭৬ জন তথা শতকরা ৪৬.৯১ ভাগ উত্তরদাতাই এ গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যুগপৎ বাঙ্গালীর আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সতাজব্যবস্থার পরিবর্তন প্রত্যাশা করেছিলেন। শুধু বাঙ্গালীর আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন মোট ৩৮ জন তথা শতকরা ২৩.৪৬ জন উত্তরদাতা। এছাড়া আয়ুবের স্বৈরশাসনের অবসান ও অবাধ গণতন্ত্র প্রর্বতনের আকাঙ্গা নিয়ে এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন মোট ২৪ জন অর্থ্যাৎ শতকরা ১৪.৮২ ভাগ উত্তরদাতা। আর মোট ১৮ জন বা শতকরা ১১.১১ ভাগ উত্তরদাতা সমগ্র পাকিস্তানের সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের আকাংখায় এ আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। এছাড়া মাত্র ৩ জন উত্তরদাতা শুধু ব্যক্তি আইয়ুবের অপসারণই কামনা করেছিলেন।

সারণি ৮.২৬ এর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, শুধু মাত্র ছাত্র নেতাদের মধ্যেই এ আন্দোলনে অংশগ্রহণের প্রশ্নে অধিকতর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল। রাজনৈতিক দলগুলির ভিতর একমাত্র ন্যাপ (মোজাফফর) এ কিয়ৎ পরিমাণে সে ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আওয়ামী লীগ এবং ন্যাপ (ভাসানী) নেতাদের লক্ষ্যের মধ্যে কোন ঐক্য ছিল না। আওয়ামী লীগের ৬০ জন নেতার মধ্যে শতকরা ৫ জন শুধুমাত্র ব্যক্তি আইয়ুবের অপসারণ, শতকরা ২০ জন আইয়ুবের স্বৈরশাসনের অবসান ও অবাধ গণতন্ত্র প্রবর্তন, শতকরা ৩৮.৩৩ জন বাঙ্গালীর আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠা, শতকরা ৩১.৬৭ জন যুগপৎ আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং মাত্র ২ জন বা শতকরা ৩.৩৩ ভাগ নেতা সমগ্র পাকিস্তানের সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের আকাংখা নিয়ে এ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

ছাত্র নেতাদের মধ্যে অবশ্য এ ব্যাপারে বেশ মিল ছিল। ছাত্র লীগের শতকরা ৫৪.৫৫ ভাগ, ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)-এর শতকরা ৬৩.১৬ নেতা এবং চাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)-এর শতকরা ৬৮.৪২ ভাগ নেতা যুগপৎ বাঙ্গালীর আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার ও সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের আকাংখা নিয়ে এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ছাত্র লীগের কেউই সমগ্র পাকিস্তানের সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন না, বরং তাঁদের শতকরা ৩৬.৩৬ জন শুধু মাত্র বাঙ্গালীর আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অন্যদিকে, ছাত্র ইউনিয়নের উভয় অংশের নেতারা শুধুমাত্র বাঙ্গালীর আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের প্রশ্নে তেমন উৎসাহী ছিলেন না, বরং তাঁদের উভয় সংগঠনের সমসংখ্যক তথা শতকরা ২১.০৫ ভাগ নেতা সমগ্র পাকিস্তানের সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের আকাংখা নিয়ে এ আন্দোলনে যোগ দেন।

উপরোক্ত, আলোচনা থেকে দেখা যায় যে,সে সময় আওয়ামী লীগের মধ্যেই বিভিন্ন ধরনের স্বার্থ ও আকাংখা সম্পন্ন নেতার সবচেয়ে বেশী সমাবেশ ঘটেছিল। ফলে আওয়ামী লীগই ছিল তখন বহু শ্রেণী ও বহুমতের প্রতিনিধিত্বকারী একটি রাজনৈতিক দল। এর পরই যে দলটি সবচেয়ে বেশী গণচরিত্র অর্জন করেছিল সেটি হচ্ছে ন্যাপ(ভাসানী)। অন্যদিকে, ছাত্র সংগঠনগুলির মূল নেতৃত্বের মধ্যে বাঙ্গালীর আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রশ্নটি প্রধান আকাংখারূপে আত্মপ্রকাশ করে। ছাত্র লীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের উভয় অংশের মধ্যে যে পার্থক্যটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তা হচ্ছে এই যে, ছাত্র লীগ নেতৃত্বের একাংশ শুধুমাত্র বাঙ্গালীর আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের ব্যাপারে বেশী উৎসাহী হয়ে ওঠেন। অন্যদিকে, ছাত্র ইউনিয়নের (উভয় গ্রুপ) কয়েকজননেতা সমগ্র পাকিস্তানের সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রতি বেশী আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

উক্ত ১৬২ জন মাঠ পর্যায়ের নেতার কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল একই সাথে পাকিস্তানের উভয় অংশে আন্দোলন গড়ে না উঠলে আইয়ুব সরকারের পতন হত কিনা? এ প্রশ্নের উত্তরে তাদের শতকরা ৪৮.৭৭ ভাগ না-বোধক উত্তর দেন। আর তাঁদের শতকরা ৫১.২৩ ভাগ জানান অবশ্যই পতন হত; এদের মতে শুধু পূর্ব পাকিস্তানের আন্দোলন দিয়ে আইয়ুব সরকারের পতন ঘটাতে হলে তাকে আরো জঙ্গী রূপ নেওয়া প্রয়োজন হত, তবে আইয়ুব সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত এ আন্দোলন থামত না। তাদের কথায় পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলন যে গতিলাভ করেছিল তাতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বাতিল ও রাজবন্দীদের মুক্তি না দিয়ে কোন উপায় ছিল না। সারা প্রদেশে পাকিস্তান সরকার যেরূপ দমন-পীড়ন চালাতে শুরু করেছিল তা যদি ২০শে ফেব্রুয়ারির পর অব্যাহত থাকতো তাহলে স্বাভাবিকভাবে বলপ্রয়োগমূলক, এমনকি, সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে উঠতে পারতো। অন্যদিকে, যারা নেতিবাচক উত্তর দিয়েছেন তাঁদের অধিকাংশের মতে পশ্চিম পাকিস্তানে একই সময় যদি আন্দোলন গড়ে না উঠতো তাহলে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর মধ্যে এত ব্যাপক জাগরণ ঘটা সম্ভব ছিল না।

সেদিনের মাঠ পর্যায়ের নেতাদের মধ্যে দল মত নির্বিশেষে মতামতের এ পার্থক্য ঘটেছে। তবে যে সকল কারণে আইয়ুব সরকার সবচেয়ে বেশী নিপীড়ন চালিয়েছিল তা প্রধানতঃ পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অন্যদিকে, ২৪শে জানুয়ারি গণঅভ্যুত্থানের পরই আইয়ুব সরকার গোল টেবিল বৈঠক ডাকতে বাধ্য হয়েছিল, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে আইয়ুব খান যেখানে ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখেও বলেছিলেন, 'এটা দেশের নিরাপত্তার সাথে যুক্ত, তাই সেই মামলার এক নম্বর আসামী শেখ মুজিবের মুক্তির প্রশ্ন আসে না; কিন্তু গণআন্দোলনকে দমন করার জন্য সকল পদক্ষেপ যখন পূর্ব পাকিস্তানে একে একে ব্যর্থ হয়ে যেতে শুরু করলো শুধুমাত্র তখনই

Dhaka University Institutional Repository

আইয়ুব সরকার নতি স্বীকার করে। মাত্র ১০ দিনের ব্যবধানে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নিতে সরকার বাধ্য হয়। পূর্ব পাকিস্তানেই এ দু'টি বিশাল ঘটনা ঘটে। পূর্ব পাকিস্তানে ২০শে জানুয়ারি আসাদের মৃত্যুর পর থেকে গণঅভ্যুত্থান শুরু হয় এবং গোটা দুই মাস সে জাগরণ ও অভ্যুত্থান অব্যাহত থাকে। সে গণঅভ্যুত্থানকে দমন করতে গিয়ে ১৪৪ ধারা ও সান্ধ্য আইনসহ যত ব্যবস্থাগ্রহণ করা হয়েছে, যত গুলীবর্ষণ ও হত্যার ঘটনা ঘটানো হয়েছে ততই এ আন্দোলন গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছে। আর মানুষ হয়ে উঠেছে মারমুখি। সান্ধ্য আইনকেও মানুষ মামুলী বিষয় হিসাবে গণ্য করতে শুরু করে, শেষ পর্যায়ে মেহনতী মানুষের অভ্যুত্থান আরো বেগবান হতে থাকে। ফলে সারা প্রদেশের প্রশাসন একেবারে অকার্যকর হয়ে পড়ে। সমগ্র গ্রাম-বাংলা জুড়ে গড়ে ওঠে পুলিশ প্রশাসন পুষ্ট সামাজিক অপরাধীদের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক গণঅভ্যুত্থান। এর কোন কিছুই পশ্চিম পাকিস্তানে ঘটেনি। পশ্চিম পাকিস্তানেও বহুবার গুলী হয়েছে, অনেক ছাত্র-জনতাকে হত্যা করা হয়েছে; কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোন গণঅভ্যুত্থান ঘটেনি। সেখানেও সান্ধ্য আইন জারী হয়েছে, কিন্তু এ আইন ভাঙ্গতে কেউ এগিয়ে আসেনি। সেখানকার আন্দোলন গড়ে উঠেছে কয়েকটি বৃহৎ নগরীতে, কিন্তু সে আন্দোলন গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়েনি। সরকারী প্রশাসন পুষ্ট সামাজিক অপরাধী ও বিভিন্ন টাউট শ্রেণীর বিরুদ্ধে সেখানে কোন আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এ সব ঘটনা ব্যাপকভাবেই ঘটেছিল এবং তা প্রদেশব্যাপী। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে একই সাথে আন্দোলন গড়ে না উঠলে যে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে উঠতো না বা সে আন্দোলনকে দিয়ে সরকারের পতন ঘটানো যেত না বলে যারা অভিমত প্রকাশ করেছেন তাঁদের সাথে অভিন্ন মত পোষন করা কঠিন। কেননা উক্ত মাঠ পর্যায়ের নেতাদের কাছে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের কারণে আইয়ুব খান যখন ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন তখন কেন গণআন্দোলন আর অগ্রসর হল না-- এ প্রশ্নের উত্তরে মাত্র শতকরা ৮ জন উত্তরদাতা সাংগঠনিক সমস্যার কথা বলেছেন। অর্থাৎ শতকরা ৯২ জন উত্তরদাতাই রাজনৈতিক সমস্যা ও অন্যান্য সমস্যার কথা বলেছেন। যদি ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা না ছেড়ে আইয়ুব সরকার আরো দীর্ঘদিন ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতো তাহলে কোন রাজনৈতিক সংকট দেখা দিত না, বরং সে আন্দোলনকে অগ্রসর করে নেয়ার জন্য আরও বলিষ্ঠ কর্মসূচী গ্রহণের বাস্তবতা তখন পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্যমান ছিল।

উপরোক্ত সমগ্র আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর থেকে যে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু হয়েছে, তা বার বার পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের কারণে যৌক্তিক পরিণতিতে পৌছতে পারেনি। প্রথম থেকেই ঔপনিবেশিক চরিত্রের ঐ রাষ্ট্র কাঠামোটি এতে বাঁধা দিয়েছে। শক্তিশালী আমলাতন্ত্র বার বার হস্তক্ষেপ করেছে। প্রথম দিকেবেসামরিক আমলাতন্ত্র হস্তক্ষেপ করেছে, কিন্তু তারতের সাথে দ্বন্দ্বের প্রশ্নকে সামনে এনে মার্কিনের সাথে বিভিন্ন সামরিক চুক্তির মাধ্যমে যখন সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা হয়েছে তখন থেকেই সামরিক আমলাতন্ত্রও বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রশ্নে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। এভাবে সর্বপ্রথম ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণের যুক্তফ্রন্ট গঠনের মাধ্যমে অর্জিত নির্বাচনী বিজয়কে নস্যাৎ করে দেওয়া হয়। এর পর সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্র যখন পাকিস্তানের উভয় অংশের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, যখন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রায় আর কোন প্রতিনিধি থাকে নি এবং যখন সামরিক-বেসামরিক আমলাতান্ত্রিক পাকিস্তান রাষ্ট্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতা কন্টক মুক্ত থাকবে না বলে ক্ষমতাধরদের কাছে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে ওঠে, তখন এ রাষ্ট্র আরও স্থূলভাবে হস্তক্ষেপ শুরু করে। ১৯৫৬ সালে গৃহীত সংবিধানের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচনে জনসাধারণ যাতে অংশগ্রহণ করতে না পারে সে জন্য সকল গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ভূলুণ্ঠিত করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সবচেয়ে শক্তিশালী উপাদান সামরিক বাহিনী সরাসরি মাঠে নামে, ঘোষণা করে সামরিক শাসন। এক বিভীষিকাময় শাসনব্যবস্থা কায়েম করে জনসাধারণের সকল মৌলিক ও মানবিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। সামরিক শাসনের এই নির্মম নিপীড়নের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ ক্রমশঃ ক্রোধে পরিণত হতে থাকে। এরই এক পর্যায়ে গণবিরোধী শিক্ষানীতিকে প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ছাত্রদের যে ব্যাপক বিদ্রোহ ঘটে যায় তাতে জনসাধারণের অপরাপর অংশের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি হয়। শুরু হয়ে যায় দেশব্যাপী শ্রমিক আন্দোলন। শ্রমিক আন্দোলনের এই ব্যাপকতর বিস্তারকে রোধ করার জন্য পাকিস্তান রাষ্ট্র ও তার সৃষ্ট শিল্পপতি শ্রেণী নানা ধরনের চক্রান্ত শুরু করে। ১৯৬৩ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা করলেও তা খুব বেশী বিস্তার লাভ করেনি কিন্তু পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থের এ অশুভ উদ্দেশ্যটি ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে সফল হয়। যখন ভারতের একটি নগরীতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়, পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা শুরু হলেও তা দ্রুতই বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী দাঙ্গায় রূপান্তরিত হয়। বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে পাকিস্তানী শাসকদের এ চক্রান্ত প্রদেশের সকল গণতান্ত্রিক শক্তির কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সমগ্র বাঙ্গালী জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের এ অপপ্রয়াসকে ব্যর্থকরে দেয়। এভাবেই বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক ভিত্তিটি গড়ে ওঠে।

ইতিমধ্যে দেশপ্রেমিক অর্থনীতিবিদগণ দুই অর্থনীতির তত্ত্ব দিয়ে বেশ সাড়া জাগিয়েছেন। আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিব অর্থনীতিবিদদের এ তত্ত্বকে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক পরিভাষায় ব্যাখ্যা করেন। অবশ্য ইতিপূর্বে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন আর সাম্রাজ্যবাদের প্রশ্নে আওয়ামী লীগ ভেঙ্গে যায়। পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের প্রবল প্রবক্তা মওলানা ভাসানী তার সমর্থকদের ১৯৫৭সালে আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে গিয়ে পাকিস্তানের উভয় অংশের অন্যান্য কয়েকটি দলকে নিয়ে ন্যাপ নামক একটি নতুন দল গঠন করেন। এ দলটি সর্ব পাকিস্তান-ভিত্তিক চরিত্র অর্জন করা পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি তার কাছে আর প্রধান দাবী হিসাবে অব্যাহত থাকে নি, ফলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতাই এ দলের প্রধান স্লোগানে পরিণত হয়। যতদিন পাকিস্তান সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক রক্ষা করে চলছিল ততদিন ন্যাপের সরকার-বিরোধী ভূমিকা অটুট ছিল। কিন্তু যখনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমাজতন্ত্র বিরোধী সামরিক সজ্জার সাথে ভারতকেও যুক্ত করে নিল তখন থেকেই পাকিস্তানের সাথে মার্কিনের সম্পর্কের অবনতি ঘটতে শুরু করে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বিশেষতঃ চীনের সাথে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পাকিস্তান সরকারের বৈদেশিক নীতির এ পরিবর্তনকে দ্বান্দ্বিকভাবে মূল্যায়ন করতে না পারার কারণে ন্যাপ নামক বিশাল সংগঠনটি তথাকথিত 'Responsive cooperation' -এর রাজনীতি গ্রহণ করে, যা দলটিকে দীর্ঘ চার বছর প্রায় নিষ্ক্রিয় করে রাখে। অন্যদিকে, ষাট দশকের গোড়ার দিকে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে মতাদর্শগত বিতর্ককে কেন্দ্র করে এ দলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রচন্ডভাবে বৃদ্ধি পায়। সোভিয়েত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেকার শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানমূলক সম্পর্কের প্রচন্ড প্রতিক্রিয়া ন্যাপের উপর পড়ে। এ দলের মস্কোপন্থী অংশের সাথে আওয়ামী লীগের সখ্যতা গড়ে ওঠে। অন্যদিকে, পিকিংপন্থী ন্যাপের কাছে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীন ও পাকিস্তানের বড় শত্রু বলে

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিপন্ন হয়। এ বিরোধের কারণে ন্যাপের সাথে সম্পর্কিত পূর্ব পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়ন দ্বিখন্ডিত হয়ে যায়। অন্যদিকে, নিপীড়নমূলক শিল্পনীতির বিরুদ্ধে এক চরম শ্রমিক আন্দোলন গড়ে ওঠার পরিপ্রেক্ষিতে আইয়ুব সরকার জনসাধারণের দৃষ্টিকে ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করার লক্ষ্যে ভারত-বিরোধী ব্যাপক প্রচারণা শুরু করে। তারই পরিণতিতে বেঁধে যায় পাক-ভারত যুদ্ধ। ন্যাপের পিকিংপন্থী নেতারা প্রকাশ্যে পাকিস্তান সরকারের সমর্থনে মাঠে নামে।

এদিকে মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার অধীনে প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সমগ্র পাকিস্তানের সমস্ত বিরোধী দল একজোট হয়ে দেশব্যাপী তুমুল গণজোয়ার সৃষ্টি করা সত্ত্বেও যখন দেখা গেল আইয়ুব খানই প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন, তখনএ ধরনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগ পাকিস্তান রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ক্ষমতাকে মোকাবিলা করার লক্ষ্যে ৬ দফা দাবি উত্থাপন করলে পাকিস্তান রাষ্ট্র তার ধ্বংসের অশনিসংকেত শুনতে পায়। আওয়ামী লীগের ওপর চরম নির্যাতন নেমে আসে। এর ফলে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কর্মকান্ড ব্যাহত হলেও তার ৬ দফা ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ১৯৬৮ সালে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' শুরু হওয়ার পর ৬ দফা আরও গণভিত্তি পায় এবং ৬-দফার প্রণেতা শেখ মুজিব হয়ে ওঠেন কিংবদন্তীর নায়ক। স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নকে পাশ কাটিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনীতি করার আর কোন সুযোগ থাকে নি। প্রধানতঃ পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রশ্নে মত বিরোধকে কেন্দ্র করে ন্যাপেও ভাঙ্গন আসে। পরে অবশ্য ওয়ালী-মোজাফফরে নেতৃত্বাধীণ ন্যাপের মস্কোপন্থী অংশটি ক্রমশঃ বেশী পরিমাণে মার্কিন বিরোধী হয়ে ওঠে,আর মৌলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাপের পিকিংপন্থী অংশটিও মার্কিন বিরোধিতার পাশাপাশি পূর্ণ পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের কথা স্পষ্টভাবে বলতে থাকে। আর এ দুই-এর দ্বান্দ্বিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে আওয়ামী লীগের বৈদেশিক নীতিতেও পরিবর্তন আসে। ফলে সাংগঠনিকভাবে তিনটি দল আলাদা থাকলেও ন্যাপের উভয় অংশ এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে আইয়ুব সরকার-বিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষে একটি শক্তিশালী বৈষয়িক ভিত্তি তৈরী হয়ে যায়। তাবে ন্যাপ (ভাসানী) অন্য দু'টি দলের সাথে ঐক্য স্থাপন করতে পারেনি, কিন্তু তাঁদের সমর্থক ছাত্র সংগঠনগুলির সমঝোতার মধ্য দিয়ে তাদের পারস্পারিক রাজনৈতিক ঐক্যের প্রতিফলন ঘটে। আর তিনটি দলের রাজনৈতিক ঐক্যের ভিত্তি হিসাবে প্রণীত হয় ১১-দফা, যা' উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে স্বীকৃতি পায়।

Dhaka University Institutional Repository

৯. সারসংক্ষেপ ও উপসংহার

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ছিল কেন্দ্রীভূত সামরিক-আমলাতান্ত্রিক পাকিস্তানী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যাপক জনসাধারণের এক প্রকাশ্য বিদ্রোহ। একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই সে দেশের ব্যাপক জনসাধারণের ওপর উহা যেভাবে একটি আগ্রাসী রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল, বিভিন্ন জাতি, শ্রেণী ও পেশার মানুষের ওপর যে নির্মম দমন-পীড়ন অব্যাহত রেখেছিল সেই দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশের জনসাধারণ জোয়ারের মত রাজপথে নেমে এসেছিল। আর এই জনজোয়ারের প্রচণ্ডতম তীব্রতা যখন রাষ্ট্রব্যবস্থাকে আঘাত হানল, রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা যখন হুমকির সম্মুখীন হয়েছিল ঠিক তখনই আইয়ুব খানের মত একজন তথাকথিত লৌহ মানবও ক্ষমতা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। এভাবেই সূচিত হয়েছিলেন জনসাধারণের বিজয়।

কার্যত উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ছিল একটি সামাজিক আন্দোলন। পাকিস্তানের জনসাধারণের ওপর চেপে বসা এক ভয়ংকর সামরিক আমলাতান্ত্রিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে দীর্ঘ লড়াইয়ের এক পর্যায়ে এক স্বতঃস্ফূর্ত গণজাগরণ ঘটেছিল, যা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে গনঅভ্যুত্থানে রূপলাভ করেছিল। এ গণঅভ্যুত্থান শেষ পর্যন্ত এমন তীব্র রূপ ধারণ করেছিল, যা প্রত্যক্ষ করে স্বয়ং আন্দোলনের নেতৃত্বকারী রাজনৈতিক দলসমূহও শংকিত হয়ে পড়েছিল। এই বিস্ময়কর ধরনের গণঅভ্যুত্থান উনসত্তরে এসে সংঘটিত হলেও তা একদিনে ঘটেনি, শহরের সমগ্র শ্রমজীবী-কর্মজীবী মেহনতী জনতা থেকে শুরু করে গ্রামের কৃষক, ক্ষেতমজুর, তাঁতী, কুমার, জেলে এমনকি নিষিদ্ধ পল্লীর মেয়েরা পর্যন্ত সেদিন যে ঘর থেকে বের হয়ে এসেছিল তার একটি বিশাল পটভূমি আছে এবং রাজনৈতিক-অর্থনীতির ভিতরেই এর কার্যকারণ সম্পর্ক বিদ্যমান।

বৃটিশ আমলের ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কাঠামোয় ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকা, জাতি, ধর্মীয় গোষ্ঠী ও শ্রেণীসমূহের ভিতর ঘটে এক ধরনের অসম বিকাশ। বৃটিশ শাসকদের দমনমূলক ঔপনিবেশিক শাসনপ্রণালীর মধ্যে পড়ে ভারতবর্ষ শেষ পর্যন্ত ধর্মের ভিত্তিতে দ্বিধা-বিভক্ত হয়েই স্বাধীনতা লাভ করে। মুসলমান প্রধান এলাকাগুলি নিয়ে পাকিস্তানের জন্ম হয়। তার মধ্যে প্রধান তিনটি শ্রেণী-স্বার্থের সম্মিলন ঘটেঃ এক, অধিকতর অগ্রসরমান ভারতীয় হিন্দু মধ্যবিত্তের প্রভুত্বমূলক অস্তিত্বের আওতা থেকে মুসলমান মধ্যবিত্তের প্রধান অংশ বের হয়ে আসতে চেয়েছিল; দুই, বিকাশমান মুসলমান শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ভারতবর্ষের বিশালায়তন হিন্দু শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিল; তিন, বাংলার ব্যাপক কৃষক জনগোষ্ঠী জমিদার শ্রেণীর শোষণ থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিল। প্রথম দুটি দ্বন্দ্বের প্রকৃতিগত কারণেই একই শ্রেণীর মধ্যে তা সাম্প্রদায়িক রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং ক্রমাগত তা বিকশিত হতে হতে চল্লিশের দশকে এসে তীব্র আকার ধারণ করেছিল। উক্ত দ্বন্দ্ব দু'টি পরিনামে তৃতীয় দ্বন্দ্বকেও প্রভাবিত করে। কেননা, তৃতীয় দ্বন্দ্বটি বস্তুতঃ শ্রেণীগত বিরোধ থেকে উদ্ভুত, কিন্তু আগের দুটি বিরোধের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাংলার কৃষক জনগোষ্ঠী শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলে বাংলার সমগ্র কৃষক জনগোষ্ঠী কয়েক যুগ ধরে ঐক্যবদ্ধভাবে সামন্তবাদ-বিরোধী লড়াই করেও শেষ পর্যন্ত একত্র থাকতে পারেনি। ভূমির ওপর মুসলমান কৃষক-জনতার অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবির সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে পড়ে, জন্ম হয় দুটি রাষ্ট্র। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় পাকিস্তান। বাংলা আর পাঞ্জাবের মধ্যে বড় ধরনের বিভক্তি ঘটে। পাঞ্জাব বিভক্ত হওয়ার ফলে মুসলমান সংখ্যাগুরু অঞ্চল পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে ধনাঢ্য হিন্দু ও শিখ ব্যবসায়ীদের সকল সম্পদ কেড়ে নিয়ে তাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। অন্যদিকে, বোম্বাই, আহমেদাবাদ ও দিল্লীর ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও অন্যান্য মধ্যবিত্তের একাংশ তাদের সম্পদ নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে বাসস্থান গড়ে তোলে। উপরন্তু, পশ্চিম পাকিস্তানের ভাগে পড়ে লাহোর, করাচী, পেশোয়ারের মত ঐতিহাসিক নগরকেন্দ্রসমূহ। অন্যদিকে, বাংলা ভাগ হয়ে তার যে অংশ পাকিস্তানের ভাগে পড়ে সেটা ছিল ঔপনিবেশিক শহর কলিকাতার পশ্চাদ্ভূমি। প্রধানতঃ পূর্ব বাংলার সম্পদ সঞ্চিত হয়েই কলিকাতা ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ নগরকেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর সেই কলিকাতাই পড়ে যায় পূর্ব বাংলার বাইরে। সেখানে আগে থেকেই দেশের বড়ো বড়ো জমিদাররা তাদের সম্পদ জমা করেছিল। আর এ জমিদারদের অধিকাংশই হিন্দু সমাজভুক্ত হওয়ার কারণে পূর্ব বাংলায় সঞ্চিত তাদের অর্থ সম্পদও তারা এখান থেকে নিয়ে যায়। ফলে পূর্ব বঙ্গ সঞ্চয় শূন্য হয়ে পড়ে। এভাবে দুটি অঞ্চলের মধ্যে এক ব্যাপক বৈষম্য নিয়েই পাকিস্তান তার যাত্রা শুরু করে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরুতে সঞ্চয় ও শহরায়নের দিক থেকেই শুধু পূর্ব বাংলা পিছিয়ে ছিল না, আর্থিকভাবে সচ্ছল ও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত কোন শ্রেণীও এখানে সে সময় কার্যত ছিল না। জমিদারী উচ্ছেদের দাবি পাকিস্তান দাবির অংশে পরিণত হওয়ায়, এখানকার মুসলমান জমিদাররাও সেভাবে জনসাধারণের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। এখানকার একমাত্র জনভিত্তি সম্পন্ন শ্রেণী ছিল মুসলমান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ। তবে এ মধ্যবিত্ত সমাজ সরকারী চাকুরি, ব্যবসা-বাণিজ্য বা শিল্প প্রতিষ্ঠায় তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি, তাঁদের প্রায় একমাত্র পেশা ছিল আইন ব্যবসা। অন্যদিকে, পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল একটি অত্যন্ত শক্তিশালী সামন্ত অভিজাত শ্রেণী। পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে সেভাবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ না ঘটলেও করাচীকে কেন্দ্র করে ভারত প্রত্যাগত যে বিশাল মুসলিম মধ্যবিত্তের সম্মিলন ঘটে সে মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে ব্যবসায়ী, শিল্পপতি আর পেশাজীবী শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা সমহারেই অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর এই মধ্যবিত্ত শ্রণীর প্রতিনির্ধি ছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্। পশ্চিম পাকিস্তানের সমগ্র জনসাধারণের বিবেচনায় মধ্যবিত্ত শ্রেণী একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র জনসমষ্টি হলেও নবপ্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে এ মধ্যবিত্তদের ভূমিকা ছিল সুদূরপ্রসারী। মোহাম্মদ আলী জিন্নার একক নেতৃত্ব মধ্যবিত্তদের উক্ত ভূমিকাকে গ্রহণযোগ্য করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

দেশ বিভাগের সময় যে দলটি পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় সেই মুসলিম লীগের সভাপতির পদটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একমাত্র জাতীয় সম্মেলন ছাড়া আর কারো কাছে সভাপতিকে জবাবদিহি করতে হত না। সভাপতির মনোনীত ব্যক্তিদের নিয়ে কার্যকরী কমিটি গঠিত হত। যে কোন ব্যক্তি বা কমিটিকে সভাপতি যে কোন সময় বহিষ্কার বা বাতিল করে দেওয়ার অধিকার রাখতেন। ১৯৩৬ সাল থেকেই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ছিলেন এই পদের অধিকারী। এছাড়া, সর্বময় সরকারী ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী গভর্ণর জেনারেলের পদটিও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় জিন্নাহ্ই গ্রহণ করেন। ফলে পার্টি, সরকার ও রাষ্ট্রের একক ক্ষমতার অধিকারী মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ নিজের পছন্দমত একটি রাষ্ট্র গঠনে উদ্যোগী হন।

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে জিন্নাহ্ প্রধানতঃ সামরিক ও বেসামরিক আমলা আর ব্যবসায়ীদের ওপর নির্ভর করেন। তবে পশ্চিম পাকিস্তানী সমাজে সামন্ত অভিজাতদের ব্যাপকতর সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি থাকার কারণে জিন্নাহ্ এদেরকে পাশ কাটিয়ে যেতে সক্ষম হননি। উপরন্তু, মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতেও এ সামন্ত অভিজাতদের ব্যাপকতর প্রভাব থাকার কারণে সরকারে এদের অংশীদারিত্ব না দিয়ে জিন্নাহ্র কোন উপায় ছিল না। ফলে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠ মন্ত্রীর পদ পশ্চিম পাকিস্তানের সামন্ত অভিজাতদের হাতে ছেড়ে দিলেও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মূল কেন্দ্রগুলি জিন্নাহ সামরিক-বেসামরিক আমলা ও অন্যান্য মধ্যবিত্তের হাতেই রেখে দেন। রাষ্ট্রপ্রশাসনই সকল কার্যকরী ক্ষমতার অধিকারী হয়। প্রশাসনিক আমলা কাঠামোটি একটি কেন্দ্রীয় কাঠামোর অধীনে থাকার কারণে এবং আমলা কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করার একমাত্র ক্ষমতা গভর্ণর জেনারেলের হাতে থাকার ফলে এই আমলা কাঠামোর ওপর সরকারের, বিশেষতঃ মন্ত্রী পরিষদের শুরু থেকেই কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। উপরন্তু, আমলা প্রশাসনের মাধ্যমে সংগৃহীত রাজস্ব, বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের ওপর ভিত্তি করে উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালিত হওয়া এবং তা কার্যকরী করার দায়িত্ব আমলাতন্ত্রের হাতে থাকায় আমলাতন্ত্রই পাকিস্তান রাষ্ট্রের মূল ভিত্তিতে পরিণত হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যসহ প্রায় সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের নেতৃত্বও আমলাতন্ত্রের হাতে চলে আসে। বেশ কয়েকজন সামন্ত অভিজাত কেন্দ্র ও প্রদেশের মন্ত্রী হলেও শ্রেণী হিসাবে সামন্তদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে তেমন কোন ভূমিকা থাকে নি। এভাবেই পশ্চিম পাকিস্তানের সামন্ত অভিজাত শ্রেণী ও আমলাতন্ত্রের মধ্যে একটি মৌলিক বিরোধের সূত্রপাত ঘটে।

যে সকল সামরিক আমলা নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামোটি গড়ে ওঠে তাদের মধ্যে বাঙ্গালীদের কোন অবস্থানই ছিল না বলা যায়। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের পারমিট-লাইসেন্স গ্রহণ কিংবা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে গড়ে ওঠা শিল্প-কারখানার মালিকানাপ্রাপ্তি বা এ ধরনের অর্থনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ থেকে বাঙ্গালী জনগোষ্ঠী পরিপূর্ণভাবে বঞ্চিত হয়। এভাবে সমগ্র বাঙ্গালী জনতার সাথে পাকিস্তান রাষ্ট্রের আরো একটি মৌলিক বিরোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তানের জন্ম হলেও ধর্ম তথা ইসলামী ভ্রাতৃত্ব যে একটি জাতি গঠনের জন্য যথেষ্ট নয় এ সত্যটি পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাছে খুব দ্রুতই পরিষ্কার হয়ে ওঠে। আর এ কারণেই রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ভাষা ও কৃষ্টিগত ঐক্য আনয়নের জন্য নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। সরকারী প্রচার মাধ্যমগুলিতে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সপক্ষে জোর প্রচার চালানো হয়। সেই সাথে একটিমাত্র পাকিস্তানী ভাষা প্রতিষ্ঠার পক্ষেও ব্যাপক প্রচারণা চালানো হতে থাকে। এভাবে পূর্ব বাংলার ওপর পাকিস্তান রাষ্ট্রের একটি স্পষ্ট সাংস্কৃতিক আধিপত্য চেপে বসে। জনসাধারণের কাছে এটা পশ্চিম পাকিস্তানী তথা অবাঙ্গালীদের সাংস্কৃতিক আধিপত্য হিসাবে পরিগণিত হয়। এভাবেই পূর্ব বাংলার গণমানুষের মাঝে স্বতন্ত্র জাতীয় চেতনা গঠনের ভিত্তি রচিত হয়।

পাকিস্তান জন্মের পর যাদের নিয়ে পূর্ব বাংলায় সরকার গঠিত হয় তাদের কোন দৃঢ় শ্রেণী ভিত্তি ছিল না। ফলে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য নির্দিষ্ট কোন শ্রেণীর ওপর নির্ভর না করে তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি তোষামোদের পথ বেছে নেন। পূর্ব বাংলা সরকারের ওপর কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের প্রশাসনিক আধিপত্যকেও তাঁরা বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নেন। ফলে কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার পূর্ববাংলা সরকারকে দিয়ে একের পর এক এমন অসংখ্য কাজ করিয়ে নেয়, যেগুলি পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। অন্যদিকে, জন্মলগ্ন থেকেই কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার এমন তীব্র বৈষম্যমূলকনীতি গ্রহণ করে যে, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তথা প্রতিটি ক্ষেত্রেই পূর্ব বাংলা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পিছিয়ে পড়তে থাকে। প্রথম দশকে যে বৈষম্য নীতি চালু করা হয় তা ছিল অবিশ্বাস্য। শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধা থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রেই পূর্ব বাংলা ব্যাপকভাবে পিছিয়ে পড়ে। পশ্চিম পাকিস্তানীরা বৈদেশিক ও আন্ত-আঞ্চলিক বাণিজ্যের প্রায় পুরোটাই দখল করে নেয়। পূর্ব বাংলায় যে দু'চারজন এসকল ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশ নিতে সক্ষম হয়েছিলেন তাদেরও অধিকাংশ ছিল অবাঙ্গালী। প্রথম দশকে পাকিস্তানে যে শিল্প বিকাশ ঘটে তার প্রায় সবটুকুই হয় পশ্চিম পাকিস্তানকে কেন্দ্র করে, পূর্ব বাংলায় যে দু'চারটি আধুনিক শিল্প কারখানার প্রতিষ্ঠা হয় তারও মূল উদ্যোক্তাগণ ছিলেন অবাঙ্গালী। সামরিক বাহিনী কিংবা বেসামরিক প্রশাসনের আকৃতি এসময় খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল, কিন্তু তাতে পূর্ব বাংলার অংশ ছিল নামমাত্র। এভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই বৈষম্য তীব্র আকার ধারণ করে।

আঞ্চলিক বৈষম্যের পাশাপাশি পাকিস্তানের প্রথম দশকে আরো দু'টি প্রবণতা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠেঃ একটি হচ্ছে, বেসামরিক আমলাতন্ত্র ক্রমাগত এত অধিক শক্তি অর্জন করে যে, পার্লামেন্ট বা রাজনৈতিক সরকারের পক্ষে তার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। দুই, পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের আগ্রাসন মোকাবিলার নামে মার্কিনের সাথে বিভিন্ন গোপন সামরিক চুক্তি ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সামরিক চুক্তির মাধ্যমে পাক সেনাবাহিনী এমন প্রবল শক্তির অধিকারী হয়ে ওঠে যে, তার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা আর কোন প্রতিষ্ঠানেরই থাকে না। আমলাবর্গের প্রতিনিধি পর্যায়ক্রমে পাকিস্তান রাষ্ট্রের শীর্ষ পদসহ সরকারেরও প্রধান প্রধান দপ্তর দখল করে ফেলে। আর এ ক্ষমতাবান আমলাগণ তাদের সামাজিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় সমূহকে একে একে সরিয়ে ফেলতে শুরু করে।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। বৃহৎ বৃহৎ সব এস্টেট-এ বিভক্ত পশ্চিম পাকিস্তানের মফস্বল ও গ্রামীণ অঞ্চলগুলি ছিল সামন্তদের অধীনে। এ ধরনের সামন্ততান্ত্রিক ক্ষমতা আমলাতন্ত্রের সম্প্রসারণের জন্য সহায়ক ছিল না। এছাড়া সামন্ততান্ত্রিক ক্ষমতার অস্তিত্ব বৃহৎ ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রের সহযোগী অন্যান্য শ্রেণীর বিকাশের জন্যও অনুকূল নয়, কেননা সামন্ততান্ত্রিক আধিপত্য থাকার অর্থই হচ্ছে উক্ত শ্রেণীসমূহের জন্য কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের বাইরে দ্বিতীয় আর একটি প্রশাসনের মুখোমুখি হওয়া। বৃহৎ ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের বিকাশের জন্য স্বতন্ত্র সামন্ততান্ত্রিক প্রশাসনের অস্তিত্বই শুধু বাধাস্বরূপ নয়, স্বতন্ত্র প্রাদেশিক প্রশাসনের অস্তিত্বও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। উপরন্তু, যে কোন প্রদেশ বা এস্টেট যত বেশি স্বায়ত্তশাসিত বা স্ব-শাসিত ততই উক্ত বৃহৎ ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের অবাধ বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তা বাধাস্বরূপ। ফলে দ্রুত সম্প্রসারণশীল প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্র এবং তার ওপর নির্ভরশীল শ্রেণী বৃহৎ ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি স্পষ্ট বিরোধ সূচীত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের সব প্রদেশকে ভেঙ্গে দিয়ে যখন এক ইউনিট ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় তখন এ বিরোধ আরও স্পষ্ট রূপ লাভ করে।

এদিকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কিছুদিন আগেই বঙ্গীয় মুসলিম লীগের মূল নেতৃত্ব অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল সামন্ত সংস্কৃতির অনুসারী ব্যক্তিবর্গের হাতে চলে যায়, ফলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগ আর মধ্যবিত্ত ও কৃষক সমাজের আকাংখাকে ধারণ

Dhaka University Institutional Repository

করতে পারেনি। সাধারণ কর্মীদের পক্ষ থেকে এ নীতি পরিবর্তনের জন্য চাপ আসলে মুসলিম লীগের অধিকাংশ জেলা কমিটিকে ভেঙ্গে প্রতিবাদীদের সদস্যপদ নবায়ন ও নতুন সদস্য সংগ্রহের ব্যবস্থাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। পূর্ব বঙ্গীয় মুসলিম লীগের এধরনের কার্যকলাপের সাথে বিভাগ পূর্ব বঙ্গীয় মুসলিম লীগের মূল নেতৃত্বের একাংশের, বিশেষতঃ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম ও এ.কে. ফজলুল হক প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের কোন সম্পর্ক ছিল না। বরং এঁরা বঙ্গ বিভাগকে বিরোধিতা করেছিলেন। সঙ্গত কারণেই এ সকল নেতার অনুসারী তরুণ কর্মীরা ছিলেন অপেক্ষাকৃত অসাম্প্রদায়িক। পাকিস্তান জন্মের পর এ কর্মীরা নেতৃত্ব শূন্য হয়ে পড়ে, দলীয় সদস্যপদ নবায়ন না হওয়াতে দলের নীতি পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও তারা কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। আর এ অবস্থাটিই মুসলিম লীগের বিপরীতে নতুন রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠার ভিত্তি রচনা করে। পরবর্তীকালে এ যুবসমাজের নেতৃত্বেই গড়ে ওঠে বাঙ্গালী জাতির ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠার এক গৌরবোজ্জ্বল আন্দোলন।

কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের নীতিসমূহ পূর্ব বাংলার ওপর চাপিয়ে দিতে গিয়ে পূর্ব বাংলা মুসলিম লীগ সরকার খুব দ্রুতই গণবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। গণবিচ্ছিন্ন এ সরকারকে অপসারণ করার লক্ষ্যে পূর্ব বাংলার সকল মত ও পথের অনুসারী রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ হয়। প্রণীত হয় ২১ দফা, গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট। যুক্তফ্রন্টের মূল নেতৃত্বে এ.কে. ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী থাকলেও এর মধ্যে নেজাম-ই-ইসলামের মত সাম্প্রদায়িক দল ছিল। ২১ দফায় পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনসহ কৃষক ও মধ্যবিত্তের দাবি সন্নিবেশিত হলেও উহা দ্বিজাতি তত্ত্ব থেকে সরে আসতে পারেনি, বরং মুসলিম লীগ নয় -- যুক্তফ্রন্টই খোদ মুসলিম লীগের কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করতে পারে -- এ ধরনের একটি ধারণা তুলে ধরা হয়। আর এ কারণেই যুক্তফ্রন্টের ব্যাপক বিজয় সত্ত্বেও অতি দ্রুতই যুক্তফ্রন্টের সাম্প্রদায়িক ধারার সাথে অসাম্প্রদায়িক ধারার বিরোধটি স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। এ অবস্থাকে ব্যবহার করে কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার যুক্তফ্রন্টকে ভেঙ্গে ফেলার প্রচেষ্টা নেয়। কিন্তু মওলানা ভাসানীর মত ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এ ভাঙ্গনকে রোধ করা হয়। এ অবস্থাটি কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের জন্য মোটেও গ্রহণযোগ্য ছিল না। কেন্দ্রীয় সরকার তার আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে প্রয়োগ করে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত প্রাদেশিক সরকারকে অপসারণ করে। কায়েম করে কেন্দ্রীয় শাসন। যুক্তফ্রন্টের প্রায় সকল নেতা ও কর্মীর ওপর নেমে আসে সীমাহীন নির্যাতন। একদিকে নির্যাতন আর অপরদিকে ক্ষমতার লোভ দেখানো -- এভাবে আবার শুরু হয় যুক্তফ্রন্টের মধ্যে ভাঙ্গণ প্রচেষ্টা। এর পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে দেশের উভয় অংশের মার্কিন অনুসারী নেতৃবৃন্দকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। এ প্রচেষ্টারই অংশ হিসাবে পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ তাঁর মোহাম্মদ আলী (বগুড়া) মন্ত্রিসভায় আইন মন্ত্রী হিসাবে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মত নেতাকে যোগদান করাতে সমর্থ হন। এভাবেই প্রধানতঃ সামরিক ও আমলাতান্ত্রিক ব্যক্তিত্বকে নিয়ে গড়ে-ওঠা 'ট্যালেন্ট' মন্ত্রিসভা স্বল্প সময়ের জন্য হলেও পাকিস্তানের উভয় অংশের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। তথাকথিত এ ট্যালেন্ট মন্ত্রিসভার আমলেই স্বয়ং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর হাত দিয়ে তৈরি হয় ১৯৫৬ সালের সংবিধান -- যেখানে গণতান্ত্রিক কিছু ধারা সংযোজিত হলেও পূর্ব বাংলার জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে অস্বীকার করা হয়, আর প্রেসিডেন্টকে প্রায় সকল ক্ষমতার অধিকারী করা হয়। এ সংবিধানের আরো একটি দিক হচ্ছে এই যে, পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলিকে একটিমাত্র প্রদেশে রূপান্তরিত করা হয়। এ সকল কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন পূর্ব বাংলার ঐক্যের প্রতীক যুক্তফ্রন্টকে ভেঙ্গে ফেলা হয়, অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিতে সামরিক-আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্বকে আরো সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়।

১৯৫৬ সালের সংবিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিতে যদিও সামন্ত অভিজাতদের কর্তৃত্ব হ্রাস পায়, আমলা ও ব্যবসায়ীদের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র বিস্তৃত হয় এবং প্রেসিডেন্টের সীমাহীন ক্ষমতা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে, তবু সাংবিধানিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণেই জনপ্রতিনিধিদের বিশেষতঃ গণপরিষদকে উপেক্ষা করে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপায় থাকেনি। তবে সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানকে নিয়ে এক ইউনিট গঠনের বিষয়টি সেখানকার জনসাধারণও ভালভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলি প্রথম থেকেই এর প্রতিবাদ জানায়। ইতিমধ্যে এসে পড়ে পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন। মুসলিম লীগ এক ইউনিট বাতিলের দাবিকে নির্বাচনী ইস্যু হিসাবে গ্রহণ করে। অন্যান্য দলের পাশাপাশি মুসলিম লীগও প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জার সমালোচনায় যোগ দেয়। এভাবে মুসলিম লীগ সেখানকার নির্বাচনে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। গণপরিষদের নব নির্বাচিত মুসলিম লীগ সদস্যগণ নেতা পরিবর্তনের জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জার জন্য এ অবস্থাটি মোটেও অনুকূল ছিল না। প্রেসিডেন্ট স্বয়ং ব্যক্তিগতভাবে হস্তক্ষেপ করেন এবং তারই উদ্যোগে রিপাবলিকান পার্টি নামক রাজনৈতিক দলের জন্ম হয় - প্রথমে যার মূল কর্মসূচী ছিল এক ইউনিট ব্যবস্থা ও স্বতন্ত্র নির্বাচন। এটা ছিল প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জার একটি সচেতন প্রয়াসের ফল, যাতে করে যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থার অনুসারী আওয়ামী লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ওপর একটি চাপ সৃষ্টি করা যায়। সোহরাওয়ার্দী এ চাপের মুখে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি ছেড়ে দেন এবং এ শর্তে যুক্ত নির্বাচনের দাবিকেও রিপাবলিকান পার্টি গ্রহণ করে। এভাবেই সোহরাওয়ার্দী এক ইউনিট ব্যবস্থার অনুসারী হিসাবে পার্লামেন্টে সংখ্যালঘু সদস্য নিয়েই পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন। সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী হয়ে শুধু এক ইউনিট ব্যবস্থাকেই সমর্থন করেননি। উপরন্তু, 'ট্যালেন্ট' মন্ত্রিসভার আমলের সকল সামরিক চুক্তিকেও সমর্থন করেন এবং তার যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। শুধু তাই নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পূঁজিবাদী দেশের সাথে কমিউনিষ্ট বিরোধী নতুন নতুন সামরিক চুক্তি সম্পাদনের জন্যও উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। সোহরাওয়ার্দী সরকারের এধরনের আচরণের বিরুদ্ধে সমগ্র পাকিস্তানে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা- এ দুটি দাবিকে সামনে রেখে আওয়ামী লীগের মধ্যেই ব্যাপক বিতর্কের সূত্রপাত হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়ে।

পাকিস্তানের দুই অংশের কয়েকটি আঞ্চলিক দল ও মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের বিচ্ছিন্ন অংশকে নিয়ে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) নামে একটি সর্বপাকিস্তানভিত্তিক প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে। নব গঠিত এ রাজনৈতিক দলের মূল লক্ষ্য ছিল সকল জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠা, এক ইউনিট বাতিল, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা ও সামন্তবাদের উচ্ছেদ সাধন। ক্ষমতা বহির্ভূত মুসলিম লীগের সাথে এ দলের কোন ব্যাপারে মিল না থাকলেও একটি ব্যাপারে মিল ছিল এবং তা হচ্ছে এক ইউনিট বাতিল। মুসলিম লীগ এক ইউনিট বাতিলের দাবিকে সামনে রেখে ন্যাপের সাথে একটি সমঝোতায় উপণীত হয় এবং এ প্রশ্নে পশ্চিম পাকিস্তানে এক ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে। আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে রিপাবলিকান পার্টির মধ্যেও এক ইউনিট প্রশ্নে নতুন

Dhaka University Institutional Repository

উপলব্ধির জন্ম হয়। রিপাবলিকান পার্টিও এক পর্যায়ে এক ইউনিট ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। এ সময়ই সোহরাওয়ার্দী সরকারের প্রতি তারা অনাস্থা জানায়। এভাবেই সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বিভিন্ন সামরিক ও অর্থনৈতিক চুক্তির বদৌলতে পাকিস্তানের রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। পাকিস্তানে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি স্থাপিত হওয়ার ফলে সে প্রভাব আরো স্পষ্ট রূপ লাভ করে। পাকিস্তানের রাজনীতিতে এর গভীর প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। পাকিস্তানের উভয় অংশে এক প্রচণ্ড মার্কিন-বিরোধী বিক্ষোভ ও আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। এ পর্যায়ে পাকিস্তানের প্রায় সকল রাজনৈতিক দল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও এক ইউনিট-বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে। এর বাইরে থাকে একমাত্র আওয়ামী লীগ। এ অবস্থাটি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জার নেতৃত্বাধীন সামরিক-আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে মোটেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এদিকে সামনেই ছিল পাকিস্তানের জাতীয় গণপরিষদ নির্বাচন। এক ইউনিট ব্যবস্থা ও পাকিস্তানের মার্কিন প্রভাবের সমর্থক একমাত্র আওয়ামী লীগের ওপর নির্ভর করে নির্বাচনকে মোকাবিলা করার সাহস সে সময় প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জার থাকার কথা নয়, কেননা এক ইউনিট ও মার্কিন প্রভাবের বিরুদ্ধে যে প্রবল আন্দোলনের জোয়ার সমগ্র পাকিস্তানে সেদিন বইছিল -- তার বিরুদ্ধে কোন শক্তিশালী দলের পক্ষেও - এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজয় অর্জন করা সম্ভব ছিল না। উপরন্তু, সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার পতনের পর থেকেই আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলার পূর্ণস্বায়ত্তশাসন দাবি পুনরায় উত্থাপন করতে থাকে। পশ্চিম পাকিস্তান কেন্দ্রিক পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থের আওয়ামী লীগের ওপর নির্ভর করার মত বস্তুগত ভিত্তিও সে সময় নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। ফলে সেদিনের পাকিস্তানে সামরিক আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে এবং তার জাতীয়-আন্তর্জাতিক নীতিকে সমর্থন করার মত কোন রাজনৈতিক দলেরই অস্তিত্ব থাকেনি। এ অবস্থাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পাকিস্তানের সাথে সম্পর্কিত পূঁজিবাদী দুনিয়ার কারো জন্যই কাম্য ছিল না।

সে সময় পাকিস্তানের উভয় অংশে মার্কিন-বিরোধী তীব্র আন্দোলন হচ্ছিল বটে, কিন্তু যে রাষ্ট্র ব্যবস্থাটি এ অবস্থার জন্য দায়ী সে বিষয়টি প্রায় কোন রাজনৈতিক দলই তখন প্রকাশ করে। ব্যক্তিগতভাবে ইস্কান্দার মির্জা মন্দ শাসক হিসাবে পরিচিত হলেও এটা যে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার ব্যাপার নয়, একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিনিধি হিসাবেই ইস্কান্দার মির্জা সেদিন উক্ত সকল ভূমিকা গ্রহণ করেছিল - এই সত্য কথাটি সেদিন কোন রাজনৈতিক দল তুলে ধরেনি। ফলে এ পর্যায়ে রাষ্ট্রের মূল অংশ তথা সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্র যে নিজেই সকল কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধি হিসাবে প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করতে পারে, নিজেই যে আইন প্রণয়ন ও তা কার্যকারী করার মূল উৎসে পরিণত হতে পারে এ বিষয়গুলিও কোন রাজনৈতিক দল সেদিন জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেনি। এ রকম একটি পরিস্থিতিই ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারির জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র সৃষ্টি করে।

১৯৫৮ সালের যে সময় জেনারেল আইয়ুব খান আমলাতন্ত্র ও বড় ধনি-ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি হিসাবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে তখন আমলাতন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল একটি ক্ষুদ্র শিল্পপতি ও ধনি-ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর বাইরে এমন কোন শ্রেণী ছিল না যার ওপর সামরিক সরকার নির্ভর করতে পারে। তখন পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় সমগ্র অঞ্চলে সামন্ত অভিজাতদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব ছিল এত দৃঢ় যে, তাকে এড়িয়ে সামরিক সরকারের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করার ক্ষমতা আর কোন শ্রেণীরই ছিল না। অন্যদিকে, পূর্ব পাকিস্তানে একটি শ্রেণী হিসাবে সামন্তদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। উপরন্তু, পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র জনতাই তখন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের প্রতি বেশ অসন্তুষ্ট ছিল। পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি সে সময় সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানীদের জাতীয় দাবিতে পরিণত হয়েছিল। ফলে, পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি মেনে না নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানী সমাজের বিদ্যমান শ্রেণীসমূহের কোন একটিকেও সামরিক সরকারের পক্ষে মেরুভূত করা সম্ভব ছিল না। তাই প্রথম থেকে সামরিক শক্তির ব্যবহারই সমগ্র পাকিস্তানের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রধান উপায় হয়ে ওঠে।

দেশের ওপর সামরিক শক্তি ব্যবহার করে প্রাথমিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পর সামরিক সরকার সামাজিক ভিত্তি গড়ে তোলার প্রতি মনোযোগী হয়। নির্বাচিত সরকারের পতনের পর স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিম পাকিস্তানের সামন্ত অভিজাত শ্রেণীসহ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে প্রভাবশালী সকল শ্রেণীর জন্যই রাষ্ট্রক্ষমতা প্রয়োগের বৈধ পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সমাজের প্রভাবশালী শ্রেণীসমূহের প্রতিনিধিকে ক্ষমতার বাইরে রেখে যে কোন সরকারের শাসনই নির্বিঘ্ন হতে পারে না - একথা সামরিক সরকারের কাছেও বেশ পরিষ্কার ছিল। আর এ কারণেই নিজের স্বার্থেই সামরিক সরকার পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু পছন্দসই সামন্তঅভিজাত এবং পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকজন বিশিষ্ট বিত্তবান ও প্রভাবশালী ব্যক্তিকে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় স্থান দেয়। পূর্ব পাকিস্তানের বিত্তবান শ্রেণী সম্পর্কে সামরিক সরকারের চিন্তার কোন কারণ ছিল না, কেননা এখানে ভূমিসংস্কার আইন কার্যকরী হওয়ার পর বিত্তবান হতে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের আনুকূল্য লাভ অপরিহার্য হয়ে ওঠে, যারা রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের আনুকূল্য লাভ করে বিত্তবান হয়ে ওঠে তাদের থেকে সামরিক সরকারের আশু কোন বিপদাশংকা ছিল না, কেননা এ সকল ব্যক্তির সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি রাষ্ট্রীয় প্রভাব প্রতিপত্তিরই সম্প্রসারিত রূপ মাত্র। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থাটি ছিল ভিন্ন। কারণ একজন সামন্ত অধিপতির মন্ত্রীত্বের ক্ষমতা তার সামন্ততান্ত্রিক আধিপত্যকে আরো বৃদ্ধি করে। ফলে সামন্ত অভিজাতকে মন্ত্রীত্ব দেওয়ার মাধ্যমে সামন্ততান্ত্রিক আধিপত্যের বিপরীতে সামরিক সরকারের পক্ষে কোন সামাজিক ভিত্তি গড়ে উঠার সম্ভাবনা ছিল না। সে কারণে সামরিক সরকার পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ভিন্নধর্মী একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

সামরিক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করার পর পরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ সমগ্র পূঁজিবাদী বিশ্বের সাথে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং তাদের দেওয়া সকল শর্তকে মেনে নিয়েই বিভিন্ন ধরনের সামরিক ও অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পাদন করে। পাশ্চাত্য বিশ্বের পূঁজি বিনিয়োগের জন্য সম্ভাব্য সকল রকমের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। যে কোন শিল্প উদ্যোক্তা যাতে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মাত্রায় শ্রমিক ও কাঁচামাল বিক্রেতা কৃষকদের ওপর শোষণ-নিপীড়ন চালাতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ধরনের আইনগত নিরাপত্তা প্রদান করা হয়। শিল্পপতিদের জন্য বোনাস-ভাউচারের ব্যবস্থা করা হয় - যা দিয়ে বিশ্বের যে কোন দেশ থেকে যে কোন পণ্য কিনে দেশের বাজারে বিক্রি করা যেত। আর এ সকল পণ্য আমদানিকে করমুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়। বিদেশী অর্থে লাভজনক শিল্প গড়ে তা প্রায় নামমাত্র মূল্যে শিল্পপতিদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এভাবে পাকিস্তানের উভয় অংশে একটি শক্তিশালী পূঁজিপতি শ্রেণীর জন্ম হয়। দ্রুত বিকাশমান এই শিল্পপতি শ্রেণীটি তাদের বিকাশের ধারাবাহিকতার কারণেই পাকিস্তান রাষ্ট্র তথা সামরিক সরকারের অনুগত ছিল। বলা বাহুল্য, পূর্ব পাকিস্তানে যে শিল্পপতি শ্রেণীটির জন্ম হয় তাদের অধিকাংশই ছিল অবাঙ্গালী। যাহোক, এভাবে পাকিস্তানে সামরিক সরকারের পক্ষে পূঁজিপতি বা শিল্পপতি শ্রেণী একটি শক্তিশালী সামাজিক ভিত্তি হিসাবে গড়ে ওঠে।

Dhaka University Institutional Repository

শহরাঞ্চলে একটি শক্তিশালী শিল্পপতি শ্রেণী গড়ে তোলার পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলেও সামরিক সরকারের সমর্থক একটি শ্রেণী গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষক-জনতা ছিল সামন্ততান্ত্রিক নিগড়ে আবদ্ধ। সামন্ত অভিজাত শ্রেণীর বিপরীতে দাঁড়ানোর মত সেখানে কোন শ্রেণীর প্রায় অস্তিত্বই ছিল না। অপরদিকে, পূর্ব পাকিস্তানে জমিদারী উচ্ছেদ আইন প্রয়োগ হওয়ার কারণে কারো পক্ষে ১০০ বিঘার ওপর জমি রাখার কোন আইনগত বৈধতা ছিল না। ফলে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, পুরো পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চল ক্ষুদে কৃষক মালিকানা ব্যবস্থার অধীন হয়ে পড়ে। এতে এমন কোন আইনগত সুবিধা ছিল না যা' ব্যবহার করে কোন শ্রেণী গ্রামীণ জনতার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এমন এক পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের দুই অংশের জন্য সামরিক সরকার সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দুটি ভূমি নীতি ঘোষণা করেঃ পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষকদের ওপর সামন্ত অভিজাতের সামন্ততান্ত্রিক কর্তৃত্বের আইনগত বৈধতাকে বিলোপ করা হয় এবং সর্বোচ্চ জমির সিলিং ৫০০ একর করা হয়। এর ফলে সামন্ত আধিপত্য ৫০০ একর জমির মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ে। পশ্চিম পাকিস্তানে জমির সর্বোচ্চ সিলিং ৫০০ একর করায় খুব বেশি পরিমাণ জমি উদ্ধার করা না গেলেও সামন্ত পরিবারগুলি, বিশেষতঃ তাদের ভূসম্পত্তি অসংখ্য ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, পূর্ব পাকিস্তানে জমির সিলিং ৩৩ একরের পরিবর্তে ১২৫ একর নির্ধারণ করা হয়। এর মাধ্যমে এখানকার কৃষিকাঠামোর মধ্যে একটি শক্তিশালী বড় খামার মালিক শ্রেণীর অস্তিত্বের বৈধতা প্রদান করা হয়।

ভূমিনীতি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সামরিক সরকার পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলে এমন একটি শ্রেণীর বিকাশকে উৎসাহিত করে যারা নিজের মালিকানাধীন জমির ওপর নির্ভর করেই সমাজে ব্যাপকতর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে ভূমি নীতির প্রতিক্রিয়া হয় সুদূরপ্রসারী। সমগ্র কৃষক সমাজ ভূমি দাসত্ব থেকে মুক্তি পায়। সামন্ত অভিজাতদের ভূমির ওপর কর্তৃত্ব ৫০০ একরের মধ্যে সীমিত হয়ে আসার ফলে তাদের অর্থনৈতিক ভিত্তিও দুর্বল হয়ে পড়ে। ভূমি দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে খোদ কৃষক সমাজের মধ্য থেকেও একটি জোতদার শ্রেণী আত্মপ্রকাশ করে।

সামরিক সরকার পশ্চিম পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলে এক ব্যাপক কৃষি সংস্কারের কর্মসূচী গ্রহণ করে। স্বল্প মূল্যে প্রচুর পরিমাণে কৃষি যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ সরবরাহ করা হয়, পল্লী বিদ্যুতায়ন করা হয় এবং উৎপাদিত ফসলের নিম্নতম মূল্য বেঁধে দেওয়া হয়। এভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষি উৎপাদনকে বিরাট লাভজনক ব্যবসায় রূপান্তরিত করা হয়। কৃষি উৎপাদনের সাথে যুক্ত খামার-মালিকদের একাংশ পুঁজিবাদী খামার মালিকে পরিণত হয়। গ্রামাঞ্চলে ট্রাক্টর দিয়ে চাষাবাদ শুরু হয়। জমিদারদের একাংশও এই বাণিজ্যিক কৃষি উৎপাদনের সাথে যুক্ত হয়, কিন্তু গ্রামে বসবাসকারী ও খোদ কৃষক সমাজ থেকে আগত পুঁজিপতি খামার মালিকরা অন্যান্য সকলকে প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দেয়। গ্রামের এই নব্য ধনিক পুঁজিপতি খামার মালিকগণই সামরিক সরকারের দ্বিতীয় সামাজিক ভিত্তি হিসাবে গড়ে ওঠে। পশ্চিম পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলের এ পুঁজিবাদী খামার মালিক শ্রেণী আর শহরের বৃহৎ শিল্পমালিক শ্রেণীকে নিয়েই পর্যায়ক্রমে আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসনের অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে ওঠে।

আইয়ুব সরকার তার সামাজিক ভিত্তিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান করার লক্ষ্যে মৌলিক গণতন্ত্র নামে আরো একটি ব্যবস্থার পত্তন ঘটায়। আমলাতন্ত্রের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে ৮০ হাজার লোকের এমন একটি গোষ্ঠীর জন্ম দেওয়া হয় যে, যারা জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হলেও জনসাধারণের কাছে তাদের জবাবদিহি করার কোন দায় ছিল না। এদের নিয়েই গড়ে ওঠে জাতীয় ও প্রাদেশিক সরকারের নির্বাচকমন্ডলী। স্থানীয় সরকার পরিচালনার দায়িত্বও এদের ওপর অর্পিত হয়। উপরন্তু, সরকারী অর্থে স্থানীয় অবকাঠামো নির্মাণসহ বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করার দায়িত্বও এদের ওপর বর্তায়। আর এদেরকে এমনই এক আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণে রাখা হয় যে, সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপকে সমর্থন না করলে যে কোন সময় তাদের সদস্যপদ বাতিল হয়ে যেতে পারতো। অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সুবিধা লাভের শর্তে সরকারকে সমর্থন করাই ছিল উক্ত মৌলিক গণতন্ত্রীদের প্রধান কাজ। মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে একদিকে যেমন জনসাধারণের মৌলিক অধিকারকে কেড়ে নেওয়া হয়, অন্যদিকে, বিভিন্ন ধরনের সুবিধা দিয়ে মৌলিক গণতন্ত্রীদেরকে সরকারের স্থায়ী রাজনৈতিক সমর্থকে পরিণত করা হয়। ফলে মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার অধীনে সরকার পরিবর্তন অসম্ভব হয়ে ওঠে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, পূর্ব পাকিস্তানে যে শিল্প মালিক শ্রেণীটি গড়ে উঠেছিল তাদের অধিকাংশই ছিল অবাঙ্গালী। যে দু'চারটি বাঙ্গালী পরিবার শিল্পপতি হিসাবে গড়ে ওঠে তারাও ছিল অবাঙ্গালী বৃহৎ পুঁজিপতিদের ক্ষুদ্র অংশীদার। এখানকার বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল অংশটি অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা দখল করে। তারাই আবার পাকিস্তানের আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্যকেও পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতো। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের কৃষকের উৎপাদন করা অর্থকরী ফসলের দাম কি হবে তা একচ্ছত্রভাবে নিয়ন্ত্রণ করতো অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা। কৃষকের অর্থকরী ফসল বিশেষতঃ পাটের সর্বনিম্ন কোন বিক্রয়মূল্য বেঁধে দেওয়া হয়নি। ফলে তাদের ইচ্ছামত কৃষকদের কাছ থেকে নামমাত্র মূল্যে পাট ক্রয়ের ব্যাপারটি একটি নিয়মিত ব্যবস্থায় পরিণত হয়। অন্যদিকে, কৃষিতে আধুনিকীকরণের কথা বলে নামসর্বস্ব কয়েকটি প্রদর্শনী খামার করা হয়, স্বল্প মূল্যে সামান্য কিছু রাসায়নিক সার ও কীটনাশক বন্টন করা হয়। কৃষি উৎপাদনে এমন পদক্ষেপ মোটেই কোন ইতিবাচক ভূমিকা রাখেনি। কৃষক জনতা ক্রমাগত দারিদ্র্যের মুখোমুখি হয়েছে। আর তাদের উক্ত অর্থনৈতিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মৌলিক গণতন্ত্রী ও রাষ্ট্রীয় অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিরা নামমাত্র মূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে জমি ক্রয় করে। ভূমি মালিকানার উচ্চতর সীমা ১২৫ একর নির্ধারিত হওয়ায় গ্রামাঞ্চলে জোতদারী শোষণ আরও তীব্র আকার ধারণ করে। মৌলিক গণতন্ত্রীরা অব্যাহত গণবিরোধী কার্যকলাপের সাথে যুক্ত থাকার কারণে তারা দ্রুতই গণবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে স্বীয় ক্ষমতাকে প্রয়োগ করার জন্য এরা রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের পাশাপাশি সামাজিক অপরাধীদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। ক্রমান্বয়ে মৌলিক গণতন্ত্রী ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসন সামাজিক অপরাধীদের রক্ষাকর্তায় পরিণত হয়। এভাবে পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র গ্রামাঞ্চল সামাজিক অপরাধীদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়ে।

শহরাঞ্চলে দ্রুতবিকাশমান শিল্পপতি শ্রেণী নিবর্তনমূলক শ্রম আইনকে ব্যবহার করে শ্রমিক সমাজের ওপর নিষ্ঠুর শোষণ চালায়। একেবারে মানবেতর জীবন ধারনে বাধ্য শ্রমিকদের সামান্য আবেদন-নিবেদনকেও রাষ্ট্রীয় বাহিনী ও তার পোষা গুন্ডাদের দিয়ে দমন করা হয়। সামান্য ট্রেড ইউনিয়ন করার দাবির অপরাধে শত শত শ্রমিককে চাকুরিচ্যুত করা হয়। এধরণের নির্মম শোষণ ও নির্যাতন এক পর্যায়ে শ্রমিক সমাজের কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে। ফলে ১৯৬৩ সালের শেষ দিক থেকেই শ্রমিকদের মধ্যেকার বিক্ষোভ ক্রমাগত বিদ্রোহ রূপে প্রকাশ পেতে থাকে। শ্রমিক সমাজের এ ব্যাপক বিদ্রোহের আশংকা থেকেই অবাঙ্গালী মালিক শ্রেণী শ্রমিক এলাকায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির পাঁয়তারা করে। ১৯৬৩ সালেই বিক্ষিপ্তভাবে কিছু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়, খুলনাতে তা এক মারাত্মক আকার ধারন করে। ১৯৬৪ সালের প্রথম দিকে ভারতে সংঘটিত একটি সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে সারা পূর্ব বাংলায় এক লোমহর্ষক সাম্প্রদায়িক

Dhaka University Institutional Repository

দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। তবে ঢাকায় রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও বুদ্ধিজীবীদের বিচক্ষণ ও সাহসী ভূমিকার ফলে অবাঙ্গালী মিল মালিকদের লেলিয়ে দেওয়া দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণপ্রতিরোধ গড়ে ওঠে, যা শেষ পর্যন্ত বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী বিরোধে পর্যবসিত হয়। এ ঘটনাটি সমগ্র শ্রমিক শ্রেণী, বিশেষতঃ বাঙ্গালী শ্রমিক সমাজ ও মধ্যবিত্ত সমাজের কাছে বাঙ্গালী বিদ্বেষী রাষ্ট্রীয় চরিত্রকে স্পষ্ট করে তুলে ধরে। এ ঘটনার পর থেকেই রাজনীতি ক্ষেত্রে বাঙ্গালী বিদ্বেষী পাকিস্তানী রাষ্ট্রীয় চরিত্রের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রতিবাদ উত্থাপিত হয়। এতদিন যে বক্তব্য প্রধানত বাম রাজনৈতিক শক্তির পক্ষ থেকেই বলা হত, উক্ত ঘটনার পর থেকে আওয়ামী লীগের মুখ থেকে আরো জোরালোভাবে তা উচ্চারিত হতে থাকে। শ্রমিক সমাজের মধ্যেও একথা দ্রুতই পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, শিল্পপতিরা শ্রমিক শ্রেণীকে বিভক্ত করার লক্ষ্যে এ ধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে উৎসাহিত করছে। ফলে সমগ্র শ্রমিক সমাজের মধ্যে যেমন মালিক শ্রেণীর প্রতি তীব্র ঘৃণার উদ্রেক হয়, তেমনই সমগ্র বাঙ্গালী শ্রমিক পাকিস্তান রাষ্ট্রের আঞ্চলিক আধিপত্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে চলে যায়। কেননা শত শত শ্রমিকের রক্ত ও জীবনের বিনিময়ে বাঙ্গালী শ্রমিকরা একথা বুঝেছিল যে, বিদ্যমান রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে থেকে শ্রমিক সমাজের কল্যাণের আর কোন পথ অবশিষ্ট নেই। আর তাই শ্রমিক শ্রেণী সব ক্ষেত্রে এক অব্যাহত আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়। সরকার ও শিল্প মালিকদের লেলিয়ে দেওয়া মাস্তান বাহিনীকে তারা ব্যাপকভাবে প্রতিরোধ করে, কোথাও কোথাও মাস্তানদের পরিপূর্ণভাবে পরাস্ত করে। সরকারী পুলিশবাহিনীর নির্মম হামলাও তাদের আন্দোলনের গতিকে রোধ করতে পারেনি। শ্রমিক সমাজের অব্যাহত আন্দোলন সারা পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প উৎপাদন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিপর্যস্থ করে দেয়। উক্ত অব্যাহত শ্রমিক আন্দোলনকে একমাত্র ১৯৬৫ সনে সংঘটিত পাক-ভারত যুদ্ধ আপাততঃ স্থগিত করে দিতে সমর্থ হয়।

আগেই বলা হয়েছে, পাকিস্তান পঞ্চাশের দশকের গোড়া থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থক হয়ে ওঠে। সামরিক শাসন আমলে এ সমর্থন এত তীব্র ছিল যে, সামরিক আইন জারি হওয়ার পর সামরিক সরকার আন্তর্জাতিক ফোরামে গিয়ে প্রকাশ্যে মার্কিনের প্রতি সর্বোচ্চ আনুগত্য জ্ঞাপন করতেও দ্বিধা করেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এভাবে আত্মসমর্পন করার মূল কারণ ছিল এই যে, পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই বিভিন্ন প্রশ্নে ভারতের সাথে ছিল অব্যাহত বিরোধ। সামরিক দিক দিয়ে তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী দেশ ভারতের পক্ষ থেকে সব সময়ই পাকিস্তান আক্রমণের আশংকা করতো। অন্যদিকে, ভারত গোড়া থেকেই একটি জোট নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি গড়ে তোলার চেষ্টা করে, যদিও অধিকাংশ সময় আবার সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষকেই সমর্থন করতো। মার্কিনের পক্ষ থেকে ব্যাপক সামরিক সাহায্য প্রদান করার পিছনে বিভিন্ন লক্ষ্যের মধ্যে ভারতের প্রতি একটি চাপ সৃষ্টি করাও ছিল অন্যতম লক্ষ। তবে তার মূল লক্ষ্য ছিল সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের বিরুদ্ধে দুনিয়াব্যাপী সমরসজ্জার রণকৌশলগত অবস্থান হিসাবে পাকিস্তানকে ব্যবহার। সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈদেশিক নীতিতে পরিবর্তন আসার পর রণকৌশলগত অবস্থান হিসাবে পাকিস্তানের গুরুত্ব হ্রাস পায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের নীতি গ্রহণ করার পর মার্কিনের সাথে তার ঠান্ডা লড়াইয়ের মাত্রা হ্রাস পায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের নীতি কার্যকরী করতে গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বেশ কিছু বিষয়ে আপোস মীমাংসার পথ অবলম্বন করে। সোভিয়েতের এ নয়ানীতির বিরুদ্ধে গণচীন প্রচন্ডভাবে সমালোচনা করে। সেই সাথে গণচীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্ববিপ্লবের প্রধান শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও নতূনভাবে তার আন্তর্জাতিক সমরসজ্জাকে বিন্যস্ত করে। প্রথমেই গণচীনকে চারদিক থেকে ঘেরাও করে ফেলার রণকৌশল গ্রহণ করে।

গণচীনের সাথে ভারতের ছিল দীর্ঘদিনের সীমান্ত বিরোধ। কিন্তু কখনও এ বিরোধকে কেন্দ্র করে ভারতের সাথে চীনের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার কোন কারণ ঘটেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ষাট দশকের গোড়া থেকে ভারতকে চীনের বিরুদ্ধে মদত দিতে থাকে। প্রায় প্রকাশ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে এ প্রতিশ্রুতি দেয় যে - চীনের সাথে ভারত কোন বিরোধে জড়িয়ে পড়লে সে অবশ্যই ভারতের পক্ষে থাকবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার প্রতিশ্রুতি রক্ষার অংশ হিসাবে ভারতকে বিপুল পরিমাণে অস্ত্র সাহায্য প্রদান করে। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানের কাছে এ নির্দেশ পাঠানো হয় যে, চীনের সাথে ভারত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে পাকিস্তান যেনো ভারতকে স্বসৈন্যে সহযোগিতা করে। পাকিস্তান সরকারের কাছে মার্কিনের এ নির্দেশ ছিল খুবই বিব্রতকর। কেননা পাকিস্তানের বিবেচনায় ভারতই ছিল তার প্রধান শত্রু। ফলে অন্য কোন দেশের সাথে ভারতের বিরোধ ঘটলে ভারতের পক্ষে সৈন্য প্রেরণ করার কোন কারণ ছিল না। উপরন্তু, চীন-ভারত বিরোধের প্রশ্নেও যদি ভারতকে অস্ত্র সহযোগিতা করা হয় তাও পাকিস্তানের জন্য সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। কেননা, এ অস্ত্র যে কোন সময় পাকিস্তানের বিরুদ্ধেও ব্যবহৃত হতে পারে। এসব কিছু মিলে চীন-ভারত সম্পর্ক প্রশ্নে পাকিস্তান মার্কিন নীতিকে সমর্থন করতে পারেনি। উপরন্তু, পাকিস্তান চীনের সাথেই ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক গড়ে তোলে। শুধু তাই নয়, এক পর্যায়ে পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন মুখপাত্র প্রকাশ্যে মার্কিন নীতিকে সমালোচনা করে। এ বিষয়গুলি পাকিস্তানের অভ্যান্তরীণ রাজনীতিতে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া ফেলে।

এ সময় কমিউনিস্ট আন্দোলনের আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত বিতর্কের ঢেউ পাকিস্তানের বাম রাজনীতিকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। এ মতাদর্শগত বিতর্কের ফলাফল হিসাবে ১৯৬৪ সালেই পূর্ব পাকিস্তানের বাম রাজনীতি ভিতরে ভিতরে দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ দ্বিধা-বিভক্তির প্রতিফলন হিসাবে ১৯৬৫ সালের গোড়ার দিকেই বাম ছাত্রসংগঠন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন দ্বিখন্ডিত হয়ে পড়ে। মওলানা ভাসানী প্রকাশ্যেই ভারত-মার্কিন আঁতাতকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন এবং পাক-চীন বন্ধুত্বকে অভিনন্দিত করেন। এরকম একটি পর্যায়েই সংঘঠিত হয় পাক-ভারত যুদ্ধ।

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের কাছে পাকিস্তানের ওপর ভারতের আগ্রাসন হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। সমগ্র পাকিস্তানের জনসাধারণের মধ্যে ভারত-বিরোধী মাতম সৃষ্টি হয়। লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী যুবক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার লক্ষ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বেচ্ছাসেবক দলে নাম লেখায়। চীনপন্থী রাজনীতিবিদগণ এ যুদ্ধকে পাকিস্তানের ওপর ভারতের আগ্রাসন বলে বর্ণনা করেন এবং উদাত্ত কন্ঠে আইয়ুবের হাতকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান। কোন কোন চীনপন্থী বাম নেতা আইয়ুব খানকে জাতীয় বীর উপাধিতে ভূষিত করেন। এভাবে ব্যাপক সমর্থন ও গণজোয়ারের মধ্য দিয়ে পাক-ভারত যুদ্ধের অবসান ঘটে। যুদ্ধ শেষে এই ভারত-বিরোধী গণজোয়ার যেমন স্তিমিত হয়ে আসে, তেমনই আবেগের পর্যায় থেকে সাধারণ মানুষ হিসাব-নিকাশের যায়গায় ফিরে আসেন। হিসাব-নিকাশে দেখা যায় যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান ছিল একেবারেই অরক্ষিত। যুদ্ধ চালানোর মত পূর্ব পাকিস্তানে কোন সামরিক প্রস্তুতিই ছিল না। দ্বিতীয় উপলব্ধি হয়, পূর্ব পাকিস্তান কার্যত ভারতের করুণার কারণে রক্ষা পেয়েছিল। এ বিষয়টি আওয়ামী লীগ এক বিবৃতির মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে। এর পরবর্তীকালে আরো নিখুতভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করে আওয়ামী লীগ অভিমত প্রকাশ করে যে, পূর্ব পাকিস্তানকে কেন্দ্রীয় সরকার তার একটি উপনিবেশের অতিরিক্ত কিছু ভাবে না। আর তাই পূর্ব আঞ্চলিক

Dhaka University Institutional Repository

স্বায়ত্তশাসন ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের অস্তিত্ব আর কোনভাবেই রক্ষা করা সম্ভব নয়। এ বক্তব্যই পরবর্তীকালে শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক ৬-দফা আকারে উপস্থাপিত হয়।

শেখ মুজিবের ৬-দফা কর্মসূচী সম্পর্কে সরকার ও বামপন্থীদের একাংশের মধ্য থেকে বেশ কিছু বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য প্রকাশ করা হয়। আইয়ুব সরকার সুস্পষ্টভাবে একে পাকিস্তান ভেঙ্গে ফেলার উদ্দেশ্যে প্রণীত বলে অভিমত প্রকাশ করে। দ্বিধা-বিভক্ত কমিউনিষ্ট পার্টির পিকিংপন্থী অংশ এবং মওলানা ভাসানী একে সি.আই. এ-এর চক্রান্ত হিসাবে আখ্যায়িত করেন। এসব কারণে বেশ বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। উক্ত ৬-দফা কর্মসূচীকে মনে মনে সমর্থন করলেও শ্রেণী ও পেশার মানুষের কোন দাবি নেই - এ অভিযোগ এনে কমিউনিষ্ট পার্টির মস্কোপন্থী অংশও প্রকাশ্যে এ কর্মসূচীকে সে সময় সমর্থন করেনি। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে এ কর্মসূচী অভূতপূর্ব সাড়া জাগায়। বিশেষ করে, মধ্যবিত্ত, বাঙ্গালী শ্রমিকশ্রেণী এবং উঠতি শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর মধ্যে উক্ত ৬-দফা কর্মসূচীর আবেদন ছিল অত্যন্ত গভীর।

যে সময় ৬-দফা কর্মসূচী প্রদান করা হয় তখন পূর্ব বাংলার অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের পরিমাণ বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে, বাঙ্গালীদের অসংখ্য ছোট ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগ গড়ে উঠেছে, ছোট ও মাঝারি শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটি শ্রেণীগত আকাংখা সুস্পষ্ট রূপ নিয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে অবাঙ্গালীদের সাথে বাঙ্গালী শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। ব্যাংক-বীমা ক্ষেত্রে প্রধান কয়েকটি অবাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বাঙ্গালী জনসাধারণের অসংখ্য ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। আন্ত-আঞ্চলিক ও বৈদেশিক বাণিজ্যের সাথেও কিছু কিছু বাঙ্গালী পরিবার যুক্ত হতে শুরু করেছে। একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাঙ্গালী সামরিক ও বেসামরিক সরকারী চাকরিতে অংশগ্রহণে সক্ষম হয়েছেন, কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে বাঙ্গালীরা ছিল অবাঙ্গালীদের অধীনস্ত ও দুর্বল। পক্ষপাতদুষ্ট সরকারী নীতি বাঙ্গালীদেরকে এগিয়ে যেতে বাধা দিয়েছে। বাঙ্গালীদের আত্মবিকাশের আকাংখা প্রতিটি ক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। চাকরি, ব্যবসা কিংবা শিল্পপ্রতিষ্ঠায় যেমন অবাঙ্গালীদের আধিপত্য ছিল, তেমনই রাজনীতি ক্ষেত্রেও অবাঙ্গালীদের ছিল অবাধ ক্ষমতা। আর সমাজব্যবস্থা আমলাতন্ত্র দ্বারা এত প্রচন্ডভাবে নিয়ন্ত্রিত হত যে, পূর্ব পাকিস্তানের সরকার চাইলেও উক্ত আমলাতন্ত্রের বিরোধিতা কিংবা হস্তক্ষেপের কারণে তা সে কার্যকরী করতে পারত না। উপরন্তু, পূর্ব পাকিস্তানের সরকার ছিল কেন্দ্রীয় সরকারেরই প্রতিনিধি। তাদের নিজস্ব কোন স্বকীয়তা ছিল না। এরা ছিল তীব্রভাবে বাঙ্গালী স্বার্থের বিরোধী ও গণনিপীড়ক। সমাজের ওপর যে অবাঙ্গালী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের একচেটিয়া শোষণ চলছিল তাকে নিরাপত্তা দান করাই ছিল এ সরকারের প্রধান কাজ। তখন কেন্দ্রীয় সরকারের স্বার্থের পরিপন্থী কোন ভূমিকা গ্রহণ করা প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে স্বাভাবিকভাবে সে সময়ের গঠনতন্ত্রের অধীনে থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বিকাশের কোন সম্ভাবনা নেই - একথাটি সাধারণ মানুষের কাছে ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। এরকম একটি পর্যায়ে শেখ মুজিবের ৬-দফা কর্মসূচী ব্যাপক সাধারণ মানুষের চেতনাকে প্রচন্ডভাবে নাড়া দেয়। ৬-দফা কর্মসূচীতে আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে কোন দাবি না থাকলেও যেহেতু তারা অবাঙ্গালী মালিক ও কর্মকর্তাদের দ্বারা বিশেষভাবে নির্যাতিত হয়ে আসছিল সেহেতু তারা এ কর্মসূচীর মধ্যে কিছু আশার আলো দেখতে পায়। বৈদেশিক সম্পর্ক ও প্রতিরক্ষা ছাড়া সকল ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের কাছে হস্তান্তরের দাবি ৬-দফাতে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার কারণে খোদ কৃষক-জনতাও এ কর্মসূচীর মধ্যে নিজের মুক্তির স্বপ্ন দেখতে পেয়েছিল। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় সরকার উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল যে, ৬-দফা কার্যকরী হওয়ার অর্থই হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর কেন্দ্রের প্রত্যক্ষ শাসনের অবসান। কেননা ৬-দফায় মুদ্রার মত বিষয়কেও প্রাদেশিক সরকারের আওতায় নেওয়ার কথা বলায় পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বৃত্ত পাচারের বৈধ পথের অবসান ঘটার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল-যা কেন্দ্রীয় সরকারের তথা পাকিস্তান রাষ্ট্রের সামাজিক ভিত্তিকেই বিনষ্ট করে দিতে পারে। এ আশংকা থেকেই পাকিস্তান রাষ্ট্র ও তার প্রতিনিধি জেনারেল আইয়ুব খানের সরকার ৬-দফা কর্মসূচীকে খুবই গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে এবং ৬-দফা কর্মসূচীর প্রণেতা শেখ মুজিব ও তার দল আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে এক ধরনের যুদ্ধ ঘোষণা করে। ৬-দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ যে সব কর্মসূচী গ্রহণ করে সে সবকে নির্মমভাবে প্রতিহত করার পন্থা গ্রহণ করা হয়। ১৯৬৬ সালের ৭ই জুনের হরতাল প্রায় কোন পিকেটিং ছাড়াই পালিত হয়ে যায়, অথচ বিনা উস্কানিতে পুলিশ বাহিনী শ্রমিকদের শোভাযাত্রাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে এবং শেষ পর্যন্ত গুলী বর্ষণ করে। এ গুলী বর্ষণের ফলে এ দিন দুই যায়গায় মোট ১১ জন শ্রমিক ও গরীব মানুষ নিহত এবং অসংখ্যজন গুলীবিদ্ধ হয়। এতেও ক্ষান্ত না হয়ে সরকার শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগের সকল নেতৃবৃন্দ ও শত শত কর্মীকে গ্রেফতার করে। রাষ্ট্রের মৌলিক নীতি বিষয়ক এ ধরনের একটি কর্মসূচীকে সামনে রেখে আওয়ামী লীগ সেদিন যে আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল তার পিছনে তাদের তেমন কোন পরিকল্পিত সাংগঠনিক প্রস্তুতি ছিল না। আর তাই এক সাথে প্রায় সকল নেতা গ্রেফতার হন। সে কারণেই ৭ই জুন হরতালের পরবর্তীকালে তাদের পক্ষে অনেকদিন আর কোন সম্পূরক কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। অবশ্য নতুন কোন আন্দোলণগত কর্মসূচী গ্রহণ করা না হলেও ৭ই জুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যে ৬-দফা সম্পর্কে যে ব্যাপক আগ্রহ সঞ্চারিত হয় তা তাদের মুখে মুখে আরও জোরেশোরে উচ্চারিত হতে থাকে।

এদিকে পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে এদেশের বাম রাজনীতিতে ব্যাপক ধরনের বিভ্রান্তি দেখা দেয়। আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের মতাদর্শগত মহাবিতর্ককে কেন্দ্র করে যারা পিকিং -এর লাইনকে সমর্থন করেন তারা ক্রমাগত আইয়ুব সরকারের প্রতি দুর্বল হয়ে উঠতে থাকেন। আইয়ুবের প্রতি এ দুর্বলতার কারণেই পিকিংপন্থীরা আইয়ুব সরকার - বিরোধী কোন কার্যকর সংগ্রাম গড়ে তোলার প্রচেষ্টা গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। তবে তারা রাজনৈতিক কর্মকান্ড থেকে পিছিয়ে থাকেনি। বাম রাজনৈতিক নেতারা ক্রমশঃ রাজনৈতিক সংগ্রাম গড়ে তোলার পরিবর্তে শ্রমজীবী মানুষকে সংগঠিত করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। তারা শিল্প অঞ্চলে শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা, বিশেষতঃ বেতন বৃদ্ধির আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য জোর প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। চীনপন্থী বাম রাজনৈতিক কর্মীরা শ্রমিকদেরকে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করতে সক্ষম না হলেও শ্রমিকশ্রেণীর অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া নিয়ে ব্যাপকতর আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। অন্যদিকে, স্বয়ং মওলানা ভাসানী এক বিশাল কর্মী বাহিনী নিয়ে কৃষকদের আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক তৎপরতা শুরু করেন। খাজনা, ট্যাক্স্, জমির ওপর সার্টিফিকেট মামলা জারি, জোতদারী-মহাজনী শোষণ, হাট ও ঘাটকে কেন্দ্র করে ইজারাদারী শোষণ, জলাকে কেন্দ্র করে ইজারাদারী ও মহাজনী শোষণ, অর্থকরী ফসলের মূল্যহীনতা ইত্যাদি সমস্যাকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপক গ্রামাঞ্চলে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আন্দোলন গড়ে ওঠে। কোথাও কোথাও এসব আন্দোলন জঙ্গী রূপ লাভ করে। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে এ কৃষক আন্দোলন জাতীয় রাজনীতিতে তেমন কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়নি বটে, কিন্তু জাতীয় রাজনীতিতে এর পরোক্ষ প্রভাব ছিল অপরিসীম। কেননা কৃষক আন্দোলন করতে

Dhaka University Institutional Repository

গিয়ে যতই জোতদার-মহাজনকে সামনে আনার চেষ্টা করা হোক না কেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃষক আন্দোলনগুলি সংগঠিত হয়েছে আমলাতন্ত্র ও তাদের গ্রামীণ প্রতিনিধি মৌলিক গণতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে। কৃষক সমাজের সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও এ সকল কৃষক আন্দোলনের ভূমিকা ছিল প্রচুর। মওলানার কৃষক আন্দোলনের মূল রূপ ছিল বিশাল বিশাল জমায়েত এবং তাতে নেতৃবৃন্দের অনলবর্ষী বক্তৃতা। কৃষকের কি নেই তার এক দীর্ঘ তালিকা এবং সেই সাথে জোতদার-মহাজন ও ধনি ব্যবসায়ীদের অত্যাচারের বিস্তারিত বিবরণ। নিঃসন্দেহে বলা যায়, পাক-ভারত যুদ্ধের পরবর্তী তিন বছরের এ কৃষক আন্দোলনে গ্রামীণ সমাজে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এ কৃষক আন্দোলনের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল শ্রেণী ঘৃণার উদ্রেক করা। এটাই ছিল এ আন্দোলনের মূল দুর্বলতা। সমাজ জীবনের কোন কিছুই শ্রেণী স্বার্থের উর্ধে নয় এটা যেমন ঠিক, তেমনই সমাজের মূল দ্বন্দ্বকে উপেক্ষা করে অপ্রধান বিষয়সমূহকে বেশি বেশি সামনে আনলে তাতে প্রধান দ্বন্দ্বের বিরোধী শক্তিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়- মাও সেতুঙ এর এই বহুল প্রচারিত ধারণাকে মাও সেতুঙ চিন্তা ধারার অনুসারিগণই তখন ভুলে বসেন। বাঙ্গালী জাতি যে সেদিন এক নির্মম জাতীয় নিপীড়নের শিকার হয়েছিল, একথা যেন ভাসানী ন্যাপ ও তাঁর অনুসারিগণ অনুভব করতে ব্যর্থ হন। যেখানে দেশের অর্থনীতির প্রধান খাতগুলির অধিকাংশই ছিল অবাঙ্গালীদের দখলে, যেখানে চরমতম এক বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে পূর্ব বাংলার ওপর ঔপনিবেশিক ধরনের শাসন শোষণ চালানো হচ্ছিল এবং যেখানে গ্রাম-শহরের কিছু টাউট ও সুবিধাভোগী দালাল গোষ্ঠী ছাড়া বাঙ্গালী জনসাধারণের কোন অংশের মধ্যেই সরকারের কোন ভিত্তি ছিল না, সেখানে বিদেশী পুঁজির ওপর নির্ভরশীল আমলা ধনিক গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষাকারী সরকার ও অত্যাচারী রাষ্ট্রকে আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্যবস্তু না ধরে শুধুমাত্র কৃষক-জনতার ওপর জোতদার-মহাজন-বিরোধী সংগ্রাম করতে গেলে সে আন্দোলন কোনভাবেই গণভিত্তি পেতে পারে না। কেননা, স্বয়ং ক্ষুদে ও মাঝারি কৃষকও তার অস্তিত্বের সংকট থেকেই সেদিন উপলব্ধি করতো অবাঙ্গালী নিয়ন্ত্রিত বাজার ব্যবস্থার কাছে তারা কি সাংঘাতিকভাবে বন্দী এবং এক্ষেত্রে একজন ধনি কৃষকের সাথে তাদের কোন পার্থক্য নেই। তাই ব্যাপক কৃষক-জনতার ওপর জোতদারী-মহাজনী শোষণ বিরোধী সংগ্রামকে যদি আঞ্চলিক আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সাথে যুক্ত করা না যায় তাহলে শোষিত কৃষক-জনতা উক্ত আন্দোলনে সাড়া দিতে পারে না। বহুদিন পর্যন্ত মওলানা ভাসানী ও তাঁর পিকিংপন্থী অনুসারিগণ এ বিষয়টি বুঝতে পারেননি। ফলে অক্লান্ত পরিশ্রম করেও দেশব্যাপী কোন কার্যকরী আন্দোলন গড়ে তোলা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে এ কৃষক আন্দোলনের প্রভাবেই গ্রামের কৃষক-জনতা জাতীয় আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত হয়ে যায়। এই কৃষক আন্দোলনের কারণেই আইয়ুব সরকারের গ্রামীণ প্রতিনিধি মৌলিক গণতন্ত্রী ও তার সহযোগীরা কৃষক-জনতা থেকে ব্যাপকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

শুধু শ্রমিক ও কৃষকদের ওপরই নয়, পাকিস্তান রাষ্ট্র গোটা দেশের ওপর তার চূড়ান্ত ধরনের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বকে স্থায়ী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল কর্মকান্ডই পরিচালনা করে। দেশের বুদ্ধিজীবী সমাজের কণ্ঠ রোধ করার জন্য খুবই অগণতান্ত্রিক ও নিপীড়নমূলক প্রচার ও প্রকাশনা আইন জারী করে। ফলে সরকারের প্রতি সামান্যতম সমালোচনামূলক সংবাদ, কাহিনী কিংবা নাটক, এমন কি চিত্রাংকন প্রকাশ করাও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ওপর এমন ধরনের কালাকানুন জারি করা হয় যে, সরকার ইচ্ছা করলে যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন শিক্ষককে যে কোন সময় পদচ্যুত করতে পারতেন। সরকারী, আধা-সরকারী, এমনকি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে এমন ধরনের কালাকানুন প্রবর্তন করা হয় যে, এ সকল প্রতিষ্ঠানের সাধারণ কর্মচারীরা পর্যন্ত তাদের নিজস্ব সমস্যার কথা কাউকে জানাতে পারতো না। কর্মচারীদের যে কোন দাবি, যে কোন সভা কিংবা কোন ধরনের শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ পর্যন্ত নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। উপরন্তু, ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধকে কেন্দ্র করে দেশে যে জরুরী আইন চালু হয়েছিল তা ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এ সময়ে কার্যত সকল ধরনের রাজনৈতিক কর্মকান্ডই বে-আইনী বলে গণ্য হয়। ফলে দেশের প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার বলতে এ সময়ে কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিলনা। সরকারের এ কালাকানুন ছাত্র সমাজকে সবচেয়ে বেশি বন্দী করে রাখে।

জেনারেল আইয়ুব ক্ষমতাসীন হয়েই এমন একটি শিক্ষানীতি চালু করেন যে, ছাত্র সমাজের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সাংঘাতিকভাবে সংকুচিত হয়ে পড়ে। উপরন্তু, ছাত্র সমাজকে উপলক্ষ করে এমন সব কালাকানুন ও বিধি-নিষেধ জারি করা হয় যে, সাধারণ নাগরিক হিসাবে ন্যূনতম মৌলিক অধিকার ভোগ করার কোন ব্যবস্থা থাকে নি। ফলে ছাত্র সমাজ অচিরেই উপলব্ধি করে যে, দেশের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান না হলে ছাত্রদের সমস্যা তথা শিক্ষা ও মৌলিক অধিকার বিষয়ক কোন সমস্যারই সমাধান সম্ভব নয়। এ উপলব্ধি ব্যাপক সাধারণ ছাত্র সমাজের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং ছাত্র সমাজের আন্দোলন খুব শীঘ্র শিক্ষা সমস্যার গন্ডি পেরিয়ে জাতীয় আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। ছাত্র সমাজকে দমন করার জন্য সরকার রাষ্ট্রীয় পুলিশ বাহিনীর পাশাপাশি পরিকল্পিতভাবে শক্তিশালী গুন্ডাবাহিনী গড়ে তোলে। সরকার খুব স্থূলভাবে গুন্ডাদের এ কার্যকলাপকে সমর্থন করতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর মোনায়েম খান স্বয়ং গুন্ডাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বলে পরিগণিত হন। ফলে জনসাধারণের মধ্যে সরকারের গ্রহণযোগ্যতা বলতে আর কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকে নি।

এদিকে, ১৯৬৬ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে রাজনৈতিক দল হিসাবে আওয়ামী লীগ ও তার নেতা-কর্মীদের ওপর এমন তীব্র আক্রমণ শুরু হয় যে, আওয়ামী লীগের পক্ষে দৈনন্দিন কর্মকান্ড চালিয়ে যাওয়াও অসম্ভব হয়ে পড়ে। শেখ মুজিবসহ প্রায় সকল নেতার নামে বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা মামলা রুজু করা হয়। অধিকাংশ নেতাকে দীর্ঘদিন ধরে আটকে রাখার পরও যখন দেখা গেল সমগ্র জনসাধারণের মধ্যে আওয়ামী লীগের প্রভাব ক্রমাগত বেড়েই চলেছে, তখন সরকার ভিন্ন পথের আশ্রয় নেয়। বন্দী অবস্থাতেই শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে দেশদ্রোহিতার মামলা দায়ের করা হয়। এর সাথে বেশ কিছু সামরিক-বেসামরিক বাঙ্গালীকে জড়িত করা হয়। প্রায় এক বছর ধরে এ মামলার বিবরণ সংবাদপত্র ও বিভিন্ন প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে ফলাও করে প্রচার করা হয়। এ মামলার শুরুতে সমগ্র রাজনৈতিক অঙ্গনে এক বিস্ময়কর নীরবতা বিরাজ করে, কিন্তু যতই দিন যেতে থাকে ততই এটা যে একটি পাতানো ব্যাপার তা সমগ্র জনসাধারণের কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে শেখ মুজিব আত্মপক্ষ সমর্থন করে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণধর্মী ভাষণ দেন। এ ভাষণের অনুলিপি হাজার হাজার সংখ্যা বিলি হয়। মামলা পরিচালনার জন্য জনসাধারণের কাছে অর্থ সাহায্যের আহ্বান জানানো হয়। জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেয়। অচিরেই সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, শেখ মুজিবকে এক মারাত্মক ধরনের সাজা দেওয়ার লক্ষ্যেই এ মামলা পাতানো হয়েছে। ফলে দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষের মনে শেখ মুজিবের প্রতি এক বিশেষ ধরনের সহানুভূতির সৃষ্টি হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ইতিমধ্যে পিকিংপন্থী বাম-রাজনৈতিক দল ইপিসিপি (এম-এল) ও আইয়ুব সরকার সম্পর্কে সকল ধরনের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ন্যাপ (ভাসানী) ও তার সহযোগী গণসংগঠনগুলি বিভিন্ন আন্দোলনে আপোসহীন ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। এ পর্যায়ে জেনারেল আইয়ুব খোলাখুলিভাবে বামপন্থীদের সমালোচনা শুরু করেন। মস্কোপন্থীদের মধ্যে আন্দোলনের ধরন নিয়ে মত-বিরোধ থাকলেও আইয়ুব সরকার সম্পর্কে কখনও কোন দুর্বলতা ছিল না। এ সময় অবাঙ্গালী শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের অব্যাহত আধিপত্যের কারণে পুঁজিবাদ সম্পর্কে সমাজে একটি সাধারণ নেতিবাচক মনোভাব গড়ে ওঠে। আওয়ামী লীগের মধ্যেও এর প্রভাব পড়ে। আওয়ামী লীগ তখন উদার বাজার ব্যবস্থার পরিবর্তে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে উক্ত তিনটি রাজনৈতিক ধারার মধ্যে একটি কার্যকরী ঐক্য গড়ে ওঠার ভিত্তি রচিত হয়। অর্থনীতি সম্পর্কে আওয়ামী লীগের এ পরিবর্তনের কারণে উহার গণসংগঠনগুলির মধ্যেও নতুন চেতনার জন্ম হয়। বিশেষতঃ ছাত্র ও শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র তৈরি হয়। ছাত্র সমাজের ১১ দফা কর্মসূচী এ ক্ষেত্রকে আরো সম্প্রসারিত করে। এই ১১-দফার ভিত্তিতেই ছাত্র সমাজ কিছু দিনের জন্য হলেও সমগ্র আন্দোলনের নেতৃত্ব দানে সক্ষম হয়।

পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে যেসব দল সামন্ত শ্রেণীর প্রতিভূ সেসব দলও ষাট দশকের গোড়ার দিকে তেমন কোন ভূমিকা পালন না করলেও শেষের দিকে আইয়ুব সরকারের পতনের আন্দোলনে শরিক হয়। সামন্তশ্রেণীর ওপর আইয়ুব সরকারের নির্মম আঘাত এদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তোলে। কেননা, এ শ্রেণী দীর্ঘদিন ধরে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে যে আধিপত্য বজায় রেখেছেন এ সময় আর তা বজায় থাকেনি, বিকল্প শক্তি হিসাবে বৃহৎ শিল্পপতি শ্রেণী ক্রমাগত তাদের স্থান দখল করে নিতে থাকে। আর এটাই হচ্ছে এসব রাজনৈতিক দলের আইয়ুব সরকার-বিরোধিতার মূল কারণ। এ ধরনের নেতিবাচক অবস্থান থেকে সামন্তশ্রেণীর দলগুলি আইয়ুব সরকার বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল সত্য, কিন্তু এদের অংশ গ্রহণের ফলে আন্দোলনে খুব শক্তি বৃদ্ধি না হলেও আইয়ুব সরকারের পক্ষে এ সকল শক্তিকে আর কাজে লাগানো যায়নি। অন্যদিকে, কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত ও ছোট শিল্পপতি শ্রেণী তাদের অস্তিত্বের কারণেই আইয়ুব সরকার বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। এসকল শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলসমূহ স্বাভাবিকভাবেই এ আন্দোলনে শরিক হয়। তবে সকল শ্রেণীর আন্দোলনে অংশগ্রহণের পটভূমি অভিন্ন ছিল না।

পশ্চিম পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয় ও বিদেশী পুঁজির ওপর নির্ভরশীল বড় শিল্পপতি গোষ্ঠী ষাটের দশকের শেষ দিকে তাদের শিল্প-কারখানায় উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার শুরু করে। ফলে একদিকে যেমন ধোপদুরস্ত শ্রমিকদের (white colour labour) জন্য নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হয়, অন্যদিকে হাজার হাজার শ্রমিক-কর্মচারী বেকার হয়ে পড়ে। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ শ্রমিকরা তাদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই এক প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে। পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহৎ শিল্পগুলিতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলির ওপরও এক দারুণ প্রতিক্রিয়া পড়ে। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারকারী বৃহৎ কারখানাগুলির সাথে প্রতিযোগিতায় হেরে ছোট ও মাঝারি কারখানাগুলি ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। ১৯৬৭ সালের পর থেকে শত শত কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলেও হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হয়। ছোট ও মাঝারি শিল্পের মালিকগণও তাদের শ্রেণী-অস্তিত্ব বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়। পূর্ব পাকিস্তানের মত পশ্চিম পাকিস্তানেও গণবিরোধী শিক্ষানীতি, বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স, প্রচার ও প্রকাশনা আইন এবং অন্যান্য নিবর্তনমূলক কালাকানুনকে মোকাবিলা করতে ছাত্র, শিক্ষক ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবী জনগোষ্ঠী ব্যাপকভাবে সরকারের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন।

পশ্চিম পাকিস্তানেও শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর মধ্যে বৃহৎ কয়েকটি পরিবার এমনভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে, তারাই অন্যান্য সকল শ্রেণী ও স্তরের জনসাধারণের উন্নয়নের প্রধান প্রতিবন্ধক হিসাবে পরিগণিত হতে থাকে। এরকম একটি পরিস্থিতে বাম-চিন্তা তথা সমাজতান্ত্রিক চেতনা বিকাশের জন্য খুবই উপযোগী। সরকার এ সময় রাষ্ট্রযন্ত্রের সকল শক্তিকে ব্যবহার করে এই বৃহৎ শিল্প মালিক শ্রেণী ও বড় ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা করতে থাকে। ফলে রাষ্ট্র পশ্চিম পাকিস্তানেও তার চরমতম নির্যাতনমূলক চেহারা নিয়ে জনসাধারণের সামনে আবির্ভূত হয়। আর জনসাধারণের ব্যাপক অংশ শত অত্যাচার-নির্যাতনকে অস্বীকার করে সরকারের বিরুদ্ধে আপোসহীন আন্দোলনে শামিল হন। আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে এক পর্যায়ে ব্যাপক আক্রমণাত্মক রূপ লক্ষ্য করা যায়। আর এভাবেই গড়ে ওঠে পাকিস্তানের দুই অংশের জনসাধারণের মধ্যে এক ঐতিহাসিক ঐক্য; সংঘটিত হয় আইয়ুব সরকারবিরোধী এক বৈপ্লবিক গণঅভ্যুত্থান।

পাকিস্তানের উভয় অংশের জনসাধারন এক সাথে আইয়ুব সরকারবিরোধী ব্যাপকতর আন্দোলনে অবতীর্ণ হলেও পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের অংশগ্রহণ থেকে পূর্ব পাকিস্তানীদের অংশগ্রহণের একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। পূর্ব পাকিস্তানীরা শুধু বৃহৎ শিল্পপতি ও বড় ব্যবসায়ীদের একচেটিয়া শোষণ কিংবা উক্ত শোষণের প্রতিভূ পাকিস্তান রাষ্ট্রের নিপীড়নমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেনি, তাদের অংশগ্রহণের শিকড় ছিল আরো গভীরে। দীর্ঘদিন ধরে আঞ্চলিকভাবে বৈষম্যমূলক নীতির শিকার হয়ে পূর্ব পাকিস্তানীদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অর্জনের এক প্রবল আকাংখা, আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবের ৬-দফা কর্মসূচীর মধ্যে সে আকাংখার সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটে।

জনসাধারণের ওপর অন্যায় শোষণ ও অগণতান্ত্রিক শাসনবিরোধী সংগ্রামের ক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তানীদের আন্দোলন ছিল অনন্য। পূর্ব পাকিস্তানে এ আন্দোলনের পটভূমি নির্মাণের ক্ষেত্রে অব্যাহত কৃষক আন্দোলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। আর সে কারণেই পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব সরকারবিরোধী আন্দোলন শহরে সীমিত থাকেনি, তা' সমগ্র প্রদেশব্যাপী গ্রাম-শহরের ব্যাপক জনতার ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে পরিণত হয়েছিল। আর এ ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের এক পর্যায়ে এ আন্দোলন আইয়ুব সরকারবিরোধী সংগ্রামের লক্ষ্যমাত্রাকে অতিক্রম করে সামগ্রিক রাষ্ট্র-বিরোধী সংগ্রামে রূপান্তরিত হতে থাকে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের অনুগত ও সহযোগী শ্রেণীসমূহের বিরুদ্ধে এমন ব্যাপকতর আন্দোলনের সূত্রপাত হয় যে, সমগ্র গ্রামাঞ্চল তো বটেই, শহরাঞ্চলের ব্যাপক অঞ্চলের ওপর রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ বলতে যা বোঝায় তার কোন অস্তিত্ব ছিল না। আর এ সামগ্রিক রাষ্ট্র-বিরোধী সংগ্রাম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করেছিল ছাত্র সমাজের বৈপ্লবিক ১১-দফা কর্মসূচী। ১১-দফা কর্মসূচীর মধ্যে এমন কিছু দাবি সংযোজিত হয়েছিল যা বিদ্যমান রাষ্ট্রব্যবস্থাকে না ভেঙ্গে কোনভাবেই অর্জন করা সম্ভব ছিল না। মওলানা ভাসানীর আপোসহীন ও দৃঢ় নেতৃত্ব এ রাষ্ট্র-বিরোধী সংগ্রামকে ব্যাপক গভীরতা দান করে। রাষ্ট্র বিরোধী এ ব্যাপক গণসংগ্রাম যখন রাষ্ট্রের অনুগত শ্রেণীসমূহের ওপর আঘাতের পর আঘাত হানতে থাকে, জনসাধারণকে প্রতিহত করার কোন ক্ষমতাই তাদের অবশিষ্ট থাকেনি, রাষ্ট্রীয় প্রশাসনও তাদের নিরাপত্তা দিতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়, স্বয়ং শেখ মুজিব বার বার শান্তির আহবান জানানো সত্ত্বেও যখন এ আন্দোলন ক্রমবর্ধমান হারে সারা পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে

Dhaka University Institutional Repository

থাকে তখনই জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। তবে জনসাধারণের এ সামগ্রিক রাষ্ট্র-বিরোধী আন্দোলনকে উৎসাহিত করার পক্ষে ১১-দফা কর্মসূচী আর মওলানা ভাসানীর নেতৃত্ব থাকলেও ছাত্র সমাজ কিংবা মওলানা ভাসানী অথবা অন্য কোন বাম রাজনৈতিক দলের ক্ষমতা দখলের কোন লক্ষ্য ছিল না। আর সে কারণেই প্রচন্ড গতি নিয়ে যে ব্যাপকতম রাষ্ট্র-বিরোধী সংগ্রাম দেশব্যাপী বিস্তার লাভ করেছিল তা একটি সামরিক শাসনে পর্যবসিত হয়েছিল। তবে এ গণঅভ্যুত্থান জনসাধারণকে এমন এক বিজয়ের আনন্দ উপহার দিয়েছিল, জনসাধারণের ক্ষমতা সম্পর্কে এমন মূল্যবান অভিজ্ঞতা তাদের দান করেছিল যা থেকে মাত্র ২ বছরের মধ্যে পাকিস্তান সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে নির্বিঘ্নে তারা অস্ত্র হাতে যুদ্ধে লিপ্ত হতে সক্ষম হয়েছিল।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে নিম্নলিখিত কতকগুলি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়ঃ

(১) আন্দোলন হচ্ছে সংগঠিত জনগোষ্ঠীর এমন কতক সচেতন প্রয়াস যা' প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিদ্যমান সমাজ কাঠামোকে পরিবর্তনের লক্ষে ভূমিকা পালন করে। যখন কোন আন্দোলনে সংগঠিত জনগোষ্ঠীর বাইরে থেকে সাধারণ জনতার স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ঘটে তখন তা গণআন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। আর সংগঠিত জনগোষ্ঠীর দাবি যখন গণদাবিতে পরিণত হয় এবং সে গণদাবি পূরণের লক্ষ্যে উক্ত আন্দোলনে যখন ব্যাপক জনতার স্বতস্ফূর্ত ও সক্রিয় অংশগ্রহণ ঘটে এবং সেই স্বতস্ফূর্ত জনতাই যখন আন্দোলনের নিয়ামক উপাদানে পরিণত হয় তখনই একটি আন্দোলন গণঅভ্যুত্থান বলে পরিগণিত হতে পারে।

(২) সাধারণভাবে রাষ্ট্র যেকোন সমাজের প্রভুত্বকারী শ্রেণীসমূহের স্বার্থে সচেতনভাবে নির্মিত একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। অবনত শ্রেণীর ওপর শোষণমূলক সম্পর্ক চাপিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রকে সে নিশ্চিত করে। আর সে কারণেই রাষ্ট্র হচ্ছে শ্রেণী শোষণ ও শ্রেণী নিপীড়নের হাতিয়ার। উপনিবেশোত্তর দেশসমূহের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নতুন একটি বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। সমাজের অভ্যন্তরের উৎপাদন উপায়ের মালিকানার সাথে সম্পর্কিত কোন শ্রেণীর রাষ্ট্র গঠনে কোন ভূমিকা থাকেনা। ঔপনিবেশিক আমলে ঔপনিবেশিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সৃষ্ট রাষ্ট্র ব্যবস্থাটিই উপনিবেশোত্তর আমলেও কার্যতঃ টিকে থাকে। এর কারণ ত্রিবিধ ঃ

(ক) রাষ্ট্রের মূল ও স্থায়ী উপাদান সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের কোন মৌলিক পরিবর্তন হয়না।

(খ) রাষ্ট্রের স্থায়ী উপাদানের ওপর অস্থায়ী উপাদান তথা সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিভাগের কর্তৃত্ব থাকে খুবই সীমিত।

(গ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিভাগের প্রতিনিধিগণই আমলাতন্ত্রের শীর্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। কিন্তু তাদের সহযোগিতা করার মত শক্তিশালী কোন শ্রেণী না থাকার কারণে উক্ত প্রতিনিধিবর্গ আমলাতন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হন। এবং এভাবে তাঁরা নিজেরাই আমলাতন্ত্রের অংশে পরিণত হন।

উপরোক্ত কারণে উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্র উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত কোন শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকেনা। ফলে, শ্রেণীসমূহ রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে না, বরং রাষ্ট্রই তাদের নিয়ন্ত্রণ করে।

(৩) পাকিস্তানও ছিল একটি উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্র। শুরুতে সামন্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে নতুন রাষ্ট্রটি গঠিত হলেও ঔপনিবেশিক আমলের সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্র দ্রুতই পাকিস্তান রাষ্ট্রের মূল অংশে পরিণত হয়। সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রই পর্দার আড়ালে থেকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের নেতৃত্ব দিতে থাকে। নিজের সামাজিক ভিত্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যেই একটি শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর জন্ম দেয়। কিন্তু আমলাতন্ত্রের নিজস্ব ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উক্ত নব্য ধনিক শ্রেণীর বিকাশ বিদ্যমান সামাজিক শক্তির দৃঢ় অস্তিত্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ফলে ১৯৫৯ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে উক্ত সামাজিক শক্তির সরকার যখন রাষ্ট্রের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চলেছিল তখন সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র তা মেনে নেয়নি। বরং তারাই রাষ্ট্রের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে ওঠে।

(৪) ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের সামন্ত শ্রেণী ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের মধ্যকার দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ। পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি প্রচন্ড ক্ষোভ থাকলেও তখন পর্যন্ত এখানে এমন কোন শ্রেণীর জন্ম হয়নি যা সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় লিপ্ত হতে পারে। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের বিশেষ কোন শ্রেণীর ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সামরিক শাসনের কোন প্রয়োজন ছিলনা। বরং পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য দেখা দেয় তা সামরিক শাসনকে যৌক্তিক করে তুলতে সাহায্য করে। অবশ্য, পূর্ব পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নৈরাজ্য সৃষ্টির জন্য সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের চক্রান্ত্য কম দায়ী ছিলনা।

(৫) সামরিক আইন জারী করার পর সামরিক আমলাতন্ত্র তার সপক্ষে একটি দৃঢ় সামাজিক ভিত্তি গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করে। পূর্ব পাকিস্তানী সমাজ তখন এত পশ্চাদপদ ছিল যে, এখানকার কোন শ্রেণীর ওপর নির্ভর করে সামরিক-আমলাতন্ত্রের সামাজিক ভিত্তি গড়ে ওঠা অসম্ভব ছিল। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন শ্রেণীকে নিয়েই পাকিস্তান রাষ্ট্রের সামাজিক ভিত্তি গড়ে তুলতে হয়েছিল। বিদেশী পুঁজি ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত পুঁজির ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা শিল্প পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ী শ্রেণীই ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রধান সামাজিক ভিত্তি। উক্ত সামাজিক ভিত্তিকে আরো সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বী সামন্ত শ্রেণীকে দুর্বল ও ক্ষতিগ্রস্থ করার প্রয়োজনে পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যাপক কৃষি ও ভূমি সংস্কার করা হয়। তারই ফলশ্রুতিস্বরূপ পশ্চিম পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলে গড়ে ওঠে একটি শক্তিশালী গ্রামীন বুর্জোয়া শ্রেণী। শহরের শিল্পপতি ব্যবসায়ী শ্রেণীর আধিপত্য ছিল পাকিস্তানের উভয় অংশে, আর উক্ত গ্রামীন বুর্জোয়া শ্রেণীর আধিপত্য ছিল শুধু পশ্চিম পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলে সীমাবদ্ধ। এই শিল্পপতি-ব্যবসায়ী শ্রেণী আর গ্রামীন বুর্জোয়া শ্রেণীই ছিল আইয়ুব সরকারের মূল সামাজিক ভিত্তি। এ দুটি শ্রেণীর ওপর নির্ভর করেই আইয়ুব সরকার পাকিস্তানের উভয় অংশের ব্যাপক জনসাধারণের ওপর স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল।

(৬) পূর্ব পাকিস্তানের মূল সমস্যা ছিল উৎপাদন ক্ষেত্রে সামগ্রিক পশ্চাদপদতা। আর এ পশ্চাদপদতার মূল কারণ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পাকিস্তান রাষ্ট্র ও তার সামাজিক শক্তি বৃহৎ শিল্পপতি-ব্যবসায়ী শ্রেণীর ঔপনিবেশিক চরিত্রের শোষণ। এই ঔপনিবেশিক চরিত্রের শোষণ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে পূর্ব-পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বিরোধী সংগ্রাম শুরু হয়। এ সংগ্রামে আপোষহীন থাকতে গিয়েই আওয়ামী লীগ থেকে মওলানা ভাসানী তার ব্যাপক সংখ্যক কর্মীসমর্থক নিয়ে বের হয়ে যান। কিন্তু এই ব্যাপক সংখ্যক কর্মী নিয়ে বের হয়ে গিয়ে আর যে সকল শক্তিকে নিয়ে মওলানা ভাসানী ন্যাপ নামক সর্ব পাকিস্তানভিত্তিক একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল গঠন করেন সেই দলটি সর্ব পাকিস্তানভিত্তিক হওয়ার কারণে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের রাজনীতিকে এককভাবে ধারণ করতে পারেনি। গোপন কমিউনিষ্ট পার্টিও তার শ্রেণীভিত্তিক রাজনীতি দিয়ে উক্ত সামাজিক আকাংখা পূরণ করতে সক্ষম হয়নি। উপরোন্তু, আর্ন্তজাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনে মতাদর্শগত মহাবিতর্কের ফলে

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বপাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। তার মধ্যে সাংগঠনিক দুর্বলতা দেখা দেয়। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বেঁচে থাকা পর্যন্ত আওয়ামী লীগও পূর্বপাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে তুলে ধরতে পারেনি। সেই জাতীয় আকাংখাকে আংশিকভাবে হলেও পূরণ করতে সক্ষম হয় ছাত্র সমাজ। আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচীর মধ্যে সে আকাংখার পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলন ঘটে।

(৭) ৬-দফা কর্মসূচী পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগায়। শিল্পাঞ্চলে অবাঙ্গালীদের আধিপত্যের হাত থেকে মুক্তির পথ হিসাবে শ্রমিক শ্রেণীর একাংশও ৬-দফাকে সমর্থন করে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বকে দুর্বল করে দিতে সক্ষম হবে বলে পূর্ব পাকিস্তানের সচেতন নাগরিক মাত্রই ৬-দফার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেন। কিন্তু গোপন কমিউনিষ্ট পার্টির পিকিংপন্থী অংশ ও ভাসানী ন্যাপ ৬-দফার বিরুদ্ধে নানা ধরণের সমালোচনা করে। ফলে তারা সঙ্গত কারণেই জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকেন। পিকিং পন্থী কমিউনিষ্ট পার্টি ও ভাসানী ন্যাপ বাঙ্গালীর জাতীয় আকাংখা ধারণ করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণেই তাদের সমর্থক ছাত্র সংগঠনের ওপর তারা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারেনি। তাদের সমর্থিত ছাত্র সংগঠন তথা ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) সরাসরি ৬-দফাকে সমর্থন না করলেও পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনসহ পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠার রাজনীতি গ্রহণ করে। উপরোন্তু, তাঁরা মাও-সেতুং চিন্তাধারার অনুসারী হওয়ায় পাকিস্তানের সামরিক-আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিপ্লবাত্মক সংগ্রামের আহবান জানাতে থাকে। আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রসংগঠন ছাত্র লীগ জাতীয়তাবাদী চিন্তায় এমনভাবে উদ্বুদ্ধ হয় যে তা উগ্র জাতীয়তাবাদের রূপ ধারণ করে। এরা যেকোনভাবে আইয়ুব সরকারের পতনের আন্দোলন অগ্রসর করে নেওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। দুটি ভিন্ন চেতনা থেকে ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) আর ছাত্র লীগ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এ দুটি ছাত্র সংগঠন সমান্তরাল একটি অবস্থান গ্রহণ করে। অন্যদিকে, ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) মতাদর্শগত কারণেই না পেয়েছে পাকিস্তান রাষ্ট্র বিরোধী একটি বিপ্লবী রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণ করতে, না পেরেছে উগ্র জাতীয়তাবাদী অবস্থান নিতে। ফলে সংগ্রামের পথ হিসাবে এটি অবিচলভাবে 'ধীরে চল' নীতি গ্রহণ করে।

ছাত্র ইউনিয়নের উভয় অংশ যে দুটি রাজনৈতিক দলের সমর্থক ছাত্র সংগঠন হিসাবে পরিচিত ছিল তাদের কেউ বাঙ্গালীর জাতীয় আকাংখাকে ধারণ করতে পারেনি, তথা পূর্ব পাকিস্তানের আত্মনিয়ন্ত্রণের সমস্যা পাকিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্র কাঠামোর অধীনে সমাধান করা সম্ভব নয়-এই দৃঢ় রাজনৈতিক অবস্থানটি তারা কেউ গ্রহণ করতে পারেনি। শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের নীতির প্রতি ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া) সমর্থন থাকার কারণে তারা বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতিও বিশেষ আগ্রহী হয়নি। ফলে এটি মস্কোপন্থী কমিউনিষ্ট পার্টি ও ন্যাপের (ওয়ালী) প্রতি অনুগত থেকেছে। আওয়ামী লীগের সমর্থক ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগও মূল দলের প্রতি অনুগত থেকেছে। তাছাড়া সে দলের মূল রাজনীতি ৬-দফা হওয়ার কারণে আওয়ামী লীগের প্রতি উহার সে আনুগত্য অনুপ্রেরণা হিসাবেই কাজ করেছে। উপরন্তু, আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব জেলে থাকায় এবং পরবর্তীকালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হয়ে তিনি মারাত্মক শাস্তির মুখোমুখি হওয়ার কারণে ছাত্রলীগ কর্মীরা মরিয়া হয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। আওয়ামী লীগের যে কোন আপোসমুখী প্রবণতাকেই তারা প্রত্যাখ্যান করে। এভাবে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের (মেনন) মধ্যে গড়ে ওঠে সংগ্রামী ঐক্য। এ দুটি ছাত্র সংগঠনের সংগ্রামী ও উগ্র মেজাজের সাথে ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) মাঝে মাঝে খাপ খাওয়াতে না পারলেও উহা ব্যাপক ছাত্র সমাজের ঐক্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়, ছাত্র সমাজের ব্যাপক ঐক্যের প্রশ্নে যার মূল্য ছিল অপরিসীম। এ তিনটি ছাত্র সংগঠনের যৌথ প্রচেষ্টায় ১১-দফা সম্বলিত এমন একটি কর্মসূচী প্রণয়ন করা সম্ভব হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের সকল পেশা, শ্রেণী ও গোষ্ঠীর স্বার্থকে তা তুলে ধরে। সর্বজন গ্রাহ্য ১১-দফা কর্মসূচী গ্রহণ করার কারণেই এ তিনটি ছাত্র সংগঠন ও ডাকসু নিয়ে গঠিত ছাত্র সংগ্রাম কমিটি (SAC) আইয়ুব সরকার বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী সংস্থায় পরিণত হয়।

(৮) পাকিস্তানের ব্যাপক জনসাধারণের ওপর অবাঙ্গালী শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের নিষ্ঠুর শোষণ নিপীড়ন এবং রাষ্ট্রীয় দমন-নির্যাতন পুরো দু'দশক ধরে চলছিল। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রের সামাজিক ভিত্তি হিসাবে কাজ করতে পারে এমন কোন শ্রেণী পূর্ব পাকিস্তানে জন্মলাভ করেনি। ফলে পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোর অভ্যন্তরে পূর্ব পাকিস্তানের সমাজে প্রধান দ্বন্দ্বটি জাতীয় দ্বন্দ্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ষাট দশকের শেষে প্রায় পাকিস্তানের পুরো রাষ্ট্রব্যবস্থাটিই পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মৌলিক গণতন্ত্রী নামে যে নির্বাচক মন্ডলীটি গড়ে তোলা হয় তা রাষ্ট্র প্রশাসনের আজ্ঞাবাহীর ভূমিকা পালন করতে গিয়ে দ্রুতই গণবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। গণবিচ্ছিন্ন এই মৌলিক গণতন্ত্রী ও স্থানীয় প্রশাসন গণরোষ প্রতিরোধের জন্য সামাজিক অপরাধীদেরও ব্যবহার করতে থাকে। চিহ্নিত গুন্ডা ও সামাজিক অপরাধীরা রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের আনুকুল্য পেয়ে স্থানীয় পর্যায়ে ব্যাপকভাবে ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে। ফলে সামাজিক অপরাধে দেশ ছেয়ে যায়। সামাজিক অপরাধীদের প্রতি গণরোষ ক্রমাগত রাষ্ট্রবিরোধী গণরোষে রূপান্তরীত হয়। ছাত্র সমাজের ১১-দফা কর্মসূচীর মধ্যে সেই ব্যাপক গণরোষের রাজনৈতিক বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তাই ১১ দফাই হয়ে ওঠে জনগণের গণ-সংগ্রামের রাজনৈতিক হাতিয়ার।

(৯) ৮টি রাজনৈতিক দল সমন্বয়ে 'ডাক' গঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে একথা পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল যে, সারা পাকিস্তানে আইয়ুব সরকারের পক্ষে দাঁড়ানোর মত কোন রাজনৈতিক শক্তি আর অবশিষ্ট নেই। কেননা, 'ডাক' এর বাইরে প্রধান যে দুটি দল ছিল তাদের মধ্যে পাকিস্তান পিপলস পার্টি আইয়ুব সরকারকে অপসারণের কর্মসূচী নিয়েই যাত্রা শুরু করেছিল। অন্যদিকে, ন্যাপ দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার পর থেকেই ভাসানী ন্যাপ আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম পরিচালনার জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক দেয়। ঐ ন্যাপের রাজনৈতিক আচরণে এ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ছাত্র ইউনিয়নের (মেনন) পক্ষ থেকে ক্রমাগত চাপ প্রদান একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রাখে। অন্যদিকে, আইয়ুব সরকার বামপন্থীদের প্রকাশ্যে সমালোচনা করতে থাকলে ভাসানী ন্যাপের আইয়ুব সরকার বিরোধী ভূমিকা আরো স্পষ্ট রূপ লাভ করে। ফলে দেশের রাজনৈতিক শক্তি বলতে সে সময় যাদেরকে বোঝাতো তাদের মধ্যে আর পরোক্ষভাবেও আইয়ুব সরকারের পক্ষ অবলম্বন করার মত কেউ ছিল না। আন্দোলনকারী দলসমূহ যেসব দাবি উত্থাপন করেছিল সেসবকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করার ক্ষমতা আইয়ুব খাঁনের নেতৃত্বাধীনে কনভেনশন মুসলিম লীগের ছিল না। ফলে আন্দোলন প্রতিরোধের জন্য সরকার রাষ্ট্রযন্ত্রকে প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার করতে থাকে। গণবিচ্ছিন্ন সরকারের পক্ষে রাষ্ট্রযন্ত্র জনসাধারণের ওপর নির্মম দমন-পীড়ন চালানোর ফলে সরকারের প্রতি গণরোস রাষ্ট্রযন্ত্র বিরোধী গণরোষে পরিণত হয়। গণরোষ এমন একটি পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয় যে, কোন্ রাজনৈতিক দল আন্দোলনের কর্মসূচী দিচ্ছে সেটা প্রধান বিবেচ্য বিষয় আর থাকেনি, সরকার বিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে রাজপথে গড়ে ওঠে এক ব্যাপক গণ ঐক্য। আর এ গণ ঐক্যই আইয়ুব সরকারের পতনকে অনিবার্য করে তোলে।

Dhaka University Institutional Repository

(১০) আইয়ুব সরকার বিরোধী সকল রাজনৈতিক শক্তির ঐক্য সরকারকে নৈতিকভাবে দুর্বল করে ফেলে। কেন্দ্রীয় সরকার যথাসম্ভব সতর্কতার সাথে কথা বলতে থাকে। সরকারের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের ঘনঘন পরামর্শ সভা বিরোধী রাজনৈতিক দলের আন্দোলনের কর্মসূচীকে আরো গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় পরিষদের বিরোধী দলীয় সদস্যদের কণ্ঠ আরো জোরালো হয়, তীব্র সমালোচনায় সরকারকে তারা বিদ্ধ করতে থাকেন। সংবাদ পত্রগুলিও নীপিড়নমূলক আইনকে অবজ্ঞা করে সত্য সংবাদ পরিবেশন করতে থাকে। আর সরকারও এক পর্যায়ে হাল ছেড়ে দেয়। ফলে সংবাদ পত্রগুলি আরো অবাধে সরকারের সমালোচনামূলক সকল ধরণের সংবাদ ও প্রবন্ধ ছাপাতে শুরু করে। এ পর্যায়ে সরকারী দল কনভেনশন মুসলিম লীগও তার কর্মীদেরকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারেনি। এরকম একটি পর্যায়েই ছাত্ররা ১১-দফা ঘোষণা করে। আর এ ঘটনার মধ্য দিয়েই পূর্ব পাকিস্তানের সকল ছাত্র জনতা মুক্তির একটি পথ পেয়ে যায়। আর এ ১১-দফা দাবি আদায়ের সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে গিয়েই আসাদ নিহত হন বলে তিনি হয়ে ওঠেন জনতার সম্পদ। আসাদের ওপর পাকিস্তান রাষ্ট্রযন্ত্রের আঘাত সমগ্র জনতার ওপর আঘাত হিসাবে পরিগণিত হয়। জনসাধারণ গণঅভ্যুত্থানে সামিল হয়ে পড়েন। গণঅভ্যুত্থানের ব্যপকতা নেতৃবৃন্দের ধারণাকে অতিক্রম করে যায়। উত্তপ্ত শ্লোগানমুখর জনস্রোত এত প্রবল রূপ ধারণ করে যে, তা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা কারো ছিলনা। ছাত্র ইউনিয়নের উভয় অংশই হতবুদ্ধি হয়ে যায়, কেননা এমন কোন আশু দাবি তাদের হাতে ছিলনা যা মেনে নিলে সরকারের নৈতিকভাবে পরাজয় ঘটতে পারতো। কিন্তু ছাত্রলীগের কাছে সে ধরণের একটি দাবি ছিল এবং তা হচ্ছে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তি। এ দাবি মেনে নেওয়ার অর্থই ছিল সরকারের অন্যায় ও ষড়যন্ত্রমূলক ভূমিকাকে স্বীকার করে নেওয়া। ছাত্রলীগ অত্যন্ত জোরালোভাবে দাবিটি উত্থাপণ করতে থাকে। বিরোধী কোন রাজনৈতিক দল এ দাবির বিরোধীতা করেনি। এ পর্যায়ে আইয়ুব সরকার সকল বন্দী মুক্তির দাবিটি মেনে নেয় এবং 'ডাক' এর ৮-দফার অন্যান্য দাবি পর্যালোচনার জন্য গোলটেবিল বৈঠক ডাকে। সরকার এভাবে আপোষমূলক মনোভাব প্রকাশ করলেও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও তার প্রধান আসামী শেখ মুজিবের প্রশ্নে অনমনীয় থাকে। এ অবস্থায় 'ডাক'এর গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকেনা। কিন্তু ভাসানী ন্যাপ ও পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি গোলটেবিল বৈঠকের বিরোধিতা করে। শ্লোগান উচ্চারিত হয় গোলটেবিল না রাজপথ, রাজপথ, রাজপথ। ভাসানী ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের (মেনন) এ দাবির সাথে ছাত্রলীগের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তির দাবির সংগ্রামী পথের (Line of Action) সম্মেলন ঘটে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তির দাবির মধ্যে গোলটেবিল বৈঠক বিরোধীতায় দাবির রাজনৈতিক বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কেননা ভাসানী ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) এর গোলটেবিল বৈঠক বিরোধীতার কোন যৌক্তিক কারণ ছিল না, কিন্তু মওলানা ভাসানী বুঝেছিলেন যে. আন্দোলনের এ পর্যায়ে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের অর্থই হবে একটি নিশ্চিত বিজয়ী সংগ্রাম থেকে গণমানুষকে পিছু হটতে উৎসাহিত করা। জনসাধারণের এই গণঅভ্যুত্থানকে আরো উচ্চতর রূপদান করার জন্য প্রয়োজন ছিল আরো উচ্চতর ঘোষণা। শেখ মুজিবের মুক্তির দাবি পাশ কাটিয়ে সেদিন আর অন্যকোন দাবি উথাপনের সুযোগ ছিল না। মওলানা ভাসানী শেষ পর্যন্ত ঘোষণা করলেন 'শেখ মুজিবকে ক্যান্টনমেন্ট ভেঙ্গে বের করে নিয়ে আসবো'। মওলানা ভাসানীর উক্ত দৃপ্ত ঘোষণা ছাত্রলীগের রাজনীতিকেই প্রতিফলিত করে। এভাবে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তির দাবি দ্বিতীয় দফা গণঅভ্যুত্থানের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। এ পর্যায়েই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে ক্যান্টনমেন্টে বন্দী অবস্থায় গুলি করে হত্যা করা হয়। গুলি করে হত্যা করা হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্যরত শিক্ষক ডঃ শামসুজ্জোহাকে। পরপর সংঘটিত এ দুটি ঘটনায় আইয়ুব সরকারের সর্বশেষ গ্রহণযোগ্যতাও নিশ্বেষিত হয়ে যায়। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের সমাজে বুদ্ধিজীবীসহ সমগ্র জনতার মধ্যে যেন একটি বিস্ফোরণ ঘটে যায়। আর সে বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র কার্যত বিকল হয়ে পড়ে। আইয়ুব সরকারকে পরাস্ত করার লক্ষ্যে মানুষ মরিয়া হয়ে ওঠে। এ পর্যায়ে শেখ মুজিবের মুক্তির প্রশ্নটি সরকার পতনের প্রতীক রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ফলে শেখ মুজিবের মুক্তির দাবি সমগ্র জনতার দাবিতে পরিণত হয়। এভাবে শেখ মুজিব হয়ে ওঠেন সমগ্র পূর্বপাকিস্তানী জনতার নেতা। জনসাধারণের উক্ত দ্বিতীয় দফা অভ্যুত্থান গণবিদ্রোহে রূপ লাভ করে। তখন সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়ার মাধ্যমে আইয়ুব সরকারের চুড়ান্তভাবে নৈতিক পরাজয় ঘটে।

(১১) শেখ মুজিবের মুক্তির পর ছাত্রলীগেরও আর দাবি করার মত কোন বিষয় থাকেনি, কিন্তু 'গোলটেবিল না রাজপথ- রাজপথ, রাজপথ' শ্লোগানটি থেকে যায়। ন্যাপ ভাসানী আর ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) এ দাবি করতেই থাকে। লক্ষকোটি জনতা তখন রাজ পথে। প্রতিবাদী মিছিল দেখলেই তারা তাতে সামিল হন। প্রতিবাদী ও বিক্ষুব্ধ জনতার কাছে তখন মওলানা ভাসানী নতুন আহবান জানালেন। তিনি ঘুনেধরা রাষ্ট্র ওশোষণ ব্যবস্থা উৎপাটনের ডাক দেন। সমগ্র প্রদেশব্যাপী নতুন করে এক আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। রাষ্ট্রযন্ত্রের স্থানীয় শাখা, রাষ্ট্রের সহযোগী মৌলিক গণতন্ত্রী আর সামাজিক অপরাধীদের বিরুদ্ধে এক স্বতস্ফূর্ত গণসংগ্রাম আরম্ভ হল। থানা, কোর্ট-কাচারি আর তহসিল অফিসগুলি জালিয়ে দেওয়া শুরু হয়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংগ্রামী জনতা কর্তৃক মৌলিক গণতন্ত্রী ও সামাজিক অপরাধীদের শাস্তি দান আরম্ভ হয়। স্বয়ং শেখ মুজিবের শান্তির আহবান বার বার রেডিও-টেলিভিশনে প্রচার করেও এ আন্দোলনকে থামানো যায়নি। এ পর্যায়ে মওলানা ভাসানীই হয়ে উঠলেন এ পর্যায়ের গণআন্দোলনের মুখ্য নেতা। রাষ্ট্রযন্ত্র ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে এ আন্দোলন ক্রমাগত শ্রেণী সংগ্রামের দিকে মোড় নিতে থাকে, যা' পাকিস্তান রাষ্ট্রের ধারক ও অনুগত শ্রেণীসমূহকেও সংকিত করে তোলে। শেখ মুজিবও তার নেতৃত্বের কার্যকারিতা নিয়ে চিন্তিত হয়ে ওঠেন। পাকিস্তান রাষ্ট্রও তার স্থায়িত্ব নিয়ে বিচলিত হয়ে ওঠে। ফলে যে সরকার ক্ষমতায় থাকার সকল বৈধতা হারিয়ে ফেলেছিল, সেই আইয়ুব সরকার রাষ্ট্রক্ষমতাকে বৈধ বা সংবিধানসম্মত কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির কাছে না দিয়ে সেনাবাহিনীর হাতে দিয়ে যেতে সক্ষম হল। এ সামরিক সরকার কারো কাছ থেকেই সামান্যতম বাধার সম্মুখিন হল না। প্রধান রাজনৈতিক শক্তি কোন বাধা দেয়নি। কেননা সে পর্যায়ে তাদের হাতে রাজনৈতিক কোন ইস্যু ছিল না। জনপ্রিয়তার যে তুঙ্গ অবস্থা তখন তাদের ছিল তাতে নিরাপদে নির্বাচন অনুষ্ঠান তাদের জন্য কাম্য ছিল। সেদিক থেকে রাষ্ট্র বিরোধী ব্যাপক গণসংগ্রামমুখী উত্তপ্ত অবস্থার অবসান ঘটা তাদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। এদিক থেকে সামরিক বাহিনীর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর তাদের কাছে আশির্বাদ হিসাবেই পরিগণিত হয়। কেননা একমাত্র সামরিক শাসন ছাড়া নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি আর কোনভাবেই সেদিন সম্ভব ছিলনা। অন্যদিকে ভাসানী ন্যাপেরও সে সময় ক্ষমতা দখলের কোন পরিকল্পনা বা প্রস্তুতি ছিলনা। ফলে জনসাধারণকে তারা উত্তেজিত করতে সক্ষম হলেও সামরিক শাসনকে ভেঙ্গে ফেলার জন্য সংগঠিত শক্তি প্রয়োগে তারা সক্ষম হয়নি। এরকম কোন উদ্যোগও কেউ গ্রহণ করেনি।

Dhaka University Institutional Repository

(১২) উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান শুধু এ কারণেই গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, উহা আইয়ুব সরকারের মত একটি শক্তিশালী স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। অধিকন্তু এ আন্দোলনে এমন সব উপাদানের সংযোজন ঘটেছিল যেসব সামাজিক বিপ্লবের পথকে প্রশস্ত করতে পারত। আর সে সামাজিক বিপ্লবকে বাধা দিতেই মূলতঃ সেদিন সামরিক শাসন জারি পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। সে যা হোক, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ফলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সামাজিক বিপ্লব না ঘটলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এ অভ্যুত্থান একাত্তরে বাংলাদেশের সমগ্র জনতাকে পাকিস্তানী শাসক ও শোষক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সশস্ত্র সংগ্রামে অনুপ্রণিত করে, যার পরিণতিতে স্বায়ত্ত শাসন - স্বাধিকার আন্দোলনের পর্যায় থেকে স্বাধীনতা অর্জিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সংযোজনী –১

দৈনিক আজাদ পত্রিকায় নির্বাচিত সংবাদ শিরোনাম

১.১০.৬৪ চট্টগ্রামে মিছিলের উপর গুন্ডামীঃ ৬ জন শ্রমিক নেতা কর্তৃক দুষ্কৃতিকারীদের নিন্দা
" চট্টগ্রামে পুনরায় শ্রমিকদের উপর দুর্বৃত্তদের হামলাঃ ২২ জন আহতঃ ৪৫টি শ্রমিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ৩রা অক্টোবর হইতে প্রতীক ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত।
২.১০.৬৪ প্রতিরোধ দিবসে চট্টগ্রামে গুন্ডামীঃ বিরোধী দল কর্তৃক বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী।
" জন-নিরাপত্তা আইনের ৪১ নং ধারা শাসনতন্ত্রের পরিপন্থীঃ হেবিয়াস কর্পাসের আবেদনে হাইকোর্টের রায়ঃ অবিলম্বে শওকত আলীকে মুক্তি দানের নির্দেশ।
" প্রস্তাবিত শ্রমিক সম্মেলনঃ ১০ই অক্টোবর প্রস্তুতি কমিটির বৈঠক।
৪.১০.৬৪ জেলা, মহকুমা ও থানায় সমন্বয় কমিটি গঠনের নির্দেশঃ সম্মিলিত বিরোধী দলের সিদ্ধান্ত কার্যকরীকরণের ব্যবস্থা।
৫.১০.৬৪ আরও ৪টি স্কুলের আগাম ছুটি শেষ। পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষক ধর্মঘট অব্যাহত।
" প্রতীক ধর্মঘট অব্যাহতঃ দুই ঘন্টার জন্য চট্টগ্রামে কলকারখানা বন্ধ।
৬.১০.৬৪ মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষকদের ধর্মঘট অব্যাহত।
৭.১০.৬৪ ধর্মঘটী শিক্ষকদের দাবী পুরণের আহবানঃ সম্মিলিত বিরোধী দলের বৈঠকে সরকারের অনমনীয় মনোভাবের নিন্দা।
" শিক্ষক ধর্মঘট অব্যাহত।
" বস্ত্র মিল শ্রমিক ধর্মঘটঃ কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে বিরোধী দলের উদ্যোগ।
" ২জন রাজবন্দীকে মুক্তি দিয়া জেল গেট হইতে পুনরায় গ্রেফতার।
৮.১০.৬৪ প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক তিন মাসের জন্য রেল কর্মচারী ধর্মঘট নিষিদ্ধ ঘোষিত।
" ওয়াপদা কর্মচারী ধর্মঘট বেআইনী ঘোষিত।
" "ইত্তেফাক" সম্পাদকের নিকট জামানত তলবঃ ১২ই অক্টোবরের মধ্যে ২৫ হাজার টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ।
৯.১০.৬৪ রেল কর্মচারীদের প্রতীক ধর্মঘটঃ ২৯শে অক্টোবর পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
১০.১০.৬৪ ধর্মঘটী স্কুল শিক্ষকদের ব্যাপক হারে বরখাস্ত শুরুঃ অবস্থান ধর্মঘট অব্যাহতঃ বুধবার হইতে অনশন ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত।
১১.১০.৬৪ সোমবার হইতে সমগ্র প্রদেশে চটকল শ্রমিক ধর্মঘট।
" মওলানা মওদুদী, ফরিদ আহমদ ও অপর ৪৩ জন জামাত কর্মীকে অবিলম্বে মুক্তি দানের নির্দেশঃ পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্ট কর্তৃক হেবিয়াস কর্পাস আবেদনের সর্বসম্মত রায় দান।
" অবস্থান ধর্মঘট অব্যাহত।
" শ্রমিক সম্মেলনের প্রস্তুতিঃ সমগ্র প্রদেশের ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের বৈঠক অনুষ্ঠিত।
১৩.১০.৬৪ আট দফা দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে অদ্য হইতে ৯০ হাজার পাটকল শ্রমিকের ধর্মঘট।
১৪.১০.৬৪ চাউল রেশনে ২৫ টাকাঃ বাজারে ২৬ টাকা – ইহা কি সত্য ?
" ১৪৪ ধারা জারীঃ কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপঃ বহু আহত। খুলনায় দুইদল পাটকল শ্রমিকের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ।
" অদ্য রাত ১২টার পর হইতে শিক্ষকদের অনশন।
১৫.১০.৬৪ শ্রমিকদের দাবী মানিয়া লউনঃ ৬ জন বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতার যুক্ত বিবৃতি।
" আমি দেশের মঙ্গল চাই, আর বিরোধী দল ধ্বংস চাহেঃ কনভেনশন লীগের প্রেসিডেন্ট পদ প্রার্থী আইয়ুব খানের নির্বাচনী বক্তৃতা।
" খুলনায় ধর্মঘটী পাটকল শ্রমিকের উপর গুলীবর্ষনে ১জন নিহত ৬জন আহত; শহরে তীব্র উত্তেজনাঃ বহু শ্রমিক গ্রেফতার।
১৬.১০.৬৪ খুলনায় ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর গুন্ডাদের সুপরিকল্পিত ও বর্বর হামলায় বহু নিহত।
১৭.১০.৬৪ দাবী না মানিলে প্রদেশ ব্যাপী ধর্মঘট।
" ভীতিগ্রস্ত শ্রমিকদের খালিশপুর ত্যাগ।
১৮.১০.৬৪ খুলনায় গুন্ডামী অব্যাহত।
" দুইজন অনশন ধর্মঘটী শিক্ষক হাসপাতালে নীত।
১৯.৬.৬৪ ১৩জন আহত।
২০.১০.৬৪ অদ্য চটকল শ্রমিকদের শোক দিবস পালনঃ খুলনায় গুলীবর্ষনে বহু সংখ্যক শ্রমিক নিহত।
" শ্রমিকদের মৌন মিছিল।
২১.১০.৬৪ শিক্ষকদের অনশন ধর্মঘটঃ দুইজনের অবস্থার অবনতি।
২২.১০.৬৪ খুলনায় শ্রকিম নেতা গ্রেফতার।
" স্বার্থবাদী মহলের প্ররোচনাই খুলনার মর্মান্তিক হত্যাকান্ডের অন্যতম কারণঃ নেতৃবৃন্দ কর্তৃক বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী।
২৩.১০.৬৪ পাটশ্রমিক ধর্মঘটের দশম দিবস।
২৫.১০.৬৪ ধর্মঘটীদের অবস্থা আশংকাজনক।
২৬.১০.৬৪ শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে সরকারী হামলার নিন্দাঃ ঢাকায় দুই দিনব্যাপী শ্রমিক প্রতিনিধি সম্মেলন শুরু।
২৭.১০.৬৪ ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন গড়িয়া তোলার সংকল্পঃ ১৫ দফা দাবীর ভিত্তিতে পূর্ব-পাক শ্রমিক পরিষদ গঠন।
" অফিসারদের দৌরাত্ম্য ?ঃ বিরোধী দলীয় প্রার্থীদের উপর চাপ প্রয়োগের অভিযোগ।
২৮.১০.৬৪ ইত্তেফাকের জামানত তলবঃ হাইকোর্ট কর্তৃক কার্য্যকারিতা স্থগিত রাখার নির্দেশ।
" প্রদেশের বিরোধী দলের ১১শত জন নির্বাচিতঃ ঢাকায় ৩০ জনের মধ্যে ২৫ জনই বিরোধী দলভুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

২৯.১০.৬৪ পুলিশ কর্তৃক বিরোধী দলীয় প্রার্থী হয়রানীঃ সরকারী প্রেস নোটে অভিযোগ অস্বীকার।
" বেসরকারী তদন্ত কমিটি গঠণ দাবীঃ খুলনায় শ্রমিক হত্যা সম্পর্কে শ্রমিক পরিষদের সিদ্ধান্ত।
" আজাদের বার্তা সম্পাদকসহ ৩জন সাংবাদিকের মুক্তি লাভ।
" ৯জন শিক্ষকের অনশন ধর্মঘট ভঙ্গঃ প্রদেশব্যাপী শিক্ষক ধর্মঘট প্রত্যাহারঃ অদ্য কার্য্যে যোগদান।
৩০.১০.৬৪ আইয়ুব খান তাঁহার অসমাপ্ত বক্তৃতায় বলিতে চাহিয়াছিলেন বিরোধী দল দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করিতে চাহে।
" জনতার রুদ্ররোষে কনভেনশন লীগের 'জলসা' পন্ডঃ অধিকার সচেতন মানুষের বজ্র কঠিন আওয়াজঃ বক্তৃতা অসম্পূর্ণ রাখিয়া আইয়ুব খানের মঞ্চ ত্যাগঃ জনতার উপর লাঠি চার্জজঃ কয়েকজন আহতঃ বহু গ্রেফতার।
৩১.১০.৬৪ সরকারী প্রেসনোট স্ববিরোধী তথা বিভ্রান্তিকরঃ চটকল ফেডারেশনের বিবৃতিতে প্রকৃত পরিস্থিতি বিশ্লেষণ।
১.১১.৬৪ ছাতা – ঘড়ি বন্ধক দায়ী খাদ্য সংগ্রহঃ সরকারী লিগ অফিসে হানা। যশোরে জনসভার জন্য আমদানীকৃত মানুষের তীব্র বিক্ষোভ (আইয়ুবের সহিত সফররত আজাদের বিশেষ প্রতিনিধি)।
২.১১.৬৪ নিরাপত্তা আইনের ১৭ ধারায় গ্রেফতারের বিধান নাইঃ মীর্জ্জা গোলাম হাফিজ কাজী জাফরের আটকাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাসের আবেদন।
২.১১.৬৪ সাবেক কেন্দ্রীয় উজির গ্রেফতার।
৩.১১.৬৪ চটকল শ্রমিক ধর্মঘটঃ শান্তি পূর্ণভাবে ২১তম দিবস অতিবাহিত।
৩.১১.৬৪ বিভ্রান্তিকর প্রচারনাঃ ভাষানী কর্তৃক সরকারী দলের মনোভাবের তীব্র নিন্দা।
" পশ্চিমে পাকিস্তানে সম্মিলিত বিরোধী দলের শতকরা ৮০টি আসন লাভঃ কেন্দ্রীয় কমিটির বিবৃতিতে প্রার্থীদের বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভের সংবাদ প্রচার।
" সরকারী দলের জয়লাভের প্রচারনা শুভংকরের ফাঁকিঃ বিরোধী দলীয় ব্যক্তিদের নাম তালিকাভুক্তির অপপ্রয়াস।
৪.১১.৬৪ রাজশাহীর জনসভায় নগন্য সংখ্যক লোকের যোগদানঃ আইয়ুব খান কর্তৃক একই সুরে বিরোধী দলের সমালোচনা আইয়ুব খানের সহিত সফররত আজাদের পিন্ডি অফিস হইবে।
" সরকারী লীগের শক্তিশালী ঘাটি ঝিলামে বিরোধী দলের অভূতপূর্ব সাফল্যঃ শতকরা একশতটি আসনই দখলঃ পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বত্র বিরোধী দলের জয় যাত্রা অব্যাহত।
" অদ্য সমগ্র প্রদেশে শ্রমিক দলনের প্রতিবাদ।
৫.১১.৬৪ খুলনার মর্মান্তিক ঘটনার প্রতিবাদে প্রদেশের সর্বত্র শ্রমিকদের সভা ও শোভাযাত্রা।
৬.১১.৬৪ করাচীতে আওয়ামী লীগ কর্মী গ্রেফতার।
" দিনাজপুরে শোভাযাত্রীদের উপর গুন্ডাদলের বর্বর হামলা।
৮.১১.৬৪ প্রধান নির্বাচনী কমিশনারের নিকট অভিযোগ পেশ। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটগন নির্বাচন কেন্দ্রে দুষ্কৃতিকারীদের প্রশ্রয় দিতেছে।
" মর্মান্তিক দাঙ্গার শিকার। এ পর্য্যন্ত করাচীতে ২০ জন নিহতঃ কোরাঙ্গী এলাকায় পুনরায় অগ্নিসংযোগ।
৯.১১.৬৪ রাষ্ট্রদ্রোহের দায়ে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার ও মুক্তিদান।
" পশ্চিম পাকিস্তানের বিরোধীদলের সংখ্যা গরিষ্ঠতা।
১০.১১.৬৪ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট বলেনঃ (দেশে পুনরায় বিপ্লব ঘটিয়া যাইতে পারে) বিরোধী দলের 'অরাজকতা
" দেশে পুনরায় বিপ্লব ঘটিলে আইয়ুব খানই দায়ী হইবেনঃ শেখ মুজিব।
" নারায়নগঞ্জে বিরোধী দলের উপর দুর্বৃত্তদলের হামলা।
১১.১১.৬৪ নির্যাতন–নিপীড়ন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ সমীপবর্ত্তীঃ আজ হইতে সমগ্র প্রদেশে মৌলিক গণতন্ত্র নির্বাচন শুরুঃ সর্বত্র বিরোধী দলের অনুকুল অবস্থা।
" আর ও একজন বিরোধী দলীয় নির্বাচন প্রার্থী গুম।
১২.১১.৬৪ ("ঐ নতুনের কেতন ওড়ে কাল বোশেখীর ঝড়, তোরা সব জয়ধ্বনি কর" (সম্মিলিত বিরোধী দলের শতকরা ৯০টি আসন দখল) গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে উর্দ্ধ জনতার জয়যাত্রা) নির্বাচনের প্রথম দিবসে মিস জিন্নার পক্ষে রায়।
" দেশের প্রত্যন্ত কোনি, নিভৃত পল্লীতে গণতন্ত্রের পতাকা ইডডীন রাখুনঃ পথে পথে জাগ্রত জনতার অভিনন্দনে অভিষিক্ত আজমের আহবান।
১৩.১১.৬৪ নির্বাচনের দ্বিতীয় দিবসেও সম্মিলিত বিরোধী দলের নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাঃ শতকরা ৯৩টি আসন দখল। নিশ্চিত ভরা–ডুবির হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য কনভেনশনপন্থীদের ভুয়া ভোটার আনয়ন।
" কনভেনশন লীগের দাবীর প্রতি চ্যালেঞ্জঃ সাহস থাকলে নাম প্রকাশ করিয়া সংখ্যা গরিষ্ঠতা প্রমান করুন।
" সরকারী লীগের গুন্ডাদল কর্তৃক প্রিজাইডিং অফিসার আক্রান্ত।
১৪.১১.৬৪ এই সংগ্রাম এক নায়কত্বের বিরুদ্ধেঃ এই বিজয় নির্যাতিত জনতার তৃতীয় দিবসে বিরোধী দলের শতকরা ৯৭টি আসন দখল।
" গুন্ডামীর খবর (সরকারী লীগের স্বরুপ প্রকাশ) (দিনাজপুরে গুন্ডাদের হামলায় ১ ব্যক্তি আহত)
" পুনরায় গুন্ডামী।
" গুন্ডা বাহিনীর হামলায় এক ব্যক্তি নিহত।
" সরকারী লীগের গুন্ডাবাহিনীর দৌরাত্ম্য।
১৫.৬.৬৪ কনভেনশনীদের দৌরাত্ম্য ভোট চুরি ও গুন্ডামীর অভিযোগ।
" খুলনা ও দিনাজপুর ১৭ ব্যক্তি আহত গুন্ডাদের হামলাও বিরোধী দলের জয়যাত্রাকে স্তব্ধ করিতে পারে নাই।
১৬.১১.৬৪ চট্টগ্রামে গুন্ডার রাজত্ব কায়েমঃ পরাজয়ের গ্লানি হজম করিতে না পারিয়া বিশেষ মহলের ক্ষিপ্ত রুপ ধারন।

Dhaka University Institutional Repository

১৮.১১.৬৪ আবদুল আওয়ালের নির্বাচন অবৈধঃ নির্বাচনী ট্রাইবুনালের রায় দুর্নীতি ও সরকারী প্রভাব বিস্তারের দায়ে প্রাদেশিক শিক্ষা উজির জনাব মফিজউদ্দিন অভিযুক্ত।
" নব নির্বাচিত সদস্যদের "বশীভূত" করার জন্য অশুভচক্রের ব্যাপক তৎপরতা গণতন্ত্রীদের 'দর্শনের' জন্য আইয়ুব খানের পুনরায় প্রদেশ সফর।
" কুমিল্লা মিউনিসিপ্যাল এলাকায় ১৪৪ ধারা জারী।
১৯.১১.৬৪ সম্পাদক, মুদ্রাকর, প্রকাশক ও রিপোর্টারের প্রতি সমন জারীঃ প্রেস ট্রাষ্টের বাংলা পত্রিকার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা।
২০.১১.৬৪ বিরোধী দলের অগ্রাভিযান অব্যাহতঃ নবম দিবসের নির্বাচনে শতকরা ৯৫টি আসন দখল।
২১.১১.৬৪ শোয়েবের মন্তব্যের জবাবে শেখ মুজিব "যৌথ রক্ষাব্যবস্থার নামে দেশ বিক্রয়ের অপচেষ্টায় কে মাতিয়াছিল ?"
২২.১১.৬৪ রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলাঃ শেখ মুজিবের জামিন মঞ্জুর।
২৩.১১.৬৪ প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে সম্মিলিত বিরোধী দলের বিজয়ী ব্যক্তিদের তালিকা।
" নওয়াব জাহিদ আলী খান গ্রেফতার।
২৯.১১.৬৪ জোরগলায় পূর্ব পাকিস্তানের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রচার করা হইলেও বাস্তবে প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে উন্নয়নকার্যে অচলাবস্থার সৃষ্টি।
৩০.১১.৬৪ (বিরোধী দলের মধ্যে বিভেদ নাই) সাংবাদিকদের নিকট জনাব মুজিবেরর মন্তব্য।
৩.১২.৬৪ করাচীতে ধর্মঘটী ছাত্রদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ।
" রাতারাতি আইন সংশোধন করিয়া "ফিল্ড মার্শালের" অবসর গ্রহণের ঘোষণা ক্ষমতার অপব্যবহার ছাড়া কিছুই নহে।
" সুপ্রীম কোর্টের রায় গ্রহণ করা হইলে নির্বাচন বিলম্বিত হইবে নাঃ লারী।
৫.১২.৬৪ রেল কর্মচারীদের দাবী দাওয়াঃ পুরণ না হইলে আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত।
" পশ্চিম পাকিস্তানে ৭৪ কোটি ১২ লক্ষ টাকা পূর্ব পাকিস্তানে ৪০ কোটি ৮২ লক্ষ। শিল্পোন্নয়নে ব্যাংকের বৈষম্যমূলক ঋণদান নীতির জলন্ত প্রমান।
" আপনাদের আরও ক্ষমতা দেওয়া হইবেঃ করাচীতে মৌলিক গণতন্ত্রী সভায় প্রেসিডেন্টের বক্তৃতা।
" শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে নয়া মামলা দায়েরঃ পূর্বতন মামলা হাইকোর্টে স্থানান্তরের জন্য বিবাদীর আবেদন।
" চাকুরী ক্ষেত্রে বঞ্চনা প্রসঙ্গঃ ডাক্তারদের পদোন্নতির প্রশ্নে কর্তৃপক্ষের গড়িমসি।
" করাচীতে ছাত্র নির্য্যাতনঃ বিভিন্ন ছাত্র সংস্থা কর্তৃক নিন্দা।
" ধর্মঘটের ৪র্থ দিবসেও অবস্থা অপরিবর্ত্তিতঃ করাচীর ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ অব্যাহত।
" কলেজ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া করাচীতে ছাত্রদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ।
৭.১১.৬৪ দীর্ঘ ৫৫ দিবস পর চটকল ধর্মঘট প্রত্যাহারের সম্ভাবনাঃ শ্রমিকদের সহিত মালিকদের সমঝোতাঃ চুক্তির স্বাক্ষর।
৮.১২.৬৪ নির্বাচনী কমিশনের ভূমিকাঃ নিরপেক্ষ নহে বলিয়া শেখ মুজিবের অভিযোগ।
" সকল প্রকার দাবী দাওয়া মানিয়া লওয়ায় মোমেনশাহী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ১৭২দিন ব্যাপী ধর্মঘট প্রত্যাহার।
৯.১২.৬৪ আরও চারটি চটকল ধর্মঘট প্রত্যাহার।
" শিল্পোন্নয়ন ব্যাংকে ইঞ্জিনিয়ারদের ধর্মঘট।
১০.১২.৬৪ করাচীতে কায়েদে আজমের মাজারে সভানুষ্ঠানের পর প্রত্যাবর্ত্তনরত ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণে ১জন ছাত্র নিহত।
" বাগেরহাটের ছাত্রদের উপর গুলীবর্ষন (টেলিফোনযোগে প্রাপ্ত)।
" ১৪৪ ধারা জারী।
" অদ্য নিহত ছাত্রের জানাজা।
" অদ্য ঢাকায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট।
১১.১২.৬৪ অত্যাচারী সরকারের জুলুম বাজীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ শপথগ্রহণঃ দেশব্যাপী ছাত্র নির্যাতনের প্রতিবাদে ঢাকায় বিক্ষোভের ঝড়।
" শিক্ষা প্রতিষ্টান বন্ধঃ পিটুনি কর ধার্য্যের ব্যবস্থাঃ কাঁদুনে গ্যাসঃ লাঠিচার্জঃ সমগ্র পঃ পাকিস্তানে ছাত্র নির্য্যাতনের নয়া রুপ।
" ব্রাম্মণবাড়িয়ায় মোনায়েম খানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ।
" ছাত্র বহিস্কার মামলার রায়। হাইকোর্ট কর্তৃক তোলারাম কলেজ কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অবৈধ ঘোষিত।
" ১৪ই ডিসেম্বর সমগ্র প্রদেশে ছাত্র ধর্মঘট।
১২.১২.৬৪ পেশোয়ারে ১৪৪ ধারা জারী।
" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়া গবেষনা ছাত্রদের রাজনীতি মুক্ত রাখার পন্থা উদ্ভাবনের চেষ্টা।
" প্রতক্ষ ঋণদানের ব্যাপারে বৈষম্যমূলক নীতি অব্যাহত থাকায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অবিলম্বে শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক বিভক্তিকরণের দাবী।
১৩.১২.৬৪ নির্যাতনের বিরুদ্ধে শ্রমিক নেতাদের বিবৃতি। দেশে ফ্যাসীবাদ কায়েমের বিরুদ্ধে সতর্কবানী।
" করাচী ও খয়েরপুরে ধর্মঘট প্রতিপালিতঃ শহীদ নাসিম দিবস উপলক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানে শহরে শহরে ছাত্র মিছিল)
১৪.১২.৬৪ করাচী ছাত্র ধর্মঘটঃ ১৩শ দিবস শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত।
" যুগোশ্লাভ - ঋণে পূর্ব পাকিস্তানে জাহাজ আসিল না কেন ? শতকরা ৫০ ভাগ মুলধন দাবীর অর্থ কি? শিল্পোন্নয়ন ব্যাংকের মর্জিমাফিক কার্য্যকলাপে ন্যায্য পাওনা হইতে পূর্ব পাকিস্তান বঞ্চিত।
১৪.১২.৬৪ কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিলের সুপারিশঃ পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের তথ্য প্রকাশ।

Dhaka University Institutional Repository

১৫.১২.৬৪ সাংবাদিক সম্মেলনে ঢাকা বণিক ও শিল্পপতি সমিতি সভাপতির ভাষনঃ পূর্ব পাকিস্তানী ক্ষুদ্র বণিকদের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ অব্যাহত থাকিলে "নিজস্ব বিকল্প পন্থা" গঠণের ইঙ্গিত।

" নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে সর্বত্র ধর্মঘট সভা ও শোভাযাত্রা জুলুম প্রতিরোধের জন্য ছাত্র সমাজ ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে।

" (ছাত্রহত্যা ও দমননীতির প্রতিবাদে অদ্য প্রদেশ ব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট। সভা ও বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজনঃ পশ্চিম পাকিস্তানে শোক দিবস পালন।

" ই,পি,আর,টি,সি কর্মচারীদের ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত।

" ওয়াপদার কর্মচারী ছাটাইয়ের সম্ভাবনা।

" খুলনায় ছাত্র মিছিলের উপর গুন্ডাদলের নৃশংস হামলা।

" চটকল শ্রমিক পরিস্থিতিঃ গোলযোগ সৃষ্টির অপচেষ্টার বিরুদ্ধে হুশিয়ারী।

১৬.১২.৬৪ বিশৃংখলা সহ্য করিব না - মোনায়েম খান।

১৭.১২.৬৪ মাদারীপুরে আজম খান বলেনঃ ২রা জানুয়ারী স্বৈরতন্ত্রের সমাধি রচিত হইবে।

১৭.১২.৬৪ 'কপ' সদস্যদের উপর গুন্ডা বাহিনীর হামলা।

" খুলনার শান্তিপূর্ণ ছাত্র মিছিলের উপর গুন্ডা বাহিনীর হামলার নিন্দা।

১৯.১২.৬৪ সনোরঞ্জন ধর গ্রেফতার।

২০.১২.৬৪ আইয়ুবের বিরুদ্ধে অনৈছলামিক কার্য্যের ১০ দফা অভিযোগ/ ওলামা সম্মেলনের সর্বসম্মত প্রস্তাবঃ পবিত্র কোরান ও হাদিছ বিকৃতকারীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার ডাক।

২৩.১২.৬৪ মোকাবেলা সভার নিকটে প্রচন্ড ছাত্র বিক্ষোভঃ পুলিশের সহিত সংঘর্ষ।

" ৪ জন ছাত্রের অনশন ধর্মঘটঃ কুষ্টিয়া কলেজে ছাত্র অসন্তোষ।

২৪.১২.৬৪ ছাত্র সম্প্রদায়ের প্রচারাভিযানে ঢাকা নগরী সরগরম। গনতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম সফল করার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

" রাজশাহীতে আইয়ুবের বিরুদ্ধে প্রচন্ড বিক্ষোভঃ পুলিশ ও গুন্ডাদের হামলায় ১০৩ জন আহত।

২৫.১২.৬৪ মোকাবেলা সভায় গুন্ডাদের প্রবেশপত্র।

" 'কপ' নেতা কর্তৃক জুলুম শাহীর নিন্দাঃ গুন্ডাবাহিনী লেলাইয়া দিয়া শেষ রক্ষার কোশেশ।

" ১৪৪ ধারা সত্ত্বেও মোকাবেলা সভায় রিভলবারসহ গুন্ডার প্রবেশ। কর্তৃপক্ষের নীরবতাঃ লালমিয়া নাজেহাল।

" সাংবাদিকরা ও বাদ যায় নাইঃ মোকাবেলা সভার নিকটে জনতার উপর পুলিশের অমানুষিক হামলা।

" গুলীতে নিহত বৃদ্ধার কথা।

" কুমিল্লায় মর্মান্তিক হত্যাকান্ডের প্রতিবাদঃ অদ্য ঢাকায় ছাত্রদের মিছিল ও গায়েবানা জানাজাঃ বিভিন্ন মহল কর্তৃক বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী।

" নির্য্যাতনের পর বাতাকান্দির করুণ চিত্রঃ বাড়ী আছে বাসিন্দা নাই, কাটা ধান স্তুপীকৃত, সাভারে লোক নাই।

" বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও জনাব মফিজুদ্দিনের পদত্যাগের দাবীতে প্রস্তাব গ্রহণ। কুমিল্লা গ্রামে নিরস্ত্র জনতার উপর গুলীবর্ষনের প্রতিবাদে ঢাকায় ছাত্রদের ধর্মঘটঃ মিছিল।

" বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের উপর বিধিনিষেধ আরোপের বৈধতায় চ্যালেঞ্জ। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উপর রুল জারী।

" (ত্রি-দলীয় বৈঠক অনুষ্ঠানের দাবী) চটকল ধর্মঘট সম্পর্কে শ্রমিক পরিষদ।

" দেশরক্ষা বাহিনীতে সংখ্যাসাম্যের কি হইল।

২৮.১২.৬৪ চট্টগ্রামে ১৪৪ ধারার মেয়াদ বর্দ্ধিত।

৩০.১২.৬৪ নির্বাচনের প্রাক্কালে সর্বত্র বিরোধী দলীয় কর্মীদের ব্যাপক ধরপাকড়ঃ গনমনে ক্ষোভের সঞ্চার।

" অফিসারদের প্রতি শেখ মুজিবের হুশিয়ারী।

৩১.১২.৬৪ জনাব আইয়ুব খান বলেনঃ 'কপ' জয়ী হইলে দেশে হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

" খুলনায় ১৪৪ ধারার মেয়াদ বৃদ্ধি।

" ছাত্রদের উপর হামলা।

" চট্টগ্রামে ১৪৪ ধারা জারী।

" মওলানা ভাসানী বলেনঃ বিরোধী দল জয়ী হইলে সকল কালাকানুন প্রত্যাহৃত হইবে।

" প্রদেশের ৫০টি মহকুমায় ১০ সহস্রাধিক ছাত্রের প্রচার অভিযান।

১.১.৬৫ শহরের বিভিন্ন এলাকায় ১৪৪ ধারা জারী।

" মওলবীবাজারে কপ কর্মী আহত।

৫.১.৬৫ ই পি আর টি সিতে প্রস্তাবিত ধর্মঘটঃ বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সাময়িকভাবে স্থগিত।

" বিরোধী দলীয় কর্মী গ্রেফতার।

" প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সমাপ্ত হওয়ার পর প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে বিরোধী দলীয় কর্মীদের ধর-পাকড় ও ব্যাপক হয়রানীর সংবাদ।

৭.১.৬৫ শহরে আরও একজন গ্রেফতার।

৯.১.৬৫ নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে নির্বাচনী বিধি লংঘনের অভিযোগ।

" ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ১১ জন গ্রেফতার।

১০.১.৬৫ সাবেক পাঞ্জাবে শিক্ষক ধর্মঘট।

" রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে গ্রেফতার।

Dhaka University Institutional Repository

” 'কপের'র সভায় প্রদেশে ব্যাপকধর পাকড়ের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন।
১০.১.৬৫ পূর্ব পাকিস্তান সরকারের আকস্মিক অভিনব সিদ্ধান্ত গ্রহণ। প্রদেশের উন্নয়ন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের শতকরা ২০ ভাগ হ্রাস।
১০.৩.৬৫ ডাক শ্রমিকদের দাবী পরীক্ষঃ সরকার কর্তৃক কমিটি নিয়োগ।
” পিন্ডিতে শহীদ দিবসে ১৫ জন ছাত্র গ্রেফতার।
১১.১.৬৫ অবিলম্বে প্রেস অর্ডিন্যান্স বাতিলের দাবী।
১২.১.৬৫ হায়দারাবাদে ছাত্র ধর্মঘটঃ চালাইয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
১২.১.৬৫ পিন্ডিতে ছাত্রদের প্রতিবাদ সভাঃ গ্রেফতার কৃত ছাত্রদের মুক্তি ও মামলা প্রত্যাহারের দাবী।
১৩.১.৬৫ পূর্ব পাকিস্তানে ৫১ জন কপ নেতা ও কর্মী গ্রেফতার।
১৩.১.৬৫ করাচীতে ছাত্রদের উপর পুনরায় লাঠি চার্জঃ ৭জন গ্রেফতার।
” ব্যবসায়ী মহলের প্রতিক্রিয়া। নয়া আমদানী নীতি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের প্রতি চরম আঘাত স্বরুপ।
” জাতীয় পরিষদের আসন্ন অধিবেশনঃ শহরের কতিপয় এলাকায় ১৪৪ ধারা জারী।
” করাচীতে পুনরায় ২ মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারী।
১৪.১.৬৫ বহু স্কুল-কলেজ বন্ধঃ ছাত্রদের বিক্ষোভঃ সান্ধ্য আইন। করাচীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমুহে গোলযোগ অব্যাহতঃ ব্যাপক ধরপাকড়।
” পিন্ডিতে ১৪৪ ধারা জারী।
১৫.১.৬৫ খয়ের পুরে ১৫ জন ছাত্র নেতা গ্রেফতারঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গোলযোগ অব্যাহত।
” পশ্চিম পাকিস্তান কলেজ শিক্ষকদের প্রতিবাদ দিবস।
” লাহোরে শিক্ষক ধর্মঘটঃ শান্তিপূর্ণভাবে তৃতীয় দিবস অতিবাহিত।
” পশ্চিম পাকিস্তানে ছাত্র অসন্তোষ। পেশোয়ারের চরসাদ্দায় ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষঃ ৫জন আহত।
” ধরপাকড়ের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপনঃ আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় পরিস্থিতি আলোচনা।
” জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শুরুঃ আমদানী নীতির সমালোচনাঃ পাট চাষীদের ন্যায্য মূল্যদানের নিশ্চয়তা বিধানে সরকারী ব্যর্থতা আলোচনার জন্য মুলতবী প্রস্তাব গৃহীত।
১৭.১.৬৫ পশ্চিম পাকিস্তান পরিষদে হট্টগোল।
” (গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এক হউন) এন,ডি,এফ এর সিদ্ধান্তের প্রতি ছাত্রদের সমর্থন।
১৮.১.৬৫ বিরোধী দলীয় সদস্যদের ঔদাসীন্যের ফলে মীজানুর রহমানের গ্রেফতার সম্পর্কিত অধিকারের প্রস্তাব বাতেল।
” করাচীর দাঙ্গার বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা না হইলে বিরোধী দলই উদ্যোগী হইবেঃ 'কপ' শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তাবঃ মরহুম নাজিমুদ্দিনের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপণ।
১৯.১.৬৫ চারটি সংবাদপত্র ও অবাধ্য সরকারী কর্মচারীদের প্রতি ব্যবস্থাবলম্বনের জন্য কনভেনশন লীগের সুপারিশ।
২০.১.৬৫ দশজন পোলিং এজেন্ট গ্রেফতারঃ পরিষদে পঃ পাক সদস্যের অভিযোগ।
” রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের গ্রেফতারঃ শরাফতগঞ্জ ইউনিয়নে ন্যাপের সভায় প্রতিবাদ।
” জনগনের দাবী মানিয়া লউনঃ সরকারের প্রতি আওয়ামী লীগের আহবান।
২১.১.৬৫ লাহোরে শিক্ষক ধর্মঘটঃ শান্তিপূর্ণভাবে ৯ম দিবস অতিবাহিত।
” পঃ পাকিস্তান পরিষদঃ একজন পার্লামেন্টারী সেক্রেটারীসহ আটজন সরকার দলীয় সদস্যের বিরোধী দলের পক্ষে ভোটদান।
” ৩০শে জানুয়ারী হইতে পঃ পাকিস্তানে ছাত্রদের অনশন ধর্মঘট।
” রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী।
২৩.১.৬৫ মেডিক্যাল ছাত্রদের ধর্মঘট।
২৫.১.৬৫ ঈদের পূর্বে বেতনঃ ৪র্থ শ্রেণী সরকারী কর্মচারীদের দাবী।
” চট্টগ্রামে পুলিশের লাঠি চার্জ সম্পর্কিত মুলতবী প্রস্তাব বাতেলঃ প্রাদেশিক পরিসদের শেষ অধিবেশন শুরুঃ নাজিমুদ্দিনের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।
২৯.১.৬৫ পাকিস্তান অবজারভারে কর্মচারী ধর্মঘট।
” জামিনে মুক্তিদানের পর পেশোয়ারে পুনরায় চারজন ছাত্র গ্রেফতার।
৩০.১.৬৫ শতাধিক ষ্টেটবাস অচলঃ ব্যর্থতা ঢাকিবার জন্য ই.পি,আর,টি,সি কর্তৃপক্ষের ক্ষমাহীন ঔদ্ধত্য।
” করাচীতে ১৭জন ছাত্র গ্রেফতার।
৩১.১.৬৫ কপ ষ্টিয়ারিং কমিটির নিন্দা।
২.২.৬৫ বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবীঃ সাংবাদিক হত্যার প্রতিবাদে ধর্মঘট।
” অনশনরত করাচী ছাত্রের অবস্থার অবনতি।
” পূর্ব পাকিস্তানে উন্নয়নের ফিরিস্তি অর্জিত রাজস্বের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ প্রদেশের জন্য ব্যয় হয়।
৭.২.৬৫ পেশোয়ারে ছাত্রনেতা আটক।
৮.২.৬৫ সংখ্যালঘুদের তরফ হইতে দুর্গত ব্যক্তি (পুর্নবাসন) অর্ডিন্যান্স বাতেলের দাবী।
৯.২.৬৫ দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিঃ সুযোগসন্ধানী ব্যক্তিদের অভুতপূর্ব তৎপরতাঃ নির্বাচনের প্রাক্কালে দল ভারী করার জন্য ক্ষমতাসীন দলের অভিনব কারসাজি।
১১.২.৬৫ সিতারা-ই-পাকিস্তান খেতাব প্রাপ্ত প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ কুদরতে-খুদা অপ্রত্যাশিত ভাবে অপসারিত।

Dhaka University Institutional Repository

" জনমতের প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শনের আরও একটি দৃষ্টান্তঃ প্রাদেশিক পরিষদে ইউনিয়ন কাউন্সিলে মনোনয়ন দান সম্পর্কিত বিল গৃহীত।

১২.২.৬৫ গঙ্গা-কপোতাক্ষ পরিকল্পনার ইতিবৃত্তঃ ভাগ্যবিড়ম্বিত কৃষকগণ কি ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পাইবে না?

" শহীদ দিবসের অনুষ্ঠান বানচালের চক্রান্ত।

১৩.২.৬৫ পেশোয়ারে ছাত্রনেতা গ্রেফতার।

১৫.২.৬৫ হাইকোর্টের রায় প্রকাশের অব্যাবহিত পরই দুষ্কৃতিকারী দল কর্তৃক ডঃ মামুদ প্রহৃত।

১৭.২.৬৫ ডাক বিভাগীয় কর্মচারী ধর্মঘট।

" ২৭শে মে হইতে রেল কর্মচারী ধর্মঘট।

১৮.২.৬৫ রাজবন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে কাজী জাফর আহমদ।

১৯.২.৬৫ বোটানিক্যাল গার্ডেন বেগুন ক্ষেতে পরিণতঃ প্রতিবাদ করায় খুলনায় ৪জন ছাত্র বহিষ্কৃত।

২১.২.৬৫ প্রদেশে ডাক ও তার বিভাগে ধর্মঘটঃ ২৩শে ফেব্রুয়ারী হইতে শুরুর সিদ্ধান্ত।

" অদ্য সমগ্র দেশে তার কর্মচারী ধর্মঘট।

২২.২.৬৫ ধর্মঘট বেআইনী ঘোষনা।

২৩.২.৬৫ পল্টনের জনসভায় বলিষ্ঠ আওয়াজ '৬৬ সালের মধ্যে সকল স্তরে বাংলাভাষা চালু করিতে হইবে।

" ডাক কর্মচারী ধর্মঘটের সপ্তম দিবস।

" যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত রক্তেরাঙ্গা অমর একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপিত।

" ঢাকা হলে ছাত্র নির্য্যাতন।

২৪.২.৬৫ জাতীয় পরিষদে ন্যাপ প্রার্থী ভাসানীর সহিত আলোচনার্থে নেতৃত্রয়ের কাগমারী যাত্রা।

" আজ প্রদেশে ধর্মঘট ষ্টাফ রিপোর্টার।

" অধ্যাপক প্রহারের প্রতিবাদে ছাত্রদের ধর্মঘট।

" ডাক কর্মচারী ধর্মঘট ২৪শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে কাজে যোগদানের জন্য সরকারের নির্দেশ।

" হায়দারাবাদে ১৪৪ ধারার মেয়াদ বৃদ্ধি।

২৫.২.৬৫ ডাক বিলির কাজে সেনাবাহিনীর সাহায্য প্রার্থনা। প্রদেশে ডাকা কর্মচারী ধর্মঘটের ফলে অচলাবস্থার সৃষ্টি।

" তার কর্মচারীদের ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত।

" হায়দারাবাদে ৫জন ডাক কর্মচারী গ্রেফতার।

" সংযোগ উজিরের হুশিয়ারী ধর্মঘটীদের প্রতি কাজে যোগদানের নির্দেশ।

" করাচীতে ৪৩জন ডাক কর্মচারী গ্রেফতার।

২৫.২.৬৫ প্রদেশে ডাক কর্মচারী ধর্মঘট পরিস্থিতি দ্বিতীয় দিবসে জনগণের অবর্ণনীয় দুর্ভোগঃ কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য।

" পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক পরিষদের সমর্থন।

" ধর্মঘট অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত।

" তার বিভাগের ধর্মঘট শুরু।

" মনোনয়ন প্রশ্নে কপ-ন্যাপ মতৈক্য প্রতিষ্ঠা।

" ১৫শত ডাক কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা।

২৭.২.৬৫ পশ্চিম পাকিস্তানে ছাত্রদের কালো দিবস পালন।

" রাজশাহীতে ডাক ধর্মঘট।

" তার কর্মচারী ধর্মঘট শুরু।

" ধর্মঘটের তৃতীয় দিবসে ও অবস্থা অপরিবর্তিত।

২৮.২.৬৫ ডাক ও তার কর্মচারী ধর্মঘট অব্যাহত রহিয়াছে।

" দাবী পুরণ না হওয়া পর্য্যন্ত ধর্মঘট চলিবে।

" ৭শত ছাপাখানা ও কপ সদস্যদের প্রতি নির্দ্দেশ করাচীতে বিরোধী দলীয় প্রচারের উপর প্রি-সেন্সরশীপ আরোপ।

১.৩.৬৫ চট্টগ্রামে ধর্মঘট।

" টেলিফোন কর্মচারীদের ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত।

" 'বিকল্প' ব্যবস্থা প্রহসনে পরিনতঃ জনগনের দুর্ভোগ চরমে উপনীত। ধর্মঘটের পঞ্চম দিবসে পাঁচজন নেতা গ্রেফতার।

২.৩.৬৫ সরকারী লীগে কোন্দল। আরও ২১ ব্যক্তি পার্টি হইতে বহিষ্কৃত

" দাবী পুরণ না হওয়া পর্য্যন্ত ধময়ঘট অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত।

" ডাক কর্মচারী ধর্মঘট সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান বলেনঃ বেতন বৃদ্ধি করিতে হইলে কর বৃদ্ধির জন্যও প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

৩.৩.৬৫ প্রেসিডিন্টের উক্তি দুঃখজনকঃ ধর্মঘটী শ্রমিক ইউনিয়নের সংগ্রাম পরিষদের বিবৃতি।

" ধর্মঘট পরিস্থিতি অপরিবর্তিত। প্রদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে চরম সংকট সৃষ্টি।

" শিক্ষা উজিরের পদত্যাগ দাবী।

৪.৩.৬৫ ধর্মঘটের নোটিশ দান।

" ডাক কর্মচারী ধর্মঘট অপরিবর্তিত রহিয়াছে।

" চার হাজার কর্মচারীর বেতন আটক।

৫.৩.৬৫ সহানুভূতিশীল ধর্মঘট।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৩.৬৫ দশদিন ব্যাপী ডাক কর্মচারী ধর্মঘট প্রত্যাহৃত।
৭.৩.৬৫ নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে আগামী ৮ই মার্চ হইতে মামলার শুনানী শুরু।
" নেত্রকোনা শহরে প্রবল উত্তেজনাঃ পুলিশ কর্তৃক কতিপয় ছাত্র গ্রেফতার।
৮.৩.৬৫ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিলের সোপারিশ। সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা চালুর প্রস্তাব।
" খয়েরপুর ১৪৪ ধারা জারী।
৯.৩.৬৫ পশ্চিম পাকিস্তানে তার কর্মচারীদের ধর্মঘটের নোটিশ।
" ঢাকা জুটমিলে ধর্মঘটের নোটিশ।
১০.৩.৬৫ আমদানী বন্ধ করায় ঢাকায় কাগজের তীব্র অভাব।
১২.৩.৬৫ দাবী মানা না হইলে ২৮শে মে হইতে পুনরায় ডাক ধর্মঘট।
১৫.৩.৬৫ ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার দাবী।
" চালনা পোর্টের ডিরেক্টরের আশাঃ শীঘ্রই ধর্মঘটের অবসান হইবে।
" চালনা বন্দরে শ্রমিক ধর্মঘট পরিস্থিতির আরও অবনতি।
" আসন্ন নির্বাচনে গণতন্ত্রের সংগ্রামকে জয়যুক্ত করার জন্য বিরোধী দলের আবেদন।
১৬.৩.৬৫ চালনায় শ্রমিক ধর্মঘটের সপ্তম দিবস।
১৭.৩.৬৫ খুলনায় শ্রমিক ধর্মঘটের অবসান।
২০.৩.৬৫ ঢাকা সদর মহকুমায় ৪টি থানায় ১৪৪ ধারা।
২১.৩.৬৫ শেখ মুজিব কর্তৃক ধর-পাকড়ের নিন্দা।
" মাদারীপুরে ১৪৪ ধারা জারী।
২৭.৩.৬৫ 'পিকিকে'র কার্য্যাবলী ঋণদান পদ্ধতির অন্তরালে বিত্তবানদের আরও বিত্তশালী করার অভিনব কাহিনী।
৫.৪.৬৫ তার কর্মচারীগণ কি পুনরায় ধর্মঘট শুর করিবে ?
" (সম্পূর্ণরুপে অগ্রহনযোগ্য) শাসনতন্ত্রের উপর আওয়ামী লীগের প্রস্তাব গ্রহণ।
৭.৪.৬৫ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্দ্ধারিত অর্থ কি ব্যয় করা হইবে না ?
" বন্দী মুক্তি দিবসকে সার্থক করুনঃ বিভিন্ন ছাত্র নেতার আবেদন।
৮.৪.৬৫ অদ্য বন্দীমুক্তি দিবস।
১১.৪.৬৫ ঢাকা হাইকোর্ট কর্তৃক ৩ জন ছাত্র বন্দীকে অবিলম্বে মুক্তির নির্দ্দেশ দান।
১২.৪.৬৫ প্রাদেশিক অর্থ উজির বলেনঃ অর্থনৈতিক বৈষম্য আর ও ২০ বৎসর অব্যাহত থাকিবে।
১৭.৪.৬৫ শিল্প বণিক সমিতির সভাপতি কর্তৃক পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ স্থানান্তরের অভিযোগ তদন্তের দাবী।
১৮.৪.৬৫ 'কপ' মনোনীত প্রার্থী গ্রেফতার।
২০.৪.৬৫ রেল ধর্মঘট সম্পর্কে হাজী দানেশ।
২১.৪.৬৫ রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা ৯ জন নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েরঃ লারীর অব্যাহতি।
২২.৪.৬৫ যানবাহন শ্রমিক ফেডারেশন গঠনের সিদ্ধান্ত।
২৩.৪.৬৫ রেল কর্মচারীদের "সংগ্রাম দিবস" পালনের সিদ্ধান্ত।
" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রসংসদ ভাঙ্গিয়া দেওয়ার সম্ভাবনা।
২৪.৪.৬৫ খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল পরিস্থিতিঃ শ্রমিক ইউনিয়ন কর্তৃক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ।
২৫.৪.৬৫ রেল শ্রমিকদের সংগ্রাম দিবস ১১দফা দাবীর ভিত্তিতে ২৭শে মে ধর্মঘট।
" নির্বাচন সংক্রান্ত খবর মুদ্রণের উপর বিধিনিষেধঃ পঃ পাকিস্তানে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ।
২৭.৪.৬৫ বন্দী ছাত্রদের মুক্তি দাবী।
২৮.৪.৬৫ ঢাকায় ছাত্র বিক্ষোভ।
২৯.৪.৬৫ রেল শ্রমিকদের দাবী সমর্থনঃ চট্টগ্রামের ৩৩ জন শ্রমিক নেতার বিবৃতি।
" আরও একটি বৈষম্যের কাহিনী।
১.৫.৬৫ রেল শ্রমিকদের শোভাযাত্রা।
৩.৫.৬৫ ঢাকা হলে মারামারিঃ কতিপয় ছাত্র আহত।
৪.৫.৬৫ মে দিবসের জনসভায় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ বলেনঃ দাবী আদায় না হইলে বছরের প্রতিটি দিনই মে দিবস বলিয়া গণ্য হইবে।
" যানবাহন শ্রমিক গ্রেফতারের প্রতিবাদে ঢাকায় বাস ধর্মঘট।
" কনভেনশন লীগে কোন্দল। 'শৃঙ্খলা' ভঙ্গের অভিযোগে ৯৯জন বহিস্কৃত।
৫.৫.৬৫ কুষ্টিয়া কলেজে ১৪৪ ধারা।
৭.৫.৬৫ অবিলম্বে দাবী দাওয়া পুরণ না হইলে ৩টি হাসপাতালের ৮০জন ষ্টাফ নার্সের পদত্যাগের সম্ভাবনা।
" দাবী পুরণ না হইলে ২৭শে মে হইতে পূর্ববাংলা রেল ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত।
" ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারী।
" ঢাকা হল প্রোভোষ্টের অপসারন দাবী।
৯.৫.৬৫ পল্টন জনসভা ভিয়েৎনামে মার্কিন হামলা ও পূর্ব-পাক সীমান্তে ভারতীয় সৈন্য সমাবেশের নিন্দা।
১৩.৫.৬৫ করাচীতে বিক্ষোভ কতিপয় ছাত্র গ্রেফতার।
২৫.৫.৬৫ ঢাকায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আকষ্মিক মূল্য বৃদ্ধি।
২৭.৫.৬৫ ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারী।

Dhaka University Institutional Repository

২৮.৫.৬৫ রাজশাহীতে এক লক্ষ সার্টিফিকেট জারী।
" গভর্নরের কঠোর হুশিয়ারীঃ সরকার রেল ধর্মঘট বরদাস্ত করিবে না।
" ২২ ব্যক্তি গ্রেফতার।
২৯.৫.৬৫ ধর্মঘট সম্পর্কের রেল কর্তৃপক্ষের ভাষ্য।
" রেল কর্মচারী ধর্মঘট সম্পর্কিত সংবাদ।
৩০.৫.৬৫ অদ্য ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট।
" প্রদেশের সামগ্রিক ধর্মঘট পরিস্থিতি।
" চট্টগ্রামে গুলীবর্ষনঃ একজন নিহতঃ ৫জন আহতঃ সরকারী প্রেসনোটে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা।
৩১.৫.৬৫ গুলীবর্ষনের প্রতিবাদে ছাত্রসভা।
" চট্টগামে আরও একজনের মৃত্যুঃ বন্দরে প্রতিবাদ ধর্মঘট।
১.৬.৬৫ রেল ধর্মঘট পরিস্থিতি।
২.৬.৬৫ চট্টগ্রামে ২৯জন বন্দর ও রেল শ্রমিক গ্রেফতার।
৩.৬.৬৫ আরও ৮ জন আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মী গ্রেফতার।
৪.৬.৬৫ রেল ধর্মঘট প্রসঙ্গে পাবনায় ধৃত ৫৭ ব্যক্তির জামিন লাভ।
৪.৬.৬৫ শেখ মুজিবের বিবৃতি। আলোচনার ভিত্তিতে রেল ধর্মঘট অবসানের আহবান।
৮.৬.৬৫ আওয়ামী লীগের বৈঠকে প্রস্তাব পার্লামেন্টারী সরকারই পাকিস্তানের উপযোগী।
১০.৬.৬৫ নয়া জাতীয় পরিষদের নয়ারুপঃ সদস্যদের সপথ গ্রহণ সম্পন্নঃ নুরুল আমীন বিরোধী দলের নেতা হইবেন।
১১.৬.৬৫ ইপিআইডিসি ধর্মঘটঃ পরিধেয় প্রতিবাদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা গ্রহণ।
১৪.৬.৬৫ বিরোধী দলের "ইউনাইটেড পার্লামেন্টারী পার্টি" নামগ্রহণঃ জাতীয় পরিষদে ন্যাপের পৃথক সত্তাঃ নুরুল আমীন ও শাহ আজিজ নেতা ও ডেপুটি নেতা নির্বাচিত।
১৬.৬.৬৫ করের বোঝা চাপাইয়া ঘাটতি পুরনের ব্যবস্থাঃ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম বাজেটঃ কেন্দ্রীয় অর্থ উজির কর্তৃক ৬৫-৬৬ সালের জন্য ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার উদ্বৃত্ত বাজেট পেশ।
২০.৬.৬৫ শেক মুজিবের প্রতিক্রিয়াঃ নয়া বাজেটে ধনী নির্ধনের ব্যবধান বৃদ্ধি।
২৭.৬.৬৫ ছাত্রী হল প্রোভোষ্টের এই দাপট কেন ?
২৮.৬.৬৫ দেশরক্ষা বিভাগে পূর্ব পাকিস্তানকে সংখ্যাসাম্য দানের দাবী।
" বৈষম্য নাই কোথায় ?
৮.৭.৬৫ প্রেস অর্ডিন্যান্স সম্পর্কে বিরোধী দলীয় সদস্যগন বলেনঃ ইহা সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধেরই নামান্তর।
৯.৭.৬৫ শ্রমিকদের বেতন বন্ধঃ অনশন ধর্মঘটের সিদ্ধান্তঃ ঢাকেশ্বরী কটন মিল কি বন্ধ হইয়া যাইবে ?
১১.৭.৬৫ বিরোধী দলের প্রতিবাদ বৃথাই গেলঃ জাতীয় পরিষদে নিরাপত্তা আইনের সংশোধনী অর্ডিন্যান্স গৃহীত।
১২.৭.৬৫ পূর্ব পাকিস্তানে গোলা বারুদের কারখানা স্থাপনের জোর দাবী।
১৩.৭.৬৫ ঢাকেশ্বরী কটন মিল জনেক শ্রমিকের আমরন অনশনের সিদ্ধান্ত।
১৬.৭.৬৫ আগামীকল্য হইতে রাজধানীতে যানবাহন ধর্মঘট।
১৭.৭.৬৫ জাতীয় পরিষদে "ধনিক ও সর্বহারাদের" জেহাদঃ বিরোধীদল কর্তৃক ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠান অবিলম্বে জাতীয় করণের দাবী।
২১.৭.৬৫ পূর্ব পাকিস্তানে অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরী স্থাপনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য।
" সার্টিফিকেট জারীর মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের নিন্দা।
২২.৭.৬৫ ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিল।
২৫.৭.৬৫ জাতীয় পরিষদ ঢাকায় ছাত্র মিছিলের উপর লাঠিচার্জ সংক্রান্ত বাতিল।
" আইনজীবীদের সভায় প্রদেশে সামরিক কলেজ স্থাপনের দাবী।
২৮.৭.৬৫ মুজিব কর্তৃক ভাসানীর সমালোচনা।
২৯.৭.৬৫ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য পাকিস্তানকে ৪ কোটি ১০ লক্ষ ডলার দানঃ পাকিস্তান ও যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে দুইটি ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত।
" শ্রমিকদের প্রতীক ধর্মঘটের ফলে করাচী বন্দর এলাকায় অচলাবস্থার সৃষ্টি।
৩০.৭.৬৫ ১১ই আগষ্ট হইতে ঢাকেশ্বরী কটন মিলে ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত।
" প্রেস ক্লাবে কাঁদুনে গ্যাস সম্পর্কিত মুলতবী প্রস্তাব বাতিল ঘোষনা।
৩১.৭.৬৫ পাকিস্তানের সংবাদপত্র সমূহের সেচ্ছাপ্রণোদিত নীতিমালা প্রবর্তন।
১.৮.৬৫ ইডেন কলেজের ছাত্রীদের বিক্ষোভ মিছিল।
২.৮.৬৫ জাতীয় পরিষদে বিরোধী দল কর্তৃক শাসনতন্ত্রে সংশোধনী বিলের তীব্র সমালোচনা।
" মাদারীপুরে কলেরা সম্পর্কে আনীত মুলতবী প্রস্তাব বাতিল।
৩.৮.৬৫ ১৪ই আগষ্ট ন্যাপ কর্তৃক দেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দিবস পালন।
৫.৮.৬৫ বিরোধীদলের তীব্র প্রতিবাদ ও ওয়াক আউট সত্ত্বেও প্রাদেশিক পরিষদে শ্রমবিরোধ বিল গৃহীত।
৬.৮.৬৫ শ্রম বিরোধ বিলের প্রতিবাদে শ্রমিক বিক্ষোভ।
" ফ্যাক্টরী বিলের সমালোচনা।
৭.৮.৬৫ শ্রমবিরোধ বিলের প্রতিবাদে অদ্য প্রতীক ধর্মঘট।

Dhaka University Institutional Repository

"	বাংলাবাজার বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের বিক্ষোভ মিছিল।
৮.৮.৬৫	প্রতিবাদ দিবসের সমাবেশে শ্রমিকদের স্বার্থের পরিপন্থী বিল বাতিলের দাবী।
"	রেল ধর্মঘটকালে ৬০৬ জন গ্রেফতার।
১০.৮.৬৫	বিরোধী দলের ওয়াক আউট। প্রাদেশিক পরিষদে ট্রেড ইউনিয়ন বিল গৃহীত।
১৪.৮.৬৫	প্রাদেশিক পরিষদে শ্রমিক নিয়োগ বিল বিরোধী দলের ওয়াক আউট সত্ত্বেও গৃহীত।
১৮.৮.৬৫	'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' মামলাঃ ঢাকার ডি,সির উপর হাইকোর্টের রুল জারী।
২৪.৮.৬৫	রেল সর্মচারীদের উপর নির্য্যাতন। মাহবুবুল হক কর্তৃক বন্ধ করার আবেদন।
"	বহরমপুরে ছাত্র পুলিশ সংঘর্ষ।
২৬.৮.৬৫	৪০ কোটি টাকার মধ্যে প্রদেশে মাত্র সোয়া তিন কোটিঃ পূর্ব পাকিস্তানে অর্থ বিনিয়োগের প্রশ্নে বীমা কোম্পানীসমূহের বৈষম্য নীতি।
২৮.৮.৬৫	স্বর্ণ সূত্র যাহারা ফলায়, তাহারা কি পায় ?
২৯.৮.৬৫	পলিটেকনিক ছাত্রদের ধর্মঘট।
৪.৯.৬৫	৭ জন ছাত্র গ্রেফতার।
৫.১০.৬৫	প্রদেশে রক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ়তর করার দাবীঃ আওয়ামী লীগ কার্য্যকরী কমিটির প্রস্তাব।
৭.১০.৬৫	ইউনিয়ন প্রশ্নে ছাত্র ধর্মঘটঃ নটরডাম কলেজ অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষনা।
৮.১০.৬৫	দেরাদুনে গুলীঃ চৌদ্দ জন ছাত্র হতাহত।
১৮.১০.৬৫	অদ্য পল্টনের জনসভায় ভাসানীর বক্তৃতা।
১১.১১.৬৫	আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জনসভা।
২৫.১১.৬৫	বিরোধী দলের ৬টি প্রস্তাবই অগ্রাহ্য। ১১৩-১৩ ভোটে পঞ্চম সংশোধনী গ্রহীত।
৩.১২.৬৫	সর্বনিম্ন মূল্য নির্দ্ধারত হওয়া সত্ত্বেও পাটচাষীরা বঞ্চিত হইতেছে কেন ?
১৩.১২.৬৫	বিরোধী দলীয় সদস্য কর্ত্তৃক প্রদেশে সামরিক কারখানা দাবী।
"	পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধী দলের ওয়াকআউট।
১৬.১২.৬৫	বাজেট আলোচনা সমাপ্তঃ বিরোধী দলীয় নেতা কর্ত্তৃক দুই অর্থনীতি চালু করার দাবী।
১৩.১.৬৬	রাওয়ালপিন্ডি জেলায় ১৪৪ ধারা জারী
১৪.১.৬৬	পূর্ব্ব পাক' গবর্ণর কর্তৃক শত্রু সম্পত্তি সম্পর্কিত নির্দ্দেশ ঘোষণা।
"	প্রদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিশ্রুতিঃ অর্থের ত্রিশ কোটি টাকা এখনও দেওয়া হয় নাই
১৭.১.৬৬	১৪৪ ধারা অমান্য করার অভিযোগে লাহোরে কাউন্সিল লীগের সাধারণ সম্পাদক সরদার শওকত হায়াত খানসহ ৫ ব্যক্তি গ্রেফতার
"	আরও কতিপয় এলাকায় ১৪৪ ধারা
১৮.১.৬৬	পাকিস্তান বার সমিতির কার্য্যকরী সংসদের প্রস্তাবঃ দেশের বর্তমান জরুরী অবস্থার অবসান ঘটাইয়া জনগণের মৌলিক অধিকার ফিরাইয়া দেওয়ার আহবান
১৯.১.৬৬	লাহোরে আরও ৭ ব্যক্তি গ্রেফতার
১৯.১.৬৬	লায়ালপুরে ১৪৪ ধারা
২০.১.৬৬	আজ ত্রি--দলীয় শ্রমিক সম্মেলন
২২.১.৬৬	১৪৪ ধারা অমান্য করার দায়ে পিন্ডিতে ৮ জন গ্রেফতারঃ জনতার উপর পুলিসের লাঠি চার্জ
২৫.১.৬৬	লাহোরে ১৪৪ ধারা জারী
২৭.১.৬৬	১৪৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে লাহোরে ৫ জন রাজনৈতিক কর্মি গ্রেফতার
৫.২.৬৬	পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ সায়ত্তশাসনঃ শেখ মুজিব কর্তৃক প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ
৬.২.৬৬	শেখ মুজিব বলেনঃ শান্তির বিরুদ্ধে অভিযানের প্রতি সতর্ক থাকতে হইবে
৭.২.৬৬	কুষ্টিয়া মোহিনী মিলের হিসাবপত্র গুরুতর অব্যবস্থাঃ অপাকিস্তানী মালিকগণ কর্তৃক বিপুল পরিমান অর্থ দেশের বাহিরে পাচার
১১.২.৬৬	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ শ্রেণীর ছাত্রদলের দৌরাত্ম্য
১১.২.৬৬	লাহোরে সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিবঃ পূর্ব পাকিস্তানে সায়ত্তশাসন কায়েমের গুরুত্ব ব্যাখ্যা
১২.২.৬৬	লাহোর সম্মেলনের কোটারী বিশেষের বিরুদ্ধে শেখ মুজিবের অভিযোগ। পূর্ব্ব পাকিস্তানের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কর্মসূচী আলোচিত হয় নাই।
১৫.২.৬৬	২১ দফা দাবীর ভিত্তিতে অদ্য হইতে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের ১২ হাজার অটোরিক্সা চালকের ধর্মঘট
"	(মুজিবের ছয় দফা কার্য্যসূচী) দুইজন কাউন্সিল লীগ নেতার সমালোচনা।
"	আদালত অবমাননার দায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডাঃ ওসমান গনি ও সিন্ডিকেটের সদস্যবৃন্দ দন্ডিত
১৬.২.৬৬	পুলিসের নিষ্ক্রিয়তাঃ সাংবাদিকদের উপর হামলা
"	ডঃ আবু মাহমুদের এজাহার
১৭.২.৬৬	ছাত্রদের প্রতিবাদ সভা ও মিছিলঃ ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ ওসমান গনির অপসারণ দাবীঃ গুন্ডামির নিন্দা।
"	ছাত্র নেতৃবৃন্দের বিবৃতিঃ বর্বরোচিত হামলার নিন্দা
"	২২শে ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট

Dhaka University Institutional Repository

১৮.২.৬৬ সকল মহল কর্তৃক অধ্যাপক প্রহারের নিন্দা
" ডঃ মাহমুদকে প্রহারকারী ছাত্রদল সম্ভতঃ লাঠভবনে আশ্রয় লইয়াছে
" ৬ দফা প্রস্তাবের সমালোচনার জবাবে শেখ মুজিব
" পাকিস্তান রক্ষা আইন বলে লাহোরে ৫ জন বিরোধী দলীয় নেতা গ্রেফতার
" ২৬ শে ফেব্রুয়ারি দেশের সর্বত্র জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার দিবস পালনের আহবান
১৯.২.৬৬ ছাত্র নেতৃবৃন্দ কর্তৃক প্রতিবাদ দিবসের কর্মসূচী সফল করার আহবান
" প্রেসিডেন্টের নিকট ১৬৮ জন অধ্যাপকের তারবার্তা– শিক্ষক প্রহারের ব্যাপারটি তদন্ত করার জন্য বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠনের দাবী
২০.২.৬৬ ডঃ মাহমুদকে প্রহারের নিন্দা জ্ঞাপন
২১.২.৬৬ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার ঘটনা সম্পর্কে সরকার বলেনঃ বর্তমান অবস্থার তদন্ত কমিশন গঠন আইনসঙ্গত নহে
" নেতৃবৃন্দ কর্তৃক আজাদের জামানত তলবের নোটিশের তীব্র নিন্দাঃ অবিলম্বে প্রত্যাহার দাবী
২২.২.৬৬ আওয়ামী লীগ কর্তৃক আজাদের জামানত তলবের নোটিশের তীব্র নিন্দা
" ডঃ মাহমুদকে প্রহারের অভিযোগে দুই জনকে গ্রেফতার ও মুক্তি দান
" আজ প্রদেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট
" আজাদের উপর জামানত তলবের নোটিশ দিয়া সরকার ভদ্রলোকের চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছেন
" আজাদের জামানত তলবের নোটিশের নিন্দা জ্ঞাপন
" সকল স্তরে বাংলাভাষা চালু করার জোর দাবীঃ ভাবগম্ভীর পরিবেশে অমর একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপিত
" শহীদ দিবসের ছাত্র সভায় প্রস্তাবঃ আজাদের জামানত তলবের নোটিশ প্রত্যাহার করার দাবী
২৩.২.৬৬ ডঃ মাহমুদকে প্রহারের প্রতিবাদে প্রদেশে পূর্ণ ছাত্র ধর্মঘট পালন
২৩.২.৬৬ আজাদের উপর জামানত তলবের নোটিশ প্রত্যাহারের দাবী
২৪.২.৬৬ অবিলম্বে আজাদের উপর প্রদত্ত নোটিশ প্রত্যাহার করার দাবী
২৫.২.৬৬ শিক্ষাবিদ অধ্যাপক হাইয়ের অভিমতঃ বাংলাকে উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণে বিলম্বের ফলে জাতীয় স্বার্থের ক্ষতি হইবে
" সংবাদপত্রের উপর দমননীতির প্রতিবাদঃ আজাদের উপর হইতে জামানত তলবের নোটিশ প্রত্যাহার দাবী
২৭.২.৬৬ কর্তৃপক্ষের দাবী ভিত্তিহীনঃ ধর্মঘটী কর্মচারী সমিতির সেক্রেটারীর বিবৃতি
" বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্রতা নষ্ট ও শিক্ষককে প্রহার করার সকল মহলের ক্ষোভঃ দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দাবী
১.৩.৬৬ আজ ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট
" আজ হইতে বেবী ট্যাক্সিও রিক্সা ধর্মঘট আহবান
২.৩.৬৬ সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে চ্যান্সেলর নিয়োগ করার দাবীঃ ঢাকায় পূর্ণ ছাত্র ধর্মঘট
" শহরে বেবী ট্যাক্সী ধর্মঘটঃ ৪৩ জন গ্রেফতার
৩.৩.৬৬ হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট প্রসঙ্গঃ পর্য্যালোচনার জন্য উজির সভার সাব-কমিটি গঠন
৪.৩.৬৬ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলিতে গুন্ডাদের দৌরাত্ম্য অব্যাহতঃ গতকল্য ফজলুল হক ও ইকবাল হলে ১০ জন ছাত্র আহতঃ ডক্টর মতিন চৌধুরীকে ভীতি প্রদর্শন
৫.৩.৬৬ ন্যাপের জনসভায় প্রস্তাব গ্রহণঃ অবিলম্বে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের দাবী
৭.৩.৬৬ ধর্মঘটকারী ছাত্রদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে--গবর্ণর
" বিশ্ববিদ্যালয়ের আশংকাজনক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে নাগরিক কমিটি গঠিত
৮.৩.৬৬ রাজবন্দী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাবলী সম্পর্কিত মূলতবী প্রস্তাব নাকচ হওয়ায় জাতীয় পরিষদ অধিবেশনের উদ্বোধনী দিবসেই বিরোধী দলের ওয়াক আউট
" ভাইস চ্যান্সেলরের অপসারণের দাবীতে ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট
৯.৩.৬৬ জাতীয় পরিষদে প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আইয়ুব খান বলেনঃ পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার কায়েম হইলে দেশে পুনরায় রাজনৈতিক স্থিতিহীনতা দেখা দিবে
" একটি অভিনব স্মারকলিপির প্রস্তুতিঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র ও শিক্ষক কম্যুনিষ্ট?
১২.৩.৬৬ পাটের নিম্নতম মূল্য ৪০ টাকা নির্দ্ধারণের দাবী সম্বলিত প্রস্তাব পেশঃ পাট চাষীদের বঞ্চিত করিয়া তাহাদের অর্থে বড় বড় শহর গড়িয়া উঠিতেছে
১৩.৩.৬৬ স্বতন্ত্র দলীয় সদস্যবৃন্দ কর্তৃক আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের দাবী
১৫.৩.৬৬ গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত বিরোধী দলীয় কমিটির রিপোর্ট পেশঃ দেশে সুষ্ঠ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি কায়েমের জন্য জনগণের প্রকৃত নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করা আবশ্যক
" মুজিবের ৬ দফা দাবীর প্রতি করাচী আওয়ামী লীগের সমর্থন
১৭.৩.৬৬ জমি লইয়া স্কুল শিক্ষকঃ মোক্তারের বচসার শোচনীয় পরিণতিঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ছাত্রদের উপর পুলিসের গুলী বর্ষন ৪১ জন নিহত ৯ জন আহত
" বিরোধী দলের তীব্র সমালোচনার মুখে জাতীয় পরিষদঃ পুজিবিনিয়োগ কর্পোরেশন অর্ডিন্যান্স অনুমোদিত।
১৮.৩.৬৬ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় শোকের কালোছায়াঃ ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে পূর্ণ হরতাল পালন।
" ছাত্র হত্যা সম্পর্কিত মুলতবী প্রস্তাব অগ্রাহ্য
১৯.৩.৬৬ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে ৬ দফার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা

Dhaka University Institutional Repository

"	গবর্ণর বলেনঃ দেশের সংহতি বিনষ্টকারী শক্তিকে ধ্বংস করা হইবে।
২০.৩.৬৬	দেশের সংহতি বিনষ্টকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার আহবানঃ ছয় দফা প্রস্তাব কোনক্রমেই বাস্তবায়িত হইতে দেওয়া হইবে না।
"	মালিক হামিদ সরফরাজ কর্তৃক পুর্ব পাকিস্তানের সায়ত্তশাসন দাবীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন।
"	আওয়ামীলীগ প্রেসিডেন্ট পদে শেখ মুজিব
"	২২শে মার্চ হইতে গণতন্ত্র সপ্তাহ শুরু।
২১.৩.৬৬	ফজলুল কাদের চৌধুরী বহিস্কৃত
২২.৩৬৬	আওয়ামী লীগ কর্তৃক ভুট্টোর চ্যালঞ্জ গ্রহণ।
"	পশ্চিম পাক- হাইকোর্ট কর্তৃক আওয়ামী লীগ নতা খওয়াজা রফিককে মুক্তি দানের নির্দেশ।
"	দুই প্রদেশ অর্থনৈতিক বৈষম্য দুরীকরণের নয়া সুপারিশঃ পাট ও পাটজাত দ্রব্য হইতে অর্জিত সমুদয় অর্থ পাঁচ বৎসরের জন্য পূর্ব পাকিস্তানকে দেওয়া হউক।
২৩.৩.৬৬	আতাউর রহমান ও ফরিদ আহমদের বিবৃতিঃ আসল সমস্যা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য গৃহযুদ্ধ ও বৃহত্তর বঙ্গের ধুয়া তোলা হইয়াছে।
২৫.৩.৬৬	চটকল শ্রমিক ফেডারেশনের সমেলনের প্রস্তাবাবলী
"	বহিষ্কারাদেশ সম্পর্কে ফজলুল কাদের চৌধুরী বলেনঃ যে দেশে বাক-স্বাধীনতা ও ভোটদানের অধিকার নাই সে দেশে সবই সম্ভব
২৮.৩.৬৬	সায়ত্তশাসনের দাবীর প্রতি ন্যাপের সমর্থন
২৯.৩.৬৬	বাবুপুরা বস্তির ছিন্নমুল অধিবাসীদের বিক্ষোভ
২.৪.৬৬	চট্টগ্রামে জেল আক্রমণকারী বিক্ষুব্ধ জনতার উপর পুলিসের গুরীবর্ষনে ১ জন হিনতঃ শতাধিক আহত
৪.৪.৬৬	সায়ত্তশাসনের দাবীদারগণ লাহোর প্রস্তাবের ভুল ব্যাখ্যা করিতেছেন
৬.৪.৬৬	শেখ মুজিবের ব্যাপক সফরসুচী
১৪.৪.৬৬	পাটের ন্যূনতম মুল্য ৪০ টাকা ধার্য্য করার দাবী
১৬.৪.৬৬	মুজিব বলেনঃ আমাদের নৈতিক বিজয় সুচিত হইয়াছে
২১.৪.৬৬	কনভেনশন লীগ কাউন্সিলের প্রস্তাবাবলীঃ খাদ্য-দ্রব্যের মুল্য বৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশঃ পাট চাষীদের ন্যায্য মূল্য প্রদানের দাবী
২২.৪.৬৬	সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে দমননীতির তীব্র নিন্দা
"	ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের সভায় দ্রব্যমুল্য বৃদ্ধির জন্য উদ্বেগ প্রকাশ
"	শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করিয়া সিলেট প্রেরণ
২৪.৪.৬৬	কুষ্টিয়ার জনসভায় সরকারের খাদ্যনীতির তীব্র সমালোচনা
"	শেখ মুজিবকে জামিন দানের পর পুনরায় আটক করিয়া মোমেনশাহী প্রেরণ
২৫.৪.৬৬	পল্টনের বিরাট জনসভায় ছয়দফা ঘোষণাঃ ছয়দফা প্রস্তাব পাকিস্তানের গণশক্তির 'মুক্তির' সনদ
২৫/৪/৬৬	লাহোরে সাংবাদিকদের প্রতীক ধর্মঘট
২৯.৪.৬৬	মোছলেম লীগ কর্তৃক পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দাবী
৩০.৪.৬৬	কুমিল্লার জনসভায় শেখ মুজিব বলেন ৬দফাই দেশবাসীর মুক্তি সনদ
১.৫.৬৬	খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে এনডিএফ
২.৫.৬৬	গবর্ণর বলেন টেন্ডুপাতা ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে না
৪.৫.৬৬	এন ডি এফ কমিটির প্রস্তাব অবিলম্বে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের দাবী
"	হাঙ্গামা সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত ১০৯ জন গ্রেফতার
৫.৫.৬৬	দ্রব্যমূল্য রোধের দাবীতে ন্যাপের পথসভা
৬.৫.৬৬	পেশোয়ারে ১৪৪ ধারা জারি
"	সস্তা মূল্যে খাদ্য চাই- ন্যাপের সপ্তাহব্যাপী বিক্ষোভ কর্মসূচীর ২য় দিবস
"	ইত্তেফাকের রীট আবেদন নাকচ
৭.৫.৬৬	-খাদ্য পরিসস্থিতি- আতাউর রহমান বলেনঃ সরকারী বরাদ্দ অপ্রতুলঃ সরকারী ভাষ্যঃ সংরক্ষিত খাদ্যশস্য আজ বাজারে ছাড়া হইবে।
"	ন্যাপ কর্মীদের পথসভা অব্যাহত
"	শেখ মুজিবের সিলেট উপস্থিতি
৯.৫.৬৬	আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবঃ জমির খাজনা ও কৃষকদের প্রদত্ত ঋণের কিস্তি আদায় বন্দের দাবী
"	১০ই মে শেখ মুজিবের মোমেনশাহী যাত্রা
১০.৫.৬৬	শেখ মুজবসহ ৭ জন আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতারঃ ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল
১১.৫.৬৬	শেখ মুজিবের হিবিয়াস কর্পাস
১২.৫.৬৬	২২শে মে সমগ্র প্রদেশে খাদ্য দাবী দিবস
১২.৫.৬৬	নেতৃবৃন্দ কর্তৃক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য দেশরক্ষা আইন প্রয়োগের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন।
১৩.৫.৬৬	ধর্মঘট করিলে বহিস্কার করা হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৩.৫.৬৬ ধর্মঘট পালনঃ আজ পুনরায় ধর্মঘট
১৪.৫.৬৬ আওয়ামী লীগ নেতাদের গ্রেফতার প্রসঙ্গঃ সরকারের উপর কারণ দর্শাইবার নোটিশ
১৫.৫.৬৬ পল্টনে বিড়ি শ্রমিক সভায় দাবী পুরণ না করা পর্য্যন্তঃ সংগ্রাম অব্যাহত রাখার সংকল্প ঘোষণা
২১.৫.৬৬ আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ৭ই জুন হরতার
" বিড়ি শ্রমিক সম্মেলনঃ টেন্ডুপাতা অর্ডিন্যান্স বাতিলের দাবী
২২.৫.৬৬ চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতার
" আতাউর রহমানের উপর নিষেধাজ্ঞা
" আজ খাদ্য দাবী দিবস
২৩.৫.৬৬ বিড়ি শ্রমিক আন্দোলন
" খাদ্য দাবী দিবস পালনঃ প্রদেশে পূর্ণাঙ্গ রেশনিং ব্যবস্থা চালুর দাবী
২৪.৫.৬৬ ৭ই জুন প্রদেশে সাধারণ ধর্মঘট পালনের আহবান
২৪.৫.৬৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাবলীঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির আশংকা প্রকাশ
" আতাউর রহমানের উপর নিষেধাজ্ঞা অবিলম্বে প্রত্যাহার করিয়া লওয়ার জন্য জনাব নুরুল আমীনের আহবান
" আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জনসভাঃ অবিলম্বে সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী
৩০.৫.৬৬ নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবী মালিবাগের চৌরাস্তায় জনসভা
৩১.৫.৬৬ হরতালকে সফল করার আহবান
১.৬.৬৬ আওয়ামী লীগের প্রচারপত্র আঠকের নিন্দা
২.৬.৬৬ ন্যাপের জনসভায় মাইক ব্যবহারের অনুমতি বাতেল
৪.৬.৬৬ হরতালের প্রাক্কালে প্রাদেশিক গবর্ণরের কঠোর হুঁশিয়ারী। অশুভ প্রচেষ্টার মোকাবেলার জন্য সরকার সমপূর্ণ প্রস্তুত রহিয়াছেন।
৫.৬.৬৬ হরতালকে সফল করার আহবান
৬.৬.৬৬ ন্যাপের উদ্যোগে জনসভাঃ পুর্ণ আঞ্চলিক সায়ত্তশাসনের জোর দাবী
৬.৬.৬৬ হরতাল প্রশ্নে আওয়ামী লীগ ও গবর্ণর আইন শৃংখলা ভঙ্গের চেষ্টা কঠোর হস্তে দমন করা হইবে। হরতাল সফল করার জন্য আওয়ামী লীগের প্রচেষ্টা
৭.৬.৬৬ জাতীয় পরিষদে শাসনতন্ত্র সংশোধনের চারিটি বেসরকারী বিল অগ্রাহ্য
" আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আজ প্রদেশে হরতাল (শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে)
৮.৬.৬৬ নারায়ণগঞ্জে ও ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি
" সরকারী প্রেসনোটঃ পুলিসের গুলিতে ১০ জননিহত
৯.৬.৬৬ পশ্চিম পাকিস্তান পরিষদের বিরোধী দলীয় সদস্যদের পরিষদ কক্ষ বর্জন
" সরকারী প্রেসনোট আরও একজনের মৃত্যু
১০.৬.৬৬ আজ আওয়ামী লীগের জরুরী বৈঠক
১২.৬.৬৬ আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জুলুম প্রতিরোধ দিবস
১৫.৬.৬৬ শেখ মুজিব ও অন্যান্য নেতার হেবিয়াস কর্পাসের শুনানী শুরু
" প্রেস কোর্ট-অব অনার ঃ তিনটি পত্রিকার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বাতেল
" আসন্ন প্রতিবাদ দিবসঃ সফল করুন-, আওয়ামী লীগ নস্যাৎ করুন - গমীর উদ্দিন প্রধান
১৭.৬.৬৬ ইত্তেফাক সম্পাদক গ্রেফতার
১৮.৬.৬৬ ইত্তেফাকের প্রকাশনালয় নিউনেশন প্রেস বাজেয়াফত
১৯.৬.৬৬ ইত্তেফাকের ছাপাখানা সম্পর্কিত মুলতবী প্রস্তাব অগ্রাহ্যঃ বিরোধীদলের ওয়াক-আউট
" জুলুম প্রতিরোধ দিবসঃ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সভা
২০.৬.৬৬ জুলুম প্রতিরোধ দিবস পরিসমাপ্ত
২২.৬.৬৬ নিউ নেশন প্রেস বাজেয়াফত করণের বৈধতা চ্যালেঞ্জঃ প্রাদেশিক সরকারের উপর ঢাকা হাইকোর্টের রুল জারী
২৩.৫.৬৬ দেশরক্ষা আইনে মিজানুর রহমান গ্রেফতার
২৫.৬.৬৬ শাহ আজিজ বলেনঃ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সম্পদ পুঞ্জিভুত করার জন্য পাকিস্তান সৃষ্টি হয় নাই
" ফজলুল কাদের চৌধুরী কর্তৃক পুর্ণ আঞ্চলিক সায়ত্তশাসনের দাবী
২৭.৬.৬৬ বিরোধী দলীয় রাজনীতির মোড় পরিবর্তনের পূর্ব্বাবাসঃ অধিকার আদায়ের সংগ্রাম জোরদার করার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টার সম্ভাবনাঃ যুক্তফ্রন্ট গঠনের বিষয় বিবেচনাধীন
" ১৪ই জুলাই বিড়ি শ্রমিকদের ভুখা দিবস পালন
২৮.৬.৬৬ জনাব আবুল কাশেম কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানী শিল্পে সাহায্যের আহবান
২৯.৬.৬৬ আসাদুজ্জামান খানের অভিযোগঃ সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতেছেন
" কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা
" মিজানুর রহমানের গ্রেফতারের প্রশ্নঃ মাহমুদ আলী বহিষ্কৃতঃ বিরোধী দলের দুইবার ওয়াক আউট
১.৭.৬৬ চাউলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মুল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি
২.৭.৬৬ ভাসানী কর্তৃক ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী গ্রহণের আহবান

Dhaka University Institutional Repository

"	পাক-চীন মৈত্রী সাময়িক নীতি প্রসূত নহেং বরং পারস্পরিক সহযোগিতা ও সদিচ্ছার উপরই সুপ্রতিষ্ঠিতঃ প্রেসিডেন্টের মাসপয়লা বেতার ভাষণ
৭.৭.৬৬	মাহমুদ আলী বলেনঃ মিজানুর রহমান চৌধুরীর আটক সম্পূর্ণ বে-আইনী
"	আওয়ামী লীগের সংগ্রাম অব্যাহত রাখার সংকল্প
৮.৭.৬৬	মুজিবের ছয় দফা বনাম ভারত
"	ভিয়েৎনাম সম্পর্কিত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় বিরোধীদলের ওয়াক আউট জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা
৯.৭.৬৬	প্রাদেশিক পরিষদে বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্সের তীব্র সমালোচনা
"	ভিয়েৎনাম প্রশ্নে নয়জন বিরোধী দলীয় সদস্যের বিবৃতিঃ সাম্রাজ্যবাদীরা সমগ্র বিশ্বে সমরানল ছড়াইতেছে
১৩.৭.৬৬	শ্রমিক ফেডারেশনের ৮ দফা প্রস্তাব
১৪.৭.৬৬	প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধী দলের অভিযোগ টেন্ডুপাতা অর্ডিন্যান্সের দ্বারা সরকার মৌলিক অধিকার হরণ করিয়াছেন
১৫.৭.৬৬	ইপিআর টি সি কর্মচারীদের ধর্মঘট
"	প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধীদলীয় সদস্য কৃর্তক লবনের উপর করের বোঝা চাপানোর তীব্র নিন্দা
১৯.৭.৬৬	ছয় দফা সমর্থন করি নাঃ ভাসানী
২০.৭.৬৬	গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম অপরিহার্য্যঃ নুরুল আমীন
২১.৭.৬৬	পশ্চিম পাকিস্তানে চেয়ারম্যানদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আণয়নের পথ বন্ধ
২৩.৭.৬৬	চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের জনসভাঃ শেখ মুজিবর ও অন্যান্যের আশু মুক্তি দাবী
২৫.৭.৬৬	১৫ই আগষ্ট হইতে আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলন
"	ইডেন কলেজে ছাত্রী ধর্মঘট
১.৮.৬৬	সবুর খান বলেনঃ চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন সম্ভব নহে
"	সর্বদলীয় বৈঠকের সাফল্য ঃ গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পন্থা সম্পর্কে নেতৃবৃন্দের তিন ঘন্টাব্যাপী আলোচনা
৩.৮.৬৬	বেতন বৃদ্ধির প্রতিবাদে ঢাকায় ছাত্রদের ধর্মঘট ও মিছিল
৫.৮.৬৬	জনাব এম, আহমদ বলেনঃ উভয় প্রদেশের বৈষম্য দুরীকরণে কমিশন কাজ করিতেছেন
৮.৮৬৬	সম্মিলিত আন্দোলনের উপর গুরুত্ব আরোপ এন,ডি,এফ-এর বৈঠকে রাজনৈতিক ও খাদ্য পরিস্থিতি পর্যালোচনা
৯.৮.৬৬	ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের অভ্যন্তরে শেখ মুজিবের মামলার শুনানী শুরু
১০.৮.৬৬	তীব্র সমালোচনার মুখে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স গৃহীত
"	নিউ নেশন প্রেস বাজেয়াফত করণের আদেশ অবৈধ ঘোষিত
১২.৮.৬৬	এন,ডি,এফ এর সভায় সায়ত্তশাসনের দাবী
১৩.৮.৬৬	ছয় দফা আদায়ের আন্দোলন সম্পর্কে আওয়ামী লীগ
১৬.৮.৬৬	গবর্ণরের মাসমধ্য বেতার ভাষণঃ সংহতি বিনষ্টকারীদের মূলোৎপাটনের আহবান
"	কনভেনশন লীগের উদ্যোগে জাতীয় সংহতি দিবস পালন
"	আওয়ামী লীগের জনসভার অনুমতি মিলে নাই
১৮.৮.৬৬	প্রাদেশিক পরিষদে আনসারদের প্রতি ঔদাসীন্যের সমালোচনাঃ অধিক পরিমাণে অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরী ও সামরিক একাডেমী স্থাপনের দাবী প্রত্যাখ্যাত
১৯.৮.৬৬	রেল কর্মচারী লীগের স্বীকৃতি বাতেলের আদেশ অবৈধঃ ঢাকা হাইকোর্টের রায়
১৯.৮.৬৬	আমেনা বেগম কর্তৃক সিলেটে আটক নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবী
২০.৮.৬৬	ছাত্র সভায় সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী
২৪.৮.৬৬	আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আগামী শুক্রবার ময়মনসিংহে জনসভা
২৫.৮.৬৬	প্রদেশের মোট ১৬টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণাঃ ধর্মঘটের জের
"	খুলনার ৫টি জুটমিলে ত্রিশ হাজার শ্রমিকের ধর্মঘট
২৭.৮.৬৬	খুলনায় গোলযোগঃ দুইদলে মারামারি শহরে ১৪৪ ধারা বলবৎঃ ইপিআর ও পুলিশ বাহিনীর টহলঃ জুট মিলে ধর্মঘট অব্যাহতঃ ১জন নিহত ও অপর ৭ জন আহত
"	মোমেনশাহীতে আমেনা বেগম বলেনঃ ছয় দফা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে আরও শক্তিশালী করিবে
২৮.৮.৬৬	কলেজ শিক্ষক সমিতির অধিবেশন শিক্ষা সমস্যা বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ
"	অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে জাতীয় পরিষদের সদর দফতর ঢাকায় স্থানান্তরের ব্যবস্থা
২৯.৮.৬৬	প্রেসনোটঃ নাটোরে পুলিশের গুলীবর্ষণ
৩০.৮.৬৬	আদমজী মিলে আংশিক ধর্মঘট
"	বেসরকারী কলেজ শিক্ষকদের চাকুরীর নিরাপত্তা দাবী
৫.৯.৬৬	দেশ রক্ষা বিধিবলে নুরুল ইসলাম গ্রেফতার
৬.৯.৬৬	শহর আওয়ামী লীগের সভাঃ সমগ্র প্রদেশকে দুর্ভিক্ষ এলাকা ঘোষণার দাবী
৮.৯.৬৬	একটি জনসভাঃ তাহারা প্রতিরক্ষা সম্পর্কে শুনিল কিন্তু রাজনৈতিক সামলোচনা শুনিল না!
১০.৯.৬৬	মহাকুমা আওয়ামী লীগের সভাঃ রাজবন্দী মুক্তি ও জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার দাবী
১১.৯.৬৬	শেখ মুজিবের মামলা
"	কিশোরগঞ্জে আওয়ামী লীগের জনসভা
১২.৯.৬৬	পশ্চিম পাকিস্তানে তার যোগাযোগ বিভাগের কর্মচারীদের ধর্মঘট অব্যাহত

Dhaka University Institutional Repository

১৩.৯.৬৬ দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ফলে পঃ পাকিস্তান তার কর্মচারীদের ধর্মঘটের অবসান
১৫.৯.৬৬ ফজলুল কাদের চৌধুরী গ্রেফতারঃ ৫০ হাজার টাকায় জামিন লাভ
১৮.৯.৬৬ চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের সভা
২০.৯.৬৬ প্রদেশের খাদ্য পরিস্থিতিঃ আওয়ামী লীগের উদ্বেগ প্রকাশ
" ঢাকার দুই সহস্রাধিক প্রাথমিক শিক্ষক জুলাই হইতে বেতন না পাওয়ায় দুর্ভোগ
২৩.৯.৬৬ ইপিআইডিসির অভ্যন্তরে-
২৫.৯.৬৬ সংহতির জন্য প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন অত্যাবশ্যকঃ জনসভায় প্রস্তাব গ্রহণ
১.১০.৬৬ ইপিআইডিসি বনাম মোহিনী মিলঃ এই মিল বন্ধের জন্য দায়ী কে
৩.১০.৬৬ পল্টনের জনসভায় প্রস্তাবঃ বন্যা দুর্গতদের পর্যাপ্ত রিলিফ দানের দাবী
৪.১০.৬৬ ফেনীতে আওয়ামী লীগের বিরাট জনসভাঃ ৬ দফা দেশের বহুমুখী সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়
১১.১০.৬৬ জেলখানায় ইত্তেফাক সম্পাদকের বিচার শুরু
" দাবী-দাওয়া পুরণের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে ৭ হাজার রেল কর্মচারীর ধর্মঘটের নোটিশ প্রদান
২০.১০.৬৬ চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ অফিসে হামলা
২০.১০.৬৬ মালেক উকিল কর্তৃক অসুস্থ রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী
২৫.১০.৬৬ জুলুম প্রতিরোধ দিবসের বক্তৃতাঃ শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আনীত মামলা খারিজ
" টঙ্গীস্থ বাটা শ্রমিকদের ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত
" কুলাউড়ায় মাহমুদ আলী কর্তৃক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হওয়ায় গণতন্ত্রীদের সমালোচনা
২৬.১০.৬৬ ছয় দফায় আপত্তিকর কিছুই নাইঃ ইহা দেশকে আরও শক্তিশালী করিবেঃ -পল্টনে জহীরুদ্দীনের মন্তব্য
৯.১১.৬৬ ওয়াপদা কর্মচারীদের ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত
" ২৮শে ডিসেম্বর হইতে আই,ডি,বি,পি কর্মচারীদের ধর্মঘট
১০.১১.৬৬ নারায়ণগঞ্জে শ্রমিক ধর্মঘট
১৫.১১.৬৬ আওয়ামী লীগের সভা সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী
১৬.১১.৬৬ ২৪ জন রাজবন্দীর মুক্তিলাভ
" ইত্তেফাকের মামলাঃ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রাদেশিক সরকারের আবেদন নাকচ
১৮.১১.৬৬ এক সদস্য ট্রাইব্যুনাল গঠনঃ সরকার কর্তৃক নিউ নেশান প্রিন্টিং প্রেস পুনরায় বাজেয়াফত
২২.১১.৬৬ নিউনেশন প্রেস বাজেয়াফতকরণ প্রসঙ্গঃ হাইকোর্ট কর্তৃক সরকারের উপর কারণ দর্শাইবার নির্দেশ
২৩.১১.৬৬ সিলেট কলেজ অধ্যক্ষের উপর রুল জারি
২৭.১১.৬৬ শহরে বেবী ট্যাক্সী ধর্মঘট
২৮.১১.৬৬ সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে আসাদুজ্জামান বলেনঃ মৌলিক কর্মসূচীর ভিত্তিতে বিরোধী দলসমূহের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত
২.১২.৬৬ ন্যাশনাল ব্যাংক কর্মচারীদের ধর্মঘট শুরু
৩.১২.৬৬ আমেনা বেগম কর্তৃক চাউলের মুল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ
" শহরে গুন্ডাদের দৌরাত্ম্য
৩.১২.৬৬ ন্যাশনাল ব্যাংক কর্মচারীদের ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিবস অতিবাহিত
৪.১২.৬৬ পুর্বাঞ্চল শাখায় ন্যাশনাল ব্যাংক কর্মচারীদের অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু
" করাচীতে ১৪৪ ধারা জারী
" জাতীয় পরিষদে প্রহার সম্পর্কিত মুলতবী প্রস্তাব বাতেল
৫.১২.৬৬ শিল্প উপদেষ্টা পরিষদের অধিবেশনে শিল্পপতিদের অভিযোগঃ পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পোন্নয়ন অত্যন্ত মন্থর গতিতে চলিয়াছে
৫.১২.৬৬ ন্যাপের জনসভায় পুর্ণ আঞ্চলিক সায়ত্তশাসন কায়েমের দাবী
৬.১২.৬৬ ন্যাশনাল ব্যাংক কর্মচারীদের ধর্মঘট অব্যাহত
৭.১২.৬৬ পরিষদে শাহ আজিজুর রহমানের অভিযোগঃ সরকার মুলতবী প্রস্তাব উত্থাপনের পথে বাধা সৃষ্টি করিয়েছেন-
৮.১২.৬৬ ঢাকা জুট মিলে শ্রমিক ধর্মঘট
" জাতীয় পরিষদ সংশোধনী প্রস্তাব অগ্রাহ্য
৯.১২.৬৬ ন্যাশনাল ব্যাংক কর্মচারীদের ধর্মঘট অব্যাহত
১০.১২.৬৬ তীব্র সমালোচনার মুখে পরিষদ কার্য্যবিধি বিল গৃহীত
" ধর্মঘটী কর্মচারীদের দাবী -দাওয়া বিশ্লেষণ
" বিরোধী দল কর্তৃক প্রশ্ন উত্থাপনঃ বর্জন দুই ইউনীটে পুঁজি বরাদ্দে ব্যাপক বৈষম্য
১১.১২.৬৬ বায়তুল মোকাররমে শ্রমিক কর্মচারী সমাবেশঃ রেশন চাউলের দাম বিশ টাকায় হ্রাসের দাবী
" ন্যাশনাল ব্যাংক কর্মচারীদের ধর্মঘট অব্যাহত
" টঙ্গীতে শ্রমিকদের উপর গুলীবর্ষণ
১২.১২.৬৬ টঙ্গীতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ
১২.১২.৬৬ ন্যাশনাল ব্যাংক কর্মচারীদের সমর্থনে প্রতীক ধর্মঘট
১৪.১২.৬৬ পঃ পাকিস্তান ন্যাশনাল ব্যাংক কর্মচারীদের ধর্মঘট অবসান
১৫.১২.৬৬ জাতীয় পরিষদে নুরুল আমীন বলেনঃ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অবিচার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে
১৭.১২.৬৬ ঢাকা হাইকোর্ট কর্তৃক আওয়ামী লীগ নেতা জহুর আহমদ চৌধুরীর আটক অবৈধ ঘোষিত

Dhaka University Institutional Repository

১৮.১২.৬৬ বিভেদ সৃষ্টি অপচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করিবঃ আইয়ুব
" টঙ্গীতে গুলী বর্ষণের ঘটনাঃ বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী
" বার কাউন্সিল নির্বাচনে জনগণের বিজয়ই সূচিত হইয়াছে
১৯.১২.৬৬ পল্টনের জনসভায় মেহনতী জনতার আওয়াজঃ বিশ টাকা দরে রেশনের চাউল চাই
" গবর্ণর মোনায়েম বলেনঃ অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্য বিরোধী দলীয় নেতারাই দায়ী
" বিভিন্ন ছাত্র প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সায়ত্তশাসন সম্পর্কিত জাফরের বিবৃতির তীব্র প্রতিবাদ
২০.১২.৬৬ দ্রব্যমূল্য হ্রাসের দাবীতে সরকারী কর্মচারী সভা
২১.১২.৬৬ জাতীয় পরিষদে কামরুজ্জামানের অভিযোগঃ উন্নয়নের নামে কয়েক জনের ভাগ্যেরই উন্নতি হইয়াছে
" আমার জন্য কনভেনশন লীগের দুয়ার বন্ধঃ ভুট্টো
২২.১২.৬৬ করাচীতে ৩০ ব্যক্তি গ্রেফতার
" জাতীয় পরিষদে জনাব নুরুল আমিন বলেনঃ অবিলম্বে দেশ রক্ষা আইন প্রত্যাহার করা হউক
২৩.১২.৬৬ ২২শে জানুয়ারি প্রদেশব্যাপী প্রতিবাদ দিবস
" চট্টগ্রামে ১১ জন নেতা কর্তৃক আইন উজিরের উক্তির নিন্দা জ্ঞাপণ
" সরকার বুদ্ধিজীবীমহলকে বিশ্বাস করেন নাঃ নুরুল আমীনঃ দীর্ঘ বিতর্কের পর জাতীয় পরিষদে বার কাউন্সিল বিল গৃহীত
২৯.১২.৬৬ ইত্তেফাক সম্পাদককে মুক্তিদানের জন্য ১১ জন সম্পাদকের আবেদন
৩১.১২.৬৬ ন্যাপের উদ্যোগে জনসভা
১.১.৬৭ প্রায় আট বছর পর রাজনীতির নয়া অধ্যায় শুরু।
২.১.৬৭ বর্তমান খাদ্য সংকটঃ জাতীয় জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।
" অদ্য নিউনেশন প্রেস মামলার শুনানী পুনরারম্ভ।
৩.১.৬৭ কাইয়ুম খান কর্তৃক সরাসরি নির্বাচনে ব্যবস্থার প্রবর্তনের জন্য বিরোধী দলসমূহের যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাব।
" আজ নিউনেশন প্রিন্টিং প্রেসের মামলাল শুনানী শুরু।
৭.১.৬৭ পাটনায় জনতার উপর পুলিশের গুলীবর্ষনে ১০ ব্যক্তি নিহতঃ ২৩ জন আহত।
" আওয়ামী লীগের সভায় রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী।
৮.১.৬৭ বিরোধী দলীয় সদস্যবৃন্দ কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্সের তীব্র সমালোচনা।
১০.১.৬৭ কোসিগিনের নিকট আইয়ুবের বানীঃ জাম্মু ও কাশ্মীর বিরোধই পাক-ভারত সম্পর্ক অবনতির কারণ।
১১.১.৬৭ ঢাকা হাইকোর্ট কর্তৃক টেন্ডপাতা অর্ডিন্যান্স বৈধ ঘোষনা।
১৫.১.৬৭ দুইটি রাজনৈতিক দলের পোষ্টার।
" পাটকল ধর্মঘট সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী মন্তব্য।
" চটকল শ্রমিক ধর্মঘট স্থগিতকরণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা।
" কেন্দ্রীয় টেলিভিশন ইনসটিটিউট উদ্বোধনকালে প্রেসিডেন্ট বলেনঃ এছলামী জাতীয়তাবাদ ও শক্তিশালী কেন্দ্র পাকিস্তানের পক্ষে অত্যাবশ্যক।
১৯.১.৬৭ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্সের ৬নং ধারার তীব্র সমালোচনা। শাসনতন্ত্রে স্বীকৃত মৌলিক অধিকার লংঘন করা হইয়াছে। আসাদুজ্জামান খানের অভিযোগ।
২০.১.৬৭ তীব্র সমালোচনার মুখে প্রাদেশিক পরিষদে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স অনুমোদিত।
২১.১.৬৭ বিনা নোটিশে শহরে বাস ধর্মঘট।
২২.১.৬৭ শহরে বাস ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিবস অতিবাহিত।
২৩.১.৬৭ জননিরাপত্তা আইন বলে রসুল বখশ তালপুর গ্রেফতার।
" যানবাহন পরিস্থিতি আজ প্রতীক ধর্মঘট।
২৪.১.৬৭ শহরে বাস ধর্মঘটের অবসান।
২৫.১.৬৭ ন্যাশনাল ব্যাংকে কর্মচারীদের ধর্মঘট শেষ হইয়াছে --- কিন্তু।
২৬.১.৬৭ প্রাদেশিক পরিষদে তীব্র সমালোচনার মুখে শ্রম আইন অর্ডিন্যান্স অনুমোদিত।
২৮.১.৬৭ আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস সমূহে নির্বাচন।
" ওয়াপদা অর্ডিন্যান্স অনুমোদিত পানি - বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ।
" ওয়াপদা কর্মচারী ধর্মঘট প্রসঙ্গে।
২৯.১.৬৭ জগন্নাথ কলেজের নির্বাচনে ছাত্র লীগের জয়লাভ।
" বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসের নির্বাচনের ফলাফল।
৩০.১.৬৭ প্রেস নোট মওদুদীসহ ৫ ব্যক্তি গ্রেফতার।
" তিন দিনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হল নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া ছাত্রদের মধ্যে গোলযোগঃ তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি।
" নির্বাচনী কমিশনের রিপোর্ট। শক্তিশালী বিরোধী দলের অনুপস্থিতি ভাল লক্ষণ নহে।
১.২.৬৭ ৬ দফা দিবস পালনের নির্দ্দেশ।
২.২.৬৭ পঃ পাকিস্তানে রেল শ্রমিক ধর্মঘটঃ ট্রেন চলাচল বিঘ্নিত।
" মাস পয়লা বেতার ভাষনে প্রেসিডেন্ট বলেনঃ আমরা খাদ্য ঘাটতির সম্মুখীন হইয়াছি।
" আজ ছাত্র ধর্মঘটঃ বিশ্ববিদ্যালয় আরও তিন দিনের জন্য বন্ধ।
৪.২.৬৭ পশ্চিম পাকিস্তানে রেলওয়ে ধর্মঘটঃ পরিস্থিতির মোকাবেলায় সেনাবাহিনী তলবঃ লাহোরে গুলীবর্ষনে ছয় ব্যক্তি আহত।

Dhaka University Institutional Repository

"	করাচীতে ১৪৪ ধারা জারী।
"	করাচীতে ১৪৪ ধারা জারী।
৫.২.৬৭	শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ও উহার জবাব।
"	রেল ধর্মঘট পরিস্থিতির ক্রমোন্নতি।
৫.২.৬৭	আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট।
৭.২.৬৭	বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট।
৮.২.৬৭	গাইবান্ধায় পুলিশের গুলীবর্ষনে একজন ছাত্র নিহতঃ ছয়জন আহত।
৯.২.৬৭	পশ্চিম পাক রেলওয়ে ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক গ্রেফতার।
১৩.২.৬৭	৬-দফা বার্ষিকী বনাম পল্টন।
১৩.২.৬৭	ভাষা সম্মেলন সমাপ্ত সর্বস্তরে বাংলা চালুর দাবী।
১৪.২.৬৭	ছয়দফা দাবী দিবস উপলক্ষে জনসভাঃ নারায়ণগঞ্জ/চট্টগ্রাম।
১৪.২.৬৭	ওয়াপদার কর্মচারী ধর্মঘটঃ বেআইনী ঘোষনা।
১৫.২.৬৭	করাচী পোর্ট শ্রমিক ধর্মঘটঃ সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য।
"	সিদ্ধিরগঞ্জ ও ধানমন্ডি এলাকায় ১৪৪ ধারা জারী।
১৬.২.৬৭	ছাত্রলীগ সভাপতি গ্রেফতার।
১৭.২.৬৭	১০ই মার্চ ন্যাপের প্রতিবাদ দিবস।
১৮.২.৬৭	আজ রংপুরে ধর্মঘট ও জনসভা।
১৯.২.৬৭	বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে আজ চটকল শ্রমিক সভা।
"	দেশ রক্ষা বিধিবলে রানা আজাহার আলী গ্রেফতার।
২১.২.৬৭	শহরে মশাল শোভাযাত্রা।
২২.২.৬৭	সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু ও ২১শে ফেব্রুয়ারী সরকারী ছুটি ঘোষণার দাবীঃ ভাব গম্ভীর পরিবেশে সমগ্র প্রদেশে শহীদ দিবস উদযাপিত।
২৩.২.৬৭	শ্রমিক ফেডারেশনের সভায় ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কিত নয়া অর্ডিন্যান্স বাতিলের দাবী।
২৭.২.৬৭	লেখক সংঘের সভায় সরকারী কাজে বাংলা ভাষা চালু করার দাবী।
৪.৩.৬৭	দৌলতপুর জুট মিলঃ হাইকোর্ট কর্তৃক সরকারী আদেশ অবৈধ ঘোষিত।
৫.৩.৬৭	আজ বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে কৃষক সমাবেশ।
৬.২৩.৬৭	সকলের জন্য শিক্ষা আজাদী লাভের পর প্রদেশের দুই হাজার প্রাথমিক স্কুলের বিলুপ্তি ঘটিয়াছে।
"	নিশাত মিল শ্রমিকদের ভিক্ষা মিছিল।
৭.৩.৬৭	কৃষক গ্রেফতারের প্রতিবাদ।
"	রেল শ্রমিকদের স্বল্পমূল্যে রেশন প্রদানের দাবী।
৮.৩.৬৭	বাংলা বাজার স্কুলের ছাত্রীদের বিক্ষোভ।
১৪.৩.৬৭	চটকল শ্রমিকদের ধর্মঘটের সংবাদ।
"	সিলেট কলেজের ছাত্র বহিস্কার অবৈধ ঘোষিত।
১৫.৩.৬৭	চটকল শ্রমিক ধর্মঘটের তৃতীয় দিবস আদমজী ও ঢাকা জুট মিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রেশন প্রদান বন্ধ।
১৭.৩.৬৭	ভুট্টা খাইয়া এপর্যন্ত দুইজনের মৃত্যুঃ ১৭০ জন হাসপাতালে নীতঃ পাবনায় ভুট্টার বিরুদ্ধে জনতার বিক্ষোভঃ কতিপয় স্থানে অগ্নিসংযোগঃ বিক্ষোভকারীদের প্রতি পুলিশের গুলীবর্ষন।
১৮.৩.৬৭	সাবেক উজিরসহ প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক পঃ পাকিস্তানে সমবায় ব্যাংকসমূহের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ।
১৮.৩.৬৭	শাহ মোয়াজ্জেমের আটকাদেশ হাইকোর্ট কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত।
"	পাবনায় থমথমে ভাবঃ বিদ্যমান সান্ধ্য আইনের মেয়াদ বর্দ্ধিতঃ এপর্য্যন্ত ২৭ জন গ্রেফতার।
১৯.৩.৬৭	শ্রমিক ফেডারেশন কর্তৃক দাবী দিবস সমর্থন।
১৯.৩.৬৭	পাবনায় আজাদের সংবাদদাতা গ্রেফতার।
২০.৩.৬৭	পাবনার ঘটনা সম্পর্কে আমেনা বেগমঃ গুলীবর্ষন সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী।
২১.৩.৬৭	চটকল শ্রমিক ধর্মঘটঃ আরও ৩৩ হাজার শ্রমিকের যোগদান।
"	পাবনায় এপর্য্যন্ত প্রায় তিনশত ব্যক্তি গ্রেফতার।
২৫.৩.৬৭	গতকাল চটকল শ্রমিক ধর্মঘটের দ্বাদশ দিবস অতিবাহিতঃ বৃহস্পতিবার দুইদলে সংঘর্ষে ২ জনের মৃত্যুঃ ৩২জন গ্রেফতার।
২৮.৩.৬৭	পল্টন ময়দানের অনুমতি মিলিল না।
২৯.৩.৬৭	দেশরক্ষা আইন বলে ৫ ব্যক্তি গ্রেফতার।
৩০.৩.৬৭	স্বায়ত্বশাসনের দাবী দেশকে বিভক্ত করার সমতুল্যঃ প্রেসিডেন্ট।
"	চটকল শ্রমিকদের ধর্মঘট অব্যাহত।
"	ন্যাপের কার্য্যালয়ে জরুরী সভাঃ অবিলম্বে ধৃত নেতাদের মুক্তি দানের দাবী।
৩১.৩.৬৭	নিশাত জুট মিলের ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর একদল দুবৃত্তের হামলাঃ একজন নিহত।
"	পঃপাক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলযোগঃ ৩৩ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণ।
"	ন্যাপের বর্তমান ভুমিকা পরিবর্তিত হইবে না - ওসমানী।
১.৪.৬৭	যশোরের জনসভায় প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের ভাষণ। বিরোধী দল সমুহের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে কঠোর সতর্কবানী।

Dhaka University Institutional Repository

"	টঙ্গী শিল্প এলাকায় স্বতঃস্ফূর্ত প্রতীক ধর্মঘট।
৩.৪.৬৭	আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের ১০দিন ব্যাপী সফর সূচী।
"	৫ই এপ্রিল চটকল শ্রমিকদের প্রতি প্রতীক ধর্মঘট পালনের আহবান।
"	হায়দারাবাদে ১৪৪ ধারা জারী।
৪.৪.৬৭	শিক্ষাবিদ সমাবেশে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক স্বায়ত্বশাসন দাবীর তীব্র সমালোচনা।
৫.৪.৬৭	হাজারীবাগ ট্যানারী শ্রমিকদের প্রতীক ধর্মঘট পালন।
"	প্রতিবাদ দিবসের সভায় টঙ্গীর ঘটনার তদন্ত ও নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবী।
৭.৪.৬৭	মধুসুদন কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্র গ্রেফতারের প্রতিবাদ।
৮.৪.৬৭	প্রদেশকে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইয়াছে – গভর্নর।
৯.৪.৬৭	মেডিক্যাল ছাত্রদের প্রতীক ধর্মঘট পালন।
১১.৪.৬৭	খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলে ধর্মঘট অব্যাহতঃ ৮জন গ্রেফতার।
১২.৪.৬৭	ঝিনাইদহে পরীক্ষা কেন্দ্রে হাঙ্গামাঃ জনতার উপর পুলিশের গুলীবর্ষন।
"	টঙ্গীতে শ্রমিক নির্য্যাতন ও ধরপাকড় অব্যাহত।
১৩.৪.৬৭	পাকিস্তান সরকারের প্রতিক্রিয়াঃ মার্কিন সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের পক্ষে শুভ হইবে না।
"	গোপালগঞ্জে সাংবাদিকসহ ৫ ব্যক্তি গ্রেফতার।
১৮.৪.৬৭	দুইটি পরস্পর বিরোধী বিবৃতিঃ চটকল শ্রমিক ধর্মঘট প্রত্যাহার।
২০.৪.৬৭	চটকল ধর্মঘট অব্যাহত থাকিবে।
২৩.৪.৬৭	চটকল শ্রমিক ধর্মঘটের ৪১তম দিবস অতিবাহিত।
২৪.৪.৬৭	রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কর্তৃক ঐক্যজোট গঠনের প্রশ্নে আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্তের প্রতীক্ষা।
২৫.৪.৬৭	নিম্নবেতনভুক কর্মচারীদের ধর্মঘটঃ মিটফোর্ড হাসপাতালের প্রায় ৫ শত রোগী চরম দুরবস্থায় সম্মুখীন।
২৭.৪.৬৭	ঐক্যজোট প্রশ্নে বিরোধী দলীয় নেতাদের দীর্ঘসুত্রতা অব্যাহত।
"	চটকল ধর্মঘট প্রত্যাহারের কারন ব্যাখ্যা।
"	মিটফোর্ড হাসপাতালে ধর্মঘট প্রত্যাহারঃ ছয় ব্যক্তি গ্রেফতার।
২৯.৪.৬৭	ঐক্যজোট গঠনের প্রশ্নে বিরোধী দল সমুহের খসড়া কর্মসূচী প্রনয়নঃ কিন্তু শেষ রক্ষা হইবে কি ?
"	ঐক্য প্রচেষ্টার প্রশ্নে ভাসানীর শর্ত।
১.৫.৬৭	হায়দারাবাদে পুনরায় ১৪৪ ধারা জারী।
"	ন্যাপ ওয়ার্কিং কমিটির সভা।
"	পল্টন ময়দানে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সভা।
২.৫.৬৭	নবগঠিত দলসমুহের ঐক্য জোটের ৮দফা কর্মসুচী।
৩.৪.৬৭	ন্যাপ – আওয়ামী লীগ আঁতাত ?
৪.৫.৬৭	পঃ পাক ন্যাপ নেতৃবৃন্দের মন্তব্যঃ পাকিস্তানের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী পররাষ্ট্রনীতি প্রনয়ন করা উচিত।
৮.৫.৬৭	কাউন্সিল লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে অবিলম্বে দেশের জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের দাবী।
১৩.৫.৬৭	সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক নসরুল্লার আটকাদেশ বেআইনী ঘোষিত।
"	পল্টনে ন্যাপের জনসভাঃ সরকার ও পিডিএম এর ৮ দফার সমালোচনা।
"	প্রাদেশিক সরকারের উপর রুল জারীঃ ন্যাপ নেতৃবৃন্দের আটকের বৈধতা চ্যালেঞ্জ।
১৫.৫.৬৭	আদমজী নগরে শ্রমিক সভা অনুষ্ঠিতঃ দেশের স্বার্থে চটকল জাতীয়করণের দাবী।
১৫.৫.৬৭	টঙ্গীতে শ্রমিক নির্য্যাতনের অভিযোগ।
১৭.৫.৬৭	সংবাদ কর্মচারীদের ধর্মঘট অব্যাহত।
২০.৫.৬৭	ন্যাপ কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকঃ হাজী দানেশ ও অন্যান্য নেতার আটকের নিন্দা।
২২.৫.৬৭	প্রাঃ আওয়ামী লীগ কমিটির সিদ্ধান্তঃ ৬ দফায় প্রতি পূর্ণ আস্থাজ্ঞাপনঃ ৮দফা কাউন্সিল অধিবেশনে প্রেরণের প্রস্তাব।
২৩.৫.৬৭	পিডিএম-এর ৮-দফার সমালোচনা করিয়া ন্যাপের ১০ দফা প্রকাশ।
২৭.৫.৬৭	জব্বলপুরে সেনাবাহিনী তলব। জনতার উপর গুলীবর্ষনে ২ ব্যক্তি নিহত।
২৮.৫.৬৭	ঢাকা নারায়ণগঞ্জ ও জয়দেবপুরে ১৪৪ ধারা জারী।
৪.৬.৬৭	কুষ্টিয়ায় ১৪৪ ধারা জারী।
৭.৬.৬৭	করাচীতে বিক্ষোভঃ দুই ব্যক্তি আহত।
৮.৬.৬৭	রাজধানীতে ২০ ব্যক্তি গ্রেফতার।
১৭.৬.৬৭	প্রাদেশিক পরিষদে সরকার দলীয় কতিপয় সদস্যের বিদ্রোহ।
২৭.৬.৬৭	ঢাকায় ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার।
২৯.৬.৬৭	জনগণের নাগরিক অধিকার খর্ব করা হইয়াছে। জাতীয় পরিষদে জরুরী অবস্থার তীব্র সমালোচনা।
৬.৭.৬৭	শ্রমিক নেতার অভিযোগঃ টঙ্গীতে শ্রমিক নির্য্যাতন অব্যাহত রহিয়াছে।
১৫.৭.৬৭	পল্টনে জনসভার অনুমতি এখন ও মিলে নাই।
১৭.৭.৫৬	আটক ব্যক্তিদের সংখ্যা সম্পর্কিত প্রশ্ন উৎযাপনের দাবী প্রত্যাখ্যাতঃ প্রতিবাদে বিরোধী ও স্বতন্ত্র দলীয় সদস্যদের পরিষদ কক্ষ বর্জন।
২১.৭.৬৭	দ্বিতীয় দিনেও ঢাকায় ছাত্র মিছিল ও পথসভা অব্যাহত।

Dhaka University Institutional Repository

২২.৭.৬৭ বন্দীমুক্তির দাবীতে ছাত্র বিক্ষোভ অব্যাহত।
২৩.৭.৬৭ ২রা আগষ্ট প্রদেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট।
২৫.৭.৬৭ আওয়ামী লীগের বৈঠক অনুষ্ঠানের আবেদন অগ্রাহ্য।
৩০.৭.৬৭ শান্তিপূর্ণ ছাত্র মিছিলের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ।
৩১.৭.৬৭ নেতৃবৃন্দ কর্তৃক ছাত্রদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জের নিন্দা।
১.৮.৬৭ ২রা আগষ্টের প্রস্তুতি উপলক্ষে ছাত্রসভা। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে ১৪৪ ধারা জারী।
১.৮.৬৭ ২০শে আগষ্ট দাবী দিবস পালনের জন্য ন্যাপের প্রতি মওলানা ভাসানীর নির্দ্দেশ।
২.৮.৬৭ আজও যাহারা কারাগারে আছেন।
" আজ বন্দী মুক্তি দিবস পালনঃ প্রদেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট।
৩.৮.৬৭ আমেনা বেগম কর্তৃক পুলিশী হামলার নিন্দা।
" প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ছাত্র ধর্মঘট।
" আজ ডাক্তারদের ধর্মঘট।
" নার্সদের প্রতীক ধর্মঘট পালন।
" আজ প্রতিবাদ দিবস।
" ছাত্রসভার দৃপ্ত ঘোষণা। রাজবন্দীদের মুক্ত করা হইবেই।
" গোলযোগ সম্পর্কে সরকারী প্রেসনোট।
" ছাত্র জনতার উপর পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপঃ বহু আহত অনেক ছাত্র গ্রেফতারঃ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অভ্যন্তরে ডাক্তার ও নার্স প্রহৃত।
৪.৮.৬৭ নেতৃবৃন্দের বিবৃতিঃ হাসপাতালের অভ্যন্তরে পুলিশী হামলার নিন্দা।
" খুলনা ও দৌলতপুরে ছাত্র ধর্মঘট।
" ছাত্রসভার দাবীঃ রাজবন্দীদের ১৫ আগষ্টের মধ্যে মুক্তি দিতে হইবে।
" পুলিশী হামলার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট পালন।
" হাসপাতালের অভ্যন্তরে পুলিশী হামলার প্রতিবাদে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তার ও নার্সদের ২৪ ঘন্টাব্যাপী ধর্মঘট পালন।
" গতকালও শহীদ মিনারে পুলিশ মোতায়েন ছিল।
৫.৮.৬৭ মালেক উকিল কর্তৃক ছাত্রদের উপর পুলিশী হামলার নিন্দা।
৭.৮.৬৭ গভর্নরের প্রতি উষ্ঠক বর্ষনঃ ৮৯ ব্যক্তির কয়েক ঘন্টা হাজত বাস।
৮.৮.৬৭ বন্দী মুক্তি দিবস পালন সম্পর্কে কুষ্টিয়ায় ৬জন ছাত্র গ্রেফতার।
৯.৮.৬৭ রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পেশাগত পোশাক ছাড়া নার্সদের কাজে যোগদান অব্যাহত।
৯.৮.৬৭ মওলবী বাজারে ১৪৪ ধারা জারী।
১২.৮.৬৭ করাচীতে দুই মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারী।
১৪.৮.৬৭ মোমেনশাহীতে রেশনের আটা ভক্ষনে ৮৫ জন সংজ্ঞাহীন।
১৭.৮.৬৭ শনিবার সকাল নয়টায় মা-বোনদের জমায়েত।
১৮.৮.৬৭ আওয়ামী লীগের কোন্দল চূড়ান্ত পর্য্যায়ে পৌঁছিয়াছে।
" আলীম আল রাজী কর্তৃক প্রেসিডেন্টের মন্তব্যের সমালোচনা।
" নারী শিক্ষার সুযোগ সুবিধার দাবীতে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীদের সাধারণ সভা ও মিছিল।
" ছাত্র ইউনিয়ন কর্তৃক আরবী হরফে বাংলা লেখা সংক্রান্ত প্রস্তাবের নিন্দা।
" ন্যাপের জনসভার অনুমতি মিলে নাই।
" চট্টগ্রামে দুইটি পাল্টা শ্রমিক ইউনিয়নের মধ্যে সংঘর্ষেঃ ২ ব্যক্তি নিহত।
১৯.৮.৬৭ ৬-দফা বনাম পিডিএমঃ দ্বিধাবিভক্তির সুখে আজ ঢাকায় আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন।
" দাবী দিবসের প্রস্তুতিঃ ন্যাপের পথসভা অনুষ্ঠিত।
২০.৮.৬৭ ১৪ জন প্রভাবশালী সদস্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনঃ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে পিডিএম-এ যোগদান না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
" গভর্নর সমীপে স্মারকলিপি পেশঃ রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে ঢাকা মহিলা সমাজের বিক্ষোভ।
" রাজবন্দীদের মুক্তি দাবীঃ পুনরায় ছাত্র আন্দোলনের সিদ্ধান্ত।
২৩.৮.৬৭ ছাত্র ইউনিয়ন ও লীগ কর্তৃক ৩০শে আগষ্ট প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত।
" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮জন ছাত্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।
২৪.৮.৬৭ ভারপ্রাপ্ত সম্পাদিকা কর্তৃক আঃ লীগের ১৪ জন সদস্যের প্রতি শোকজ নোটিশ।
২৬.৮.৬৭ সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও আমেনা বেগমের বিবৃতি - প্রাদেশিক আঃ লীগ কমিটি বাতিলের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় কমিটির নাই।
২৮.৮.৬৭ প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকঃ পাকিস্তান আঃ লীগ সাংগঠনিক কমিটি গঠনের প্রস্তাব।
" লালদীঘি ময়দানে বিরাট সভাঃ শ্রমিক স্বার্থবিরোধী সকল কালাকানুন বাতিলের দাবী।
" এক মাসের জন্য ঢাকায় পুনরায় ১৪৪ ধারা জারী।
২৯.৮.৬৭ ছাত্র নেতাদের যুক্ত বিবৃতিতে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার দাবী।
" পিন্ডিতে গভর্নর মোনায়েম খানের স্পষ্ট উক্তিঃ রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হইবে না।

Dhaka University Institutional Repository

৩০.৮.৬৭ ছাত্রদের উদ্যোগে অদ্য বন্দী মুক্তি দিবস।
৩১.৮.৬৭ ঢাকায় বন্দীমুক্তি দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের ধর্মঘট পালন।
১.৯.৬৭ ফরিদপুর উপনির্বাচনে সরকারী কর্মচারীদের হস্তক্ষেপের অভিযোগ।
২.৯.৬৭ ষ্টেটবাস চালক ও কন্ডাক্টরদের আকস্মিক ধর্মঘটঃ যাত্রী বহনের অনুপযুক্ত বাস চালাইতে অস্বীকৃতি।
৫.৯.৬৭ বণিক ফেডারেশন বিভক্তিকরণঃ পূর্ব পাকিস্তানের দাবী গ্রহণে বিশেষ কমিটির অসম্মতি।
৭.৯.৬৭ সিন্ধু আওয়ামী লীগ কর্তৃক ৬-দফার ভিত্তিতে নুতন আওয়ামী লীগ গঠনের দাবী।
১৪.৯.৬৭ গুন্ডা হামলার প্রতিবাদে চট্টগ্রাম বন্দরের ডক শ্রমিকদের ধর্মঘট।
১৬.৯.৬৭ ছুটি না ধর্মঘট।
১৮.৯.৬৭ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতেল করার দাবী।
২২.৯.৬৭ কৃষি কলেজে বহিরাগতদের হামলাঃ কতিপয় ছাত্র আহত।
২৫.৯.৬৭ আঃ লীগের কার্য্যনির্বাহক কমিটির বৈঠকঃ এক ইউনিট বিলোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত।
" পঃ পাক শ্রমিক ফেডারেশন প্রধান কর্তৃক শ্রমিক আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত করিয়া তোলার আহবান।
২৬.৯.৬৭ দাবী পুরণ না হইলে ন্যাশনাল ব্যাংক কর্মচারীদের পুনরায় ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত।
২৭.৯.৬৭ নিরাপত্তা আইনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২জন ছাত্র গ্রেফতার।
২৮.৯.৬৭ পি-ডি-এম- এর সহিত সম্পর্কচ্ছেদের জন্য সাময়িকভাবে বহিস্কৃত আঃ লীগ সদস্যদের আরও সময় প্রদান।
২.১০.৬৭ রাজবন্দী সাহায্য কমিটির অর্থ সংগ্রহ অভিযান শুরু।
২.১০.৬৭ চট্টগামে ১৪৪ ধারা।
৪.১০.৬৭ বিবাহিতা মহিলাকে কেন্দ্র করিয়া গোলযোগঃ রংপুরের পল্লীতে পুলিশের গুলীবর্ষনে ৩ ব্যক্তি নিহত।
১১.১০.৬৭ প্রাদেশিক ন্যাপে কোন্দলঃ ৬জন সদস্য বহিস্কৃতঃ পার্টির যুগ্ম সম্পাদক সহ ২ জনের বিরুদ্ধে শোকজ নোটিশ।
১৩.১০.৬৭ করাচীতে ১৪৪ ধারা জারী।
১৪.১০.৬৭ চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ কর্মী সম্মেলনে প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার না পাইলে আগামী নির্বাচন বর্জনের আহবান।
২২.১০.৬৭ পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পোদ্যোগ ব্যহত হইবার আশংকাঃ প্রদেশ হইতে চালু কারখানার যন্ত্রপাতি পশ্চিম পাকিস্তানে প্রেরণের কারসাজি।
২৩.১০.৬৭ সদ্য কারামুক্ত তিন জন শ্রমিক নেতার বিবৃতিঃ রাজশাহী জেলে বহু রাজবন্দী বিভিন্ন রোগে ভুগিতেছেন।
২৪.১০.৬৭ মওলানা ভাসানীর অভিজ্ঞতা বর্ণনাঃ দরিদ্র চাষীরা ১৭ টাকা মন দরে পাট বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে।
৩১.১০.৬৭ চটকলে বঞ্চনার কাহিনী। কাজ চুক্তি শ্রমিকদের বেতন ৩০ টাকায় স্থলে ১৩ টাকার হ্রাস।
১.১১.৬৭ ন্যাপের রিকুইজিশন কাউন্সিল সভা ১৯শে নভেম্বরের মধ্যে ঢাকায় অনুষ্ঠানের আহবান।
৩.১১.৬৭ পিডিএম পন্থী আওয়ামী লীগ কর্তৃক ব্যক্তিগত মালিকানায় শিল্প হস্তান্তরের প্রতিবাদ।
৭.১১.৬৭ ৬-দফা দাবী পুরণ না করিলে ১৫ই নভেম্বর হইতে অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য রিক্সা ধর্মঘট।
" অলিম্পিয়া মিলের সরঞ্জাম পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার প্রসঙ্গে প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক তদন্তের নির্দ্দেশ।
৮.১১.৬৭ ন্যাপের কলহ তীব্র আকার ধারন। সোভিয়েতপন্থীদের পৃথক কাউন্সিল অধিবেশন আহবানের সম্ভাবনা।
" পূর্বাঞ্চলের ব্যবসায়ীদের দাবীর স্বীকৃতিঃ পাকিস্তান শিল্প ও বণিক সমিতিতে প্যারিটি প্রবর্তন।
১১.১১.৬৭ ইকবাল হলে বহিরাগত সশস্ত্র ছাত্রদের হামলা।
১২.১১.৬৭ মনি সিংকে মুক্তিদানের দাবী।
১২.১১.৬৭ ছাত্র নেতৃবৃন্দ কর্তৃক গুন্ডামীর নিন্দা ও প্রতিবাদ।
" ত্রাসের মুখে দলে দলে ছাত্রদের হল ত্যাগ।
১৩.১১.৬৭ ছাত্রদের উপর হামলার নিন্দা।
" ছাত্র-ছাত্রীরা এখনও শংকিত।
১৪.১১.৬৭ রিকশা চালকদের ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত।
১৫.১১.৬৭ লাহোরে ছাত্র পুলিশ সংঘর্ষ।
১৬.১১.৬৭ ১২১জন বিশিষ্ট আইনজীবী কর্তৃক মনিসিং এর মুক্তি দাবী।
" ৭২ কোটি টাকার পুরাতন ব্রহ্মপুত্র বহুমুখী পরিকল্পনার কাজ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত।
১৭.১১.৬৭ লাহোরে ১৪৪ ধারা জারী।
২২.১১.৬৭ ডিসেম্বর রিকুইজিশনকারীদের বিশেষ কাউন্সিল সভা আহবান হইল।
২৮.১১.৬৭ জনসভায় গোলযোগঃ ৬-দফার সমর্থনে শ্লোগান।
" পল্টনে পিডিএমের জনসভা হবেঃ অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য বিরোধী দলসমূহের প্রতি ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম পরিচালনার আহবান।
৫.১২.৬৭ বল প্রয়োগে সদস্য বহিষ্কারের প্রতিবাদে জাতীয় পরিষদে বিরোধী ও স্বতন্ত্র দলীয় সদস্যবৃন্দ কর্তৃক অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য অধিবেশন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
৬.১২.৬৭ মীমাংসার গ্রহণযোগ্য ভিত্তি প্রদানে সরকার পক্ষের ব্যর্থতাঃ বিরোধী ও স্বতন্ত্রদলীয় সদস্যদের জাতীয় পরিষদ বর্জন অব্যাহত।
৭.১২.৬৭ বিরোধী দলের পরিষদ বর্জন অব্যাহত থাকিবেঃ অধিবেশনের আয়ুকাল সংক্ষিপ্ত হইবার সম্ভাবনা।
৭.১২.৬৭ ভাসানীর সমর্থনে আসলামঃ রিকুইজিশনকারীদের কার্য্যকলাপ শৃঙ্খলা ভঙ্গের প্রচেষ্টা।
" জুট মিল শ্রমিকদের প্রতিবাদ সপ্তাহ পালনের সিদ্ধান্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৯.১২.৬৭	স্পীকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা ? জাতীয় পরিষদে বিরোধী ও স্বতন্ত্র দলের যোগদানের আশা প্রায় তিরোহিত।
১২.১২.৬৭	বৈষম্য নাই কোথায় ?
"	সাংবাদিক সম্মেলনে মোহাম্মদ সুলতানের পাল্টা অভিযোগঃ "বহিষ্কৃত" ন্যাপ নেতৃবৃন্দ পার্টির সংহতি বানচাল করিতে তৎপর ছিলেন।
১৩.১২.৬৭	বৈষম্য সর্বত্র রহিয়াছেঃ রফতানী ও আমদানী ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম নাই।
১৫.১২.৬৭	নিষ্প্রাণ ও বৈচিত্র্যহীন বেসরকারী দিবসঃ বিরোধী দলের পরিষদ বর্জন হেতু ১৫টি বিল উথাপিত হয় নাই।
"	সরকারী ও আধা সরকারী বিভাগে বৈষম্যের খতিয়ান।
১৭.১২.৬৭	ন্যাপের রিকুইজিশনকারীদের সভায় রংপুর সম্মেলনকে গঠনতন্ত্র বিরোধী আখ্যা দান।
২২.১২.৬৭	মালেক উকিল কর্তৃক নোয়াখালীর পল্লীতে গুলীবর্ষন ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী।
"	শেখ মুজিবের মুক্তি দাবী।
২৩.১২.৬৭	অমানুষিক নির্য্যাতনের করুণ কাহিনীঃ হাইকোর্ট কর্তৃক স্বাধীন মেডিক্যাল বোর্ডের মাধ্যমে পরীক্ষা করার নির্দ্দেশ।
৩.৩.৬৮	ছাত্র নেতৃবৃন্দ কর্তৃক অবিলম্বে জগন্নাথ কলেজ খোলার দাবী।
"	জগন্নাথ কলেজ ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি গ্রেফতার।
৫.৩.৬৮	প্যারা মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউশনে ছাত্র ধর্মঘট।
৭.৩.৬৮	পূর্ব পাকিস্তান হইতে প্রাবিত অলিম্পিয়া টেক্সটাইলের যন্ত্রপাতি করাচী বন্দরে আটক।
৮.৩.৬৮	প্যারা মেডিক্যাল ইন্সটিটিউটের ধর্মঘটী ছাত্রদের হোষ্টেল ত্যাগের নির্দেশ।
১৪.৩.৬৮	ঢাকা শিল্প বণিক সমিতির সমালোচনা সরকারের সিমেন্ট নীতিই সংকট সৃষ্টি করিয়াছে।
১৬.৩.৬৮	আগামী ১লা সেপ্টেম্বর গ্রীসের নয়া শাসনতন্ত্রের উপর গণভোট অনুষ্ঠিত হইবে।
১৮.৩.৬৮	পঃ পাক ন্যাপ দ্বিধাবিভক্ত।
"	মনস্তত্বঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নমুনা জরিপের ফলঃ অধিকাংশ ছাত্রের মনে শিক্ষা-উত্তর জীবনের অনিশ্চয়তা ও বেকারত্বের ভীতি।
১৯.৩.৬৮	মনস্তত্ত্ব সম্মেলনে খাদ্য ঘাটতি প্রসঙ্গঃ কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে কৃষকের দৃষ্টিকোণ উপেক্ষার পরিণতি।
২১.৩.৬৮	পিডিএম শাখাসমূহকে আসন্ন নির্বাচক মন্ডলী নির্বাচনে সক্রিয় অংশ গ্রহণের নির্দ্দেশ।
২২.৩.৬৮	হাজী দানেশ ও সৈয়দ আলতাফের মুক্তিলাভ।
২৩.৩.৬৮	ছাত্রলীগ সম্মেলন উপলক্ষে আলোচনা সভায় পাকিস্তানে বৈদেশিক ঋণ লাভ সম্পর্কে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবী।
২৫.৩.৬৮	ভিয়েৎনাম দিবসে পল্টনের জনসভায় মওলানা ভাসানী বলেনঃ মেহনতী মানুষের অবস্থার উন্নতি ছাড়া দেশের উন্নতির দাবী অর্থহীন।
"	মাতৃভাষার মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষা বাস্তবায়নের আহ্বান।
"	ন্যাপ নেতা বেজেঞ্জো গ্রেফতার।
২৬.৩.৬৮	ভূট্টোর অভিমতঃ সমাজতন্ত্রই দেশের সমস্যা সমাধানের একম পথ।
২৭.৩.৬৮	খণ্ডরাজা শাহাবুদ্দিন কর্তৃক ভবিষ্যৎ দায়িত্ব গ্রহণের জন্য ছাত্রদের প্রতি আহ্বান।
২৮.৩.৬৮	বুদ্ধিজীবীসহ শতাধিক নাগরিক কর্তৃক জগন্নাথ কলেজের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনার দাবী।
২৯.৩.৬৮	খুলনা নিউজপ্রিন্ট উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা বিক্রয়মূল্য অনেক বেশী।
৩০.৩.৬৮	কর্তৃপক্ষ নিস্ক্রীয়ঃ ছাত্রদের মধ্যে গোলযোগ।
৩১.৩.৬৮	১লা এপ্রিল হইতে বাস ভাড়া বৃদ্ধি।
"	রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় মসিউর রহমানের ছয় মাস কারাদন্ড।
১.৪.৬৮	সড়ক পরিবহন শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি দাবী।
"	পরিবহন শ্রমিকদের সভায় ৮ ঘন্টা কাজের দাবী।
"	ছাত্রনেতাদ্বয়ের বিবৃতিতে অবিলম্বে জগন্নাথ কলেজ খোলার দাবী।
২.৪.৬৮	বস্ত্র শ্রমিকদের বেতন বোর্ড গঠনের দাবী।
৪.৪.৬৮	শ্রমিক নেতার অভিযোগঃ দুইটি কটনমিল বন্ধের দরুন ও হাজার শ্রমিক বেকার।
"	বিভিন্ন দাবীতে ঢাকা চারু ও কারু শিল্প কলেজের ছাত্রদের ধর্মঘট।
৫.৪.৬৮	চারু ও কারুকলা কলেজের ধর্মঘটীদের সহিত সিরামিক ছাত্রদের যোগদান।
"	বিভিন্ন দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে আর্ট কলেজের ছাত্রদের অদ্য প্রতীক ধর্মঘট।
৬.৪.৬৮	পিডিএম নেতাদের অভিজ্ঞতাঃ পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণও নির্যাতন হইতে মুক্তিকামী।
৯.৪.৬৮	৯৫ জন ছাত্রের মুক্ত বিবৃতিঃ অবিলম্বে জগন্নাথ কলেজ খোলার দাবী।
"	বাওয়ানী জুট মিলে সাড়ে পাঁচ হাজার শ্রমিকের ধর্মঘট শুরু।
১১.৪.৬৮	প্রায় দেড়শত শ্রমিকের বরখাস্তের আশংকাঃ বাওয়ানী জুটমিলে ধর্মঘট অব্যাহত।
১২.৪.৬৮	পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়াকিং কমিটির বৈঠক।
"	লতিফ বাওয়ানী জুট মিলঃ ১৪০ জন ধর্মঘটী শ্রমিকদের প্রতি নোটিশ।
১৩.৪.৬৮	অদ্য হইতে আর্ট কলেজের ছাত্রদের পুনঃ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত।
"	লতিফ-বাওয়ানী জুট মিলে শ্রমিক ধর্মঘটের সপ্তম দিবস অতিবাহিত।
১৪.৪.৬৮	ধর্মঘটী আর্ট কলেজ ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিল।
"	আহত ৯ ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি।

Dhaka University Institutional Repository

১৬.৪.৬৮ আওয়ামী লীগ কার্য্যকরী সংসদের বৈঠকে শেখ মুজিবর রহমানের প্রকাশ্য বিচার দাবী।
১৭.৪.৬৮ শহরে আকস্মিকভাবে বাস ধর্মঘটঃ বর্ধিত ভাড়া প্রদানে অসম্মত যাত্রীদের সহিত কন্ট্রাক্টরদের সংঘর্ষ।
" ৫ জন শ্রমিক নেতা গ্রেফতারঃ লতিফ বাওয়ানী জুটমিলে ধর্মঘট অব্যাহত।
" ধর্মঘটী ছাত্রগণ ক্লাসে যোগ না দিলে অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য আর্ট কলেজ বন্ধ রাখার সম্ভাবনা।
১৮.৪.৬৮ জগন্নাথ কলেজ খোলার দাবীতে ছাত্রদের পথসভা।
" বাসভাড়া লইয়া গোলযোগ অব্যাহতঃ বিকালে বাস ধর্মঘট।
১৯.৪.৬৮ জগন্নাথ কলেজ খোলার দাবীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বদলীয় ছাত্রসভা।
" আর্ট কলেজ ছাত্রাবাসঃ ছাত্রগণ ধর্মঘটের সমর্থনে অদ্য আহার্য্য গ্রহণ করিবেন না।
" ৯ জন বিরোধী দলীয় নেতা রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা হইতে বেখুসুর খালাস।
২০.৪.৬৮ ভাড়া বৃদ্ধির বিরোধীতার মুখে আংশিক বাস ধর্মঘট অব্যাহত।
২১.৪.৬৮ বাস ধর্মঘটের ফলে নাগরিক জীবনে অচলাবস্থাঃ জনতা কর্তৃক নারায়নগঞ্জে বাসে হামলা ও অগ্নিসংযোগ।
২২.৪.৬৮ সংশ্লিষ্ট মহল উদাসীনঃ আংশিক বাস ধর্মঘট অব্যাহত।
" ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের এজলাসের স্থান ধার্য্যঃ ষড়যন্ত্র ও সশস্ত্রবাহিনীর কর্মচারীদের উস্কানী দান সংক্রান্ত অপরাধের বিচারের জন্য অর্ডিন্যান্স জারী।
২৩.৪.৬৮ বাস ধর্মঘটের ৭ম দিবস অতিবাহিত হইলেও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলের বিস্ময়কর নীরবতা।
" শ্রমিকদের মজুরী বাড়ে নাইঃ পরিবহন শ্রমিক সভায় বাসভাড়া বৃদ্ধির সমালোচনা।
" আর্ট সলেজে ছাত্র ধর্মঘটের নবম দিবসঃ ৯ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে শোকজ নোটিশ প্রদান।
২৫.৪.৬৮ অলিম্পিয়া টেক্সটাইল মিলঃ ২৪ ঘন্টার জন্য শ্রমিকের প্রতিবাদ ধর্মঘট।
" আর্ট কলেজ ছাত্রদের দাবী-দাওয়া পূরণের আহ্বান।
২৬.৪.৬৮ আর্ট কলেজে ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিল।
" নিম্নতম কর্মসূচীর ভিত্তিকে ন্যাপের উদ্যোগে যুক্তফ্রন্ট গঠনের জন্য প্রাথমিক আলোচনা শুরু।
" ডাক ও তার বিভাগীয় কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির দাবী।
২৭.৪.৬৮ দরিদ্র চাষীদের দ্রব্যের ন্যায্য মূল্য দানের আহ্বান।
" ন্যাপসহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সভায় বাসভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
২৯.৪.৬৮ ছাটাইয়ের প্রতিবাদঃ হাউজিং কর্মচারীদের বিক্ষোভ মিছিল।
" রাজবন্দী জিবেন ঘোষকে বাহিরের হাসপাতালে স্থানান্তরের দাবী।
৩০.৪.৬৮ জগন্নাথ হলের সম্প্রসারণ ও ছাত্রীদের জন্য হল নির্মণ দাবী।
১.৫.৬৮ বিদেশী ইঞ্জিনিয়ারদের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট। ছাত্র বিক্ষোভের সময়ে হামলার ফলে ওয়াসাসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত।
২.৫.৬৮ মজদুর ফেডারেশনের উদ্যোগে শ্রমিক সভায় শ্রম আইনের সংশোধন দাবী।
৩.৫.৬৮ বিনা নোটিশে ২৪ জন ট্যানারী শ্রমিক বরখাস্ত।
" বর্দ্ধিত ভাড়া প্রদানে অস্বীকৃতিঃ একজন বাসযাত্রী গ্রেফতার।
৭.৫.৬৮ ঢাকায় ছাত্রসভায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবীঃ করাচীতে ছাত্রদের উপর গুন্ডামীর তীব্র নিন্দা।
" ন্যাপের বৈঠকে প্রস্তাব গৃহীতঃ রাজনৈতিক বন্দীদের প্রথম শ্রেণীর মর্য্যাদা দানের দাবী।
৯.৫.৬৮ ১৪৪ ধারা ভঙ্গের দায়ে নারায়ণগঞ্জে ৫ ব্যক্তি গ্রেফতার।
১০.৫.৬৮ আর্ট কলেজ প্রতিবাদ সভার নিরাপত্তার ব্যবস্থা দাবী।
" পুলিশের গুলিতে ছাত্র নিহত।
১৪.৫.৬৮ জনৈক পুলিশ সার্জেন্টের বিরুদ্ধে অটোরিক্সা চালক সমিতির অভিযোগ।
১৬.৫.৬৮ ৪ জন ন্যাপ নেতার বিবৃতিঃ রাজবন্দীদের যথাযথ মর্য্যাদা দানের আবেদন।
" পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিলম্বিত হওয়ার আশংকাঃ খন্ড কারখানার যন্ত্রপাতির জন্য ৪র্থ বার টেন্ডার আহবানের সিদ্ধান্ত।
১৮.৫.৬৮ "পরিসংখ্যান উন্নয়ন" সেমিনারে তথ্য প্রকাশ: পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যাগত বৈষম্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি।
" ২৮মে পঃ পাক হাইকোর্টে শুনানীঃ 'চাট্টান' সম্পাদকের আটকাদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ।
১৯.৫.৬৮ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আঞ্চলিক ফৌজ গঠনের দাবী।
" ছাত্রনেতা গ্রেফতার।
২০.৫.৬৮ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব কর্তৃক লাল ফিতার দৌরাত্ম্য দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দ্দেশ।
" প্রাদেশিক হেলথ্ সার্ভিসের সহকারী সার্জনদের অবিলম্বে প্রথম শ্রেণীর অফিসারের মর্যাদা দাবী।
২১.৫.৬৮ পিপলর্স পার্টি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে।
" জাতীয় পরিষদে আরশাদ হোসেনের তথ্য প্রকাশঃ ৬৯ সালের জুলাই হইতে পেশোয়ারস্থ মার্কিন ঘাটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।
২২.৫.৬৮ সর্বদলীয় ছাত্র সভায় জগন্নাথ কলেজের প্রিন্সিপ্যালের অপসারন দাবী।
২৪.৫.৬৮ ৩য় পাঁচশালা পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বেসরকারী শিল্প বরাদ্দ হইতে ১শত ৬ কোটি টাকা হ্রাস।
" শেখ মুজিবের মামলায় সাহায্য কল্পে ডিফেন্স কমিটি গঠন।
" জরুরী অবস্থার মেয়াদ ৬ মাস সীমিত করার বিরোধী দলীয় প্রয়াস ব্যর্থ।

Dhaka University Institutional Repository

" বেসরকারী দিবসে জাতীয় পরিষদে তুমুলঃ শাসনতন্ত্র সংশোধনী বিল উথাপনের অনুমতি প্রার্থনা অগ্রাহ্যঃ
" যাত্রীদের দূর্ভোগঃ শহরে আকস্মিক অটোরিক্সা ধর্মঘট।
২৫.৫.৬৮ ঢাকা জুটমিলের মহিলা শ্রমিকদের ধর্মঘট প্রত্যাহার।
" অটোরিক্সা ধর্মঘট।
" ছাত্রনেতাদ্বয়ের যুক্ত বিবৃতিঃ জগন্নাথ কলেজ প্রাদেশিকীকরণ হইতে বিরত থাকার দাবী।
২৬.৫.৬৮ আর্ট কলেজ ছাত্রদের উপর হামলা।
২৮.৫.৬৮ পুনরায় ছাত্রদের উপর হামলা। আর্ট কলেজ ছাত্রদের ক্লাশ বর্জন অব্যাহত।
২৯.৫.৬৮ ছাত্রদের ক্লাশ বর্জন অব্যাহতঃ আর্ট কলেজ শিক্ষকদের সভায় হামলার নিন্দা জ্ঞাপন।
৩১.৫.৬৮ রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে ছাত্রলীগের মিছিল ও পথসভা।
" আর্ট কলেজে হামলা সম্পর্কে ৫০ জন শিল্পীর নিন্দা জ্ঞাপন।
" সেটেলমেন্ট প্রেস কর্মচারীঃ দাবী মানার জন্য সরকারের প্রতি আহবান।
১.৬.৬৮ জাতীয় পরিষদে আয়কর অর্ডিন্যান্স অনুমোদিতঃ আবশ্যকীয় সার্ভিস বিলে শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ।
" ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারী।
২.৬.৬৮ ছাত্রনেতৃবৃন্দ কর্তৃক ১৪৪ ধারার প্রতিবাদ।
" পুলিশ ক্যাম্পে হানা দিয়া ডাকাতদলের রাইফেল দখলঃ বরিশালের কালীগঞ্জ বন্দর লুণ্ঠনঃ ৩ লক্ষাধিক টাকা অপহৃত।
৩.৬.৬৮ ১৪৪ ধারা জারীর নিন্দা।
" আমেনা বেগমের বিবৃতিঃ অবিলম্বে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহারের দাবী।
" ৭ই জুন পালনের জন্য আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের আহবান।
" চট্টগ্রামে ১৪৪ ধারা জারী।
৪.৬.৬৮ মাদ্রাসা ছাত্রদের দাবী দিবস পালন।
৪.৬.৬৮ ৭ই জুন পল্টন ময়দানে সভা করার অনুমতি মিলিল না।
" অতিরিক্ত রেল বাজেটে ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যয় মঞ্জুরী দাবীর তীব্র সমালোচনা।
" খুলনায় ১৪৪ ধারা জারী।
৫.৬.৬৮ আদমজী জুট মিলঃ বকেয়া বেতনের দাবীতে সহস্রাধিক শ্রমিকের ধর্মঘট।
" প্রাদেশিক পরিষদে তথ্য প্রকাশঃ কেন্দ্রীয় সরকারকে সুদ বাবদ ৩৩ কোটি টাকা প্রদান।
" বিরোধী দলীয় সদস্যদের মোনায়েম খানের সম্মানার্থে আয়োজিত ভোজসভা বর্জন।
" ন্যাপনেতা কর্তৃক ১৪৪ ধারা জারীর নিন্দা।
৭.৬.৬৮ আমেনা বেগমের আহবানঃ আজ ৭ই জুন দিবস পালন করুন।
৮.৬.৬৮ ৭ই জুনের শহীদদের সম্মান ও ১৪৪ ধারা জারীর প্রতিবাদে বিরোধী দলের পরিষদ কক্ষ বর্জন।
১২.৬.৬৮ বেকারত্বের অভিশাপ।
১৩.৬.৬৮ অর্থনৈতিক তথ্যানুসন্ধান রিপোর্টঃ ৬৭-৬৮ সালে প্রদেশের রফতানী বাণিজ্যের দ্রুত অবনতি।
" আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যঃ সাড়ে আট বৎসরে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় ৪ শত কোটি টাকা ঘাটতি।
১৪.৬.৬৮ প্রদেশে সরকারী দলে 'বিদ্রোহ' রেল বাজেটের সাধারণ আলোচনায় অংশ গ্রহণে অস্বীকার।
" ঢাকা জেলা আঃ লীগ কর্তৃক মুজিব তহবিলে অর্থ দানের আহবান।
" সরকারী দলের কতিপয় সদস্যের বিদ্রোহঃ আমলাতন্ত্রই দেশের শাসনভার পরিচালনা করিতেছে।
১৫.৬.৬৮ রেল বাজেটের উপর আলোচনাঃ বিরোধীদলের অভিযোগঃ সাধারন যাত্রীদের উপেক্ষা করা হইয়াছে।
" বাজেট আলোচনায় আলীম আল রাজীর ৭ দফাঃ নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের উপর হইতে কর প্রত্যাহার দাবী।
" আওয়ামী লীগের "হামলা পরিচালনা কমিটির" সভা আহবান।
১৬.৬.৬৮ ষড়যন্ত্র মামলাঃ দর্শকদের জন্য প্রবেশপত্রের ব্যবস্থা।
১৮.৬.৬৮ আগামীকাল হইতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী শুরু।
" চটকল শ্রমিকদের জন্য অবিলম্বে ন্যূনতম বেতন বোর্ড গঠনের দাবী।
১৯.৬.৬৮ সলিমুল্লা মোছলেম এতিম খানার ছেলেদের বিক্ষোভ মিছিল।
" সরকারের বিরুদ্ধে আব্দুল মালেকের অভিযোগঃ জরুরী অবস্থা বজায় রাখিয়া জনগণের মৌলিক অধিকার অস্বীকার করা হইতেছে।
" গভর্নরের নিকট স্মারকলিপি পেশঃ লাট ভবনের সম্মুখে ছিন্নমূল কৃষকদের মিছিল।
" পেশাগত দায়িত্ব পালনে বাধাঃ ২ জন ফটোগ্রাফার আড়াই ঘন্টাকাল আটক।
২১.৬.৬৮ নূরুল আমিন বলেনঃ পূর্ব দিগন্ত ঘনঘটায় ছাইয়া গিয়াছে।
২২.৬.৬৮ বাজেট আলোচনা প্রসঙ্গে বিরোধী দলঃ প্রদেশবাসী করভারে নিষ্পেষিত হইতেছে।
২৩.৬.৬৮ ৩টি কটন মিল আংশিক বন্ধঃ বেকার শ্রমিকদের অবর্ণনীয় দুর্দশা।
২৪.৬.৬৮ সোমবার হইতে ট্যাক্সিও চলিতেছে নাঃ বাসভাড়া বৃদ্ধিজনিত অচলাবস্থা অব্যাহত।
২৬.৬.৬৮ ঢাকার বাজারে এক সপ্তাহে চাউলের দাম গড়ে পাঁচ টাকা বৃদ্ধি।
২৭.৬.৬৮ শেখ মুজিব তহবিলের জন্য কুপনের ব্যবস্থা।
" প্রাঃ পরিষদে বিরোধী দলীয় সদস্যের অভিযোগঃ বাংলা ভাষার উন্নতির চেষ্টার পরিবর্তে বিকৃত করার ষড়যন্ত্র চলিতেছে।

Dhaka University Institutional Repository

" ঘোড়াশাল দুইদল শ্রমিকের মধ্যে সংঘর্ষে ছয়জন নিহত ও শতাধিক আহত।

২৮.৬.৬৮ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক চেতনা সমান নহেঃ প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার না দেওয়ার পক্ষে পার্লামেন্টারী সেক্রেটারীর যুক্তি।

" ইপিআরটিসির দক্ষ শ্রমিকদের বেতন পুনর্নির্দ্ধারণ করার দাবী।

২৯.৬.৬৮ রংপুর জেলায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতিঃ দশ সহস্র লোক ক্ষতিগ্রস্তঃ চিলমারীর বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত।

" সুতাকল শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরী বোর্ড গঠনের দাবী।

৫.৭.৬৮ মোমেনশাহী মেডিক্যাল কলেজে ধর্মঘট।

৬.৭.৬৮ আলীম আল রাজীঃ অবিলম্বে জগন্নাথ কলেজ খোলার দাবী।

" বার্ষিক রেলওয়ে খাতে উন্নয়ন বাবদ পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের জন্য যথাক্রমে ৩১ কোটি ও ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ।

৫.৭.৬৮ খুলনায় ১৪৪ ধারা চারি।

৮.৭.৬৮ মেডিক্যাল ছাত্র নেতাগণ কর্তৃক অটোমেশন প্রথা প্রত্যাহারের দাবী।

" বন্দী রাজনৈতিক ও ছাত্রদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে মেডিক্যাল বোর্ড গঠনের দাবী।

৯.৭.৬৮ অটোমেশন প্রথার প্রতিবাদে আগামীকাল মেডিক্যাল ছাত্র ধর্মঘট অব্যাহত।

" ছাত্র লীগ নেতা গ্রেফতার।

১০.৭.৬৮ চট্টগ্রাম কক্সবাজার যোগাযোগ বিচ্ছিন্নঃ ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়ক প্লাবিত। ১২টি জেলায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতিঃ ৫ লক্ষাধিক একর জমির ফসল বিনষ্ট।

" অদ্য প্রদেশব্যাপী মেডিক্যাল ছাত্রদের প্রতীক ধর্মঘট।

১১.৭.৬৮ অবিরাম বর্ষণে প্রদেশের বন্যা পরিস্থিতি গুরুতররূপ ধারণ। পঁচিশ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত এবং ১০ লক্ষাধিক একর জমির ফসল বিনষ্ট।

" অটোমেশন প্রথা বিলুপ্তির দাবীতে প্রদেশব্যাপী মেডিক্যাল ছাত্রদের ধর্মঘট পালন।

" ৩য় ও চতুর্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের চিকিৎসা ভাতা প্রদানের প্রস্তাব বাতিল।

১২.৭.৬৮ প্রাদেশিক পরিষদে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের ব্যয় সম্পর্কে তদন্তের বিরোধী দলীয় প্রস্তাব বাতিল।

১৩.৭.৬৮ প্রাদেশিক পরিষদে প্রশ্নোত্তরঃ খাদ্যে বিষক্রিয়ায় প্রদেশে মোট ৪০ ব্যক্তির মৃত্যু।

১৪.৭.৬৮ বন্যা পরিস্থিতি প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের সভা।

" সমগ্র প্রদেশে এযাবৎ ১৫৭ জনের মৃত্যুঃ কুমিল্লা ও সিলেটে বন্য পরিস্থিতির ভয়াবহ অবনতি।

১৫.৭.৬৮ ইপি ওয়াপদার বাধসমূহে বিরাট ভাঙ্গনঃ নিহতের সংখ্যা ১৮০ঃ কুমিল্লা ও সিলেটের অবস্থা ভয়াবহ।

" বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহারের জন্য ছাত্রদের দাবী।

" বন্যার্তদের জন্য অর্থ সংগ্রহকারী ভিক্ষা মিছিলের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ।

১৬.৭.৬৮ ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জ সংক্রান্ত মূলতবী প্রস্তাব অগ্রাহ্যঃ প্রতিবাদে বিরোধী দলের সদস্যদের পরিষদ কক্ষ বর্জন।

" বিরোধী দলের নেতা কর্তৃক ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জের তীব্র নিন্দা।

১৭.৭.৬৮ শ্রমিক নেতৃবৃন্দের যুক্ত বিবৃতিতে পূর্ব পাকিস্তানকে জরুরী এলাকা বলিয়া ঘোষণা করার দাবী।

" আওয়ামী লীগ কর্তৃক বন্যার্তদের জন্য দশ কোটি টাকা সাহায্যের দাবী।

১৮.৭.৬৮ আলীম আল-রাজী কর্তৃক জগন্নাথ কলেজকে সরকারী কলেজে পরিণত করার প্রতিবাদ।

" ছাত্র নেতাদের যুক্ত বিবৃতিঃ জগন্নাথ কলেজ সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ।

১৯.৭.৬৮ ২৭ জন ছাত্র নেতার বিবৃতিঃ জগন্নাথ কলেজকে সরকারীকরণের নিন্দা।

২০.৭.৬৮ জগন্নাথ কলেজ প্রসঙ্গেঃ ২৪শে জুলাই ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট আহবান।

" প্রদেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণার দাবী।

" মসিউর রহমানের বিবৃতিতে রাজনৈতিক কর্মী সভায় পুলিশ উপস্থিতির অভিযোগ।

২১.৭.৬৮ ন্যাপ, কৃষক সমিতি ও শ্রমিক ফেডারেশনের ৯ জন নেতার বিবৃতি।

" ২৪শে জুলাই ছাত্র ধর্মঘটের প্রতি ডাকসুর সমর্থন।

" অধ্যাপকের অভিযুক্ত হত্যাকারী গ্রেফতার।

২৩.৭.৬৮ পশ্চিম পাকিস্তানে হাইকোর্ট কর্তৃক চটান এর ডিক্লারেশন বাতিল অবৈধ ঘোষণা।

" ১লা আগষ্ট হইতে ৪টি লাইনে ষ্টীমার চলাচল বন্ধঃ পি আর এ-এর ১৬ শত কর্মচারী চাকুরীচ্যুত হওয়ার আশংকা।

২৪.৭.৬৮ লন্ডনে পাকিস্তানীদের বিক্ষোভঃ পুলিশের সহিত সংঘর্ষ।

২৫.৭.৬৮ পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে জগন্নাথ কলেজ চালুর দাবিতে ঢাকা শহরে কলম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট পালিত।

২৮.৭.৬৮ বিরোধী দলসমূহের প্রতি মওলানা ভাসানী বন্যা নিয়ন্ত্রণ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান বাহির করার আহ্বান।

২৯.৭.৬৮ কতিপয় বীমা কোম্পানীর এক চেটিয়া ব্যবসাঃ পূর্ব পাকিস্তানী বীমা কোম্পানীগুলি অসুবিধার সম্মুখিন।

৩০.৭.৬৮ তোয়াহার বিবৃতিতে পূর্ব পাকিস্তানে দুর্ভিক্ষ এলাকা ঘোষণা দাবী।

" ১লা আগষ্ট জগন্নাথ কলেজে ছাত্র ধর্মঘটের আহ্বান।

৩১.৭.৬৮ ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে পুনরায় ১৪৪ ধারা জারী।

৩.৮.৬৮ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যানের নিকট শেখ মুজিবের কতিপয় অভিযোগ পেশ।

১১.৮.৬৮ চট্টগ্রামে ১১ জন গ্রেফতার। ধর্মঘটী ছাত্রদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ।

" ধ্বংসাত্মক কার্য্যে লিপ্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে গভর্ণর মুসার কঠোর সতর্কবানী।

" মোমেনশাহীতে ছাত্র ধর্মঘট পালনঃ পুলিশের সহিত সংঘর্ষে ১২ জন ছাত্র আহতঃ ২০ জন গ্রেফতার।

Dhaka University Institutional Repository

"	প্রদেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘটঃ বিভিন্ন স্থানে ৪৫ জন গ্রেফতারের সংবাদঃ লাঠিচার্জ ও কাঁদুনি গ্যাস প্রয়োগের অভিযোগ।
১২.৮.৬৮	ছাত্র নেতাদের যুক্ত বিবৃতিতে পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদ।
"	নেত্রকোনার পূর্ণ ছাত্র ধর্মঘট পালিত।
"	বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক বাংলা বানান সংস্কারের সুপারিশ অনুমোদন।
১৩.৮.৬৮	বাংলা হরফের রদবদলের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ছাত্র বিক্ষোভ।
"	চট্টগ্রামে তৃতীয় দিনে ও স্বতঃস্ফূর্ত ছাত্র ধর্মঘটঃ কড়া পুলিশ প্রহরা।
"	রাওয়ালপিন্ডিতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে ক্রুসের শুরুর আহবান।
১৭.৮.৬৮	সৈয়দপুরে ৭ হাজার রেল কর্মচারী কর্তৃক প্রদেশের প্রথম ঘেরাও অভিযানঃ অফিসে অফিসারগণ ১২ ঘন্টা যাবৎ আবদ্ধ।
২৫.৮.৬৮	ক্যাম্বেলপুরে ১৪৪ ধারা।
১.৯.৬৮	মতিয়া চৌধুরীর দুই বৎসর জেল ও এক হাজার টাকা জরিমানা।
"	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদের প্রতিবাদ সভা।
"	লেখক সাংবাদিকদের বিবৃতিঃ বাংলা বর্ণমালা পরিবর্তনের বিরোধিতা।
৬.৯.৬৮	কেশবপুরে পুলিশের গুলীবর্ষন ও লাঠিচার্জে ৮ ব্যক্তি আহত।
৭.৯.৬৮	প্রাদেশিক সরকারের প্রেসনোট। মোমেনশাহীর পল্লীতে পুলিশের গুলীবর্ষনে এক ব্যক্তি নিহত।
৯.৯.৬৮	পাবনায় পুলিশের গুলীবর্ষনঃ জনৈক প্রত্যক্ষ দর্শীর বিবরণ।
১২.৯.৬৮	আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা জবানবন্দী দানকালে ৬ নম্বর রাজস্বাক্ষী বলেনঃ পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করা হয় বলিয়া আমরা মনে করিতাম।
১৩.৯.৬৮	৩-দফা দাবীর ভিত্তিতে ১৭ই সেপ্টেম্বর সারা প্রদেশে ছাত্র ধর্মঘট আহবান
১৫.৯.৬৮	মতিয়া চৌধুরী মুক্তি দাবী।
১৭.৯.৬৮	৩-দফা দাবী আদায়ের জন্য ছাত্র সমাজের শপথঃ আজ প্রদেশব্যাপী ঐতিহাসিক শিক্ষা দিবস।
১৮.৯.৬৯	চিত্তরঞ্জন কটন মিলে শ্রমিকদের ধর্মঘটের নোটিশ।
"	মতিয়া চৌধুরীকে মুক্তিদানের আবেদন।
"	ছাত্র ধর্মঘটের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের নির্দেশনামা।
"	১৭ই সেপ্টেম্বরের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলিঃ ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট পালন।
"	নদীমাতৃক পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানীতে পানির উচ্চমূল্যঃ ঢাকার চাহিদার অর্ধেক খাবার পানি মাত্র ওয়াসা সরবরাহ করে।
"	পটুয়াখালীতে ৪৮ জন ছাত্র গ্রেফতার।
১৯.৯.৬৮	শান্তিপূর্ণ ধর্মঘটকালে ছাত্র গ্রেফতারের প্রতিবাদ।
২০.৯.৬৮	৪৫ ব্যক্তির গ্রেফতারঃ বাড়বকুন্ডে দুইজন শ্রমিকের মধ্যে সংঘর্ষে কয়েক ব্যক্তির হতাহত।
২১.৯.৬৮	কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপঃ ৪৯ ব্যক্তি গ্রেফতারঃ দুষ্কৃতিকারীদের চারটি ক্রীড়াক্লাবে অগ্নিসংযোগঃ ৬ লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি।
২২.৯.৬৮	শ্রমিক নেতার ভাষাঃ ধর্মঘটের নোটিশ বে-আইনী নহে।
"	রাজবন্দীদের অবস্থা প্রসঙ্গে সদ্য কারামুক্ত ৩ জন শ্রমিক নেতার যুক্ত বিবৃতি।
২৩.৯.৬৮	প্রেসিডেন্ট কর্তৃক বিরোধীদলগুলির ভূমিকার কঠোর সমালোচনাঃ দেশের দশ বছরের অগ্রগতি গত ২ শত বছরের অপেক্ষাও অধিক।
"	আইয়ুব খানের পুনরায় প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপর প্রস্তাব গ্রহণ।
"	পটুয়াখালীতে প্রতিবাদ সভাঃ ছাত্রদের উপর হইতে গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহারের দাবী।
২৫.৯.৬৮	সদরঘাট হকার মার্কেট কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া।
"	সম্ভবতঃ একদিন এক পাকিস্তানী ভাষার অধিকারী হইবঃ প্রেসিডেন্ট।
২৭.৯.৬৮	কঠোর শর্তে ঋণ এবং ঋণের দায় পরিশোধের মুখে আসন্ন চতুর্থ পরিকল্পনার প্রশ্নে সংশ্লিষ্ট মহল সংকটের সম্মুখীন।
২৮.৯.৬৮	খুলনার আফিল জুটমিল এলাকায় ১৪৪ ধারা জারী।
২৯.৯.৬৮	ছাত্র নেতাদের যুক্ত বিবৃতিঃ ভাষা ও তমদ্দুনিক সত্তাকে অস্বীকার করিয়া অগ্রগতি সম্ভব নহে।
"	আরও একজন শিক্ষক গ্রেফতার।
৩০.৯.৬৮	পিআই এর পাইলটদের আকস্মিক ধর্মঘটের ফলে বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে অচলা অবস্থার সৃষ্টি।
১.১০.৬৮	ছাত্রলীগ কর্তৃক শেখ মুজিবকে প্যারোলে মুক্তিদানের আহবান।
২.১০.৬৮	প্রেসিডেন্ট আইয়ুব মাস পহেলা বেতার ভাষনঃ আঞ্চলিক তমদ্দুনে বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী।
"	মিসেস আমেনা বেগম কর্তৃক শেখ মুজিবকে প্যারোলে মুক্তি দানের আহবান।
"	ইতিহাস সম্মেলনে ডঃ মাহমুদ হোসেন বলেনঃ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন ও উন্নয়ন এছলামের পরিপন্থী নহে।
৩.১০.৬৮	শেখ মুজিবকে প্যারোলে মুক্তি দানের অনুরোধ।
"	ভাষা প্রশ্নে তর্কবাগিশ ও বিভিন্ন অনুরোধ।
৪.১০.৬৮	প্রদেশে নয়া রাজনৈতিক তৎপরতা শুরুঃ দ্বিধাবিভক্ত আওয়ামী লীগকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া শক্তিশালী ফ্রন্ট গঠনের প্রচেষ্টা।
৫.১০.৬৮	টাঙ্গাইল বৈঠকে আসন্ন নির্বাচন প্রশ্নে প্রাদেশিক ন্যাপ গণমুখী সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবে কি?
৬.১০.৬৮	ন্যাপের বৈঠকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই।
"	রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনার জন্য ভাসানী কর্তৃক ২৫ জন বিরোধী দলীয় নেতা আমন্ত্রিত।
"	পল্টন ময়দানে জনসভাঃ আজ গণতন্ত্র দিবস।
৭.১০.৬৮	সন্তোষে ন্যাপ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক সমাপ্তঃ ৩রা নভেম্বর দাবী দিবস পালনের সিদ্ধান্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৯.১০.৬৮ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহক কমিটিঃ জনগণ বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করিবে।
" শেখ মুজিবের প্যারোলে মুক্তিঃ প্রেসিডেন্ট সমীপে ভাসানীর তার।
" তারিখ পরিবর্তনঃ নেতা সম্মেলনে অংশ গ্রহণের প্রস্তাব আওয়ামী লীগ কর্তৃক প্রত্যাখান।
১১.১০.৬৮ জর্দানে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব বলেন দেশের অগ্রগতির জন্য পাকিস্তানের আদর্শের প্রতি আনুগত্য আবশ্যক।
১২.১০.৬৮ দুই ব্যক্তি গ্রেফতার। দুই দল শ্রমিকের মধ্যে সংঘর্ষে ১জন নিহত।
১৪.১০.৬৮ ১৭ দফা দাবীর ভিত্তিতে চালনা বন্দরে শ্রমিকদের ধর্মঘট পালনের হুমকি প্রদান।
১৫.১০.৬৮ করাচীতে ৩০ জন ছাত্রকে গ্রেফতারের প্রতিবাদ।
১৬.১০.৬৮ প্রতিপক্ষ ছাত্রদের আক্রমণ (?) সলিমুল্লাহ মোছলেম হলের ৫জন ছাত্র আহত।
১৭.১০.৬৮ ভুট্টো কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানকে "দুর্যোগ এলাকা" ঘোষণার দাবী।
১৯.০.৬৮ অধিকাংশ ছাত্রের হল ত্যাগ। গুন্ডাদের আক্রমণে ১ জন আহতঃ আজ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ।
২০.১০.৬৮ ছাত্র ইউনিয়নের বিবৃতিঃ "ষড়যন্ত্রের" বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান।
" আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনঃ জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পন্থা।
" বিচারপতি সাজ্জাদ খান বলেনঃ উর্দুকে সরকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহারের ইহাই উপযুক্ত সময়।
২১.১০.৬৮ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় প্রস্তাব। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুখের ভাষা বাংলাকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করা হউক।
" আওয়ামী লীগের অধিবেশন সমাপ্তঃ নির্বাচন প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ মুলতবী।
" পল্টনে আওয়ামী লীগের জনসভাঃ বন্যা নিয়ন্ত্রণের স্থায়ী ব্যবস্থার দাবীঃ বাংলা ভাষার উপর কোন প্রকার আঘাত সহ্যকরা হইবে না।
২২.১০.৬৮ ছাত্রদের হলত্যাগের নির্দেশঃ কতিপয় পরীক্ষা স্থগিতঃ অরাজকতার মুখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য ঘোষণা
২৩.১০.৬৮ মিজানুর রহমান চৌধুরীর বিবৃতিঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার শৃংখলা বজায় রাখিতে ব্যর্থ হইয়াছেন।
২৪.১০.৬৮ এন,এ,এফ,এর প্রস্তাবে ভাইস চ্যান্সেলার ডক্টর গনির পদত্যাগ দাবী।
২৫.১০.৬৮ রাজশাহীতে ১৪৪ ধারা জারী।
২৬.১০.৬৮ শাসনতন্ত্র সেমিনারের প্রথম দিবসঃ প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ হইতে বিচার বিভাগকে মুক্ত করার দাবী।
৩০.১০.৬৮ সংখ্যাগরিষ্ট মানুষের মুখের ভাষা বাংলাকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার দাবী।
" ন্যাপ কার্য্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় অবিলম্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দাবী।
" ছাত্রনেতা পংকজ ভট্টাচার্যঃ রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে মামলা দায়ের।
৩১.১০.৬৮ প্রদেশব্যাপী দাবী সপ্তাহ পালনে ন্যাপের সিদ্ধান্ত।
১.১১.৬৮ ন্যাপ নেতা কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দাবী।
" উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির জন্য টিএন্ডটি কলেজ অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা।
৩.১১.৬৮ অদ্য বৈঠক আহবানঃ দ্বিধাবিভক্ত আওয়ামী লীগকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্যোগ।
" দাবী দিবস উপলক্ষে আজ পল্টন ময়দানে জনসভা।
৪.১১.৬৮ ছয়দফা পন্থী আওয়ামী লীগ বৈঠকে যোগদান করে নাই। দ্বিধাবিভক্ত আওয়ামী লীগকে ঐক্যবদ্ধ করার ১ম রাউন্ড প্রচেষ্টা ব্যর্থ।
" দাবী দিবস উপলক্ষে ন্যাপ কর্মী সভা–
" বিরোধী দলের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী পূর্ব পাকিস্তানী হওয়া বাঞ্ছনীয়– মওলানা ভাসানী।
" পল্টনে ন্যাপের জনসভাঃ মওলানা ভাসানী কর্তৃক বর্তমান সরকারের কার্যক্রমের তীব্র সমালোচনা।
" সাইদুর রহমান হত্যা প্রসঙ্গে মোট ৫ ব্যক্তি গ্রেফতার।
৫.১১.৬৮ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষঃ পুলিশ মোতায়েন।
৬.১১.৬৮ পটকা ও বাজি পোড়ানো নিষিদ্ধঃ ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারী।
৯.১১.৬৮ করাচী, পিন্ডি, লাহোর পেশোয়ারে ছাত্র বিক্ষোভঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ।
" গুলী বর্ষনে ছাত্র নিহত।
" করাচীতে ছাত্রসহ ৬০ ব্যক্তি গ্রেফতার।
" পুলিশের লাঠি চার্জঃ পিন্ডিতে সান্ধ্য আইনঃ শান্তি ফিরাইয়া আনার জন্য সেনাবাহিনী তলব।
১০.১১.৬৮ প্রদেশের তিনটি ছাত্র সংস্থা কর্তৃক পঃপাকিস্তানে ছাত্রদের উপর গুলীবর্ষন ও পুলিশের হামলার নিন্দা
" পেশোয়ারে ছাত্র পুলিশ সংঘর্ষ। পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে ছাত্র বিক্ষোভ প্রচন্ড আকার ধারন।
" মনি সিং গ্রেফতার।
" পেশোয়ার, লাহোর, করাচী, লায়ালপুর ও মুলতানে প্রচন্ড ছাত্র বিক্ষোভ অব্যাহতঃ পুলিশের গুলিতে পিন্ডিতে দুই ব্যক্তি নিহতঃ সান্ধ্য আইনের মেয়াদ বৃদ্ধিঃ ছাত্র ও রাজনৈতিক কর্মীসহ বহুলোক গ্রেফতার।
" লাহোরে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১৬ই নভেম্বর পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা।
১১.১১.৬৮ ছাত্র নেতাদের যুক্ত বিবৃতিতে শিক্ষক প্রহারের বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী।
" পেশোয়ারে আইয়ুব বলেনঃ আঞ্চলিকতা বাদীরা ঐক্যের শত্রুঃ পিস্তলসহ গাঢ় নীল স্যুট পরিহিত যুবক ধৃতঃ
" সভা চলাকালে দুইটি গুলীবর্ষন।
" অদ্য হইতে ন্যাপের দাবী সপ্তাহ শুরু।
" পেশোয়ারে ১৪৪ ধারা জারী।
১২.১১.৬৮ পশ্চিম পাকিস্তানে ছাত্র হত্যার নিন্দাঃ ছাত্র সমাজের প্রতি সরকারী নীতি পরিবর্তনের আহবান–আসাদুজ্জামান খান।

Dhaka University Institutional Repository

" পঃ পাকিস্তানে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি বিদ্যমানঃ আরও বহু স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা।
১৩.১১.৬৮ ন্যাপের দাবী সপ্তাহের দ্বিতীয় দিবসে পথসভা।
১৪.১১.৬৮ ভুট্টোর মুক্তির দাবীতে লাহোরে একশত আইনজীবীর মিছিলঃ ভুট্টো ও ওয়ালী খানসহ ১৫ জন গ্রেফতার।
" লাহোরে ১৪৪ ধারা জারী।
১৫.১১.৬৮ পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিবাদের ঝড়ঃ ভুট্টোসহ সকল রাজনৈতিক বন্দীর অবিলম্বে মুক্তির দাবী।
" ১৭ই নভেম্বর পল্টনে ন্যাপের জনসভা।
" বিভিন্ন ছাত্র প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদেশব্যাপী 'প্রতীক প্রতিবাদ দিবস' পালনের আহবান।
" পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থান হইতে মাহমুদুল হক উসমানীসহ আরও ৫৪ জন গ্রেফতার।
১৬.১১.৬৮ ন্যাপ কর্মী সভায় পশ্চিম পাকিস্তানে গ্রেফতারের নিন্দা।
" ভুট্টোসহ ৫ জন নেতার আটকাদেশের বিরুদ্ধে রীট আবেদনঃ পঃ পাকিস্তান হাইকোর্ট কর্তৃক গৃহীত।
" গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠার দাবীতে লাহোরে আইনজীবিদের নীরব বিক্ষোভ মিছিল।
১৭.১১.৬৮ ঢাকা বার সমিতি কর্তৃক পশ্চিম পাকিস্তানে পাইকারী গ্রেফতারের নিন্দা।
" আজ পল্টনে ন্যাপের জনসভা।
" সিরাজগঞ্জে ১২ জন ছাত্র গ্রেফতার।
" পশ্চিম পাকিস্তানে ধর পাকড় ও আইনজীবীদের নীরব বিক্ষোভ প্রদর্শন অব্যাহত।
১৮.১১.৬৮ অদ্য ঢাকায় আইনজীবীদের বিক্ষোভ।
" গুজরাটে ১৪৪ ধারা জারী।
১৯.১১.৬৮ ছাত্রদের উদ্যেঅগে অদ্য প্রদেশব্যাপী প্রতীক প্রতিবাদ দিবস পালন।
" শ্রমিকদের জন্য সর্বনিম্ন মজুরী দেড়শত টাকা ধার্য্য দাবী।
" দমননীতির প্রতিবাদে ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবীতে ঢাকায় আইনজীবীদের শান্তিপুর্ণ বিক্ষোভ মিছিল।
২০.১১.৬৮ অদ্য কাওরান বাজার শাহী মসজিদে প্রতিবাদ সভা।
" কুষ্টিয়ায় ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিল।
" ছাত্র বিক্ষোভ।
" শিয়ালকোটে ১৪৪ ধারা।
২১.১১.৬৮ পশ্চিম পাকিস্তানে দমননীতির প্রতিবাদে ২৪ সে নভেম্বর ন্যাপ কর্তৃক প্রতিবাদ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত।
২২.১১.৬৮ জাফর আহমদের উপর হইতে হুলিয়া প্রত্যাহারের দাবী।
২৩.১১.৬৮ পিন্ডিতে আসগর খানঃ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহবান।
" হায়দারাবাদ ও মুলতানে বিক্ষোভ মিছিল।
২৪.১১.৬৮ পঃ পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে মিছিল।
" অদ্য ন্যাপের উদ্যোগে প্রতিবাদ দিবস।
" রংপুরে আইনজীবীদের বিক্ষোভ মিছিল।
২৫.১১.৬৮ ন্যাপের উদ্যোগে "প্রতিবাদ দিবস" পালিতঃ সর্বনিম্ন দাবীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহবান।
" পশ্চিম পাকিস্তানের নয়জন পিডিএম নেতার জনসংযোগ অভিযান শুরু করার উদ্যোগ।
" রাওয়ালপিন্ডিতে ১৪৪ ধারা জারী।
২৬.১১.৬৮ ২৭শে নভেম্বর লাহোরের কলেজসমূহ খুলিবেনা।
২৭.১১.৬৮ সরকারের প্রতি দাবী-দাওয়া সম্পর্কে চরমপত্র প্রদানঃ পিন্ডিতে ২০ হাজার ছাত্রের দীর্ঘ ৭ ঘন্টাব্যাপী বিক্ষোভ প্রদর্শন।
" পিন্ডি ও এছলামাবাদের স্কুল কলেজ পুনরায় বন্ধ ঘোষনা।
২৮.১১.৬৮ ন্যাপ, কৃষক সমিতি ও শ্রমিক ফেডারেশনের উদ্যোগে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান।
" বিরোধীদলের ঐক্যজোট গঠনের উদ্দেশ্যে ন্যাপ কর্তৃক সর্বদলীয় বৈঠক আহবান।
" পেশোয়ার ও পিন্ডিতে ছাত্র বিক্ষোভ অব্যাহতঃ কতিপয় স্থানে পুলিশের সহিত সংঘর্ষ।
২৯.১১.৬৮ অদ্য পিন্ডিতে প্রতিবাদ দিবসঃ ছাত্রদের প্রস্তুতিঃ কর্তৃপক্ষের সতর্কতা।
" ৬ই ডিসেম্বর দমননীতি প্রতিরোধ দিবস।
" গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবীতে লাহোরে বিরাট বিক্ষোভ মিছিলঃ পুলিশের লাঠিচার্জঃ কিছুসংখ্যক ছাত্র গ্রেফতার।
৩০.১১.৬৮ পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বত্র আইনজীবীদের বিক্ষোভ।
" করাচীতে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিল।
" হাইকোর্ট বার সমিতির উদ্যোগে ঢাকায় আইনজীবীদের বিক্ষোভ মিছিল।
" শাসনতন্ত্রের ২ ও ৯৮ ধারা সংশোধনের ফলে মানবিক স্বাধীনতা মারাত্মকরূপে বিপন্ন হইবে।
" ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় সৈন্য মোতায়েন। রাওয়ালপিন্ডিতে লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ।
১.১২.৬৮ ন্যাপ প্রস্তাবিত ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে আওয়ামী লীগের সম্মতি জ্ঞাপণ।
" পিন্ডিতে ছাত্র মিছিলের উপর একদল লোকের হামলাঃ গুলি বর্ষণ ও মারধোর করাকালে পুলিশের নীরব ভূমিকা গ্রহণ।
" বায়তুল মোকাররমে ন্যাপের সভাঃ পল্টন ময়দানে সভার অনুমতি মিলিল না।
২.১২.৬৮ পাঁচজন ছাত্রনেতার বিবৃতিঃ সিরাজগঞ্জে ছাত্র মিছিলের উপর পুলিশের লাঠি চার্জের নিন্দা।
" শাসনতন্ত্রে ২ ও ৯৮ ধারা সংশোধনের ফলে দেশ ঔপনিবেশিক শাসনে ফিরিয়া যাইবে।
৩.১২.৬৮ লাহোরে হাইকোর্ট বার সমিতি কর্তৃক আইনজীবীদের উপর লাঠিচার্জ ও গ্রেফতারের নিন্দা।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১২.৬৮ বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স প্রসঙ্গে পিন্ডি ছাত্র সংসদ 'কালাকানুন' টি পুরাপুরি বাতিলই তাহাদের দাবী।
" দাবী আদায়ের জন্য পঃ পাকিস্তানের শিক্ষক বিক্ষোভের সম্ভাবনা।
" রাওয়ালপিন্ডিতে পি,ডি,এম কর্মীদের নীরব বিক্ষোভ মিছিল।
" অটোরিক্সা ধর্মঘট অব্যাহত।
" রাজনীতিকের গ্রেফতারের প্রতিবাদে গুজরানওয়ালা শহরে তুমুল বিক্ষোভ।
৫.১২.৬৮ দমননীতির বিরুদ্ধে পিডিএম আজ কালো পতাকাসহ শোভাযাত্রা।
" আগামীকল্য পিন্ডিতে ছাত্র সংগ্রাম কমিটির সভা।
৬.১২.৬৮ ঢাকা বিমান বন্দরে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব বলেনঃ পূর্ব পাকিস্তানের উন্নতির প্রতি মনোযোগ দেওয়া হইতেছে।
৭.১২.৬৮ পল্টন সভা শেষে গভর্ণর ভবনের সম্মুখে ন্যাপের বিক্ষোভ প্রদর্শনঃ নির্যাতনের প্রতিবাদে আজ যানবাহন হরতাল পালনের জন্য মওলানা ভাসানীর আহবান।
" জাতীয় পরিষদে প্রশ্নোত্তরঃ ন্যাশনাল ব্যাংকের এক চতুর্থাংশ কর্মচারী পূর্ব পাকিস্তানী।
" রমনা পার্কে শিক্ষক ও কৃষক সমাবেশ প্রেসিডেন্ট আইয়ুবঃ বিরোধী দলে দেশ পরিচালনার উপযোগী কেহ নাই।
" পিন্ডিতে ছাত্র মিছিলের উপর লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ।
৮.১২.৬৮ বিরোধী দলের ওয়াক-আউটের মিছিলসহ হাসপাতাল গমণ।
" বিরোধীদল দেশকে বিভক্ত করিতে চাহেঃ আইয়ুবের হুশিয়ারী।
" ঢাকায় পুলিশের গুলিবর্ষনে ৩ জন নিহত।
" প্রেসনোটঃ ২ জন নিহত ও ৪ ব্যক্তি আহত। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে ১৪৪ ধারা জারী।
৯.১২.৬৮ ১০ই ডিসেম্বর প্রতিবাদ দিবস।
" ঠাকুরগাঁয়ে ১৪৪ ধারা জারী।
১০.১২.৬৮ ভাসানীর আহবানে আজ হরতাল।
" দিনাজপুরে জনসভায় প্রেসিডেন্টের বক্তৃতাঃ সরকার কোনমতেই দেশকে বিভক্ত হইতে দিবে না।
" আজ দেশে সাংবাদিক ধর্মঘট।
১২.১২.৬৮ নেতৃবৃন্দ কর্তৃক হরতাল পালনের আহবান।
" সাংবাদিকদের ধর্মঘট।
১৩.১২.৬৮ আজ সারা প্রদেশে হরতাল।
" চট্টগ্রামে সাংবাদিকদের সফল ধর্মঘট।
" উন্নয়ন দশকে প্রাপ্ত ঋণের অসম বন্টনঃ দুই প্রদেশের জন্য ভিন্ন আমাদানী নীতির প্রস্তাব অগ্রাহ্য।
" সমগ্র শহরে পাইকারী হারে নিরীহ নাগরিকের গ্রেফতার।
" হাফেজ মুসা গ্রেফতার।
" গর্ভণর সম্মেলন সমাপ্ত। হিংসাত্মক কাজের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত।
১৪.১২.৬৮ ফজলুল কাদের চৌধুরী বলেন- সরকার জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করিয়াছেন।
" ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে ভাসানীসহ ১০জন বিরাধী দলীয় নেতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের।
" সারা প্রদেশে পূর্ণ হরতাল প্রতিপালিত। চট্টগ্রামে গুলীবর্ষনে ২৬ জন আহতঃ ১৫৭ জন গ্রেফতার।
" সহস্রাধিক গ্রেফতারঃ লাঠিচার্জ, পানি নিক্ষেপ। ঢাকায় হরতাল।
" আসগর খানের প্রাইভেট সেক্রেটারী গ্রেফতার।
" আসগর খানের উপর রঙ্গীন পানি নিক্ষেপ।
১৫.১২.৬৮ হরতাল দিবসে আসাদুজ্জামান খান কর্তৃক পুলিশের গুলীবর্ষণের নিন্দা।
" চট্টগ্রামে গুলীর শিকার মুসা মিয়ার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ।
১৬.১২.৬৮ ভোজ সভায় আসগর খানঃ দীর্ঘদিন অপেক্ষা করিতে হইবে না।
" সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানব্যাপী বিক্ষোভঃ লাহোরে ছাত্র মিছিলের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ।
১৭.১২.৬৮ বর্তমান শাসনতন্ত্র সম্পর্কে গণভোট অনুষ্ঠানের প্রস্তাব।
২০.১২.৬৮ দুই মাসাধিককাল বন্ধ থাকার পর ২৬শে ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলিবে।
২৪.১২.৬৮ ভবনশীর্ষ ও গাড়ীতে কালোপতাকাঃ বাহুতে কালো ব্যাজঃ ঈদের জামাতে গোলযোগ ও বিক্ষোভ মিছিলঃ ২ জন আলেমসহ ২৪জন গ্রেফতারঃ বহু সম্পত্তি বিনষ্টঃ ঈদের আনন্দ মানঃ পিন্ডিতে সংঘর্ষ।
২৫.১২.৬৮ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক আজ পিন্ডিতে পূর্ণ হরতাল পালনের আহবান।
২৭.১২.৬৮ ছাত্র সংগ্রাম কমিটির আহবানে রাওয়ালপিন্ডিতে পূর্ণ হরতাল পালিত।
" সরকারী নির্যাতনের প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় ভবন শীর্ষে কালোপতাকা।
" কনভেনশন লীগের বক্তৃতা মঞ্চ হইতে এবার বক্তৃতা নয় গুলীবর্ষণ।
২৮.১২.৬৮ খুলনার জনসবায় মওলানা ভাসানী।
" প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধী দলের নেতা আসাদুজ্জামান বলেনঃ বর্তমান সরকারের ভিত্তিমুল কাপিয়া উঠিয়াছে।
২৯.১২.৬৮ পেশোয়ারে আরো ২৬ ব্যক্তি গ্রেফতার।
" ভুট্টো প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন।
" মওলানা ভাসানী কর্তৃক আজ ধর্মঘট পালনের আহবান।
" গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য আগামী মাসে ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু হওয়ার সম্ভাবনা।

Dhaka University Institutional Repository

৩০.১২.৬৮ নড়াইলে পুলিশের গুলীবর্ষণ।
" মিছিল দেশবাসীর পক্ষে উপদ্রব স্বরূপঃ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব।
" করাচীতে পিডিএম-এর মিছিল।
৩১.১২.৬৮ বিরোধীদলের প্রবল সমালোচনার মুখে বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ বিল পরিষদে গৃহীত।
" প্রাদেশিক পরিষদে তুমুল হট্টগোলের পর গুলীবর্ষণ ও নাগরিক হত্যা সম্পর্কিত মুলতবী প্রস্তাব বাতিল।
" মনোহরদীর হাতির দিয়া বাজারে জনতার উপর পুলিশের গুলীবর্ষণে ৩ জন নিহত।
" ন্যাপ নেতা কর্তৃক হাতির দিয়া বাজারে পুলিশের গুলীবর্ষনের নিন্দা।
" প্রেসিডেন্ট আইয়ুব বলেনঃ শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতি ও নির্বাচনের মাধ্যমেই সরকার পরিবর্তন সম্ভব।
১.১.৬৯ পূর্ব পাক-মস্কোপন্থী ন্যাপের প্রস্তাবঃ সরকারের পরিবর্তন ঘটানোর জন্য ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনের আহবান
" বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কর্তৃক হাতিরদিয়ায় পুলিশের গুলী বর্ষণের নিন্দা
" অদ্য পিন্ডিতে টাঙ্গা ও ট্যাক্সি চালক ধর্মঘট
২.১.৬৯ মাসপহেলা বেতার ভাষণে প্রেসিডেন্ট আইয়ূবের ঘোষণাঃ মিছিল ও উৎচ্ছৃংখলতায় ভীত হইয়া সরকার নীতি ত্যাগ করিবে না
৪.১.৬৯ আজম খান কর্তৃক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার আহবান
" পঃ পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে সরকার বিরোধী সভা ও শোভাযাত্রা অব্যাহত
" ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনের উদ্দেশ্যে অন্যান্য দলের সহিত আলোচনার জন্য পি,ডি,এম এর উদ্যোগ গ্রহণ
৫.১.৬৯ আটটি বিরোধীদল অধিকার আদায়ের উদ্দেশ্যে ঐক্যফ্রন্ট গঠনের প্রশ্নে মতৈক্যে উপনীত
" নেতৃবৃন্দের প্রতি ছাত্র সমাজঃ সমগ্র দেশে ১ দিন হরতাল পালন করুণ
" ন্যাপের সভায় রাজবন্দীদের সুযোগ-সুবিধা দানের আহবান
" পোষ্টম্যান কর্মচারী ইউনিয়নের সভাঃ সাপ্তাহিক কার্য্যকাল হ্রাস ও রেশনিং ব্যবস্থা চালুর দাবী
" পিকিংপন্থী ন্যাপ কর্তৃক সাধারণ নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত
৬.১.৬৯ ৮টি বিরোধী দলীয় প্রতিনিধিদের বৈঠক প্রেসিডেন্টের নিকট গণদাবী-দাওয়া ভিত্তিক পত্র প্রেরণের সম্ভাবনা
" ছয় জন ছাত্রনেতার যুক্ত বিবৃতিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জন্য বিরোধী দলগুলির প্রতি আহবান
" অদ্য পিন্ডিতে ছাত্রীদের মিছিল
৭.১.৬৯ পেশোয়ারে ৪ জন বিরোধী দলীয় রাজনীতিক গ্রেফতার
" পাঁচটি ন্যূনতম দাবী আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত পিডিএম কর্তৃক আসন্ন সাধারণ নির্বাচন বর্জন করার সিদ্ধান্ত
" পিডিএমসহ ৮টি দলের বৈঠকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের খসড়া কর্মসূচী প্রণীত
" পেশোয়ারে জেঃ আজম খানের বক্তৃতাঃ বিরোধী দলগুলিকে জাতীয় ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান
৮.১.৬৯ তোয়াহা ও আবদুল হকের প্রতি আত্মসমর্পনের নির্দ্দেশ
" পিন্ডিতে কাল দোপাট্টা পরিহিতা ছাত্রীদের বিক্ষোভ মিছিল
" আট পার্টির খসড়া প্রস্তাবে নির্বাচন বয়কটের প্রস্তাব গ্রহণের সম্ভাবনা
" গত ৪ বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক শিল্পখাতে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কোন নগদ বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দ করা হয় নাই
৯.১.৬৯ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন পরিচালনার জন্য সংগ্রাম কমিটি গঠন ঃ আটটি বিরোধী দল কর্তৃক আসন্ন সাধারণ নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত
৯.১.৬৯ হাজী দানেশের বিবৃতিঃ জুলুম বিরোধী সপ্তাহকে সফল করার আহবান
" তাসখন্দ ঘোষণার প্রতিবাদে ১৩ই জানুয়ারি পিন্ডিতে হরতাল
১০.১.৬৯ ১৭ই জানুয়ারী মেডিক্যাল ছাত্রদের দাবী দিবস পালনের আহবান
" দুই জন ছাত্র নেতা কর্তৃক জরুরী আইন ও দেশরক্ষা আইন প্রত্যাহার দাবী
" ১৭ জন রাজনীতিকের যুক্ত বিবৃতিতে রাজবন্দীদের অভাব অভিযোগ পূরণের জন্য সরকারের প্রতি আহবান
১১.১.৬৯ বগুড়ায় মওলানা ভাসানীঃ নির্বাচন বর্জনের পুনরাহবান
" ঢাকা বণিক সমিতির সভাপতির মন্তব্যঃ সম সুযোগের অভাবই দুই অংশের মধ্যে বৈষম্যের কারণ
১২.১.৬৯ তাসখন্দ ঘোষণা দিবসে লাহোর ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ মিছিল
১২.১.৬৯ নবগঠিত 'ডাক' এর আঞ্চলিক সংযোগ সংস্থার সভায় ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার দাবী
" ভাসানী কর্তৃক বিরোধীদলের নির্বাচন বয়কটের সিদ্ধান্ত অভিনন্দিত
১৩.১.৬৯ গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি কর্তৃক ১৭ই জানুয়ারী দাবী দিবসকে সাফল্যমন্ডিত করার আহবান
" ডাক্তারদের পেশাগত মর্য্যাদার দাবী বাস্তবায়নকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট অনুরোধ
১৪.১.৬৯ বিরোধী দলসমূহ কর্তৃক নরসিংদীতে শ্রমিক কর্মচারীদের উপর গুন্ডামীর নিন্দা
১৫.১.৬৯ নেতৃবৃন্দের আহবানঃ দাবী দিবস সাফল্যমন্ডিত করুন
" শিয়ালকোটে ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিল
" এয়ার মার্শাল আসগর খানের অভিযোগঃ সরকার জাতীয় সংবাদ পত্রসমূহের কণ্ঠরোধ করিয়াছেন
১৬.১.৬৯ বিরোধী দলের তীব্র সমালোচনার মুখে পূর্ববঙ্গ (জরুরী) হুকুমদখল অর্ডিন্যান্স অনুমোদিত
" অপহৃত আজাদ সম্পাদকের উদ্ধারে ব্যর্থতাঃ আমেনা বেগম কর্তৃক প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের তীব্র সমালোচনা
" পশ্চিম পাক ইঞ্জিনিয়ারিং ভার্সিটি ছাত্রদের আজ বিক্ষোভ মিছিল

Dhaka University Institutional Repository

১৭.১.৬৯ আট পার্টির ঐক্যজোট গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটির উদ্যোগে জনসভা ও গণমিছিলের মাধ্যমে আজ দেশব্যাপী দাবী দিবস পালন
" সরকারী নির্যাতনের প্রতিবাদে আজ প্রদেশব্যাপী ছাত্রসভা ও বিক্ষোভ মিছিল
" সিলেটে ভাসানীর বক্তৃতাঃ পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন যে কোন আন্দোলনের ভিত্তি হওয়া উচিত
১৮.১.৬৯ রায়টকার হইতে লালপানি বর্ষনঃ ব্যারিকেট সৃষ্টিঃ বেপরোয়া গ্রেফতারঃ দুইজনের মিছিলঃ দাবী দিবসে ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিলকারীদের উপর পুলিসের লাঠি চার্জ
" আজ ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘটঃ দাবী দিবসে ছাত্র গ্রেফতার, লাঠি চার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ
" ৫ই ফেব্রুয়ারী হরতাল
১৯.১.৬৯ ছাত্রদের উপর হামলার নিন্দা
" পুলিস কর্তৃক কাঁদুনেগ্যাস লালপানি ও ইষ্টক বর্ষনঃ বিক্ষুব্ধ ছাত্রদল কর্তৃক ইষ্টকও গুলতি ব্যবহার বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষঃ শতাধিক আহতঃ বহু গ্রেফতারঃ রাজপথে ছাত্র মিছিল
" সোমবার ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট
" ছাত্র জনতার উপর পুলিসী হামলার প্রতিবাদে বিরোধীদলের পরিষদ কক্ষ বর্জন
" খোরশেদ কর্তৃক ঢাকায় ছাত্রদের উপর পুলিসী জুলুমের নিন্দা
২০.১.৬৯ শিক্ষক পরিষদ কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিসী হামলার নিন্দা
" আজ ছাত্র ধর্মঘট
" ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রদের মিছিলের উপর লাঠি চার্জ
২১.১.৬৯ পুলিসের গুলিতে ছাত্র নিহত
" শোকসন্তপ্ত মহানগরীর বুকে অশ্রুসজল ছাত্র ছাত্রীর নীরব মিছিল
" ঢাকায় ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে লাহোরে মিছিল
" নারায়নগঞ্জে ছাত্রদের উপর লাঠি চার্জ
" আজ ঢাকায় হরতাল
২২.১.৬৯ ঐতিহাসিক জানাজা ও লক্ষাধিক লোকের মিছিল
"ঢাকায় স্বতঃস্ফূর্ত হরতালঃ গুলীবর্ষনঃ লাঠিচার্জ ও ইষ্টক বর্ষনে ১৫ জন ছাত্রীসহ প্রায় অর্দ্ধশত আহতঃ বহু গ্রেফতার
২৩.১.৬৯ সরকারী দমননীতির প্রতিবাদে প্রদেশে প্রথম মৌলিক গণতন্ত্রীর পদত্যাগ
" বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক ছাত্র হত্যা, গুলী বর্ষন, লাঠি চার্জ ও ব্যাপক গ্রেফতারের নিন্দা
" ছাত্রদের ডাকে আগামীকাল প্রদেশব্যাপী হরতাল
" কনভেনশনলীগ পত্রিকা অফিসে ছাত্রদের হামলাঃ পিন্ডিতে সংঘর্ষঃ ব্যাটন চার্জঃ কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপঃ বহু গ্রেফতার
" তিন দিবসব্যাপী কর্মসূচীর প্রথম দিনে কালো পতাকা ও ব্যানারসহ ঢাকার রাজপথে ছাত্র–ছাত্রীদের তিন মাইল দীর্ঘ শোক মিছিল
২৪.১.৬৯ পঃ পাক বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল
" আজ হরতাল
" সোমবার মহিলা সমাবেশ
" ঢাকায় গুলী বর্ষনের প্রতিবাদে প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ। মিছিলঃ প্রতিবাদী সভা
" ঢাকার বুকে স্মরণকালের বৃহত্তর মশাল মিছিলঃ ত্রিশ সহস্রাধিক ছাত্র–ছাত্রীর অংশগ্রহণ
২৫.১.৬৯ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শুরুঃ শোক
" ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শুরুঃ শোক প্রস্তাব অগ্রাহ্যের প্রতিবাদে বিরোধী দলের ওয়াক–আউট
" পাঁচ লক্ষ লোকের সমাবেশঃ পুলিশের গুলীবর্ষনে অন্ততঃ পক্ষে ৪ জন নিহত ও বহু আহত
" মোনেশাহীতে ছাত্রসহ ২ জন নিহত
" সান্ধ্য আইন লংঘনের বিরুদ্ধে গবর্ণরের কঠোর হুঁশিয়ারী
" ঢাকায় ২৪ ঘন্টার জন্য সান্ধ্য আইন জারী
২৬.১.৬৯ ছাত্রদের কর্মসূচী ঘোষণাঃ তিন দিন শোক দিবস পালনের আহবান
" খুলনা, নারায়গঞ্জ, সিদ্ধিরগঞ্জ, বন্দর ও ডেমরায় সান্ধ্য আইন জারী
" ঢাকায় সান্ধ্য আইনের মেয়াদ আরও ২৪ ঘন্টা বর্দ্ধিতঃ ১১টা হইতে ২ টা পর্য্যন্ত তিন ঘন্টার বিরতি গুলীবর্ষনে ২ জন নিহতঃ ১২ জন আহত
২৭.১.৬৯ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক অবিলম্বে সান্ধ্য আইন প্রত্যাহারের দাবী
" ফরিদ আহমদের বিবৃতিঃ সান্ধ্য আইন প্রত্যাহারের দাবী
" ঢাকায় ৫ ঘন্টা ও নারায়ণগঞ্জে তিন ঘন্টা বিরতিঃ সান্ধ্য আইন ৩৬ ঘন্টা বর্দ্ধিত
" নারায়ণগঞ্জে বিক্ষুব্ধ জনতা কর্তৃক রাস্তা অবরোধের চেষ্টাঃ আরও ২৪ জন নিহত
২৮.১.৬৯ প্রেসনোটঃ গৌরীপুরে গুলীতে দুই ব্যাক্তি হতাহত
" নারায়ণগঞ্জে গুলীবর্ষনঃ ঢাকায় পূর্ব দিনের আহত ২ জনের মৃত্যু
" স্পীকার কর্তৃক ৫ জন বিরোধীয় সদস্যকে বলপূর্বক বহিষ্কারের নির্দেশদানের ফলে জাতীয় পরিষদে তুমুল হট্টগোল
" সান্ধ্য আইন চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে ফরিদ আহমদের বিবৃতি
" বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক শিক্ষকপত্নীদের বিবৃতিঃ সরকারের বর্ত্তমান নীতির সমালোচনা

Dhaka University Institutional Repository

" ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের ঘোষণাঃ ১১ দফা আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলিবে
২৯.১.৬৯ আমাকে মিথ্যা জড়িত করা হইয়াছেঃ শেখ মুজিবের জবানবন্দীঃ পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবী দাবাইয়া রাখার জন্যই এই ষড়যন্ত্র মামলা
" ঢাকায় ১০ ঘন্টা ও নারায়ণগঞ্জে ৬ ঘন্টার জন্য শিথিলঃ সান্ধ্য আইন আরও বর্দ্ধিত
" পিন্ডিতে ৫ হাজার ছাত্র জনতার বিক্ষোভ মিছিল
" অদ্য রীট আবেদনের শুনানী শুরুঃ কারফিউ 'জারীকরণের' বৈধতা চ্যালেঞ্জ
" সরকারী প্রেসনোটঃ বরিশালে গুরী বর্ষনে ৯ ব্যক্তি আহত
" অধ্যাপক মোজাফফর গ্রেফতার
৩০.১.৬৯ করাচীতে ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত বিরতিহীন সান্ধ্য আইন
" সকাল ৬টা হইতে বিকাল ৩ টা পর্য্যন্ত বিরতিঃ ঢাকায় সান্ধ্য আইনের মেয়াদ বর্দ্ধিত
" সান্ধ্য আইন কবলিত ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের অবস্থা
" আইন সম্পর্কিত রীট আবেদনের শুনানীকালে এডভোকেট জেঃ বলেনঃ কারফিউ বলবৎ থাকাকালীন দেখামাত্র গুলী করা সম্পর্কে কোন নির্দেশ নাই
" বরিশালে পুলিসের গুলিতে আহত ১ জন ছাত্রের মৃত্যু
" প্রদেশে নেতৃবৃন্দ গ্রেফতার
" ৫ই ফেব্রুয়ারী প্রদেশে ছাত্রদের প্রতীক ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত
" লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেমের জবানবন্দীঃ অকথ্য নির্য্যাতনের কাহিনী বর্ণনা
৩১.১.৬৯ প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে শত শত রাজনৈতিক কর্মী গ্রেফতার
" করাচীর ১১ জন নেতার যুক্ত বিবৃতিঃ সরকারের আলোচনার ইচ্ছার খবর নিছক "টোপ" মাত্র
" দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আজ জাতীয় পরিষদে নূরুল আমীনের ভাষণ
" সান্ধ্য আইন সম্পর্কিত রীট নাকচঃ রায়দানকালে মাননীয় বিচারপতিদ্বয় বলেনঃ এডভোকেট জেনারেলের বিবৃতি আমরা মানিয়া নিতে পারিনা
"ঢাকায় সান্ধ্য আইন প্রত্যাহার
১.২.৬৯ খান এ, সবুর বলেনঃ ছাত্রদের ১১ দফার ১০ দফাই রাজনৈতিক প্রকৃতিরঃ প্রেসিডেন্ট সর্বদাই যুক্তির প্রতি কর্ণপাত করিতে প্রস্তুত
" সরকারী হিসাব মতে ৭ই ডিসেম্বর হইতে প্রদেশে গুলীতে ৩০ ব্যক্তি নিহত
" ভেদরগঞ্জে পুলিসের গুলিতে ছাত্র আহত
" নুরুল আমীন বলেনঃ গুলিতে শতাধিখ লোক নিহত হইয়াছে
" ওলি আহমেদ গ্রেফতার
" আজ ঢাকায় প্রতীক ছাত্র ধর্মঘট
২.২.৬৯ বেতার ভাষনে প্রেসিডেন্ট বলেনঃ শাসনতন্ত্র ঐশীবাণী নহে- ইহা পরিবর্তন করা যাইতে পারেঃ আলাপ-আলোচনার জন্য শীঘ্রই দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিবর্গকে আমন্ত্রণ জানাইব
" বগুড়ায় পুর্ণ হরতাল পালিত
" সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ঘোষণাঃ ১১ দফা কর্মসূচীর বাস্তবায়ন ছাড়া আপোষ-মীমাংসার অবকাশ নাই
" ভাসানীপন্থী ন্যাপ নেতৃবর্গ বলেনঃ গণদাবীর প্রশ্নে আপোষ-আলোচনার অবকাশ নাই
" ২৭ জন কনভেনশন লীগ নেতার বিবৃতিঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন দাবী
" ১ জন নিহত
" বাগেরহাট ছাত্র মিছিলে পুলিসের গুলীবর্ষনে ২ ব্যক্তি আহত
৩.২.৬৯ প্রেসিডেন্টের প্রস্তাব সম্পর্কে বিভিন্ন নেতার মন্তব্যঃ উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি না হইলে বৈঠক সম্ভব নয়
" প্রকৌশল ছাত্রদের সভায় ১১ দফার বাস্তাবায়ন দাবী
" বিচারপতি মোরশেদ কর্তৃক গোলটেবিল বৈঠকের পূর্বে মুজিব-ভূটো-ওয়ালীসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী
" ঢাকায় কৃষি কলেজ ছাত্রদের প্রতীক ধর্মঘট পালন
" আজ ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট
" ন্যাপের কর্মিসভায় রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী গ্রেফতারের নিন্দা
" নিপীড়নমূলক নীতির প্রতিবাদে আগামীকাল প্রদেশে সাংবাদিকদের ধর্মঘট
" গ্রেফতার ও নির্য্যাতনের প্রতিবাদে রংপুরে মহিলাদের সভা ও মিছিল
৪.২.৬৯ সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ঘোষণাঃ নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ রাখিয়া কোন প্রকার আলোচনাই অনুষ্ঠিত হইতে পারে না
" লাহোরে ছাত্রদের ক্লাশ বর্জন
" আগামীকাল প্রদেশে ছাত্র ধর্মঘট
" আজ প্রদেশব্যাপী সাংবাদিক ধর্মঘট
৫.২.৬৯ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহবানে ৯ই ফেব্রুয়ারি শপথ দিবস
" সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক গোল টেবিল বৈঠকের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান
৭.২.৬৯ শেখ মুজিব ব্যতীত আওয়ামী লীগ আলোচনায় যোগ দিবে না

Dhaka University Institutional Repository

” জরুরী আইন প্রত্যাহারের বিষয়টি বিবেচনা করা হইতেছেঃ ঢাকা আগমনের পর সাংবাদিকদের নিকট প্রেসিডেন্টের তথ্য প্রকাশ
” "কালো দিবস" উপলক্ষে ছাত্র ধর্মঘটঃ ২০ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর কালোপতাকা মিছিল
৮.২.৬৯ সরকারী প্রেসনোটঃ কুমিল্লায় গুলিবর্ষনে ২ ব্যক্তি নিহত
” ডাকের ৮-দফার ৭-দফা মানিয়া না লওয়া হইলে আওয়ামী লীগ গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিবে না
” দেশরক্ষা আইন ও অর্ডিন্যান্সের প্রয়োগ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষনাঃ সাংবাদিক সম্মেলনে আইন উজিরের তথ্য প্রকাশ
” কামরুল আনাম খান ও অন্যান্যদের জামিন না মঞ্জুর
” সরকারী নির্যাতনের প্রতিবাদে ঢাকায় আড়াই সহস্রাধিক মহিলার সভা ও শোভাযাত্রা
৯.২.৬৯ দৈনিক ইত্তেফাক-এর ছাপাখানা নিউনেশন প্রিন্টিং প্রেসের উপর হইতে বাজেয়াফত আদেশ প্রত্যাহার
১০.২.৬৯ কনভেনশন লীগ অধিবেশনে প্রেসিডেন্ট বলেনঃ বৈষম্য দূরীকরণের নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিবেচনা করা হইতেছে
” সরকারী মুখপাত্রের উক্তিঃ ২ দিনের মধ্যে জরুরী আইন প্রত্যাহার
” আওয়ামী লীগ কর্তৃক ১৪ই ফেব্রুয়ারী পূর্ণ হরতাল পালনের আহবান
” সরকারী নীতির প্রতিবাদে জাতীয় পরিষদের ২ জন সদস্যের পদত্যাগ
” সেন্ট্রাল জেল গেটে গণমিছিল
” ১৪৪ জন রাজবন্দীর মুক্তি লাভ
” পল্টনের ছাত্র জনতার ঐতিহাসিকসমাবেশঃ ১১-দফা আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রাখার সংকল্প
১১.২.৬৯ গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান প্রশ্নে অচলাবস্থার সৃষ্টিঃ আগরতলা মামলা প্রত্যাহার ও মুজিবের মুক্তি দাবী
” সতীর্থ আবদুল লতিফের মৃত্যুতে পলিটেকনিক ছাত্রদের সভা ও মিছিল
” ভাইস চ্যান্সেলরদের বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল সম্পর্কে আলোচনা
” ঢাকা জেল হইতে চারজন রাজবন্দীর মুক্তি লাভ
১২.২.৬৯ বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স সংশোধন ও ডিগ্রী প্রত্যাহার সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ বাতেল করা উচিত
” ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের সহিত দেশের নিরাপত্তার প্রশ্নটি জড়িতঃ ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে প্রেসিডেন্টের মন্তব্য-
” ভাসানীপন্থী "ন্যাপ" কর্তৃক ১৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে "গণদাবী সপ্তাহ" পালনের সিদ্ধান্ত
” বেয়নেট চার্জে নিহত মনিরের এন্তেকালঃ স্কুল ছাত্রদের ক্লাস বর্জনঃ মিছিল ও শোকসভা
” ১৪ই ফেব্রুয়ারী হরতালের প্রতি বিভিন্ন মহলের অকুণ্ঠ সমর্থন
” "শেখ মুজিব দিবসে" চট্টগ্রামে পূর্ণ হরতাল
” লাহোরে ছাত্রদের বৃহত্তম মিছিল
” শেখ মুজিব সম্পর্কিত প্রশ্নটি পূর্বশর্তের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাইঃ গোলটেবিল সম্পর্কিত 'ডাকে'র বৈঠক স্থানান্তরিত
১৩.২.৬৯ সরকারী নীতির প্রতিবাদে পশ্চিম পাকিস্তানে এ পর্য্যন্ত তিন শতাধিক মৌলিক গণতন্ত্রীর পদত্যাগ
” করাচীতে মহিলাদের শোভাযাত্রা
” শেখ মুজিবেকে মুক্তি না দিলে ত্রিশ হাজার রিক্সা শ্রমিক ধর্মঘট করিবে
” ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক শহীদ দিবস স্মরণে বেতার ও টেলিভিশন অনুষ্ঠানের দাবী
” ১৪ই ফেব্রুয়ারী হরতালের প্রতি সমর্থন
” জাতীয় পরিষদ অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী ঘোষণা
” নির্যাতন গণহত্যার প্রতিবাদে এবং ১১-দফার সমর্থনে জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলীয় ৭ জন সদস্যের পদত্যাগ
১৪.২.৬৯ গোলটেবিল বৈঠকের জন্য গুলীবর্ষন ও লাঠি চার্জঃ বন্ধ করিতে হইবে
” লাহোরে মিছিলের পর মিছিলঃ পুলিশের লাঠি চার্জ মহিলাদের উপর কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ
” হরতালের পূর্ব দিন পাড়ায় পাড়ায় মিছিল
” বরিশালে ছাত্রদের নীরব মিছিল
” কাউন্সিল লিগ নেতা আবুল কাশেম বলেনঃ শেখ মুজিবের মুক্তি ছাড়া আলোচনা ফলপ্রসূ হইতে পারে না
” আজ ভুট্টোর আমরণ অনশন শুরু
” ছাত্রনেতা মেননসহ ৬৫ জন রাজবন্দীর মুক্তিলাভ
ছাত্র-গণহত্যা-নির্য্যাতনের প্রতিবাদে ও ৮-দফা দাবীতে 'ডাক'এর আহবানে আজ সারা পাকিস্তান হরতাল
১৫.২.৬৯ পার্লামেন্টারীসরকার কায়েম ও সার্বজনীন ভোটাধিকারের দাবীর ধ্বনিতে মহানগরী প্রকম্পিতঃ পল্টনে তিন লক্ষাধীক লোকের ঐতিহাসিক সমাবেশ
” মুজিব-ভুট্টো-ওয়ালী ছাড়া জাতীয় সরকার গঠিত হইতে পারে না
” কেন্দ্রীয় আইন উজির কর্তৃক প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্ত ঘোষিতঃ সোমবার জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার
” প্রদেশে পূর্ণ হরতালঃ চট্টগ্রামে ২টি পত্রিকা অফিসে অগ্নিসংযোগ
” লাহোরে গুলি বর্ষনে ২ জন নিহতঃ করাচী হায়দরাবাদ ও লাহোরে সেনাবাহিনী তলব
” পলায়নের চেষ্টা করায় ষড়যন্ত্র মামলার দুইজন অভিযুক্তের প্রতি গুলীবর্ষন
১৬.২.৬৯ গুলীবর্ষনে বানিয়াচঙে ২ ব্যক্তি আহত
” নারায়নগঞ্জে গুলীতে একজন ছাত্র নিহতঃ ৬জন আহত
” গবর্ণরের মাসমধ্য বেতার ভাষনঃ বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল করা হইবে
” আগামীকাল ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট

Dhaka University Institutional Repository

"	সরকারী দলের বহু এম, এন, এ, বর্তমান শাসন ব্যবস্থার বিরাট পরিবর্তন কামনা করেন
১৭.২.৬৯	বিক্ষুব্ধ জনতা কর্তৃক বিভিন্ন স্থানে অগ্নিসংযোগঃ সান্ধ্য আইন জারী ও সেনাবাহিনী তলবঃ গুলিবর্ষনের ফলে ১ জন নিহতঃ বহু আহত
"	জরুরী অবস্থার অবসান
১৮.২.৬৯	গোলটেবিল বৈঠকে অংশ গ্রহণকারীদের নাম
"	পাস দেখাইয়াও ফটোগ্রাফার লাঞ্ছিতঃ সান্ধ্য আইনের মেয়াদ পুনরায় বৃদ্ধি
"	ছাত্র নেতৃবৃন্দ কর্তৃক সান্ধ্য আইন প্রত্যাহারের দাবী
"	করাচীতে সেনাবাহিনী তলবঃ পুলিসের গুলীবর্ষনে ২ ব্যক্তি নিহতঃ ২৬ জন আহত
"	ছাত্র ধর্মঘটঃ গায়েবানা জানাজাঃ গৃহ ও সিনেমায় অগ্নিসংযোগঃ চট্টগ্রামে ইপিআর তলবঃ১৪৪ ধারা জারী
"	'ডাক' বহির্ভূত নেতৃবৃন্দের যোগদানের বিষয় সক্রিয় বিবেচনাধীনঃ আগামীকাল পিন্ডিতে গোলটেবিল বৈঠক শুরু
১৯.২.৬৯	গুলীতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডারসহ তিন জন নিহত
"	আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও অভিযুক্তদের মুক্তি ব্যতীত শেখ মুজিব গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিবেন না
"	নিরাপত্তা আইনে পুনরায় গ্রেফতারের নিন্দা
"	শেখ মুজিবের মুক্তি ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে সান্ধ্য আইন উপেক্ষা করিয়া রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় রাত্রে বিক্ষোভ মিছিল
"	প্রেসিডেন্টের নিকট ভাসানীর তারঃ ১১-দফা আলোচ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত না হইলে ন্যাপ বৈঠকে যোগ দিবে না
২০.২.৬৯	হাসপাতাল সূত্রে চার জনের মৃত্যুর সংবাদঃ ঢাকায় গুলীবর্ষনে বহুলোকের মৃত্যুর আশংকা
"	মওলানা ভাসানীসহ বহু নেতা কর্তৃক অবিলম্বে সান্ধ্য আইন, সেনাবাহিনী ও ১৪৪ ধারা প্রত্যাহারের আহবান
"	ডক্টর শামসুজ্জোহার হত্যার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়-স্কুল-কলেজ শিক্ষকদের অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট ঘোষণা
"	'শহীদ দিবস' উপলক্ষে কারফিউ প্রত্যাহার দাবী
"	কুষ্টিয়া ও নোয়াখালীতে বিক্ষোভ মিছিলে গুলীবর্ষনঃ ৪ ব্যক্তি নিহত ও বহু ব্যক্তি আহতঃ কুষ্টিয়ায় ইপিআর তলব
২১.২.৬৯	গুলীতে ডঃ জোহার মৃত্যুতে প্রদেশব্যাপী শিক্ষক ধর্মঘট
"	সান্ধ্য আইন ও ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার
"	পল্টনে জনসমুদ্রের গর্জনঃ এগার দফার ভিত্তিতে নয়া শাসনতন্ত্র রচনার দাবী
২২.২.৬৯	পল্টনে জনসমুদ্রের গর্জ্জনঃ এগার দফার ভিত্তিতে নয়া শাসনতন্ত্র রচনার দাবী
"	খুলনায় শহীদ দিবসের মিছিলে গুলিবর্ষনঃ সান্ধ্য আইন জারী। জনতার হাতে জনৈক পুলিশের মৃত্যু। ৮ জন নিহত
"	পল্টনের জনসভার প্রস্তাবঃ ৪ঠা মার্চ সমগ্র প্রদেশে হরতাল
"	পাবনায় ছাত্রসহ ২ জন নিহত
২৩.২.৬৯	মনি সিং সহ ৩৪ জন রাজবন্দীর মুক্তিলাভ
"	সুখবরঃ পল্টনে ছাত্রদের এগার দফার প্রতি মুক্ত মানবদের পূর্ণ সমর্থন
"	আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহৃতঃ 'এসো সমিতির সদস্য ও ঐক্যে এসো জনতার মুখরিত সখ্যে'
২৪.২.৬৯	গুলীবর্ষন সম্পর্কে শেখ মুজিব
"	দশ লক্ষাধিক লোকের সমাবেশে মুজিব বলেন- গোল টেবিল বৈঠকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের ন্যায্য দাবী পেশ করিব
"	সম্মিলিত বাহিনীর গুলীবর্ষনে ঢাকায় তিন ব্যক্তি আহত
২৫.২.৬৯	আজ পিন্ডিতে গোলটেবিল বৈঠক শুরু
"	ন্যাপ দফতরে মনি সিং সহ ২৯ জন রাজবন্দীর সম্বর্দ্ধনাঃ গণ-আন্দোলনকে সঠিক পথে পরিচালিত করিতে হইবে
"	৪ মার্চের হরতালের প্রতি ন্যাপের পুর্ন সমর্থন
"	ঢাকা আইনজীবি সমিতি কর্তৃক শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলাভাষা চালু করার দাবী
"	আজম-শেখ মুজিব বৈঠক গুরত্বপুর্ণ জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে সন্তোষজনক আলোচনা
"	লাহোর যাত্রার প্রাক্কালে শেখ মুজিবঃ বৃহত্তর জাতীয় সংহতির স্বার্থে উভয় অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসন প্রয়োজন
"	গোলটেবিল বৈঠকেঃ যোগদান প্রশ্নে ন্যাপের সাতটি পূর্ব শর্ত
"	ছাত্রনেতাদের হস্তক্ষেপের ফলে পরিস্থিতি আয়ত্তাধীনঃ ওয়াপদার সহস্রাধিক কর্মচারীর আকস্মিক ধর্মঘটের ফলে সমগ্র শহরে বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ বন্ধ
২৬.২.৬৯	করাচীর উপদ্রুত এলাকায় ২৪ ঘন্টা সান্ধ্য আইন জারী
"	ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে পল্টনে সদ্যমুক্ত রাজবন্দীদের সবর্দ্ধনা
"	বিজলী শ্রমিকদের আকস্মিক ধর্মঘটঃ ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গী এলাকায় ৪ ঘন্টাকাল বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ
২৭.২.৬৯	৬ জন বিরোধীয় নেতার বিবৃতিঃ সান্ধ্য আইন জারীর মাধ্যমে আন্দোলন নিঃস্তব্দ করা যাইবে না
২৮.২.৬৯	সান্ধ্য আইন বর্দ্ধিত
১.৩.৬৯	মনিসিংসহ চার জনের বিবৃতিঃ সংগ্রামী ঐক্য অটুট রাখার আহবান
"	"পঃ পাকিস্তানের কথাও আমিই বলিব"
"	এক ইউনিট বাতিলের দাবীতে সিন্ধুতে ৪ জনের আমরণ অনশন ধর্মঘট শুরু ন্যাপের কর্মীসভা অনুষ্ঠিত
২.৩.৬৯	ন্যাপের পথসভাঃ ৪ঠা মার্চের হরতালের প্রস্তুতি
"	অফিস-আদালতে বাংলা ভাষা চালু করার দাবী

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩.৬৯	১১ দফার সমর্থনে টঙ্গী শিল্প এলাকায় ছাত্র ও শ্রমিকদের সভা
"	দেশের স্বার্থেই আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার সিদ্ধান্ত করিয়াছি- আইয়ুব
"	লিয়াকতাবাদের সভায় ভূট্টোর ঘোষণাঃ প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ করিলে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিব
৪.৩.৬৯	হরতালের প্রতি শেখ মুজিবের পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন
"	চাঁদপুরে দুইজন মৌলিক গণতন্ত্রী হত্যার পরিণতিঃ ক্রুদ্ধ জনতার হাতে পুত্রসহ চেয়ারম্যান নিহত
"	আজ পল্টনে জনসভা
"	'ডাক' এর আহবানঃ শান্তি বজায় রাখুন
৫.৩.৬৯	শান্তিপূর্ণ হরতায় পালিত
"	জনকল্যাণের শাসন ব্যবস্থা কায়েম না হওয়া পর্যন্ত ১১ দফার আন্দোলন অব্যাহত থাকিবেঃ পল্টনের বিরাট জনসভায় ছাত্রনেতৃবৃন্দের ঘোষণা
"	গণ কমিটি গঠনের আহবান
"	বিক্ষুব্ধ জনতা কর্তৃক থানা আক্রমনঃ কনভেনশন লীগ অফিস ভস্মীভূতঃ বগুড়ায় সান্ধ্য আইন জারী। ইপিআর মোতায়েন
"	ভাওতাবাজদের প্রতি ছাত্রদের ৩-দফা সতর্কবাণী
"	পল্টনের জনসভার প্রস্তাবঃ এগার দফার ভিত্তিতে নয়া শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবী
"	১২ই মার্চের মধ্যে মোনায়েম খানের অপসারণ দাবী
৬.৩.৬৯	ফেডারেল রাজধানী পূর্ব পাকিস্তানে আনয়নের দাবী
"	মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ কর্মচারীদের চৌদ্দ দফা দাবী মানিয়া লইবার আহবান
"	আওয়ামী লীগ কর্তৃক পার্টি প্রধানের উপর সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পনঃ গোলটেবিলে শেখ মুজিব ৬ দফা, ১১ দফা ও জনসংখ্যাভিত্তিক দাবী-দাওয়া উত্থাপণ করিবেন
"	গুলিতে নিহত রিক্সাচালকদের জন্য ক্ষতিপূরণ
"	সাঃ জহুরুল হকের হত্যা সম্পর্কে ৬ জন আইনজীবীর বিবৃতি
"	সম্মিলিত বিরোধী দলীয় সদস্যদের ৩রা মে'র মধ্যে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত
"	শ্রমিক ধর্মঘটের ফলে করাচী বন্দরে অচলাবস্থা
"	ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ইন্টার্নি ডাক্তারদের অনিদির্ষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু
৭.৩.৬৯	১৩ই মার্চ হইতে ছাত্রদের প্রদেশ সফর শুরুঃ দুস্কৃতিকারীদের সমাজবিরোধী কার্য্যকলাপ ও অরাজকতা সৃষ্টির অপচেষ্টার বিরুদ্ধে ছাত্র নেতৃবৃন্দের কঠোর হুশিয়ারী
"	ডাক কর্মচারী ধর্মঘটে লাহোরে জি,পি,ও অচল
"	ডাক্তারদের ধর্মঘট অব্যাহত
"	শেখ মুজিব কর্তৃক দ্বিতীয় বেতন বোর্ড স্থাপনের দাবী
"	ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে মুজিব বলেনঃ গোল টেবিল বৈঠকে যে কোন বিষয় উথাপণ করিতে পারি
"	পিডিএম পন্থী আওয়ামী লীগ ও জামাতে এছলাম কর্তৃক জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব দাবী
৮.৩.৬৯	অর্থনৈতিক দিক দিয়া পূর্ব পাকিস্তানকে দেউলিয়া করার হীন কারসাজিঃ প্রদেশের ন্যাশনাল ব্যাংকের শাখাসমূহে জমাকৃত অর্থের শতকরা ৯০ ভাগ পঃ পাকিস্তানের শিল্পপতিদের স্বার্থে ব্যয় করা হইতেছে
"	পিন্ডিতে স্কুল ছাত্রদের বিক্ষোভ
"	প্রধান তিনটি দাবী না মানিলে ইন্টার্নী ডাক্তারদের ধর্মঘট অব্যাহত থাকিবে
৯.৩.৬৯	প্রাদেশিক শিক্ষক সমিতির চরম পত্র
৯.৩.৬৯	চেয়ারম্যানের গুলীতে ২ জন ছাত্র নিহত
"	পিন্ডিতে ২৫টি শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে ধর্মঘট পালন
"	গোল টেবিল বৈঠকের ভুমিকা প্রসঙ্গে ভাসানীঃ কায়েমী স্বার্থের গোপন আঁতাত ও ষড়যন্ত্রের সুযোগ দিয়াছে
"	পাকিস্তানের শিল্প বণিক সমিতির আঞ্চলিক কমিটির সভাঃ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দের দাবী
১০.৩.৬৯	সংবাদপত্রে প্রেস কর্মচারীদের ওয়েজ বোর্ড দাবী
"	সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ নের্তৃবর্গ কর্তৃক বাঙ্গালী ও উর্দু ভাষীদের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টির বিরুদ্ধে হুশিয়ারী
"	চাকলালা বিমান বন্দরে জামাতে এছলামীর সহিত ভাসানীপন্থীদের সংঘর্ষ
"	পাঁচটি বাণিজ্যিক ব্যাংকে পূর্ব পাকিস্তানে জমাকৃত অর্থ হইতে পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পপতিদের স্বার্থে বছরে ১২০ কোটি টাকা ঋণ ও অগ্রিম দেওয়া হইতেছে
"	ফরিদ আহমদ কনভেনশন লীগের অর্থে লাহোর সফর করেন
"	লাহোরে মওলানা ভাসানীঃ প্রয়োজন হইলে গৃহযুদ্ধের জন্যও প্রস্তুত রহিয়াছি
১১.৩.৬৯	শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদের সভায় সম্প্রতি গণআন্দোলনে হতাহতদের ক্ষতিপুরণ দাবী
"	ছাত্র নেতৃবৃন্দের যুক্ত বিবৃতিঃ ১১ দফার সংগ্রাম অব্যাহত রাখার সংকল্প পুনরুল্লেখ
"	জনগণতন্ত্র কায়েমের জন্য ভাসানীপন্থী ন্যাপ ও পিপলস পার্টির মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর
"	গোলটেবিলঃ দেশের বর্তমান রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের উপায় এখনও মিলে নাই-
"	ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী সভায় ঃ ত্যাগ ও তিতিক্ষার বিনিময়ে ১১ দফার সংগ্রাম অব্যাহত
"	দাবী পুরণ না হইলে ১৭ই মার্চ হইতে সমাজ কল্যাণ কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদের ধর্মঘট শুরু
১২.৩.৬৯	আজ প্রদেশব্যাপী ডাক্তারদের প্রতীক ধর্মঘট

Dhaka University Institutional Repository

"	দশজন ছাত্রনেতার বিবৃতিঃ ১১ দফার ভিত্তিতে ছাত্র-জনতার সংগ্রামী ঐক্য গড়ার আহবান
"	আজ বায়তুল মোকাররমে গণজমায়েত
"	হলিয়,া রাজনৈতিক মামলা ও গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত
"	এছলামী শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের দাবীতে ঢাকায় বিরাট বিক্ষোভ মিছিল
"	'রাজনৈতিক ভারসাম্য'তা, অত্যাবশ্যকীয়- ভুট্টোঃ গোলটেবিল বৈঠকে গ্রহীত ফর্মুলা শর্ত্তাধীনে সমর্থন করিবেন
"	আমি জনগণের কন্ঠস্বর
১৩.৩.৬৯	ছাত্র সংগ্রাম কমিটি কর্ত্তৃক অবিলম্বে গবর্ণর মোনায়েম খানের অপসারণ দাবী
"	বিমান বন্দরে ছাত্র নেতা তারিক আলীর মন্তব্যঃ দেশের মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান প্রয়োজন
"	ছাত্র-গণজমায়েতে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দের ঘোষণাঃ রাজনীতির সহিত 'ধর্মকে' জড়াইয়া দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতে দেওয়া হইবে না
"	১০ জন ছাত্র নেতার বিবৃতিঃ জগন্নাথ কলেজকে পুর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনার দাবী
"	টঙ্গীতে শ্রমিকদের ঘেরাও অভিযান
১৪.৩.৬৯	ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আট দফা দাবীর ভিত্তিতে নার্সদের ৪ ঘন্টা ধর্মঘট পালন
"	মানিকগঞ্জে ও অন্যান্য স্থানে পয়তাল্লিশ জন সমাজ-বিরোধী ব্যক্তিকে হত্যা
"	সংবাদপত্র প্রেস কর্মচারীঃ সাংবাদিক ওয়েজ বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত করার দাবী
"	পার্লামেন্টারী সরকার ও প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার সম্পর্কে মতৈক্য গোলঃ টেবিলে ডাকের দুই দফা প্রস্তাব গৃহীত-
"	স্বায়ত্তশাসন ও এক ইউনিট প্রশ্নে সমর্থন না করায় শেখ মুজিব কর্ত্তৃক 'ডাক' পরিত্যাগ
১৫.৩.৬৯	প্রদেশের ৪টি জেলায় ৯১ জন দুষ্কৃতিকারী নিহত
"	পিন্ডিতে শেখ মুজিব বলেন- প্রেসিডেন্টের নিকট শীঘ্রই শাসনতন্ত্রের কতিপয় সমাধান পেশ করিব
"	গোলটেবিল বৈঠকে জনদাবী উপেক্ষার প্রতিবাদে ১৭ই মার্চ প্রদেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট পালনের আহবান
"	বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মঘটী শিক্ষকদের সভা
"	ঢাকা ক্লাব কর্মচারীদের পাঁচ দফা দাবী
"	বিশ্ববিদ্যালয়েল ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ১০ দফা দাবী
"	গোলটেবিলে পূর্ব পাকিস্তানকে অবহেলার প্রতিবাদে রাজশাহীতে বিরাট ছাত্রসভা ও মিছিল
"	ন্যাপনেতা মোজাফফর আহম্মদ কর্ত্তৃক সংগ্রাম অব্যাহত রাখার আহবান
"	এবার বিমান ঘেরাও
১৭.৩.৬৯	মওলানা ভাসানীর জীবন নাশের প্রচেষ্টার প্রতিবাদে আজ হরতাল
"	করাচীতে মওলানা ভাসানীর বিপুল সম্বর্দ্ধনাঃ এছলামী সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে বলিয়া ঘোষণা
"	শেখ মুজিবসহ বিভিন্ন দলীয় নেতা কর্ত্তৃক মওলানা ভাসানীর উপর ঘৃণ্য হামলার নিন্দা
"	মওলানা ভাসানী কর্ত্তৃক অন্তবর্ত্তীকালীন সরকার গঠনের আহবান
"	ন্যাপ নেতৃবৃন্দ কর্ত্তৃক মওলানা ভাসানীর জীবন নাশের চেষ্টার তীব্র নিন্দা
১৮.৩.৬৯	পুলিশ-জনতার সংঘর্ষে ৭ ব্যক্তি হতাহত
"	জনদাবী না মানিলে নির্ব্বাচন করিতে দিব না-ভাসানী
"	করাচীতে মওলানা ভাসানী বলেনঃ দুই মাসের মধ্যে শ্রমিকদের দাবী পুরণ না হইলে কলকারখানা দখল করা হইবে
"	বিভিন্ন দাবীর ভিত্তিতে কৃষি-ছাত্রদের অবস্থান ধর্মঘট
"	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ ধর্মঘট পালিতঃ ছাত্র সভায় ১১ দফার সংগ্রাম অব্যাহত রাখার সংকল্প
১৯.৩.৬৯	সংঘর্ষের ফলে ১ জন নিহত ও ২ শত লোক আহতঃ ১ হাজার গৃহহীনঃ ট্রেনের উপর হামলাঃ ইপিআর তলবঃ পার্শ্বতীপুরে সান্ধ্য আই জারী
১৯.৩.৬৯	সেক্রেটারীয়েটসহ বহু প্রতিষ্ঠান ঘেরাওঃ অবরুদ্ধ নগরী
"	১২ দফা দাবী আদায়ের জন্য শিল্প কর্মচারীদের বিক্ষোভ মিছিল
২০.৩.৬৯	শান্তিকামী মানুষ রুখিয়া দাঁড়াওঃ ছাত্র নেতাদের আহবান
"	শেখ মুজিবের পুরাতন ঢাকা পরিদর্শনঃ সমাজ বিরোধী কার্য্যের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার আহবান
"	জোহা হত্যার বিচারের দাবীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের ধর্মঘট অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত
২১.৩.৬৯	টঙ্গীতে শ্রমিক সভার প্রস্তাবঃ ঘেরাও কালে স্বীকৃত দাবী-দাওয়া অবশ্যই পুরণ করিতে হইবে
"	৫০ জন শ্রমিক বহিষ্কৃত
২২.৩.৬৯	সাংবাদিক বেতন বোর্ডের অন্তর্ভুক্তির দাবীতে ২৫শে মার্চ সংবাদপত্র প্রেস কর্মচারীদের ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত।
"	১৫ দফা দাবী -দাওয়ার ভিত্তিতে আজ ৪০ হাজার লক্ষ শ্রমিকের ধর্মঘট শুরু
"	ষ্টেট ব্যাংক ঘেরাও ।
"	রিক্সাচালকদের আকস্মিক ধর্মঘট।
২৩.৩.৬৯	১২ দফা দাবীর ভিত্তিতে অটোরিক্সা চালকদের ধর্মঘট পালন।
"	ডঃ জোহার হত্যার বিচারের দাবীতে মঙ্গলবারে ঢাকা ভার্সিটি ও প্রকৌশল ভার্সিটি শিক্ষকদের যৌথ মিছিল।
"	আজিমপুরে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাঃ দাবী আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত রাখার সংকল্প।
২৫.৩.৬৯	ওয়েজ বোর্ডে অন্তর্ভুক্তির দাবীতে আগামীকল্য সংবাদপত্র প্রেস শ্রমিকদের প্রতীক ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত।
"	সিঙ্গাইর থানায় পুলিশের গুলীতে ১ ব্যক্তি নিহত ও ১ জন আহত।

Dhaka University Institutional Repository

" গোলটেবিলে শেখ মুজিবের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ কর্তৃক ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র সংশোধনী বিলের খসড়া প্রণয়ন।

২৬.৩.৬৯ সারা দেশে সামরিক আইন জারী।

" পূর্ব পাক কলেজ–শিক্ষক সমিতি কর্তৃক অনির্দিষ্টকালের জন্য জগন্নাথ কলেজ বন্ধ রাখায় উদ্বেগ প্রকাশ

২৭.৩.৬৯ আজ প্রদেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট।

Dhaka University Institutional Repository

সংযোজনী-২
সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের নাম পরিচয়

১. অচিন্ত সেন, সিলেট
এক নম্বর সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি,ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)।

২. অশীন চন্দ্র সাহা, রাজশাহী
সহ-সম্পাদক, নওগা মহকুমা কমিটি, আওয়ামী লীগ।

৩. আইয়ুব আলী মিয়া, কুমিল্লা, সহ-সভাপতি, জিনাত টেক্সটাইল মিলস্,শ্রমিক ইউনিয়ন, আওয়ামী লীগ সমর্থক, শ্রমিক ফেডারেশন।

৪. আখতারুজ্জামান মন্ডল, রংপুর
সভাপতি, কুড়িগ্রাম মহকুমা, ছাত্রলীগ।

৫. আজিুল হক, শ্রমিক, আদমজী
সহ-সভাপতি, আদমজী শাখা, আওয়ামী লীগ সমর্থক

৬. আতাহারুল ইসলাম, ময়মনসিংহ,
সক্রিয় কর্মী, ছাত্রলীগ।

৭. আনছার উল ছানু, রংপুর, সাধারণ সম্পাদক, নীলফামারী কলেজ, ছাত্র সংসদ, সাধারণ সম্পাদক, নীলফামারী মহকুমা কমিটি, ছাত্রলীগ।

৮. আনিছুর রহমান, নোয়াখালী
যুগ্ম সম্পাদক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা,ছাত্রলীগ।

৯. আনোয়ার হোসেন, কুমিল্লা,
সদস্য, কোহিনুর ক্যামিক্যাল কোঃ ঢাকা শাখা, আওয়ামী লীগ সমর্তক শ্রমিক সংগঠন

১০. আফজল হোসেন, ঢাকা, যুগ্ম-সম্পদক,
মানিকগঞ্জ মহকুমা কমিটি ন্যাপ (ভাসানী)।

১১. আবু তাহের, কুমিল্লা
সভাপতি, মেঘনা টেক্সটাইল মিলস্ শ্রমিক ইউনিয়ন, ন্যাপ (ভাসানী) সমর্থক।

১২. আবুল আহসান চৌধুরী, কুষ্টিয়া,
নাট্য ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক
কুষ্টিয়া সরকারী কলেজ ছাত্র সংসদ, ছাত্রলীগ।

১৩. আবুল হোসেন, শ্রমিক, আদমজী,
সদস্য, ন্যাপ (ভাসানী)।

১৪. আব্দুর রউফ, কুমিল্লা
ভিপি, চাটখিল কলেজ ছাত্র সংসদ,
সহ-সভাপতি, জেলা শাখা, নোয়াখালী, ছাত্রলীগ।

১৫. আব্দুর রাজ্জাক, রাজশাহী,
সাধারণ সম্পাদক, রাজশাহী কমিটি,
ন্যাপ (মোজ্জাফফর)।

১৬. আব্দুর রাজ্জাক সিকদার, ছাত্র, উচ্চ মাধ্যমিক স্তর,
যুগ্ম সম্পাদক, ঢাকা শহর কমিটি, ছাত্রলীগ

১৭. ডঃ আব্দুল ওয়াজেদ চৌধুরী, আইন ব্যবসা
সভাপতি, আইনজীবী সমিতি, ফরিদপুর,
সদস্য, আওয়ামী লীগ।

১৮. আব্দুল খালেক, পাবনা,
সমর্থক, আওয়ামী লীগ।

১৯. আব্দুল জলিল, শ্রমিক আদমজী, প্রচার সম্পাদক,
লৌহজং থানা কমিটি,আওয়ামী লীগ, ঢাকা।

২০. আব্দুল জলিল, ফরিদপুর,
সাংগঠনিক সম্পাদক, পাকিস্তান এন্টার প্রাইজ শ্রমিক ইউনিয়ন, ঢাকা, আওয়ামী লীগ সমর্থক শ্রমিক সংগঠন।

২১. আব্দুল মতিন, কুমিল্লা, সাধারণ সম্পাদক,
আশরাফ টেক্সটাইল লিঃ, শ্রমিক ইউনিয়ন,
ন্যাপ (ভাসানী)

২২. আব্দুল মতিন, কুমিল্লা, সহ-সম্পাদক,
ঢাকা ওয়াসা শাখা, আওয়ামী লীগ সমর্থক শ্রমিক সংগঠন, শ্রমিক লীগ, ঢাকা।

২৩. আব্দুল মতিন, নোয়াখালী,
সভাপতি, কোহিনুর টোবাকো, কোঃ

২৪. আব্দুল মতিন, নোয়াখালী,
সহ-সাধারণ সম্পাদক, অলিম্পিয়া টেক্সটাইল মিলস, শ্রমিক ইউনিয়ন, ন্যাপ (ভাসানী), সমর্থন ফেডারেশন।

২৫. আব্দুল মতিন, পাবনা,
যুগ্ম- সাধারণ সম্পাদক, ন্যাপ (ভাসানী)
সমর্থক কৃষক সংগঠন, কেন্দ্রীয় কমিটি।

২৬. আব্দুল মান্নান, ঢাকা,
সভাপতি, মনু টেক্সটাইল মিলস, শ্রমিক ইউনিয়ন, ন্যাপ (ভাসানী), সমর্থক শ্রকিম ফেডারেশন।

২৭. আব্দুল মান্নান, ফেনী,
সদস্য, আওয়ামী লীগ।

২৮. আব্দুল মালেক, বরিশাল,
সাংগঠনিক সম্পাদক, পাকিস্তান এন্টার প্রাইজ
শ্রমিক ইউনিয়ন ঢাক, আওয়ামী লীগ সদস্য।

২৯. আব্দুল মালেক, নোয়াখালী,
ট্রেড ইউনিয়ন এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি,
তেজগাও অঞ্চল শাখা,সমর্থক, আওয়ামী লীগ

৩০. আব্দুল মালেক চৌধুরী, রাজশাহী,কোষাধ্যক্ষ,
জেলা কমিটি, রাজশাহী, ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)।

Dhaka University Institutional Repository

৩১. আব্দুল হাই, শিক্ষকতা, এম,এম, মাদ্রাসা
কোন দলের সদস্য নন, ইসলামিক রাষ্ট্র
ব্যবস্থার অনুসারী, ব্যক্তিগত অবস্থান থেকে
গণঅভ্যুত্থানে খুব জোরালো ভূমিকা পালনকারী।

৩২. আব্দুল হান্নান, কুষ্টিয়া,
থানা স্তরের নেতা, ছাত্রলীগ।

৩৩. আব্দুল হামিদ জমাদার, ছাত্র, উচ্চ মাধ্যমিক স্তর,
সদস্য, ছাত্রলীগ, কুমিল্লা।

৩৪. মোঃ আব্দুল্লাহ, ব্যবসা, কোন দলের সমর্থক নয়।
আন্দোলনের সক্রিয় কমী।

৩৫. আব্দুল সামাদ রাজশাহী,
সহ-সভাপতি, রাজশাহী সরকারী কলেজ
ছাত্র সংসদ, ছাত্রলীগ।

৩৬. আব্দুল সোবহান, ঢাকা,
সদস্য, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় দপ্তর কমিটি।

৩৭. আব্দুস সোবহান, শ্রমিক, আদমজী,
সাধারণ সদস্য, আওয়ামী লীগ।

৩৮. আমির হোসেন মালিতা,
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক, জেলা কমিটি,
যশোর, আওয়ামী লীগ।

৩৯. আরশাদ আলী, যশোর
সহ-সাধারণ সম্পাদক, বি.এল. কলেজ
ছাত্র সংসদ, খুলনা, ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)।

৪০. আলতাফ উদ্দীন ভূঁইয়া, ঢাকা,
এম.পি.এ. পূর্ব পাকিস্তান, সভাপতি,
থানা কমিটি, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।
আওয়ামী লীগ ।

৪১. আলাউদ্দীন আহমদ, যশোর
সহ-সভাপতি, জেলা কমিটি, যশোর,
সাধারণ সম্পাদক, মহকুমা কমিটি, ঝিনাইদহ,
ন্যাপ (ভাসানী) সমর্থক কৃষক সংগঠন।

৪২. আলী আকবর, নোয়াখালী
দপ্তর সম্পাদক, মনু টেক্সটাইল লিঃ, শ্রমিক ইউনিয়ন,
ন্যাপ (ভাসানী) সমর্থক।

৪৩. আলী আজম, নোয়াখালী,
প্রচার সম্পাদক, তেজগাঁও এলাকা কমিটি, ঢাকা,
আওয়ামী লীগ সমর্থক শ্রমিক সংগঠন।

৪৪. আলেয়া শরীফ, রাজশাহী,সাধারণ সম্পাদিকা,
রাজশাহী জেলা কমিটি,ছাত্রলীগ, মহিলা সম্পাদক,
রাজশাহী কলেজ, ছাত্র সংসদ।

৪৫. আশরাফ উদ্দিন আহমেদ, ময়মনসিংহ,
সহ-সম্পাদক, কিশোরগঞ্জ কলেজ
ছাত্র সংসদ, ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)।

৪৬. আহদেম কামাল, ফরিদপুর
সক্রিয় কর্মী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)।

৪৭. আহসান উল্লাহ, কুষ্টিয়া,
সহ-সভাপতি, জেলা কমিটি, কুষ্টিয়া,আওয়ামী লীগ।

৪৮. ইনায়েত পীর খান, বরিশাল,
সভাপতি, কেন্দ্রীয় কমিটি,
সংযুক্ত শ্রমিক ফেডারেশন পূর্ব পাকিস্তান,
(নির্মল সেন নেতৃত্বাধীন একটি রাজনৈতিক ধারা)।

৪৯. উজির আলী সরদারঃ শ্রমিক
ন্যাপ ভাসানী পন্থী শ্রমিক সংগঠনের ব্যাসিক
ইউনিয়ন সদস্য, আদমজী, ঢাকা।

৫০. এ.এফ.এস, ইমামউদ্দিন, ছাত্র,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নির্মল সেনের অনুসারী সংগঠনের
সক্রিয় সদস্য।

৫১. এ.কে.এম.ডি. মাহাবুবুল আলম, কর্মচারী
নির্বাচিত সহ-সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান
শিপিং কর্পোরেশন কর্মচারী ইউনিয়ন,
ন্যাপ (ভাসানী) সদস্য।

৫২. এ.কে.এম. শফিউল আলম, ঢাকা,
ইপিআইপিসি কর্মচারী ইউনিয়নের সাংস্কৃতিক
সম্পাদক, সাধারণ সম্পাদক-টিএন্ডটি কলেজ ছাত্র
সংসদ, ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ।

৫৩. এ.কে.এম. সিরাজুল হক, নোয়াখালী,
সভাপতি, জগন্নাথ কলেজ শাখা, ছাত্রলীগ।

৫৪. এ.জেড.কে. (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক), কুমিল্লা,
সমর্থক, আওয়ামী লীগ।

৫৫. এনামুল হক, রাজশাহী, ক্রীড়া সম্পাদক,
রাজশাহী কলেজ ছাত্র সংসদ,ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)।

৫৬. এম. আব্দুল গফুর, বরিশাল,
সভাপতি, বরিশাল জেলা কমিটি, ন্যাপ (ভাসানী)।

৫৭. এম.এ. মান্নান, কুমিল্লা
সদস্য, ছাত্র সংসদ, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা,
দপ্তর সম্পাদক, কলেজ শাখা, ছাত্রলীগ।

৫৮. এম.এ.মান্নান, নোয়াখালী
সাধারণ সম্পাদক, নিশাত জুট মিলস শ্রমিক
ইউনিয়ন, সহ-সভাপতি, কেন্দ্রীয় কমিটি,
আওয়ামী লীগ সমর্থক শ্রমিক ফেডারেশন।

৫৯. এম.এ. রাজ্জাক, কুষ্টিয়া,সাধারণ সম্পাদক,
জেলা কমিটি, কুষ্টিয়া, ছাত্রলীগ, কুষ্টিয়া সরকারী
কলেজ, ছাত্র সংসদের ক্রীড়া সম্পাদক।

৬০. ওমর হায়দার চৌধুরী, চট্টগ্রাম,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র ছাত্র,
সাধারণ সদস্য, ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)।

Dhaka University Institutional Repository

৬১. ওসমান হায়দার চৌধুরী
সম্মান শ্রেণীর ছাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
সভাপতি জিন্না হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা,
বাংলাদেশ ছাত্রলীগ।

৬২. (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক), ঝিনাইদহ,
প্রচার সম্পাদক, ঝিনাইদহ মহকুমা কমিটি,
আওয়ামী লীগ।

৬৩. ক.খ. জোয়ার্দার, ঝিনাইদহ
সভাপতি, তেজগাঁও শাখা, ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)।

৬৪. কবির আহমেদ, নোয়াখালী,
প্রচার সম্পাদক, কোহিনুর ক্যামিক্যাল কোঃ শাখা,
আওয়ামী লীগ সমর্থক শ্রমিক সংগঠন।

৬৫. কসিম উদ্দিন, ঢাকা
সংগঠক, ন্যাপ (ভাসানী) সমর্থক, শ্রমিক ফেডারেশন।

৬৬. কাজী মহম্মদ আলী, শ্রমিক,
আদমজী, সদস্য, আওয়ামী লীগ।

৬৭. কামরুল আহসান চৌধুরী, চট্টগ্রাম,
সাধারণ সম্পাদক, ইকবাল হল শাখা,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)।

৬৮. কৃষ্ণা রহমান, ছাত্রী, দশম শ্রেণী
সাধারণ সম্পাদিকা, জেলা কমিটি,
খুলনা, ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)।

৬৯. খান আলতাফ হোসেন ভুলু, বরিশাল,
সহ-সভাপতি, ব্রজমোহন কলেজ ছাত্র সংসদ,
বরিশাল, সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি, ছাত্রলীগ।

৭০. খোন্দকার রশিদুজ্জামান (দুদু), কুষ্টিয়া,
সহ-সভাপতি (ভিপি), কুষ্টিয়া সরকারী কলেজ
ছাত্র সংসদ, ছাত্রলীগ।

৭১. গ. (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক), কুমিল্লা,
আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী, কিন্তু কোন দলের সদস্য
নন বা সমর্থক ও নন। তবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের
শিক্ষক সমাজের পক্ষে প্রতিনিধিত্বশীল।

৭২. জয়নাল আবেদীন, ঢাকা,
যুগ্ম সম্পাদক, কোহিনূর ক্যামিক্যাল কোঃ
শ্রমিক ইউনিয়ন, ন্যাপ (মোজাফফর),
সমর্থক শ্রমিক সংগঠন।

৭৩. জয়নাল আবেদীন, ঢাকা,
কার্যকরী কমিটির সদস্য, ঢাকা জেলা কমিটি,
আওয়ামী লীগ সমর্থক শ্রমিক সংগঠন।

৭৪. জাফর উল্লাহ খান চৌধুরী, কুষ্টিয়া
সক্রিয় কর্মী, ন্যাপ (ভাসানী)।

৭৫. জালাল উদ্দিন, ঢাকা
সাধারণ সম্পাদক, মেঘনা টেক্সটাইল মিলস্
শ্রমিক ইউনিয়ন, ন্যাপ (ভাসানী) সমর্থক।

৭৬. জাহাঙ্গীর আলম, ঢাকা, সাধারণ সম্পাদক,
ইউনিয়ন কমিটি, যুগ্ম সম্পাদক, থানা কমিটি,
লৌহজং, ঢাকা, আওয়ামী লীগ।

৭৭. টিপু বিশ্বাস, পাবনা, সাধারণ সম্পাদক, পাবনা
এডোয়ার্ড কলেজ, ছাত্র সংসদ, সহ-সভাপতি,
কেন্দ্রীয় কমিটি, ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)।

৭৮. তোবারক হোসেন, ঢাকা, সহ-সভাপতি,
জেলা কমিটি, সিলেট, ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)।

৭৯. দাউদ আলী সরদার, রাজশাহী,
সমর্থক, মুসলিম লীগ,
গণআন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী।

৮০. দীপা দত্ত, টিটাগাং
যুগ্ম সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি, ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)।

৮১. দুদু মিয়া, ঢাকা,
সদস্য তেজগাঁও অঞ্চল কমিটি,
আওয়ামী লীগ সমর্থক শ্রমিক সংগঠন,
যুগ সম্পাদক, নাবিস্কো শ্রমিক ইউনিয়ন।

৮২. নাসিম আনজুম, রাজশাহী, সাধারণ সম্পাদক,
রাজশাহী জেলা কমিটি, ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)।

৮৩. নাসির উদ্দিন, পাবনা,
সাংস্কৃতিক সম্পাদক সিরাজগঞ্জ কলেজ
ছাত্র সংসদ, ছাত্রলীগ।

৮৪. নূরুজ্জামান, নোয়াখালী,
যুগ্ম সম্পাদক, পাকিস্তান সাইকেল শ্রমিক
ইউনিয়ন, ঢাকা। আওয়ামী লীগ সমর্থক শ্রমিক
সংগঠনের তেজগাঁও এলাকা কমিটির, যুগ্ম সম্পাদক।

৮৫. নূরুর রহমান, কুমিল্লা, যুগ্ম সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি,
উত্তর ন্যাপের ঐক্যবদ্ধ কৃষক সংগঠন।
ন্যাপ (মোজাফফর) সমর্থক।

৮৬. নূরুল ইসলাম, কুমিল্লা, সাংগঠনিক সম্পাদক,
তেজগাঁও শাখা, ন্যাপ (ভাসানী) সমর্থক, শ্রমিকসংগঠন,
সদস্য, নাবিস্কো শ্রমিক ইউনিয়ন, ঢাকা।

৮৭. নূরুল ইসলাম, কুমিল্লা, সাংগঠনিক সম্পাদক,
মনু টেক্সটাইল মিলস্, শাখা কমিটি,
ন্যাপ (ভাসানী) সমর্থক শ্রমিক ফেডারেশন।

৮৮. নূরুল ইসলাম, ঢাকা, সভাপতি,
পাকিস্তান এন্টারপ্রাইজ শ্রমিক
সভাপতি, পাকিস্তান এন্টারপ্রাইজ শাখা,
আওয়ামী লীগ সমর্থক শ্রমিক সংগঠন।

৮৯. নূরুল হাসান, রাজনীতি,
সহ-সভাপতি ও কার্যকরি সভাপতি,
কেন্দ্রীয় কমিটি, ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন),
১১ দফা প্রনয়ণের সময় অন্যতম সাক্ষরদাতা।

৯০. প্রদ্যুৎ রায়, সিলেট, সহ-সভাপতি, মহকুমা কমিটি,
সুনামগঞ্জ ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)।

Dhaka University Institutional Repository

৯১. প্রফুল্ল দত্ত সরকার, রাজশাহী
সমর্থক, ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)।

৯২. প্রশান্ত সাহা, রাজশাহী, সহ-সভাপতি,
জেলা কমিটি, ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)।

৯৩. ফজলুর রহমান, শ্রমিক, আদমজী, কোষাধ্যক্ষ,
আদমজী শাখা, ন্যাপ (মোজাফ্ফর),
সমর্থক শ্রমিক সংগঠন।

৯৪. ফরহাদ আলী মিঞা, রাজশাহী, প্রচার সম্পাদক,
রাজশাহী জেলা শাখা, সাধারণ সম্পাদক,
রাজশাহী সরকারী কলেজ শাখা,
ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)।

৯৫. ফরিদা আকতার জাহান, ঢাকা,
সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি, ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)।

৯৬. বি.এ. রশিদ, ছাত্র, সদস্য, ছাত্র ইউনিয়ন
(মতিয়া), ঢাকা।

৯৭. বিমল বিশ্বাস, যশোর
সহ-সভাপতি, নড়াইল কলেজ ছাত্র সংসদ,
সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি, ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)।

৯৮. বেলায়েত হোসেন, ছাত্র,
সভাপতি, চট্টগ্রাম কলেজ শাখা,
ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)।

৯৯. মনসুর রহমান, কুষ্টিয়া,
সদস্য, জেলা কমিটি, কুষ্টিয়া, ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)।

১০০. মনিরুজ্জামান, ছাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
যুগ্ম সম্পাদক, ঢাকা শহর কমিটি, প্রচার
সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি, ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)।

১০১. মনিরুল হক, কুমিল্লা, সহ-সম্পাদক, ছাত্র সংসদ,
চাঁদপুর কলেজ, ছাত্রলীগ সদস্য।

১০২. মফিজুল ইসলাম, কুমিল্লা, সদস্য,
এলাকা কমিটি, তেজগাঁও,
আওয়ামী লীগ সমর্থক শ্রমিক সংগঠন।

১০৩. মহম্মদ আলী, কুমিল্লা,
সদস্য, কোহিনূর ক্যামিক্যাল কোঃ, ঢাকা শাখা,
আওয়ামী লীগের সমর্থক শ্রমিক সংগঠন।

১০৪. মহম্মদ রাশেদ, নোয়াখালী,
সাধারণ সম্পাদক, অলিম্পিয়া টেক্সটাইল মিলস্
শ্রমিক ইউনিয়ন, ন্যাপ (ভাসানী) সমর্থক,
শ্রমিক সংগঠন।

১০৫. মহম্মদ হোসেন, নোয়াখালী, সহ-সভাপতি,
টঙ্গী আঞ্চলিক কমিটি,
ন্যাপ (ভাসানী) সমর্থক শ্রমিক ফেডারেশন।

১০৬. মহিবউল্লাহ, নোয়াখালী, সাংগঠনিক সম্পাদক,
ওয়াপদা ওয়ার্কার্স ফেডারেশন, কেন্দ্রীয় কমিটি,
ন্যাপ (মোজাফফর), ঢাকা।

১০৭. মহিবউল্লাহ, নোয়াখালী, সাধারণ সম্পাদক,
মৃন্নু টেক্সটাইল মিলস্, শ্রমিক ইউনিয়ন,
ন্যাপ (ভাসানী) সমর্থক, শ্রমিক ফেডারেশন।

১০৮. মাহতাব উদ্দিন, রাজশাহী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক,
জেলা কমিটি, রাজশাহী, ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)।

১০৯. মারু মন্ডল, কুষ্টিয়া,
সক্রিয় সমর্থক ন্যাপ (ভাসানী)।

১১০. মানিক মিয়া, বরিশাল, যুগ্ম সম্পাদক,
মেঘনা টেক্সটাইল মিলস্
শ্রমিক ইউনিয়ন, টঙ্গী, ন্যাপ (ভাসানী) সমর্থক।

১১১. মাহমুদুর রহমান, ঢাকা, সহ-সম্পাদক,
জগন্নাথ কলেজ শাখা, ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)।

১১২. মামুদুল আলম, চট্টগ্রাম,
সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদের পাঠাগার
সম্পাদক এবং সাংস্কৃতিক সম্পাদক, হল শাখা,
ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)।

১১৩. মুহম্মদ এহিয়া, রাজশাহী,
সমর্থক, ন্যাপ (মোজাফফর)।

১১৪. মুস্তাফিজুর রহমান, রাজশাহী,
সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি, ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)।

১১৫. মোঃ ইব্রাহিম, কুমিল্লা, সদস্য, জেলা কমিটি, কুমিল্লা,
ন্যাপ (ভাসানী), সমর্থক কৃষক সংগঠনঃ
সহ-সাধারণ সম্পাদক, আঞ্চলিক কমিটি, টঙ্গী,
ন্যাপ (ভাসানী) সমর্থক শ্রমিক সংগঠন।

১১৬. মোঃ ইব্রাহিম, ঢাকা,
কর্মী, আওয়ামী লীগ।

১১৭. মোঃ মফিজুল ইসলাম, বরিশাল, সাধারণ সম্পাদক,
জিন্নাহ কলেজ, ছাত্র সংসদ, ঢাকা, ছাত্র লীগ।

১১৮. মোখলেসুর রহমান, শ্রমিক আন্দোলন ও রাজনীতি
নির্মল সেন-এর অনুসারী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার
অন্যতম নেতা।

১১৯. মোমেন চৌধুরী, ছাত্র, উচ্চ মাধ্যমিক স্তর,
সাংগঠনিক সম্পাদক, দৌলতপুর কলেজ শাখা
খুলনা, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ।

১২০. মোবারক হোসেন, কুমিল্লা, কোষাধ্যক্ষ,
মেঘনা টেক্সটাইল মিলস্, শ্রমিক ইউনিয়ন, টঙ্গী
ন্যাপ (ভাসানী) সমর্থক।

১২১. মোয়াজ্জেম হোসেন, রাজশাহী
সক্রিয় কর্মী, ন্যাপ (ভাসানী)।

১২২. মোসাররফ হোসেন, যশোর, কোষাধ্যক্ষ,
কায়দে আজম কলেজ কমিটি, ঢাকা, ছাত্র লীগ।

১২৩. মোহাম্মাদ মঞ্জুরুল ইমাম, খুলনা, প্রচার সম্পাদক,
খুলনা শহর শাখা, আওয়ামী লীগ।

Dhaka University Institutional Repository

১২৪. মোহাম্মদ ইমদাদুল হক, যশোর,
সাংগঠনিক সম্পাদক,
জেলা কমিটি, যশোর, দপ্তর সম্পাদক, এস.এম.হল,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)।

১২৫. মোহাম্মদ মোস্তফা, কুমিল্লা, সাধারণ সম্পাদক,
চৌমুহনী কলেজ, ছাত্র সংসদ, ছাত্রলীগ।

১২৬. মোস্তাফিজুর রহমান, কুমিল্লা, সাধারণ সম্পাদক,
ঢাকা ওয়াসা কর্মচারী,ইউনিয়ন,
আওয়ামী লীগ সমর্থক।

১২৭. রওশন আলী, যশোর, সভাপতি, জেলা কমিটি,
যশোর, আওয়ামী লীগ।

১২৮. রঞ্জিত কুমার দত্ত, ফরিদপুর, সাধারণ সম্পাদক,
জেলা কমিটি, খুলনা, ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)।

১২৯. রংগলাল সেন, সিলেট, শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ
সক্রিয় কর্মী, কমিউনিষ্ট পার্টি (মনিসিং)।

১৩০. রমিজ উদ্দিন খান, সরকারী কর্মচারী,
আওয়ামী লীগের জোর সমর্থক, ঢাকা।

১৩১. রুহুল আমিন, ময়মনসিংহ
সাধারণ সদস্য, ছাত্রলীগ।

১৩২. রুহুল আমিন, শ্রমিক, সাধারণ সম্পাদক,
সিফ্‌ট কমিটি, কালুর ঘাট, চট্টগ্রাম
ন্যাপ (ভাসানী) সমর্থক শ্রমিক সংগঠন।

১৩৩. রেজাউল হক, বরিশাল, সমর্থক,
ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন), ঢাকা, বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১৩৪. লুৎফর রহমান, কুষ্টিয়া, সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি,
ন্যাপ (ভাসানী), সভাপতি, জেলা কমিটি, কুষ্টিয়া,
ন্যাপ (ভাসানী), সমর্থক কৃষক সংগঠন।

১৩৫. লুৎফর রহমান খান লোকন, ছাত্র, সাধারণ সম্পাদক,
কেন্দ্রীয় কমিটি, ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)।

১৩৬. শফিউদ্দীন আহমেদ, ছাত্র, ডিগ্রীস্তর,
সভাপতি, মহাকুমা শাখা, চাঁদপুর, কুমিল্লা
ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)।

১৩৭. শফিকুর রহমান বাদশা, রাজশাহী,
সাংগঠনিক সম্পাদক, জেলা কমিটি, রাজশাহী,
ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)।

১৩৮. শরিয়ত উল্লাহ, আদমজী, আদমজী এমপ্লয়ীজ
ইউনিয়ন, সদস্য, কার্যকরি কমিটি। শ্রমিক-কৃষক
সমাজবাদী দল-এর সমর্থক শ্রমিক সংগঠন।

১৩৯. শহীদুজ্জামান (বেন্টু), যশোর,সাধারণ সম্পাদক,
কে.সি. কলেজ ছাত্র সংসদ, ঝিনাইদহঃ সাধারণ
সম্পাদক, মহকুমা কমিটি, ঝিনাইদহ,
ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)।

১৪০. শহিদুল ইসলাম, ছাত্র, নবম শ্রেণী,প্রচার সম্পাদক,
থানা কমিটি, কালিগঞ্জ, যশোর, থানা ছাত্র সংগ্রাম
পরিষদের অন্যতম সদস্য, ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)।

১৪১. শামসুল আলম, কুষ্টিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক,
জেলা কমিটি, কুষ্টিয়া, আওয়ামী লীগ।

১৪২. শামসুল হুদা, বরিশাল, সক্রিয় সংগঠক,
ন্যাপ (ভাসানী) সমর্থক, শ্রমিক সংগঠন, সদস্য,
গোপন কমিউনিষ্ট পার্টি (পিকিংপন্থী)।

১৪৩. শামসুজ্জোহা মানিক, দিনাজপুর, জেলা সংগঠক,
কৃষক সমিতি, ন্যাপ (ভাসানী) সমর্থক।

১৪৪. শাহনেওয়াজ, ঢাকা, ক্রীড়া সম্পাদক,
ঢাকা হল ছাত্র সংসদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ছাত্রলীগ।

১৪৫. শুকুর আহমেদ, চাকুরী যুগ্ম সম্পাদক,
কো-অপারেটিভ জুট মিলস্‌ ওয়ার্কাস, ফেডারেশন,
আওয়ামী লীগ সমর্থক, ঢাকা।

১৪৬. সংকর চন্দ্র সাহা, ছাত্র, থানা কমিটি সদস্য,
দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)।

১৪৭. সাইদুল ইসলাম, ঢাকা, সহ-সাধারণ সম্পাদক,
ঢাকা ওয়াসা কর্মচারী, ইউনিয়ন,
ন্যাপ (মোজফফ্‌র সমর্থক)।

১৪৮. সাইফুল ইসলাম, রাজশাহী
সাধারণ সম্পাদক, রাজশাহী জেলা শাখা
ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)।

১৪৯. সামসুল হক খান, ফরিদপুর,
সাধারণ সম্পাদক, ওয়াপদা শ্রমিক ফেডারেশনের
কেন্দ্রীয় কমিটি, ন্যাপ (ভাসানী)।

১৫০. সালাউদ্দিন ইউসুফ, খুলনা
সাধারণ সম্পাদক, খুলনা নগর আওয়ামী লীগ।

১৫১. সিদ্দীক আহমেদ সরদার, শ্রমিক আদমজী
৬ দফা পন্থী আওয়ামী লীগের সমর্থক শ্রমিক
সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যকরি কমিটির সদস্য।

১৫২. সুনীল রায়, রাজনীতি
সদস্য, জেলা কমিটি, ঢাকা,
কমিউনিষ্ট পার্টি (মনিসিং)।

১৫৩. সুলতান হাফিজ রহমান, চট্টগ্রাম
সাধারণ সম্পাদক, চট্টগ্রাম জেলা শাখাঃ
ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)।

১৫৪. সৈয়দ মাসুদ রুমী, কুষ্টিয়া,
সভাপতি, জেলা কমিটি, কুষ্টিয়া,
সহ-সভাপতি, কেন্দ্রীয় কমিটি, ন্যাপ (ভাসানী)।

১৫৫. হাফিজা বেগম, রাজশাহী
সহ-সাধারণ সম্পাদিকা, রাজশাহী
জেলা কমিটি, আওয়ামী লীগ।

Dhaka University Institutional Repository

১৫৬. হারুন অর রশিদ, বরিশাল,
সাংগঠনিক সম্পাদক, কোহিনূর ক্যামিক্যাল কোঃ,
ঢাকা শাখা, ন্যাপ (মোজফফর)
সমর্থক শ্রমিক সংগঠন।

১৫৭. হারুনর রশিদ খান, শ্রমিক, আদমজী
সভাপতি, সৃজনী সাংস্কৃতি সংস্থা,
আওয়ামী লীগ সমর্থক।

১৫৮. হারুন অর রশিদ, শ্রমিক আদমজী সদস্য,
শ্রমিক লীগ, আদমজী শাখা।

১৫৯. হারুন উর রশিদ চৌধুরী, চিটাগাং
সহ-সভাপতি, জগন্নাথ কলেজ ছাত্র সংসদ,
ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)।

১৬০. হাসানুল ইসলাম, পাবনা,
সাংস্কৃতিক সম্পাদক, জেলা কমিটি
পাবনা, ছাত্রলীগ।

১৬১. হিরণ মিয়া, ময়মনসিংহ
সভাপতি, কাদেরিয়া টেক্সটাইল মিলস্
শ্রমিক ইউনিয়ন, ন্যাপ (ভাসানী) সমর্থক
শ্রমিক ফেডারেশনের সদস্য।

১৬২. হেমায়েত উদ্দিন, বরিশাল,
সহ-সভাপতি, মহকুমা কমিটি,
আওয়ামী লীগ, সদস্য, বরিশাল জেলা কমিটি।

Dhaka University Institutional Repository

সংযোজনী–৩

প্রশ্নমালা

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক কর্মীদের রাজনৈতিক মতামত ও সামাজিক অবস্থানকে চিহ্নিত করার লক্ষ্যে এ জরিপটি পরিচালনা করা হচ্ছে। উত্তরদাতাদের কাছে অনুরোধ, তারা যেন উত্তর দিতে গিয়ে ঠিক ১৯৬৮–৬৯ সালে যেভাবে চিন্তা করতেন উত্তরে তারই প্রতিফলন ঘটান; পরবর্তী উপলব্ধিসমূহের প্রতিফলন যেন এখানে না ঘটে। আপনার এ সহযোগিতার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

লেনিন আজাদ
পি.এইচ.ডি গবেষণা ফেলো
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

১. নামঃ
২. পিতার নামঃ
৩. বর্তমান বয়স ঃ
৪. স্থায়ী বাসস্থানঃ গ্রাম/শহর
৫. স্থায়ী বাসস্থান শহরে হলে কোন শহরঃ ঢাকা/রাজশাহী/চিটাগাং/খুলনা/অন্য কোন জেলা শহর/অন্যান্য শহর
৬. নিজ জেলা শহরের নাম বলুনঃ
৭. পিতার কর্মক্ষেত্রঃ
৮. গ্রামে কি আপনার পরিবারের কোন বাড়ী ছিল? হ্যাঁ/না

উত্তর হ্যাঁ হলে, সে সময় আপনার গ্রামীণ পরিবারের ভূমি কাঠামোর একটি বিবরণ দিন ঃ

বাসস্থানের অধীন জমি	নিজ চাষের অধীন জমি (একর)	পতিত জমি (একর)	বর্গা দেওয়া জমি (একর)	বর্গা নেওয়া জমি(একর)	অন্যান্য জমি (একর)

৯. (ক) আপনার পারিবারিক কাঠামোর একটি বর্ণনা দিন

ক্রমিক নং	আপনার সাথে সম্পর্ক	বয়স	শিক্ষা	প্রথম পেশা	দ্বিতীয় পেশা
১.					
২.					
৩.					
৪.					
৫.					
৬.					
৭.					
৮.					
৯.					

খ. এর বাইরে আর কোন নির্ভরশীল সদস্য থাকলে তাদের বিবরণ দিন।

Dhaka University Institutional Repository

১০. সে সময় আপনার পরিবারের বার্ষিক আয় কাঠামোর একটি পরিচয় দিন (সে সময়ের মূল্যে)

কৃষি থেকে আয় (টাকা)	ব্যবসা থেকে আয় (টাকা)	চাকুরী থেকে আয় (টাকা)	অন্যান্য পেশা থেকে আয় (টাকা)

১১. আপনি সে সময় কি ধরণের রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন ? উদার গণতন্ত্র/সমাজতন্ত্র ইসলামিক ব্যবস্থা/ইসলামিক সমাজতন্ত্র/কোন কিছুতে বিশ্বাস ছিলনা/অন্যান্য (উল্লেখ করুন)।

১২. এ বিশ্বাসের পিছনে আপনার পরিবারের কারো কি কোন ভূমিকা ছিল? হ্যাঁ/না।

উত্তর হ্যাঁ হলে, কি ধরণের ভূমিকা তিনি পালন করেছিলেন?

(ক) প্রত্যক্ষভাবে আলাপ আলোচনা করতেন
(খ) আলোচনা করতেন এবং বইপুস্তক পড়তে দিতেন
(গ) তার ব্যক্তিত্ব ও কর্মকান্ডে আপনি প্রভাবিত হয়েছিলেন
(ঘ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন)

১৩. ষাটের দশকে যে সকল কারণে আপনাকে আইয়ুব বিরোধী করে তুলেছিল, সে কারণগুলিকে আপনি ক্রমানুসারে চিহ্নিত করুন। (বামপাশে বিবেচনা অনুযায়ী ১,২,৩ ...... সংখ্যা বসান)

(ক) আইয়ুব সরকার যে কোন রাজনৈতিক সমালোচনাকে কঠোর হস্তে দমন করতো
(খ) মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিতো না
(গ) সমাজের ধনিক শ্রেণীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করতো
(ঘ) অবাঙ্গালীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করতো
(ঙ) দলীয় লোকদের প্রতি প্রত্যক্ষভাবে পক্ষপাতিত্ব করতো
(চ) পূর্ব বাংলার স্বায়ত্বশাসনের দাবীর ঘোরতর বিরোধী ছিল
(ছ) বাংলাভাষা ও সংস্কৃতিকে দমন করা হচ্ছিল
(জ) পূর্ব বাংলা অর্থনৈতিকভাবে নির্যাতিত হচ্ছিল
(ঝ) মৌলিক গণতন্ত্রীদের ওপর অধিক পরিমাণে ক্ষমতা দিয়েছিল
(ঞ) আমলা সমাজের ওপর অধিক পরিমাণ ক্ষমতা দিয়েছিল
(ট) রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর নির্যাতন ও হয়রানী করতো
(ঠ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন)।

১৪. আইয়ুব সরকার বিরোধী আন্দোলনে যে সকল জনগোষ্ঠী সক্রিয়ভাবে সমর্থন জানিয়েছিল তাদেরকে ক্রমানুসারে চিহ্নিত করুন। (বাম পাশে বিবেচনা মত ১,২,৩...... সংখ্যা বসান)

(ক) ছাত্র সমাজ
(খ) বুদ্ধিজীবী সমাজ
(গ) পেশাজীবী শ্রেণী
(ঘ) স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সাধারণ কর্মচারী
(ঙ) সরকারী/আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বাঙ্গালী কর্মকর্তাগণ
(চ) ব্যাবসায়ী ও শিল্পপতি
(ছ) সংগঠিত শ্রমিক সমাজ
(জ) রিক্সাচালক, কুলি বা এ জাতীয় অসংগঠিত বিত্তহীন জনগোষ্ঠী
(ঝ) ক্ষুদে দোকানদার বা ছোট ব্যবসায়ী
(ঞ) নিম্ন বেতনভূক সরকারী কর্মচারী
(ট) ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী
(ঠ) বড় কৃষক
(ড) ক্ষুদে কৃষক
(ণ) ক্ষেতমজুর ও গ্রামীণ বিত্তহীন
(ত) অন্যান্য (উল্লেখ করুন)

১৫. যে সকল জনগোষ্ঠী আইয়ুব সরকার বিরোধী আন্দোলনে সেভাবে অংশগ্রহণ করেনী তাদেরকে ক্রমানুসারে চিহ্নিত করুন।

(ক) কৃষক জনগোষ্ঠী
(খ) সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ
(গ) বেসরকারী/আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ
(ঘ) বড় ব্যবসায়ী

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) বুদ্ধিজীবী শ্রেণী
(চ) পেশাজীবী শ্রেণী
(ছ) শিল্পপতি
(জ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন)

১৬. আইয়ুব সরকার বিরোধী আন্দোলনে যে শ্রমজীবী জনসাধারণ অংশ গ্রহণ করেছিল তাদের অংশ গ্রহণের কারণগুলিকে গুরুত্বের ক্রমানুসারে চিহ্নিত করুন।
(ক) পুলিশী নির্যাতন
(খ) সরকারী দলের মাস্তানদের দ্বারা নির্যাতন
(গ) অবাঙ্গালীদের আধিপত্য
(ঘ) ধনিক শ্রেণীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব
(ঙ) বাঙ্গালীদের প্রতি অবিচার
(চ) অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি
(ছ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন)

১৭. আপনি সে সময় যে রাজনৈতিক দল। শ্রমিকসংগঠন/কৃষকসংগঠন। ছাত্র সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন তার নাম লিখুন এবং নিজের পদাধিকার বিবরণ দিন।

....

....

১৮. আপনি কি সে সময় একথা কখনও ভাবতেন যে বাংলাদেশের জনসাধারণ কখনও স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পারে ? হ্যাঁ/না, উত্তর হ্যাঁ হলে,
(ক) আপনি কি সে সম্ভাবনাকে সমর্থন করতেন ? হ্যাঁ/না
(খ) উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান কি সে সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেয় ? হ্যাঁ/না

১৯. আপনি উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে কি চেয়েছিলেন ?
(ক) ব্যক্তি আইয়ুবের অবসান
(খ) স্বৈর শাসক আইয়ুবের অবসান ও অবাধ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা
(গ) বাঙ্গালীর আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠা
(ঘ) বাঙ্গালীর আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠা ও বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তণ
(ঙ) সমগ্র পাকিস্তানের বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তণ
(চ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন)

২০. আপনি কি মনে করতেন পশ্চিম পাকিস্তানে সেই একই সময়ে আন্দোলন গড়ে না উঠলেও আইয়ুব সরকারের পতন হত ? হ্যাঁ/না

উত্তর হ্যাঁ হলে,
(ক) আর কোন্ কোন্ সামাজিক শক্তিকে সংগ্রামে সক্রিয় করার প্রয়োজন পড়তো?
(খ) আন্দোলনের কৌশলের কোন পরিবর্তন আবশ্যক ছিল কিনা ? হ্যাঁ/না
(গ) কৌশল পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়লে সে কৌশলগুলি কি কি হতে পারতো ?
(১) আইয়ুব প্রদত্ত নির্বাচনে অংশ গ্রহণ
(২) লাগাতার ঘেরাও
(৩) লাগাতার অসহযোগ
(৪) সশস্ত্র সংগ্রাম
(৫) অন্যান্য (উল্লেখ করুন)
(ঘ) সে সময় এ সকল আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য আপনি কি মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন ? হ্যাঁ/না

২১. উনসত্তরের গণ আন্দোলনে কৃষকদের বিভিন্ন অংশের ভূমিকা কতটুকু ছিল তা চিহ্নিত করুন
(বড় কৃষক=১, মাঝারি কৃষক=২, ক্ষুদে কৃষক=৩, ক্ষেতমজুর=৪)
(ক) সক্রিয় অংশ নিয়েছিল
(খ) সক্রিয় অংশ না নিলেও সমর্থক ছিল
(গ) আন্দোলন হওয়ার মধ্য দিয়ে বা তার পরে এ আন্দোলনের সমর্থক হয়ে ওঠে
(ঘ) নিষ্ক্রিয় ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

২২. আইয়ুব খান ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করার পর এ আন্দোলন আর অগ্রসর হল না কেন?

(ক) দাবী পূরণ হয়ে গিয়েছিল

(খ) অগ্রসর করে নেবার মত রাজনৈতিক প্রস্তুতি ছিল না।

(গ) এগিয়ে নেবার মত সাংগঠনিক প্রস্তুতি ছিল না

(ঘ) নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনৈক্য দেখা দিয়েছিল

(ঙ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন)

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা দলিল পত্র

আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সাধারণ লাইন সম্পর্কে একটি প্রস্তাব (১৯৮৭)ঃ সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ১৯৬৩ সালের ৩০শে মার্চের চিঠির জবাবে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠি (১৪ই জুন ১৯৬৩) ঢাকাঃ গণ প্রকাশন।

আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত মহাবিতর্ক (১৯৯১)ঃ লেনিনবাদের সমকালীন সমস্যাবলীঃ তোগলিয়াত্তি সম্পর্কে আরো বক্তব্য চতুর্থ খন্ড, কলকাতাঃ পিপলস্ বুক সোসাইটি।

আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত মহাবিতর্ক (১৯৯০)ঃ সোভিয়েত ও চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির মতাদর্শগত মহাবিতর্কের দলিল সংকলন ১৯৬৩ প্রথম খন্ড, কলকাতাঃ পিপলস্ বুক সোসাইটি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৮২)ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ-দলিলপত্র প্রথম খন্ড, ঢাকাঃ তথ্য মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৮২)ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দ্বিতীয় খন্ড, ঢাকাঃ তথ্য মন্ত্রণালয়।

পূর্ববাংলার শ্রমিক আন্দোলনের থিসিস (১লা ডিসেম্বর, ১৯৬৮), আজাদ, আবদুর রহিম ও শাহ আহমদ রেজা (১৯৮৭)ঃ ২১-দফা থেকে ৫-দফা, ঢাকাঃ সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র।

বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি (১৯৭৩)ঃ দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত দলিলসমূহ, ঢাকাঃ সিপিবি।

সর্বহারা বিপ্লব ও ক্রুশ্চভের সংশোধনবাদ (১৯৮৬)ঃ সিপিসিইউ'র খোলা চিঠির ওপর সিপিসির অষ্টম মন্তব্য (৩১ শে মার্চ ১৯৬৪) ঢাকাঃ গণপ্রকাশন।

সাবেক ইপিসিপি(এম-এল)-এর দুটি দলিল(-)ঃ পূর্ব পাকিস্তা কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-র কর্মসূচী- জনগণতান্ত্রিক পূর্ববাংলা (১৯৬৭) ও পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) কি চায়? ঢাকাঃ প্রকাশনা বিভাগ, বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট লীগ।

বাংলা গ্রন্থ ও প্রবন্ধ

আকাশ, এম,এম (১৯৯০)ঃ ভাষা আন্দোলনঃ শ্রেণী ভিত্তি ও রাজনৈতিক প্রবণতাসমূহ ঢাকাঃ ইউ,পি,এল। গবেষণা কেন্দ্র।

আজাদ, আব্দুর রহিম ও শাহ আহমদ রেজা (১৯৮৭)ঃ বাংলাদেশের রাজনীতিঃ প্রকৃতি ও প্রবণতাঃ ২১ দফা থেকে ৫-দফা, ঢাকাঃ সমাজবিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র।

আজাদ, লেনিন (১৯৯০)ঃ 'বাংলাদেশের কৃষি কাঠামোঃ প্রত্যয়গত সমস্যা ও তিন দশকের পরিবর্তন 'Sociology and Development Edited by K.A.M. Saead uddin and et.al., Dhaka: BSA.

আবদুল্লাহ, কাজী আবু মোহাম্মদ (১৯৭০)ঃ শহীদ সোহরাওয়ার্দী, ঢাকাঃ সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ।

আরিফ, কাজী (১৯৮৯)ঃ 'তিন দশকের ছাত্র রাজনীতি ও ছাত্রলীগের ইতিহাস", তারোকালোক জানুয়ারী ১-১৪।

আহমদ, আবুল মনসুর (১৯৮৯)ঃ শেরেবাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু ঢাকাঃ আহমদ পাবলিশিং হাউস।

আহমদ আবুল মনসুর (১৯৬৮)ঃ আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান।

আহমদ, আলাউদ্দীন (১৯৮৮)ঃ 'মওলানা ভাসানী ও শাহপুর কৃষক সম্মেলন' মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

আহমদ, কামরুদ্দীন (১৯৮২)ঃ 'স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং তারপর' ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান।

আহমদ, কামরুদ্দীন (১৩৮২)ঃ বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ (দ্বিতীয় খন্ড), ঢাকাঃ ইনসাইড লাইব্রেরী।

আহমদ, ফয়েজ (১৯৮৮)ঃ 'সংগ্রামী ঐতিহ্যের জাগ্রত চেতনা মওলানা ভাসানী' মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউনেডশন বাংলাদেশ।

আহাদ, অলি (প্রকাশকাল নেই)ঃ জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-৭৫ ঢাকাঃ বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ২য় সংস্করন।

উমর, বদরুদ্দীন (১৯৮৭)ঃ ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান।

উমর, বদরুদ্দীন (১৯৮৫)ঃ পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, তৃতীয় খন্ড, ঢাকাঃ বইঘর।

উমর, বদরুদ্দীন (১৯৮৪)ঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলার কৃষক ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স।

এঙ্গেলস্, ফ্রেডারিক(-)ঃ 'জার্মানির কৃষক যুদ্ধ গ্রন্থের ভূমিকা 'মার্কস-এঙ্গেলস রচনা সংকলন, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় অংশ, মস্কোঃ প্রগতি প্রকাশন।

এঙ্গেলস্, ফ্রেডারিক(-)ঃ 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি, মার্কস-এঙ্গেলস রচনা সংকলন, ২য় খন্ড, প্রথম অংশ, মস্কোঃ প্রগতি প্রকাশন।

এঙ্গেলস্, ফ্রেডারিক(-)ঃ'ই ব্লক সামীপে চিঠি' 'মার্কস-এঙ্গেলস রচনা সংকরণ' দ্বিতীয় খন্ড' দ্বিতীয় অংশ, মস্কোঃ প্রগতি প্রকাশন।

কবীর, মফিজুল্লাহ (১৩৮২)ঃ 'পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আন্দোলনঃ তুলনার কয়েকটি দিক' ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, তৃতয়ি ও চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৮১-৮২।

কামাল, মেসবাহ (১৯৮৬)ঃ আসাদ ও উনসত্তরের গণঅভ্যুথান ঢাকাঃ বিবর্তন।

খান, আতাউর রহমান (১৯৭০)ঃ স্বৈরাচারের দশ বছর ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান।

খান, মুহম্মদ আইয়ুব (১৯৬৮)ঃ প্রভু নয় বন্ধু ঢাকাঃ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

জাহাঙ্গীর, মুহাম্মদ (সম্পাদিত) ১৯৮৭)ঃ জাতীয়তাবাদ বিতর্ক ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

খাঁ, ফজলুর রহমান (১৯৮৮)ঃ 'মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীঃ শতাব্দীর নায়ক, মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

দেহলবী, শাহেদ আহমদ (১৯৬৬)ঃ পাক-ভারত যুদ্ধ- কয়েকটি বিশিষ্ট দিক ঢাকাঃ পাকিস্তান পাবলিকেশনস্।

ফরহাদ, মোহাম্মদ (১৯৮৭)ঃ উনসত্তরের গণঅভ্যুথান ঢাকাঃ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী।

বারানত, এস;এস; (১৯৮৬)ঃ পূর্ববাংলাঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের বৈশিষ্ট (১৯৪৭-১৯৭১) ঢাকাঃ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী।

বাসার, আবুল (১৯৭০)ঃ ৬-দফা বনাম পূর্ববাংলার জাতীয় মুক্তি আন্দোলন পাবনাঃ মোফাখখার চৌধুরী।

Dhaka University Institutional Repository

Books:

Aleem-al-Razee (1988): Constitutional Glimpses of Martial Law in India, Pakistan and Bangladesh Dhaka: UPL.

Aber Crombe, Necholas and John Urry (1983): Capital, Labour and the Middle Classes London: George Allen & Unwin.

Ahmad, Kamruddin (1978): Labour Movement in Bangladesh Dhaka: Inside Library.

Ahmad, Kamruddin (1975): A Socio-Political History of Bengal and the Birth of Bangladesh Dacca: Inside Library.

Ahmed, Muneer (1964): The Civil Servants in Pakistan. Dacca: Oxford University Press.

Alamgir, Mohiuddin & Lodewijk J.J. Berlage (1974): Bangladesh: National Income and Expenditure 1949/50-1969/70 Research Monograph No.1, Dacca: BIDS.

Ali, Tariq (1970): Pakistan: Military Rule or People's Power. Delhi: Vikas Publications.

Almond, G. and J. Colemen (1960): The Politics of Developing Areas Princeton: Princeton University Press.

Altaf, Zafar (1983): Pakistan Enterpreneurs: Their Development, Characteristics and Attitudes London: Croom Helm.

Arnald F.B et. al., (1955): Pakistan: Economic and Commercial Conditions in Pakistan 1954 London: Her Majesty's Stationery Office.

Aron, Raymond (1965): Main Currents in Sociological Thought Part-1, New York: Penguin Books.

Bently, Arthus (1908): The Process of Government Chicago: University of Chicago Press.

Beteille, Andra (1977): Studies in Agrarian Social Structure. Delhi: Oxford University Press.

Bhuiyan, Md. Abdul Wadud (1982): Emergence of Bangladesh and Role of Awami League. New Delhi: Vekas Publishing House Pvt. Ltd.

Blaut, James M. (1987): The National Question - Decolonizing the theory of Nationalism London: Zed Books Ltd.

Bottomore, T.B. (1966): Classes in Modern Society London: George Allen & Unwin Ltd.

Braibanti, Ralph (1962): "Public Bureaucracy and Judiciary in Pakistan" Bureaucracy and Political Development Edited by Joseph La Palombara, Princeton: Princeton University Press.

Breuilly, John (1982): Nationalism and the State Manchester: Manchester University Press.

Burki, Shahid Javed (1971): "Interest Group Involvement in West Pakistan's Rural Works Program' Public Policy, No.19.

Burnel, Peter J. (1986): Economic Nationalism in the Third World, Colorado: Westview Press.

Callard, Keith (1957): Pakistan: A Political Study New York: The Macmillan Company.

Castle, Francis G. (1967): Pressure Groups and Political Culture: A Comparative Study London: Routledge and Kegan Paul.

Chadwick, H.M (1966): The Nationalities of Europe and the Growth of National Idiologies, Chambridge: Chambridge University Press.

Dahl, Robert A. (1967): Pluralist Democracy in the United States Chicago: Rance Mc Nally.

Davis, Horace B. (1978): Toward a Marxist Theory of Nationalism New York: Monthly Review Press.

Durkhiem, Emile (1964): The Division of Labour in Society New York: Free Press.

Dutta, K.R, Dasgupta and A. Chatterjee (1973): Bangladesh Economy: A Analytical Study Calcutta: People's Publishing House.

Finar, S.E (1958): Anonymous Empire, London: Pall Mall Press.

Frank, A.G. (1981): Crisis in the Third World, New York: Holmes and Meier Publishers.

Frank, A.G (1972): Lumpen Bourgioisie and Lumper Development: Dependency, Class and Politics in Latin America New York: Monthly Review Press.

Frank, Andre Gunder (1967): Capitalism and Underdevelopment in Latin America New York: Monthly Review Press.

Dhaka University Institutional Repository

Ghosh, Shyamali (1990): The Awami League: 1947-1971 Dhaka: Academic Publisher.

Ghose, Agha M.-ed (1968): Pakistan in the Development Decade - Problems and Performance Karachi: The Economic Development Seminar.

Giddens, Anthony (1983): A Contemporary Critique of Historical Materialism Berkeley: University of California Press.

Giddens, Anthony (1973): The Class Structure of the Advanced Societies, London: Hutchinson.

Gledhill, Alen (1957): Pakistan: The Development of its Laws and Constitutions London: Stevens of Sons Ltd.

Golay, F.H. et. al., (1969): Underdevelopment and Economic Nationalism in Southeast Asia New York: Cornell University Press.

Goodnow, Henry Frank (1969): The Civil Services of Pakistan: Bureaucracy in a New Nation, New Haven: Yale University Press.

Hagen, E.E (1962): On the Theory of Social Change, Part III, Home Wood: The Dorsey Press.

Haque, Abunasar Shamsul (1970): Administrative Reform in Pakistan, Dacca: National Institute of Public Administration.

Heberle, Rudolf (1951): Social Movement - An Introduction to Political Sociology New York: Appleton-Century-Crofts, Inc.

Holsti, Ole R. (1969): Content Analysis for the Social Sciences and Humanities, London: Addison-Wesley Publishing Company.

Jahan, Rounaq (1973): Pakistan - Failure in National Integration, Dacca: Oxford University Press.

Jannuzi, F.T and Peach, J.T (1982): The Agrarian Structure of Bangladesh: An Impediment to Development. Madras: Sangram Books.

Khan, Mahmood Hasan (1981), Underdevelopment and Agrarian Structure in Pakistan, Colorado: Westview Press.

Khan, Mohammad Mahabbat (1980): Bureaucratic Self-preservation: Failure of Major Administrative Reform Efforts in Civil Service of Pakistan, Dacca: University of Dacca.

Khan, Tamizuddin (1989): The Test of Time - my life and days, Dhaka: UPL.

Kohn, Hans (1962): The Age of Nationalism New York: Macmillan.

Lenin, V.I (1976): The State Moscow: Progress Publishers.

Miliband, Ralph (1970): The State in Capitalist Society, London: Wiedenfeld & Necolson.

Mills, C. Wright (1962): The Marxists, New York: Dell Publishing Co. Inc.

Moore, Berrington (1966): Social Origins of Dictatorship and Democracy, Boston: Beacon Press.

Nairn, Tom (1977): The Breakup of Britain, London: New Left Books.

Nayak, Pandav ed (1984): Pakistan: Society and Politics, New Delhi: South Asean Publishers Pvt. Ltd.

The Pakistan Development Review, Vol. XX, No.4.

Palombaro, J.G. La (1964): Interest Groups in Italian Politics, Princeton: Princeton University Press.

Papanek Gustav F. (1967): Pakistan's Development: Social Goals and Private Incentives Cambridge: Harvard University Press.

Papanek, Hanna (1969): `Entrepreneurs in East Pakistan' South Asian Series Research Paper No.16, Mechigan State Universtiy: Asian Studies Centre.

Patwari, A.B.M. Mofizul Islam (1988): Protection of the Constitution and Fundamental Rights Under the Martial Law in Pakistan-1958-1962 Dhaka: University of Dhaka.

Poulantzas, Nicos (1978): State, Power, Socialism London: New Left Books.

Poulantzas, Nicos (1976): The Crisis of the Dictatorship London: NLB.

Poulantzas, Nicos (1975): Classes in Contemporary Capitalism London: NLB.

Poulantzas, Nicos (1973): Political Power and Social Classes London: NLB.

Rahim, S.A (1965): Communication and Personal Influence in an East Pakistan Village Comilla: The Academy for Rural Development.

Rashiduzzaman, M (1968): Politics and Administration in the Local Councils Dacca: Oxford University Press.

Dhaka University Institutional Repository

Razee, Aleem-al (1988): Constitutional Glimpses of Martial Law -- In India, Pakistan and Bangladesh Dhaka: UPL.

Roberts, Ron E. & Robert Mash Kloss (1979): Social Movements - between the balcony and the barricade London: The C.V. Mosby Company.

Sayeed, Khalid B. (1968): Pakistan: The Formative Phase 1857-1948. London: Oxford University Press.

Sen, Anupan (1982): The State, Industrialization and Class Formation in India London: Routledge and Kegan Paul.

Sen, Rangalal (1986): Political Elites in Bangladesh Dhaka: UPL.

Shafi, M (1969): East Pakistan Labour Code-with Commentry Karachi: Bureau of London Publications.

Sills, David L. (-): International Encyclopedia of the Social Sciences. New York: The Macmillan Company & the free press.

Snyder, Louis L. (1964): The Dynamics of Nationalism: Readings in its Meaning and Development Princeton: Princeton University Press.

Sobhan, Rehman (1968): Basic Democracies, Works Programme and Rural Development In East Pakistan Dacca: Bureau of Economic Research.

Sobhan, Rehman and Muzaffar Ahmad (1980): Public Enterprise in an Intermediate Regime - A Study in the Political Economy of Bangladesh Dacca: BIDS.

Sombert, Werner (1968): Socialism and the Social Movement New York: Augustus M. Kelly Publishers.

Stein, Lorenz Von (1964): The History of the Social Movement in France - 1789-1850. Edited and translated by Dr. K. Mengelberg, New Jersey: Bedministers Press.

Stevens, Robert D. et. al., -ed (1976): Rural Development in Bangladesh and Pakistan Honolulu: An East West Center Book.

Stewart, J.D (1958): British Pressure Groups London: Oxford University Press.

Vorys, Karl Von (1965): Political Development in Pakistan Princeton: Princeton University Press.

Wallerstein, Immanual (1974): The Modern World System. New York, Academic Press Inc.

Weber, Max (1968): Economy and Society. edited by Guenther Rath, New York: Bedminister Press.

Weber, Max (1948): Essays in Sociology. Translated, Edited and with an Introduction by H.H. Gerth and C. Wright Mills, London: Rotledge & Kegan Paul Ltd.

Wilkinson, Paul (1971): Social Movement. London: Praeger Publishers.

Williams, Raymond (1961): Culture and Society: 1080-1950. Harmonds Work: Penguin Books.

Wordruff, Philip (1954): The Men who Ruled India: The Guardians. London: Janathan Cope.

Wright, Erik Olin (1978): Class, Crisis and the State London; NLB.

Articles:

Abbas, B.A. (1969): "Experiences of Major Administrative Reforms of Development" Administrative Science Review Vol.3, Dacca, September, Vol.3.

Abdullah, Abu (1976): `Land Reforms and Agrarian Changes in Bangladesh' The Bangladesh Development Studies Vol.4, No.1. Dacca, Janunary.

Abedin, Najmul (1969): "Bureaucratic Behaviour and Attitude and the Politico-Social Environment in Pakistan" Administrative Science Review Vol.3, September, Dacca.

Ahmed, Feroz (1972): "Structure and Contradiction in Pakistan". Imperialism and Revolution in South Asia Edited by Kathleen Gough and Hari P. Sharma, New York: Monthly Review Press.

Alavi, Hamza (1982): `State and Class Under Peripharal Capitalism' Introduction to the Sociology of Developing Societies edited by Hamza Alavi and Teodor Shanin, London: The Macmillan Press.

Alavi, Hamza (1976): "The Rural Elite and Agricultural Development in Pakistan", Rural Development in Bangladesh and Pakistan. Edited by Robert D. Stevens et.al., Honolulu: An East-West Centre Book.

Alavi, Hamza (1972): `The State in Post-colonial Societies: Pakistan and Bangladesh' Imperialism and Revolution in South Asia Edited by Kathleen Gough and Hari P. Sharma, New York: Monthly Review Press.

Dhaka University Institutional Repository

Amjad, Rashid (1976): "A Study of Investment Behaviour in Pakistan, 1962-70", The Pakistan Development Review, Vol. XV, No.2.

Blumere, Hurbert (1965): "Social Movements" Principles of Sociology' Edited by Alfred Mccluung lee, Inc. New York: Barnes of Nobles

Bottomore, T.B. (1964): "The Administrative Elite" The New Sociology Edited by Irving rouis Horowitz, New York: Oxford University Press.

Braibanti, Ralph (1966): Research on Bureaucracy of Pakistan Durhan: Duke University Press.

Braibanti, Ralph (1966): "The Higher Bureaucracy of Pakistan" Asian Bureaucratic System: Emergent from British Imperial Tradition Edited by Braibanti et.al., Durham: Duke University Press.

Burki, Shahid Javed (1969): "Twenty Years of Civil Service of Pakistan", Asian Survey, No. 9.

Burki, Shahid Javed (1976): "The Development of Pakistan's Agriculture: An Interdisciplinary Explanation" Rural Development in Bangladesh and Pakistan Edited by Stevens, Robert D.et.al., Honolulu: An East Center Book.

Elsenhaus, Harmut (1987): `Dependency, Under-development and the World State' Law and State - A Biannual Collection of Recent German Contributions to these Field, Institute for Scientific Cooperation, Vol.36.

Engels, Friedrich (1959): `The Origin of the Family, Private Property and the State' Marx & Engles: Basic Writings on Politics & Philosophy Edited by Lewis S. Finar, New York: Anchor Books.

Gulalp, Haldun (1987): `Capital Accumulation, Classes and the Relative Autonomy of the State' Science and Society, Vol. 51, No.3.

Hasan, Parvez (1976): "Agricultural Growth and Planning in the 1960's", Rural Development in Bangladesh and Pakistan Edited by Robert D. Stevens et. al., Honolulu: An East West Centre Book.

Heberle, Rudolf (1968): "Types and Functions of Social Movement" International Encyclopaedia of Social Sciences, New York: Colleir Macmillan.

Heberle, Rudolf (1951): `Observations on the Sociology of Social Movements' Readings in Sociology, Edited by Alfred Meclung Lee, New York: Barnes & Nobles, Inc.

Hobsbawm, Eric (1977): `Some Reflections on the Breakup of Britain' New Left Review, No.105, London.

Islam, Nazrul (1983): `The State, Industrialization and Class formation in India' The Journal of Social Studies, Vol. 20.

Krotki, Karol J. and Khalida Parveen (1976): "Population Size and Growth in Pakistan -- Early Reports of 1972 Census", The Pakistan Development Review, Vol. XV, No.3.

Kumar, Satish (1989): `Problems of Federal Politics in Pakistan' Pakistan: Society and Politics - South Ascan Studies Series 6, Edited by Pandav Nayak, New Delhi: South Asian Publishers Pvt. Ltd.

Lenin, V.I (1970): Collected Works, Vol. 23, Moscow: Progress Publishers.

Lenin, V.I. (1970): `The State and Revolution', Selected Works, Vol.3, Moscow: Progress Publishers.

Lenin, V.I. (1965): `A Great Beginning' Collected Works, Vol. 29, Moscow: Progress Publishers.

Leys, Colin (1976): `The Overdeveloped Post-colonial State: A Re-Evaluation' Review of African Economy, No.5.

Mahmood, Naushin (1978): "Literacy and Educational Attainment Levels in Pakistan: 1951-73", The Pakistan Development Review, Vol. XXII, No.3.

Maniruzzaman, Talukder (1966): "Group Interests in Pakistan's Politics", Pacific Review, Vol. 39.

Marx, Karl (1967): Capital - A Critique of Political Economy, Vol.III, New York: International Publishers.

Marx, Karl (1959): `Critique of the Gotha Program' Marx & Engels: Basic Writings on Politics & Philosophy Edited by Lewis S. Finar, New York: Anchor Books.

Miliband, Ralph (1983): `State Power and Class Interests', New Left Review, No. 138.

Nayak, Pandav (1989): `Political Economy of the State of Pakistan' Pakistan: Society and Politics, New Delhi: South Asian Publishers Pvt. Ltd.

Petras, T. and Gundle S. (1982): `A Critique of Structuralist State Theorizing', Contemporary Crisis, Vol. 6.

Poulantzas, Nicos (1976): `The Capitalist State: A Reply to Miliband and Laclau' New Left Review No.95.

Dhaka University Institutional Repository

Populantzas, Nicos (1973): `On the Classes' New Left Review No. 78.

Sayeed, Khalid, B. (1958); "The Political Role of Pakisan's Civil Services", Pacific Affairs. Vol.3. .

Sobhan, Rehman (1984): `The State and the Development of Capitalism in the Third World' The Journal of Social Studies. Vol. 25.

Soofi, Anwar Khan (1969): "Evolution of Industrial Policy and Pattern in Pakistan", Pakistan in the Development Decade: Pattern and Performance. Edited by Agha M. Ghouse, Lahore: The Economic Development Seminar.

Westergard, Kirsten (1981): `The State: A Review of Some Theoretical Issues' The Journal of Social Studies. Vol.13.

Zald, Mayer N. & Mechael A,. Berger (1978): "Social Movements in Organization: Coup d'Etat, Insurgency, and Mass Movements" American Journal of Sociology, Vol.83, No.4.

Government's Publications:

Census of Pakistan 1961 (1964): Non-Agricultural Labour Force: West Pakistan, Islamabad: GOP, Vol. 6, Part II.

Economic Research Bureau (-): Statistical Abstract of Bangladesh Calcutta: Society & Commerce Publications.

East Pakistan Provincial Assembly (1963): Assembly Proceedings (official report), Dacca: East Pakistan Government Press.

Government of East Pakistan (1965): Statistical Digest of East Pakistan, No.3, Dacca: EPBS.

Government of East Pakistan (1964): A Handbook of Basic Democracries. Karachi: GOP.

Government of East Pakistan (1963): Report of the Land Revenues Administration Enquiry Committee, 1962-63, Dacca: Revenue Department.

Government of East Pakistan (1956): Statistical Abstract for East Pakistan, Dacca: Planning Department.

Government of East Pakistan (1955): Statistical Abstract for East Pakistan - Containing Statistical data on Various Subjects for the Years 1947-48 to 1952-53. Dacca: Planning Department, GOEP.

Government of Pakistan (1956): The Economic Emergence of Pakistan (Special Emphasis on East Pakistan) Dacca: Planning Division of GOEP.

Government of Pakistan (1970): The Budget in Brief 1970-71. Islamabad: Ministry of Finance.

Government of Pakistan (1966): A Collection of the Central Acts and Ordinance for the Year 1964. Karachi: Government of Pakistan Press.

Government of Pakistan (1965): The Dacca Gezette, extraordinary. Dacca: Published by the Authority.

Government of Pakistan (1964): A Collection of the Central Acts and Ordinances for the Year 1962. Karachi: Government of Pakistan Press.

Government of Pakistan (1964): Economic Survey 1962-1963, Rawalpindi: Ministry of Finance, Government of Pakistan.

Government of Pakistan (1962): The Constitution of the Republic of Pakistan. Karachi: Government of Pakistan Press.

Government of Pakistan (-): Pakistan: Census of Agriculture 1960, Vol.1, East Pakistan, Agricultural Census Organization, Ministry of Food & Agriculture, GOP.

Government of Pakistan (1960): National Sample Survey (2nd Round), Central Statistical Office, GOP.

Government of Pakistan (1960): Report of the Commission on National Education, Karachi: Publication Department of Pak. Govt.

Government of Pakistan (1960): The Second Five Year Plan (1960-65), Government of Pakistan; Planning Commission.

Government of Pakistan (1957): Economic Survey of East Pakistan. Karachi: Central Statistical Officer.

Government of Pakistan (1956): Statistical Year Book of East Pakistan, Dacca: Planning Department, East Pakistan, Vol. III.

Dhaka University Institutional Repository

Government of Pakistan (1952): Pakistan: Constituent Assembly (Legislative) Debates, Vol. I, No.18.

Government of West Pakistan (1959): Report of the Land Reform Commission, Lahore: Government Printing, Government of West Pakistan.

Mulk, S.M. Ikhtiar ul (1968): 20 Years of Pakistan in Statistics: 1947-1967. Karachi: Central Statistical Office, GOP.

Reports:

Hazelhurst, Leeghton W. (1966): Enterpreneurship and the Merchant Castes in the Punjab City, mimeo Durham: Commonwealth Studies Centre, Duke University.

Hexner, J. Tomas (1969): `EPIDE: A Conglomerate in Pakistan - The Spin-off Process' Cambridge: Development Advisory Service' mimeo.

Khan, Mahmood Hasan (1985): Lecture on Agrarian Transformation in Pakistan, mimeo, Islamabad: Pakistan Institute of Development Economics.

Rahman, Atiqur (1979): `Agrarian Structure and Capital Formation - A Study of Bangladesh Agriculture with Farm Level Data' Ph.D Dissertation, Clare College; University of Cambridge.

Saha, Bimal Kumar (1990): `Agrarian Structure, Technological Change and Productivity: A Comparative Study of Bangladesh and West Bengal Agriculture' (Ph.D. Dissertation), Economics Department, University of Calcutta.

Sobhan, Rehman (1990): `The Economic Basis of Bangali Nationalism' memio, Dhaka; BIDS.